## Talks on Srimad Bhagavad Geeta, delivered by Swami Samarpanananda at Ramakrishna Mission Vivekananda University before the students of Indian Spiritual Heritage Course

(Transcribed and edited by Amit Ray Chaudhuri)

১৭ই জুলাই ২০১০

বেদের সময় থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত ভারতে যত আধ্যাত্মিক জ্ঞান, চিন্তাধারা ও বুদ্ধির উন্মেষ হয়েছে, সমাজে যা কিছু আচার, আচরণ, প্রথা প্রচলিত আছে, যার উপর প্রকৃত ভারতীয় সমাজ দাঁড়িয়ে আছে, এর সব কিছুই শ্রীমদ্ভাগবত গীতাতে সমন্বিত করা হয়েছে। গীতাতে অনেক ধরণের উচ্চ আধ্যাত্মিক তত্ত্ব ও বিভিন্ন আধ্যাত্মিক সাধনার পথের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যে কোন একটা আধ্যাত্মিক তত্ত্ব ও নির্দেশকে অনুসরণ করে মানুষ তার মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্যে পৌঁছে যেতে পারে। এই কারণে যে কোন মানুষের কাছে গীতা একটি অত্যন্ত কঠিণ শাস্ত্র। গীতার দর্শন এতই উচ্চ আধ্যাত্মিকত তত্ত্ব দ্বারা সমৃদ্ধ যে, যত বড় আচার্যই হোন না কেন, যত বড় পণ্ডিতই হোন না কেন গীতার সারতত্ত্বকে কয়েকটি প্রবচনের মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে বুঝিয়ে দেওয়া সত্যিই অসম্ভব। অন্য দিকে গীতা হচ্ছে মোক্ষশাস্ত্র, গীতার তত্ত্বকে যিনি ঠিক ঠিক হৃদয়ে ধারণা করে নিতে পেরেছেন, বুঝতে হবে তিনি মুক্তির পথে অনেক এগিয়ে গেছেন। এই কারণেও গীতাকে অত্যন্ত কঠিণ শাস্ত্র বলা হয়। স্বামী তুরীয়ানন্দজী বলতেন – গীতার যে কোন একটি শ্লোককে বেছে নাও, তারপর সারাটা দিন ঐ শ্লোকের অন্তর্নিহিত ভাবের উপর ধ্যান কর, এইভাবে একটি শ্লোককে এক মাস ধরে ধ্যান করে গেলে তবে সেই শ্লোকের অন্তর্নিহিত ভাবটা সুস্পষ্ট হতে থাকবে।

গীতা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত ও অদ্বৈতের আচার্যরা বিভিন্ন যুক্তি দিয়ে, ন্যায় শাস্ত্রের বিভিন্ন নিয়ম ও সংজ্ঞার সাহায্যে তাঁদের নিজস্ব দর্শনকে সামনে রেখে বোঝাতে চাইবেন গীতা তাঁর দর্শনের কথাই বলছে। একজন একটা তর্ক আনবেন, আরেকজন আরেকটি যুক্তি এনে তার বিপরীত একটা তর্ক নিয়ে আসবেন। এখানে আমরা ঐ ধরণের কোন আলোচনাই করতে যাব না। আমরা শুধু দেখব গীতা কি বলতে চাইছে, গীতার শুধু মূল ভাবকে তুলে ধরার চেষ্টাই করা হবে। অবশ্য গীতার অনেক জায়গা সত্যিই খুব কঠিন হয়ে যায়, যেখানে সঠিক ভাবকে ধরে রাখা খুব মুশকিল হয়। পনের-কুড়ি বছর ধরে কোন ভাষ্যাদিকে অবলম্বন করে নিয়মিত যদি গীতা একটু একটু করে টানা প্রতিদিন অধ্যয়ণ করা যায় তখন কোথাও কোথাও গিয়ে এর ভাবটা স্পষ্ট হতে শুরু হয়।

যে কোন আচার্যের পক্ষেই কাউকে গীতার সারতত্ত্ব কারুর মাথার মধ্যে বসিয়ে দেওয়ার কাজ প্রায় অসম্ভব, যতক্ষণ না নিজে থেকে ধারণা না হবে ততক্ষণ কিছুই বোঝা যাবে না। আচার্য শুধু ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে যাবেন, কিন্তু গীতা বুঝতে হলে নিজেকেই বুঝতে হবে, তারজন্য আগে চাই অন্তর্মুখীনতা, নিয়মিত জপ-ধ্যান করে করে মনকে অন্তর্মুখী করতে হবে। শৈশবকাল থেকে আমরা এই চোখ, কান, নাক ইত্যাদি ইন্দ্রিয়ের দ্বারাই জগতকে গ্রহণ করার শিক্ষা পেয়ে এসেছি, কিন্তু আমাদের ভেতর থেকেও যে একটা জ্ঞান হয় এই ব্যাপারটা আমাদের মাথা থেকেই বেরিয়ে গেছে। এই কারণেই গীতা বোঝা বা ধারণা করা অত্যন্ত কঠিন বলা হয়।

গীতা অধ্যয়ণের আগে আমাদের মূল কয়েকটি জিনিষকে বুঝে নিতে হবে। দর্শনের দিক থেকে চারটি বেদের সার আমরা উপনিষদে পাই, আর সব উপনিষদের সার গীতাতে পাওয়া যায়, এটা তত্ত্বের দিক থেকে বলা হচ্ছে।

মহাভারতের ভীষ্মপর্বে গীতা অন্তর্ভুক্ত। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে কৌরব ও পাণ্ডব উভয় পক্ষের রাজা, সেনাপতি, সৈন্যরা মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে, যুদ্ধ শুরু হতে চলেছে। এই যুদ্ধকে বলা হচ্ছে ধর্মযুদ্ধ, ধর্মযুদ্ধে উভয় পক্ষই মনে করছে আমরাই ঠিক। তখন অন্যান্য ক্ষত্রিয় রাজারা যে পক্ষকে ঠিক মনে করত তারা সেই পক্ষে যোগদান করে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করত। এক পক্ষ যদি মনে করে আমি ঠিক নই, তাহলে অন্যরা যুদ্ধ করতে যাবে না। আবার যারা শুধু মাত্র নিজের শক্তি ও পরাক্রম দেখানর জন্য যুদ্ধ করত, যেমন আলেকজণ্ডারের মত রাজারা যখন সাম্রাজ্য বিস্তার করতে যুদ্ধ করতে বেরিয়ে পড়তেন, তাদের কিন্তু সাহায্যের জন্য কেউ এগিয়ে আসত না। ধরে বেঁধে কাউকে জোর করে নিয়ে আসাটা অন্য জিনিষ, কিন্তু নিজে থেকে কেউ সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসত না। ভারতবর্ষে এই ধরণের যুদ্ধকে, অর্থাৎ তুমি শুধু অপরের রাজ্যকে গ্রাস করার জন্য যুদ্ধ করবে, কখনই সমর্থন করা হত না। তাহলে নিজেদের শক্তি সামর্থকে কিভাবে প্রদর্শন করবে? তখন এরা কোন একটা বিরাট যজ্ঞের আয়োজন করতেন, যেমন বাজপেয় যজ্ঞ, অশ্বমেধ যজ্ঞ, রাজসূয় যজ্ঞ এই ধরণের যজ্ঞ করতেন। আবার ছিল চক্রবর্তী যজ্ঞ। এই ধরণের যজ্ঞে দেখান হতো যে আমার শক্তির পরাক্রমের সামনে কেউ দাঁড়াতে পারবে না। এইসব যজ্ঞের জন্য প্রচুর অর্থের দরকার হত। এখন এই অর্থ কিভাবে আসবে? তখন সেই রাজার সৈন্যরা অর্থ সংগ্রহের জন্য বেরিয়ে পড়ত, বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে দিয়ে সেই সৈন্যরা যাবে। তারা কিন্তু সৈন্য পাঠিয়ে অন্য রাজ্যকে নিজের রাজ্যের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে নিত না। তোমার রাজ্য আমরা দখল করতে আসেনি, কিন্তু তুমি একটা পরিমাণ কর দিয়ে দাও, হয় যুদ্ধের আগে দিয়ে দাও, আর তা নাহলে যুদ্ধ করে সমাধান করে নাও তুমি দেবে কি দেবে না। ওরা কিন্তু বলেই নিত আমরা আমাদের শক্তি প্রদর্শন করতে এসেছি। এখন তুমিও যদি শক্তি দেখাতে চাও তাহলে যুদ্ধে নেমে ফয়সালা করে নাও।

ধর্মযুদ্ধের ক্ষেত্রে কিন্তু ব্যাপারটা পুরো আলাদা। বাজপেয়, অশ্বমেধাদি যজ্ঞাদিতে অন্যরা কেউ এগিয়ে আসত না, তারা নিজেরাই এগিয়ে যেত। ধর্মযুদ্ধে দুই পক্ষই কোন একটা ব্যাপারে বলবে এই ব্যাপারে আমিই ঠিক। তখন দুই পক্ষ থেকেই অন্যান্য

রাজাদের কাছে নিমন্ত্রণ পাঠিয়ে দেওয়া হত, সেখানে বলা হত, এই ব্যাপারটাতে আমি মনে করছি আমি ঠিক, আপনি যদি মনে করে থাকেন আমি ঠিক তাহলে আপনি আমার পক্ষে যোগদান করে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করুন। অনেক সময় এমনও দেখা গেছে যে, হয়তো আমন্ত্রিত রাজা মনে করছে যে, এ হয়তো পুরোপুরি ঠিক নয়, কিন্তু এমন একটা সম্পর্ক আছে যে, সেই সম্পর্কের খাতিরে তার বিরোধী শিবিরে না গিয়ে এই শিবিরেই যোগদান করত।

অর্জুনরা মনে করছে কৌরবরা পুরোপুরি ভুল করছে। সত্যি কথা বলতে, মহাভারত যদি খুঁটিয়ে খুব গভীর ভাবে ঠিক ঠিক পড়া হয় তাহলে বোঝা খুব মুশকিল কে ঠিক ছিল আর কার ভুল ছিল। এটাই ধর্মযুদ্ধের প্রকৃত বৈশিষ্ট্য। দ্বন্দ্ব, বৈপরিত্যের সমাবেশ এমন ভাবে থাকে যে বোঝা যায় না কোনটা ঠিক আর কোনটা ঠিক নয়, একদিক থেকে দেখলে মনে হবে এটা ঠিক, অন্য দিক থেকে দেখলে আবার মনে হবে অন্যটাই ঠিক। ধর্মযুদ্ধে আরেকটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে, তোমাকে আমন্ত্রণ জানান হয়েছে, এবার তোমাকে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করতেই হবে, কেউ না বলতে পারত না। ধর্মযুদ্ধের আরেকটি প্রধাণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যুদ্ধে এক পক্ষকে না মারা পর্যন্ত জয়পরাজয়ের কোন ফয়সালা হবে না। এক পক্ষকে মরতেই হবে।

মহাভারতে বর্ণনানুযায়ী কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের আগে অর্জুন টুকটাক এদিক সেদিক এক আধটা যুদ্ধ করেছিল, কিন্তু সেখানে কোথাও আমি মরব কি তুমি মরবে এই ধরণের যুদ্ধ অর্জুনকে কখনই করতে হয়নি। এর আগে পর্যন্ত যে যুদ্ধ করেছিল সেটা হচ্ছে আমি তোমার থেকে শক্তিমান, তুমি আমাকে মেনে নাও আমি তোমার থেকে বড় স্বীকার করে নিলেই সব মিটে যাবে। আগেকার দিনে রাজায় রাজায় যে যুদ্ধ হত সেটা রক্তারক্ত যুদ্ধ করে হয় আমি মরব না হয় তুমি মরবে, এই ধরণের হত না। এর ভালো দৃষ্টান্ত হচ্ছে বিরাট রাজ্যের যুদ্ধে। রাজা বিরাটের রাজ্যে পাণ্ডবরা অজ্ঞাত বাস করছেন। সেই সময় দুর্যোধনরা এসেছে বিরাট রাজার গোধন অপহরণ করবার জন্য। এখানে এখন এক পক্ষ নিজের সম্পত্তিকে বাঁচাতে চাইছে, আরেক পক্ষ কৌশল করে পালাচ্ছে, কিন্তু হয় তুমি মরবে না হয় আমি মরব এই অবস্থাতে কখনই যায়নি। আবার যদি কেউ তিরস্কার করে দেয় তখন পিছিয়ে আসবে। কিন্তু কুরুক্ষেত্রের এই যুদ্ধ হচ্ছে হয় তুমি বাঁচবে না হয় আমি বাঁচব। প্রথম অবস্থায় কুস্তি লড়াইয়ে আগে কোন পয়েন্টের ব্যাপার ছিল না, মাটিতে ফেলে চিৎ করে তার বুকে না বসা পর্যন্ত কোন মিমাংসা হবে না। ধর্মযুদ্ধে মৃত্যুই শেষ কথা। বন্দির কোন প্রশ্নই নেই, বন্দি হওয়া মানেই মৃত্যু, তোমাকে বধ করাটা শুধু কিছু সময়ের ব্যবধান।

এখানে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে সবাই মরার জন্য বা মারার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে। এর আগে অর্জুন এইভাবে কাউকে মারেনি। এর আগেও যুদ্ধ হয়েছে কিন্তু তোমাকে আমি বধ করার জন্যই দাঁড়িয়েছি, এই অনুভাবনা নিয়ে কোন যোদ্ধাই এর আগে দাঁড়ায়নি। অর্জুনেরও এই অভিজ্ঞতা নেই। এই কারণে অর্জুনের মনটা হঠাৎ বিচলিত হয়ে পড়েছে। যাদের কোলে পিঠে বড় হয়েছি, যাদের সাথে এক সময় খেলাধূলা করেছি, যাঁর কাছে শস্ত্রবিদ্যা, শাস্ত্রবিদ্যা পেয়েছি তাঁদেরকে শেষ করে দিতে হবে, আমি যদি শেষ না করি তাহলে তারা আমায় শেষ করে দেবে। হয় অর্জুন মরবে না হয় অর্জুন এদের মারবে। অর্জুন এখন এই অবস্থায় এসে যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়িয়েছে।

ইদানিং কালে অবশ্য এই যুদ্ধ অনেক বেড়ে গেছে। এখন জানে যে আমি যদি শত্রুকে শেষ না করে দিই শত্রুপক্ষের সৈন্য সুযোগ পেলেই আমাকে মেরে দেবে। আর আমি তো যুদ্ধে মরার জন্য যাইনি, আমি গেছি তোমাকে মারার জন্য, এই বোধটাই ইদানিং কালের যে কোন যুদ্ধে সমস্ত সৈন্যের মধ্যে গেঁথে গেছে। এই জায়গাটাতে এসে অর্জুন চিন্তা করছে আমি তো আমার আত্মীয়, বন্ধু, ভাইদেরই হত্যা করতে যাচ্ছি। এই সব চিন্তা অর্জুনের মনকে বিষাদগ্রস্ত করে দিয়েছে। তারপর তো আমরা সবাই জানি, অর্জুন তার গাণ্ডীব রথের উপর নামিয়ে রেখে বলছে আমি এই যুদ্ধ করব না। তখন শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে গীতার উপদেশ দিলেন।

আজকের দিনে হিন্দু সমাজ বলতে ঠিক ঠিক যা বোঝায়, এখনও এই সমাজ গীতার উপদেশের ভিত্তির উপরে দাঁড়িয়ে আছে। এর ভিত্তিটা হচ্ছে বর্ণাশ্রম ধর্ম। বর্ণাশ্রম ধর্মের মধ্যে দুটো জিনিষ আছে – প্রথম হচ্ছে বর্ণ এবং দ্বিতীয় হচ্ছে আশ্রম। চারটি বর্ণ – ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য আর শূদ্র আর চারটি আশ্রম হচ্ছে – ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ, বাণপ্রস্থ এবং সন্ন্যাস। গীতার প্রধান উপদেশ হচ্ছে – তোমার যাই হয়ে যাক, যে পরিস্থিতিই আসুক না কেন, কোন অবস্থাতেই তুমি তোমার বর্ণাশ্রম ধর্ম ত্যাগ করবে না। বর্ণাশ্রম ধর্মের উপরে দাঁড়িয়ে তুমি যে সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছ সেখান থেকে তুমি আর পিছিয়ে আসতে পারবে না। বাল্মীকি রামায়ণে শ্রীরামচন্দ্র যেমন বলছেন – রাম দুই রকমের কথা বলে না। কিন্তু সমস্যা হয় যখন একই লোকের দুটো ধর্মে দ্বন্দ্ব এসে যায়, যেমন ছেলে বাবার বিরুদ্ধে চলে গেছে, বাবা বলছে ছেলেকে বাড়ী থেকে বার করে দেব। এখন মায়ের মাতৃধর্ম বলছে সন্তানকে বাঁচাতে হবে আবার অন্য দিকে পতিধর্মে বলছে স্ত্রী স্বামীকে রক্ষা করবে। এই যে পরস্পর বিরোধী ভাবের সংঘাত আসছে এখানে মা তার কোন ধর্মটা পালন করবে? আসলে এর কোন উত্তর দেওয়া হয় না। সমগ্র রামায়ণ আর মহাভারতে এইসব দ্বন্দ্বগুলিকে উপস্থাপিত করা হয়েছে কিন্তু কোন ক্ষেত্রেই কোথাও এগুলোর কোন সমাধান দেওয়া হয় না।

পরাধীন ভারতবর্ষে যখন তীব্র স্বাধীনতার আন্দোলন চলছিল তখন অনেক বড় বড় স্বাধীনতা সংগ্রামী নেতারা বেলুড় মঠে এসে রাজা মহারাজা, মহাপুরুষ মহারাজদের সমালোচনা করে বলেছিলেন যে, আপনারা কেন স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ করছেন না। বেলুড় মঠ কর্তৃপক্ষ তখন স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগদান করাতো দূরে থাকুক, স্বাধীনতা সংগ্রামের সন্ত্রাসবাদীদের সাথে যারা কোন ভাবে যুক্ত রয়েছে জানতে পারলে তাদের মঠ থেকে বহিষ্কৃত করে দেওয়া হত। তাহলে কি স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী শিবানন্দ মহারাজরা কোন অন্যায় করেছিলেন? একেবারই নয়, এখানেও দ্বন্দ্ব এসে গিয়েছিল। তাঁদের কাছে ছিল একদিকে বৃহত্তর সমাজের সেবা, যেটা রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন করে চলেছে, আর অন্য দিকে হচ্ছে স্বাধীনতা সংগ্রাম যেখানে আঠারো কুড়ি বছরের ছেলেরা বোমা মারছে। সব ধরণের সংগঠণ, সমস্ত ব্যক্তিত্বকেই এই ধরণের দ্বন্দ্ব, পরস্পর বিরোধী ভাবের সঙ্কটে পড়তে হয়।

স্বামীজী বললেন ভারতের আদর্শ হচ্ছে ত্যাগ আর সেবা। এখন সেবা জিনিষটা আসলে কি? কোন্ অবস্থাতে কোন্ কার্যকে সেবা বলা হবে? এখন স্বামীজী বললেন প্লেগের সেবাতে টাকা পয়সা কুলোচ্ছে না, বেলুড় মঠ বিক্রী করে দেওয়া হোক, আমরা কৌপিন পড়া সাধু, গাছতলার সাধু গাছতলাতেই থেকে লোকের সেবা কর। আবার অন্য দিকে শ্রীমা, যিনি অনেকবার বলছেন – তোমরা গাছতলার সাধু, তোমাদের সেবার জন্য আবার চাকর বাকর রাখা কেন, সেই শ্রীমাই আবার এই ক্ষেত্রে বলছেন – বেলুড় মঠ কি নরেনের একার নাকি, ও কি বিক্রী করবে মঠ! প্রায়ই বক্তারা ভাষণে এই কথাই বলেন যে, মা বেলুড় মঠকে রক্ষা করলেন, খুবই ঠিক বলেন, কিন্তু স্বামীজীর সম্বন্ধে যখন ভাষণ দেওয়া হয় তখন একবারও বলা হয় না যে, স্বামীজী এতই আবেগপ্রবণ ছিলেন যে শ্রীশ্রীমা তাঁকে ধমক দিয়ে থামিয়ে দিয়েছিলেন। একদিকে আর্তের সেবার জন্য স্বামীজী মঠকে বিক্রী করে দিতে চাইছেন, অন্য দিকে শ্রীমা এক ধমকে আটকে দিয়ে বলছেন, একটা সেবাতেই মঠকে বিকিয়ে দেওয়া যাবে না, মঠ থাকলে ভবিষ্যতে আরও যখন দুর্ভিক্ষ, বন্যা হবে তখন সেই সময় পীড়িতদের সেবা করা যাবে। কে ঠিক ছিলেন সেবার ব্যাপারে? ঠিক ঠিক উত্তর দেওয়া খুব কঠিণ। একটা অবস্থায় প্রত্যেককেই এই ধরণের দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হতে হয়ে। এই ধরণের দ্বন্দ্বে কখনই বলা যায় না যে এটা ঠিক আর এটা ঠিক নয়, যেটা বলা যায় সেটা হচ্ছে, দুটোর মধ্যে যে কোন একটাকে তোমায় বেছে নিতে হবে, একটা পথ অবলম্বন করলে এই এই অসুবিধা সুবিধা হবে আর অন্য পথে গেলে অন্য ধরণের সুবিধা অসুবিধা হবে। আমাকেই একটা দিক ঠিক করে নিতে হবে, এই ঠিক করে নেওয়ার ব্যাপার যখন আসে তখন বর্ণাশ্রম ধর্মকে কিন্তু কোন অবস্থাতেই ছাড়া যাবে না।

কিন্তু বর্ণাশ্রম ধর্মের ক্ষেত্রেও এই পরস্পর বিরোধী ভাবের সংঘাত আসবে। এখন যেমন অর্জুনের ক্ষত্রিয় ধর্ম ও রাজধর্ম বলছে তোমার শত্রুকে একেবার সমূলে নাশ করে দাও, আবার অন্য দিকে অর্জুনের পারিবারিক ধর্ম বলছে আমি এদের কি করে হত্যা করব, ইনি আমার ঠাকুর্দা, ইনি আমার গুরু, ইনি আমার কাকা, ইনি আমার মামা, ইনি আমার দাদা, ইনি আমার ভাই ইত্যাদি। বাল্মীকি রামায়ণে প্রতি পদে পদে শ্রীরামচন্দ্রকে এই ধরণের ধর্ম সঙ্কটের মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে, একদিকে মাতৃধর্ম বলছে তোমার মাকে দেখতে হবে, মায়ের সেবা করতে হবে, আবার অন্য দিকে বাবাকে কথা দেওয়া হয়ে গেছে, একদিকে বালিকে লুকিয়ে বধ করতে হবে, অন্য দিকে মিত্রধর্মে বলছে বন্ধুকে রক্ষা করতে হবে, একদিকে এত বড় নর সংহার হতে চলেছে, যেখানে লঙ্কার পুরো সৈন্যদের বিনাশ করে দিতে হবে, অন্য দিকে তাঁর ক্ষত্রিয় ধর্ম বলছে তোমার অপমান, তোমার কলঙ্ককে ঘোচতে হবে। প্রত্যেকের জীবনেই বার বার এই ধরণের অনেক চৌমাথার মোড় এসে যায়, যেখানে এসে তাকে একটা পথই বেছে নিতে হবে। আর আমি যে পথেই যাই না কেন, কলঙ্ক আমার হবেই, কলঙ্কিত দুই দিক দিয়েই হতে হবে। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর সব কিছু মিটে যাওয়ার পরেও শেষ অবধি পর্যন্ত যুধিষ্ঠিরের পাপবোধ ছিল। আর যদি যুদ্ধ না করত তাহলেও পাপবোধ থাকত। দ্বন্দ্বাত্মক পরিস্থিতিতে যেটাই করা হোক না কেন পাপবোধ দুটোতেই থাকবে। কিন্তু আমাকে যে কোন একটা পথকেই বেছে নিতে হবে, এই বেছে নেওয়ার মধ্যে শুধু একটা জিনিষকেই মাথায় রাখতে বলা হচ্ছে যে, কোন অবস্থাতেই বর্ণাশ্রম ধর্মকে যেন না ছাড়া হয়। আবার যদি কোন কাজ বর্ণাশ্রমের মধ্যে না আসে তখন সেই কাজ তো কোন ভাবেই করা যাবে না, উপরন্তু এই ব্যাপারে কোন আলোচনাই করা হবে না।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পটভূমিতে দাঁড়িয়ে যে ব্যাপারটা হয়েছে তা হল, বর্ণাশ্রমের উপরে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে অর্জুন যুদ্ধ করতে এসেছে। এর আগেই বিরাট রাজার রাজদরবারে সমস্ত কথাবার্তা আলোচনা যা হওয়ার হয়ে গেছে, আর অর্জুনও নিজেকে প্রস্তুত করে নিয়েছেন যে আমি যুদ্ধ করব। তারপর যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগের মুহূর্তে অর্জুন পুরো একশ আশি ডিগ্রী ঘুরে গিয়ে বলছে – আমি যুদ্ধ করব না। শ্রীরামচন্দ্র যেমন বলে দিয়েছেন আমি বনে যাব, তখন তাঁর বাকি সমস্ত ধর্ম, রাজধর্ম, মাতৃধর্ম পড়ে রইল, এইটাই হবে, রাম দুই রকমের কথা বলে না। অর্জুন আগে বলে দিয়েছে – হ্যাঁ আমি যুদ্ধ করব, কিন্তু এখন পিছিয়ে এসে বলছে আমি যুদ্ধ করব না। এই ধরণের আচরণ কোন সুধীজনের কাছ থেকে কাম্য নয়। রাজা বিরাটের দরবারে বসে যখন সবাই নানান রকমের আলোচনা করছিলেন, তখনই যদি অর্জুন বলে দিতেন যে আমি এই যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করব না, তাহলে কিন্তু ততটা দোষযুক্ত হত না। কিন্তু অর্জুন তো তা করেননি, একবার যখন তুমি স্থির করে নিয়েছিলে আর তুমি পিছিয়ে আসতে পারো না, যুদ্ধ তোমাকে করতেই হবে, হয় তুমি মরবে আর তা নাহলে তোমার আত্মীয় বন্ধু বান্ধবরা মরবে। গীতা আলোচনা করার আগে এই জিনিষটাকে খুব ভালো করে আমাদের বুঝে নিতে হবে, তা নাহলে গীতার মূল বক্তব্যকে আমরা ধরতেই পারব না।

এই ব্যাপারটা অর্জুনকে যখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বুঝিয়েছেন তখন তাকে দুটো দিক থেকে বুঝিয়েছেন। একটা হচ্ছে উচ্চ আধ্যাত্মিক তত্ত্বের দিক থেকে, উচ্চ আধ্যাত্মিক তত্ত্বের দিক দিয়ে আলোচনা করে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলছেন, তুমি যদি উচ্চ বেদান্তের দিক দিয়ে দেখো তাহলে এই ধরণের যুদ্ধে শত্রু বধে কোন দোষ নেই। আর যদি পারমার্থিক দৃষ্টি দিয়ে না দেখে জাগতিক দৃষ্টি দিয়েও দেখতে চাও তাহলে জাগতিক ক্ষেত্রে বর্ণাশ্রম ধর্মই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ ধর্ম এবং বর্ণাশ্রম ধর্মানুসারে এই যুদ্ধে তোমাকে তোমার পিতামহ, গুরু, মামা, কাকা, ভাই, বন্ধু সবাইকে বধ করতেই হবে। পারমার্থিক আর জাগতিক এই দুটো দিক দিয়ে যুদ্ধ করাটাই হচ্ছে একমাত্র সঠিক পথ, যুদ্ধ না করাটাই অধর্ম। পুরো গীতাতে এই দুটো জিনিষকে নিয়েই শ্রীকৃষ্ণ বাচ খেলার মত খেলিয়ে গেছেন। অর্জুন হয় তুমি পারমার্থিক তত্ত্বকে নিয়ে চল, আর নয়তো জাগতিক মতকে নিয়ে চল, এই দুটোর মধ্যে যে কোন একটাকে তো তোমাকে নিতেই হবে। পারমার্থিক তত্ত্ব হচ্ছে আত্মা ছাড়া কিছু নেই, শরীরের মৃত্যুতে এদের কারুরই মৃত্যু হবে না, সেইজন্য এদের বধ করাটা তোমার পক্ষে কোন দোষের হবে না। আর যদি তুমি বল, আমি পরামার্থ বুঝি না, পারমার্থিক তত্ত্ব সম্বন্ধে আমার কোন ধারণা নেই, আত্মা, ব্রহ্ম, অবিনশ্বর, এইসব বড় বড় তত্ত্ব আমি ধারণা করতে পারছিনা। ঠিক আছে, তোমাকে বুঝতে হবে না, তাহলে তোমাকে আমি জাগতিক ধর্ম বলছি। জাগতিক ধর্ম হচ্ছে বর্ণাশ্রম ধর্ম। বর্ণাশ্রম ধর্মের বিচারে এই ধর্মযুদ্ধে হয় তুমি এদের বধ করবে নয়তো এরা তোমাকে বধ করবে। তোমার বক্তব্য হচ্ছে এদের হত্যা করলে দোষ হবে, আমি আমার জ্ঞাতি ভাই, সখা বন্ধুদের বধ করি তাহলে আমার কত বড় পাপ লাগবে। কিন্তু তুমি ক্ষত্রিয়, ক্ষত্রিয় ধর্মানুসারে এদের মারাটাই হচ্ছে তোমার ধর্ম, এতে কোন দোষই তোমার হবে না।

এখন অর্জুন তো এত বোকা নয়, আর একেবারেই কিছু জানে না, বোঝে না, তা নয়। তাহলে অর্জুন কি করে এই মারাত্মক ভুল সিদ্ধান্ত নিচ্ছে? ভুল এই কারণেই যে, অর্জুনের কথাগুলো এখন আর ধর্মে প্রতিষ্ঠিত নয়। অর্জুন এখন মোহগ্রস্ত হয়ে আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েছে। ধর্মের ক্ষেত্রে আবেগপ্রবণতাকে কোন মূল্যই দেওয়া হয় না। যখন স্বামীজী বেলুড় মঠ বিক্রী করতে চাইছেন তখনও তিনি আবেগপ্রবণতায় আপ্লুত হয়ে বলছেন, তাই ঐ কথার কোন গুরুত্ব নেই। জাগতিক দিকে থেকে যদি বিচার করা হয় তাহলে প্রথমত বেলুড় মঠের জমি স্বামীজীর নামেই নয়, দ্বিতীয়তঃ, বেলুড় মঠ বিক্রী করলে কটা টাকাই বা হত, আর সেই টাকা দিয়ে কটা লোককে কত দিন খাওয়াতে পারত, একটা ত্রাণেই যদি মঠকে বিক্রী করে দেওয়া হত তাহলে আজকে এত সন্ন্যাসীরা কেউ মঠে যোগ দেওয়ার সুযোগ পেত না, আর এতো বড় সঙ্ঘও গড়ে উঠত না, এতো সেবাকার্য, এতো ধর্মপ্রচারও হত না। শ্রীশ্রীমা তাঁর দূরদর্শিতা দিয়ে বেলুড় মঠকে বাঁচালনে। ধর্মের ব্যাপারে ভাবাবেগের কোন স্থান নেই। অর্জুন এখন যেটা বলছেন, সেটা ভাবাবেগের দ্বারা চালিত হয়ে বলছেন।

আধ্যাত্মিক আর জাগতিক ধর্ম, এই দুটোই হচ্ছে সমগ্র গীতার মূল দর্শন। বেদে চারটে পুরুষার্থের কথা, ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের কথা বলছে, গীতা কিন্তু অর্থ আর কামের কথা বলবে না, এখানে ধরেই নেওয়া হয়েছে যে যদি তুমি ঠিক ঠিক বর্ণাশ্রম ধর্মে প্রতিষ্ঠিত থাক তাহলে তোমার অর্থ আর কামের পুর্তি এমনিতেই হবে, কোথাও কোথাও একটু সামান্য হয়ত ছুঁয়ে যাবেন। গীতা বর্ণাশ্রম ধর্ম সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বলবে – তুমি যদি বর্ণাশ্রম ধর্ম পালন কর তাহলে তোমার জাগতিক অভ্যুদয় হবে আর মৃত্যুর পর স্বর্গে যেতে পারবে। দ্বিতীয় হচ্ছে মোক্ষ, গীতা হচ্ছে আসলে মোক্ষশাস্ত্র। মোক্ষের ব্যাপারে, মুক্তির কথাতে যা যা বক্তব্য থাকতে পারে সব কিছুই গীতাতে পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন। একটা কাপড়কে সঠিক ভাবে জানতে গেলে যেমন প্রত্যেকটি সূতোকে আলাদা করে দেখতে হবে, ঠিক তেমনি শ্রীকৃষ্ণ মুক্তির ব্যাপারে যা যা বলার থাকতে পারে সবই তিনি নানা দিক দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন। তাই হিন্দু ধর্মের যা কিছু আছে তার সবটাই গীতাতে সূত্রাকারে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। সূত্রাকারে থাকার জন্য একেকটি শ্লোককে বোঝার জন্য বা বোঝাবার জন্য দুই এক ঘণ্টা কোন ব্যাপারই নয়। আর শ্লোকের ভাবকে, যে তত্ত্বটা বলতে চাইছেন, সেটাকে হৃদয়ঙ্গম করতে আরো অনেক বেশি সময় ব্যয় করতে হবে।

কোন কোন মহল থেকে গীতাকে নিয়ে কিছু প্রশ্ন করা হয়, যদিও ইদানিং কালে এই প্রশ্ন করার হিড়িকটা আগের তুলনায় অনেক কমে গেছে। তুবও এখানে আমাদের সেই প্রশ্নগুলোকে জেনে রাখা ভাল, যদি সেই রকম কোন প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয় তখন যেন আমাদের অপ্রস্তুত না হয়ে যেতে হয়। যেমন গীতা কি আদৌ মহাভারতের অন্তর্ভুক্ত? শ্রীকৃষ্ণ বলে আদপে কেউ ছিলেন কিনা? আর অর্জুন বলে কেউ ছিলেন কিনা? চতুর্থ প্রশ্ন কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ বলে সত্যিই কোন যুদ্ধ হয়েছিল কি, না এটা নিছক কাল্পনিক? এগুলো সবই ঐতিহাসিক প্রশ্ন। এমনও হতে পারে গীতা এমনিতেই মহাভারতের কিন্তু তাই বলে বাকী জিনিষগুলো যে ঠিক তা নয়, ওগুলো ব্যাসদেবের কল্পনাও হতে পারে। শ্রীকৃষ্ণ বলে কেউ ছিলেন হয়তো কিন্তু তাই বলে যে যুদ্ধ হয়েছিল আর তিনি সেখানে গীতার উপদেশ দিয়েছিলেন তার প্রমাণ কোথাও নেই। আমি থানায় পুলিশকে গিয়ে বললাম, স্যার, ঐ গাছের তলায় একটা খুন হয়েছিল। পুলিশ প্রমাণ চাইবে। আমি বলছি, চলুন আমি ঐ গাছটাকে দেখিয়ে দিচ্ছি। কিন্তু গাছটাকে দেখিয়ে দিলেই কি খুন হয়েছে এটা প্রমাণিত হয়ে যাবে। ঠিক সেই রকম শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন বলেই যে যুদ্ধ হয়েছে, শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন বলেই যে গীতার উপদেশ হয়েছে, তার কোন প্রমাণ নেই। আবার অন্য দিকে শ্রীকৃষ্ণ বলে কেউ থাকলেও থাকতে পারেন, কিন্তু অর্জুন বলে কেউ নাও থাকতে পারে। অথবা সবই ছিল, গীতা মহাভারতের অঙ্গ ঠিকই, শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন বলে কেউ ছিলেন ঠিকই কিন্তু কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ আদপেই হয়নি, এটাও হতে

পারে। আরও বড় আপত্তি করা হয় যে, চারটেই ঠিক, গীতা মহাভারতের অন্তর্ভুক্ত, শ্রীকৃষ্ণও ছিলেন, অর্জুনও ছিলেন আর যুদ্ধও হয়েছিল, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ আদপে কোন উপদেশই দেননি। শ্রীকৃষ্ণ যে উপদেশই দেননি এই বক্তব্যের সপক্ষে বলা হয়ে থাকে, যেখানে সৈন্যরা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে এক অপরের গলা কাটার জন্য দাঁড়িয়ে আছে সেখানে এতক্ষণ ধরে একজনকে উপদেশ দেওয়াটা একটা অবাস্তব কাণ্ড। পুরো গীতা যদি টানা পাঠ করা হয় তাহলে খুব কম করে হলেও দু'ঘণ্টা সময়তো লাগবেই। কৌরব আর পাণ্ডব দু'পক্ষ মুখোমুখি যুদ্ধের জন্য দাঁড়িয়ে আছে আর তার মাঝখানে এসে দু'ঘণ্টা ধরে উপদেশ দিচ্ছেন, এটা কি কখন বিশ্বাস করা যায়? এতক্ষণ ধরে ভাষণ দিয়ে যাচ্ছেন যার শ্রোতা মাত্র একজন, সেখানে ভীম বা অন্য কেউ এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করছেন না যে যুদ্ধের সময় এগুলো কি হচ্ছে? আবার তাও ছন্দোবদ্ধ ভাবে গুছিয়ে বলছেন।

এই যত গুলো গীতাকে নিয়ে আপত্তিকর মন্তব্য বলা হল এর কোনটাই যুক্তিতে টিকবে না। গবেষকদের পিএইচডি করতে গিয়ে কিছু নতুন মৌলিক চিন্তা ধারা দেখাতে হয়, তাই তখন কি করবে, এই ধরণের কিছু জিনিষকে নিয়ে এসে একটা থিসিস দাঁড় করিয়ে দেন। এখন আর এগুলোকে নিয়ে কেউ বেশি মাতামাতি করে না, তার কারণ এরা যেসব আপত্তি তুলেছিল তার উত্তর দিয়ে দেওয়া হয়েছে, সেই উত্তরের জবাবে এরা আর কোন বক্তব্য দাঁড় করাতে না পারার ফলে এগুলোকে নিয়ে এখন আর তেমন হৈচৈ হয় না। স্বামীজীর সময়ে, বিশেষ করে ইংল্যাণ্ডে এগুলো নিয়ে বিশেষ চর্চা ছিল, তাই স্বামীজীও এই সব প্রশ্ন গুলি নিয়ে কিছু কিছু আলোচনা করেছেন। এদের কাছে গীতা যেন কিছু দিন আগের জিনিষ। এমনও আছে অনেকে সরাসরি বলেন যে গীতা আসলে শঙ্করাচার্যেরই রচনা, শঙ্করাচার্য নিজে গীতা লিখে মহাভারতে ঢুকিয়ে ব্যাসদেবের নামে চালিয়ে দিয়েছেন। এদের যদি মহাভারত একটু খতিয়ে পড়া থাকত, সাথে সাথে শঙ্করাচার্যের ভাষ্যকেও যদি পড়া থাকত তাহলে এই ধরণের মন্তব্য এরা করতে পারতেন না।

গীতা কি সত্যিই মহাভারতের অঙ্গ, না প্রক্ষিপ্ত? এর উত্তরে বলা হয়, মহাভারতের যে ভাষা আর গীতার ভাষার মধ্যে কোথাও এতটুকু পার্থক্য নেই। সেইজন্য মহাভারত আলাদা আর গীতা আলাদা বিশ্বাস করার কোন কারণ থাকতে পারেনা। আধ্যাত্মিক দিক থেকে আর সামাজিক দিক থেকে গীতার যা বক্তব্য, মহাভারতেরও ঠিক একই বক্তব্য। এখন গীতাকে যদি কেউ মহাভারতের প্রক্ষিপ্ত অংশ বলে তাহলে পুরো মহাভারতকেই প্রক্ষিপ্ত বলতে হবে, তখন আর গীতাকে নিয়ে প্রশ্ন হবে না, প্রশ্ন তখন মহাভারতকে নিয়েই উঠে আসবে। গীতা মহাভারতের অংশ নয় এটা তাই কখনই বলা যায় না, মহাভারতের অংশ হতে বাধ্য।

এবার প্রশ্ন হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণ, অর্জুন আর গীতাতে শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ দানকে নিয়ে। এর মধ্যে একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে, ভারতের যে কোন শাস্ত্রে ব্যক্তির বাহ্যিক রূপের কোন মূল্য ছিল না, ব্যক্তি সত্তার বদলে এখানে মূল্য দেওয়া হয় শাস্ত্র কি বলতে চাইছে। যদি আগামিকাল প্রমাণিত হয়ে যায় যে শ্রীরামকৃষ্ণ বলে কেউ ছিলেন না, আর তার সাথে এটাও যদি প্রমাণিত হয়ে যায় যে শ্রীম বলে কেউ ছিলেন না, তাহলে কথামৃতের তত্ত্বকথা গুলো কি সব মিথ্যা হয়ে যাবে? কোন দিনই তা হবে না। কথামৃত হচ্ছে একটা চিন্তাধারার অভিব্যক্তি। যার মাথা থেকে এই চিন্তাধারার গুলো বেরিয়েছে, যার মুখ দিয়ে উচ্চ তত্ত্বের বাণী গুলো বেরিয়েছে, সেই লোকটির কোন গুরুত্ব এখানে নেই। এখানে গুরুত্ব হচ্ছে সেই উচ্চ চিন্তাগুলো, মানবজাতির কাছে যা চিরন্তন, শাশ্বত। গীতাও হচ্ছে একটা উচ্চ ভাবাদর্শকে বাস্তবায়িত করার বিজ্ঞান সম্মত পদ্ধতি, এখানে আদপে শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন কিনা, অর্জুন ছিলেন কিনা সেটা কোন ব্যাপারই নয়। আমরা এই উচ্চ ভাবাদর্শের গভীর চিন্তনকে নিয়েই নিজেদের ব্যস্ত রাখি, এই চিন্তাধারাই আমাদের জীবনের রহস্য। কিন্তু কাদের কাছে ব্যক্তিত্ব একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়? পাশ্চাত্যের বস্তুবাদী গবেষকদের কাছে।

আরেকটি অভিযোগ হচ্ছে, গীতার রচনাকালকে নিয়ে, এদের মতে গীতা কিছু দিন আগের রচনা। আসল কথা হচ্ছে একবার যদি প্রমাণ করে দেওয়া যায় যে গীতা হচ্ছে যিশু খ্রীষ্টের আগে, তাহলে খ্রীষ্টান ধর্মের কাছে সেটা প্রচণ্ড গাত্রদাহের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। ব্রিটিশরা ছিল রাজা, ভারত তার গোলাম। রাজা যদি দেখে তার গোলামরা তার চিন্তাধারা থেকে অনেক উন্নত, তখন রাজা এটাকে কিছুতেই মানতে চাইবে না। রাজার সমান যেন কেউ না হতে পারে। গীতা যদি যিশুর পঞ্চাশ বছর আগে বলে প্রমাণিত হয়ে যায় তাহলে খ্রীশ্চানদের তো আর কোন দামই থাকবে না। সেইজন্য ব্রিটিশরা উঠে পড়ে লেগে গেল প্রমাণ করতে যে, গীতা হচ্ছে যিশু খ্রীষ্টের অনেক পড়ে। কিন্তু ইদানিং কালে আমেরিকা, ইংল্যাণ্ডের নতুন যারা গবেষকরা আসছেন তারা এখন খোলাখুলি বলছেন যে, ভারতে যখন বেদ, উপনিষদ, রামায়ণ রচিত হয়েছিল তখন তো আমাদের পূর্বজরা অত্যন্ত জংলী, বর্বর ছিল। এখন সব দিক দিয়েই এই জিনিষগুলো প্রমাণিত হয়ে গেছে তাই বর্তমান যুগে সবাইকেই গীতার প্রাচীনত্বকে মানতে বাধ্য হচ্ছে।

গীতার এই কাল সম্বন্ধে শঙ্করাচার্য খুব সুন্দর কথা বলছেন – শ্রীকৃষ্ণ যুদ্ধক্ষেত্রে অর্জুনকে যা কিছু উপদেশ দিয়েছিলেন, সেই উপদেশ গুলিকে বাছাই করে ব্যাসদেব সাতশটি শ্লোকে ছন্দোবদ্ধ করে দিলেন। কোন কোন বইতে গীতায় শ্রীকৃষ্ণ এই বলেছিলেন না বলে, মহাভারতে ব্যাসদেব এই রকম বলেছিলেন বলে যেটা বলছেন সেটা গীতারই শ্লোক বলছেন। তার মানে একদিকে বলা যায় গীতা হচ্ছে ব্যাসদেবের চিন্তা প্রসুত, কেননা ব্যাসদেব এটা রচনা করেছিলেন, আবার অন্য দিকে বলা যায় গীতা হচ্ছে ভগবানের কথা। কেন ভগবানের কথা? কারণ ভগবান যা কিছু অর্জুনকে বলেছিলেন, ঠিক সেই জিনিষটাকেই ব্যাসদেব গুছিয়ে সাতশটি শ্লোকে ছন্দোবদ্ধ ভাবে সাজিয়ে দিলেন। তার মানে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে হয়তো পাঁচ মিনিট কি দশ মিনিট, কিংবা খুব বেশি

হলে আধঘণ্টা বলেছিলেন, তার বেশি বলেননি। কিন্তু ব্যাসদেব এটাকেই যেটা অর্জুনকে বলা হয়েছিল, সাতশ শ্লোকে লিপিবদ্ধ করে দিলেন।

দুই দেশের বিদেশ সচিবের সঙ্গে যখন কথা হয় তখন সচিবদের আলোচনা করার আগে সরকার থেকে দুটো কি তিনটে কথা বলে দেওয়া হয়, যেমন ভারতের বিদেশ সচিবকে বলে দেওয়া হল, সন্ত্রাসবাদীদের ব্যাপারটা সামনে নিয়ে আসবে, কাশ্মীরের ব্যাপারটা উঠতে দেবে না, আর যেটাই বলবে মিষ্টি করে বলবে। এরা এর বেশি কিছু বলবে না, বাকিটা হচ্ছে বিদেশ মন্ত্রীর কাজ। এখন বিদেশ মন্ত্রী যা কিছু বলবে, যা কিছু সই করবে সেটা ভারত সরকারেরই বক্তব্য হয়ে যাবে। এখন বিদেশ মন্ত্রী যদি এর বাইরে গিয়ে নিজে থেকে কিছু উল্টোপাল্টা কথা বলে থাকেন তাহলে সেটা একদিক দিয়ে দেখতে গেলে বিদেশ মন্ত্রীর কথা আবার অন্য দিক দিয়ে ভারত সরকারেরই কথা হয়ে যাবে, দুই দিক থেকেই দেখা যায়। ঠিক সেই রকম গীতার কথাও দুই দিক থেকেই দেখা যেতে পারে, এক দিয়ে গীতার কথা ব্যাসদেবের কথা, আবার অন্য দিক থেকে দেখতে গেলে গীতার যা কথা বলা হয়েছে সবই ভগবানের কথা। যার যেমন শ্রদ্ধা ভক্তি সে সেই রকমই বলবে, যার শ্রদ্ধা ভক্তি খুব গভীর সে বলবে গীতার কথা ভগবানেরই কথা। আবার শ্রদ্ধা ভক্তি কম থাকলে বলবে গীতার কথা হচ্ছে ব্যাসদেবের কথা। জীবনে যদি শান্তি পেতে চাই তাহলে সব সময় আমাদের পরম্পরাতে যা বলা আছে সেটাতেই বিশ্বাস রাখতে হবে। পরম্পরাতে বলা হয়ে আসছে গীতার সব কথাই হচ্ছে ভগবানের কথা।

গীতাকে মোক্ষশাস্ত্র বলা হচ্ছে, তাকেই মোক্ষশাস্ত্র বলা হয়, যে শাস্ত্র অধ্যয়ণ করে অনুধ্যান করলে মানুষ মুক্তি পেয়ে যায়। গীতার তত্ত্বকে যদি কেউ ঠিক ঠিক বুঝে নিয়ে জীবনে পালন করতে পারে তাহলে সে মুক্তির পথে এগিয়ে যেতে পারবে। কথামৃত, উপনিষদকেও একই কারণে মোক্ষ শাস্ত্র বলা হয়। গীতা, কথামৃত, উপনিষদ পড়লে কি ফল পাওয়া যাবে? মোক্ষ ফল পাওয়া যাবে। অন্য দিকে বাল্মীকি রামায়ণকে মোক্ষশাস্ত্র বলা যায় না।

গীতাকে উপনিষদের সার বলা হচ্ছে। তবে কোন কোন জায়গায় এসে গীতা উপনিষদ থেকে একটু আলাদা হয়ে যায়। যেমন, উপনিষদে আত্মশ্রদ্ধার কথা বলা হয়। কঠোপনিষদে বলা হচ্ছে নচিকেতার মধ্যে শ্রদ্ধার জন্ম হল। কিসের প্রতি শ্রদ্ধা জন্মাল? নিজের প্রতি, এটাকেই বলা হচ্ছে আত্মশ্রদ্ধা। একটা দৃঢ়তা, হ্যাঁ আমার মধ্যে একজন অন্তর্যামী আছেন, আত্মাই সত্য বাকি সব মিথ্যা। এই দৃঢ় ধারণা থেকেই জন্ম হয় আত্মশ্রদ্ধার, নিজের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস। উপনিষদে যত কাহিনী আছে, যাজ্ঞবল্ক্যের কাহিনী, সত্যকামের কাহিনী, আরণ্যকের কাহিনী, সব কাহিনীতে আত্মশ্রদ্ধাকেই খুব বেশি করে সামনে নিয়ে আসা হয়েছে। নিজের উপর বিশ্বাসটাই হচ্ছে একমাত্র সম্বল, কারণ উপনিষদে ভগবানের কথা বলা হয় না, বিশেষ করে আমরা যেভাবে ভগবানের কথা বলি সেই ভাবে ভগবানকে সামনে আনা হয় না। ঈশ্বর শব্দ এক আধ বার উপনিষদে এসেছে, কিন্তু সেই অর্থে আসেনি যে অর্থে আমরা ঈশ্বরকে জানি। উপনিষদের সব কিছুতেই হচ্ছে 'আমি'। এই 'আমি'টা কে? এই দেহ, মন, বুদ্ধির সঙ্গে যুক্ত 'আমি'র কথা উপনিষদ বলছে না, ভেতরে যিনি অন্তর্যামী আছেন, আত্মা রূপে যিনি আছেন তাকেই এই 'আমি' রূপে ইঙ্গিত করা হচ্ছে। গীতাতে এই আত্মশ্রদ্ধাই ভক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে ভক্তিশাস্ত্রে ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি রূপে প্রকাশিত হয়। গীতাতে আত্মশ্রদ্ধার 'আত্মার' জায়গায় ঈশ্বর এসে যান আর 'শ্রদ্ধার' জায়গায় 'ভক্তি' এসে যায়। কথামৃতে এক ভক্ত ঠাকুরকে বলছেন – যখন আমরা ভগবানের পূজা করি তখন আমরা আসলে আত্মারই তো পূজা করছি, মানে নিজেরই পূজা করি। তখন ঠাকুর বলছেন – ওটা বড় উঁচু কথা। উঁচু কথা হলেও ব্যাপারটা একই, আত্মা আর ঈশ্বরের কোন প্রভেদ নেই এবং শ্রদ্ধা আর ভক্তিও কোন আলাদা কথা নয়, আমরা প্রায়ই বলি – শ্রদ্ধা ভক্তি করতে শেখনি?

ঠাকুর বলছেন আত্মার কথা, আত্মশ্রদ্ধার কথা অনেক উঁচু কথা। কারণ সাধারণ লোকেরা বুঝতে পারে না, বুঝলেও ঠিক ঠিক ভাবকে আশ্রয় করতে পারেনা। সেইজন্য উপনিষদ সাধারণ মানুষের জন্য নয়। উপনিষদের তত্ত্বকে ধারণা করতে যে মনের অধিকারী হতে হয় সেই মনই এখনও আমাদের তৈরী হয়নি। গীতা কিন্তু সবার জন্যই পথের ব্যবস্থা করে দিয়েছে। আমাকে কি করতে হবে? ঈশ্বরকে ভক্তি করতে হবে? ঈশ্বর কে? এই জগতকে চালানোর জন্য অমানবীয় শক্তির অধিকারী একজন আছেন। আচ্ছা বুঝলাম ঈশ্বর হচ্ছেন সর্বশক্তিমান, তা আমাকে কি করতে হবে? তখন গীতা বলে দিচ্ছে, ভক্তি করতে হবে। কিভাবে করব? *পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং* – ফল, ফুল, জল দিয়ে তাঁকে ভক্তিভাবে নিবেদন করবে। এটাই হচ্ছে সাধারণ মানুষের সহজ পথ। এইটাই হচ্ছে উপনিষদ থেকে গীতার সব থেকে বড় পরিবর্তন – আত্মশ্রদ্ধা থেকে ঈশ্বর ভক্তিতে।

গীতার আরেকটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে, গীতা হচ্ছে সমন্বয় শাস্ত্র। সমন্বয় হচ্ছে, সব কিছুকে মিলিয়ে একটা সামঞ্জস্য তৈরী করে এগিয়ে যাওয়া। যেমন জ্ঞান ও ভক্তির সমন্বয়, কর্ম ও জ্ঞনের সমন্বয়, বিভিন্ন ধরণের যত দর্শন আছে তার সাথে সমন্বয়। অনেক বাদ্য যন্ত্র আছে, তাদের বিভিন্ন রকমের আওয়াজ, কিন্তু যখন ঐকতান হয় তখন আর বিভিন্ন বাদ্য যন্ত্রের আর আলাদা আওয়াজ বোঝা যায় না। গীতাও সব রকম দর্শন ও তত্ত্বকে এক করে একটা ঐকতান সৃষ্টি করেছে। এই ঐকতান আমরা তিনটি শাস্ত্রে খুব বেশি করে দেখতে পাই, মূল সমন্বয় করা হয়েছে মহাভারতেই, কিন্তু দর্শনের দিক দিয়ে মূল সমন্বয় এই তিনটি শাস্ত্রেই আছে – প্রথম সমন্বয় আমরা পাই গীতাতে, তারপর দ্বিতীয় পাই শঙ্করাচার্যের ভাষ্যে আর তৃতীয় পাই ঠাকুরের কথামৃতে। এই

তিনটিই হচ্ছে মূল শাস্ত্র যেখানে হিন্দুধর্মে যত রকমের মত আছে সবগুলোকে ঠিক ঠিক সমন্বয় করা হয়েছে। অধ্যাত্ম রামায়ণেও সমন্বয় করা হয়েছে, কিন্তু যেহেতু অধ্যাত্ম রামায়ণ অতটা জনপ্রিয় নয় বলে নাম করা হয়নি। মানব জীবনের সাফল্যের ক্ষেত্রেও তাইই হয়, যে সমন্বয় করতে পেরেছে সেই জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছে। যারা সমন্বয় করতে পারে না, তারাই শেষ পর্যন্ত কোথায় হারিয়ে যায়, পরে আর তার চিহ্ন পর্যন্ত থাকে না। যারা বলছে, আমিই ঠিক বলছি, আমার ধর্মই ঠিক বলছে, এরা কিন্তু জগতের জাঁতাকলে পিষে যায়।

গীতা প্রবৃত্তিমার্গ আর নিবৃত্তিমার্গ এই দুটোকেই আলোচনা করবে। ধর্ম তখনই পূর্ণ ধর্ম হয়, যেখানে যারা সংসারে থাকতে চাইছে তার জন্যও শিক্ষা থাকবে, আবার যারা সংসারকে ছেড়ে বেরিয়ে গিয়ে পুরোপুরি ত্যাগ ও বৈরাগ্যের পথকে বেছে নিয়েছেন, তাঁর জন্যও প্রয়োজনীয় শিক্ষার কথা থাকবে। গীতাতে পরিষ্কার ভাবে প্রবৃত্তিমার্গ আর নিবৃত্তিমার্গের কথা বলা হয়েছে। দুটো সার তত্ত্বকে নিয়ে আসা হয়েছে, একটা হচ্ছে আত্মাই আছেন, যারা এই তত্ত্বকে নিয়েই আছেন তারা হচ্ছেন নিবৃত্তিমার্গি, যারা এটা পারছে না তারা বর্ণাশ্রম ধর্ম পালন করছে, বর্ণাশ্রম ধর্ম মানে প্রবৃত্তিমার্গ। নিবৃত্তিমার্গে হচ্ছে যাঁরা বর্ণাশ্রম ধর্মের পারে চলে যান, এঁরাই হচ্ছেন ঠিক ঠিক সন্ন্যাসী, তাঁরা বুঝে গেছেন আত্মা ছাড়া আর কিছু নেই। এখন এই আত্মাকে উপলব্ধি করার জন্য তাঁর জীবনকে গুরুর নির্দেশ মত চালিত করেন। সেইজন্য তাঁদের বিষয় ভোগাদি থেকে বিরত থাকতে বলা হয়য়। এই কারণেই তাঁদের গেরুয়া কাপড় পড়িয়ে দেওয়া হয় যাতে তাঁদের আর কামনা, বাসনা বলে  কিছু না থাকে, আত্মা ছাড়া আর কিছু নেই তাঁদের কাছে, এখানে শরীরেরও কোন স্থান নেই। যাদের কাছে শরীর মনের স্থান আছে তারা বর্ণাশ্রম ধর্ম পালন করবে। বর্ণাশ্রম ধর্মের কথা কিছুটা গীতাতে বলা হয়েছে আর বেশির ভাগটা স্মৃতিগ্রন্থে বিশেষ করে মনুস্মৃতি, যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতিতে বলা হয়েছে।

গীতার আরেকটি বিরাট বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে জিনিষটা ছোট্ট আকারে আছে বলা হয়েছে, সেটাই আবার বৃহৎ আকারেও আছে বলা হয়েছে। যেমন অর্জুনকে ভগবান বলছেন বর্ণাশ্রম ধর্মনুসারে জীবনকে পরিচালিত করতে, আবার অন্য দিকে বলছেন এই যে বিশাল বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এটিও একট মহাজাগতিক ধর্মানুসারে চলছে। প্রত্যেক জীবন যেমন একটা ধর্মের উপরে ভিত্তি করে চলছে, ঠিক তেমনি এই জগতটাও একটা ধর্মের ভিত্তিতে চলছে। আবার এক জায়গায় ভগবান মানুষের জন্ম-মৃত্যুর যেমন আলোচনা করছেন অন্য জায়গায় এই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়ের চক্রকে নিয়েও আলোচনা করছেন। মানে যেটা ছোটতে আছে সেইটাই আবার বৃহতেও আছে, যেটা ক্ষুদ্র অনুতে রয়েছে সেটাই আবার মহতে রয়েছে। চৈতন্যের যে ক্ষুদ্র সংস্করণ রূপে হৃদয়ে বিরাজ করছেন, সেই চৈতন্যই সর্বব্যাপী রূপে বিরাজিত। জীবাত্মারও কথা বলা হচ্ছে আবার পরমাত্মা বা ব্রহ্মেরও কথা বলা হচ্ছে। গীতাতে এক সঙ্গে সব কিছুকে নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

গীতা হচ্ছে ব্যবহারিক দর্শন, পাশ্চাত্যের যত দর্শন তার বেশির ভাগই হচ্ছে অনুমানের উপর দাঁড়িয়ে, বাস্তবিক জীবনের সাথে কোন সম্পর্কই নেই। গীতা কাকে উপদেশ দেওয়া হচ্ছে? একজন বিষাদযুক্ত লোককে এই উপদেশ দেওয়া হচ্ছে। তার মানে, কারুর জীবনে যদি দুঃখ কষ্ট থাকে তাহলে গীতা তার জন্যই। গীতার উপদেশ কে দিচ্ছেন? শ্রীকৃষ্ণ, যিনি একদিকে একজন মহান কর্মবীর আবার যুদ্ধ সঞ্চালনেও যিনি শ্রেষ্ঠ, আবার অন্য দিকে প্রচণ্ড যুদ্ধের মধ্যে তিনি প্রশান্ত, সহাস্য বদন। কোথায় এই উপদেশ দিচ্ছেন? যুদ্ধক্ষেত্রে। আমাদের প্রত্যেকের নিজ নিজ সংসারটাও একটা ছোটখাট যুদ্ধক্ষেত্র, যদিও কুরুক্ষেত্রের মত অত বিশাল যুদ্ধক্ষেত্র নয়। যেখানে অনবরত ব্রহ্মাস্ত্র থেকে শুরু করে বিভিন্ন আগ্নেয়াস্ত্রে ছুটে আসছে সেখানে দাঁড়িয়ে যদি গীতার উপদেশ পালন করা যেতে পারে, সেই তুলনায় আমাদের সংসার অনেক শান্ত। আর অর্জুনের তুলনায় আমাদের বিষাদও কম। আবার শ্রীকৃষ্ণের মাথায় যে ধরণের বুদ্ধি আমাদের মাথার বুদ্ধি সেই বুদ্ধির ধারে কাছে যাবে না। তার মানে গীতাতে একেবারে সর্বোচ্চ পর্যায়ের জিনিষ গুলোকে নেওয়া হয়েছে। অর্জুনের অত্যন্ত বিষাদযুক্ত থেকে শুরু করে অত যুদ্ধের মধ্যেও শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত শান্ত আবার প্রচণ্ড সক্রিয়। যে কাউকে যদি গীতা পড়তে দেওয়া হয় আর সে যদি বলে আমারতো দুঃখের শেষ নেই, আমার গীতা পড়ে কি হবে? তাকে বলতে হবে গীতাতো তাকেই বলা হয়েছিল যে মহা দুঃখের সাগরে নিমজ্জমান ছিল। তাই গীতার দর্শন ব্যবহারিক জীবনেও খুবই বাস্তবসম্মত।

গীতার শেষ কথা হচ্ছে *সর্বধর্মাণ্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ*। তুমি বর্ণাশ্রম ধর্ম পালন আর যাই কর না কেন, সবার শেষে তুমি তোমার যাবতীয় যা কিছু আছে সব ভগবানের চরণে সমর্পণ কর। সমস্ত কিছু সমর্পণ না করে তাঁর শরণাগত না হলে তোমার এই জন্ম-মৃত্যুর চক্র ঘুরতেই থাকবে।

গীতা কিসের জন্য? আর কি সমস্যাকে নিয়ে আসা হয়েছে? এই ব্যাপারটাকে প্রথম অধ্যায়ে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়েছে। সেই সমস্যার সমাধান দ্বিতীয় অধ্যায়ে সূত্রাকারে দেওয়া হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায় থেকে সপ্তদশ অধ্যায় পর্যন্ত, মানে পরের পনেরটা অধ্যায়ে সমাধানটাকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। অষ্টাদশ অধ্যায়ে গিয়ে পুরো জিনিষটাকে গুটিয়ে আনা হয়েছে। গীতার চারটে বিভাগ – প্রথম বিভাগ হচ্ছে যেখানে সমস্যাটাকে আনা হয়েছে। সমস্যাটা কি? শোক আর মোহ থেকে বেরোব কি করে। অর্জুনের ক্রন্দন দিয়ে শুরু করা হয়েছে। দ্বিতীয় বিভাগ হচ্ছে ভগবান এই সমস্যা থেকে কিভাবে বেরিয়ে আসবে বলছেন, অর্থাৎ শোক মোহ থেকে কিভাবে

বেরোন যায়। সমাধানটা তিনি সংক্ষেপে বলে দিচ্ছেন। সংক্ষেপে বলে দিলে ঠিক ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। তৃতীয় বিভাগে করলেন কি – তৃতীয় অধ্যায় থেকে সপ্তদশ অধ্যায় পর্যন্ত দ্বিতীয় অধ্যায়ে যা বলা হয়েছে, সেটারই একেকটি অংশকে টেনে নিয়ে এসে ব্যাখ্যা করা হল। যেমন তৃতীয় অধ্যায়ে কর্মযোগ নিয়ে আলোচনা করছেন আবার পঞ্চদশ অধ্যায়ে গিয়ে পুরুষোত্তমযোগ আলোচনা করছেন। দ্বিতীয় অধ্যায়ে 'গুণ' একটি শব্দ বলে বলেছিলেনে – *ত্রৈগুণ্যবিষয়াবেদা,* এখন ত্রৈগুণ্যটা কি, সেটাকে টেনে নিয়ে চতুর্দশ অধ্যায়ে গিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করছেন। দ্বিতীয় অধ্যায়ে স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ নিয়ে বলেছেন, সেটাকেই আবার ত্রয়োদশ অধ্যায়ে গিয়ে ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞযোগে গিয়ে এর উপর আলোচনা করছেন। যা কিছু দ্বিতীয় অধ্যায়ে সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে সেটাকেই পনেরোটা অধ্যায়ে ব্যাখ্যা করে গেছেন। অষ্টাদশ অধ্যায়ে গিয়ে পুরো জালটাকে গুটিয়ে নেওয়া হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে ক্ষিদে পেয়েছে, মাছ খেতে হবে। মাছ ধরার জন্য দ্বিতীয় অধ্যায়ে জালটাকে ছোঁড়া হয়েছে। পনেরটা অধ্যায়ে জালটাকে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। তারপর যখন দেখা গেল এর বেশি আর মাছ ধরার নেই, তখন অষ্টাদশ অধ্যায়ে জালটাকে গুটোতে আরম্ভ করা হয়েছে।

অর্জুন যখন বিষাদগ্রস্ত হয়ে গেছেন তখন ভগবান তাঁকে দুটো দিক থেকে বোঝাচ্ছেন, একটা হচ্ছে পারমার্থিক সত্য আরেকটি হচ্ছে ব্যবহারিক জগৎ। পারমার্থিক সত্তার দিক থেকে যখন বোঝাচ্ছেন, তখন বলছেন আত্মা ছাড়া আর কিছুই নেই। ব্যবহারিক জগৎকে নিয়ে যখন বোঝাচ্ছেন, তখন বলছেন এই জগৎ যেটা চলছে সেটা বর্ণাশ্রম ধর্মের উপর নির্ভর করেই চলছে। যিনি স্রষ্টা, ঈশ্বর, তিনিই এই বর্ণাশ্রম ধর্মকে প্রবর্তন করেছেন। বর্ণাশ্রম ধর্ম কিন্তু আম্বেদকর রচিত ভারতীয় সংবিধানের মত নয়। সংবিধানের বিভিন্ন ধারাকে যে এখন পাল্টানো হচ্ছে, এটাকে কে পাল্টাচ্ছে? পার্লামেন্ট ঠিক করে দিচ্ছে। বর্ণাশ্রম ধর্ম কিন্তু এইভাবে আসেনি। বর্ণাশ্রম ধর্ম আগে থাকতে সমাজে অনুসৃত হয়ে আসছিল। বাল্মীকি রামায়ণেও শ্রীরামচন্দ্র বলছেন আমার ক্ষত্রিয় ধর্মকে এইভাবে অপমান করা হয়েছিল সেইজন্য আমি রাবণকে মেরেছি। মানে তখনও বর্ণাশ্রম ধর্ম ছিল। মহাভারতেও বর্ণাশ্রম ধর্মকে নতুন করে নিয়ে আসা হয়নি, আগে থেকে যা ছিল সেটাকেই আলোচনা করা হয়েছে। বর্ণাশ্রম এত প্রাচীন কাল থেকে চলে আসছে যে, হিন্দুরা মনে করে এটা ঈশ্বর প্রদত্ত।

একটা বই যখন লেখা হয় তখন তার একটা উদ্দেশ্য থাকবে। আচার্য শঙ্কর গীতা ভাষ্যে গীতার উদ্দেশ্য বলতে গিয়ে বলছেন, গীতার উদ্দেশ্য হচ্ছে *'সংসারস্য অত্যন্ত উপরমলক্ষণম্'*, সংসার বৃক্ষের শেকড়টাকে উচ্ছেদ করে দেওয়াই হচ্ছে গীতার মূল উদ্দেশ্য। সংসার বলতে আচার্য ঘর সংসারের কথা বলছেন না, এই সংসার হচ্ছে শরীর, মন, জগৎকে নিয়ে যেটা চলছে। এই সংসার কোথা থেকে এসেছে, কেন এসেছে এই জিনিষটা আবার বিস্তৃত আলোচনা করা হবে পঞ্চদশ অধ্যায়ের পুরুষোত্তম যোগে। সংসারের মূল উচ্ছেদ করলে কি হবে? *নিঃশ্রেয়সং,* শুধু শ্রেয় নয়, নিঃশ্রেয়স। সেই শ্রেষ্ঠ পদ, যার থেকে আর কিছু শ্রেষ্ঠ হয় না। এই সংসারকে উৎখাত করে দিলেই সেই শ্রেষ্ঠ পদ লাভ হবে। আমাদের যত দুঃখ, কষ্ট, এই সব কিছুর মূলে সংসারটা আছে বলে। কিভাবে সংসারকে উচ্ছেদ করতে হবে গীতাতে এইটাই বলা হয়েছে।

তোমার মনের অবস্থা যখন সেই অবস্থায় যাবে যখন তুমি দেখবে আত্মাই সব, আত্মাই যখন সব কিছু হয়েছেন তাহলে তোমার আর কিছুতে জড়াতে হবে না, আত্মার আনন্দেই মগ্ন হয়ে থাক। যদি তোমার মন সেই অবস্থায় না এসে থাকে তাহলে তুমি বর্ণাশ্রম ধর্ম পালন কর। বর্ণাশ্রম ধর্ম পালন করতে করতে সব কিছু ভগবানের শ্রীচরণের সমর্পণ করার মনোভাব তৈরী করে নিতে থাক। বর্ণাশ্রম ধর্মের মাধ্যমে যা কিছু করা হচ্ছে তার সব কিছুই ভগবানের চরণে সমর্পণ করে দিতে হবে, এইটাই হচ্ছে শরণাগতি। সব কিছু সমর্পণ করে দিতে দিতে এক সময় এই সংসার বৃক্ষের শেকড় আপনা থেকেই উৎপাটিত হয়ে যাবে।

গীতাতে ঘুরে ঘুরে একটা কথা বার বার বলা হবে, সেটা হচ্ছে অনাসক্তি, অনাসক্ত হয়ে সব কর্ম করার কথা অনেকবার বলা হয়েছে। তিনিই মহাপুরুষ, যিনি অনাসক্ত। শুকদেব ছিলেন স্বাভাবিক অনাসক্ত। সনক, সনন্দন, সনৎ ও সনাতন এনারাও ছিলেন স্বাভাবিক অনাসক্ত। বাকীদের জন্য হচ্ছে অনাসক্তির অনুশীলন করা। অনুশীলন করতে করতে ঐ অবস্থাতে পৌঁছে যাওয়া যায়। শ্রীরামচন্দ্র জঙ্গলে গেছেন, রাবণ সীতাকে অপহরণ করে নিয়ে গেছে, কত কষ্ট, কত চোখের জল ফেলছেন। কিন্তু যুদ্ধের সময় তিনি পুরো অনাসক্ত হয়ে গেছেন। যার জন্য যুদ্ধের পর সীতাকে বলছেন – হে জনকদুহিতা, তুমি জেনে রাখ, আমি কোন নারীর কামে বশীভূত হয়ে মোহে পড়ে এত বড় যুদ্ধ করিনি। আমি ক্ষত্রিয়, আমার উপর একটা কলঙ্কের বোঝা চেপে গিয়েছিল, সেই কলঙ্কটাকে আমি দূর করলাম। কিভাবে করলেন? অনাসক্ত ভাবে। রাবণকে বধ করতে হবে। রাবণকে বধ করা এখন তাঁর কর্তব্য হয়ে গেছে, এইটাই ধর্ম, সীতাকে পাবার জন্য নয়, লঙ্কার রাজা হতে চাইছেন তাও না। আমার এইটাই কর্তব্য, রাবণকে বধ করতে হবে। শ্রীরামচন্দ্রের চরিত্র ঠিক ঠিক বুঝতে হলে বাল্মীকি রামায়ণ পড়তে হবে, বাল্মীকি রামায়ণ না পড়লে ধর্মতত্ত্বও ঠিক ঠিক বোঝা যায় না। পরের দিকে অধ্যাত্ম রামায়ণে, রামচরিতমানসে ভক্তি ভাব এত এসে গেছে যে, ভক্তিরসের মধ্যে শ্রীরামচন্দ্রের আসল মানব চরিত্র ঢাকা পড়ে যায়। যখনই আমি বলে দেব যে, শ্রীরামচন্দ্র হচ্ছেন অবতার, তারপরে তার সম্বন্ধে আর কোন কথাই বলা যাবে না।

অনেকে কথায় কথায় বলেন যে যারা ঝগড়া করে তাদের মনে কামনা বাসনা আছে বলেই ঝগড়া করছে। তাহলে শ্রীরামকৃষ্ণ আর হৃদয়রাম তো প্রায়ই ঝগড়া করতেন, তাই বলে কি শ্রীরামকৃষ্ণের মনে কি কামনা বাসনা ছিল, না আসক্তি ছিল?

তখন বলবে শ্রীরামকৃষ্ণ অবতার, অবতারকে এখানে নিয়ে আসা যাবে না। যারা অবতার মানে না, তারা তাহলে কি শিখবে? গীতাতেই আছে শ্রেষ্ঠ পুরুষরা যেমন যেমন আচরণ করেন ইতর জনরাও সেই রকম আচরণ করে। যিনি বলছেন কামনা বাসনা থাকলেই ঝগড়া করবে ঠিকই বলছেন, ঠাকুর কখনই ঝগড়া করতেন না, তাঁর মধ্যে কোন আসক্তি বা কামনা বাসনা ছিল না। শ্রীরামচন্দ্র যদি সত্যিকারের একজন মহাপুরুষ হন তিনি কখনই একটা মেয়ের জন্য এত বড় নরসংহার করবেন না। ধর্মের জন্য করবেন, তাও অনাসক্ত হয়ে করবেন। বালি বধের ক্ষেত্রেও মিত্র ধর্ম পালন করতে হবে, মিত্র ধর্ম পালন করতে গিয়ে যদি কাউকে বধ করতে হবে, তবে তাই করতে হবে, সেখানেও অনাসক্ত। কিন্তু সাধারণ লোকরা এই ব্যাপার গুলোকে বুঝতেই পারেনা। তখন বলবে বালির স্বর্গে যাওয়ার কথা, অবতারের হাতে মরলেই সে স্বর্গে যেতে পারবে, ইত্যাদি।

গীতা এই অনাসক্তির কথাই বার বার বলছে। কাদের জন্য অনাসক্তি? যাঁরা পরমহংস, কিন্তু অন্য লোকদের বলছেন তোমার অনাসক্ত হতে পারবে না। রাজা জনক তো সবাই হতে পারবে না, তাই তুমি এক কাজ কর। কি কাজ করবে? বর্ণাশ্রম ধর্ম পালন কর। বর্ণাশ্রম ধর্ম পালন করতে করতে নিষ্কাম হয়ে যাও, ফলের আশা ত্যাগ করে কর্ম করতে করতে অনাসক্ত ভাব চলে আসবে। নিষ্কাম হওয়াও খুব কঠিণ, তাই যে কর্মটা করতে যাচ্ছ, সেই কাজটা হয়ে গেলে ঠাকুরের কাছে হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে বল – হে ঠাকুর, এই যে কাজটা করলাম এর যা কিছু ফল সব তোমার চরণে অর্পণ করলাম। রুটিন করে যন্ত্রের মতই প্রথম প্রথম বলতে হবে। এক মাস ধরে যদি কেউ দিনে তিনবার, দুপুরে, সন্ধ্যায় আর রাত্রে ঘুমোবার আগে এইভাবে বলে – হে ঠাকুর, আমি এতক্ষণ ভালো মন্দ যা যা করেছি তার সব ফল তোমার শ্রীচরণে সমর্পণ করলাম, এক মাস পরে সে হয়তো পরমহংস হয়ে যাবে না, কিন্ত তার ব্যক্তিত্বে পরিবর্তন আসতে বাধ্য। ব্যক্তিত্বে পরিবর্তন এলে তখন আরও বেশি করে অর্পণ করার অনুপ্রেরণা এসে যাবে। আরও যেটা সব থেকে প্রাপ্তি হবে তা হচ্ছে, খারাপ কিছু করতে গেলেই মনের মধ্যে খুঁতখুঁতানি আসবে, তখন মনে হবে এই খারাপ কাজের ফলটাও ঠাকুরকে অর্পণ করতে হবে?

দশ দিন যুদ্ধের পর ভীষ্মদেব শরশয্যায় শায়িত হয়েছেন। সঞ্জয় এই খবর নিয়ে শোকাকুল চিত্তে ধৃতরাষ্ট্রের কাছে গেছেন। আসলে সঞ্জয় ছিলেন ধৃতরাষ্ট্রের যুদ্ধের সংবাদদাতা। সঞ্জয়কে ব্যাসদেব দিব্যদৃষ্টি দিয়েছিলেন। এখানে দিব্যদৃষ্টি বলতে বোঝায়, যুদ্ধের কোন খবর যদি সঞ্জয় জানতে চাইত সে মনে মনে ইচ্ছে করলেই সেই খবর পেয়ে যাবে। আমরা বেশির ভাগই মনে করি সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রের পাশে বসে যুদ্ধের ধারাবিবরণী দিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু ব্যাপারটা তা হয়নি, সঞ্জয় আসলে যুদ্ধক্ষেত্রেই ছিল এবং সেও যুদ্ধ করেছিল। মহাভারতে আছে, একবার কিভাবে পাণ্ডবরা সঞ্জয়কে বন্দী করে নিয়েছিল, তার গলা কাটতে যাচ্ছে। তখন ব্যাসদেব এসে পাণ্ডবদের বলছেন – সঞ্জয় অবধ্য, ওকে বধ করো না। ব্যাসদেবের কুঠিয়া কুরুক্ষেত্রের পাশেই ছিল। আবার একবার সঞ্জয়কে পাকড়াও করে নিয়েছিল, কিভাবে সে পালিয়ে গিয়ে ধৃতরাষ্ট্রকে বলছে – হে রাজন্, বহু কষ্টে আমি নিজেকে বাঁচিয়ে পালিয়ে এসেছি। তবে সঞ্জয় সব সময় যুদ্ধ করেননি, আর তিনি খুব বড় যোদ্ধাও ছিলেন না।

মহাভারতের বর্ণনানুযায়ী যুদ্ধের দশম দিনে সঞ্জয় গিয়ে ধৃতরাষ্ট্রকে বলছেন – হে রাজন্, কৌরবদের আজ খুবই দুর্দিন, পিতামহ ভীষ্মের পতন হয়েছে। শুনে ধৃতরাষ্ট্র কেঁদে ফেলেছেন। হা হুতাশ করে রাজা বলছেন – পিতামহ ভীষ্মদেব যাঁকে পরাস্ত করতে পারে এমন কোন যোদ্ধা এই ত্রিলোকে নেই, আর যাঁর ইচ্ছামৃত্যু, তাঁর কি করে পতন হতে পারে! তখন সঞ্জয় সংক্ষেপে ঘটনাটা বলতেই ধৃতরাষ্ট্র বলছেন – না, তুমি আমাকে প্রথম থেকে বিস্তারিত ভাবে বল যুদ্ধে কি কি হয়েছিল। এখানে অবশ্য একটু সংশয়ের অবকাশ থেকে যায়, দশ দিন ধরে যুদ্ধ চলছে কিন্তু ধৃতরাষ্ট্রের কাছে কোন খবর আসছে না, এটা ঠিক বিশ্বাস যোগ্য নয়। আরেকটা যেটা হতে পারে, যুদ্ধের টুকটাকি খবর হয়তো অন্য দের মারফত ধৃতরাষ্ট্রের কাছে আসছিল, কিন্তু দিন দশেক পরে সঞ্জয় একটা বড় খবর নিয়ে এসেছেন। তখন ভীষ্মের খবর পেয়ে ধৃতরাষ্ট্র বলছেন – তুমি অত সংক্ষেপে বলো না, আমাকে একটু আগে থেকে বিস্তারিত ভাবে বল। এইখান থেকে গীতার প্রথম অধ্যায় অর্জুনবিষাদযোগ শুরু হচ্ছে, ধৃতরাষ্ট্র বলছেন –

**প্রথম অধ্যায়**

## অর্জুনবিষাদ যোগ

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ

**ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা যুযুৎসবঃ। মামকাঃ পাণ্ডবাশ্চৈব কিমকুর্বত সঞ্জয়।।১।।**

এখানে বলছেন *কিমকুর্বত*, মানে কি করল, বলছেন না যে কি করছে। এখানেই পরিষ্কার হয়ে যায় যে সঞ্জয় টিভিতে খেলার যে রকম ধারাবিবরণী হয় সেই রকম কিছু ধারাবিবরণী দিচ্ছেন না। দশ দিন পরে এসে এইভাবে খবর দিয়ে সঞ্জয় আবার যুদ্ধক্ষেত্রে চলে গেছে। হস্তিনাপুর থেকে কুরুক্ষেত্র খুব বেশি দূরে ছিল না। প্রত্যেক দিন এসে সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে খবর দিত কিনা এই ব্যাপারটা মহাভারতে পাওয়া যায় না। দিব্যদৃষ্টি ছিল বলে সব কথাই সঞ্জয়ের মনে থাকত, যখন ইচ্ছে করবে সব ঘটনা তার মনে পড়ে যাবে।

কুরুক্ষেত্র খুব পবিত্র স্থান, আগেকার দিনে অনেক মুনি ঋষিরা এখানে তপস্যা করেছিলেন। কুরুক্ষেত্রে ঋষিরা সমনপ্রপঞ্চক করেছিলেন বলে কুরুক্ষেত্রের উপর একটা বর আছে যে, সূর্যগ্রহণের সময় কেউ যদি কুরুক্ষেত্রে বাস করে তাহলে সে তার সব পাপ থেকে মুক্ত হয়ে যায়। আকবরের জীবনী তে পাওয়া যায় যে, তিনিও সূর্যগ্রহণের সময় কুরুক্ষেত্রে গিয়ে বসে থাকতেন। মহাভারতেই আমরা পাই যে, যুদ্ধের আগে একবার সূর্যগ্রহণ হয়েছিল সেই সময় শ্রীকৃষ্ণ তাঁর পুরো সাঙ্গপাঙ্গোদের নিয়ে কুরুক্ষেত্রে এসেছিলেন। আবার বৃন্দাবন থেকে সব গোপীরাও এসেছেন। এই কুরুক্ষেত্রে আবার শ্রীকৃষ্ণের সাথে গোপীদের দেখা হয়েছিল। তখন শ্রীকৃষ্ণ গোপীদের বলছেন – তোমরা আত্মীয় পরিজন, স্বামী পুত্রকে নিয়ে ভালোই আছো আশা করি, এত দিনে আমাকে তোমরা হয়তো ভুলেই গেছ।

কুরুক্ষেত্র হচ্ছে ধর্মক্ষেত্র, পবিত্র স্থান, সেইখানেই ধর্মযুদ্ধ হচ্ছে। ধৃতরাষ্ট্র বলছেন – *যুযুৎসবঃ,* যারা যুদ্ধাকাঙ্খী, *মামকাঃ,* আমার পক্ষে, আমার যে কৌরব বাহিনী, আসলে ধৃতরাষ্ট্র এখানে নিজেকে রাজা আর পাণ্ডবদের শত্রু বলে মনে করছেন। আমার আর পাণ্ডবের সন্তানরা এই যুদ্ধে কি কি করল আমাকে সংক্ষেপে বল। তোমার কাছে এই দুঃসংবাদ পেয়ে আমি প্রথম থেকে বিস্তারিত ভাবে শুনতে চাই। এখানে ব্যাসদেব সরাসরি কিছু বর্ণনা করছেন না, সঞ্জয়ের মুখ দিয়ে যুদ্ধের বর্ণনা দিচ্ছেন, এটা সাহিত্য রচনার একটা বিশেষ পদ্ধতি।

সঞ্জয় কি বলছেন, এটা আমরা খুব সংক্ষেপে আলোচনা করছি। ধৃতরাষ্ট্রকে সঞ্জয় খবর দিচ্ছেন –

সঞ্জয় উবাচ

**দৃষ্ট্বা তু পাণ্ডবনীকং ব্যূঢ়ং দুর্যোধনস্তদা। আচার্যমুপসঙ্গম্য রাজা বচনমব্রবীৎ।।২।।**

কৌরবদের প্রধান সেনাপতি হচ্ছেন পিতামহ ভীষ্মদেব আর পাণ্ডবদের সেনাপতি হচ্ছেন ধৃষ্টদ্যুম্ন। কোন পক্ষের প্রধান সেনাপতিকে যদি বন্দী করে নেওয়া হয় তাহলেই কিন্তু যুদ্ধের চেহারা পাল্টে যাবে। পাণ্ডবদের প্রধান যোদ্ধা হচ্ছেন অর্জুন। আর কৌরবদের প্রধান যোদ্ধা হচ্ছে দ্রোণাচার্য। ভীষ্মদেব হচ্ছেন কৌরবদের প্রধান সেনাপতি। ভীষ্মদেবের পতনের পর প্রধান সেনাপতি হয়েছিলেন দ্রোণাচার্য, দ্রোণাচার্যের পর কর্ণ, কর্ণের পর শল্য। পাণ্ডবদের পুরো যুদ্ধটাই প্রধান সেনাপতি ধৃষ্টদ্যুম্নই পরিচালিত করেছিলেন। দুর্যোধন আচার্য দ্রোণাচার্যকে নিয়ে এসে কৌরব আর পাণ্ডবপক্ষের যত বড় বড় যোদ্ধারা ছিলেন তাদের দেখিয়ে সবার পরিচয় করিয়ে দিচ্ছেন।

**পশ্যৈতাং পাণ্ডুপুত্রাণামাচার্য মহতীং চমূম্। ব্যূঢ়াং দ্রুপদপুত্রেণ তব শিষ্যেণ ধীমতা।।৩।।**

দুর্যোধন দ্রোণাচার্যকে বলছেন – দেখুন ঐ পাণ্ডু পুত্রদের দেখা যাচ্ছে, আর ঐ হচ্ছে দ্রুপদপুত্র। একদিকে আমাদের ব্যূহ রচনা হয়েছে, অন্য দিকে ধৃষ্টদ্যুম্ন ব্যূহ রচনা করেছেন। এই ধৃষ্টদ্যুম্ন আবার কে? ধৃষ্টদ্যুম্নকে দেখিয়ে বলছেন, এ হচ্ছে দ্রুপদের পুত্র, একদিকে দ্রুপদের পুত্র আবার সে আপনারই শিষ্য, শুধু শিষ্য নয়, বুদ্ধিমান শিষ্য। দ্রুপদ একবার এক যজ্ঞ করেছিলেন, যজ্ঞতে তাঁর কামনা ছিল যে, আমার এমন এক সন্তানের জন্ম হোক যে দ্রোণাচার্যকে বধ করবে। যজ্ঞ থেকে ধৃষ্টদ্যুম্নের জন্ম হল। এখন ধৃষ্টদ্যুম্নকে কে অস্ত্র শিক্ষা দেবে? দ্রুপদ ধৃষ্টদ্যুম্নকে অস্ত্র শিক্ষা দেওয়ার জন্য দ্রোণাচার্যের কাছে নিয়ে গেছেন। আপনি আমার পুত্রকে শিক্ষা দিন। দ্রোণাচার্যের যারা হিতৈষী ছিল তার দ্রোণাচার্যকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেছিল – হে আচার্য, আপনার কি মতিভ্রম হয়েছে? এর জন্মই হয়েছে আপনাকে বধ করার জন্য, আর আপনি একেই অস্ত্র শিক্ষা দিতে রাজী হয়ে গেলেন! তখন দ্রোণাচার্য বলছেন – যদি ওর জন্ম হয়ে থাকে আমাকে বধ করার জন্য তখন আমার বধ সে যেভাবেই হোক করবে, তা আমি আমার ধর্ম ছাড়তে যাব কেন। এইটাই হচ্ছে সনাতন ভারতের মহান আদর্শ। আমি জানি এর হাতেই আমার মৃত্যু হবে, আমি হচ্ছি আচার্য, আমার ধর্ম হচ্ছে রাজপুত্রদের অস্ত্র শিক্ষা দেওয়া। দ্রোণাচার্য শেষ পর্যন্ত ধৃষ্টদ্যুম্নকে শিক্ষা দিলেন। দুর্যোধন এইটাই দ্রোণাচার্যকে একটু ব্যাঙ্গ করে বলছেন – *তব শিষ্যেণ ধীমতা,* যে আপনাকে বধ করবে তাকেই শিক্ষাদীক্ষা দিয়ে যোদ্ধা বানিয়েছেন, এবার সামলান।

এরপর দুর্যোধন এক এক করে সবার নাম নিয়ে বলছেন কারা কারা কোন্ কোন্ পক্ষে আছে –

**অত্র শূরা মহেষ্বাসা ভীমার্জুনসমা যুধি। যযুধানো বিরাটশ্চ দ্রুপদশ্চ মহারথঃ।।৪।।**
**ধৃষ্টকেতুশ্চেকিতানঃ কাশীরাজশ্চ বীর্যবান। পুরুজিৎ কুন্তিভোজশ্চ শৈব্যশ্চ নরপুঙ্গবঃ।।৫।।**
**যুধামন্যুশ্চ বিক্রান্ত উত্তমৌজাশ্চ বীর্যবান্। সৌভদ্রো দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্ব এব মহারথাঃ।।৬।।**

পাণ্ডবদের পক্ষে কারা কারা আছেন – সাত্যকি, মৎস্যরাজ বিরাট, রাজা দ্রুপদ, শিশুপালের পুত্র ধৃষ্টকেতু, যদুবংশের চেকিতান, কাশীরাজ, পুরুজিৎ, রাজা কুন্তিভোজ ইত্যাদি। আর কৌরবদের পক্ষে –

**অস্মাকং তু বিশিষ্টা যে তান্নিবোধ দ্বিজোত্তম। নায়কা মম সৈনস্য সংজ্ঞার্থং তান্ ব্রবীমি তে।।৭।।**
**ভবান্ ভীষ্মশ্চ কর্ণশ্চ কৃপশ্চ সমিতিঞ্জয়ঃ। অশ্বত্থামা বিকর্ণশ্চ সৌমদত্তির্জয়দ্রথঃ।।৮**
**অন্যে চ বহবঃ শূরা মদর্থে ত্যক্তজীবিতাঃ। নানাশস্ত্রপ্রহরণাঃ সর্বে যুদ্ধবিশারদাঃ।।৯**

আমাদের পক্ষে আপনি, ভীষ্ম, কর্ণ, কৃপাচার্য, অশ্বত্থামা, বিকর্ণ, ভুরিশ্রবা ও জয়দ্রথ আছেন। এনারা তো আছেনই উপরন্তু আমার জন্য প্রাণ দান করতে আরও অনেক বীরেরা আছেন, যাঁরা সকলেই শস্ত্র নিক্ষেপে সুদক্ষ এবং যুদ্ধ বিশারদ। এরপরে দশম শ্লোকে দুর্যোধন বলছেন –

**অপর্যাপ্তং তদস্মাকং বলং ভীষ্মাভিরক্ষিতম্। পর্যাপ্তং ত্বিদমেতেষাং বলং ভীমাভিরক্ষিতম্।।১০।।**

সংস্কৃত ভাষা অত্যন্ত কঠিন ও জটিল ভাষা। পর্যাপ্ত শব্দের অর্থ হচ্ছে প্রচুর, আর অপর্যাপ্ত মানে প্রয়োজনের তুলনায় অল্প, সীমিত। কিন্তু এখানে ঠিক উল্টো অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। পিতামহ ভীষ্ম অপর্যাপ্ত সৈন্যবল দিয়ে সুরক্ষিত, আর ভীম পর্যাপ্ত সৈন্যবল নিয়ে সুরক্ষিত। এক জায়গায় এর অনুবাদ করা হয়েছে যে, ভীষ্মের এত সৈন্যবল থাকা সত্ত্বেও তিনি দুর্বল তাই অপর্যাপ্ত বলা হয়েছে। আসলে তা নয়, পর্যাপ্তের অর্থ হচ্ছে পরি+য়াপ্ত = পর্যাপ্ত, মানে সীমিত, একটা নির্দিষ্ট সীমানা দিয়ে ঘিরে রাখা হয়েছে। আর অপর্যাপ্ত মানে হচ্ছে যেটার কোন সীমা দিয়ে নির্দিষ্ট করা যাচ্ছে না। কিন্তু হিন্দী, বাংলাতে এসে পর্যাপ্তের অর্থ হয়ে যাচ্ছে sufficient, আর অপর্যাপ্তের অর্থ হচ্ছে less than sufficient, আর সংস্কৃতে অপর্যাপ্তের অর্থ হয়ে যাচ্ছে more than sufficient, এই জন্যই বলা হয় সংস্কৃত খুব জটিল ভাষা। আসল কথা হচ্ছে, দুর্যোধন বলছেন – আমাদের সৈন্য হচ্ছে অপরিমেয়, আর ভীমের সৈন্যবল পরিমিত।

এখানে আরেকটা সংশয় এসে যায়, এর আগে বলছেন *দ্রুপদপুত্রেণ* আবার এখানে বলছেন *ভীমাভিরক্ষিতম্*। একবার ভীষ্মের সাথে ধৃষ্টদ্যুম্নের তুলনা করে এখানে ভীমের কেন তুলনা করা হচ্ছে, ভীম তো প্রধান সেনাপতি নয়? একদিকে ভীষ্ম যাদের রক্ষা করছেন আরেক দিকে ভীম যাদের রক্ষা করছেন, হঠাৎ ধৃষ্টদ্যুম্নের নাম না করে ভীমের কথা কেন বলা হল, কারণ ভীমতো প্রধান সেনাপতি নন? আসলে এগুলো কিছুই নয়, এগুলো হচ্ছে কবিতার ছন্দকে একটা ধারাতে নিয়ে যাবার জন্য শব্দের ব্যবহার, ভীষ্ম আর ভীম শব্দ দুটি খুব কাছাকাছি উচ্চারণ, ছন্দ মেলানোর জন্য এই ধরণের ব্যবহার কবিতাতে প্রয়োগ করার স্বাধীনতা কবিদের দেওয়া থাকে। কবিদের এমন স্বাধীনতা দিয়ে দেওয়া হয় যে প্রধান সেনাপতির নামটাই পাল্টে দেওয়া হল। যারা মহাভারত না পড়ে প্রথমেই যদি গীতা অধ্যয়ণ করে তারা বলবে দ্রুপদের পুত্রের নাম কি? ভীম। পুরো তালগোল পাকিয়ে যাবে। কেননা আগে বলা হয়েছে দ্রুপদের পুত্র, দ্রোণাচার্যের শিষ্য পাণ্ডবদের প্রধান সেনাপতি, ভীমও দ্রোণাচার্যের শিষ্য, তাহলে দ্রুপদের ছেলের নাম ভীম। কবিতা পড়তে গেলে এই সমস্যা আসবে। ছন্দ মেলানোর জন্য, কাব্যিক সৌন্দর্যকে বাড়াবার জন্য কবিদের এই ধরণের স্বাধীনতা দেওয়া হয়ে থাকে। আবার অন্য দিকে ভীমের নাম করে কোন ভুল কিছু করা হয়নি, কারণ ভীম নিজেই প্রচণ্ড শক্তিশালী, যে দলে ভীমের মত বিরাট শক্তিধর আছে তাদের সহজে পরাজিত করা যাবে না। শুধু যে প্রধান সেনাপতির উপরে সমস্ত সৈন্যের দায়ীত্ব থাকে তা নয়, অন্যান্য বড় বড় যোদ্ধাদের উপরেও দায়ীত্ব থাকে। কিন্তু এখানে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে, কবিতার ছন্দ মেলানোর, আর শ্রুতি মধুর করার জন্যই ভীমের নাম করা হয়েছে।

এরপর দুর্যোধন আচার্যকে বলছেন –

**অয়নেষু চ সর্বেষু যথাভাগমবস্থিতাঃ। ভীষ্মমেবাভিরক্ষন্তু ভবন্তঃ সর্ব এব হি।।১১।।**

হে আচার্য, আপনারা আপনাদের যার যার নিজের জায়গায় অবস্থান করে পিতামহ ভীষ্মকে রক্ষা করুন। এর পর সবাই যে যার জায়গায় গিয়ে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ ঘোষণা করতে যাবে। সবাই যার যার শঙ্খ বাজাতে আরম্ভ করলেন। শঙ্খ ছিল তখনকার দিনের যুদ্ধ ঘোষণার বাদ্য। কিছু দিন আগেও বড় বড় ড্রাম, বিউগল, কাড়ানাকাড়া, দুন্দুভি, ডমুরু বাজিয়ে যুদ্ধের ঠিক আগে সৈন্যদের মধ্যে উদ্দীপন জাগান হত, অবশ্য প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকেই এই ধরণের বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার বন্ধ হয়ে গেছে। আগেকার দিনের যুদ্ধের সময় ড্রামের তাল শুনেই সৈন্যরা বুঝে নিত যে সেনাপতি তাদের কি নির্দেশ দিচ্ছেন, যখন পিছিয়ে আসতে বলবে তখন তার তাল অন্য রকমের হবে, আবার এগিয়ে যাবার ব্যাপার থাকলে তখন আরেক রকম তাল দেওয়া হত। পালিয়ে এস, এগিয়ে যাও, ঝাঁপিয়ে পড়, পিছিয়ে এস সব ধরণের নির্দেশই আগে এইসব বাদ্যযন্ত্রের তালের মাধ্যমে পাঠান হত। শঙ্খের ব্যবহার মহাভারতের সময়েই দেখা গেছে, তারপরে আর কোথাও শঙ্খের ব্যবহার দেখা যায়নি। আবার কোন কোন রাজার আবার নিজস্ব বিশেষ ধরণের বাদ্যযন্ত্র থাকত। এখানে দেখান হচ্ছে সব বড় বড় যোদ্ধার আলাদা আলাদা শঙ্খ, আবার প্রত্যেকের শঙ্খের নামও আলাদা আলাদা ছিল। দুটো শঙ্খের আওয়াজ কখনই এক রকমের হবে না।

এইবার সবাই যে যার নিজের শঙ্খ ধ্বণি করতে শুরু করেছেন, সঞ্জয় বলছেন –

**তস্য সংজনয়ন্ হর্ষং কুরুবৃদ্ধঃ পিতামহঃ। সিংহনাদং বিনদ্যোচ্চৈঃ শঙ্খং দধ্মৌ প্রতাপবান্।।১২।।**
**ততঃ শঙ্খাশ্চ ভের্যশ্চ পণবানকগোমুখাঃ। সহসৈবাভ্যহন্যন্ত স শব্দস্তুমুলোহভবৎ।।১৩।।**
**ততঃ শ্বেতৈর্হয়ৈর্যুক্তে মহতি স্যন্দনে স্থিতৌ। মাধবঃ পাণ্ডবশ্চৈব দিব্যৌ শঙ্খৌ প্রদধ্মতুঃ।।১৪।।**
**পাঞ্চজন্যং হৃষীকেশো দেবদত্তং ধনঞ্জয়ঃ। পৌণ্ড্রং দধ্মৌ মহাশঙ্খং ভীমকর্মা বৃকোদরঃ।।১৫।।**
**অনন্তবিজয়ং রাজা কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ। নকুলঃ সহদেবশ্চ সুঘোষমণিপুষ্পকৌ।।১৬।।**
**কাশ্যশ্চ পরমেষ্বাসঃ শিখণ্ডী চ মহারথঃ। ধৃষ্টদ্যুম্নো বিরাটশ্চ সাত্যকিশ্চাপরাজিতঃ।।১৭।।**
**দ্রুপদো দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্বশঃ পৃথিবীপতে। সৌভদ্রাশ্চ মহাবাহুঃ শঙ্খান্ দধ্মুঃ পৃথক্ পৃথক্।।১৮।।**
**স ঘোষো ধার্তরাষ্ট্রাণাং হৃদয়ানি ব্যদারয়ৎ। নভশ্চ পৃথিবীঞ্চৈব তুমুলোহভ্যনুনাদয়ন্।।১৯।।**

ঊনিশ নম্বর শ্লোকে বলছেন শঙ্খের এই আওয়াজ শুনে কৌরব পক্ষের সবার হৃদয় কেঁপে উঠল। এখানেও একটু সংশয়ের অবকাশ থেকে যায়। সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে বলছে কৌরবদের হৃদয় কেঁপে উঠল, একজন রাজাকে তারই বশম্বদ বলবে যে আপনার সৈন্যদের হৃদয় কেঁপে উঠেছে, এটা ঠিক খাপ খাচ্ছে না। এগুলো হচ্ছে ব্যাসদেবের রচনা। তারপরে বলছেন

**অথ ব্যবস্থিতান্ দৃষ্টা ধার্তরাষ্ট্রান্ কপিধ্বজঃ। প্রবৃত্তে শস্ত্রসম্পাতে ধনুরুদ্যম্য পাণ্ডবঃ।**
**হৃষীকেশং তদা বাক্যমিদমাহ মহীপতে।।২০**

এতক্ষণ শঙ্ক ধ্বণির মাধ্যমে যার যার অস্তিত্বকে জানিয়ে দেওয়া হচ্ছিল, এবার চোখের দেখাতে সবাইকে অর্জুন এক নজর দেখে নিতে চাইছেন। প্রত্যেকের রথের উপরে পতাকা লাগান থাকত, পতাকার চিহ্ন সবার আলাদা। অর্জুনের পতাকাতে হনুমানের চিহ্ন ছিল, *কপিধ্বজঃ*, কপি মানে বানর আর ধ্বজ মানে পতাকা। শ্রীরামচন্দ্রের রথেও বানর চিহ্ন যুক্ত পতাকা ছিল। এই সব দৃশ্য দূর থেকে অবলোকন করার পর *হৃষিকেশং*, মানে শ্রীকৃষ্ণকে অর্জুন বলছেন –

অর্জুন উবাচ

**সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে রথং স্থাপয় মেঽচ্যুত। যাবদেতান্নিরীক্ষেঽহং যোদ্ধুকামানবস্থিতান্।।২১।।**
**কৈর্ময়া সহ যোদ্ধব্যমস্মিন্ রণসমুদ্যমে।।২২।।**
**যোৎস্যমানানবেক্ষেঽহং য এতেঽত্র সমাগতাঃ। ধার্তরাষ্ট্রস্য দুর্বুদ্ধের্যুদ্ধে প্রিয়চিকীর্ষবঃ।।২৩**

হে অচ্যুত, আপনি আমার রথকে যুদ্ধের মধ্য ভাগে নিয়ে চলুন, আমি ভালো করে দেখতে চাই কার কার সঙ্গে আমাকে যুদ্ধ করতে হবে। *ধার্তরাষ্ট্রস্য দুর্বুদ্ধের্যুদ্ধে* – ধৃতরাষ্ট্রের দুর্বুদ্ধি সম্পন্ন পুত্ররা যারা যুদ্ধ করতে চাইছে তাদের একবার কাছ থেকে দেখতে চাই। তখন সঞ্জয় বলছেন – অর্জুন বলতেই শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের রথকে উভয় পক্ষের মাঝখানে নিয়ে গেছেন।

সঞ্জয় উবাচ

**এবমুক্তো হৃষীকেশো গুড়াকেশেন ভারত। সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে স্থাপয়িত্বা রথোত্তমম্।।২৪।।**
**ভীষ্মদ্রোণপ্রমুখতঃ সর্বেষাং চ মহীক্ষিতাম্। উবাচ পার্থ পশ্যৈতান্ সমবেতান্ কুরূনিতি।।২৫।।**
**তত্রাপশ্যৎ স্থিতান্ পার্থঃ পিতৄনথ পিতামহান্। আচার্যান্ মাতুলান্ ভ্রাতৄন পুত্রান্ পৌত্রান্ সখীংস্তথা।**
**শ্বশুরান্ সুহৃদশ্চৈব সেনয়োরুভয়োরপি।।২৬।।**

অর্জুন অবাক হয়ে তাঁর সামনে কাকে কাকে দেখছেন, ঠাকুর্দাকে দেখছেন, পিতামহ হচ্ছেন ভীষ্ম, আর দেখছেন আচার্যকে, মামা, ভাইদের ও বন্ধুদের। *পুত্রান্ পৌত্রান্*, অর্জুনের নিজের পুত্র বা নাতি নয়, একদিকে ভীষ্ম তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করবে তাঁর নাতি অর্জুন, আবার অর্জুনের ছেলে অভিমুন্য সন্তান, আর একে অপরের সব বন্ধুবান্ধবরা। আর শ্বশুর, সুহৃদ, যে হিতাকাঙ্খী, যার ভালো চাইছে আজ তার বিরুদ্ধেই সে অস্ত্র ধারণ করেছে তাকে বধ করবার জন্য। এইগুলোই হচ্ছে এই জগতের যত রকমের জাগতিক সম্পর্ক হতে পারে। অর্জুন এই দৃশ্য দেখে –

**তান্ সমীক্ষ্য স কৌন্তেয়ঃ সর্বান্ বন্ধূনবস্থিতান্। কৃপয়া পরয়াবিষ্টো বিষীদন্নিদমব্রবীৎ।।২৭।।**

এই সমস্ত আত্মীয় পরিজন, বন্ধু বান্ধবদের দেখে অর্জুনের মনটা বিষন্ন হয়ে পড়েছে। মনটা তাঁর দুঃখে ভারাক্রান্ত হয়ে গেছে। ভারাক্রান্ত হৃদয়ে অর্জুন বলছেন –

অর্জুন উবাচ

**দৃষ্টেমান্ স্বজনান্ কৃষ্ণ যুযুৎসূন্ সমবস্থিতান্। সীদন্তি মম গাত্রাণি মুখঞ্চ পরিশুষ্যতি।। ২৮।।**

হে কৃষ্ণ আমার স্বজনদের, আত্মীয়বর্গদের দেখে আমার শরীরের সব অঙ্গগুলো অবসন্ন হয়ে পড়ছে, মুখ শুকিয়ে যাচ্ছে। অর্জুনের মত আমাদেরও অনেক সময় খুব কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে হয়, কিন্তু যখন সেটা কার্যকর করতে যাই তখন অনেক কথা মনে পড়ে যায়, আর মনটা সেই সময় অবসন্ন হয়ে পড়ে। তখন আবার আমরা সেই সিদ্ধান্ত থেকে পিছিয়ে যাই। অর্জুনেরও এই অবস্থা হয়েছে।

**বেপথুশ্চ শরীরে মে রোমহর্ষশ্চ জায়তে। গাণ্ডীবং স্রংসতে হস্তাৎ ত্বক চৈব পরিদহ্যতে।।২৯।।**

আমার শরীরের থেকে ঘাম বেরোচ্ছে, আমার শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে লোম গুলো দাঁড়িয়ে গেছে, মানে গায়ে কাঁটা দিচ্ছে। খুব নার্ভাস হয়ে গেছে অর্জুন। স্নায়ু শৈথিল্যে শরীরের এই ধরণের প্রতিক্রিয়া হয়। অর্জুনের শক্তির প্রতীক হচ্ছে গাণ্ডীব, সেই গাণ্ডীবকে অর্জুন হাত দিয়ে ধরে রাখতে পারছে না, যে গাণ্ডীব নিয়ে তাঁর এত গর্ব, যে গাণ্ডীবের সাহায্যে তিনি এত বড় যুদ্ধ করবেন, অর্জুন এত নার্ভাস হয়ে গেছে যে, সেই গাণ্ডীবকেও এখন তাঁর হাত দিয়ে ধরে রাখতে পারছে না। কিছুক্ষণ আগেও যে যুদ্ধের জন্য মানসিক ভাবে প্রস্তুত নিয়েছিল, কিন্তু এখন যুদ্ধের এই ভয়াবহ পরিণতির কথা ভেবে শরীর এত গরম হয়ে গেছে যে, তাঁর গায়ের চামড়া যেন জ্বলতে আরম্ভ করেছে। কি ভয়াবহ কাণ্ড হতে যাচ্ছে এই ভেবে অর্জুন দিশাহারা হয়ে পড়েছে। অনেক সময় ভয়াবহ পরিণামের কথা ভেবে আমরাও আতঙ্কিত হয়ে পড়ি। এটা অবশ্য মুর্খদের হয় না, কারণ দেবতারা যেটা করতে ভয় পান মুর্খরা সেই কাজ করবার জন্য এগিয়ে আসে। ভয়াবহ জিনিষ হতে চলেছে, এটা সাধারণ মানুষ করতে পারেনা।

**ন চ শক্নোম্যবস্থাতুং ভ্রমতীব চ মে মনঃ। নিমিত্তানি চ পশ্যামি বিপরীতানি কেশব।।৩০।।**

আমি আর স্থির থাকতে পারছি না, আমার মাথা ঘুরছে। যখন কোন হঠাৎ দুঃখজনক কোন সংবাদ আসে এই জিনিষটাই হয়, আর যারা খুব আবেগপ্রবণ তাদের এটা বেশি হয়। সাথে সাথে অর্জুন আবার বলছে সব লক্ষণ গুলো, নিমিত্ত গুলো সব বিপরীত দেখছি। অর্থাৎ অর্জুন সব অশুভ লক্ষণ দেখছে, ভালো কিছুই সে দেখছে না, যা কিছু হবে সব অশুভই হবে, ভালো হওয়ার কোন লক্ষণ আমি দেখছি না।

**ন চ শ্রেয়োহনুপশ্যামি হত্বা স্বজনমাহবে। ন কাঙ্ক্ষে বিজয়ং কৃষ্ণ ন চ রাজ্যং সুখানি চ।।৩১।।**

যেসব অশুভ লক্ষণ গুলো দেখছি, এতে আমি বুঝতে পারছি যে এই আত্মীয় স্বজন, বন্ধুবান্ধবদের হত্যা করে কোন মঙ্গল হবে বলে মনে করছি না। হে কৃষ্ণ, আমি জয়ও চাইনা, রাজ্যও চাই না, আর এদের হত্যা করে সুখভোগ করার ইচ্ছেও আমার নেই।

**কিং নো রাজ্যেন গোবিন্দ কিং ভোগৈর্জীবিতেন বা। যেষামর্থে কাঙ্ক্ষিতং নো রাজ্যং ভোগাঃ সুখানি চ।।৩২।।**

এই ভাবে রাজ্য নিয়ে আমি কি করব? কারণ, যাদের জন্য মানুষ সুখের পেছনে ছুটছে, সুখ সঞ্চয় করে, তারাই যদি মরে যায় তাহলে আমি এই রাজ্য নিয়ে কি করব? এখন একজন ডাক্তার যা রোজগার করেন তার বেশির ভাগ টাকাই বীমার প্রিমিয়াম দিতেই চলে যায়, ছেলের নামে বীমা, বউএর নামে বীমা, মেয়ের নামে বীমা। এখন ছেলে মরে গেলে কিছু মোটা টাকা তিনি পাবেন নিশ্চয়, কিন্তু সেই টাকা নিয়ে তিনি কি করবেন? সেই টাকা দিয়ে না একটা গাড়ী কিনতে ইচ্ছে হবে, না একটা বাড়ী বানাতে ইচ্ছে করবে। সবাই যে এত এত টাকা উপার্জন করছে কিসের জন্য? যাতে তার পরিবারের সবাই সুখে স্বাচ্ছন্দে থাকতে পারে। পরিবারের সবাই যদি শেষ হয়ে যায় তখন সে কার জন্য উপার্জন করবে? ছেলের নামে পাঁচ লাখ টাকা বীমা করেছে, বড় হলে ছেলে অনেক টাকা পাবে, তার যদি কপালে থাকে এই টাকা সে নিজেই উপার্জন করে নেবে, তাই বলে কি এখন কষ্ট করে থাকতে হবে ভবিষ্যতে দেখা যাবে বলে? এর তো কোন অর্থই হয় না। অর্জুন বলছেন, *যেষামর্থে কাঙ্ক্ষিতং নো*, যাদের জন্য এই রাজ্যসুখ ভোগ করব, তারাই যদি না বেঁচে থাকে কাকে নিয়ে এই সুখ ভোগ করব? শুধু তাই নয় –

**ত ইমেহবস্থিতা যুদ্ধে প্রাণাংস্ত্যক্ত্বা ধনানি চ। আচার্যাঃ পিতরঃ পুত্রাস্তথৈব চ পিতামহাঃ।**
**মাতুলাঃ শ্বশুরাঃ পৌত্রাঃ শ্যালাঃ সম্বন্ধিনস্তথা।।৩৩।।**

কাদের জন্য আমি সঞ্চয় করছি? কাদের জন্য আমার রাজ্য, কাদের জন্য ভোগ, কাদের জন্য এই সুখ অভিলষ্পিত? সেই আচার্যগণ, সেই জ্যাঠা-কাকারা, সন্তানাদিগণ, ঠাকুর্দা, দাদুরা, মামা, শ্বশুর, শ্যালক, নাতি, মানুষের সঙ্গে যত রকমের জাগতিক সম্পর্ক হতে পারে, তাদের সবার জন্য। তারা কি করছে? প্রাণের মায়া ত্যাগ করে, টাকা-পয়সার মায়া ত্যাগ করে দাঁড়িয়ে আছে।

কিসের জন্য? মৃত্যুর জন্য। আজকে যদি কেউ এসে বলে এই জগতের সব কিছুই তোমার থাকবে কিন্তু সবাই মারা যাবে, কেউ বেঁচে থাকবে না, কিন্তু সব কিছু তোমার হয়ে যাবে। কি হবে আমার জগতের সমস্ত সম্পত্তি নিয়ে? এইটাই পরের শ্লোকে অর্জুন বলছেন –

**এতান্ন হন্তুমিচ্ছামি ঘ্নতোঽপি মধুসূদন। অপি ত্রৈলোক্যরাজ্যস্য হেতোঃ কি নু মহীকৃতে।।৩৪।।**

হে কৃষ্ণ, এরা আমার এত প্রিয়জন, এরা যদি আমাকে বধ করে দিয়ে এই ত্রিলোকের অধিপতিও হয়ে যায় তবুও আমি এদের বধ করতে পারব না। কিছু দিন আগে এক কোম্পানীর বড় অফিসার খুব দুঃখ করে বলছেন যে – কোম্পানিতে এখন এমন একটা পরিস্থিতি হয়েছে যে কিছু লোককে বরখাস্ত করতে হবে, আর সেটা আমাকেই করতে হবে, যাদের বরখাস্ত করতে হবে তাদের মধ্যে আমার কিছু ঘনিষ্ঠ বন্ধুও আছে। ভদ্রলোক কিছুতেই করতে চাইছেন না এই কাজটা। কিন্তু তাকে এটা করতেই হবে, মোটা টাকা মাইনে দিয়ে কোম্পানি তাকে এই কাজের জন্যই রেখেছে। এখন এইটাই আপনার ধর্ম। অর্জুনেরও এই একই অবস্থা, তার ক্ষত্রিয়ে ধর্মের বিধান অনুযায়ী তাঁকে এখন যুদ্ধ করতেই হবে, এত দিন ধরে তাঁকে যে অস্ত্র-শস্ত্রের শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, এই ক্ষত্রিয় ধর্ম পালন করতে হবে বলেই তো শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু অর্জুন এখন বলছেন সমগ্র পৃথিবীও যদি আমার করতলে এসে যায় তবুও আমি এদের বধ করতে পারবনা।

**নিহত্য ধার্তরাষ্ট্রান্ নঃ কা প্রীতিঃ স্যাজ্জনার্দন। পাপমেবাশ্রয়েদস্মান্ হত্বৈতানাততায়িনঃ।।৩৫।।**

ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদের হত্যা করে আমাদের কি সুখ হবে, এরা তো সকলে এমনিতেই পাপী আর আততায়ী, পাপীদের হত্যা করলে আমাদেরই পাপ আশ্রয় করবে। আততায়ী তাদেরই বলা হয় যারা কতকগুলি খারাপ কাজ করে – যেমন ব্রাহ্মণ হত্যা করা, ভ্রূণহত্যা, কারুর বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেওয়া, শিশু হত্যা, কোন প্ররোচনা ছাড়াই এইগুলো যারা করে তাদের আততায়ী বলে। দুর্যোধনরা পাণ্ডবদের বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দিয়েছিল বলে এদের আততায়ী বলা হচ্ছে। যদিও এরা আততায়ী কিন্তু এদের বধ করতে গিয়ে পাপ আমাদেরই লাগবে।

**তস্মান্নার্হাঃ বয়ং হন্তুং ধার্তরাষ্ট্রান্ সবান্ধবান্। স্বজনং হি কথং হত্বা সুখিনঃ স্যাম মাধব।।৩৬।।**

যদিও ধৃতরাষ্ট্রের সন্তানরা সবাই আততায়ী কিন্তু এরা আমাদেরই তো ভাই, সম্বন্ধী, স্বজন, সেইজন্য এদের কে বধ করে আমরা কোন দিনই সুখী হতে পারব না। সুখীই যখন হতে পারব না, তখন আমাদের এই যুদ্ধ না করাই উচিৎ।

১৮ই জুলাই ২০১০

অর্জুন দেখছেন এই যে যুদ্ধ হতে চলেছে এতে আমাদের প্রিয়জনরাই একে অপরকে বধ করবে। মৃত্যুই হচ্ছে এই যুদ্ধের শেষ কথা। নিজের আপনজনরা যদি বেঁচেই না থাকে তবে জগতের সুখ সম্পদ নিয়ে কি করবে। মানুষ যা কিছুই করে সবই তো নিজের আত্মীয় বন্ধু পরিজনদের সাথে একসাথে বেঁচে থাকার জন্যই করে। এখন যদি কেউ এসে বলে তোমাকে এক কোটি টাকা দেওয়া হবে কিন্তু তার বিনিময়ে তোমার ছেলে মারা যাবে। তখন এই টাকা নিয়ে সে কি করবে? মানুষ খেটেখুটে, চুরিচামারি করে যা কিছুই করে সব নিজের প্রিয়জনদের ভালো ভাবে রাখার জন্যই করে। সেইজন্য অর্জুন বলছেন –

**যদ্যপ্যেতে ন পশ্যন্তি লোভোপহতচেতসঃ। কুলক্ষয়কৃতং দোষং মিত্রদ্রোহে চ পাতকম্।।৩৭।।**
**কথং ন জ্ঞেয়মস্মাভিঃ পাপাদস্মান্নিবর্তিতুম্। কুলক্ষয়কৃতং দোষং প্রপশ্যদ্ভির্জনার্দন।।৩৮।।**

*লোভোপহতচেতসঃ* – অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে বলছেন, কৌরবদের বুদ্ধি যেটা, সেটা লোভের বশে ভ্রষ্ট হয়ে গেছে। দুর্যোধনের মধ্যে এমন লোভ এসে গেছে যে, সেই লোভের ফলে তাদের বুদ্ধি নষ্ট হয়ে গেছে। বুদ্ধি ভ্রষ্টতার দরুণ কৌরবরা ধারণাই করতে পারছে না যে এই যুদ্ধে কত লোক মারা যেতে বসেছে। এত লোকের প্রাণ হরণ করে কি লাভ হবে! *কুলক্ষয়কৃতং দোষং* – পুরো কুলের নাশ হতে চলেছে, আর *মিত্রদ্রোহ,* যারা বন্ধু স্থানীয় তাদের মৃত্যু হতে যাচ্ছে। এখন যা পরিস্থিতি তাতে গৃহযুদ্ধের মত অবস্থাতে দাঁড়িয়েছে। শুধু পার্থক্য হচ্ছে – গৃহযুদ্ধে অসংগঠিত ভাবে যাকে খুশি মেরে যাচ্ছে কিন্তু এখানে সংগঠিত ভাবে একে অপরকে বধ করবার জন্য সমবেত হয়েছে। এখানে কৌরব বংশ, পাণ্ডব বংশ, আর ভারতের তৎকালীন যত রাজারা ছিলেন সবাই একজোট হয়ে একে অপরকে মারবে, এতে কত কুলের নাশ হয়ে যাবে। আর যাকে এত দিন বন্ধু বলে গলা লাগিয়েছি আজ তাকেই বধ করতে যাচ্ছে। *মিত্রদ্রোহে* বলা হয়, শাস্ত্রে সব পাপরই প্রায়শ্চিত্তের বিধান দেওয়া আছে কিন্তু মিত্রদ্রোহের কোন প্রায়শ্চিত্ত নেই। বন্ধুর সাথে বিশ্বাসঘাতকতাতে যে পাপ হয় সেই পাপে শাস্ত্রও হাত গুটিয়ে নিয়েছে। বাবাকে বধ করলে, মাকে হত্যা করলে, ব্রাহ্মণকে খুন করার মত যত পাপের বর্ণনা আছে, সব পাপেরই প্রায়শ্চিত্তের বিধান আছে, কিন্তু বন্ধু হত্যা বা বন্ধুর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা থেকে যে পাপ হবে, শাস্ত্রে সেই পাপের কোন প্রায়শ্চিত্তের বিধান দেওয়া নেই।

অর্জুন বলছেন – কৌরবরা তো অবুঝ, কিন্তু আমরা তো এই রকম নয়, আমাদের তো বুদ্ধি আছে। অর্জুনের মতে পিতামহ ভীষ্ম, দ্রোণাচার্য এনারা অবুঝ হয়ে গেছেন, বুদ্ধি আছে শুধু অর্জুনের। এরা দুটো পাপ যে করছে সেটা বুঝতে পারছে না, একটা হচ্ছে কুলক্ষয় করে পাপ করছে, আরেকটা মিত্রদ্রোহ করে পাপ করছে। আমরা তো দেখতে পাচ্ছি যে এগুলো করে পাপ হচ্ছে, কিন্তু কৌরবরা দেখতে পাচ্ছে না, আমরা তো ওদের মত নই। এই যে কুলনাশ হতে চলেছে আর মিত্রদ্রোহ করে যে পাপ হতে চলেছে এর থেকে বাঁচার পথ আমাদেরকেই বার করতে হবে। ওরা পাপ করতে চাইছে করুক, কিন্তু আমরা কুলনাশ হতে দেব না। এখন এই অবস্থায় কুলনাশ থেকে কিভাবে বাঁচান যেতে পারে, এর একটাই পথ হচ্ছে যুদ্ধ না করা। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে পরে বলবেন – তোমার মাথাটা হচ্ছে উন্মত্ত প্রমত্তবৎ। তোমার কথার মধ্যে কোন সামঞ্জস্য নেই, একটা কথার সাথে আরেকটা কথার কোন সাযুজ্য নেই। দেখে মনে হচ্ছে তোমারই যেন শুধু বুদ্ধি আছে।

কুলক্ষয়ে কি হতে চলেছে? অর্জুন বলছেন –

**কুলক্ষয়ে প্রণশ্যন্তি কুলধর্মাঃ সনাতনাঃ। ধর্মে নষ্টে কুলং কৃৎস্নমধর্মোঽভিভবত্যুত।।৩৯।।**

মনুস্মৃতি গ্রন্থাদিতে বর্ণধর্ম, বর্ণাশ্রমধর্ম, মানব ধর্ম, এইভাবে মোট সাতটি ধর্মের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু এখানে নতুন একটা ধর্মের কথা অর্জুন বলছেন সেটা হচ্ছে জাতিধর্ম। যেমন কেউ একজন বৈশ্য কুলে যাদব বংশে জন্ম নিয়েছে, যেখানে তার কাজ হচ্ছে কৃষি, গোরক্ষা ইত্যাদি। এখানে বৈশ্য ধর্ম আলাদা আবার তার মধ্যে যাদব বংশের, যারা গোপালক, তাদের ধর্মটা আরও বেশি স্পষ্ট ভাবে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। এই যাদবদের মধ্যেও বিভিন্ন কুল আছে, বিহারের যাদব আবার উত্তর প্রদেশের যাদব একই কুলের নাও হতে পারে। এখন একজন যাদবের প্রথমে তার মানব ধর্ম আছে, যদি সে গৃহস্থ হয় তাহলে তার গৃহস্থ ধর্ম আছে, সে বর্ণে বৈশ্য, তাকে বৈশ্য ধর্ম পালন করতে হবে, বৈশ্য ধর্মের মধ্যে সে আবার গোপালক সেখানেও তাকে কতকগুলি ধর্ম পালন করতে হবে। একজন চ্যাটার্জী ব্রাহ্মণ সে হয়তো পুরোহিতের কাজ করতে পারে, বা টোল চালাতে পারে আবার রাধুনির কাজও করতে পারে। যদি পুরোহিতের কাজ করে থাকে তখন সেই কাজটা হয়ে যাবে জাতি ধর্ম। এখন মেদিনীপুরের যে চ্যাটার্জী পুরোহিতের কাজ করছে আর পূর্ববঙ্গের যে চ্যাটার্জী পুরোহিতের কাজ করছে তাদের দুজনের কুলধর্ম, অর্থাৎ পরিবারের ধর্ম এক হবে না। কুলধর্ম স্থান অনুসারে পরিবর্তন হয়ে যায়। এক স্থানের পুরোহিতের পারবারিক রীতিনীতি আচার অন্য স্থানের পুরোহিতের পারিবারিক রীতিনীতি আচার কখনই এক হবে না। তাদের বিবাহের, শ্রাদ্ধের নিয়ম-কানুন সব কিছুই পাল্টে যায়। সেইজন্য ধর্মের সাথে অনেক কিছু জড়িত থাকে। এখানে অর্জুন বর্ণধর্মের উপর বেশি জোর না দিয়ে বলছে – *কুলক্ষয়ে প্রণশ্যন্তি কুলধর্মাঃ সনাতনাঃ*। এই কুলধর্ম যদি নাশ হয়ে যায় তাহলে তো সব আচার রীতিনীতি প্রথা গুলো নষ্ট হয়ে সমাজের বাঁধনটাই নষ্ট হয়ে যাবে। মেদিনীপুরের একজন চ্যাটার্জী ব্রাহ্মণ মানুষ হিসেবে সে মানবধর্ম পালন করছে, ব্রাহ্মণ হিসেবে কিছু ধর্ম পালন করতে হচ্ছে, ব্রাহ্মণের মধ্যে পুরোহিত রূপে তাকে কিছু ধর্ম পালন করতে হচ্ছে, আবার মেদিনীপুরের চ্যাটার্জী পুরোহিতরা যা যা করে সেটাও পালন করতে হচ্ছে। কুলধর্মটা ভালো পরিষ্কার ভাবে নির্দিষ্ট করা হয় গোত্র রূপে। বিভিন্ন গোত্রে আলাদা আলাদা বিধান দেওয়া আছে।

**অধর্মাভিভবাৎ কৃষ্ণ প্রদুষ্যন্তি কুলস্ত্রিয়ঃ। স্ত্রীষু দুষ্টাসু বার্ষ্ণেয় জায়তে বর্ণসঙ্করঃ।।৪০।।**

অর্জুন বলছেন – অধর্ম যখন বেড়ে যায় তখন নারীদের উপর কোন নিয়ন্ত্রণ রাখা যায় না বলে নারীরা উৎসন্নে চলে যায়। সারা ভারতে কুড়ি বছর আগেও কুলধর্মের উপর অনেক জোর দেওয়া হত, কিন্তু এখন সমগোত্রের বিবাহ নিয়ে কত আন্দোলন চলছে, ঝগড়া মারামারি হচ্ছে। অন্য দিকে কিছু লোক বলছে সমগোত্রের বিবাহের ব্যাপারে পার্লামেন্টে বিল পাশ করতে হবে। এর ফলে কুলস্ত্রী ব্যাপারটাই নষ্ট হতে চলেছে। এই রকম অবস্থা হলে বর্ণসঙ্করের সৃষ্টি হয়। দুটো আলাদা আলাদা জাতির মধ্যে বিবাহের পর যে সন্তানের জন্ম হচ্ছে তাতে বর্ণসঙ্করের প্রাদুর্ভাব হয়। প্রাচীন কালে একটা প্রথা ছিল, যখন ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়কে বিবাহ করত, কিংবা ক্ষত্রিয়ের সাথে বৈশ্যের ছেলের বিবাহ হত, কিংবা শূদ্রের সাথে ব্রাহ্মণের বিবাহ হত, আর তাদের থেকে যে সন্তান জন্ম নিত তাদের আলাদা জাতি করে দেওয়া হত। যেমন মেয়ে যদি ব্রাহ্মণ হয় আর ছেলে যদি ক্ষত্রিয় হয় এখন তাদের যে সন্তান হবে সেই সন্তান ব্রাহ্মণও হবে না আবার ক্ষত্রিয়ও হবে না। তখন ওদের জাতিটাই আলাদা করে দেওয়া হত, এদেরকে সূত জাতি বলা হত। সূত জাতিদের অনেক কিছুর উপর অধিকার খর্ব করে দেওয়া হত, ব্রাহ্মণেরও অধিকার থাকে না, ক্ষত্রিয়েরও অধিকার থাকে না। যদি বাবা ব্রাহ্মণ হয় আর মা যদি ক্ষত্রিয় হয় তখন যে সূত জন্ম নেবে তার মহাভারত, ভাগবত পড়ার অধিকার থাকবে কিন্তু বেদ পাঠের আর কোন অধিকার থাকবে না। বেদ অধ্যয়ণের যদি অধিকার না থাকে তখন বেদের কর্মের অধিকারও তার থাকবে না। এখন বাবা ছিল ব্রাহ্মণ, তার কুলজ ধর্ম ছিল ব্রাহ্মণের, তার যে কুলধর্ম চলছিল সেই ধর্ম মাঝখান থেকে বন্ধ হয়ে গেল। পার্সিদের মধ্যে এখনও এই কুলধর্ম খুব কঠোর ভাবে ধরে রাখা হয়েছে। পার্সি ধর্মের কোন ছেলে বা মেয়ে যদি অন্য ধর্মের কাউকে বিয়ে করে নেয়, তাহলে তাকে আর তাদের ধর্মে প্রবেশ করতে দেবে না। কিন্তু সেই ছেলে বা মেয়ে আবার যদি কোন পার্সিকে বিয়ে করে তখন যদি তার

সন্তান হয় তার তাদের ধর্মে প্রবেশ অধিকার থাকবে। আগেকার দিনে হিন্দুদের মধ্যেও এই জিনিষগুলোর মূল্যবোধ প্রচণ্ড দৃঢ় ভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিল, এখন আর তত গুরুত্ব দেওয়া হয় না। গুরুত্ব একেবারেই দেওয়া হয় না বলেই আজ সমাজে মারাত্মক ভাবে অবক্ষয় এসে গেছে। অর্জুন এই অবস্থার কথাই এখানে বলছেন – যখন বর্ণাশ্রম ও কুলধর্মের নাশ হয় তখন সামাজিক অবক্ষয়ের পরিণতি এই রকমই হয়। এর পর বলছেন –

**সঙ্করো নরকায়ৈব কুলঘ্নানাং কুলস্য চ। পতন্তি পিতরো হ্যেষাং লুপ্তপিণ্ডোদকক্রিয়াঃ।।৪১।।**

বর্ণসঙ্করের ফলে যে কুলঘাতী জন্ম নেয় সে নিজের পুরো বংশকে নরকের দিয়ে টেনে নিয়ে যায়। আজকের দিনে ঠিক তাই হচ্ছে, ছেলে মেয়েকে ভালোবেসে বিয়ে করে বাড়িতে নিয়ে আসছে, তারপর একটু অশান্তি হলে ৪৯৮ ধারায় থানায় ডায়রি করে দিচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে বাড়ির সব্বাইকে, এমনকি নব্বুই বছরের বুড়ো দাদাশ্বশুরকেও টানতে টানতে জেলে পুরে দিয়ে নরক যন্ত্রণা ভোগ করাচ্ছে। অর্জুন অবশ্য মৃত্যুর পরে যে নরক, তার কথা বলছে। প্রাচীন কাল থেকে হিন্দু ধর্মের একটা ধারণা চলে আসছে যে, মৃত্যুর পর বংশের কেউ পিণ্ডদান করলে পিতৃপুরুষরা স্বর্গে যেতে পারেন। পিণ্ডদান না হওয়া পর্যন্ত তাঁরা বিভিন্ন লোকে ঘুরতে থাকেন আর তা নাহলে নরকে পড়ে থাকবেন। *পতন্তি পিতরো হ্যেষাং লুপ্তপিণ্ডোদকক্রিয়াঃ* – মনে করুন, আমার প্রপিতৃমহ এত দিন পিণ্ডাদি পেয়ে উচ্চলোকে রয়েছে, আমার পর একজন কুলাঙ্গার এসে বংশে জন্ম নিল, সে বলল আমি এই সব পিণ্ড দানে বিশ্বাস করি না, এখন সেই প্রপিতৃমহদের উচ্চলোকে ধরে রাখার মত আর কেউ রইল না, তখন আস্তে আস্তে সেই উচ্চলোক থেকে তাঁদের পতন হতে শুরু হবে। এই জিনিষটা মহাভারতে খুব সুন্দর করে বর্ণনা করা হয়েছে।

এক ঋষি জঙ্গলের মধ্য দিয়ে তপস্যায় যাচ্ছেন। যেতে যেতে দেখছেন কিছু ঋষি গাছের ডালে উল্টো হয়ে ঝুলে আছেন। ঋষি তখন জিজ্ঞেস করছেন – আপনাদের পরিচয় কি? এইভাবে উল্টো হয়ে গাছে ঝুলে আছেন কেন? তখন তাঁরা বলছেন – আমরা হলাম তোমার পূর্বজ, আমরা খুব উচ্চ লোকে ছিলাম। কিন্তু তুমি বিয়ে থা করোনি, তোমার সন্তানাদি হয়নি, আমাদের পিণ্ডাদানাদিরও আর কোন সম্ভবনা নেই, তাই আমাদের সেখান থেকে পতন হয়ে এই ভাবে অবস্থান করতে হচ্ছে। ঋষিরও খুব মুশকিল হয়ে গেল, আমাকে এখনই বিয়ে করে সন্তানাদির জন্ম দিতে হবে। সে এক লম্বা কাহিনী।

প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে বিয়ে কেন করবে? এমনিতে কুদৃষ্টি নিয়ে কোন মেয়ের দিকে দৃষ্টিপাত করা আমাদের সমাজে খুব নিন্দনীয়। কখন তুমি মেয়ের দিকে তাকাবে? যদি তুমি বিয়ে করতে চাও। বিয়ে কেন করবে? যাতে সন্তান হয়। দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে তুমি কেন সন্তানের জন্ম দেবে? তোমার পূর্বজদের ঋণ শোধ করার জন্য, ঋণ শোধ করতে হবে যাতে তাঁরা স্বর্গে থাকতে পারেন। কিন্তু এখন আমরা কেন সন্তান চাই? বুড়ো বয়সে আমাদের দেখাশোনার জন্য।

**দোষৈরেতৈঃ কুলঘ্নানাং বর্ণসঙ্করকারকৈঃ। উৎসাদ্যন্তে জাতিধর্মাঃ কুলধর্মাশ্চ শাশ্বতাঃ।।৪২।।**

যে বংশে কুলঘাতীরা জন্ম নেয় সেখানে, মানে সেই বংশের জাতিধর্ম আর কুলধর্ম পুরোপুরি নাশ হয়ে যায়। এখানে কখনই বলা হয় না যে সে উচ্চবর্ণের ছেলে, সব সময় পরিচয় দেওয়া হয় বংশের নামে, বলে এই বংশের ছেলে বা ভালো বাড়ির ছেলে। যদিও আমাদের ঐতিহ্যে ব্রাহ্মণকে শ্রেষ্ঠ বলা হয়, কিন্তু ছোট কাউকেই করা হয় না। সমাজ যাঁকে বেশি সম্মান দেয় তার দাম বেশি, তিনি যে বর্ণেরই হোন না কেন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য আর শূদ্র এটা হচ্ছে একটা সামাজিক বিভাজন। তাই এখানে বর্ণধর্মের থেকে কুলধর্ম আর জাতিধর্মের উপর বেশি জোর দেওয়া হয়। এখানে বর্ণধর্ম নাশের কথা বলা হচ্ছে না, বলা হচ্ছে কুলধর্ম নাশের ব্যাপারে। এখন সত্যি সত্যিই জাতিধর্ম নাশ হয়ে গেছে। রাস্তা পরিষ্কার করার লোক, বাথরুম পরিষ্কার করার লোক পাওয়াই যায় না। বাড়িতে একটা ভালো করে পূজো দেবার জন্য একজন ভালো পুরোহিত পাওয়া যায় না, যাওবা দুই একজন পাওয়া যাবে তারা শুদ্ধ মন্ত্রোচ্চারণ করতে পারেনা। এখন সবাই রাজা উমির হতে চাইছে, জাতিধর্মের কাজ কেউ করতে চাইছে না।

কোকাকোলার মালিক কিভাবে একটা ঠাণ্ডা পানীয়ের ফরমুলা আবিষ্কার করেছিলেন, আবিষ্কার করার পর ঐ ফরমুলাটা কোন দিন কাউকে আর জানতে দেননি। এখনও পর্যন্ত কোকাকোলা ঐ একই ফরমুলাতে তৈরী হয়ে চলেছে, এখনও পর্যন্ত কেউই এর নকল করতে পারেনি। এটাই হচ্ছে কুলধর্ম। যারা কুলধর্মকে বাঁচিয়ে রাখতে পারবে তাদেরকে কেউ কোন দিন পথে বসিয়ে দিতে পারবে না। কুলধর্মই একেকটা বংশকে অনেক উঁচুতে নিয়ে যায়, তারা যখন নিজের কথা বলতে শুরু করে তখন হয়ত বাবার কথা বলবে না কিন্তু সবাই গর্ব করে বলে আমার দাদু এই রকম ছিলেন, আমার প্রপিতামহ এই এই করেছিলেন, আমিও এই বংশ থেকে এসেছি। কুলধর্মটা তখন সবারই গর্বের ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। যাদের কিছুই নেই, তারা বলে আমার তো কিছু ছিল না, সেইখান থেকে কষ্ট করে আমি দাঁড়িয়েছি, কিন্তু ভেতরে ভেতরে তার একটা কুণ্ঠাবোধ থাকে।

এই কথাই অর্জুন বলতে চাইছেন, জাতিধর্ম আর কুলধর্ম নষ্ট হয়ে যাবে। ব্রাহ্মণ ধর্ম, ক্ষত্রিয় ধর্ম আর শূদ্র ধর্ম নষ্ট হবে না কারণ এগুলো এত বৃহৎ আকারে যে নষ্ট হতে সময় লাগবে, কারণ এর পরম্পরা শত শত বছর ধরে অনুশীলিত হয়ে আসছে, তাই নষ্ট হতে প্রচুর সময় লাগবে। একটা যে বর্ণ তার নীচে শত শত জাতি আছে, সেইজন্য বর্ণধর্ম থেকে যাবে কিন্তু কুলধর্ম সঙ্গে সঙ্গে নষ্ট হয়ে যাবে, একটা পরিবার নষ্ট হয়ে যাওয়া মানে তার পুরো একটা ধারা হারিয়ে যাওয়া। আরেকটু বেশি নষ্ট হতে থাকলে জাতিধর্মও নষ্ট হয়ে যাবে। তার ফলে কি হবে? বর্ণসঙ্করের সৃষ্টি হবে। বর্ণসঙ্করে যে সামাজিক ক্ষতি হবে সেটার দিকে অর্জুন তাকাচ্ছে না, অর্জুনের চিন্তা একটাই এদের পূর্বজরা স্বর্গে আর থাকতে পারবে না, পিতৃপুরুষদের সবার পতন হয়ে যাবে। অর্জুন একই কথা বলে যাচ্ছেন –

**উৎসন্নকুলধর্মাণাং মনুষ্যাণাং জনার্দন। নরকে নিয়তং বাসো ভবতীত্যনুশুশ্রুম।**।৪৩।।

আমি এই রকম শুনে এসেছি যে, যদি কুলধর্ম উৎসন্নে চলে যায় তাহলে পূর্বপুরুষরা চিরদিনের জন্য নরকেই বাস করেন। অর্জুনের এই সব কথা বলার আদপেই কোন অধিকার নেই। কারণ, অর্জুনের থেকেও বড় বড় পণ্ডিত, পিতামহ ভীষ্ম, দ্রোণাচার্য, কৃপাচার্যদের মত মহান ব্যক্তিত্বরা যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে আছেন, তাঁরা কি এগুলো বিচার করছেন না, আর অর্জুনের মাথাতেই শুধু বিচারের জন্য জায়গা করে নিয়েছে? আবার এগুলো কাকে বোঝাচ্ছেন? তৎকালীন ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ প্রাজ্ঞ পুরুষ শ্রীকৃষ্ণকে বোঝাচ্ছেন। সব থেকে মজার ব্যাপার হচ্ছে, অর্জুনের এই সব বিচারধারাকে পুরো গীতার কোথাও শ্রীকৃষ্ণ একবারের জন্যেও উল্লেখ করেননি। ঠিক এই রকমই কঠোপনিষদে যমরাজের কাছে নচিকেতার প্রশ্ন ছিল – *যেয়ং প্রেতে বিচিকিৎসে মনুষ্যে অস্তিত্যেকে নায়মস্তীতি চৈকে১/১/১৯*। কেউ বলে মরার পর জীবন আছে কেউ বলে নেই। যমরাজ কোথাও উত্তর দেননি যে মৃত্যুর পর জীবন আছে কি নেই। অন্য সব কথাই যমরাজ বলে গেছেন কিন্তু এই প্রশ্নের উত্তর আর দেননি। তারপরের শ্লোকে অর্জুন আরও বলছেন –

**অহো বত মহৎ পাপং কর্তুং ব্যবসিতা বয়ম্। যদ্ রাজ্যসুখলোভেন হন্তুং স্বজনমুদ্যতাঃ।**।৪৪

কি দুঃখের কথা, আমরা কি বিরাট পাপ করতে যাচ্ছি! কি মহৎ পাপ? কটা টাকার জন্য, কিছু মাটির জন্য আমাদের যারা স্বজন তাদের সঙ্গে খুনোখুনি করতে বসেছি!!

এত কথা বলার পর অর্জুন এবার নিজেই সমাধান দিচ্ছেন। ওরাতো বুঝতে পারছে না, আমাদেরকেই এর একটা উপায় বার করতে হবে। কি উপায়?

**যদি মামপ্রতীকারমশস্ত্রং শস্ত্রপাণয়ঃ। ধার্তারাষ্ট্রা রণে হন্যুস্তন্মে ক্ষেমতরং ভবেৎ।**।৪৫

আমি আর অস্ত্র ধারণ করছি না, এই আমি অস্ত্র ছেড়ে দিয়ে খালি হাত হয়ে বসে পড়লাম, আর ধৃতরাষ্ট্রের পুত্ররা এসে যদি অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে আমার মুণ্ডু কেটে ফেলতে চায় তো তাই ফেলুক, আমার তাতে কিছু আসবে না। সেটা বরঞ্চ ভালো হবে, আমি কিন্তু এই পাপ করতে পারব না। আমাকে কেটে ফেলুক, বাকিরা লড়াই করুক, আমি আর এতে জড়াচ্ছি না। এইসব বলে অর্জুন শোক মোহে কাতর হয়ে নিশ্চেষ্ট হয়ে রথের উপর বসে পড়ল। সঞ্জয় এর বিবরণ দিয়ে ধৃতরাষ্ট্রকে বলছেন –

সঞ্জয় উবাচ

**এবমুক্ত্বার্জুনঃ সংখ্যে রথোপস্থ উপাবিশৎ। বিসৃজ্য সশরং চাপং শোকসংবিগ্নমানসঃ।**।৪৬।।

মনটা শোকে এত ভারাক্রান্ত হয়ে গেছে অর্জুনের যে তাঁর হাত থেকে গাণ্ডীব খসে পড়ে গেছে। অর্জুন বলছে বটে আমার গলা কেটে দাও, কিন্তু জীবনের প্রতি প্রত্যেক মানুষের এমন আসক্তি যে জীবনকে ত্যাগ করা কেউ ভাবতেও পারেনা, জীবনের প্রতি আসক্তি কেউ ছাড়তেই পারেনা। মানুষ যখন খুব হতাশা আর দুঃখে ভেঙ্গে পড়ে তখন প্রথমে বলে আমার আর বেঁচে থেকে লাভ নেই। আসলে মস্তিষ্কে সেরোগ্লোবিন নামে একটি বিশেষ ধরণের রাসায়নিক পদার্থ তার নির্দিষ্ট মাত্রা থেকে একটু নীচে যদি নেমে যায় তখনই মানুষের মধ্যে হতাশার ভাব আসে, ওর মাত্রা যদি আরও নীচে নেমে যায় তখন তার মধ্যে আত্মহত্যার প্রবণতা জেগে ওঠে। এখন যদি কেউ আত্মহত্যা করবে বলে ঠিক করে নেয় তখন তাকে সেখান থেকে কিছুতেই ফিরিয়ে আনা যাবে না। সেই সময় তাকে যদি একটা সেরোগ্লোবিন ইঞ্জেকশন দিয়ে দেওয়া যায় তখন ওর আত্মহত্যা করার প্রবণতাটা কমে যাবে। আমাদের শরীর মনের গঠনটাই এমন ভাবে তৈরী যে মানুষ ঠিক ঠিক মরতে কখনই চায় না। এটাকেই যোগশাস্ত্রে বলছে অভিনিবেশ। মরতে চায় না বলে যখনই তার প্রচণ্ড হতাশার ভাবটা কেটে যায় তখনই সেটা সরে গিয়ে অন্য একটা কিছু চলে আসে। এখানে অর্জুনের ঠিক তাই হয়েছে। ব্যাসদেব ছিলেন বিরাট ঋষি, মানুষের মনের গতিপ্রকৃতির খবর, মানুষ কখন কোন পরিস্থিতিতে কি রকম আচরণ করে তিনি খুব ভালো ভাবেই জানতেন।

ওঁ তৎসদিতি শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতাসুপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়ং যোগশাস্ত্রে
শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে অর্জুনবিষাদযোগো নাম প্রথমোহধ্যায়ঃ।।

*****

### দ্বিতীয় অধ্যায়

## সাংখ্যযোগ

সঞ্জয় উবাচ

**তং তথা কৃপয়াবিষ্টমশ্রুপূর্ণাকুলেক্ষণম্। বিষীদন্তমিদং বাক্যমুবাচ মধুসূদনঃ।।১।।**

অর্জুন এখন খুব শোকার্ত, যাকে দেখলে মানুষের মনে করুণার উদ্রেক হয়, তাঁর দুটো চোখই অশ্রুপূর্ণ, চোখ জলে ভরা। অর্জুনকে এই রকম বিষাদগ্রস্ত দেখে ভগবান তাঁকে বলছেন –

শ্রীভগবানুবাচ

**কুতস্ত্বা কশ্মলমিদং বিষমে সমুপস্থিতম। অনার্যজুষ্টমস্বর্গ্যমকীর্তিকরমর্জুন।।২।।**

এই কঠিন পরিস্থিতিতে তোমার মধ্যে বিষাদের জন্ম কোথা থেকে নিল। আচার্য শঙ্কর তাঁর ভাষ্যে পরে এক জায়গায় বলছেন যে, শ্রীকৃষ্ণ একবারও অর্জুনকে যুদ্ধ করার জন্য প্ররোচিত করেননি, কোথাও তিনি অর্জুনকে যুদ্ধ করার আদেশ দিচ্ছেন না। তিনি যেখানে যেখানে বলছেন সেটা হচ্ছে – অনুমোদনমাত্রম্। অর্জুন এখানে যুদ্ধ করার জন্যই এসেছেন। যে সিদ্ধান্তগুলো নেওয়ার ছিল সেই সিদ্ধান্ত গুলি আগেই বিরাট রাজার বাড়িতে বসে নেওয়া হয়ে গেছে, এখানে নতুন করে যুদ্ধে প্ররোচিত করার কোন প্রয়োজনই নেই। শ্রীকৃষ্ণ শুধু যেটা করেছেন তিনি অর্জুনের শোক মোহটাকে সরিয়ে দিয়েছেন, যুদ্ধ করার জন্য কোথাও প্রেরিত করেননি। তাই শ্রীকৃষ্ণ এখানে বলছেন যে, যুদ্ধ হতে যাচ্ছে, এই সঙ্কট মুহুর্তে তোমার মধ্যে কোথা থেকে এই বিষাদের ভাব জন্ম নিল। যারা আর্য, মানে শ্রেষ্ঠ পুরুষ তাঁরা এই রকম আচরণ করেন না। এই ধরণের কাজ করে তুমি এই জগতে কোন কীর্তি পাবেনা, আর মৃত্যুর পর কোন স্বর্গলোকও পাবেনা। কেন অর্জুন পাবেনা সেটা পরে শ্রীকৃষ্ণ আরও স্পষ্ট করে বলবেন। অর্জুন এখন যা করতে চলেছেন এতে তাঁর ইহলোক আর পরলোক দুটোই নষ্ট হয়ে যাবে। সেইজন্য তুমি –

**ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্যতে। ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ।।৩।।**

হে অর্জুন তোমার এই ক্লীবতা ত্যাগ করে উঠে দাঁড়াও, এই রকম কাপুরুষতা তোমার মধ্যে শোভা পায়না। ক্ষুদ্রতা, দুর্বলতা, কৃপয়া এ সবই হচ্ছে সঙ্কীর্ণতা, নিজেকে ছোট করে নেওয়া। এটাই ভগবান অর্জুনকে বলছেন, তোমার হৃদয়ের এই ক্ষুদ্র দুর্বলতাকে দূর কর, তুমি শত্রুতাপন, শত্রুদের তাপ দেওয়া তোমার স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য, তুমি উঠে দাঁড়াও। গীতার এই শ্লোকটি স্বামীজীর খুব প্রিয় ছিল। গীতার এই শ্লোকটিকে আমাদের ভারতবর্ষের পক্ষে খুবই যুগোপযোগী, স্বামীজী গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের এই তৃতীয় শ্লোকটিকে বেশি করে আমাদের দেশবাসীর সবার সামনে নিয়ে আসতে চেয়েছিলেন।

মানুষের মনের মধ্যে যখন অপূর্ণতার ভাব আসে তখন তার মনে নানা রকমের ইচ্ছার উদয় হয়। ইচ্ছার উদয় হলে সেটাকে পূরণ করবার জন্য অনেক রকম উপায়ের প্রয়াস করে। এই অপূর্ণতা থেকে আসে দুর্বলতা, দুর্বলতা থেকে জন্ম নেয় ক্লীব ভাব। অর্জুনকে শ্রীকৃষ্ণ এইটাই বলছেন, তুমি হচ্ছ পরন্তপ, তুমি যোদ্ধা, যুদ্ধক্ষেত্রে তোমার আবার অপূর্ণতা কিসের। মানুষ কখন আজেবাজে কাজ করে ফেলে? যখন তার মনটা ছোট হয়ে যায়, মন যখন নীচে পড়ে যায়। কিন্তু অর্জুন তো শক্তিমান পুরুষ, বীর, তার মধ্যে এ জিনিষ কখনই শোভা পায়না।

শ্রীকৃষ্ণের এই এক ধমকেই, অর্জুনের মনটা এর আগে যতটা নীচে নেমে গিয়েছিল, তার থেকে একটু উপরে উঠেছে। তাঁর গলার স্বর, ভাষা, বক্তব্যের মধ্যে একটু ইতিবাচক ভাব লক্ষ্য করা যাচ্ছে। ৪ নং শ্লোক থেকে ৭ নং শ্লোকে অর্জুন আগে যা বলেছিলেন সেই কথা গুলোকেই একটু অন্য ভাবে বলছেন।

অর্জুন উবাচ

**কথং ভীষ্মমহং সংখ্যে দ্রোণঞ্চ মধুসূদন। ইষুভিঃ প্রতিযোৎস্যামি পূজার্হাবরিসূদন।।৪।।**

ভীষ্ম, দ্রোণ এনারা আমার গুরুজন, আমি আমার গুরুজনদের বিরুদ্ধে কি করে তীর নিক্ষেপ করব? মানুষের মধ্যে যখন শোক, হতাশা আসে তখন সে নানান রকমের যুক্তি নিয়ে আসে, যে যুক্তি গুলো আপাত দৃষ্টিতে খুবই যুক্তিযুক্ত, মনোমুগ্ধকর আর প্রাণস্পর্শি মনে হবে কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে কোন ভাবেই দাঁড়ায় না। অর্জুনের এই ধরণের কথার পেছনেও কোন জোর নেই। মন বিষাদে ভরে আছে, মস্তিষ্ক কাজ করছে না। যাঁর শ্রীচরণের এতদিন পূজা করে এলাম সেই পূজ্যনীয় গুরুজনদের দিকে তীর ছুড়ব কি করে?

**গুরূনহত্বা হি মহানুভাবান্**
**শ্রেয়ো ভোক্তুং ভৈক্ষ্যমপীহলোকে।**
**হত্বার্থকামাংস্তু গুরূনিহৈব**
**ভূঞ্জীয় ভোগান্ রুধিরপ্রদিগ্ধান্।। ৫।।**

অর্জুন এর আগে বলছিল এরা এসে আমাকে বধ করে দিক আমি এদের বধ করতে পারব না, এখন বলছেন এঁরা আমার গুরুজন, গুরুস্থানীয় ব্যক্তিদের হত্যা করার থেকে অনেক ভালো হবে যদি আমি ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করি। কিন্তু ভিক্ষাবৃত্তির একমাত্র অধিকার দেওয়া আছে ব্রাহ্মণদের, তাও গৃহস্থ ব্রাহ্মণদের নয়, ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচারী যারা বা বাণপ্রস্থী বা সন্ন্যাসী যারা তারাই ঘুরে ঘুরে ভিক্ষা করতে পারে। কিন্তু অর্জুন একজন ক্ষত্রিয়, তাও রাজ পরিবারের সদস্য, আবার অন্য দিকে একজন যোদ্ধা, সে কিনা বলছে আমি আমার ধর্ম ত্যাগ করে ভিক্ষা করে খাবো, অস্ত্র ধারণ না করে অর্জুন এখন ভিক্ষাপাত্র হাতে তুলে নিতে চাইছে। কিন্তু তুমি হচ্ছ ক্ষত্রিয়, যুদ্ধ করে জয় করে অন্নের সংস্থান করাটাই তোমার একমাত্র পথ, ভিক্ষাপাত্র তোমার জন্য নয়। শোক আর মোহ অর্জুনকে এমন ভাবে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে যে সে নিজের স্বধর্মকেও ভুলে গিয়ে অন্য ধর্মের বৃত্তিকে অবলম্বন করতে চাইছে।

গীতা আর উপনিষদে এই একটি বিষয়কে নিয়েই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলা হয়, যে কাজ শোক আর মোহ বশতঃ করা হয় সেই কাজই অধর্ম, যখনই শোক আর মোহ বর্জিত হয়ে কাজ করা হয় তখন ঐ কাজটাই ধর্ম। পাণ্ডবরা যখন হিমালয়ের পথে স্বর্গারোহণ পথে ভিক্ষাপাত্র নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিল তখন কিন্তু তাদেরকে কেউ বলছে না যে তারা অধর্ম করছে। তখন তাদের সন্তানরা বড় হয়ে গেছে, জাগতিক সুখভোগ যা হবার হয়ে গেছে, এইবার তারা সংসার ছেড়ে চলল, এতে কেউ দোষ দেকছে না। কিন্তু বাড়িতে রাগারাগি হল, মনে অশান্তি, ভয়, ক্ষোভ হয়েছে আর আমি বৈরাগী সেজে বেরিয়ে গেলাম, এই বৈরাগ্যের কোন মূল্য নেই। কারণ এখানে শোক আর মোহ তাকে সংসার থেকে টেনে বার করে এনেছে। অর্জুনেরও এই একই সমস্যা। অর্জুন স্বধর্মকে ত্যাগ করছে শোক মোহের জন্য, শোক আর মোহ অর্জুনকে এখন গ্রাস করে নিয়েছে, তাই নানান রকমের যুক্তি দেখাচ্ছে। কি যুক্তি দেখাচ্ছে? গুরুজনদের রক্তে ভেজা এই সম্পদ আমি ভোগ করতে চাইনা, এর থেকে ভিক্ষা করাই শ্রেয়।

শোক হচ্ছে মানস সন্তাপ, মনের কষ্ট। কোন জিনিষ আমার কাছ থেকে চলে গেছে সেইজন্য মনে সন্তাপ এসেছে, টাকা পয়সা চলে গেলে বা হারিয়ে গেলে, প্রিয়জন মারা গেলে শোক হয়। একজন যুবক বড় কোম্পানিতে ভালো মাইনের চাকরি করছে, সেই চাকরিটা চলে গেলে তার শোক হয়। আর মোহ হচ্ছে বিবেক অভাব, একটা জিনিষকে আমি পেতে চাইছি, ধরে রাখতে চাইছি। যেমন মায়ের সন্তানের প্রতি মোহ হয়। ভালো চাকরি করছে তখন সে আশা করে আছে আমার একটা প্রমোশন হলে ভালো হয়, তখন তার মধ্যে মোহের উৎপন্ন হচ্ছে। ঘুষ আর উপহার দেওয়ার মধ্যে কি পার্থক্য? শোক আর মোহের তাড়নায় যখন কাউকে কিছু দেওয়া হয় তখন সেটা হয়ে যাচ্ছে ঘুষ, আর কারুকে কিছু দেওয়ার পেছনে যখন কোন শোক আর মোহ থাকে না তখন সেটা হয় উপহার। ছেলের ভালো রেজাল্ট হবে বলে ঠাকুরের কাছে এসে ফল, মিষ্টি দিলেন, এটা হয়ে গেল ঘুষ, এতে কিছুই হয়না। আর অনেক দিন ঠাকুরের দর্শন হয়নি, যাই একবার ঠাকুরকে প্রণাম করে আসি, তখন তার অন্য রকম হয়ে যাবে। আমার প্রমোশন হবে, যাতে ভালো জায়গায় পোস্টিং হয়, সাহেবকে গিয়ে একটা উপহার দিলাম, এটাই ঘুষ হয়ে গেল। একটা জায়গায় পোস্টিং হলে আমার আরও উপরি কামাই হবে, ঐ জায়গাটার প্রতি মোহ হচ্ছে, আর এখন যেখানে আছি সেখানে কম কামাই, তার মানে আমার টাকার অভাব আছে, কম টাকা আয় হওয়ার জন্য শোক হচ্ছে, তাই সাহেবকে গিয়ে কিছু উপহার দিয়ে এলাম যাতে এমন জায়াগায় পোস্টিং হয় যেখানে আমার উপরিটা ভালো আসবে, সেটাই হয়ে গেল ঘুষ।

এখন অর্জুন একটু স্বাভাবিক হতে শুরু করেছে। মানুষের মধ্যে যদি শোক, বিষাদ ভাব এসে যায় তখন তাকে দিয়ে যদি অনেক কথা বলিয়ে নেওয়া যায় তখন তার শোকের ভাবটা আস্তে আস্তে কমে আসে। অর্জুনকেও ভগবান অনেক কিছু বলার সুযোগ করে দিয়েছেন, অর্জুনও এক এক করে যা বলার বলেই গেছে। কথা যদি না বলতে দেওয়া হয় তার বিষাদ অবসন্ন ভাবটা বাড়তে থাকে, এমনকি আত্মহত্যার প্রবণতাও এসে যেতে পারে। এর আগে প্রথম অধ্যায়ে নানা যুক্তি দেখিয়ে অর্জুন নিজেই কথা বলে গেছে, আর নিজে থেকেই উচিৎ অনুচিতের সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছিল। কিন্তু এখন নিজেই শ্রীকৃষ্ণকে বলছেন আমি বুঝতে পারছি না আমার পক্ষে কোনটা শ্রেয়স্কর।

**ন চৈতদ্বিদ্মঃ কতরন্নো গরীয়ো**
**যদ্বা জয়েম যদি বা নো জয়েয়ুঃ।**
**যানেব হত্বা ন জিজীবিষাম-**
**স্তেহবস্থিতাঃ প্রমুখে ধার্তরাষ্ট্রাঃ।।৬।।**

হে কৃষ্ণ, এই যে আমাদের সামনে ধৃতরাষ্ট্রের পক্ষের সবাই অবস্থান করে আছে, যাদেরকে বধ করে আমার বেঁচে থাকতে ইচ্ছা করছে না, এখন আমি বুঝতে পারছি না, আমরা জিতি বা হারি কিংবা ওরা জেতে বা হারে এর মধ্যে কোনটা ঠিক হবে।

**কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাবঃ**
**পৃচ্ছামি ত্বাং ধর্মসংমূঢ়চেতাঃ।**
**যচ্ছ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে**
**শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্।।৭।।**

অর্জুন বলছেন, কৃপণ স্বভাব হেতু আমার মনট ছোট হয়ে গেছে। কৃপণ মানে দীনভাব, ছোট মনের ভাব, সঙ্কীর্ণতা, ঠাকুর বলছেন – দু পয়সার সন্দেশ আনতে বলে রাস্থা দিয়ে চুষতে চুষতে আসবে। অর্জুনের যে স্বাভাবিক স্বভাব, সেই স্বভাবটা সঙ্কুচিত হয়ে গেছে। *ধর্মসংমূঢ়*, বুদ্ধিটা গোলমাল হয়ে গেছে, কোনটা ঠিক কোনটা ভুল ঠিক করতে পারছি না। সেইজন্য আমি *শাধি মাং ত্বাং*, আপনার শরণ নিলাম, আমি আপনার শিষ্য, *শিষ্যস্তেঽহং*, আমার পক্ষে যেটা ভালো, যেটা মঙ্গলে হবে সেটা আপনিই বলুন। তবে আমার বেশি সমস্যা যেটা সেটা আপনাকে আবার বলে দিচ্ছি –

**ন হি প্রপশ্যামি মমাপনুদ্যাদ্**
**যচ্ছোকমুচ্ছোষণমিন্দ্রিয়াণাম্।**
**অবাপ্য ভূমাবসপত্নমৃদ্ধং**
**রাজ্যং সুরাণামপি চাধিপত্যম্।।৮**

আমি যদি সমস্ত পৃথিবীর রাজা হয়ে যাই, স্বর্গের আধিপত্যও যদি পেয়ে যাই তবুও এই আত্মীয় বন্ধুবান্ধব গুরুজনদের বধজনিত যে শোক আর গ্লানি হবে, যে পাপ হবে সেটা দূর হবার কোন সম্ভবনাই দেখতে পাচ্ছি না। একদিকে যুদ্ধজয়ের সুখভোগ আর অন্য দিকে নিজের লোকদের বধজনিত গ্লানি ও শোক এই দুটোর মধ্যে কোনটা ঠিক আর কোনটা ভুল আমি বুঝতে পারছি না। এখন আমাকে কি করতে হবে আমাকে কৃপা করে বলে দিন। তখন সঞ্জয় আবার ধৃতরাষ্ট্রকে বলছেন –

সঞ্জয় উবাচ

**এবমুক্ত্বা হৃষীকেশং গুড়াকেশঃ পরন্তপঃ। ন যোৎস্য ইতি গোবিন্দমুক্ত্বা তূষ্ণীং বভূব হ।।৯**
**তমুবাচ হৃষীকেশঃ প্রহসন্নিব ভারত। সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে বিষীদন্তমিদং বচঃ।।১০**

সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে বলছে যে এইসব বলে অর্জুন যুদ্ধ করব না বলে চুপ করে রথের উপর বসে পড়ে দেখছেন শ্রীকৃষ্ণ কি বলেন। শ্রীকৃষ্ণ তখন এই শোক আর মোহগ্রস্ত বিষাদযুক্ত অর্জুনকে যেন মিষ্টি হেসে হেসে বলছেন –

শ্রীভগবানুবাচ

**অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে। গতাসূনগতাসূংশ্চ নানুশোচন্তি পণ্ডিতাঃ।।১১**

অর্জুনের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ নিজে থেকে এর কোনট ঠিক কোনটা ঠিক নয় বলতে যাবেন না, তাঁকে জিজ্ঞেস করা হচ্ছে ঠিকই, ঠিক তেমনি শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে যুদ্ধের জন্য উৎসাহিতও করছেন না, কারণ অর্জুন এখানে যুদ্ধ করার জন্যই এসেছেন নতুন করে আবার যুদ্ধ করার কথা কেন বলতে যাবেন। ঠিক ঠিক গীতা এইখান থেকেই শুরু হয়, এতক্ষণ যেটা হচ্ছিল এটা গীতার ভূমিকা মাত্র। গীতা ঠিক ঠিক শুরু হচ্ছে দ্বিতীয় অধ্যায়ের এগারো নম্বর শ্লোক থেকে। আচার্য শঙ্করও এই এগারো নং শ্লোক থেকেই ভাষ্য রচনা করেছেন। অন্যেরা যারা গীতার অনুবাদ করেছেন তারা প্রথম অধ্যায় থেকে শুধু অর্থ বলে দেন আবার কেউ কেউ তার ব্যাখ্যাও করেন।

আচার্য এই শ্লোকের একটা বড় ভাষ্য দিয়েছেন। গীতার উদ্দেশ্য আমরা আলোচনা করেছি, গীতার উদ্দেশ্য হচ্ছে *সংসারস্য অত্যন্ত উপরমলক্ষণং*, সংসার বৃক্ষটাকে উপড়ে ফেলে দেওয়া। এখন সংসার জিনিষটা কি বস্তু, যেটাকে গীতা উপড়ে ফেলে দিতে বলছেন? গীতাতে বার বার ঘুরে ঘুরে একটা কথা বলা হবে যে, আত্মা বা ব্রহ্ম বা ঈশ্বর ছাড়া কিছুই নেই। আত্মাই যদি সব, তাহলে এগুলো, এই জগৎসংসারে যে বহু জিনিষ দেখছি এগুলো কি। বলছে আত্মাই আছেন, কিন্তু আত্মার উপর একটা আবরণ এসে যায়। এখন এই আবরণ কেন আসে, কিভাবে আসে এর ব্যাখ্যা করা যায় না। এই আবরণটাকে বলা হয় অবিদ্যা। আত্মার যে আলো, সেই আলো যখন অবিদ্যার ভেতর দিয়ে আসে তখন সাথে সাথে দুটো জিনিষ হয়ে থাকে – অহঙ্কার আর মমকার, আমি ও আমার। এই

যে সবাই বলছে আমি আর আমার, এইটাই হচ্ছে মায়া। আর তুমি ও তোমার, এইটাই হচ্ছে মায়ার পারে। অহঙ্কার আসছে অহম্ থেকে, আমি এই শরীর, আমি সন্ন্যাসী, আমার পরিবার, আমার বাড়ি, আমার টাকা এর সবটাই অহঙ্কার বশতঃ।

প্রকৃত পক্ষে আমি এগুলো কিছুই নই, আমি হচ্ছি সেই পূর্ণ আত্মস্বরূপ, আত্মা কোন কিছুই হতে পারেনা। কিন্তু অবিদ্যা করে কি দুটো জিনিষের জন্ম দেয় – একটা হচ্ছে শোক আর অন্যটা হচ্ছে মোহ। শোক হচ্ছে একটা জিনিষ আমার কাছ থেকে চলে গেছে, আর মোহ হচ্ছে একটা জিনিষ নেই সেটাকে পেতে চাইছি, আর যেটা আছে সেটাকে ধরে রাখতে চাইছি। আমি আর আমার থেকেই – আমার আমিটা একদিকে ঠেলছে আবার আমার আমার বোধ আরেকদিকে ঠেলছে, একদিকে শোক জন্ম দিচ্ছে আরেকদিকে মোহের জন্ম দিচ্ছে। এই আমি ও আমার বোধকে অত সহজে সরান যায় না। কোটি কোটি বন্ধনে বাঁধা রয়েছে, একটা বন্ধন খুলে দিলে ততক্ষণে আরেকটা বন্ধন তৈরী হয়ে যাচ্ছে। সেইজন্য ভগবান পঞ্চদশ অধ্যায়ে বলবেন – *অসঙ্গশস্ত্রেণ দৃঢ়েন ছিত্ত্বা,* খুব ধারালো আর ভারী অস্ত্র দিয়ে এই বৃক্ষের মূলোচ্ছেদ করতে হবে। কেটে ফেলে দিলেও শেষ হয়ে যায় না, দুদিন পরে আবার ফেকড়ি বেরিয়ে যাবে।

এই শোক মোহই মানুষকে কর্মের দিকে ঠেলে দেয়। যে কর্ম করছে সেই কর্ম থেকে আবার শোক মোহ উৎপন্ন হচ্ছে, সেই শোক মোহের কারণে আবার কর্ম করতে হচ্ছে, অনন্ত কাল ধরে এইটাই চলতে থাকে। এইটাই হচ্ছে সংসার, সম্+সার, যেটা সরে সরে যাচ্ছে। গীতার নবম অধ্যায়ে ভগবান বলবেন – *অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্* - এই জগৎ অনিত্য, সুখহীন, এখানে আচার্য শঙ্কর খুব জোরের সাথে বলছেন – এই সংসারে সুখের গন্ধ পর্যন্ত নেই। আগেকার দিনে জাহাজে করে পদ্মানদী পার হতে হত। জাহাজে মাঝিরা মাছভাত খেতে দিত। মাছভাত দু রকম দামে দেওয়া হত, একটা হয়তো চার টাকা আরেকটা হয়তো এক টাকা। মাছভাতের দুই রকম রেট কেন জিজ্ঞেস করলে মাঝিরা বলত – মাছটা চুইষ্যা খাইবেন, না চিবাইয়া খাইবেন। মাছটা চুষে খাওয়া মানে, মাছকে চুষে নিয়ে ছেড়ে দিতে হবে, ওটাই আবার আরেকজনকে দেওয়া হবে। চার টাকার রেটে মাছের টুকরোটাকে চিবিয়ে চিবিয়ে খেতে পারবে। যে চুষে খাচ্ছে মাছের গন্ধেই তার এক থাল ভাত উঠে যাবে। কিন্তু এখানে আচার্য বলছেন সুখের গন্ধ মাত্রও নেই, মাছের গন্ধে ভাতটাকে যে টানব তারও উপায় নেই। খুব কঠিন বাস্তব, সুখতো নেইই, কিন্তু এত দুঃখ-কষ্ট যন্ত্রণার মধ্যেও আশা নিয়েই মানুষ বুক বাঁধে কখন না কখন সুখতো পাবো। শত শত জন্মে মার খেতে খেতে তবে গিয়ে একটু চেতনা আসে যে এই সংসার সত্যিই সুখহীন।

এই শ্লোক থেকেই আচার্য শঙ্কর গীতার ব্যাখ্যা করে শুরুতেই বলছেন – *সংসারস্য অত্যন্ত উপরমলক্ষণঃ*। সংসার হচ্ছে শোক আর মোহ। শোক ও মোহ থেকে আসক্তির জন্ম হয় – Life is all about expectations and frustrations, আশা আর হতাশাই জীবন। মানুষ যখন হতাশাগ্রস্ত হয়ে যায় তখনই সে স্বধর্ম থেকে সরে আসে, আমি করবই না, কেন আমি করতে যাব, এই ধরণের কথা বলতে থাকে। আর যখন কোন কিছু প্রত্যাশা করে তখন সেটাকে পাওয়ার জন্য পুরো দমে ঝাঁপিয়ে পড়বে। মানুষ যদি অত্যন্ত হতাশার মধ্যে জীবন অতিবাহিত করে, তার ফলস্বরূপ মৃত্যুর পর তাকে ভিন্ন যোনিতে জন্ম গ্রহণ করতে হয়। হতাশা থাকলে কাজ করতে পারেনা, কাজ করতে না পারলে সে তমোগুণী হয়ে যায়। পূর্ণ আসক্তি নিয়ে জোর কদমে কাজ করলে স্বর্গাদি লোকে গিয়ে জন্ম নেয়। স্বধর্ম পালন যখন আসক্তি নিয়ে করছে বা করছে না, এই দুই ভাবে কাজ মিশ্রিত থাকলে মানুষ রূপে জন্ম নেয়। আর স্বধর্ম যখন অনাসক্ত ভাবে করে, যে বুঝে নিয়েছি সংসার এই রকমই, সুখহীন, আমার সামনে যে কাজটা কর্তব্য রূপে আসবে সেই কাজটাই অনাসক্ত ভাবে করে দেব, নতুন কোন কাজে জড়াব না, তখন মানুষ আধ্যাত্মিকতার দিকে এগোতে শুরু করে।

স্বধর্মের তিনটে দিক – একটা হচ্ছে স্বধর্ম না করা, দ্বিতীয় হচ্ছে স্বধর্ম পুরো আসক্তি নিয়ে করা আর তৃতীয় হচ্ছে অনাসক্ত ভাবে করা। চতুর্থ একটা দিক আছে মিশ্র, কখন আসক্তি আবার কখন অনাসক্তি ভাব নিয়ে করা। যদি স্বধর্ম না করা হয় তাহলে নিম্নযোনিতে জন্ম নেবে। একজন আত্মহত্যা করল, আত্মহত্যা করা মানে সে স্বধর্ম পালন করল না, শুধু পালনই করল না, মৃত্যুর মাধ্যমে স্বধর্ম থেকে পালিয়ে গেল। এবার তাকে অতি নিম্নযোনিতে অর্থাৎ ভূত, প্রেতযোনিতে জন্ম নিতে হবে। ভূত প্রেতযোনি থেকে যখন মুক্তি পাবে তখন তাকে আবার পশুযোনিতে এসে জন্ম নিতে হবে।

যখন পুরো আসক্তি নিয়ে কাজ করবে তখন কিছু দিন স্বর্গে থাকবে তারপর ভোগ করার জন্য এমন দেশে জন্মাবে যে দেশে ভোগের আধিক্য বেশি আছে, যেমন আমেরিকা, ইংল্যাণ্ড। আবার সেখান থেকে ভারতে জন্ম নেবে। ভারতে তিন রকমের লোক আছে – এক হচ্ছে যারা ফাঁকিবাজ কাজ করতে চায়না, দুই আসক্ত হয়ে কাজ করে আর তিন অনাসক্ত হয়ে কাজ করে। আচার্যের এইটাই হচ্ছে সংসারের ব্যাখ্যা – নিম্ন যোনি, মানুষ, দেবতা আর ঋষি, যাঁরা মুক্তির পথের দিকে এগিয়ে গেছেন। এটা কিভাবে ঠিক হয়? স্বধর্ম পালনের দ্বারা। স্বধর্ম থেকে মানুষ কি কারণে সরে যায়? শোক আর মোহের জন্য। শোকের আধিক্য হলে কাজ করতে চায়না। মোহগ্রস্ত হলেও কাজ করতে চায়না। শাশুড়ি বৌমাকে কাজ করতে বললে বলবে – আমি কি শাশুড়ির চাকর নাকি? আবার

শাশুড়িকে বৌমা কিছু করতে বললে বলবে আমি তোর স্বামীকে বড় করেছি, এখন আমি তোর সেবা করতে যাব নাকি! ঝগড়া যখন লাগে তখন তুমি তোমার থাকে না, তুই তোকারিতে নেমে যায়। এদের এবার ছাগল, কুকুর, বেড়াল হয়ে জন্মানর রাস্তাটা পরিষ্কার খুলে গেল। মহামায়ার এমনই খেলা যে এরা এগুলোকে তোয়াক্কাই করে না। এই ধরণের লোক আছে বলে এই সংসার আরামসে চলছে। ঠাকুর বলছেন – মা চুষি দিয়ে ভুলিয়ে রেখেছে। আমরা সবাই এই চুষি নিয়েই ব্যস্ত। বাচ্চা যদি একবার চুষি ফেলে দিয়ে কাঁদে তখন ভাতের হাড়ি ফেলে দিয়ে মা দৌড়ে আসবে বাচ্চাকে কোলে তুলে নেবার জন্য।

আবার যখন পুরো আসক্তি নিয়ে কাজ করে, কোম্পানিতে আমাকে প্রমোশন পেতে হবে, ডিরেক্টর হতে হবে, বড়বাজারে পোস্টিং নিতে হবে, এরা এবার যেখানে ভোগের অনেক সুবিধা আছে, যেমন আমেরিকা, ইংল্যাণ্ডে গিয়ে জন্মানর জন্য নিশ্চিত হয়ে গেল, ওখানে গিয়ে আরও ভালো করে ভোগ করতে পারবে। ওখানে যখন বিরক্তি জন্মাবে তখন আবার ভারতে এসে জন্মাবে। এইভাবে চলতে থাকবে, এটাতো আর একশ দুশো বছরের ব্যপার নয়। কিন্তু যখন অনাসক্ত হয়ে কাজ করা শুরু করবে তখন বুঝে নিতে হবে যে সে মুক্তির পথে পা রাখল।

এখানে আচার্য বিরাট লম্বা ভাষ্য দিয়ে বলছেন, সংসারে দুই ধরণের লোক, একজন হচ্ছেন যিনি আত্মার স্বরূপ পুরোপুরি জেনে গেছেন বা তত্ত্বটাকে বুঝে নিয়েছেন। কি তত্ত্ব? আমার ডান হাত দিয়ে এই জগতের সব কিছুকেই আমি ধরে নিতে পারি কিন্তু আমার ডান হাতকে আমি ধরতে পারিনা। আমার এই চোখ দিয়ে জগতের সব কিছুকে দেখতে পারি কিন্তু নিজের চোখকে দেখতে পারবো না। একটা জিনিষ নিজের উপর কার্য করতে পারেনা। ঠিক এইটাই আত্মার ক্ষেত্রে বলা হয়, আত্মা কিন্তু আত্মার উপর কার্য করতে পারেনা, যেমন আমি ডান হাত দিয়ে আমার ডান হাত ধরতে পারিনা। আত্মাই হচ্ছে নির্বিশেষ চৈতন্য আবার তিনি সর্বব্যাপী, আত্মা ছাড়া আর কিছু নেই। আমি যদি কোথাও যেতে চাই তখন জায়গাটা আলাদা আর আমি আলাদা, আমি আর জায়গা যদি এক বস্তু হই তাহলে আমি কোথায় যাবো? আত্মা ছাড়া তো আর কিছু নেই, এখন আত্মা কোথায় যাবে? আত্মা কাজ করবে কার উপরে? আত্মা জানবে কাকে? কারণ আত্মা ছাড়া আর কোন দ্বিতীয় বস্তু নেই। আত্মার এই স্বরূপে যাঁদের বিশ্বাস হয়ে গেছে তাঁরা সন্ন্যাস জীবনের দিকে চলে যান। হয় এনারা আত্মার স্বরূপকে জেনে গেছেন, আর তা নাহলে তত্ত্বগত ভাবে তাঁদের দৃঢ় বিশ্বাস এসে গেছে, কিন্তু এখনও উপলব্ধি হয়নি। তাঁদের জীবন যাত্রা অন্য রকমের হয়ে যাবে। এর বাইরে যারা আছেন তারা এখন আত্মার এই স্বরূপকে ধারণা করতে পারছে না বা বুঝতে পারছে না, বা মানতে পারছে না বা বিশ্বাস করে না, তারা সেই অহঙ্কার আর মমকারে অবস্থান করছে। এদের মধ্যেও যাদের একটু বিবেক জাগ্রত হয় তাদের কেউ কেউ এখান থেকে বেরিয়ে আসতে চেষ্টা করে।

যারা অজ্ঞ তারা তো এটা মানছেই না, তারা দেখছে আমি আলাদা সে আলাদা। যখনই আমি আর সে আলাদা হয়ে গেল তখন আমি তার সাথে কথা বলতে পারি, তাকে ঘুষি মারতে পারি, তাকে ভালোবাসতে পারি। এইখান থেকেই কর্মের সম্ভবনা তৈরী হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু যাঁরা দেখেন কেবল আত্মাই আছেন, তাঁদের পক্ষে কর্ম অসম্ভব। কিন্তু যার আমি তুমি আছে তার কর্মই এক মাত্র সম্বল, এদের জন্য হল কর্মযোগ।

কর্ম করতে গেলে একজন কর্তা চাই আর একটা বিষয় চাই। আমি রুটি খাচ্ছি, আমি আলাদা রুটি আলাদা হলেই তবে রুটিটা খাওয়া যাবে। আত্মার ক্ষেত্রে কি হচ্ছে, সেখানে আত্মা ছাড়া কিছুই নেই, আত্মা ব্যতিরেকে দ্বিতীয় কিছু না হওয়ার জন্য এখানে কাজ করা সম্ভব নয়, এরই নাম হচ্ছে সাংখ্যযোগ। যাদের আমি তুমি বোধ আছে তাদের জন্য কর্মযোগ আর যাদের আত্মাই আছে এই বিশ্বাস হয়ে গেছে কিন্তু বোধে বোধ হয়নি তাদের জন্য সাংখ্যযোগ। কর্মযোগকে অনেকে বলেন কর্মসিদ্ধি, আবার সাংখ্যযোগকে নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি বলেন। একজন হচ্ছেন কর্মমার্গী আরেকজন হচ্ছে সন্ন্যাসী।

পুরো গীতা জুড়ে শ্রীকৃষ্ণ এই দুটোকে নিয়েই আলোচনা করেছেন – যেমন সন্ন্যাস কি, সন্ন্যাসযোগ কিরকম, কর্ম কি আর কর্মযোগ কি। আধ্যাত্মিক জীবনে এই দুটোই পথ, সাংখ্যযোগ আর কর্মযোগ। সাংখ্যযোগ হচ্ছে সন্ন্যাসীদের জন্য, মানে যার মনে বিশ্বাস হয়ে গেছে যে একটাই সত্তা আছে, এই বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে এখন তার যে জীবন পরিচর্যা হবে সেটাই হচ্ছে সাংখ্যযোগ। আমি যখন মনে করছি আমি আলাদা, তুমি আলাদা, ঈশ্বর আলাদা তখন যে পদ্ধতি তার জীবনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য অবলম্বন করবে সেটাই হয়ে যাবে কর্মযোগ। সাংখ্যযোগ ব্যতিরেকে বাকি যত পথ আছে সবই কর্মযোগের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। ভক্তিযোগ বলতে যা বলা হয় এই দৃষ্টিকোণ দিয়ে দেখলে ভক্তিযোগও হচ্ছে কর্মযোগ। কারণ ভক্তিযোগ যে অবলম্বন করছে সেও মনে করছে আমি আলাদা আমার ইষ্ট আলাদা, ইষ্টের যখন জপ করছে, পূজো করছে তখনও মনে করছে আমি আলাদা ঠাকুর আলাদা, আলাদা বোধ যতক্ষণ থাকবে ততক্ষণ যা করবে সেটাই কর্মযোগ হয়ে যাবে, জপ করা, ধ্যান করা, যা কিছু করা হচ্ছে সবই কর্মযোগ। আর যিনি সন্ন্যাসী তিনি সুমেরুবৎ, তাঁর কাছে জগৎ বলে কিছু নেই। তাহলে জগতে যা কিছু হচ্ছে তার ক্ষেত্রে সেগুলো কি হবে? ঠাকুর বলছেন – হাত কেটে গেছে, দর্দর্ করে রক্ত পড়ছে, সে বলছে – কই আমার তো কিছু হয়নি। তার কোন

অনুভূতিই হচ্ছে না, তাঁর কাছে কোন কার্য হতেই পারেনা, আমি আলাদা এই দেহ আলাদা। একটা ব্লেড ছিল, একটা হাত আছে ব্লেডটা সেই হাতটাকে কেটে দিয়েছে। তাহলে কে কাকে কেটেছে? ব্লেড হাতকে কেটেছে। আমার সাথে তো হাতের কোন সম্পর্ক নেই।

যিনি কর্মযোগী, তিনি দেখছেন ব্লেড আলাদা, আমি আলাদা, ব্লেডে হাত কেটে গেছে, সঙ্গে সঙ্গে হাতে ওষুধ লাগাবে। যদি ভক্ত হয় সে বলবে, ভগবানের ইচ্ছাতেই এটা হয়েছে। যদি ঠিক ঠিক কর্যোগী হয় সে বলবে, হয়তো কিছু পাপ কর্ম করেছিলাম, সেই প্রারব্ধের জন্যই হাত কেটেছে। আবার যারা ধর্মে বিশ্বাস করে না তারা বলবে এটা একটা নিছক দুর্ঘটনা। শঙ্করাচার্যের মতে পথ মাত্র দুটো – সাংখ্যযোগ আর কর্মযোগ। যখন আমি এক দেখছি, সেই আত্মা ছাড়া আর কিছুই নেই তখন সাংখ্যযোগ, আর যখন দেখছি জগৎ আলাদা আর আমি আলাদা তখন কর্মযোগ। এখন ভক্ত যখন ভক্তির অনুশীলন করে সে কিন্তু তখন শঙ্করাচার্যের মতে কর্মযোগই করছে। এই কর্মযোগ করতে করতে যখন দেখে তিনি ছাড়া কিছু নেই, তিনিই আছেন, সে তখন সন্ন্যাসী, তখন সে সাংখ্যযোগী হয়ে গেল। এই দুটোর বাইরে আর কিছু পথের সম্ভবনাই নেই। হয় আপনি দেখছেন পুরো বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জুড়ে তিনিই আছেন, আর নয়তো দুই, মানে একের অধিক দেখছেন। একের অধিক দেখলেই কর্মযোগ এক দেখলেই সাংখ্যযোগ। পুরো গীতাতে এই দুটোকে নিয়েই ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বলা হয়েছে, কিছু লোক আছে যার জ্ঞানযোগ মানে সাংখ্যযোগের উপযুক্ত, আর বেশির ভাগ লোক হচ্ছে কর্মযোগের উপযুক্ত। আর যারা কর্মও মানে না, তাদের জন্য গীতা নয়, শাস্ত্রের কথা তাদের জন্য নয়। যে বলছে, আমি ধর্মে বিশ্বাস করি, আমি এই জগৎ থেকে মুক্তি পেতে চাই, তখন তাকে জিজ্ঞেস করতে হবে তুমি কি রকম দেখছ? তুমি আলাদা আর গড়ের মাঠের মনুমেন্টকে কি আলাদা মনে হচ্ছে? হ্যাঁ, আমি আলাদা দেখছি। ঠিক আছে, তোমার জন্য কর্মযোগ। আর যদি বলি, না আমি দেখছি সবটাই সেই এক সত্তা। তাহলে তোমার জন্য সাংখ্যযোগ। গীতার আঠারোটা অধ্যায়ে ভগবান এই দুটোর উপরই বাচ খেলবেন। কখন সাংখ্যের কথা বলবেন আবার কখন কর্মের কথা বলবেন, আর কেন এই রকম হচ্ছে, এইগুলোকে ব্যাখ্যা করতে থাকবেন।

গীতার উদ্দেশ্য হচ্ছে এই সংসারকে উপড়ে ফেলে দাও। দ্বিতীয়, সংসারটা কি সেটাকে ব্যাখ্যা করল। সংসারের স্বরূপকে ব্যাখ্যা করার পর আধ্যাত্মিক সত্তার ব্যাখ্যা করছেন। আধ্যাত্মিক সত্তার ব্যাখ্যা করার পর বলবে – তুমি যদি দেখ এই দুটো এক, তাহলে তুমি হচ্ছে সাংখ্যযোগী, তখন তোমার জীবন এই এই ভাবে চলবে, আর তুমি যদি দুই দেখ তাহলে তুমি কর্মযোগী, তোমার জীবন এমন এমন ভাবে চালাতে হবে। পুরো গীতাতে এই দুটো ছাড়া আর কিছু নেই।

আত্মার একত্বকে যিনি জেনে গেছেন, আমাদের সামনে যেমন উদাহরণ ঠাকুর আছেন, ঠাকুর জেনে গেছেন যে আত্মাই আছেন, এই রকম যিশু জানতেন, বুদ্ধ জানতেন, শঙ্করাচার্য জানতেন, এই রকম হাজার হাজার মহাপুরুষ আছেন। যখন তিনি আত্মার স্বভাব, আত্মার স্বরূপকে জেনে গেলেন তখন তাঁর কিছু অন্য ধরণের ব্যবহার হয়ে যায়, তাঁর আচরণ অন্য রকমের হয়ে যায়। যার বিবরণ ভগবান এই অধ্যায়ের ৫৫ নং শ্লোক থেকে দিয়েছেন। আবার যাঁদের দৃঢ় বিশ্বাস হয়ে গেছে যে, আত্মা আছেন, আত্মার এই স্বরূপ, কিন্তু এখনও উপলব্ধি হয়নি, কিন্তু আমি উপলব্ধি করতে চাইছি, তখন এনারা চেষ্টা করেন, যাঁদের উপলব্ধি হয়ে গেছে তাঁদের মত জীবনকে সাজিয়ে নেওয়া। কিন্তু যাঁরা এখনও অত উচ্চাবস্থায় পৌঁছাতে পারেননি, তাঁরা মনে করছেন আমি আলাদা, তুমি আলাদা, ঈশ্বর আলাদা তখন তাঁরা কর্মযোগ করতে শুরু করেন।

গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের এগারো নং শ্লোক থেকে তিরিশ নং শ্লোক পর্যন্ত সাংখ্য বুদ্ধির ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এখানে আত্মার স্বরূপকে নিরূপণ করা হচ্ছে আর একত্রিশ থেকে তিপ্পান্ন পর্যন্ত কর্মযোগীদের জন্য বলা হয়েছে। আর চুয়ান্ন থেকে বাহাত্তর পর্যন্ত, যিনি সাংখ্যযোগীও নন, যোগীও নন, স্থিতপ্রজ্ঞ হয়ে গেছেন, স্থিতপ্রজ্ঞ মানে লক্ষ্যে পৌঁছে গেছেন, তাঁর ব্যবহার আচরণ কি রকম হয়, তার বিবরণ দেওয়া হয়েছে। একজন স্তিতপ্রজ্ঞের সঙ্গে যদি দিনরাত থাকি তাহলে তার মধ্যে আমি কি দেখতে পাবো, তারই বিবরণ শ্রীকৃষ্ণ শেষ ঊনচল্লিশটি শ্লোকে দিচ্ছেন।

এগারো নং শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলছেন – অর্জুন তুমি ধর্মের কথা বলছ তো, ঠিক আছে আমি তোমাকে ধর্মের দিক দিয়েই জবাব দিচ্ছি। অর্জুনের প্রধান যুক্তি হচ্ছে এই যুদ্ধে সবাইকে বধ করতে হবে, যুদ্ধে প্রচুর প্রাণহানি হবে, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু, বান্ধব কেউই বেঁচে থাকবে না, তাতে ধর্মের গ্লানি এসে যাবে। ধর্মের গ্লানি হলে সব কিছুরই বিনাশ হয়ে যাবে, কুলধর্ম থাকে জাতিধর্মের সব কিছুই নষ্ট হয়ে যাবে। অর্জুন এই বিনাশকে বন্ধ করার জন্য যুদ্ধ করতে চাইছেন না। এই পয়েন্ট থেকেই শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলছেন – তুমি *প্রজ্ঞাবাদংশ্চ ভাষসে*, প্রজ্ঞাবান পুরুষ, জ্ঞানবান পুরুষরা যে রকম কথা বলেন তুমি সেই রকম কথা বলছ, তুমি খুব উচ্চ কথা বলছ এতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু অন্য দিকে মুর্খরা যে রকম আচরণ করে তুমিও সেই রকম আচরণ করছ। কি রকম আচরণ? *অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং*, যেটাকে নিয়ে শোক করতে নেই তুমি সেটাকে নিয়ে শোক করছ।

এর আগে অর্জুন খুব সুন্দর সুন্দর কথা বলেছিল, ধর্মহানি, ধর্মগ্লানি, কুলধর্ম, জাতিধর্ম, এগুলো সব পণ্ডিতদের মত কথা, পণ্ডিত মানে যাঁরা তাঁদের বুদ্ধিকে আত্মার বিষয় করে নিয়েছেন। এখানে পণ্ডিত মানে শাস্ত্র জানা ও শাস্ত্র মুখস্ত করা পণ্ডিত না, পণ্ডিত বলতে এখানে আত্মজ্ঞানীর কথা বলা হচ্ছে। *গতাসূনগতাসূংশ্চ*, আত্মজ্ঞানী যেটা চলে গেছে সেটার জন্য শোক করেন না, আর যেটা আসেনি সেটার জন্য উদ্বিগ্ন হন না। তাই অর্জুন তুমি যে এই রকম আত্মজ্ঞের মত কথা বলছ কিন্তু তোমার এই ব্যবহারিক আচরণে বিপরীত কেন হচ্ছে? ধর্মের গ্লানি যে বলছ এতে বোঝা যাচ্ছে যে তোমার বুদ্ধি তোমার নিজের নিয়ন্ত্রণে নেই। তোমার ব্যবহারটা এখন উন্মত্ত প্রমত্তবৎ হয়ে গেছে। মানুষ যখন নেশা ভাং করে ভুলভাল কথা বলে, বা মাথা খারাপ হয়ে গেলে যেমন উল্টোপাল্টা কথা বলে, তুমিও এই রকম কথা বলে যাচ্ছ।

তাহলে প্রশ্ন হতে পারে, ভীষ্ম, দ্রোণের মত মহান  পুরুষরা যদি মারা যান তাহলে কি এদের জন্য শোক করা উচিৎ হবে না? এনারা কি শোকের যোগ্য নন? তখন একটা জায়গায় ব্যাখ্যা করা হয় যে মানুষের যদি চারিত্রিক পতন হয়ে যায় তাহলে তার জন্য শোক করা যায়, মৃত্যুর জন্য শোক করা হবে কেন, কারণ মৃত্যুটাই স্বাভাবিক। বাল্মীকি রামায়ণে বলা হচ্ছে, শ্রীরামচন্দ্র যখন জঙ্গলে চলে গেলেন, ভরত এসে শুনছেন শ্রীরামচন্দ্র জঙ্গলে চলে গেছেন, শুনে ভরত খুব বিস্মিত হয়ে গেছেন, দাদা কি খুব জঘন্য কোন কাজ করেছ? স্বাভাবিক ভাবে একজন মারা গেলে তাঁর জন্য শোক করার কিছু নেই। কিন্তু তাঁর যদি নৈতিক পতন হয়ে যায়, তখন শোক করার আছে। আচার্য শঙ্কর কিন্তু এই ভাবে বলছেন না, তিনি সোজা করে বলছেন এগারো, বারো আর তেরো নং শ্লোক হচ্ছে সাংখ্যবুদ্ধির চরম তত্ত্ব, এই তিনটে শ্লোক হচ্ছে গীতার হৃদয়। গীতা হচ্ছে উপনিষদের হৃদয়, আর উপনিষদ হচ্ছে বেদের হৃদয়। বেদ হচ্ছে হিন্দুধর্মের চরম দর্শন, হিন্দুধর্মের শেষ কথা। এই তিনটি শ্লোককে যে একবার মাথাতে ঠিক ঠিক ভাবে বসিয়ে নিতে পারবে তাহলে তার হিন্দুধর্মের সব কিছুই পরিষ্কার ধারণা হয়ে যাবে। অর্থাৎ পুরো হিন্দু দর্শনে যাবতীয় নির্যাস এই তিনটে শ্লোকে দেওয়া হয়েছে। এগারো নং শ্লোকে বলছে যাঁরা আত্মজ্ঞ তাঁরা যেটা চলে গেছে তার জন্য শোক করেন না, আর যেটা আসেনি তার জন্য উদ্বিগ্ন হন না। কেন উদ্বিগ্ন হন না?

**ন ত্বেবাহং জাতু নাসং ন ত্বং নেমে জনাধিপাঃ। ন চৈব ন ভবিষ্যামঃ সর্বে বয়মতঃপরম্।।১২**

এই রকম কখনই হয়নি যে আমি ছিলাম না, বা তুমি ছিলে না, বা এই রাজারা কেউ আগে ছিল না। আমরা অনন্ত কাল ধরে আছি। এমনও নয় যে আমরা কেউ ভবিষ্যতে থাকব না, আমরা চিরদিন ছিলাম, চিরদিন আছি আর চিরদিনই থাকব। আমরা যে চিরদিন আছি, চিরদিন থাকব এটা বলা হচ্ছে আত্মদৃষ্টিতে, শরীর-মন-বুদ্ধির দৃষ্টিতে বলা হচ্ছে না। আমাদের identification যেটা হয় সেটা বেশির ভাগ সময়ই হয় আমাদের শরীরের সঙ্গে। কখন সখন মনের সঙ্গে, আমরা আমাদের আবেগের সঙ্গে নিজেদের এক করে ফেলি। জ্ঞানী কিন্তু আত্মার সঙ্গে সব সময় identify করে রেখেছেন, আত্মরূপেই তাঁরা সব সময় অবস্থান করছেন। তাহলে অর্জুন, তুমি যে জ্ঞানীদের মত কথা বলছ, এখন বল তুমি কার জন্য শোক করছ?

অর্জুনকে ভগবান কেন এইভাবে উত্তর দিচ্ছেন? কারণ অর্জুন প্রথমেই ধর্মের কথা দিয়ে শুরু করেছিল। তাই ভগবান বলছেন এই নাও তোমাকে আমি তোমার ধর্মের কথা দিয়েই উত্তর দিচ্ছি। আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, যখনই কারুর শোক দুঃখ হয় তখন তাকে বোঝাতে গেলে উচ্চ তত্ত্বের কথা দিয়েই শুরু করতে হয়। যখন ধুম্ জ্বর হয় প্রথমে আগে ডাক্তাররা বলে জ্বরটা আগে কমাতে হবে, তারপর আসল চিকিৎসা শুরু হয়। ভগবানও ঠিক তাই করেছেন, প্রথমেই অর্জুনের সামনে সব থেকে উচ্চ দর্শনের তত্ত্বকে রেখেছেন। ঠিক এই রকমই আরেকটি খুব উচ্চ দর্শনের কথা বলছেন –

**দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা। তথা দেহান্তরপ্রাপ্তির্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি।।১৩।।**

দেহাভিমানী আত্মার দুটো রূপ আছে, মানে আত্মাকে দুই ভাবে দেখা যায়। একটা হচ্ছে আত্মার নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত স্বভাব। দ্বিতীয় রূপ হচ্ছে, আত্মা যখন দেহের সঙ্গে এক করে কল্পনা করে নেয় এই দেহ আমার, এই মন আমার, এই বুদ্ধি আমার। এগুলো সে কল্পনা করে নিচ্ছে, গীতার মতে বাস্তবিক আত্মার কোন ধরণের রূপান্তর বা পরিবর্তন বা বিকার হয় না। আত্মা যখন শরীর ধারণ করে তখন তার তিনটে অবস্থা প্রাপ্ত হয়, প্রথমে দেহি জন্ম নিল, শৈশবকাল, দ্বিতীয় তারপর এই শরীরে যৌবন এল, তৃতীয় অবস্থায় শেষে তার শরীরের জরা আসে। এই তিন অবস্থার কোন অবস্থাতে আমরা কি বলি যে আমি এই অবস্থাতেই শেষ হয়ে গেলাম। একটা বাচ্চা ছেলে কৈশোর অবস্থা প্রাপ্ত হতেই তার হাল্কা গোঁফের রেখা উঠলে সে কি এই বলে হা হুতাশ করে যে, আমার একি হল, আমার সব কিছু হারিয়ে গেল! এটা হচ্ছে দেহের একটা রূপান্তর। ঠিক সেই রকম দেহের চতুর্থ অবস্থা হচ্ছে মৃত্যু, যাঁরা জ্ঞানী পুরুষ তাঁরা জানেন যে এই মৃত্যুটাও বাল্য, যৌবন, জরার মত একটা অবস্থার রূপান্তর মাত্র।

সমস্যাটা হচ্ছে মরে গেলে তাকে চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি না। যে অন্ধ সেও তো জগতের কিছু চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে না, তাই বলে কি জগৎ নেই, জগৎ কি চলছে না। আমরা বলতে পারি সে চোখে দেখতে পায়না কিন্তু শুনতে পাচ্ছে, স্পর্শ করতে পারছে। অন্ধ একটা ইন্দ্রিয়ের দ্বারা জগৎকে অনুভব করতে পারছে না কিন্তু আমি পাঁচটা ইন্দ্রিয় দিয়েই জগতের সব কিছু অনুভব করতে পারছি। গীতাতে সাধারণ মানুষের কথা বলা হচ্ছে না, এখানে এক উচ্চ তত্ত্ব ও উচ্চ আদর্শকে মানবজাতির সামনে তুলে ধরা হচ্ছে। যাঁরা মৃত্যুর পরও দেখতে পারেন যে এই জগৎ একই ভাবে চলেছে, তাঁদের কাছে মৃত্যু একটা রূপান্তর মাত্র। কারা এটাকে দেখতে পান? জ্ঞানীরাই দেখতে পান, আত্মার উপর কোন কিছুই হয় না। কিন্তু এগুলো কার উপর হচ্ছে? দেহাভিমানী আত্মার উপর। যিনি নিজেকে দেহের সাথে এক করে রেখেছেন, তিনিই দেখছেন আত্মা জন্ম নিল, আত্মার যৌবন এল, আত্মা জরাগ্রস্ত অবস্থায় চলে গেল। চতুর্থ অবস্থাটা জ্ঞানীরাই দেখতে পান, অজ্ঞানীরা দেখতে পায়না। এই যে তিনটে অবস্থার কথা বলা হল এইটাই হচ্ছে মূল কথা।

এখানে বলা হল, আত্মা কি, আত্মা কিভাবে দেহাভিমানী হয়ে যায়, দেহাভিমানী হয়ে গেলে শরীরাদির কি রকম পরিবর্তন হচ্ছে, কিন্তু আত্মার উপর এগুলো কিছুই হয় না। সেইজন্য বলছেন কোন কিছুর জন্যই শোক করা উচিৎ নয়। এরপর গীতাতে যা কিছু বলা হবে সবটাই এই তিনটে শ্লোকের সম্প্রসারিত ব্যাখ্যা। এই তিনটে শ্লোককে ব্যাখ্যা করলেই পুরো গীতা বেরিয়ে আসবে, কেননা এত সংক্ষেপে আসল বক্তব্যটা ধরা যায় না।

এই যে বলছেন *ন ত্বেবাহং জাতু নাসং ন ত্বং নেমে জনাধিপাঃ,* তুমিও এর পরে থাকবে আমিও এর পরে থাকব, এর আগে তুমিও ছিলে আমিও ছিলাম, এই রাজারাও ছিল। পরে চতুর্থ অধ্যায়ে ভগবান আবার যখন বলবেন তখন তিনি দেহাভিমানী রূপে বলছেন, এখানে যেটা তিনি বলছেন শুদ্ধাত্মা, সর্বব্যাপী আত্মা রূপে বলছেন। এইখানে এসে একজন সাধারণ পুরুষ আর একজন জ্ঞানী পুরুষের মধ্যে একটা বিরাট পার্থক্য এসে যায়। অজ্ঞানী মনে করে মৃত্যুই হচ্ছে সব কিছুর পরিসমাপ্তি, জ্ঞানী দেখেন মৃত্যু হচ্ছে একটা অবস্থার রূপান্তর মাত্র। যিনি সন্ন্যাসী তাঁর জীবনের প্রতিও কোন মোহ থাকে না আবার মৃত্যুর প্রতিও কোন আসক্তি থাকবে না, জীবন-মৃত্যুর পারে তারা চলে যান। বিভিন্ন ধর্মে এইগুলো কে বিভিন্ন ভাবে দেখে। হিন্দু ধর্মে এই কারণে আত্মহত্যাকে কঠোর ভাবে নিষেধ করা হয়। কারণ মৃত্যুই যদি সব কিছুর শেষ হত তাহলে আত্মহত্যা করাটা কিছু অন্যায় হত না। কিন্তু আমরা মৃত্যুকে এই ভাবে দেখিনা, আমরা দেখি মৃত্যু হচ্ছে একটা অবস্থার রূপান্তর মাত্র। মৃত্যুর পর আবার একটা নতুন রূপ পরিগ্রহ করে তাকে ফিরে আসতে হবে। সেইজন্য আত্মহত্যা করার কোন অর্থই হয় না, এই কারণে আমাদের শাস্ত্রে আত্মহত্যাকে পাপ বলা হয়। অন্যান ধর্মে বলে ভগবান এই শরীর দিয়েছেন এই শরীরকে এইভাবে শেষ করে দিতে নেই।

এতক্ষণ তো অনেক উচ্চ আদর্শের কথা বলা হল, কিন্তু আদর্শের অনুশীলন করে লক্ষ্যে পৌঁছাবে কি করে? তখন ভগবান এক এক করে বলবেন। এখন যেটা বলছেন এটা হচ্ছে খুব সারতত্ত্ব। আসলে গীতা হচ্ছে পুরোটাই condensed milk যতই জল ঢালা হবে ততই দুধ হতে থাকবে। সেইজন্য গীতার কোন শেষ নেই। বাল্মীকি রামায়ণে যত ধর্মের কথা বলা হয়েছে গীতাতে সেই সব কথা গুলোকে কয়েকটা শ্লোকের মধ্যেই বলা হয়ে গেছে। এখন লক্ষ্যে যাবে কি করে? প্রথম কথা আত্মা ছাড়া কিছু নেই, এক দিকে সংসার হচ্ছে দুই, অন্য দিকে অধ্যাত্ম হচ্ছে অদ্বৈত, মানে দুইয়ের অভাব। অদ্বৈতের 'অ' মানে এক নয়, দ্বৈতের অভাব, সংসার হচ্ছে দ্বৈত। দ্বৈত মানে দুই, তাহলে অদ্বৈত মানে দুই নয়। দুই যদি না হয় তাহলে কত হবে? দুই না হলে কি হবে, সেটা মুখে বলা যায় না।

বেশির ভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় অধিকাংশ লোকই অদ্বৈতকে একেশ্বরবাদের সঙ্গে এক করে ফেলেন। কিন্তু অদ্বৈত আর একেশ্বরবাদ দুটো পুরো আলাদা। একেশ্বরবাদ মানে এক ঈশ্বর আছে, এরা অদ্বৈতের অর্থ করেন যে সেই এক ঈশ্বর অদ্বৈতম্। কিন্তু তা নয়, অদ্বৈতের অর্থ হচ্ছে দুই নেই। তাহলে দুই নেই তো তাহলে আছেটা কি? আমি বলব দুই নেই তাহলে এক আছে। কিন্তু এক বললে তো দুইও আসবে। যেখানে এক থাকবে সেখানে দুইও থাকবে, যেখানে শূন্য থাকবে সেখানেও দুই আসবে। ঠাকুর বারবার বলছেন – যার জ্ঞান আছে তার অজ্ঞান আছে। এগুলো হচ্ছে খুব গভীর তত্ত্বের কথা, দু-চারটে কথাতে এগুলো কারুকে বুঝিয়ে দেওয়া অসম্ভব ব্যাপার। এগুলো প্রথমে শুনে যেতে হয়, তারপর অনেক বছর সাধন-ভজন করতে করতে হঠাৎ করে জিনিষটা পরিষ্কার হয়ে যাবে। অদ্বৈত হচ্ছে এক দুইয়ের পার, আধ্যাত্মিক জিনিষ হচ্ছে এক দুইয়ের পার।

অধ্যাত্ম রামায়ণে বলছে রাম চলেনও না রাম কিছু করেনও না। যেমন সূর্যে অন্ধকারের কল্পনাই করা যায় না। অন্ধকারের কল্পনা যখন করা যায় না, তখন সূর্যে দিনও নেই রাতও নেই। ঠিক তেমনি অদ্বৈতে একও নেই দুইও নেই। দ্বৈত হচ্ছে একটা মতাদর্শের নাম, যারা এর অনুগামী তাদেরকে বলা হয় দ্বৈতবাদী। অদ্বৈত হচ্ছে জগতের, সাংসারিক যা কিছুর অস্তিত্ব আছে তার বাইরে। সংসারটা কি? দ্বৈত, duality, এর আরেকটা অর্থ হচ্ছে দ্বন্দ্ব। দ্বন্দ্ব মানে যেটা আছে তার একটা বিপরীত থাকবে, গরম

থাকলে ঠাণ্ডা থাকবে, সুখ থাকলে দুঃখ থাকবে, কথায় বলে যার আছে সুখ তার আছে দুঃখ, যার আছে জন্ম তার হবে মৃত্যু, সংসার মানেই এই দ্বন্দ্ব। যেখানে দুই নেই, এক দুইয়ের পার সেইটাই অধ্যাত্ম। অধ্যাত্ম মানে আত্মা, আত্মা মানে সংসারের পার, সংসারের পার মানে দ্বন্দ্বাতীত, দুই নেই।

এই শ্লোকে এইটাই শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলছেন – আমাদের যা কিছু দ্বন্দ্ব আছে ইন্দ্রিয় দিয়ে মাপা হয়। কিভাবে মাপা হয় –

**মাত্রাস্পর্শাস্তু কৌন্তেয় শীতোষ্ণসুখদুঃখদাঃ। আগমাপায়িনোঽনিত্যাস্তাংস্তিতিক্ষস্ব ভারত।।১৪।।**

যেমন আমরা তাপমান যন্ত্রের সাহায্যে বলতে পারি এত তাপমাত্রা, এত তার জলীয় পদার্থ। এখানে কে মাপছে? আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি। বলছেন, যা কিছু ইন্দ্রিয় দিয়ে মাপা যায় সেটাই দ্বন্দ্ব। আর যা কিছুই দ্বন্দ্ব ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অনুভূত হয়, সেটাই *আগমাপায়িনঃ*, আসে আবার চলে যায়। *তাংস্তিতিক্ষস্ব ভারত*, সেটার দিকে মন দিয়ো না। জগতে যা কিছু আছে তার উল্টোটাও আছে, এই দুই যেমনি হয়ে যাবে সেটার জন্ম হবে আবার মৃত্যুও হবে, একটা সময় তার আগমন হবে আরেকটা সময় তার প্রস্থান হবে। যে জিনিষটা স্থায়ী নয়, আসছে আবার চলে যাচ্ছে, সেই জিনিষের দিকে মন দিও না। যেমন জন্ম মৃত্যু, যার জন্ম হল তার মৃত্যু অবধারিত হয়ে গেল, তাই মৃত্যুতে বিচলিত হয়ে মন খারাপ করো না। বিয়ে হচ্ছে ডিভোর্সও হতে পারে, ডিভোর্স যদি হয়ে যায় তাহলে মন খারাপ করো না। আমার চাকরি হয়েছে, চাকরি একদিন চলে যাবে, চাকরি চলে গেলে মন খারাপ করো না। আবার যদি চাকরি পেয়ে যাও সেটা নিয়ে বেশি উৎফুল্ল হয়ো না। আর সব কিছুতেই যদি তোমার মনে ক্রিয়া বিক্রিয়া হতেই থাকে তাহলে কি হবে? কিছুই না, এর মধ্যেই পড়ে থাকবে। তোমার উদ্দেশ্যটা কি? তোমার উদ্দেশ্য হচ্ছে আধ্যাত্মিক পুরুষ হওয়া। আধ্যাত্মিক পুরুষ যদি হতে হয় তাহলে, ইন্দ্রিয় সুখ বলতে যা কিছু আছে সবটাকে তোমায় কেটে দিয়ে এই দ্বন্দ্বাত্মক জগৎ থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। কারণ ইন্দ্রিয়ের যা কিছু আসে তার উল্টোটাও আসবে। যেমন শীত অনুভূতি, শীতের অনুভূতি কখন ভালো লাগে কখন খারাপ লাগে। যখন গরমের সময় ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা লাগে তখন আরাম লাগে, গরম কালে এসি ঘরে থাকতে কত আরাম লাগে। আবার শীতের সময় হিমালয়ে গেলে কষ্ট হয়। এখানে সুখ-দুঃখের কথাই হচ্ছে না, যে কোন দ্বন্দ্বই হোক না কেন, মন দিতে নেই। একবার ভালো মন্দ খেয়ে পেট ভরেছে, তোমার আবার ক্ষুধা হবে, পেট ভরে গেলে এমন কিছু আহামরি হয়ে গেল না। তুমি যদি ক্ষুধার্ত হয়ে যাও, তাতেও তোমার কষ্টে কাতর হয়ে ভেঙ্গে পড়ার কিছু নেই। শরীর, মন, ইন্দ্রিয় দিয়ে যে অনুভূতি হচ্ছে সেটার দিকে কখন মন দিও না। যদি এইসব দ্বন্দ্বের দিকে মন দাও তাহলে তুমি সংসারের জাঁতাকলে পড়ে পিষে যাবে। তোমাকে অভ্যাস করতে হবে এইসব দ্বন্দ্ব থেকে বেরিয়ে আসা। তারপরের শ্লোকে ভগবান বলছেন, কে অমৃত লাভ করতে পারে, অমৃত লাভের অধিকারী কে?–

**যং হি ন ব্যথয়ন্ত্যেতে পুরুষং পুরুষর্ষভ। সমদুঃখসুখং ধীরং সোঽমৃতত্বায় কল্পতে।।১৫।।**

দুঃখ আর সুখে সমান দৃষ্টি, শীত আর উষ্ণতায় কখনই বিচলিত হন না, এই ধরণের পুরুষরাই অমৃত লাভ করতে পারেন। যিনি মহাপুরুষ, যিনি ঋষি তাঁরও কষ্ট হয়, কষ্ট হওয়াটাই স্বাভাবিক, আবার আনন্দের জিনিষকে যে তিনি ভোগ করেন না তা নয়, খুবই উপভোগ করেন। তাঁকেও যদি ভালো খাওয়া দেন, ভালো কাপড় দেন, ভালো সুখ স্বাচ্ছন্দ্য দেওয়া হয়, তারও সেটা ভালো লাগবে, তাঁকে যদি কটূ কথা বলেন, তাঁরও খারাপ লাগবে। কিন্তু তাঁর ব্যক্তিত্বের যে মূল কেন্দ্রে তিনি অবস্থান করে আছেন সেখান থেকে তিনি কখন টলে যাবেন না, ওটা আসবে আবার ক্ষণিকের মধ্যে চলে যাবে। একটু নড়ে উঠবেন, কিন্তু আহা মরি হয়ে কাতর ভাবে বিচলিত হয়ে যাবেন না। সুখ এলে তিনি কখনই চেষ্টা করবেন না এটাকে কিভাবে ধরে রাখা যায়। আবার খারাপ কিছু হয়ে গেল, তখনও তিনি বাবাগো মাগো বলে অস্থির হয়ে পড়বেন না, ও এসেছে আবার চলে যাবে, এই ভাব নিয়ে ঐদিকে মন দেবেন না, একটু কষ্ট হবে ব্যস্ ঐটুকুই। মনটাকে কখন এগুলোতে ফেলে রাখবেন না, মনটা তাঁর সব সময় অমৃততত্ত্বে দিয়ে রাখবেন, আত্মজ্ঞান ব্যতিরেকে মন আর কোথাও থাকবে না।

এই অধ্যায়ের এর পরের শ্লোকটা অত্যন্ত কঠিন শ্লোক, কারণ এর অর্থকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বিভিন্ন পণ্ডিত বিভিন্ন ভাবে ব্যাখ্যা করেন আর যে যেভাবে ব্যাখ্যা করছেন সেখান থেকে একট নতুন দর্শন জন্ম নিয়ে নিয়েছে। এইভাবেই ভারতে বিভিন্ন দর্শনের সৃষ্টি হয়েছে। গীতার অনেক কঠিন শ্লোকের মধ্যে এই ষোল নং শ্লোকটি একটি কঠিন শ্লোক।

**নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ। উভয়োরপি দৃষ্টোঽন্তস্ত্বনয়োস্তত্ত্বদর্শিভিঃ।।১৬।।**

*অমৃততত্ত্বায়, তত্ত্বদর্শিভিঃ* এগুলো একই কথা। তত্ত্ব হচ্ছে তৎ থেকে, ওঁ তৎ সৎ, তৎ হচ্ছে ব্রহ্ম, যিনি ব্রহ্ম তাঁরই নাম তৎ। ব্রহ্মের পুরো ব্যাপারটা হচ্ছে তত্ত্বম্, এই ব্যাপারটাকে যিনি জানেন, জ্ঞেয় যিনি, ব্রহ্মজ্ঞান যাঁর আছে তাঁকে বলা হয় তত্ত্বদর্শী বা তত্ত্বজ্ঞ। যিনি তত্ত্বদর্শী হন তিনি সৎ আর অসতের যথার্থ স্বরূপ জানেন। চিনি আর বালিতে মিশে আছে, পিঁপড়ে চিনিটুকু নিয়ে বালিটুকু ছেড়ে দেয়। সৎ আর অসৎ মিশে আছে, তত্ত্বদর্শীগণ এর থেকে সৎ কে আলাদা করে নিয়ে অসৎকে ছেড়ে দেন। ঠাকুর

বলছেন – ঈশ্বরই সৎ আর বাকি সব অসৎ। সৎ কে কখন সখন ঈশ্বর বা ব্রহ্ম অর্থে আনা হয়, আবার কখন সখন সৎ কে মায়া অর্থেও আনা হয়। কারণ অনেক সময় বলা হয় তিনি সৎ অসৎএর পার, এই ধরণের কথাতে আমাদের সংশয় এসে যায়। এখানে সৎ বলতে যদি মায়াকে বোঝান হয় তাহলে শ্লোকের অর্থ পাল্টে যাবে, আবার সৎ বলতে যদি বোঝায় ব্রহ্ম, তখন অর্থ অন্য রকম হয়ে যাবে। আচার্য শঙ্কর এখানে সৎ বলতে ব্রহ্মকে বোঝাচ্ছেন। অসৎএর অর্থ কখন মায়াকে বোঝায়, আবার মায়াকে কখন বলা হয় মায়া সৎও নয় অসৎও নয়। সংস্কৃতে এটা একটা বিরাট সমস্যা, কখন একটা শব্দকে যে অর্থে নিচ্ছে সেই শব্দকেই আবার অন্য সময় এর ঠিক বিপরীত অর্থে বলা হয়।

শঙ্কারাচার্য তাঁর ভাষ্যে এই শ্লোকের অর্থ করতে গিয়ে বলছেন – যেটাকে বেঁধে দেওয়া হয়েছে, কোথায় বেঁধে দেওয়া হয়েছে? দেশ, কাল আর বস্তুর মধ্যে আবদ্ধ। যেমন এই বোতলটা, বোতলটা বোতলের এই আকারের মধ্যেই আবদ্ধ, মাইক্রোফোনটা বোতলের মধ্যে নেই, মাইক্রোফোনটা আলাদা বোতলটা আলাদা। বোতলটা একটা জায়গার মধ্যে আবদ্ধ, আর বোতলটা একটা সময় হয় ভেঙ্গে যাবে, না হয় নষ্ট হয়ে যাবে, একটা সময়ের মধ্যে আবদ্ধ। যে বস্তুটা একটা নির্দিষ্ট সময়, একটা নির্দিষ্ট স্থানে এবং একটা বস্তুর মধ্যে আবদ্ধ, যেমন বোতলটা প্লাস্টিক বস্তুতে আর মাইক্রোফোনটা ধাতুর মধ্যে আবদ্ধ, সেটাই অসৎ। এই পশ্চিমবঙ্গ এখানে আছে কিন্তু আমেরিকাতে নেই। সেইজন্য বাংলার প্রতি যখন ভালোবাসা আসছে তখন অসৎ জিনিষের প্রতি ভালোবাসা আসছে। আমি আজকে আছি আগামীকাল মরে যাব। সময়, দেশ আর বস্তুর দ্বারা যেটা আবদ্ধ সেটাই হচ্ছে অসৎ। আর যেটাকে এই তিনটের দ্বারা আবদ্ধ করা যায় না সেটাই হচ্ছে সৎ। সেইজন্য সৎ বলা হয় ব্রহ্মকে বা ঈশ্বরকে আর যেটাই পরিবর্তনশীল, কোথায় পরিবর্তনশীল? দেশের সীমাতে, কালের সীমাতে আর বস্তুর সীমাতে, সেটাই হচ্ছে অসৎ। যাঁরা তত্ত্বদর্শী, আধ্যাত্মিক পুরুষ তাঁরা সৎ অসৎএর তফাৎটা জানেন। ঠাকুর বলছেন ঈশ্বর সৎ আর বাকী সব অসৎ, ঈশ্বরই বস্তু আর বাকী সব অবস্তু। এখানে সৎ বলতে বোঝাচ্ছে বস্তু, বস্তু আর অবস্তুর তফাৎটা তত্ত্বদর্শী জানেন।

সৎ আর অসৎ এর পার্থক্য ছাড়া আর কি জানেন? *নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ*, বস্তুতে অবস্তু কখনই থাকতে পারেনা, আর অবস্তুতে কখন বস্তু থাকতে পারেনা। বস্তু কখন অবস্তুকে জন্ম দেয় না, অবস্তু কখন বস্তুকে জন্ম দেয় না। এখানে এনারা মৃগ মরীচিকার উপমা দিয়ে ব্যাখ্যা করেন। মরুভূমিতে মরীচিকা হয়, এখানে মরুভূমি হচ্ছে সৎ, মরুভূমিই আছে, কিন্তু মরুভূমিতে যে মরীচিকা হয় সেটা অসৎ। কিন্তু মরুভূমি আর মরীচিকার মধ্যে কোন সম্পর্ক নেই, মরুভূমি মরীচিকার জন্ম দিচ্ছে না আবার মরীচিকাও মরুভূমির জন্ম দিচ্ছে না। শঙ্করাচার্য এই জায়গাতে এসে মায়ার ব্যাখ্যা করছেন। তিনিও ভাষ্যে বলছেন সৎ আর অসৎ এর মধ্যে কোন সম্পর্ক নেই, মরুভূমি আর মরীচিকার মধ্যেও কোন সম্পর্ক নেই, ওপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। মরীচিকা হচ্ছে মনের খেলা, ওখানে কিছুই হচ্ছে না, যে দেখছে তার মনের মধ্যেই সব কিছু হচ্ছে। রাস্তায় একটা দড়ি পড়ে আছে, অন্ধকারে দড়িটাকে আমি সাপ দেখছি, আরেকজন সাপ দেখছে না। সে যদি সাপ নাই দেখে তাহলে সাপ এলো কোথা থেকে, সাপ আমার মনের মধ্যে জন্ম নিয়েছে, দড়ি আর সাপের মধ্যে কোন সম্পর্কই নেই। সেইজন্যই এখানে বলছেন সৎ অসৎকে জন্ম দেয় না, অসৎ সৎকে জন্ম দেয় না। তার মানে, এই যে ব্রহ্ম, আত্মা, এইখান থেকে সংসারের কোন উৎপত্তি হয়নি। এইটাই হচ্ছে আধ্যাত্মিকতার শেষ কথা, যখন সমাধিতে চলে যান তখন তিনি দেখেন আত্মা ছাড়া কিছু নেই। তখন তিনি বলেন ত্রিকালমে কোই জগৎ নেহি হ্যায়।

এই চরম অবস্থাতে ধাপে ধাপে এগোতে হয়। শেষ অবস্থার কথা হচ্ছে সৎ থেকে অসৎ জন্ম নেয় না, অসৎ থেকে সৎএর জন্ম হয় না। সেইজন্য জগৎকে আমি যদি ভালোবাসি, জগতের কোন বস্তুকে যদি আমি ভালোবাসি, সেখান থেকে আমি কখনই আশা করতে পারিনা যে আমি সৎ পর্যন্ত পৌঁছাতে পারব। সৎ সৎ, অসৎ অসৎ। যাঁরা তত্ত্বজ্ঞ, যাঁরা তত্ত্বের পথে চলেছেন তাঁরা কখনই এই ভুলটা করেন না। যে ঈশ্বর লাভের পথে চলেছে সে কখনই সংসারকে ধরে রেখে এগোতে পারেনা। যারা সংসারকে সার মনে করছে তারা সংসারেই পড়ে থাকবে, অর্থাৎ অবস্তুকে ধরে আছে। যাঁরা বস্তুকে ধরে আছেন তাঁরা কখনই অবস্তুকে ধরে থাকবেন না। এখানে সৎ বলতে আত্মাকে বোঝাচ্ছে অসৎ বলতে অনাত্মাকে বোঝাচ্ছে। যা কিছু পরিবর্তনশীল সেটাই অনাত্মা। কি পরিবর্তনশীল? যেটা দেশ, কাল ও বস্তু এই তিনটেতে বাঁধা। যা কিছু পরিবর্তনশীল সেটাই আবার সান্ত। সন্তানের প্রতি মায়ের যে ভালোবাসা সেটাও সান্ত। সন্তানকে ততক্ষণই ভালোবাসবে যতক্ষণ সন্তান তার কথা মত চলবে। তার মানে এই ভালোবাসাটাও অনন্ত হল না। আত্মাই একমাত্র অনন্ত, ব্রহ্মই একমাত্র অনন্ত। আত্মা আর ব্রহ্ম এক। অন্যেরা মনে করে না, মাধ্বাচার্যের মত দ্বৈতবাদীরা মনে করেন আত্মা আর ব্রহ্ম আলাদা। শঙ্করাচার্যের অন্য মত, তিনি শাস্ত্র থেকে অনেক উপমা নিয়ে এসে দেখাবেন যে আত্মা আর ব্রহ্ম এক।

যেটার ঠিক ঠিক যে স্বরূপ, সেটাকে বলা হয় তত্ত্ব। অনেক সময় কোন কিছুকে পরিষ্কার ভাবে জানার জন্য জিজ্ঞেস করা হয়, এর তত্ত্বটা কি? মানে জানতে চাইছেন এর স্বরূপটা কি। তৎ মানে ব্রহ্ম, যিনি ব্রহ্ম তত্ত্ব জানেন তিনি তত্ত্বজ্ঞ।

চৌদ্দ আর পনের নং শ্লোকে ভগবান যত কিছু দ্বন্দ্বমূলক আছ সেই ভাবকে নেতিবাচক ভাবে বোঝালেন, তুমি যদি আত্মাকে জানতে চাও তাহলে যে কোন ধরণের দ্বন্দ্বের বাইরে চলে এসো। এর পরের তিনটি শ্লোকে ভগবান সৎ বস্তুর স্বরূপের বর্ণনা করছেন, তত্ত্বটা কি, সত্যটা কি। যেমন ষোল নম্বর শ্লোকে বললেন, যে জিনিষটা দেশ, কাল ও বস্তু এই তিনটেতে বাঁধা, সেই জিনিষটা অসৎ। অসৎ থেকে সৎ বস্তুর জন্ম হবে না, সৎ থেকে অসৎ এর জন্ম হবে না। সৎ বস্তু কোনটি? যা এই তিনটি জিনিষের পরিসীমার বাইরে। আর যিনি তত্ত্বজ্ঞ তিনি সব সময় সৎ ও অসৎ বস্তু উভয়ের পার্থক্য করেন। আবার তিনি পুনরায় সৎ বস্তুর স্বরূপের বর্ণনা করতে গিয়ে বলছেন, সৎ বস্তু কি রকম?

**অবিনাশি তু তদ্বিদ্ধি যেন সর্বমিদং ততম্। বিনাশমব্যয়স্যাস্য ন কশ্চিৎ কর্তুমর্হতি।।১৭।।**

সৎ বস্তু অবিনাশী। এখানে অসৎ কথার অর্থ হচ্ছে যেটা পরিণামতে, মানে নিরন্তর যার পরিবর্তন হয়ে চলেছে, এক অবস্থা থেকে আরেক অবস্থাতে পরিণাম হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু সৎ বস্তু কে, *তু তদ্বিদ্ধি,* যিনি এই সমগ্র জগৎ পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে তাঁর কোন পরিণাম হয় না, অবিনাশী, তিনিই সৎ বস্তু। *যেন সর্বমিদং ততম্,* যেটা দিয়ে সব কিছু পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে। *ততম্* শব্দের উৎপত্তি হচ্ছে তন্ ধাতু থেকে। তন্ শব্দের অর্থ হচ্ছে বস্ত্র, তাঁত থেকে এসেছে, বস্ত্র দিয়ে যেমন সব আচ্ছাদিত করা হয়, ঠিক তেমনি সৎ বস্তু দিয়ে এই সমগ্র জগৎ, যা কিছু বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড আছে সব পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে, ঢাকা আছে। আর কি স্বরূপ সৎ বস্তুর? *বিনাশমব্যয়স্যাস্য ন কশ্চিত কর্তুমর্হতি,* যিনি অব্যয় তাঁকে কেউ বিনাশ করতে পারেনা। অর্জুনের বক্তব্য ছিল, এই ভয়ঙ্কর যুদ্ধে ভীষ্ম, দ্রোণ গুরুজনদের বধ করতে হবে, তাঁদের এই স্থুল শরীর নাশ হয়ে যাবে। শ্রীকৃষ্ণ বোঝাচ্ছেন, ভীষ্ম ও দ্রোণ এঁদের ব্যক্তিত্বের দুটো দিক আছে – একটা হচ্ছে অসৎ আরেকটা হচ্ছে সৎ, অসৎ হচ্ছে এঁদের শরীর, মন, ইন্দ্রিয়; শরীর-মন-ইন্দ্রিয় নিয়ে আমরা আলোচনা করবই না, দ্বিতীয় দিক হচ্ছে সৎ, সৎ হচ্ছে *যেন সর্বমিদং ততম্,* যেটা সব কিছুকে পরিব্যাপ্ত করে আছে, মানে চৈতন্য, আত্মা, ব্রহ্ম, যাঁকে *ন কশ্চিত কর্তুমর্হতি,* একে কেউ নাশ করতে পারেনা। শঙ্করাচার্য বলছেন, ঈশ্বর যিনি, ভগবান যিনি, তিনিও এই আত্মার নাশ করতে পারবেন না। ঈশ্বর, যিনি হচ্ছেন সর্বশক্তিমান, তিনিও এই আত্মার নাশ করতে পারেন না। কারণ, আত্মাই হচ্ছেন ব্রহ্ম, আর নিজের উপর নিজের ক্রিয়া করা যায় না। ঈশ্বর যদি চান আপনার আত্মার কিছু করতে, তিনি কিন্তু কিছু করতে পারবেন না, তাঁকে জ্ঞানও দিতে পারবেন না, তাঁকে অজ্ঞানও করতে পারবেন না, তাঁর নাশও করতে পারবেন না, তাঁর জন্মও দিতে পারবেন না। কেন পারবেন না? কারণ আত্মা আর ঈশ্বর এক, আত্মা আর ব্রহ্ম এক।

যখন আত্মা এই মায়ার অবিদ্যা রাজ্যে চলে আসে তখন সেখানে ছোট্ট আকারে যেটা আমার মধ্যে রয়েছে তাকেও বলা হচ্ছে আত্মা, আর আমার আত্মা, তার আত্মা, সমস্ত প্রাণীর আত্মা। জগতের আত্মা, সবার যিনি মালিক তাঁকে ঈশ্বর বলা হয়। আত্মা আর ঈশ্বরের এইটুকুই তফাৎ কিন্তু তত্ত্বতঃ কোন তফাৎ নেই। আমরা কিন্তু তত্ত্বতঃ এই কথা বলতেই পারিনা, যতক্ষণ আমি বোধ আছে ততক্ষণ ঈশ্বর বোধ থাকতে হবে। ঈশ্বর হচ্ছেন রাজা, আমি আর ঈশ্বর আলাদা। কিন্তু যেটা বলা যেতে পারে তা হচ্ছে, আমিই সেই ব্রহ্ম। এই পয়েন্টের উপর দাঁড়িয়েই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলছেন – ভীষ্ম আর দ্রোণের তুমি আর কি নাশ করবে, স্বয়ং ঈশ্বরও এঁদের কাউকেই নাশ করতে পারবেন না। সবার শরীরটাকে নাশ করা যেতে পারে, কিন্তু তাদের সৎ যেটা আছে তাঁকে নাশ করা যাবে না। কেন পারবেন না? নিজের উপর ক্রিয়া করা যায় না, ডান হাত দিয়ে ডান হাত যেমন ধরা যায় না। সেইজন্য অর্জুন যেটা ভাবছে এরা মরতে যাচ্ছে, এটা কখনই বাস্তবে সম্ভব নয়।

সৎ আর অসৎ এর যেমন কোন সম্পর্ক নেই, আত্মা আর দেহ এই দুটোরও কোন সম্পর্কই নেই। এবার পরের শ্লোকে বলছেন –

**অন্তবন্ত ইমে দেহা নিত্যস্যোক্তাঃ শরীরিণঃ। অনাশিনোঽপ্রমেয়স্য তস্মাদ্ যুধ্যস্ব ভারত।।১৮।।**

*অন্তবন্ত* মানে যার বিনাশ নিশ্চিত, তোমার দেহ সুন্দর হতে পারে, সুন্দর নাও হতে পারে, আমার দেহ সুস্থ হতে পারে আবার অসুস্থও হতে পারে, এই দেহ জরাগ্রস্ত হতে পারে আবার যৌবন প্রাপ্তও হতে পারে, তোমার দেহকে দেখে আমার আনন্দ হতে পারে, দেখে আবার বিতৃষ্ণাও হতে পারে, কিন্তু এই দেহের একটা জিনিষ নিশ্চিত, সেটা হচ্ছে এই দেহ *অন্তবন্ত,* এর নাশ হবেই। সিনেমার হিরো হিরোইনদের দেখতে কত সুন্দর, আবার কুষ্ঠরোগীকে দেখতে কুৎসিৎ লাগছে, কার দেহ কি রকম হবে কেউ বলতে পারেনা, কিন্তু একটা জিনিষ সবাই নিশ্চিত ভাবে বলতে পারে, এই দেহের নাশ হবেই। এই শরীরের ভেতরে যিনি আত্মা আছেন, এই শরীরটা তাঁর অধীনে। সৎ হচ্ছে শরীরি আর শরীরটা সৎ এর উপরে পোষাকের মত চাপান। *অনাশিনঃ,* যিনি অবিনাশী আর *অপ্রমেয়স্য,* যাঁকে এই মন বুদ্ধি দিয়ে জানা যায় না, যাঁর নাশ হয় না, যিনি মন বুদ্ধির অগোচর। আর যেটার জন্য তুমি দুঃখ করছ সেটা অসৎ, এর বিনাশ অবশ্যাম্ভাবি, *তস্মাদ্ যুধ্যস্য ভারত,* সেইজন্য অর্জুন তুমি যুদ্ধ কর। কারণ তুমি চেষ্টা করলেও সৎ এর নাশ করতে পারবে না, তুমি কেন, ঈশ্বরও পারবেন না, আর যেটা অসৎ, তুমি না চাইলেও সেটা আজ কিংবা কাল নাশ হবেই। ভীষ্ম,

দ্রোণদের তুমি কিভাবে নিচ্ছ, এই দুটোর মধ্যে যে কোন একটাকে তো তোমাকে নিতে হবে। হয় তুমি এঁদের সৎ রূপে নাও না হয় অসৎ রূপে নাও। যদি সৎ রূপে নাও তাহলে তুমি কেন, ভগবানও ভীষ্ম দ্রোণের নাশ করতে পারবেন না, আর যদি অসৎ রূপে নাও তাহলে এঁদের বিনাশ তো গ্যারান্টি। এই অবস্থায় তোমার একমাত্র কর্তব্য হচ্ছে যুদ্ধ করা। আর যুদ্ধ তোমার স্বধর্ম, স্বধর্ম থেকে বিচ্যুত হওয়ার মত পাপ কর্ম করতে যেও না। যখন এদের মৃত্যু গ্যারান্টি তখন তুমি কেন তোমার স্বধর্ম ত্যাগ করে নিজের উপর কলঙ্কের বোঝা চাপাতে চাইছ। আবার যখন তুমি দেখছ এঁদের আত্মার নাশ স্বয়ং ভগবানও করতে পারবে না, তাহলে তুমি মিছিমিছি তোমার স্বধর্ম ত্যাগ করতে যাবে কেন।

এখানে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে একবারও যুদ্ধ করতে বলছেন না, তিনি অর্জুনকে স্বধর্ম ত্যাগ করতে নিষেধ করছেন। কেন তুমি স্বধর্ম ত্যাগ করতে চাইছ? তুমি এই দেহ মনের মোহে মোহগ্রস্ত হয়ে গেছ, আর তোমাকে দেখিয়ে দিলাম এই দেহ মন হচ্ছে অসৎ, কালের গতিতে আজ কিংবা কাল এই দেহ মনের পরিণাম বিনাশপ্রাপ্ত হওয়া। এঁরা আজ না হয় কাল মরবে, আর মাঝখান থেকে তুমি তোমার স্বধর্ম ত্যাগ করে পাপের ভাগী হয়ে যাবে। এই রকম ভুল কাজ করতে যেও না। এখানে প্রধান হচ্ছে স্বধর্ম, যদি তুমি এঁদেরকে বাঁচাতে পারতে তাহলে স্বধর্ম ত্যাগ করাটা না হয় মেনে নেওয়া যেত, কিন্তু তুমি তো কোন ভাবেই ভীষ্ম দ্রোণ এঁদের বিনাশকে আটকাতে পারবে না।

অর্জুনের একটু আধটু স্বধর্ম ত্যাগ হচ্ছে না, বিরাট স্বধর্ম ত্যাগ করতে যাচ্ছিলেন, সমস্ত সৈন্যরা দাঁড়িয়ে গেছে, সারা ভারত থেকে ক্ষত্রিয় রাজারা তাদের বাহিনী নিয়ে এসে গেছে, যুদ্ধ শুরু হতে যাচ্ছে তখন অর্জুন বলছে আমি যুদ্ধ করব না। বন্ধুদের সাথে কথায় কথায় দুটো একটা মিথ্যা কথা বলে দিলাম এগুলোতে তেমন কোন বড় স্বধর্ম ত্যাগ হচ্ছে না, যেমন যুদ্ধের সময় যুধিষ্ঠির একটা মিথ্যে কথা বললেন, অশ্বত্থামা হত ইতি গজঃ। এখানেও একটা ধর্ম ত্যাগ হল, কিন্তু এটা একটা ছোট ধর্ম ত্যাগ, তাও একটা বৃহত্তর স্বার্থের জন্য। সেখানে তো শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে বললেন না যে, তুমি স্বধর্ম ত্যাগ করো না, উল্টে শ্রীকৃষ্ণই দিব্যি যুধিষ্ঠিরকে গিয়ে বললেন তুমিই এই মিথ্যে কথাটা বল। কিছু কিছু ক্ষেত্রে পরিস্থিতির বিচার করতে হয়, আপাতপক্ষে কার ভালো হবে দেখতে হয়, যদি বৃহত্তর স্বার্থে মঙ্গল হবে, তাহলে মিথ্যে কথা বল, যদি মিথ্যে কথা না বলে তাহলে সর্বনাশ হয়ে যাবে তখন তুমি স্বধর্ম ত্যাগ করেও মিথ্যে কথা বলে দাও। আর অর্জুন তো এখানে যুদ্ধ করবার জন্য প্রস্তুত হয়ে এসেছেন, কিন্তু শোক মোহের দরুণ ভেঙ্গে গিয়ে বিমূঢ় হয়ে পড়েছে। তখন শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে দুই দিক দিয়ে বোঝাচ্ছেন – শরীরের দিক দিয়ে যদি দেখ আজ হোক কাল হোক এদের সবার বিনাশ অবশ্যাম্ভাবি আর যদি পারমার্থিক দিক দিয়ে বিচার কর তুমি কারুকেই বিনাশ করতে পারবে না, কারণ আত্মা অবিনাশী।

আমি একটা অফিসে ভালো পোস্টে চাকরি করি। আমার ছেলের খুব অসুখ, চিকিৎসার জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন, এখন আমার একটা মোটা টাকার ঘুষ নেওয়ার অফার পেয়েছি। আমি যখন ঘুষ নিতে যাব তখন খবর এসেছে যে, আমার ছেলে ভালো হয়ে গেছে, কিংবা আমার ছেলে মারা গেছে। এখন আমি ঘুষ নিয়ে কি করব। অর্জুন ঠিক এইটাই করতে যাচ্ছে, অর্জুন একটা পাপ কর্ম করতে যাচ্ছে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে সাবধান করে দিচ্ছেন।

এতক্ষণ ভগবান আত্মার স্বরূপ বলার পরে যে দুটো শ্লোক বলছেন এই দুটো শ্লোক কঠোপনিষদ থেকে নেওয়া হয়েছে। আচার্য শঙ্কর তাঁর ভাষ্যে বলছেন যে, ভগবান দেখাচ্ছেন শ্রুতিতেও এই কথাই বলা হয়েছে।

২৪শে জুলাই, ২০১০

আমরা এর আগেও গীতার মূল সুর, পুরো গীতা কি বলতে চাইছে, সেই বিষয়ে অনেক আলোচনা করেছি। গীতার এই মূল সুরটাকে সব সময় মনে রাখতে হবে। গীতার একটাই বক্তব্য তা হল মুক্তি। যেটা শঙ্করাচার্য অনেকবার বলছেন – সংসারস্য অত্যন্ত উপরমলক্ষণঃ, সংসারের পুরোপুরি নিবৃত্তি। এইটাকেই বলা হচ্ছে মুক্তি, গীতার একমাত্র উদ্দেশ্য এইটাই। ঠাকুর গীতার উদ্দেশ্য খুব সহজ করে বলছেন – দশবার গীতা উচ্চারণ করলে যা হয় গীতার উদ্দেশ্য তাই, মানে ত্যাগ। কিসের ত্যাগ? সংসার ত্যাগ।

এই জগতে দুই রকমের লোক আছে। একজন হচ্ছেন যিনি বুঝে গেছেন ঈশ্বরই একমাত্র সত্য, ঈশ্বরই আছেন, ঈশ্বর ব্যতিরেকে আর কিছুই নেই। এই ধরণের লোকেরা কোন কাজেই লিপ্ত হন না। লিপ্ত হন না মানে তিনি যে কোন কাজ করেন না তা নয়, অহং বুদ্ধি নিয়ে কিছু করেন না। আমি করছি এই বুদ্ধিটা নষ্ট হয়ে যায়। যিশু খ্রীষ্ট, বুদ্ধ, শ্রীরামকৃষ্ণ এনারা কি খাওয়া দাওয়া করতেন না, ঘুমোতেন না? সবই করতেন কিন্তু কোন কাজেই অহং বুদ্ধি, আমি বুদ্ধিটা থাকে না। এইসব কথা অত সহজে সাধারণ মানুষ ধারণা করতে পারে না, এমন কি যারা অনেক দিন ধরে শাস্ত্র শুনছে, পূজো জপ ধ্যান করছে, ধর্ম পথে রয়েছে, তারাও কোন

ধারণাই করতে পারে না। কিন্তু শুনে যেতে হয়, ঠাকুর বলছেন সময় না হলে কিছু হয় না। গীতার গূঢ় তত্ত্ব ধারণা করা দূরে থাকুক, এর তত্ত্ব বোঝার প্রস্তুতিই অনেকের হয়নি।

এই যে অহং বুদ্ধি নাশের কথা বলা হল, এখন শ্রীরামকৃষ্ণ ভাত খাচ্ছেন আর একজন সেও খাচ্ছে, দেখতে একই রকম লাগবে, এমনকি ঠাকুর খেতে খেতে দুচারটে কথাও বলছেন, সেই ব্যক্তি হয়তো তাও বলছে না, কিন্তু তার অহং বুদ্ধি আছে, ঠাকুরের মধ্যে যেটা একেবারেই নেই। ঠাকুরের অহং বুদ্ধি নেই এটা আমরা কি করে বুঝব? যদি বলি তাঁর আচরণে বুঝতে পারব। কিন্তু কি আচরণ দেখে বুঝব? এখন শ্রীকৃষ্ণ গোপীদের বস্ত্র হরণ করেছিলেন, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে কত রকমের ছল চাতুরির আশ্রয় নিয়েছিলেন, এখন তাঁকে কি করে বুঝব যে তিনি অনাসক্ত হয়ে এই কাজ গুলো করেছিলেন। আসলে কখনই বোঝা যায় না। আমি অনাসক্ত কিনা আমি ছাড়া আর কেউ কোন দিন বুঝতে পারবে না। কারণ এর সংস্কৃত শব্দ হচ্ছে স্বসংবেদ্য, যাঁর হয়েছে তিনিই জানবেন, তাছাড়া আর কেউ জানতে পারবে না। যে ঘি খেয়েছে সেই জানতে পারবে, সে যতই বর্ণনা দিক না কেন ঘি খেতে কেমন লাগে, যে কোন দিন ঘি খায়নি তাকে কোন ভাবেই বোঝান যাবে না। কোন কারণে আমার মনে যে কষ্ট হচ্ছে এই কষ্টকে কেউ জানতে পারবে না। আধ্যাত্মিক অনুভূতি যেটা হয় যার হয় সেই বুঝতে পারে, অপর কেউ বুঝতে পারে না। আমি অনাসক্ত কিনা সেটা আমিই একমাত্র জানতে পারব। আচরণে বোঝা যায়, এটা ঠিকই, যার জন্য অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে প্রশ্ন করছেন, আপনি তো অনেক উপদেশ দিলেন, অনেক কথা বললেন কিন্তু এর লক্ষণটা কি, কি দেখে বুঝব যে ইনি স্থিতপ্রজ্ঞ। স্বসংবেদ্য তো বুঝলাম, কিন্তু কিছু তো বলুন যাতে বুঝতে পারি যে ইনি স্থিতপ্রজ্ঞ। তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৫৫ নং শ্লোক থেকে স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ বলবেন। কিন্তু সেখানেও পরিষ্কার বোঝা যাবে না। স্বামীজীর জীবনী, কথামৃত পড়লেও কিছু বোঝা যায় না। কারণ স্থিতপ্রজ্ঞের আচরণ একেবারে সাধারণ লোকেদের মতই মনে হবে। তফাৎ যেটা হয়, যেটা ঠাকুর বলছেন – কলাই ডালের পুর আরে ক্ষীরের পুর। আমিও কাজ করব আবার তিনিও কাজ করবেন কিন্তু ভেতরে কি আছে, কিসের পুর আছে সেটাই তফাৎ। এটাকে কেউ বুঝতে পারে না, একমাত্র যার হয়েছে সেই বুঝতে পারবে, কারণ একটাই – স্বসংবেদ্য।

এর ফলে এর একটা নেতিবাচক দিকও এসে যায়। সাধুরা খুব সহজে লোককে ঠকাতে পারে। কেউ যদি বলে আমি পরমহংস, আমার তো বোঝার উপায় নেই তিনি সত্যিই পরমহংস কিনা। কয়েক বছর আগে একজন যোগীবাবা বললেন আমি হচ্ছি ভগবান বুদ্ধ, আর এই নিয়ে কত ঢাক পেটানো হল। এখন তিনি বুদ্ধ হতেও পারেন আবার নাও হতে পারেন, ধরার কোন উপায় নেই। আবার একজন ঠাকুরের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করছে তিনি কি রকম পরমহংস? লাল পেড়ে ধুতি পড়েন, আবার পানও খান। কি করে ধরব? কোন উপায় নেই।

পরমহংস, ব্রহ্মজ্ঞানী তো অনেক উঁচু কথা হয়ে গেল, অনাসক্ত তো অনেক নীচে, অনাসক্ত হওয়ার পরে ব্রহ্মজ্ঞানীর অবস্থাতে যাওয়ার পথটা কিছুটা সহজ হয়ে যায়, কিন্তু একজন অনাসক্ত কিনা সেটাও বোঝা যাবে না। একজন আসল অনাসক্ত পরমহংস এবং নকল পরমহংসকে কোন দিন ধরা যাবে না কে আসল আর কে নকল। তার একটাই কারণ এটা হচ্ছে স্বসংবেদ্য। একদল সাধু ছিল, তাদের মধ্যে একজন সত্যিকারে পরমহংস ছিলেন। তিনি যাকেই দেখতেন তাকেই ধরে বলতেন – ভাই এক দান লুডো হয়ে যাক। তিনি লুডো খেলতেন। আর সাধুরা বিরক্ত হত, কোন ধ্যানট্যান করবে না, আর খালি যাকে পাবে তাকেই ধরে এক দান হয়ে যাক করবে। একদিন সেখানকার রাজা তার দলবল নিয়ে সাধুদের আখরার কাছ দিয়ে যাচ্ছিল। সাধুদের দেখে তিনি ঠিক করলেন সাধুদের একদিন ভাণ্ডারা দেবেন। সাধুরা রাজবাড়িতে গেছেন। রানী গিয়ে সাধুদের প্রণাম করছেন। সবাই রানীকে আশীর্বাদ করছেন। এই সাধুটিকে প্রণাম করতেই রানীর কানে ফিস্‌ফিস্‌ কর কি একটা বলল। বলতেই রানী চোখমুখ লাল করে গটমট করে সেখান থেকে বেরিয়ে চলে গেল। এখন রানী রেগে গেছে, রাজা কি আর রানীকে সামলাতে পারবে। রাজা সব লোকজনদের নিয়ে সাধুদের ভাণ্ডারা থেকে বেরিয়ে চলে গেছে। সাধুরা খুব রেগে গেছে, এত বড় ভাণ্ডারা ছিল, কত প্রণামী পাওয়া যেত, এর জন্য সব কেঁচিয়ে গেল। সব সাধুরা জিজ্ঞেস করছেন – তুমি রানীকে কি বলেছিলে? সাধুটি বলছে, আমি তো তেমন কিছুই বলিনি, শুধু বলেছিলাম তোমার পেট পরিষ্কার হোক। সাধুরা বলছেন – একটা মহিলাকে এই রকম কথা বলা অপমানজনক। সাধুরা আরও রেগে গেছেন। এর ঠিক আধ ঘন্টা পরেই রাজার পুরো দল আবার সাধুদের কাছে ফিরে এসেছে। এসে বলছে রানী পেট ব্যাথায় ছটফট করছে। এমন ছটফট করছে যে প্রাণ যায় যায় অবস্থা হয়ে গেছে।

তখন রাজা বুঝেছে কিছু একটা গোলমাল আছে। আসলে সাধুটি ছিল ব্রহ্মজ্ঞানী, ত্রিকালদর্শি, সব জানেন কি হতে চলেছে। বাইরে থেকে দেখে মনে হবে সাধুটি ফচকিমি করে বেড়াচ্ছে, কিন্তু কেউ বুঝতে পারবে না। রানীকে দেখেই বুঝেছেন যে মেয়েটি কিছুক্ষণের মধ্যেই একটা ঝামেলায় পড়তে যাচ্ছে। কি হতে যাচ্ছে সাধুটি রানীকে বলতেই রানী রেগে মেগে চলে এসেছে, তখন যদি রাগ না করে সাধুটিকে বলত আপনি আশীর্বাদ করুন তাহলে তিনি নিশ্চয়ই কিছু ব্যবস্থা করে দিতেন। এখন রাজার লোকরা সবাই এসে সাধুটির পায়ে পড়ে বলছে আপনি রক্ষা করুন। সাধুটি বলছেন যে, আমি তো আগেই বলেছিলাম, আচ্ছা ঠিক আছে ভালো হয়ে যাবে। তারপরেই রানীর শরীরটা আস্তে আস্তে স্বাভাবিক হয়ে গেল। তখন সাধুরা বুঝেছে যে এতো পরমহংস, আমাদের মধ্যে এতো

দিন ধরে আছে বোঝাই যায়নি। এইসব হয়ে যাওয়ার পর সাধুটি ঐ দল ছেড়ে অন্য দিকে চলে গেল। এগুলো কাহিনী, কাহিনীর সব কিছু আক্ষরিক ভাবে নিতে নেই, কিন্তু কাহিনীর মাধ্যমে একটা ভাবকে সামনে নিয়ে আসা হয়। এইটাই যে পরমহংসকে বোঝা যায় না। স্বামীজী যখন আমেরিকায় ছিলেন তখন একটা কিছু দিয়ে বোঝা যাবে না যে তিনি এত বড় ব্রহ্মজ্ঞানী পুরুষ। রাজার মত থাকছেন, বড় বড় সিগার টানছেন, সব রকম খাবার খাচ্ছেন, মেয়ের দল পেছনে পেছনে ঘুরছে, কিন্তু স্বামীজীর কাছে এগুলো কোন ব্যাপারই ছিল না। একই জিনিষ বুদ্ধের জীবনে, শ্রীকৃষ্ণের জীবনেও হয়েছে। বুদ্ধের জীবনে ভিক্ষা তো নামেই ছিল, কিন্তু রাজাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গিয়েছিল বুদ্ধকে কে তার রাজপ্রাসাদে আমন্ত্রন করে আজ ভিক্ষা দেবে, আবার রাজাদের আমন্ত্রণকে এক পাশে সরিয়ে দিয়ে আম্রপালির মত নর্তকীর বাড়িতে খাওয়া দাওয়া করতেন। শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে কত মিথ্যা কথা ছলচাতুরি করেছিলেন, অথচ আমরা জানি তিনি ভগবান। সেইজন্যই বলা হয় যে, কোন উপায়েই বোঝা যায় না তিনি অনাসক্ত কিনা। এইজন্য যারা কাউকে বোকা বানাতে চায় নিজেকে অনাসক্ত বা পরমহংস বলে জাহির করে খুব সহজেই বোকা বানাতে পারেন। যারা বোকা ধরা পড়ে যায়, যারা চালাক তারা ধরা পড়বে না। সেইজন্য ভারতে আধ্যাত্মিক শাস্ত্রকে কখনই objective করা হয়নি।

আমাদের কাছে গীতাদি মোক্ষশাস্ত্র ব্যক্তি বিশেষের জন্য। যার মনে হচ্ছে আমার জীবন এইভাবে চলতে পারে না, সে যদি নতুন ভাবে জীবন শুরু করতে চায় তাহলে একজন সাধুর কাছে যেতে হবে। সাধু এখন দেখবেন তার ত্যাগ বৈরাগ্য কেমন, সেই অনুযায়ী তাকে দু চারটে কথা বলে দিয়ে এই এই করতে বলে দেবেন। এখন কে কি করছে তাতে তাঁর কিছু আসে যায় না, সব কিছু ভুলে গিয়ে যা করতে বলা হয়েছে সেই ভাবে সাধনার মধ্যে ডুব দিতে হবে। এবার নিজের জ্ঞান হচ্ছে কিনা সে নিজেই বুঝতে পারবে, অপরের হচ্ছে কিনা সেই দিকে তার নজর দিতে নেই।

আচার্য শঙ্কর বলছেন, প্রথম ধরণের হচ্ছে যিনি বুঝে গেছেন যে জগতে ঈশ্বর ছাড়া আর কিছু নেই। ঈশ্বরের কি রূপ? ঈশ্বর চৈতন্য স্বরূপ। তিনি যে হাত পা দিয়ে যুদ্ধ করছেন, বাঁশি বাজিয়ে গোপীদের সঙ্গে লীলা করছেন সেই রূপ নয়। এই রূপও আছে, কিন্তু তাঁর আসল রূপ হচ্ছে চৈতন্যরূপ, এইটাই শেষ কথা, বাকি সব হচ্ছে তাঁর অপরা রূপ। দ্বিতীয় ধরণের হচ্ছে যাদের এই জ্ঞান হয়নি, যারা এই জগতে বদ্ধ হয়ে আছেন, যারা মনে করছে আমি আছি আর এই জগৎ আছে, আমি তুমি ভেদ আছে, এই দ্বৈত বোধ যাদের আছে তাদের জন্য হচ্ছে সাধনা। কি সাধনা তারা করবে? কর্মযোগের সাধনা করতে হবে। কর্মযোগের নিয়ম হচ্ছে কর্তা, কর্ম আর ক্রিয়া আলাদা। আমি জল পান করছি, আমি হলাম কর্তা, জলটা হচ্ছে কর্ম আর পান করাটা হল ক্রিয়া। সাধনা মানেই হচ্ছে কর্তা, কর্ম ও ক্রিয়া এই তিনটেই থাকবে। যখন জ্ঞান হয়ে যায় তখন কর্তা, কর্ম আর ক্রিয়া এক হয়ে যায়।

কর্ম অর্থাৎ সাধনা অনেক রকমের, এর মধ্যে শ্রেষ্ঠ হচ্ছে বর্ণাশ্রম ধর্ম পালন। আমার সামনে যা বর্ণাশ্রম ধর্ম অনুযায়ী যা যা কর্তব্য কর্ম আসছে সেটাকে অনাসক্ত ভাবে করে যেতে হবে। প্রথমেই অনাসক্ত ভাবে কর্ম করা যায় না, তাই প্রথমে বলা হয় ঈশ্বরে ফল সমর্পণ কর। প্রথমের দিকে অন্তর থেকে ঈশ্বরের ফল সমর্পণ করাও ঠিক ঠিক হয় না, তা না হলেও যান্ত্রিক ভাবেই বলে যেতে হবে – হে ঠাকুর, আমি যা যা কাজ করেছি, ভালো মন্দ যাই কাজ, তার সব ফল আমি তোমার শ্রীচরণে সমর্পণ করলাম। করতে করতে একটা দিন আসবে যখন মনে হবে আমি ঠাকুরকে কিসের ফল দিতে যাচ্ছি, আমি তো আজ অনেক বাজে কাজ করেছি, কারুর থেকে ঘুষ নিয়েছি, একটা খুব অত্যন্ত বাজে মিথ্যে কথা বলেছি এই নোংরা কাজের ফলও ঠাকুরকে সমর্পণ করতে হবে! ছি! ছি! একটা দিন আসবে যে তখন এই কাজের ফল আমি আর ঠাকুরকে দিতে পারব না। কিন্তু এটা চলবে না, ঐ ফলটাকেও ঠাকুরকে দিতে হবে। এইটাই সাধনা। কিন্তু মনের মধ্যে এইটা সব সময় খোঁচা দেবে যে ঠাকুরকে খারাপ জিনিষ দিতে নেই। তখন এর থেকে বাঁচার কি উপায়? একটাই উপায়। ঐসব খারাপ কাজ করাটা বন্ধ করে দিতে হবে। এইখান থেকেই সাধনার মাধ্যমে ব্যক্তিত্বের রূপান্তর হতে শুরু হয়। যখনই খারাপ কাজ করতে যাবে তখনই মনে হবে দু'ঘন্টা বাদেই এই কর্মের ফল ঠাকুরকে দিতে হবে, সাথে সাথে কাজ শুরু করার কথা ভাবতেই গা হাত সব অবশ হয়ে আসবে। এইভাবেই জীবন পরিবর্তন হয়, শুধু শাস্ত্র পড়ে কি হবে যদি জীবনটাই না পরিবর্তন হয়। জীবন পরিবর্তন করার এর থেকে ভালো উপায় আর নেই।

গীতাতে যত পথের কথা বলার, যা কিছু বক্তব্য সবটাই দ্বিতীয় অধ্যায়ে ভগবান অর্জুনকে বলে দিয়েছেন। দ্বিতীয় অধ্যায়ের কয়েকটি শ্লোক আরও বিশদ ভাবে অন্যান্য অধ্যায়ে বলা হয়েছে। অষ্টাদশ অধ্যায়ে গিয়ে পুরো ব্যাপারটাকে আবার সংক্ষেপে বলা হয়েছে। সেইজন্য গীতার দ্বিতীয় আর অষ্টাদশ অধ্যায় খুব গুরুত্বপূর্ণ।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের এগারো থেকে তেরো শ্লোক হচ্ছে গীতার হৃদয়। যেহেতু গীতার হৃদয় সেই কারণে এই তিনটে শ্লোককে উপনিষদেরও হৃদয় বলা যেতে পারে। আবার উপনিষদের হৃদয় যেহেতু, সেই হেতু বেদেরও হৃদয়। বেদের হৃদয় মানে হিন্দু ধর্মের হৃদয়। হিন্দু ধর্মের দর্শনের যা কিছু বলার এই তিনটে শ্লোকেই বলা হয়েছে। এই জিনিষটাকেই আরো সুন্দর ভাবে বলা হয়েছে ঈশোপনিষেদে। এই তিনটে শ্লোক থেকেই হিন্দু ধর্মের দর্শনের সব কিছু বিস্তার লাভ করেছে। ঊনিশ থেকে পঁচিশ নং শ্লোকে আত্মার

স্বরূপ সম্বন্ধে বলা হয়েছে। *য এনং বেত্তি হন্তারং যশ্চৈনং মন্যতে হতম্* গীতার এই উনিশ নং শ্লোকটি আসলে কঠোপনিষদের শ্লোক। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যিনি গীতার উপদেশ দিচ্ছেন তিনি তাঁর বক্তব্যকে আরও জোর দেবার জন্য শ্রুতিপ্রস্থান থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে দেখাচ্ছেন, দেখো উপনিষদও একই কথা বলছে। আমরা যখন কিছু প্রবন্ধ লিখি তখন সমগ্র প্রবন্ধে বিভিন্ন জায়গা থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে প্রবন্ধকে সাজাই, এটা আসলে ঠিক নয়। প্রবন্ধে আমার নিজের কি বক্তব্য সেটার উপরেই বেশি জোর দেওয়া উচিৎ। কোন কিছু রচনার পদ্ধতিই হচ্ছে নিজের বক্তব্যকে তুলে ধরা, নিজের বক্তব্যকে পরিবেশন করে দেখাতে হয় শ্রুতিও ঠিক এই কথা বলছেন, নিজের বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠিত করার এটাও একটা পদ্ধতি। শ্রীকৃষ্ণ এই পদ্ধতিকে অনুসরণ করেই বলছেন –

**য এনং বেত্তি হন্তারং যশ্চৈনং মন্যতে হতম্। উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হন্তি ন হন্যতে।।১৯।।**

যিনি মনে করেন আত্মা কারুকে হত্যা করে বা আত্মাকে হত্যা করা হয়, এরা আত্মার স্বরূপের ব্যাপারে অজ্ঞ। গীতার মত শাস্ত্রের ব্যাখ্যা গুরু বা ভালো আচার্যের মুখে না শুনলে বোঝা যায় না। আত্মার অবিনাশত্ব সম্বন্ধে গীতার কোন সম্পর্ক নেই এবং যুদ্ধের সঙ্গেও গীতার কোন সম্পর্ক নেই। গীতা হচ্ছে হিন্দু ধর্মের দর্শন, হিন্দু ধর্মের দর্শনে একজন কেউ মরল কি বাঁচল এই ব্যাপারে কিছুই আসে যায় না। এই শ্লোকটিতে শ্রীকৃষ্ণ খুব উচ্চ দর্শনের কথা বলছেন। এখানে যে হনন ক্রিয়ার কথা বলা হচ্ছে এই হনন ক্রিয়ার মাধ্যমে প্রত্যেকটি ক্রিয়াকে নঞর্থক অর্থে নাকচ করা হচ্ছে। যেমন, মারা আর মরে যাওয়া, মানে হচ্ছে কর্তা আর কর্ম। এখানে বলতে চাইছেন, আত্মা না কর্তা, না কর্ম। শুধু হনন ক্রিয়ার ক্ষেত্রেই নয়, যে কোন ক্রিয়ার ক্ষেত্রেই এই জিনিষটাকে বুঝতে হবে। আমি যদি এই বোতলটাকে ধরি তখন আমি কর্তা বোতলটা কর্ম, তার মানে আত্মা কি কর্তা? না, আত্মা কখনই কর্তা হয় না, কর্তা যদি না হয় তাহলে কর্মও হবে না। কিন্তু জগতে কর্তা আর কর্ম দুটোই আছে। সেইজন্য ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে প্রথমে শুরু করছেন – *যুস্মাদ্ অস্মাদ্ তত্ব গোচর বিষয়ে বিষয়ী*। জগতে দুটো জিনিষ আছে, যুস্মদ্ প্রত্যয় আর অস্মাদ্ প্রত্যয়, জগৎ হয়ে গেল যুস্মাদ্ প্রত্যয় আর আমি হলাম অস্মাদ্ প্রত্যয়। জগতে এই দুটো জিনিষই আছে, আমি আর তুমি। কিন্তু আত্মার ক্ষেত্রে এটা আমিও নয় তুমিও নয়। এর ফলস্বরূপ আত্মার তত্ত্ব কখনই বোঝা যায় না। আত্মা যদি আমি তত্ত্ব হত তাহলে বোঝা যেত আমি কি, যদি তুমি তত্ত্ব হত তাহলে আরও সহজে বোঝা যাবে। আমি তত্ত্বটাকে মনস্তাত্ত্বিকরা বুঝিয়ে দিচ্ছে, মাথা খারাপ হলে এই ওষুধ খাইয়ে দাও, ঘুম না হলে এই ওষুধ খাইয়ে দাও। আর তুমি তত্ত্বটা পদার্থ বিজ্ঞানী আর রসায়ন বিজ্ঞানীরা বুঝিয়ে দিচ্ছে। তুমি মানে জগৎ, এই জগতের যে প্রকৃতি এটা হচ্ছে তুমি তত্ত্ব, এটাকে বিজ্ঞানীরা বুঝিয়ে দিচ্ছে।

তাহলে আত্মাকে কে বোঝাবে? এইখানেই ধর্মশাস্ত্র আসে। ধর্মশাস্ত্র কিভাবে বোঝাবে? শাস্ত্র বলে দেবে এটা স্বসংবেদ্য, তুমি নিজেই একমাত্র বুঝতে পারবে। মেয়ে বিয়ের পর বাড়িতে এসেছে, মেয়ের বন্ধুরা তাকে জিজ্ঞেস করছে হ্যাঁরে স্বামী সুখ কি রকম? মেয়েটি বলছে, তোর বিয়ে হলে তুই বুঝতে পারবি। ঠাকুর এই ভাবে খুব সহজ করে শাস্ত্রের গভীর তত্ত্বগুলিকে বুঝিয়ে দিচ্ছেন। এই শ্লোকে যেটা বলছেন এখানে আত্মার অবিনাশত্বটা গুরুত্বপূর্ণ নয়, আত্মার অক্রিয়া ভাবের গুরুত্ব এখানে নিয়ে আসা হচ্ছে। অক্রিয়া ভাবটা কি? আত্মা কোন কাজ করেন না, আর আত্মার উপরে কোন কাজ হয় না। তাই যদি হয়, তাহলে মৃত্যু বলেও কিছু নেই। মৃত্যু হয় না বলেই যে আত্মা অক্রিয়া, তা নয়, অক্রিয়া বলেই আত্মা অবিনাশী। তার মানে হনন ক্রিয়াটা আপনা থেকেই খসে গেছে, হনন ক্রিয়ার অর্থ হচ্ছে মৃত্যু, আত্মা কাউকে মারেনও না আর আত্মার উপর কোন কাজও হয় না।

এইখানে এসেই আমরা এই জিনিষটাকে ভুল বুঝি, আত্মার অবিনাশত্বর কোন গুরুত্বই নেই, এখানে যুদ্ধের ব্যাপার চলছে বলে অর্জুনকে শ্রীকৃষ্ণ হনন ক্রিয়ার কথা বলছেন। কিন্তু চিন্তা করার কিছু নেই, আসল কথাটা হচ্ছে আত্মা কোন কাজ করেন না, আর আত্মার উপরে কোন কাজ হয় না। কেউ যদি বলে তোকে এক চড় মারব, এখন সে চড় মারতেও পারে আবার নাও মারতে পারে। কিন্তু বাতাসকে কি কেউ চড় মারতে পারবে? পারবে না, কিন্তু বাতাসকে অন্য অনেক কিছুই করা যায়, যেমন বাতাসকে দুষিত করা যায়। আকাশতত্ত্বকে আমরা কিছুই করতে পারব না, তাকে ছুঁতে পারব না, তাকে কাটতে পারব না, তাকে বিভক্ত করা যাবে না, ইত্যাদি। এখানে যে হনন ক্রিয়া দিয়ে বলা হচ্ছে, এটা একটা উদাহরণ দিয়ে বলা হচ্ছে। আসল কথা হচ্ছে আত্মা কর্তাও নন এবং আত্মা কর্মও নন। কর্তা আর কর্ম যদি না হয় তখন সে কি হবে? তখনই তাঁর অনন্ত তত্ত্ব সিদ্ধ হয়ে গেল। আত্মা যদি অনন্ত না হয়ে সান্ত হতেন তাহলে তাঁর কর্তা ও কর্ম এসে জুড়ে যাবে। এগুলো খুবই সহজ যুক্তি, এগুলো বুঝতে বেশি প্রখর বুদ্ধির দরকার লাগেন। যে জিনিষটা স্থান, কাল ও পাত্রের বন্ধনে আবদ্ধ তাদের উপর সব সময় কার্য হবে। যে জিনিষটা অনন্ত, অনন্ত মানে তাঁকে কোন কিছু দিয়েই বন্ধন করা যাচ্ছে না, যাকে বাঁধা যায় না তার উপরে কোন ক্রিয়াও হবে না। যিনি অনন্ত সেও কারুর উপরে ক্রিয়া করতে পারবে না। ক্রিয়া করতে গেলে নড়াচড়া করতে হবে, যিনি অনন্ত তিনি কোথায় নড়াচড়া করবেন, সবটাই তো অনন্ত, অনন্ত ছাড়া তো আর কিছুই নেই। এখানে শুধু একটা কথাই বলা হচ্ছে, আত্মা কর্তাও নন কর্মও নন, কিন্তু তিনি আছেন।

এরপর কুড়ি নম্বর শ্লোক হচ্ছে আত্মার প্রকৃত স্বরূপের বর্ণনা। এই শ্লোকটিও গীতার নিজস্ব শ্লোক নয়, কঠোপনিষদ থেকে নেওয়া হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণ বলছেন –

**ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিৎ**
**নায়ং ভূত্বাহভবিতা বা ন ভূয়ঃ।**
**অজো নিত্যঃ শাশ্বতোহয়ং পুরাণো**
**ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে।।২০।।**

এখানেও আবার *হন্যতে হন্যমানে শরীরে* বলা হচ্ছে। কঠোপনিষদে যমরাজকে নচিকেতা মৃত্যুর পরের কথা জিজ্ঞেস করা হয়েছে বলে মৃত্যুর কথা এসেছিল। এখানে যুদ্ধের কথা হচ্ছে বলে মৃত্যুর কথা এসেছে। মৃত্যুর ব্যাপারটা বড় কিছু নয়, আসল হচ্ছে কর্তা, ক্রিয়া আর কর্মের ব্যাপার। এখানে আত্মার আসল স্বরূপের কথা বলা হচ্ছে। বলা হচ্ছে আত্মা হচ্ছেন বিকারহীন। জড়ের ধর্মই হচ্ছে ষড়বিকার, প্রত্যেক বস্তুর ছয়টি বিকার হয় – জায়তে, অস্তিত্বে, বর্ধতে, বিপরিণামতে, অপক্ষিয়তে এবং বিনশ্যতে। কোন কিছু প্রথমে জায়তে, মানে জন্ম নিল, জন্ম নিলেই তার অস্তিত্ব থাকবে, বর্ধতে, বৃদ্ধি পায়, বিপরিণামতে, সেই জিনিষের একটা অবস্থা থেকে আরেকটা অবস্থাতে পরিণত হয়, আমি খাচ্ছি আমার শরীরের পরিবর্তন হচ্ছে, হাইড্রোজেন অক্সিজেন থেকে জল হচ্ছে, জল থেকে আবার বাষ্প হচ্ছে বরফ হচ্ছে, পরিবর্তন হতেই থাকবে। বিপরিণামতের সিদ্ধান্ত হচ্ছে এই জগতের কোন কিছুই স্থিতিশীল নয়। অপক্ষিয়তে, তারপর তার ক্ষয় হতে থাকে, যে কোন জিনিষের ক্ষয় হবেই। এখন বেলুড় মঠে পাথরের উপর মেশিন চালান হচ্ছে, কেননা পাথরের উপর রোদ বৃষ্টি জল পড়ে পড়ে পাথরে পাপড়ি জমে গেছে, এখন মেশিন দিয়ে তার চল্‌কা গুলো ওঠানো হচ্ছে। পাথর ক্ষয় হতে হতে একদিন সেও ধূলায় পরিণত হয়ে যাবে। তখন আবার নতুন পাথর বসিয়ে মন্দিরের সংরক্ষণ করতে হবে। সব শেষে বিনশ্যতি, বস্তুর বিনাশ হয়। জগতের যে কোন জিনিষের, ইলেকট্রন প্রোটন থেকে শুরু করে আকাশের গ্রহ নক্ষত্র যা কিছু আছে সবাইকে এই ছয়টি বিকারের মধ্যে দিয়েই যেতে হবে।

এখানে বলা হচ্ছে *কদাচিৎ,* কদাচিৎ শব্দের অর্থ হচ্ছে কখন, এখানে সব কয়টি শব্দের সাথে কদাচিৎ লাগাতে হবে। কি রকম? ন জায়তে ম্রিয়তে, আত্মার কখন জন্ম নেই, কখন মৃত্যু নেই। *নায়ং ভূত্বাহভবিতা বা ন ভূয়ঃ,* এমন নয় যে এক সময় ছিল না, আবার হয়ে গেল। জন্ম নেই, মৃত্যু নেই মানে আত্মা সব সময়ই আছেন। *অজঃ,* যাঁর জন্ম নেই, জন্মরহিত। *নিত্যঃ,* যাঁর বিনাশ নেই, যাঁর কখন মৃত্যু হয় না, সব সময়ই তিনি থাকবেন। *শাশ্বতোহয়ং,* শাশ্বত মানে যাঁর ক্ষয় হয় না, ষড়বিকারের পঞ্চম বিকার অপক্ষয়তি তাঁর নেই। *পুরাণো* – বৃদ্ধিহীন, বর্ধতে যেটা বলা হয়েছিল সেই বিকার এর উপর হয় না, যে রকমটি ছিল ঠিক সেই রকমটিই, বাড়েওনি কমেওনি। জন্মও নেননি, মৃত্যুও হয়নি। *ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে,* এর দ্বারা বলা হল আত্মার ষড়বিকারের বিপরিণামতে হয় না, সমস্ত কিছুর পরিবর্তন হয় কিন্তু আত্মার কোন পরিবর্তন হয় না। জল বাষ্প হয়ে উবে যাচ্ছে, কি করে হচ্ছে? তার উপরে ক্রিয়া হচ্ছে বলে একটা পরিণাম হচ্ছে। আত্মার উপর কোন ক্রিয়া হয় না বলে তাঁর কোন পরিবর্তন হয় না। এই সংসার হচ্ছে ষড়বিকার ধর্মের মধ্যে আবদ্ধ, কিন্তু আত্মা এই ষড়বিকারের পারে। আত্মা আর অনাত্মার এইটাই হচ্ছে বিরাট তফাৎ।

এই জায়গাতে এসে আমাদের হিন্দু ধর্মের বিভিন্ন দর্শন শাস্ত্রের মধ্যে মত পার্থক্য এসে যায়। কেউ বলবে বহু আত্মা আবার কেউ বলবে এক আত্মাই আছেন। মাধ্বাচার্য গীতার ভাষ্যে এই জায়গাটাতে এসে যুক্তি দিয়ে দেখাচ্ছেন এখানে এক আত্মার কথা বলা হচ্ছে না। তারপরের শ্লোকেও আত্মার স্বরূপের কথা বলা হচ্ছে –

**বেদাবিনাশিনং নিত্যং য এনমজমব্যয়ম্। কথং স পুরুষঃ পার্থ কং ঘাতয়তি হন্তি কম্।।২১।।**

যিনি জানেন যে আত্মা কাউকে হত্যা করেন না, কারুর দ্বারা হতও হন না তখন তিনি কি করে ভাববেন যে কেউ কাউকে মারছে। তুমিও কাউকে মারছ না, তোমাকেও কেউ মারছে না। শঙ্করাচার্য এই শ্লোকের ভাষ্যেও বলছেন - এখানে যে হনন ক্রিয়ার কথা বলা হয়েছে, এটা উদাহরণ দেওয়ার জন্যই বলা হয়েছে। শুধু হনন ক্রিয়াই নয়, বাস্তবে আত্মার উপর কোন ধরণের ক্রিয়াই হয় না।

ঠিক ঠিক বিদ্বান কে? প্রথমের দিকে অর্জুনকে শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন, তুমি যাদের জন্য শোক করার কথা নয় তাদের জন্যই শোক করছ অথচ বিদ্বান, প্রজ্ঞাবান লোকদের মত কথা বলছ। তাহলে ঠিক ঠিক বিদ্বান প্রজ্ঞাবান কে? আচার্য শঙ্কর বলছেন – আত্ম আর অনাত্ম এই দুটোর স্বভাবকে যিনি আলাদা করতে পারেন, আত্ম আর অনাত্মের উপর যার ঠিক ঠিক বুদ্ধি আছে তিনিই হচ্ছেন ঠিক ঠিক বিদ্বান। এর বাইরে কেউই বিদ্বান বা পণ্ডিত নন। ভাষ্যের এক জায়গায় শঙ্করাচার্য বলছেন – গীতার মত শাস্ত্র দুটো জিনিষের কথা বলেন, একটা হচ্ছে ধর্মোপদেশ আর দ্বিতীয় মোক্ষোপদেশ। ধর্মের কথা আর মোক্ষের কথা বলার অধিকার একমাত্র শাস্ত্রের রয়েছে। কেন শাস্ত্রের একমাত্র অধিকার? কারণ দেহান্তর সম্বন্ধিত জ্ঞান একমাত্র শাস্ত্রেই পাওয়া যায়। দেহান্তর সম্বন্ধিৎ জ্ঞানের

অর্থ হচ্ছে মৃত্যুর পরে কি হয় সেই বিষয়ের যে জ্ঞান। মৃত্যুর পর আমার কি হবে সেটাকে কোন বুদ্ধিবৃত্তি দিয়ে জানার উপায় নেই। পঞ্চদশ অধ্যায়ে ভগবান বলবেন – মৃত্যুর পরে কি হয় সেই জ্ঞান একমাত্র তাঁরাই জানেন যাঁদের জ্ঞানচক্ষুর উন্মোচন হয়ে গেছে। তাঁদের কথা গুলো শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ করা আছে। দেহান্তর সম্বন্ধিৎ জ্ঞান যখন আমি শাস্ত্র থেকে পেয়ে গেলাম তখন আমার মধ্যে ধর্ম আর মোক্ষের এই দুটোর জ্ঞান এসে যাবে। এই ব্যপারটাকে আরেকটু বিশ্লেষণ করে বোঝা যাক।

আমাদের মানব জীবনের চারটে উদ্দেশ্য, ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ। এর মধ্যে অর্থ আর কাম হচ্ছে এই জগতে জীবিত কালের জন্য। অর্থ হচ্ছে কাঞ্চন, কাম হচ্ছে কামিনী, ঠাকুর বলছেন কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ করতে। বাচ্চা থেকে বুড়ো সবাই এই কামিনী আর কাঞ্চনের পেছনে ছুটে চলেছে। এরপরে যেটা উচ্চ অবস্থা তা হচ্ছে ধর্ম, মৃত্যুর পর আমার কি গতি হবে, এই ব্যাপারে সজাগ হয়ে গিয়ে মানুষ যা করে সেটাই হচ্ছে ধর্ম। আমরা আশা করি মৃত্যুর পর আমাদের যেন সদ্‌গতি হয়। কি রকম সদ্‌গতি? আমার যেন স্বর্গে জন্ম হয়, নরকে যেন আমাকে না যেতে হয়। তার মানে মৃত্যুর পরে স্বর্গপ্রাপ্তি হচ্ছে ধর্ম, স্বর্গপ্রাপ্তি যদিও না হয় তাহলে আমার যেন আরও ভালো যোনিতে জন্ম হয়, মানে নরক প্রাপ্তি যেন না হয়, অধোগতি যেন না হয়। ধর্ম পালন করা মানে, তুমি এমন কর্ম কর যাতে মৃত্যুর পর তোমাকে নরকে না যেতে হয়। প্রথম আর দ্বিতীয় মানে অর্থ আর কাম হচ্ছে জীবিতকালের জন্য, তৃতীয় হচ্ছে ধর্ম, মৃত্যুর পর আমার যেন ভালো অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া। চতুর্থ হচ্ছে জীবন ও মৃত্যুর পারের যে অবস্থা তার কথা বলা হচ্ছে, যার উদ্দেশ্য মোক্ষ।

এখন ধর্ম তখনই মানুষ পালন করবে যখন তার বিশ্বাস হবে যে মৃত্যুর পরও কিছু থাকে। এখন মৃত্যুর পর কি থাকে? জীবাত্মা থাকে। এখন জীবাত্মাকে আমি বুঝব কি করে? বিজ্ঞান কোন দিন জীবাত্মার প্রমাণ দিতে পারবে না। সাধারণ বুদ্ধি দিয়ে জীবাত্মার ব্যাপারে কোন দিন প্রমাণ দেওয়া যাবে না। আমাদের ইন্দ্রিয় এত কিছুর জ্ঞান আহরণ করে আনছে, সেই ইন্দ্রিয়ও কোন দিন জীবাত্মাকে জানতে পারবে না। এখানে এসেই বোঝা যায় যে, আচার্যের যুক্তি যে কত যুক্তিযুক্ত আর প্রখর বুদ্ধি সম্পন্ন, আজ পর্যন্ত কেউ আচার্যের একটা কথার উপরে কলম চালাতে পারেননি। আচার্য বলছেন *ধর্ম অস্তিত্ব বিজ্ঞানম্*, ধর্মের যে অস্তিত্বের বিজ্ঞান সেটা কিভাবে হয়? *দেহান্তর সম্বন্ধিৎ জ্ঞানম্*, দেহান্তরের সম্বন্ধে জ্ঞান। এখন দেহান্তর যদি নাই হয়, তাহলে কেন আমি ধর্ম পালন করতে যাব, আর দেহান্তরের সমস্যা যদি না থেকে থাকে তাহলে সে মোক্ষ লাভ করতে চাইবে কেন? মৃত্যুর পর যদি কোন অস্তিত্ব নাই থাকে, আমি মরে গেলাম, আমার মৃত্যুর সাথে সব কিছু শেষ হয়ে গেল, তাহলে আর ধর্মেরই বা কি প্রয়োজন আর ধর্মই যখন নেই তখন মোক্ষেরও কোন প্রয়োজন নেই, মৃত্যুতেই সব ফুরিয়ে গেল।

যমরাজ নচিকেতাকে তৃতীয় বর প্রার্থনা করতে বলাতে নচিকেতে বলছেন – *অস্তীত্যেকে নায়মস্তীতি চৈকে* – কেউ কেউ বলে মৃত্যুর পর আত্মার অস্তিত্ব থাকে আবার কেউ কেউ বলে কিছুরই অস্তিত্ব থাকে না, আমি এই মৃত্যুর পরের ব্যাপারটা আপনার কাছে ভালো করে জানতে চাই। মৃত্যুর পর যদি কিছু নাই থাকে তাহলে কি হবে? যত ইসলাম ধর্ম, খ্রীশ্চান ধর্ম সব তাসের ঘরের মত চুরমার হয়ে ভেঙ্গে পড়বে। কারণ তখন আর ধর্মের কোন প্রয়োজনীয়তাই থাকবে না। ধর্মের প্রয়োজনীয়তাটা কোথায়? মৃত্যুর পরে যেটা আছে সেটার সাথে সংযোগ সাধিত হয় ধর্মের মাধ্যমে, এই জীবন আর মৃত্যুর পরবর্তি জীবনের মাঝখানে ধর্ম হচ্ছে সেতু। ধর্মের মৌলিক সংজ্ঞাই হচ্ছে it links this life with after life, আমি যদি বলি মৃত্যুর পর কি আছে কি নেই ওতে আমার বিশ্বাস নেই, তাহলে ধর্ম আমার জন্য নয়। এখন আমি যদি বলি মৃত্যুর পর কিছু যে আছে তার প্রমাণ কোথায়। তখন আমাকে বলা হবে – শাস্ত্র প্রমাণ, শাস্ত্রে এর কথা বলা আছে। শাস্ত্র ছাড়া আর অন্য কোন উপায় নেই মৃত্যুর পর কি আছে জানার। মুসলমান বা খ্রীশ্চান ছেলেমেয়েরা যদি বলে আমরা মৃত্যুর পর কি আছে মানিনা, তখন তাদেরও বলে দেওয়া হয় তাহলে ধর্ম তোমার জন্য নয়। তাহলে তোমার ধর্ম কি হবে, তাহলে তোমার জন্য সামাজিক আচরণ বিধি। বাবা ছেলেকে শাসন করবে কি করবে না, শিক্ষক ছাত্রছাত্রীকে শাস্তি দেবেন কি দেবেন না, এগুলো ঠিক করে দিচ্ছে পার্লামেন্ট, এগুলোর সাথে এই ধর্মের কোন সম্পর্ক নেই। ধর্মের একমাত্র কাজ ইহলোক আর পরলোকের মধ্যে সংযোগ করা।

ধর্মের জ্ঞান আমরা আহরণ করি শাস্ত্র থেকে, শাস্ত্র আমাদের দেহান্তরের ব্যাপারটা জানিয়ে দিচ্ছে। শঙ্করাচার্য তারপরেই বলছেন – যখন আমরা শাস্ত্র আর আচার্যের উপদেশ শুনলাম, যখন শম, দম, তিতিক্ষাদি ইত্যাদি আত্মসংযমের দ্বারা চিত্তকে সংস্কৃত করা হয়েছে, মানে ঘষে মেজে পরিষ্কার করা হল তখন আত্মদর্শনের জন্য সে প্রস্তুত হয়ে গেল। আত্মদর্শনের জন্য প্রথম পদক্ষেপ হচ্ছে শাস্ত্র ও আচার্য, গুরুজনদের কাছ থেকে উপদেশ গ্রহণ, তারপর দ্বিতীয় পদক্ষেপ শম, দম, তিতিক্ষাদির অনুশীলন, এগুলো হচ্ছে শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, শ্রদ্ধা ও সমাধান, এই ছয়টির অনুশীলন। যে শাস্ত্র অধ্যয়ণ করেনি, যে আচার্যের কাছে উপদেশ নেয়নি তার কোন দিন আত্মজ্ঞান হবে না। তারপর কি করতে হবে? শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধিকে নিয়ন্ত্রণে আনতে হবে। উপরতি, সব কিছু থেকে নিজেকে তুলে নেওয়া, তিতিক্ষা সব রকমের দুঃখ কষ্টকে প্রতিকার ও প্রতিবাদ না করে সহ্য করা, বেদান্ত বাক্যে, শাস্ত্রবাক্যে

শ্রদ্ধা আর সব শেষে সমাধান, মনটাকে একটা নির্দিষ্ট জায়গায় একাগ্র করে রাখা। যখন এইগুলো ঠিক ঠিক নিষ্ঠা ও যত্ন সহকারে অনেক দিন করতে থাকবে তখন এই জিনিষগুলোই আত্মদর্শনের সহায়ক হবে, তখন জানতে পারা যাবে আত্মা আছে কি নেই।

স্বামীজী বলছেন আধ্যাত্মিক ব্যাপারে তোমরা সবাই হলে কচি খোকা, তোমাদের মোচ বেরিয়ে থাকতে পারে, বয়স হয়ে যেতে পারে কিন্তু আধ্যাত্মিক ব্যাপারে সবাই শিশু। তুমি বিজ্ঞানের জ্ঞান অর্জন করে থাকতে পারো, ইতিহাসের সব কিছু তোমার নখদর্পণে থাকতে পারে, তুমি শাস্ত্রের সব কিছুই জেনে নিতে পার, কিন্তু আধ্যাত্মিক ব্যপারটা হচ্ছে পুরো আলাদা। আধ্যাত্মিক ব্যাপার হচ্ছে, শাস্ত্রের কথা যখন আচার্যের মুখ থেকে শ্রবণ করা হয়েছে, ধারণা করেছ আর শম, দম, তিতিক্ষাদি আত্মসংযমের সাধনা করেছ তখন আধ্যাত্মিকতাকে ধারণা করার প্রস্তুতি হয়েছে। ঠাকুর বলছেন ঈশ্বরে পাকা ভক্তি না হলে শাস্ত্রের কথা, গুরুর কথা ধারণা হয় না। তারপরে বলছেন কাঁচে কালি মাখানো থাকলে তবেই তাতে ছবি হবে, সাদা কাঁচে কোন ছবি পড়ে না। কালিটাই হচ্ছে পাকা ভক্তি, কাঁচা ভক্তি হলে হবে না। ভক্তরা শাস্ত্রের কথা শুনে বলে এগুলো সত্যিই এই রকম হয়। তোমার মধ্যে তো সেই ভক্তিই জাগেনি তুমি এগুলো বুঝবে কি করে, তাই তোমার মনে সন্দেহ হচ্ছে। যদি তোমার মধ্যে ভক্তি এসে থাকে তাহলে এখন তুমি আচার্যের কাছে যাও, শাস্ত্রে কি বলা আছে সেটা আচার্যের মুখ থেকে শোন। শোনার পর তুমি সাধনা কর। কি সাধন? শম, দম, উপরতি ইত্যাদির।

গীতাতে একটা কথা অনেকবার ঘুরে ঘুরে আসবে, যে একবার বুঝে গেল আত্মা কর্তাও নয় কর্মও নয়, তখন সে আর কোন কাজ করতে যাবে কেন। প্রত্যেক কাজ করার পশ্চাতে একটা উদ্দেশ্য থাকে, উদ্দেশ্য না থাকলে সে কাজ করতে যাবে না। আচার্য যখন শাস্ত্র অধ্যয়ন করাচ্ছেন, তখন অধ্যয়ন করানটা ক্রিয়া, যাদের অধ্যয়ন করাচ্ছেন তারা হচ্ছেন কর্ম। যাঁরা শুনছেন তাদের ক্ষেত্রে আবার উল্টো হয়ে যাচ্ছে, তাঁরা শুনছেন তাঁরা হয়ে গেলেন কর্তা আর আচার্য কর্ম। কিন্তু ক্রিয়াটা সেই একই, শাস্ত্র অধ্যয়ন। যাঁরা শুনছেন তাঁদের একটা উদ্দেশ্য আছে, তাঁদের উদ্দেশ্য হচ্ছে শাস্ত্র কি বলছে আমরা একটু জানবার চেষ্টা করছি। আচার্য কেন অধ্যয়ন করাচ্ছেন? আচার্যের উপর এই কর্ম ন্যস্ত করা হয়েছে, এইটাই তাঁর কাজ। কিন্তু যে জেনে গেল আত্মা কর্মও নন কর্তাও নন তখন সে ক্রিয়া করবে কি করে, তারতো কোন উদ্দেশ্যই নেই। তাঁরতো ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ চারটিতেই পূর্ণকাম হয়ে গেছে, জগতের প্রতি বা কাম আর অর্থের প্রতি তাঁর কোন আকর্ষণ নেই, ধর্মের ব্যাপারেও তাঁর আর কোন ইচ্ছে নেই, মোক্ষতে সে প্রতিষ্ঠিত, তিনি তো জেনে গেছেন আত্মা ছাড়া আর কিছু নেই, এইটাই তো জ্ঞান, এইটাই তো মোক্ষ, এখন কি করতে তিনি আর কাজ করতে যাবেন। গীতা হচ্ছে, যাঁরা এই উচ্চতম আদর্শের জন্য মরণপণ চেষ্টা করছেন, তাঁদের জন্য।

এই স্বসংবেদ্যের জন্য কোন কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে সমস্যাও হয়। এক ধরণের বেদান্তী আছেন যাঁরা অনেক অনাচার করে বেড়াবে, চরিত্র বলে কিছু নেই, অন্য দিকে বড় বড় বেদান্তের কথা বলবে। যদি জিজ্ঞেস করা হয়, আপনারা মেয়েদের সঙ্গে থাকেন কি করে? তখন বলবে – তাতে কি হল? আমার হাত, পা, শরীরকে স্পর্শ করছে, তাতে হলটা কি, আমার শরীরটাও জড় মেয়ের শরীরও জড়, আর আত্মা ছাড়া কিছু নেই। এইসব শুনেই হয়তো ঠাকুর বলেছিলেন – তোমার বেদান্ত জ্ঞানে আমি ইত্যাদি করি। ঠাকুর বলছেন – যে নাচতে ওস্তাদ তার কখন বেতালা পা পড়ে না। যাঁরা ব্রহ্মজ্ঞানী, তাঁরা কক্ষণ এমন কিছু করবেন না যাতে অন্যেরা দেখে ভুল শিক্ষা পায়। এই ব্যাপারে তাঁরা খুব সজাগ।

আত্মার এই অবিনাশী তত্ত্বকে, আসলে আত্মা হচ্ছে অনন্তস্বরূপ, এইটাকেই আরও জোর দিয়ে বোঝাবার জন্য বলছেন –

**বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়**
**নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি।**
**তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা-**
**ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী।।২২।।**

পুরনো বস্ত্র জীর্ণ হয়ে গেলে মানুষ সেই জীর্ণ বস্ত্রকে ত্যাগ করে যে রকম নতুন বস্ত্র পরিধান করে, স্থূল শরীর যখন জরা, বার্ধক্যে জীর্ণ হয় যায়, মানে পুরনো হয়ে যায়, আত্মাও সেই জীর্ণ শরীরকে ত্যাগ করে আরেকটা নতুন শরীর পরিগ্রহ করেন। আত্মার অবিনাশী তত্ত্বটাকে এখানে ঠিক ঠিক বোঝান হচ্ছে। কিন্তু এর পরের শ্লোকেই কর্তা, কর্ম ও ক্রিয়ার ব্যাপারটা আবার নিয়ে আসছেন।

**নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ। ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ।।২৩।।**

শস্ত্র আত্মাকে ছেদন করতে পারেনা, আগুন এঁকে দাহ করতে পারেনা, জল আর্দ্র করতে পারেনা, বায়ু শুষ্ক করতে পারেনা। ছেদন করা, দাহ করা, আর্দ্র করা, শুষ্ক করা এই ক্রিয়া গুলি তার ওপর তখনই সম্ভব যার কোন অবয়ব থাকে। এই বোতলে যেমন জল আছে, এই জল দীর্ঘকাল এইভাবে থাকলে এক সময় জলটা শুকিয়ে যাবে। কেন জল শুকিয়ে যাবে? কারণ জলের একটা অবয়ব

আছে। কি রকম অবয়ব? অনেক বিন্দু বিন্দু জলের কণা মিলে এই জল হয়েছে, প্রত্যেকটি জলকণায় আবার লক্ষ লক্ষ মলিক্যুলস আছে। যখন বাতাস এসে ধাক্কা মারছে তখন একেকটি মলিক্যুল বেরিয়ে যাচ্ছে। যে জিনিষের কোন অংশ আছে তারই বিভাজন করা যাবে। যার অংশই নেই তার আবার কি করে বিভাজন হবে। যখন দাহ করা হয় তখন ভাগে ভাগে পুড়তে থাকে, যখন ভিজে যায় তখন একেকটা অংশ ভিজতে থাকে, যখন শুকোয় তখনও অংশে অংশে শুকোতে থাকে। কিন্তু আত্মার কোন অংশ হয় না। যেহেতু আত্মার কোন অংশ নেই তাই এই ধরণের কোন ক্রিয়াই তাঁর উপরে হবে না। তলোয়ার দিয়ে বাতাসকে কাটতে বলা হলে বাতাসকে কাটা যাবে না। যে জিনিষটা অনন্ত তাকে ছেদন করে আলাদা করা যাবে কিভাবে। যে জিনিষটা অনেক গুলো টুকরো দিয়ে তৈরী হয় সেই জিনিষটাকেই আলাদা করা যায়। তারপরের শ্লোকেও আত্মার আরও বৈশিষ্ট্যের কথা বলছেন –

**অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ। নিত্যঃ সর্বগতঃ স্থানুরচলোঽয়ং সনাতনঃ।।২৪।।**

আত্মার সেই অনন্ত ভাবকেই এখানে বোঝান হচ্ছে। যেটা অনন্ত সেটাই অচ্ছেদ্য, মানে ছেদন করা যায় না, অদাহ্য, দাহ্য করা যায় না, অক্লেদ্য, আর্দ্র করা যায় না, অশোষ্য, শুষ্ক করা যায় না, যার উপর এই ক্রিয়া হয় না তিনিই নিত্য, অনন্ত সর্বব্যাপী, যিনি সর্বব্যাপী তিনি কোথায় নড়াচড়া করবেন, সেইজন্য আত্মা স্থির ও অচল, অনড় আর সনাতন, সেই আদি কাল থেকে একই ভাবে চলে আসছেন।

**অব্যক্তোঽয়মচিন্ত্যোঽয়মবিকার্যোঽয়মুচ্যতে। তস্মাদেবং বিদিত্বৈনং নানুশোচিতুমর্হসি।।২৫।।**

এই আত্মা হচ্ছেন অব্যক্ত, অব্যক্ত হচ্ছে যে জিনিষটাকে বুদ্ধি দিয়ে জানা যায় না। কারণ বুদ্ধি হচ্ছে সীমিত আর আত্মা হচ্ছে অনন্ত, সান্ত দিয়ে অনন্তকে মাপা যায় না। অব্যক্ত বলতে আবার প্রকৃতিকেও বোঝায়। *অচিন্ত্যোঽয়ম্*, যে জিনিষটা ইন্দ্রিয়গোচর সেই জিনিষটাকেই চিন্তন করা যায়। আমরা সাধারণতঃ ভালো খাবার দাবারের চিন্তা করি, ভালোবাসার চিন্তা করি, ভবিষ্যতের নিরাপত্তার কথা চিন্তা করি, এই জিনিষ গুলো হচ্ছে ইন্দ্রিয়ের গোচর, ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ধরা বা বোঝা যায়, কিন্তু এই আত্মাকে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গোচর করা যায় না। আর বলছেন *অবিকার্যোঽয়ম্*, এই আত্মার কোন ধরণের বিকার হয় না। যেমন দুধ থেকে দই হয়ে যায়, আত্মার এই রকম কোন পরিবর্তন হয় না। আত্মা হচ্ছেন অবয়বহীন, এর কোন অংশ নেই, অবয়বহীন মানে নিরাকার, কোন আকার নেই। যখন আকার থাকে, অংশ থাকে তখনই তার পরিণাম হয়। আত্মাই আছেন, এ ছাড়া আর কিছু নেই। আত্মাই এক অনন্ত আছেন আর কোন ধরণের কিছু নেই। তাই জগতে যা কিছু আছে সব ব্যাপারে চিন্তা করতে পার কিন্তু আত্মার ব্যাপারে কোন কিছুই ভাবা যাবে না, এইটাকেই এখানে বলতে চাইছেন। এই সব কথা বলে আত্মার ব্যাপারে শ্রীকৃষ্ণের যা বলার অর্জুনকে বলে দিয়ে সমস্ত রকমের শোককে পরিত্যাগ করতে বললেন, *নানুশোচিতুমর্হসি*।

আত্মার সম্বন্ধে এই উচ্চ তত্ত্বের কথা বলার পর শ্রীকৃষ্ণ বলছেন – অর্জুন, তোমাকে আমি যা বললাম এগুলো তোমার হয়তো বিশ্বাস নাও হতে পারে। আত্মার ব্যাপারে বেদান্তের যে দর্শন সেটাকেই ঊনিশ নং শ্লোক থেকে পঁচিশ নং শ্লোক পর্যন্ত শ্রীকৃষ্ণ ব্যাখ্যা করলেন। আত্মার ব্যাপারে আরও দুটো দর্শন আছে। বেদের একটা দর্শনে আত্মার ব্যাপারে বলছে, আত্মা আছেন, জন্ম নেয়, শরীর ধারণ করে, কিছুদিন থেকে শরীরটা নাশ হয়ে যায়, তারপর আত্মা হয় স্বর্গে যাবে না হয়তো নরকে যাবে। সেখানে কিছুদিন কর্মফল ভোগ করে আবার এসে জন্ম নিয়ে শরীর ধারণ করবে। এইভাবে চলতেই থাকে, এটা হচ্ছে বেদের একটা মত। চৈতন্য আছে আর জড় আছে, চৈতন্যের সাথে জড়ের মিলন হয়ে শরীর ধারণ করে, তারপর কর্ম করে কর্ম সঞ্চয় কর, তারপর মৃত্যুর পর স্বর্গে যায় বা নরকে যায় বা অন্য কোন যোনিতে যায় তারপর আবার মানব শরীর ধারণ করে, এইভাবে চলতেই থাকে। বেদের এই মতটাকেই শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে পরের শ্লোকে বলছেন –

**অথ চৈনং নিত্যজাতং নিত্যং বা মন্যসে মৃতম্। তথাপি ত্বং মহাবাহো নৈনং শোচিতুমর্হসি।।২৬।।**

অর্জুন তুমি যদি মনে কর যে আত্মার নিত্য জন্ম নিত্য মৃত্যু তাহলেও তো তোমার কোন শোক করা উচিৎ নয়, কেন শোক করা উচিৎ নয়?

**জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ। তস্মাদপরিহার্যেঽর্থে ন ত্বং শোচিতুমর্হসি।।২৭।।**

তোমার শোক করা উচিৎ নয় কারণ, যার জন্ম হয়েছে সে একদিন মরবে, আর যে মারা যাবে সে আবার জন্ম নেবে। অনেকে মনে করেন যে গীতা যখন এই কথা বলছে আত্মার জন্ম হয় আর আত্মার মৃত্যুও হয়, যে মরবে সে আবার জন্ম নেবে, তখন এইটাই হয়ত গীতার মত হবে। কিন্তু এটা কখনই গীতার মত নয়। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে একটা বিপক্ষ তর্ক দিয়ে বোঝাচ্ছেন, যদি তোমার এই মত থাকে, তুমি যদি বেদের এই মতকে অবলম্বন কর, তাহলেও তোমার শোক করা উচিৎ নয়, কারণ

*তস্মাদপরিহার্যেহর্থে* – এইটাই অবশ্যম্ভাবি, আত্মার এই রকমই হবে, গরমের পরে বৃষ্টি, বৃষ্টির পরে গরম, জন্মের পর মৃত্যু, মৃত্যুর পর জন্ম। যদি এইটাই আত্মার স্বরূপ হয় তাহলে শোক করার কি আছে।

তারপর দ্বিতীয় মতটা কি? যেটা ভৌতবাদীদের মত, আমি ছিলাম, কিভাবে কিভাবে পিতা-মাতার সংযোগে আমার জন্ম হল, তারপর আবার মরে যাব, মরার পর সব খেলা শেষ। তখন শ্রীকৃষ্ণ বলছেন –

**অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত। অব্যক্তনিধনান্যেব তত্র কা পরিদেবনা।।২৮।।**

আমি জন্ম নেওয়ার আগে ছিলাম না, মৃত্যুর পরে থাকব না, মাঝখানের এই কটা দিনের জন্য এত কান্নাকাটি করার কি আছে। মৃত্যুই যদি শেষ কথা হয়, মৃত্যুতেই যদি সব কিছুর পরিসমাপ্তি হয়ে যায় তাহলে এত চিন্তার কি আছে। জড়বাদীদের এইটাই মত। জড়বাদীদের যদি প্রশ্ন করা হয় মৃত্যুর পর যদি কিছুই না থাকে তাহলে আত্মহত্যা করে নিলেই তো হয়, তখন জড়বাদীদের কাছে সমস্যা হয়ে যায়। যে লোকটা মৃত্যুপথ যাত্রী কিছু দিনের মধ্যে মরতে চলেছে, অথচ যন্ত্রণায় ছটফট করছে তাকে কেন ইঞ্জেকশান দিয়ে মেরে ফেলা হচ্ছে না। যত বুড়োবুড়ি আছে তাদের বাঁচিয়ে রেখে কি হবে, সবাইকে মেরে দাও, তোমরাইতো বলছ আমরা জন্মের আগে অব্যক্ত ছিলাম, জন্মের পরেও অব্যক্ত থাকব, মাঝখানে কয়েকটি বছরের জন্য ব্যক্ত থাকছি। যদি তুমি মেনে নাও এই পৃথিবী কয়েক শত কোটি বছর আগে জন্ম নিয়েছে আবার ভবিষ্যতে কয়েক শত কোটি বছর থাকবে, আর মাঝখানে তুমি একশ বছরের জন্য পৃথিবীতে এসেছ, তোমার কি গুরুত্ব আছে এখানে তাহলে। অর্জুনকে এইটাই শ্রীকৃষ্ণ বলছেন – অর্জুন তুমি যদি ভৌতবাদীদের এই মতকেও গ্রহণ কর তাহলেও তো তোমার চিন্তা করার কিছু নেই, মিছিমিছি কেন শোক করে ভেঙ্গে পড়ছ। আর যদি তুমি বেদবাদী হও তাহলে জন্ম মৃত্যু তো হতেই থাকবে, সবাই একদিন মরবে সবাই আবার জন্ম নেবে, এতে শোকের কি আছে। কিন্তু তুমি যদি বেদান্তবাদী হও, তাহলে জেনে নাও আত্মাই একমাত্র আছেন, আত্মা অনন্ত, আত্মা ছাড়া আর কিছু নেই। তোমাকে কোন একটা মতকে তো মানতে হবে। যে মতটাই তুমি গ্রহণ করো না কেন, কোন দিক দিয়েই তোমার শোক করা উচিৎ নয়। অর্জুন আর আমাদের সমস্যা হচ্ছে আমরা ভৌতবাদীও নই, বেদবাদীও নই আর বেদান্তবাদীও নই, এই কারণেই আমাদের এত কষ্ট। স্বামীজী বলছেন – যদি ঠিক ঠিক নাস্তিক কেউ থেকে থাকেন হাজার মাইল পাড়ি দিয়েও তাকে দেখার জন্য আমি যাব। আসলে ঠিক ঠিক নাস্তিকও কেউ হতে পারবে না। যে নাস্তিক সেও মৃত্যুকে ভয় পায়, কেন ভয় পাবে সে, সেতো বিশ্বাস করে আছে যে তার জন্মটা হচ্ছে by chance, মৃত্যুর আগেও সে অব্যক্ত ছিল মৃত্যুর পরেও অব্যক্ত থাকবে, তাহলে মৃত্যুকে কেন ভয় পাচ্ছে? এর কোন উত্তর নেই।

২৫শে জুলাই, ২০১০

গুপ্তপ্রেস মতে আজ হচ্ছে গুরুপূর্ণিমা, কিন্তু বিশুদ্ধসিদ্ধান্ত মতে আগামীকাল গুরুপূর্ণিমা, আগামিকালই বেলুড় মঠে গুরুপূর্ণিমা পালন করা হবে। গুরুপূর্ণিমার উপর প্রথমে দু-চার কথা আলোচনা করে মূল আলোচনার জন্য গীতাতে প্রবেশ করব।

গুরুপূর্ণিমা পালনের প্রথা আমাদের পরম্পরাতে কবে এবং কোথা থেকে শুরু হয়েছে বলা খুব মুশকিল। ভারতের অনেক কিছুই যেমন আমাদের পরম্পরা থেকে হারিয়ে গেছে, এটাও ঠিক সেইভাবেই হারিয়ে গেছে যে কবে থেকে গুরুপূর্ণিমা উদযাপনের প্রথা শুরু হয়েছিল। ভারতে যে কোন জিনিষের পরম্পরাটাই হচ্ছে মুখ্য, তার ইতিহাস, তার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা, যুক্তি কোথায় নিয়ে যাবে সেটার কোন গুরুত্ব নেই, এখানে পরম্পরাটাই হচ্ছে প্রধান, পরম্পরাতে কি বলছে সেটাই সবাই গ্রহণ করে, তুমি কোন্ পরম্পরা থেকে এসেছে, তুমি কোন্ সম্প্রাদায়ের সেটাকেই সবাই গুরুত্ব দেবে। যার জন্য শঙ্করাচার্য ত্রয়োদশ অধ্যায়ের ভাষ্যে বলবেন যে, সম্প্রদায়ই হচ্ছে সব, যে অসম্প্রদায়, সম্প্রদায় বিদ্যা যার নেই, গুরু-শিষ্য পরম্পরায় যে শিক্ষা পায়নি তার কথার কোন মূল্য নেই। সে যদি সব শাস্ত্র জানে, বেদ, উপনিষদের উপর পুরো দখল থাকে তবুও তার কথা গ্রহণ করবে না।

সম্প্রদায় বিদ্যার মতে আজ হচ্ছে ব্যাসদেবের জন্ম। হিন্দু ধর্মের দর্শনের সর্বক্ষেত্রে ব্যাসদেবের প্রচুর অবদান। তিনি মহাভারত ভাগবত রচনা যা করার করেছেন, এছাড়াও বলা হয় আমাদের আঠারোটি পুরান তিনিই নাকি রচনা করেছেন, তদুপরি তাঁর চার জন শিষ্যকে দিয়ে বেদের বিভাজন করিয়েছেন। আজকে আমরা বেদান্ত বলতে যা বুঝি, এই বেদান্তকে ঠিক ঠিক প্রতিষ্ঠিত করেছেন ব্যাসদেব। তাঁর সব থেকে বড় কাজ হচ্ছে ব্রহ্মসূত্র রচনা। ব্রহ্মসূত্রে ৫৫৫টি সূত্র আছে, এর প্রথম সূত্র হচ্ছে 'অথাতো ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা' এখন আমরা ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা নিয়ে আলোচনা করতে যাচ্ছি।

ঠাকুরের আগমনের পর এত অল্প সময় অতিবাহিত হয়েছে যে, কথামৃত বা স্বামীজীর দশটি রচনাবলীতে যা মূল বক্তব্য আছে তাকে নিয়ে এখনও কোন প্রশ্ন ওঠা শুরুই হয়নি। যখন ঠাকুর স্বামীজীর দর্শনকে নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু হবে, তখন কেউ বলবেন যে শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতের বক্তব্য হচ্ছে এই। যখন কোন দর্শনকে নিয়ে প্রশ্নের উত্তর দিতে হয় তখন সেই উত্তর এক, দুই,

তিন, চার করে যথাযথ পদ্ধতিতে বলতে হয়। বেদ উপনিষদের কি বক্তব্য ঠিক ঠিক পদ্ধতিতে এটা কোথাও আগে বলা ছিল না। ব্যাসদেব বেদ উপনিষদের বক্তব্যকেই সাজিয়ে গুছিয়ে সুন্দর করে ব্রহ্মসূত্র রচনা করলেন। পরবর্তি কালে আবার ব্রহ্মসূত্র কি বলতে চাইছে সেটাকে বোঝাতে গিয়ে শঙ্করাচার্য আবার ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য রচনা করলেন। শঙ্করাচার্য ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে কি বলতে চাইছেন তার উপরে আচার্যের পরবর্তি কালে যাঁরা এসেছেন তাঁরা বিভিন্ন ভাবে ব্যাখ্যা করে যাচ্ছেন।

ভারতের ধর্মের প্রাণকেন্দ্র বেদান্ত বলতে যা বুঝি, তার সর্বক্ষেত্রে ব্যাসদেবের বিরাট অবদান পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে। আজকে বেদকে সাজান গোছান অবস্থায় পাচ্ছি, এই সাজান গোছানর কাজ ব্যাসদেব করে গেছেন। ভারতের আপামর সাধারণ মানুষের সামগ্রিক ধর্ম পুরোটাই পৌরানিক কথা ও কাহিনীর উপর দাঁড়িয়ে আছে, এই পৌরানিক কথা ও কাহিনী যা কিছু আছে সবটাই ব্যাসদেবের সৃষ্টি। মহাভারতের যা কিছু ভাবধারা, সামাজিক নিয়ম-কানুন, আজকেও যা আমরা অনুশীলন করে যাচ্ছি, এও ব্যাসদেবের তৈরী। আর হিন্দুধর্মের যে দর্শন, বেদান্ত, সেটাও ব্যাসদেবের রচনা। একজন মানুষের পক্ষে এত কিছু করা সম্ভব কিনা সেই ব্যাপারে আমাদের সবারই সন্দেহ হয়। আক্ষরিক অর্থে যদি হিসেব করা হয় যে, একজন মানুষ তাঁর জীবদ্দশায় এতগুলো কাজ করতে পারেন কিনা তাহলে হিসেবে গরমিল হয়ে যায়, এই ব্যাপারে কিছু মন্তব্য করা আমাদের পক্ষে সম্ভবও নয়, উচিতও নয়, হয়তো করতেও পারেন। কিন্তু পরবর্তি কালে যাঁরাই মূল্যবান কিছু রচনা করেছেন সেটাই ব্যাসদেবের নামে অর্পণ করে দিয়ে গেছেন।

বেলুড় মঠের সন্ন্যাসী থেকে শুরু কর সব ভক্তরা সব কিছু করার পর বলেন 'জয় গুরুমহারাজ জী কি জয়', এইটাই আমাদের রীতি হয়ে গেছে। যা কিছুই করা হোক সব কিছুতেই গুরুমহারাজের নামে, মানে ঠাকুরের নামে উৎসর্গ করে দেওয়া হয়। পরের দিকে যাঁরাই যে আসনে আসীন হয়ে বেদান্ত সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করতেন সেই আসনকে বলা হ্ত ব্যাসপীঠ। এখনও হিন্দী অঞ্চলে উত্তরাখণ্ডে বেদান্ত ব্যাখ্যার করার আগে জিজ্ঞেস করে আজকে ব্যাসপীঠে কে বসবেন, এটা বলবেন না যে আজকে কে বক্তব্য রাখবেন। ব্যাসপীঠাসীন কে হবেন বলা মানে, গুরু সেই এক, সচ্চিদানন্দই গুরু, ঠিক তেমনি বক্তা এক, ব্যসদেবই বক্তা। বাকীরা ব্যাসপীঠে আরোহণ করে বেদান্ত দর্শনকে প্রচার করে যাচ্ছেন।

সেই ব্যাসদেবের আজ জন্মতিথি। শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন ব্যাসদেবের সমসাময়িক, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে যখন শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের সারথি হয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে অবস্থান করছিলেন, সেই কুরুক্ষেত্রের পাশেই ব্যাসদেবের কুঠিয়া ছিল। ব্যাসদেবের জন্মতিথিকে তাঁর শিষ্যরা হয়তো পালন করতেন, কিন্তু পরবর্তি কালে সন্ন্যাসীদের মধ্যে গুরুপূর্ণিমা পালন করাটা খুব প্রচলিত হয়ে যায়। মজার ব্যাপার হচ্ছে গুরুপূর্ণিমা কিন্তু গৃহস্থের আদর্শ উৎসব নয়, এটা পুরোপুরি সন্ন্যাসীদের উৎসব। গৃহস্থদের হাজারটা উৎসব পালন করতে হয়, তার চেয়ে বড় কথা হচ্ছে তাদের কুলগুরু প্রথাতে চলতে হয়। কুলগুরুতে নানান রকমের মত আছে, আবার একেক অঞ্চলে একেক রকমের মত। এক বাংলাদেশেই কত রকমের মতের প্রচলন, কোথাও বৈষ্ণব মতে চলছে, কোথাও শাক্ত বা তন্ত্র মতে চলছে, কোথাও শৈব মত আবার কোথাও পৌরানিক মত চলছে, এখন সব মতের গুরুরাও আলাদা আলাদা উৎসবের বিধান দিচ্ছেন।

কিন্তু রামকৃষ্ণ মঠ মিশন থেকে যাঁরা দীক্ষা নিয়েছেন বা নিচ্ছেন বা নেবেন তাঁদের সবার কাছে স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী গুরু কিনা, কিংবা স্বামী আত্মস্থানন্দজী গুরু কিনা এটা কোন ধর্তব্যের মধ্যেই পড়ে না। যাঁরাই এখান থেকে দীক্ষা নিচ্ছেন তাঁদের কাছে ব্যক্তি গুরুতে কিছু আসে যায় না, সবাই সেই একই ইষ্টমন্ত্র দেবেন, একই পদ্ধতি বলে দেবেন, সবই এক। কারণ রামকৃষ্ণ মঠ মিশনে গুরু হচ্ছে সঙ্ঘ, এখানে স্বামী আত্মস্থানন্দজী বা স্বামী গহনানন্দজী গুরু নন, গুরু হচ্ছে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ, এখানে প্রত্যেকটি সন্ন্যাসীই আমাদের গুরু। সেইজন্য কারুর মনে যদি ধর্মের ব্যাপারে কোন জিজ্ঞাস্য থাকে তখন তাকে বলা হয় গুরুর কাছে প্রশ্ন করে মনের সংশয় মিটিয়ে নিতে হয়। কিন্তু এখন গুরুকে কোথায় পাবে, গুরুর একটু দর্শনের জন্যই কি বিশাল লাইনে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে হয়। আর গুরু এখন নব্বুই বছর পার হয়ে গেছেন, কদিন আর এই শরীরে থাকবেন। কিন্তু তারপর কার কাছে যাবে? তখন সন্ন্যাসীদের কাছে যেতে বলা হয়। রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের মূল আধ্যাত্মিক ভিত্তি হচ্ছে একটাই, সেটা হচ্ছে সচ্চিদানন্দই গুরু। গুরু কে? সচ্চিদানন্দ। তাহলে স্বামী আত্মস্থানন্দ বা স্বামী গহনানন্দজী এনারা কে, এনারা হচ্ছেন ছাদে আকাশের জল পড়ছে, সেই জল সিংহ, হাতি, বাঘের মুখ লাগানো পাইপ দিয়ে যেমন জল পড়ছে, এনারাও ঠিক সেই রকম, সেই সচ্চিদানন্দের শক্তি তাঁদেরকে আধার করে সঞ্চারিত হচ্ছে, এর বাইরে আর কিছু নেই।

গীতার এক জায়গায় শঙ্করাচার্য তাঁর ভাষ্যে বলছেন, এত যে সাধনা আছে, বৈদিক মতে, বেদান্ত মতে সাধনা আছে, পৌরানিক মতে, ঐতিহাসিক মতে সাধনা আছে, তন্ত্র মতে সাধনা আছে, কিন্তু শুধু গীতাতেই গড়ে প্রত্যেক চারটে শ্লোকের পরেই একটা নতুন সাধনার কথা বলে দিচ্ছেন। আর সাধনাতে কি কি আমাদের করতে হবে, কি কি আমাদের নিয়ন্ত্রণ করতে হবে এদের মধ্যে যদি যোগসূত্র খুঁজতে যাই তাহলে মাথা ঘুরে যাবে। সাংখ্য মতে এক রকম, যোগ মতে আরেক রকম, বেদান্ত মতে অন্য রকম, এইতো ছোট্ট জীবনে, এইটুকু জীবনে এত কিছু করবে কখন। এই ব্যাপারটাকেই সহজ ভাবে বলছেন, আমার হাতে হয়তো একটা

বিরাট সম্পত্তি এসে গেছে, একশ একরের মত জমি। সেই জমিতে জঞ্জাল আর জঙ্গলে ভর্তি হয়ে আছে। এখন যদি একটি একটি করে গাছ কাটতে থাকি তাহলে তো বুড়ো হয়ে যাব সব গাছ আর জঙ্গল কাটতে কাটতে। কিন্তু সহজ পথ হচ্ছে আগুন লাগিয়ে দেওয়া, ঐ আগুনই সব জঙ্গল কয়েক ঘন্টার মধ্যে পুড়িয়ে শেষ করে দেবে। আচার্য শঙ্কর এই আগুন লাগানোর কথা বলছেন। কিভাবে আগুন লাগানো যাবে? একটি যদি সাধনা করা হয়, ঐ একটি সাধনাতে পুরো জঙ্গল ছাই হয়ে যাবে। একটা একটা করে শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, যম, নিয়ম, আসন, প্রত্যাহার এসব কিছুই করার প্রয়োজন হবে না। খুব সহজ সাধনা, বলছেন যদি কেউ মৎপরঃ হয়ে যায়। গীতাতে মচ্চিত্ত আর মৎপরঃ এই দুটো শব্দ বারবার আসবে। মচ্চিত্তঃ শব্দটা কম আসবে কিন্তু মৎপরঃ অনেক বার আসবে। মৎ মানে আমি, এখানে আমি মানে শ্রীকৃষ্ণ। যদি কেউ মনে করে শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন পরমাত্মা, সেই পরমব্রহ্ম, এই বোধ যার পাক্কা হয়ে গেছে বাকী সব কিছুই তার হয়ে যাবে। এই কথা বলে আচার্য আরেকটা লাইন যোগ করছেন, আমি সেই ঈশ্বরের সঙ্গে এক। আমাদের এখানে যারা শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্ত, তাকে প্রথমে মানতে হবে জগতে এমন কিছু নেই যেটা শ্রীরামকৃষ্ণের থেকে শ্রেষ্ঠ। সে যে কোন জিনিষই হোক না কেন, এই বিশ্বে একজন মহা সুন্দরী থাকতে পারে, আমার চিত্ত তার রূপে লেগে থাকতে পারে, তা থাকুক, একে কোথাও আচার্য নিষেধ করছেন না। টাকা পয়সা রোজগার করার বিরাট ইচ্ছা, তা থাকুক, ভোগের প্রচণ্ড ইচ্ছা আছে, তাও থাকুক, কোন অসুবিধা নেই, কিন্তু আমি কি মানছি যে শ্রীরামকৃষ্ণ এই সব কিছুর থেকে উপরে। একটা জায়গায় আচার্য শঙ্কর বলবেন, এই যে মহাভোগী, যার মনটা একটা মেয়ের প্রতি পড়ে আছে, কিন্তু সেও জানে শিব হচ্ছেন এই মেয়েটার থেকেও উপরে। এখন একজন যদি বুঝে নেয় যে, বিষ্ণু হচ্ছেন সর্বোপরি পরঃ, সব কিছুর উপরে, এটা হচ্ছে প্রথম শর্ত, দ্বিতীয় শর্ত হচ্ছে আমি তাঁর সাথে অভিন্ন। এই কথাই ঠাকুর বলতে গিয়ে বলছেন – তাঁর প্রতি একটা ভাব অবলম্বন করতে হবে। কিভাবে সেই ভাবটা আমি আনব সেটার কোন গুরুত্ব নেই, আমি তাঁর সখা, আমি তাঁর দাস, আমি তাঁর সন্তান, যে ভাবই অবলম্বন করি না কেন তাতে কোন কিছুই যায় আসে না, কিন্তু আমি তাঁর সাথে অভিন্ন, যেমন মা সন্তানের সাথে অভিন্ন, দাস প্রভুর সাথে অভিন্ন, সখা সখার সাথে অভিন্ন, এইটাই আমার প্রকৃত ব্যক্তিত্ব। আমি শ্রীকৃষ্ণের সাথে এক, আমি শ্রীরামকৃষ্ণের সাথে এক এই ভাবটাকে জাগ্রত করতে হবে।

কথামৃতে ঠাকুর বলছেন – পাকা ভক্তি না হওয়া পর্যন্ত শাস্ত্রের কথা ধারণা হয় না। এর উদাহরণ টেনে বলছেন যেমন কাঁচে কালি না লাগালে ছবি পড়ে না। পাকা ভক্তিটা কি? আমি তোমার সাথে অভিন্ন, এইটাই হচ্ছে পাকা ভক্তি। এই পাকা ভক্তি যদি হয়ে যায় তাহলে বাকি সব কিছু খসে পড়ে যাবে। বেদান্ত মতে প্রথম যখন কেউ সাধনার পথে নামে, তখন তাঁর কাছে পরমব্রহ্ম কোথায়, নির্গুণ নিরাকার, এমনকি যদি সগুণ সাকারও যদি হয়, তাদের কাছে তো কোন ধারণাই নেই ব্রহ্ম বলতে কি বলছে, আমাদের মত সাধারণ লোকেরা যখন দীক্ষা নিয়ে জপ ধ্যান শুরু করছি তখন তো আমাদের ধারণাতেই নেই ঠাকুর বলতে কি বোঝাচ্ছে, ঠাকুরের একটা ছবি বা মুর্তি আছে, ব্যস্ ঐটুকুই, তারপরে আর কিছুই ভাবনাতে নেই। সেখানে আচার্য শঙ্কর বলছেন, ইষ্টের সঙ্গে এক হয়ে যেতে। কিন্তু মুখে যে যাই বলুক এই এক ভাবাটা সম্ভবই নয়। তখন মানুষ তার পক্ষে যেটা সহজ হবে সেই রকম কিছু একটা খোঁজে। গুরুদেব বলে দিয়েছেন – ধ্যানে দেখবি গুরু আর ইষ্ট এক। আবার আমাকে দেখতে হবে আমি আর ইষ্ট এক, সেটা হচ্ছে না। সেইজন্য সবার আগে ভাবতে হয় আমি আর গুরু এক, গুরুর সঙ্গে এই সম্পর্কটা আগে করতে হয়। আমার যা কিছু সর্বস্ব আছে, দেহ মন, বুদ্ধি এগুলো গুরুর সাথে এক। এতে একটাই সুবিধা, ভাব ধারণা করতে সুবিধা হয়, তাছাড়া আর কিছু না।

বেদের যে ঋচাগুলো আছে, তাঁদের একবার খুব ইচ্ছে হয়েছিল ভগবানকে নররূপে আস্বাদন করার। তখন ভগবান বেদের ঋচাদের বললেন, ঠিক আছে তোমরা সবাই বৃন্দাবনে চল, সেখানে আমি নরলীলা করব, ওখানে তোমরা যখন গোপি হয়ে জন্ম নেবে তখন আমি তোমাদের সাথে লীলা করব। বলে নাকি, বেদের যত ঋচা আছে তাঁরাই দিব্যরূপে সব গোপি হয়ে বৃন্দাবনে শরীর ধারণ করেছিলেন। বাল্মীকি রামায়ণে আছে যে, শ্রীরামচন্দ্রকে বিশ্বামিত্র ঋষি যত অস্ত্র দিয়েছিলেন এদের প্রত্যেকেরই একটি দিব্য সত্তা ছিল। সেই রকম বেদের যত ঋচা বা মন্ত্র আছে এদেরও সবাইর একটা দিব্য সত্তা আছে, তারাই সব বৃন্দাবনে গোপি রূপ ধারণ করে জন্ম গ্রহণ করে শ্রীকৃষ্ণের সাথে লীলা করেছিলেন। বেদের যে ঋচা তাঁদেরও ইচ্ছে হয়েছিল যে ভগবানের যে মানবরূপ সেই রূপের সাথে লীলা করি। যাঁরা ভক্ত, যাঁরা এখানে শাস্ত্র অধ্যয়ণ করতে আসছেন, তাঁরা যে এই জন্মেই প্রথম ভক্ত হয়েছেন তাতো নয়। অনেক জন্মের সাধনা ছিল বলেই আজকে এত দূর তাঁরা পৌঁছেছেন যে, ছুটির দিন, বৃষ্টি পড়ছে, কোথায় বাড়িতে খাওয়া দাওয়া করে একটু আরাম করে ঘুমোবেন, তা না করে, বাস ট্রেন পাল্টে পাল্টে দুপুর বেলা বেলুড় মঠে চলে আসছেন একটু শাস্ত্র অধ্যয়ণ করতে। শাস্ত্রের প্রতি এই নিষ্ঠা বা আগ্রহ এটা এক জন্মের সাধনাতে হয় না।

এখন যখন সিদ্ধির অবস্থা হয়ে গেল, তখন প্রথমে জ্ঞান হবে। কিন্তু এই জ্ঞান লাভ করেই সাধক শান্তি পায়না, পূর্ণ তৃপ্তি অধরাই থেকে যায়। ঠাকুর বলছেন ঈশ্বরের চিন্তা করলে কি হবে, ঈশ্বরের জ্ঞান লাভ করে কি হবে, ঈশ্বরের সাক্ষাৎ দর্শন করা চাই, তাঁর সাথে কথা বলা চাই। ঠাকুর বলছেন, ঈশ্বরের যখন সাক্ষাৎ দর্শন হবে তখন তাঁর হাত পা টিপে টিপে দেখতে হবে। ঈশ্বরের সাক্ষাৎও না হয় হয়ে গেল, কিন্তু নররূপ তো হল না, ঈশ্বরের যে সাক্ষাৎকার হবে সেতো ভাবরূপে হবে নররূপে তো হবে না। যাঁরা

ভক্ত তাঁরা ঈশ্বরের নররূপকে দেখত চান। কিন্তু অবতার তো বার বার আসবেন না। তাহলে ভক্ত ঈশ্বরকে নররূপে কি ভাবে আস্বাদ করবে? তখন যিনি গুরু আছেন তিনি দেহধারী কিনা, তাঁকে ঈশ্বরের নররূপে দেখার কথা বলা হয়। ঠাকুর বলছেন আমি একঘেঁয়ে হব না। আমি সমাধিতেও তাঁর দর্শন করব, চোখ খুলেও তাঁকে দর্শন করব, চিন্তাতেও দর্শন করব আর সাক্ষাৎ দর্শন করব। আমার ইচ্ছে হয়েছে তাঁকে খাওয়াবো শোওয়াবো, আমার ইচ্ছে হয়েছে তাঁকে সাজাব, এটাও করব ওটাও করব। সেইজন্য আমাদের বলা হয় গুরুকে সচ্চিদানন্দ রূপে দেখতে।

স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী যখন রামকৃষ্ণ মঠ মিশনের অধ্যক্ষ ছিলেন, তিনি দেখলেন রামকৃষ্ণ মিশনও বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মত হয়ে যাচ্ছে, সবাই যে যার গুরুকে নিয়ে উৎসব শুরু করে দিয়েছে। রামকৃষ্ণ মঠ মিশনের এই ভাব নয়। যার যার গুরুকে নিয়ে উৎসব করাটাকে বন্ধ করার জন্য প্রভু মহারাজ (স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী) গুরুপূর্ণিমার দিনটাকে বেছে নিয়ে ঠিক করে দিলেন এই দিনটাই হবে আমাদের সব গুরুদের জন্মদিন। প্রভু মহারাজ তিনি নিজের জন্মদিন কাউকে কখনই জানতে দেননি, পরের দিকে কিভাবে কিভাবে একজন জেনে গিয়েছিলেন, সেই থেকে পরে ইদানিং কালে সবাই জেনে গেছে। যারা একবার শ্রীরামকৃষ্ণের খাতায় নাম লিখিয়ে দিয়েছে, বিশেষ করে গুরুস্থানে, তাদের সবার গুরুর একটাই জন্মদিন, গুরুপূর্ণিমা, ব্যাসদেবের জন্মদিন। সব নদীর জল যখন সমুদ্রে মিশে গেল তখন সব জলের একটাই পরিচয়, সমুদ্র, আর কোন পরিচয় নেই। রামকৃষ্ণ মঠ মিশনের ঠিক ঠিক ভাব এইটাই। কোন গুরুই আলাদা ভাবে আমাদের কাছে প্রধান নয়। সবার গুরু এখানে সেই একজন শ্রীরামকৃষ্ণ, ঠাকুর। এখন শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মদিনই আমাদের কাছে ঠিক ঠিক গুরুবার। কিন্তু মানুষ একটা নির্দিষ্ট দিনকে চায় নিজের গুরুকে স্মরণ করতে, সেইজন্য গুরুপূর্ণিমার দিনকে এই ব্যাপারে নির্দিষ্ট করে দেওয়া হল। কিন্তু তা সত্ত্বেও সব ভক্তরাই গুরুপূর্ণিমাও করছে আবার নিজের গুরুর জন্মদিনও পালন করছে।

গুরুপূর্ণিমার মাহাত্ম্য আর তাৎপর্য হচ্ছে, মানুষ ভগবানকে, অবতারকে, ব্রহ্মজ্ঞান, আত্মজ্ঞান, যেটাই হোক, লাভ করার জন্য যখন পথে নেমেছে, সেই পথে তাকে যিনি নামিয়েছেন, তাঁর প্রতি নিজের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন। কবীর দাস খুব বড় সাধক ছিলেন, তিনি বলছেন, গুরু আর গোবিন্দ যদি দুজনেই সামনে দাঁড়িয়ে থাকেন তাহলে কাকে আগে প্রণাম করবে? বলছেন গুরুকেই আগে প্রণাম করবে। কেন? কারণ গুরুই গোবিন্দকে চিনিয়ে দিয়েছিলেন, গুরু না চিনিয়ে দিলে তো গোবিন্দকে চিনতেই পারতাম না। এই ভাবটার বেশির ভাগটাই আসে কৃতজ্ঞতা থেকে।

দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, গুরু আর গোবিন্দ এক, যিনি সচ্চিদানন্দ তিনিই গুরু। গুরুকে যদি সচ্চিদানন্দ রূপে দেখা হয় তার ফল কি হবে? শ্রীরামকৃষ্ণ ভগবান, তিনি নররূপ ধারণ করেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ শরীর অনেক দিন হয়ে গেছে চলে গেছে। আবার যদি তিনি অবতার হয়ে আসেন, তখন তাঁকে চিনতে পারব কিনা বলতে পারছি না। শ্রীরামচন্দ্রকে কজন চিনেছিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণকেই বা তাঁর জীবদ্দশায় কত জন চিনতে পেরেছিলেন। কিন্তু এখন রামকৃষ্ণ মঠের প্রচারের ফলে জানাজানি হয়ে গেছে, ঠাকুরের কথা প্রচার হয়ে গেছে। রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্ঘগুরু আছেন, তিনি দীক্ষা দেন। এখন ওনাকে যখন জানা হয়ে গেল তখন আমরা তাঁকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করলাম, এইটাই হচ্ছে মূল কথা।

ঐতিহাসিক দিক থেকে, ব্যাসদেবের জন্মতিথি বলে এই দিনটাকে গুরুপূর্ণিমা রূপে পালন করা হয়। শাস্ত্র ব্যাখ্যাদি যিনি করেন তাঁকে বলা হয় তিনি ব্যাসপীঠে বসে আছেন। এইটাই হচ্ছে গুরুর পরিচয়। সত্যি কথা বলতে কি, সন্ন্যাসীদের জন্য কোন উৎসবের কথা বলা নেই, এমনকি মুর্তিপূজারও কোন বিধান নেই সন্ন্যাসীদের, কিন্তু এই গুরুপূর্ণিমাই একমাত্র যেখানে সব কিছু একাকার ভাবে মিলেমিশে করা হয়। সমাজের গুরু হচ্ছে সন্ন্যাসী সম্প্রদায়, তাই পরের দিকে সাধারণ ভক্তরা সন্ন্যাসীদের নিয়েই গুরুপূর্ণিমা পালন করতে শুরু করলেন। এখনও গুরুপূর্ণিমার দিন উত্তরকাশীতে চেনা পরিচয়ের কিছু থাকে না, সন্ন্যাসীকে দেখলেই পুরো শহরের লোকেরা বাচ্চা থেকে বুড়োরা দৌড়ে আসে প্রণাম করতে। এদের কাছে গুরুপূর্ণিমা মানে সাজ্ঘাতিক ব্যাপার, জাতীয় উৎসবের মত হয়ে গেছে।

মূল কথা হচ্ছে সচ্চিদানন্দই গুরু। কিন্তু মানুষ ভগবানকে নররূপে আস্বাদন করতে বেশি ইচ্ছুক। তখন বলা হয়ে তোমাকে যিনি আধ্যাত্মিক পথে নামিয়েছেন, যিনি তোমাকে ঈশ্বর সাক্ষাৎকারের উপায় জানিয়ে দিলেন তিনিই তোমার গুরু আর সেই সচ্চিদানন্দই এই গুরু রূপে তোমাকে পথ দেখাচ্ছেন। গুরু হচ্ছেন নররূপধারী, গুরুর মধ্য দিয়েই তুমি তোমার বাঞ্ছিত আকঙ্খা ঈশ্বরের নররূপ আস্বাদন করে নাও। গুরুপূর্ণিমার মূল ভাব এইটাই।

এবারে আমরা মূল আলোচনা গীতার কথা শুরু করছি। আত্মতত্ত্বের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ভগবান আত্মার স্বরূপের স্পষ্ট সংজ্ঞা ঊনিশ আর কুড়ি এই দুটো শ্লোকে দিয়েছেন, এই দুটো শ্লোক আবার গীতার শ্লোকই নয়, কঠোপনিষদের শ্লোক। আরও জোর

দেবার জন্য ব্যাসদেব শ্রুতি থেকে এই দুটো শ্লোক নিয়ে বলতে চাইছেন যে গীতাতে যা বলা হচ্ছে শ্রুতিও এই একই কথা বলে গেছে, যদিও আমরা বলি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজের মুখে গীতার উপদেশ দিয়েছেন।

গুরু বা আচার্যের মুখে যতক্ষণ শাস্ত্র শ্রবণ না করা হচ্ছে ততক্ষণ কখনই শাস্ত্র বোঝা যাবে না। যেমন অনেকে বলেন যে, গীতা কঠোপনিষদ থেকে শ্লোক তুলে এনেছে, আবার অনেকে বলেন কঠোপনিষদই গীতা থেকে শ্লোক নিয়ে এসেছে। প্রথমে প্রমাণ করতে হবে যে গীতা পরে কঠোপনিষদ আগে। অথচ শঙ্করাচার্য তাঁর ভাষ্যে পরিষ্কার করে বলছেন গীতার যা বক্তব্য উপনিষদেরও ঠিক একই বক্তব্য। এটাকে দেখানোর জন্য গীতা উপনিষদ থেকে দুটো শ্লোক নিয়ে এসেছে। ঠিক সেই রকম পঞ্চদশ অধ্যায়ে যে অশ্বত্থ বৃক্ষের কল্পনা করা হয়েছে সেটাও কঠোপনিষদ থেকে নেওয়া হয়েছে। আমরা যখন কোন বিষয়ের উপর প্রবন্ধাদি লিখি তখন আমাদের বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য অন্যান্য বই বা প্রবন্ধ থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে বলি যে স্বামীজীও এই কথা বলেছেন। যেমন বলা হল, ঠিক ঠিক ভক্তি যদি না হয়, মন পরিষ্কারা যদি না হয় শাস্ত্রের কথা ধারণা করা যায় না। কিন্তু এই বক্তব্যকে সবাই নাও মানতে পারে, তখন যদি বলা হয় ঠাকুর কথামৃতে ঠিক এই কথাই বলেছেন, তখন এই বক্তব্য প্রতিষ্ঠা পেয়ে যাবে, আর কারুর কিছু বলার থাকবে না। যে কোন বক্তব্যের পেছনে যদি চাপরাশ না থেকে সেই বক্তব্যের কোন দাম থাকে না। আমাদের নিজস্ব কথার কোন দাম নেই, কারণ আমরা তো আর আত্মজ্ঞানী নই, ঠাকুরের প্রত্যেকটি কথার একটা অপরিসীম মূল্য আছে, কারণ ঠাকুর হচ্ছেন আত্মজ্ঞানী। যখনই কেউ কোন নতুন দর্শনের মতকে দাঁড় করাবেন তখন সেই মতকে ওজন দেওয়ার জন্য বড় একজনের কাছ থেকে চাপরাশ নিয়ে আসতে হবে, হয় গীতা থেকে নয়তো উপনিষদ থেকে, নয়তো ঠাকুরের কথা থেকে। যখন গীতা লেখা হয়েছিল তখন এর বড় চাপরাশ নিয়ে আসা হয়েছে উপনিষদ থেকে। এখন তো গীতা যা বলেছে সেটাই শেষ কথা বলে সবাই এক বাক্যে স্বীকার করে নিচ্ছে।

এরপর শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা বলছেন, অর্জুন তোমাকে আত্মার ব্যাপারে অনেক কথাই বলা হল, কর্তা কর্ম ও ক্রিয়ার সাথে আত্মার কোন সম্পর্ক নেই। জগতে দুটো জিনিষই আছে, কর্তা আর কর্ম যেটাকে বলা হচ্ছে যুস্মদ্ অস্মদ্ প্রত্যয়, প্রত্যয় হচ্ছে বোধ। যেমন আমার আমি বোধ আছে, আমার বোধ আছে এটা বোতল। আমার আমি বোধটা হল অস্মদ্ প্রত্যয়, আর এই বোতল আছে, এখানে যা কিছু আছে এই বোধটা হচ্ছে যুস্মদ্ প্রত্যয়। সেই রকম আপনি আপনার কাছে হচ্ছেন অস্মদ্ প্রত্যয় আর আমি আপনার কাছে যুস্মদ্ প্রত্যয়। এই অস্মদ্ আর যুস্মদ্ প্রত্যয়ের সাথে যুক্ত থাকে কর্তা, কর্ম আর ক্রিয়া। এই তিনটে জিনিষকে নিয়েই জগৎ চলছে। এই জগতে যা কিছু আছে এর সব কিছুই হয় অস্মদ্ প্রত্যয়, আমি আছি আর তা নাহলে যুস্মদ্ প্রত্যয়, জগৎ আছে। সবাই নিজে আছে আর তার সামনে জগৎ আছে। এই বোতলটা আমার কাছে Object, কর্ম, আর আমি হচ্ছি Subject, কর্তা। যদি বোতলের বোধ শক্তি থাকত তাহলে আমি বোতলের কাছে কর্ম হয়ে যেতাম বোতল হয়ে যেত কর্তা। যখন কর্তা কর্মের উপর চেপে যায় তখন হয় ক্রিয়া। আমি আছি আর রুটি আছে, আমি যখন রুটিকে ধরে খেতে যাচ্ছি তখন ক্রিয়ার জন্ম হচ্ছে। মানে কর্তা যখনই কর্মের উপর চেপে যায় তখনই ক্রিয়া শুরু হয়। বলছেন, আত্মার কাছে এগুলো কোন অস্মদ্ প্রত্যয়ও নয় যুস্মদ্ প্রত্যয়ও নয়, কর্তাও নয় কর্মও নয়। আবার কখন কর্তা আর কখন কর্ম হবে তাও না, আত্মা কর্তা আর কর্মের পারে। এর ফলস্বরূপ আত্মার উপরে কোন ক্রিয়া করা যায় না। এই গ্লাশে জল ভরা যেতে পারে, গ্লাশে জল থাকলে জলটাকে ফেলে দেওয়া যেতে পারে, আবার গ্লাশকে ভেঙ্গে দেওয়া যেতে পারে, গ্লাশকে নিয়ে যা খুশি করা যেতে পারে, কারণ গ্লাশটা কর্ম। আত্মা যেহেতু কর্ম নয় কর্তা নয়, তাই আত্মার উপর কোন ক্রিয়া হয় না, এটা আমরা কোথা থেকে জানছি? শাস্ত্র থেকে। কেউ বলতে পারে আমি শাস্ত্র মানিনা। তখন বলতে হবে, ভাই, ধর্ম তোমার জন্য নয়। আবার কেউ যদি বলে এই জগতের দুঃখ যন্ত্রণায় আমার প্রাণ বেরিয়ে যাচ্ছে, আমি আর পারছি না, বলুন আমি কি করব? তখন তাকে বলতে শুরু করা হবে, আত্মা কর্তাও নন, কর্মও নন, তাই তাঁর উপর কোন ক্রিয়া হয় না। এই কথা শুনে সে কিছু না বুঝতে পেরে আবার মাথায় হাত দিয়ে বসবে। তখন তাকে বলা হবে, ভাই আগে সাধন ভজন করে ভক্তি লাভ করে এসো তখন এই কথার ধারণা করতে পারবে। এইজন্য বলা হয় ধর্ম তাদেরই জন্য যারা সংসার জ্বালায় দগ্ধ হয়ে জ্বলে পুড়ে গিয়ে আর্তনাদ করে বলবে আমাকে রক্ষা করুন, আপনি আমাকে যা বলবেন আমি তাই শুনব ও করব। এই অবস্থায় না গেলে ধর্ম ঠিক ঠিক শুরু করা যায় না।

এই ধর্ম লাভের প্রেরণাকে আশ্রয় করে যখন এগোতে শুরু করে তখন এগোতে এগোতে একটা অবস্থায় গিয়ে পরিষ্কার বোধগম্য হয় যে গুরু যা বলেছিলেন ঠিক তাই হচ্ছে। তখন নিজেই বুঝতে পারবে, কেউ কাউকে এসে উপলব্ধি করিয়ে দিতে পারবে না, কারণ সমস্যা হচ্ছে এটা স্বসংবেদ্য। নিজের সন্তানকে যতই স্নেহ করুক, যতই ভালোবাসুক, যখন বাচ্চার জন্য খাদ্য তৈরী করে তখন কত যত্ন নিয়ে সাবধানে তৈরী করা হয়, তৈরী করার পর কত সাবধানে যত্ন নিয়ে বাচ্চাকে খাওয়ানোর চেষ্টা করা হয়, কিন্তু খাওয়াটাকে হজম করে শরীরকে হৃষ্টপুষ্ট করতে কোন বাবা মাই বাচ্চার হয়ে করে দিতে পারবে না, বাচ্চকেই করতে হবে। কোন গুরু কোন শিষ্যের অজ্ঞান অন্ধকার দূর করতে পারেননি পারবেনও না, কিন্তু অজ্ঞান অন্ধকার দূর করার রাস্তাটা দেখিয়ে দিয়ে অনুকূল পরিস্থিতিটা তৈরী করে দিতে পারেন। এর পর গুরুর কথা নেওয়া, শাস্ত্রের কথা ধারণা করার কাজটা নিজেকে করতে হয়। এরপরে জ্ঞান যেটা হয় সেটা একমাত্র স্বসংবেদ্য, যে জানে সেইই জানে, যে বুঝেছে সেইই বুঝেছে, আর কেউ বুঝতেও পারবে না ধরতেও

পারবে না। উপনিষদে আছে, সত্যকাম যখন জঙ্গল থেকে গুরুর কাছে ফেরত এসেছে, গুরু সত্যকামকে দেখে বলছেন – সত্যকাম তোমার চেহারাতো ব্রহ্মজ্ঞানীর মত ঝকঝক করছে। ব্রহ্মজ্ঞানীরা নাকি ব্রহ্মজ্ঞানীকে চিনতে পারেন, হতে পারে, এটাই আমরা পরম্পরায় শুনে আসছি। কিন্তু এর বাইরে এটা হচ্ছে পুরোপুরি স্বসংবেদ্য।

বলছেন আত্মা কর্ম নয় কারণ আত্মাকে ছেদন করা যাবে না, জল দ্বারা আর্দ্র করা যাবে না, বাতাসের দ্বারা শুষ্ক করা যাবে না, আগুনে পোড়াতে পারব না, কোন কর্মই করা যাবে না। আত্মা অবিনাশী, বিনাশ করা যায় না এই অর্থেই আত্মাকে অবিনাশী বলা হচ্ছে না, আত্মার উপর কোন ধরণের ক্রিয়াই করা যায় না। শুধু নাশ করাই যাবে না তা নয়, কোন কাজই করা যাবে না, আমি বললাম ঠিক আছে আত্মার উপরে কোন কাজ করা যাবে না, আচ্ছা আত্মাকে একটু রঙ করে দিই, কিন্তু করা যাবে না। আত্মাকে রঙ করা যাবে না, ঠিক আছে আত্মাকে একটু জ্ঞান দিয়ে দিই, আত্মাকে একটু লম্বা করে দিই। কিছুই করা যাবে না। কেন করা যাবে না? কারণ আত্মা দ্বিতীয়ার কর্ম নয়। আচ্ছা কর্ম না হোক তাহলে কর্তা হবে। কিন্তু আত্মা কর্তাও নয়, আত্মা কোন কাজও করবে না আর তার উপরে কোন কাজও হবে না।

এখানে উপস্থিত সমস্যা হচ্ছে এখন যুদ্ধ শুরু হতে চলছে, অর্জুন বলছে যুদ্ধ করব না। সেই পরিপ্রেক্ষিতে অর্জুনকে বলা হচ্ছে আত্মা কাউকে মারেনও না আর কারুর দ্বারা হতও হন না। তোমার সমস্যা হচ্ছে তুমি ভীষ্ম দ্রোণাদির মত গুরুজনদের কি করে বধ করবে। কিন্তু আত্মা কাউকে মারেও না কারুর দ্বারা হতও হন না। অর্জুনকে এই কথা কেন বলা হচ্ছে? অর্জুন তুমি আসলে কে, তোমার প্রকৃত স্বরূপটা কি এইটিকে একটু বিচার কর তো। বিচার করতে গেলে তিনটে মতের মধ্যে যে কোন একটা মত তো তোমাকে নিতে হবে। প্রথম মত হচ্ছে, বাবা মার কোন এক সম্পর্কে আমার জন্ম হয়ে গেছে, যে কথা ঘোর ভৌতিকবাদী, চার্বাক, কম্যুনিস্টরা, জড়বাদীরা বলে। এখন এটাই যদি সত্য হয় তাহলে আমি কোথা থেকে এলাম? কোথাও থেকে জেনেটিক একটা সেলের সঙ্গে আরেকটা সেলের সংযোগ হয়ে এই শরীর হয়েছে। তখন ভগবান বলছেন তোমার যদি এইটাই সত্তা হয়, কি সত্তা? এই শরীর আছে আর এই শরীরের মধ্যে একটা চেতন বোধ আছে, তাছাড়া আর কিছুই নয়, মরে গেলে সব শেষ। একদম ঠিক কথা, এতে কোন ভুল নেই। যদি তাই হয়, বলে নাকি এই পৃথিবী পনেরো বিলিয়ন বছর আগে সৃষ্টি হয়েছিল, মানে কয়েক শত কোটি বছর আগে। আর পৃথিবী এইভাবে কত দিন চলবে? বলা হয় আরও নাকি কয়েক শত কোটি বছর চলবে। এটা হচ্ছে বিজ্ঞানের মত। এখন পনেরো বিলিয়ন পেছনের দিকে আর পনের বিলিয়ন সামনের দিকে, মাঝখানে তোমার একশ বছরের অস্তিত্ব, তাতে তুমি এতো চিন্তা করছ কেন, দু বছর পরে না মরে, না হয় দু বছর আগেই মরলে, তাতে কি আসবে যাবে, এই নিয়ে এত হাহুতাশ করার কি আছে, আর এর জন্য তুমি নিজের ধর্ম ছাড়তে চাইছ কেন।

আর তুমি তোমার সত্তা, চৈতন্য বলে কিছু যে একটা আছে এটাকে যদি না মেনে যদি ভাবো ছিছি আমি কি কুকুর বেড়াল নাকি, আমার তো আমি চেতনা বোধ আছে। তাই যদি মনে করে থাক তাহলে বেদের মতে চল। বেদের মত হচ্ছে আত্মা চিরকাল আছেন আর তার সাথে অনিত্য জড় আছে। আত্মা এই জড় থেকে পদার্থ নিয়ে নিজের শরীর তৈরী করে এই পৃথিবীতে এসে কর্ম করতে থাকে, কর্মের ফল অনুযায়ী সে স্বর্গ বা নরকে বা পশুপাখি যোনিতে জন্ম নেয়, এইসব জায়গায় ঘুরে ঘুরে কর্মের ফল শেষ হয়ে গেলে আবার মনুষ্য লোক এই পৃথিবীতে জন্ম নেয়, আবার কর্ম করে আবার স্বর্গাদি লোকে যায়, এই চক্র চলতেই থাকে, অনন্ত কাল ধরে চলতেই থাকে। যে জন্মেছে সে মরবে, যে মরেছে সে জন্মাবে। বেদের এই মতটাকেও তুমি যদি মান তাহলে মৃত্যুকে তোমার এতো ভয় পাওয়ার কি আছে, মরবে আবার জন্মাবে, আবার মরবে আবার জন্মাবে, তুমি চিন্তা কেন করছ। এগুলো কিন্তু গীতার মত নয়, অনেকেই ভুল করে মনে করেন শ্রীকৃষ্ণ যখন বলছেন তাহলে এটাই গীতার মত, কিন্তু ভগবান অর্জুনকে বোঝাবার জন্য বলছেন তুমি যদি এই মতকে বিশ্বাস কর, এগুলো আদপেই গীতার মতই নয়।

এর পর তৃতীয় মত বলছেন। এইটাই হচ্ছে ভগবানের মত, যেটা আমরা এতক্ষণ আলোচনা করে যাচ্ছি। এই তিনটে মতের যে কোন একটা মতকে কাউকে না কাউকে নিতে হবে। কিন্তু তুমি যদি জ্ঞানীর মত নাও, বেদান্তের কথা বল, তাহলে আত্মার কি স্বভাবের কথা বলছে বেদান্ত? আত্মা কর্তাও নন কর্মও নন, কর্তা আর কর্ম না হওয়াতে আত্মার উপর কোন ধরণের ক্রিয়াও হয় না কারুর উপর আত্মা কোন ক্রিয়াও করেন না। সেই আত্মাতে যদি তোমার বিশ্বাস থাকে তাহলে তুমি কাউকে মারছ না, তোমাকেও কেউ মারছে না, এত চিন্তার কি আছে যুদ্ধ করাই এখন তোমার একমাত্র কর্তব্য।

এর আগে অর্জুন বলছেন *শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্*। আমি আপনার শিষ্য, আপনি আমাকে বলুন আমি যুদ্ধ করব কি করব না। তাই শ্রীকৃষ্ণ বলছেন কেন যুদ্ধ করবে না, তিনটেই তো সম্ভবনা আছে, যদি মন কর মরে গেলে সব শেষ, তাহলে যুদ্ধ কর, খেলা শেষ, খেলা যদি আরও আগে শেষ করে দিতে চাও তাও ভাল। যদি বেদের মতে চল তাহলে মরে গেলে আবার জন্মাবে, তাহলে মৃত্যুকে এতো ভয় পাচ্ছ কেন, ভীষ্ম দ্রোণ আবার জন্ম নেবেন। আর যদি বেদান্ত মতে চল, আত্মাই আছে আত্মা ছাড়া কিছু

নেই, তাহলে তোমার ভীষ্মের দ্রোণের জন্মও নেই মৃত্যুও নেই। তাই তোমার স্বধর্মটি কখনই ছেড়ো না। তবে কি অর্জুন তোমাকে যে এতো কথা বললাম, কিছু মনে করো না কারণ –

**আশ্চর্যবৎ পশ্যতি কশ্চিদেন-**
**মাশ্চর্যবদ্ বদতি তথৈব চান্যঃ।**
**আশ্চর্যবচ্চৈনমন্যঃ শৃণোতি**
**শ্রুত্বাপ্যেনং বেদ ন চৈব কশ্চিৎ।**।২৯।।

এইসব কথা বেশির ভাগ লোকই শুনতে পায়না, দেখাতো দূরের কথা। আর শুনলেও ধারণা করতে পারেনা। এই শ্লোকটাই আবার অন্য ভাবে কঠোপনিষদে আসছে – *আশ্চর্যো বক্তা কুশলোঽস্য লব্ধাশ্চর্যো জ্ঞাতা কুশলানুশিষ্টঃ।।(১/২/৭).* এই সব কথা যে বলবে, যিনি বক্তা তাঁকে বিরাট কিছু হতে হবে, আর যে শুনছে তাকেও ধারণা করার ক্ষমতা থাকতে হবে। শুধু গুরুকেই উপলব্ধিবান হলে হবে না, শ্রোতাকেও বিরাট কিছু হতে হবে। শ্রীরামকৃষ্ণ অবতার হয়ে কলকাতায় ঘুরে ঘুরে উপদেশ দিয়ে বেড়ালেন, কজন শিখল, হাতে গোনা কয়েকজন মাত্র। উপনিষদে বলছে *কুশলোঽস্যা লব্ধা,* যে শিষ্য তাকেও সেই রকম অনুভূতি সম্পন্ন হতে হবে এবং ধারণা করার ক্ষমতা থাকতে হবে।

যে কোন কর্মের পেছনে প্রয়োজনটাই হচ্ছে সব থেকে গুরুত্ব, প্রয়োজন অভাবে একমাত্র উন্মত্ত যে সেই কাজ করে। গরুও খিদে পেলেই ঘাসের দিকে যায় তার খিদে না থাকলে যাবে না। এই জগৎ ক্রিয়ায় চারটে জিনিষই সব সময় থাকবে – কর্তা, কর্ম, ক্রিয়া আর প্রয়োজক। প্রয়োজনটা কোথা থেকে আসছে? অভাব বোধ থেকে। আমার জল পিপাসা লেগেছে, শরীরের জলের অভাব হয়েছে, জলের প্রয়োজন হল, আমি জল খেলাম। আত্মার আছে চৈতন্যবোধ, সে নিজে পূর্ণ হয়ে আছে, সচ্চিদানন্দ। কিন্তু একটা অজানা রহস্যে, যে রহস্য আমাদের কারুর পক্ষেই জানা সম্ভব নয়, আত্মার মাঝখানে এসে যায় একটা অজ্ঞান বা অবিদ্যা। অজ্ঞান বা অবিদ্যা মানে আত্মা তাঁর সৎস্বরূপ, আনন্দ স্বরূপ আর চিৎস্বরূপকে ভুলে যায়। নিজের স্বরূপকে যেমনি ভুলে যায় তাঁর যা যা স্বরূপ তার ঠিক উল্টো জিনিষটা করতে শুরু করে। ব্রহ্ম ছাড়া কিছু নেই, ব্রহ্ম পূর্ণ, যখন অজ্ঞান এসে গেল তখন সে নিজেকে জীবাত্মা রূপে ভেবে অপূর্ণতার চিন্তা করতে থাকে।

জীবাত্মা কখন বলছি? এই আত্মা যিনি পূর্ণ, তিনি যখন এই শরীর, মন, ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে নিজকে একাত্ম করে ফেলছেন। এক কখনই হয় না, আত্মা ভেবে নিচ্ছে আমি ওর, ও আমার। আত্মা মনে করে আমার শরীর না হলে চলবে না, অথচ দুটোই বিপরীত ধর্মী। জড়ের ধর্মের সাথে আত্মার ধর্মের কোথাও মিল নেই, সবটাই বিপরীত, কিন্তু আত্মা অবিদ্যা বশতঃ নিজেকে জড়ের সাথে এক মনে করছে, আর জড়ের ধর্মকে নিজের ধর্ম বলে মনে করছে। ঠাকুর এটাকেই মজা করে বলছেন – হারুকে পেতনীতে ধরেছে, হারুর আর সেই তেজ নেই। শুদ্ধ আত্মাকে পেতনী ধরে নেয়, পেতনী হচ্ছে অবিদ্যা। এখন দেহে জলের দরকার, জল না পেলে দেহ ছটফট করতে থাকে, আত্মা দেহের সাথে নিজেকে এক করে ফেলেছে বলে আত্মাও ছটফট করতে শুরু করে দেয়। শরীরের যেমন যেমন প্রয়োজন হবে, ইন্দ্রিয়, মনের যা যা চাহিদা, আত্মাও বোকার মত তেমন তেমন চাইতে থাকবে। বিয়ের সময় বোকা বরগুলো যেমন বউয়ের পেছন পেছন হাঁটতে থাকে আত্মাও বোকার বরের মত শরীর, মন, ইন্দ্রিয়ের সাথে হাঁটতে থাকে।

এখন যিনি জ্ঞানী, যিনি জ্ঞান লাভ করেছেন তিনি বুঝে গেছেন যে আমি হলাম সেই শুদ্ধ আত্মা, আমি আলাদা আর এই শরীর, মন, ইন্দ্রিয় আলাদা। তার মানে তাঁর অবিদ্যা নাশ হয়ে গেল। অবিদ্যা নাশ হয়ে যাওয়াতে তাঁর প্রয়োজনটাই নাশ হয়ে গেল। প্রয়োজনটা আসছে অভাব বোধ থেকে। আমার যদি কোন অভাব বোধ না থাকে তাহলে আমি কেন ছোটাছুটি করতে যাব। যে মদ খায় না সে শুঁড়ির দোকানে যাবে কেন। এখন যাঁদের অবিদ্যা নাশ হয়ে গেছে, স্বামী বিবেকানন্দ, বুদ্ধ, যিশু এঁদের অবিদ্যা নাশ হয়ে গেছে, এখন এঁদের শরীরের প্রয়োজন যখন হবে তখন তাঁদের বয়ে গেছে শরীরের কথা মত চলতে, কেননা আমি আলাদা শরীর আলাদা। এখন শরীরটাকে আমার প্রয়োজন আছে, এই শরীর দিয়ে অনেক কাজ করতে হবে তাই শরীরের যেটা একান্ত প্রয়োজন সেটা তাকে দিতে হবে। তাঁদের শরীর যখন নাশ হয়ে যাবে তখন কি হবে? কিছুই হবে না। তিনি দেখবেন আমি তো কখন বন্ধনে ছিলামই না, আমি শুধু কল্পনা করে যাচ্ছিলাম। কিসের কল্পনা করে যাচ্ছিলেন? ধর্ম অধর্মের কল্পনা, পাপ পূণ্যের কল্পনা, জীবন মৃত্যুর কল্পনা।

এগুলো অনেক উঁচু অবস্থার কথা। কিন্ত সাধারণ কথা হচ্ছে শুদ্ধ আত্মা আর জীবাত্মার মধ্যে কোন তফাৎ নেই। জীবাত্মার সাথে শুদ্ধ আত্মার তফাৎ এইটুকুই, জীবাত্মা নিজেকে দেহ, মন, ইন্দ্রিয় বুদ্ধির সাথে কল্পনাতে নিজেকে জুড়ে নেয়। আমার দুটো হাতকে যদি কেউ দড়ি দিয়ে বেঁধে দেয় তখন আমার পক্ষে দড়ি থেকে হাতকে মুক্ত করার কোন উপায় নেই। কিন্তু আমি যদি নিজেই নিজের হাত দুটোকে জুড়ে নিয়ে চেঁচাতে থাকি আমার হাত দুটো আটকে গেছে, আমি ছাড়াতে পারছি না। হাত দুটোকে এখন কে

ছাড়াতে পারবে? কেউই কোন দিন ছাড়াতে পারবে না। এখানে তো কোন বন্ধন নেই, আমি মনে করছি আমার হাত বন্ধনে রয়েছে। আত্মা আর শরীরের ঠিক এই এক অবস্থা। এটা হচ্ছে পুরো কল্পনা, সেইজন্য বলছেন - *আশ্চর্যবৎ পশ্যতি কশ্চিদেনম্*, এই জিনিষ গুলিকে ধারণা করা অত্যন্ত কঠিণ। এই অবিদ্যা কেন হয়, কিভাবে হয়, কোথা থেকে আসে এসব প্রশ্নের উত্তর কোন দিন কোন শাস্ত্র পরিষ্কার করতে পারে না। একেই কেউ বলে 'তাঁর ইচ্ছা' কেউ বলে 'তাঁর লীলা'। আর বেদান্ত বলে অবিদ্যা, যেটা কোন কালেই ছিল না, তুমি শুধু কল্পনা করে যাচ্ছ। কেউ বলে ব্রহ্ম আর শক্তির খেলা, এগুলো শক্তিরই খেলা, যেমন সমুদ্র আর তার ঢেউ।

কিন্তু মূল কথা হচ্ছে অবিদ্যাকে ব্যাখ্যা করা যায় না। অবিদ্যাকে যদি ব্যাখ্যা করে দেওয়া হয় তাহলে সমস্যা আরও কঠিণ হয়ে যাবে। কারণ তখন প্রশ্ন উঠবে, যে চৈতন্যকে শুদ্ধ বলে ব্যাখ্যা করা হচ্ছে সেই শুদ্ধ চৈতন্য এই রকম বোকা কাজ কেন করতে যাবে। অনেকে বলেন ভগবানই এই সব কিছু সৃষ্টি করেছেন, এর জবাবে মাণ্ডুক্যকারিকাতে একটা শ্লোকে প্রশ্ন করে বলছেন – *আপ্তকামস্য কা স্পৃহা*, যিনি আপ্তকাম তাঁর আবার স্পৃহা কিসের। আমি যদি বলি তাঁর ইচ্ছা, তাহলে তার মানে হচ্ছে তাঁর স্পৃহাও আছে, কেননা পাগল ছাড়া বিনা প্রয়োজনে কেউ কিছু করে না। তাহলে ভগবানের কিছু প্রয়োজন ছিল। ভগবানের যদি প্রয়োজন থাকে তাহলে তাঁকে আপনি যে বলছেন আপ্তকাম সেটাতো আর সিদ্ধ থাকল না। এইজন্য আরও বিরাট সমস্যা হয়ে যাবে।

আমদের সেই আগের অবস্থানে গিয়ে বলতে হচ্ছে যে, চৈতন্যের জ্ঞান হচ্ছে স্বসংবেদ্য। যে মুহুর্তে আমার জ্ঞান হয়ে যাবে যে আমি সেই শুদ্ধ চৈতন্য, তখন মনে হবে আরে আরে আমি বোকার মত এসব কি করছিলাম। তখন আমি সবাইকেই বলতে যাব আরে তোমরা বোকার মত এই সব কি করে বেড়াচ্ছ। যার জ্ঞান হয়ে যায় সে দেখে যে বাকীদের সে বোঝাতে পারবে না, অথচ জ্ঞান হবার আগে তাকে যখন তার গুরু বোঝাচ্ছিলেন তখন সেও হাসছিল। নরেন্দ্রনাথ দত্তও ঠাকুরের কথাতে হেসেছিল – বাবা, বলে কি, এই ঘটি বাটি নাকি ঈশ্বর, সবই নাকি চৈতন্য। সেই নরেন্দ্রনাথ দত্তের যখন চৈতন্য হয়ে গেল তখন তিনিই আবার স্বামী বিবেকানন্দ হয়ে সবাইকে বলতে শুরু করলেন চৈতন্য ছাড়া কিছু নেই। এখন আমরা হাসছি, আমাদের যখন জ্ঞান হয়ে যাবে তখন আমদের দেখে বাকি জগত হাসবে, এটাই পর পর চলতে থাকবে।

তাঁদের যখন চৈতন্যের অপরোক্ষ অনুভূতি হয়ে যায়, তাঁরা যখন তাঁদের অভিজ্ঞতার কথা কিছু লিপিবদ্ধ করেন, তখন সেটাই হয়ে যায় গীতা। আবার আমি তখন বলব এটা মিথ্যা। সেইজন্য ধর্ম পথে যাদের জিজ্ঞাসু মনোভাব খুব বেশি তাদের প্রচণ্ড সমস্যা হয়ে যায়। যারা আর্ত তারা খুব দ্রুত অগ্রসর হয়, কারণ যে আর্ত সে অত শত কিছু ভাবতে যায় না, এটা এই রকম কেন, ওটা কেন হবে না এসব মাথায় আসে না, তার কাছে তখন মরণ বাঁচন সমস্যা। ঠাকুর প্রথমে জিজ্ঞাসুর মত গিয়েছিলেন, পর আর্ত ভাবে চলে গিয়েছিলেন, সেইজন্য তাঁর গতি ঐরকম প্রচণ্ড বেড়ে গিয়েছিল। সেইজন্য বলা হয় তপ্তশিরোবৎ - মাথায় আগুন লেগে গেলে তখন কি সে হিসেব করতে যাবে যে জলটা নোংরা না পরিষ্কার, প্রথমে যে পুকুরটা সামনে দেখবে তাতেই ঝাঁপ মারবে। এই অবস্থা যতক্ষণ না আসে ততক্ষণ কিন্তু ধর্ম শুরু হয় না। ঠাকুর বলছেন, হাজরার কথা শুনে আমার মাথা ঝিমঝিম করে। ঠাকুর হচ্ছেন অবতার আর হাজরা হচ্ছে জ্ঞানী, মানে এখান ওখান থেকে দু-চারটে বই পড়েছে বা শুনেছে, ওতেই ঠাকুরকে যা যা প্রশ্ন করছে আর একেকটা কথা বলছে যে ঠাকুরও কিছু বলতে না পেরে তাঁর মাথা ঝিমঝিম করতে শুরু করে দিয়েছে। আর নরেন্দ্রনাথ যখন উল্টোপাল্টা উত্তর দিচ্ছে তখন ঠাকুর বলছেন – যাঃ শালা, তোর কথা আমি শুনবোনি, তুই এখানে আসিস কেন। কারণ এই জিনিষের উত্তর দেওয়া যায় না। স্বসংবেদ্য জ্ঞান অপরকে বোঝানো খুব কঠিণ। ঠাকুর বলছেন – আমি কাকেই বা বলি আর কেইবা বুঝবে।

সেইজন্য শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলছেন *আশ্চর্যবৎ পশ্যতি কশ্চিদেনম্*, এইটাকে তুমি কোন দিন ধারণা করতে পারবে না। আচার্য গীতার সব তত্ত্ব ব্যাখ্যা করে বলে দেবেন কিন্তু কাউকে ধারণা তিনি করিয়ে দিতে পারবেন না, ধারণা করিয়ে দেওয়া আচার্যের ক্ষমতার বাইরে। ধারণা হবে, যদি সাধনা করতে থাকে। সাধনা করতে করতে মন যখন পরিষ্কার হয়ে যাবে তখন ধারণা হবে। সাধনাটা কি? বলছেন – শাস্ত্র আর আচার্যের উপদেশ পালন করলে ধর্মতত্ত্ব ধারণা হয়। শাস্ত্রের কথা যখন আচার্যের মুখে শোনা হয় আর যার মন শম, দম, উপরিত, তিতিক্ষাদি দ্বারা সংস্কৃত করা হয় তখন শাস্ত্রের কথা ধারণা করার জন্য প্রস্তুত হয়। তিরিশ নম্বর শ্লোকে ভগবান আত্মার স্বরূপের বর্ণনার ইতি টানছেন –

**দেহী নিত্যমবধ্যোঽয়ং দেহে সর্বস্য ভারত। তস্মাৎ সর্বাণি ভূতানি ন ত্বং শোচিতুমর্হসি।।৩০।।**

প্রত্যেকটি দেহের মধ্যে দেহী আছেন, তিনিই এই দেহের মালিক, তাঁকেই আমরা জীবাত্মা বলছি। মৃত শরীর আর জীবিত শরীরের মধ্যে পার্থক্য করছে এই চৈতন্য সত্তা। চৈতন্য আছে বলেই এই শরীর চলছে, ফিরছে, চিন্তা করছে আর চৈতন্য যদি না থাকে তখন শরীরটা মৃত হয়ে একটা জড় পদার্থ হয়ে যায়। এই চৈতন্য সত্তাকেই বলা হয় আত্মা। এই আত্মা কখনই কোন কিছুর সাথে জড়ায় না, কিন্তু যখন এই চৈতন্য বা আত্মা দেহ, মন, ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে ফেলে তখন তাঁকে বলা হয় জীবাত্মা,

এই জীবাত্মার আরেকটা নাম হচ্ছে *দেহী*, যিনি এই দেহের মালিক। শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, তিনি মানে এই দেহী *নিত্যম্*, তাঁর জন্ম নেই মৃত্যু নেই, তাঁর বৃদ্ধিও নেই অবক্ষয়ও নেই। সেইজন্য দেহী *অবধ্যোঽয়ম্*, যে নিত্য তাঁকে বধ করবে কি করে, তিনি তো কর্ম নন। *তস্মাৎ সর্বাণি ভূতানি*, জগতে যত প্রাণী আছে সবার নাশ হয়ে গেলেও এই দেহীর কিছু হয় না, আত্মা আত্মাই থাকেন। সেইজন্য *ন শোচিতুমর্হসি*, অর্জুন এইজন্য তোমার কোন শোক করা উচিৎ নয়।

এই পর্যন্ত শ্রীকৃষ্ণ আত্মা বা চৈতন্য সম্বন্ধে যে তিনটে মত জগতে প্রচলিত আছে তার ব্যাখ্যা করলেন। এই তিনটের একটু এদিক ওদিক হতে পারে কিন্তু এই তিনটে মতের বাইরে কখনই যাবে না। একটা মত হচ্ছে আত্মা বলে কিছু নেই, এটাকে তুমি যদি মানো তাহলে তুমি যুদ্ধ করে মরে যাও। দ্বিতীয় মত হচ্ছে আত্মা একবার জন্মাচ্ছে আবার মরছে, আবার জন্মাচ্ছে আবার মরছে, এইটাই চলতে থাকবে। যেমন ইলেক্ট্রিসিটি আর পাখা, বিদ্যুত আসছে বলে পাখা চলছে, ট্রান্সফর্মার থেকে বিদ্যুত সরবরাহ বন্ধ হয়ে গেলে পাখা বন্ধ হয়ে যাবে। সুইচ অফ্ করে দিলে পাখা আর চলবে না, আত্মাও ঠিক এই রকম আসছে শরীরটাকে চালাচ্ছে, আত্মা বেরিয়ে চলে যাচ্ছে শরীরটাও আর চলছে না। এই মতটাকেও যদি তুমি মেনে নাও তাও তোমার চিন্তা করার কিছু নেই, তুমি তোমার স্বধর্ম পালন করে যাও। তৃতীয় মত হচ্ছে – বেদান্তের মত, যেটা আমরা এতক্ষণ আলোচনা করলাম। বেদান্ত মতকেও যদি তুমি মানো তাহলেও তোমাকে স্বধর্ম অবলম্বন করতে হবে।

গীতার মতে স্বধর্ম পালন কে করবে? আত্মার স্বরূপ হচ্ছে আত্মা কর্তাও নয় আর কর্মও নয়, কর্তা আর কর্ম যদি নাই হল তাহলে আত্মার উপরে কোন ক্রিয়াও হয় না, আত্মা কারুর উপর ক্রিয়াও করেন না। আত্মার এই স্বরূপকে যদি খুব গভীর ভাবে চিন্তা করে, ধ্যান করে করে, যদি সে নিজের স্বরূপকে জেনে যায় যে আমিই সেই শুদ্ধ আত্মা, তখন তার প্রথম প্রতিক্রিয়া হবে এই জীবনে তার আর কোন কিছুর প্রয়োজন অনুভব হবে না। আমার মেয়ের বিয়ে, তিরিশ হাজার টাকা কম পড়ছে। একজন খবর দিল অমুক একজন দয়ালু বড়লোক আছেন তাঁর কাছে সাহায্য চাইলে তিনি না করবেন না। আমি তাঁর কাছে সাহায্যের জন্য যাবো বলে বেরিয়েছি, ইতিমধ্যে আমার মোবাইলে একটা খবর এলো আমি লটারিতে পঞ্চাশ লাখ টাকা পেয়েছি। এখন আমি কি আর তার কাছে তিরিশ হাজার টাকাটার জন্য হাত পাততে যাব? আমি যদি জেনে যাই আমি সেই আত্মা, আমি কর্তাও নই, কর্মও নই, আমার উপর কোন ক্রিয়া হয় না, আমি কারুর উপর ক্রিয়া করিনা, তাহলে কি আমি আর কিছু পাওয়ার জন্য এদিক ওদিক দৌড়াদৌড়ি করব? মানুষ তো সারা জীবন দৌড়েই চলেছে, আমার চাকরি চাই, আমার বউ চাই, আমার ছেলে মেয়ে চাই, আমার বাড়ি-গাড়ি চাই, আমার ছেলের চাকরি চাই, আমার মেয়ের ভালো পাত্র চাই, আমার আমার করে সারাটা জীবন দৌড়াতে দৌড়াতে একদিন মুখ তুবড়ে পরে মারা যাচ্ছে। কিন্তু যার একবার সত্যি বোধ হয়ে যায় আমি কর্তা নই, আমি কর্ম নই, আমি কোন ক্রিয়া করি না, আমার উপর কোন ক্রিয়া হয় না, তাই আমার কোন প্রয়োজনও নেই, তখন কি আর সে এইভাবে দৌড়াবে! জ্ঞান হওয়া থাক, যদি আমাকে বলে দেওয়া হয় আর দু'মিনিটের মধ্যে তোমার মৃত্যু হবে তখন কি আমার দৌড়াদৌড়ি করতে ইচ্ছে হবে? তখন সমস্ত ক্রিয়াই বন্ধ হয়ে যাবে। আমি একজনকে বাঁচাতে যাচ্ছি, ততক্ষণে খবর এসে গেল সে মারা গেছে, তখন তাকে বাঁচাবার আর কোন প্রয়োজনই আমার থাকবে না। আত্মার জ্ঞান যখন হয়ে যায় তখন তার আর কোন প্রয়োজন থাকে না, হয় সে কোন কাজ করবে না, যদি কাজ করে অপরের ভালোর জন্য কিছু করবে, তাও নির্লিপ্ত ভাবে করবে। যাদের এই প্রয়োজন ও অভাবের পরিসমাপ্তি হয়ে গেছে তাঁদেরকে বলা হয় জ্ঞানী। জ্ঞানীকে অনেক নামে অভিহিত করা হয়, কেউ তাঁদের বলেন সাংখ্যযোগী, সাংখ্য মানে সম্যকদর্শী, যাঁর বুদ্ধিটা সম্ বা পরিষ্কার হয়ে গেছে। অনেকে জ্ঞানীকে বলেন সন্ন্যাসী বা তত্ত্বদর্শী। এনারা সমস্ত নিয়ম, ধর্মাধর্ম, পাপপূণ্যের উর্দ্ধে চলে যান। কোন কিছুতেই তাঁর কোন প্রয়োজনই নেই। কিন্তু এই উপদেশ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কাকে দিচ্ছেন? অর্জুনকে দিচ্ছেন। অর্জুনকে এত উচ্চ তত্ত্বের কথা বলার পর শ্রীকৃষ্ণ দেখছেন অর্জুনের কিছুই হচ্ছে না। অর্জুনের কিছু হচ্ছে না দেখে ভগবান এইবার সুরটা পুরো পাল্টে দিলেন।

অর্জুন, তুমি জ্ঞানী নও, তুমি সন্ন্যাসী নও, তুমি সাংখ্যযোগী নও, তোমার মন এখনও চঞ্চল, কারণ তোমার মধ্যে কর্তা, কর্ম আর ক্রিয়ার বোধ রয়েছে। এই বোধ থেকেই তুমি ভাবছ, আমি অর্জুন, আমি ভীষ্ম দ্রোণের সাথে লড়াই করতে যাচ্ছি। তাই তোমার দ্বারা আত্মার জ্ঞান এখন হবে না, তোমাকে বলে রাখলাম তুমি শুনে নিলে মাত্র, কিন্তু কিছুই ধারণা করতে পারছো না, তাই আত্মজ্ঞান তোমার জন্য নয়। সুতরাং তুমি তোমার বর্ণাশ্রম ধর্ম পালনে নেমে এস। অর্জুনের মত আমাদেরও একই অবস্থা, আমরাও গীতা পড়ছি, শুনছি, ধারণা করা হবে না, তাই ভগবান আমাদের জন্য বলছেন – মায়েরা, তোমরা তোমাদের বাড়িতে ভালো ভালো রান্নাবান্না করে স্বামী, পুত্র, শ্বশুর, শাশুরিকে খাইয়ে সেবা কর, ভালো করে ঘরদোর পরিষ্কার কর, ঘর-গেরস্থালির কাজগুলো নিষ্ঠা নিয়ে কর, আর ভাইয়েরা তোমার পরিশ্রম করে খেটে সৎ ভাবে অর্থোপার্জন কর, স্ত্রী, সন্তান, বাবা মার দেখাশোনা কর, দান কর, সাধু সেবা কর, রোজ আমার চিন্তা করে, মচ্চিত্ত হয়ে জপধ্যান কর। হে আমার জগতের মায়েরা ভাইয়েরা, তোমার এইভাবে তোমাদের স্বধর্ম পালন করতে থাক, আর দিনের শেষে সমস্ত কর্মের ফল আমাকে সমর্পণ করতে থাক।

ভগবান যেভাবে কাজ করতে বললেন সেইভাবে যারা স্বধর্ম পালন করছে গীতাতে তাদের বলা হচ্ছে যোগী বা কর্মযোগী। যাঁদের জ্ঞান হয়ে গেছে গীতাতে তাঁদের বলা হচ্ছে জ্ঞানী বা সাংখ্যযোগী। কর্মযোগীর জন্য এখন আত্মজ্ঞান নয়, অবশ্য আচার্য এক জায়গায় বলছেন, গুরু বা আচার্যের কাছে বার বার শুনে শুনে যার একটু ধারণা হয়েছে সেও এই আত্মজ্ঞানের পথে এগোতে পারে। আধ্যাত্মিক সাধনার পথে যারা আছেন তাঁদের আচার্য তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করছেন, প্রথম হচ্ছেন যাঁরা জ্ঞানী, আত্মার স্বরূপে যাঁরা নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে রেখেছেন, দ্বিতীয় শ্রেণীর হচ্ছে যাঁদের আত্মার স্বরূপের ধারণা হয়নি মানে এখনও আত্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হননি, তাঁদের জন্য কর্ম। একটা তৃতীয় শ্রেণীর কথা আচার্য বলছেন যাঁরা শুনে শুনে ধারণা করে নিয়েছেন আর মনে করছেন এইটাই সত্য, তাঁর শরীর মনও পবিত্র, তত্ত্বতঃ একটা ধারণা করে নিয়েছে, এঁনারা বর্ণাশ্রম ধর্ম পালন করেন না, এঁদেরকে বলা হয় বিবিদিষা সন্ন্যাসী, জ্ঞানী আর যোগীর মাঝখানে। আর বিদ্বদ্ সন্ন্যাসী তাঁদের বলা হয় যাঁরা আত্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছেন। যারা গৃহী তারাও বিবিদিষা সন্ন্যাসীতে আসতে পারেন যদি তাঁরা ধারণা করে নেনে যে আত্মার সম্বন্ধে যা বলা হয়েছে এইটাই সত্য। দ্বিতীয় তাঁদের শরীর মন পবিত্র হতে হবে। গীতার শ্লোকে কিন্তু এই তৃতীয় শ্রেণীর কথা বলা হয়নি, কিন্তু আচার্য শঙ্কর তাঁর গীতা ভাষ্যের মাঝে মাঝে উল্লেখ করে গেছেন। বেদান্তের যে অনেক গ্রন্থ আছে সেটাও এই তৃতীয় শ্রেণীর সাধকদের জন্য।

কিন্তু গীতার পথ হচ্ছে দুটো – জ্ঞানমার্গ আর যোগমার্গ। যোগমার্গ হচ্ছে কর্ম, যা কিছু করা হচ্ছে সব কর্মযোগ, ঠাকুরকে ভক্তি করছি, জপ করছি, সব কর্মযোগ, যখন খণ্ডনভববন্ধন গান করছি তখন তাও কর্মযোগ, ধ্যান করছি সেটাও কর্মযোগ, যখন বিবেক বিচার করছি সেও কর্মযোগ, যা কিছুই করছি সব কাজই এই কর্মযোগের মধ্যে পড়তেই হবে। এর বিপরীত হচ্ছে জ্ঞান। আসলে আমরা সাধারণতঃ জ্ঞানযোগ বলতে যেটা বুঝি তা হচ্ছে নিত্যানিত্যবিবেক, এটাও কিন্তু কর্মযোগের মধ্যে পড়ে যাচ্ছে। যখন বিচার করছি তখন বোধ হচ্ছে আমি আলাদা আমার বিচার আলাদা। আমি চিন্তা করছি, আমি আলাদা আর চিন্তা আলাদা, আমি কর্তা আর চিন্তা কর্ম, চিন্তা করছি ক্রিয়া। আপনি কি করছেন? আমি এখন ধ্যান করছি, তার মানে আমি আলাদা আর ধ্যান আলাদা হয়ে গেল, তাহলে কর্মযোগ হয়ে গেল। ঠাকুর ধ্যান করে সমাধির অবস্থায় চলে গিয়ে কি দেখছেন? তখন ধ্যাতা আর ধ্যেয় এক হয়ে যায়, এই দুটোই এক হয় না, এর যে ক্রিয়া সেই ধ্যানটাও এক হয়ে যায়। জ্ঞাতা, জ্ঞেয় আর জ্ঞান এক হয়ে যায়, শাস্ত্রে যাকে বলছে ত্রিপুটিভেদ। যেটাই জ্ঞাতা সেটাই জ্ঞান, যেটাই জ্ঞেয় সেটাই জ্ঞাতা, যেটাই জ্ঞান সেটাই জ্ঞাতা। সাধনা, জপধ্যান, শাস্ত্রপাঠ না থাকলে এগুলো প্রথমে শুনলে মাথা গুলিয়ে যাবে।

যার মধ্যে কর্তা আর কর্মের বোধ থাকবে তার জন্য জ্ঞান নয়, তার জন্য কর্ম, কর্ম মানে বর্ণাশ্রম ধর্মের কর্ম। এই বর্ণাশ্রম ধর্ম আবার সব মানুষ পালন করে না, পালন করতে চায়ও না, মানুষের মধ্যে যারা উন্নত তারাই বর্ণাশ্রম ধর্ম পালন করে। আচার্য শঙ্কর বলছেন – বর্ণাশ্রম ধর্ম তারাই পালন করে যারা জীবনে অভ্যুদয় চাইছে। পাড়ার মস্তান, চোর, গুণ্ডারা বর্ণাশ্রম ধর্ম পালন করে না। যারা অপরকে ঠকিয়ে, মিথ্যা কথা বলে, স্বার্থপরতায় ডুবে আছে, তারাও বর্ণাশ্রম ধর্ম পালন করতে চায় না। শাস্ত্র এদেরকে কখনই বলবে না যে তুমি বর্ণাশ্রম ধর্ম পালন কর, বলবে, তুমি যদি বর্ণাশ্রম ধর্ম পালন কর তাহলে তোমার উন্নতি হবে, আর যদি না কর, তাহলে দিনে দিনে তুমি পশুর স্তরে চলে যাবে, এই জন্মে মানব শরীর পেয়েছিলে, সামনের জন্মে পশুযোনিতে গিয়ে কিংবা তারও নিচু যোনিতে জন্ম নেবে। তাই বর্ণাশ্রম ধর্ম সব মানুষের জন্য নয়। যারা উন্নত মানসিকতার, যারা জীবনে অভ্যুদয় চাইছে তাদের জন্য বর্ণাশ্রম ধর্ম বলা হচ্ছে। এতে কি মুক্তি হবে? বর্ণাশ্রম ধর্মে মুক্তি হবে না, তবে মুক্তির দিকে এগিয়ে দেবে।

কত দিন এই ভাবে চলছে? যবে থেকে সৃষ্টি চলছে তবে থেকেই চলছে, আর সৃষ্টির আদিও নেই অন্তও নেই, তাই যত দিন না জ্ঞান হচ্ছে তত দিন এইভাবেই চলতে থাকবে। পৃথিবী যেমন সুর্যের চারিদিকে ঘুরছে, এই রকম ঘুরতেই থাকবে, এর থামাথামি নেই। ঠিক তেমনি যে জীবাত্মা আজ কুকুর হয়ে জন্মেছে, খুব বেশি কিছু হলে পরের জন্মে বেড়াল হবে, আবার কুকুর নয়তো শেয়াল হবে, আর এর মধ্যে ঘুরতেই থাকবে। তারপর কোন বেড়াল বা কুকুর কোন সাধুর ভালোবাসা পেল, তখন তার যোনি মুক্তি হয়ে যাবে, কুকুর থেকে হয়তো গরু হয়ে গেল। আবার গরুর দুধ কোন সাধুর সেবায় বা ঠাকুরের সেবায় গেল, সেখান থেকে সে আরো একটু উন্নত হয়ে গেল, এইভাবে উন্নত হতে হতে শেষে হয়তো অনেক যোনি ঘুরে ঘুরে মানুষের শরীরে জন্ম নেবে। মানুষ হয়েই সে যে ঈশ্বর লাভের সাধনাতে নেমে পড়বে তা নয়, এখানে আবার তার গুরু কৃপা চাই। শ্রীরামকৃষ্ণ এখন অবতার হয়ে এসেছেন, অবতার হয়ে এসে তিনি বেশ কিছু লোককে উপরের দিকে টেনে নিয়ে এলেন। ঠাকুর যাঁদের উপরের দিকে টেনে তুলে দিলেন এনারাও আবার আরও কিছু লোককে উপরে নিয়ে এলেন। সেইখান থেকে হয়ে হয়ে আজ কেউ স্বামী আত্মস্থানন্দ হয়েছেন, কেউ স্বামী গীতানন্দ হয়েছেন, কেউ স্বামী স্মরণানন্দ হয়েছেন। এনারাও আবার কিছু লোককে টেনে উপরের দিকে তুলছেন। কিন্তু সমাজের সার্বিক ধর্মের যে বিবর্তন হয় সেটা অবতার না এলে হয় না, এখন অবতার এসে একটা ধাক্কা দিয়ে ধর্মের সিঁড়িতে তুলে দিলেন। আবার যখন পাঁচশ, সাতশ বছর ধরে অবতার আসবেন না তখন ধর্মের ভাবটা আবার নীচের দিকে পড়ে যেতে থাকবে। এই জিনিষটাকে আচার্য শঙ্কর খুব সুন্দর ভাবে বলছেন, ভগবান এসে ধর্ম স্থাপন করে যান, কিন্তু দীর্ঘকাল ধরে যখন সেই ধর্মের অনুষ্ঠান

হতে থাকে তখন সেই ধর্মের মধ্যে গ্লানি জমতে থাকে, মানুষের মনে লোভ, কামনা, বাসনা এইসব ঢুকে যায়। ধর্মের গ্লানি যখন খুব বেড়ে গিয়ে অধর্ম ভাব বেশি চলে আসে তখন আবার অবতার এসে ধর্মকে স্থাপন করে যান।

কর্তা, কর্ম আর ক্রিয়া এই তিনটের ভেদ এখনও যার মধ্যে রয়েছে, তাদের দ্বারা এই মুহূর্তে কখনই উচ্চ আধ্যাত্মিকতার জ্ঞান লাভ হবে না। তখন তাদের জন্য দ্বিতীয় পথের কথা বলা হয়। দ্বিতীয় পথ হচ্ছে, স্বামীজী যেটাকে বলছেন চারটে যোগের সমন্বয়। চারটে যোগেই, তা জ্ঞানযোগই হোক বা রাজযোগই হোক, কর্মযোগই হোক কিংবা ভক্তি যোগই হোক, কর্তা আর কর্মের ভেদ রাখা হয়েছে। আর যাদের মধ্যেই এই কর্তা ও কর্মের ভেদ আছে, আমি তুমি বোধ আছে, তাদেরকেই স্বধর্ম পালন করতে হবে। বর্তমান কালের স্বধর্ম বলতে কি এই নিয়ে আবার অনেক বিতর্ক ও আলোচনা করা হচ্ছে, নতুন করে স্বধর্মকে ব্যাখ্যা করা হচ্ছে। আমাদের এইসব আলোচনাতে যাওয়া উচিত নয়। মনুস্মৃতিতে হিন্দুদের স্বধর্মকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

স্বধর্মের মধ্যে সব থেকে প্রথম হচ্ছে মানব ধর্ম। মানুষ হিসাবে প্রত্যেককেই কিছু কিছু কর্ম করতেই হবে, এগুলো স্বধর্মের মধ্যে পড়ছে, যেমন কেউ সঙ্কটে পড়ে গেছে, তাকে সঙ্কট থেকে রক্ষা করা। তারপরেই স্বধর্ম হচ্ছে বর্ণধর্ম। আমরা সবাই জন্মসূত্রে কোন না কোন বর্ণে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র বর্ণের মধ্যে জন্ম নিয়েছি, এই সব বর্ণের কিছু কিছু নিজস্ব ধর্ম আছে সেগুলোকে আমাদের সবাইকে পালন করতে হয়। এরপরেই আসছে আশ্রম ধর্ম। আমি ব্রহ্মচর্যাশ্রমে আছি, না গৃহস্থাশ্রমে আছি, না আমি বাণপ্রস্থী সেই অনুসারে আমার কিছু কিছু কর্ম করতে হয়, সেটাকে পালন করাই আমার স্বধর্ম। এর মধ্যে সন্ন্যাসীকে ধরা হয় না, কারণ সন্ন্যাসীর জন্য স্বধর্ম নয়, সন্ন্যাসী সব কিছুর পারে। এরপরে আসছে বর্ণাশ্রম ধর্ম, আমি কোন্ বর্ণে আছি এবং কোন্ আশ্রমে আছি। যেমন একজন ব্রাহ্মণ সে এখন গৃহস্থ, গৃহস্থ ব্রাহ্মণ হিসেবে তার কতকগুলি বিশেষ কর্তব্য থাকে, সেই কর্তব্যগুলো তাকে সম্পন্ন করতে হবে। এরপরে আসছে সামান্য ধর্ম এবং আরেকটি হয় বিশেষ ধর্ম। বিশেষ ধর্ম হচ্ছে – যেমন একজন ক্ষত্রিয় গৃহস্থাশ্রমে আছে, সেখানে তার কিছু কর্তব্য কর্ম আছে, তদুপরি সে আবার রাজা, তখন রাজা হিসাবে তার কিছু কর্তব্য কর্ম এসে যাচ্ছে, কিন্তু সে যদি রাজা না হয়ে সেনাপতি হয় তখন তার কর্তব্য কর্ম পাল্টে যাবে, এটাই হচ্ছে বিশেষ ধর্ম।

আমরা এখন যে বর্ণাশ্রমের কথা বলছি, এই বর্ণ আর আশ্রমের কিছু কিছু কর্তব্য কর্ম এখন উঠে গেছে, কিন্তু মনু বাকি যে সাধারণ কর্তব্যগুলোর কথা ব্যাখ্যা করে গেছেন সেই সেই কর্তব্যগুলোর কোন পরিবর্তন হয়নি। তার মানে, এখন যে রেলওয়েতে কাজ করতে যাচ্ছে, তার জন্য রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ চাকরির কতকগুলি পরিষ্কার আর স্পষ্ট আচরণবিধি ঠিক করে দিচ্ছে, এখানে চাকরি করতে গেলে এই আচরণবিধিকে মেনে চলতে হবে। এখন এই আচরণবিধিকে পালন করাই হচ্ছে স্বধর্ম পালন করা। এছাড়াও তাকে মানব ধর্ম পালন করতে হবে আর আশ্রমধর্ম। আশ্রম ধর্মটা কি? যখন আমি ছাত্রাবস্থায় আছি তখন আমার আশ্রমের ধর্ম – *ছাত্রানাং অধ্যয়নং তপঃ*, ছাত্রাবস্থায় আমার তপস্যা হচ্ছে অধ্যয়ন করা। এইগুলো বিচার করে দেখলে আমরা বলতে পারি মনু যেটা বলে দিয়ে গেছেন সেই অর্থে আজকের দিনের স্বধর্ম আর বর্ণাশ্রম ধর্মে খুব একটা পরিবর্তন হয়নি। এর মধ্যে যেটা ছিল, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের যে বর্ণ ব্যবস্থা ছিল সেটা পুরোপুরি লোপ হয়ে গেছে, তার ফলে ঐসব বর্ণের যে কর্তব্য কর্ম ছিল সেগুলোও এখন উঠে গেছে। এর বাইরে যা কিছু ছিল সেগুলো একই ভাবে রয়ে গেছে। এখন রেলের চাকরি না করি যদি শিক্ষকতা করে তখন শিক্ষকদেরও আচরণবিধি আছে। আবার এই আচরণবিধির বাইরেও এমন অনেক কিছু আছে যেগুলো বলা হয় না, অথচ ধরে নেওয়া হয় সেটা সে করবে। যেমন একজন শিক্ষকের নিজের ছাত্রের প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা থাকতে হবে, ছাত্রকে ভালোবেসে পড়াবে। ছাত্রকে ভালোবাসতে হবে, ভালোবেসে পড়াতে হবে এটা কিন্তু কোথাও লিখিত ভাবে থাকবে না। যখন স্বধর্মের কথা বলা হবে তখন লিখিত অলিখিত সব কিছুকেই একসাথে বোঝাবে। একজন মহিলা যখন সন্তানের মা তখন তার কিছু কর্তব্য আছে, যখন কারুর স্ত্রী তখন সেখানে তার কিছু কর্তব্য আছে, সেই মহিলাই পত্রবধু হিসাবে যখন কোথাও থাকবে তখন তার শ্বশুর-শাশুরির প্রতি কর্তব্য আছে। এই সব কর্তব্য কর্মই হিন্দুদের স্মৃতিমূলক শাস্ত্রে উল্লেখ করা আছে।

স্বধর্মের পর আরেকটা উচ্চ অবস্থার কথা বলা হবে, তুমি যখন স্বধর্ম অনুসারে কর্ম করবে তখন সেই কর্ম নিষ্কাম ভাবে কর। কিন্তু নিষ্কাম কর্ম করাও খুব কঠিন, যতই আমরা বড় বড় তত্ত্ব কথা বলি না কেন নিষ্কাম হওয়া যায় না। সেইজন্য বলা হয় যা কিছু কর্ম করছ, ভালো হোক মন্দ হোক, সব কর্মের ফল ঈশ্বারার্থে অর্পণ করে দাও। অর্জুনকে এতক্ষণ আত্মতত্ত্বের সব থেকে উচ্চ দর্শনের কথা বলার পর ভগবান স্বধর্মের কথা বলছেন –

**স্বধর্মমপি চাবেক্ষ্য ন বিকম্পিতুমর্হসি। ধর্ম্যাদ্ধি যুদ্ধাচ্ছ্রেয়োহন্যৎ ক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্যতে।।৩১।।**

অর্জুন, তুমি আমাকে বলেছিলে *যচ্ছ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে*, আমাকে নিশ্চিত করে বলুন কোনটা আমার পক্ষে মঙ্গলজনক। তোমাকে আত্মদর্শনের যা বলার বলে দিয়েছি, কিন্তু তুমি এখনও আত্মতত্ত্ব ধারণা করার জন্য প্রস্তুত নও। সেইজন্য এখন তোমাকে স্বধর্ম পালন করতে হবে। ভগবান এখানে স্বধর্মের ব্যাখ্যা করছেন না, অষ্টাদশ অধ্যায়ে গিয়ে ভগবান বলবেন ব্রাহ্মণের কি

কাজ, ক্ষত্রিয় কি কাজ করবে, বৈশ্যের কি কাজ, শূদ্রের কি কাজ। কিন্তু তাও স্বধর্মের পুরো চিত্রটা পরিষ্কার হবে না। বর্ণাশ্রম ধর্মের কথা বিস্তারিত ভাবে বলা হয়েছে স্মৃতিমূলক শাস্ত্রে যেমন, মনুস্মৃতি, যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতি ইত্যাদিতে। এখানে মূল কথা হচ্ছে আমরা প্রত্যেকেই পূর্ব কর্মানুসারে জন্মসূত্রে একটা বংশে জন্ম নিয়েছি, সেই বংশের একটা পরম্পরা আছে, আর যেখানে আমি পেশাগত কাজে নিযুক্ত আছি তার একটা আচরণবিধি আছে, এর উপর মানবিক মূল্যবোধের উপর কিছু আচরণ তৈরী করা হয়েছে, এই সব কিছুকে মিলিয়েই বর্ণাশ্রম ধর্ম তৈরী হয়। একটা বংশে জন্ম নিয়ে সেই বংশের পরম্পরাকে মেনে চলা, এখানে বংশ বলতে শুধু যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য বর্ণের বংশ অর্থেই বোঝাচ্ছে তা নয়, একটা বংশের নিজস্ব সাংস্কৃতি থাকে। আমরা যেমন শিশুদের শিক্ষা দেবার সময় বলি, আমাদের বংশের এইটাই কালচার, এই পরম্পরা, এর বাইরে কিছু করতে যেও না।

এই শ্লোকে অর্জুনকে ভগবান বলছেন – ক্ষত্রিয়ের জন্য শ্রেষ্ঠতম স্বধর্ম হচ্ছে যুদ্ধ করা। বলা হয় যুদ্ধের দুটো কাজ, একটা হচ্ছে প্রজা রক্ষণ, অসাধু, গুণ্ডা, বদমাইস, আর বাইরের শত্রুদের থেকে প্রজাদের রক্ষা করা। আর দ্বিতীয় হচ্ছে, অন্যান্য রাজ্যের সাথে যখন যুদ্ধ হয় তখন সেই যুদ্ধ জয়ের পর সেই রাজ্য থেকে যা যা সম্পদ আহরণ করা হয় তাই দিয়ে প্রজা রক্ষণ করা। এই অনুসারে ক্ষত্রিয়ের কাজ দুটো – একটা হচ্ছে নতুন নতুন রাজ্য জয় করে রাজ্য বিস্তার করা আর যেটা আছে সেটাকে রক্ষা করা। ক্ষত্রিয়ের এই বর্ণাশ্রম ধর্ম অনুযায়ী যুদ্ধ করতে গিয়ে যদি ক্ষত্রিয়ের প্রাণ চলে যায় তাহলে তার স্বর্গপ্রাপ্তি হবেই হবে। ভগবান এই কথাই পরের শ্লোকে বলছেন –

**যদৃচ্ছয়া চোপপন্নং স্বর্গদ্বারমাবৃতম। সুখিনঃ ক্ষত্রিয়াঃ পার্থ লভন্তে যুদ্ধমীদৃশম্।।৩২।।**

তুমি যদি যুদ্ধে অংশ নাও তাহলে তোমার জন্য স্বর্গের দ্বার খোলা। এটা হচ্ছে দর্শনের একটা মত, সেইজন্য মহাভারতেই শেষের দিকে যখন যুধিষ্ঠির সশরীরে স্বর্গে গিয়ে দেখছেন সেখানে দুর্যোধনাদিরা আগেই পৌঁছে গেছে। কারণ তারা যুদ্ধে হত হয়েছিল। আমরা যতই স্বর্গ স্বর্গ বলি না কেন, আমাদের স্বর্গেও বিশ্বাস নেই। মানুষ যতক্ষণ নিজে থেকে কোন জিনিষকে প্রত্যক্ষ না দেখছে ততক্ষণ তার কখনই সেই জিনিষে বিশ্বাস হয় না। ঈশ্বরের ক্ষেত্রেও এই একই ব্যাপার। যারা বলে – ঠাকুরের উপর বিশ্বাস রাখ। তাকে পাল্টা জিজ্ঞেস করতে হয়, আপনার কি বিশ্বাস আছে? আমরা সবাইকেই উপদেশ দিই ঠাকুর যা করেন মঙ্গলের জন্যই করেন, কিন্তু নিজের যখন কিছু হয় তখন কিন্তু এই উপদেশ নিজের উপর লাগাতে পারি না। কেন লাগাতে পারছি না? কারণ, আমারই ঈশ্বরে ছিটেফোঁটা বিশ্বাস নেই। যে কোন লোক, যার ঈশ্বর দর্শন হয়নি, সে যদি বলে ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখতে বলে, বুঝে নিতে হবে সে পরিষ্কার নিজের বেলাতেও বিশ্বাস রাখতে পারেনা। স্বামীজী বারবার বলছেন, আপনার ঈশ্বর দর্শন হয়েছে, যদি না হয়ে থাকে তাহলে ঈশ্বরের ব্যাপারে কথা বলার অধিকার কি আপনার আছে? ঠাকুর তাই মাঝে মাঝে তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গোদের একটু ধাক্কা দিতেন। আমাদের আদপেই ঠাকুরে বিশ্বাস নেই, আমরা মনে করছি ঠাকুরে বিশ্বাস আছে। তাই স্বর্গ, নরক, পুনর্জন্ম, কর্মফল, ঈশ্বর এসবই হচ্ছে অন্ধ বিশ্বাস, আমাদের মেনে নেওয়া ছাড়া আর কোন উপায় নেই। অর্জুনেরও কোন বিশ্বাস ছিল না, সেই বিশ্বাস আনার জন্য একাদশ অধ্যায়ে ভগবান যখন তাঁর বিশ্বরূপ দর্শন করালেন, তখন অর্জুন দেখছেন বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সব কিছু শ্রীকৃষ্ণের মুখ থেকে বেরোচ্ছে আবার তাঁর মুখেই সব প্রবেশ করে যাচ্ছে। ঐ অবস্থাতেই একমাত্র বোঝা যায় ভগবানই সব কিছু করেন।

ঈশ্বর দর্শনের আগে এগুলো আমাদের কাছে শুধু শব্দ মাত্র। ঠাকুর বলছেন – এমনি সময়ে টিয়ার মুখ দিয়ে রাম রাম বুলি বেরোয়, কিন্তু যখন বেড়াল টিয়াকে ধরে তখন তার রাম নাম উড়ে গিয়ে ট্যাঁ ট্যাঁ শব্দ বেরোতে থাকে। সেইজন্য স্বর্গাদির যত কথা এখন আমাদের কানে প্রবেশ করছে এগুলো সবই মুখের কথা, শাস্ত্র বলছে তাই মেনে নিতে হচ্ছে। শঙ্করাচার্যও বলছেন – না মানার কথা আসেই না, শাস্ত্র যখন বলে দিয়েছে আমি মেনে নিলাম। মা বলে দিয়েছে ও তোর দাদা হয়, ব্যস্ এর পর আর কোন কথা নেই, ও দাদা। শাস্ত্রও আমাদের মায়ের মত। ধর্ম পথে এগোতে গেলে বেশি প্রশ্ন করতে নেই। প্রশ্ন করতে থাকলে এগোনই যাবে না। কারণ আমরা শাস্ত্রের কথা এমনিতে ধারণা করতে পারব না। ধারণা কখন হবে? শাস্ত্রের কথা যখন আচার্যের মুখ থেকে শোনা হবে। কোন্ অবস্থায় শুনলে ধারণা হবে? যখন আমার চিত্ত শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষার দ্বারা একেবার পরিষ্কার হয়ে ঝকঝক করবে। যখন শ্রুতিধর হয়ে যাবে, একটা কথা বলা হয়ে গেল, সেই কথাটা একেবারে মনের মধ্যে চিরস্থায়ী হয়ে বসে যাবে। মন শুদ্ধ হলেই শ্রুতিধর হয়ে যাবে, যে কোন কথা একবার শুনে নিলেই মনে বসে যাবে, মনে বসে যাওয়াই নয়, ধারণা হয়ে যাওয়া।

এখন যারা বর্ণাশ্রম ধর্ম মানতে চাইছে না, স্বর্গ, নরক, পুনর্জন্মাদি মানবে না, তাদের জন্যে এই শাস্ত্রের কথা নয়। যারা পুনর্জন্মাদির মাধ্যমে নিজের বর্তমান অবস্থাকে উন্নত করতে চাইছে তাদের জন্যই বর্ণাশ্রম ধর্ম। যারা ভোগ বিলাস চাইছে তাদের জন্যও স্বধর্ম নয়, স্বধর্মের মূল ভিত্তিই হচ্ছে ত্যাগ। যে ব্রাহ্মণ তার পুরো জীবনটাই স্বাধ্যায় আর শাস্ত্রালোচনার মধ্যে ঢেলে দেবে, ক্ষত্রিয় যুদ্ধে নিজের প্রাণ দেওয়ার জন্য প্রস্তুত। বৈশ্য ধন-সম্পদ আহরণ করবে কিন্তু জানবে যে এই ধন-সম্পদ তার ভোগের জন্য নয়, সমাজ ও দেশের কল্যাণের জন্য। কিছু দিন আগেও বড় বড় কোটিপতি ব্যবসায়ীরা মনে করতেন আমাদের এই অর্থ নিজেদের ভোগের জন্য নয়, আমরা এই অর্থে সম্পদেরর ট্রাস্টি, সংরক্ষক মাত্র। যার জন্য দেখা যায় কোন বৈশ্য, যাদের প্রচুর টাকা-পয়সা

ছিল, তারা এগুলো দিয়ে কখন ভোগ করত না। এই ধন-সম্পদ দিয়ে সমাজের ভারসাম্যকে তারা ধরে রেখে অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতাকে বজায় রাখতেন। শূদ্র যারা তারা পরিচর্যাত্মক কার্যের দ্বারা সমাজের স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতাকে রক্ষা করত। যারাই এই বর্ণাশ্রমকে মানত না তাদের ভোগের ব্যাপারে নিষেধ ছিল না, তারা সব কিছুই ভোগ করতে পারত, এদের জন্য বর্ণাশ্রম নয়, এদেরকেই বলা হয় ম্লেচ্ছ। আজকে ভারত ম্লেচ্ছজাতির দেশ হয়ে গেছে, ভারতের সবাই, ব্রাহ্মণ থেকে শুরু করে সব বর্ণের লোকেই ভোগের মধ্যে ডুবে গেছে। এরা সবাই আজ বর্ণাশ্রমের বাইরে। সমাজ ও জাতির উন্নতির জন্য শিক্ষা চাই, সম্পদ চাই, সুরক্ষা চাই, সুস্বাস্থ্য চাই ও পরিচ্ছন্নতা চাই। এখন এই জিনিষগুলিকে যে যে সম্প্রদায়ের লোকেরা করছে তাদেরকে অনেক ত্যাগ স্বীকার করতে হবে। এখন ব্রাহ্মণের মধ্যে অনেকেই আছেন যারা বর্ণাশ্রমের বাইরে, অন্যান্য বর্ণের লোকেরাও বর্ণাশ্রমের বাইরে। এরাই যখন ত্যাগের পথ অবলম্বন করে তখন বর্ণাশ্রমের মধ্যে ঢুকে যায়। ভোগের ত্যাগ কে করবে? যে জীবনে উপরে উঠতে চায়। বর্ণাশ্রমের মাধ্যমেই একজন মানুষ নিজেকে ঠিক ঠিক গড়ে তুলতে পারে। যার উপরে ওঠার ইচ্ছে নেই সে ত্যাগের পথে কখনই আসবে না। এর পরের শ্লোকে বলছেন –

**অথ চেৎ ত্বমিমং ধর্ম্যং সংগ্রামং ন করিষ্যসি। ততঃ স্বধর্মং কীর্তিং চ হিত্বা পাপমবাপ্স্যসি।।৩৩।।**

অর্জুনকে ভগবান বলছেন, তুমি যদি স্বধর্মের দিকে তাকিয়েও যুদ্ধ যদি না কর তাহলে তোমার কিন্তু পাপ লাগবে। যারা স্বধর্ম পালন করে না তাদের পাপ লাগে, যার ফল আমরা হাতেনাতে দেখতে পাচ্ছি। একটা ছেলে মেয়েকে বিয়ে করে আনছে, বিয়ে করার পর ছেলে মেয়ের ভালোমন্দ দেখবে, মেয়ে ছেলের ভালোমন্দের দিকে তাকাবে, এটাই তাদের দুজনের স্বধর্ম। এখন এই স্বধর্ম তারা পালন করছে না বলেই দুদিন বাদে দুজনে দজনের থেকে আলাদা হয়ে যাচ্ছে। এইটাই হচ্ছে পাপের ফল। এখন মৃত্যুর পর সে ছাগল বেড়াল হয়ে জন্মাবে কিনা সেটা পরে দেখা যাবে, হাতেনাতে ফল এইখানেই পেয়ে যাচ্ছে। হে অর্জুন, এই স্বধর্ম যদি পালন করে যদি যুদ্ধ না কর তাহলে তোমার পাপ হবে। মৃত্যুর পর কি হবে সেটা ছেড়ে দাও, তোমার জীবদ্দশাতেই কি হবে ভেবে দেখেছ কি?

**অকীর্তিং চাপি ভূতানি কথয়িষ্যন্তি তেঽব্যয়াম্। সম্ভাবিতস্য চাকীর্তিরর্মরণাদতিরিচ্যতে।।৩৪।।**

তোমার যা কিছু সম্মান, মান-যশ সব নষ্ট হয়ে চারিদিকে তোমার অখ্যাতির কথা লোকে বলে বেড়াবে। স্কুল কলেজের কোন ভালো ছেলে যদি কখন কোন অন্যায় কাজ করে তখন তার শিক্ষক বলেন – তোমার কাছে আমি এই জিনিষ প্রত্যাশা করিনি। মানুষ স্বভাবতই সবার প্রতি একটা সম্মানের ভাব রাখে। মানুষ যখন নিন্দনীয় কিছু কাজ করে তখন ঐখান থেকে তার পতন শুরু হয়ে যায়। মানে, যাদের চোখে আপনি সম্মানের একটা উচ্চাসনে ছিলেন তখন সেখান থেকে পড়ে গেলেন। বলছেন *সম্ভাবিতস্য চাকীর্তিঃ*, প্রতিষ্ঠিতবান, সম্মানীয় ব্যক্তির যদি অকীর্তি হয়ে যায়, তাহলে সেই অকীর্তিকে বয়ে বেড়িয়ে বেঁচে থাকার থেকে মরে যাওয়াটা তার পক্ষে অনেক মঙ্গলদায়ক। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় আমেরিকার কয়েকজন উচ্চপদস্থ সামরিক অফিসার জার্মানির হয়ে নিজের দেশের সামরিক ব্যবস্থার উপর গুপ্তচর বৃত্তি করতে গিয়ে একজন ধরা পড়ে যায়। সেই অফিসারকে প্রধান কার্যালয়ে ডেকে পাঠান হল, তার সামনে একটা কাগজে লিখে দেওয়া হল – আপনার বিরুদ্ধে এই এই অভিযোগ ছিল, সব অভিযোগই প্রমাণিত। কাগজটা তার সামনে দিয়ে আর একটা পিস্তলে একটা মাত্র গুলি ভরে অভিযুক্ত অফিসারের সামনে রেখে চুপচাপ সেখান থেকে বেরিয়ে আসত। তার মানে তুমি এই একটা গুলি দিয়ে নিজেকে শেষ করে দাও। মুখে কিছু বলা হত না, মুখে বললে সেটা আদেশ হয়ে যাবে বলে কিছু বলা হত না। অনেক সময় গাড়ি ড্রাইভ করে কোন উঁচু পাহাড়ি রাস্তায় নিয়ে গিয়ে সেখান থেকে গাড়িটাকে নীচে ফেলে দেওয়া হত। সেটাও নিজেরাই করত, মিলিটারি থেকে কিছু করা হত না। সমাজে, প্রতিষ্ঠানে যারা খুব সম্মানিত ও উচ্চপদের লোক তাদের যখন কোন রকমের কেলেঙ্কারির কথা জানাজানি হয়ে যায় সেটা তাদের মৃত্যু থেকেও খারাপ অবস্থা। তাই বলছেন এর থেকে মরে যাওয়া অনেক ভালো।

অর্জুনকেও ভগবান এই কথাই বোঝাতে চাইছেন, তুমি যদি স্বধর্ম ত্যাগ করে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সরে যাও, এর থেকে তোমার মরে যাওয়া অনেক ভালো। লোকে বুঝবে না, তুমি কেন পালাতে চাইছ, এটাই চিরকাল লোকে মনে রাখবে অর্জুন কাপুরুষ ছিল, তাই যুদ্ধ ক্ষেত্রে থেকে পালিয়ে গেল। এর থেকে যুদ্ধ করে মরে গেলে লোকে জানবে যে তুমি বীরের মত স্বধর্ম করে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে।

**ভয়াদ্ রণাদুপরতং মংস্যন্তে ত্বাং মহারথাঃ। যেষাং চ ত্বং বহুমতো ভূত্বা যাস্যসি লাঘবম্।।৩৫।।**

যত ক্ষত্রিয় বীরেরা এখানে যুদ্ধের জন্য দাঁড়িয়ে আছে তারা মনে করবে তুমি প্রাণের ভয়ে রণভূমি থেকে পালিয়ে গেছ। তুমি এতদিন যাবৎ যত যুদ্ধ জয় করেছিলে, যার জন্য তোমাকে এত লোক সম্মান জানিয়ে এসেছে, এত দিনের সব সম্মান তোমার ধুলায় গড়াগড়ি খাবে।

প্রথমে অর্জুনকে উচ্চতম আদর্শের কথা বলে দেখালেন যে তুমি যুদ্ধ না করে ভুল করছে, দ্বিতীয় এখানে দেখাচ্ছেন তুমি স্বধর্ম পালন না করে পাপ করছ, যে পাপে তোমার স্বর্গে যাওয়ার কথা, সেখানে না গিয়ে তুমি নরকে যাবে। তৃতীয়, জাগতিক ক্ষেত্রে মান সম্মান থেকে শুরু করে যাবতীয় যা কিছু আছে সব তোমার নষ্ট হয়ে যাবে। অর্জুনের যুদ্ধ না করার বিরুদ্ধে ভগবান তিনটে পৃথক যুক্তি নিয়ে এসেছিলেন, একটা হচ্ছে সামাজিক, দ্বিতীয় ধর্ম আর তৃতীয় আধ্যাত্মিক। আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে আত্মার দৃষ্টি থেকে দেখালেনে অর্জুন ভুল করছে, ধর্মের দিক থেকে স্বর্গ ও নরকের দৃষ্টি দিয়ে ভুল প্রমাণ করলেন আর সামাজিকতার দিক থেকে তার সম্মান, প্রতিষ্ঠার কথা বলে দেখালেন অর্জুন যুদ্ধ না করে ভুল পথেই চলেছে। যখনই কোন কাজ এই তিনটের প্রতি দৃষ্টি রেখে করা হয় তখন সেই কাজই শ্রেষ্ঠ কাজে পরিণত হয় – আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে, ধর্মের দৃষ্টিতে আর সামাজিক দৃষ্টিতে। যদি সামাজিক দৃষ্টি না নিয়েও করা হয় অন্তত আধ্যাত্মিক ও ধর্মীয় মনোভাব নিয়ে করা উচিৎ, যদি ধর্মীয় মনোভাবও না থাকে তাহলে আধ্যাত্মিকতার মনোভাব যেন থাকে। কিন্তু যখনই কোন কাজ করার সময় মনে হয় সামাজিক ক্ষেত্রে যদিও অনুমোদন থাকে কিন্তু এটা পাপ কর্ম, তখন সেই কর্ম কখনই করা উচিৎ নয়। যদি আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে এই কর্ম আমাকে মাটিতে ফেলে দেবে, তখনও সেই কর্ম করতে যাওয়া একেবারেই ঠিক হবে না। আবার এই কর্ম করলে আমার স্বর্গ প্রাপ্তি হবে কিন্তু আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে কর্মটি ভালো নয়, সেই কর্মটিও করা উচিৎ হবে না।

সবার উপরে রাখতে হবে আধ্যাত্মিক কর্ম, তারপর আধ্যাত্মিক ও ধর্মীয় কর্ম তারপরের স্থান হচ্ছে আধ্যাত্মিক, ধর্মীয় ও সামাজিক কর্ম। যেমন কেউ একজন সন্ন্যাসী হতে চাইছে, তখন তার বাবা-মা তিরস্কার করছে, আত্মীয়-স্বজনরা নিন্দা করছে, অর্থাৎ সামাজিক দিক দিয়ে অনেক আপত্তি আসছে, কিন্তু আধ্যাত্মিকতার দিক দিয়ে তাকে উন্নত জীবনচর্চার সুযোগ করে দিচ্ছে। অথচ সন্ন্যাসী হয়ে সেই যখন সন্ন্যাসের আদর্শ জীবন যাপনের সাফল্য অর্জন করে দৃষ্টান্ত স্থাপন করছে তখন এই সমাজই তাকে স্বীকৃতি দিয়ে দিচ্ছে, সেইজন্য আধ্যাত্মিকতাকে প্রথম সুযোগ দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু যদি আধ্যাত্মিকতা, ধর্মীয় ও সামাজিকতা এই তিনটে দিক দিয়েই যে কাজ করা হয় সেই কাজটাই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ কাজ, এর মত উৎকৃষ্ঠ কর্ম হয়ই না।

**অবাচ্যবাদাংশ্চ বহূন্ বদিষ্যন্তি তবাহিতাঃ। নিন্দন্তস্তব সামর্থ্যং ততো দুঃখতরং নু কিম্।।৩৬।।**

তুমি যদি স্বধর্ম পালন না করে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যাও, তখন তোমার শত্রুরা তোমার ক্ষমতার ব্যাপারে নিন্দা করে যা বলার নয় তাই বলবে। তোমার আড়ালে যখন তোমার নিন্দা করতে থাকবে তখন সবাই ভাববে, এই লোকটাকে আমরা এতদিন সম্মান করে এসেছি! *নিন্দন্তস্তব সামর্থ্যং*, তোমার সামর্থ্য, তোমার ক্ষমতার দৌড় কতখানি তাই নিয়ে তারা সরব হবে, এর থেকে দুঃখের আর কি হতে পারে! পেছনে সবাই তোমাকে ছ্যা ছ্যা করবে। যারা যোগ্য লোক, যাদের জীবনে অনেক কীর্তি আছে, আড়ালে তাদেরকে সবাই যদি কোন কাজের জন্য ছ্যা ছ্যা করে, এর থেকে বড় দুঃখ আর কিছু নেই।

অর্জুন যদি যুদ্ধ না করে পালিয়ে আসতেন তখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে গিয়ে বোঝাতেন যে এ রকমটি করো না, কিন্তু এখানকার পরিস্থিতি হচ্ছে অর্জুন জিজ্ঞেস করছে আমার পক্ষে কোনটা ভাল, যুদ্ধ করাটা ঠিক, না যুদ্ধ থেকে সরে আসাটা ঠিক। এখানে আমাদের আবার মনে রাখতে হবে যে, শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু একবারও অর্জুনকে যুদ্ধ করতে বলছেন না। অর্জুন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়েই এসেছেন, নতুন করে যুদ্ধ করতে বলার আর কোন প্রয়োজনই নেই। কিন্তু যুদ্ধ ক্ষেত্রে আত্মীয়-স্বজন, বন্ধ-বান্ধবদের দেখার পর শোক আর মোহ অর্জুনকে আচ্ছন্ন করে দিয়েছে। তারপর বলছেন, এই শোক আর মোহের থাবা থেকে আমি কি করে মুক্ত হতে পারি। এরই উত্তর শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে দিচ্ছেন। অর্জুনকে যুদ্ধ করার জন্য উপদেশ দেওয়া হচ্ছে না, উপদেশ দেওয়া হচ্ছে অর্জুন কিভাবে শোক আর মোহ থেকে বেরিয়ে আসবে, যুদ্ধের জন্য অর্জুনকে প্ররোচিত করা হচ্ছে না। গীতার সব উপদেশ দেওয়ার পর যখন দেখছেন অর্জুনের শোক আর মোহ নিবারণ হয়ে গেছে তখন অর্জুনকে বলছেন – *বিমৃশ্যৈতদশেষেণ যথেচ্ছসি তথা কুরু* – আমার যা উপদেশ দেওয়ার দিলাম এবার তুমি বিবেচনা করে তোমার যা ইচ্ছে হয় কর। অর্জুন বলছেন – *করিষ্যে বচনং তব* – আমি আপনার উপদেশই পালন করব। গীতা অধ্যয়ণের সময় আমাদের এই ব্যাপার গুলোকে খুব ভালো করে মনে রাখতে হবে, শ্রীকৃষ্ণ আদপেই অর্জুনকে যুদ্ধ করতে উৎসাহিত করবার জন্য উপদেশ দেননি। অর্জুন যদি বিরাট রাজার দরবারেই, যেখানে যুদ্ধ নিয়ে সবাই আলোচনা হয়েছিল, সেখানে বলে দিত আমি যুদ্ধ করব না, তখন শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু এই উপদেশ দিতে যেতেন না। কিন্তু এখন আর এই মুহূর্তে 'যুদ্ধ করব না' এই কথা বলা যাবে না। কেন বলা যাবে না, সেটাকে পরিষ্কার করে বোঝাবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ দেখিয়ে দিলেন সামাজিক দৃষ্টিতে কি কি দোষ হবে, ধর্মের দিক থেকে কি কি দোষ, আর আধ্যাত্মিকতার দিক থেকে কি কি দোষ হবে। শেষ দোষ কি? *অবাচ্যবাদাংশ্চ বহূন্*, যে নিন্দা গুলো তোমার প্রতি প্রযোজ্য নয় সেই কথা গুলোই তোমাকে সবাই বলবে, তুমি কাপুরুষ, ভীরু, বিশ্বাসঘাতক, চোর ইত্যাদি কত কি বলবে।

অর্জুন এর আগে প্রশ্ন করেছিল – *ন চৈতদ্‌বিদ্মঃ কতরন্নো গরীয়ো যদ্বা জয়েম যদি বা নো জয়েয়ুঃ* – হে ভগবান, আপনি আমাকে বলুন আমার পক্ষে কোনটা ভালো, যুদ্ধে জয়লাভ করাটা, না কৌরবদের কাছে পরাজিত হওয়া। এই প্রশ্নের পরিসমাপ্তি টেনে ভগবান উত্তর দিচ্ছেন –

**হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্। তস্মাদুত্তিষ্ঠ কৌন্তেয় যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ।।৩৭।।**

এখানে আর আধ্যাত্মিকতার কিছু নেই, এবারে এসে গেছে পুরোপুরি ধর্ম আর সামাজিক ব্যাপার। তুমি যদি যুদ্ধে জয়লাভ কর তাহলে এই পৃথিবী ভোগ করবে আর তুমি যুদ্ধে মারা যাও তাহলে তুমি স্বর্গে যাবে। এখানে পরাজিত হওয়ার কোন প্রশ্নই নেই, আর অর্জুনের তো হেরে যাওয়ার কোন প্রশ্নই নেই, হয় যুদ্ধে জিতবে নয়তো মরবে। তাই এখানে যুদ্ধ না করার কোন প্রশ্নই আসছে না, এখন তুমি দৃঢ় সঙ্কল্প হয়ে যুদ্ধের জন্য উঠে দাঁড়াও। আগেকার দিনের যত বড় বড় বীর যোদ্ধা ছিল, তারা বন্দী হয়ে যাওয়া বা হেরে গিয়ে বেঁচে থাকা, এগুলো তারা কিছুতেই মেনে নিতো না। হয় জিতব নয় মরব, পরাজয় বা বন্দী হয়ে যাওয়া কাকে বলে আমাদের জানা নেই। ক্ষত্রিয়ের এই ভাবটা ভারতে চিরন্তন। গীতার এই ভাব গুলির পরিণতি হচ্ছে আমাদের ভারতের জীবনাদর্শে, হয় জিতব নয় মরব। এরই পরিণতি আমরা বুদ্ধদেবের জীবনেও দেখতে পাই, বলছেন – আমি এই আসনেই হয় সিদ্ধিপ্রাপ্ত হব নয়তো আমার শরীর শুকিয়ে নাশ হয়ে যাবে। হিন্দু ধর্মে পরাজয় ব্যাপারটা অত্যন্ত গর্হিত, ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখা হয়। আমাদের ভারতে সব সময়ই ধর্ম যুদ্ধই হত, অধর্ম যুদ্ধের কোন অনুমতি ভারতে কখনই ছিল না। লোভ, মোহে প্রেরিত হয়ে কোন রাজ্যকে আক্রমণ করে তার ধন সম্পদ লুন্ঠন করাকে ভারত চিরকালই নিন্দা করে এসেছে। কিন্তু এখানে ধর্মযুদ্ধ হচ্ছে।

৩৭ নং শ্লোকে সামাজিক আর ধর্মীয় যুক্তি দিয়েই অর্জুনের ধর্ম সঙ্কটের ব্যাপারটাকে একেবারে শেষ করে দেলেন। পুরো গীতাতে শ্রীকৃষ্ণ কিছুক্ষণের জন্য মাঝখানের কয়েকটি শ্লোকে ধর্মীয় ব্যাপারটাকে নিয়ে এসেছিলেন, যেখানে বলা হয়েছে যে, স্বধর্ম যদি তুমি ঠিক ঠিক পালন কর তাহলে স্বর্গে যাবে। এরপর থেকে কিন্তু পুরো গীতাতে আধ্যাত্মিকতাকে নিয়ে আসা হয়েছে। যেমন এই বর্ণাশ্রম ধর্মকেই পরের দিকে মেলাবেন সাংখ্যযোগের সাথে, মানে বর্ণাশ্রম ধর্মকে রাখলেও স্বর্গ, নরক, পুনর্জন্ম এগুলোকে গৌণ করে দিয়েছেন। এর পরের শ্লোকেই বলছেন –

**সুখদুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ। ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব নৈবং পাপমবাপ্স্যসি।।৩৮।।**

শ্রীকৃষ্ণ এবারে এসে গেলেন নিষ্কাম অনাসক্ত কর্মের প্রারম্ভিক পর্যায়ে। অনাসক্ত কর্ম মানেই হচ্ছে লাভ অলাভ, সুখ দুঃখ, জয় পরাজয় এসব কিছুর থেকে মনকে সরিয়ে আনা। এই ভাব নিয়ে যদি তুমি এখন যুদ্ধ কর তাহলে তোমার কোন পাপ লাগবে না। অর্জুন প্রশ্ন করেছিল আমার জন্য কোনটা ঠিক, শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে প্রথমে বললেন যুদ্ধ করাটাই ঠিক। অর্জুন বলেছিলেন, যুদ্ধে এতো লোকের প্রাণনাশ করতে হবে তাতে আমার পাপ লাগবে, শ্রীকৃষ্ণ এই কথার জবাব এই শ্লোকে দিয়ে দিলেন, তুমি অনাসক্ত হয়ে, নিষ্কাম ভাবে এদের প্রাণনাশ কর তোমার কোন পাপ লাগবে না। নিষ্কাম হওয়া মানে – তুমি লাভ-অলাভ, সুখ-দুঃখ, জয়-পরাজয়, পাপ-পূণ্য এগুলোর কোনটাই চিন্তা করো না। নিষ্কাম কর্মে একটা ভাবকে উদ্দেশ্য করে নিল, আমাকে কি করতে হবে? আমাকে এই করতে হবে। ঠিক আছে, আমি করব, এর পর আর কোন ধরণের বিচার বিবেচনা এর মধ্যে মাথা গলাতে পারবে না। কোন কাজ শুরু করার আগেই আমাদের শারীরিক ও মানসিক শক্তির নব্বুই শতাংশ নষ্ট হয়ে যায় এই বিচার আর বিবেচনাতেই। একটা মেয়ে বিয়ে বাড়িতে যাবে, বিয়ে বাড়িতে যেতে হলে সাজতে হবে, নিশ্চয়ই সাজবে, নারীকে সব সময় সাজগোজ করতে হয়। কিন্তু এখন সাজতে বসে ভাবতে থাকবে আমি এই শাড়িটা পরলে ওরা আমাকে কি ভাববে, এই রঙের ব্লাউজটা যদি পড়ি তাহলে লোকে কি বলবে, এই গয়না গুলো পড়লে আমার বন্ধুরা কি বলবে, কে কি ভাববে এই চিন্তা করতে করতেই তার মাথাটা খারাপ হয়ে যায়। তোমাকে সাজতে হবে, তুমি সাজবে, আমার এই এই জিনিষ আছে এর মধ্যেই নিজের মত সেজে চলে যাও। আমাকে দেখে কে কি বলবে এই নিয়ে আমি কেন চিন্তা করতে যাব। এই মনোভাব নিয়ে সেজে বেরিয়ে এলে তার সৌন্দর্য স্বাভাবিক ভাবেই অনেক বেড়ে যাবে।

বেলুড় মঠের প্রত্যেক সন্ন্যাসীকেই কাজ করতে হয়। তাঁরা যখন কাজ করেন পুরো তেজ নিয়ে কাজ করবেন এখন কাজে সাফল্য এলো কি এলো না তাতে তাঁর ভারি বয়ে গেছে। এর ফলে তাঁর তেজ অনেক বেড়ে যাচ্ছে। যখনই মনের মধ্যে খুঁতখুঁতানি আসবে, এটা করলে ভালো হবে কি হবে না, নব্বুই শতাংশ তেজ ঐখান দিয়েই সাইকেলের টিউবের মত লিক হয়ে বেরিয়ে যায়। মূল কথা হল কর্মের কোন ফল আকাঙ্খা করবে না। মায়েরা যখন রান্না করেন তখন তিনি কি ভাবেন যে আমার স্বামী কি বলবে, আমার সন্তানরা কি বলবে? মায়েরা যখন রান্না করেন তখন কত শান্ত মনে রান্না করেন। কিন্তু রান্না করার সময় যদি সব সময় মাথায় ঘুরতে থাকে কি জানি কেমন হবে, তাহলে কিন্তু নিশ্চিত যে রান্না খারাপ হবেই। কিন্তু মায়েরা যখন ঐভাবে শান্ত মনে রান্না করেন তার কোন কর্ম ফল তাঁদের লাগছে না। বাড়িতে যদি কোন বিশিষ্ট অতিথিকে নিমন্ত্রণ করা হয়েছে, তখন খুব চিন্তা ভাবনা করে

বানাচ্ছেন, সেটা আবার তাঁর কর্ম বন্ধন হয়ে গেল, বন্ধন মানে কর্মফল লেগে গেল। ভালো-মন্দ গুরুত্ব নয়, এইটাই বলছেন, *সুখদুঃখে সমে কৃত্বা*, তোমার জয় হোক পরাজয় হোক কিন্তু মনকে শান্ত রাখ। মনকে শান্ত রেখে, অনাসক্ত ভাবকে নিয়ে যে কোন কাজে যদি প্রবৃত্ত হও তখন সে কর্ম থেকে তোমার *নৈবং পাপমবাপ্স্যসি*, তোমার পাপও হবে না পূণ্যও হবে না। এখানে বিষয় হচ্ছে যুদ্ধ কর্ম, মানুষ মারা কাজ সব থেকে গর্হিত কর্ম, কিন্তু অনাসক্ত হয়ে মানুষকে মারলেও তোমার পাপ লাগবে না। কারণ তুমি যা কিছু করছ ধর্মের জন্য করছ, তোমার ধর্মই বলছে তুমি হত্যা করতে পার। এখানে তোমরা সবাই একজোট হয়েছ কিসের জন্য? একে অপরকে মারার জন্যই একজোট হয়েছ। কিন্তু এর পর যদি তুমি সুখ-দুঃখ, জয়-পরাজয়ে আসক্ত হয়ে যাও তাহলেই কিন্তু তোমার পাপ লাগবে।

এতক্ষণ তোমাকে যা বলা হল, এই কথা গুলো হচ্ছে সাংখ্যযোগের, সাংখ্য মানে জ্ঞান, তোমাকে জ্ঞানযোগের কথা বললাম। মাঝখানে কিছু শ্লোকে সামাজিক আর ধর্মের কথা বলা হয়েছে। এর পর থেকে ভগবান কর্মযোগের কথা বলবেন।

খুব সংক্ষেপে গীতার মূল কথা হচ্ছে – গীতা হচ্ছে মোক্ষ শাস্ত্র। মোক্ষ শাস্ত্রে একটা কথাই নানা ভাবে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলা হয়, আত্মা ছাড়া কিছু নেই। আত্মাই ব্রহ্ম, তিনিই ঈশ্বর। আত্মা, ব্রহ্ম আর ঈশ্বরের কোন প্রভেদ নেই। আত্মা ছাড়া আর কিছু নেই, এই জ্ঞান যাঁর হয়ে গেছে তিনিই পরমহংস। যার এই জ্ঞানটুকু হয়নি কিন্তু বোধটুকু আছে, সে কিন্তু আধ্যাত্মিক পথে অনেক এগিয়ে গেছে, তার আর কর্ম করার দায়ীত্ব নেই। আর যাদের এই বোধ হয়নি, যাদের কাছে কর্তা, কর্ম আর ক্রিয়া এই তিনটি বিষয়ে ভেদ আছে, যাদের আমি তুমি ভেদ রয়েছে, আত্মাই শুধু আছেন এই বোধ যাদের নেই, এদের জন্য কর্মযোগ। যাবতীয় যত যোগ আছে, ভক্তি যোগ, জ্ঞান যোগ, রাজযোগ সবই কর্মযোগের অঙ্গ। কর্তা আর কর্ম যেখানে আলাদা সেটাই কর্মযোগের মধ্যে পড়ে যাবে। গীতায় প্রথমে জ্ঞানের সর্বোচ্চ তত্ত্বের, একমাত্র যেটি সর্বোচ্চ সত্য তার কথা বলে দেওয়া হয়েছে। সর্বোচ্চ লক্ষ্যের কথা বলে দিয়ে এবার ওখানে কিভাবে পৌঁছান যাবে, গীতার বাকী অধ্যায়গুলোতে তারই ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

৩১শে জুলাই ২০১০

অর্জুন প্রথম থেকেই খুব উৎসাহের সাথেই যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছিল। কিন্তু যুদ্ধের ঠিক আগের মুহুর্তে অর্জুন শোক আর মোহ বশতঃ অবসাদগ্রস্ত হয়ে সমস্ত উৎসাহ হারিয়ে ফেলেছে। তখন ভগবান অর্জুনকে ক্লীব ভাব ত্যাগ করে যুদ্ধার্থে উঠে দাঁড়াতে বলছেন, আর বলছেন এই ধরণের কাপুরুষতা তোমার মত বীরের পক্ষে অত্যন্ত অবমাননাকর। পুরো গীতাতে ভগবান অনেকবার বলছেন যে *মামনুস্মর যুধ্য চ*, আমাকে মনে রেখে তুমি যুদ্ধ কর। অর্জুনকে ভগবান ঠিক ঠিক যে উপদেশ দিচ্ছেন, সেই উপদেশ অর্জুনকে যুদ্ধে প্ররোচিত করার জন্য দিচ্ছেন না। যারা গীতার সারগর্ভকে ভালো করে বুঝতে চান, তাদের এই ব্যাপারটা আগে ভালো করে হৃদয়ঙ্গম করতে হবে, বেশির ভাগ লোকেই এই জায়গাটাতে এসে গীতার মূল উদ্দেশ্য ও বক্তব্যকে ভুল বুঝে ফেলেন। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে যদি যুদ্ধ করার জন্যই এই উপদেশ দিতেন তাহলে গীতা কখনই আধ্যাত্মিক শাস্ত্র হত না। যে কোন শাস্ত্রের উদ্দেশ্য যদি অর্থোপার্জন করা, কাম-বাসনার পুর্তি করা হয়, তাহলে সেই শাস্ত্র কখনই আধ্যাত্ম শাস্ত্র হবে না। গীতাতে যদিও অনেকবার ভগবান অর্জুনকে বলছেন যুদ্ধ কর, তার মানে অর্জুন যুদ্ধ করতে চাইছে না আর শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে দিয়ে যুদ্ধ করাতে চাইছেন, ভগবানের শুধু এইটাই উদ্দেশ্য নয়। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, অর্জুন যুদ্ধ করল কি করল না তাতে আমার কি সমস্যা সমাধান হবে গীতা পড়ে। একজন যদি কেউ বিরাট এমবিএ কোর্সে পরীক্ষা দিয়ে ম্যানেজমেন্ট ডিগ্রী নিয়ে পাশ করে তাতে আমার আপনার কি লাভ হচ্ছে। ধর্মশাস্ত্র হছে যেখানে আমার আপনার সবার জীবনের চিরন্তন সমস্যার উপযোগী সমাধানের পথ স্পষ্ট রূপে উল্লেখ রয়েছে। তাহলে গীতার মূল উদ্দেশ্যটা কি? একটাই মূল উদ্দেশ্য – শোক আর মোহ নাশ করা।

শোক আর মোহ এমন জিনিষ, যা প্রত্যেক মানুষের জীবনে সর্বদা লেগেই আছে। প্রশ্ন হতে পারে এই শোক আর মোহের সঙ্গে আধ্যাত্মিকতার কি সম্পর্ক থাকতে পারে? আমাদের প্রত্যেকের যে স্বাভাবিক অবস্থা, এই অবস্থাটাই হচ্ছে আমাদের আধ্যাত্মিক অবস্থা। শোক আর মোহ এই স্বাভাবিক অবস্থাকে ঢেকে দিচ্ছে, কখন খুব গভীর ভাবে। কখন অল্প গভীর ভাবে ঢেকে দিচ্ছে। আমার যে স্বাভাবিক অবস্থা তাকে শোক আর মোহ জানতে দিচ্ছে না। শোক আর মোহের মা হচ্ছে অবিদ্যা, অবিদ্যা থেকে জন্ম নিচ্ছে শোক আর মোহ। অবিদ্যার যখন নাশ হয়ে যাবে তখন আমার যা স্বরূপ সেই স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাব, আমি যা ছিলাম তাই হয়ে যাব। এখন এই শোক আর মোহ নাশের কি উপায়? শোক মোহকে নাশ করার দুটো উপায়। শোক আর মোহের মূলে আছে অবিদ্যা, মানে অজ্ঞান, জ্ঞান দিয়ে এই অজ্ঞানকে দূর করতে হবে। কি জ্ঞান? ঈশ্বরই আছেন, ঈশ্বর ছাড়া দ্বিতীয় আর কোন বস্তুই নাই, এটাই জ্ঞান। এই জ্ঞান যখন এসে যাবে তখন তার অবিদ্যা চলে যাবে, অবিদ্যা চলে গেলে শোক মোহাদি সব আপনা থেকেই খসে পড়ে যাবে।

কিন্তু আমার বোধ হচ্ছে না যে ঈশ্বরই একমাত্র আছেন। ঈশ্বর ছাড়া আর কিছু নেই এটা আমি বুঝতে পারছি না। তখন গীতা আমাদের দ্বিতীয় উপায় বলছেন তুমি তোমার স্বধর্ম পালন কর। কিন্তু গীতার উদ্দেশ্য স্বধর্ম পালন করতে বলা নয়। এই জায়গাটাকে না বুঝতে পারলে গীতার মূল সুর ও গীতার মূল ভাবটাকে কোন দিনই ধরতে পারা যাবে না। আমার স্বাভাবিক অবস্থা

হচ্ছে আমি সেই সচ্চিদানন্দ পরমাত্মার সাথে এক, সচ্চিদানন্দ হচ্ছেন নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত। শুদ্ধ আত্মার এই স্বাভাবিক অবস্থার মাঝখানে একটা পর্দা পড়ে আছে। এই পর্দাকে বলা হচ্ছে অজ্ঞান বা অবিদ্যা। ধর্মগ্রন্থানুসারে আমাদের স্বাভাবিক অবস্থাটা কি? সেটা হচ্ছে – ঈশ্বরই আছেন, আর আমরা কোন না কোন ভাবে এই ঈশ্বরের সঙ্গে এক। এই ঈশ্বরকে আমরা একেক জন একেক ভাবে সম্বোধন করি, কেউ সচ্চিদানন্দ বলছে, কেউ ভগবান বলছে, কেউ আল্লা বলছে, কেউ গড্ বলছে, আমরা শ্রীরামকৃষ্ণ বলছি। ঈশ্বরকে যে নামেই সম্বোধন করা হোক না কেন, আমরা কোন না কোন ভাবে এই ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত। এখন যিনি অদ্বৈতবাদী বেদান্তী, তিনি বলবেন আমি তাঁর সঙ্গে এক, কিন্তু ঈশ্বরের সঙ্গে এক বলা যাবে না, ব্রহ্মের সঙ্গে এক বলা যায়। অদ্বৈতবাদী ছাড়া আর সবাই বলবে আমি ঈশ্বরের সন্তান, আমি ঈশ্বরের দাস, মানে কোন না কোন ভাবে ঈশ্বরের সাথে একটা সম্পর্ক নিয়ে জড়িয়ে আছে। সাধারণ অবস্থায় আমি যে ঈশ্বরের সঙ্গে কোন না কোন ভাবে জড়িয়ে আছি এটা বোঝা যায় না। কেন বোঝা যায় না? আমাদের স্বাভাবিক অবস্থা হচ্ছে ঈশ্বরের সাথে সম্পর্কিত, অজ্ঞান আর অবিদ্যা এই স্বাভাবিক অবস্থাকে ঢেকে রেখেছে বলে আমরা কেউ এই স্বাভাবিক অবস্থাটাকে, ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের একত্বকে বুঝতে পারছি না। যে কোন আধ্যাত্মিক শাস্ত্র, সে বাইবেল হোক, কোরান হোক, ধম্মপদ হোক, তারা এই অজ্ঞান আর অবিদ্যাকে বিভিন্ন ভাবে বলছে। খ্রীশ্চান ধর্মে এই অজ্ঞান আর অবিদ্যাকে বলছে আদম আর ইভের পতন। আদমের কেন পতন হয়েছে? সেই আদি পাপ থেকে তার পতন হয়েছে। আদি পাপটাই হচ্ছে অবিদ্যা। ইসলামেও এই একই জিনিষ বলছে, এরা বলছে গফ্‌লা। গফ্‌লা আর অজ্ঞান একই জিনিষ। কথা সবাই একই বলছে।

এই অজ্ঞান আর অবিদ্যাকে নাশ করতে হবে। অজ্ঞানের নাশ কিভাবে হবে? অজ্ঞানের উল্টো হচ্ছে জ্ঞান, অন্ধকারের বিপরীত হল আলো। ঈশ্বরের সাথে আমার যে নিত্য, শাশ্বত ও চিরন্তন সম্পর্কটা রয়েছে সেটাকে জাগিয়ে দাও তাহলেই অজ্ঞান নাশ হয়ে গেল। এর জন্য দরকার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি। তোমার যদি তীক্ষ্ণ বুদ্ধি না থাকে, কারণ মানুষের বুদ্ধি অত্যন্ত সাধারণ, তাই বলা হয় – হয় তুমি জ্ঞানের অনুশীলন কর, আর জ্ঞানের অনুশীলন করা যদি তোমার দ্বারা না হয় তাহলে স্বধর্ম পালন কর। স্বধর্মের উচ্চাবস্থা হচ্ছে অনাসক্ত, অনাসক্ত হওয়া মানে যা কিছু করলাম তার সব ফল ঈশ্বরে সমর্পণ করে দিলাম। অনাসক্তের নীচে হচ্ছে শুধু স্বধর্ম করে যাওয়া। আর তারও নীচে হচ্ছে স্বধর্ম না করা। এরও নীচে হচ্ছে ধর্ম বলে কিছু নেই বলে মনে করা। এখন প্রত্যেক দিন নাস্তিকরা নিত্য নতুন যুক্তি তক্কো নিয়ে বলছে আমরা এসব কিছুই মানি না। কিন্তু তাতে জ্ঞানীদের কিছু আসে আসে না। মানুক আর নাই মানুক এর ফল কি হবে? অজ্ঞান আর অবিদ্যা। অজ্ঞান আর অবিদ্যার ফল দুটি – শোক আর মোহ।

মানুষ দুঃখ কষ্টে হেঁদিয়ে হেঁদিয়ে কাঁদে। কেন কাঁদে মানুষ? হয় তার শোক হয়েছে, নয় তার মোহ হয়েছে। একটা জিনিষ ছিল, হারিয়ে গেছে, তার জন্য যে দুঃখ হচ্ছে এটাকে বলছে শোক। একটা জিনিষ কাছে নেই, সেটাকে পেতে চাইছি, এইটাই মোহ। আমি প্রমোশন পেতে চাইছি, এটা হয়ে গেল মোহ, আবার চাকরি যদি চলে যায় তখন হবে শোক। এই শোক আর মোহের মাঝখানেই মানুষ ঘুরে বেড়াচ্ছে। মোহ পুর্তির জন্য মানুষ লোভে কাজ করছে। আর যাতে শোক না হয় সেটার জন্যও কাজ করছে। কাজকর্ম মানুষ কেন করে? প্রথম হচ্ছে যাতে শোক না হয় আর যাতে আমার মোহের পুর্তি হয়। কাজে নামলেই আরও নানান অশান্তি, হয়তো আর চার জন আগে থাকতেই ঐ জিনিষটাকে পাওয়ার জন্য দাঁড়িয়ে গেছে, তখন আবার অশান্তি। পুরো জগতে যত কাজকর্ম হচ্ছে সবই এই শোক আর মোহের জন্য, আর যত অশান্তি এই শোক মোহের জন্য। শ্রীনগরে সন্ত্রাসবাদীরা প্রত্যেক দিন মানুষ খুন করছে, মোহের জন্য। কমনওয়েলথ গেমস্ হতে যাচ্ছে সেখানে দুর্নীতিতে ভরে গেছে, মোহের জন্য। শোক মোহের জন্য লোকেরা যখন দুঃখ কষ্ট আঘাত পাচ্ছে, তখন এই দুঃখ কষ্টের বদলা নেওয়ার জন্য একজন আরেকজনের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে। জগতে শোক মোহ ছাড়া আর কিছু নেই। এই শোক আর মোহের জন্মদাত্রী হচ্ছেন অবিদ্যা, অজ্ঞান। শোক মোহের আগুনে যত ইন্ধন দেওয়া হবে তত তার অবিদ্যা অজ্ঞানও বাড়তে থাকবে। একজন বলছে ঠাকুরের কৃপায় দুটো ডাল ভাত হয়ে গেলেই হয়ে যাবে। ডাল ভাতের ব্যবস্থা হয়ে যাওয়ার পর বলছে একটা ভালো বাড়ি পেলেই আমার সব ভাবনা দূর হয়ে যাবে। বাড়ি হয়ে গেলে বলবে একটা মারুতির অল্টো গাড়ি হলে হত। মনের চাহিদার শেষ নেই। এই অবিদ্যাই আমাদের নাচিয়ে চলেছে। ঈশোপনিষদে এই একই কথা বলা হয়, ঈশ্বর ছাড়া আর কিছুই নেই, তাই অবিদ্যারও কোন স্থান নেই। কিন্তু আমরা তো অনেক সেয়ানা, ঠাকুর বলছেন – কাক বড় সেয়ানা কিন্তু সকাল থেকে অপরের উচ্ছিষ্ট খেয়ে বেড়ায়। আমরাও মনে করি আমাদের মত সেয়ানা কেউ নয়, কিন্তু আমরা সবাই সবার উচ্ছিষ্ট খেয়ে বেড়াচ্ছি। আর তাতেই সবাই মনে করছি আমার কত আনন্দ, আমি এখন কোটিপতি, আমি এখন মন্ত্রী, সবাই আমরা নিজেকে কাকের মত সেয়ানা মনে করছি। সবাই উচ্ছিষ্ট খায় না, উচ্ছিষ্ট খাচ্ছেন না এক সন্ন্যাসী। সন্ন্যাসীও বলে, হ্যাঁ আমিও উচ্ছিষ্ট খাচ্ছি, কিন্তু সন্ন্যাসী মৌমাছির মত সাতটা বাড়ি থেকে তাঁর জীবন ধারণের জন্য যতটুকু দরকার সংগ্রহ করবে। আপনার আমার বাড়িতে গেল তাঁকে এক মুঠো কিছু দিয়ে দিলে তাতেই তার কাজ চলে যাবে। অথবা আগেকার দিনে যাদের একটু জমি-জায়গা ছিল, ক্ষেতে যা ফসল হচ্ছে তাতেই তাদের তখন দিন চলে যেত আর একে অপরের সাথে আদান-প্রদান করেই তাদের জীবন স্বাচ্ছন্দে চলে যেত। এর বাইরে আমরা সবাই এঁটো খেয়ে যাচ্ছি। আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে এদের থেকে অপদার্থ আর কেউ নয়।

আমাদের শাস্ত্র একটা কথাই বলছে, তুমি জাগতিকে ক্ষেত্রে যতই উপরে যাও, সব তোমার মোহ থেকেই এসেছে, মোহ ছাড়া আর কিছু নয়। তাই জাগতিক বিপর্যয় এলেই, এবং এটা আসবেই, তখন তুমি ভেঙ্গে পড়বে। আর তা নাহলে তুমি শোক থেকে পালাতে চাইছ। হিন্দু ধর্মে স্বধর্ম পালনকে খুব উচ্চস্থান দেওয়া হয়েছে, কিন্তু কদাচিৎ কখন মুষ্টিমেয় কিছু লোক স্বধর্ম পালন করছে। আইনস্টাইন একজন বিজ্ঞানের শিক্ষক, বিজ্ঞানের নতুন কিছু যখন আবিষ্কার করলেন, তখন তিনি তাঁর নতুন থিসিসটা এমনিই পাঠিয়ে দিলেন, এখানে তাঁর কোন শোক মোহের কিছু হচ্ছে না, কারণ তিনি শিক্ষকের স্বধর্ম পালন করছেন। আমি এটাকে নিয়ে গভীর ভাবে অধ্যয়ণ করেছি, আমি এটাকে নিয়ে গভীরে গিয়ে চিন্তা করেছি, চিন্তা করে আমি বিজ্ঞানের এই তত্ত্বটা পেয়েছি, এটাকে আমি জগতের জন্য দিয়ে দিলাম। এরজন্য আইনস্টাইন কারুর কাছে টাকা চাইছেন না, কে সম্মান করল, কে এই থিয়োরির সমালোচনা করছে সেই নিয়ে তিনি একবারও ভাবছেন না, কারণ তিনি স্বধর্ম পালন করছে, স্বধর্ম পালন করা মানেই হচ্ছে সেখানে শোক আর মোহের কোন কিছু নেই। এখন কত নতুন নতুন থিয়োরি আসছে, আজ একটা থিয়োরি আসছে কাল এই থিয়োরির বিরুদ্ধে আরেকটা থিয়োরি দাঁড় করিয়ে দিচ্ছে। আজকে বলছে বেগুন থেকে ক্যান্সার হবার সম্ভবনা, পরের দিন আরেক দল বিজ্ঞানী বলে দিল বেগুন ক্যান্সারের প্রতিরোধক। এখন মানুষ কোন দিকে যাবে! কারণ ইদানিং যত গবেষণা হচ্ছে সব গবেষণার পেছনে প্রচুর অর্থ ঢালা হচ্ছে। যে গবেষণাতে যত নতুন নতুন তথ্য দিতে পারবে তার তত অর্থ আসবে। এরা সবাই টাকা চাইছে, এরা কেউই স্বধর্ম পালন করছে না, সবাই মোহের জন্য করছে।

এই জগতে এমন কেউই নেই যার জীবনে কখন দুঃখ-কষ্ট অনুভব হয়নি। বুদ্ধদেব এইখান থেকেই তাঁর আধ্যাত্মিক যাত্রা শুরু করেছিলেন, জীবনে দুঃখ, দুঃখ, শুধু দুঃখই আছে। মানুষের সব দুঃখের পেছনে একটাই কারণ হয় শোক, না হয় মোহ। পুরো গীতা জুড়ে শুধু এই কথাই বলা হয়েছে, শোক আর মোহকে কিভাবে দূর করবে। শোক আর মোহের নাশ করার উপায় গীতা বলে দিচ্ছে। যারই এই শরীর ধারণ হয়েছে তাদের প্রত্যেকের শোক আর মোহ আসবেই, যদি না সে রাজা জনকের মত হয়।

শোক আর মোহ এই দুটো এসে গেছে, এখন তার একটা সাধারণ ভূমি থাকতে হবে। বিজ্ঞানের কাছে একটা বড় সমস্যা এতগুলো মৌলিক উপাদান কি করে হয়, কোথাও এর একটা একত্ব থাকতে হবে। দর্শনের কাছেও এই একত্বের ব্যাপারে সমস্যা আছে, যদি দুটো থাকে তাহলে এর একটা মা থাকবে। এখানে এই শোক আর মোহের মা হচ্ছে অজ্ঞান বা অবিদ্যা। অজ্ঞান মানে আমি আমার স্বরূপকে ভুলে গেছি। আমার স্বরূপটা কি? আমি সেই সচ্চিদানন্দের সাথে এক। আমি যদি খ্রীশ্চান হই তাহলে আমি যিশুর সন্তান, যদি আমি মুসলমান হই তাহলে আমি আল্লার সৃষ্টি, কৃষ্ণভক্ত যদি হই তাহলে আমি তাঁর সৃষ্টি, তাঁর সন্তান, তাঁর দাস, সেই একই ব্যাপার। আর যদি অদ্বৈতবাদী বেদান্তী হই তখন আমি বলব সোহহং, আমিই সেই। কিন্তু সম্পর্ক সেই একই। কিন্তু আমার সাথে যিশু, আল্লা, কৃষ্ণের কারুর সাথেই কোন সম্পর্ক নেই, সেইজন্যই এত দুঃখ-কষ্ট। বলছেন, এই শোক আর মোহকে নাশ কর। কিভাবে নাশ করব? তোমার যে বাস্তবিক স্বরূপ, তুমিই যে সেই আত্মা, তুমিই যে সেই সচ্চিদানন্দ, তোমার আসল সত্তাকে তুমি জেনে নাও, সঙ্গে সঙ্গে তোমার শোক মোহজনিত সব দুঃখ-কষ্ট চলে যাবে। তুমি তোমার স্বরূপকে জানতে পারছ না? এই জানতে না পারাটাই হল অবিদ্যা। ঠিক আছে, আমি তোমাকে সহজ পথ দেখাচ্ছি। তুমি তোমার কর্ম করে যাও। কর্ম যখন করতে যাবে তখন তার অনেকগুলো রূপ দেখতে পাবে, যার মধ্যে ভক্তিযোগ, জ্ঞানযোগ, রাজযোগ ও কর্মযোগ সব কিছু আসবে। আরেকটা যেটা আসছে যার মধ্যে কোন যোগের ব্যাপার নেই, যদিও কিছুটা কর্মযোগের ব্যাপার আসছে, সেটা হচ্ছে স্বধর্ম পালন। স্বধর্ম পালনের উচ্চাবস্থা হচ্ছে অনাসক্ত ভাবে কর্ম করা। অনাসক্ত হয়ে যদি নাইই করতে পার, তাহলে আসক্তি নিয়েই কর, কর্ম না করার থেকেও সেটা উন্নত অবস্থা, আর ঐ কর্মের ফল, ভালো-মন্দ যাই হল সব আমাকে অর্পণ করে দাও। আমি জানি তুমি বলবে, আমিতো মন মুখ এক করে ফল অর্পণ করতে পারছি না। মন মুখ এক করে ফল অর্পণ তুমি প্রথমে করতে পারবে না, না পারাটাই স্বাভাবিক, যান্ত্রিক ভাবে মুখে মুখে বলে আমাকে সব অর্পণ করতে থাক, করতে করতে একদিন হৃদয়ের থেকেই অর্পণ করতে পারবে। এখন তুমি দিনের মধ্যে দু'চারটে মিথ্যে কথা বলছ, লোককে গালাগাল দিচ্ছ, এগুলোও আমাকে অর্পণ করতে হবে। এক সময় তোমার মনে হবে – ছিঃ, আমি শ্রীকৃষ্ণকে যত আজেবাজে কর্মের ফল অর্পণ করছি! তখন ঐ কাজ গুলো করার সময় তোমার শরীরটা কেঁপে উঠবে, তার মানে তোমার আধ্যাত্মিক যাত্রা শুরু হল। আস্তে আস্তে তোমার ব্যক্তিত্বের পরিবর্তন হতে শুরু করবে, আস্তে আস্তে তুমি এক অন্য মানুষ হতে থাকবে।

সব জ্ঞান তোমার ভেতরেই আছে, বাইরে থেকে তোমার কোন জ্ঞান হবে না। কিন্তু তার জন্য তোমাকে খাটতে হবে। তোমার যখন জ্ঞান হবে গুরু তখন বলে দেবেন হ্যাঁ বাপু, এখন তোমার হয়েছে। যদি কোন শিষ্য গুরুকে বলে দেয় – আমি আপনার সাথে একমত হতে পারছি না। তখন গুরু বলে দেবেন, তোমার বাপু এখনও সময় হয়নি। কোন গুরু, সেই ব্যাসদেব থেকে শুরু করে শ্রীরামকৃষ্ণ পর্যন্ত, কারুর ক্ষমতা নেই যে আমার আপনার মাথার মধ্যে একটি কথা ঢুকিয়ে দিতে পারবেন। শাস্ত্র আর গুরুর উপদেশ মত যত আমি খাটব তত আমার জ্ঞানের উন্মেষ হতে থাকবে। ঐ জ্ঞান, যেটা আমার মধ্যে এসেছে ওটা ঠিক না ভুল, সেটা

গুরু বলে দেন। স্বামীজী বারবার বলছেন – সমস্ত জ্ঞান তোমার মধ্যেই। আমাদের কাছে শাস্ত্রই গুরু, সেইজন্য বলা হয় শাস্ত্রের সাথে মিলিয়ে নাও।

গীতাতেও প্রথমে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে উচ্চ তত্ত্বের কথা বললেন। বলার পর দেখছেন অর্জুনের কিছুই হচ্ছে না, হবার কথা নয়। তারপর তিনি জাগতিক কর্ম, স্বধর্মের কথা অর্জুনকে ব্যাখ্যা করে দিলেন। দ্যাখো, অর্জুন তুমি যদি জাগতিক দৃষ্টিতে এই স্বধর্ম থেকে বিচ্যুত হয়ে যুদ্ধ না করে সরে পড়, তাহলে লোকে তোমার নিন্দা করবে, এই রকম নিন্দার তুমি একেবারেই উপযুক্ত নও। এর পর গীতার ঠিক ঠিক দর্শন শুরু হচ্ছে। এত সব বলার পর শ্রীকৃষ্ণ বলছেন –

**এষা তেহভিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধির্যোগে ত্বিমাং শৃণু। বুদ্ধ্যা যুক্তো যয়া পার্থ কর্মবন্ধং প্রহাস্যসি।।৩৯।।**

অর্জুনের মধ্যে সংশয় এসেছিল, আমি যে গুরুজনদের বধ করব এতে আমার পাপ হবে, আমি এই পাপ থেকে কিভাবে মুক্তি পাব। তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলছেন, এর আগে তোমাকে যে আত্মার কথা বলা হয়েছে সেটা হচ্ছে সাংখ্যযোগের কথা। তুমি কে, তোমার স্বরূপ কি, এটা যখন সাক্ষাৎ নিজে জেনে গেলে সঙ্গে সঙ্গে তার ফল পেয়ে যাবে। কি ফল পেয়ে যাবে? তোমার শোক আর মোহ চিরদিনের মত খসে যাবে। শোক আর মোহটা কি? আচার্য বলছেন সংসার হেতু। এই শোক আর মোহের জন্যই সংসার চলছে। দেশ বিদেশের যত তেলের খনি আছে, আমেরিকা চাইছে সব তার নিজের হাতে চলে আসুক। সেইজন্য আমেরিকা এর সাথে ওর, ওর সাথে এর লড়াই বাঁধিয়ে দিচ্ছে। এইভাবে চলতে চলতে ওসামা বিন লাদেন তৈরী হয়ে গেল। লাদেনকে মারার জন্য আবার আফগানিস্থানের উপর আক্রমণ চালাল। নানান রকমের রাজনীতির যত খেলা চলছে তার পেছনে একটাই হেতু, তেলের উপর আমেরিকা যেন নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নিতে পারে, এই একটাই মোহ। এই একটা সাধারণ জিনিষ সারা জগতকে নাচিয়ে চলেছে। আমাদের মোহ সব সাধারণ জিনিষের প্রতি, কিন্তু তার প্রতিক্রিয়া খুব গভীরে চলে যায়। আর যদি জ্ঞান হয়ে যায়, আমি সচ্চিদানন্দের সাথে এক, তাহলেই আমি সব মোহ থেকে মুক্ত। রাজার ব্যাটা কক্ষণ ভিক্ষা করে খাবে না। বলে ক্ষিদে পেলে বাঘও ঘাস খায়, কিন্তু সে বাঘ বাঘ নয়। না খেয়ে মরে যাবে বাঘ কখনই ঘাস খাবে ন। যখনই সে জেনে গেল আমি আর সেই পরমাত্মা এক, তখন কিছুতেই আর কামিনী-কাঞ্চনের ভূত দেখবে না। কামিনী-কাঞ্চনই হচ্ছে শোক আর মোহের একমাত্র কারণ। এখানে গীতায় যাকে শোক মোহ বলা হচ্ছে ঠাকুর তাকেই কামিনী-কাঞ্চন বলছেন। কামিনী-কাঞ্চনকে পাওয়ার যে ইচ্ছা তাকে বলছে মোহ, কামিনী-কাঞ্চন হাত থেকে ছিটকে বেরিয়ে গেলে যে দুঃখ হয় সেটাই শোক। কামিনী-কাঞ্চন আর নাম-যশ, ঠাকুর নাম-যশের থেকে কামিনী-কাঞ্চনের কথাই বেশি বলছেন, কারণ নাম-যশের থেকে কামিনী-কাঞ্চন জাগতিক দৃষ্টিতে আরও স্পষ্ট ভাবে বোঝা যায়। যে মানুষ বুঝে গেল আমি সেই পরমাত্মা তখন তাঁর কাছে তিলোত্তমা-রম্ভাকে চিতার ভস্ম মনে হয়।

*এষা তেহভিহিতা সাংখ্যে,* এতক্ষণ তোমাকে সাংখ্যযোগ বললাম, *বুদ্ধির্যোগে ত্বিমাং শৃণু,* এখন তোমাকে বুদ্ধিযোগের কথা বলছি। এখানে অনেকেই একটা জিনিষ ভুল মনে করেন, এই সাংখ্য শব্দটা গীতাতে অনেকবার আসবে, এই সাংখ্য কিন্তু কপিল মুনির সাংখ্য দর্শন নয়, এখানে সাংখ্যের অর্থ হচ্ছে প্রকৃত জ্ঞান, সম্যক জ্ঞান। কপিল মুনির সাংখ্য দর্শনের উদ্দেশ্যও একই, সম্যক জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া। কিন্তু এখানে সাংখ্যযোগ আর সাংখ্য দর্শন দুটো আলাদা। এইজন্য শাস্ত্র যখন ঠিক ঠিক না পড়া হয় তখন সব গুলিয়ে যায়, এরটা ওর ঘাড়ে তারটা ওর ঘাড়ে চেপে যায়। এখন শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বুদ্ধিযোগের কথা বলছেন। বুদ্ধিযোগটাই আসলে কর্মযোগ।

সাংখ্যযোগের মূল বক্তব্য হচ্ছে কর্তা, কর্ম আর ক্রিয়া এক। তার মানে সেখানে বুদ্ধির কিছু ব্যাপার নেই। বুদ্ধি আমি আর তুমিতে বিভেদ নিয়ে আসে। আমি আর তুমির যদি কোন ভেদ না থাকে তখন মনোনাশ হয়ে যায়। যার বুদ্ধির বোধ আছে তার আমি তুমির বোধ থাকবে। কিন্তু আধ্যাত্মিক সত্তাতে আমি তুমির বোধ থাকে না। সেখানে বুদ্ধিরও নাশ হয়ে যায়, আধ্যাত্মিক সত্তার জ্ঞান লাভের ক্ষেত্রে বুদ্ধিকে অতিক্রম করে যেতে হয়। বুদ্ধিকে অতিক্রম না করলে গীতা উপনিষদে যে তত্ত্বের কথা বলা হচ্ছে, সেই তত্ত্ব যুক্তিতে দাঁড়াতেই পারবে না। কেন দাঁড়াতে পারবে না? কারণ বুদ্ধি মানেই আমি তুমি। সেইজন্য শ্রীকৃষ্ণ বলছেন তোমার দ্বারা সাংখ্যযোগ হবে না, মানে তুমি বুদ্ধিকে অতিক্রম করতে পারবে না। তাই তোমাকে বুদ্ধিযোগের কথা বলছি, যেখানে তুমি বুদ্ধি লাগিয়ে আমার কথাকে বুঝতে পারবে।

এই বুদ্ধিযোগ কিভাবে হবে? আচার্য শঙ্কর বলছেন, *নিঃসঙ্গতয়া,* নিঃসঙ্গ হচ্ছে কোন আসক্তি না থাকা, আর *দ্বন্দ্বপ্রহারণপূর্বকম্* কোন ধরণের দ্বন্দ্ব, সুখ-দুঃখ, জন্ম-মৃত্যু, শীত-গ্রীষ্ম এগুলোর দ্বারা তোমার মধ্যে কোন প্রতিক্রিয়া তৈরী হবে না, এগুলোর দিকে মনও দিও না। আর, *ঈশ্বরারাধনার্থে,* যে কাজ গুলো করবে সেই কাজগুলো হচ্ছে ঈশ্বরের আরাধনা। আমি যেটা রান্না করছি, সেটা আমার জন্য নয়, ঠাকুরের জন্য করা হচ্ছে, ঠাকুরকে নিবেদন করে আমরা প্রসাদ পাব। আগেকার দিনে বাড়িতে যখন মাছ মাংস রান্না করা হত তখন বাড়ির বাইরে কাঠের উনুনে রান্না করা হত। এর একটাই কারণ, বাড়িতে যেটা রান্না হত সেটা

পারিবারিক বিগ্রহ দেবতাদের, নারায়ণ, শিব, গোবিন্দ, শ্যামসুন্দর, গিরিধারি, যে নামেই বিগ্রহ দেবতা থাকতেন তাঁকে আগে নিবেদন করা হত, মাছ মাংস ভগবানের বিগ্রহকে ভোগে দেওয়া যাবে না, তাই বাড়িতে ঐ জিনিষ রান্না হবে না। যা কিছু করবে ঈশ্বরের আরাধনার্থেই করবে, স্বধর্ম মানেই তাই। তুমি যখন কাউকে বধ করতে যাচ্ছ, সেটাও ঈশ্বর আরাধনা, বিয়ে করতে যাচ্ছ সেটাও ঈশ্বর আরাধনা, টাকা উপার্জন করবে সেটাও ঈশ্বর আরাধনা, ঈশ্বর আরাধনা না হলে স্বধর্ম হবে না। এইভাবে ঈশ্বর আরাধনার্থে যখন কর্ম হয় তখন এই কর্মই তোমাকে সমাধিযোগ, মানে বুদ্ধিযোগের দিকে নিয়ে যাবে।

বক্তব্য খুব পরিষ্কার, এর আগে আমরা আলোচনা করেছি, কর্তা, কর্ম আর ক্রিয়া এই তিনটে এক, জ্ঞাতা, জ্ঞেয় আর জ্ঞান এক, এটা হচ্ছে জ্ঞানীর অবস্থা। এই অবস্থা কি তোমার হয়েছে? তুমি কি এক দেখছ, তোমার কি বহু দেখা বন্ধ হয়েছে? না হয়নি, আমি দেখছি আমি আলাদা আপনি আলাদা। তার মানে ঐ সাংখ্য জ্ঞান এখন তোমার জন্য নয়। সাংখ্যযোগ তাহলে কাদের জন্য? শুকদেবাদিদের জন্য, সনক, সনকাদিদের জন্য, স্বামী বিবেকানন্দের জন্য। তাহলে সাধারণ লোকেদের জন্য কি? সাধারণ লোকেদের জন্যই এখন বলা হচ্ছে। আমার জন্য সাংখ্যযোগ নয়, তার মানে এই নয় যে আমি এই যোগকে জানতে পারব না। অর্জুনের সময় হয়নি কিন্তু ভগবান তাঁকে জানিয়ে দিলেন। ঠাকুর বলছেন – সময় না হলে কিছুই হয় না, কিন্তু শুনে রাখা ভাল। অর্জুনকে শুনিয়ে দিয়ে এইবারে অর্জুনের পক্ষে যেটা কার্যকরী, উপযুক্ত পথ সেই বুদ্ধিযোগের কথা বলছেন। বুদ্ধিযোগ মানে কর্মযোগকেই বোঝায়, যে জিনিষটা বুদ্ধির সাহায্যে করা হয়। এর আগের যোগ হচ্ছে আত্মজ্ঞানের অবস্থা, আত্মজ্ঞানের অবস্থায় কোন কার্য হয় না। বুদ্ধিযোগ তাহলে কি? তুমি কর্ম কর। কিভাবে কর্ম করব? আচার্য শঙ্কর বলছেন নিঃসঙ্গতয়া, কোন আসক্তি থাকবে না। আর কোন ধরণের দ্বন্দ্ব থাকবে না, সফলতায় উৎফুল্ল হবে না, অসফল হলে মন খারপ করে ভেঙ্গে পড়বে না। আর যে কাজই করা হবে সেটা হবে ঈশ্বরের আরাধনা। অনেকে মন্তব্য করেন যে শঙ্কারাচার্যের মধ্যে ভক্তির ব্যাপারটা ছিল না। কিন্তু তা নয়, শঙ্কারাচার্য যখনই কর্মযোগের কথা বলছেন শুধু ভক্তি, ভক্তির কথাই শুধু বলে গেছেন, যা কিছু করবে ঈশ্বরের আরাধনার্থে করবে। আমরা এখানে শাস্ত্র পাঠ করছি কেন? ঈশ্বরের আরাধনার্থে। আচার্য কেন পড়াচ্ছেন? ঈশ্বর আরাধনার্থে। রান্না করছি, ঠাকুরের পূজো, গালাগাল দিচ্ছি ঠাকুরের পূজো। কিন্তু ছোটবেলা থেকে আমাদের যে সংস্কার তৈরী হয়ে আছে সেই সংস্কার বলছে গালাগাল দেওয়ার সময় ঠাকুরের পূজা হয় না। সংস্কারটা কোথা থেকে তৈরী হল? কারণ শাস্ত্র বলছে ঐ জিনিষটা দিয়ে পূজো হয় না। ষোড়শ অধ্যায়ে ভগবান বলে দিচ্ছেন এই এই জিনিষ গুলো করা যায়না। যে কাজগুলো করা যায় না, সেই কাজ দিয়ে ঈশ্বরের পূজো হয় না। তবে কর্মসূত্রে অনেকের এমন এমন জায়গায় কাজ করতে হয় যে তাদের দু'চারটে মন্দ কথা বলতে হয়, আবার কাউকে গালাগালও দিতে হয় কাজ আদায় করবার জন্য, সেগুলো আর ঠাকুরকে দেওয়া যায় না, দেওয়ার কথাও নয়। তখন আর কি করবে, ঠাকুরকে তখন বলতে হয়, হে ঠাকুর আমাকে নিরূপায় হয়ে এইভাবেই তোমার পূজো করতে হচ্ছে। আমি যে শোক আর মোহে পড়ে কাউকে গালাগাল দিচ্ছি তা নয়, এটা না করলে আমার কর্তব্য কর্মে অবহেলা হয়ে যাবে। তখন ঠাকুর কিছু দিন দেখার পর দেখেন যে এর এখানে বড় কষ্ট হচ্ছে, ঠিক আছে, তখন তিনি নিজে তার কাজের জায়গাটা পাল্টে দেন। যারা ঠিক ঠিক ভক্ত, তাদের যদি কোন পরিস্থিতিতে সাধনায় অনেক বিঘ্ন আসে তখন ঠাকুর তার ঐ পরিস্থিতিটাকে অন্য রকম করে দিয়ে সাধনার অনুকূল পরিস্থিতি করে দেন।

এই যোগ বিষয়ক বুদ্ধি, কর্মযোগের যে বুদ্ধি, এতে ঈশ্বর প্রসাদ নিমিত্ত জ্ঞান প্রাপ্তি হয়, তখন ঈশ্বরের কৃপা হয়, ঈশ্বরের কৃপাতেই তার জ্ঞান প্রাপ্তি হয়। এই জ্ঞান আর সাংখ্যযোগের জ্ঞান একই বলা হচ্ছে। এইখানেই আচার্য এটাকে পরিষ্কার করে দিয়ে বলছে সাংখ্যযোগীরা যেখানে যান, কর্মযোগীরাও সেইখানে যান। আমাদের সমস্য হচ্ছে অজ্ঞানতাকে নিয়ে। গীতা, মহাভারত, রামায়ণ, বাইবেল, কোরান সবাই এই অজ্ঞান অবিদ্যাকে নিয়েই আলোচনা করে গেছে। আত্মজ্ঞানে কর্তা, কর্ম আর ক্রিয়া এই তিনটে এক, মানে আত্মা ছাড়া কিছুই নেই, এই জগতে যত রূপ আছে, যত নাম আছে সবই ঈশ্বরেরই রূপ আর নাম। এই বোধ যখন পুরোপুরি এসে যায় তখন তার কর্তা, কর্ম আর ক্রিয়া বলে কিছু থাকে না। এই জ্ঞান যখন না থাকে তখন আসছে কর্মযোগ। কর্মযোগ করার সময় ঈশ্বরের কৃপা দরকার। তার কারণ যার মধ্যে কর্তা আর কর্মের ভেদ রয়েছে সে কখনই এই ভেদকে নিজে থেকে দূর করতে পারেনা, এই ভেদকে দূর করতে একমাত্র ঈশ্বরই পারেন। তিনি যাকে যখন বুঝবেন তখন তাঁর ইচ্ছা হলে তিনি কৃপা করে তার ভেতর থেকে কর্তা আর কর্মের ভেদটাকে দূর করে দেবেন। যখন কেউ জ্ঞানযোগ করছেন, রাজযোগ, ভক্তিযোগ বা কর্মযোগ করছেন, কেউ খ্রীশ্চান মতে, কেউ শিখ মতে কেউ ইসলাম মতে সাধনা করে যাচ্ছে, তখন ভগবান তাদের মধ্যে কয়েকটি অবস্থাকে দেখে নেন, সে অনাসক্ত হয়ে গেছে কিনা, দ্বন্দ্ব রহিত হয়ে গেছে কিনা, ঈশ্বরের সেবা মাত্র করছি এই বোধে সব কাজ করে যাচ্ছে কিনা, এই জিনিষগুলো যখন কোন সাধকের মধ্যে এসে যায় তখন ঈশ্বর তার প্রতি কৃপা বর্ষণ করে ঐ দুই বোধটা নাশ করে দেন। অজ্ঞান নাশ মানেই হচ্ছে এই দুই বোধের নাশ। কারুর কারুর এটা নিজে থেকে হয় আর বেশির ভাগ লোকের এটা ঈশ্বরের কৃপাতে হয়। এই সংসারে আমাদের সবারই এই দুই বোধ আছে, দুই বোধ মানে আমি তুমি বোধ, আমি তুমি বোধ মানেই হচ্ছে কর্তা আর কর্ম, কর্ম এখানে মানে কারকের দ্বিতীয়া, বাংলার কর্ম নয়, Subject and Object। কদাচিৎ একশ বছরে কখন কেউ আসেন যার এই দুই বোধ আর থাকে না।

ঠাকুর বলছেন জ্ঞানী মুখে বললেই জ্ঞানী হয় না, জ্ঞানীর লক্ষণ আছে, সবাই জ্ঞানী হতে পারেনা। তাহলে কি হতে পারে? ভক্ত হতে পারে, ভক্ত বলতে কর্মযোগীকেই বোঝায়। ঈশ্বর কৃপা করলে ভক্তেরও জ্ঞান প্রাপ্তি হয়। জ্ঞান প্রাপ্তিতে ভক্তের সব বন্ধন কেটে যায়। কিসের বন্ধন কাটে? ধর্মের বন্ধন ও অধর্মের বন্ধন। কারণ ধর্মটাও বন্ধন আবার অধর্মটাও বন্ধন। আমি খারাপ কাজ যখন করছি তখন সেই কাজটাও আমার মনের গভীরে গিয়ে একটা ছাপ রেখে চলে যাচ্ছে, ভালো কাজও ছাপ রেখে যাচ্ছে। গীতার চতুর্দশ অধ্যায়ে ভগবান এইটাই বলছেন – *সুখসঙ্গেন বধ্নাতি জ্ঞানসঙ্গেন চানঘ* – সত্ত্বগুণ যখন বৃদ্ধি হয় তখন তার সুখটাকে ভালো লাগে 'আমি সুখী' এই বোধ হয় আর তার জ্ঞান ভালো লাগে, জ্ঞানের আসক্তি আত্মাকে বন্ধনে ফেলে দেয়। কিন্তু অধ্যাত্ম হচ্ছে ত্রিগুণের পার, সত্ত্বগুণকেও ছাড়িয়ে যেতে হবে, ধর্ম অধর্মের পারে, পূণ্য অপূণ্যের পারে যেতে হবে। এগুলো শুধু মাত্র শুনে ধারণা করা যায় না, অত্যন্ত কঠিণ জিনিষ।

এর ভালো উদাহরণ হচ্ছে – মনে করা যাক সূর্যে একজন একটা বাড়ি বানিয়েছে, ধরে নিচ্ছি তার শরীর সূর্যের তাপ সহ্য করার উপযোগী। এখন সে গিয়ে সুর্যে কি সব সময় দিন দেখবে না রাতও দেখবে? তার কাছে দিন রাত কোনটাই থাকবে না। এই পৃথিবীতে আমাদের রাতের বোধও আছে দিনের বোধও আছে। কিন্তু যে সূর্যে বাস করছে তাকে যদি জিজ্ঞেস করা হয় এখানে কতক্ষণ দিন হয় আর কতক্ষণ রাত হয়? সে অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করবে – দিন রাত! দিনটাই কি আর রাতটাই বা কি? তার কাছে দিন-রাতের কোন বোধই নেই। আমরা তাহলে কি ধরে নেব সূর্যে সব সময় দিন থাকবে? না, সব সময় দিন থাকবে এই কথাও বলা যাবে না। সূর্যে যে অবস্থাটা সেটা হচ্ছে দিন-রাতের পারের অবস্থা। যেখানে সূর্যের আলো পড়ছে আবার আলো সরে যায় সেখানে দিন আর রাতের বোধ হবে। কিন্তু সূর্যের যারা বাসিন্দা তাদের কাছে দিন রাতের কোন ধারণাই থাকবে না। একজন কুস্তিগীর কুস্তি করা ছেড়ে দিয়েছে, এখন সে কুস্তিতে জেতা হারার পারে। আগে যখন কুস্তি লড়ত তখন অনেক জিতেছে অনেক হেরেছে, এখন কুস্তি লড়ে না, তাই জেতা হারার প্রশ্নই নেই, মানে জেতা হারার পারে চলে গেছে। যিনি ব্রহ্মজ্ঞানী হয়ে গেলেন তিনি বলবেন আমি ধর্ম অধর্মের পারে চলে গেছি। আগে আমি অনেক ধর্ম করেছি, অধর্মও করেছি, এখন ধর্ম অধর্মের পার।

গীতাতে যে কর্মযোগের কথা বলা হচ্ছে, এর তিনটি শর্ত আছে – প্রথম হচ্ছে অনাসক্তি। দ্বিতীয় দ্বন্দ্ব রহিত, মানে সুখে বা দুঃখে তার মন চঞ্চল হবে না, হারলেও চঞ্চল হবে না, জিতলেও লাফাবে না। যিনি ব্রহ্মজ্ঞানী তিনি দেখেন এই যত দ্বন্দ্বমূলক বিষয় আছে এর সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। ব্রহ্মজ্ঞানী যদি মাংস ভাতও খান, তিনি দেখবেন তাঁর মুখ এগুলো খেয়েছে, মুখ, জিহ্বা এগুলো তো ইন্দ্রিয়, আমি তো ইন্দ্রিয় নই, আমার সাথে এদের কোন সম্পর্কই নেই। আর মাংস ভাত না দিয়ে শুকনো মুড়ি আর লঙ্কা খেতে দিলেও তাঁর একই মনে হবে, তাতেও কিছুই আসবে না তাঁর। ব্রহ্মজ্ঞানীর এটা স্বাভাবিক, সাধারণ লোকেদের এগুলোকে সাধনা করতে হয়। আমাকে একজন মহারাজ একটা প্যাকেট দিয়ে বললেন – এই প্যাকেটটা মঠের অমুক মহারাজকে দিয়ে দেবেন। আমি প্যাকেটটা নিয়ে তাঁর হাতে দিলাম। উনি প্যাকেটটা খুলে দেখলেন ওর মধ্যে একটা পচা কমলালেবু রাখা আছে। এখানে পচা কমলালেবু থাকাতে আমার কোন ব্যাপার নেই, যে পাঠিয়েছে আর যে পেল এটা তাদের ব্যাপার, আমার কিছুই ব্যাপার নয়। আমি যখন কর্মযোগ করছি সেটাই এখানে তৃতীয় শর্ত – ঈশ্বরারাধনার্থম্, ঈশ্বর আরাধণার জন্য। যে কাজটাই করছি মনে করতে হবে এটা ঠাকুরের কাজ। এই যে আমাকে একটা প্যাকেট দেওয়া হল পোঁছে দেওয়ার জন্য, এখন আমি রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে প্যাকেটটাকে লোফালুফি করতে করতে যাচ্ছি। প্যাকেটটা খুলে গেল, লেবুটা রাস্তায় পড়ে গেল। রাস্তাতে ফেলে দেওয়ার জন্য আমাকে প্যাকেটটা দেওয়া হয়নি। কাজটা আমাকে ঠিক ভাবে করতে হবে। এরপর প্যাকেট থেকে কি বেরোল না বেরোল তার দায়ীত্ব আমার নয়, কিন্তু ঠিক মত পোঁছে দেওয়াটা আমার দায়ীত্ব। যে কোন কাজই আমি করব সেই কাজের ফল কি হল না হল তার জন্য আমি চিন্তা করব না, এটাই এখানে বলা হচ্ছে। যে কোন কাজ, আমি যখন স্বধর্ম রূপে কোন কাজ করছি তখন পুরো মন, প্রাণ, বুদ্ধি দিয়ে সেই কাজটা করতে হবে। এই কাজ থেকে যে ফল হবে, কাজের পরিণাম যাই হোক, সুখ-দুঃখ, আনন্দ-নিরানন্দ, উচ্ছাস, হতাশ ভাব হবে এর কোনটাই যেন আমাকে স্পর্শ না করে। যদি কিছুই স্পর্শ না করে তাহলে বুঝতে হবে যে ঠিক ঠিক কর্মযোগ হচ্ছে। আর যে কাজটা করলে ঈশ্বরের পূজা হবে না, যে কাজটাকে ঈশ্বরের পূজা রূপে নেওয়া যাবে না, সেই কাজ করব না। এই তিনটিই হচ্ছে কর্মযোগের শর্ত।

এই তিনটেকে পূরণ করে যদি কর্ম করা হয় তখন আমার ধর্ম অধর্মের বন্ধনটা কেটে যাবে, পাপ-পূণ্যের বোধ চলে যাবে। এরপর ভগবান এই কর্মযোগের প্রশংসা করে বলছেন –

**নেহাভিক্রমনাশোহস্তি প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে। স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ।।৪০।।**

*স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য*, এই তিনটে জিনিষের অনুশীলনের মাধ্যমে যদি একটু সামান্যতম কর্মযোগের সাধনা করতে পারা যায় তাতেই মন চাঙ্গা হয়ে যাবে, ব্যক্তিত্বে আমূল পরিবর্তন এসে যাবে। *নেহাভিক্রমনাশোহস্তি* – *অভিক্রমনাশোহস্তি*, যেমন চাষীরা চাষের জন্য মাটিতে কিছু বীজ ছড়িয়ে দিল। সেই বছর আর বৃষ্টি হল না, বৃষ্টি না হওয়াতে বীজটা আস্তে আস্তে শুকিয়ে নষ্ট হয়ে গেল। কিন্তু

কর্মযোগে কোন কিছুই এই ভাবে চাষের বীজের মত নষ্ট হয়ে যায় না। কর্মযোগের একটুও যদি সাধনা করা থাকে তাহলে তার ব্যক্তিত্ব তৈরী করে দেবে, যে ব্যক্তিত্বটা তৈরী হয়ে গেলে সেটা আর কখনই নষ্ট হয়ে যাবে না। সাইকেল চালান, সাঁতার কাটা শিখলে আর কখন ভুলে যায় না। *প্রত্যবায়ো ন বিদ্যত* – প্রত্যবায় হচ্ছে উল্টো ফল, যদি আমি ভুল ওষুধ সেবন করে ফেলি, তাহলে আমার শরীর খারাপ হবে, কর্মযোগে সেটা হবে না। যারা ব্রাহ্মণ তাঁরা সন্ধ্যা-বন্দনাদি করেন, গায়ত্রীমন্ত্র জপ করেন, এগুলো করলে কোন পূণ্য হয় না, কিন্তু এগুলো না করলে প্রত্যবায় হবে, অকরণে প্রত্যবায়, করেনি বলে পাপ লেগেছে। কিন্তু কর্মযোগে এটা হয় না। গুরু আমাকে আদেশ দিয়েছেন সকাল আর বিকেলে নিয়মিত জপ করবে। সকাল বিকেল জপ করলে কিন্তু আমার কোন পূণ্য হবে না, যদি জপ না করি তাহলে পাপ হবে। কিন্তু কর্মযোগ আমি একদিন করলাম পরে এক মাস হয়তো করলাম না, তার জন্য কোন পাপ হবে না। আবার এক মাস পরে মনে পড়ল যে আমাকে আচার্য কি যেন করতে বলেছিলেন, ঠিক আছে আবার সেই সাধনাটা করা যাক। যেমনি সাধনা শুরু করলাম আবার আমি এগোতে থাকব। এই শ্লোকের মূল বক্তব্য এইটাই। আর বলছেন *ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ* - এই কর্মযোগের সামান্য একটু যদি তুমি সাধনা করতে থাক কিছু দিনের মধ্যে জন্ম-মৃত্যু চক্রের যে সংসারভয়, এই ভয়টা কেটে যাবে। কর্মযোগের কিছু কিছু বৈশিষ্ট্যগুলি ব্যাখ্যা করে পরিষ্কার করে দিচ্ছেন। পরের শ্লোকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলছেন –

**ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন। বহুশাখা হ্যনন্তাশ্চ বুদ্ধয়োঽব্যবসায়িনাম্।।৪১।।**

এখানে দুই রকম বুদ্ধির কথা বলা হচ্ছে – ব্যবসায়িক বুদ্ধি আর অব্যবসায়িক বুদ্ধি। ব্যবসায়িক বুদ্ধি মানে যাদের বুদ্ধি এক দিকে লেগে আছে, এই বুদ্ধি যাঁদের আছে তাঁরাই হচ্ছেন যোগী, যোগীর বুদ্ধি একটা দিকেই যায়, সেই একটা দিক হচ্ছে ঈশ্বর, ঈশ্বর ছাড়া যোগীর মন অন্য কোন দিকে যায় না। অব্যবসায়িক বুদ্ধি হচ্ছে, যাদের বুদ্ধি বহুশাখা, বহুশাখা বলতে বোঝায়, যেমন কোন গাছ এক ডেলে হয়, একটাই কাণ্ড, তালগাছ, নারকেল গাছ ইত্যাদি। বেশির ভাগ গাছেরই অনেক ডালপালা থাকে, একটা ডাল থেকে আরও অনেক শাখা প্রশাখা বেরিয়েছে, এই গাছকে বলা হচ্ছে বহুশাখা বিশিষ্ট গাছ। যাদের বুদ্ধি অব্যবসায়ী, তাদের বুদ্ধি দশ দিকে লেগে আছে, বুদ্ধির বহুশাখা হয়ে আছে। এখন নতুন একটা শব্দ বেরিয়েছে multi-tasking, আজকালকারর ছেলেরা একদিকে কম্প্যুটারে কাজ করছে, কানে একটা মোবাইল ফোন সেখানে কথা বলে যাচ্ছে, কম্প্যুটারের টেবিলে চাও রাখা আছে, কখন কখন চায়েও চুমুক দিচ্ছে, পাশে একজন বসে আছে তার সাথে আড্ডাও মেরে যাচ্ছে, সাথে সাথে আরও কত কি করে যাচ্ছে। যে multi-tasking কে ধরে নিয়েছে তার জীবন সর্বনাশের দিকে এগিয়ে গেল। এই multi-tasking কে বন্ধ করতে হবে। কিন্তু ম্যানেজমেন্ট কোর্সে প্রথমেই ট্রেনিং দেওয়া হয় কিভাবে এই multi-tasking এর দ্বারা একসাথে অনেক কাজ হাতে নিয়ে সব দিকে সামলাতে হবে। কিন্তু গীতা বলছে – *বহুশাখা হ্যনন্তাশ্চ*, অব্যবসায়িক বুদ্ধি যদি হয় তাহলে বহুশাখা, একই সময়ে যদি পাঁচ দিকে মন দিয়েছ তাহলে তুমি নিশ্চিত হয়ে যাও তোমার অসাফল্যই আসছে। আর তুমি যদি জীবনে তোমার পতন চাও, তাহলে পাঁচটা দিকে এক সঙ্গে মন দাও। আর যদি সাফল্য পেতে চাও তাহলে একটা দিকে মন দাও। স্বামীজী এর খুব সুন্দর ব্যাখ্যা করে বলছেন – একটু ওখান থেকে একটু সেখান থেকে নেওয়াটা বন্ধ কর, একটা ভাবকে অবলম্বন করে এগিয়ে চল আর ওতেই ডুবে যাও। এটাই হচ্ছে কর্মযোগে গীতার মত।

নিউম্যান বলে একজন খুব বড় পদার্থ বিজ্ঞানী ছিলেন, নোবেল প্রাইজও পেয়েছিলেন। এ্যটম বোমার প্রজেক্টেও তিনি যুক্ত ছিলেন, মূলতঃ তিনি গাণিতজ্ঞ ছিলেন। নিউম্যানকে এই শতাব্দীর একজন বড় প্রতিভাশালী বিজ্ঞানী বলে মনে করা হয়, যদিও তাঁর নাম খুব একটা প্রচারের আলোতে আসেনি। তিনি পদার্থের উপর অত বড় বিজ্ঞানী, কিন্তু হঠাৎ তাঁর কি মনে হল, এইসব আমি কি আলতু ফালতু কাজ করছি, তিনি পদার্থ বিজ্ঞানের কাজ ছেড়ে দিয়ে অর্থনীতিতে ঢুকে পড়লেন। দশ বছর অর্থনীতিতে থাকার পর উনি নতুন নতুন থিয়োরি দিতে শুরু করলেন, পরের দিকে এই থিয়োরি গুলিকে গবেষণা করে অন্যরা নোবেল প্রাইজ পেয়েছিল। এত বড় বিজ্ঞানী নিউম্যান, যেদিন ফিজিক্স বন্ধ করে দিলেন, তারপর দিন থেকে আর ফিজিক্সের দিকে তাকাননি, ইকনমিকসের বাইরে তিনি আর কিছুই জানেন না। একটা জিনিষকে যখন ধরে নিল ঐটাকে নিয়েই পড়ে থাকতে হবে।

এতক্ষণ কর্মযোগ আর আত্মজ্ঞানীর সম্পর্ক কিভাবে হয় সেটা বলা হল। এরপর ৪২ থেকে ৪৫ শ্লোকে বেদে যে বিভিন্ন যজ্ঞ-যাগের কথা বলে মানুষের মনকে আকৃষ্ট করা হয়েছে, তার সমালোচনা করা হচ্ছে।

**যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ। বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতিবাদিনঃ।।৪২।।**
**কামাত্মানঃ স্বর্গপরা জন্মকর্মফলপ্রদাম্। ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ভোগৈশ্বর্যগতিং প্রতি।।৪৩।।**
**ভোগৈশ্বর্যপ্রসক্তানাং তয়াপহৃতচেতসাম্। ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে।।৪৪।।**

বেদে বিভিন্ন যাগযজ্ঞের কথা বলা হয়েছে, তুমি এই যজ্ঞ কর এই স্বর্গে যাবে, এই যজ্ঞ কর তুমি ঐশ্বর্য পাবে, এই যজ্ঞ কর এই ভোগ করতে পারবে। যাদের চিত্ত বেদের এই সব মনোমুগ্ধকর বাক্যে মোহিত হয়ে ভোগে আসক্ত হয়ে পড়ে থাকে তাদের ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি হয় না, বুদ্ধি তাদের কোন দিনই শুদ্ধ হয় না, তাদের অন্তঃকরণও স্থির হয় না।

**ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জুন। নির্দ্বন্দ্বো নিত্যসত্ত্বস্থো নির্যোগক্ষেম আত্মবান্।**।৪৫।।

বলছেন বেদে যা কিছু আছে সবই এই তিনটে গুণের মধ্যেই ঘোরাফেরা করছে, সত্ত্বঃ, রজঃ আর তমঃ। কিন্তু তুমি যদি আধ্যাত্মিক হতে চাও তোমাকে এই তিনটে গুণ থেকে বেরোতে হবে। বেদ তোমাকে কোথায় নিয়ে যাবে? বেদের শেষ লক্ষ্য হচ্ছে স্বর্গ, স্বর্গ পর্যন্তই তোমাকে বেদ নিয়ে যাবে, স্বর্গ তো আবার এই তিনটে গুণের মধ্যে আবদ্ধ। সুখ-দুঃখ, ভালো-মন্দ, পাপ-পূণ্য যা কিছু দ্বন্দ্বাত্মক সবই এই তিন গুণের মধ্যে। তাই তোমাকে এইখান থেকে বেরোতে হলে *নির্দ্বন্দ্বো* অর্থাৎ সমস্ত দ্বন্দ্বের পারে যেতে হবে, *নিত্যসত্ত্বস্থো,* সব সময় তোমাকে সত্ত্বগুণে আশ্রিত থাকতে হবে। আর *নির্যোগক্ষেম,* কোন কিছু পাওয়ার চেষ্টা তুমি করবে না, তার মানে তুমি জাগতিক সুখ ভোগের জন্য কোন কিছুর আকাঙ্খা রাখবে না। *আত্মবান,* অর্থাৎ ঠিক সময়ে জপ, ধ্যান সাধনা করে যেতে হবে, যখন জপ, ধ্যানের সময় হবে তখন কোন প্রমাদ, আলস্য তোমাকে যেন না পেয়ে বসে, সব সময় আত্মাতে স্থিত অর্থাৎ আত্মাতে মন দিয়ে রাখবে। এর পরের শ্লোকে বলছেন –

**যাবানর্থ উদপানে সর্বতঃ সংপ্লুতোদকে। তাবান্ সর্বেষু বেদেষু ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ।**।৪৬।।

যারা বেদের যজ্ঞ-যাগ করেন তাদের বিভিন্ন রকমের কামনার পুর্তি হয়, কিন্তু যিনি আত্মজ্ঞানী তাঁর আর কোন কিছুর দরকার হয় না, তার সব কামনা খসে যায়। এটাকেই একটি উপমার সাহায্যে এই শ্লোকে বলছেন। যেমন মানুষ জলের জন্য বাড়িতে কুয়ো খনন করে, পুকুর কাটে, টিউবওয়েল বসায়, কোন জলে কাপড় কাছে, কোন জলে স্নান করে, কোন জলে রান্না করে, কিন্তু যখন বন্যার সময় নদীর জল প্লাবিত হয়ে সমস্ত এলাকা জলমগ্ন করে দেয় তখন আলাদা আলাদা করে জলের ব্যবহারের প্রয়োজন শেষ হয়ে যায়, ঐ একটা জলেই তার সব কাজ মিটে যায়। ঠিক তেমনি *ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ,* যাঁর ব্রহ্মজ্ঞান হয়ে গেল তখন আর তাঁর এই ছোট খাটো জিনিষের দরকার হয় না।

**কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন। মা কর্মফলহেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্মণি।**।৪৭।।

অর্জুনকে বলছেন – অর্জুন তোমার শুধু কর্মেই অধিকার। এখানে শ্রীকৃষ্ণ হঠাৎ করে কেন বলছেন যে তোমার কর্মেই অধিকার? ভগবান বলতে চাইছেন যে অর্জুনের জ্ঞানে অধিকার নেই। অধিকারী দুই ধরণের, জ্ঞান অধিকারী আর কর্ম অধিকারী। জ্ঞান অধিকারী তারাই যাদের কর্তা, কর্ম আর ক্রিয়া এই তিনটের কোন ভেদ নেই, নেই মানে খুব পাতলা একটা আবরণ রয়েছে, একটু ধাক্কা মারলেই সেটাও খসে যাবে। অর্জুনের মধ্যে এখন এই তিনটেরই বিভেদ স্পষ্ট রূপে রয়েছে, তাই অর্জুন কর্মের অধিকারী। আমি যখন বাড়ির সবার ব্যবহারের জন্য একটা গাড়ী কিনতে যাই তখন কি আমি বাস কিনব, নাকি বুলডোজার কিনব? আমার বাড়ির ব্যবহারের যেটা উপযোগী হবে সেই রকম একটা গাড়ীই কিনব। কর্ম অধিকার মানে কর্মই তোমার পক্ষে উপযুক্ত। যেহেতু কর্মের জন্যই তুমি উপযুক্ত তাই এতেই তোমার অধিকার আছে। আর যদি তুমি আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভ করতে চাও তাহলে তুমি কর্মের ফলের দিকে মন দিও না, তুমি কাজ করে যাও। *মা কর্মফলহেতুর্ভূঃ,* কর্মফলের হেতু তুমি হয়ো না, অর্থাৎ কখন এমন কর্ম করো না যেটা আবার একটা নতুন কর্মফল সৃষ্টি করবে। অর্জুন এখন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে এসেছে, একটা বিশেষ পরিস্থিতি অর্জুনকে এই রণভূমিতে নিয়ে এসেছে, এখন যদি অর্জুন পালিয়ে যায় তখন সে একটা নতুন কর্মফলের সৃষ্টির জন্য দায়ী হয়ে যাবে। যে কর্মটা তোমার কাছে এসে গেছে সেটাই শুধু করে দাও, নতুন করে কিছু করতে যেও না। তুমি আগ বাড়িয়ে নতুন কিছু কর্ম করতে যেও না, স্বধর্ম মানেই তাই, স্বধর্মে যেটুকু করার কথা সেইটুকুই করব, আগ বাড়িয়ে নতুন কিছু করতে হবে না। *মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্মণি,* সাথে সাথে অন্য দিকে কর্ম না করে চুপচাপ বসেও থাকবে না। কর্মযোগের এই তিনটে আবার শর্ত এসে গেল। প্রথম আলস্য ছেড়ে কাজ কর, দ্বিতীয় নতুন কর্ম সৃষ্টি করবে না আর তৃতীয় হচ্ছে ফলাকাঙ্খা করবে না।

এর পরে কয়েকটি শ্লোক আসছে, যার ব্যাখ্যা আবার তৃতীয় অধ্যায়ে আরও বিস্তৃত ভাবে করা হয়েছে। বলছেন –

**যোগস্থঃ কুরু কর্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়। সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে।**।৪৮।।

*যোগস্থঃ,* যোগ বলতে গিয়ে আচার্য বলছেন – *কেবলং ঈশ্বরার্থম্,* শুধু ঈশ্বরের জন্য কাজ করা, আর কোন ফলের আশা না কর। এইটাই হচ্ছে ত্যাগ। ত্যাগ হচ্ছে ছেড়ে দেওয়া, কিন্তু এখানে বলছেন কোন ধরণের আশা মনের মধ্যে জাগবেই না। এমন কি বলছেন – *ঈশ্বরো মে তুষ্যতু,* প্রভু আমার উপর প্রসন্ন হউন, তিনি খুশি হন, এই ভাবনাকেও ত্যাগ করতে বলছেন। গীতার এটি

অত্যন্ত উচ্চ ধারণা। দীক্ষার সময় বলে দেওয়া হয়, জপ শেষ করার পর জপের ফল ইষ্টে সমর্পণ করতে। তোমাকে ভালোবাসি তাই তোমার নাম করেছি। এইটাই হচ্ছে অহৈতুকী ভালোবাসা। তোমাকে ভালোবাসছি এই ভালোবাসার পেছনে কোন হেতু নেই। স্বামীজী খুব সুন্দর উপমা দিচ্ছেন – কেউ হিমালয়ের উত্তুঙ্গ তুষারাবৃত শৃঙ্গমালাকে দেখে মুগ্ধ হয়ে ভালোবাসছে। হিমালয় তো তাকে কিছু দিচ্ছে না, কিন্তু হিমালয়কে দেখেই আনন্দ। ঈশ্বরের প্রতি এই ভালোবাসার কথা বলা হচ্ছে, তোমাকে ভালোবাসি, এর কোন কারণ নেই, তুমি যদি খুশি হও সেতো ভালো কথা, যদি খুশি নাও হয় তবুও তোমাকে আমি ভালোবাসছি। এই কথা গুলো খুবই সাধারণ ভাবে বলা হচ্ছে, কিন্তু এগুলো অতি উচ্চ অবস্থার কথা। এই উচ্চ অবস্থায়, এই অহৈতুকি ভালোবাসায় তুমি কৃপা কর এটাও থাকবে না, তুমি প্রসন্ন হও এও থাকবে না। তন্ত্রে বলা হয় – মা তুমি প্রসন্না হও, কিন্তু বেদান্তের এই অনাসক্ত ভাব হচ্ছে খুব উচ্চ দর্শনের তত্ত্ব, সেখানে প্রসন্ন হও এই কথা বলার ইচ্ছেও মনের মধ্যে উদয় হবে না। এইটাই হচ্ছে *সমত্বং যোগ উচ্যতে*, মনের সমত্ব ভাব, এই নির্বিকার ভাব নিয়ে যে কাজ করবে সেইই যোগী।

**দূরেণ হ্যবরং কর্ম বুদ্ধিযোগাদ্ ধনঞ্জয়। বুদ্ধৌ শরণমন্বিচ্ছ কৃপণাঃ ফলহেতবঃ।।৪৯।।**

*কৃপণাঃ ফলহেতবঃ*, কৃপণ মানে হচ্ছে ছোট বুদ্ধি, যারা অতি সাধারণ মনের অধিকারি, তারাই ফলের আকাঙ্খা করে। তাদের দ্বারা জীবনে কিছু হয় না। যারা ঠিক ঠিক বুদ্ধিমান লোক, যারা ঠিক ঠিক আধ্যাত্মিক জীবন যাপন করছে তারা নিষ্কাম কর্ম করে।

**বুদ্ধিযুক্তো জহাতীহ উভে সুকৃতদুষ্কৃতে। তস্মাদ্ যোগায় যুজ্যস্ব যোগঃ কর্মসু কৌশলম্।।৫০।।**

যদি তুমি এই ধরণের বুদ্ধির আশ্রয় নাও, কি কি বুদ্ধি? সমস্ত দ্বন্দ্ব রহিত, ঈশ্বরের আরাধনার্থে, আর ফলাকাঙ্খা রহিত। তখন *উভে সুকৃতদুষ্কৃতে*, কর্মের ভালো ফলও তোমাকে স্পর্শ করবে না, কর্মের খারাপ ফলও তোমাকে স্পর্শ করবে না। এটি গীতার অত্যন্ত কঠিন তত্ত্ব, যেটা অনেকবার ঘুরে ঘুরে গীতাতে এসেছে। উদ্দেশ্য নিয়ে যখনই কোন কাজ করা হয় তখন সেই কাজটা আমাদের মনের উপর একটা দাগ ফেলে সংস্কার রূপে মনের গভীরে চলে যায়। আর উদ্দেশ্য না নিয়ে যখন কোন কাজ করা হয় তখন সেই কাজ কোন দাগ ফেলে না। দাগ না ফেললেও একটা খুব সূক্ষ্ম অবস্থাতে গিয়ে কিন্তু দাগ ফেলবে। আমি রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি। হঠাৎ একটা ভিখারিকে দেখলাম যে সে কিছু একটা কষ্ট পাচ্ছে। আমি গিয়ে তাকে কিছু একটা করে দিয়ে তার কষ্টটা লাঘব করে আমি আমার কাজে যেমন যাচ্ছিলাম সেইভাবে চলে গেলাম। আমার মাথাতেও এর আর কিছু নেই। গীতার মতে, আমি এই যে একটা পূণ্য কাজ করলাম, এর ফল কিন্তু আমার আর আসবে না। কারণ আমার এখানে কোন উদ্দেশ্য ছিল না। কিন্তু স্বামীজী কর্মযোগ প্রসঙ্গে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলছেন, এই যে আমি একটা ভালো কাজ করলাম, এই কাজটাও খুব সূক্ষ্ম স্তরে গিয়ে একটা ছাপ রেখে যাবে। সেই ছাপটা হচ্ছে, মানবজাতির প্রতি আমার যে করুণা, ভালোবাসার সংস্কার যেটা আগে থেকেই ছিল, সেই সংস্কারটা আরও শক্তিশালী হয়ে গেল। কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞান যখন হয়ে যায় তখন তো আর কোন সংস্কারের প্রশ্নই থাকছে না, সংস্কার তো মনের, তখন তিনি মনকেও ছাড়িয়ে চলে গেছেন।

এখানে যেটা বলতে চাইছে তা হচ্ছে, তুমি কোন কিছু চাইবে না, তাতে তোমার কোন ফল আসবে না। আসলে কেন ফল হয় না, কি কারণে ফল আসে না আমাদের ঠিক জানা নেই। কিন্তু পুরো গীতাতেই এই জিনিষটা ঘুরে ঘুরে এসেছে, তুমি যদি ফলাকাঙ্খা রহিত হয়ে একটা কর্ম কর তাহলে সেই কর্মের ফল তোমাকে স্পর্শ করবে না, মানে তোমার মনের কোথাও ছাপ ফেলবে না। এর সাথে অন্যান্য জিনিষও হবে। আমি এখান থেকে কোন উদ্দেশ্য ছাড়াই এমনিই দিল্লী যাচ্ছি। যেতে যেতে ট্রেনের দুর্ঘটনা হয়ে গেল, তখন আমি নানা ঝামেলায় পড়ে গেলাম, তখন বলবে, এই তো আমি ফল পেয়ে গেলাম। এখানে ঠিক এই অর্থে বলা হয় না, আরও গভীর অর্থে বলা হচ্ছে। কিন্তু যতক্ষণ না ব্রহ্মজ্ঞান হচ্ছে, ফলাকাঙ্খা না করে ভালো মন্দ আমি যাই করি না কেন, খুব গভীর সূক্ষ্ম স্তরে গিয়ে ছাপ একটা ফেলবেই। একটু পরেই বলবেন – *রসবর্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ততে*। খুব সূক্ষ্ম স্তরে যেটা ছাপ ফেলছে, এই ছাপটা ব্রহ্মজ্ঞান না হওয়া পর্যন্ত থেকে যাবে। কিন্তু যে বিরাটাকারে ফল দেবে সেটা হবে না। এটা একটা মতও হতে পারে। এখানে শাস্ত্র মতে বলা হচ্ছে ফল পাবে না। ফল পাওয়াটা হচ্ছে, যেমন বেদ মতে আমি যখন একটা যজ্ঞ করছি, তখন আমি তার একটা ফল পাব, যেমন স্বর্গরূপী, ভালো জন্মরূপী ফল একটা পাব। গীতার মতে যখনই আমি একটা কাজ করছি তার একটা ভালো কিংবা মন্দ ফল হবে। এখন আমি যদি বলি আমার কোন ফল লাগবে না, তখন ঐ ফলটা আমার আসবে না। কিন্তু এখানে অনেক প্রশ্ন আসতে পারে, কেন এই ফলটা ছাপ ফেলে না। স্বামীজী কিন্তু বারবার বলছেন, তুমি ভালো মন্দ যাই কর সেটা কিন্তু মনের মধ্যে একটা ছাপ ফেলে যাবে। এটা কিন্তু গীতাও বলছে। আমি কাউকে একটা আম দিলাম, কর্মফলের মত কোন না কোন দিন আমাকে ঐ ফল দেবে। রাজসভায় যখন দ্রৌপদীর বস্ত্র হরণ হতে যাচ্ছিল, তখন শ্রীকৃষ্ণ দ্রৌপদীকে জিজ্ঞেস করছেন – তুমি মনে করে দেখ, তুমি কি কখন কাউকে কোন বস্ত্র দান করেছিলে? দ্রৌপদী তখন বললেন – হ্যাঁ হ্যাঁ মনে পড়েছে, এক ঋষি স্নান করার সময় নদীর স্রোতে তাঁর কৌপিন ভেসে গিয়েছিল, আমি আমার শাড়ির আঁচল ছিড়ে তখন তাঁকে দান করেছিলাম। শ্রীকৃষ্ণ

তখন বললেন, তাতেই হবে। এটা কি একটা নিছক কাহিনী, না কোন তত্ত্বকে প্রকাশ করতে চাইছে। এটা একটা কাহিনীই, কিন্তু অত্যন্ত একটা মূল্যবান কাহিনী। সাধারণ লোক যারা তারা এই কাহিনী থেকে নিজেদের অবস্থার কথা ভাবতে শুরু করে। সাধারণ মানুষ নিজের মা, বোন, স্ত্রীকে কখনই বিবস্ত্র দেখতে চাইবে না। তখন সে দান করতে শুরু করে। কিন্তু এই কাহিনীটাকে যদি আরেকটু ভালো করে কাটা ছেঁড়া করা হয়, দ্রৌপদী কবে কোন্ সাধু বাবাকে একটা কাপড়ের ছেঁড়া টুকরো দিয়েছিলেন আর ভগবান তাকে শাড়ি দিতেই থাকলেন, এটা ঠিক জমছে না। কেননা মানুষ তার জীবদ্দশায় কিছু না কিছু দান করেই থাকে। তাহলে এদেরও এত কেন কষ্ট হচ্ছে? যে কোন কর্ম সূক্ষ্ম স্তরে আমার ব্যক্তিত্ব তৈরী করছে এটা বিশ্বাস না করে উপায় নেই, হতে বাধ্য। আর যখন পরম জ্ঞান লাভ হয় তখন এই ছাপ পড়াটাও বন্ধ হয়ে যায়, এটাও খুবই যুক্তিযুক্ত, কেননা অনাসক্ত হয়ে যান বলে কর্মের কোন ফল তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না। স্বামী ভূতেশানন্দজীকে একবার এক সিনিয়র মহারাজ কর্মফল নিয়ে প্রশ্ন করেছিলেন। তার উত্তরে তিনি ঠিক এই জিনিষটাই উল্লেখ করে বলেছিলেন – লঙ্কা খেলে যেমন ঝাল লাগে ঠিক তেমনি কর্ম আর কর্মফলের সঙ্গে কোথাও কোন একটা সম্পর্ক আছে। এখন এটাকেই বৃহত্তর ক্ষেত্রে নিয়ে গেলেই সব সন্দেহের অবসান হয়ে যাবে।

একজন আচার্য আধ্যাত্ম শাস্ত্রের ক্লাশ নিচ্ছেন আর বাকিরা সবাই শুনছেন। এখন যদি প্রশ্ন করা হয় তিনিই কেন ক্লাশ নিচ্ছেন আর বাকিরাই বা কেন শুনছে? এর উল্টোটাও তো হতে পারত। তখন এর উত্তরে সহজ ব্যাখ্যা করে বলে দেবেন কর্মফলের জন্য। এটাই এই প্রশ্নের সহজতম সমাধান, বেশি কাঁটাছেড়া করে ভেতরের দিকে প্রবেশ করা হল না। এই ক্লাশ নেওয়ার জন্য যিনি আচার্য রূপে নির্বাচিত হয়েছেন, তাঁকে এর জন্য ঘরবাড়ি ছেড়ে সন্ন্যাসী হতে হয়েছে, সমস্ত রকমের জাগতিক সুখ ত্যাগ করতে হয়েছে, বছরের পর বছর তাঁকে শাস্ত্রের পেছনে পরিশ্রম করতে হয়েছে, আর আজ তাঁকে আচার্যের পদে অভিষিক্ত করা হয়েছে। একটা কথাতে আমরা বলে দিচ্ছি তিনি কর্ম করেছিলেন বলে আজ এখানে পৌঁছেছেন। যে কোন জিনিষের পেছনে হাজারটা কারণ থাকতে পারে, সেই কারণ গুলোকে কেউ দেখতে পায়না। তাই সবাই বলে দেয় সব কর্মফল। কর্মফল যেই বলে দেওয়া হবে তখন মনটাও শান্ত হয়ে যায়। আজকে ধীরুভাই আম্বানি কোথা থেকে কোথায় উঠে গিয়ে কোটিপতি হয়ে গেল। কোটিপতি হতে গিয়ে কত রকমের চালাকি, মিথ্যে কথা আর কত ভালো মন্দ কাজ করতে হয়েছে। ধীরুভাই আম্বানি কেন এত বড়লোক হয়ে গেল, আমি কেন হতে পারলাম না? কিন্তু আম্বানির কর্মগুলো আমরা দেখতে পাইনা, আমরা বলি দিই তার কর্মে ছিল। কর্মফল বলে দিলে আর এত বিশ্লেষণ করতে হয় না। এখন যদি বিশ্লেষণ করে দেখি যে সে এত চুরি করেছিল, এত লোক ঠকিয়েছিল, ঠিক আছে আমিও তাই করে বড়লোক হব। এখানে কিন্তু তার খারাপ কর্মের কথাগুলো বলছেন না, তার জন্য নয়, কোন জন্মে সে বড় দান করেছিল সেইজন্য সে আজ এত বড়লোক হতে পেরেছে। এখন এই কথা শোনার পর সবাই দান পূণ্য করতে শুরু করে দেবে। এতে সমাজের একটা স্থিতিশীলতা এসে যায়। সেইজন্য হিন্দু ধর্মের দর্শনকে অত্যন্ত বাস্তব সম্মত দর্শন বলা হয়। যদি বলি আমার কপালে যদি থাকবে তাহলে এমনিতেই আসবে, এটাই নেতিবাচক মানসিক বৃত্তি হয়ে গেল, এই ধরণের বৃত্তি বশতঃ সে আর কোন কাজ করতে চাইবে না। গীতা কিন্তু কখনই এই কথা বলবে না, সেইজন্য গীতা বলছে - *মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্মণি*, তোমার অকর্মণি যেন কখন না হয়, কাজ তোমাকে সব সময়ই করতে হবে। যখন হাতের কাজ তখন কাজ কর, যখন যেটা করার সেটা কর, যখন হাতের কাজ নেই তখন পড়াশুনা করে উচ্চ চিন্তন নিয়ে নিজেকে ব্যাস্ত রাখ। যখন কোন কাজ নেই, উচ্চ চিন্তনও হচ্ছে না তখন মনের কাজ কর, মানে জপ, ধ্যান কর। এই তিনটে কাজ যেন সব সময় চলতে থাকে। কিন্তু বেশির ভাগ সময়ই আমরা কি করি, ঠাকুর বলছেন – কুমড়ো কাটা বট্‌ঠাকুর। সারাক্ষণ বসে বসে তামাক টানছে, মেয়েদের কুমড়ো কাটতে নেই, তাই মাঝে মাঝে ঘরের ভেতরে গিয়ে কুমড়োটা কেটে দিয়ে আসে। কর্মের মাধ্যমে আমাকে ঈশ্বর লাভ করতে হবে এই বোধ কারুরই নেই।

বেলুড় মঠের মহারাজদের কত কাজ করতে হয় যে তাদের আমোদ ফুর্তি করার ইচ্ছে থাকলেও উপায় নেই, সময়ই পাবে না, আমোদ ফুর্তি বলতে ঐ সন্ধ্যা আরতির সময়টুকু। গীতাতে আমোদ ফুর্তি একেবারে বন্ধ, লোকে তাই বলে গীতা এখন থাক। অফিস থেকে এসে একটু টিভি না দেখলে চলবে না, সপ্তাহে একদিন ছুটি, ঐদিন বন্ধুবান্ধব নিয়ে আড্ডা মারা, তারপর বিয়ে বাড়ি, জন্মদিন, বিবাহবার্ষিকী এগুলো তো আছেই। আধ্যাত্মিক জীবন এইভাবে চলে না, আধ্যাত্মিক জীবন অত্যন্ত কঠিন ও ক্ষুরধার। আধ্যাত্মিক জীবন আমাকে এক মুহুর্তের আমোদ প্রমোদের সময় দেবে না। আধ্যাত্মিক জীবনে যে কাজই করা হবে সেটাই ঈশ্বরের কাজ, অফিসের কাজই হোক, ঘরের কাজই হোক, কারুর গলা কাটা হোক সবই ঈশ্বরের কাজ মনে করে করতে হবে, এই বোধকে ধরে রাখতে হবে। আধ্যাত্মিক জীবনে জপ-ধ্যান, অধ্যয়ণ আর কাজ এর বাইরে আর কিছু নেই। সাধু সন্ন্যাসীদের এই জন্য কোন আমোদ-প্রমোদ নেই।

এখানে তাই বলছেন *যোগঃ কর্মসু কৌশলম্*, যোগ হচ্ছে কর্মের কৌশল। কর্মের কৌশল মানে, তুমি কর্মটা কিভাবে, কি কৌশলে করবে। কি কৌশল? সমত্ব বুদ্ধি নিয়ে ফলাকাঙ্খা রহিত হয়ে কর্ম করা, এইটাই কৌশল। তুমি কত বড় কর্মযোগী, তোমার কাজ কত ভাল বোঝা যাবে তোমার বুদ্ধি কতটা শান্ত। বুদ্ধি যদি শান্ত না থাকে, সমত্ব বুদ্ধি যদি না হয়, তাহলে বুঝতে হবে কোথাও তোমার গোলমাল আছে। সমত্ব বুদ্ধি তখনই হয়, যখন কর্মের ভালো মন্দ সব ফল ঈশ্বরকে অর্পণ করে দেওয়া হয়, হে প্রভু এটা

তোমারই কাজ। আচার্য ক্লাশ নিতে আসছেন, তিনি বলছেন – ঠাকুর ক্লাশ নেওয়াটা তোমার কাজ। আচার্য তাঁর সমস্ত প্রচেষ্টা শিক্ষকতার কাজে লাগিয়ে দেবে। তখন ভালো মন্দ কোনটাই তাঁকে স্পর্শ করবে না। ঠাকুর যেটা গিরিশ ঘোষকে বলছেন – কিছুই যদি না করতে পার তাহলে আমাকে বকলমা দিয়ে দাও। পরে গিরিশ ঘোষ যখন কোন কাজের ব্যাপারে বলছেন, এই কাজটা আমিই করব, তখন ঠাকুর বলছেন – খবরদার, আমি করব বলার কোন এক্তিয়ার তোমার নেই, সব এখন আমার। ব্যাঙ্কের ক্যাশিয়ার, রোজ কোটি কোটি টাকা নাড়াচাড়া করে যাচ্ছে, কিন্তু একটা টাকাতেও তার কোন অধিকার নেই। আমরা যাবতীয় যা কিছু করছি সবটাই ঈশ্বরের, আমাদের কিছুই নেই। এখানে আমার বলতে যখন কিছুই নেই তাহলে আমার আসক্তি কোন্ জিনিষটার প্রতি হবে। কিন্তু মানুষের মন এই ব্যাপারটাকে বুঝতেই পারেনা, আমরা এখনও উচ্চ আদর্শের জন্য তৈরীই নই। উচ্চ আদর্শ যে কত কঠিন, যারা ধরে রেখেছেন তারাই বুঝতে পারেন। বলছেন –

**কর্মজং বুদ্ধিযুক্তা হি ফলং ত্যাক্ত্বা মনীষিণঃ। জন্মবন্ধবিনির্মুক্তাঃ পদং গচ্ছন্ত্যনাময়ম্।।৫১।।**

যাঁরা মনীষি, মানে যাঁদের বুদ্ধি স্থির হয়ে গেছে, যাঁরা জ্ঞানী, আমাদের যে দেহবুদ্ধি, যে বুদ্ধি সব থেকে প্রবল, সেটাকেই তাঁরা এইখানেই নাশ করে দেন। পরমপদ, বিষ্ণুপদ যখন তাঁরা পেয়ে যান তাঁদের এইখানেই মুক্তি হয়ে যায়। যে কোন ধর্ম থেকে বেদান্তের বিশেষত্ব এইখানেই। অন্যান্য ধর্মে যেটাক উচ্চ অবস্থা বলা হয়েছে, সেই অবস্থা লাভ করতে হলে আমাকে আগে মরতে হবে। আমি যদি মুক্তি চাই তাহলে কাশীতে গিয়ে আমাকে মরতে হবে। খ্রীশ্চান ধর্মে আমাকে যদি তাদের উচ্চাবস্থা লাভ করতে হয় তাহলে আমাকে আগে মরতে হবে, মানে মরলে স্বর্গে যাব, ইসলাম ধর্মেও স্বর্গ হচ্ছে সব থেকে উচ্চাবস্থা, সেখানে যেতে হলে আমাকে মরতে হবে। বৌদ্ধ ধর্মের উচ্চ অবস্থা হচ্ছে নির্বাণ প্রাপ্তি, কিন্তু না মরা পর্যন্ত নির্বাণ প্রাপ্তি হচ্ছে না। একমাত্র হিন্দু ধর্মই বলছে তুমি তোমার এই জীবনেই জীবদ্দশাতেই মুক্তি পেয়ে যাবে। সেইজন্য হিন্দু ধর্ম হচ্ছে সব ধর্ম থেকে বিশেষ ভাবে আলাদা এবং স্বকীয়তায় শ্রেষ্ঠ ধর্ম বলা যায়, এই কারণে সমগ্র মানব জাতির স্বার্থে হিন্দু ধর্মকে সব সময় রক্ষা করা অত্যন্ত প্রয়োজন।

হিন্দু ধর্মের দর্শন অন্য কোন ধর্মের সাথে মিলবে না। আমি যদি এই শরীর দিয়ে, যেটা আমি প্রত্যক্ষ অনুভব করছি, যেটাতে আমার বিশ্বাস দৃঢ় হয়ে আছে, এটা দিয়ে যদি ভোগ নাইই করলাম, তাহলে মৃত্যুর পর, যার সম্বন্ধে আমাদের কোন ধারণাই নেই, কেউ স্পষ্ট করে কিছু বলেননি, সেই স্বর্গ পেয়ে আমার লাভটা কি। সেইজন্য স্বামীজী বলছেন – I don't believe in God who will give me eternal heaven after death, but cannot give me a piece of bread here. যে ভগবান এখানে আমাকে এক টুকরো রুটি দিতে পারেনা আর মরার পর আমাকে স্বর্গ দেবে এই রকম ভগবানে আমার বিশ্বাস নেই। অন্যান সব ধর্মে যা কিছু সর্বোচ্চ শ্রেষ্ঠ সব মরার পর। আর স্বর্গের বর্ণনা কি রকম? দশ লক্ষ ধরণের ফল সেখানে আমার জন্য রাখা আছে, সুন্দর ঠাণ্ডা শুদ্ধ জল, ওখানে যত পুরুষ থাকবে তারা সব সময় তিরিশ বছরের যুবক হয়ে থাকবে, আর সবাইকে দেখতে সুন্দর, যত মেয়েরা থাকবে তাদের সবাই বাইশ বছরের যুবতী। পাকিস্থানে এক বিদেশী জার্নালিস্ট লিখছেন, কোরান পড়ে আমার মনে হচ্ছে আমি কেন খ্রীশ্চান হয়ে জন্মালাম, মুসলমান হয়ে জন্মালেই হত, তাহলে স্বর্গের যা বর্ণনা, তাতে মনে হচ্ছে এটাই ঠিক ঠিক বসবাসের উপযুক্ত স্থান। অথচ পাকিস্থান আফগানিস্থানের কত লোক না খেয়ে মরছে, একে অপরের গলা কাটছে। কেন কাটছে, মরার পরে আমি স্বর্গে যাব, স্বর্গে গিয়ে আমি হুড়িদের পাব, হুড়ি হচ্ছে আমাদের পরীর মত। আমাদের রামানুজম, মাধ্বাচার্য যত দর্শন দিয়েছেন তাতেও আমাকে মরতে হবে। একমাত্র অদ্বৈত বেদান্ত বলছে, না, এখানেই যা হবার হবে, এখানে যদি না হয় তাহলে আমার লাভ কি। এইটাই গীতা এই একান্ন নং শ্লোকে বলছে – *জন্মবন্ধবিনির্মুক্তাঃ*, এইখানেই জন্ম-মৃত্যুর বন্ধন থেকে মুক্তি লাভ করতে হবে। তারপর বলছেন –

**যদা তে মোহকলিলং বুদ্ধির্ব্যতিতরিষ্যতি। তদা গন্তাসি নির্বেদং শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্য চ।।৫২।।**

যখন তোমার মনের কালি, মনের কালি হচ্ছে এই শোক মোহাদি, মনের এই কলুষ যখন দূর হয়ে মন শুদ্ধ হয়ে যাবে, তখন তুমি সব কিছুর পারে চলে যাবে, সমস্ত কর্মই তখন তোমার কাছে নিষ্ফল হয়ে যাবে। তুমি যদি জানতে চাও তুমি কবে পরামার্থ জ্ঞান লাভ করবে? তখন শ্রীকৃষ্ণ বলছেন –

**শ্রুতিবিপ্রতিপন্না তে যদা স্থাস্যতি নিশ্চলা। সমাধাবচলা বুদ্ধিস্তদা যোগমবাপ্স্যসি।।৫৩।।**

তোমার জন্মের পর থেকে সেই ছোটবেলা থেকে যত রকমের কথা শুনে এসেছ, এই করলে এই ফল পাবে, মন দিয়ে লেখাপড়া কর তাহলে পরীক্ষার ফল ভাল হবে, ভাল ফল হলে ভাল চাকরী পাবে, ভালো চাকরি পেলে ভালো মেয়ের সাথে বিয়ে হবে। বেদ আমাদের কত রকমের কথা বলে গেছে, আমাদের গুরুজনরাও একই কথা বলে আসছেন, এই করলে এই ফল পাবে, ঐ করলে ঐ ফল পাবে, এত রকমের কথা শুনতে শুনতে আমাদের মনটা চঞ্চল হয়ে গেছে। চঞ্চল মনের ধর্ম হচ্ছে, কখন বলছে ঐটা করব, কখন বলছে ঐটা করব না, এইটা করব, একবার এটাকে ধরছে আরেকবার এটাকে ছেড়ে অন্য কিছু করতে যাচ্ছে। মনের

এই ধরণের চঞ্চলতা যখন প্রশমিত হয়ে মন শান্ত হয়ে যাবে, বুদ্ধি স্থির হয়ে যাবে, যখন বলবে আমার এটাও চাইনা, ঐটাও চাইনা তখন তোমার তত্ত্বজ্ঞান লাভ হবে।

গীতাতে 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' এই শব্দ দুটো অনেকবার উল্লেখ করা হয়েছে, ঠাকুর বলছেন জ্ঞানী আর বিজ্ঞানী। আচার্য শঙ্কর এই জ্ঞান ও বিজ্ঞানকে পরিভাষিত করতে গিয়ে বলছেন শাস্ত্রে যেটা বলা হয়েছে, আচার্য যেটা বলছেন সেটাকে যে ঠিক ঠিক বুঝতে পারে, আর দিনরাত সব সময় তার এটাই মাথার মধ্যে চিন্তন হয়ে যাচ্ছে তিনি জ্ঞানীর অবস্থায় পৌঁছে গেছেন। মনে রাখতে হবে, এখানে কিন্তু জ্ঞানীর কথা বলা হচ্ছে। জ্ঞানী আর বিজ্ঞানীর মধ্যে অনেক পার্থক্য। কিন্তু *শ্রুতিবিপ্রতিপন্না তে*, বেদের নানান রকমের কর্ম, তার আবার কত রকমের ফলের কথা শুনতে শুনতে আমাদের মন চঞ্চল, জ্ঞানীর এই ধরণের চঞ্চলতা আর হচ্ছে না। কিন্তু গীতার একটা জায়গায় বলা হবে অজ্ঞানী আর জ্ঞানীর কি তফাৎ, সেখানেও কিন্তু বিজ্ঞানীর কথা বলা হচ্ছে না। জ্ঞান মানে পরমার্থ জ্ঞান হয়, আবার যে জ্ঞানের পথে চলছে তাকেও জ্ঞানী বলা হয়, নিম্ন জ্ঞান আবার উচ্চ জ্ঞান, উচ্চ জ্ঞানকে অনেক সময় বিজ্ঞানও বলা হয়। এখানে নিম্ন জ্ঞানের কথা বলা হচ্ছে। এই নিম্ন জ্ঞানের যে জ্ঞানী তার সাথে অজ্ঞানীর কি তফাৎ সেটা বলতে গিয়ে আচার্য বলছেন – অজ্ঞানী যখন কোন কাজ করে ভোগে লিপ্ত হয়ে কর, তখন তার বিরাট আনন্দ। ঠাকুর এর খুব সুন্দর উপমা দিয়ে বলছেন – দুই বন্ধু মেলাতে ঘুরতে গেছে, একজন বন্ধু মেলাতে দেব-দেবীর সব ছবি দেখছে, আরেক বন্ধুও ছবি দেখছে, যে ছবিতে দেখাচ্ছে একজন নষ্টা মেয়ে নিজের উপপতিকে ঝাঁটা দিয়ে পেটাচ্ছে। এই ছবি দেখতে দেখতে সে চিৎকার করে বলছে – ওরে ওখানে কি দেখছিস্ এখানে দেখবি আয়। অজ্ঞানীরা যখনই কোন জিনিষ ভোগ করে ঐটাতেই তখন প্রচণ্ড আনন্দ পায়, পরে তার যাই হোক, সেই মুহুর্তে অত্যন্ত আনন্দে মশগুল্ হয়ে থাকবে। চিংড়ি মাছ খেলে এলার্জি হয়, কিন্তু বিয়ে বাড়িতে এত বড় বড় গলদা চিংড়ি, পরে যা হবে দেখা যাবে এখনতো খেয়েনি, এরা হচ্ছে অজ্ঞানী। কিন্তু জ্ঞানী যে, সেও খায়, সেও ভোগ করে আবার সেও রোগে ভোগে। কিন্তু প্রথম থেকেই বলতে থাকে ছিছিছিঃ, এগুলো আমি কি করছি, আমার মনে যে কামনা বাসনা আছে এরাই আমাকে এগুলো করাচ্ছে, আমি কি করব বুঝতে পারছি না। তাই ঠাকুর বলছেন জ্ঞানী ভয় তরাসে, জ্ঞানীর মনে সব সময় ভয়, এই বুঝি আমার পতন হয়ে গেল। পরমার্থ জ্ঞান না হওয়া পর্যন্ত এই ভয়টা জ্ঞানীর সব সময় থেকে যাবে।

তিপান্ন নং শ্লোকে এই বক্তব্যকেই বলা হচ্ছে। *শ্রুতিবিপ্রতিপন্না তে*, শ্রুতিতে মানে বেদে যে নানা কর্মফলের কথা বলা আছে, যখন এইসব নানা কর্মফল থেকে তোমার মন সরে আসবে, মন আর চঞ্চল হবে না, মন যখন স্থির হয়ে যাবে, তখন *সমাধাবচলা*, তোমার বুদ্ধি সমাধি হয়ে যাবে, সমাধি মানে ভেতরে তোমার আত্মাতে মন স্থির হয়ে যাবে, পাঁচ রকম বিষয়ের দিকে মন যে ছুটে বেড়াচ্ছিল সেটা বন্ধ হয়ে যাওয়াটাকে সমাধি বলছেন। মন তখন একটা জায়গাতে স্থির হয়ে গেল। মন যতক্ষণ স্থির না হচ্ছে ততক্ষণ এর আগে এতো যে কর্মযোগের শর্তের কথা বলা হয়েছে, স্বধর্ম পালন, ঈশ্বরের পূজা, কর্মফল ত্যাগ, অনাসক্তি, ঈশ্বরে ফল অর্পণ, এগুলো কোনটাই ফলপ্রসু হবে না। মন যতক্ষণ বহির্মুখি থাকবে ততক্ষণ কর্মযোগ করাই যাবে না। মন বহির্মুখি কেন হয়? সাধারণতঃ কামনা বাসনার জন্য, আর তার থেকে যারা একটু উন্নত তাদের বহির্মুখি হয় *শ্রুতিবিপ্রতিপন্না তে*, বেদে যে নানা রকমের ক্রিয়াকর্মের কথা বলা হয়েছে তার দিকে আকৃষ্ট হয়ে মন বহির্মুখি হচ্ছে।

এই কথাগুলো অর্জুনকে বলা হচ্ছে, অর্জুন সেই সময়কার লোক যখন বেদের কাল পুরোদমে সমাজে তখনও সচল ছিল, তুমি রাজসূয় যজ্ঞ কর, তুমি অশ্বমেধ যজ্ঞ কর, এই যজ্ঞ করলে এই ফল পাবে, অমুক যজ্ঞ করলে তমুক ফল পাবে, এক কথায় কামিনী-কাঞ্চন, মান, যশ, প্রতিপত্তি এই বিষয়গুলির দিকে মন দৌড়াচ্ছে। এই শ্লোক যে মতটাকে সামনে নিয়ে এসেছে, তাতে জেহাদীরা যে সন্ত্রাস করে বিধর্মীদের গলা কাটছে, তার অনুমতি হচ্ছে না। জেহাদের কথা বলতেই, তোমার মন কিন্তু চঞ্চল হয়ে উঠছে, পাঁচটা কাজে মনকে নিযুক্ত করতে হচ্ছে, তুমি স্থির হয়ে বসতে পারছ না, এটা কিন্তু ধর্মের কাজ নয়, তুমি এই কাজ করা থেকে বিরত হও।

গীতা উপনিষদ স্বর্গে যাওয়ার প্রচেষ্টাকে প্রতিহত করছে, জেহাদ করে স্বর্গে যাওয়ার চেষ্টাকে এই শ্লোকে আটকানো হচ্ছে। যদি শাস্ত্র তোমাকে পাঁচ রকমের কাজ করতে বলে, তুমি এই পাঁচটা বিষয়ে মন দিও না। অনেক সাধ্য, সাধন ও সম্বন্ধ এই জিনিষ গুলিকে বেদ প্রকাশ করে। সাধ্য হচ্ছে কি কি জিনিষ পাওয়া যাবে, সাধন হচ্ছে কিভাবে পাওয়া যাবে, সাধ্য আর সাধন এই দুটোর মধ্যে কি সম্বন্ধ সেটা বলছে। গীতা এগুলোকে আটকে দিচ্ছে। স্বর্গে যাওয়ার আকাঙ্খা যতক্ষণ না বন্ধ করছ ততক্ষণ তুমি যোগী হতে পারবে না, স্বর্গাকাঙ্খী কক্ষণ *সমাধাবচলা* হতে পারবে না। তুমি যদি বল আমি স্বর্গে যেতে চাই, ঠিক আছে তাই আকাঙ্খা কর, তবে তোমার জন্য গীতা নয়। হিন্দু ধর্মে কখনই ধর্মান্তরিত করার ব্যাপার নেই। কারণ, হিন্দুরা অধিকারিতে বিশ্বাস করে। সবাই সব কিছুর যোগ্য নয়। তাহলে মুক্তির যোগ্য কারা? যারা স্বর্গপ্রাপ্তিতে বিশ্বাস করছে তাদের জন্য মুক্তির ধারণা নয়। তাই গীতার উপদেশও সবার জন্য নয়। যদি তুমি বল আমি মুক্তির ব্যাপার জানতে চাইছি, তাহলে তুমি এসো, আমি তোমাকে জানিয়ে দেব। গীতা কাউকে ধরে

বেঁধে নিয়ে এসে তার মত কারুর উপর চাপিয়ে দেবে না, হিন্দু ধর্মের কোথাও কখন এই ভাবে ধর্মান্তরিত করা হয়নি। ধর্মান্তরিতের ধারণা আমাদের হিন্দু দর্শনেই দাঁড়ায় না।

যদি কেউ বলে আমি স্বর্গসুখও চাই না, ইহ জগতের সুখও চাই না, আমি এই জন্মমৃত্যুর চক্র থেকে বেরোতে চাই, তখন বলবে এবার গীতা উপনিষদের বাণী তোমার জন্য, তুমি উপযুক্ত আচার্যের কাছে গীতা উপনিষদ অধ্যয়ণ কর। জন্ম-মৃত্যুর চক্র থেকে না বেরোতে চাইলে গীতা উপনিষদ তার জন্য নয়। ধর্মান্তরিত করার জন্য গীতা উপনিষদ নয়, যারা সব কিছু ছেড়ে দিয়েছে, একটা একটা স্তর পেরিয়ে এসে যারা বলছে আমি জ্ঞান ছাড়া আর কিছু চাইনা, তখন তার জন্য গীতা উপনিষদ। যেহেতু গীতাতে স্বধর্মের কথা বলা আছে, তাই যারা স্বধর্মের চেতনা আনতে চাইছে তাদেরই শুধু গীতার উপদেশ দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু যারা একেবারে পুরোপুরি জাগতিক সুখ ভোগে ডুবে থাকতে চাইছে, স্বধর্মও করতে চাইছে না, তাদের জন্য গীতা একেবারেই নয়। এখন আমি যদি বলি তুমি যদি স্বধর্ম পালন কর তাহলে তোমার শরীর মন ভালো থাকবে, তুমি আরো ভালোভাবে সব কিছু ভোগ করতে পারবে, ভোগের লোভ দেখিয়ে এদেরকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে আসা হচ্ছে। এটা কিন্তু আদপেই গীতার উদ্দেশ্য নয়।

অর্জুনের সমস্যা হচ্ছে, যুদ্ধ করতে এসে তার মধ্যে শোক আর মোহ এসে গেছে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর শোক মোহ দূর করবার জন্য বললেন, তোমার নিজের স্বরূপকে জেনে নিলে তোমার শোক মোহ নাশ হয়ে যাবে। অর্জুনকে আত্মতত্ত্বের জ্ঞান দিয়ে দেখলেন অর্জুনের মধ্যে এই জ্ঞানের কোন প্রভাবই পড়ল না, অর্জুনের মনের কোন পরিবর্তনই হল না। এখান থেকে তিনি একেবারে সোজা রাস্তায় এসে বললেন – লোকেরা তোমার কাণ্ড দেখে হাসবে, *অবাচ্যবাদাংশ্চ বহূন্, নিন্দন্তস্তব সামর্থ্যং,* ইত্যাদি, এই রকমটি করো না। অর্জুন কিছু একটু বুঝল, কিন্তু পুরো ধাক্কাটা লাগেনি। তখন ভগবান বললেন – দ্যাখো, তোমাকে অনেক উঁচু কথা বললাম, এই কথা গুলো তোমার জন্য নয়, এবারে তোমার জন্য যেটা উপযুক্ত সেই কথা বলছি। তোমার পক্ষে উপযুক্ত হচ্ছে কর্মযোগ। কর্মযোগের কয়েকটা বৈশিষ্ট্য বললেন। যদি তুমি কর্মযোগের মাধ্যমে সাংখ্যযোগ লাভ করতে চাও, কারণ সাংখ্যযোগ হচ্ছে সব চাইতে উচ্চ অবস্থা, কর্মযোগের দ্বারাই তুমি এই উচ্চ অবস্থা অর্থাৎ সাংখ্যযোগের অবস্থাতে চলে যাবে, তাই বলে –*শ্রুতিবিপ্রতিপন্না তে যদা স্থাস্যতি নিশ্চলা,* মন যেন তোমার চঞ্চল না হয়। নিজের মনের মধ্যেই মনকে অবরুদ্ধ করে দিতে হবে, চার পাঁচটা বিষয়ের দিকে মনকে ছুটতে দিও না।

ভগবান আগে সাংখ্যযোগের কথা বললেন, সাংখ্যযোগের কথা বলে কর্মযোগের কথা বললেন, তারপর সাংখ্যযোগকে কর্মযোগে মিলিয়ে দিলেন। কিভাবে মেলালেন? যদি তুমি পাঁচটা জিনিষের দিকে দৌড়ানটা বন্ধ করে দাও, ঈশ্বরে যদি সব কর্মের ফল অর্পণ করে দিতে অনাসক্ত হতে পার তখন এই কর্মযোগই সাংখ্যযোগে রূপান্তরিত হয়ে যাবে।

অর্জুন এর আগে এত উঁচু কথা তো কখন শোনেনি, এত কথা শোনার পর অর্জুনের মাথা গেছে ঘুরে। তখন অর্জুন ভগবানকে প্রশ্ন করছেন, যে প্রশ্ন একটা সময় আমাদের সবারই মনে আসে, তা হচ্ছে –

অর্জুন উবাচ

**স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষা সমাধিস্থস্য কেশব। স্থিতধীঃ কিং প্রভাষেত কিমাসীত ব্রজেত কিম্।।৫৪।।**

অর্জুন অনেকক্ষণ ধরে সব শুনে যাচ্ছে, তখন থেকে শুনে যাচ্ছে সাংখ্যযোগ, কর্মযোগের কথা। ভগবান শুরু করলেন সাংখ্য দিয়ে তারপরেই কর্মযোগ, কর্মযোগে বললেন স্বধর্মের কথা। সব বলে শেষে আবার সাংখ্যকে কর্মের সঙ্গে জুড়ে দিচ্ছেন। জুড়ে দেওয়ার পর অর্জুনের মনে প্রশ্ন উঠছে, সাংখ্যযোগী আসলে কাকে বোঝাতে চাইছেন ভগবান, সাংখ্যযোগীকে দেখতে কি রকম। কথা তো সবাই বলতে পারে, উপদেশও সবাইকে দিয়ে দেওয়া যায়, কিন্তু দৃষ্টান্ত কোথায়। অনেক তো উপদেশ দিলেন, সাংখ্য সাংখ্য তো অনেক শুনলাম, এই সাংখ্যযোগীর একটা দৃষ্টান্ত দেখান। *স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষা,* সাংখ্যযোগীকে দেখতে কি রকম হয়, তাঁকে কিভাবে জানব যে ইনি সাংখ্যযোগী, স্থিতপ্রজ্ঞ? যিনি সমাধিবান পুরুষ তিনি কি রকম হন? আর *সমাধিস্থস্য কেশব,* সমাধিতে যখন থাকেন তখন কি রকম অবস্থা তাঁর হয়? *স্থিতধীঃ কিং প্রভাষতে,* লোকের সঙ্গে যখন আচরণ করেন তখন কি রকম কথা বলেন, তাঁর আচার ব্যবহার কেমন? আর *কিমাসীত,* যখন সমাধিতে থাকেন না, চুপচাপ বসে থাকেন তখন তিনি কি করেন? ঠাকুর বলছেন – লোকে বলে আমি তো চুপচাপ থাকতে পারিনা তাই দড়ি পাকাচ্ছি। আরেক জায়গায় গিয়ে ঠাকুর দেখছেন বুড়ো হয়ে গেছে কিন্তু এখনও তাস খেলে যাচ্ছে, যেন এখনও ভগবানের নাম নেওয়ার সময় হয়নি। *কিমাসীত,* মানে বসেন কি করে, তার মানে আসন করে বসে থাকার কথা বলা হচ্ছে না, তিনি যখন সমাধিতে নেই, কারুর সাথে কথাবার্তা বলছেন, একা একা রয়েছেন তখন তিনি কি রকম থাকেন? *ব্রজেত কীম্,* তাঁর হাঁটা চল, মানে লোকেদের সঙ্গে ব্যবহার কি রকম, আর কি ধরণের কথা বলেন? যখন একা থাকেন তখন তার আচরণ কি রকম, পাঁচ জনের সঙ্গে যখন রয়েছেন তখন কেমন আচরণ, সমাধিতে যখন আছেন, মন যখন তাঁর পরব্রহ্মে লীন হয়ে আছে তখন তাঁকে কি রকমটি দেখায়, তাঁর চরিত্রটা কি রকম?

এখানে যে স্থিতপ্রজ্ঞ বলা হচ্ছে, স্থিতপ্রজ্ঞ সাংখ্যযোগ আর কর্মযোগ এই দুই ধরণের লোকদের জন্যই বলা হচ্ছে। যাঁরা জ্ঞাননিষ্ঠাতে সমাধিবান, আর দ্বিতীয় জন হচ্ছেন, কর্মযোগ করে করে চিত্তশুদ্ধি হয়ে জ্ঞানী হয়ে গেছেন। জ্ঞানী দুই ভাবে হয়, একজন হচ্ছেন রাজার ব্যাটা, তিনি আত্মার স্বরূপ জেনে গেছেন, তিনি আর কিছুতেই নেই, এনারা স্থিতপ্রজ্ঞ। আর দ্বিতীয় জন বলছেন আমি কর্মযোগের পথ অবলম্বন করে আত্মার স্বরূপকে জানব। এখন কর্মযোগী হলে তাকে কি কি করতে হবে? যে কাজই করে থাকুন না কেন, সরকারী চাকরী, বেসরকারী চাকরী, রান্না করছেন, বাসন মাজছেন, যাই করুন না কেন এটা ঈশ্বরের পূজা। এও সবাই করতে পারেনা। কারণ আধ্যাত্মিক জ্ঞান সবার প্রাথমিক লক্ষ্য নয়। যিনি আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভ করতে চাইছেন তখন, স্বামী যখন স্ত্রীকে গালাগাল দেবে তখনও সেটা ঈশ্বরের পূজা, স্ত্রী যখন স্বামীকে গালাগাল দেবে সেটাও ঈশ্বরের পূজা, রিক্সাওয়ালার সঙ্গে যখন এক টাকার জন্য ঝগড়া করবে তখন সেটাও ঈশ্বরের পূজা, যাবতীয় যা কাজ করবে সবটাই ঈশ্বরের পূজা মনে করে করতে হবে। কর্মযোগের আরেকটি প্রধান শর্ত হচ্ছে অনাসক্ত ভাবে কাজ করা এবং দ্বন্দ্ব রহিত হতে হবে। কোন ধরণের সুখ দুঃখই মনকে দোলাবে না। পাঁচটা জিনিষের প্রতি মন দৌড়াবে না। এইভাবে কর্মযোগ করতে করতে মন পরিষ্কার হতে থাকবে। তখন আস্তে আস্তে মনটাকে মনের ভেতরে ঢুকিয়ে দিতে হবে। এইখান থেকেও স্থিতপ্রজ্ঞ হওয়া যায়। যাঁরা ভক্তির পথ অবলম্বন করছেন তাঁদের ক্ষেত্রেও এই একই জিনিষ প্রযোজ্য। যেখানে সাধারণ কর্মটাকে পূজা রূপে করছে, এখানে ভক্তি মানে সেটাও পূজো, সব কর্মই পূজা। যাঁরা জ্ঞানযোগ সাধন করছেন, রাজযোগ সাধন করছেন, অক্ষরব্রহ্ম যোগ করছেন, পুরুষোত্তম যোগ সাধন করছেন, গুণত্রয়বিভাগ যোগ করছে, যা যোগই করছেন সবটাই হচ্ছে কর্মযোগ। এইভাবে সাধনার মাধ্যমে যখন মন শুদ্ধ হয়ে গেল, মন মনের ভেতরে প্রবেশ করে গেল, তখন সেও স্থিতপ্রজ্ঞ। স্থিতপ্রজ্ঞের আক্ষরিক অর্থ হচ্ছে যাঁর বুদ্ধি স্থির হয়ে গেছে, নড়াচড়া করে না। এইটাই হচ্ছে হিন্দু ধর্মের চূড়ান্ত আদর্শ।

গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৫৫ থেকে ৭২ শ্লোক পর্যন্ত মানব জাতির চরম লক্ষ্য ও আদর্শের কথা বলা হয়েছে। মানব জীবনের উদ্দেশ্য কি, সেটা কি ভাবে প্রাপ্তি হবে আর তার ফল কি হবে, সব কিছু এই আঠারোটি শ্লোকে বর্ণনা করে দেওয়া হয়েছে। এই আঠারোটি শ্লোক হচ্ছে সাংখ্যযোগেরই বিস্তার। প্রথমের দিকে ভগবান অর্জুনকে সাংখ্যযোগের কথা বলেছেন, পরের দিকে কর্মযোগের কথা বলেছেন, কর্মযোগের ফলটাও বলে দিচ্ছেন, এই ফলটাও সাংখ্যযোগ। এই সাংখ্যে যে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলেন তিনি হয়ে গেলেন সমাধিবান পুরুষ, ইনিই স্থিতপ্রজ্ঞ।

১লা আগস্ট ২০১০

আগে আমরা যে জিনিষগুলি নিয়ে আলোচনা করে এসেছি, সেটাইকে আবার একটু ঝালিয়ে নেওয়া যাক। গীতার মূল বক্তব্য হচ্ছে শোক আর মোহকে নিয়ে, এই শোক আর মোহ আমাদের প্রকৃত স্বরূপ মানে আমাদের যে অনন্ত স্বরূপ তাকে ক্ষুদ্র করে দেয়, মনকে কৃপণ করে দেয়। আমাদের মনের যত রকমের ক্রিয়া বিক্রিয়া, মনের যত রকমের ধর্ম, মানে যত ইমোশান সবই হচ্ছে নেতিবাচক। গীতার মতে ইমোশান মাত্রই নেগেটিভ।

একজন আমেরিকান মনস্তাত্ত্বিক মানুষের ইমোশানের উপরে একটা বই লিখেছেন, বইটি অনেক ভাষায় অনুবাদ হয়েছে, আর প্রায় দশ লক্ষ বই ইতিমধ্যে বিক্রী হয়ে গেছে। উনি নিজের মত গবেষণা করে সিদ্ধান্তে আসছেন যে, মানুষ দশ মিনিটে গড়ে তিনটে করে মিথ্যে কথা বলে। অবশ্য এগুলো খুবই ছোটখাটো মিথ্যে কথা, যেমন আমাকে কেউ কিছু দিল আমি তাকে বললাম থ্যাঙ্ক্যু, কিন্তু আমার আদৌ কোন থ্যাঙ্কস্ দেওয়ার ইচ্ছে নেই, কিন্তু এই যে থ্যাঙ্ক্যু বলছি এটা মিথ্যে কথা। কেউ আমাকে ট্রেনে চা খাওয়াল, আমি বললাম থ্যাঙ্ক্যু, সে বলল মাই প্লেজার। কিন্তু আদপেই তার কোন প্লেজার হচ্ছে না, এটাও মিথ্যে কথা, বা একটি ছেলে একটি মেয়েকে বলছে আমি ভালোবাসি, আসলে কিন্তু ভালোবাসে না, এটাও মিথ্যে কথা। বিদেশে এই ধরণের তিন চারটে মিথ্যে কথা বলা যেতে পারে কিন্তু ভারতে এই ধরণের মিথ্যা কথা ভাবাই যায় না। এসব বলার পর একটা ঠিক কথা বলছেন যে, কোন মিথ্যে কথা বললেই মনের মধ্যে একটা চাপ হয়। আমাদের গ্রামের কেউ যদি একটা মিথ্যে কথা বলে তাহলে তার শরীর খারাপ হয়ে যাবে। এত বলার পরও উনি পাওয়ার অফ পজিটিভ থিঙ্কিং, পাওয়ার অফ পজিটিভ ইমোশান নিয়ে অনেক বড় বড় কথা বলছেন। কিন্তু ইমোশান কখনই পজিটিভ হয় না, ইমোশান সব সময় নেগেটিভই হয়।

আমাদের আচার্যরা এই কথাই বারবার বলে গেছেন। ব্যাসদেব ছিলেন মহাচার্য, তিনি গীতাতে অর্জুনের এই শোক মোহকে এক ভাবে উল্লেখ করছেন, শঙ্করাচার্য সেটাকে আবার ভাষ্য রূপে লিখছেন। শঙ্করাচার্য তাঁর ভাষ্যে বলছেন, মানুষের যত ধরণের ইমোশান আছে সবার মা দুটি, দুঃখজনিত যত রকমের ইমোশান তার মা হচ্ছে শোক, আর উৎফুল্লজনিত, সুখজনিত যত রকমের ইমোশান এর মা হচ্ছে মোহ। এই দুটোই মা, শোক আর মোহ, এই শোক আর মোহের বাইরে মনের আর কিছুই নেই। শোক হচ্ছে একটা জিনিষ ছিল সেটা চলে যাওয়াতে দুঃখ হচ্ছে আর মোহ হচ্ছে আমার নেই কিন্তু পেতে চাইছি। কোন কিছু পাওয়ার আশা করছি, যখন সেটা পেয়ে গেলাম তখন আনন্দ হচ্ছে। এই আনন্দকে আমি মনে করছি পজিটিভ, কিন্তু এই পজিটিভের জন্মদাত্রী হচ্ছে সেই নেগেটিভ মা। এই জন্যই বলা হচ্ছে ইমোশান মাত্রই নেগেটিভ, ইমোশান কখনই পজিটিভ হয় না। আমাদের কাছে ইমোশান

মানেই নেগেটিভ। এই নেগেটিভের আবার তারতম্য হবে, কখন বেশি নেগেটিভ কখন কম নেগেটিভ হবে। যে নেগেটিভ ইমোশান আমাকে মাটিতে ফেলে দিচ্ছে, যেখান থেকে উঠে দাঁড়াবার শক্তি আমি আর ফিরে পাচ্ছি না, সেই নেগেটিভ ইমোশান হচ্ছে ঠিক ঠিক খারাপ ইমোশান।

এই শোক আর মোহকে পার করা যায় কিভাবে? আমাদের আচার্যরা বলছেন একে পার করার দুটো উপায় আছে। একটা উপায় হচ্ছে উচ্চতম উপায় আরেকটি উচ্চতর উপায়। একটাকে উচ্চতম আরেকটা নিম্নতম বলা হচ্ছে না, উচ্চতম আর উচ্চতর, কারণ যেটা আমাকে পার করাচ্ছে সেটা কখন নিম্নতম হতে পারে না। উচ্চতম উপায় হচ্ছে আত্মজ্ঞানের মাধ্যমে শোক আর মোহকে পার করা। আত্মজ্ঞান মানে আমি জেনে গেলাম আমি সেই নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত সচ্চিদানন্দ। গীতাতে এই নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত সচ্চিদানন্দের উপর খুব বেশি একটা আলোচনা নেই, কিন্তু উপনিষদের সমস্ত আলোচনা একমাত্র বিশুদ্ধ চৈতন্যের উপরই কেন্দ্রীভূত। এই কারণে উপনিষদ সবাই বুঝতে পারে না। শুদ্ধ চৈতন্য, যা মানুষের প্রকৃত স্বরূপ, এটিকে মুষ্টিমেয় কয়েকজন ছাড়া কারুর পক্ষেই বোঝা সম্ভব নয়। উপনিষদ কত উপমা দিয়ে বোঝান সত্ত্বেও আমরা কিছুই ধারণা করতে পারিনা, যারা সামান্য একটু যাওবা বোঝেন কিন্তু তাদের ব্যবহারিকে ক্ষেত্রে ও আচরণে তাকে প্রয়োগ করতে পারেন না। অর্জুনের ক্ষেত্রেও এই একই ব্যাপার হয়েছে। এখানেও ভগবান বিশুদ্ধ চৈতন্যের কথা দিয়েই শুরু করেছিলেন, কিন্তু দেখলেন অর্জুন কিছুই বুঝতে পারছে না। সঙ্গে সঙ্গে ভগবান উচ্চতম প্রসঙ্গ থেকে সরে উচ্চতর প্রসঙ্গকে টেনে নিয়ে এসে বললেন – হে অর্জুন, তোমার কিন্তু জ্ঞানে অধিকার নেই। জ্ঞান অধিকার হচ্ছে, আমি যে শুদ্ধ চৈতন্য সচ্চিদানন্দ, এই ভাবকে ধারণা করে প্রতি মুহূর্তে ধরে রাখার ক্ষমতা যার আছে সেই হচ্ছে প্রকৃত জ্ঞানের অধিকারি। কিন্তু অর্জুন তুমি এই ভাবকে ধরে রাখতে পারবে না। সেইজন্য তুমি উচ্চতর উপায় অবলম্বন কর, মানে স্বধর্মের পথ, যোগের পথকে অবলম্বন করে যোগাভ্যাস কর।

যোগের পথ অবলম্বনের কথা বলে ভগবান অর্জুনকে কয়েকটি মূল কথা বলে দিলেন, যেগুলো আমরা এর আগে আলোচনা করে এসেছি। সব সময় কাজ করবে, কখনই আলস্য করে চুপচাপ বসে না থেকে সচেতন ভাবে কাজে লেগে থাকবে। ঠাকুর যিনি মুহুর্মুহু সমাধিতে চলে যাচ্ছেন, সমাধিতে না থাকলে যিনি এত উচ্চ দর্শনে কথা বলছেন, সেই ঠাকুরের রাত্রিতে প্রায়ই ঘুম হত না, হৃদয়রাম একদিন মাঝ রাতে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের ঘরে গিয়ে দেখছেন, সেদিনও ঠাকুরের যথারীতি ঘুম হয়নি, ঠাকুর বসে বসে সব্জি কাটছেন। তরকারি কাটা দেখে হৃদয়রাম আঁতকে উঠেছেন, ও মামা, তুমি একি করছ। ঠাকুর বলছেন, আমার ঘুম হচ্ছিল না, ভাবছিলাম কি করব, যারা আমার জন্য রান্না করে তারা বুঝতে পারেনা আমি কতটুকু খেতে পারি, বেশি হয়ে যায়, ফেলে দিতে হয়, এখানকার আনাজ নষ্ট হয়, কত টাকা নষ্ট হচ্ছে, টাকার কত দাম, আর টাকার জন্যই তো তুমি নিজের দেশ ছেড়ে এখানে কৈবর্ত্তের চাকরি করছ, তাই আমার যতটুকু লাগে ততটুকু সবজি বানিয়ে রাখছি। আচার্য শঙ্করও মাঝে মাঝে মন্তব্য করবেন, দুঃখটা কি? বলছেন অপরের গোলামি করা, মানে এখনকার কথায় চাকরি করা। গোলামির মত মনকে সঙ্কীর্ণ করার মত আর কোন কিছু নেই। সরকারী চাকরিতে তাও একটু স্বাধীনতা থাকে, কিন্তু প্রাইভেট চাকরিতে কোন স্বাধীনতাই নেই। ঠাকুরের এই বোধটা আছে যে এক কৈবর্ত্তের আমি চাকরি করছি, হৃদয়রামকেও আবার মনে করিয়ে দিচ্ছেন। ব্রাহ্মণ হয়ে একজন কৈবর্ত্তের চাকরি করতে হচ্ছে এর থেকে মর্ম পীড়াদায়ক আর কিছু নেই। ঠাকুর বলছেন, ঘুম হচ্ছে না বলে কাজ করছি, আমার জন্য আনাজ যেটা নষ্ট হচ্ছে সেটা যেন আর না হয়। বাড়িতে যখন কোন কাজ না থাকে তখন সবাই হয় টিভি দেখে আর তা নাহলে আজে বাজে খোস গল্প করে সময় নষ্ট করে, কিন্তু সেই সময় বাড়ির অন্যান্য কাজ যদি করে তাতে মন ভালো থাকে, শরীর ভালো থাকে, নিজের ঘরবাড়িও সাফসুতরো থাকে, বাড়িটা শ্রী সম্পন্ন হয়।

শ্রীকৃষ্ণ যে উচ্চ তত্ত্বের কথা বললেন তা অর্জুন ধারণাই করতে পারছে না। গীতার উচ্চতম উপদেশ ভগবান কি তাহলে অপাত্রে দিলেন? বলে, যদি শিষ্য খুব উচ্চ আধারের হয় তখন আচার্যের উপদেশ খুব প্রচার প্রসার পায়। অর্জুনকে অপাত্র ভগবান নিজেই বলছেন, *কর্মণ্যেবাধিকারস্তে,* তুমি কর্মের অধিকারি, জ্ঞানের অধিকারি তুমি নও। যে কোন জিনিষ যদি কোন জেদী লোককে বলে দেওয়া হয় এটা তোমার জন্য নয়, তুমি এটা পারবে না, এটা তুমি করো না। এখন সে ঐ কাজটাই করবার জন্য যে কোন ভাবে লেগে যাবে। অর্জুনকে যখনই বললেন যে জ্ঞানের অধিকারি তুমি নও, তুমি জ্ঞান পথে চলতে পারবে না, সঙ্গে সঙ্গে অর্জুন প্রশ্ন করছেন *স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষা,* যিনি জ্ঞানী তাঁর লক্ষণ কি? এখন শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের গুরু, শিষ্য প্রশ্ন যখন করেছে তখন কিছু উত্তর তো দিতে হবে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে ছাড়বেন না, অর্জুনকে দিয়ে স্বধর্মই করিয়ে নেবেন।

এখানে প্রশ্ন হচ্ছে, যিনি স্থিতপ্রজ্ঞ হয়ে গেছেন, যাঁর মন স্থির হয়ে গেছে, আমি কি ভাবে বুঝব যে তাঁর মন স্থির হয়ে গেছে, তাঁর কি কি লক্ষণ? মন স্থির দুই ভাবে হয়, যিনি আত্মজ্ঞানে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে নিয়েছেন, মানে যিনি বুঝে গেছেন আত্মা ছাড়া কিছু নেই, সচ্চিদানন্দ ছাড়া কিছু নেই, এই বোধ যার হয়ে গেছে তিনি স্থিতপ্রজ্ঞ, তিনি পরিব্রাজক পরমহংস, জ্ঞানমার্গ, সাংখ্য বুদ্ধি দিয়ে এখানে পৌঁছেছেন। আর দ্বিতীয় হচ্ছে, যাঁরা কর্ম করে করে এই বোধে চলে গেছেন। কি কাজ করে আর কিভাবে করে তাঁরা

এই অবস্থায় পৌঁছেছে? শ্রীকৃষ্ণ বলছেন অনাসক্ত ও নিষ্কাম ভাবে স্বধর্ম করে। এখন স্বধর্ম বলতে অনেকেই মনে করেন যে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যাদির যে কাজ, সেই কাজ করাকেই যেন ভগবান স্বধর্ম বলছেন। স্বধর্মের অনেক গুলো শর্ত আছে, আর বিভিন্ন স্মৃতিকাররা একে বিভিন্ন ভাবে ব্যাখ্যা করে গেছেন। স্বধর্মের মধ্যে মানব ধর্মও আছে, মানুষ হয়ে জন্ম নেওয়ার পর তার উপর যে যে কর্তব্যগুলো বর্তেছে সেটাও স্বধর্মের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, সবাইকে ভালোবাসা, সবাইকে সেবা করা ইত্যাদি। এ ছাড়া সে যে পদের দায়ীত্বে আছ, যে চাকরি করছে সব মিলিয়েই স্বধর্ম ঠিক করা হয়।

অর্জুনকে স্বধর্ম করার কথা বলা হচ্ছে। কিভাবে স্বধর্ম করবে? যে কাজটা করবে নিষ্কাম ভাবে কর, কোন ফলের আকাঙ্খা করবে না। সুখ-দুঃখ, জয়-পরাজয়, লাভ-ক্ষতি এই সব দ্বন্দ্ব থেকে নিজেকে মুক্ত রাখবে। আর ধীরে ধীরে সব কর্মের ফল ঈশ্বরে অর্পণ করার ভাবটাকে দৃঢ় কর। এইভাবে স্বধর্ম করতে করতে তোমার চিত্তশুদ্ধি হতে থাকবে। মন একেবারে পরিষ্কার হয়ে যাওয়ার পর ঈশ্বরের কৃপায় তুমি সেই অবস্থায় পৌঁছে যাবে যে অবস্থায় এই জ্ঞানমার্গীরা বা সাংখ্যযোগীরা পৌঁছান। জ্ঞানীরা যাঁরা ঐ অবস্থায় যাচ্ছেন তাঁদের ঈশ্বরের কৃপার দরকার হয় না, কারণ তিনি সব সময় নিজেকে ঈশ্বরের সঙ্গে একাত্ম বোধকে ধরে নিয়ে এগোচ্ছেন। এই আলোচনা গীতাতে বারবার চলতে থাকবে, সপ্তম অধ্যায়ে বলা হবে যে জ্ঞানী *ত্বাত্মৈব মে মতম্*, জ্ঞানী যাঁরা তাঁরা আমারই আত্মা। আর যাদের কর্তা আর কর্মের বোধ আছে, আমি তুমি এই ভেদ বুদ্ধি যাদের আছে, তাদের ক্ষেত্রে ঈশ্বরের কৃপা দরকার, ঈশ্বর কৃপা ছাড়া এরা মুক্তি পায় না। কোন্ কোন্ অবস্থায় ঈশ্বর কৃপা করেন, গীতাতে পর পর আসতে থাকবে, সেখানে শ্রীকৃষ্ণ বলবেন, আমি এটা করে দিই, আমি এটা দিয়ে দিই, এগুলোই হচ্ছে ঈশ্বরের কৃপা। ঈশ্বরের কৃপা লাভের সহজ উপায় হচ্ছে স্বধর্ম পালন।

ঠাকুর একবার বলছেন – আমি যদি বাল বিধবা হতাম, গ্রামে এক ফালি জমি থাকত, সেই জমিতে শাক বুনতাম, সূতো কাটতাম আর সারা দিন কৃষ্ণকে পতি ভেবে তাঁর নাম করতাম। ঠাকুর এই যে বিধবার কল্পনা করলেন, এই বিধবার স্বধর্ম এখন কি? একমাত্র কৃষ্ণ নাম করাই তার স্বধর্ম। সেইজন্য স্বধর্মের ধারণা অত্যন্ত গতিশীল, স্থিতিশীল ধারণা নয়। যেমন আমি একটা চাকরি করছি, আমি কারুর অধঃস্তন কর্মচারী, এখানে আমার স্বধর্ম এক রকম হবে। আগামীকাল আমি ম্যানেজার পদে চলে গেলাম তখন আমার স্বধর্ম পাল্টে যাবে। আমি যখন শৈশবে আছি তখন আমার স্বধর্ম এক রকম, যখন ছাত্র তখন অন্য রকম স্বধর্ম, অধ্যয়ণ করাই তখন আমার স্বধর্ম, আমি বিয়ে করলাম তখন অন্য রকম স্বধর্ম হয়ে যাবে, বাবা হয়ে গেলাম স্বধর্ম পাল্টে যাবে, ঠাকুর্দা হলাম আবার অন্য স্বধর্ম চলে এল। প্রত্যেক ব্যক্তির স্বধর্ম তাই সব সময় পরিবর্তনশীল।

শ্রীকৃষ্ণকে অর্জুন বলতে চাইছেন যে, আপনি তো আমাকে অনেক কথা বললেন সেই *বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়* থেকে শুরু করে *স্বধর্মপি চাবেক্ষ্য ন বিকম্পতুমর্হসি*, তারপরে বললেন *কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচেন*, এত সব কথা বলে বলেছেন যে এগুলোই আমাকে স্থিতপ্রজ্ঞের অবস্থায় নিয়ে যাবে, আমাকে জ্ঞানী বানিয়ে দেবে। কিন্তু আমি যে জ্ঞানী বা যাঁরা জ্ঞানী হচ্ছেন সেটা বুঝব কি করে? আগে জেনেনি যারা জ্ঞানী তারা কি রকমের হয়, জ্ঞানীকে দেখতে কি রকম, তিনি কি কি করেন, তিনি কিভাবে চলাফেরা করেন, অন্যদের সাথে তাঁর ব্যবহার, আচার আচরণ কেমন, যখন সমাধিতে থাকেন তখন তাঁর কি লক্ষণ, যেটা দেখে আমি বুঝতে পারব যে তিনি সমাধিস্থ? তিনি যখন কাজ করেন তখন কি কাজ আর কিভাবে করেন? শুধু অর্জুনের কেন, আমাদের সবারই মনে স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষকে নিয়ে এই ধরণের কৌতুহল হওয়াটা স্বাভাবিক। যাঁরা জ্ঞানী তাঁরাও তো প্রচুর কাজ করছেন, স্বামীজীও দেশে বিদেশে ঘুরে ঘুরে বেদান্তের প্রচার করে গেলেন, ঠাকুর ঘুরে ঘুরে এত মানুষকে উপদেশ দিচ্ছেন। স্থিতপ্রজ্ঞও কাজ করেন, তাঁরও মন খারাপ হয়, তিনিও ঝগড়া করেন। এঁদের সবই হবে কিন্তু কোথাও একটু তফাৎ থাকে। তফাৎটা কোথায় থাকে এর বিশদ ব্যাখ্যা গীতাতে পাওয়া যাবে না। কিন্তু পরবর্তি কালে গীতার ভাষ্যকাররা তাঁদের ভাষ্যের মধ্যে বিস্তৃত ভাবে বলে গেছেন। ভাষ্যের মধ্যে একটা জিনিষ যেটা খুব পরিষ্কার ভাবে বলা হয়েছে, সেটা হচ্ছে এনারা মমত্ব বর্জিত। মমত্ব বর্জিত হচ্ছে আমি আর আমার এই বোধটা জ্ঞানীদের থাকে না। এঁদের রাগ হচ্ছে পোড়া দড়ির মত, একটা দড়িকে পুড়িয়ে দিলে তার ছাইটা পড়ে আছে, দড়ির মতই লাগবে কিন্তু ফু দিলেই কিছু নেই, ঐ দড়ি দিয়ে আর বাঁধনের কাজ হবে না। অর্জুন তাই বলছেন আগে ফলটা তো দেখি তবেই না আমি ঠিক করব আমি এই জিনিষ চাইব কিনা। শুধু তাই নয়, আমি ভালো করে বিস্তারিত ভাবে জানতে চাই।

এখন ভগবান স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ বলতে গিয়ে এক এক করে অর্জুনের প্রশ্নের উত্তর দিতে শুরু করেছেন। ৫৫ থেকে ৭২ শ্লোক পর্যন্ত ভগবান যা যা বলছেন এর মধ্যে দুটো জিনিষ খুব গুরুত্বপূর্ণ। মানুষ বড় বড় কথা সব সময় শুনতে চায় না, সে চায় এই বড় বড় কথা মহাপুরুষদের চরিত্রে কিভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। ছোটবেলা থেকেই আমাদের মহাপুরুষদের জীবনী পড়তে দেওয়া হয়, কারণ মহাপুরুষদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য গুলো, তাঁরা কিভাবে বড় হয়েছেন, তাঁদের ব্যক্তিত্ব, গুণ আমাদের আকর্ষণ করে।

আচার্য শঙ্কর এই আঠারোটি শ্লোকের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে শুরুতে বলছেন – মহাপুরুষের যেটা লক্ষণ, তাঁদের যে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সেটাই সাধকের সাধ্য ও সাধন। সিদ্ধপুরুষ যে জিনিষ গুলো অনায়াসে করছেন সেই জিনিষ গুলোই সাধকরা অনেক কষ্ট করে দীর্ঘ দিন চেষ্টা করে যেতে থাকে। সিদ্ধপুরুষের কাছে যেটা স্বাভাবিক সেটাই সাধককে কষ্ট করে অর্জন করতে হয়। যে পাকা ড্রাইভার হয়তো সে ঘুমিয়ে ঘুমিয়েই গাড়ি চালিয়ে দেবে কিন্তু যে কাঁচা ড্রাইভার ফাঁকা রাস্তাতেও তার হাত কাঁপবে। সেইজন্য ঠাকুর বলছেন জ্ঞানী ভয়তরাসে। সাধারণ সাধকদের কথা ছেড়েই দিন, যারা সব শাস্ত্র বুঝে নিয়েছেন তাঁরাও ভয়ে কাঁপতে থাকেন। এটাই আচার্য বলছেন – *জ্ঞানী যত্র সাধ্যানি সাধনানি* – যেটা খুব কষ্ট করে সাধনা করা হয় সেটাই জ্ঞানীর *লক্ষণানি*, তাঁর সেটাই লক্ষণ হয়ে যায়, সেটাই তাঁর গুণ, সেটাই তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। শ্রীরামকৃষ্ণের ব্যক্তিত্বের যেটা বৈশিষ্ট্য সেটাই অন্য সাধকদের জন্য সাধনা। সাধক মনে করে ভগবান বুদ্ধ সিদ্ধিলাভের আগে আর সিদ্ধির পরে যা যা করেছিলেন, সেটা করলেই সেও ভগবান বুদ্ধ হয়ে যাবে। এটাই হল সাধনা। বেলুড়ে একজন আছেন যিনি ঠাকুরের জন্মতিথি উৎসবের দিনে ঠিক ঠাকুরের মত সেজে আসেন, ঠাকুরের মত ধুতি জামা, ঠাকুরের মত দাড়ি, আবার পেছনে একজন হৃদয়রাম সেজে ঠাকুরকে ধরে রাখে। অনেকে মনে করেন এই লোকটি বুঝি বহুরূপী। কিন্তু এ বহুরূপী নয়, এটাই তার সাধনা। ঠাকুর যে ভাবে হাঁটাচলা করতেন, যে রকম মুখের ভাবভঙ্গি করতেন, ঐটাকেই সে সাধনা করে নিয়েছে। লোকটি ভেবেছে ঠাকুর যে রকম পোশাক পড়তেন, চলতেন, যে ভঙ্গিমাতে কথা বলতেন ঐ রকম করতে পারলে আমিও হয়তো ঠাকুরের মত হতে পারব। ঠাকুরের স্থুল ভাবকে সাধনা করলে আর কিছু না হোক ভাবারোপ তো হবেই। কিন্তু আসল হচ্ছে ঠাকুরের লক্ষণ, তাঁর চরিত্রের বৈশিষ্ট্যগুলোকে নকল করতে পারলে সে কিন্তু ওখানে পৌঁছাবেই। তবে দুজন মহাপুরুষ কখন সমান হন না। যিশু আর শ্রীরামকৃষ্ণ একই রকম আচরণ করবেন না। কিন্তু লক্ষণ গুলো সবার একই রকম হবে। সেই লক্ষণ গুলো কি রকম এই আঠারোটি শ্লোকে বলছেন। এই কটি শ্লোক মূলতঃ সাংখ্যযোগেরই বিস্তারিত ব্যাখ্যা। সাংখ্য বুদ্ধি যখন হয়ে যায়, অর্থাৎ ঈশ্বরে তাঁর মন পুরোপুরি আবিষ্ট হয়ে গেছে, ব্রহ্মে বা আত্মজ্ঞানে তাঁর মন পুরোপুরি প্রতিষ্ঠিত। তখন কি হয় –

শ্রীভগবানুবাচ

**প্রজহাতি যদা কামান্ সর্বান্ পার্থ মনোগতান্। আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে।।৫৫।।**

যিনি জ্ঞানী, যিনি ভক্ত, যিনি মহাপুরুষ এঁদের সব কিছুকে এই একটি শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে। গীতার যত গভীর ও উচ্চ ভাবের শ্লোক আছে তার মধ্যে এই শ্লোকটি অন্যতম। যিনি আধ্যাত্মিক মহাপুরুষ তাঁর বৈশিষ্ট্যের সব কিছুকে এখানে সূত্রাকারে সংক্ষেপে বলা হয়েছে। মনের মধ্যে যত রকমের, যত ধরণের কামনা বাসনা আছে তাঁর সব খসে পড়ে গেছে। যাঁর সব কামনা বাসনা খসে গেছে সেটা কিভাবে আমরা জানব? আমরা বাইরে থেকে জানতে পারব না, এটা যাঁর হয়েছে তিনিই একমাত্র বলতে পারবেন, কারণ এটা হচ্ছে স্বসংবেদ্য। তিনি কিভাবে থাকেন? *আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ*, নিজের আত্মাতেই আত্মা অবস্থান করে থাকে আর আত্মাতেই তিনি সব তুষ্টি পান, মানে বাইরের কোন জিনিষ উপর তাঁর তুষ্টি নির্ভর করে থাকেনা। এই শ্লোকটিকে কেন গভীর মর্মার্থক বলা হচ্ছে এইখানে বোঝা যায়। এই *আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ* এর অর্থ হচ্ছে, যিনি নিজের আত্মাতেই আত্মার তুষ্টি পান তাঁর আর কোন কাজ করার প্রয়োজন হবে না। কারণ কাজ সব সময় হয় অভাব বোধ থেকে, কাজ মানেই অভাববোধ, অভাববোধ মানে আমার মনে কামনা বাসনা আছে। তার আগেই বলে দেওয়া হয়েছে তাঁর কামনা বাসনা সব খসে পড়ে গেছে। তাই এখানে অভাববোধের প্রশ্নই উঠছে না।

এখন যারা গাঁজা খেয়ে, আফিং খেয়ে, ড্রাগস নিয়ে নিজের মধ্যে বুঁদ হয়ে পড়ে আছে, আবার যে কোমাতে পড়ে আছে তারও এই একই অবস্থা, তাহলে কি *আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ* যিনি তাঁর সাথে এরা এক হবে? কখনই এক হবে না, প্রথম কথা মন থেকে সব কামনা বাসনা চলে গেছে, দ্বিতীয় কথা হচ্ছে বাইরের কোন ধরণের সহায়তার উপর তিনি নির্ভর করেন না। গাঁজা, আফিং, ড্রাগস এগুলো হচ্ছে বাইরের সহায়তা, গাঁজা, আফিং এর নেশা যখন চলে যাবে তখন আবার তার মধ্যে সুপ্ত কামনা বাসনা গুলো জেগে উঠবে। স্থিতপ্রজ্ঞের কোন ধরণের বাহ্যিক সহায়তার প্রয়োজন হয় না, নিজের আত্মার আনন্দেই মশগুল থাকেন, সেইজন্য এঁদের বলা হয় আত্মারাম। এটা কি করে সম্ভব হচ্ছে? কারণ মনের মধ্যে কোন কামনা বাসনা নেই। যার মনের মধ্যে কোন কামনা বাসনা নেই তাকে আর বিরক্ত করবে কে।

আচার্য তাঁর ভাষ্যে আরও বিস্তৃত করে বলছেন – যিনি পুত্রৈষণা, বিত্তৈষণা আর লোকৈষণা এই তিনটে এষণাকে ত্যাগ করে দিয়েছেন, যেটাকে ঠাকুর তাঁর নিজের ভাষাতে বলছেন কামিনী-কাঞ্চন আর নাম-যশ। আমাদের বেদ উপনিষদে আগে নাম-যশ না বলে লোকৈষণা বলা হত, লোকৈষণার অর্থ হচ্ছে মৃত্যুর পর স্বর্গপ্রাপ্তি। মৃত্যুর পর যাতে স্বর্গপ্রাপ্তি হয় তার জন্য এই জীবনে এই লোকে কিছু কর্ম করার কথা বলা হত, যজ্ঞাদি করার কথা, দানাদি করার কথা বলা হত। এর ফলে এই জগতে তার জীবিত অবস্থাতে নাম যশ প্রতিষ্ঠা হত আর বিশ্বাস করত মৃত্যুর পর সে স্বর্গলোকে যাবে। যিনি স্থিতপ্রজ্ঞ তিনি এই লোকৈষণার পারে চলে গেছেন, আর পুত্রৈষণা, বিত্তৈষণা এখন কামিনী আর কাঞ্চনের মধ্যে চলে এসেছে। যারা অধর্ম করছে, লোককে ঠকিয়ে পয়সা রোজগার করছে, আজকে একজনকে ছেড়ে পরশু আরেক জনকে বিয়ে করছে এখানে তাদের কোন কথাই বলা হচ্ছে না। এখানে

বলা হচ্ছে যারা ধর্ম পথকে অবলম্বন করে অর্থ রোজগার করছে, ধর্মের মাধ্যমে নাম যশ প্রতিষ্ঠা পেতে চাইছে, তাদের কথা বলা হচ্ছে। যেমন হিন্দু ধর্মে বিবাহ শুধু ইন্দ্রিয় সুখ চরিতার্থের জন্যই করা হয় না, ইন্দ্রিয় সুখ চরিতার্থ করার জন্য তোমাকে অনেক কিছুই, ভালো বাড়ি, ভালো খাওয়া-দাওয়া, ভালো পোষাক দেওয়া যেতে পারে কিন্তু বিবাহ শুধু সন্তান প্রাপ্তির জন্যই করা হত। সেইজন্য বিয়ের সময় ভালো বাড়ির মেয়ের সন্ধান করা হত, মেয়ের বংশ, শিক্ষ-দীক্ষা সব দেখা হত। আমরা যে ভবিষ্যত নিরাপত্তার কথা বলি সেটা সন্তানের মাধ্যমে পাওয়া যায়। যেমন বংশকে ধরে রাখার জন্য বিবাহের মাধ্যমে একটা সংসার চাওয়া হচ্ছে, একে আমরা নিরাপত্তার অর্থে নিতে পারি, বংশের ধারাকে বজায় রাখার প্রয়োজন বলতে পারি বা নরক থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যও নিতে পারি। যেটাই হোক না কেন মূল হচ্ছে পুত্র প্রাপ্তি। একটা ছেলে মেয়েকে দেখে পছন্দ করে বিয়ে করে নিল, স্বামীজী এই ধরণের বিয়ের প্রচণ্ড নিন্দা করতেন। এখানে এদেরকে আলোচনার মধ্যেই আনা হচ্ছে না, যারা ধর্ম মতে বিয়ে করেছে আর সন্তান কামনা করছে, ধর্ম পথকে অবলম্বন করে অর্থোপার্জন করছে, আর ধর্ম পথে স্বর্গ পাওয়ার জন্য ভালো কাজ করছে তাদের কথা বলা হচ্ছে। এখানে তাঁদের কথাই বলা হচ্ছে যাদের এই তিনটে এষণা খসে পড়ে গেছে। আমাদের যা কিছু কামনা এই তিনটেকে কেন্দ্র করেই ঘুরপাক করবে। যারা রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ বিশ্ববিদ্যালয়ে শাস্ত্র অধ্যয়ণ করতে আসছেন, তাঁরা কত কষ্ট করে, কত অর্থ ব্যয় করে, রোদ বৃষ্টি শীত গ্রীষ্মকে উপেক্ষা করে, দুপুরের বিশ্রামকে বিসর্জন দিয়ে এখানে আসছেন, তাঁরা কি সন্তান পাওয়ার জন্য আসছেন, নাকি নাম যশ পাওয়ার জন্য আসছেন, নাকি স্বর্গ পাওয়ার জন্য আসছেন। এর কোনটার জন্যই আসছেন না, শুধু শাস্ত্র অধ্যয়ণ করার জন্যই এখানে আসছেন, এইটাই হচ্ছে ঠিক ঠিক নিষ্কাম কর্ম, এটাই হচ্ছে স্বধর্ম। এই শাস্ত্র অধ্যয়ণ করে যখন সাধনা শুরু হবে, আমি ঠিক করে নিয়েছি জাগতিক কোন কিছুতে আর মন দেব না। সাধনা করে করে মন যখন পরিষ্কার হতে থাকবে, সমস্যা তখন শুরু হবে। মন যখন পবিত্র হয় তখনই আধ্যাত্মিক পথের বিঘ্ন গুলি আসতে থাকে। এখন যে টুকটাক বিঘ্ন আসছে, ক্লাশে ঘুম পেয়ে যাওয়া, বাড়িতে অতিথি এসে গেছে আজকে ক্লাশে যেতে পারলাম না, এগুলো কোন বিঘ্ন নয়। কিন্তু মন পবিত্র হওয়ার পর যে বিঘ্ন গুলো আসে সেগুলোকে উপড়ে ফেলা প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। তখন বিত্তৈষণা আসে, ভোগের জন্য নয়, একটু দান ধ্যান করব, তীর্থে ঘুরব, আমার নামে একটা মন্দির যদি বানাতে পারতাম। পুত্রৈষণা, কোথাও মনের মধ্যে একটা তখন ইচ্ছে হয় যে যদি আমার কোন সন্তান থাকে, গয়াতে আমার পিণ্ড দান করবে, আমি স্বর্গে যাব, এই বাসনা গুলোর এত ক্ষমতা যে লক্ষ্য থেকে ছিটকে ফেলে দেবে। ঠাকুরও বলছেন – আমার এক সময় খুব ইচ্ছে হত গরীব দুঃখীদের দান করব, তখন মা একজন একজন করে রসদদার পাঠিয়ে দিলেন। অবতারের মনেও ইচ্ছে হচ্ছে একটু সেবা কাজ করি। এই বিঘ্ন গুলো খুব উচ্চ অবস্থায় আসে।

আধ্যাত্মিক জগতে যাঁরা এগিয়ে গেছেন তাঁদের জন্যই শঙ্করাচার্যের ভাষ্য, সাধারণের জন্য শঙ্করাচার্যের ভাষ্য নয়। পুত্রৈষণা, বিত্তৈষণা আর লোকৈষণা, কাদের জন্য বলা হচ্ছে? যাদের মন সাধনা করে করে পবিত্র হয়ে গেছে। সারা জগতের লোক টাকা চাইছে, নাম যশ চাইছে, যারা ঝুপড়ি বা ফুটপাথে দিন কাটায় তারাও এই জিনিষ চাইছে, এখানে তাদের কথা বলা হচ্ছে না, শঙ্করাচার্য তাদেরকে অনেক আগেই বাদ দিয়ে রেখেছেন। যারা আধ্যাত্মিক পথে অনেক এগিয়ে গেছেন তাদের কথাই বলা হচ্ছে, তাদের একটা সময় এই বিঘ্ন গুলো আসে। এখন অনেক ভক্ত বলতে পারেন, আমাদের কাছে স্বর্গ-ফর্গ অনেক দিন আগেই ফালতু হয়ে গেছে, যেদিন থেকে ঠাকুরের পায়ে আশ্রয় নিয়েছি সেদিন থেকেই রামকৃষ্ণলোকে আমার সিট বুকিং হয়ে গেছে। কিন্তু একটা সময়ের পর, বিশেষ করে যখন বয়স হতে থাকে, তখন মৃত্যু ভয় এসে যায়, তখন হিন্দু সংস্কার বশতঃ মনের মধ্যে এই সংশয় ভীতি আসে – মরে গেলে আবার কোথায় জন্ম নেব। স্বর্গলোক আর ভালো যোনিতে বা ভালো বংশে জন্ম নেওয়ার বাসনা একই ব্যাপার।

কিন্তু যিনি মহাপুরুষ, তিনি এই তিনটেকে পার করে যান, তাঁর কখনই পুত্রের ইচ্ছা, টাকা পয়সার ইচ্ছা, এই জগতে নাম যশ আর মৃত্যুর পর স্বর্গলোকের ইচ্ছা হবে না। টাকা পয়সার ইচ্ছে হয়ত আসবে কিন্তু তার জন্য চেষ্টা করবে না। কোন সাধুই চেষ্টা করে কিছু টাকা পয়সা উপার্জনের ফিকির খুঁজতে যাবে না। তখনই তিনি আত্মারাম হয়ে যান, নিজের মধ্যে মস্ত হয়ে থাকেন। আত্মারাম হওয়ার জন্য বিজ্ঞানীর অবস্থা হতে হয়, অর্থাৎ সাক্ষাৎ দর্শন করতে হয়। শঙ্করাচার্য যে অবস্থার কথা ভাষ্যে বলছেন এটা হচ্ছে সব থেকে উচ্চ অবস্থার কথা। আত্মারাম জগতের সঙ্গে কখনই কোন ব্যাপারে জড়াবেন না। প্রথম হচ্ছে জগতের ব্যাপারে আর কোন আগ্রহ থাকবে না, নতুন লোকের সঙ্গে পরিচয় করব, নতুন জায়গা দেখব এই ইচ্ছেগুলো মনের মধ্যে কখনই উদয় হবে না। দিনে চার ঘণ্টা পাঁচ ঘণ্টা টানা জপ ধ্যান করার পরে দশ বছর কেটে যাওয়ার পরেও যদি এই তিনটে এষণা না আসে তাহলে বুঝতে হবে সে মোটামুটি এই তিনটেকে পার করে গেছে। যা আসার এই দশ বছরের মধ্যেই আসবে। কিন্তু শেষ অবস্থায় মনে একটা বাসনা হয় যে লোকে জানুক আমি একজন ভালো সাধু। সাধুর শেষ অহঙ্কার হচ্ছে আমি শ্রেষ্ঠ সাধু। তারও পরে একটা হয় গুরু হওয়ার ইচ্ছে, আমি জগতকে উপদেশ দেব। এটাকেও যখন পার করে দেবে তখন আত্মারাম হয়ে যাবে। এই বাসনাগুলো অত্যন্ত সূক্ষ্ম স্তরে হয়ে, বোঝাও যায় না, তবে এগুলো জাগতিক কোন কিছু নয়।

এই শ্লোকে বলছেন *আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ*, মন শান্ত হয়ে গেছে, এখন আর উন্মত্ত প্রমত্তবৎ নয়। রাস্তার পাগল গুলোরও কোন কামনা বাসনা নেই, পাগলদের দেখা যায় গরমের মধ্যে গায়ে একটা কম্বল চাপিয়ে চলছে, খেলো কি খেলো না কোন ঠিক নেই, কোথায় ঘুমাবে, কোথায় বসবে কোন ঠিক নেই। যাঁরা আত্মারাম তাদের মন থেকে কামনা বাসনা খসে গেছে তারাও কি এই পাগল গুলোর মত আচরণ করবেন? না না, তিনি সব সময়ই তুষ্ট। কোথায় তাঁর সন্তুষ্টি? মা যেমন নিজের সন্তানকে দেখে সন্তুষ্টি মেটায়, বিষয়ী নিজের ব্যাঙ্কের পাসবুকটা উল্টেপাল্টে দেখবে কত টাকা ব্যাঙ্কে জমেছে, ঐটা দেখেই তার সন্তুষ্টি। কোন বিষয় থেকে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আত্মারামের তুষ্টি আসে না, তিনি নিজের যে স্বরূপ সেই আত্মাতেই তুষ্ট। আত্মারামকে অনেক সময় শিবের সঙ্গে তুলনা করা হয়। শিবের বেশির ভাগ ছবিতে শিবকে সমাধিতে দেখান হয়, যদিও শিবের নামে অনেক কাহিনী প্রচলিত হয়ে আছে, পার্বতীর সাথে ঘুরে বেড়ান, ষাঁড়ের পিঠে চড়েন, কিন্তু শিবের এগুলো আসল রূপ নয়, তাঁর আসল ছবি হচ্ছে পালকি মেরে ধ্যানে বসে নিজের স্বরূপ চিন্তনে ডুবে আছেন। ঐটাই হচ্ছে যোগীর ঠিক ঠিক ছবি, যোগী সব সময় এইভাবেই থাকেন। অর্জুনের প্রশ্ন ছিল সমাধিবান পুরুষ কিভাবে থাকেন? এখানে সেই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়ে গেল। এর পরে বলছেন –

**দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ। বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে।।৫৬।।**

প্রথমে বললেন সমাধিবান পুরুষ কিভাবে থাকেন। এখন *কিং প্রভাষেত*, কি ভাবে চলেন, কথা বলেন বলা হচ্ছে। সমাধিবান পুরুষের কি দুঃখ হয় না? খুব হয়, কিন্তু দুঃখে উদ্বিগ্ন হন না। দুঃখ হলে সাধারণ মানুষ ছটফট করতে শুরু করে, কি করলে এই দুঃখটা নিবারণ হবে তার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতে থাকবে। যিনি পরমহংস তিনি কখনই এই রকম দুঃখে কাতর হয়ে ছটফট করেন না আর কিভাবে দুঃখটা দূর করা যাবে সেই নিয়েও ওনার মন কখনই উদ্বিগ্ন হবে না। আর বলছেন সুখ হলে তিনি *বিগতস্পৃহঃ*, সুখ আসার এসেছে ও কিছু না। যাঁরা জ্ঞানী তাদেরও সুখ-দুঃখ হয় যারা অজ্ঞানী তাদেও সুখ-দুঃখ হয়। অজ্ঞানীর সুখ হলে বলবে আমি কি ধন্য, আমার মত কেউ সুখী নেই, চল যাই ভালো করে মন্দিরে একটা পূজা দেওয়া যাক যাতে এই সুখটাকে ধরে রাখতে পারি, এই দিন যেন চিরদিন দেখতে পাই, আবার দুঃখ হলে বলবে আমার মত অভাগা দুনিয়ায় কেউ নেই, কোন জন্মে কি পাপ করেছিলাম কে জানে। এরপরেই কোন জ্যোতিষী কিংবা কোন বাবাজীর কাছে যাবে মাদুলি আর পাথর জোগাড় করতে। জ্ঞানী বলেন আমার কোন পূর্ব জন্মে কিছু গোলমাল ছিল তাই এই কষ্ট এসেছে, আর সুখ হলে বলেন, কোন পূর্বজন্মে আমার সুকৃতি ছিল তাই এই সুখ এসেছে। মনে মনে এটা ভেবে তিনি শান্ত হয়ে যাবেন। অজ্ঞানীদের দুটো জিনিষ হয়, প্রথম হচ্ছে যেটা খারাপ হওয়ার কথা সেটাকে কোন ভাবেই আটকান যাবে না, সেটা আসবার সেটা আসবেই আসবে, এই জিনিষটাকে অজ্ঞানী বুঝতে চায় না বলে সে এদিক ওদিক দৌড়াদৌড়ি করবে, এক গাদা টাকার শ্রাদ্ধ করবে, শারীরিক পরিশ্রম হবে, এই কষ্টগুলো হচ্ছে বাড়তি, মূলধনের উপর এগুলো সুদ। আর যখন সুখ হচ্ছে তখনও বন্ধু বান্ধবদের নিয়ে লাফালাফি করবে, একে খাওয়াবে তাকে উপহার দেবে, আর যেই সুখটা হাত থেকে বেরিয়ে যাবে তখন আবার হা হুতাশ করবে। অজ্ঞানীরা এই ভাবেই সুখ আর দুঃখের মধ্যে নাস্তানুবুদ হয়ে ঘুরপাক খেয়ে যাচ্ছে।

জ্ঞানীদের যখন খারাপ কিছু হয় তখন তাঁদেরও মন খারাপ হয়, যিনি পরমহংস পরিব্রাজক তাঁরও একটা অবস্থা পর্যন্ত খুব ধাক্কা লাগবে, দুঃখ-কষ্ট হবে, দু-চার মিনিট মন খারাপ হবে, কিন্তু একটু নড়ে গিয়েই আবার সোজা হয়ে যাবেন। আর ভালো কিছু হলে তাঁরও ভালো লাগে, স্বামীজীর চিঠিতেই তাঁর যখন একেকটা জিনিষে আনন্দ হচ্ছে তখন কি সুন্দর ভাবে অভিব্যক্ত করছেন সেই আনন্দকে, আবার যখন কাছের কেউ ছেড়ে চলে যাচ্ছে তখন তিনি দুঃখও পাচ্ছেন। নরেনের বিয়ে হবে ভেবে ঠাকুরেরও মন খারাপ হয়েছিল। আবার কেশবের শরীর খারাপের খবর পেয়ে তিনি সিদ্ধেশ্বরী কালীবাড়িতে কেশবের শরীর ভালো হওয়ার জন্য ডাব-চিনি মেনে ছিলেন। কিন্তু এই সুখ-দুঃখ তাঁর সেই গভীর ভাবকে স্পর্শ করতে পারে না। কি সেই ভাব? আমি যে সেই শুদ্ধ চৈতন্য, আমি আত্মা সেই আত্মার সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই, এই ভাবটাকে কোন ভাবেই এই জিনিষ গুলো স্পর্শ করতে পারে না, ওখান থেকে তাঁদের মনকে কোন কিছুই নড়াতে পারবে না।

এখানে যে স্থিতপ্রজ্ঞের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে স্থিতপ্রজ্ঞের এই অবস্থার সাথে ত্রৈলঙ্গস্বামীর খুব মিল পাওয়া যায়। গীতাতে যে স্থিতপ্রজ্ঞের অনেক গুলো বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, সব বর্ণনাই কিন্তু এক রকম নয়। ঠাকুরই কতকগুলো অবস্থার কথা বলছেন – বালকবৎ, পিশাচবৎ, উন্মাদবৎ ও জড়বৎ। এখানে একটা ভাবের বর্ণনা করা হয়েছে। অজ্ঞানী যখন আনন্দযুক্ত কোন কাজ করবে, যেমন মেয়ের বিয়ের সময় সবাইকে জানিয়ে এমন ঢাকঢোল পিটিয়ে করবে যে পাড়ার লোকের ঘুম ছুটে যাবে, আর কত রকমের এলাহি খাবার দাবার। ঠাকুর বলছেন – মেয়ের বিয়েতে এত টাকা খরচ করছে আর পাশের বাড়ির লোক খেতে পাচ্ছেনা তার কোন খোঁজ নেয় না, লজ্জাও করে না। কিন্তু যিনি জ্ঞানী তিনি মেয়ের বিয়ে, ছেলের পৈতা এগুলো কর্তব্য বোধে করেন।

যিনি *স্থিতধীঃ* তাঁর কোন কিছুর প্রতি আসক্তিও নেই, কোন কিছুর থেকে ভয়ও নেই, আর তিনি সব সময় ক্রোধ রহিত। যখনই কোন উদ্বেগ হয় তখন একটা অনুতাপ আসে। *স্পৃহকে* আচার্য বলছেন *হর্ষাত্মিকা বুদ্ধি*, *ভয়কে* বলছেন *দ্বৈতাত্মিকা বুদ্ধি*, দ্বৈত

ভাবের থেকে ভয় আর *ক্রোধ*কে বলছেন – *অভিজ্বলনাত্মিকা*, আগুন লাগলে যেমন জ্বলন হয়, ক্রোধে এই জ্বলন বৃত্তি এসে গিয়ে সমস্ত শরীর মনের মধ্যে জ্বালা ধরিয়ে দেবে আর শেষে *রাগ* হচ্ছে *রঞ্জনাত্মিকা*, যেখানে মন আনন্দ পায়, রাজযোগ যাকে বলছে *সুখানুশয়ী রাগঃ*, যেখানে মন সুখ পায় সেটাকেই বলা হয় রাগ। যত রকমের ইমোশানস্ আছে এখানে সব কটাকে নেতিবাচক বলে দেওয়া হল। শুধু মাত্র শোক আর মোহের জন্যই ইমোশানকে নেগেটিভ বলা হচ্ছে না, যত ইমোশানস্ আছে সব ইমোশানই হল নেতিবাচক, বন্ধনের কারণ। দুঃখ, উদ্বেগ, সুখ, স্পৃহা, রাগ, ক্রোধ সব কটাকেই গীতা নেতিবাচক বলছে। যিনি স্থিতপ্রজ্ঞ তাঁকে এই ধরণের কোন ইমোশান স্পর্শ করতে পারে না। কিন্তু তাঁরও রাগ হয়, সুখ হয়, সবই হয়। ঠাকুর বলছেন – হ্যাঁগো, এখানকার মত আর কোথাও দেখেছ? যাকে জিজ্ঞেস করছেন সে বলছে – না, আপনার মত কেউ নেই। কেন নেই? কারণ আপনার রাগ নেই। ঠাকুর তখন বলছেন – কেন সেদিন তো ঘোড়াওয়ালা সময়ে আসেনি বলে রেগে গিয়েছিলাম। ভক্ত বলছে ওটা আপনার লোকশিক্ষার জন্য। এখানে ঠাকুরও রাগ করছেন, ঠাকুরকে যে প্রথম দেখছে, এর আগে কোন দিন দেখেনি সে তো এখানে দেখছে ঠাকুরও রাগ করছেন। কিন্তু ঠাকুরের যে রাগ, পরমহংসরা যে রাগ দেখান সেটা হচ্ছে সাপের ফোঁস করা, ওর মধ্যে বিষ নেই।

দুঃখটা হচ্ছে, যখন আসে তক্ষুনি সেটাকে যে কোন ভাবে ছুঁড়ে ফেলে দিতে চাই, যেটাকে আমি চাইছি না, কিন্তু এসে যাচ্ছে, এইটাই দুঃখ আর যেটা আমি চাইছি সেটা এসে গেছে আর আমি ছাড়তে চাইছি না, ধরে রাখছি, তার মানে হল ঐ জিনিষটা থেকে আমি সুখ পাচ্ছি। তুলসীদাসের একটা দোঁহাতে বলছেন – সন্ত আর অসৎ দুই জনকেই আমার প্রণাম। সন্ত পুরুষরা কাছে এসে আনন্দ দেন আর দুষ্ট লোক কাছ থেকে চলে গিয়ে আনন্দ দেয়। দুজনেই আনন্দ দিচ্ছে, একজন এসে আনন্দ দিচ্ছেন আরেক জন দূরে চলে গিয়ে আনন্দ দিচ্ছে। সুখ এসে আনন্দ দেয় আর দুঃখ চলে গিয়ে আনন্দ দেয়। কিন্তু যিনি স্থিতপ্রজ্ঞ তাঁর কোনটাতেই কোন বিকার নেই, যৎ আয়াতু তৎ আয়াতু, যৎ প্রয়াতু প্রয়াতু তৎ। যেটা আসতে চাইছে আসুক, যেটা চলে যেতে চাইছে চলে যাক। এটাকেই কর্মযোগের বক্তৃতাতে স্বামীজী বলছেন – Avoid not, seek not. কোন জিনিষকে প্রত্যাখ্যান করার দরকার নেই, আবার কোন জিনিষকে আবাহনও করার দরকার নেই। সুখ যখন আসে আমরা সেটাকে ধরে রাখতে চাই, দুঃখ যখন আসে সেটাকে ঝেড়ে ফেলে দিতে চাই। এর কোনটাই তুমি করবে না। ফলে কি হবে?

**যঃ সর্বত্রানভিস্নেহস্তত্তৎ প্রাপ্য শুভাশুভম্। নাভিনন্দতি ন দ্বেষ্টি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা**।।৫৭।।

স্থিতপ্রজ্ঞ কোন কিছুকে অভিনন্দনও করেন না আবার কোন কিছুকে দ্বেষও করেন না, এখানে দ্বেষ মানে কোন কিছু থেকে পালিয়ে আসেন না, *দ্বেষ্টি* মানে নিন্দা করা, *অভিনন্দতি* মানে প্রশংসা করা। শুভ অশুভকে লাভ করে ভালো মন্দকে পেয়ে ভেতর থেকে কোন ধরণের উচ্ছ্বাস হবে না আবার কাউকে ধিক্ ধিক্ করে ছোটও করবেন না। *সর্বত্রানভিস্নেহ* – সব কিছুর প্রতি তাঁর অভিস্নেহ, মানে ভালোবাস, আকর্ষণ, স্নেহ সব চলে গেছে। কিসের জন্য চলে গেছে? আচার্য শঙ্কর বলছেন – নিজের শরীর যে এত প্রিয়, সেই শরীরের প্রতি, জীবনের প্রতি স্নেহটাও চলে যায়। তিনি যে বেঁচে আছেন এর জন্যও চিন্তা করছেন না, তিনি যে মরে যেতে চাইছেন তাও না। বেঁচে আছি ঠিক আছে, মরে যাব তাও ঠিক আছে। কোনটাতেই তাঁর কোন ধরণের কিছু প্রতিক্রিয়া হয় না। সন্ন্যাসীর এইটাই হচ্ছে বিশেষত্ব, তাঁর বাঁচারও স্পৃহা নেই, আর আমি মরে যাব এই কথাও তিনি বলবেন না। দেহ থাকলেও ভালো, মৃত্যু এসে দেহটাকে নাশ করে দিল তাও ভালো। জগতের যত রকমের জিনিষের প্রতি অভিস্নেহ হতে পারে সমস্ত অভিস্নেহ বর্জিতম, কোন জিনিষের প্রতি তাঁর যে আকর্ষণ আসবে তাও না। ৫৪ নং শ্লোকে অর্জুনের প্রশ্ন ছিল *কিমাসীত ব্রজেত কিম্*, জগতে যখন তিনি বিচরণ করেন তখন তিনি কিভাবে বিচরণ করেন? বলছেন *নাভিনন্দতি ন দ্বেষ্টি*, কোনটাতেই তাঁর মন চঞ্চল হবে না। ঠাকুর আর হৃদয়রাম কলকাতায় লাট সাহেবের বাড়ির সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় হৃদয়রাম ঠাকুরকে বলছেন – মামা, এইটা হচ্ছে লাট সাহেবের বাড়ি, বড় বড় থাম। ঠাকুর বলছেন দেখলাম ইটের ঢিপি। তাই লাট সাহেবের বাড়ির প্রতি তাঁর কোন আকর্ষণ আসছে না। এটা সত্যি সত্যিই এই রকমই হয়ে থাকে। কোন সাধু বা সন্ন্যাসী যদি কোন কিছু দেখে ভেতর থেকে বলেন বাঃ বাঃ, তাহলে বুঝতে হবে তাঁর ভেতরে কিছু না কিছু গোলমাল আছে। স্বামীজী প্যারিসের রাস্থা দিয়ে যাচ্ছেন, রাস্থায় একটা খুব সুন্দরী মেয়ে তাঁর নজরের মধ্যে পড়ে গেছে, ঐ রকম সুন্দরী তিনি নাকি কোন দিন দেখেননি। সৌন্দর্য্যের আকর্ষণে স্বামীজীর মন নড়ে উঠেছে। যতক্ষণে তাঁর মন নড়ে উঠেছিল, ততক্ষণে স্বামীজী দেখছেন ঐ চেহারাটা পাল্টে গিয়ে একটা বাঁদরের চেহারা হয়ে গেছে। স্বামীজীর মন এমন ভাবে তৈরী হয়ে গেছে যে, যে চেহারাটা জাগতিক দিক দিয়ে আকর্ষণীয় হতে পারে, কিন্তু তাঁর মনই ঐ চেহারাটাকে পাল্টে দিচ্ছে একটা বাঁদরের আকৃতিতে। ঠাকুর বলছেন – মেয়েদের পাল্লা থেকে বেরোতে হলে ওদের অঙ্গ গুলিকে দ্বিগুণ দেখবি, তখন ঐ মেয়েটাকে রাক্ষসী মনে হবে। মেয়েদের চোখ যা স্বাভাবিক তার দুই গুণ দেখলে তাকে রাক্ষসীই মনে হবে, তখন আর কোন মোহ আসবে না। মনকে যদি ঐভাবে দেখার প্রশিক্ষণ দিয়ে দেওয়া হয় তখন মেয়েদের শরীরের যে কোন অঙ্গকে দ্বিগুণ দেখলে তাহলে আর সেই মেয়ের প্রতি কোন আকর্ষণ থাকবে না। যাঁরা পরমহংস পরিব্রাজক তাঁদের মনটা এই রকমই হয়ে যায়, তাঁদের মন অন্য কোন কিছুর দিকে যাবেই না। ঠাকুর বলছেন – ভাত ডাল এক সঙ্গে দুদিন রেখে দাও, পরে সেটাই বিষ্ঠা হয়ে যায়। ভালো খাবার, ভালো রূপ, কোন কিছুর কোন চিরন্তন মূল্য নেই। বাচ্চা বয়স থেকে আর জন্ম জন্মান্তর ধরে মন এক রকম ভাবে তৈরী হয়ে আছে বলে আমরা

সব কিছুকে বাহাবা দিই। কিন্তু যিনি পরমহংস, যিনি যোগী তাঁদের মন এমন হয়ে যায় জগতের কোন কিছুই তাঁদের মনকে আর টেনে এনে তার দিকে নামিয়ে আনতে পারে না।

অর্জুনের প্রশ্ন ছিল তিনি কি ভাবে বিচরণ করেন। তার উত্তর শ্রীকৃষ্ণ দিয়ে দিলেন, কোন কিছুতেই যোগী আর আসক্ত হন না। আকৃষ্ট হন না বুঝলাম, তাই বলে কি যোগী সব কিছুকে ঘৃণার চোখে, বিরক্তির ভাব নিয়ে দেখেন? না, কোন কিছুর প্রতি তাঁর ঘৃণাও হবে না, বিরক্তিও আসবে না। তাই বলে কি তিনি কোমাগ্রস্ত রোগীর মত পড়ে থাকেন? না, তিনি সব সময় *আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ*, সব সময় আনন্দ সাগরে ভাসছেন। এই অবস্থা কি করে হয়, সেটাকে ভগবান খুব সুন্দর একটা উপমার সাহায্যে পরের শ্লোকে ব্যাখ্যা করছেন –

**যদা সংহরতে চায়ং কূর্মোঽঙ্গানীব সর্বশঃ। ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা।।৫৮।।**

কচ্ছপ ভয় পেলে নিজের হাত, পা, মুখ গুটিয়ে নিয়ে খোলসের মধ্যে ঢুকে যায়, ঠাকুর বলছেন, কুড়ুল দিয়ে কাটলেও কচ্ছপ আর হাত পা বার করবে না। যোগীও তাঁর ইন্দ্রিয় গুলিকে কচ্ছপের মত ভেতরে টেনে নেন। *ইন্দ্রিয়াণি ইন্দ্রিয়ার্থেভ্যঃ*, ইন্দ্রিয়কে ইন্দ্রিয়ের মধ্যে ঢুকিয়ে দিচ্ছেন। এখন তাঁর হাতকে ঢুকিয়ে নিলে যোগী খাবেন কি করে? এখানে দুটো শব্দ আসছে, *ইন্দ্রিয়াণি* আর *ইন্দ্রিয়ার্থ*, আমাদের যে হাত, পা, চোখ, কান এগুলো ইন্দ্রিয়ের যন্ত্র, এগুলো প্রকৃত ইন্দ্রিয় নয়। আসল যে ইন্দ্রিয়ের কথা এখানে বলা হচ্ছে সেই ইন্দ্রিয়গুলি আমাদের মস্তিষ্কে স্নায়ুকেন্দ্র রূপে অবস্থান করে। ইন্দ্রিয়ের এই যন্ত্রগুলিকে বলা হয় করণ, এ যন্ত্র গুলিকে যে চালাচ্ছে তাকেই ইন্দ্রিয় বলা হয়। আমাদের দশটা ইন্দ্রিয় আর মনকে নিয়ে মোট একাদশ ইন্দ্রিয়। এখন যার চোখ নেই, তার নটা ইন্দ্রিয় হওয়ার কথা, যার হাত নেই তারও নটা ইন্দ্রিয় হওয়ার কথা, কিন্তু সেই রকম তো কিছু বলা হয় না। ইন্দ্রিয় সব সময় দশটাই থাকবে, যে অন্ধ তারও দশটা ইন্দ্রিয়, যার হাতও নেই পাও নেই, তারও দশটা ইন্দ্রিয়ই থাকবে। কিন্তু তার একটা কি দুটো করণ নেই, যেটা দিয়ে ইন্দ্রিয়ের কাজ করা হয় সেটা নেই। *ইন্দ্রিয়ার্থ হচ্ছে* ইন্দ্রিয়ের বিষয় বা অবজেক্ট, যেমন চোখ দিয়ে ভালো দৃশ্য দেখছি, কান দিয়ে ভালো গান শুনছি, হাত দিয়ে স্পর্শ সুখ পাচ্ছি। যোগী এই ইন্দ্রিয়গুলিকে গুটিয়ে নেন, তার মানে যখন তিনি ভোজন করতে যান, তিনি বুঝে গেছেন তাঁর কাছে ভাত ডাল খেলেও যা, ভাত মাংস খেলেও তাই, জিহ্বা তাঁর নিজের নিয়ন্ত্রণে। মনটাকে ইন্দ্রিয় থেকে টেনে নিয়েছেন, কি খাবার খাচ্ছেন, কি দৃশ্য চোখের সামনে আসছে, তাতে তাঁর মনে কোন প্রতিক্রিয়াই হয় না। সেদিন কাগজে একটা খুব মজার সমীক্ষা বেরিয়েছিল, বলছে রোড এ্যাকসিডেন্ট যে এত বেড়ে গেছে এই ব্যাপারে অনুসন্ধান করতে গিয়ে বলা হচ্ছে, রাস্তার দু ধারে যত বিজ্ঞাপনের হোর্ডিং আছে সেখানে শুধুই স্বল্পবাস মেয়েদের ছবি দিয়ে ভরিয়ে রাখা হয়েছে, ড্রাইভারদের চোখ ও মনকে এই সব ছবি আকর্ষণ করছে বলে এত দুর্ঘটনা হচ্ছে। এখন হোর্ডিং গুলো সরিয়ে দিলে ড্রাইভারদের মন থেকে সব কামনা বাসনা চলে যাবে? কখনই যাবে না। কারণ তোমার মনের মধ্যে এগুলো ঘাপটি মেরে সব সময় বাইরের উত্তেজনাকে নেওয়ার জন্য বসে আছে, মনটাকে আগে নিয়ন্ত্রণ করতে চেষ্টা কর, কত জিনিষ মনের মধ্যে আছে আর কাকে কাকে লুকিয়ে রাখবে। যোগীর মন পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে, তাঁকে এসব কিছুই স্পর্শ করবে না। যোগীর কোন ধরণের অহঙ্কার আর মমত্ব বোধ থাকে না। যোগীর সামনে কেউ সুন্দর পোষাক পড়ে এলে তিনিও বাহাবা দিয়ে বলবেন – আরে বাঃ তোমার জামাটা কি সুন্দর। তার মানে এই নয় যে যোগীও ঐ রকম একটা জামা পেতে চাইছেন। একটা ভালো জিনিষের প্রশংসা করে দিলেন। কিন্তু যারা সাধারণ লোক তাদের মনে তখনই উঠবে, আমারও যদি ঠিক এই রকম একটা ভালো জামা থাকত।

এখানে *ইন্দ্রিয়াণীইন্দ্রিয়ার্থেভ্য* মানে মনটাকে ইন্দ্রিয়ের বিষয় থেকে টেনে নিলেন, টেনে নেওয়া মানে ভালো জিনিষকে খারাপ আর খারাপ জিনিষকে কখন ভালো বলবেন না, ঐগুলোকে পাওয়ার ইচ্ছে তার আসবে না। ভালো ভাবে কাজ করছে না, তখনও বলবেন – বাঃ খুব ভালো, আরও ভালো চেষ্টা কর। নিন্দা করার ভাব তার মধ্যে কখনই আসবে না, আর ঐখান থেকে সরে আসার চেষ্টাও কখন করবেন না।

৫৫ থেকে ৫৯ নং শ্লোকে যাঁরা উপলব্ধিবান, যিনি বিজ্ঞানী তাঁদের লক্ষণ গুলিকে বর্ণনা করা হয়েছে।

**বিষয়া বিনিবর্তন্তে নিরাহারস্য দেহিঃ। রসবর্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ততে।।৫৯।।**

এর আগের চারটে শ্লোকে যে লক্ষণ গুলো বলা হয়েছে সেগুলো কেন আর কিভাবে হয় সেটা এখানে বলা হচ্ছে। যিনি *নিরাহারস্য*, অর্থাৎ যিনি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা কোন কিছুই গ্রহণ করছেন না, যিনি তপস্বী তিনি বললেন – আমি চোখ বন্ধ করে দিলাম, আমি আর কোন কিছুর দিকে তাকাব না, কান বন্ধ করে দিলাম, আমি গান শুনব না, ইন্দ্রিয়ের কোন বিষয়ে মনকে যেতে দেব না। এখানে বলছেন, এগুলো ভালো কিন্তু কার্যকরী কিছু ফল হবে না। এরা বিষয় থেকে সরে এসে নিরাহারী হয়ে আছে, নিরাহারী মানে বিষয় ভোগ থেকে বিরত, কিন্তু সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয় গুলো সক্রিয় থাকে। আমি চোখ বন্ধ করে দিলাম, মানে আমি করণটাকে বন্ধ করে

দেওয়াতে বাইরের কোন কিছু আমার দর্শন ইন্দ্রিয়ের মধ্যে ধরা পড়ছে না, এটাকে বলছে নিরাহারী। কিন্তু ভেতের সূক্ষ্ম দর্শনেন্দ্রিয় চালু রয়েছে। ঠাকুর বলছেন – সাধন জীবনের প্রথম দিকে বেড়া দিতে হয় তা নাহলে গরুতে ছাগলে খেয়ে নেবে। আসলে ঠাকুর বলতে চাইছেন প্রথমের দিকে এই রকম নিরাহারী হতে হয়। যে সাধু জীবন যাপন করতে চাইছে তাকে প্রথমের দিকে নিরাহারী না হলে সাধু জীবনে বিপদ আসবে। নিরাহারী হওয়ার ফলে ইন্দ্রিয়ের যন্ত্র গুলো যাকে করণ বলা হচ্ছে, এদের দৌড়ঝাপটা বন্ধ হয়ে যায়। করণগুলোর ছুটোছুটি দাপাদাপি যখন বন্ধ হয়ে গেল, তার পরের পদক্ষেপ হচ্ছে – *রসবর্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ততে*, বিষয় রসের নিবৃত্তি। বিষয় রস থেকে যে বিষয়াসক্তি হবে সেটাও নিবৃত্ত হয়ে যায়। কখন হয়? *পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ততে*, ঈশ্বর দর্শনে। ব্রহ্মজ্ঞান হলে, আত্মজ্ঞান হলে বিষয়রসের প্রতি যে টান সেটাও চলে যায়। আমার ডায়বেটিস হয়েছে, মিষ্টি খাওয়া এখন নিষেধ, আমিও আর মিষ্টি খাচ্ছি না। এখন আমি কি বিরাট কোন যোগী হয়ে যাব? কি করে হব, মিষ্টির প্রতি আমার যে তৃষ্ণা সেটাতো ভেতরে পুরো মাত্রায় রয়ে গেছে। ডায়বেটিস কমে গেলে আবার মিষ্টি খাব। মনে করা যাক আমার কোন রোগ হয়নি, আমি বললাম – আমি আর মিষ্টি খাবো না, ঠাকুরের নামে মিষ্টি খাওয়া সমর্পণ করে দিলাম। এটা আমি জোর করে টেনে নিয়েছি, এটা হল নিরাহার, এটা খুবই ভালো, কিন্তু সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়ের মধ্যে যে মিষ্টি খাওয়ার বিষয়রস রয়ে গেছে সেটা যখন তখন আমাকে টেনে মিষ্টি খাওয়াতে নামিয়ে দিতে পারে। আমরা প্রায়ই টিভিতে, খবরের কাগজে দেখি অমুক বাবাজীর কেলেঙ্কারী, অমুক পরমহংসের নানান কেচ্ছা। কারণ এইটাই, প্রথমের দিকে এনারা গায়ের জোরে টেনে নিয়ে নিরাহারী হয়ে যাচ্ছেন, কিন্তু রসবোধ তাঁর তখনও ভেতরের থেকে গেছে। দশ বছর হিমালয়ে গিয়ে তপস্যা করেছে, সেখানে সে কোন মানুষ বা নারীর মুখ দর্শন করেনি। আমাদের জীবনে এই কয়টিই তো প্রধান আকর্ষণ – টাকা-পয়সা, নাম-যশ, সুখভোগ আর নারী। যতই নিরাহারী হোক না কেন, এই জিনিষ গুলোর রসবোধ বীজাকারে ভেতরে গিজ্‌গিজ্‌ করছে। এখানে যোগী প্রথম অবস্থাতে যখন জোর করে ইন্দ্রিয়গুলোকে টেনে নিল তখন তার মাঠ পরিষ্কার, একটা বাগানে অনেক ফুল গাছও আছে, আবার আগাছাও আছে, বাগানে সার, জল দিলে ফুল গাছও টানবে আবার আগাছা গুলোও টানবে, কিন্তু সব আগাছা যদি পরিষ্কার করে দেওয়া হয় আর একটাই যদি বীজ থাকে তখন যা সার দেওয়া হবে, যা জল দেওয়া হবে সব ঐ একটা বীজই টেনে নেবে। ঠিক সেই রকম যদি একবার যোগীর মন ভোগের দিকে যায় তখন তাঁকে কেউ আটকে রাখতে পারবে না। কারণ তাঁর বাকি জিনিষ গুলো চলে গেছে কিন্তু *পরং দৃষ্ট্বা*, ঈশ্বর দর্শন হয়নি। আত্মজ্ঞান না হওয়া পর্যন্ত ঐ রসবোধ থেকে যাবে। ঠাকুর যে বলছেন জ্ঞানী ভয়তরাসে, ভয় এই কারণেই, কারণ তাঁর রসবোধটা এখন যায়নি। বিজ্ঞানীর অবস্থায় গেলে রসবোধ শেষ হয়ে যাবে।

বলে, যখন নারীর প্রশংসা করা হয় শুধু সেই নারীকে নিয়েই প্রশংসা করা হয় না, প্রশংসার মধ্যে তার অনেক কিছুই থাকে। তার মধ্যে একটা হচ্ছে শোভন অধ্যাস, শোভন অধ্যাস হচ্ছে, একটা সুন্দর জিনিষ, দেখতে খুব সুন্দর, শোভনীয়, তার প্রতি যে আকর্ষণ, বার বার চোখ চলে যায়, এইটাই হচ্ছে শোভন অধ্যাস। এখন যে মেয়েটির প্রতি আমার আকর্ষণ হচ্ছে, মেয়েটি যদি মরে যায় তাই বলে কি আমি পরমহংস হয়ে যাব! আমার মধ্যে সেই শোভন অধ্যাসটা তো থেকেই গেছে। এই শোভন অধ্যাসই তখন অন্য দিক দিয়ে অন্য আরেকটা রূপ নিয়ে বেরিয়ে আসবে। এই সমস্যাটা কিন্তু প্রত্যেক সাধকেরই থাকবে। যে সাধকের সৌন্দর্য বোধ নেই সেতো কোন দিন সাধকই হতে পারবে না। আবার সৌন্দর্য বোধ থাকা মানেই হচ্ছে পতনের বিপদ তাকে ঘিরে রেখেছে। এই শোভন অধ্যাস থেকে যখন সে বেরিয়ে এসে আত্মজ্ঞান লাভ করে নেবে তখন এই সৌন্দর্য বোধটাই সোনাতে রূপান্তরিত হয়ে যাবে। চুম্বক আর লোহাকে টানতে পারবে না, কেননা পরশমণির ছোঁয়ায় লোহাটা এখন সোনা হয়ে গেছে, তাকে আর চুম্বক টানতে পারবে না। সাধকের আধ্যাত্মিকতার উন্নতিতে প্রাথমিক অবস্থায় সৌন্দর্য বোধের বিরাট ভূমিকা আছে, সৌন্দর্য বোধ যার নেই সে জীবনে কখনই কিছু করতে পারবে না। কিন্তু এই সৌন্দর্য বোধ যদি নিয়ন্ত্রণে না থাকে তাহলে এই সৌন্দর্য বোধটাই সাধকের মনকে ভোগের দিকে টেনে নিয়ে যাবেই যাবে। অনেক কবি, বিজ্ঞানী, শিল্পীদের জীবনে এই ধরণের ভুরি ভুরি ঘটনা দেখতে পাই। সাধককেও তার সাধনার জীবনে এই সমস্যার মুখোমুখি হতে হবে, তার সঙ্গে লড়তে হবে, এর ওপর কর্তৃত্ব করতে হবে আর একে নিয়ন্ত্রণে রাখার ক্ষমতা অর্জন করে এই শোভন অধ্যাসকে অতিক্রম করে যেতে হবে। ঈশ্বর দর্শনের পর আর এই সৌন্দর্য বোধ মানে শোভন অধ্যাস থাকে না। তখন আর গায়ের জোরে মনকে ইন্দ্রিয়ের বিষয় থেকে টেনে আনতে হয় না, ঐটাই তাঁর স্বাভাবিক হয়ে যায়। হলধারী ঠাকুরকে বলছেন – একি, তুমি নিচু জাতের এঁটো পাতা কুড়োচ্ছ, তোমার সন্তানের বিয়ে কি করে হবে? ঠাকুর বলছেন – এই তোমার শাস্ত্র পড়া, আমার তো মাতৃযোনি, আমার আবার সন্তান কিসে হবে। তার মানে, যিনি পরমহংস হয়ে যান তাঁর দ্বারা আর গৃহস্থের কোন কর্মই হবে না, সে চাইলেও পারবে না। এটা বিজ্ঞানীর অবস্থা, জ্ঞানীকে গায়ের জোরে ইন্দ্রিয়ের বিষয় থেকে টেনে আনতে হচ্ছে, বিজ্ঞানীর ক্ষেত্রে সেটাই স্বাভাবিক হয়ে যায়, কারণ তাঁর *রসবর্জং রসোঽপ্যস্য*, সমস্ত বিষয়র রস চলে গেছে।

আমাদের সৃষ্টিতত্ত্বানুসারে যদি জানতে চাওয়া হয় জল কি থেকে তৈরী হয়েছে, তখন বলা হচ্ছে অপ থেকে জল হয়েছে, আবার যে জিহ্বা বা রসনা ইন্দ্রিয় সেটিও অপ থেকে তৈরী। জিহ্বা হচ্ছে ইন্দ্রিয় আর অপ হচ্ছে তার গোচর, এই শ্লোকে এটাকেই বলা হচ্ছে *ইন্দ্রিয়ার্থ*। প্রত্যেকটি যে ইন্দ্রিয় আর তার যে একেকটি *ইন্দ্রিয়ার্থ* বা গোচর আছে, স্বাভাবিক নিয়মানুযায়ী ইন্দ্রিয় তার বিষয়ের

দিকে আকর্ষিত হয়ে ছুটে যাবে। এখন সৌন্দর্য্য তেজ থেকে আসছে, আর চোখও তেজ দিয়ে তৈরী। দুটোরই মূল হচ্ছে তেজ বা অগ্নি, এখন অগ্নি অগ্নির দিকে যাবে এটাই স্বাভাবিক। যার দর্শনেন্দ্রিয় যত শক্তিশালী তার তেজ অংশ তত বেশি। যার সৌন্দর্য্য যত বেশি সেখানে তেজ তত বেশি, বেশি তেজ বেশি তেজকেই খুঁজবে। চাষাভুষা লোক যে কোন মানুষকে নিয়েই সন্তুষ্ট হয়ে যাবে। কিন্তু যিনি খুব সংবেদনশীল লোক নিজের স্বভাবের লোক না হলে সে তার থেকে দূরেই থাকবে। আবার যার কর্ণেন্দ্রিয় খুব শক্তিশালী তখন বুঝতে হবে তাঁর আকাশতত্বের প্রভাব খুব প্রচণ্ড, আকাশতত্বের সাথে আবার সঙ্গীতের সম্পর্ক। তানসেনের মত বড় বড় সঙ্গীতজ্ঞদের শ্রোত্রিন্দ্রিয় খুব শক্তিশালী থাকে। তানসেনকে যদি এখনকার হিন্দী সিনেমার কোন পপ সং শোনান হয় তাঁর শরীর মন অস্থির করতে শুরু করবে। এখন যে গানকে ভালোবাসছে সে যদি কোন একটা অবস্থাতে এসে বলে আমি আর গান শুনব না, গান শোনা আমি ত্যাগ করলাম। সে গান শোনাকে ত্যাগ করল কিন্তু তার শ্রবণেন্দ্রিয়কে নিয়ে কি করবে, সে যেমন ছিল সেই রকমই থাকবে। তাই আজ হোক কাল হোক গান তাকে আবার টানবেই। সে যদি যোগী হয়ে থাকে তাহলেও তাকে আসন থেকে টেনে উঠিয়ে গান শুনিয়ে ছাড়বে। এটা তখনই বন্ধ হবে যখন *পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ততে*, যখন আত্মজ্ঞান হয়ে যাবে তখন আর তাকে টানতে পারবে না, উচ্চ প্রশংসা করবে কিন্তু তাকে টলাতে পারবে না। এই ব্যাপারটাই আরেকটু বিস্তার করে পরের শ্লোকে বলা হচ্ছে –

**যততো হ্যপি কৌন্তেয় পুরুষস্য বিপশ্চিতঃ। ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথীনি হরন্তি প্রসভং মনঃ।।৬০।।**

আমি এখন জেনে গেলাম ঈশ্বর দর্শন না হওয়া পর্যন্ত আমার মন ও ইন্দ্রিয়কে নিজের নিয়ন্ত্রণে আনতে পারব না। ঈশ্বর দর্শনের আগে প্রথমে করতে হবে ইন্দ্রিয় নিগ্রহ, মানে ইন্দ্রিয়গুলোকে গুটিয়ে আনতে হবে, তারপর হবে লড়াই, জোর করে ভোগের বিষয় থেকে তাকে সরিয়ে রাখতে হবে। ইন্দ্রিয়গুলোকে যদি ওদের নিজের খুশি মত ভোগে ছেড়ে দেওয়া হয় তাহলেই কিন্তু সর্বনাশ। সেইজন্যই বলা হয় জোর করে ইন্দ্রিয়কে টেনে নিয়ে আসতে হবে। মুখে বললে হবে না, জোর করা বাহ্যিক ভাবে করতে হবে। যেমন পবিত্রতার জন্য সকালে উঠে স্নান করবে, গায়ে গঙ্গাজল ছেটাবে, জগন্নাথের আটকে প্রসাদ খাবে, তুলসি পাতা খাবে, চন্দনের ফোঁটা দেবে, এগুলো আমাদের নিয়মিত জোর করে করতে হবে, প্রথমে করতে ইচ্ছে করবে না, কিন্তু তবুও জোর করে করতে হবে। এগুলো কত দিন করতে হবে? যত দিন না এগুলো স্বাভাবিক ভাবে হবে, না করলে মন অস্থির হয়ে যাবে, তত দিন করতে হবে। না করতে পারলে মন অস্থির যখন হবে তখন এক ধাপ এগোল। প্রথমে গায়ের জোর, দ্বিতীয় অভ্যাসে দাঁড়িয়ে যাবে, তৃতীয় ইশ্বর দর্শন হয়ে গেলে এগুলো খসে পড়ে যাবে।

এখানে যেমন পবিত্রতার ব্যাপারে বলা হল, এরপর অপবিত্র যা কিছু, সমস্ত অশুভ জিনিষ থেকে মনকে জোর করে সরিয়া আনা। অশুভ, অপবিত্র জিনিষ গুলো থেকে মনকে যদি জোর করে না সরিয়ে আনা হয় তাহলে কি হবে? বলছেন *যততো হ্যপি কৌন্তেয় পুরুষস্য বিপশ্চিতঃ*, হে কুন্তিপুত্র যিনি অনেক সাধনা করেছে, সর্বদা যোগে যত্নশীল, মেধাবী পুরুষরাও যদি গায়ের জোরে মনকে সরিয়ে না আনে তাহলে তাদেরও *ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথীনি হরন্তি প্রসভং মনঃ*, ইন্দ্রিয়গুলো সেই পুরুষের মনকে বলপূর্বক বিষয়ের দিকে টেনে নিয়ে আসবে। কঠোপনিষদে উপমা দিয়ে বলছে *'ইন্দ্রিয়াণি হয়ন্যাহুর্বিষয়াংস্তেষু গোচরান্। আত্মেন্দ্রিয়মনোযুক্তং ভোক্তেত্যাহুর্মনীষিনঃ।।১/৩/৪।* পাঁচটা ঘোড়া মিলে রথকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে, ঘোড়া গুলি যদি নিয়ন্ত্রণে না থাকে তখন রথের আরোহিকে তার গন্তব্য স্থল থেকে সরিয়ে ঘোড়গুলি অন্য দিকে নিয়ে চলে যাবে। মন হচ্ছে ঘোড়ার লাগাম, বুদ্ধি হচ্ছে সারথি। শাস্ত্র আমাকে বলে দিল নোংরা কাজ করবে না, বাজে কথা বলবে না, শুচিতা, পবিত্রতার দিকে নজর রাখবে, এখন শাস্ত্রের কথা মত চলতে শুরু যখন করব তখন লাগামটা টানা শুরু হল। যখনই লাগাম টানা শুরু করবে তখনই ঘোড়া গুলো তিড়িং বিড়িং করে লাফিয়ে উঠবে। যতই লাফালাফি করুক ঘোড়ার লাগামকে শক্ত করে টেনে বশে রাখতে হবে। যদি লাগাম ছেড়ে দেওয়া হয় তখন কি হবে? *ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথীনি হরন্তি প্রসভং মনঃ*, পাঁচটা ঘোড়া এখন নিজের বিষয়ের দিকে ছুটতে থাকবে, রাস্থা থেকে নেমে মাঠের দিকে চলে যাবে। মাঠের এবড়ো খেবড়ো জায়গায় চলতে গিয়ে রথই হয়তো উল্টে গেল, ঘোড়া গুলোও রথের জোত থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে নিজের মত যেদিকে খুশি চলে যাবে। আমার যে জিহ্বা সে জলের সাথে মিশে আনন্দ পেয়ে গেল, কারণ এটাও রস থেকে ঐটাও রস থেকে। *প্রমাথীনি* করে দেয়, মানে, একেবারে প্রমত্ত হয়ে উঠে বিক্ষুব্ধ করে দেবে। ইন্দ্রিয় যখন বিষয়াভিমুখী হয়ে যায়, মন যদি নিয়ন্ত্রণে না থাকে, তখন একটু সামান্য বাধা এলেই প্রচণ্ড রেগে যাবে। সাধারণ লোকেরা এই জিনিষটাকে ধরতেই পারে না, সর্বদাই ভেতরে ইন্দ্রিয় আর বিষয়ের এত মন্থন হতে থাকে যে তাতেই ডুবে থাকে, যার ফলে এগুলো ধরতে পারেনা। কিন্তু যারা একটু জপ ধ্যান করে বিবেক বুদ্ধিকে জাগ্রত করেছে তারা ধরতে পারে, যে মুহুর্তে কোন চিন্তা আসে তখন বুঝে নেয় যে, এবার সে আমার মনকে উত্তেজিত করতে শুরু করবে, এর পরেই আমার ইন্দ্রিয়গুলিকে নাচাতে শুরু করবে, আর মনটাও তো ইন্দ্রিয়ই।

এখানে সাধারণ মানুষের কথা বলা হচ্ছে না, যারা চেষ্টা করে আধ্যাত্ম পথে এগোবার চেষ্টা করছেন তাদের কথাই বলা হচ্ছে। তার মনে কখন কি বাসনা উঠবে বুঝতেই পারবে না, কামিনী-কাঞ্চনের কথা ছেড়েই দেওয়া হোক, হঠাৎ ইচ্ছে হল বিরিয়ানি খেতে হবে, রাত দশটায় যদি একবার মাথায় চেপে যায় এখন সারা রাত বিরিয়ানিরই স্বপ্ন দেখতে থাকবে। যারা যতি, যোগী তাদের

এটা আরও বেশি হয়, আচার্য বলছেন – *বিক্ষোভয়ন্তি আকুলি কুর্বন্তি,* আকুল করে দেয়। সাধারণ লোককে এগুলো কম করে কিন্তু যারা যোগী, নিজেদের মনকে নিয়ন্ত্রণে রাখবার প্রচেষ্টা করে যাচ্ছেন তাদের এটা বেশি হয়। সেইজন্য ভগবান বলছেন –

**তানি সর্বাণি সংযম্য যুক্ত আসীত মৎপরঃ। বশে হি যস্যেন্দ্রিয়াণি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা।।৬১।।**

*তানি সর্বাণি সংযম্য,* এই দশটি ইন্দ্রিয়কে সংযম পূর্বক *যুক্ত আসীত মৎপরঃ,* এইখানে প্রথম *মৎপরঃ* শব্দটা শ্রীকৃষ্ণ নিয়ে আসছেন। এই *মৎপরঃ* ভাবটাকে যদি বুঝে নিয়ে জীবনের সর্বক্ষেত্রে একে অবলম্বন করে চলা যায় তাহলে সমস্ত দুঃখ-কষ্ট চিরদিনের মত দূর হয়ে যাবে। *মৎপরঃ,* মৎ শব্দ মানে আমাতে, আমি অর্থে এখানে শ্রীকৃষ্ণ, আমিই সর্বশ্রেষ্ঠ। আচার্য শঙ্কর ভাষ্যে বলছেন – কিভাবে তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ, *অহং বাসুদেবঃ,* আমি শ্রীকৃষ্ণ, *সর্ব প্রত্যগাত্মা,* আমি সবারই অন্তর্যামী, সবারই চৈতন্য সত্তা আমিই এবং *পরো যস্যঃ,* আমি হচ্ছি সবার থেকে শ্রেষ্ঠ, সবার থেকে আলাদা, পর মানে আমি সবার উপরে, আমার উপরে আর কিছু নেই, আমিই হচ্ছি শেষ কথা। এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সর্বশ্রেষ্ঠ হচ্ছেন ভগবান, তিনিই আবার আমার হৃদয়ে বাস করেন। এই ভাবকে অবলম্বন করে – *ন অন্যঃ অহং তস্মাদ্* - আমি কিন্তু এই পরমাত্মা থেকে আলাদা নই। সাধনার এইটাই হচ্ছে শেষ অবস্থা। যারা সাধনার পথে সংগ্রাম করছেন, সংগ্রাম করতে গিয়ে পঞ্চাশ রকমের ঝামেলা, বাধা আসছে, অশান্তি হচ্ছে, তারা যদি গীতার এই লাইনটাকে মনে রেখে গভীর ভাবে চিন্তন করতে পারেন, দিনে দশবার যদি নিজেকে মনে করিয়ে দেওয়া হয়, তার সব কষ্ট চিরদিনের মত সমাপ্ত হয়ে যাবে। শ্রীরামকৃষ্ণ, তিনি হচ্ছেন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ভগবান, তিনিই আমার অন্তর্যামী, আমি সেই শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে এক। এই ভাবকে যে অবলম্বন করে নিল তার মন বিবেক, বুদ্ধিকে আর কোন ইন্দ্রিয় ক্ষোভিত করতে পারবে না। অবলম্বন করলেই হবে না, প্রতি মুহুর্তে এই ভাবটাকে জাগ প্রদীপের শিখার মত প্রজ্জ্বলিত করে রাখা চাই তবেই হবে। আমার স্বামী, আমার স্ত্রী, আমার সন্তান, আমার অফিসের বস্ কেউই তাঁর থেকে বড় নয়, যিনি সবার থেকে বড় তাঁর সাথে আমার এক গভীর সম্পর্ক আছে, সেটা হচ্ছে আমি তাঁর সঙ্গে এক, শঙ্করাচার্য খুব সুন্দর শব্দ ব্যবহার করছেন – *ন অন্যঃ অহং তস্মাদ্,* আমি তাঁর থেকে আলাদা নই। এখানে বলা হচ্ছে না, তাঁর সাথে আমার কি সম্পর্ক হবে, বন্ধুর সম্পর্ক হবে, না কি সন্তান সম্পর্ক হবে, না কি প্রভুর সম্পর্ক হবে, একটাই সম্পর্ক যে আমি তাঁর থেকে অভিন্ন। মা যেমন সন্তান থেকে নিজেকে অভিন্ন মনে করে, ঠাকুর বলছেন সতীর পতির উপর টান, মায়ের সন্তানের উপর টান, একই জিনিষ, মূল কথা হচ্ছে একত্ব অনুভব। শ্রীরামকৃষ্ণ হচ্ছেন সব কিছুর শ্রেষ্ঠ, তিনি আমার অন্তর্যামী, আমার বাস্তবিক সত্তা আর আমি তাঁর থেকে আলাদা নই। এই ভাব যার হয়ে গেছে তাকে আর ইন্দ্রিয় সমূহ কিছু করতে পারবে না।

যারা সাধক তাদের কথাই এখানে বলা হচ্ছে, সাধক হতে গেলে আগে থাকতে কিছু প্রস্তুতির দরকার। যে সাধক, সে যদি কোন বিষয়ভোগের রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকে, যে কোন বিষয়, কামিনী-কাঞ্চন, নাম-যশ, ভোগসুখ, এইটাই মহারোগ, এই ভয়ঙ্কর রোগ যার লেগে আছে তাকে যদি এই ওষুধ সেবন করিয়ে দেওয়া হয়, দ্যাখ্ বাপু, তুই দশ মাস দিনে দশবার করে এই লাইনটা পড়ে যা, আর এটাকে বোঝ্, তাহলেই তোর মনের সব কুভাব, যে কুভাব তোকে সব সময় ইন্দ্রিয় ভোগের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে, সব কুভাব দূর হয়ে যাবে। কুভাব দূর হতে বাধ্য, এখানে এইটাই বলা হচ্ছে, *তানি সর্বাণি সংযম্য যুক্ত আসীত মৎপরঃ,* যোগী সব ইন্দ্রিয়কে সংযম করে *মৎপরঃ* হয়ে বসে পরে, আমি তাঁর সাথে অভিন্ন। এই ভাবে যার ইন্দ্রিয় বশে এসে গেছে, সেই হচ্ছেন স্থিতপ্রজ্ঞ। এই শ্লোকের দুটো অর্থই হয় – যিনি সিদ্ধ পুরুষ তাঁর এই ভাব – *অহং বাসুদেবঃ সর্বং প্রত্যগাত্মা,* ইনি যেন সর্ব দিক দিয়ে সুরক্ষিত পুরুষ। মায়ের কোলে শিশু যেমন নিরাপদ মনে করে, ঠিক তেমনি যিনি মনে করছেন ভগবান আমার অন্তর্যামী, আমি তাঁর সাথে অভেদ, সেই মুহুর্তে সে মায়ের কোলে শিশুর মত নিরাপদ হয়ে গেল, কোন ইন্দ্রিয়ের ক্ষমতাই হবে না যে তাঁকে উত্তেজিত করবে।

সমস্যা হয় কি, ভক্ত সবই করছে কিন্তু সে ভগবানের সাথে নিজেকে এক মনে করতে পারছে না। এই ভাবটা নেই বলেই ভক্তরা এত কষ্ট পায়। ভক্ত হলে এই তিনটে ভাবকে সব সময় ধরে রাখতে হবে – ১) শ্রীরামকৃষ্ণ হচ্ছেন সর্বশ্রেষ্ঠ, তার উপরে আর কেউ নেই। ২) শ্রীরামকৃষ্ণ আমার অন্তর্যামী, মানে প্রত্যগাত্মা, চৈতন্য স্বরূপ, তিনিই আমার চৈতন্য, তিনিই আমার বাস্তব সত্তা। আর ৩) আমি তাঁর সাথে অভিন্ন। এই ভাব যে সব সময় মনের মধ্যে ধরে রাখবে তাকে কেউ কিছু করতে পারবে না। আত্মশ্লাঘা পুরুষ রাবণের মত রাক্ষসও যদি আক্রমণ করে সেও কিছু করতে পারবে না, কারণ আমি তো সেই শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে এক। তিনি কে? সর্বশ্রেষ্ঠ, রাক্ষস তাঁর থেকে অনেক ক্ষুদ্র। এইটাই সাধনা আর সাধনার অন্তিম সিদ্ধিও এইটাই। গীতাতে যেটা সিদ্ধি সেটাই সাধন। সিদ্ধ পুরুষের যেটা লক্ষণ সেটাই সাধকের সাধনা। সিদ্ধ পুরুষের কি লক্ষণ? তিনি ইন্দ্রিয় সমূহকে সংযম করে *মৎপরঃ* হয়ে স্থির হয়ে বসে গেছেন। সাধনা কি? তুমিও স্থির হয়ে বসে এই তিনটে ভাবকে নিয়ে চিন্তন কর তখন তোমার সব ইন্দ্রিয় তোমার বশে এসে যাবে। সংসারে নিত্য ঝামেলা লেগেই থাকে, আর ঝামেলাতে দু ফোঁটা চোখের জল সবারই ঝরে, যখনই চোখে জল আসবে তখনই ভাবতে হবে আমি আদ্যাশক্তি জগজ্জননী শ্রীমা বা শ্রীরামকৃষ্ণের সাথে অভিন্ন, আমার স্বামী, শ্বশুর, শাশুড়ি, ননদ, দেওর, সবার থেকে শ্রীমা ও ঠাকুর শ্রেষ্ঠ। এই ভাব যখন পাকাপোক্ত ভাবে বসে যাবে তখন কামনা বাসনা সব খ্যাঁচ্ খ্যাঁচ্ করে কেটে বেরিয়ে যাবে। পরে আচার্য শঙ্কর বলবেন, তখন অজ্ঞানী জ্ঞানীর থেকে তফাৎ হয়ে যায়। অজ্ঞানী যখন ভোগ করে তখন কোন আগু পিছু না ভেবে

ঝাঁপিয়ে পড়ে ভোগ করে খুব আনন্দ পায়, পরে যখন সেই ভোগ থেকে কষ্ট পায় তখন হেঁদিয়ে হেঁদিয়ে কাঁদে, আর ভাবে লোভে পাপ পাপে মৃত্যু। আর জ্ঞানী বলে, আমার কিছু কামনা ছিল, দুর্বলতা ছিল তাই এটা করে ফেলেছি, যখন ভোগ করে তখনও তার মনে এই ভাবটা থাকে যে এ সব আমি কি করছি! জ্ঞানী যখন পাপে নিযুক্ত হয়ে জ্বালা যন্ত্রণা পায় তখন সে বলে, আমার পাপবোধ, আমার দুর্বলতা আমাকে ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে দৌড় করাচ্ছে, ঠাকুর তুমি রক্ষা কর আমি যেন এখান থেকে বেরোতে পারি, তুমি আমার অন্তর্যামী, আমি তোমার থেকে অভিন্ন। এই ভাবে প্রার্থনা করতে করতে এক সময় তার ইন্দ্রিয় গুলি বশে এসে যাবে। এসবের মূলে কি, কেন এই রকম হয়? তার উত্তরে ভগবান বলছেন –

**ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষুপজায়তে। সঙ্গাৎ সঞ্জায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে।।৬২।।**
**ক্রোধাদ্ ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ। স্মৃতিভ্রংশাদ্ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি।।৬৩।।**

এই দুটো শ্লোক এক সাথে চলে। মানুষের বিনাশের পথে কটি ধাপের প্রয়োজন, সেই কটি ধাপের কথা এই দুটো শ্লোকে বলা হচ্ছে। এখানে স্মৃতি হচ্ছে, গুরু আর শাস্ত্র থেকে যা শুনে এসেছি। এই স্মৃতি যখন গোলমাল হয়ে যায় তখন বুদ্ধি নাশ হয়ে যায়। বুদ্ধি হচ্ছে নিশ্চয়াত্মিকা, বুদ্ধি নিশ্চিত করে বলে দেয় কি করতে হবে আর কি করবে না। মাথা খারাপ কার হয়? যে ঠিক করতে পারে না, কোনটা করতে হবে আর কোনটা করতে নেই, এই বিবেক যার হারিয়ে গেছে তারই মাথা খারাপ হয়। এই বিবেক বুদ্ধি কখন হারিয়ে যায়? যখন স্মৃতিভ্রংশ হয়। স্মৃতিভ্রংশ কার হয়? যার আচার্য আর শাস্ত্রের উপদেশ মাথা থেকে হারিয়ে গেছে, ঠিক সময়ে যেটা কাজ করে না। স্মৃতি কার যায়? যার সম্মোহ হয়ে গেছে। সম্মোহ হচ্ছে মোহের আবরণে সে আচ্ছাদিত হয়ে গেছে। শোক আর মোহের যে কথা বলা হয়েছিল এখানে সেই মোহের কথাই বলা হচ্ছে। মোহের আবরণ কিভাবে হয়? দুভাবে হয়, একটা সরাসরি আসে, আরেকটা ক্রোধ থেকে আসে। যখন একটা জিনিষ আমি চাইছি, কিন্তু পাচ্ছি না, তখন ক্রোধের জন্ম হয়। ক্রোধ না হলেও জিনিষটার প্রতি একটা মোহের সৃষ্টি হয়। একটা জিনিষ কখন আমি পেতে চাইছি? কাম থেকে, মনে যখন কামনা আসে। কামনা কখন আসে? সঙ্গ থেকে। একটা জিনিষের সঙ্গ করতে করতে কামনার জন্ম হয়। কামনা আবার কোথা থেকে আসে? *ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ*, পুরুষ যখন বিষয়ের চিন্তা করতে থাকে, বিষয়ের চিন্তা থেকে কামনার জন্ম হয়।

আমি খবর পেলাম, আমার প্রতিবেশী একটা দামী গাড়ি কিনেছে। গাড়িটা একবার দেখছি, দুবার দেখছি, গাড়ি নিয়ে চিন্তা করতে শুরু করলাম। এখানে গাড়ির বদলে যে কোন বস্তু বা বিষয়কে নিয়েও যদি বলা যায় তাহলেও এই ধাপ গুলো একই থাকবে। *ধ্যায়তো বিষয়ান্*, এখানে বিষয়টা হচ্ছে গাড়ি, গাড়ির বদলে আমার প্রমোশন হতে পারে, ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স হতে পারে, কোন মানুষের প্রতি আকর্ষণ হতে পারে, এই একই ক্রম পর্যায়ে চলতে থাকবে। প্রথমে হচ্ছে সঙ্গ, একটা বিষয়ের চিন্তা করতে করতে কামনা জন্মায়, কামনা হচ্ছে ঐ জিনিষটাকে পাওয়ার ইচ্ছা। এই মডেলের গাড়ি যদি আমারও থাকতো। যে কোন বিষয় বস্তুর চিন্তা, গয়না, গাড়ি, সম্পত্তি যাই হোক না কেন, যদি দ্বিতীয় বার মনের মধ্যে উদিত হয় তাহলে বুঝতে হবে আমি বিপদে পড়ে গেলাম। তার মানে আমি সেই বিষয়ের অনুধ্যান করতে শুরু করেছি। এরপরেই আসবে সেটাকে পাওয়ার ইচ্ছা। এতক্ষণ ভেতরে ছিল এবার বাহ্যিক স্তরে এসে গেছে। সেই জিনিষটাকে পাওয়ার জন্য শারীরিক ভাবে চেষ্টা করবে, পরিশ্রম করবে। অনেক খেটেও যখন এই কামনার পুর্তি হবে না, তখন আমার ভেতরে ক্রোধের জন্ম নেবে। কার উপরে ক্রোধ আসবে? সমাজের প্রতি আসতে পারে, কোন ব্যক্তির প্রতি আসতে পারে, ক্রোধের বহিঃ প্রকাশ নানান ভাবে হতে পারে। যখনই ক্রোধ হল তখনই হয়ে গেল *সম্মোহঃ*। এখন মনটা কুয়াশাচ্ছন্ন হয়ে গেছে। মন কুয়াশাচ্ছন্ন হয়ে গেছে এবার বুদ্ধিও কাজ করবে না। *বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি*, যার বুদ্ধি চলে গেছে সে বিনাশের দিকে চলে গেল।

আচার্য বলছেন, মানুষ যখন ক্রোধের দ্বারা আক্রান্ত হয়, তখন তার কোন লঘু গুরু জ্ঞান থাকে না, যাঁরা শ্রদ্ধার পাত্র গুরুজন বা প্রিয়জন, তাদের প্রতিই আক্রোশে তার রাগটা নিক্ষেপ করে দেবে। মা যখন ছেলেকে শাসন করে তখন কিন্তু আক্রোশ থেকে শাসন করে না, ছেলেকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য ক্রোধের রূপ দেখান। কিন্তু স্ত্রী যখন স্বামীর উপর, স্বামী যখন স্ত্রীর উপর কটূ কথা প্রয়োগ করে তখন দুজনেই আক্রোশ ও ক্রোধে বশীভূত হয়ে কটূ কথা বলে চেঁচামেচি করছে। স্ত্রীর যখন ক্রোধ এসে যায় তখন সামনে ছেলে এসে গেলে তাকেই মারধোর করবে তখন আর সেটা শাসন থাকেনা। স্বামী-স্ত্রী ঝগড়া করবেই, এগুলোকে নিয়ে এখানে আলোচনা হচ্ছে না। কিন্তু ভেতরে যার আক্রোশ আছে, বিষ ঢালা যাদের স্বভাবে দাঁড়িয়ে গেছে তাদের কথা বলা হচ্ছে। মোট কথা ক্রোধ বিভিন্ন রূপে বহিঃপ্রকাশ হয়। যারা যোগী হন তাঁরা কিন্তু এই সব রাগদ্বেষ, ক্রোধ, আক্রোশ থেকে মুক্ত থাকেন। পরের শ্লোকে এইটাই বলা হচ্ছে –

**রাগদ্বেষবিযুক্তৈস্তু বিষানিন্দ্রিয়ৈশ্চরন্। আত্মবশ্যৈর্বিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি।।৬৪।।**

যোগী রাগ আর দ্বেষ থেকে বিযুক্ত হয়ে যান। ভগবান বলছেন, জ্ঞানী পুরুষ যখন এই জগতে বিচরণ করেন তখন ইন্দ্রিয় আর তার যে বিষয়ের সংযোগ হয়, সেটাকে গ্রহণ করতে থাকে। ঠাকুর স্বামীজী এনারাও যে ভালো খাবার দাবার খেতেন না তা নয়। স্বামীজীকে আমেরিকাতে এক ভক্ত স্ট্র বেরী দেওয়া আইসক্রীম দিয়েছে। স্বামীজীর খাওয়া হয়ে যাওয়ার পর ভক্ত জিজ্ঞেস করছেন – স্বামীজী আইসক্রীম কেমন লাগল? স্বামীজী – দারুণ, দারুণ লেগেছে। ভক্ত – স্ট্র বেরীগুলো কেমন ছিল। স্বামীজী – ও তাই, স্ট্র বেরী দেওয়া ছিল? লক্ষ্য করিনি তো। ভক্ত – ওঃ স্বামীজী আপনি কেমন লোক, অসময়ের স্ট্র বেরী কত দামী জিনিষ, আপনার জন্য আইসক্রিমে দেওয়া হয়েছে আর আপনি খেয়াল করেননি? তখন স্বামীজী বলছেন – আইসক্রিমে যদি আলপিনও দিয়ে দেওয়া হয় ওটারও স্বাদ ভালো হয়ে যাবে। স্বামীজীর কথা শুনে ভক্ত মহিলা স্বামীজীর উপরে খুব রেগে গেছে। আসলে স্বামীজী আইসক্রীম এত ভালোবাসতেন যে আইসক্রীমে কি দেওয়া হয়েছে আর কি দেওয়া হয়নি ঐদিকে তিনি কোন ভ্রুক্ষেপই করতেন না। আইসক্রীম ভালো, ওতে যে তোমার স্ট্র বেরী আছে তাতে আমার কিছু যায় আসে না। তার মানে জ্ঞানীদের যে পছন্দের খাবার দাবার থাকবে না তা নয়, তাঁদেরও পছন্দ অপছন্দ আছে। স্বামীজী যখন ভারত পরিক্রমা করছেন, তখন তাঁর পকেটে কোন কানা-কড়ি নেই। মীরাটে কোন গুরুভাইয়ের সঙ্গে দেখা হয়েছে, কি করে কোথা থেকে কিছু পয়সা জোগাড় করে তাই দিয়ে মাংস কিনে এনে ঠিক করলেন শিক কাবাব বানাবেন। এখন শিক কোথায় পাবেন, কতকগুলো কাঠি দিয়ে শিক কাবাবের মত কিছু একটা বানিয়েছেন।

ঘোড়া যেমন ঘাস খেতে মাঠে নেমে পড়ে, জ্ঞানীরাও এই জগতে নেমে পড়েন, ভোগও করেন এবং আনন্দও পান, *প্রসাদমধিগচ্ছতি*, কিন্তু *আত্মবশ্যৈর্বিধেয়াত্মা*, বুদ্ধিকে পুরো নিজের বশে রাখেন, আর *রাগদ্বেষবিযুক্তৈস্তু*, তাঁর কোন ধরণের রাগ আর দ্বেষ থাকে না। তার মানে হল, যেমনটি আসছে তেমনটিই নেবে, আইসক্রীম পেলাম, তাই পেয়েই বলবেন দারুণ দারুণ, কোন রাগ দ্বেষ নেই তাতে। তারপর আগামী ছয় মাস আইসক্রীম কেউ খাওয়াল না, তাই বলে তিনি বলবেন না যে কত দিন আইসক্রীম পাচ্ছি না বলে আমার মন আইসক্রীমের জন্য হাঁকপাঁক করছে। সাধারণ মানুষ যা কিছু করে সব তার ইন্দ্রিয়ের প্রেরণাতে করে, এই প্রেরণা কোথা থেকে আসছে? রাগ আর দ্বেষ থেকে। সাজাহান কি পরিমাণ ঐশ্বর্য ঢেলে তাজমহল বানাল, কেন বানাল? তার স্ত্রীর প্রতি রাগ, মানে আসক্তি। স্ত্রীর প্রতি আসক্তি থেকে সাজাহান এই তাজমহল বানানোর প্রেরণা পেল। আবার বিধর্মীদের প্রতি দ্বেষ, সেখান থেকে প্রেরণা পেলো যত হিন্দুদের গলা কেটে শেষ করে দিতে হবে। সবই হচ্ছে রাগ আর দ্বেষের খেলা। জ্ঞানীও জগতে ঘুরে বেড়ায় অজ্ঞানীও ঘুরে বেড়ায়, দুজনেই জগৎ থেকে আনন্দ পান, দুঃখও পান। কিন্তু পার্থক্য হচ্ছে জ্ঞানী মুক্ত বিহঙ্গের মত ঘুরে বেড়ান, আরেক জন তিড়িং বিড়িং করে লাফালাফি করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাকে তিড়িং বিড়ং করে কে ঘোরাচ্ছে? রাগ আর দ্বেষ, কোন জিনিষের প্রতি ভালোবাসায় আকর্ষিত হয়ে সেই জিনিষকে পাওয়ার জন্য ছটফট করবে আর যে জিনিষকে পছন্দ করছে না, তখন হয় তাকে মেরে কেটে শেষ করে দিতে চাইবে আর তা নাহলে সেই জিনিষ থেকে পালাতে চাইবে। রাগ আর দ্বেষ থেকে এইভাবেই কর্মগুলো সৃষ্টি হচ্ছে। জ্ঞানীরা রাগ দ্বেষ থেকে বিযুক্ত থাকেন বলে তিনি সব সময় আত্মপ্রসাদে পরিতৃপ্ত থাকেন। বলছেন –

**প্রসাদে সর্বদুঃখানাং হানিরস্যোপজায়তে। প্রসন্নচেতসো হ্যাশু বুদ্ধিঃ পর্যবতিষ্ঠতে।।৬৫।।**

কোন রাগ দ্বেষ নেই কিনা, সেই কারণে তাঁর মন সব সময় আত্মপ্রসাদে পূর্ণ থাকে, এই অবস্থায় তাঁর সমস্ত দুঃখের হানি হয়ে যায়। মানুষ যখন সব কিছুতেই প্রসন্ন চিত্ত হয়ে যায় তখনই *বুদ্ধিঃ পর্যবতিষ্ঠতে*, অর্থাৎ তাঁর বুদ্ধি স্থির হয়, তখনই ঠিক ঠিক ধ্যান হয়। ধ্যানের জন্য প্রয়োজন প্রসন্নতা আর শান্তি। শান্তি কখন হয়? যখন মানুষ যুক্ত হয়। যুক্ত হওয়া মানে বৈরাগ্য। রাগ আর দ্বেষ যখন চলে যেতে শুরু হয় তখন তাঁর একটার পর একটা জিনিষ খসে পড়ে যেতে থাকে। রাগ দ্বেষ কমতে থাকলে মনের মধ্যে ততই প্রসন্নতা বৃদ্ধি পাবে। মন প্রসন্ন হলে বুদ্ধি শান্ত হয়ে যায়, শান্ত বুদ্ধি হয়ে গেলে মন যুক্ত হয়ে যায়। ভক্তরা প্রায়ই বলে ঠাকুরের দিকে মন যায় না। যাবে কি করে, আমাদের মনে সেই আনন্দ নেই, *মনঃ প্রসাদ* নেই, *মনঃ প্রসাদ* মানে শান্তি, প্রসন্নতা, সেই শান্তি প্রসন্নতা আমাদের কি আছে? নেই বলেই যুক্ত হতে পারছে না, ঠাকুরে মন যাচ্ছে না। প্রসন্নতা নেই কেন? রাগ দ্বেষ সব সময় প্রেরণা দিয়ে যাচ্ছে। কি করে ভগবানে মন যাবে? যাওয়ার কথাতো নয়, জপে মন না বসাটাই তো স্বাভাবিক। জপ ধ্যানে মন বসাতে হলে আগে মনের প্রসন্নতা, চিত্তে প্রশান্তি আনতে হবে, প্রসন্নতা তখনই আসবে যখন রাগ আর দ্বেষ থেকে নিজেকে বিযুক্ত করবে। এই অবস্থা যখন হবে, যখন উচ্চ ভাবের সাথে যুক্ত হয়ে গেল তখন বুদ্ধি ভাবনা শান্ত হয়। বুদ্ধিতে ঐ শান্তি এসে গেলে তখনই ঠিক ঠিক সুখ হয়। দুনিয়ার সবাই বলছে জীবনে সুখ শান্তি নেই। সুখ শান্তি আসবে কোথা থেকে, সুখ শান্তির মূল হচ্ছে রাগ আর দ্বেষের থেকে বিযুক্ত হওয়া, বিযুক্ত তো হতেই পারছি না, মাঝখান থেকে আরও বেশি বেশি করে যুক্ত হয়ে পড়ছি, সেই কারণেই কারুর জীবনে কোন সুখ শান্তি নেই।

**নাস্তি বুদ্ধিরযুক্তস্য ন চাযুক্তস্য ভাবনা। ন চাভাবয়তঃ শান্তিরশান্তস্য কুতঃ সুখম্।।৬৬।।**

এখানেও একই কথা বলা হচ্ছে, বুদ্ধি যদি অযুক্ত হয়, মানে ঈশ্বরের সাথে যদি নিজেকে এক মনে না করতে পারি, তাহলে বুঝতে হবে আমার বুদ্ধি নেই, *ন চাযুক্তস্য ভাবনা*, ভাবনার অর্থ এখান হচ্ছে চিন্তা ভাবনা, চিন্তা ভাবনা যতক্ষণ থাকবে আত্মজ্ঞানের প্রতি ভক্তি ততক্ষণ আসবে না। যতক্ষণ ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি না হয়, আত্মচিন্তনের প্রতি আগ্রহ না আসে, ততক্ষণ মনে শান্তি আসে না। যার শান্তি নেই তার সুখও নেই। এখানে সুখকে ব্যাখ্যা করছেন শান্তির সঙ্গে জুড়ে দিয়ে, যেটা পূর্ণ শান্তি। শান্তির জন্য দরকার ভাবনা, ভাবনা মানে বুদ্ধি ভাবনা, বুদ্ধি ভাবনা হচ্ছে আত্মবুদ্ধি, আত্মচিন্তন, আত্মার চিন্তন নিয়ে বসে থাকা বা ঈশ্বরকে নিয়ে বসে থাকা। ঈশ্বরকে নিয়ে বসে থাকার আগে ঈশ্বরের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করতে হবে। যুক্ত হতে গেলে আগে দরকার প্রসাদ, একটা বিশেষ ধরণের প্রশান্তি। প্রশান্তি কোথা থেকে আসবে? যখন রাগ ও দ্বেষ থেকে বিযুক্ত হবে। যদি এই রাগ দ্বেষ থেকে যতক্ষণ না বেরোন যাবে ততক্ষণ কি হবে?

**ইন্দ্রিয়াণাং হি চরতাং যন্মনোহনুবিধীয়তে। তদস্য হরতি প্রজ্ঞাং বায়ুর্নাবমিবাম্ভসি।।৬৭।।**

সাধারণ মানুষের মন যখন ইন্দ্রিয়ের বিষয়ে বিচরণ করে, তখন তার *হরতি প্রজ্ঞাং*, তার বুদ্ধিকে হরণ করে নেয়, যেমন *বায়ুর্নাবমিবাম্ভসি*, ঝড় যেমন নৌকাকে টেনে নিয়ে চলে যায়, ঠিক তেমনি যে মানুষের মন সংযমিত নয়, বুদ্ধি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ যে করে না তাকে ইন্দ্রিয়ের বিষয় ঝড়ের নৌকার মত উড়িয়ে নিয়ে চলে যায়। কখন এদিকে টেনে নিয়ে যাবে কখন অন্য দিকে টেনে নিয়ে চলে যাবে, কিছুই করার থাকে না। সারা জগৎ এই ভাবেই একবার এদিকে ধাক্কা খাচ্ছে, আরেকবার ঐদিকে ধাক্কা খাচ্ছে। আমরা এই ভব সাগরে সবাই ছোট ছোট নৌকার মত, আর এই সাগরে কামনা-বাসনা, শোক-মোহের ঝড় লেগেই রয়েছে, এই ঝড় নৌকাকে উড়িয়ে নিয়ে এই কুলে ফেলছে আরেকবার ঐ কুলে নিয়ে ফেলছে। এর থেকে বাঁচার কি উপায়? শান্তি আর সুখ, শান্তি আর সুখের জন্য চাই বুদ্ধি ভাবনা, বুদ্ধি ভাবনার জন্য যুক্ত হতে হবে, মনটাকে ঈশ্বরের দিকে নিয়ে যেতে হবে বা আত্মচিন্তনে মনকে সর্বদা যুক্ত করে রাখতে হবে। আত্মচিন্তনের জন্য চাই মনের প্রশান্তি ভাব, চঞ্চলতার অভাব হতে হবে। চঞ্চলতার অভাব কখন হবে? যখন রাগ আর দ্বেষ থেকে সরে আসব। রাগ আর দ্বেষের প্রতি মন যদি পড়ে থাকে তাহলে চঞ্চলতার অভাব কখনই হবে না। রাগ আর দ্বেষ যদি থাকে তখন কি হবে সেটাই এই শ্লোকে বলছেন, *ইন্দ্রিয়াণাং হি চরতাং যন্মনোহনুবিধীয়তে*, রাগ আর দ্বেষ থেকে প্রেরিত হয়ে যারা ইন্দ্রিয়ের পেছনে দৌড়াচ্ছে তাদের মধ্যে যার গান ভালো লাগছে সে গান শুনবার জন্য দৌড়াচ্ছে, যে খেতে ভালোবাসে সেই ভোজবাড়ি আর রেস্টুরেন্টের খোঁজে দৌড়াচ্ছে, এদের বুদ্ধি ঝড়ের নৌকার মত হারিয়ে যায়। সেইজন্য হে অর্জুন তুমি কি করবে?

**তস্মাদ্ যস্য মহাবাহো নিগৃহিতানি সর্বশঃ। ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা।।৬৮।।**

অর্জুন তুমি তোমার ইন্দ্রিয়গুলিকে নিগ্রহ করে শান্ত হয়ে বসে পড়। কিভাবে? *ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যঃ*, ইন্দ্রিয়গুলোকে ইন্দ্রিয়ের বিষয় থেকে জোর করে টেনে নিয়ে এসো, তোমার ইন্দ্রিয়গুলোকে দৌড়তে দিও না। প্রথমে তোমাকে ইন্দ্রিয় সংযম করতে হবে, ইন্দ্রিয় সংযম করার পর মনকে সংযম করবে, মন সংযম হলে তোমার বুদ্ধি বশে আসবে। এই জিনিষটাকেই ভগবান আবার তৃতীয় অধ্যায়ে ব্যাখ্যা করবেন। মোদ্দা কথা তোমার ইন্দ্রিয়গুলোর যার যার বিষয়ের প্রতি দৌড় ঝাঁপটা বন্ধ কর। এর পরের শ্লোকে ভগবান জ্ঞানী আর অজ্ঞানীর পার্থক্যটা বলছেন –

**যা নিশা সর্বভূতানাং তস্যাং জাগর্তি সংযমী। যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ।।৬৯।।**

জ্ঞানীর যেটা দিন অজ্ঞানীর কাছে সেটা রাত, আর অজ্ঞানীর যেটা দিন জ্ঞানীদের কাছে সেটা রাত। অজ্ঞানীরা বিষয়ভোগে জেগে আছে, আর আত্মজ্ঞানের ক্ষেত্রে ঘুমিয়ে আছে, ভগবানেই বিশ্বাস নেই। জ্ঞানীর ঠিক উল্টোটাই হয়। পরমার্থ জ্ঞানের ক্ষেত্রে জ্ঞানী সদা জাগ্রত, সেটাই তার দিন, আর বিষয়ভোগ তাঁর খসে পড়ে গেছে, মানে বিষয়ভোগ তার কাছে রাত। ইন্দ্রিয় সুখ, বিষয় সুখে অজ্ঞানী সব সময় সচল। মানুষ কখন সচল থাকে? দিনের বেলাতেই সে সক্রিয় থাকে, যত রকমের কর্ম চাঞ্চল্য দিনের বেলাতেই হয়। অজ্ঞানীদের সমস্ত রকমের সক্রিয়তা ইন্দ্রিয়ের বিষয়সুখে। ঘুমিয়ে পড়লে মানুষ যেমন কোন কাজকর্ম করে না, জ্ঞানীরও ইন্দ্রিয়সুখের হেতু কোন কর্ম হয় না। জ্ঞানীদের সব কাজকর্ম কোথায় তাহলে? আচার্য বলছেন – পরমার্থ জ্ঞানেই জ্ঞানীদের সমস্ত সক্রিয়তা, ঈশ্বরের ব্যাপারে তিনি সজাগ। দিনের বেলায় মানুষের মন যেমন জাগ্রত থাকে ঠিক তেমনি ঈশ্বর জ্ঞানের ক্ষেত্রে জ্ঞানীর মন সব সময় সজাগ। পরমার্থ জ্ঞনের ক্ষেত্রে অজ্ঞানীদের সব প্রচেষ্টা, ক্রিয়া কর্ম, সচলতা সব বন্ধ থাকে, আর জ্ঞানীদের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলে এরা কি সারাদিন ঠাকুর ঠাকুর করে যাচ্ছে। জ্ঞানীরাও সব রকমের কাজকর্ম করেন কিন্তু তাঁরা বিষয়ের প্রতি কোন রকম আসক্তি নিয়ে কোন কাজ করে না, শাস্ত্র আমাকে এই এই কাজ করতে বলেছে তাই আমি এই কাজ করছি, আমার কোন আসক্তি নেই। এই কথা বলার পর ভগবান বলছেন –

**আপূর্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং**
**সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ।**
**তদ্বৎ কাম যং প্রবিশন্তি সর্বে**
**স শান্তিমাপ্নোতি ন কামকামী।।৭০।।**

হে অর্জুন, তোমার সমস্যা হচ্ছে, তুমি শান্তি পাচ্ছ না। যে কামনার কামী সে কোন দিন শান্তি পেতে পারে না। যার ইন্দ্রিয়ের বিষয়ের প্রতি আকর্ষণ পুরোপুরি শান্ত হয়ে গেছে সেই শান্তি পায়। ভগবান প্রথমে কূর্মবৎএর উপমা নিয়ে এসেছিলেন, এখানে তিনি সমুদ্রের উপমা নিয়ে এসেছেন। চারিদিক থেকে নদীগুলো প্রবাহিত হয়ে শেষে সমুদ্রে প্রতিনিয়ত কত জল সমুদ্রে ঢালছে, কিন্তু তাতে সমুদ্রের কোন রকম ক্ষোভণ হয় না। যেমন এক বালতি জলে আমি এক ফোঁটা জল দিলাম, এতে বালতির জলের কিছুই হবে না। একটা পাথর যদি সমুদ্রে ফেলে দিই, সেই পাথর আর খুঁজে পাওয়া যাবে না, সমুদ্রেই হারিয়ে যাবে। জ্ঞানীর আত্মচিন্তন সমুদ্রের মত এত গভীর আর এত বিশাল যে এখন সে যাই ভোগ করুক না কেন সব আত্মচিন্তনের গভীরতায় হারিয়ে যাবে। একটা মাটির বিশাল ঢিপি, বৃষ্টির জল পড়ে নরম হয়ে আছে, এখন যদি একটা তীর ঐ মাটির ঢিপিতে মারা হয় তখন তীরটা গিয়ে ঐ ঢিপির মধ্যে হারিয়ে যাব, তীরটা ঢিপিরও কিছু করতে পারবে না, আর ঢিপি থেকে বেরিয়েও আসতে পারবে না, ঐখানেই সে পচে পচে এক সময় ওর অস্তিত্বই হারিয়ে যাবে। যিনি জ্ঞানী পুরুষ, আত্মজ্ঞ যিনি, তাঁর হৃদয় সমুদ্রের মত এত বিশাল হয়ে যায় যে, জগতের যত রকমের কামনা বাসনা তাঁর মধ্যে গিয়ে সব হারিয়ে যায়, আর খুঁজে পাওয়া যায় না, জ্ঞানীও চুপচাপ গম্ভীর সমুদ্রের মত পড়ে থাকেন। আমাদের ক্ষেত্রে কি হচ্ছে, কেউ একটু প্রশংসা করল তো সঙ্গে সঙ্গে মনটা তিড়িং করে লাফিয়ে উঠবে, আবার কেউ একটু মন্দ কথা বলল তক্ষুণি ভেঙ্গে মুষড়ে পড়ি। এইটাই হচ্ছে চঞ্চলতার লক্ষণ, সব সময় আমাদের মন চঞ্চল হয়েই আছে। মনের মধ্যে একটা ভালো কিছু খবর এসে গেল খুব খুশি হয়ে গেলাম, খারাপ কিছু খবর এলো সঙ্গে সঙ্গে বিষাদগ্রস্ত হয়ে গেলাম। এই আনন্দ আবার এই বিষাদ, এই দুঃখ এই খুশি, এই হর্ষ এই অবসাদ। জ্ঞানী পুরুষের এই সব কিছুই হয় না, কেউ ভালো বলল তাতেও তাঁর কিছু হয় না আবার কেউ সমালোচনা করল তখনও তিনি ভেঙ্গে পড়েন না। যাঁর আত্মজ্ঞানের উপলব্ধি হয়ে যাবে তখনই তিনি এই অবস্থা প্রাপ্ত হন।

**বিহায় কামান্ যঃ সর্বান্ পুমাংশ্চরতি নিঃস্পৃহঃ। নির্মমো নিরহাঙ্কারঃ স শান্তিমধিগচ্ছত।।৭১।।**

আত্মজ্ঞানী সব কামনাকে নিঃশেষ রূপে পরিত্যাগ করে দিয়েছেন, তাঁর মনে আর কোন কামনা নেই। যিনি *মৎপরঃ* হয়ে গেছেন তাঁর আর কিসের কামনা থাকবে। শ্রীরামকৃষ্ণ সবার উপরে, সর্বশ্রেষ্ঠ, যিনি সব থেকে শ্রেষ্ঠ তাঁকেই তুমি পেয়ে গেছ তোমার মনে আর কিসের কামনা আসবে। ঠাকুর বলছেন যে মিছরির শরবৎ খেয়েছে সে আর চিটে গুড়ের পানা খেতে যাবে না। সেই ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার হলে তিলোত্তমা রম্ভা সব চিতাভস্ম মনে হয়। এগুলো কোন কল্পনা নয়, এটাই হয়, এটাই ঘটনা। পুরো গীতাতে যা বলা হচ্ছে সবটাই উপলব্ধি সাপেক্ষ, বাল্মীকি রামায়ণে কবির অনেক কল্পনা আছে, গীতার মধ্যে কল্পনার কোন স্থান নেই। যেটা হয় সেটাই বলা হয়েছে। যাঁরা নিয়মিত কথামৃত পড়েন তাঁরা দেখবেন ঠাকুরের জীবনে এর প্রত্যেকটি ঘটনার পুনরাবৃত্তি হয়েছে, তিনি নিজেই এই সব অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিচ্ছেন।

এখানে বলছেন, যাঁর সব কামনা নিঃশেষে ত্যাগ হয়ে গেছে, তিনি *নিস্পৃহঃ*, তাঁর আর কোন কিছুতেই স্পৃহা নেই, পাওয়ার কিছুই নেই তাঁর। আর কি হয়? *নির্মমঃ*, তাঁর আমার বোধ চলে যায়, *নিরহঙ্কারঃ*, অহঙ্কার, আমি আমি ভাব থাকে না। শরীর ও জীবনযাত্রা চালাতে যতটুকু দরকার সেইটুকুর প্রয়োজন বোধ তিনি রেখে দেন, কিন্তু তাতেও এটা আমার এই বোধটা তাঁর থাকে না। ঠাকুরও খাওয়া দাওয়া করতেন, তাঁরও জামা কাপড় ছিল, জুতো ছিল, কেননা তাঁকেও শরীর চালাতে হবে। এখানে কোথাও বলা হচ্ছে না যে শরীরের আর কোন দরকার নেই, এবার শরীরটাকে ফেলে দাও। না, তিনি শরীর রেখে দেন, জীবন যাত্রার জন্য যা কিছু দরকার সেটাও রাখেন। কিন্তু ঐটুকুর মধ্যেও তাঁর কোন মমত্ব বোধ, আমার বোধ থাকবে না।

**এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ নৈনং প্রাপ্য বিমুহ্যতি। স্থিত্বাহস্যামন্তকালেহপি ব্রহ্মনির্বাণমৃচ্ছতি।।৭২।।**

এই ধরণের যাঁরা তাঁরাই একমাত্র শান্তি পান, যাঁর আমি বোধ, মমত্ব বোধ নেই। আমি আমার বোধ কখন চলে যায়? যখন তাঁর ভেতর থেকে সব কামনা বাসনা খসে পড়ে যায়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলছেন এইটাই হচ্ছে *ব্রাহ্মী স্থিতিঃ*। মন যাঁর আত্মাতেই স্থিত, আত্মা ছাড়া আর কিছুই দেখেন না, এই ভাবে যখন সুদৃঢ় ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যান সেটাই হচ্ছে ব্রাহ্মী স্থিতি, এই ব্রাহ্মী স্থিতি প্রাপ্ত হলে আর সে কোন কিছুতে মোহগ্রস্ত হবে না। একবার যদি এই ভাব প্রাপ্ত হয়ে যায় তিনি আর এই অবস্থা থেকে বিচলিত হন না। এর আগে বলেছিলেন, *যততো হ্যপি কৌন্তেয় পুরুষ্যস্য বিপশ্চিতঃ*, তুমি এখন সাধনা করছ, কিন্তু এখনও তোমার মনে কামনা বাসনা আছে, এখান থেকেও তোমার কিন্তু সমস্যা আসবে, তোমার পতন হতে পারে। কিন্তু এই ব্রহ্মভাবকে যখন উপলব্ধিতে নিয়ে এসে ব্রহ্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে তখন আর তোমার কোন কিছুর থেকে সমস্যা হবে না। *স্থিত্বাহস্যামন্তকালেহপি ব্রহ্মনির্বাণমৃচ্ছতি*, মৃত্যুর

সময়েও যদি এই ভাব এসে যায় যে, আমি ব্রহ্মের সঙ্গে অভেদ, তাঁর মুক্তি হবেই হবে। আচার্য এখানে আবার নিজের তরফ থেকে যোগ করে বলছেন – যিনি ব্রহ্মচর্য অবস্থা থেকেই সন্ন্যাস গ্রহণ করে নিয়েছেন, আর সারা জীবন এই ভাবকে অবলম্বন করে অতিবাহিত করছেন, তাঁর তো কারুর সাথেই তুলনা হয় না, তিনি তো মহাপুরুষ, কিন্তু মৃত্যুর সময়ও যদি কেউ এই ব্রহ্মভাব লাভ করেন, ঈশ্বর ভাব প্রাপ্ত হন তাতেই তিনি মোক্ষ পেয়ে যাবেন। যিনি ছোটবেলা থেকেই সন্ন্যাস নিয়ে এই ব্রহ্মভাবকে নিয়ে জীবন যাপন করছেন তাঁর তো তুলনাই হয় না।

আজকের আলোচনার মূল কথা হচ্ছে, অর্জুন জিজ্ঞেস করছেন স্থিতপ্রজ্ঞ কে? ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, যিনি আত্মভাব, ব্রহ্মভাব বা ঈশ্বরভাবে প্রতিষ্ঠিত তিনিই স্থিতপ্রজ্ঞ। কারা এই ব্রহ্মভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না? যাদের মনের মধ্যে কামনা-বাসনা আছে। যাদের মনে কামনা-বাসনা আছে তাদের ইন্দ্রিয় সমুদয় চঞ্চল হয়ে থাকে। ইন্দ্রিয় যার চঞ্চল থাকে তাকে এদিক ওদিক দৌড়াদৌড়ি করতে হয়। এর বিপরীত ব্রহ্মভাবে যিনি প্রতিষ্ঠিত, তিনি যে পথেই ব্রহ্মভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকুন না কেন, জ্ঞানমার্গ দিয়েই আসুন, কিংবা কর্মমার্গ দিয়েই আসুন, এই ধরণের ব্রহ্মভাব সম্পন্ন মানুষ একেবারে শান্ত। অর্জুনের প্রশ্ন ছিল ব্রহ্মভাবে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তির আচরণ কি রকম? আচরণ হচ্ছে, তিনি যখন বসে থাকেন তখনও তিনি চঞ্চল হন না, যখন দাঁড়িয়ে থাকেন তখনও তিনি চঞ্চল হন না, চলা ফেরা করলেও চঞ্চলতার লেশ মাত্র দেখা যায় না, কথা বলার সময়ও চঞ্চল হন না, কাজ করার সময়ও চঞ্চলতার ভাব দেখা যায় না। এর ফলস্বরূপ যুদ্ধে যখন উনি কারুর গলা কাটেন তখনও চঞ্চল হন না, আর এনার গলাও যদি কেউ কেটে দেবে তাতেও তিনি চঞ্চল হবেন না। চঞ্চলতার এইটাই হচ্ছে মূল কথা, তাঁর মধ্যে কোন ধরণের চঞ্চলতা থাকে না। চঞ্চলতার ভাব কোথা থেকে আসছে? রাগ আর দ্বেষ থেকে। এনাদের রাগ আর দ্বেষটা অনেক আগেই খসে গেছে বলে কোন চঞ্চলতার অবকাশ তাঁরা দেখেন না। রাগ আর দ্বেষই হচ্ছে শোক আর মোহের কারণ। অর্জুনের আসল সমস্যা এইটাই, তাঁকে শোক আর মোহ গ্রাস করে নিয়েছিল, অর্জুনের এই শোক আর মোহ রাগ ও দ্বেষ থেকে জন্ম নিয়েছে। ভগবান অর্জুনকে এই শোক ও মোহ থেকে মুক্ত হতে বলছেন। কিভাবে মুক্ত হবে তার জন্য তিনি এক এক করে কয়েকটি পথের কথা বলে দিলেন।

**ওঁ তৎসদিতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসুপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়ং যোগশাস্ত্রে**
**শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে সাংখ্যযোগো নাম দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ।।**

************

## তৃতীয় অধ্যায়
# কর্মযোগ

৭ই আগস্ট ২০১০

ভারতের যত ধর্ম, দর্শন ও চিন্তাধারার উদ্ভব হয়েছে, গীতাতে এসে সব মিশে এক হয়ে গেছে, তারপর গীতা থেকেই আবার বিভিন্ন মত ও দর্শনের উদ্ভব হয়ে ছড়িয়ে গিয়ে হিন্দু ধর্মের বিভিন্ন শাখা তৈরী হয়েছে। গীতা হচ্ছে শিবের ডমরুর ঠিক মাঝের অংশ। আমাদের আগেকার যত রকমের চিন্তাধারা, বেদ, উপনিষদ, পুরান, সাংখ্য দর্শন থেকে যত ধরণের চিন্তা ভাবনা বেরিয়েছে, এর বাইরেও যত রকমের স্বতন্ত্র মত ছিল সব এসে গীতাতে মিশে একাকার হয়ে গেছে। মিশে যাওয়ার পর গীতা থেকেই আবার নতুন নতুন চিন্তা ভাবনা, দর্শন বিচ্ছুরিত হয়ে ভারতের বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে গেছে। সেইজন্য গীতার পরের দিকে যত দার্শনিক ভারতে এসেছেন তাঁরা সবাই অন্তত একবার গীতাকে ব্যাখ্যা করার প্রয়াস করে গেছেন। যখনই কোন সাধক বা পণ্ডিত কোন নতুন একটা দর্শন বা মত নিয়ে আসতেন, এনারা জানতেন যতক্ষণ আমার এই নতুন দর্শনকে গীতার আলোকে ব্যাখ্যা করে দেখাতে না পারব যে আমার নবাবিষ্কৃত দর্শনে যা বলা হয়েছে গীতাও ঠিক এই একই কথা বলছে, ততক্ষণ আমার এই দর্শনকে ভারতের কেউ গ্রহণ করবে না।

যেমন স্বামীজী বলছেন আগেকার যাঁরা আচার্য, শঙ্করাচার্য, রামানুজাদিরা ছিলেন এনারা সবাই এক দেশীয়। কারণ যিনি অদ্বৈত বলেছেন তিনি শুধু অদ্বৈতের কথাই বলে গেছেন, যিনি দ্বৈতের কথা বলে গেছেন শুধু দ্বৈতের কথাই বলে গেছেন। শুধু তাই নয়, স্বামীজীর মতে একেকটা গীতার একেকটি শ্লোককে যিনি দ্বৈতবাদী তিনি দ্বৈত মতে, যিনি বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী তিনি বিশিষ্টাদ্বৈতবাদে আর যিনি অদ্বৈতবাদী তিনি অদ্বৈত মতে টেনে নিয়ে দাঁড় করিয়েছেন। স্বামীজীর মতে এর সবটাই হচ্ছে এক দেশীয়। স্বামীজী বললেন, গীতাতে দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত, অদ্বৈত সব কিছুই আছে, শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনাদর্শ ও বাণীর আলোকে গীতা উপনিষদের নতুন ব্যাখ্যা করতে হবে। স্বামীজীর এই মন্তব্যে দুটো খুব গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার এসে যায়। প্রথম কথা হচ্ছে ঠাকুর কি বলেছেন, ঠাকুর বলছেন দ্বৈত, অদ্বৈত ও বিশিষ্টাদ্বৈত সবই ঠিক, কোনটাই ভুল নয়। এখন গীতার আলোকে ঠাকুরের এই মতকে প্রমাণিত করে দেখাতে হবে যে গীতা তাই বলছে যেটা শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন। তার আগে যুক্তি দিয়ে দেখাতে হবে যে শঙ্করাচার্যের অদ্বৈত, রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈত ও মাধ্বাচার্যের দ্বৈত হচ্ছে এক দেশীয়। ভুল এই কথা বলা যাবে না, কিন্তু বলা যেতে পারে যে এনাদের মত পুরোপুরি ঠিক নয়। এখানে আরেকটি নতুন মত এসে গেল। আমরা বলছি ঠাকুর সমন্বয়ের পথ বলছেন। পাঁচশ বছর পর আবার যখন কোন অবতার আসবেন তিনিও হয়তো ঠাকুরের সমন্বয়ের মতকে পাল্টে দিয়ে আরেকটা নতুন কিছু বলবেন। কিন্তু এখন তো আমাকে দেখাতে হবে তিন হাজার বছর আগে গীতা যা বলেছিল এখন ঠাকুর যেটা বলছেন গীতাও ঠিক তাই বলতে চেয়েছে। ঠাকুর আসার পর একশ বছর হয়ে গেছে কিন্তু এখনও ঠাকুরের জীবনদর্শন ও বাণীর উপর ভিত্তি করে একটিও পূর্ণাঙ্গরূপে গীতার ভাষ্য লেখা হয়নি। ঠাকুর বলছেন মত পথ, যত মত তত পথ, শঙ্করাচার্যও ঠিক আবার রামানুজও ঠিক, মাধ্বাচার্যও ঠিক। ঠাকুরের এই আদর্শকে গ্রহণ করেই আমরা এগোচ্ছি। কিন্তু গীতার দর্শনকে ভিত্তি করে ঠাকুরের এই মতকে আমাদের দেখাতে হবে, কারণ ব্যাখ্যা করাটা অবতারের কাজ নয়, যিনি আচার্য, যেমন স্বামীজী, তাঁরও এটা কাজ নয়। এনাদের পরে যে আচার্যরা আসবেন তাঁদের কাজ হল ঠাকুরের মত শঙ্করাচার্য, রামানুজের মত থেকে কোথায় আলাদা এটা দেখানো। যতক্ষণ না এটা করা যাচ্ছে ততক্ষণ দর্শনের জগতে, বিশেষ করে ভারতের তথাকথিত পণ্ডিত মহল শ্রীরামকৃষ্ণের এই মতকে কেউ মানবে না।

গীতা কত কঠিণ শাস্ত্র এটাকে বোঝাবার জন্য এই কথাগুলো উত্থাপন করা হল। সাধারণ মানুষের পক্ষে গীতাকে বুঝে নেওয়া একেবারেই দুঃসাধ্য। তবে গীতা আমাদের পড়তে হবে, গীতাকে বোঝার চেষ্টাও করতে হবে, এগুলো করতে করতে যতটুকু বোঝা যাবে ততটুকুই আমাকে আধ্যাত্মিক পথে এগোতে অনেকখানি সাহায্য করবে। স্বামী তুরিয়ানন্দজী বলছেন – গীতার যে কোন একটি শ্লোককে ধরে একমাস ঐ শ্লোকের অর্থকে চিন্তন করলে তারপরে গিয়ে ঐ শ্লোকের অর্থ স্পষ্ট হবে। হরি মহারাজ এটা সাধারণ লোককে বলছেন না, বলছেন সাধুদের। সাধারণ মানুষ যারা কিভাবে কত ভাবে যে বন্ধনে পড়ে আছে সেটাকে বোঝারও ক্ষমতা তাদের নেই। আমাদের এই বন্ধন দশা, অসহায়তাকে বুঝতেই কয়েক জন্ম লেগে যায়। কোন জন্মে যদি বুঝতে পারে যে আমি বন্ধনে পড়ে আছি, তারপরে তার প্রচেষ্টা হবে সেই বন্ধন থেকে বেরোন। গীতা হচ্ছে মোক্ষশাস্ত্র, শুধু শুনলে কিছু হবে না, এর অর্থের উপর দীর্ঘকাল ধরে গভীর চিন্তন করে যেতে হবে, তাই গীতাকে শোনার সাথে সাথে কোন ভালো ভাষ্যকে ধরে নিয়মিত অধ্যয়ণও করে যেতে হবে।

গীতা হচ্ছে সমন্বয় শাস্ত্র। সমণ্বয় শাস্ত্রে এমন অনেক সব কথা বলা থাকে যেটাকে আপাত দৃষ্টিতে মনে হবে বিপরীত। এই বিপরীত জিনিষগুলোকে তুলে নিয়ে এসে তার মধ্যে সমন্বয় করা হবে। গীতার প্রথম বিপরীত ভাব দ্বিতীয় অধ্যায়তেই নিয়ে আসা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে ভগবান প্রথমে সাংখ্য বুদ্ধি দিয়ে শুরু করেছেন, সেখানে বলছেন – *এষা তেঽভিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধির্যোগে*

*ত্বিমাং শৃণু* – অর্জুন তোমাকে এতক্ষণ সাংখ্য বুদ্ধির কথা বললাম এবার আমি তোমাকে যোগবুদ্ধির কথা বলছি। আবার অর্জুন প্রশ্ন করছেন – যাঁরা সাংখ্যবুদ্ধি লাভ করেছেন, যিনি ঋষি, যিনি উচ্চতম অবস্থা প্রাপ্ত হয়েছেন তাঁর লক্ষণটা কি, আমি কিভাবে বুঝব যে তিনি সাংখ্যবুদ্ধিতে প্রতিষ্ঠিত? তখন ভগবান স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণের বর্ণনা করছেন – যাঁর মনে কোন বিকার হয় না, কেউ ভালো প্রশংসা করল সেটাও শুনে বাঃ বাঃ করবেন, কেউ মিষ্টি কথা বললেন সেটাও শুনে বাঃ বাঃ করবেন, কেউ খারাপ কথা বলল তখনও বাঃ বাঃ করছেন।

আমাদের অনেকেরই স্বামী লোকেশ্বরানন্দজীর সংস্পর্শে আসার সৌভাগ্য হয়েছিল, স্বামী লোকেশ্বরানন্দজী খুব মিষ্টি স্বভাবের মানুষ ছিলেন, তাঁর ব্যবহার ছিল অত্যন্ত আকর্ষণীয়। তিনি হয়তো অফিসে বসে কাজ করছেন, বা কোন কিছু বই বা প্রবন্ধ রচনা করছেন, সেই সময় যখনই কেউ তাঁর কাছে যেত, তিনি সঙ্গে সঙ্গে কলম বন্ধ করে এমন ভাবে আপ্যায়ন করতে এগিয়ে আসতেন যেন ওনার যত সময় সব তার জন্যই তুলে রাখা হয়েছে। সামনে বসিয়ে বলতেন – বলো কি খাবে, চা খাবে না কোল্ডড্রিঙ্কস খাবে? না বললেও তাকে জোর করে খাওয়াবেন। আর সেই ব্যক্তি দশ মিনিট, আধ ঘন্টা, এক ঘন্টা যতক্ষণ খুশি বসে থাকলেও কখনই তিনি বলতেন না যে, এবার তুমি এসো। এর মধ্যে যত ফোন সব তাঁকেই যেন ধরতে হবে, কখন না করতেন না, সবার সাথেই ফোনে কথা বলতেন। কিন্তু কোন ধরণের চঞ্চলতা, বিরক্তিভাব, তুমি আমার সময় নষ্ট করছ, আমি এখন ব্যস্ত আছি এই ধরণের আচরণ কখনই তাঁর মধ্যে দেখা যেত না। সাধুরা ভাবতেন কি করে যে তিনি এত সময় পেতেন আশ্চর্যের ব্যাপার ছিল। কেউ এসে কান্নাকাটি করছে, কেউ ছেলের ভর্তির ব্যাপার নিয়ে গেছে, কেউ খোশ গপ্প করতে গেছে, কারুর ছেলে অবাধ্য হয়ে গেছে, কেউ সুখের কথা বলছে, কেউ দুঃখের কথা বলছে, কেউ শুধু চা খাওয়ার জন্য বসে আছে, সব তিনি নির্বিকার চিত্তে শুনে যেতেন, কারুর প্রতি একটা কোন ধরণের কটূ মন্তব্য করে আঘাত দিতেন না। এরই মধ্যে তিনি বই লিখে যাচ্ছেন, প্রবন্ধ রচনা করছেন, বিভিন্ন জায়গায় বক্তৃতা দিয়ে যাচ্ছেন আবার গোলপার্কের ইনস্টিট্যুট অফ কালচারের মত একটা প্রতিষ্ঠানকে দক্ষতার সঙ্গে চালিয়ে যাচ্ছেন। কোন সময় তাঁর ভেতরে কোন ধরণের আলোড়ন কারুর চোখে পড়েনি। আমাদের মনে হত গীতার স্থিতপ্রজ্ঞের সাক্ষাৎ মুর্তরূপ হচ্ছেন যেন স্বামী লোকেশ্বরানন্দজী।

এখানে এই বোতলটা আছে, এর একটা ইমেজ সে ছুঁড়ে দিয়েছে, সেই ইমেজটা আলোর তরঙ্গ হয়ে আমার চোখে এসে লেগেছে, চোখ থেকে মনে গেল, এই ইমেজ মনে গিয়ে মনকে উদ্বেলিত করে দেয়। মন যখন উদ্বেলিত হয়ে যায় তখন মন তার নিজের একটা প্রতিক্রিয়া ছুঁড়ে দেয়, সেই প্রতিক্রিয়াটা চোখের মাধ্যমে বোতলের উপরে এসে পড়ে। মনের এই প্রতিক্রিয়াটাই হচ্ছে জ্ঞান। চোখ আর কান এই দুটো দরজা দিয়ে বাইরের সব কিছু আলো আর শব্দের তরঙ্গের মারফৎ স্নায়ুর মধ্যে দিয়ে আমাদের মস্তিষ্কে যায়। মস্তিষ্কে গিয়ে এটাই একটা ছাপ ফেলছে। মস্তিষ্ক নিস্তরঙ্গ পুকুরে পাথর ছুঁড়ে ফেলা জলের মত নড়ে উঠল। মস্তিষ্কের মধ্যে যখন এই তরঙ্গ সৃষ্টি হল তখন সে এর একটা প্রতিক্রিয়া পাঠায়। যেমন আমাকে কেউ একটা ঘুষি মারল আমিও তাকে একটা ঘুষি মারতে যাব। মস্তিষ্কও একটা প্রতিক্রিয়া ছুঁড়ে দেয়। যেখান থেকে তরঙ্গটা এসেছিল এই প্রতিক্রিয়াটা গিয়ে সেটাক ঢেকে ফেলে। জিনিষটাকে যদি পুরো না ঢেকে ফেলতে পারে তাহলে কিন্তু জ্ঞান হবে না, তখন হয়ে যাবে অপূর্ণ জ্ঞান। ব্রহ্মজ্ঞান যখন হয় তখনও এই একই পদ্ধতিতে হচ্ছে। যখন স্বাভাবিক অবস্থাতে সে ব্রহ্মকে আস্বাদন করছে তখনও তার মস্তিষ্ক একই ভাবে প্রতিক্রিয়া ছুঁড়ে যাবে। কিন্তু মস্তিষ্ক, আমাদের বুদ্ধি এই এক বোতল জলের মত, আর ব্রহ্ম হচ্ছেন যেন এক অনন্ত সাগর। এখন মস্তিষ্ক থেকে যে প্রতিক্রিয়াটা ছুঁড়ে দিয়ে ব্রহ্মকে ঢেকে ফেলতে চাইবে তখন সে কতটুকু আর ঢাকতে পারবে, এক বোতলে যতটুকু জল আছে ততটুকুই পারবে তার বেশি তো আর পারবে না। জগতে যাবতীয় যা কিছু জানার আছে সব বোতলের জলের এক ফোঁটার মত। কাউকে আমি যে জানছি সেটা হচ্ছে আমার বোতলে এক ফোঁটার মত। তাই মস্তিষ্ক সব কিছুকেই জ্ঞানের আয়ত্ত করে নিচ্ছে। একমাত্র ব্রহ্মকে সে ধরতে পারেনা, কারণ ব্রহ্ম শব্দটা এসেছে 'বৃ' ধাতু থেকে, 'বৃ' মানে বৃহৎ, ব্রহ্ম এত বৃহৎ যে এই মস্তিষ্ক ধরতে পারেনা। এইজন্যই বলা হয় বুদ্ধি দিয়ে ব্রহ্মকে জানা যায় না।

আমাদের অধ্যাত্ম শাস্ত্র বলছে, তুমি যখন এই প্রতিক্রিয়াটা পাঠাবে তখন শুদ্ধ প্রতিক্রিয়াটা পাঠাও আর তার সাথে অহংতা আর মমতা দিও না। কথায় বলে সূদ সমেত ফেরত দেওয়া। ঠাকুর একটা খুব সুন্দর গল্প বলছেন – এক নাপিত সাহেবের দাড়ি কামাচ্ছিল, কামাতে গিয়ে সাহেবের ব্যাথা লেগেছে। সাহেব বলল ড্যাম্। নাপিত তখন সাহেবকে জিজ্ঞেস করছে – কি বললে সাহেব? সাহেব বলছে – ও কিছু না, তুই একটু সামলে কামা। নাপিত ছাড়বে না, বলছে – সাহেব ড্যাম্ যদি ভালো কথা হয় তাহলে আমি ড্যাম্, আমার বাবা ড্যাম্ আমার ঠাকুরদা ড্যাম্। আর ড্যাম্ মানে যদি খারাপ হয় তাহলে তুমি ড্যাম্, তোমার বাবা ড্যাম্ তোমার ঠাকুরদা ড্যাম্, শুধু ড্যাম্ না, ড্যামড্যামা ড্যাম্ ড্যাম্। এখানে নাপিত ড্যাম্ শব্দের অর্থ জানে না, কিন্তু ড্যাম্ শব্দে তার মধ্যে যে প্রতিক্রিয়া হল সেটাকে সে নিজের অহংতা আর মমতা দিয়ে ফেরত পাঠাল। পুরো অধ্যাত্ম শাস্ত্রে, উপনিষদ থেকে শুরু করে গীতা কথামৃত পর্যন্ত সবাই বলছেন তোমার প্রতিক্রিয়া যেটা হবার হবেই, কিন্তু তুমি যে তাতে অহংতা আর মমতা লাগাচ্ছ এটাকে আটকাও। পরে আর আটকাতেও হবে না, কারণ যিনি ব্রহ্মজ্ঞানী তাঁর অহংতা আর মমতা পুড়ে ছাই হয়ে যায়, তিনি পাঠাতে চাইলেও

পাঠাতে পারবেন না। মনের মধ্যে যে প্রতিক্রিয়াটা আমাদের হচ্ছে সেটা সেকেণ্ডের মধ্যে তৈরী হচ্ছে, সেকেণ্ডের মধ্যেই অহংতা আর মমতা এসে যাবে। অধ্যাত্ম শাস্ত্র এইটাই বলছে, পুরো জগৎ সব সময় ইমেজ পাঠিয়েই চলেছে। জগৎ একটা মেলার মত, মেলাতে কত কিছু পসরা সাজিয়ে দোকানিরা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে, বাচ্চারা একবার বলছে ঐটা খাব, ঐটা কিনব, এটাতে চাপব। এই জগতে আমরাও ঠিক বাচ্চাদের মত। যেদিকেই তাকাচ্ছি সেদিক থেকেই ইমেজ এসে মনে প্রতিক্রিয়া তৈরী হচ্ছে। প্রতিক্রিয়া পর্যন্ত ঠিক আছে, কিন্তু যেই বলবে আমি ঐ জিনিষটা চাই, বা আমাকে ঐ জিনিষটা থেকে পালাতে হবে, এইবারে অহংতা আর মমতা এসে গেল। এই অহংতা আর মমতাকেই কাটতে বলা হচ্ছে। এই অহংতা আর মমতাকে কখন নাশ করতে বলছে? মন যখন তার প্রতিক্রিয়াটা ছুঁড়ছে তখন নাশ করতে হবে। দোল খেলার সময় আমি শুধু সাদা জল দিয়ে কোন রং না মিশিয়ে খেলতে পারি, আবার তার মধ্যে লাল, নীল, সবুজ হলুদ রঙ গুলেও ছুড়তে পারি। জলে এই রঙটাকে গুলতে বারণ করা হচ্ছে।

মা যখন ছেলেকে শাসন করে চড় মারে তখন তাতে কোন বিষ থাকে না। সিংহী যখন শিকার ধরে তখন দাঁতটা এক রকম করে ধরে, কিন্তু যখন নিজের বাচ্চার ঘাড়টাকে মুখে করে ধরে নিয়ে যায় তখন দাঁতটা আরেক ভাবে থাকে। ঋষিরাও ঐ সিংহীর মত আমাদের সাথে আচরণ করেন, তিনি যখন আমাদের কাউকে ধরেন তখন ঐ ধরাটার মধ্যে সন্তানের প্রতি মায়ের স্নেহ মমতার স্পর্শ থাকে, আমাকে রক্ষা করার জন্য, উদ্ধারের জন্য ধরে নিয়ে যান। সাধুর মন হচ্ছে *আপূর্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং*, সাধুর মনে যাই প্রবেশ করুক না কেন তার মনের মধ্যে কোন রকম ক্ষোভণ হয় না। এই জগৎ থেকে সমস্ত রকমের ইমেজ ক্রমাগত আসতেই থাকবে, এই আসাটাকে কেউ আটকাতে পারবে না। আবার ভেতরে যেটা আসবে সেটা আবার বাইরেও বেরিয়ে আসবে, এই বাইরে থেকে ভেতরে আসা আর ভেতর থেকে বাইরে আসা ক্রমাগত চলতেই থাকবে। যিনি স্থিতপ্রজ্ঞ তাঁরও এই ইনপুট আর আউটপুট হয়ে চলেছে, শুধু তাই নয়, এর ইনপুট আর আউটপুটের মধ্যে অশান্তি, বিক্ষোভও থাকতে পারে, রাগ, দ্বেষ, ইচ্ছা এগুলোও থাকতে পারে। শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন নরেনের জন্য মন আটুপাটু করছে। এগুলো থাকবে, কিন্তু স্থিতপ্রজ্ঞের ক্ষেত্রে অহংতা আর মমতাটা নাশ হয়ে যায়, শরীর ধারণের জন্য যতটুকু থাকে সেটাও জলের দাগের মত থাকে। আর যাদের শরীর ধারণের প্রতি কোন আগ্রহ নেই তাদের এইটুকুও নেই, থাকল ভালো, না থাকলে থাকল, এই নিয়ে কোন রকম মাথা ব্যাথা নেই। এই কারণেই তাঁদের প্রতিক্রিয়াতে কোন ধরণের অহংতা মমতা থাকে না।

শ্রীরামকৃষ্ণ যখন নরেনের জন্য ছটফট করছেন, তখন একজন বলছেন একটা কায়েতের ছেলের প্রতি আপনি কেন মন দিচ্ছেন? তখন ঠাকুর বলছেন – ঠিক আছে, এই দ্যাখ্ আমি নরেনের থেকে মন তুলে নিচ্ছি। সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুরের শরীরের সব লোম, মাথার চুল সোজা দাঁড়িয়ে গেল। মনটা সচ্চিদানন্দে লীন হয়ে গেছে। অবতারকে তো সব সময় এইভাবে লীন হয়ে থাকলে চলবে না, তাঁকে এই জগতের মাঝখানে নেমে এসে তাঁর কাজ তাঁকে করে যেতে হবে, তাই তিনি নরেনদের মত শুদ্ধসত্ত্ব মানুষের উপর মনটাকে অবতরণ করিয়ে জগৎ সংসারে বিচরণ করেন। প্রতিক্রিয়া তাঁরও হবে, কিন্তু এটা চাই বা এটা থেকে পালাব এই প্রবৃত্তিটা তাঁর হয় না। উপনিষদ, গীতা, বাইবেল যত শাস্ত্র আছে সব শাস্ত্রকে দুধ জাল দেওয়ার মত যখন ফোটাতে থাকবে, ফুটতে ফুটতে তখন পুরো শাস্ত্র এই দুটো জায়গাতে এসে দাঁড়িয়ে যাবে। তোমার যাই হয়ে যাক না কেন, এই জগৎটা থাকবেই, জগৎ সব সময় তোমাকে উত্তেজনা পাঠাবেই, আর তুমি যত দিন বেঁচে থাকবে এই উত্তেজনা গুলো তোমার ভেতরে ঢুকবেই, যত দিন ঢুকবে ততক্ষণ তোমার ভেতরে প্রতিক্রিয়া হবেই হবে। মানসিক প্রতিক্রিয়াতে নতুন যে জগৎটা সৃষ্টি হবে ঐটাতে অহংতা আর মমতা নাশ কর। অহংতা আর মমতা নাশ হয়ে গেলে ঐ প্রতিক্রিয়াটা নিজে থেকেই সরে যাবে।

ভগবান অর্জুনকে সাংখ্যযোগ আর বুদ্ধিযোগের অথবা বলতে পারি সাংখ্যবুদ্ধি ও যোগবুদ্ধির কথা বলে দিলেন। একটা হচ্ছে জ্ঞানের অবস্থা আরেকটি হচ্ছে কর্মের অবস্থা। যাঁর এই বোধ হয়ে গেছে ঈশ্বর ছাড়া আর কিছু নেই, আত্মাই কেবল আছেন তিনি সাংখ্য বুদ্ধি অবলম্বন করেন। আর যাদের এই সাংখ্য বুদ্ধি হয়নি তাদেরকে বললেন তোমরা কর্মযোগ কর। অর্জুনকে পরিষ্কার বলে দিলেন – *কর্মণ্যেবাধিকারস্তে*, তোমার কর্মেই অধিকার, সাংখ্য বুদ্ধির জন্য তুমি এখনও প্রস্তুত নও। মা সরষে বাটা দিয়ে মাছের ঝাল করেছেন, সেই একই মাছকে কাঁচা লঙ্কা, আদা আর জিরের ফোড়ন দিয়ে একটা পাতলা ঝোল করেছেন। এক ছেলেকে মা এই পাতলা ঝোল দিতেই ছেলে বলছে আমাকে মাছের ঝাল কেন দিলে না? মা বলছে, ওরে তোর পেটে ঐ ঝাল সইবে না। ছেলের রেগে যাওয়াটাই স্বাভাবিক, তুমি ভালো জিনিষটা অপরকে দেবে আর আমাকেই শুধু এই পাতলা ট্যালট্যালে ঝোল কেন দেবে? অর্জুনও ঠিক এই প্রশ্নই করছেন।

অর্জুন উবাচ

**জ্যায়সী চেৎ কর্মণস্তে মতা বুদ্ধির্জনার্দন। তৎ কিং কর্মণি ঘোরে মাং নিয়োজয়সি কেশব।।১।।**

আপনি সাংখ্যযোগের এত প্রশংসা করলেন, আর আমাকে আপনি ইন্দ্রিয়ের যে জিনিষ, সেই জিনিষ গুলো করতে বলছেন। আমরা জানি ধ্যানযোগ হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ। কিন্তু ধ্যান হচ্ছে dignified laziness, যদি কেউ খুব করে জপধ্যান কর তাতে তার শুধু লাভই লাভ। প্রথম লাভ হচ্ছে কোন কাজ করতে হবে না, কারণ যখনই তাকে জপধ্যান করতে দেখবে তখন তাকে কেউ বিরক্ত করে

কোন কাজ করতে বলবে না। দ্বিতীয় যে ধ্যান করছে তার মুখ বন্ধ আছে, সেইজন্য কারুর সাথে বেশি বাক্যালাপ করতে হবে না। লোকের সাথে যত ঝামেলা হয় এই বাক্যালাপ থেকেই তার সূত্রপাত হয়। তৃতীয় হচ্ছে, ধ্যান করতে গিয়ে ঘুমে ঢুলতে থাকে, এতে ভালো বিশ্রামও হয়ে যাবে, বিছানায় শুয়ে যদি ঘুমোয় তাহলে লোকে বলবে ব্যাটা পড়ে পড়ে খালি ঘুমোচ্ছে। আর ধ্যান করতে করতে ঝিমোতে থাকলে লোকে বলবে আহা রে ধ্যান করতে করতে ভাবের ঘোরে চোখটা বন্ধ হয়ে গেছে। ধ্যান করাতে শুধু লাভই লাভ। অর্জুনও শ্রীকৃষ্ণকে বলছেন আপনি কেন আমাকে dignified laziness হতে দেবেন না।

কাজ করা মানে খালি খেটে মরা ছাড়া আর কিছুই না। মেরি আর মার্থা দুই বোন ছিল। ওদের বাড়িতে একবার যিশু গেছেন। মার্থা বেচারী একাই ছুটোছুটি করে এঘর সেঘর করে রান্নাবান্না থেকে সব কিছুর ব্যবস্থা করছে যাতে যিশু আর তাঁর সাঙ্গপাঙ্গোদের সেবার কোন ত্রুটি না হয়ে যায়। অন্য দিকে মেরী যিশুর কাছে চুপচাপ বসে যিশুর মুখনিঃসৃত উপদেশ শুনে যাচ্ছে। মার্থা এসে যিশুকে বলছেন – আপনি একটু মেরীকে বলুন না আমাকে সাহায্য করতে। যিশু আবার মেরীকে খুব স্নেহ করতেন। যিশু তখন মার্থাকে বলছেন – মেরী যা করছে ঠিকই করছে। এই ব্যাপারটাই পরে আলস্যে রূপান্তরিত হয়ে যায়। ঈশ্বরে ঠিক ঠিক ভক্তি আর আলস্য ভাব এই দুটোকে পার্থক্য করা খুব মুশকিল। পার্থক্য শুধু একটা জায়গায় আছে, বাইরে থেকে সেই পার্থক্য বোঝা যায় না। এই তৃতীয় অধ্যায়েই ভগবান বলবেন – *কর্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্* - তুমি কাজ না করে হাত পা গুটিয়ে বসে আছ কিন্তু তোমার মনের মধ্যে বিষয় বাসনা ঘুরঘুর করছে। এই জিনিষটা কখনই করতে নেই। আধ্যাত্মিক জীবনে সেইজন্য বেশির ভাগ মানুষই প্রবঞ্চক হয়ে ওঠে। পঞ্চম অধ্যায়েই আবার বলবেন – সন্ন্যাস জিনিষটা ভালো নয়, কারণ যারা প্রথমে কাজ কর্ম করে প্রস্তুতির পর্ব শেষ না করেই সন্ন্যাস নিয়ে নেয় তাহলে তার সর্বনাশ হতে বেশি দিন লাগবে না, সত্ত্বগুণী হওয়ার বদলে সে তমোগুণী হয়ে যায়। যারাই কোন কাজ কর্ম না করে শুধুই জপধ্যান করে যায়, তাদেরকে বাইরে থেকে যে রকমই লাগুক না কেন, ভেতর থেকে বিশ্বাস করা খুব সমস্যা হয়ে যায়। তবে হ্যাঁ যারা কাজ আসছে কাজ করে দিচ্ছেন আবার কাজ নেই ঠাকুরের নাম করছেন তাঁদের কথা আলাদা, তাঁরাই মহৎ। কিন্তু যারা নিজেদের কর্তব্য কাজকর্ম ছেড়ে খালি জপ আর ধ্যান নিয়েই পড়ে থাকে, একটা সময়ের পর এদের ব্যক্তিত্বে অনেক রকম গোলমাল ধরা পড়ে।

তৃতীয় অধ্যায়ে অর্জুন এই প্রশ্নই করছেন, আপনি এক দিকে সাংখ্যযোগের মানে জ্ঞানের প্রশংসা করছেন আর আমাকে বলছেন যুদ্ধ করতে, এটা কি ধরণের ব্যাপার আপনার? কারণ যিনি উত্তম গুরু তাঁর যে প্রিয় শিষ্য, তাকে যেটা শ্রেষ্ঠ শিক্ষা সেই শিক্ষাটাই তো তাকে দেবেন। আর আপনি শ্রেষ্ঠ শিক্ষাটা আমাকে শুনিয়ে দেওয়ার পর যেটা গৌণ সেটাকে অনুশীলন করতে বলছেন।

অর্জুন আবার এমন ভাবে ভগবানকে বলছেন ভগবান যেন পরিষ্কার করে কিছু বলছেন না, ভগবানের কথাগুলো যেন স্পষ্ট নয়, কেমন যেন সন্দেহজনক -

**ব্যামিশ্রেণেব বাক্যেন বুদ্ধিং মোহয়সীব মে। তদেকং বদ নিশ্চিত্য যেন শ্রেয়োহহমাপ্নুয়াম্।।২।।**

আপনার কথা গুলো কেমন জটিল, স্পষ্ট নয়, আপনি একদিকে ভালো জিনিষটার কথা বলছেন কিন্তু করতে বলছেন অন্য জিনিষ। *তদেকং বদ নিশ্চিত্য*, আপনি পরিষ্কার করে বলুন, ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে বলবেন না, যেটা বলার সেটা পরিষ্কার করে সোজাসুজি বলুন আমার পক্ষে কোনটা শ্রেয়।

এখানে কয়েকটা কথা আমাদের বোঝার দরকার আছে। গীতার তৃতীয় অধ্যায়ের নাম হচ্ছে কর্মযোগ, এর মূল বক্তব্য ঈশোপনিষদেও বলা হয়েছে। সেখানেও প্রথমে বলছেন, তুমি যদি উপলব্ধি চাও তাহলে তুমি সব কিছুতেই ঈশ্বরকে দর্শন কর – *ঈশা বাস্যমিদং সর্বং*, এই জগতে যা কিছু আছে সব তিনিই হয়েছেন। এটাকে যদি না বোধ করতে পার তাহলে – *কুর্বন্নেবেহ কর্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ*, তুমি কাজ করে যাও। কিভাবে কাজ করবে? *ন কর্ম লিপ্যতে নরে* – কর্ম করবে কিন্তু কোন কিছুতে লিপ্ত হবে না। গীতার তৃতীয় অধ্যায়ে ঠিক এই উচ্চ আদর্শকেই অর্জুনকে ভগবান ব্যাখ্যা করছেন। কাজ করা মানেই একটা মানসিক প্রতিক্রিয়া থাকবে। আমার খিদে পেয়েছে, খিদে পাওয়া মানেই হচ্ছে একটা বাহ্যিক উদ্দীপনা, তবে পেটের ভেতর থেকে আসে বলে বাহ্যিক ব্যাপার অতটা বোঝা যায় না। খিদে পেতেই আমার মস্তিষ্কে সঙ্কেত গেল, খিদে পেলেই আমাকে কিছু খেতে হবে। যাঁরা ব্রহ্মজ্ঞানী তাঁদেরও খিদে পায়, আর খিদে পেলে তাঁরা কি না খেয়ে থাকবেন? তাঁরাও খাওয়া-দাওয়া করেন। অবশ্যই খাবেন।

এর খুব সুন্দর উপমা হচ্ছে – দক্ষিণেশ্বর থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ গিয়েছেন কামারপুকুরে। সেখানে সেই সময় শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী আর লক্ষ্মীদিদিও আছেন। রোজ সকালে উঠেই ঠাকুর জিজ্ঞেস করতেন – হ্যাঁগো, আজকে তোমাদের কি ব্যান্নুন হচ্ছে। কয়েক দিন পরেই ঠাকুর নিজের থেকে বলছেন – ছিঃ একি রোজ সকাল হলেই খাবার কথা মাথায় আসছে, রোজ রোজ একি জিজ্ঞেস করছি কি ব্যান্নুন হবে বলে, ধিক্! যেই এই ভাবনা এলো তখনই বলছেন, তোমরা যা রান্না করবে আমি তাই খাবো। শ্রীরামকৃষ্ণ তখন

পরমহংস, আধ্যাত্মিকতার সমস্ত রকমের চরম উপলব্ধি তাঁর তখন হয়ে গেছে। এখন তিনি যে খাওয়া দাওয়ার কথা ভাবছেন, তিনি কি ভুল করছেন? না, এটাই হচ্ছে ব্যবহারিক জীবনের বেদান্ত। আমরা প্রশ্ন করতে পারি বেদান্ত কি দুই রকমের? ব্যবহারিক বেদান্ত আর অব্যবহারিক বেদান্ত? হ্যাঁ, দুই রকমেরই বেদান্ত হয়। যে বেদান্ত ব্যবহারিক জীবনে প্রয়োগ হয় না, সেই বেদান্তের কোন দাম নেই। শ্রীরামকৃষ্ণ যখন রোজ সকালে উঠে জিজ্ঞেস করছেন – ওগো আজ তোমাদের কি রান্না হবে। তখন ওটা impractical ছিল। কিন্তু যে মুহূর্তে তাঁর মাথায় এসেছে এটা impractical তৎক্ষণাৎ সেটাকে ত্যাগ করে দিয়ে বলছেন – তোমরা যা রান্না করবে আমি তাই খাব। যে অবেদান্তী, যে এখনও সিদ্ধ হয়নি, এমনকি যে সাধকও নয়, সে বলবে আজ থেকে আমি মাছ খাবো না, বলেই পরের দিন থেকেই মাছ খাওয়া শুরু করবে। এদের কোন আঁট নেই। যিনি বেদান্তী, সিদ্ধ পুরুষ, সাধক, তিনি একবার যখন যা বলে দিলেন সেখান থেকে তাঁর মন আর নড়বে না।

কোন কর্মে লিপ্ত না হওয়া মানে হচ্ছে, কর্মের সরাসরি ও আনুষাঙ্গিক কোন ফলের প্রতি আকাঙ্ক্ষা না থাকা। আমি একজন শিক্ষক, আমাকে ছাত্রদের পড়াতে হবে, পড়াতে গিয়ে আমাকে কত মাইনে দিচ্ছে, ছাত্ররা আমাকে কতটা সম্মান করছে, ছেলেরা পাশ করে চলে যাওয়ার পর আমাকে মনে রাখবে কিনা, আমাকে বিভিন্ন দিনে উপহার দেবে কিনা, এই সব নিয়ে আমি কখনই ভাবব না, যদি আমি আমার কর্মে লিপ্ত হতে না চাই। শিক্ষকের ছাত্রদের পড়ানটাই তার স্বধর্ম, ভালো ভাবে নিজকে প্রস্তুতি করে যত্ন নিয়ে পড়ানোটাই তার স্বধর্ম, এর বাইরে তার আর কিছু নিয়ে না ভাবাটাই হচ্ছে কর্মে লিপ্ত না হওয়া। আমি কি কাজ করছি সেটা বড় কথা নয়, আমি চাপরাশি করতে পারি, রেললাইনের পাথর ভাঙতে পারি, মুটেগিরি করতে পারি, কিন্তু যেটাই করছি সবটাই ভগবানের পূজো, এটাই তার কাছে স্বধর্ম। উচ্চতম স্বধর্ম হচ্ছে যখন ভগবান আমার উপর প্রসন্ন হন, এই ভাবটাও তার থাকবে না। সুফি সম্প্রদায়ে রাবাইয়া বলে একজন খুব নামকরা সাধিকা ছিলেন। রাবাইয়া খুব সুন্দর প্রার্থনা করতেন – হে আল্লা, আমি যদি নরকের ভয়েও তোমার প্রার্থনা করি, তুমি চিরকালের জন্য আমাকে নরকে রেখে দিও। আর স্বর্গ কামনা করে যদি তোমাকে প্রার্থনা করি তাহলে তুমি আমাকে স্বর্গে ঢুকতে দিও না। আর তোমাকে যেন ভালোবাসতে পারি, এই ভাবনা নিয়ে তোমাকে প্রার্থনা করি তাহলে তুমি অবশ্যই আমাকে কৃপা কর।

কর্মযোগের এই অধ্যায়কে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। আমরা কাজ কেন করব, এটাকে কয়েকটা শ্লোকে বলেছেন, তারপরে কয়েকটি শ্লোকে বলবেন কিভাবে কাজ করব, এরপর বেদের সময়ে যজ্ঞাদি কর্মের সাথে ইদানিং কালে যেভাবে কর্ম করা হচ্ছে, কয়েকটি শ্লোকে তার সমন্বয় করা হবে। আর যারা পরমহংস পরিব্রাজক যাদের কোন কাজ করতে হয় না, তারা যখন কাজ করবেন তখন কি কাজ করবেন। এই অধ্যায়েই ভগবান বলছেন সবাইকেই কাজ করতে হবে, শুধু পরমহংস পরিব্রাজক তিনিই কাজ করবেন না। এমনকি যাঁরা সিদ্ধ পুরুষ তাঁরাও কিন্তু লোকশিক্ষার জন্য কাজ করেন। যাঁরা কাজ করছেন এদের মধ্যে দুই ধরণের লোক হয়, একজন জ্ঞানী আরেকজন অজ্ঞানী। আমরা যে কাজটা করব সেটা জ্ঞানীর মত করব, অজ্ঞানীর মত কাজ করব না, কারণ আমরা শাস্ত্র অধ্যয়ণ করছি। তারপর কর্মই ঈশ্বরের পূজা এই মনোভাবে কর্ম করা, মানে কর্মকে কিভাবে পূজা ও উপাসনাতে রূপান্তরিত করা যাবে। সব শেষে বলবেন কর্মযোগে কি ধরণের বিঘ্ন আসে। ভালো কাজ করতে গেলে ঠিক ঠিক কি ধরণের সমস্যা আসে। মানুষ নিজেকে ধন্য করার জন্য, কৃতার্থ করার জন্যই কাজ করছে, কৃতার্থ করার জন্যই যদি কাজ করে থাকে তাহলে কিভাবে কৃতার্থ হবে সেটাই অধ্যায়ের একেবারে শেষ পর্যায়ে গিয়ে ব্যাখ্যা করবেন।

শ্রীভগবানুবাচ

**লোকেহস্মিন্ দ্বিবিধা নিষ্ঠা পুরা প্রোক্তা ময়ানঘ। জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কর্মযোগেন যোগিনাম্।।৩।।**

ভগবান এখন অর্জুনের প্রশ্নের উত্তর দিতে শুরু করেছেন। যখন সৃষ্টি হয় তখন আমিই মানুষকে দুটো পথ শিখিয়েছি। এই দুটো পথ হচ্ছে প্রবৃত্তিমার্গ আর নিবৃত্তিমার্গ। প্রবৃত্তিমার্গ হচ্ছে বেদে যে কাজ গুলোর কথা বলা হয়েছে, অর্থাৎ শাস্ত্র বিহিত কর্ম করাই হচ্ছে প্রবৃত্তিমার্গ। নিবৃত্তিমার্গ হচ্ছে সমস্ত কর্ম ত্যাগ করে দিয়ে মানুষ যখন আত্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হতে চাইছে। এই দুটো মার্গের মাঝখানে একটি মার্গ হয়, সেটা হচ্ছে নিষ্কাম ভাবে প্রবৃত্তিমার্গ। প্রবৃত্তিমার্গের নীচে চতুর্থ আরেকটি মার্গ আছে, যেখানে মানুষ কাজ করে শুধু মাত্র ভোগের জন্য, পুরোপুরি জাগতিকমার্গ। এই চতুর্থ মার্গী যারা এরা হচ্ছে পশুস্তরের। সারা বিশ্ব জুড়ে যারা যত কাজ করছে সবাই হল এই পশুস্তরের, সে যত বড় প্রভাবশালী ব্যক্তিত্বই হোন না কেন। কারণ এদের সব কাজই হচ্ছে রাগ আর দ্বেষ দ্বারা প্রেরিত। এদের মধ্যে আবার তারতম্য আছে, পশুর মধ্যে যেমন গরুও আছে আবার বাঘ সিংহও আছে ঠিক তেমন মানুষের মধ্যে ভালো লোকও আছে, খারাপ লোকও আছে, কিন্তু সবাই পশুস্তরের। এদের থেকে উঁচু স্তরের যাঁরা তারা হয়ে যান প্রবৃত্তিমার্গের লোক। প্রবৃত্তিমার্গের মধ্যে সব থেকে উচ্চ অবস্থার লোক হচ্ছেন ঋষিরা, আর সাধারণ স্তরে ভক্তদের মত, যারা সকালে উঠে একটু জপধ্যান করছে, আর শাস্ত্রে যেভাবে বলে দিয়েছে সেইভাবে একটু কাজ কর্ম করছেন, এরাই হচ্ছেন প্রবৃত্তিমার্গের সাধক, পশুস্তর থেকে এরা অনেক উপরে চলে এসেছে।

প্রবৃত্তিমার্গের সব থেকে উচ্চ লক্ষ্য হচ্ছে ব্রহ্মলোক, ব্রহ্মলোক হচ্ছে স্বর্গলোকই কিন্তু স্বর্গলোক থেকে আরও উচ্চলোক। সেইজন্য আচার্য মাঝে মাঝেই বলছেন আস্তম্ভ ব্রহ্মলোক পর্যন্ত, একটা ঘাসের টুকরো থেকে ব্রহ্মলোক পর্যন্ত। যারা জাগতিক মার্গের তারা মৃত্যুর পর যে কোন লোকে যেতে পারে, স্বর্গলোকেও যেতে পারে, নরকেও যেতে পারে, উদ্ভিদ হয়েও জন্মাতে পারে, যে কোন যোনিতেও যেতে পারে। সেখান থেকে প্রবৃত্তিমার্গের লোকেরাও ফিরে আসবে আবার জাগতিকমার্গের লোকেরাও ফিরে আসবে। কিন্তু প্রবৃত্তিমার্গের লোকেরা স্বর্গ থেকে ফিরে এসে একটা ভালো জায়গায় জন্ম নেবে, হয়তো রাজা হয়ে জন্মাল বা একজন ঋষি হয়ে জন্মাবে, কিন্তু ঘুরতে থাকবে। এটা হচ্ছে শাস্ত্রের মত। জাগতিক লোকেরাও ঘুরতে থাকবে কিন্তু তাদের কখন ভালো জায়গায় জন্ম হবে কখন খারাপ জায়গায় জন্ম হবে, এরাও ঘুরতে থাকবে। তৃতীয় হচ্ছে অনাসক্ত ভাবে যারা কর্ম করছেন, প্রবৃত্তিমার্গে আছে কিন্তু অনাসক্ত, অর্থাৎ এরা আর রাগ ও দ্বেষ থেকে প্রেরিত হয়ে কর্ম করছেন না। এইখান থেকে এরা চলে যান নিবৃত্তিমার্গে। যদি কোন কারণে নিবৃত্তিতে না যেতে পারে তখন মৃত্যুর পর সে চলে যায় উচ্চতম শ্রেষ্ঠ স্বর্গে। সেখানে গিয়ে সে ঈশ্বরের সঙ্গে এক হয়ে যায়। ঈশ্বরের যখন এই কল্পটা শেষ হয়ে যাবে তখন তারও মুক্তি হয়ে যায়। আর যারা নিবৃত্তিমার্গের তারা কোন কাজ করবে না, এদেরকে কোন কিছুই বদ্ধ করতে পারবে না। এই হচ্ছে চারটে অবস্থা – জাগতিকমার্গ, প্রবৃত্তিমার্গ, অনাসক্ত প্রবৃত্তিমার্গ আর নিবৃত্তিমার্গ। জাগতিক ভাব নিয়ে যারা কর্ম করে যাচ্ছে, যাদের কর্ম শাস্ত্র অনুমোদিত নয়, সব সময় রাগ আর দ্বেষ প্রেরিত হয়ে কর্ম করছে, শুধু ভোগের জন্য, এরা সবাই সমান, পোকামাকড়ের যা গতি এদেরও এই একই গতি। পোকামাকড় মরলে আবার পোকামাকড়ই হয়। কিন্তু সমাজে যারা ভালো ভালো কাজ করছেন, খুব করিৎকর্মা তাদের কি আর পোকামাকড় হতে হবে? কখনই না, এইজন্যই আমাদের শাস্ত্রে নানা রকমের স্বর্গের কল্পনা করা হয়েছে, এরা সেই রকম কোন ভালো স্বর্গে যাবে। কিন্তু যারা প্রবৃত্তিমার্গ করছেন তাদের শেষ উচ্চ অবস্থা হল ব্রহ্মলোক। আর যারা অনাসক্ত হয়ে প্রবৃত্তিমার্গ করছে এরা নিবৃত্তিমার্গের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করে নিল। কিন্তু কোন কারণে যদি তার জ্ঞান লাভ না হয়ে থাকে, জ্ঞানলাভের আগেই যদি শরীর পতন হয়ে যায় তখন সে যার ধ্যান করছিল, তার যে ইষ্ট, কারণ প্রবৃত্তিমার্গের সাধনা হচ্ছে সগুণ সাকারের সাধনা, সে যদি শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনা করে থাকে, মৃত্যুর পর সে শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে এক হয়ে যাবে। এই সগুণ সাকার ঈশ্বর শ্রীরামকৃষ্ণও যখন কল্পান্তে লীন হয়ে যাবেন তখন তারও মুক্তি হয়ে যাবে। কিন্তু বাকীরা যারা, পোকামাকড় এরা আবার যখন কল্প শুরু হবে তখন আবার জন্মাবে। গীতার নবম অধ্যায়ে ভগবান এই জিনিষগুলোর আলোচনা করেছেন। এই হচ্ছে মূল কথা।

ভগবান বলছেন আমিই এই দুটো পথের প্রবৃত্তিমার্গ আর নিবৃত্তিরমার্গের কথা মানুষকে শিখিয়েছি। নিবৃত্তিমার্গ হচ্ছে সন্ন্যাসীদের পথ, সন্ন্যাসী মানে যাঁর জ্ঞান হয়ে গেছে। আবার যাঁরা গেরুয়া নিয়ে সন্ন্যাস নিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে যাঁরা তত্ত্বগত ভাবে বুঝে গেছেন যে, আত্মার স্বরূপ এই রকম, তাঁরা এই সিদ্ধিটাকেই নিজের সাধনা বানিয়ে নেন। তার মানে, শঙ্করাচার্যও সন্ন্যাসী আবার বিভিন্ন মঠে যে মহারাজরা আছেন তাঁরাও সন্ন্যাসী, কিন্তু দুটো সন্ন্যাসের তফাৎ আছে। শঙ্করাচার্য সব কিছু জানার পর, মানে উপলব্ধি করার পর সন্ন্যাস নিয়েছেন, কিন্তু বেশির ভাগ সন্ন্যাসী যাঁরা সন্ন্যাস নেওয়ার আগে ত্যাগ তপস্যার আদর্শের কথা কিছু শুনে অনুপ্রাণিত হয়ে এই পথে চলার সঙ্কল্প করে সন্ন্যাস নিয়ে নিলেন। এবার সন্ন্যাস নিয়ে তিনি সাধনা করে করে আস্তে আস্তে সেই স্তরে পৌঁছাবার জন্য প্রয়াসী হয়েছেন, তারপর তিনি সেখানে এক সময় পৌঁছেও গেলেন। সন্ন্যাসীর বন্ধনের কোন কারণ নেই, বন্ধনের কারণ হচ্ছে কামিনী-কাঞ্চন আর নাম-যশ, এই বন্ধনের কারণ থেকে সন্ন্যাসীরা বেরিয়ে এসেছেন বলে ওটাকে আর ত্যাগ করার ব্যাপার থাকে না, কারণ ওগুলো আগেই জোর করে ত্যাগ হয়ে গেছে। শঙ্করাচার্যের মত যাঁরা প্রকৃত সন্ন্যাসী তাঁদের এগুলো খসে পড়ে যায়, কিন্তু অন্যান্য সন্ন্যাসীদের ক্ষেত্রে এগুলোকে জোর করে ঝেড়ে ফেলে দিতে হয়।

**ন কর্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে। ন চ সংন্যসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি।।৪।।**

এখানে বলছেন *কর্মণাম্ ন অনারম্ভাৎ*, কাজ যতক্ষণ না করছ ততক্ষণ কিন্তু তোমার নৈষ্কর্ম হবে না, নৈষ্কর্ম হচ্ছে নিবৃত্তিমার্গ, নিষ্কর্মা, যিনি কাজ করেন না। কিন্তু অর্জুন ভগবানের মুখে প্রবৃত্তি মার্গ আর নিবৃত্তিমার্গ দুটো মার্গেরই কথা শুনে খুব উৎসাহিত হয়ে বলছেন যে, আপনি আমাকে শ্রেষ্ঠটা না করতে বলে অন্যটা, মানে যুদ্ধ করতে কেন বলছেন। এর আগে যে চারটে মার্গের আলোচনা করা হয়েছিল সেখানেও নিবৃত্তিমার্গকেই শ্রেষ্ঠ বলা হয়েছে। তাহলে তো সবারই উচিৎ নিবৃত্তিমার্গকেই অবলম্বন করা, কিন্তু ভগবান অর্জুনকে বলছেন যে তোমাকে এই নিবৃত্তিমার্গকে অবলম্বন করার আগে অনাসক্ত ভাবে প্রবৃত্তিমার্গকে অবলম্বন করতে হবে। তারও আগে, অর্থাৎ অনাসক্ত ভাবে প্রবৃত্তিমার্গ করার আগে তোমাকে শুধু প্রবৃত্তিমার্গই করতে হবে। প্রবৃত্তিমার্গ মানে শাস্ত্রোপদিষ্ট কর্ম, শাস্ত্রে যে কর্মগুলো করতে বলা হয়েছে সেই কর্মগুলো করতে হবে। এইটাই এখানে বলছেন, *ন কর্মণামনারম্ভাৎ*, যতক্ষণ না যজ্ঞাদি করে নিজেকে পবিত্র না করছ ততক্ষণ তুমি নিবৃত্তিমার্গে যেতে পারবে না। নিবৃত্তিমার্গ আমাদের সবারই উদ্দেশ্য, কিন্তু তুমি এখন প্রস্তুত নও। কারণ তুমি কর্মই করোনি, শুধু তাই নয়, তোমার স্বধর্ম যুদ্ধ করা, সেই যুদ্ধই তুমি করতে চাইছ না, এতেই পরিষ্কার যে তুমি নিবৃত্তিমার্গে অনুপযুক্ত। যাঁরা সন্ন্যাসী তাঁরাও যখন দেখেন যে লোকশিক্ষার জন্য কাজ করা দরকার, সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা কাজে নেমে পড়েন, যদিও সন্ন্যাস আর কর্ম এক সঙ্গে চলে না। কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দ জগৎকে শিক্ষা দিতে নেমে গেলেন, শ্রীকৃষ্ণ যুদ্ধ করতে নেমে গেলেন, শ্রীরামচন্দ্র এত বড় লঙ্কাকাণ্ড করলেন, মহম্মদ তরোয়াল নিয়ে নেমে গেলেন। যাঁরা জ্ঞানী পুরুষ

তাঁরাও দরকার হলে কাজে নেমে পড়েন। কিন্তু অজ্ঞানী যদি প্রথমেই উচ্চতম আদর্শের দোহাই দিয়ে বলে আমি কাজ করব না, কারণ উচ্চতম অবস্থা হচ্ছে কাজ না করা, আর এই ভেবে শুধু সন্ন্যাস নিয়ে কর্মত্যাগ করে চুপচাপ বসে যদি মনে করে এতেই আমার সিদ্ধি হয়ে যাবে, তাহলেীতে তার ভালোতো কিছুই হবে না, উল্টে অনেক বিপত্তি এসে যাবে। কাজ তোমাকে করতেই হবে। জগৎ নশ্বর আর ঈশ্বরই সত্য এই জ্ঞান উপলব্ধি হওয়ার আগেই যদি তুমি কর্মসন্ন্যাস নিয়ে নাও তাহলে তোমার কোন কিছুই হবে না।

যে কোন মঠেই সন্ন্যাসী হতে গেলে বেশির ভাগ সন্ন্যাসীকেই খুব অল্প বয়সে সন্ন্যাস নিতে হয়, এমনকি অনেকের তখন সব কিছু বোঝার মত বয়সও থাকে না। কিন্তু অনেক দিন ধরে একটা চর্চার মধ্যে থাকতে থাকতে তাদের সন্ন্যাস জীবনের উদ্দেশ্য, ঈশ্বর, জগৎ সম্বন্ধে ধারণা হতে শুরু করে। সেই সময় তাকে বলা যেতে পারে তুমি তো কর্মসন্ন্যাসের অনুপযুক্ত। একদিকে তাকে ঠিকই বলা হচ্ছে, ভগবান পরে বলবেন, যাদের দেহাত্মবুদ্ধি প্রবল তাদের সন্ন্যাস জীবন খুব কষ্টের, সন্ন্যাসীদের এই কষ্ট গুলোকে সহ্য করতে হয়েছে। কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দ, শঙ্করাচার্য, যিশু এনাদের কিন্তু এই কষ্ট গুলোর মধ্য দিয়ে যেতে হয়নি, কারণ তাঁদের ঈশ্বর বোধ আগেই হয়ে গেছে। কিন্তু ঈশ্বর বোধ হওয়ার আগে যাঁরা সন্ন্যাস নিয়েছেন, যাঁরা কাঁচা সন্ন্যাসী তাদের কষ্টের শেষ নেই। মহা কষ্ট তাকে সহ্য করতে হচ্ছে ঠিকই, কিন্তু একটা মহা সুবিধাও এতে পাওয়া যায়। যেমন সন্ন্যাস নেওয়ার আগে তার হয়তো ঠাকুরের প্রতি সেই রকম ভক্তি ছিল না, ঠিক ঠিক জ্ঞানও ছিল না, এখন সে যদি সন্ন্যাস না নিয়ে বিয়ে করে একটা সংসার সাজিয়ে বসত, তখন তো সে পুরোই বদ্ধ হয়ে যেত, ওখান থেকে বেরোবার আর কোন পথই থাকতা না। এখন দেখতে হবে তার কষ্টটা কোথায় বেশি হবে, কাঁচা সন্ন্যাসীর কষ্ট হবেই, কাঁদিয়ে ছাড়বে, কিন্তু এই কান্নাটাকে যদি তুমি একটা সময় পর্যন্ত সহ্য করতে পার তাহলে ঠিক আছে, আর যদি না পার তাহলে ভাই তুমি সন্ন্যাস নিও না। স্বামীজী নিজেই বলছেন যে, যারাই ঈশ্বরের পথে আসে তাদের শতকরা আশি জনই ঠগবাজ হয়ে যায়, বাকি পনের শতাংশ পাগল হয়ে যায়, অবশিষ্ট পাঁচ শতাংশ স্বাভাবিক, সিদ্ধ বলছেন না, বলছেন একশ জনের মধ্যে পাঁচ জন স্বাভাবিক অবস্থায় থাকেন। এটা স্বামীজীর সময়কার হিসাব।

সেইজন্যই বলা হয় কাঁচা সন্ন্যাসীর অনেক কষ্ট, অনেক লড়াই করে টিকে থাকতে হয়। তবে সুবিধা হচ্ছে এরা অনেক ঝামেলা থেকে বেঁচে যান। যার জগতের প্রতি প্রচুর আকর্ষণ, ভোগ করার ইচ্ছে রয়ে গেছে, সে যদি সন্ন্যাসের পথ অবলম্বন করতে যায় তাহলে সে হয় পাগল হয়ে যাবে নয়তো ঠগবাজ হয়ে যাবে, তার মানে সন্ন্যাস নিলে তার সুবিধা অনেক কমে গেল। যদি মনে করে কান্নাটাই বেশি তাহলে বাপু তুমি এই পথে এসো না, সংসারেই আগে কান্নাটান্না যা করার আছে করে নাও। কর্ম না করে যদি তুমি সন্ন্যাসী হয়ে চলে আস তাহলে তুমি কিন্তু কাঁদবে। কেন তোমাকে কাঁদতে হবে –

**ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্মকৃৎ। কার্যতে হ্যবশঃ কর্ম সর্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ।।৫।।**

সমস্ত মানুষ যে জন্মাচ্ছে, কর্মের দ্বারাই জন্ম হচ্ছে। সাইকেল যদি দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয় তাহলে সাইকেল পড়ে যাবে, কিন্তু সাইকেল যখন চলতে থাকে তখন পড়ে যায় না, বিজ্ঞানের পরিভাষায় একে বলা হয় Dynamic Equilibrium এই জগৎ হচ্ছে Dynamic Equilibrium বসে পড়েছ কি মরেছ। জগৎ শব্দটাই এসেছে গম্ ধাতু থেকে, গম্ মানে চলা। সংসারও তাই, সৃপ্ ধাতু থেকে, যেটা সব সময় সরে সরে যাচ্ছে। এখানে কোন কিছুই স্থির থাকতে পারবে না। সেইজন্যই বলছেন, এমন কোন জিনিষই নেই যে সেটা এখানে স্থির। তাই কাজ করাটাই তোমার স্বাভাবিক, কর্মের দ্বারাই তুমি সৃষ্ট, আর কর্মের মধ্য দিয়েই তোমাকে চলতে হবে, স্বভাব বা প্রকৃতির সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ গুণের প্রভাবে কর্ম করতে তুমি বাধ্য। এই স্বভাব তোমার ভেতরে জন্ম জন্মান্তর থেকে বসান আছে। তাই কর্ম ছাড়া কেউ এক মুহুর্ত শরীর ধারণই করতে পারবে না, বিশেষ করে তোমার যদি জ্ঞান না হয়ে থাকে তাহলে তো কোন প্রশ্নই নেই, তোমাকে কাজ করতেই হবে। কর্মের দ্বারাই সব কিছু চলছে, সেই কারণে জ্ঞানীরাও কাজ করেন, যদিও অন্য দৃষ্টিভঙ্গিতে কাজ করেন, সেটা আমাদের পরে আলোচনায় আসবে। তৃতীয়, চতুর্থ আর পঞ্চম অধ্যায়ে কর্মকে নিয়ে বিভিন্ন ভাবে বিশ্লেষণ করা হবে। তমোগুণীদের কথা উল্লেখ করে বলছেন –

**কর্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্। ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে।।৬।।**

যারা ঘোর তমোগুণী, তারা কাজকর্ম কিছুই করছে না, হাত পা সব গুটিয়ে বসে আছে, কিন্তু মনে মনে ইন্দ্রিয়ের বিষয়ের কথা চিন্তা করে নাচতে থাকে। আমার কাছে টাকা পয়সা নেই, অথচ বেড়াতে যাওয়ার খুব ইচ্ছে, কিন্তু যেতে পারছি না। এখন বসে বসে ভাবছি আমি দিল্লী গেলাম, হোটেলে গিয়ে একটা ভালো ঘর দেখে বাসা পাকড়ালাম। সেখান থেকে বোম্বে গেলাম, সমুদ্রের পারে ঘুরে বেড়াচ্ছি। তাহলে কি আমার দিল্লী বোম্বে যাওয়া হল না? যোগের দৃষ্টিতে আমার কিন্তু বোম্বে দিল্লী ঘোরা হয়ে গেল। ঠাকুর বলছেন – গৃহস্থের মনে ত্যাগ আর সন্ন্যাসীর মনে ও বাইরে দুটোই ত্যাগ করতে হবে। গৃহস্থকে টাকা-পয়সা সঞ্চয় করতেই হবে, তাকে ভোগ বাসনার উপকরণ রাখতেই হবে, গৃহস্থ যদি না রাখে তাহলে লোকে তাকে মন্দ বলবে, এগুলো না করাটাই গৃহস্থের অধর্ম। এটাই গৃহস্থের ধর্ম। গৃহস্থকে বাড়ির লোকজনদের দেখাশোনা, সাধু সেবার জন্য কিছু অর্থ রাখতেই হবে, আর ভোগের জন্যও

কিছু জিনিষ রাখতে হয়। কিন্তু মনেতে তাকে ত্যাগ করতে হবে। আমি আমার প্রয়োজনের বেশি কিছু রাখব না, আর এসব জিনিষ আমার ভোগের জন্য নয়, আমি শুধু এর রক্ষক, আমার আত্মীয় বন্ধু বান্ধব, সাধুসেবার জন্যই সব কিছু। সন্ন্যাসীর ক্ষেত্রে ভোগের উপকরণও থাকবেও না, এগুলোর চিন্তাও করবে না।

বয়স হয়ে গেলে মানুষের ভোগ করার ক্ষমতা কমে যায়, ভোগের ইচ্ছা থাকবে, কিন্তু ইন্দ্রিয় ও প্রাণ শক্তি হ্রাস পাওয়ায় জন্য কিছু করার ক্ষমতা থাকে না, তখন ভোগের এই ইচ্ছাগুলো বীজাকারে ভেতরে থেকে যায়। যখন আবার জন্ম নেবে তখন এই বীজ থেকেই আবার ভোগের আকাঙ্খা পুরো মাত্রায় জেগে উঠবে। সন্ন্যাসী ত্যাগের পথ অবলম্বন করেছে, এখন তার মনে কোন কিছুর পাওয়ার ইচ্ছা হওয়া মানেই সেটাকে পাওয়া হয়ে গেল। সন্ন্যাসীদের ক্ষেত্রে কোন জিনিষ পেয়ে গেলে যে পাপ হবে সেই জিনিষের চিন্তা করলে একই পাপ হবে। সেইজন্য ভগবান বলছেন, তুমি শরীর ইন্দ্রিয় দিয়ে কিছু করছ না, কিন্তু মনে মনে ভোগের চিন্তা করে যাচ্ছ এটা কিন্তু গোলমাল। কি গোলমাল? বলছেন *মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে,* এটা তোমার মিথ্যা আচরণ হয়ে যাচ্ছে, তোমার মন ভোগ বাসনায় গিজ্‌গিজ্‌ করছে। ভোগ বাসনা থেকেই যত কাজকর্ম। কিন্তু যাঁরা জ্ঞানী পুরুষ তাঁরা এর ঠিক উল্টোটা করেন, তাঁদের মন পুরো নিয়ন্ত্রণে থাকে, অথচ তিনি হাত দিয়ে, পা দিয়ে, বাণী দিয়ে কাজ করে যাচ্ছেন। এখানে ছয় নং শ্লোকটিতে ভগবান অজ্ঞানীদের কথা বলছেন আর সাত নং শ্লোকে জ্ঞানীদের কথা বলছেন –

**যস্ত্বিন্দ্রিয়াণি মনসা নিয়ম্যারভতেঽর্জুন। কর্মেন্দ্রিয়ৈঃ কর্মযোগমসক্তঃ স বিশিষ্যতে।।৭।।**

অজ্ঞানী হাত পা বাইরের ইন্দ্রিয়গুলিকে গুটিয়ে রাখে কিন্তু ভেতরে ভেতরে মন সারা জগৎ ঘুরে বেড়াচ্ছে। আর জ্ঞানীর হাত পা সব কাজ করে যাচ্ছে কিন্তু মনটাকে পুরো নিজের নিয়ন্ত্রণে রেখে দেন। এনারা পূর্বোক্ত মিথ্যাচারী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এখন গীতার এই শ্লোক দুটি মুখস্ত করে যদি বলি, আমি বাড়িতে সব কাজ করছি, রান্নাবান্না, বাসন মাজা, ঘর ঝাড়পোছ করা সব করছি, কিন্তু আমার মনটাকে আমিও নিয়ন্ত্রণে রাখি। এখন সবাই কি করে বুঝব যে আমি মনকে নিয়ন্ত্রণে রাখছি কিনা? কোন ভাবেই বোঝা যাবে না, আমি ঠিক বলছি না মিথ্যা বলছি। সেইজন্য ধর্মের পথে লোক ঠকানো অত্যন্ত সোজা। যে যত বেশি লোক ঠকাতে পারে ধর্মের পথে সে তত বড় মহাত্মা হয়ে যেতে পারে। ব্রহ্মচারীদের প্রতি সবারই দৃষ্টি এক রকম থাকে, সে যদি অনেক লোকের সঙ্গে মেলামেশা করে, যেখানে সেখানে ঘুরতে যায় তাহলে লোকে সন্দেহের দৃষ্টি নিয়ে তার দিকে তাকাবে। যখন সন্ন্যাসী হয়ে যায় তখন যদি অনেক লোকের সাথে মেলামেশা করে লোকে ভাববে উনি লোককে উপদেশ দিয়ে সৎ পথে আনার চেষ্টা করছেন। যদি কাঁচা সন্ন্যাসী হয় এই অবস্থায় সে অনেক বেনিয়ম করার সুযোগ তার কাছে চলে আসছে। ঠাকুর তাই বলছেন – সন্ন্যাসী যদি মিথ্যাচার করে তাহলে তার নিজেরও পতন সাথে আরও পাঁচ জনের পতনের কারণ হয়। কিন্তু ব্রহ্মচারী নিজেকে চারা গাছকে বেড়া দিয়ে রাখার মত খুব সচেতনতার সাথে তাকে সাবধানে থাকতে হয়।

গীতা এই ধরণের বেনিয়ম আচরণ নিয়ে বেশি আলোচনা করছে না, শুধু বলছে অজ্ঞানী হাত পা গুটিয়ে ইন্দ্রিয়ের সংযম করছে কিন্তু মনকে ঢালাও স্বাধীনতা দিয়ে দেয়, আর জ্ঞানী ঠিক উল্টোটা করেন, তাঁরা মনকে সংযত করে অনাসক্ত ভাবে কর্মেন্দ্রিয় সমূহের দ্বারা পুরো দমে কাজ করেন। এই কথা বলার পর অর্জুনকে ভগবান বলছেন, তুমি আমার প্রিয় বলে তোমাকে বলছি –

**নিয়তং কুরু কর্ম ত্বং কর্ম জ্যায়ো হ্যকর্মণঃ। শরীরযাত্রাপি চ তে ন প্রসিধ্যেদকর্মণঃ।।৮।।**

কর্ম না করার থেকে কর্ম করা অনেক শ্রেয়ঃ, সেইজন্য নিত্যকর্ম যা আছে, যেটা তোমার কর্তব্য কর্ম, সেটা তুমি অবশ্যই করবে। *নিয়তং কুরু,* তোমার যে নিত্য কর্ম, যিনি শিক্ষক, ছাত্রদের পড়ানোর জন্য তাঁকে খুব ভালো ভাবে প্রস্তুতি নিয়ে ক্লাশে ছাত্রদের ভালো জিনিষটা দিতে হবে, এটাই শিক্ষকের নিত্য কর্ম। আর অর্জুন তুমি সাংখ্যযোগের কথা মনে করে যদি বল আমার তো কাজ করার কথা নয় তাই আমি কাজ করব না, তাহলে তো তোমার শরীরই চলবে না। তুমি যে নিঃশ্বাস নিচ্ছ, খাওয়া দাওয়া করছ, তোমার হৃদস্পন্দন হচ্ছে, রক্ত চলাচল করছে, ফুসফুস চলছে, এগুলোও তো কর্ম। তুমি যদি ঠিক ঠিক অকর্মে বিশ্বাসী হও তাহলে তো তোমার শরীরই চলবে না, শরীর না চললে তুমি বাঁচবে কি করে। কর্ম না করা ভালো এই ধারণা একেবারেই ভ্রান্ত। তোমাকে কাজ করতেই হবে, তবে তুমি কাজ কিভাবে করবে?

**যজ্ঞার্থাৎ কর্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্মবন্ধনঃ। তদর্থং কর্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর।।৯।।**

গীতার এই শ্লোকটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ, পুরো কর্মযোগের সার এই শ্লোকের মধ্যে দেওয়া হয়েছে। যজ্ঞ রূপে, যজ্ঞের জন্য যে কর্মগুলো করা হয় সেই কর্মগুলোই ঠিক ঠিক কর্ম। যজ্ঞ ব্যতিরেকে যত কর্ম সব হচ্ছে কর্ম বন্ধন। যজ্ঞার্থে যে কর্মগুলো করা হচ্ছে সেটাও *মুক্তসঙ্গঃ,* আসক্তি ছাড়া করতে হবে, আসক্তি ছাড়া মানে রাগ দ্বেষ বর্জিত হয়ে কাজ করাকে বলা হচ্ছে। সাধারণ মানুষদের বলা হচ্ছে তুমি কাজ কর কিন্তু তোমার ইন্দ্রিয়কে সংযম করে কাজ কর, ইন্দ্রিয় সংযমই হচ্ছে রাগ ও দ্বেষ বর্জিত। আচার্য শঙ্কর

*যজ্ঞার্থাৎ* কথার ব্যাখ্যা করে বলছেন, ঈশ্বরের সেবার জন্য, ঈশ্বরের পূজা ভেবে যেটা করা হয় সেটাই *যজ্ঞার্থাৎ*। আমি এখানে শাস্ত্র অধ্যয়ণ করতে আসছি এটা ঠাকুরের পূজো। কাজ করার সময় আমাদের এই মনোভাব সব সময় থাকে না, থাকবার কথাও নয়, কিন্তু কাজের শুরুতে একবার মনে করলাম আমি যে কাজ করতে যাচ্ছি সেটা ভগবানের পূজা, কাজের মাঝখানে একবার ভাবলাম, আর কাজের শেষে আরেকবার বলছি ঠাকুর এই তোমার পূজা করলাম এর যা ফল হল সব তোমার। এই মনোভাব নিয়ে কাজ করতে করতে আস্তে আস্তে আমাদের মধ্যে এই ভাবটাই দৃঢ় হয়ে যাবে। তখন আজেবাজে কাজ থেকে মন আপনা থেকেই সরে আসবে। যদি আমরা এইভাবে সব কাজ যজ্ঞভাব নিয়ে করতে পারি কিছু দিনের মধ্যেই আমাদের ব্যক্তিত্বের মধ্যে একটা আমূল পরিবর্তন আসবে, এই মনোভাবই আমাদের একটা নতুন মানুষে রূপান্তরিত করে দেবে, জীবন শান্তিময় হয়ে আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে।

যদি যজ্ঞভাব নিয়ে কাজ না করা হয়, পূজোর ভাব নিয়ে যদি কাজ না করা হয়, সেবার মনোভাব নিয়ে কাজ যদি না করা হয়ে থাকে তাহলে বুঝে নিতে হবে ঐ কর্ম আমার মধ্যে একটা ছাপ ছেড়ে যাচ্ছে, ঐ ছাপটাই সংস্কার রূপে আমাকে বন্ধনে ফেলে দিল। এই সংস্কার থেকেই আবার নতুন কর্ম তৈরী হবে।

এর পরের ছয়টি শ্লোকে কর্মযোগের অন্য দিক নিয়ে আলোচনা করা হবে। বেদে যেসব যজ্ঞের কথা বলা হয়েছে, বৈদিক যুগে সেই সব যজ্ঞের প্রচণ্ড প্রভাব ছিল। কিন্তু বাল্মীকি রামায়ণে এসে যজ্ঞের মাহাত্ম্য কিছুটা কমতে শুরু করে, মহাভারতে এসে যজ্ঞের প্রভাব প্রায় শেষ হয়ে যায়, কয়েকজন মুষ্টিমেয় ব্রাহ্মণ ছাড়া বেদের অত বিশাল যজ্ঞ কেউ করত না। কিন্তু যজ্ঞের প্রতি আকর্ষণ মানুষের মনে থেকেই গিয়েছিল, এখনও আছে। এখনও উপনয়ন, বিবাহ, বিদ্যারম্ভ ইত্যাদি অনুষ্ঠান যজ্ঞ রূপেই অনুষ্ঠিত হয়। এখন অত যজ্ঞ না হলেও হিন্দুদের জীবনে যজ্ঞ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়ে আছে। গীতাকে বলা হয় সমন্বয় শাস্ত্র, প্রাচীন কাল থেকে মানুষের মধ্যে যে ধর্মীয় ভাবগুলোর প্রভাব ছিল, ইদানিং কালে যে ধর্মীয় ভাবগুলিকে মানুষ দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে ওতোপ্রতো হয়ে রয়েছে, এই পুরাতন আর নতুন ভাবধারাগুলোর মধ্যে গীতা একটা সমন্বয় সাধন করে এক নতুন ধর্মীয় ভাবকে মানবজাতির সামনে নিয়ে আসছে। যজ্ঞের এই গুরুত্বকে সামনে নিয়ে এসে গীতা এখানে বলছেন, এই যা কিছু সৃষ্টি হয়েছে, সেই প্রথম সৃষ্টি থেকে শুরু করে এখনও যা সৃষ্টি হয়ে চলেছে সব কিছু যজ্ঞ থেকেই সৃষ্টি হয়েছে, পরের শ্লোকে এটাই বলা হচ্ছে –

**সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্টা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ। অনেন প্রসবিষ্যধ্বমেষ বোহস্ত্বিষ্টকামধুক্।।১০।।**

সৃষ্টির প্রারম্ভে ব্রহ্মা যজ্ঞের দ্বারাই সব কিছু সৃষ্টি করলেন, সৃষ্টি করে বললেন – তোমরাও যজ্ঞ কর, আর সেই যজ্ঞের দ্বারাই তোমাদের সমস্ত রকমের অভীষ্ট সিদ্ধি হবে, এই যজ্ঞই তোমাদের কামধেনু তুল্য। এই জিনিষটাকেই বেদে বিশদ ভাবে বলা হয়েছে, তুমি পুত্র চাও পুত্রেষ্টি যজ্ঞ কর, রাজা হতে চাও যজ্ঞ কর ইত্যাদি। পরের দিকে এসে এই ভাবটাই আস্তে আস্তে পরিবর্তিত হয়ে একটা নতুন ভাবে রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছিল, এটাকেই গীতা এখানে সমন্বয় করছে, এই কারণেই গীতা হচ্ছে সমন্বয় শাস্ত্র। যজ্ঞের কথা বলে ভগবান বললেন –

**দেবান্ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্তু বঃ। পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্স্যথ।।১১।।**

এই যজ্ঞ দ্বারা তোমরা দেবতাদের তুষ্টি সাধন কর আর দেবতারা তোমাদের ঐহিক সামগ্রি প্রদান করে তোমাদের রক্ষা করবে। *পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ*, একে অপরের সেবা কর। দেবতারাও আছেন মানুষও আছে, তুমি যদি ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ, যম, অগ্নি দেবতাদের নামে যজ্ঞ কর, এই দেবতারা আবার তোমাদের দেখাশোনা করবে, ঠিক সময়ে বৃষ্টি দেওয়া, ঠিক সময়ে গাছে ফুল ফল দেওয়া ইত্যাদি যে যে দেবতার যা যা কর্ম সেই সেই কর্ম তারা ঠিক মতে করে তোমাকে সব অভিষ্ট দিয়ে তোমাদের জীবনধারাকে মসৃণ ভাবে চালিয়ে যাবেন। দেবতাদের প্রাপ্য যদি ঠিক না রাখ তাহলে কিন্তু জগতের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে সব কিছু গোলমাল হয়ে যাবে। বর্তমান যুগে এটাকে মালিক আর কর্মচারীর সম্পর্কের সাথে তুলনা করা যেতে পারে। আজকের দিনে বেশির ভাগ কর্মচারীরা আমাদের দাবী মানতে হবে বলে চেঁচিয়ে যাবে কিন্তু আমাদের উভয়ের যে দায়ীত্ব আছে সেটাকে পালন করতে কেউ চাইছে না, আমরা উভয়েই উভয়ের ভালো দেখব এই কথা কেউ বলছে না। যার ফলে শিল্পক্ষেত্রে, কর্মক্ষেত্রে, শিক্ষাক্ষেত্রে নানা রকমের অসন্তোষ লেগেই আছে। কর্মচারীরা যখন মালিকের স্বার্থের কথা ভেবে ঠিক মত কাজ করে, আর মালিকও যখন ভাববে কর্মচারীদের সব রকম সুযোগ সুবিধা দিয়ে এদের ভালো ভাবে রাখতে হবে, তখনই দেশ, সমাজ, জাতির প্রগতি স্বচ্ছল ভাবে এগিয়ে চলে। এই দুটো ভাবের একটা ভাব যদি বিনষ্ট হয়ে যায় তাহলেই কিন্তু সমাজের ভারসাম্য বিপন্ন হয়ে পড়বে। এই বিপদকে এড়াবার জন্যই গীতা এখানে বলছে, *পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্স্যথ*, তোমরা দুজন দুজনের ভালো চিন্তা করে সেইভাবে একে অপরের জন্য যজ্ঞ করলে তোমাদেরই শ্রেয়ঃ লাভ হবে। প্রত্যেক পরিবারের মধ্যেও এই ভাবকে আনা দরকার, স্ত্রী সব সময় দেখবে আমার স্বামীর কিসে ভালো হয়, আর সেই ভাবেই সে সংসারের কাজকর্ম করবে, স্বামীও সব সময় দেখবে আমার স্ত্রীর কিসে সুখ হয় মঙ্গল হয়। এই ভাবকে যদি পরিবারগুলো অনুসরণ করে চলে তাহলে প্রতিটি পরিবারই শ্রী সম্পন্ন ও ঐশ্বর্য্য সম্পন্ন হয়, এটাই তো শ্রেয়ঃ। কিন্তু

কেউ কারুর কথা ভাবে না, হয়তো একজন এই ভাব নিয়ে চলছে আরেকজন চলছে না, সংসারের যত অশান্তি এই জায়গা থেকেই শুরু হয়। আমাদের ভারতে প্রাচীনকাল থেকেই এই ঐতিহ্য চলে এসেছে যে, মহিলারা সংসারে স্বামী, সন্তান, শ্বশুর, শাশুড়ি, ননদ সবাইর দেখাশোনা করতেন, স্বামীরা না দেখলেও তাও সংসারটা একটা শ্রীসম্পন্ন ছিল, কিন্তু মহিলারাও দেখছে না, পুরুষরাও দেখছে না, দুজনেই দুজনের উপরে সব সময় বিষোদ্গার করে চলেছে।

আমরা এই ভাবধারাতেই গৌরবান্বিত যে, ভগবান দেবতাদেরও সৃষ্টি করেছেন আবার মানুষকেও তিনিই সৃষ্টি করেছেন। দেবতাদের তিনি বেশি ক্ষমতাবান করে বানিয়েছেন, সব ক্ষমতা তাদের হাতে, মানুষকে কম ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে, কিন্তু দুজনকে পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত করলেন যজ্ঞের মাধ্যমে। শ্রমিক আর মালিকের কি সম্পর্ক? কাজটাই এই দুই পক্ষের মধ্যে সম্পর্কটাকে ধরে রেখেছে। শ্রমিক যদি ভালো ভাবে কাজ করে তাহলে মালিক তার ভালোমন্দ সব দেখবে, গরুকে ভালো করে ঘাস খাওয়ালে বেশি দুধ দেবে। প্রকৃতির শক্তি সম্পদ যা কিছু আছে সব রয়েছে দেবতাদের হাতে। এখনও, বিজ্ঞান, টেকনোলজির এই রমরমা বাজারেও সব ক্ষমতা দেবতাদের হাতেই আছে, কেউ মানুক আর নাই মানুক, তাতে কিছুই আসে যায় না, কিন্তু এটাই সত্য।

**ইষ্টান্ ভোগান্ হি বো দেবা দাস্যন্তে যজ্ঞভাবিতাঃ। তৈর্দত্তানপ্রদায়েভ্যো যো ভুঙ্‌ক্তে স্তেন এ সঃ।।১২।।**

যজ্ঞাদির দ্বারা দেবতারা সন্তুষ্ট হন, দেবতারা সন্তুষ্ট হলে তখন তাঁরা আমাদের দেখাশোনা করেন। কিন্তু বেদের সময়ে যে যজ্ঞ হত সেটা এখন পাল্টে গেছে, যজ্ঞের আকার, প্রক্রিয়া পাল্টে যেতে পারে, কিন্তু যজ্ঞের ফল যা ছিল এখনও ঠিক তাই আছে। কিভাবে যজ্ঞ এখন করা হচ্ছে সেটাই এই অধ্যায়ে আর চতুর্থ অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে। তোমরা দেবতাদের যজ্ঞ দ্বারা তুষ্ট করে যা পাচ্ছ এটা দেবতাদেরই বস্তু, এগুলোকে যদি তুমি আগে দেবতাকে নিবেদন না করেই ভোগ কর তাহলে তো তুমি চোর সাব্যস্ত হয়ে যাবে।

**যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্বকিল্বিষৈঃ। ভুঞ্জতে যে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ।।১৩।।**

*কিল্বিষঃ* মানে পাপ। তুমি যখন তোমার জীবন রক্ষা করতে গিয়ে যা যা করছ তাতে তুমি তোমার অজান্তেই অনেক পাপ কর্ম করছ, রাস্থা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছ তোমার পায়ের তলায় কত পিঁপড়ে পিষে যাচ্ছে, রান্না করতে গিয়ে আগুন জ্বালছ তাতে কত পোকামাকড় পুড়ে মরছে। আমরা যাই খাচ্ছি, আমাদের মনে রাখতে হবে, যে গ্রাসটা আমি মুখে দিতে যাচ্ছি ঐ গ্রাসটা অন্য আরেকজনের মুখের গ্রাস থেকে টেনে নেওয়া হয়েছে বলেই আমার মুখে যাচ্ছে। সেইজন্য আগেকার দিনের লোকেরা প্রকৃতি থেকে ঠিক ততটুকুই আহরণ করত যতটুকু তার দরকার। নদী থেকে মাছ ধরবে, ততটুকুই মাছ ধরবে যতটুকু মাছে তার পরিবারের পক্ষে যথেষ্ট, পশু শিকার ততটাই করবে যতটা তার প্রয়োজন। কিছু দিন আগে খবরের কাগজে বেরিয়েছিল আমাদের এফসিআই গোডাউনে কত হাজার হাজার মেট্রিক টন গম পচে যাচ্ছে। তার মানে, তুমি পৃথিবী থেকে এই শস্যগুলোকে বার করে এখন বুঝতে পারছ না এত শস্য দিয়ে কি করবে, তাই পচে যাচ্ছে। এটাই হচ্ছে ধর্ম বিরুদ্ধ কাজ।

আমরা যখন ভাত, ডাল, রুটি খাই, তখন খাওয়ার শেষে পাতে যদি একটি শস্য দানা পড়ে থাকে তাহলে বুঝতে হবে যজ্ঞ ভাব নিয়ে খাওয়া হয়নি। ঠাকুরের ভোগের বোঁদে, পায়েস যখন হাতে নিয়ে খাই তখন কত সাবধানে প্রসাদ গ্রহণ করি, আমাদের নজর থাকে হাত থেকে যেন গড়িয়ে একটিও বোঁদের দানা বা পায়েসের রস মাটিতে না পড়ে। কারণ এটা হচ্ছে ঈশ্বরের ভোগের জিনিষ, মাটিতে পড়লে কেউ পা দেবে, কত যত্ন করে সাবধানে আমরা প্রসাদ গ্রহণ করি। এখন আমরা যখন আহার করি তখন কি আমরা এই ভেবে খাচ্ছি যে এটা ঈশ্বরের প্রসাদ, নাকি আমি আমার ভোগের জন্যই খাচ্ছি? যখনই আমি খাওয়ার আগে ব্রহ্মার্পণং করে গ্রহণ করছি তখন সেটা যজ্ঞ হয়ে গেল, তখন আর কিন্তু এটা ভোগ হচ্ছে না, খাওয়াটা পূজাতে রূপান্তরিত হয়ে গেল, এখন এর একটি দানাও আর ডাস্টবিন বা নর্দমাতে যাতে না চলে যায় সেই দিকে আমাকে খুব সতর্ক হয়ে থাকতে হবে। এই ভাব নিয়ে যদি না করা হয় তাহলেই বুঝতে হবে আমাদের জীবনকে সর্বনাশের দিকে ঠেলে দিচ্ছি। মঠে খাওয়ার সময় দেখা যায় যখন মহারাজদের দ্বিতীয়বার ভাত দেওয়া হয় মহারাজরা বলবেন – এই দেখবি দু'দানার বেশি যেন না পড়ে। ব্রহ্মচারীরা, যারা পরিবেশন করে, তারাও এত চৌখস হয়ে যায় যে, ঠিক ততটুকুই দেবে যতটুকু হাতে দিয়ে মহারাজরা দেখাবেন। তার থেকে কয়েকটা দানা যদি বেশি পড়ে যায় মহারাজরা এমন চেঁচিয়ে উঠবেন যে কি একটা মহা অন্যায় কার্য হয়ে গেছে – বাঁদরাম করছ, ঠিক করে দিতে জাননা। ব্রহ্মচারী অবস্থায় মনে হয় দুটো কি তিনটে দানা বেশি হয়েছে তার জন্য এত চেঁচামেচির কে আছে? কিন্তু এরাই আবার সন্ন্যাসী হয়ে যাওয়ার পর এদেরও একই অবস্থা হয়। ব্রেন এমন হয়ে যায় যে একটা দানা ভাত যদি পাতে ফেলতে হয় তখন যে কি প্রচণ্ড কষ্ট হয় চিন্তা করা যায় না। এটাই হচ্ছে ঠিক ঠিক যজ্ঞ।

প্রকৃতির নিয়ম, যতটুকু দরকার তার থেকে এক চুল বেশি নেওয়া চলবে না। প্রয়োজনের বেশি যদি তুমি নিয়েছ তাহলে কিন্তু সেটা আর *যজ্ঞশিষ্ট-অশিনঃ* হল না। দ্বিতীয় হচ্ছে, *কিল্বিষঃ,* একটা কিছু খাওয়া মানেই তুমি কিছু পাপ করছ, মাছ খাচ্ছি মানে একটা মাছের প্রাণ গেল, ছাগল খাচ্ছি ছাগলের প্রাণ গেল, চাল, ডাল, আনাজ সবারই প্রাণ আছে, এতগুলো জিনিষের প্রাণ যাচ্ছে। শুধু এইটুকুই নয়, এত কিছু, এই ধান, গম, তরিতরকারী চাষ করতে কত গরীব লোককে রোদে পুড়ে, বৃষ্টিতে ভিজে কত পরিশ্রম করতে হয়েছে। তারপর আমাদের মায়েরা কত কষ্ট করে যত্ন নিয়ে রান্না করেছে, আমার মুখের একটা গ্রাসের পেছনে কত হাজার হাজার লোকের পরিশ্রম লেগে আছে। আমার প্রতিটি গ্রাসে এত পাপ লাগছে, এই পাপ থেকে আমি কিভাবে মুক্তি পেতে পারি? তখন গীতা বলছে, *যজ্ঞশিষ্ট-অশিনঃ,* তুমি যা কিছু গ্রহণ করছ সেটাকে যজ্ঞ রূপে গ্রহণ কর। আমার একটা নতুন জামা হয়েছে, আগে ঠাকুরকে নিবেদন করে বলা হে প্রভু, এসব তোমার জিনিষ, তুমিই আমার প্রয়োজনে পাঠিয়েছ, তুমি আগে গ্রহণ কর, তারপর আমি এর ব্যবহার করব। তখনই ওই জামাটা প্রসাদী জামা হয়ে গেল, এটাই হয়ে যাবে যজ্ঞের অবশিষ্ট, যজ্ঞের অবশিষ্ট আমি গ্রহণ করলাম। এই মনোভাব নিয়ে শুধু জামা কাপড়ই নয়, যা কিছু আমার প্রয়োজনে গ্রহণ করছি সেটাই এই ভাব নিয়ে গ্রহণ করলে আর পাপ লাগবে না।

আমি যখন ভাত খেতে যাচ্ছি, কিছু ভাত পাত থেকে খাবার পরে আলাদ করে পশুপাখিদের জন্য রেখে দিলে সেটাও যজ্ঞ, ঐটাও যজ্ঞের অংশ হয়ে গেল। দেখতে হবে এখানে কোন কিছুই যেন নষ্ট না হয়ে যায়। জীবন চালাতে গেলে আমাদের পাঁচ রকম ভাবে পাপ করা হয়, এই পাঁচ রকম পাপ থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য মনুস্মৃতিতে পাঁচ রকম যজ্ঞের বিধান দেওয়া আছে। বেদের যাবতীয় যত যজ্ঞ ছিল পরের দিকে গিয়ে এগুলো সব পাল্টে গেল, আর গৃহস্থদের জন্য এই পঞ্চ মহাযজ্ঞের ব্যবস্থা কর হল। প্রথম হচ্ছে ব্রহ্মযজ্ঞ – উপাসনা, জপধ্যান বা শাস্ত্র পাঠ করা হচ্ছে, এগুলো হচ্ছে ব্রহ্মযজ্ঞ। দ্বিতীয় হচ্ছে দেবযজ্ঞ – পূজা, অর্চনা ইত্যাদি করা, কোন দেবতাকে ফুল চন্দন দিয়ে অর্ঘ্য দেওয়া হচ্ছে, ভোগ নিবেদন করা হচ্ছে এগুলো হল দেবযজ্ঞ। তৃতীয় হচ্ছে পিতৃযজ্ঞ – পিতৃপুরুষদের উদ্দেশ্যে অর্পণ করা, খাবার আগে কিছু পিতৃদের নামে অর্পণ করে দেওয়া হয়, এটা অবশ্য আজকাল উঠে গেছে। চতুর্থ হচ্ছে নৃযজ্ঞ, অতিথি সেবা, কাউকে যখন নিমন্ত্রণ করে সেবাদি করান হয় তখন সেটাই যজ্ঞ রূপে করা। শেষে পঞ্চম হচ্ছে ভূতযজ্ঞ, যা কিছু রান্না হয়েছে তার থেকে কিছু গরু, কুকুর, বেড়াল, পাখিদের খেতে দেওয়া। কুকুর বেড়াল পাখিদের খাওয়ার জন্য কিছু দিয়ে দেওয়াটাকে নষ্ট বলা হয় না, এটাও যজ্ঞের অঙ্গ। আমাদের মানবজীবন এই পাঁচটা যজ্ঞ দিয়ে বাঁধা আছে, এর মধ্যে কুকুর, বেড়াল, পাখিদেরও স্থান আছে। এরপর বলছেন –

**অন্নাদ্ভবন্তি ভূতানি পর্জন্যাদন্নসম্ভবঃ। যজ্ঞাদ্ভবতি পর্জন্যো যজ্ঞঃ কর্মসমুদ্ভবঃ।।১৪।।**
**কর্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি ব্রহ্মাক্ষরসমুদ্ভবম্। তস্মাৎ সর্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্।।১৫।।**

এই দুটো শ্লোক এক সঙ্গে মিলিয়ে অর্থ করা হয়। এই দুটি শ্লোকে বেদে যে যজ্ঞের কথা বলা হয়েছে আর ইদানিং কালে যে কর্ম করা হচ্ছে এই দুটোর মধ্যে সমন্বয় করা হচ্ছে। তোমার শরীর যে দাঁড়িয়ে আছে কিসের শক্তিতে দাঁড়িয়ে আছে? খাওয়া দাওয়ার উপর দাঁড়িয়ে আছে। খাদ্য শস্য কোথা থেকে আসছে? বৃষ্টি থেকে। বৃষ্টি কোথা থেকে আসছে? যজ্ঞ থেকে। যখন যজ্ঞ করা হয় তখন ইন্দ্র দেবতা সন্তুষ্ট হয়ে এই বৃষ্টি দিচ্ছেন। বলছেন *কর্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি,* যজ্ঞ কোথায় আছে? যজ্ঞ ব্রহ্মে অবস্থিত। এখানে ব্রহ্ম মানে ঈশ্বরকে বোঝাচ্ছে না, বেদকে বোঝাচ্ছে। বেদ কোথা থেকে এসেছে? *ব্রহ্মাক্ষরসমুদ্ভবম্,* ব্রহ্ম মানে বেদ এসেছে সেই অক্ষর থেকে, সেই পরমাত্মা থেকে। গীতার অর্থ নিজে নিজে করতে গেলে খুব জটিল হয়ে যাবে। নিজে থেকে অর্থ করতে গেলে ব্রহ্মের জন্ম হয়েছে অক্ষর থেকে, অর্থ সব গুলিয়ে যাবে। কারণ ব্রহ্ম হচ্ছে শেষ কথা, তাহলে ব্রহ্ম অক্ষর থেকে কিভাবে জন্ম নেবে। এইসব জটিল শ্লোকের জন্যই নতুন নতুন ভাষ্য তৈরী হয়। মাধ্বাচার্যের মত পণ্ডিতরা এখানে এসে অর্থ করবেন – অক্ষর কে? শ্রীকৃষ্ণ। ব্রহ্ম কি? বেদান্তীরা যে ব্রহ্মের কথা বলে সেই ব্রহ্মের কথা এখানে গীতা বলছে। সেই ব্রহ্ম কোথা থেকে এসেছে? শ্রীকৃষ্ণ থেকে। তাই ব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ থেকে নীচে। কিন্তু আচার্য শঙ্কর অর্থ করছেন – ব্রহ্ম হচ্ছে বেদ। সংস্কৃতের ব্যকরণে বলা আছে ব্রহ্ম বলতে বেদকেও বোঝায়। যখনই ব্রহ্ম বলতে বেদকে বোঝান হবে তখন এই শ্লোকের অর্থ পরিষ্কার হয়ে যাবে।

তারপরের লাইনে বলছেন – *তস্মাৎ সর্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্,* এই বেদ সব সময় যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত আছেন। এখন ব্রহ্ম বলতে যদি বেদকে ধরা হয় আবার ব্রহ্ম বলতে যদি বেদান্তবাদীদের ব্রহ্মকে নেওয়া হয় তাও একই অর্থ হয়ে যাবে। কিন্তু অর্থের ধারাবাহিকতাকে যদি ধরে রাখতে হয় তাহলে এখানে ব্রহ্ম বলতে বেদকেই বুঝতে হবে। কি অর্থ বলছেন? বেদ যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত, তাই যজ্ঞ কর। ঈশ্বরের সর্বশ্রেষ্ঠ স্মৃতিগ্রন্থ হচ্ছে বেদ। বেদ যজ্ঞকে জন্ম দিচ্ছে, যজ্ঞ মেঘকে জন্ম দিচ্ছে, মেঘ থেকে জল আসছে, জল থেকে অন্ন, অন্ন থেকেই তোমার এই অস্তিত্ব রক্ষা হচ্ছে। সেইজন্যে তোমার এই অস্তিত্বের মূলে কে? সেই বেদ, এই বেদ আবার যজ্ঞে কর্ম রূপে অবস্থিত, তাই তুমি কর্ম কর। সেই বেদ কোথায়? পরমাত্মাতে। পরমাত্মা হচ্ছেন সর্বশ্রেষ্ঠ, তাই তুমি পরমাত্মাতে অবস্থিত হও।

**এবং প্রবর্তিতং চক্রং নানুবর্তয়তীহ যঃ। অঘায়ুরিন্দ্রিয়ারামো মোঘং পার্থ স জীবতি।।১৬।।**

এই যে বিশাল চক্র, চক্রটা কি? আমি কথা বলছি, কেন কথা বলতে পারছি? খাওয়া-দাওয়া করছি বলে। খাওয়া-দাওয়া কি করে সম্ভব হচ্ছে? বৃষ্টি হয় বলে। বৃষ্টি কার জন্য সম্ভব হচ্ছে? ইন্দ্রের জন্য সম্ভব হচ্ছে। ইন্দ্র কোথা থেকে শক্তি পাচ্ছে? যজ্ঞ থেকে। যজ্ঞের কথা কোথায় বলা আছে? বেদে বলা আছে। বেদ কোথা থেকে জন্ম নিয়েছে? পরমাত্মা থেকে। যা কিছু হবে সব পরমাত্মা থেকে আসতে হবে। যদি কোন কিছু শেষ পর্যন্ত পরমাত্মাতে নিয়ে যাওয়া যাবে না, তখন সেটা আর যজ্ঞ হবে না। কিন্তু এই যে এত কথা বলা হল সব পরমাত্মাতে চলে গেল। তার আগে বললেন এই দুটো পথ, প্রবৃত্তিমার্গ ও নিবৃত্তিমার্গকে কে দেখিয়েছেন? তখন ভগবান বলছেন, আমিই এই দুটো পথের কথা বলেছি, তখনই এই দুটো পথ স্বীকৃতি পেয়ে গেল। ঈশ্বর থেকে যদি না এসে থাকে তাহলে কিন্তু তার কোন দাম নেই।

সেইজন্য বলছেন, এই যে চক্র ঈশ্বর থেকে প্রবর্তিত হয়েছে, এই কর্মচক্রকে যে অনুসরণ না করে শুধু ইন্দ্রিয়ের মধ্যে রমণ করে, তাহলে তার জীবন ধারণ বৃথা হয়ে যায়, এইটাই এখানে বলছেন *মোঘং পার্থ স জীবতি*। আমরা এর আগে যে জাগতিক মার্গের লোকের কথা বলেছিলাম এরা হচ্ছে ঠিক সেই অর্থে পুরোপুরি জাগতিক মার্গের লোক। যারা এই যজ্ঞের মাহাত্ম্যকে মানে না, বেদের মাহাত্ম্যকে অস্বীকার করে, আর ঈশ্বর প্রবর্তিত চক্রের অনুসরণ করে না আর আমরা আজকে চক্র বলতে খাদ্য খাদকের যে চক্র সেটাকে মানছি, কিন্তু যারা এই চক্রকে মানে না, তাদের জীবনটা ইন্দ্রিয়াসক্ত পাপপূর্ণ জীবনে পর্যবসিত হয়ে যায়। আমাদের কাছে এই চক্র হচ্ছে, ঈশ্বর, ঈশ্বর থেকে বেদ, বেদ থেকে যজ্ঞ, যজ্ঞ থেকে বৃষ্টি আদি, বৃষ্টি থেকে অন্ন, অন্ন থেকে আমার শরীর। এই চক্রটাকে আমরা বেশি অনুসরণ করি। ইদানিং ইকোলজিক্যাল ব্যালেন্সের কথা বলা হয়, কিন্তু এখানে অনেক আগেই এই ইকোলজিক্যালের যে ঠাকুর্দা তার ব্যালেন্সের কথা বলা হয়েছে। পরিবেশবিদরা এখন ইকোলজিক্যাল ব্যালন্সের কথা বলছেন। কিন্তু এই ইকোলজিক্যালের কথা এরাতো সেদিন আবিষ্কার করল, ছাগল ঘাস খায়, ছাগলকে আবার বাঘ খায়, বাঘকে জঙ্গল রক্ষা করছে, বন থেকে আবার বৃষ্টি হচ্ছে, বৃষ্টির জলে আবার গাছ জন্মাচ্ছে, সবারই অস্তিত্ব পরস্পরের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে আছে।

কিন্তু এখানে সুপার ব্যালন্সের কথা কত আগেই বলা হয়েছে। আর শুধু এই দৃশ্যমান জগতকে নিয়েই নয়, অদৃশ্যমান জগতকে নিয়েও চলার কথা বলা হচ্ছে। তোমার আমার বুদ্ধি কতটুকু, এইটুকু তো বুদ্ধি, এই দৃশ্যমান জগতের বাইরেও এক বিশাল জগতের অস্তিত্ব রয়েছে তার খবর আমাদের কাছে নেই, সেই জগতের অনুসন্ধান কর, তারপর তুমি সেই জগতটাকেও সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে চল। এই দৃশ্যমান জগতকে এখানে কি বলছেন? তুমি এখন যেভাবে জীবন চালাচ্ছ, এতে তুমি পাপ করছ। জীবন চালাতে গেলে সবাইকে পাপ করতেই হবে। এই পাপ থেকে মুক্তি কিভাবে পাবে? যা কিছু করছ, খাচ্ছ, সব যজ্ঞরূপে কর এবং যজ্ঞের অবশিষ্টকে প্রসাদ রূপে গ্রহণ কর। আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, তোমার যে যজ্ঞ হচ্ছে সেটা ঈশ্বরের সাথে সরাসরি যুক্ত। তাই শেষ প্রান্তে যারা নীচে আছে আর উপর প্রান্তে যারা আছে এদের দুজনকেই তোমাকে দেখতে হবে। এখন যারা ভোগবৃত্তির মধ্যে পড়ে আছেন তারা বেশি ইকোলজিক্যাল ব্যালেন্সের কথা বলে, এর উপরে বেশি কথা বলে না। যতটুকু দরকার তার বেশি নেওয়া ঠিক নয়, এটাকে এরা কিছুতেই চাইবে না, এরা বলে দরকার থাকুক আর নাই থাকুক সংগ্রহ করে রাখ পরে কাজে লাগবে। এর ফলে কারুর একদিকে ব্যাঙ্ক ব্যলেন্স বেড়েই যাচ্ছে, ঘরের জিনিষ বেড়েই যাচ্ছে, অথচ এগুলো একজনের একার পক্ষে ভোগ করা কখনই সম্ভব নয়। অন্য দিকে লুটেপুটে নিচ্ছে, আবার ইন্দ্রিয়াতীত জগতকে মানেই না। সেইজন্য আমাদের এত কষ্ট। এত কিছু বলার পর বলছেন – *অঘায়ুরিন্দ্রিয়ারামো – অঘ-আয়ুঃ,* এদের জীবনটা হচ্ছে পাপজীবন, *ইন্দ্রিয়ারামো,* যারা ইন্দ্রিয়াসক্ত তারা বৃথাই জীবন ধারণ করে। কিন্তু এর বিপরীত হচ্ছে, কাদের কাজ করতে হয় না –

**যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাদাত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ। আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টস্তস্য কার্যং ন বিদ্যতে।।১৭।।**

এতক্ষণ যাবৎ শ্রীকৃষ্ণ বলে গেলেন সবাইকে কাজ করতে হবে, যজ্ঞভাব নিয়ে কাজ করে যেতে হবে। কিন্তু এখন বলছেন যিনি আত্মারাম হয়ে গেছেন তাঁকে কোন কাজ করতে হয় না। আত্মারাম হচ্ছেন, নিজেতেই নিজে যিনি সন্তুষ্ট হয়ে আছেন। এখানে এসে ভগবান আবার সাংখ্যযোগ ফিরে গেলেন। কর্মযোগের কথা ঠিকই বলছেন ভগবান, কিন্তু ভগবানকেও আবার সাংখ্যযোগে ফিরে আসতে হল। কাজ সবাইকে করতে হবে একমাত্র সাংখ্যযোগীকে কোন কাজ করতে হবে না। সাংখ্যযোগীর লক্ষণ কি, দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৫৫ নং শ্লোক থেকে ৭২ নং শ্লোক পর্যন্ত যে লক্ষণ গুলোর কথা বলেছিলেন, সেই লক্ষণ গুলো যার মধ্যে আছে তাকেই কাজ করতে হবে না। স্থিতপ্রজ্ঞ যিনি তিনি *আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টঃ* নিজের আত্মাতেই সন্তুষ্ট হয়ে আছেন, তাঁর আর বাইরের কোন কিছুর প্রয়োজন নেই। আত্মারামকে ভালো কিছু একটা দিলাম, তিনিও নিজের খুশিকে প্রকাশ করবেন। কিন্তু যদি বলেন এই রকম আরেকটা পাওয়া যাবে কিনা, তখনই বুঝতে হবে কিছু গোলমাল আছে। কিন্তু আত্মারাম তাঁকে কিছু দিলেও তাঁর কোন হেলদোল হবে না, না দিলেও তিনি মনঃক্ষুণ্ন হবেন না। কারণ তিনি আত্মাতেই তৃপ্ত, আত্মাতেই প্রীত, আত্মাতেই সন্তুষ্ট।

**নৈব তস্য কৃতেনার্থো নাকৃতেনেহ কশ্চন। ন চাস্য সর্বভূতেষু কশ্চিদর্থব্যপাশ্রয়ঃ।।১৮।।**

এই ধরণের আত্মারাম পুরুষের কর্তব্য কর্ম বলে কিছু থাকে না। নিজে থেকে কিছু করলেও তাঁদের না কোন পূণ্য হয়, না কোন পাপ হয়, আবার কিছু না করলেও কোন রকমের পাপ বা পূণ্য হয় না। *অর্থব্যপাশ্রয়ঃ*, কোন কাজে যে অর্থ সিদ্ধি হয় তার কথা বলা হচ্ছে, একটা কর্ম করলে একটা ফল পাওয়া যায়, এটা হচ্ছে অর্থ সিদ্ধি। যেমন চাকরি করলে মাসের শেষে মাইনে পাচ্ছে, এটা হচ্ছে *অর্থব্যাপাশ্রয়ঃ*। এই ধরণের ক্রিয়াতে তাঁদের কোন আকর্ষণ থাকে না। শরীর যেটা ধারণ হয়ে আছে তার জন্য যতটুকু দরকার ততটুকুই নড়াচড়া, সেটাও চলে গেলে তার জন্য তাঁর কিছুই আসে যায় না। এই কথা বলে ভগবান অর্জুনের জন্য বলছেন –

**তস্মাদসক্তঃ সততং কার্যং কর্ম সমাচর। অসক্তো হ্যাচরন্ কর্ম পরমাপ্নোতি পুরুষঃ।।১৯।।**

অর্জুন তোমাকে কিন্তু সর্বদা কাজ করতেই হবে, কাজ যেটা করবে সেটা অনাসক্ত হয়ে কর। আত্মতৃপ্ত, যিনি আত্মারাম, তাঁর কোন কিছুতেই সঙ্কল্প নেই। তুমি যদি এই রকম আত্মারামের মত বিরাট কিছু হতে চাও প্রথমে তোমাকে *তস্মাৎ অসক্তঃ*, অনাসক্ত হয়ে তোমার কর্তব্য কর্ম অবশ্যই করে যেতে হবে। উদ্দেশ্য হচ্ছে নিবৃত্তি কর্ম, তুমি প্রথমে প্রবৃত্তি মূলক কর্ম কর। নিবৃত্তিতে যে কর্ম করা হয় তার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে অনাসক্ত। অর্জুন প্রথমে বলেছিল আমি ভিক্ষা করে অন্ন সংস্থান করব, মানে নিবৃত্তিমার্গের কথা বলেছিল, কিন্তু অর্জুনের সেটা পথ নয়। নিবৃত্তিমার্গ যদি তোমার পথ না হয়, যদি নিবৃত্তিমার্গের কর্ম তোমার দ্বারা সম্ভব না হয়, তাহলে তুমি অন্তত প্রবৃত্তিমার্গের কর্ম কর, কিন্তু কোন ভাবেই যেন জাগতিক কর্মে তোমার মন না যায়, যারা আসক্তি নিয়ে কর্ম করে তারাই জাগতিক মার্গের লোক, এরা হচ্ছে নিকৃষ্ট। নিবৃত্তিমার্গের কর্ম তোমার দ্বারা হবে না, তুমি মনে করছ নিবৃত্তিমার্গের কর্ম করতে পারবে, কিন্তু তুমি পারবে না। কেন তুমি পারবে না? যাঁরা এই প্রবৃত্তিমার্গে নিষ্কাম কর্ম দিয়েই মোক্ষ লাভ করেছিলেন, তাঁরাই হচ্ছেন এই পথের শ্রেষ্ঠ উদাহরণ –

**কর্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ। লোকসংগ্রহমেবাপি সংপশ্যন্ কর্তুমর্হসি।।২০।।**

অর্জুনের মনে প্রশ্ন হতে পারে, ভগবান যে কথাগুলো বলছেন এগুলো সব তাত্ত্বিক কথা কিন্তু বাস্তবে কি এটা কখন সম্ভব? অর্জুনের মনে যাতে কোন সংশয় না হয়, তাই ভগবান ইতিহাস থেকে দৃষ্টান্ত নিয়ে এসে বলছেন যে, জনক, অশ্বপতি প্রভৃতি যাঁরা রাজর্ষি ছিলেন তাঁরা কর্ম করেই সংসিদ্ধি পেয়েছিলেন। যদি তুমি মনে কর যে, জনক তো নিজে জ্ঞানী ছিলেন, কিন্তু অর্জুন তিনি জ্ঞান লাভ করার পরেও কাজ করে গেছেন। আর তুমি যদি মনে কর এঁরা জ্ঞানী ছিলেন না, তাহলেও এনারা কাজ করে করে সেই জ্ঞানীর অবস্থায় চলে গিয়েছিলেন। *লোকসংগ্রহমেবাপি*, মানে লোকশিক্ষার জন্য, মানুষকে সুপথে নিয়ে যাওয়ার জন্যও জ্ঞানীরা দৃষ্টান্ত স্থাপন করার জন্য, উচ্চ ভাব ও আদর্শকে মানুষের সামনে স্থায়ী ভাবে ধরে রাখার জন্য কোন সঙ্কল্প না রেখে কাজ করেন।

লোকসংগ্রহার্থে কর্ম দুই ধরণের লোকেরা করেন, একজন যাঁরা আত্মবুদ্ধিতে পুরোপুরি অবস্থিত, যেমন ঠাকুর স্বামীজী। অর্জুনকে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, তুমি হচ্ছ প্রারব্ধ কর্মের অধীন, তুমি কর্মের বন্ধনে পড়ে আছ। তুমি যদি লোকসংগ্রহের জন্য কাজ করতে শুরু কর, মানে তুমি যদি নিজেকে রোল মডেল রূপে দেখাতে চাও, তাহলে কিন্তু তুমি এই সাধারণ জাগতিক জিনিষগুলো থেকে বেঁচে যাবে। মূল বক্তব্যটা হচ্ছে, অর্জুন এখন যে অবস্থায় আছে, এই অবস্থায় জগতের কোন কিছুই স্থির থাকে না, এক অবস্থা থেকে আরেক অবস্থাতে সব কিছুরই পরিবর্তন হয়ে চলেছে। এটাই বিজ্ঞানের নিয়ম, মনের স্বাভাবিক গতি নীচের দিকে যাওয়া। কাঁচের গ্লাশটা যদি মাটিতে পড়ে যায়, এর হাজারটা টুকরো হয়ে যাবে। ঐ হাজারটা টুকরো নিজে থেকে কোন দিন আর গ্লাশ হয়ে যেতে পারবে না। ঐ টুকরো গুলিকে গ্লাশ হওয়ার জন্য প্রচুর পরিশ্রম করতে হবে। ফিজিক্সের পরিভাষায় এটাকেই বলা হয় এনট্রপি, একটা গাড়ীকে গ্যারজে দশ বছর ফেলে রাখলে গাড়ীটা দশ বছরের পর নিজে থেকেই খারাপ হয়ে যাবে। মানুষের মনের অবস্থাও ঠিক এই রকমই হয়, মন যদি কর্মহীন অবস্থাতে ফেলে রাখা হয়, তাহলে আস্তে আস্তে মনও অধোগতি প্রাপ্ত হতে হতে খণ্ড খণ্ড হয়ে বিচ্ছিন্ন প্রাপ্ত হয়ে যাবে। মনকে এই অবস্থা থেকে বাঁচাতে হলে অর্জুন তুমি লোকসংগ্রহের জন্য কর্ম করতে থাক, তা নাহলে তোমার মনটাও ছিটকে বেরিয়ে যাবে। লোকের জন্য রোল মডেল তৈরী কর নিজেকে। কি রোল মডেল? কর্মযোগ। তাহলে তোমার মনের আর বিভাজন হয়ে যাবে না। অপরকে তুমি কিছু শিক্ষা দেওয়ার জন্য কাজ কর। অনেকে বলবে যে তুমি নিজে কি কিছু শিখেছ যে অপরকে শিক্ষা দেবে? না, এখানে তা বলছে না, অপরকে শিক্ষা দেওয়াটাকে যখন যজ্ঞ রূপে নিয়ে নিচ্ছে, সাধনা রূপে নিয়ে নিচ্ছে, তখন কিন্তু তার স্বাভাবিক ভাবেই উন্নতি হবে। ব্রাহ্মদের ঠাকুর যেটা বলছেন সেটা অন্য অর্থে তিনি বলছেন, সেখানে যে শিক্ষা দিচ্ছে সে বলছে, আমি গুরু, আমি যা বলছি তোমরা শোন। তখন কিন্তু নিজের কিছু উপলব্ধি বা জ্ঞান না থাকলে কেউ শুনবে না, শুনলেও ধারণা করতে পারবে না, দুদিন পরে ভুলে যাবে। আমি যখন কাউকে গীতার কথা বলছি, তখন আমিও জানি গীতার জ্ঞান আমি পুরোপুরি আয়ত্ত করতে পারিনি, কিন্তু আমি মনে করছি এটা আমার যজ্ঞ, এটাই আমার সাধনা, তখন কিন্তু আমার মন উন্নতির দিকে যাবে, একদিএ আমার চর্চাও হচ্ছে আবার কিছু লোকের উপকারও হচ্ছে।

ঠাকুর খুব সুন্দর একটা গল্প বলছেন – এক ভাগবতের পণ্ডিত এক রাজাকে ভাগবত শোনাত। কিছুক্ষণ ভাগবত শুনিয়ে পণ্ডিত রাজাকে জিজ্ঞেস করতেন – কি রাজামশাই, কিছু বুঝলেন? রাজা বলত – আগে তুমি বোঝ। পণ্ডিত রোজ বাড়িতে এসে ভাবে – রাজা কেন বললেন 'আগে তুমি বোঝ'। এই রকম ভাবতে ভাবতে একদিন তার সব পরিষ্কার হয়ে গেল। মানুষ যখন উপদেশ দেওয়া, বক্তৃতা দেওয়া, শিক্ষা দেওয়া এই কাজ গুলোকে পূজো রূপে, যজ্ঞ রূপে করে তখন তার উন্নতি হতে থাকে। কিন্তু যদি মনে করে এরা সব মুর্খ, এদেরকে শিক্ষা দিয়ে মানুষ করতে হবে, ঐখানেই তার সর্বনাশ হয়ে গেল, সব উন্নতি ঐখানেই থেমে গেল। অর্জুন তুমি হচ্ছে জগতের একজন শ্রেষ্ঠ পুরুষ, তোমাকে দেখেই লোকে শিখবে –

**যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ। স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ততে।।২১।।**

শ্রেষ্ঠ পুরুষ যে রকম আচরণ করেন, সাধারণ মানুষ সেই ধরণের আচরণকেই অনুকরণ করে ওপরে উঠতে চেষ্টা করে। শ্রেষ্ঠ পুরুষের আচরণটাই প্রমাণ, তাঁরা যেটাই করবেন সেটাই সাধারণের কাছে প্রমাণস্বরূপ। ঠাকুর বলছেন – আমি যদি দাঁড়িয়ে প্রস্বাব করি তোরা তাহলে ঘুরে ঘুরে প্রস্বাব করবি। গ্রামের চাষারা জমিদার বাড়িতে এসেছে ভোজ খেতে। তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হচ্ছে – তোমরা আমড়ার অম্বল খাবে কি? তখন চাষারা বলছে – বাবুরা কি খেয়েছেন, বাবুরা যেকালে খেয়েছেন তাহলে অবশ্যই ভালো হবে। শিশুরাও বড়দেরকে দেখেই শেখে। যারা নিয়মিত শাস্ত্র অধ্যয়ণ করছেন, ধর্মের পথে চলেন, তাঁদের আচরণে যদি কোন ত্রুটি থাকে তাহলে সমাজের খুব ক্ষতি হয়ে যায়। এরপর ভগবান নিজের কথা বলে অর্জুনকে বলছেন –

**ন মে পার্থাস্তি কর্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন। নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত এব চ কর্মণি।।২২।।**

অর্জুন, এই জগতে আমার কোন কর্তব্য নেই আর এই জগতে এমন কিছু নেই যেটা আমি চাইলে পেতে পারিনা, অথচ কোন জিনিষের প্রতিই আমার স্পৃহা নেই। শ্রীকৃষ্ণের দুটো ক্ষমতা – এমন কিছু এই জগতে নেই যেটা শ্রীকৃষ্ণ পেতে চাইছেন কিন্তু তিনি পেতে পারবেন না। আমি ঈশ্বর, আমার ক্ষমতা আছে যখন যেটা চাইব সেটাকেই আমি পেতে পারি। আর দ্বিতীয় ক্ষমতা – আমার কোন কিছুর প্রতি আসক্তি নেই। অন্য দিকে আমার কোন কর্তব্যও নেই। সারা জগতের মানুষ এই দুটোর জন্যই কাজ করে, এক, সে কিছু পেতে চাইছে, কাজ না করলে সে সেই জিনিষ পাবে না, আর কর্তব্যের জন্য কাজ করে যাচ্ছে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ কাজ না করে ইচ্ছে করলেই সব কিছু ঘরে বসে পেয়ে যেতে পারেন, আর তাঁর কোন কর্তব্যও নেই, তা সত্ত্বেও তিনি বলছেন আমি এক মুহুর্ত বসে থাকি না, কাজ করেই যাচ্ছি। আমি যদি এক মুহুর্তের জন্য কাজ বন্ধ করে দিই তাহলে কি হবে?

**যদি হ্যহং ন বর্তেয়ং জাতু কর্মণ্যতন্দ্রিতঃ। মম বর্ত্মানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ।।২৩।।**

আমি যদি এক মুহুর্ত কাজ না করি তবে সমস্ত জগৎ টুকরো টুকরো হয়ে ছিটকে বেরিয়ে যাবে, জগৎ ধ্বংস হয়ে যাবে। *মম বর্ত্মানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ*, পুরো জীব জগৎ আমাকেই অনুসরণ করে। এই জগৎ ভগবানের সৃষ্টি, ভগবান এই সৃষ্টিকে নষ্ট হতে দেবেন না। স্রষ্টা কখনই তার সৃষ্টিকে নষ্ট হতে দেয় না। সন্তান যতই বিপথে চলে যাক, মা কখনই সন্তানের বিনাশ চাইবে না, মা সন্তানকে সুপথে ফিরিয়ে আনবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাবে। ভগবান কি করেন? প্রত্যেকটা জিনিষকে ধর্ম দিয়ে ধরে রাখেন, ধর্ম শব্দের অর্থই হচ্ছে ধারণ করা। মানুষ ছাড়া এই জগতের বাকি যা কিছু আছে কেউই নিজের ধর্মকে ত্যাগ করে না, সব সময় নিজের ধর্মে অবস্থিত থাকে। একমাত্র মানুষই নিজের ধর্মকে ছেড়ে দেয়। পশুদের মধ্য থেকে যখন তার ধর্মটা সরে যায় তখন সেই পশু পাগল হয়ে যায়, যেমন বাঘ যখন মানুষখেকো হয়ে যায়, তখন শিকারীরা গিয়ে বাঘটাকে মেরে ফেলে। বাঘ যখন গোয়াল ঘর থেকে গরু তুলে নিয়ে যায়, তখন কিন্তু এই নিয়ে মানুষ বেশি উদ্বিগ্ন হয়ে চেঁচামেচি করে না, কিন্তু বাঘ যখন মানুষ মারতে শুরু করে তখন বুঝতে হবে যে বাঘ তার ধর্ম ছেড়ে দিয়েছে। তখন জিম করবেটের মত লোককে ডাকা হয়। মানুষের ক্ষেত্রে ধর্মকে ছেড়ে দেওয়া খুব সহজ। যে কোন জিনিষ যদি তার ধর্মকে ছেড়ে দেয়, ধর্মকে ছেড়ে দিয়ে যদি অধর্মের বৃদ্ধি হয়ে যায়, তখন ভগবান যদি দেখেন যে আমার সৃষ্টিকে আর ধর্মে ধরে রাখা যাচ্ছে না, তিনি তখন জগতের নাশ করে দেন। ভগবান যে সৃষ্টি করেন সেখানে তিনি কখনই অধর্মের বৃদ্ধি হতে দেবন না। ভাত রান্না করতে গিয়ে যদি ভাতটা পুড়ে যায়, তখন কি করবে, সেই ভাততো আর কাউকে দেওয়া যাবে না নিজেও খেতে পারবে না, অগত্যা ভাতটাকে ফেলে দিতে হবে। কিন্তু কেউ কি চাইবে ভাতটা ফেলে দিতে? কখনই চাইবে না, কিন্তু সাবধান থাকতে হয় যাতে কখন ভাত না পুড়ে যায়। ভগবানও খুব সাবধান থাকেন।

ধর্মকে পুরোপুরি ছেড়ে দেওয়া আর জগতকে বিনাশের দিকে ঠেলে দেওয়ার আগে ভগবান মাঝে মাঝে ধর্মের প্রবর্ত্তক রূপে এসে ধর্মটাকে আবার নিজের জায়গায় ঠিক করে ধর্মকে প্রবর্ত্তন করে দেন, ধর্ম কিভাবে চলবে দেখিয়ে দিয়ে যান। শ্রীরামচন্দ্র আর শ্রীকৃষ্ণের সময় গোটা দেশ জুড়ে খুব অন্যায় অনাচারে অধর্ম প্রচণ্ড ভাবে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল তখন এনারা এসে সেটাকে বন্ধ করে সমগ্র মানব জাতির জন্য একটা সুনির্দিষ্ট নতুন পথের দিশা ঠিক করে দিয়ে গেলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের সময় ভগবান দেখলেন যে প্রচণ্ড ভোগের যুগ আসছে তাই কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগের আদর্শকে স্থাপিত করার জন্য তাঁকে অবতরণ করতে হয়েছিল। কামিনী-কাঞ্চন

ত্যাগের পথ না দেখালে মানুষের যেটা স্বাভাবিক প্রবৃত্তি ভোগের দিকে রয়েছে সেটাই মানুষকে শুধু মাত্র ভোগের দিকে টেনে নিয়ে শেষ করে দেবে। ভগবান এসে একটা পথ দেখিয়ে বলে দিলেন কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগই হচ্ছে তোমার বাঁচার পথ। এর পরেও মানুষ যদি কামিনী-কাঞ্চনকে নিয়েই থাকে তখন ভগবান দেখবেন যে এদের বিনাশ না করা ছাড়া আর কোন উপায় নেই। শ্রীকৃষ্ণ যেমন নিজের যদুবংশের বিনাশ করে দিয়েছিলেন। শ্রীরামচন্দ্র তো অসুরদের নাশ করলেন, আর শ্রীকৃষ্ণ নিজের লোকেদের, দুর্যোধনও তাঁর নিজের লোক, যুধিষ্ঠির অর্জুন এরাও নিজের লোক, কিন্তু কোন পথ নেই, সব কটাকেই শেষ করে দিলেন। তুমি এমন অধর্মে চলে গেছ এখান থেকে তোমাকে ধর্মে ফিরিয়ে আনা অসম্ভব, তোমার বিনাশই ধর্মকে বাঁচানর একমাত্র পথ। শ্রীরামকৃষ্ণ কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগের কথা বলে অধর্মকে বাঁচাবার জন্য ভোগের মধ্যে ডুবে যেতে নিষেধ করে গেছেন। এখন মানুষ যদি সেই ভাবে না চলে এরপর হয়তো কল্কি অবতার হয়ে এসে তিনি নিজের সৃষ্টিটাকেই বিনাশ করে দিয়ে যাবেন। কিন্তু ভগবান নিজের সৃষ্টির বিনাশ হয়ে যাক এটা সহজে চান না, সেইজন্য বলছেন *মম বর্ত্মানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ*, মানুষ আমাকেই অনুসরণ করে, তাই আমাকে কাজ করতে হয়। আমি যদি কাজ না করি তাহলে আর কি হবে –

**উৎসীদেয়ুরিমে লোকা ন কুর্যাং কর্ম চেদহম্। সঙ্করস্য চ কর্তা স্যামুপহন্যামিমাঃ প্রজাঃ।।২৪।।**

আমি যদি কাজ না করি তাহলে সব লোক উৎসন্নে চলে যাবে। আর এই যত প্রজাকুল রয়েছে সবার মধ্যে বর্ণসঙ্কর এসে যাবে, আলাদা আলাদা করে কোন কিছুর পরিচয় থাকবে না, প্রত্যেকেই তাদের নিজস্ব স্বকীয়তাকে হারিয়ে ফেলবে। এর ফলে সমাজের, দেশের, জাতির সমস্ত কিছুর স্থিতিশীলতা বিচ্ছিন্ন হয়ে অরাজকতা হয়ে যাবে। বর্ণসঙ্কর যখন হয় তখন সমাজের যে স্থিতিশীলতা, সুরক্ষা এগুলো অনেক আগেই নষ্ট হয়ে যায়। শাস্ত্র অধ্যয়ণের জন্য শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত পাওয়া যাবে না, যুদ্ধ করার জন্য ক্ষত্রিয় থাকবে না, ঘরদোড় পরিষ্কার লোক পাওয়া যাবে না, রাস্থাঘাট সাফসুতরো করার কোন লোক থাকবে না, সবাই চাইবে ঘরে বসে বসে কম্প্যুটার চালিয়ে কটা টাকা কিভাবে কামিয়ে নেওয়া যায়। টাকা আয় করে আরও যাতে ভালো করে নিজেই শুধু ভোগ করতে পার সেই চেষ্টাই করে যাবে, কোন দানধ্যান করবে না।

ভারতের কিছু কিছু পরিবার এখনো যারা নিজদের একটা বিভিন্ন বিশেষ ধরণের শিল্প কর্মের মধ্যে জড়িয়ে রেখেছেন তাদের নিয়ে উইলিয়ম গ্যাবলিন্টন নামে একজন বিদেশি 'লাইম লাইনস্' নামে একটা খুব সুন্দর বই লিখেছেন। দক্ষিণ ভারতের এই রকম এক পরিবারের কথা উল্লেখ করে বলছেন যারা বহু প্রাচীন কাল থেকে, রাজাদের আমল থেকে কাঁসার মুর্তি তৈরী করে আসছেন। এই ধরণের মুর্তি ভারতে আর কেউ তৈরী করতে পারে না। কি ভাবে এই মুর্তিগুলো তৈরী করা হয় তার খুব সুন্দর বর্ণনা আছে। সেখানে তিনি দেখাচ্ছেন কিভাবে মুর্তির চোখের পাপড়িটা খোলা হয়, তখন মুর্তি গুলোতে যেন প্রাণ দেওয়া হল। বলছেন যে, কোন মুর্তি বানাতে হলে ছ'মাস আগে অর্ডার দিতে হবে, ছ'মাসের আগে কোন অর্ডারই নেবে না। আবার অর্ডার দেওয়ার ছ'মাস পরে ঐ মুর্তি বানানোর কাজ শুরু হবে, অথচ তাদের পঞ্চাশ থেকে ষাট জন লোক প্রতিদিন লাগাতার কাজ করে যাচ্ছেন। যে ডিজাইনের মুর্তি আমি বানাতে চাইছি, সেই ডিজাইন দিলে এরা প্রথমে ঐ ডিজাইনের একটা মোমের মুর্তি তৈরী করবে। ওদের যে আসল শিল্পী, সে মোম দিয়ে অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে আগে মুর্তিটা বানিয়ে দেবে। যখন মুর্তিটাকে পুরো আকার দিয়ে দিল, কোথাও আর কোন রকমের খুঁত নেই, এদের লোকালয়ের কাছের নদীতে এক বিশেষ ধরণের মাটি আছে, ঐ মাটি দিয়ে মোমের মুর্তির সারা গায়ে একটা পাতলা আস্তরণ দিয়ে দেয়। ভেজা মাটিটা সম্পূর্ণ ভাবে শুকিয়ে যাবার পর ঐ মুর্তিটার ছাঁচ তৈরী করার জন্য এবার আগুনে ঢুকিয়ে দেয়, আর ঐ মুর্তির পায়ের কাছে একটা ছোট্ট ফুঁটো রেখে দেয়। আগুনে দিতেই মোমটা গলে সেই ফুঁটো দিয়ে বেরিয়ে গেল। এর পরে ঐ ফুঁটো দিয়ে গলান পেতল ঢালতে থাকে। কিছুক্ষণের মধ্যেই গলান পেতল জমে যায়। একটা নির্দিষ্ট সময়ের পর মাটির ঐ আস্তরণটা যেটা পুড়ে শক্ত হয়ে গিয়েছিল, সেটাকে আস্তে আস্তে ভাঙতে থাকে। তার মানে মোমটাও চলে গেল, মাটির আস্তরণটাও খসে গেল। কোন কারণে যদি পেতলের ঐ মুর্তিটা ডিজাইন মাফিক না হয়, একটু যদি এদিক সেদিক হয়, তাহলে আবার সেই একই পদ্ধতিতে বানাতে থাকবে। কিন্তু এরা এতই সুদক্ষ যে এই ধরণের গোলমাল সাধারণত হয় না। এর পর বিভিন্ন মুর্তির ফিনিশিং এর কাজে বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন কারিগর কাজ করে।

সেখানে লেখক খুব সুন্দর লিখছেন, যে ভদ্রলোক এর প্রধান কারিগর, এটাই তাদের বংশ পরম্পরা শিল্প কর্ম। বলছেন তার ছেলের এই শিল্প কর্মে কোন রকম আগ্রহ নেই, সে কম্প্যুটার নিয়ে পড়াশোনা করছে। তার যে ভাইপো, সেই একমাত্র কাজে এলো, কিন্তু আসার পরে তার আবার মাথায় এলো কিভাবে ইন্টারনেটের মাধ্যমে বিদেশে বিক্রী করে মোটা টাকা আয় করতে পারে। ভদ্রলোক খুব আফশোস করে বলছিলেন যে, আমাদের পরের প্রজন্মের কারুরই মুর্তি বানানোর দিকে কোন আগ্রহ নেই, এরা ইন্টারনেটের মাধ্যমে অর্ডার নেবে, বিক্রী কত ভাবে করা যাবে এই সব নিয়েই বেশি মাথা ব্যাথা, কিন্তু মুর্তি কে বানাবে এই নিয়ে কোন চিন্তা ভাবনা নেই। ভদ্রলোক বলছেন, আমার প্রজন্মের বলতে গেলে আমিই শেষ ব্যক্তি যে এই শিল্প কর্ম সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি, আমার পরে কে দেখবে এটাই এখন প্রধান চিন্তার বিষয়। অথচ এই ভদ্রলোক, যিনি এখনও মুর্তি বানিয়ে যাচ্ছেন তিনি বিরাট উচ্চ শিক্ষিত আর খুব বড়লোক। কিন্তু বলছেন এই শিল্পটাই এখন নষ্ট হয়ে যেতে বসেছে।

এই কথাই গীতাতে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, *সঙ্করস্য চ কর্তা,* ব্রাহ্মণের ছেলে সে এখন শিখে নিয়েছে কম্প্যুটার, কম্প্যুটার শিখে পড়ছে বিজনেস ম্যানেজমেন্ট, তার ভেতরে পারিবারিক সংস্কার একদিকে ব্রাহ্মণের, অন্য দিকে সে কাজ নিয়ে নিচ্ছে বৈশ্যের। না থাকল ঐদিককার না থাকল এইদিককার, এইটাই হয়ে যাচ্ছে বর্ণসঙ্কর। এর ফলে সমাজের স্থিতিশীলতা পুরোপুরি ভেঙ্গে পড়ছে। সেইজন্য ভগবান মাঝে মাঝে নিজে স্বয়ং অবতরণ করে এই অবস্থাটাকে আবার ঠিক পথে চালিত করে দেন।

**সক্তাঃ কর্মণ্যবিদ্বাংসো যথা কুর্বন্তি ভারত। কুর্যাদ্বিদ্বাংস্তথাসক্তশ্চিকীর্ষুর্লোকসংগ্রহম্।।২৫।।**

বিষয়ীরা যেমন কর্মের প্রতি আসক্ত হয়, কর্মফলের প্রতি যেমন আসক্তিপূর্ণ মন নিয়ে কর্ম করে, হে অর্জুন তুমিও এদের মত ঠিক সেইভাবেই কর্ম কর কিন্তু অনাসক্ত হয়ে। মানে কাজের প্রতি তুমিও আসক্তি দেখাও, এমন ভাবে কর যেন তুমি পরীক্ষায় পাশ করতে যাচ্ছ। ছেলেরা যেমন পরীক্ষায় ভালো রেজাল্ট করার জন্য রাতদিন পড়াশোনা করে প্রস্তুতি নেয়, লোকেরা যেমন নাম-যশ পাবার জন্য জান লাগিয়ে দিয়ে কাজ করে, তুমিও ঠিক সেইভাবে কাজ করতে থাক। তারা আসক্ত হয়ে করে আর তুমি সেই কর্মই অনাসক্ত হয়ে করবে, এইটাই শুধু তফাৎ। তুমি যদি এইভাবে কাজ কর তাতে লোকসংগ্রহ হবে, সবাই তোমার এই কর্মোদ্যম দেখে প্রেরণা পাবে, অর্জুন একজন শ্রেষ্ঠ পুরুষ হয়ে যখন এতো খাটছে, তাহলে আমিও খাটবো। স্বামীজী বলছেন, আমি এত পরিশ্রম করে মুখ দিয়ে রক্ত তুলে ফেলছি, তোরাও খাট। ঠাকুর বলছেন, আমি ষোল টাং করেছি, তোরা অন্তত এক টাং কর। এগুলো সবই হচ্ছে লোকসংগ্রহের জন্য। যদি ঠাকুর, স্বামীজী কাজ না করতেন তাহলে এরাও বলত যে আমি কেন কাজ করব। সন্ন্যাসীদের মধ্যে এক সময় এই নিয়ে অনেক বিতর্ক ও সমস্যা হয়েছিল, হরি মহারাজ, লাটু মহারাজরা তো কাজ করতেন না, আমি কেন কাজ করব।

সেইজন্য শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলছেন, তুমি এই ভাবে ভিক্ষা বৃত্তি অবলম্বন করার সঙ্কল্প ত্যাগ কর, আমার কোন কিছুই পাওয়ার নেই, আমার কোন কর্তব্য নেই, তা সত্ত্বেও আমি নিজেও এক মুহূর্ত কাজ ছাড়া থাকি না, মানুষের মঙ্গলের জন্য, যাতে এই জগতটা স্থিতিশীল থাকে, সেইজন্য আমি কাজ করি। তুমি লোকসংগ্রহের জন্য কর, এটা আমার কাজ নয়, ঠাকুরের কাজ, ঈশ্বরের কাজ ভেবে কর। তার মানে, তুমি যদি নিজেকে কাঁচা লোক মনে কর তাহলেও তোমাকে কাজ করতে হবে, তুমি যদি নিজেকে পূর্ণ জ্ঞানী মনে কর তাহলেও তোমাকে কাজ করতে হবে, আর যদি তুমি অর্ধ কাঁচা মনে কর তাও তোমাকে কাজ করতে হবে। কাজ ছাড়া এক মুহূর্তও থাকবে না, তুমি শ্রেষ্ঠ পুরুষ, লোকদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য তোমাকে অবশ্যই কাজ করতে হবে। দেশ, সমাজ, জাতির কাছে আদর্শ স্থাপনের জন্য কাজ কর।

৮ই আগস্ট ২০১০

এর আগের শ্লোকে বলা হল, যাঁরা জ্ঞানী পুরুষ, যাঁরা সব কিছু বুঝে গেছেন তাঁদেরকেও কাজ করতে হবে। কেন কাজ করবেন? যারা অজ্ঞানী, যারা কিছু বোঝে না বা জানেনা, তাদের কাছে দৃষ্টান্ত স্থাপনের জন্য। জ্ঞানীরা যে শুধু তাদের দেখানোর জন্যই কাজ করবে তা নয়, বলছেন অজ্ঞানীরা যেমন আসক্ত হয়ে কাজ করে, জ্ঞানীরাও একই ভাবে কাজ করেন কিন্তু সে কাজের মধ্যে কোন রকম আসক্তি থাকে না, জ্ঞানীদের কাজ করা দেখেই লোকেরা আগ্রহ ও উৎসাহ নিয়ে কাজ করবে।

আমরা সবাই তিনটে গুণের দ্বারা সমন্বিত, এর মধ্যে তমোগুণের লক্ষণ হচ্ছে আলস্য, রজোগুণের লক্ষণ কর্ম চাঞ্চল্য, আর সত্ত্বগুণে মনটা শান্ত অবস্থায় চলে যায়। আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে এই তিনটে গুণের পারে যাওয়া। তিনটে গুণের পারে যেতে হলে আমাকে আগে সত্ত্বগুণের অধিকারী হতে হবে, সত্ত্বগুণে আসার আগে আমার মধ্যে রজোগুণকে জাগাতে হবে। রজোগুণ না হলে সত্ত্বগুণের অধিকারী কখনই হবে না। সেইজন্যই বলা হয় আগে তমোগুণ থেকে বেরিয়ে এসে কাজের মধ্যে নিজেকে নিয়োজিত করে রজোগুণের অধিকারী হতে হবে। সাধারণ লোক যদি কাজ না করে তাহলে এরা ঘোর তমোতে ডুবে যায়। সাধু সন্ন্যাসীরাও যদি কাজের মধ্যে নিজেদের ব্যস্ত না রাখে তাহলে তাদেরকেও ঘোর তমোগুণ গ্রাস করে নেয়। স্বামীজীর জীবনে একটা ঘটনা আছে একবার হৃষিকেশে গিয়ে দেখেন দিনের বেলায় দুপুর বারোটার সময় এক সাধু রোদের মধ্যে কম্বল মুড়ি দিয়ে জোর নাক ডাকছে। স্বামীজী দেখে প্রচণ্ড রেগে গিয়ে বলছেন 'দে ব্যাটাকে লাঙ্গলে জুতে'। একটা বয়স হয়ে যাওয়ার পর কাজ না করাটা আলাদা ব্যাপার, কিন্তু পঁচিশ তিরিশ বছরের সাধু এখনই কোন কাজ না করে চুপচাপ বসে আছে, এটাকে কোন ভাবেই প্রশ্রয় দেওয়া হয় না।

আমাদের ভারতের আরেকটি বড় সমস্যা হচ্ছে যে, যে আত্মজ্ঞানের কথা সব জায়গায় বলা হচ্ছে, সেই আত্মজ্ঞানকে সরাসরি অকর্মের সাথে যুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। এটা ঠিকই যে আত্মজ্ঞান আর কর্ম কখনই এক সঙ্গে চলতে পারে না, পুরো গীতাতেও আত্মজ্ঞান আর কর্ম এক সঙ্গে যায় না। শঙ্করাচার্যও প্রতি পদে পদে এই কথাই বলছেন। আত্মজ্ঞান আর কর্মের এই বিরোধ সারা ভারতে বিরাট সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। স্বামীজীর শিষ্য স্বামী কল্যাণানন্দজী মহারাজ যখন কঙ্খলে তপস্যা করছিলেন, তিনি দেখেন একজন সাধু মৃত্যুশয্যায় কাতরাচ্ছে, কিন্তু তাঁর পাশে যে সাধুটি রয়েছে সে তার কোন সেবাই করছে না। কেন করছেন

না? সে বলছে কাজ হচ্ছে জঞ্জাল আর এই জগত হচ্ছে মায়া। তখন স্বামী কল্যাণানন্দজী আর স্বামী নিশ্চয়ানন্দজী কঙ্খলে সেবা কাজ শুরু করলেন। এখন তো এই সেবামূলক কাজ রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের দৌলতে সমস্ত জায়গায় ছড়িয়ে গেছে।

এটা ঠিকই যে, সাধক জীবনে কাজ করার অনেক সমস্যা আছে। ঠাকুরও কথামৃতে এই কথা অনেকবার বলছেন। কিন্তু যে কোন অবস্থায় কাজ না করার থেকে কাজ করা অনেক ভালো। এই কথাই গীতা বারে বারে বলছে। সেইজন্য অনেকেই বলেন যে গীতা কর্মযোগের শিক্ষা দিচ্ছে। কিন্তু সেই অর্থে গীতা কিন্তু কর্মযোগের শিক্ষা দিচ্ছে না, গীতার মূল বক্তব্য হচ্ছে তোমার এই জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে মুক্তি। গীতা আবার এটাও বলছে যে, আত্মজ্ঞান না হওয়া পর্যন্ত মুক্তি হবে না, তুমি কে, এটা জেনে গেলেই তুমি মুক্ত। কিন্তু আত্মজ্ঞান সবার জন্য নয়। বেশির ভাগ মানুষই আত্মজ্ঞানের জন্য প্রস্তুতই নয়। এখানে কিন্তু সাধারণ লোকের কথা বলা হচ্ছে না, যারা সাধক জীবনে এস ধর্ম ও আধ্যাত্মিক জীবন যাপন করতে চাইছে, তাদের কথাই বলা হচ্ছে। বেশির ভাগ সাধকই আত্মজ্ঞানের জন্য প্রস্তুত নয়। সেইজন্য বলছে তুমি কাজ করতে থাক। স্বামীজী বলছেন – সন্ন্যাসীর স্বধর্ম হচ্ছে সেবা। এখন স্বধর্ম জিনিষটা কি? যারা গৃহী তাদের নিষেধ করা হলেও তারা দুটো পয়সা রোজগার করবেই। গৃহীদের বারণ করা হলেও সে পরিবারে বউ, ছেলেমেয়ের জন্য পরিশ্রম করবেই। বলতে গেলে এটাই গৃহীদের স্বধর্ম। এবার বাকী যে সময়টা বেঁচে আছে সে সময়টাতে সেবা কাজ করুক। স্বামীজী যে সেবাকাজের মাধ্যমে কর্মযোগের প্রবর্তন করলেন এই কারণেই তিনি করলেন। স্বামীজী তো বলতে পারতেন – তুমি স্বধর্ম পালন করে তোমার ঘর পরিবারের দেখাশোনা কর, কিন্তু স্বামীজী না বললেও এই স্বধর্ম গৃহীরা সব সময়ই করবে। কিন্ত ঘরবাড়ির কাজ করার পরও গৃহীদের অনেক সময় থাকে, সেই সময়টুকু যদি সেবামূলক কাজ করে তখন সেটাই সঙ্গে সঙ্গে তাকে স্বধর্মের উচ্চতম আদর্শে পৌঁছে দেবে। সেইজন্য স্বামীজী সেবাযোগ নিয়ে এলেন। সেবামূলক করলে ভেতরের ময়লা গুলো পরিষ্কার হয়ে হৃদয়ের সমস্ত রকমের সঙ্কীর্ণতা দূর হয়ে মানুষের ব্যক্তিত্বকে প্রসারিত করে দেবে। সেবার মাধ্যমে নিজের ক্ষুদ্র ব্যক্তিত্বকে সমষ্টির সাথে যুক্ত হয়ে নিজেকে সবার সাথে জুড়ে দেওয়া যায়।

**ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্মসঙ্গিনাম্। জোষয়েৎ সর্বকর্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্।।২৬।।**

যারা সাধারণ মানুষ তাদের কখন বুদ্ধিভেদ করতে নেই। বুদ্ধিভেদ হচ্ছে, সাধারণ মানুষ বা অজ্ঞানীরা কতকগুলি ধারণাকে আঁকড়ে ধরে বেঁচে আছে, হুট্ করে একদিনেই সেই ধারণাগুলিকে ভেঙ্গে দেওয়াটাকে বলা হচ্ছে বুদ্ধিভেদ। অজ্ঞানীদের কখন বুদ্ধিভেদ করতে নেই। *জোষয়েৎ সর্বকর্মাণি*, সে যা কিছু কাজ করছে, জ্ঞানীও ঠিক সেই ভাবে তার সাথে কাজ করতে নেমে পড়বে। সেখান থেকে আস্তে আস্তে তাকে উপরে নিয়ে আসতে হয়। এখানে যদিও কর্মযোগ প্রসঙ্গে নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে, কিন্তু গীতার এই শ্লোকটি প্রত্যেক ক্ষেত্রেই, প্রত্যেকটি জীবনেই প্রযোজ্য হবে। উপদেশ দেওয়া যাদের অভ্যাস আছে, যদিও উপদেশ দিতে সবারই ভালো লাগে, তাহলে তাদের এই শ্লোকটিকে সব সময় মাথায় বসিয়ে নিয়ে উপদেশ দিতে হবে। স্বামীজী ভালো আচার্যের লক্ষণের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলছেন, শ্রেষ্ঠ আচার্য শিষ্য যেখানে পড়ে আছে আগে নিজে সেখানে নেমে আসেন, সেখানে নেমে আগে শিষ্যের হাত ধরে, তারপর ধীরে ধীরে তাকে উপরের দিকে নিয়ে আসতে থাকেন। আর প্রথম দিনেই যে আচার্য শিষ্যকে বলে দিল, তুমি এতদিন যাবৎ কিছু শিখে এসেছ সবটাই ভুল, তখনই বোঝা যাবে যে এই আচার্যের যারা শিষ্য তাদের কপাল মন্দ। একটা ক্লাশ ওয়ান/টুয়ের বাচ্চাকেও যখন কিছু শেখাতে যাবে সেখানেও এই শ্লোকটা প্রযোজ্য হবে।

অনেকেই হিরণ ম্যাক্সিনের নাম শুনে থাকবেন, যিনি মেশিনগান আবিষ্কার করেছিলেন। হিরণ ম্যাক্সিন আসলে খুব ভালো মানুষ ছিলেন। পরে যখন দেখলেন এই মেশিনগানের সাহায্যে মানুষকে নির্বিচারে মারা হচ্ছে, তখন তিনি প্রায়ই দুঃখ করে আফশোষ করতেন, কেন যে আমি এই মেশিনগানের মত একটা জঘন্য মারণাস্ত্র আবিষ্কার করতে গেলাম। উনি নিজে একজন খুব বড় বিজ্ঞানী হওয়া সত্ত্বেও তিনি কিন্তু খ্যাতির সেই রকম উচ্চ পর্যায়ে যেতে পারেনি। ছোট খাটো অনেক জিনিষ তিনি আবিষ্কার করেছিলেন। ওনার স্ত্রী ছিলেন খুবই ধর্মপরায়ণ খ্রীশ্চান মহিলা। স্বামীজীর সাথেও এই ম্যাক্সিন পরিবারের দেখা হয়েছিল। হিরণ ম্যাক্সিন স্বামীজীকে দেখে খুব অনুপ্রাণিতও হয়েছিলেন। ম্যাক্সিনদের বাড়িতে স্বামীজী খাওয়া দাওয়াও করেছিলেন। ওনার ছেলে পরে তার বাবার জীবনী লিখেছিলেন। ছেলেও পরে খুব নাম করেছিল, কিন্তু বাবার মত অত বিখ্যাত হয়নি।

হিরণ ম্যাক্সিনের এই ছেলে ছোটবেলায়, যখন তার ছয় সাত বছর বয়স একদিন এক দোকানে গেছে, গিয়ে দেখে সেই দোকানদারের পোষা কুকুর খুব সুন্দর ফুটফুটে কয়েকটা বাচ্চা দিয়েছে। কুকুরটার একটা ধব্ধবে সাদা বাচ্চাকে ছেলের খুব পছন্দ হয়েছে। দোকানদারকে বলছে – এই বাচ্চাটা আমাকে দেবে? এটার কত দাম হবে? ছোট শিশু অত কিছু বোঝেও না। দোকানদার বলছে – হ্যাঁ, আমি তোমাকে বিক্রী করব, এর দাম এক ডলার, কিন্তু সেই একটি ডলারের দুদিকেই মাথা থাকতে হবে। মানে ডলারের দুদিকে হেড, টেল নেই। আসলে দোকানদারের ঐ কুকুরের বাচ্চাটা বিক্রী করবার একেবারেই ইচ্ছে নেই। বাচ্চাটাকে কাটিয়ে দেবার জন্য ঐ রকম কথা বলেছে।

ছেলে তো আনন্দে খুব উত্তেজিত হয়ে গেছে। যাক, একটি তো ডলার, আর দুদিকেই হেড ঐ রকম একটা ডলার নিশ্চয় কখনও না কখন পাওয়া যাবে। বাড়িতে মাকে গিয়ে বলেছে, মা, আমাকে একটা ডলার দেবে যার দুদিকে মাথা আছে। মা ছেলেকে খুব বকে দিয়েছে। ছেলের খুব মন খারাপ হয়ে গেছে। সন্ধ্যে বেলা বাবা কাজ থেকে বাড়িতে এসেছেন, ছেলে গিয়ে বাবাকে ধরেছে, বাবা এক ডলারের একটা কয়েন হবে যার দুদিকে মাথা আছে, মা বলেছে ওরকম কয়েন নাকি হয় না। বাবা ছেলেকে বলছেন – মা ঠিক জানে না, আচ্ছা দেখছি। বলে তিনি পকেটে হাতড়ে খুচরো পয়সা গুলো নিয়ে এসে দেখছেন ওর মধ্যে ঐ রকম কোন কয়েন আছে কিনা। দেখে টেখে ছেলেকে বললেন, এখন এই যা খুচরো কয়েন আছে এর মধ্যে তো নেই, আচ্ছা কালকে আমি দেখব পাওয়া যায় কিনা।

পরের দিন বাবা আবার কাজ থেকে সন্ধ্যেবেলা বাড়িতে এসেছেন। ছেলে তো সারা দিন না ঘুমিয়ে, না খেয়ে কাটিয়েছে, ওর মাথায় খালি কুকুরের বাচ্চাটা ঘুরছে। বাবাকে গিয়ে আবার ধরেছে, বাবা পেয়েছ। বাবা – ও, ও, দেখছি দেখছি। আবার পকেট থেকে খুচরো পয়সা গুলো ঘাটতে লাগলেন, ঘাটতে ঘাটতে হঠাৎ বললেন, এই তো এর মধ্যে একটা কয়েন রয়েছে দেখছি যার দুদিকেই মাথা। ছেলেকে আর কে পায়, আনন্দে লাফাতে আরম্ভ করেছে। তারপর বাবা আর ছেলে দুজনে মিলে গেছে দোকানে, দোকানে গিয়ে দোকানদারকে ছেলে বলছে – এই যে দুদিকে মাথাওয়ালা এক ডলার নিয়ে এসেছি। দোকানদার হাতে কয়েনটা নিয়ে দুদিকে উল্টেপাল্টে দেখে নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারছে না, সত্যিই একটা ডলার যার দুদিকেই মাথা। দোকানদার তখন হিরন ম্যাক্সিনকে বলছে, এই কুকুরটাতো বিক্রীর জন্য রাখা হয়নি। হিরন ম্যাক্সিন খুব রেগে গেছে, আপনি কেন এই ধরণের মজা করতে গেলেন, পরিষ্কার বলে দিতে পারতেন যে এটা বিক্রী করব না। দোকানদার ক্ষমাটমা চাইল, কুকুরটা আর পাওয়া হল না। বাচ্চাটাও বাবার সাথে ফেরত চলে এসেছে।

এই ছেলে বড় হয়ে বাবার জীবনী লিখতে গিয়ে বলছেন, বাবা বাচ্চার মনটাকে ভাঙবেন না। বাবা ছিলেন আসলে ইঞ্জিনিয়ার, তিনি দুটো কয়েনকে নিয়ে লেদ মেশিন দিয়ে মাঝখান দিয়ে চিড়েছেন, আর মেটালিক ফ্লুড দিয়ে দুটো মাথাকে সেঁটে দিয়েছেন। এমন ভাবে দুটো কয়েনকে জুড়েছেন যে কারুর ক্ষমতা নেই ধরার। ঐভাবে জুড়ে পকেটে করে নিয়ে এসেছেন, কিন্তু একবারও বললেন না যে আমি দুদিকে মাথাওয়ালা কয়েন নিয়ে এসেছি। যেই ছেলে ধরেছে তখন – ও, ও, আচ্ছা আচ্ছা, তুমি বলেছিলে না, আচ্ছা দেখছি আজকে পকেটে পাওয়া যায় কিনা। এই হচ্ছে *ন বুদ্ধিভেদং জনয়েৎ*, বাচ্চাকে বাচ্চার নিজের ঐ অবস্থা থেকে তুলছেন। এরাই হচ্ছে ঠিক ঠিক মহৎ শিক্ষক। নিজের সন্তান, নিজের শিষ্যকে যতক্ষণ এই রকম প্রশিক্ষণ না দেওয়া হচ্ছে, ততক্ষণ তার কোন উন্নতি হবে না।

রাজনৈতিক নেতারা সাধারণ গরীব মানুষের চেতনাকে জাগ্রত করার জন্য অনেক রেভলিউশারি আইডিয়ার কথা বলেন। আসলে Revolutionary Idea বলে কিছু হয় না, যারাই বলছে আমি একটা Revolutionary Idea দিচ্ছি, তখন বুঝতে হবে কিছু গোলমাল আছে। তোমার যদি আইডিয়া রেভলিউশানারি হয় তাহলে তোমাকে আগে ওদের স্তরে যেতে হবে, ঐ স্তর থেকে ওদের তুলে নিয়ে আসতে হবে। তার আগেই যদি রক্তারক্তি বিপ্লব করে দিয়ে কোন ভাবে ক্ষমতায় চলে আসে তাহলে সেই ক্ষমতা বেশি দিন স্থায়ী হয় না। এইভাবে যত ক্ষমতা হস্তান্তর হয়েছে সব ক্ষেত্রেই তার উল্টো প্রতিক্রিয়া এদেরকেই ইতিহাসের পাতা থেকে সরিয়ে দিয়েছে। অনেক উগ্র বিপ্লবী নেতারাই পরে তাদের ভুলকে স্বীকার করেছেন।

মেঘালয় রাজ্য হচ্ছে পুরো মাতৃতান্ত্রিক সমাজ, ওখানে ছেলেরা বিয়ের পর শ্বশুর বাড়ি চলে যায়, মানে ঘরজামাই হয়ে থাকে, আর সন্তানের পরিচয় মায়ের নামেই হয়। চেরাপুঞ্জী স্কুলে কলকাতা থেকে কয়েকজন শিক্ষক এসেছেন। এরা এসে এই সব দেখে স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের মাতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থার সমালোচনা করে উপদেশ দিতে শুরু করেছেন। স্কুলের ছেলেরা শুনে ঘাবড়ে গেছে। কিছু দিন পরে দেখা গেলে সব মেয়ে কাটারি হাতে স্কুলে এসে বলছে, কই সেই মাস্টার যে আমাদের হাজার বছরের প্রথাকে উল্টে দিতে চাইছে। তারপর সেই শিক্ষককে কোন রকমে লুকিয়ে চুরিয়ে ওখান থেকে অন্যত্র পাচার করে দেওয়া হয়েছিল। এগুলো কখনই করতে নেই, গীতায় এই জিনিষটাকেই করতে নিষেধ করা হচ্ছে, বুদ্ধিভেদ খুব খারাপ জিনিষ, ইংরাজীতে বলা হয় unsettlement of faith। পুরনো বিশ্বাসের জায়গাটাকে একদিনেই কখন ভেঙ্গে দিতে নেই। সবারই একটা নিজস্ব চিন্তা ভাবনা ধ্যান-ধারণা থাকে, অনেক দিন ধরে তারা সেই চিন্তা ভাবনাটা করে আসছে, সেটাকে একদিনেই দুম্ করে উল্টে দেওয়াটা খুব বিপজ্জনক।

তাহলে কি ভাবে করবে? *জোষয়েৎ সর্বকর্মাণি*, বাঃ বাঃ, দারুণ হয়েছে। এদের সমস্ত কাজে উৎসাহ দিয়ে নিজেকেও ঐ রকম কাজ করা শুরু করতে হয়। তারপর ধাপে ধাপে ওদেরকে উপরে তুলে নিয়ে আসতে হবে। স্বামীজীর আদর্শ শিক্ষক কি রকম হবে? শিক্ষক আগে ছাত্র যে অবস্থায় যে স্তরে আছে সেখানে যেতে হবে, সেখানে গিয়ে তাকে তুলে নিয়ে আসতে হবে। কিন্তু এখন বেশির ভাব শিক্ষকরা ঐ স্তরে যেতেই চান না, আর যারা যদিও বা যান তারা ছাত্রদের ঐ স্তরে নেমে গিয়ে ঐখানেই নিজে থেকে

যান, ছাত্রকেও ওপরে আনেন না, নিজেও আর ওপরে আসেন না। একটা লোক যদি পাঁকের মধ্যে পড়ে থাকে, তাকে কখনই বলা উচিৎ নয় যে তুমি তো পাঁকের মধ্যে পড়ে আছে, দরকার হলে তুমিও ঐ পাঁকের মধ্যে নেমে পড়ে ওকে সেই পাঁক থেকে বার করে নিয়ে এসো। পরের শ্লোকে বলছেন অজ্ঞানী আর জ্ঞানী বা কর্মযোগী কিভাবে কর্ম করেন –

**প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্মাণি সর্বশঃ। অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্তাহমিতি মন্যতে।।২৭।।**

প্রকৃতির তিনটে গুণ – সত্ত্বঃ, রজঃ ও তমঃ, এই তিনটে গুণ খুব সূক্ষ্ম। একটা চককে যদি ভাঙা হয় তখন চকটি কয়েকটা টুকরো হয়ে যাবে, সেই টুকরো গুলোকে ভাঙতে ভাঙতে গুড়ো হয়ে যাবে। এরপর এর রাসায়নিক উপাদান গুলিকে ভাঙতে ভাঙতে চকটা মলিক্যুলস স্তরে চলে যাবে। এইভাবে ভাঙতে ভাঙতে ইলেকট্রন প্রোটনে চলে যাবে, সেই ইলেক্ট্রন প্রোটনকে ভেঙে ভেঙে শেষে চক মনের পার্টিকেলস্ স্তরে চলে যাবে। মনের স্তরকেও যখন ভাঙা হবে তখন পাঁচটা তন্মাত্রা অবস্থায় চলে আসব, ভূমি, অপঃ, মরুৎ, তেজ ও ব্যোম। এই স্তরের সূক্ষ্ম অবস্থাকে আমরা কল্পনাই করতে পারব না, আর পুরো বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড এখান থেকে সৃষ্টি হচ্ছে। এগুলো মিলিয়েই মহৎ মন বা কসমিক মাইণ্ডের সৃষ্টি হচ্ছে। তারও পেছনে আছে এই সত্ত্বঃ, রজঃ ও তমঃ। মিষ্টির দোকানে যত ছানার তৈরী মিষ্টি আছে, সব মিষ্টিই হচ্ছে মাত্র তিনটে জিনিষের খেলা, দুধ, চিনি আর আগুন। এই তিনটে জিনিষ দুধ, চিনি আর আগুনকে যখন নানান ভাবে খেলাতে শুরু করা হবে তখন হাজার রকমের হাজার হাজার মিষ্টি তৈরী হতে থাকবে। গরম দুধে চিনি গুলে খাওয়া যা আর মিষ্টি দোকানের ছানার যে কোন মিষ্টি খাওয়া একই ব্যাপার। জ্ঞানী আর অজ্ঞানীর তফাৎ হচ্ছে অজ্ঞানীরা ঐ মিষ্টি দেখে মুগ্ধ হয়ে যায়, মুগ্ধ হওয়ারই কথা মিষ্টি তৈরীর পেছনে কত দক্ষতা ও কুশলতা আছে। কিন্তু যারা জ্ঞানী তিনি দেখছেন সব দুধ, চিনি আর আগুনের খেলা, তাছাড়া আর কিছু নয়। এখন এই প্রকৃতির দিকে যখন জ্ঞানী দৃষ্টি দেন তখন সেখানে তিনি এই তিনটে গুণের খেলাই দেখেন, যা কিছ ঐ সত্ত্বঃ, রজঃ আর তমের খেলা। জগতে যা কিছু হচ্ছে, এই যে পাখা ঘুরছে, এখানে গীতার ক্লাশ চলছে, সবাই কথা শুনছে, এই সবই সত্ত্বঃ রজঃ ও তমের খেলা, বুদ্ধি দিয়েই সব হচ্ছে।

আমাদের মত সাধারণ লোকেদের সমস্যা হচ্ছে তিনগুণের এই খেলার মধ্যে আমরা নিজেদের অহংটাকে লাগিয়ে দিই। আমরা চাই বা না চাই, সূর্য এইভাবেই রোজ উঠবে আর এই ভাবেই রোজ অস্ত যাবে, পৃথিবী এইভাবেই ঘুরতে থাকবে, জগতে যা কিছু হচ্ছে তা নিজের মতই হবে। মাঝখান থেকে আমরা ভেবে মরি যে এটা আমরাই করছি, কিন্তু আসলে প্রকৃতিই সব করছে। আমার যে স্বভাব, আমার যে প্রকৃতি বা স্বভাব, আমার মধ্যে সত্ত্বঃ রজঃ ও তমের আধিক্য যেভাবে আছে, সেভাবেই এরা আমাকে কাজ করিয়ে ছাড়বে। এখন যারা শাস্ত্র পড়তে আসছেন, আজ যদি এখানে শাস্ত্রের ক্লাশ না থাকত তাহলে তারা এখানে না এসে খোঁজ নিত কোথায় ভালো প্রবচন হচ্ছে, যদি ভালো প্রবচন না থাকে তাহলে মন্দিরে যাবে, নয়তো বাড়িতে বসে নিজে থেকে কিছু শাস্ত্র অধ্যয়ণ করবে, যার স্বভাবে রয়েছে ভালো কথা শুনব, ভালো বই পড়ব, তাকে এই স্বভাব তাকে এই সব কাজ করিয়েই ছাড়বে। যারা বুদ্ধিমান তারা দেখে যে এই যা কিছু হচ্ছে সবই এই তিনটে গুণের খেলা। কিন্তু মাঝখান থেকে আমরা এর মধ্যে আমিটাকে জুড়ে দিয়ে এর সমস্ত খেলার মধ্যে একাত্ম হয়ে কষ্ট পেয়ে মরি।

আমি সেই শুদ্ধ চৈতন্য, আমার এই শরীরে শুদ্ধ চৈতন্য আছে বলেই এই শরীরকে জীবন্ত মনে হচ্ছে, শরীরের হাত, পা, কান, চোখ ইত্যাদি সব ক্রিয়াশীল হচ্ছে একমাত্র শুদ্ধ চৈতন্য আছে বলেই। শুদ্ধ চৈতন্য এই শরীরের মধ্যে আছে বলেই এই শরীরকে আমরা এত ভালোবাসি। এক্ষুণি যদি আমার শরীর থেকে শুদ্ধ চৈতন্য বেরিয়ে যায় তখন আমার এই শরীরকে কি কেউ ভালোবাসবে? মৃত দেহ স্পর্শ করলে স্নান করতে হয়, কিন্তু জীবন্ত মানুষের শরীরকে নিয়ে কত আদর, কত নাচানাচি। এই স্থূল শরীরের পুরোটাই হচ্ছে সত্ত্ব, রজঃ আর তমের খেলা, সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ দিয়েতো আমার পরিচয় হবে না, আমি তো সেই শুদ্ধ চৈতন্য। কিন্তু আমার মন বুদ্ধি কখনই সেই শুদ্ধ চৈতন্যের দিকে দৃষ্টি দিচ্ছে না, সব সময় তার দৃষ্টি বাইরের দিকে, বাইরে যা আছে সব এই তিনটে গুণের খেলা। আমি হয়তো চাষবাস করি, একটা ট্রাক্টর নিয়ে ভালো করে চাষ করে প্রচুর ফসল ফলিয়েছি, আমি বলছি আমার কি দারুণ ফসল হয়েছে। এখানে আমার কি ফসল হয়েছে, শক্তি জড়ের উপর কাজ করেছে, এখানে আমার সাথে এর কি সম্পর্ক আছে, আসলে কোন সম্পর্কই নেই। যারা সাধারণ মানুষ তারা শক্তি আর জড়ের উপরে যা হচ্ছে তার সাথে নিজের যে অহং ভাব সেই ভাবকে জুড়ে দেয়, জুড়ে দিয়ে কষ্ট পায়। কিন্তু যারা বুদ্ধিমান লোক তারা কি করে? ভগবান বলছেন –

**তত্ত্ববিত্তু মহাবাহো গুণকর্মবিভাগয়োঃ। গুণা গুণেষু বর্তন্ত ইতি মত্বা ন সজ্জতে।।১৮।।**

কিন্তু যাঁরা তত্ত্ববিদ্, যাঁরা জ্ঞানী পুরুষ, যাঁদের বুদ্ধি পরিশ্রুত, তাঁরা পরিষ্কার বুঝতে পারেন যে *গুণা গুণেষু বর্তন্ত*, গুণ গুণের উপর খেলা করছে, এখানে গুণ মানে সত্ত্বঃ, রজঃ ও তমঃ। আমি গান শুনতে খুব ভালোবাসি, যখন খুব ভালো উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শুনছি, যে বাদ্যযন্ত্র থেকে সুর বেরোচ্ছে সেই বাদ্যযন্ত্রে সত্ত্ব, রজঃ ও তমের কাজ চলছে, বাদ্যযন্ত্রে আঘাতের ফলে যে ধ্বণি হচ্ছে সেটা আকাশতত্ত্ব থেকে হচ্ছে, আর যে কান দিয়ে শুনছি সেই শ্রবণেন্দ্রিয়ও আকাশতত্ত্ব দিয়ে তৈরী। এখানে আমি কিভাবে নিজেকে

জড়ালাম, এখানে তো আমার কোন ভূমিকাই নেই। গরমের সময় মিষ্টি ঠাণ্ডা শরবৎ পান করে আমি বলছি, আঃ, প্রাণটা জুড়িয়ে গেল। এখানেও সেই তিন গুণের খেলা, শরবৎ হচ্ছে রসতত্ত্ব থেকে তৈরী, আর জিহ্বা সেও রসতত্ত্ব দিয়ে তৈরী, রসতত্ত্ব রসতত্ত্বকে আস্বাদ করছে, আমি এখানে কোথায় জড়াচ্ছি! যিনি আত্মা, যিনি চৈতন্য স্বরূপ, তাঁর সাথে রসতত্ত্ব, আকাশতত্ত্ব এদের কোন সম্পর্কই নেই। চৈতন্য নিজেকে বোকার মত এগুলোর সাথে নিজেকে একাত্ম করে কখন আনন্দে আহ্লাদে আটখানা হয়ে যাচ্ছে আবার কখন দুঃখ পেয়ে কেঁদে ভাসিয়ে দিচ্ছে। চৈতন্য এই স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরকে আশ্রয় করে প্রকৃতির সব কিছু খেলার মধ্যে নিজেকে জড়িয়ে প্রকৃতির ধর্মকেই নিজের ধর্ম বলে মনে করছে। চৈতন্য সর্বব্যাপী, সব জায়গাতেই চৈতন্য আছে, কিন্তু জীবের শরীরে আশ্রয় করে বলে তার প্রকাশটা বেশি মনে হয়। এখন কোন কারণে চৈতন্য যদি এই শরীরের আশ্রয়টা ছেড়ে দেয় তখন এই শরীর আর জড় পদার্থের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকবে না। এই চৈতন্য যখন গাছের মধ্যে আশ্রয় করবে তখন সে গাছের মত আচরণ করবে, যখন একটা পশুর শরীরকে আশ্রয় করবে তখন পশুর মত ব্যবহার করবে, মানুষের শরীরে আশ্রয় করবে তখন মানুষের মত কাজ করবে। কিন্তু প্রাণ সেইভাবে কাজ করবে না, যেমন টিউবলাইটেও ইলেক্ট্রিসিটি আছে পাখাতেও ইলেক্ট্রিসিটি আছে, কিন্তু ইলেক্ট্রিসিটি টিউবলাইটে পাখার মত কাজ করবে না, পাখাতে টিউবলাইটের মত কাজ করবে না। আমাদের শরীরে অঙ্গপ্রত্যাঙ্গাদি যেভাবে রয়েছে এখানে প্রাণ যেভাবে কাজ করবে গাছের মধ্যে সেইভাবে কাজ করবে না। এখন যদি আমার শরীরটাকে টুকরো টুকরো করে দেওয়া হয় তখন চৈতন্য শক্তি সেই শরীরের আশ্রয় ছেড়ে দেবে কেননা এই শরীরটা তার যন্ত্রস্বরূপ ছিল এখন সে যন্ত্রটা অকেজো হয়ে গেল, তাই এই যন্ত্রটাকে ছেড়ে দেবে। ছেড়ে দিয়ে কোথায় যাবে? কোথাও যাবে না, যেখানে ছিল সেখানেই থাকবে।

চৈতন্য যে শুধু এই স্থূল শরীরের সাথে নিজেকে একাত্ম করে রেখেছে তাতো নয়, এই শরীরের পেছনে যে সূক্ষ্ম শরীর আছে, যার সাহায্যে প্রাণ ও ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া হয়, সেই সূক্ষ্ম শরীরের সাথে আরও বেশি করে নিজেকে একাত্ম করে রেখেছে। যখনই স্থূল শরীরটা দিয়ে কোন কাজ করতে পারবে না, তখনই সূক্ষ্ম শরীরটা সেই স্থূল শরীরটাকে ছেড়ে দিয়ে আরেকটা শরীরকে নিজের অপূর্ণ কামনা বাসনাকে মেটাবার জন্য দাঁড় করিয়ে নেবে। আমার এই জামা প্যাণ্ট যদি ছিঁড়ে যায় তখন তো আমি উলঙ্গ ঘুরে বেড়াব না, আমি আরেকটা জামা প্যাণ্ট বানিয়ে নেব, এও ঠিক তেমনি আরেকটা শরীর বানিয়ে নেবে। কিন্তু শরীর বানাবার ক্ষমতা খুব কম, তাই একটা গর্ভকে বেছে নিয়ে সেখানে ঢুকে যেতে হয়। যোগীদের সূক্ষ্ম শরীরের ক্ষমতা অনেক বেশি, সেইজন্য তাঁদের গর্ভে ঢোকার দরকার পড়ে না। উনি দেখছেন একটা পাথর পড়ে রয়েছে, ঐ পাথরকে কেউ বিরক্ত করতে আসবে না, তিনি ঐ পাথরকে আশ্রয় করে নিজের জীবাত্মাকে ঐখানে ঢুকিয়ে নিয়ে তপস্যাতে ডুব দেন। এখন ঐ পাথর হাজার হাজার বছর ধরে পড়ে আছে, যোগী ওর মধ্যেই ঢুকে গিয়ে ধ্যান করে যাচ্ছেন। অহল্যা যেমন পাথরের শরীরকে আশ্রয় করে পড়েছিলেন।

যোগীর উদ্দেশ্য হচ্ছে ঐ সূক্ষ্ম শরীরটা, যার মধ্যে ইন্দ্রিয়গুলো রয়েছে, প্রাণ রয়েছে, সেই শরীরটাকে বিনাশ করে দেওয়া। এই সূক্ষ্ম শরীরের বিনাশ না হওয়া পর্যন্ত কিন্তু কিছুই হবে না। চৈতন্য কখনই বেরোতে পারেনা, কারণ সে এমন মায়া, মমতার সংস্কারে নিজেকে একাত্ম করে রেখেছে, যত দিন না ঐ সংস্কারের বীজ পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে তত দিন সে বেরোতে পারেনা, মানুষ মারা যাওয়ার পর যে বলা হয় চৈতন্য বেরিয়ে গেলে, আসলে চৈতন্য বেরোয় না, বেরোয় সূক্ষ্ম শরীরটা। যেদিন চৈতন্য সূক্ষ্ম শরীরকে ছেড়ে বেরিয়ে যায়, তখন যে সূক্ষ্ম শরীর সমস্ত জড়ের উপাদান গুলিকে ধরে রেখেছিল সেগুলো আলাদা হয়ে যে যেখান থেকে এসেছিল সেখানে চলে যায়। প্রতি মুহুর্তে আমি যে নিঃশ্বাস ছাড়ছি তখন এই নিঃশ্বাসের বায়ু কোথায় যাচ্ছে, সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ছে। সূক্ষ্ম শরীরকে যখন আত্মা ছেড়ে দিচ্ছে তখন সূক্ষ্ম শরীরের সূক্ষ্ম উপাদান গুলি কোথায় যাবে? সারা বিশ্বে ছড়িয়ে যাচ্ছে। সেগুলো আবার একজন কেউ নিয়ে নেবে। আর আত্মা কোথায় যাবে? কোথাও যাবে না, যেখানে ছিল সেখানেই থাকবে। মুক্তি বলতে এটাকেই বোঝায়, শুদ্ধ আত্মা বা চৈতন্য যখন এই সূক্ষ্ম শরীরটাকে ছেড়ে দেয় তখনই সে মুক্ত হয়ে গেল।

সূক্ষ্ম শরীরটা আসলে কি? হাজারটা সূক্ষ্ম উপাদান দিয়ে এই সূক্ষ্ম শরীর গঠিত হয়েছে, যেমন মন, মনের আবার হাজারটা সূক্ষ্ম উপাদান আছে, সেই রকম ইন্দ্রিয়ের হাজারটা সূক্ষ্ম উপাদান, বুদ্ধির হাজারটা উপাদান, প্রাণের হাজারটা উপাদান, এই সব উপাদান নিয়ে সূক্ষ্ম শরীরটা তৈরী হয়েছে। এই সূক্ষ্ম শরীরের সাথে চৈতন্য নিজেকে একাত্ম করে নিয়েছে। যতক্ষণ চৈতন্য সূক্ষ্ম শরীরের সাথে একাত্ম হয়ে থাকেব ততক্ষণ এই সূক্ষ্ম শরীর যেমন যেমন চিন্তা ভাবনা করতে থাকবে সেই অনুযায়ী বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন স্থূল শরীরের মধ্যে ঘুরতে থাকবে। এই ঘোরার সময় সে কিছু উপাদানকে ছেড়ে দেবে আবার কিছু নতুন উপাদানকে গ্রহণ করবে। যেমন যেমন ভালো কাজ করতে থাকবে তেমন তেমন তার সূক্ষ্ম শরীর পাল্টাতে থাকবে। যেদিন জ্ঞান হয়ে যাবে তখন যে উপাদানকে এতদিন ধরে রেখেছিল সেই উপাদান গুলো তার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। যেমন একটা ইলেক্ট্রো ম্যাগনেট লোহার ছোট ছোট টুকরোকে ধরে রেখেছে। মনে করা যাক ইলেক্ট্রো ম্যাগনেট হচ্ছে চৈতন্য, তার হঠাৎ জ্ঞান হল, আরে আমি একি করছি কতকগুলো লোহাকে আমি ধরে রেখেছি! এখন যদি সুইচ অফ্ করে দেওয়া হয় তখন লোহার টুকরো গুলো কোথায় যাবে? ছড়িয়ে ছিটিয়ে যাবে। এখন ঐ টুকরো গুলোকে কে ধরবে? অন্য কোন ইলেক্ট্রো ম্যাগনেট ধরে নেবে। অন্য ইলেক্ট্রো ম্যাগনেট না ধরলে কোথায় যাবে? কোথাও যাবে না, ঐখানেই পড়ে থাকবে। আজ হোক কাল হোক কোন না কোন ইলেক্ট্রো ম্যাগনেট ঐগুলোকে ধরে

নেবে। এই রকম হাজার হাজার কোটি কোটি লোহার টুকরো পড়ে আছে। আর কুড়ি পঁচিশটা ইলেক্ট্রো ম্যাগনেট ঘুরে চলেছে, এখন এরা নিজের ক্ষমতা অনুযায়ী লোহার টুকরো গুলোকে ধরে নেবে। যদি নাই ধরে তাহলে বলা হবে প্রকৃতি নিজের মত আছে। এইটাই হচ্ছে অপরা প্রকৃতি আর পরা প্রকৃতি, যেটা সপ্তম অধ্যায়ে আলোচনা করবে। এই পরা প্রকৃতি মানে ইলেক্ট্রো ম্যাগনেটও লোহা দিয়েই তৈরী, লোহার টুকরোও লোহা দিয়েই তৈরী হয়েছে, আবার একে অপরকে টানছে। ইলেক্ট্রো ম্যাগনেট আর লোহাকে আমরা উপমার জন্য ব্যবহার করলাম।

**প্রকৃতের্গুণসংমূঢ়াঃ সজ্জন্তে গুণকর্মসু। তানকৃৎস্নবিদো মন্দান্ কৃৎস্নবিন্ন বিচালয়েৎ।।২৯।।**

প্রকৃতির এই তিনটি গুণ অজ্ঞানীদের চিত্তকে বিভ্রান্ত করে তাদের মাথা গুলিয়ে দিয়েছে। এই তিনটে গুণ সাধারণ মানুষকে নাচাতে থাকে আর সেও নাচতে থাকে – আমাকে টাকা পেতে হবে, আমাকে অমুক করতে হবে, আমাকে অমুক হতে হবে। প্রকৃতির এই তিনটে গুণের খেলাকে যারা বুঝতে পারেন তাঁরা তাঁদের নিজের মনকে কোন কিছুতেই বিচলিত হতে দেন না। যখন ক্ষিধে পেয়েছে তখন দেখছে – এটাতো ইন্দ্রিয়ের ধর্ম, আচ্ছা ঠিক আছে, ইন্দ্রিয় যখন চাইছে তখন কিছু একটা খেয়ে নিলেই হল। মনুস্মৃতিতে খুব বিস্তৃত করে দেখান হয়েছে যে, ইন্দ্রিয়ের উপর নিজের আধিপত্য বিস্তার করে ইন্দ্রিয়কে জয় করার জন্য মানুষ নানা রকমের উপাসাদি করে। একাদশীর উপবাস, বিভিন্ন তিথি পার্বণে উপবাস, আগেকার দিনে মায়েদের প্রতি মাসে এই উপোস, সেই উপোস লেগেই থাকত। এগুলো করার মুখ্য উদ্দেশ্যই হচ্ছে ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযম করা। এর পরের সংযম হচ্ছে কোন কিছুর প্রতি আকর্ষিত না হওয়া। যারা ঠিক ঠিক *কৃৎস্নবিৎ*, যারা প্রকৃতির পুরো ছবিটাকে জানেন, তাঁদের কিন্তু কখনই এগুলোতে বিচলিত হওয়া উচিৎ নয়, অন্যকেও মানে যারা মন্দবুদ্ধির লোক তাদেরকেও বিচলিত করা উচিৎ নয়। প্রকৃতির এই গুণের খেলা থেকে কি করে বাঁচবে?

**ময়ি সর্বাণি কর্মাণি সংন্যস্যাধ্যাত্মচেতসা। নিরাশীর্নির্মমো ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ।।৩০।।**

ভগবান অর্জুনের কথাতে আবার চলে এলেন। তুমি যা কিছু করছ, ভালো মন্দ যাই হোক না কেন, *ময়ি সর্বাণি কর্মাণি*, সমস্ত কর্ম আমার উপর *সংন্যস্যাধ্যাত্মচেতসা*, উপর ফেলে দাও, আর *বিগতজ্বরঃ*, তোমার যত রকমের শোক মোহ আছে সব আমাকে দিয়ে দাও। এই বল, ঠাকুর সব তোমাকে দিয়ে দিলাম। এই ভাবে সমর্পণ করে দেওয়ার পর তুমি কাজ কিভাবে করবে? আচার্য শঙ্কর খুব সুন্দর বলছেন – *অহং কর্তা ঈশ্বরায় ভৃত্যবৎ করোতি*। আমি কর্তা, ঈশ্বরের জন্য তাঁর দাসের মত কাজ করছি। এটি অত্যন্ত মূল্যবান উচ্চ আদর্শের কথা। যা কিছু কাজ করবে মনে করবে আমি করছি, এই আমিটা কে? ঈশ্বরের দাস। কাজ করার সময় মনের মধ্যে সব সময় থাকবে, এই কাজের আমি কর্তা, আমিই করছি, বিগ বসেরা যেমন নিজেকে সব কাজে কর্তা মনে করে কাজ করে। বাড়ির মায়েরা যখন রান্নাবান্না করেন, ঘরদোর গোছগাছ করেন তখন তিনি মনে করেন, আমি এই বাড়ির গিন্নী, এই কাজের আমিই কর্ত্রী। কাজের সব কিছুতে নিজের মালিকানাকে ঠিক ঠিক বোধ হওয়া চাই। আমি যখন ব্যাঙ্কে যাই তখন আমি দেখি একাউন্টে আমার সব টাকা ঠিক আছে কিনা, ঐ টাকাতে আমার মালিকানা বোধ আছে, প্রত্যেকটি কাজেও এই রকম মালিকানা বোধ নিয়ে করতে হবে, এইটাই হল আমি কর্তা, অহং কর্তা। আমি কর্তা এই বোধের সাথে সাথে মনে করতে হবে এই কাজটা ঈশ্বরের কাজ, তিনি আমাকে এই কাজে নিযুক্ত করেছেন, ঈশ্বরের জন্যই এই কাজটা তাঁর ভৃত্যের মত করছি। অর্জুন যুদ্ধ করছে। কে করছে? আমি অর্জুন, আমি যুদ্ধ করছি। কেন করছে? যুদ্ধটা ঈশ্বরের কাজ, ঈশ্বরের প্রয়োজনার্থে এই যুদ্ধ। এই কাজের মালিক যেন অর্জুন, আমাদের কাজে ব্যবহারে হবে এই কাজের মালিক যেন আমি, কিন্তু আমি জানি মালিক হচ্ছেন সেই ঈশ্বর। যে কোন কাজই হচ্ছে ঈশ্বরের কাজ, ঈশ্বরই একমাত্র মালিক। আমি কেন কাজ করছি? যে কোন কাজই হোক না কেন, সরকারি কাজই হোক আর বেসরকারি কাজই হোক, সব কাজ হচ্ছে সেই সরকারেরও যে মালিক সেই ঈশ্বরের, ঈশ্বরের আদেশ এটা, কাজটা ঠিকভাবে গুছিয়ে করতে হবে আমাকে। কাজ করার সময় কি বোধ হবে, কাজটা আমার, আমি কাজটা করছি। মুর্খ ভক্তরা বলে – ও ঠাকুরের কাজ, ঠাকুরই কাউকে না কাউকে দিয়ে করিয়ে নেবেন, তাঁর অনেক লোক আছে, আমি কেন ওর মধ্যে জড়াতে যাব।

এক সন্ন্যাসী তাঁর পূর্বাশ্রমের বাড়িতে গেছেন, ওনারা বিরাট বড়লোক, তাদের বাড়িটাও রাজবাড়ির মত। মহারাজ যাওয়ার পরই বাড়ির মালিক বলছেন – আরে তোরা কে আছিস, মহারাজ এসছেন ভালো করে এক কাপ চা নিয়ে আয়। মালিক যে চাকরকে বলেছে, সেই চাকর সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে রান্নাঘরে গিয়ে বলল – এই, মহারাজ এসেছেন, দু'কাপ চা চাই। রান্নাঘরের চাকর তখন বাইরে যে দারোয়ান ছিল তাকে বলল – এই, মহারাজ এসেছেন, দু'কাপ চা নিয়ে আয়তো। দারোয়ান সঙ্গে সঙ্গে ড্রাইভারকে বলল – এই মহারাজ এসেছে, তাড়াতাড়ি গিয়ে দু'কাপ চা নিয়ে আয়। ড্রাইভার একটা ফ্লাস্ক নিল, গাড়ি স্টার্ট করে একটা দোকানে গিয়ে বলল – এই ভালো করে দু'কাপ চা বানিয়ে এই ফ্লাস্কে ঢেলে দে। ড্রাইভার চা নিয়ে ঠিক একই অনুক্রমে, দারোয়ানকে দিল, দারোয়ান রান্নঘরের চাকরকে দিল, রান্নঘরের চাকর মালিকের নিজস্ব চাকরকে দিল। মালিক কিন্তু এত কিছু জানেই না, সে জানে আমার রান্নাঘর থেকে চা এসেছে। দু'কাপ চায়ের জন্য কত টাকার তেল পুড়িয়ে, কত ঘুরে চা নিয়ে আসা হল। সরকারি অফিসে এই একই

অবস্থা, বেশির ভাগ কর্মচারিরা বলে সরকারের কাছ থেকে তো সবাই মাইনে পাচ্ছে আমি কেন একা খেটে মরব। দ্বিতীয় হচ্ছে ভক্তরা বলে, সবই ভগবানের কাজ, তা ভগবানের অনেক লোক আছে, ভগবানের কাজ করার লোকের অভাব হবে না। বাড়িতে যদি তিন মহিলা থাকে তাহলে সে বাড়িতে কোন কাজ হয় না, তিনজনই বলবে আমি কেন করব, ওরাও তো আছে।

কিন্তু এখানে এই কথা গুলো কাকে বলা হচ্ছে? তুমি যদি মহৎ হতে চাও, তাহলে তোমার কখনই এই ধরণের মনোভাব থাকা উচিৎ হবে না। তোমার কাছে যে কাজটা এসে গেছে, বা যে কাজটা তুমি করবে বলে ঠিক করেছ, তখন সেই কাজটা ঈশ্বরের কাজ এই ভাব আনতে হবে, কাজের কর্তা আমি, আমাকে নিশ্চিত করতে হবে যে এই কাজটাকে ভালো ভাবে নিখুঁত ও ত্রুটিবিহীন ভাবে করতে হবে। যখন জপধ্যান করছি তখনও ঠিক এই একই ভাবে করতে হবে। জপধ্যানটাও ঠাকুরের কাজ, তাই আমাকে জো সো করে জপধ্যান করতে হবে। এক ভক্ত প্রায়ই মঠে আসতেন। অনেক দিন মঠে আসা বন্ধ করে দিয়েছেন। এক মহারাজের সঙ্গে দেখা হতেই ভক্তটিকে জিজ্ঞেস করছেন, কি হল, অনেক দিন মঠে আসছেন না। ভক্তটি বলছে, তিনি ডাকলেই যাব। তিনি ডাকলেই যাব বলা মানে? তার কিন্তু আর কর্তাবোধটা নেই। গীতাতে স্পষ্ট করে বলছে যে, তোমার কর্তবোধ থাকতে হবে, কিন্তু কি কর্তাবোধ? আমি ঈশ্বরের দাস। কথামৃতে ঠাকুরও বলছেন – আমি ঈশ্বরের দাস, এই ভাবটাকে ধরে রাখতে হয়। আমি ঈশ্বরের দাস এই ভাবটাকে ঠিক ঠিক ধরে রাখতে পারলে তবেই আধ্যাত্মিক উন্নতি হয়। ঈশ্বরের দাস এই ভাবের মধ্যে কাজের মধ্যে আমি কর্তা এই ভাবটাই লুকিয়ে আছে। যশোদা বলছেন, আমি কৃষ্ণকে না দেখলে কে দেখবে? এই দুটো জিনিষ খুব তাৎপর্যপূর্ণ – আমি ঈশ্বরের দাস আর দ্বিতীয় আমি কর্তা। কাজ করার সময় আমার বোধ থাকবে আমি কর্তা, কাজ করব প্রভুর মত, ক্রীতদাসের মত কাজ করতে বলা হচ্ছে না। আগেকার দিনে বড় বড় জমিদারদের কিছু গোলাম থাকত, গোলামদের যা আদেশ করা হত, কারুর গলা কেটে দিতে হবে, কাউকে গুম্ করে দিতে হবে, নির্বিশেষ চিত্তে গোলামরা সেই কাজ হাসিল করে দিত, গোলাম জানে আমি এই কাজ না করলে জমিদারের খুব ক্ষতি হয়ে যাবে। সেইজন্য কবিরের ভজনে বলছে – প্রভু ম্যায় গোলাম, ম্যায় গোলাম তেরা।

বাড়িতে খুব গণমান্য কোন অতিথি এসেছেন, বাড়ির মেয়ে চা বানাতে গেছে, মা দৌড়ে এসে বলছে – তুই সরে যা, গোলমাল করে দিবি, আমাকে বানাতে দে। মায়ের এই যে আমি কর্তা এই বোধটার কথাই ভগবান বলছেন, তার সাথে আরেকটা বোধ এটা ঠাকুরের কাজ, এই দুটো বোধ যদি যুগপৎ না থাকে তাহলে কিন্তু কর্ম বন্ধন হয়ে যাবে। সেইজন্য বলছেন *ময়ি সর্বাণি কর্মাণি* সব কাজ তাঁরই, *সংন্যস্য অধ্যাত্ম-চেতসঃ,* মনে প্রাণে সচেতন ভাবে তুমি সব কর্ম আমাকেই সমর্পণ করে শোক মোহ ত্যাগ করে যুদ্ধ কর। যুদ্ধটা আমার জন্যই করছ, যুদ্ধের যা ভালো মন্দ হবে সব আমারই হবে এই ভেবে তুমি শোক মোহ শূন্য হয়ে কাজে নেমে পর। যখন তুমি বুঝে নেবে যে এটা ঈশ্বরের কাজ তখন তুমি কাজটাকে ত্রুটিমুক্ত ভাবে করার জন্য কত সজাগ হয়ে যাবে। অথচ আমরা একটা সাধারণ পুলিশ কনস্টেবল থেকে ভয়ে কত সতর্ক থাকি, অথচ ঈশ্বরের মত এত বড় একজন বস্ আমাদের মাথার উপর বসে আছেন তাঁকে কোন ভয়ই পাইনা।

**যে মে মতমিদং নিত্যমনুতিষ্ঠন্তি মানবাঃ। শ্রদ্ধাবন্তোঽনসূয়ন্তো মুচ্যন্তে তেঽপি কর্মভিঃ।।৩১।।**

যাঁরা এই ধরণের নিষ্কাম কর্মে শ্রদ্ধাবান ও আমার এই কথাগুলোকে ধারণা করে সেই মত আচরণ করছেন, তাঁরা সব রকমের পাপ ও পূণ্য থেকে মুক্তি পেয়ে যান। গীতার এই উপদেশ পালন করা যদিও আপাত দৃষ্টিতে খুব কঠিন মনে হবে কিন্তু অসম্ভব কিছু নয়। আমি কর্তা আর এটা ঈশ্বরের কাজ, আমি তাঁর ভৃত্য, এই বোধ নিয়ে যা কিছু করি না কেন, আমি মাংস ভাত খেতে যাচ্ছি তখনও যদি মনে করি এটাও ঠাকুরেরই কাজ, সেই মুহূর্তেই কিন্তু আমার মনটা আটকে যাবে, ছ্যাঃ, এই মাংস-ভাত ভোগ করছি এটা কি কখন ঠাকুরের কাজ হতে পারে? তখন আর মাংস-ভাত খেতে ইচ্ছে করবে না। যে কোন ভোগের ইচ্ছা নিয়ে কিছু করার পর যদি মনে এই ভাব আসে যে, এটা ঠাকুরের কাজ, তখন কিন্তু ভোগ করতে ভালো লাগবে না, ভোগের ইচ্ছেটা আপনা থেকেই কমে যেতে থাকবে।

**যে ত্বেতদভ্যসূয়ন্তো নানুতিষ্ঠন্তি মে মতম্। সর্বজ্ঞানবিমূঢ়াংস্তান্ বিদ্ধি নষ্টানচেতসঃ।।৩২।।**

তবে হে অর্জুন আমার এই কথাকে যারা শ্রদ্ধা করে না এবং অমান্য করে, আমার কোন্ কথা? *ময়ি সর্বাণি কর্মাণি,* এই কথাকে যারা অশ্রদ্ধা করে তারা সমস্ত কর্মেই অযোগ্য। মুক্তির পথ কি? সব কাজ ঈশ্বরের কাজ এই ভেবে কর্ম করা। বন্ধনের পথ হচ্ছে যারা আমার এই কথাকে অশ্রদ্ধা করে। দুই ধরণের লোক বন্ধনে আবদ্ধ হয়, এক হচ্ছে যারা কোন কাজ করে না, আর দ্বিতীয় ধরণের লোক হচ্ছে, যারা মনে করে সব কাজ আমারই কাজ, ঈশ্বর এখানে কোথা থেকে আসছে। এই দুটোর মধ্যে একটা ভাব যদি তোমার এসে যায় তাহলেই তুমি আবদ্ধ হয়ে গেলে। বাবা-মা সন্তানকে যদি মনে করে এই সন্তান ঈশ্বরের সন্তান, আমি আমার সব চেষ্টা চালিয়ে একে সত্যিকারের মানুষ করতে প্রযত্নশীল হব। কিন্তু সন্তান কি হবে আর কি হবে না সেটা আমার দেখার কোন দায়ীত্ব নেই, তাঁর সন্তান তিনি জানেন কি হবে। কিন্তু আমার তরফ থেকে তাকে লালন পালন করে বড় করতে যা যা করা দরকার সব করে

দেব। তখন বাবা কিংবা মা আর কোন বন্ধনে জড়াবে না, এখন বড় হয়ে সন্তান যদি অবাধ্য হয়ে যায় তাতে আমার কি, ঠাকুরের সন্তান ঠাকুর জানেন, আমার যা করার সব কর্তব্য করে দিয়েছি। এত কথা বলার পর ভগবান এইবার বলছেন –

**সদৃশং চেষ্টতে স্বস্যাঃ প্রকৃতের্জ্ঞানবানপি। প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি।।৩৩।।**

এইখান থেকে ভগবান কর্মযোগের বাধা গুলো বলতে শুরু করলেন। এই যে বিরাট কর্মযোগের কথা বলা হল, এর প্রতিবন্ধকতা গুলো কি? প্রতিবন্ধকতা মানে যার জন্য মানুষ যোগের পথে অগ্রসর হতে পারেনা। বলছেন, এই যে তোমাকে এত উঁচ্চ তত্ত্বের কথা বললাম, মানুষকে যতই এই উচ্চ তত্ত্বের ভালো ভালো কথা বলা হোক না কেন, মানুষের প্রকৃতি এমন যে সে এই প্রকৃতির বাইরে যেতে পারে না। চেষ্টা করলেও যেতে পারে না। এখানে প্রকৃতির অর্থ হচ্ছে স্বভাব, মানুষের যে প্রারব্ধ কর্ম, যে কর্মের জন্য তার এই জন্ম হয়েছে। শঙ্করাচার্য বলছেন – এর আগের আগের জন্মে আমি ভালো মন্দ যা যা কর্ম করেছি, এই জন্মে গিয়ে সেই কর্মের অভিব্যাক্তি হয়।

আমরা যদি খুব গভীর ভাবে খতিয়ে দেখি তাহলে দেখতে পাব যে জীবনে পরিবর্তন বলে কিছু হয় না। বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে কেউ চাকরি পেল, তার বন্ধুরা বলে – দ্যাখ্, ও চাকরি পেয়ে কেমন পাল্টে গেছে। অফিসের খুব প্রিয় সহকর্মি, পরীক্ষা দিয়ে প্রমোশন পেয়ে বড় অফিসার হয়ে গেছে। কিছু দিন পর সহকর্মিরা বলছে – অফিসার হয়ে একেবারে পাল্টে গেছে। এরা কিন্তু কেউই পাল্টায়নি, প্রথম থেকে তার এই স্বভাবই ছিল, এক্সপোজারটা ছিল না, স্বভাবটাকে প্রতিফলিত করার সুযোগ পাচ্ছিল না। সবাই কারুর কিছু হলেই বলে – তার জীবনে কি বিরাট পরিবর্তন এসে গেছে। কিন্তু কারুর জীবনে এক পয়সার কোন পরিবর্তন হয় না। যদি কারুর কোন পরিবর্তন হয় তাহলে পুরো শাস্ত্র মিথ্যে হয়ে যাবে। তার স্বভাবে যেটা আছে সেটা কখন উপরের দিকে যায় কখন নীচের দিকে যায়। ইতিহাস থেকে দৃষ্টান্ত দিয়ে আমি বলতে পারি – কেন কলিঙ্গ যুদ্ধের পরিণতি দেখে সম্রাট অশোকের কি বিরাট পরিবর্তন হয়েছিল। কিচ্ছু পরিবর্তন ছিল না অশোকের জীবনে। তিনি তো অহিংসা ধর্ম নিয়ে নিলেন, কিন্তু অন্য দিকে প্রচুর রাজকোষ ব্যায় করে বিরাট সৈন্যবাহিনী চালাতেন। নিজের সৈন্যবাহিনী থেকে একটি সৈন্যও কমাননি। এখন তো অনেক ঐতিহাসিকরা বলছেন অশোকের বৌদ্ধ ধর্ম নেওয়াটা একটা রাজনৈতিক চাল ছিল, পুরো ভারতবর্ষকে নিজের অধীনে রাখার জন্য। এটা গেলে একটা দিক, আরেক দিকে প্রতিবেশী যত রাজ্য ছিল তাদের অশোক বলে দিয়েছিল যে, আমি বৌদ্ধ হয়ে যেতে পারি, অহিংসা ধর্ম নিয়ে নিতে পারি, কিন্তু তোমরা যদি একটু ট্যাঁফু করেছ তো আমার সৈন্যবাহিনী তৈরী আছে তোমাদের সোজা করে দিতে একটুও দেরী হবে না। এই ব্যাপারে সম্রাট অশোক নিজের স্বভাব ও সংস্কারকে দৃঢ় ভাবেই ধরে রেখেছিলেন, ওখানে তাঁর কোন পরিবর্তন হয়নি। কারণ মানুষের স্বভাব কখনই পাল্টায়না।

আমরা দেখি যে উনি খুব ধর্মকর্মে মন দিয়েছেন। কিন্তু খোঁজ নিয়ে দেখুন, কাম, ক্রোধ, লোভ, হিংসা এগুলো তার একটুও পাল্টায়নি। একটা বয়সের পর ইন্দ্রিয়গুলো শিথিল হয়ে যায় বলে এগুলোর বহিঃপ্রকাশটা অন্য রকম হয়ে যায়, কিন্তু এগুলো যে রকম থাকার সেই রকমই থাকে, একটুও এদিক সেদিক হয় না। এই শ্লোকে ভগবান এইটাই বলছেন, যারা জ্ঞানী হয়ে যান তাঁরাও তাঁদের নিজের স্বভাব অনুযায়ী আচরণ করেন, অজ্ঞানীদের আর কি কথা। তারপর বলছেন – যদি মানুষের স্বভাব নাই পাল্টাল তাহলে তো শাস্ত্রের কথা সব নিরর্থক হয়ে যাবে। শাস্ত্র যে কত ভাবে বলছে তুমি মুক্তি যদি চাও তাইলে এই কর সেই কর, কিন্তু একটা মানুষের স্বভাব যদি নাই পরিবর্তন হয়, তাহলে এই শাস্ত্রের কি উপযোগিতা রয়েছে। তার এই স্বভাবকে ধরে রেখে তো মুক্তি পেতে পারবে না, তাহলে তো তার সব প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হয়ে যাবে। তা নয়, তখন বলছেন পুরুষকারের, এই যে চেষ্টা করছে, এর একটা মূল্য আছে। কি মূল্য আছে? তখন বলছেন –

**ইন্দ্রিয়স্যেন্দ্রিয়স্যার্থে রাগদ্বেষৌ ব্যবস্থিতৌ। তয়োর্ন বশমাগচ্ছেৎ তৌ হ্যস্য পরিপন্থিনৌ।।৩৪।।**

যারা শাস্ত্র পড়ে বুঝে গেছেন যে, আমার যে ইন্দ্রিয়গুলো আছে এগুলো ইন্দ্রিয়ের বিষয়ের উপরেই কাজ করে চলেছে। এই যে ইন্দ্রিয়গুলো আছে, এরা আবার কাজ করছে দুটো জিনিষের জন্য, এই দুটো জিনিষ হল রাগ আর দ্বেষ। এই দুটোকে একটু নিয়ন্ত্রণে আনা দরকার। মানে একটা জীবনে বিরাট কিছু পরিবর্তন নাও হতে পারে, কিন্তু একটা কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন অবশ্যই আসতে পারে। কি করে হবে? যদি ইন্দ্রিয় সংযম না করে, ইন্দ্রিয়ের পেছনে যে দুটো জিনিষ রয়েছে, রাগ আর দ্বেষকে সংযত করতে পারা যায় তাহলেই একটা পরিবর্তন আসবে। যেমন আমার মিষ্টি খেতে খুব ভালো লাগে। এখন গীতা পড়ে আমি বুঝলাম যে আমার লোভের জন্যই আমি এত মিষ্টি খাই, ঠিক আছে আজ থেকে মিষ্টি খাব কিন্তু লোভ করব না। আগে আমি ভোজ বাড়িতে কুড়িটা রসগোল্লা খেতাম, কিন্তু গীতার কথা শোনার পর এখন আমি বিয়ে বাড়িতে এক দিনেই কুড়িটা রসগোল্লা খাওয়া কমাতে পারব না, খাবো কিন্তু লোভ করব না, আমার এটা অনেক দিনের অভ্যাস, একদিনেই কমান যাবে না, যে কটাই খাই না কেন, লোভ করব না। কয়েক দিনের মধ্যে কুড়িটা থেকে কমে পাঁচটায় নেমে আসবে। কিন্তু তাই বলে যে আমার বিষয়ের প্রতি আকর্ষণ একেবারে মিটে

যাবে তা নয়, কিন্তু ওটা আমার নিয়ন্ত্রণে এসে যাবে। যে প্রবৃত্তিটা বন্য প্রবৃত্তি হয়ে গিয়েছিল সেটা কমে আসবে। এখনও খাবো কিন্তু যে শক্তিটা আমাকে টেনে খাওয়ার মধ্যে নামিয়ে দিচ্ছিল সেই রাগ আর দ্বেষের ঠেলার শক্তিটা আস্তে আস্তে কমে আসবে। শাস্ত্র তাই কখনই বলে না যে তুমি মিষ্টি খেও না, তুমি মাংস খেও না, বলছে রাগ আর দ্বেষটাকে আটকাতে, এই দুটোর ফাঁদে পা দিও না। ইন্দ্রিয়ের বিষয় থেকে পালানোটা কোন কাজের কথা নয়, আর ইন্দ্রিয়ের বিষয়ের প্রতি ছুটে যাওয়াটাও কোন গুরুত্ব নয়, গুরুত্ব সব সময় হচ্ছে এই রাগ আর দ্বেষের। আমার ছোটবেলা থেকে যে স্বভাব তৈরী হয়ে আছে সেটা চলে যাবে না, ওটা থাকবে, কিন্তু ওর পেছনে যে শক্তি ঠেলা দিচ্ছে ঐটাকে কমান যায়। গীতা এইটাই বলছে, তুমি ঐটাকে কমাও। এই কথা বলার পর বলছেন –

**শ্রেয়ান্ স্বধর্মো বিগুণঃ পরধর্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ। স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ।।৩৫।।**

অর্জুন তুমি হচ্ছ ক্ষত্রিয়, পূর্ব পূর্ব জন্মের সংস্কার ও স্বভাব অনুযায়ী ক্ষত্রিয় ধর্মে তোমার জন্ম হয়েছে বলে তোমার স্বধর্ম হচ্ছে যুদ্ধ করা। এই যুদ্ধ করতে গিয়ে তুমি যদি মারাও যাও তাও ভালো, কিন্তু অপরের ধর্ম তুমি নিতে যেও না। অর্জুনকে কেন ভগবান অপরের ধর্ম গ্রহণ করতে বারণ করছেন? কারণ, মানুষ যখন নিজের ধর্মকে ত্যাগ করে তখন সেই ত্যাগের পেছনে কাজ করছে সেই রাগ আর দ্বেষ। কিসের দ্বেষ? কেন অর্জুন যুদ্ধ করতে চাইছে না? আমার প্রিয়জনেরা সব মারা যাবে, তাদের প্রতি আমার মোহ আছে, সেই কারণে যুদ্ধের প্রতি দ্বেষ এসে গেছে, তাই ক্ষত্রিয়ের ধর্মকে অর্জুন ত্যাগ করতে চাইছে, আর ভিক্ষা বৃত্তির উপর তোমার রাগ মানে আসক্তি এসে গেছে। কিন্ত যে নিষ্কাম ভাবে কর্ম করছে, রাগ আর দ্বেষ তাকে ধরতেই পারবে না। মহাভারতে ধর্মব্যাধ অনাসক্ত ভাবে নিজের বংশগত পেশা মাংস বিক্রী করছে, তাতে তার কিছু যায় আসছে না। যিনি নিষ্কাম কর্ম করছে, ঠাকুরের কথায় যে পাকাল মাছের মত আছে, সে কাকে মারছে, কাকে কি করছে তাতে তার কিছু আসে যায় না, সে জানে সবটাই ঠাকুরের কাজ।

এই যে আজকাল প্রায়ই বলা হচ্ছে এই কঠোর জাতিপ্রথার বিলোপ হওয়া অবশ্যই দরকার। কিন্তু যখনই সব কাজ ঠাকুরের কাজ বলে মনে হবে তখন এই জাতিপ্রথাকে কঠোর বলে কখনই মনে হবে না। কারণ আমাদের কাছে যদি ধর্মপ্রাপ্তিই উদ্দেশ্য হয়, তাহলে আমাকে নিষ্কাম কর্ম করতে হবে, আর নিষ্কাম কর্মে কোন কাজই ছোট বড় কিছু নয়। রামকৃষ্ণ মঠের সন্ন্যাসীদের কাছে কোন কাজই ছোট কাজ বা বড় কাজ বলে কিছু নেই। বেলুড় মঠের কিছু কিছু জায়গাতে ব্রহ্মচারীরা ধোওয়া মোছা, ঝাড় দেওয়ার কাজ করে, সন্ন্যাসীরা সাধারণত ঐ কাজে যান না। কিছু দিন আগে ঠিক করা হয়েছে ঠাকুরের মূল মন্দিরে সন্ন্যাসীরাও বিকেল তিনটে থেকে চারটে ধোওয়া মোছার কাজ করবেন। অনেক সিনিয়র মহারাজরা ফাঁকা থাকলে তাঁরাও কাজে হাত লাগান, তাঁদের দেখে আবার জুনিয়র মহারাজরাও খুব উৎসাহ পান। এখানেও সেই গীতার কথা *যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ*, প্রতিফলিত হচ্ছে। সিনিয়র মহারাজরা যখন ঝাঁটা মারছেন তাহলে এই কাজে কোন দোষ নেই, তখন আরও সবাই বেশি করে কাজ করতে এগিয়ে আসবে। যখন আমার মনে এই ভাবটা এসে যাবে যে, ঈশ্বর দর্শনের ক্ষেত্রে নিষ্কাম কর্মের বিরাট ভূমিকা আছে, তখন আমি বই লিখি, কিংবা মন্দিরে ঝাঁটা দিচ্ছি, কি রান্নঘরে রান্না করছি, কি পরিবেশন করছি, কিংবা লেকচার দিচ্ছি সব কাজই তখন ঈশ্বরের পূজা। গীতাতে বারবার বলা হচ্ছে, আগে তুমি তোমার জীবনের উদ্দেশ্যটা পরিষ্কার কর। উদ্দেশ্য যদি পরমার্থ প্রাপ্তি হয়, তাহলে সব কর্মই সমান। What we do is not important, how we do is important. পুরো কর্মযোগ শেষে এই একটা বাক্যে গিয়ে দাঁড়িয়ে যায়, আমি কি কাজ করছি সেটার কোন দাম নেই, আমি কাজটা কিভাবে করছি সেটাই হচ্ছে মূল কথা। কর্মযোগের সার কথা এটাই।

তিরিশ বছর আগে পর্যন্ত ভারতে এইটাই ধারণা ছিল, সে কেরানিগিরি করছে না প্রফেসারি করছে কেউ দেখতে যেত না। তখনকার দিনে কেউ যদি ঘুষ নেয় জেনে যেত তাহলে তখনকার সমাজ তাকে ত্যাজ্যই করে দিত, নিজের মেয়েকে বিয়ে পর্যন্ত দিতে চাইত না ঐ রকম বাড়িতে। আর এখন যদি ঘুষ না নেয় তাহলে তো তার কপালে মেয়েই জুটবে না। মেয়ের বাবা বলবে – কি বাবা, তুমি ঘুষ নাও না, তাহলে আমার মেয়েকে চটি কিনে দেবে কি করে, আমার মেয়ে যে চটি পড়ে তার দামই তো পাঁচ হাজার টাকা। প্রথম থেকেই ভারতে কর্মযোগ হচ্ছে আদর্শ। আমি মুচিগিরি করছি কি, পুরোহিতগিরি করছি, না পাণ্ডিত্যগিরি করছি, এগুলোর কোন দাম নেই। যারা জাতিধর্মকে নিন্দা করছেন তারা ভারতের এই আদর্শকেই ভুলে গেছেন। আমাদের জাতীয় জীবনের ভাবই হচ্ছে পরমার্থ জ্ঞান লাভ করা। পরামার্থ জ্ঞানে ব্রাহ্মণ শূদ্রের কোন পার্থক্য নেই। স্বামীজী এই কথাই বলছেন – যে রাজা তাকে মুচি বানিয়ে দাও, যে মুচি তাকে রাজা বানিয়ে দাও, এবার দেখো ঐ জায়গাতে এরা দুজন কিভাবে কাজ করছে। রাজা যদি নিষ্কাম কর্মের ভাবকে নিয়ে কাজ করতে সক্ষম হয় তখন সে যদি মুচিগিরি করে তখন একটা সুন্দর জুতো বানাতে রাজার পক্ষে কোনই অসুবিধাই হবে না। মুচিও যদি অনাসক্ত হয়ে নিষ্কাম ভাব নিয়ে কাজ করে থাকে তাহলে সেও কিন্তু রাজার কাজ ভালো ভাবে চালিয়ে দিতে পারবে। *যোগঃ কর্মসু কৌশলম্*, কি কৌশল অবলম্বন করতে বলছেন? নিষ্কাম ভাবের কৌশল, অনাসক্ত হওয়ার কৌশল। যার উদ্দেশ্য আধ্যাত্মিক জ্ঞান সে কখনই চিন্তা করবে না যে তাকে কি কাজ করতে হচ্ছে। অনাসক্ত হওয়া মানে ফাঁকিবাজি করে, দায়সারা

ভাবে কাজ করতে বলা হচ্ছে না, মন ও শরীরের পুরো শক্তিকে কাজের মধ্যে ঢেলে দিয়ে সুন্দর ভাবে নিখুঁত ভাবে, যতটা পারা যায় ত্রুটিমুক্ত ভাবে কাজ করা।

কিভাবে করবে? *অহং কর্তা, ঈশ্বরায় ভৃত্যং করোমি,* মুচি যখন জুতো বানাচ্ছে তখন সে ভাববে আমি ঠাকুরের শ্রীচরণের জন্য চটি বানাচ্ছি, ঈশ্বরের ভৃত্য হয়ে খুব সুন্দর করে চটি বানাচ্ছি। আজকাল বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে মানুষকে যে যে কাজে নিয়োগ করা হয়েছে, কেউই তার নিজের ক্ষেত্রে ঠিক মত কাজ করতে চায় না, কেন করবে সে? তার কাছে তো আধ্যাত্মিক জীবন লক্ষ্য নয়, তার কাছে শরীর মনই সব কিছু। এরা এখন কুকুর বেড়ালের স্তরে চলে গেছে, এদের যতটা উপরে ওঠার কথা সেটা হয়ে গেছে, এখন তাদের নীচের দিকে নামার সময় এসে গেছে। বেশির ভাগ মানুষের কাছে শরীর মনটাই আদর্শ হয়ে গেছে, পশুরাও নিজেদের শরীরের চাহিদা অনুসারেই কাজ করে। এত কিছু শোনার পর অর্জুনের মনে আবার প্রশ্ন এসেছে।

অর্জুন উবাচ

**অথ কেন প্রযুক্তোহয়ং পাপং চরতি পুরুষঃ। অনিচ্ছন্নপি বার্ষ্ণেয় বলাদিব নিয়োজিতঃ।।৩৬।।**

হে ভগবান, মানুষ কেন পাপ কাজে প্রবৃত্ত হয়? মানুষ পাপ করতে চায় না, কিন্তু তা সত্ত্বেও কি একটা শক্তি মানুষকে পাপের দিকে যেন জোর করে টেনে নিয়ে যায়। শরতের আকাশের সাদা পেঁজা মেঘগুলোকে বাতাস যেমন উড়িয়ে নিয়ে চলে যায়, সেই রকম মানুষকেও পাপ যেন টেনে নিয়ে যায়। কোন্ জিনিষটা মানুষকে এই পাপের দিকে বলপূর্বক টেনে নিয়ে যাচ্ছে? ভগবান অর্জুনের প্রশ্নের উত্তরে বলছেন -

শ্রীভগবানুবাচ

**কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভবঃ। মহাশনো মহাপাপ্মা বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণম্।।৩৭।।**

তমোগুণী মানুষ কোন কাজই করে না, তারা জড়, পাথরের মত স্থবির। এই জন্য তমোগুণী মানুষ থেকে কোন ঝামেলাও হয় না। আমরা অনেককে বলি উনি কি ভালো লোক, কোন জিনিষের দিকে লোভ নেই। ভালো করে দেখলে দেখা যাবে যে সে এমন তমোগুণী যে ভালো জিনিষের দিকে তাকাবার জন্য চোখ খোলারও ক্ষমতা নেই। কিন্তু ঝামেলা হয় রজোগুণী লোকদের নিয়ে। রজোগুণের দুটো সন্তান কাম আর ক্রোধ। এই কাম আর ক্রোধ রজোগুণীকে নানা দিকে দৌড় করাতে থাকে। এরা হচ্ছে আগুনের মত *মহাশনঃ,* আগুনের মত দুষ্পূরণীয়, কাম আর ক্রোধ আগুনের মত সব কিছুকে গিলে ফেলে। এই দুটোর দাদা হচ্ছে তমোগুণ, তমোগুণ আর সত্ত্বগুণ দেখতে এক রকম। তমোগুণীকে বাইরে থেকে মনে হবে সে কখন মিথ্যে কথা বলে না, চুরি করে না, কিন্তু তমোগুণীর চুরি করার ক্ষমতাই নেই, মিথ্যা কথাও বলতে পারবে না। বেশির ভাগই হচ্ছে তমোগুণী, এদের দ্বারা কোন কাজই হবে না, ভগবান লাভের তো কোন প্রশ্নই নেই। তমোগুণ থেকে রজোগুণে যখন আসবে তখন তার মধ্যে প্রথমে অনেক রকমের গোলমাল দেখা দেবে, এখানে চুরি করছে, ওখানে জোচ্চুরি করছে, সেখানে চালবাজি করছে। রজোগুণী এগুলো কেন করছে? সে কি নিজে থেকে করছে? না, কাম আর ক্রোধ এই দুটো রজোগুণীকে ধাক্কা মেরে মেরে করাচ্ছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে ভগবান বলেছিলেন, *কামাৎ ক্রোধোহভিজায়তে,* ক্রোধ কাম থেকে জন্ম নিচ্ছে। এই কাম আর ক্রোধ আসলে রাগ আর দ্বেষ থেকে হয়। একটা বাসনা এসে আমাদের ঘিরে ফেলে, আমাকে পাঁচ জন লোক জানুক, মানুক, তখন যদি কেউ কটূ কথা বলে আমার তখন ক্রোধ এসে যাবে। এই ক্রোধের বশবর্তি হয়ে আমি হয়তো কোন পাপ কাজ করে বসলাম। পাপ কর্মের পেছন আছে কাম আর ক্রোধ, কাম আর ক্রোধের পেছনে আছে রজোগুণ। কিন্তু তা সত্ত্বেও রজোগুণী তমোগুণীর থেকে অনেক ভালো।

**ধূমেনাব্রিয়তে বহ্নির্যথাদর্শো মলেন চ। যথোল্বেনাবৃতো গর্ভস্তথা তেনেদমাবৃতম্।।৩৮।।**
**আবৃতং জ্ঞানমেতেন জ্ঞানিনো নিত্যবৈরিণা। কামরূপেণ কৌন্তেয় দুষ্পূরেণানলেন চ।।৩৯।।**

ধোঁয়া যেমন আগুনকে আচ্ছাদিত করে রাখে, ময়লা যেমন আয়নার কাঁচকে মলিন করে দেয় আর জরায়ুর দ্বারা গর্ভ যেমন আচ্ছন্ন থাকে, ঠিক সেই রকম যা কিছু কাজ কর্ম হয় সব এই কাম আর ক্রোধ দিয়ে সেই কাজে কর্তার বিবেক বুদ্ধিকে আবৃত করে রাখে। তাই জ্ঞানীদের কাছে কাম আর ক্রোধ সব সময়ের শত্রু। *জ্ঞানিনো নিত্যবৈরিণার* ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে শঙ্করাচার্য জ্ঞানী, অজ্ঞানী আর বিজ্ঞানীর তফাৎ করে বলছেন – বিজ্ঞানীর কখনই কোন কিছুতেই বেতালা পা পড়বে না, অজ্ঞানীর ক্ষেত্রে কি হয়, যখন সে ভোগ করে সব কিছুই তার অমৃতের মত মনে হয় আর ভোগের মধ্যে একেবারে ঝাঁপিয়ে পড়ে, পরে তার শরীর খারাপ হয়, মানে এই ভোগের ফলটা পরে বিষের মত আসে। বিজ্ঞানী ভোগের দিকে যাবেই না, আর অজ্ঞানীর কোন কিছুর তৃষ্ণা এলে ভোগে একেবারে ঝাঁপিয়ে পড়বে, পরে যখন ভোগের ফলট বিষ হয়ে ফিরে আসবে তখন সে বলবে হায় একি হল আমার। জ্ঞানীও ভোগ করতে যায় কিন্তু যখন ভোগ করতে যায় তখনও, যখন ভোগ করে তখনও আর ভোগের পরেও বলবে, ছি ছি ছি, আমি এটা কি করছি, আমার মনে যে কাম আর ক্রোধ আছে, আমার ভেতরে যে রাগ আর দ্বেষ আছে, এরাই আমাকে দিয়ে এইসব উল্টোপাল্টা

কাজ করাচ্ছে। আর মনের মধ্যে সব সময় খোঁচাতে থাকবে আমি কিভাবে এইটা থেকে বেরোতে পারব। জ্ঞানীও ভোগে নেমে পড়ে, কিন্তু সে জানে যে আমার আগের আগের জন্মের যত রকমের কাম আর ক্রোধ জমে আছে, এগুলোই আমাকে দিয়ে এই সব আজেবাজে কাজ করাচ্ছে, আমাকে যে করেই হোক এখান থেকে বেরোতে হবে। এই রকম ভেবে নিয়ে সে আর কখন ভোগ করতে যাবে না যে তা নয়, আবার সে ভোগে নেমে আসবে, কিন্তু এখন সে নিজকে খুব সংযমিত করে রেখেছে। জ্ঞানী বুঝতে পারছে যে আমার পূর্ব পূর্ব সংস্কার গুলি আমাকে দিয়ে এইসব করাচ্ছে। করার আগেও সে ভালো ভাবে ভোগ করবে না, ভোগের সময়ও আনন্দ পাবেনা, আর ভোগের পরে তো তার মনটা খারাপ হয়ে যাবে। যা ভোগ করতে এসেছিল ভোগ করার পর বলবে, এগুলো আমার মধ্যে ছিল ভালোই হল এগুলো বেরিয়ে গেল। কিন্তু যারা অজ্ঞানী ভোগের অনেক আগে থেকেই কত রকমের পরিকল্পনা করতে থাকবে।

মথুরার দিকে একটা খুব মজার গল্প প্রচলিত আছে, মথুরার দিকে প্রচুর ভাণ্ডারা হয়, এই গল্পটাও সেই ভাণ্ডারা নিয়ে। একবার একটা ভাণ্ডারা হয়েছে তাতে কয়েকজন পাণ্ডা কোন কারণে যেতে পারেনি। তখন বিকেলের দিকে সেই পাণ্ডার খোঁজ নিতে যাবে আজকের ভাণ্ডারায় খাওয়াতে কে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। যেতে যেতে রাস্তায় একজন দুজন করে ফিরে আসছে দেখতে পাচ্ছে। কিছু দূর গিয়ে দেখতে পাচ্ছে যে একজনকে চারজন লোক কাঁধের উপরে বসিয়ে চাগিয়ে নিয়ে আসছে। এরা বুঝে গেল যে আজকের ভাণ্ডারাতে এই চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। তখন এরা এসে একে বলছে – ক্যায়া চৌবে, ক্যাইসে কাটো কাট্? মানে চৌবেজী আজকে কেমন হারান হারালে সবাইকে। চৌবেজী তখন খুব দুঃখ করে বলছে – ম্যায় কেয়া কাটো কাট্, ও চৌবে কাটো কাট্ লগ্মে যো আবত হ্যায় খাটো খাট্। মানে, আমি কি চ্যাম্পিয়ন, যাকে খাটে করে আনা হচ্ছে সেই চ্যাম্পিয়ন, আমি এর কাছে কিছুই না। তারপরেই দেখে একটা লোককে খাটে করে নিয়ে আসা হচ্ছে। এরাও তখন তার কাছে দৌড়ে গিয়ে বলছে, ক্যায়া চৌবে ক্যাইসে কাটো কাট্। এও খুব দুঃখ করে বলছে – ম্যায় কেয়া কাটো কাট্, ও চৌবে কাটো কাট্ পোঁছা যো শ্মশান ঘাট। যে শ্মশান ঘাটে পোঁছে গেছে সে হচ্ছে চ্যাম্পিয়ন। অজ্ঞানীরা এই রকমই হয়, যখন ভোগ করতে নেমে পড়ে তখন কোন হুঁশ থাকে না, তারপরেই হয় মরে নাহলে নড়াচড়ার ক্ষমতাই থাকে না। আবার যখন সোজা হয়ে যাবে তখন আগের কষ্ট সব ভুলে গিয়ে আবার ভোগের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়বে।

কাম আর ক্রোধ এই দুটোই হচ্ছে প্রধান শত্রু। এরা কোথায় থাকে? ভগবান বলছেন -

**ইন্দ্রিয়াণি মনো বুদ্ধিরস্যাধিষ্ঠানমুচ্যতে। এতৈর্বিমোহয়ত্যেষ জ্ঞানমাবৃত্য দেহিনম্**।।৪০।।

এই কাম আর ক্রোধের অধিষ্ঠান কোথায় কোথায়? বলছেন – ইন্দ্রিয়, মন আর বুদ্ধি হচ্ছে কাম আর ক্রোধের অধিষ্ঠান। একবার যদি জেনে নেওয়া যায় আমার শত্রু কোথায় লুকিয়ে আছে, তখন সেই শত্রুকে নাশ করা অত্যন্ত সহজ হয়ে যায়। যত রকমের কাজ হতে থাকে সবার উৎস হচ্ছে এই কাম আর ক্রোধ। সেইজন্য তমোগুণ থেকে কোন সমস্যা হয় না, কিন্তু যারা রজোগুণী তাদেরই সমস্যা হয়, সমস্যাটা হচ্ছে কাম আর ক্রোধ। কাম আর ক্রোধ কেন হচ্ছে? রাগ আর দ্বেষ এই দুটোর জন্য। মূলতঃ কাম আর ক্রোধ রাগ আর দ্বেষের সাথে জড়িয়ে আছে। কাম আর ক্রোধের তিনটে বাসস্থান, ইন্দ্রিয়, মন আর বুদ্ধি। আমাদের এই বাইরের চোখ, কান, নাক এগুলো ইন্দ্রিয় নয়, আসল ইন্দ্রিয় হচ্ছে মস্তিষ্কের বিভিন্ন স্নায়ু কেন্দ্রে অবস্থিত, আর এগুলো হচ্ছে তার যন্ত্র। মন আর বুদ্ধিরও কেন্দ্র হচ্ছে মস্তিষ্কে। ইন্দ্রিয়ের যত যন্ত্র এগুলো নার্ভ সেন্টারের মাধ্যমে মস্তিষ্কে গিয়ে বসে আছে। এই মস্তিষ্কেরই একটা বিশেষ কাজকে ইন্দ্রিয় বলা হচ্ছে, আরেকটা বিশেষ ধরণের কাজকে মন বলছে, সেই মস্তিষ্কেরই আরেকটা বিশেষ কাজকে বুদ্ধি বলা হচ্ছে। এই মস্তিষ্কই যখন স্থূল শরীরের মাধ্যমে বাইরে থেকে তথ্য আহরণ করে মস্তিষ্কের স্নায়ুকেন্দ্রে পাঠাবার কাজ করছে তখন তাকে বলছে ইন্দ্রিয়। মস্তিষ্ক যখন চিন্তা ভাবনা রূপে কাজ করছে, এটা করব কি করব না, ওখানে যাবো কি যাবো না, এই ধরণের যে চিন্তা গুলি করছে এটাকে বলা হচ্ছে মন। এরাও তথ্য আহরণ করছে, কিন্তু সূক্ষ্ম শরীরের মাধ্যমে যে তথ্য সংগ্রহ হচ্ছে তাকেই বলা হচ্ছে চিত্ত। আর মনকে যখন বলে দিচ্ছে এটাই করতে হবে, এটাই ঠিক, এই ঠিক করে দেওয়ার কাজটা হচ্ছে বুদ্ধির। এই চিত্ত, মন, বুদ্ধি আর অহঙ্কার, এদের মধ্যে অহঙ্কার সব সময় রাগ আর দ্বেষ থেকেই আসে। অহঙ্কার ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির মাধ্যমে কাজ করায়। যদি অহঙ্কারের নাশ করতে বলা হয় তখন ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধিকে নিয়ন্ত্রণে আনতে হবে। কেননা অহঙ্কারের কিছু করার নেই, আর চিত্তের কাজ শুধু বৃত্তি তৈরী করা, তাই চিত্তকে নিয়ন্ত্রণ করে কোন লাভ নেই। অহঙ্কারটা হচ্ছে আমাদের সমস্যা, এর বাস হচ্ছে এই তিনটেতে ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধিতে।

যে খেতে খুব ভালোবাসে, এখন সে বিয়ে বাড়ির নেমন্তন্ন পেলেই সেখানে চলে যাবে। বিয়ে বাড়িতে নিয়ে যাওয়াতে কার বড় ভূমিকা? তার দুটো পায়ের। পা দুটো যদি বলে দেয় আমি যাবো না, তখন তো আর তার বিয়ে বাড়িতে যাওয়া হবে না। এখন সে যদি বলে আমি আর ভোজ খেতে যাব না, তখন পাকে বলে দেবে আমার পা যাবে না। রাগ আর দ্বেষ কোথায় ঢুকে আছে? মন আর বুদ্ধিতে। মন বলছে যাবো কি যাবো না, বুদ্ধি বলছে এবারের মত চল। বুদ্ধি যখন বলে দিল তখন আর কোন সমস্যাই নেই। এখন যদি কোন কারণে পা খোঁড়া হয়ে যায় তখন বুদ্ধি বললেও যেতে পারবে না, এগুলো হচ্ছে স্থূল ইন্দ্রিয়ের ব্যাপার। এখন যিনি

সাধক তাকে বলা হচ্ছে তোমার ইন্দ্রিয়গুলোর ছুটোছুটি দাপাদাপি বন্ধ করতে হবে। তাহলে কি সাধক চোখে ফেট্টি দিয়ে, কানে সিসা ঢেলে, পা খোঁড়া করে চুপ করে বসে থাকবে? না, এগুলো করতে বলা হচ্ছে না। মস্তিষ্কে যে প্রতিক্রিয়া হচ্ছে ঐটাকে আটকে দিতে বলা হচ্ছে, যেমন বাইরে ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে উত্তেজনা আসছে, সেই উত্তেজনা নার্ভের মাধ্যমে মস্তিষ্কে যাচ্ছে, মস্তিষ্কে গিয়ে সে ঠিক সেই উত্তেজনাটা বাইরে ছুঁড়ে দিচ্ছে, এই বাইরে ছুঁড়ে দেওয়াটাকে আটকাবার কথা বলা হচ্ছে। তার থেকে আরও বড় ব্যাপার হচ্ছে এই প্রতিক্রিয়ার সাথে যখন কামনা বাসনা গুলো জুড়ে যায় তখন সাধককে পুরো বিধ্বস্ত করে দেয়। তাই বলছেন –

**তস্মাত্ত্বমিন্দ্রিয়াণ্যাদৌ নিয়ম্য ভরতবর্ষভ। পাপ্মানং প্রজহি হ্যেনং জ্ঞানবিজ্ঞাননাশনম্।।৪১।।**

যদি ইন্দ্রিয়কে সংযম না করা হয়, মনকে যদি সংযত না কর, আর বুদ্ধিকে যদি প্রশিক্ষণ না দেওয়া হয় তাহলে তোমার জ্ঞান ও বিজ্ঞান দুটোই চলে যাবে। শঙ্করাচার্যের এই জ্ঞানের ব্যাখ্যা দিচ্ছেন – আত্ম ও অনাত্ম, বিদ্যা ও অবিদ্যার বিভেদকে আলাদা করে ধরতে পারাটাই জ্ঞান। কিভাবে এই জ্ঞান আসবে? শাস্ত্র আর আচার্যের উপদেশ থেকে। তাহলে জ্ঞান শব্দের ঠিক ঠিক অর্থ হচ্ছে, শাস্ত্র ও আচার্যের উপদেশিত আত্মা ও অনাত্মার বিভেদ। বিজ্ঞান শব্দের অর্থ হচ্ছে – এই বিভেদকে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করা। গীতাতে জ্ঞান ও বিজ্ঞান শব্দ দুটি প্রায়ই ব্যবহার করা হয়েছে। কথামৃতেও ঠাকুর অনেকবার এই জ্ঞান ও বিজ্ঞান শব্দ দুটি ব্যবহার করেছেন। গীতাতে অনেক শ্লোকে জ্ঞান শব্দটাকে বিজ্ঞানের অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে আবার অনেক সময় জ্ঞানকে এই জ্ঞানের অর্থে নিয়ে আসা হয়েছে, আবার কোন কোন সময় জ্ঞান শব্দটাকে শুধু মাত্র শাস্ত্রজ্ঞান রূপেও ব্যবহার করা হয়েছে। সেইজন্য গীতার অনেক শ্লোক নিজে পড়তে গেলে অন্য রকম অর্থ মনে হবে। কিন্তু বিজ্ঞানকে সব সময় বিজ্ঞানের যা প্রকৃত অর্থ সেই অর্থেই ব্যবহার করা হয়েছে আর অজ্ঞান মানে সব সময় অজ্ঞানের অর্থেই উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্ত জ্ঞান বিভিন্ন সময় বিভিন্ন অর্থে নেওয়া হয়েছে।

এই যে আমরা এখন শাস্ত্র অধ্যয়ণ করছি, এখন আমরা অজ্ঞান থেকে জ্ঞানের দিকে যাচ্ছি। তারপর আমার যখন দৃঢ় ধারণা হয়ে যাবে যে ঠাকুর ছাড়া আর সবই হচ্ছে অনিত্য, যখন যে কোন ধরণের ভোগ করতে গিয়ে শরীরটা ঘিনঘিন করবে, অথচ আমি বেরোতে পারছি না, যখন আমার মনের প্রত্যেকটি আচরণে ধরতে পারব যে এই আমি রেগে যাচ্ছি, এই আমার ক্রোধ আসছে, এই আমার লোভ হচ্ছে, যখন মনকে বলতে পারব – মন এইটাই হচ্ছে *কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে*, তখনই কিন্তু আমি জ্ঞান থেকে বিজ্ঞানের অবস্থার দিকে যাচ্ছি।

আমরা কামনা বলতে সব সময় কামিনী-কাঞ্চনকে মনে করি, কিন্তু কামিনী-কাঞ্চনের বাইরেও হাজারটা কামনা থাকে। আমাকে সবাই মানি ও জানি যে, এইটাও কাম। আর যখনই কোন ক্রোধ এসেছে, এমন কি যদি মান-অভিমানও হয়ে থাকে তখনই বুঝতে হবে যে কোথাও আমার একটা কাম জেগেছিল সেই কামটা কোন ভাবে প্রতিহত হওয়াতেই এই জিনিষ গুলো হচ্ছে। অনেক শাস্ত্র অধ্যয়ণ করতে করতে আর আচার্যের উপদেশ শুনতে শুনতে মনটা এইসব ব্যাপারে খুব সজাগ হয়ে যায়। কি ব্যাপারে সজাগ হচ্ছে? এই যে বলা হল আত্ম আর অনাত্ম এবং বিদ্যা আর অবিদ্যা এই দুটোর ব্যাপারে।

তাই বলে কি জ্ঞানীর কাম ও ক্রোধ থাকবে না? নিশ্চয়ই থাকবে। সাধারণ মানুষের কাম ক্রোধ আর জ্ঞানীর কাম ক্রোধের পার্থক্য শুধু গভীরতা আর স্থায়ীত্বে। জ্ঞানী বুঝতে পারেন আমি রেগে গেছি, অজ্ঞানী বা সাধারণ মানুষ বুঝতেই পারেনা যে আমি রেগে গেছি। কাম নেই ক্রোধ নেই একমাত্র মরা মানুষের। জ্ঞানী ও বিজ্ঞানীরও ক্রোধ হবে, স্বয়ং ভগবান অর্জুনকে এতো উপদেশ দিলেন, তারপর পিতামহ ভীষ্ম যখন এমন তীর মারতে শুরু করলেন যে অর্জুন সামলাতেই পারছিল না, তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ রেগে গিয়ে পিতামহ ভীষ্মকে আজকেই শেষ করে দেব বলে রথ থেকে যেই নেমে পড়েছেন, অর্জুন গিয়ে শ্রীকৃষ্ণকে বলছেন, আপনি এ কি করতে যাচ্ছেন প্রভু। অর্জুন যেমনি বললেন শ্রীকৃষ্ণ সঙ্গে সঙ্গে ফিরে এলেন। আর অর্জুন যদি নাও বলত তাহলে কি হত? কিছুই হত না, আরও দু'পা গিয়ে নিজেই ঠাণ্ডা হয়ে ফিরে চলে আসতেন। কাম ক্রোধকে নিয়ন্ত্রণ করা মানে এইটাই। কাম আর ক্রোধ যে কখনই আসবে না সেটা বলা হচ্ছে না। কাম আর ক্রোধ উঠবে না যে বলা হচ্ছে, এর অর্থ হচ্ছে উঠলেই জ্ঞানী সজাগ হয়ে যান। আবার অনেক সময় এনাদের ক্রোধ যখন ওঠে তখন প্রয়োজনে সেই ক্রোধকে প্রকাশ করতেই হয়। শ্রীরামচন্দ্রও ক্রোধকে প্রকাশ করেছেন, মহম্মদও প্রকাশ করেছেন। কিন্তু সেটার পেছনে অন্য কারণ আছে। লোভ জনিত, স্বার্থজনিত কোন ক্রোধের প্রকাশ হচ্ছে না, এখানে সবটাই হচ্ছে পরমার্থের জন্য, এই যে যুদ্ধ হচ্ছে ঈশ্বরের জন্যই আমাকে যুদ্ধ করতে হচ্ছে এবং যুদ্ধে আমার ক্রোধকেও প্রকাশ করতে হচ্ছে। এই জিনিষ গুলোকে কেউ মুখে বলে দিলে ধরতে পারবে না। যেমন যেমন সে সাধন জীবন যাপন করবে তেমন তেমন এগুলোও পরিষ্কার হয়ে যাবে। সব উত্তর কিন্তু শেষ পর্যন্ত ঠাকুরের কাছ থেকেই আসে। ভালো করে জপ ধ্যান করলে ঠাকুরই সব উত্তর দিয়ে দেবেন।

এটা অত্যন্ত খাঁটি কথা, কারণ যে কোন উত্তর যদি ঠাকুরের মুখ থেকে সাক্ষাৎ না আসে ঐ উত্তরে কোন দিনই আমার সংশয় দূর হবে না। যেদিন ঠাকুর সামনে বসে শিক্ষা দেবেন সেই শিক্ষাটাই শিক্ষা আর বাকি সব অসার, সেইজন্যই বলা হয় সব

বিদ্যাই হচ্ছে অপরা বিদ্যা, পরা বিদ্যা হচ্ছে সেটাই যেটা ভগবান নিজে শিক্ষা দেন। বেদ, গীতা, উপনিষদ, কথামৃত সবই অপরা বিদ্যা। তার মানে আগে গুরু যেটা বলে দিয়েছেন, শাস্ত্র যেটা বলছে সেই কথাতে আপাততঃ বিশ্বাস রেখে সাধনার পথে এগিয়ে যেতে হবে, সাধনা করে করে ঠাকুরের দর্শন করে, দর্শন মানে চোখ বন্ধ করে বাইরেও অন্ধকার ভেতরেও অন্ধকার দেখা নয়, সামনে এসে ঠাকুর বলবেন – বল তোমার আজ কি প্রশ্ন। আমার এই প্রশ্ন। ঠাকুর বলবেন এই প্রশ্নের এই উত্তর, তখন পরিষ্কার হবে, তার আগে হবে না। সুফি সাধকদের জীবনী পড়লে, খ্রীশ্চান মিস্টিক সাধকদের জীবনী পড়লে দেখা যাবে, সবাই এই একই কথা বলছেন। জ্ঞান ও বিজ্ঞানের ব্যাখ্যাতেও শঙ্করাচার্য এই কথাই বলছেন। গীতা পড়ে গীতা কি বলতে চাইছে এইটাকে ধারণা করার নাম হচ্ছে জ্ঞান, আর ঠাকুর এসে যখন নিজে বলবেন তখনই ঐটা বিজ্ঞান। ঠাকুর না আসা পর্যন্ত বিজ্ঞান হবে না। ঠাকুরই বলছেন জ্ঞানী ভয় তরাসে, জ্ঞানী সব সময় ভয়ে থাকে কখন পতন হয়ে যাবে ঠিক নেই। এই দেখছি বিরাট সাধু, কত লেকচার, কত ভক্ত, কি সুন্দর সব বুঝিয়ে দিচ্ছেন, তার কিছু দিন পরে খবরের কাগজে ঐ সাধুর নামে একটা কেচ্ছা বেরিয়ে গেল। এইটাই স্বাভাবিক, বিজ্ঞানী যতক্ষণ না হচ্ছে ততক্ষণ পতনের সম্ভবনা থাকবেই, তবে হ্যাঁ, অজ্ঞানীর থেকে তিনি অনেক উপরে। যারা এইসব জ্ঞানীদের পতন দেখে তির্যক দৃষ্টিপাত করে, তাদের বাপ ঠাকুর্দাও কিন্তু ঐ অবস্থায় পৌঁছতে পারবেন না যেখানে উনি পৌঁছে গেছেন। আর এই পতনের পর জ্ঞানী এবার যেখানে এগিয়ে যাবেন, সেখানে পৌঁছান আমাদের মত সাধারণের লোকের পক্ষে সম্ভবই নয়।

জ্ঞানী যত উপরে উঠছেন ততই তাঁর পা টলমল করে পড়ে যাবার সম্ভবনা বেশি হবে। আমরা যখন পায়ে হাঁটছি তখন পা স্লিপ করে পড়ে যেতে পারি। এখন যদি চার ফুটের রণপা নিয়ে হাঁটি তখন পড়ে যাওয়ার ভয়টা আরও বেড়ে গেল। আর যদি পনের ফুট লম্বা রণপা নিয়ে হাঁটি, তখন ব্যালেন্স আরও কঠিন হয়ে যাবে। যদিও আমাকে বিরাট উঁচু দেখাচ্ছে কিন্তু যে কোন মুহুর্তে আমার পড়ে যাওয়ার সম্ভবনা রয়েছে। আর রণপাটাকে যদি একশ ফুট করে দেওয়া হয়, তাহলে আমার ব্যালেন্স কিন্তু তখন পুরো টলমল করবে, যখন তখন পড়ে যেতে পারি, আর পড়া মানে মুখ থুবড়ে পড়ে কি হবে ভাবাই যাবে না। আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে এই রণপা দিয়ে বিরাট উঁচু একটা পঁচিলকে ডিঙিয়ে যাওয়া, পাঁচিলটাকে যদি কোন রকমে টপকে যেতে পারি তাহলেতো কেল্লা ফতে হয়ে গেল। কিন্তু শেষ মুহুর্ত পর্যন্ত আমার ভয় থাকবে। এইটাই হচ্ছে জ্ঞানীদের সমস্যা। এই সমস্যার ব্যাপারটা সাধারণ লোকের ধারণা করা সম্ভবই নয়। এই যে এইখানে ভগবান বললেন - *পাপ্মানং প্রজহি হ্যেনং জ্ঞানবিজ্ঞাননাশনম্, জ্ঞানবিজ্ঞাননাশনম্* হচ্ছে এই ধরণের পাপ কর্ম তোমার জ্ঞানকে তো নাশ করেই দেবে আর সাথে সাথে *বিজ্ঞান নাশনম্* মানে বিজ্ঞানী হতে দেবে না। বিজ্ঞানীর কখন নাশ হয় না, যার প্রত্যক্ষ অনুভূতি হয়ে গেছে আর তার কখন নাশ হবে না। এখন বলছেন এগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করবে কিভাবে?

**ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুরিন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ। মনসস্তু পরা বুদ্ধির্যো বুদ্ধেঃ পরতস্তু সঃ।।৪২।।**

এই শ্লোকটি খুব উল্লেখনীয় একটি শ্লোক, এটা হচ্ছে মা ও ছেলের সম্পর্ক। এখন উদ্দেশ্য হচ্ছে কাম আর ক্রোধকে আটকানো বা রাগ আর দ্বেষকে আটকানো। রাগ হচ্ছে, যে জিনিষটাকে দেখলেই আমি ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইছি। এই ব্যাপারে সব থেকে বিপজ্জনক হচ্ছে বিষয়। রাগ আর দ্বেষের যত গোলমাল হচ্ছে বিষয় থেকে, তাহলে বিষয় গুলিকে সরিয়ে দিলেই হল। ঠাকুর বলছেন কামিনী-কাঞ্চনই মায়া, বেলুড় মঠের ঘেরাটোপের মধ্যে কামিনী-কাঞ্চনে মন দেবার সুযোগই নেই। তার মানে রাগ আর দ্বেষ নিয়ন্ত্রণে এসে গেল। কিন্তু ভেতরে এই কামিনী-কাঞ্চনের বীজতো গিজ্‌গিজ্ করছে। সেইজন্য বলছেন বিষয়কে সরিয়ে দিলেই হবে না, দ্বিতীয় অধ্যায়েই ভগবান বলেছিলেন – *বিষয়াবিনিবর্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ*। এই বিষয়ের প্রতি ইন্দ্রিয় সবার আগে ধাবিত হচ্ছে। ইন্দ্রিয়কে কে নাচাচ্ছে? মন নাচাচ্ছে, ইন্দ্রিয়ের মালিক হল মন। আবার এই মনকে নাচাচ্ছে বুদ্ধি। বুদ্ধি কি করে? বুদ্ধি মনকে বলছে – সব ব্যবস্থা করা আছে, পুলিশে ধরবে না, বাড়িতে খবর পাবে না, কোন চিন্তা নেই, সব ঠিক করা আছে, চল এই বদমাইসিটা করে নেওয়া যাক। আজকাল প্রায়ই খবরের কাগজে দেখা যায় যে বড় বড় শহরের ইয়ং ছেলেমেয়েরা কোন ফার্ম হাউসে গিয়ে নানা রকমের নেশা ভাং করতে গিয়ে মারা যাচ্ছে। এখন ইয়ং ছেলেমেয়েরা ভালো মত জানে ড্রাগস্ খাওয়া নিষেধ আছে। ড্রাগস নেওয়ার আগে মন দোনমোনা করছে, বাবা-মা যদি জানতে পারে, পুলিশ যদি খবর পেয়ে যায়, যদি ধরা পড়ে যাই তখন কি হবে? তখন বুদ্ধি বলবে, না না, পুলিশকে টাকা দেওয়া আছে, আর বাবা-মা জানবে কি করে, দু'ঘন্টা পরেই তো বাবা-মার কাছে ফিরে যাবে। বুদ্ধি বলে দিল, এইবার ও নেমে পড়ল। এরা ধারণা করতে পারছেনা যে, তোমাকে পুলিশ নাই ধরুক, বাবা-মা নাই জানুক কিন্তু তোমার যা সর্বনাশ হবার সেটাতো হয়ে গেল।

ইন্দ্রিয়, বিষয়, মন, বুদ্ধি এই সব কিছুর মালিক হচ্ছেন আত্মা। তোমার প্রধান সমস্যা তৈরী করছে তোমার রাগ আর দ্বেষ। তাই এই রাগ ও দ্বেষকে সংযম কর। আপাতদৃষ্টিতে এই রাগ ও দ্বেষকে সংযত করার সহজ উপায় হচ্ছে বিষয় থেকে সরে আসা। কিন্তু এটা কোন স্থায়ী সমাধান নয়, এই রাগ ও দ্বেষই আবার রূপ পাল্টে অন্য ভাবে আসবে। তাই বলা হচ্ছে আগে ইন্দ্রিয় সংযম কর। ইন্দ্রিয় সংযম হচ্ছে, যেমনি খবর পেলাম ওখানে ভালো খাবারের ব্যবস্থা করা হয়েছে, তখনই জিহ্বা ইন্দ্রিয়কে আটকে দাও। এটা যদি করতে না পার তাহলে মনের মধ্যে যা সঙ্কল্প বিকল্প আসছে আসুক, কিন্তু আমি এটা করব না। এটাকেও যদি না আটকাতে পার তাহলে তুমি যেটা শেষে ঠিক করে নিয়েছ যে ওখানে যাব, এই ঠিক করাটাকে আটকাও।

আগেকার দিনের শিক্ষিত মার্জিত পুরুষ যাঁরা ছিলেন তাঁদের বুদ্ধিটা ছিল পরিমার্জিত। বুদ্ধি মানে আমরা যে অর্থে বিষয়ীর বুদ্ধি মনে করি সেই intelligence এর কথা বলা হচ্ছে না। শাস্ত্র আর আচার্যের কাছে শুনে শুনে যে পরিমার্জিত বুদ্ধি, যে বুদ্ধিকে বলছে decision making faculty, এত পরিষ্কার ছিল যে তাঁদের বুদ্ধি কোন কিছু অনিয়ম বেনিয়মের মধ্যে কখন যাবেই না। যেমন আমরা এখানে যারা শাস্ত্র অধ্যয়ন করতে এসেছি, আমাদের যদি বলা হয় গরুর মাংস খেতে, তাহলে আমরা আঁৎকে উঠব, তার মানে গরুর মাংস খাওয়া না খাওয়ার ব্যাপারে আমাদের যে বুদ্ধি সেটা পরিষ্কার, এখানে সঙ্কল্প-বিকল্প কখনই উঠবে না, ইন্দ্রিয়ের এই ব্যাপারে কোন স্বাধীনতা পাবেই না, ইন্দ্রিয়ের সামনে বিষয় থাকুক আর নাই থাকুক গরুর মাংসের ব্যাপারে কোন প্রশ্নই নেই। অথচ নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের উপর কোন নিয়ন্ত্রণ নেই, বিদেশ বিভুঁইয়ে গিয়ে তারা এখন চুটিয়ে গরুর মাংস খেতে শুরু করেছে। এখানে এদের কাছে শাস্ত্রের কথা গুলোতে শ্রদ্ধা নেই, বুদ্ধি দুর্বল হয়ে গেছে। কিন্তু প্রথমবার বীফ্ মুখে দিতে তারও মন অবশ্যই চঞ্চল হবে। একবার যখন মুখে তুলে নিয়েছে, তখন বুদ্ধির উপর তার সমস্ত নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা চলে গেল। অথচ এদেরই বাবা মা যারা ভারতে আছেন তারা বীফ্ খাওয়ার কথা চিন্তাই করতে পারেন না। ভারতবর্ষে বীফ্ খাওয়ার নামে সরকারের পতন হয়ে যাবে। সামনে কমনওয়েলথ গেমস আসছে, সেখানে ক্রীড়া মন্ত্রীকে লিখিত ভাবে নোটিশ দিতে হয়েছে যে No beef will be served, অথচ আমাদের সন্তানরা আমেরিকাতে গিয়ে বীফ্ খাচ্ছে। কিন্তু বুদ্ধি যদি নিয়ন্ত্রণে এসে যায়, শাস্ত্র যেটা বলে দিয়েছে আমি তার বাইরে যাব না, তখন ইন্দ্রিয়, রাগ, দ্বেষ, কামক্রোধাদি আমাকে কিছুই করতে পারবে না। আর এই শাস্ত্র প্রমাণের উপর একটাই আছে, সেটা হচ্ছে আত্মজ্ঞান। আমি যদি সব সময় আত্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত থাকি, প্রতিষ্ঠিত না হলেও যদি আত্মজ্ঞানের চিন্তন মনন নিয়ে সব সময় থাকতে পারি, তাহলে কখনই এই শত্রুগুলো আমাকে কোন গোলমালের মধ্যে নিয়ে যেতে পারবে না। আমি তো বিশুদ্ধ আত্মা, আমি এগুলো কেন করতে যাব, এই ভাবকে যদি ধরে রাখা যায় তাহলে কখনই কোন গোলমাল হবে না।

বুদ্ধি হচ্ছে সবার মা। একটা ছাগল, তার দুটো তিনটে বাচ্চা, ছাগলকে যদি ধরে নিই তখন বাচ্চা গুলো নিজে থেকেই তাদের মায়ের পেছনে পেছনে যাবে। ইন্দ্রিয় হচ্ছে মনের বাচ্চা, মনের মা হচ্ছে বুদ্ধি। বুদ্ধিকে যদি একবার ধরে নেওয়া যায় তাহলে সব কটা পথে এসে যাবে। কিন্তু যদি আমরা আত্মজ্ঞানকে সব সময় ধরে রাখি, এখানে আত্মজ্ঞান বলতে আত্মোপলব্ধির কথা বলা হচ্ছে না, আত্মজ্ঞানকে এখানে আত্মবুদ্ধি রূপেই বলা হচ্ছে, আরে আরে আমি এগুলো কি করছি, আমি তো সেই বিশুদ্ধ চৈতন্য, এই বুদ্ধি করা। বিশুদ্ধ আত্মা কখনই রাগ ও দ্বেষ দ্বারা প্রেরিত হবেন না। যখনই মনে হবে আমি এই কাজটা যে করছি এটা রাগ ও দ্বেষের দ্বারা প্রেরিত হয়ে করছি, যেমন আমার বাড়ির দরকার নেই কিন্তু একটা বাড়ি কিনছি, গাড়ির দরকার নেই গাড়ি কিনছি, তখন আমি চিন্তা করছি কি করব, কিনব কি কিনব না, কেনাটা কি ঠিক হবে, তখনই স্মরণ করতে হবে আরে এগুলো আমি কি করতে যাচ্ছি, আমি তো আত্মজ্ঞানের পথিক, আমি কেন রাগ ও দ্বেষ থেকে প্রেরিত হয়ে এগুলো কিনতে যাব। যিনি আত্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হতে চাইছেন তার এগুলো শোভা দেয় না। এই চিন্তা যখন হতে থাকবে তখন সঙ্গে সঙ্গে মনের ছবিটা পুরো পাল্টে যাবে, তখন কেউ আমাকে নাড়াতে পারবে না। যাঁরা আত্মজ্ঞানী তাঁদের কথাই শাস্ত্রে আছে, তাই শাস্ত্র আর আত্মজ্ঞানী একই জিনিষ। আমাদের মধ্যে যে প্রতিনিয়ত সংশয় উপস্থিত হয়, আমি এটা করব কি করব না, আমি সেখানে যাব কি যাব না, এই ধরণের সংশয় মানে আমি decision making faculty তে পিছিয়ে আছি। এই decision making খুব সহজ ভাবে হয় যদি আমি আত্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হই, আমি বিশুদ্ধ আত্মা, আমার এখন সেই বোধ হয়নি, কিন্তু আমি ঐ পথের পথিক, তাই আমি আমার মনকে চঞ্চল হতে দেব না। কিসের থেকে চঞ্চল হতে দেব না? রাগ আর দ্বেষ থেকে, কারণ আত্মাতে রাগ আর দ্বেষের কোন স্থান নেই। আমি এমন কোন কাজ করব না যেটা রাগ আর দ্বেষ প্রেরিত। এই ভাবে যখন তুমি এগোতে থাকবে, তখন কি হবে –

**এবং বুদ্ধেঃ পরং বুদ্ধা সংস্তভ্যাত্মানমাত্মনা। জহি শত্রুং মহাবাহো কামরূপং দুরাসদম্।।৪৩।।**

এই শুদ্ধ মনকে যখন সমাধিস্থ করে দেওয়া হয়, সমাধিস্থ মানে মনকে আত্মজ্ঞানে ঢুকিয়ে দেয়, তখন এই যে দুর্জয় শত্রু কাম, একে পুড়িয়ে ছাই করে দেয়। আত্মভাবে যে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল, তখন বুদ্ধি, মন, ইন্দ্রিয় সব কিছুই নিজের আয়ত্তে চলে এসেছে, রাগ আর দ্বেষকে তখন কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। এখানে কিন্তু আত্মজ্ঞান বলতে আত্মার উপলব্ধি যার হয়েছে তাঁর কথা বলা হচ্ছে না। এখানে আত্মজ্ঞান বলতে বোঝান হচ্ছে যে, এই বোধটুকু রাখা যে আমি সেই বিশুদ্ধ আত্মা। এটা হচ্ছে জ্ঞানের অবস্থা, মানে যিনি শাস্ত্র ও আচার্যের কাছে আত্মার কথা, উচ্চ আধ্যাত্মিক জীবনের কথা শুনেছেন তাদের কথা গীতা এখানে বলছে।

যারা প্রথম প্রথম শাস্ত্র অধ্যয়ণ করতে আসেন তাঁদের কাছে সব কিছুই নতুন মনে হলেও তাঁদের মনে এই বোধ হয় যে, যা কথা শুনছি এগুলো যেন অন্য কোন উচ্চ জগতের কথা। এনারা বোধ করে থাকুন কি বোধ নাই করে থাকুন, মানুক নাই মানুক কিন্তু এটা মনে হবে যে এগুলো যা শুনছি সব অন্য জগতের কথা। আর যারা অনেক দিন ধরে শাস্ত্রের কথা শুনছেন তাদের কাছে তো সাংঘাতিক ব্যাপার হয়ে গেছে। তারা বুঝতে পারছেন যে একটা উচ্চ সত্তা কিছু আছে যে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে আমার শরীর, মন, ইন্দ্রিয়কে চালাচ্ছে। এখন তাদের যদি কোন সমস্যা আসে, সিদ্ধান্ত নেওয়ার ব্যাপারে সংশয় আসে, এই কাজটা করব কি করব

না, তখন কি হবে - *এবং বুদ্ধেঃ পরং বুদ্ধা সংস্তভ্যাত্মানমাত্মনা,* এই বুদ্ধিকে *পরং* দিয়ে, *পরং* হচ্ছেন আত্মা, আত্মা দিয়ে বুদ্ধিকে একেবারে *সংস্তভ্যাত্মাননাত্মনা,* নিজের আয়ত্তের মধ্যে নিয়ে আসবে, আত্মা যেন বুদ্ধিকে গলা টিপে ধরে বলে দিচ্ছে এটাই করতে হবে। এই আত্মভাবটাকে দৃঢ় করার কথাই বলা হচ্ছে। আত্মভাব দৃঢ় হয়ে গেলে যে বুদ্ধি বলছিল করব কি করব না, সে তক্ষুণি বলে দেবে কি করতে হবে। বুদ্ধির পরে যে মন রয়েছে সেতো এই আত্মভাবের কাছে দাঁড়াতেই পারবে না, ফুঁ মেরেই উড়িয়ে দেবে। তোমার যা কিছু আছে নিয়ে এসো তুমি আমাকে কিছু করতে পারবে না।

আমাদের যেমন কিছু রোগ আছে যেমন ব্যাক পেইন, জ্বর, ডাক্তাররা বলছেন এগুলো কোন রোগই নয়, এগুলো হচ্ছে কোন জিনিষের পরিণাম থেকে এটা হচ্ছে। বলে স্ট্রেস ও টেনশান থেকে ব্যাক পেইন হয়, আসলে ব্যাক পেইন বলে কোন রোগই নাকি নেই। আমি যখন কোন বিষয়ের প্রতি ধাবিত হচ্ছি, এই ধাবিত হওয়াটা কখনই বড় নয়, এর পেছন একটা রোগ আছে, সেটা হচ্ছে শোক আর মোহ, রাগ ও দ্বেষ, কাম ও ক্রোধ। এই জিনিষ গুলো কোথাব বাস করে? ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধিতে বাস করে। এখন আমি যদি শুধু ইন্দ্রিয়কে সংযম করি তখন খুব ভালো কাজ হবে, কিন্তু বাকি দুটো মন ও বুদ্ধিতো কথা শুনবে না, এই দুটো সব সময় চেষ্টা করে যাবে আমাকে ফাঁদের মধ্যে ফেলে গোলমাল পাকিয়ে দিতে। মন যদি আয়ত্তে এসে যায় তখন সঙ্কল্প-বিকল্প থেকে যে কাজ গুলো করা হচ্ছে ঐ কাজ গুলো করব না। কিন্তু কখন মন বলছে আমাকে এটা করতেই হবে, অথচ সেটা আবার শাস্ত্র সম্মত নয়। তার মানে বুদ্ধি যদি ঠিক ঠিক আয়ত্তে না আসে বলছেন তখনও মন নিয়ন্ত্রণে থাকলেও গোলমাল হতে থাকবে। কিন্তু একবার যে আত্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত, আবার বলা হচ্ছে, এখানে আত্মজ্ঞান মানে ব্রক্ষজ্ঞানীর কথা বলা হচ্ছে না, যিনি ব্রক্ষজ্ঞানী, বিজ্ঞানী, যেমন শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে কোন কিছুই আর আয়ত্ত করতে হবে না, এখানে এনাদের কথা বলা হচ্ছে না, আমাদের মত লোকেদের কথা বলা হচ্ছে। এই ভাবটাকে দৃঢ় করা, আমি সেই বিশুদ্ধ আত্মা, বিশুদ্ধ আত্মার মধ্যে কোন কাম ক্রোধ থাকে না, আমি এই পথের পথিক, তাই আমি এইগুলো করব না। এই ভাবটা যেমনি আরোপ করব তখন এই পুরো ব্যাপারটাই সঙ্গে সঙ্গে আটকে যাবে।

আমি একটা মইএর উপর দাঁড়িয়ে আছি, মইটা লড়বড় করছে, এখন দেখতে হবে মইটার কোন জায়গাটাতে লড়বড় করছে, তখন সেটাকে টাইট করে দড়ি দিয়ে বেঁধে দিলে আর লড়বড় করবে না। আমাদের যত লড়বড় এই বুদ্ধি থেকেই শুরু হয়, এই বুদ্ধিকে টাইট করে বেঁধে দিলে সবটাই পথে চলে আসবে। বুদ্ধি সব সময় হচ্ছে শাস্ত্র আচার্য সম্বন্ধিত, শাস্ত্র আর আচার্যের কাছ থেকে যেটা শিখছি সেটাই বুদ্ধিকে ঠিক করবে। কিন্তু আমি সব কথা নাও শিখে থাকতে পারি। যেমন ইসলামে এই সমস্যা হয়েছে, কোরানে যেটা বলা হয়েছে সেটা হচ্ছে শাস্ত্র সম্বন্ধিত, কোরানের কথা মানা মানে বুদ্ধির মত কাজ করা, কিন্তু নতুন নতুন যে পরিস্থিতি গুলি আসছে তার কথা তো কোরানে নেই। সেখানে এরা কি করে ঠিক করে বলবে যে এটা করা যায় কি যায় না। যেমন কোরান বলছে তুমি সুদ নেবে না। সুদ নেবে না কেন বলা হয়েছে? কারণ মহম্মদ ছিলেন জিউসদের বিরুদ্ধে, টাকা পয়সা ধারের কারবার করত জহুদিরা, জহুদিরা এই কাজ করত বলে মহম্মদ নিষেধ করে দিলেন তোমরা কেউ সুদ নেবে না। কিন্ত বর্তমান অর্থনীতি দাঁড়িয়ে আছে শেয়ার মার্কেটের উপর। আমার এক কোটি টাকা আছে, ঐ টাকা দিয়ে আমি কোন কোম্পানির শেয়ার কিনে ইনভেস্ট করলাম, কোম্পানির তখন প্রসার হতে থাকবে, প্রসার হলে তার মুনাফা আসবে, মুনাফা হলে শেয়ারহোল্ডাররা তার অংশ পাবে, মূলতঃ এটাই সুদ হয়ে গেল। ইসলামিক মূল্যবোধকে আঁকড়ে থাকলে আমার শেয়ার কেনা কখনই উচিৎ হবে না। এখন শেয়ার যদি কেউ না কেনে তাহলে কোম্পানি টাকা তুলতে পারবে না, কোম্পানি টাকা না পেলে কোম্পানির সমৃদ্ধি আসবে না, এই কারণে পাকিস্থানের অর্থনীতি পুরো ভেঙ্গে পড়ছে। তাই কোরানকে আধার করে নিজের বুদ্ধিকে ঠিক করা যাচ্ছে না। নতুন নতুন পরিস্থিতি আসতেই থাকবে, সব কথাই শাস্ত্রে থাকবে তার কোন মানে নেই। কিন্তু শেষ কথা কার থাকবে? কার কথাই শেষ কথা? আত্মাই হচ্ছেন শ্রেষ্ঠ শিক্ষক।

গীতা আমাকে কখনই বলছে না যে তুমি এই এই কাজ কর আর এই এই কাজ করবে না, গীতা অনুসারে আমরা যে কোন কাজই করতে পারি, যদি সেই কাজ রাগ ও দ্বেষ দ্বারা প্রেরিত না হয়। আমাকে ঘর সংসার চালাতে টাকার দরকার, আমি শেয়ার মার্কেট থেকে টাকা আয় করব, তুমি লাগাও টাকা শেয়ারে। প্রচুর টাকা আসতে লাগল, এখন কি আমি আনন্দে রাস্থায় ধেই ধেই করে নেচে বেড়াব! আর যদি সব টাকা শেয়ারে ঢালার পর শেয়ার মার্কেটে ধস নেমে গেল, তখন আমি কি গলায় দড়ি দিয়ে দেব! গীতা এই গুলোকে আটকাবার কথা বলছে। গীতা কখন শেয়ার মার্কেট নিয়ে কথা বলছে না, একটা সার্বজনীন সবার জন্য নিয়ম বলে দিলেন, সেটা হল রাগ দ্বেষ থেকে প্রেরিত হয়ে কোন কাজ করবে না। তুমি কি করছ, কি করছ না এগুলো গীতার কাছে কোন মূল্যই নেই, শুধু বলে দিচ্ছে, তোমার যখন কোন কাজে সফলতা এসে যায় তখন তুমি ধেই ধেই করবে না, যদি ধেই ধেই কর তাহলে বুঝতে হবে তুমি রাগ প্রেরিত হয়ে এই কাজ করেছ। আর যদি কোন কাজে অসাফল্যতার জন্য তুমি যদি গলায় দড়ি দিয়ে দাও তাহলে বুঝতে হবে তুমি দ্বেষ প্রেরিত হয়ে কাজ করেছ। এর পরে গীতা কিন্তু তোমার দায়ীত্ব নেবে না।

গীতা আমাদের আগেই পর পর বলে দিয়েছে কি কি পথ অবলম্বন করবে, সব থেকে উচ্চ হচ্ছে নিবৃত্তিমার্গ, এর নীচে আছে যারা অনাসক্ত হয়ে প্রবৃত্তিমার্গের কর্ম করছে, এর নীচে আছে প্রবৃত্তিমার্গের সাধক। তৃতীয় অধ্যায়ে যেটা বলা হচ্ছে সেটা হচ্ছে অনাসক্ত ভাবে প্রবৃত্তিমার্গের কর্ম করা। অনাসক্ত হয়ে প্রবৃত্তিমার্গও যদি না করতে পারে তাহলে অন্ততঃ যেন প্রবৃত্তিমার্গে থাকে। কিন্তু আমার শেয়ারের পয়েন্ট কুড়ি হাজার ছাড়িয়ে গেছে, লাগাও পার্টি বলে খুবসে খাওয়া-দাওয়া আর ফুর্তি করা শুরু হয়ে গেল, তার মানে এই তিনটের কোনটাতেই আমি নেই, আমার কোথাও গোলমাল আছে। এই ফুর্তির সাথে এটাও নির্ধারিত হয়ে গেছে যেদিন শেয়ার পড়ে যাবে সেদিন আমি গলায় দড়ি দেব। গীতা তাই এই জিনিষগুলোকে একেবারেই প্রশ্রয় দেয় না। দুটো অবস্থায় গীতা অনুমতি দেবে না, এক হচ্ছে যদি আমি পারমার্থিক জ্ঞানের পথিক হই তাহলে অনুমতি দেবে না, আর যদি আমি এক শান্তিপূর্ণ জীবন যাপন করতে চাইছি তখনও এর অনুমতি দেবে না।

এখানে বলছেন *জহি শত্রুং মহাবাহো কামরূপং দুরাসদম্*, দুর্জয় শত্রু হচ্ছে কামনা-বাসনা, এই কামনা-বাসনা গুলোকে পুড়িয়ে ভস্ম করে দাও। কিভাবে ভস্ম করবে? ইন্দ্রিয় সংযম কর, ইন্দ্রিয় সংযমে ভস্ম হবে না, মন্দের ভালো, ইন্দ্রিয় সংযমের থেকে আরও ভালো হবে তোমার মনকে বশে নিয়ে এস, মনকে বশ করলেও সমস্যা থেকে যাবে, এরও উপরে আছে বুদ্ধিকে নিয়ন্ত্রণ কর। কিন্তু আত্মজ্ঞানের অনুশীলন যদি তুমি কর তাহলে এই পুরো ব্যাপারটাই চিরদিনের মত মিটে যাবে। ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি কোন দিন আর তোমাকে বিরক্ত করতে আসবে না, বিরক্ত করবে কিন্তু তোমাকে কাবু করে দিতে পারবে না, বিজ্ঞানীর অবস্থায় যতক্ষণ না যাবে, প্রত্যক্ষ দর্শন যতক্ষণ না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত পতনের সম্ভবনা থাকবে। পতন হয়ে গেলেও তুমি শেষ হয়ে যাবে না, ঐখান থেকেই দাঁড়িয়ে আবার তুমি চলতে থাকবে।

এরপর আমরা চতুর্থ অধ্যায়ে প্রবেশ করব। চতুর্থ অধ্যায়ে কর্মসন্ন্যাসের ধারণাটাকে নিয়ে আসবেন। এতক্ষণ দেখান হল কাজ, কিন্তু আমাদের আধ্যাত্মিক শাস্ত্রে কখনই কাজের প্রশংসা করা হয় না। পুরো গীতার উদ্দেশ্য হচ্ছে আত্মজ্ঞান। কিন্তু জ্ঞানের সঙ্গে কর্মের কখন যোগ হয় না। কিন্তু এই জগতে যত লোক আছে তাদের ৯৯.৯৯৯% লোক জ্ঞানের জন্য তৈরী নয়। সেইজন্য তাদেরকে বলা হচ্ছে কর্ম করতে। কর্ম করতে গেলে প্রথম পদক্ষেপ হচ্ছে পুরো আসক্ত হয়ে কাজ করতে হবে। এর পর শাস্ত্র নির্দেশিত স্বধর্মে যে কর্ম করার কথা বলছে সেগুলো কর। স্বধর্ম করতে করতে যখন মন আরেকটু পরিষ্কার হল তখন তোমাকে অনাসক্ত ভাব নিয়ে কাজ করা শুরু করতে হবে। এটাও করতে করতে যখন মন আরও পরিষ্কার হয়ে গেল এইবার তুমি কাজ কমাতে শুরু কর। কাজ কর্মে বেশি না জড়িয়ে তোমার মনটাকে এইবার আত্মজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত কর। মন যখন আত্মজ্ঞানে পুরো বসে গেল, তখন তোমার জ্ঞান লাভ হবে। জ্ঞান লাভের পর এবার তুমি সাধারণ লোককে শিক্ষা দেওয়ার জন্য, তাদের কাছে দৃষ্টান্ত স্থাপনের জন্য তোমাকে কিন্তু আবার কাজ করতে হবে। কাজ কিন্তু তুমি পুরোপুরি ছেড়ে ত্রৈলঙ্গস্বামী হয়ে থাকবে বলা হচ্ছে না। শ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামীজী, যিশু, মহম্মদ এনারা সবাই কাজ করে গেছেন। তুমিও কাজ ছাড়বে না, কিন্তু এইটা তোমাকে জেনে রাখতে হবে যে কাজটা হচ্ছে সিঁড়ি মাত্র, কাজ কখনই উদ্দেশ্য নয়। দ্বিতীয় অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ সাংখ্যবুদ্ধির আর যোগবুদ্ধির কথা বলেছিলেন। তৃতীয় অধ্যায়ে কিন্তু এই যোগবুদ্ধিটাকে ব্যাখ্যা করে দেওয়া হল।

**ওঁ তৎসদিতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসুপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়ং যোগশাস্ত্রে**
**শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে কর্মযোগো নাম তৃতীয়োহধ্যায়ঃ।।**

**********

## চতুর্থ অধ্যায়
# কর্মসন্ন্যাসযোগ

১৪ই আগস্ট ২০১০

প্রথম থেকেই আমরা বলে আসছি যে গীতা হচ্ছে খুব জটিল শাস্ত্র, গীতার মত আর কোন এত জটিল শাস্ত্র আছে কিনা সন্দেহ হয়। গীতার এই জটিলতার সাথে একমাত্র কথামৃতের তুলনা করা যায়, কথামৃতও ঠিক এই রকমই জটিল শাস্ত্র। কথামৃতের একটি পাতার মধ্যেই একশটি ভাবের সমাবেশ পাওয়া যাবে, কিন্তু আমরা এই ভাবগুলিকে ধরতে পারি না। তাই বলা হয় যেদিন কেউ কথামৃতের একটি পাতার মধ্যে একশটি ভাবকে ঠিক ঠিক ধরতে পারবে বুঝে নিতে হবে সে সাধুজীবন যাপনের জন্য তৈরী হয়ে গেছে। গীতা আর কথামৃতের ভাব এত গভীর যে কতটা গভীর সেটাও বোঝা যায় না। গীতা হচ্ছে বেদ উপনিষদের সার, গীতার প্রত্যেকটি শ্লোককে ঠিক ভাবে বিশ্লেষণ করতে গেলে একটা ছোটখাটো বইয়ের আকার নিয়ে নেবে। গীতার প্রত্যেকটি শ্লোক এককেটি অধ্যায় রূপে যদি বিশ্লেষণ করা হয় তবে গিয়ে এর অর্থ স্পষ্ট হবে। আবার এই গীতার সারকেই ঠাকুর এক কথায় বলে দিলেন গীতার সার হচ্ছে ত্যাগ। আবার গীতাকে যখন বিস্তারিত ভাবে অধ্যয়ণ করতে যাওয়া হবে তখন তার ভাব অন্য রকম হয়ে যায়। সেইজন্য সাধারণ ভক্তদের পক্ষে গীতার সব কথাকে মনে রেখে প্রত্যেকটি ভাবের সঙ্গে একে অপরের কি সম্পর্ক এইগুলোকে ধারণা করা খুবই কঠিণ। গীতার সাতশ শ্লোককে মাথায় ধারণা করা মানে একশটা বইকে মাথায় চাপিয়ে দেওয়ার সমান। গীতার প্রত্যেকটি শ্লোককে অনেক দিন ধরে আলোচনা করতে করতে, দীর্ঘ দিন ধরে ভাষ্য নিয়ে অধ্যয়ণ করে করে একটা সময় গীতার ভাবগুলোকে ধরা যায়। সাথে সাথে যেমন যেমন জীবনে আধ্যাত্মিক সাধনা করা হবে তেমন তেমন এই ভাব গুলো ভেতরে বসতে থাকবে।

গীতার আরেকটি সমস্যা হচ্ছে, গীতা হচ্ছে একটি ছন্দোবদ্ধ কবিতা। কবিতার শব্দগুলো পড়ে সব সময় সঠিক ভাবে বলা যায় না কবি কি বলতে চাইছেন। যিনি কবি তিনিও অনেক সময় বলতে পারেন না তিনি কি বলতে চেয়েছেন। গীতাতেও এই সমস্যা হয়, গীতার একই শ্লোক একজন পণ্ডিত এক রকম বুঝে একটা ব্যাখ্যা করলেন, আরেকজন পণ্ডিত তিনি আবার অন্য রকম একটা ব্যাখ্যা দিলেন। এই জিনিষ হবেই, এখানে কিছু করার নেই। একেই ধর্ম ব্যাপারটাই খুব কঠিন, বেদ, উপনিষদের অভিব্যক্তি খুবই কঠিন, সেটাকে আবার সূত্রাকারে রাখা হয়েছে, তার ফলে আরও কঠিন হয়ে গেছে। সংক্ষেপে যেটা বলা হয়েছে সেটাও গদ্যে রাখা হয়নি কবিতার আকারে রাখা হয়েছে, তাতে আরও বেশি সমস্যা হয়ে গেছে। কারণ কবিতাতে ছন্দ মেলাবার জন্য কিছু অপ্রাসঙ্গিক শব্দের ব্যবহার করতে হয়, আবার কয়েকটা প্রয়োজনীয় শব্দকে ছেড়েও দেওয়া হয়। শঙ্করাচার্য তাঁর ভাষ্যে কোথাও কোথাও বলছেন শ্লোকের অর্থ পুর্তির জন্য আপনাকে এই শব্দটা লাগিয়ে নিতে হবে। আবার কোথাও কোথাও বলছেন শ্লোক পুর্তির জন্য এই শব্দটা দেওয়া হয়েছে, এই শব্দের কোন প্রয়োজন নেই। শঙ্করাচার্যের কাছে এগুলো বোঝা কোন দুঃসাধ্য ব্যাপার নয়, কিন্তু সাধারণ মানুষের পক্ষে সত্যিই দুঃসাধ্য। শঙ্করাচার্য অনেক জায়গাতে বলছেন, এই শব্দের সংস্কৃতে এই অর্থ হলেও এখানে এই অর্থ নিতে হবে তা নাহলে শ্লোকের অর্থ অন্য রকম হয়ে যাবে। সেইজন্য গীতা প্রথম প্রথম পড়তে গেলে গীতার শ্লোকের অর্থকে মাথার মধ্যে ধরে রাখা যায় না।

গীতাতে দুটো শব্দ খুব বেশি ব্যবহার হয়, এক হচ্ছে সাংখ্যযোগী আর যোগী। সাংখ্যযোগী বলতে বোঝায় যিনি বুঝে গেছেন আত্মাই কেবল আছেন, আত্মা ছাড়া আর কিছু নেই, সাংখ্যযোগী আত্মার সাক্ষাৎ করেছেন। যোগী বলতে বোঝায় যারা এই পথের সাধক। এই পথের সাধক হচ্ছে সন্ন্যাসী, সন্ন্যাসী ছাড়া এই পথের সাধক হতে পারেনা। আত্মা হচ্ছেন নিক্রিয়, আত্মার কোন ভোক্তৃত্ব নেই, কর্তৃত্ব নেই, আত্মার এই স্বরূপকে যিনি উপলব্ধি করে নিয়েছেন তখন তিনি আর কোন কিছুতেই নিজেকে জড়ান না।

জমিদার কাউকে ধরে নিয়ে গিয়ে গোলাম করে তাকে চাবুক মেরে কাজ করাচ্ছে। সে বেচারা সকাল থেকে চাবুকের ভয়ে কাজ করেই যাচ্ছে। এখন কোন ভাবে সে বুঝতে পেরে গেল যে এই জমিদার আমার মালিক নয়, আর আমিও এর ক্রীতদাস নই, আমাকে জোর করে জমিদার আটক করে রেখেছে। তারপর সে খবর পেল যে এই জমিদার অনেক দিন আগেই মারা গেছে, তাহলে এখন আমি তো আসলে মুক্ত পুরুষ। এটা বোঝার পর কাজের ব্যাপারে তার কি দৃষ্টিভঙ্গী হবে? এত দিন যে কাজগুলো করে আসছিল সেই কাজগুলো করার তো কোন প্রশ্নই আসছেন, যে অত্যাচার করছিল সে মারা গেছে। জমিদারের আরও যত গোলাম ছিল তাদের যদি সে এখন বলতে থাকে আমরা মুক্ত, জমিদার মারা গেছে। এরা কিন্তু কেউ বিশ্বাসই করতে চাইবে না। এরা যদি বিশ্বাস না করে তাহলে সে কি করবে? বলবে আমার কথাতে যদি তোমাদের বিশ্বাস না হয় তাহলে তোমরা ভাই খেটে মরো, আমি আর খাটতে যাচ্ছি না, আমি মুক্ত। আর সে যদি খুব মহৎ উদার হয় তখন সে আরো দু'চারদিন ওদের সঙ্গে খাটতে থাকবে আর বোঝাতে চেষ্টা করবে যদি এদের মধ্যে কেউ কেউ বুঝে নিয়ে বেরিয়ে আসতে পারে। যারা বোকা লোক তারা খেটেই যাবে, তারা এর কোন কথাকেই বিশ্বাস করবে না। মায়াটা হচ্ছে এই রকম এক নির্মম ক্রূঢ় জমিদার, আমরা সবাই হলাম এই জমিদারের গোলাম। কিন্তু এই জমিদার অনেক আগেই মরে গেছে, মায়া বলে কিছু নেই। ঠাকুর, স্বামীজী, শঙ্করাচার্যের মত কিছু ব্যক্তিত্ব বুঝে গেছেন মায়া

বলে কিছু নেই, এখন এনারা কাজ করবেন কি করবেন না? এনারা কোন কাজই করতে যাবেন না, কেন কাজ করতে যাবেন! যদি কাজ করেন সেটা আমাদের বোঝানর জন্য করবেন, তোমরা মিছিমিছি খেটে মরছ, মায়া বলে কিছু নেই। পুরো গীতা এই কথাই আমাদের বলতে চাইছে।

গীতা বলছে, যদি কাজই কর তাহলে গোলামের মত পাথর ভাঙ্গার কাজ করো না। তাহলে তুমি কি করবে? এই বাড়ি, সেই বাড়ি, এই ঘর সেই ঘর সব ভালো করে দেখে নাও যে মায়া বলে কিছু নেই, তুমি যাকে জমিদার বলে মনে করতে সে নেই, তুমি বৃথা খেটে মরছ, বোকার মত দেওয়ালে মাথা ঠুকে যাচ্ছ। এই উপমাটাকে মাথায় রাখলে গীতার পুরো বক্তব্যটা বুঝতে পারা যাবে। সাধারণ অবস্থায় মানুষ পাগলের মত খেটে মরছে, পাথর ভেঙ্গেই চলেছে। সে জানে যে আমি হচ্ছি গোলাম, এইভাবে যদি না খেটে যাই তাহলে আমার পিঠে চাবুক পড়বে। চাবুকটা কিভাবে পড়বে? পাপবোধ, পূণ্যবোধ, ধর্মবোধ, অধর্মবোধ রূপে, এগুলোই হচ্ছে চাবুক, আমি আমার কর্তব্য করছি, আমি কর্তব্য না করলে কি হবে? পুরো গীতা এইটুকুই বলছে। যে বুঝে গেছে তার আর কোন বন্ধন নেই। বন্ধন নেই বলছে ঠিকই কিন্তু আসলে বন্ধন কোন দিনই ছিল না, সে এতদিন বোকার মত ভেবেই চলেছে আমি বন্ধনে আছি, সেতো চিরকাল মুক্তই আছে। এখন সে বুঝে গেছে আমি এতদিন বোকার মত নিজেকে বন্ধন বলে মনে করছিলাম, আসলে আমি মুক্ত। বুঝে গেলে সে আর কাজ করতে যাবে কেন, এরাই হচ্ছেন সাংখ্যযোগী।

কিন্তু যারা নিজেদের বন্ধনত্বকে বুঝতে পারছে না, তাদের বলা হচ্ছে, ঠিক আছে তোমরা যা কাজ করছিলে সেই কাজই কর, কাজ করতে করতে বোঝার চেষ্টা কর ঐ যে নির্মম, দাপুটে অত্যাচারী জমিদার আছে বলে তুমি ভাবছ সেই রকম কোন জমিদার আদপেই নেই। যেদিন তুমি বুঝতে পারবে তোমার কোন ঐ রকম মালিক বলে কেউ নেই, তখন তুমি মুক্ত, তুমি আর কার জন্য কাজ করতে যাবে তখন! তুমি এখন যেখানে খুশি যেতে পার, যা খুশি করতে পার, তোমাকে আর কেউই আটকাতে আসবে না। নির্মম জমিদার রূপ মায়া, আমার বন্ধন আর আমার মুক্তি, এই তিনটেকে গীতা আলোচনা করে যাবে।

আর চতুর্থ যিনি, তিনি হচ্ছেন আমার স্বভাব, এই স্বভাবটাই হল জ্ঞান, যে জ্ঞান দিয়ে জানতে পারব এই মায়া বলে কিছু নেই, আমার মালিক বলে কেউ নেই। এই জ্ঞান আমার এসে গেলেও বাকী যারা আছে তাদের কিছুতেই হুঁশ আসবে না, তাদের তাই খেটে যেতে হবে।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দ্বিতীয় অধ্যায়ে সাংখ্যযোগের কথা বললেন, তারপর তৃতীয় অধ্যায়ে গিয়ে কর্মযোগের কথা আলোচনা করে অর্জুনকে বললেন, অর্জুন তোমার বন্ধন বলে যে কিছু নেই সেটা তুমি বুঝতে পারছ না, তাই তুমি কর্ম করে যাও। কর্মযোগে যে শুধু কাজ করে যেতে বলা হয়েছে তাই নয়, কাজ করে গেলেই হবে না, কাজের সাথে সাথে যোগ করতে হবে। যোগটা কি? ঈশ্বরার্পণ বুদ্ধি নিয়ে কাজ করতে হবে। তৃতীয় অধ্যায়ে যদিও কর্মযোগের স্তুতি করা হয়েছে, কিন্তু কর্মযোগই শেষ কথা নয়। কর্মযোগ হচ্ছে চিত্তশুদ্ধির জন্য। কর্মযোগের পথ ধরে কাজ করতে করতে চিত্তশুদ্ধি হয়ে গেলে সে সন্ন্যাসের পথে চলে আসবে। সেই কারণে উচ্চতম সন্ন্যাস মুষ্টিমেয় কয়েকজনের জন্যই। বাকী যারা আছেন তাদের জন্য বিভিন্ন রকমের সন্ন্যাসের কথা বলা হয়, এর মধ্যে যেমন আছে কর্মসন্ন্যাস, কর্মত্যাগ, অহঙ্কার ত্যাগ। তৃতীয় অধ্যায়ে এইগুলোকে নিয়ে আলোচনা করা হয়েছিল। চতুর্থ অধ্যায়ের নাম হচ্ছে কর্মসন্ন্যাস যোগ। দ্বিতীয় অধ্যায়ে নিবৃত্তিমার্গ তৃতীয় অধ্যায়ে প্রবৃত্তিমার্গ এই দুটোকে নিয়ে মিলিয়ে মিশিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এরপর থেকে জিনিষগুলোকে আরো পরিষ্কার করে বলা হবে।

শ্রীকৃষ্ণ এখন অর্জুনকে জ্ঞাননিষ্ঠা রূপ যোগ বলতে যাচ্ছেন। জ্ঞাননিষ্ঠা হচ্ছে কর্মসন্ন্যাস যোগেরই আরেকটি পরিভাষা। শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, আমি তোমাকে যেটা বলতে যাচ্ছি তুমি মনে করো না যে হঠাৎ করে আমার মাথায় এলো আর আমি তোমাকে বলতে শুরু করলাম। যদি কোন মহারাজ এসে কোন ভক্তকে বলেন – এই পাথরটা নিয়ে কপালে একশ আটবার ঘষতে থাকুন তাহলে আপনার ঈশ্বর দর্শন হবে। ভক্তটি তখনই জিজ্ঞেস করবে, অবশ্য যদি বোকা ভক্ত না হয়ে থাকে, মহারাজ এর আগে আগে কি কারুর এইভাবে ঈশ্বর দর্শন হয়েছিল? মূল কথা হল এর কোন পরম্পরা বা এর কোন সম্প্রদায় বিদ্যা আছে কিনা। সুফি সম্প্রদায়ের মধ্যেও এই পরম্পরা বিদ্যাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়, গুরু থেকে শিষ্য পরম্পরা চলতে থাকে, এটাকে সুফিদের ভাষায় বলা হয় সিলসিলা। হঠাৎ এসে কেউ যদি বলে আমি এই তত্ত্বটা পেয়েছি, আমি তোমাদের এই তত্ত্বটা শেখাবো, তার আগে তাকে জিজ্ঞেস করতে হবে আপনি যে এই তত্ত্বটি পেয়েছেন এর আগেও কি কেউ এই তত্ত্ব পেয়েছিলেন, আর এর কি পরম্পরা আছে? যদি এর কোন পরম্পরা না থেকে থাকে তাহলে কিন্তু এই তত্ত্বের কোন মূল্য নেই। কর্মসন্ন্যাস যোগের কথা বলার আগে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে এইটাই বলছেন। অর্জুন তুমি মানো আর নাই মানো আমি ভগবান, আমি তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি, ভগবান হলেও আমি যে কথা গুলো তোমাকে বলছি এগুলো আমি তোমারও আগে সূর্যকে বলেছিলাম –

শ্রীভগবানুবাচ

**ইমং বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবানহমব্যয়ম্। বিবস্বান্ মনবে প্রাহ মনুরিক্ষ্বাকবেঽব্রবীৎ।।১।।**

এই যোগের কথা এর আগে আগে আমি অনেককে বলেছি, এর পরম্পরা আছে। বিবস্বান, মনু, ইক্ষ্বাকু এনারা হচ্ছে সব নামকরা পৌরানিক পুরুষ। বিবস্বত হচ্ছেন সূর্য, আমি প্রথমে সূর্যকে বলেছিলাম, সূর্য এই বিদ্যা মনুকে বলেছিলেন এবং মনু এই বিদ্যাই ইক্ষ্বাকুকে বললেন। ভগবান হঠাৎ কেন এই বিদ্যাটা বিবস্বতকে বলতে গেলেন? বলছেন ক্ষত্রিয়দের মধ্যে শক্তি স্থাপন করার জন্য। কর্মযোগ হচ্ছে ক্ষত্রিয় ধর্ম, কর্মযোগের মাধ্যমে ক্ষত্রিয়ের মধ্যে ক্ষাত্র শক্তি দৃঢ় ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়, ক্ষত্রিয়ে মধ্যে ঠিক ঠিক আধ্যাত্মিক শক্তি জাগরিত হয়, সেই শক্তি দিয়ে তারা ব্রাহ্মণদের রক্ষা করে। ব্রাহ্মণ হচ্ছে, যারা ব্রহ্মবিদ্যাকে ধরে রাখছেন। ব্রাহ্মণদের যদি রক্ষা করা যায় তাহলে ব্রহ্মবিদ্যা সুরক্ষিত থাকবে। ব্রহ্মবিদ্যা যদি সুরক্ষতি থাকে তাহলে কোন কিছুই আর নাশ হবে না। সেইজন্য ব্রাহ্মণ আর ক্ষত্রিয়কে যদি ঠিক ভাবে রক্ষা করা যায় তাহলে জগতের স্থিতিশীলতায় আর কোন ধরণের গোলমাল হবে না, বাকি সব কিছু ঠিক ঠিক ভাবে তাদের স্বাভাবিক ধর্মানুযায়ী চলতে থাকবে। শঙ্করাচার্য তাঁর ভাষ্যে ঠিক এই কথাই বলছেন, ব্রহ্মবিদ্যা, অধ্যাত্মবিদ্যাকে রক্ষা করতে হবে। এই বিদ্যাকে রক্ষা করার জন্য চাই শৌর্য, তেজ আর তলোয়ার। কারণ ব্রাহ্মণদের যদি রক্ষা না করা যায় তাহলে কিন্তু এই ব্রহ্মবিদ্যা হারিয়ে যাবে। ভগবান বলছেন ব্রহ্মবিদ্যাকে রক্ষার জন এই কর্মযোগ আমিই শিখিয়েছিলাম। উপনিষদে তো কর্মযোগের কথা নেই, সেখানে শুধু আত্মা, ব্রহ্ম, চৈতন্যের কথা। আত্মা আত্মা করলে আমাকে রক্ষা কে করবে। যখন বিধর্মীরা গলা কাটতে আসবে তখন তোমাকে কে বাঁচাবে? বাঁচানর কাজটা হচ্ছে ক্ষত্রিয়দের। ক্ষত্রিয়রা কিভাবে বাঁচানর কাজ করবে সেটা আমিই তাদের শিখিয়েছি। কিভাবে শিখিয়েছি? আমি বিবস্বতকে, বিবস্বত মনুকে, মনু ইক্ষ্বাকুকে।

**এবং পরম্পরাপ্রাপ্তমিমং রাজর্ষয়ো বিদুঃ। স কালেনহ মহতা যোগো নষ্টঃ পরন্তপ।।২।।**

আগেকার দিনে যত রাজর্ষিরা ছিলেন, তাঁরা এই বিদ্যাকে পরম্পরা ভাবে পেয়ে আসছিলেন। রাজর্ষি হচ্ছেন, একাধারে রাজা আবার অন্য দিকে ঋষিও। কিন্তু যে কোন ভালো জিনিষই চলতে চলতে কালের নিয়মে একটা সময় তার মধ্যে অনেক অবাঞ্ছিত জিনিষ ঢুকে গিয়ে মূল বিদ্যাটাকে নষ্ট করে দেয়। এমনিতে যে কোন জিনিষই একটা সময়ে নষ্ট হয়ে যায়। সময়ের গতিতে বাড়ি, গাড়ি, সম্পদ সব কিছুই এক দিন নষ্ট হয়ে যাবে। এই যে যোগবিদ্যা এটাও নষ্ট হয়ে যায়, বিশেষ করে বীর্যহীন, শক্তিহীন লোকেদের হাতে যখন ধর্ম চলে যায় তখন ধর্মও নাশ হয়ে যায়। হিন্দুধর্মের এই অধঃপতনের মূল কারণ হচ্ছে বেশির ভাগ হিন্দু জাতি হয়ে গেছে বীর্যহীন। ভারতের যুবকরা বীর্যহীনতা, শৌর্যহীনতা, কাপুরুষতাকে আশ্রয় করে আছে দেখে স্বামীজী প্রচণ্ড গালামন্দ করে গেছেন। এখন এই জাতির না আছে ব্রহ্মভাব, না আছে ক্ষত্রিয়ের তেজ ও শক্তি, যে শক্তি দিয়ে এই ব্রহ্মভাবকে রক্ষা করবে। এই দুটোর একটিও নেই। এখন সবাই কত মাইনে বাড়ল, কত ইনকাম ট্যক্স ছাড় পাওয়া গেল, চালের দাম কত বাড়ল, গ্যাসের দাম, শেয়ারের দাম এই সব নিয়েই সবাই ব্যস্ত। আমার ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স কত, আমার প্রমোশন হবে কিনা, মেয়ের বিয়েতে কত পণ দিতে হবে, ছেলের বিয়েতে কি কি আদায় করতে হবে, সব সময় এইগুলোই মাথায় ঘুরছে। সারা ভারত এখন এই চাওয়া-পাওয়ার মধ্যেই ঘুরপাক খেতে ব্যস্ত। তার উপর আবার এসে গেছে আইটি সেক্টর, বাচ্চা ছেলেমেয়েদের হাতে প্রচুর টাকা পয়সা এসে গেছে, রক্ত এখন গরম, তার উপর হাতে এত টাকা, তাই কাউকে শ্রদ্ধা ভক্তি করার প্রয়োজন মনে করে না। এগুলো কার ধর্ম? বৈশ্যদের ধর্ম। এখন ভারতে না আছে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম না আছে ক্ষত্রিয় ধর্ম। সবাই এখন বৈশ্যদের ধর্ম নিয়েছে। ভগবান বলছেন, আগের আগের এনারা রাজাও ছিলেন আবার ঋষিও ছিলেন, সেই রাজর্ষিরা এই যোগকে ধরে রেখেছিলেন, কিন্তু কালের স্রোতে এই যোগ নষ্ট হয়ে গিয়েছে।

**স এবায়ং ময়া তেঽদ্য যোগঃ প্রোক্তঃ পুরাতনঃ। ভক্তোঽসি মে সখা চেতি রহস্যং হ্যেতদুত্তমম্।।৩।।**

হে অর্জুন, এখন আমি আবার তোমাকে এই পুরাতন যোগের কথা বলব, কারণ তোমার মধ্যে সেই শৌর্য বীর্য আছে, আর তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয়। কোরানে একটা জায়গায় একটা মজার ব্যাপার আছে, আল্লা মহম্মদকে বলছেন – মহম্মদ তোমাকে আমি এমন কোন কথা বলিনি যেটা আমি এর আগের আগের যত অবতাররা এসেছিলেন, যত মহাত্মার এসেছিলেন এদের কাউকেই বলিনি। এখানেও সেই পরম্পরা বিদ্যার কথাই বলা হচ্ছে। কিন্তু তারা সব ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে গেছে বলে তোমাকে আবার আমি বলছি। অর্জুনকে ভগবান ঠিক একই কথা বলছেন – তোমাকে আমি যা বলছি এগুলো নতুন কিছু বলছি না, এর আগে আগেও আমি অনেককে বলেছিলাম। আমরা বাড়িতে বাচ্চাদের অনেক সময় বলি, একই কথা কবার বলতে হবে। ভগবানও একই কথা যুগে যুগে বলে যাচ্ছেন। কেন বলেন? যুগে যুগে যারা ধর্মের ধ্বজা ধরে থাকেন তাদের মধ্যে এমন এমন মানুষ এসে যায় যাদের না আছে ব্রাহ্মণত্ব না আছে ক্ষত্রিয়ত্ব, তাই ধর্মের পতন হতে দেরী হয় না। এইজন্য ভগবানকে বারে বারে আসতে হয়, তিনি এসে ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব আর ক্ষত্রিয়ের ক্ষাত্র ধর্মকে আবার তুলে ধরেন। কিভাবে তুলে ধরেন? ব্রাহ্মণকে তিনি শিক্ষা দেন সাংখ্যযোগের আর ক্ষত্রিয়দের শিক্ষা দেন কর্মযোগের। শূদ্ররা যেটা পরিচর্যাত্মক মানে সেবার কাজ করছে সেটাও কর্মযোগের মধ্যে যুক্ত হয় আর বৈশ্যরা যা করছে সেটাও কর্মযোগের মধ্যে গণ্য হচ্ছে। কিন্তু ক্ষাত্র ধর্মে যে তেজের দরকার সেই তেজটাকে তিনি বাড়িয়ে দেন।

অর্জুন উবাচ

**অপরং ভবতো জন্ম পরং জন্ম বিবস্বতঃ। কথমেতদ্বিজানীয়াং ত্বমাদৌ প্রোক্তবানিতি।।৪।।**

এই সব কথা শোনার পর অর্জুন চমকে উঠেছেন। শ্রীকৃষ্ণকে বলছেন – হে ভগবান, আপনার তো সেদিন জন্ম হল, যে বছর আমার জন্ম সেই বছর আপনারও জন্ম, আমার বার্থ ডে পার্টি আর আপনার বার্থ ডে পার্টি খুব কাছাকাছি পালন করা হয়। তখনকার দিনে অবশ্য জন্মদিনে ব্রাহ্মণ, দরিদ্রদের দান করা হত। এখন সে জায়গায় নিজের বন্ধু বান্ধবদের নিয়ে আমোদ-আহ্লাদ করা হয় আর কে কি রকম গিফট দিয়েছে সেই দিকে নজর রাখা হয়। এখন সেই রকম ব্রাহ্মণও নেই আর গরীবদের কথা কেউ ভাবেও না। অর্জুন অবাক হয়ে বলছেন, আপনার জন্ম তো সেদিন আর সূর্যের জন্মতো অনেক যুগ আগে, আপনার কথাগুলো কেমন খাপছাড়া লাগছে। অর্জুনের এই সংশয় কাটাবার জন্য ভগবান তারপর থেকে বলতে শুরু করলেন। এইখান থেকে আমাদের শাস্ত্রে প্রথম অবতার তত্ত্ব শুরু হয়। পরের দিকে এই অবতার তত্ত্বের ধারণা হিন্দুধর্মে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে।

শ্রীভগবানুবাচ

**বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জুন। তান্যহং বেদ সর্বাণি ন ত্বং বেত্থ পরন্তপ।।৫।।**

হে অর্জুন, আমি আর তুমি বহুবার জন্ম গ্রহণ করেছি, কিন্তু আমি আমার সব জন্মের কথা মনে রেখেছি, তোমার কিন্তু এর আগের কোন জন্মের কথা মনে নেই। আচার্য শঙ্কর গীতার ভাষ্যে অনেকবার বলছেন, ধর্মের কথা যুক্তি দিয়ে ন্যায় শাস্ত্র দিয়ে বোঝান যায় না। ধর্মের কথা জানার একমাত্র উপায় হচ্ছে শাস্ত্র প্রমাণ। আমাদের যদি কেউ জিজ্ঞেস করে পুনর্জন্ম আছে কি নেই? আমাদের কাছে এর কোন সঠিক যুক্তিযুক্ত উত্তর নেই? কেন নেই? যুক্তি দিয়ে জন্মান্তরকে কখনই প্রমাণ করা যাবে না। এর একমাত্র প্রমাণ হচ্ছে শাস্ত্র। এখন যদি কেউ এসে বলে আমি শাস্ত্র মানি না, তখন তাকে বলতে হয়, ভাই তোমাকে শাস্ত্র মানতে হবে না, আর পুনর্জন্মও মানতে হবে না। পুনর্জন্ম মানলে আর পুনর্জন্ম না মানলে জীবনের কোন পরিবর্তন তো আসবে না। তবে হ্যাঁ, যদি তুমি ধর্ম পথে এগোতে চাও তাহলে কিন্তু তোমাকে পুনর্জন্ম মানতে হবে। তখন যদি পুনর্জন্ম না মান তাহলে ধর্ম পথে আসার তোমার কোন প্রয়োজনই নেই। মৃত্যুতেই সব কিছু শেষ হয়ে যায় যে এই মতকেই যারা বিশ্বাস করে তারা ধর্ম পথে কেন আসবে। মানুষের বয়স হয়ে গেলে রাত্রে ঘুম হয় না, চোখে কম দেখে, কানে শোনেনা, খেলে হজম করতে পারেনা, কাশতে পারে না, কাশলে বুকের দম ফুরিয়ে যায়, তার উপর বাড়ির লোকের নানান রকমের গঞ্জনা। এই যে বেঁচে থাকার যন্ত্রণা, মৃত্যুতেই যদি সব শেষ হয়ে যায়, তাহলে বেঁচে থেকে এত কষ্ট পাওয়ার কি আছে? কেন মরতে চাইছে না? কোথাও তার মনে একটা চিন্তা ধাক্কা মারছে, মরে গেলে আবার আমাকে জন্মাতে হবে। এই চিন্তা কোথা থেকে আসছে? শাস্ত্র থেকে আসছে। ধর্ম প্রমাণ, অধ্যাত্ম প্রমাণ, পুনর্জন্ম প্রমাণ এই সব কিছু দাঁড়িয়ে আছে শাস্ত্রকে ভিত্তি করে। এখন আমি আপনি যদি শাস্ত্রের কথা বিশ্বাস না করি তাহলে এগুলোও আমাদের মানতে হবে না। পশুরাও তো কিছু মানে না, তাদের শরীর ইন্দ্রিয়ের নির্দেশেই চলছে। তাই বলে কুকুর বেড়ালরা কি আনন্দে নেই, তারাও দিব্যি আনন্দে খাওয়া-দাওয়া করছে, সন্তান উৎপাদন করে যাচ্ছে। তাদের না আছে টেনশান, না আছে ব্যাঙ্ক ব্যালান্সের চিন্তা, না আছে অসুখ বিসুখের চিন্তা, খাচ্ছে দাচ্ছে ঘুরে বেড়াচ্ছে, জন্মালে মরতে হবে মরে আবার জন্ম নিতে হবে এই নিয়ে তাদেরও কোন মাথা ব্যাথা নেই। অর্জুনকে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন - *তান্যহং বেদ সর্বাণি ন ত্বং বেত্থ পরন্তপ*, আমার আগের আগের সব জন্মের কথা মনে আছে, কিন্তু তোমার মনে নেই, কারণ তুমি বদ্ধ জীব।

ভগবান হচ্ছেন নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত, তিনি সব সময় এই নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত স্বভাব নিয়েই বিরাজ করছেন। আর তাঁর জ্ঞানশক্তি সব সময় পরিষ্কার, জ্ঞান অনাবৃত, জ্ঞান কোন কিছু দিয়ে আচ্ছাদিত নয়। সেইজন্য কোন কিছুই তাঁর মন থকে হারিয়ে যায় না। আমাদের জ্ঞানশক্তি আবৃত, শাস্ত্রের কিছু ভালো কথা শুনলাম, দুদিন পরে ভুলে যাচ্ছি। তার মানে যে জ্ঞানটা এসেছিল সেটা আবৃত হয়ে যাচ্ছে। শাস্ত্রের কথা না হয় ছেড়ে দিলাম, আমি গতকাল সকাল আটটার সময় কি করছিলাম বলতে পারবো না, মনে করতে হলে অনেকক্ষণ চিন্তা করতে হবে। কিন্তু ভগবানের এই সমস্যা হয় না। পাপ-পূণ্য বোধ আমাদের মত সাধারণ লোকেদের কর্মের মাধ্যমে বেঁধে ফেলে। এই পাপ-পূণ্য বেঁধে নেয় বলে আমাদের জন্মটাও এই পাপ-পূণ্যানুসারে হয়। আমরা যেমন যেমন কাজ করছি, এই কাজ থেকে যেমন যেমন পাপ-পূণ্য হচ্ছে, এই পাপ-পূণ্যই আমাদের পায়ে দড়ি দিয়ে বেঁধে টেনে নিয়ে সেই রকম যোনিতে নিয়ে ফেলবে। কিন্তু যিনি ভগবান তাঁকে কোন কর্মই স্পর্শ করতে পারছে না, যেহেতু তাঁর কোন পাপও নেই পূণ্যও নেই। ভগবান যখন জন্ম নেন, তিনি যখন শরীর ধারণ করেন, মায়া যেমন আমাদের পায়ে দড়ি দিয়ে বেঁধে জন্ম নেওয়াচ্ছে, ভগবানকে মায়া সেইভাবে নিয়ে আসতে পারে না, তিনি স্বেচ্ছায় আসেন স্বেচ্ছায় চলে যান। তাই ভগবানের আমাদের মত জন্ম হয় না। আমাদের জীবাত্মা যে রকমটি কাজ কর্ম করছে, জীবাত্মারও সেই রকমটি শক্তি হয়, আর সেই রকম কর্মে গিয়েই আবার জন্ম নেয়। সেখানে গিয়ে আবার কর্ম করে করে বেরিয়ে আবার সেই রকম স্বভাব অনুসারে জন্ম নেয়। ভগবানের এই রকম কোন কিছু হয় না। তিনি যখন মনে করেন মানবজাতিকে পথ দেখাতে আমাকে পৃথিবীর বুকে জন্ম নিতে হবে তখন তিনি দেখেন পূণ্যকর্মা কে আছেন,

পূণ্যকর্মা বাবা-মাকে দেখে নিয়ে তিনি সেই বাবা-মার গর্ভে গিয়ে আশ্রয় নেন। ঐখান থেকে জন্ম নিয়ে তাঁর কাজকর্ম এগোতে থাকে। ভগবান কিভাবে দেহধারণ করেন?

**অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্। প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া।।৬।।**

ভগবান বলছেন, আমি *অজঃ,* আমার জন্ম হয় না। যার জন্ম হচ্ছে সে কখনই ভগবান নয়। সেইজন্য শঙ্করাচার্য গীতার ভাষ্যে প্রথমের দিকে বলছেন – মনে হয় তিনি যেন জন্ম নিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ ভগবান নন, যিনি ভগবান তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ রূপ দেহকে আশ্রয় করেছেন। জন্মের যে কারণ অবিদ্যা, পাপ-পূণ্য, এগুলো ভগবানের থাকে না, তিনি নিজের ইচ্ছে মত শরীর ধারণ করেন। আমরা যদি এখন ভেবে রাখি এর পরের জন্মে আমি অমুকের বাড়িতে জন্ম নেব, আমাদের দ্বারা সেই বাড়িতে জন্ম নেওয়া কখনই সম্ভব হবে না। জন্ম বলতে যেভাবে বোঝায় ভগবানের সেই অর্থে জন্ম হয় না, তাঁর নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত স্বভাব। ভগবান যদি না চান তাহলে তিনি জন্ম নেবেন না, তিনি যদি জন্ম নিতে চান তাহলে কোথাও তিনি একটা আশ্রয় ঠিক করে নেবেন। কিন্তু আমাদের নাকে মায়ার দড়ি বাঁধা। ভগবান যখন ঠিক করেন আমি এই পৃথিবীতে আসব, তখন শ্রীকৃষ্ণ কি রথে করে আকাশ থেকে এসে মাটিতে নামবেন আর রথ থেকে তাঁর সুদর্শন চক্র নিয়ে নামবেন? তাহলে লোকে আগে সেখান থেকে পালাবে। তিনি যখন আসেন মানুষের মতই আসেন আর মানুষ যেভাবে জন্ম নেয় তিনিও সেইভাবেই মানব শরীর ধারণ করেন।

*ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্,* আমি সমস্ত ভূতের ঈশ্বর, যাবতীয় যা কিছু আছে সব কিছুর মালিক আমি। তারপরে বলছেন, *প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া,* এই প্রকৃতি আমারই, ত্রিগুণাত্মিকা মায়া এটা আমারই, এই প্রকৃতিকে বশীভূত করে একে অধিষ্ঠান করে যেন শরীর ধারণ করি। আমি যখন আসব ঠিক করি তখনও আমি এই প্রকৃতির মালিক, যখন আসি তখনও এই প্রকৃতির মালিক আমি, যখন শরীরে অবস্থান করছি তখনও আমি এর মালিক। কিন্তু আমরা কি কখনও ভাবছি যে আমরা প্রকৃতির মালিক? যদি ভাবতাম আমি প্রকৃতির মালিক তাহলে দুটো পয়সার জন্য সকাল সন্ধ্যে ট্রেনে বাসে গলদঘর্ম হয়ে কাজ করার জন্য, মালিকের গালাগাল খাওয়ার জন্য এত দৌড়াদৌড়ি করতাম না। *সম্ভবামি আত্মমায়য়া,* আমার নিজের মায়ার শক্তিকে বশীভূত করেই আমি শরীর ধারণ করি, আমাকে কেউ টেনে হিঁচড়ে নামাতে বাধ্য করতে পারে না।

সাধারণ জীব আর ভগবানের মধ্যে তফাৎটা কোথায়, সাধারণ জীবের মধ্যেও সেই শুদ্ধ চৈতন্য, সেও ভগবান, কিন্তু সে যে শুদ্ধ পরমাত্মা এটা সে ভুলে গেছে, তার প্রকৃত স্বভাবকে মনে করতে পারছে না। সেইজন্য সাধারণ জীবের জন্মকে জন্ম বলা হয়। কিন্তু যিনি সাক্ষাৎ ভগবান, তিনি যখন জন্ম নিচ্ছেন তখনও তিনি জানেন যে আমি সেই শুদ্ধ চৈতন্য। সেইজন্য তাঁর এই জন্ম নেওয়াকে বলা হয় লীলা, তিনি মানব শরীরে অবতরণ করছেন বলে তাঁকে বলা হয় অবতার। যিনি অবতরণ করেন, যিনি এই জীবলোকে নেমে আসেন, তিনিই অবতার। সবাইকেই তো এই জীবলোকে নামতে হচ্ছে, ভগবানও নামছেন, তাহলে কিসের তফাৎ রইল অবতারের সাথে সাধারণ জীবের? সাধারণ জীবকে টেনে নামান হচ্ছে, কিন্তু ভগবানকে কেউ টেনে নামাতে পারেন না, তাঁর ইচ্ছে হলেই তিনি নামেন, স্বইচ্ছায় নামছেন। সাধারণ জীব মায়ার অধীনে থাকে, মায়াই তাকে নাকে দড়ি দিয়ে টেনে নামাচ্ছে, এইটাই শুধু পার্থক্য। কোন অবস্থাতেই ভগবানের স্বরূপের জ্ঞান ঢাকা পড়ে না, সেইজন্য এই শরীরধারণকে বলা হচ্ছে লীলা। দেখাচ্ছে যেন তিনি জন্ম গ্রহণ করলেন, তাঁর শরীর খারাপ করছে, তিনি গোপীদের সাথে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, লড়াই করছেন, রাগারাগি করছেন। এত কিছু তিনি করছেন কিন্তু কোন কর্মেই তাঁর কর্তৃত্ব বোধ নেই, কারণ কর্তৃত্ব বোধ আসে মায়া থেকে, আর তিনি হচ্ছেন মায়ার মালিক। সাধারণ জীব মায়ার অধীনে আছে, আর এই সাধারণ জীব কেন মায়ার অধীনে রয়েছে, এটাই তার মুর্খামি। এবার বলছেন ভগবান কখন ইচ্ছে করেন যে এখন আমি শরীর ধারণ করব?

**যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত। অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্।।৭।।**
**পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্। ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।।৮।।**

ধর্মের যখন গ্লানি হয়, কোন্ ধর্মের গ্লানির কথা বলছেন ভগবান? ব্রাহ্মণ্য আর ক্ষত্রিয় ধর্মের যখন গ্লানি হয় তখন ভগবান আসেন। কখন তিনি দেখান ক্ষত্রিয় ধর্ম আবার কখন তিনি দেখান ব্রাহ্মণ্য ধর্ম। শ্রীরামচন্দ্র অবতারে ক্ষত্রিয় ধর্মের পুনোরথান করা হয়েছিল। অন্য দিকে স্বামীজী ঠাকুরকে উদ্দেশ্য করে স্তোত্র রচনা করে বলছেন – অবতারবরিষ্ঠায়। ঠাকুর ছিলেন ব্রাহ্মণত্বের অবতার, ব্রাহ্মণত্ব অবতারে ঠাকুর শুদ্ধ, বিশুদ্ধ যে জ্ঞান, সেই জ্ঞানকে সামনে নিয়ে এসেছেন। শ্রীরামচন্দ্র ক্ষত্রিয় বংশে জন্ম নিয়েছিলেন যাতে দেখাতে পারেন ক্ষত্রিয় ধর্মের তেজ ও প্রতাপটা কি রকম।

তারপরে বলছেন *অভ্যুত্থানমধর্মস্য,* যখন অধর্মের খুব প্রভাব বেড়ে যায়, অধর্মের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে শঙ্করাচার্য বলছেন – অভ্যুদয় আর নিঃশ্রেয়স এই দুটোর যখন হানি হয়ে যে পরিস্থিতি হবে সেই পরিস্থিতিই অধর্মের অভ্যুত্থানকে আহ্বাণ করে নিয়ে

আসবে। এই সৃষ্টি হচ্ছে ভগবানের নিজের কিনা, তাই তিনি তাঁর সৃষ্টিকে অত সহজে বিনাশ হয়ে যেতে দেন না। যে কোন সমাজের যখন খুব হীনদশা প্রাপ্ত হয়, সমাজের সব মূল্যবোধ যখন খুব নীচের দিকে চলে যায়, তখন ভগবান কাউকে নিজের শক্তি দিয়ে দেন, সে তখন ভগবানের শক্তিতে সেই সমাজকে আবার দাঁড় করিয়ে দেন। যেমন মহম্মদের আগে মুসলিম সমাজ অত্যন্ত বর্বর ও হীন জাতিতে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। আল্লা তখন মহম্মদকে বেছে নিয়ে বলে দিলেন – মহম্মদ, তুমি আমার লোকেদের এই মন্ত্র দাও, তাহলে এরা বাঁচবে। এখানে ভগবান স্বয়ং আসেননি, কারণ ভগবানকে নিজে আসতে হলে আরও অনেক শুদ্ধতা পবিত্রতার দরকার।

অধর্ম দুটো ব্যাপারে হচ্ছে, প্রথম হচ্ছে বর্ণাশ্রম ধর্ম হীনদশা প্রাপ্ত হয়। আর দ্বিতীয় হচ্ছে অভ্যুদয় আর নিঃশ্রেয়স, মানব সমাজের সার্বিক সুখ-শান্তি-স্বাচ্ছন্দ-আনন্দ সব সময় নির্ভর করে জাগতিক উত্থানের উপর, এই জাগতিক উত্থান যখন কমে যায়, আর নিঃশ্রেয়স, মনের যে ত্যাগ বৈরাগ্যের ভাব সেটা কমে যায়। এই দুটোই যখন কমে যায় তখন অধর্ম বেড়ে যায়। জাগতিক উত্থান না হলে আমাদের ঘর-সংসার চলবে না, সমাজের শৃঙ্খলা নষ্ট হয়ে যাবে, অন্য দিকে জ্ঞান বৈরাগ্য প্রাপ্তির ইচ্ছেটাও স্তিমিত হয়ে যায়।

তখনই *পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্,* ঐ ভাবে যখন ধর্মের হানি হয়ে অধর্ম খুব বেড়ে যায় তখন সেখানকার সাধুদের, যারা বর্ণাশ্রম ধর্ম পালন করতে চাইছেন তাদের পরিত্রাণ করবার জন্য, আর যারা এর বিরোধী, যারা অধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করছে তাদের বিনাশ করে আবার ধর্মকে ঠিক পথে চালিত করতে *সম্ভবামি যুগে যগে,* আমি যুগে যুগে আসি। ইসলাম ধর্মে মহম্মদ বলছেন আমিই শেষ অবতার, কিন্তু হিন্দু ধর্মের অবতার আসতেই থাকবেন, অবতারের আসা কখন শেষ হবে না। হিন্দুধর্মে যারা বর্ণাশ্রমের বিরোধী আর অপরকেও বর্ণাশ্রম ধর্ম পালন করতে দেয় না তাদেরকেই অসুর বোঝায়। এরা এখন পশু হয়ে গেছে। নিজে যদি না পালন করে তাহলেও কিছুটা ঠিক আছে, সেতো তখন ম্লেচ্ছ হয়ে গেছে। কিন্তু যখন অপরকেও করতে দেবে না তখন এরা পশু হয়ে গেল। এখন ভারতে যে নতুন প্রজন্ম এসেছে, এরা এখানকার প্রথম অবস্থাটাকে অবলম্বন করেছে, নিজেরা কিছুই পালন করবে না, এর পরের ধাপ হবে অপরকেও করতে দেবে না, কি খালি খলি ঠাকুরের নাম করছ দিনরাত। তখন বুঝতে হবে ভগবানের আবার আসার সময় হয়ে গেছে।

এই অধ্যায় ভগবান এই বলে শুরু করেছিলেন যে, তিনি জ্ঞাননিষ্ঠা শেখাবেন, কর্মসন্ন্যাস শেখাবেন। কিন্তু মাঝখান থেকে তিনি বিষয়টা থেকে সরে গেলেন। কেন সরে গেলেন? শুরুতেই অর্জুন হঠাৎ একটা প্রশ্ন করে বসল। যার জন্য চতুর্থ অধ্যায়ের মূল বক্তব্যের মধ্যে ভগবান এখনও ঢুকতেই পারলেন না। একটু পরেই বক্তব্যতে তিনি এসে পড়বেন। মাঝখানে তিনি অবতারতত্ত্বটা অর্জুনকে বুঝিয়ে দিতে গিয়ে আরও কিছু কথা বলছেন।

**জন্ম কর্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ। ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জুন।।৯।।**

ভগবান বলছেন, যারা আমার স্বভাবকে ঠিক ঠিক তত্ত্বতঃ জানেন, আমার যেমনটি স্বভাব ঠিক তেমনটি জানেন। কি স্বভাব? আমার জন্ম আর আমার কর্ম। আমার জন্ম মৃত্যু সবটাই মায়া। আমরা মনে করি শ্রীরামকৃষ্ণ ফাল্গুন মাসের শুক্লা দ্বিতীয়ায় জন্মালেন, আসলে তা নয়। ভগবানের জন্ম হচ্ছে মায়া। চন্দ্রমণির গর্ভে আসা, তাঁর জন্ম হওয়া, বড় হওয়া সবটাই মায়া। আমাদের ক্ষেত্রে এগুলো মায়া, আমাদের টেনে হিঁচড়ে এখানে সেখানে জন্ম নেওয়াচ্ছে, কিন্তু তিনি সব সময় জানেন যে আমার এগুলো সবই মায়া, সবই লীলা। তিনি তাঁর স্বরূপ সম্বন্ধে সব সময় অবহিত। আর তাঁর কি কর্ম? আমরা মনে করি গদাধর চট্টোপধ্যায় কোথাও চাকরি পেলেন না, তাই দক্ষিণেশ্বরে পুরোহিত বামুনের কাজ নিলেন, এইটাই তাঁর কর্ম। কিন্তু তা নয়, তাঁর একটাই কর্ম – *পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।* আর কি কর্ম? *ধর্মসংস্থাপনার্থায়,* সাধুদের রক্ষা করা, দুষ্কৃতের বিনাশা আর ধর্ম স্থাপন করা, এই তিনটেই হচ্ছে ভগবানের ঠিক ঠিক কর্ম। এই তিনটের বাইরে ঠাকুরের আর কোন কাজ নেই। আমাদের ক্ষেত্রে আমরা যে কাজই করছি সেটি ঠাকুরের কাজ ভেবে নিজেকে পরিশুদ্ধ করে নিজেকে উপরে নিয়ে আসছি কিন্তু ঠাকুরের নিজের কাজ ও উদ্দেশ্য যখন বলতে হয় তখন এই তিনটেই হচ্ছে ঠাকুরের ঠিক ঠিক কাজ।

জেহাদীরা যে অপরের গলা কাটছে, বোমা মারছে, এরাও ভাবছে আমরা ভগবানের কাজই করছে। জেহাদীরা তাদের ভাব অনুসারে যেটাকে ধর্ম মনে করছে, সেই ধর্মের বিরুদ্ধে যারা যাচ্ছে তাদের শেষ করে দাও। কিন্তু এদের চিন্তা ভাবনার মধ্যে গোলমাল আছে। এখানে বলা হচ্ছে ঈশ্বরের একটা কাজ হচ্ছে দুষ্কৃতের বিনাশ করা। দুষ্কৃতের ব্যাখ্যা করে শঙ্করাচার্য বলছেন – তারাই দুষ্কৃত যারা বর্ণাশ্রম ধর্মকে নাশ করতে চাইছে, সামাজিক স্থিতিশীলতাকে যারা ক্ষুণ্ন করে দিচ্ছে, আর যারা আততায়ী। আততায়ী আবার তাদেরকেই বলা হবে – যারা বিষ প্রয়োগ করে মারার চেষ্টা করে, যারা বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেয়, অপরের স্ত্রীকে অপহরণ করে ইত্যাদি। এদেরকে প্রাণদণ্ড দেওয়া যায়, কিন্তু অন্য অবস্থায় এদেরকে মারতে পারবে না। কিন্তু জেহাদীরা সামাজিক স্থিতিশীলতাকে আগেই নাশ করে দিচ্ছে, আর এরা সামনা সামনি এসে লড়াই করছে না, লুকিয়ে চুরিয়ে মানুষকে খুন করছে, বোমা মারছে। কিন্তু আমাদের সমাজে বর্ণাশ্রম ধর্মকে যখন কেউ ভাঙতে চাইবে তখন তাদের বলবে তোমরা সামনা সামনি এসে লড়াই কর। লুকিয়ে

চুরিয়ে আত্মগোপন করে মানুষকে খুন করার অনুমতি আমাদের হিন্দুধর্মে কোথাও অনুমতি দেওয়া হয় না। তাছাড়া কেউ শুধু মাত্র অন্য ধর্ম পালন করছে, অন্য ভাষা ব্যবহার করছে, অন্য পোষাক পরিধান করছে বলে তাকে মেরে দাও, যেটা জেহাদীরা করছে, এই ধরণের কাজকে হিন্দু ধর্ম কখনই প্রশ্রয় দেয় না। কিন্তু আপনার ধর্মকে আঘাত করছে, আপনার স্ত্রীদের অপহরণ করে নিচ্ছে, তখন আমাকে এর প্রতিরোধ করতেই হবে, কেননা এরা হচ্ছে আততায়ী।

মূল কথা হচ্ছে, যদি আমি জানি শ্রীরামকৃষ্ণের জন্ম হচ্ছে মায়া, আর তাঁর কর্ম হচ্ছে এই তিনটে, সাধুদের পরিত্রাণ, দুষ্কৃতের বিনাশ আর ধর্ম সংস্থাপন, এই তিনটে আর এই তিনটের যে কোন একটি, এর বাইরে ভগবানের আর কোন কর্ম নেই, এই জানাটাই তখন তত্ত্বতঃ জানা। যার জন্য আমরা কখন ঠাকুরকে টাকা পয়সা সঞ্চয় করতে দেখিনি, কামিনীর প্রতি আসক্তির কোন গন্ধই ছিল না, নিজের নাম যশ প্রচারের জন্য এতটুকুও চেষ্টা করেননি। ঠাকুরের একটাই কাজ ধর্ম সংস্থাপন।

ঠাকুরের কাজ যদি কেউ ঠিক ঠিক করতে চায়, ঠাকুরের সেবা যদি কেউ করতে চায় তার এই তিনটে কাজই করতে হবে – সাধু সেবা করা মানেই সাধুর ত্রাণ, দুষ্টের বিনাশ, তুমি আমাদের ধর্ম পথে বাধা দিচ্ছ তোমাকে আমরা পরিহার করব। আর ধর্ম সংস্থাপন, ধর্ম সংস্থাপনের জন্য যে আমাকে সন্ন্যাসী হতে হবে বা একটা প্রাইভেট আশ্রমের সেক্রেটারি হতে হবে তা একেবারেই নয়। খুব ছোট্ট জায়গা থেকেই এই ধর্ম সংস্থাপনের কাজ করা যায়। যারা ভক্ত তাদের দুজনের মধ্যে দেখা হলেই ঠাকুরের কথা, ধর্মের কথা আলোচনা করার জায়গায় বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য কি করল, মমতা বন্দোপাধ্যায় কি করল এই নিয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা আলোচনা শুরু করে দেবে। দুটো ধর্ম কথা, দুটো ভালো কথা কি আলোচনা করা যায় না! যারা ভক্ত তাদের কজন ট্রেনে বাসে যাওয়ার সময় সীটে বসে কথামৃত পড়েন কিংবা লীলাপ্রসঙ্গ পড়েন, বা কোন ধর্মগ্রন্থ পড়েন, লোকে দেখুক যে এত লোকের মধ্যেও এমন একজন আছে যে ঈশ্বরের চিন্তন করছে। বাড়িতে নিয়মিত ধর্মচর্চা করা যাতে বাড়ির লোকেরাও অনুপ্রাণিত হতে পারে। আমাদের বেশির ভাগই জানে না যে ঠিক ঠিক ধর্ম কাকে বলে, যদিও দুই একজন জানে, কিন্তু তাদের ক্ষমতাই নেই যে অন্যকে ধর্ম পথে নিয়ে আসবে।

কিন্তু যে আমার এই দিব্য জন্ম ও দিব্য কর্মের রহস্যকে জেনে যান তার আর – *ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জুন* – তার আর পুনর্জন্ম হয় না। ঈশ্বর তত্ত্ব যত দিন না জানতে পারছে ততদিন এই জন্মমৃত্যু চক্রের মধ্যে ঘুরতেই থাকবে। এর পর বলছেন –

**বীতরাগভয়ক্রোধা মন্ময়া মামুপাশ্রিতাঃ। বহবো জ্ঞানতপসা পূতা মদ্ভাবমাগতাঃ।।১০।।**

অর্জুন, এর আগে আগেও যাদের মধ্যে এই গুণ গুলো ছিল, যারা ক্রোধ, মোহাদিকে নিয়ন্ত্রণ করে বশে নিয়ে এসেছিলেন তাদের সদ্‌গতি হয়ে গেছে, মানে তাঁদের আর পুনর্জন্ম হবে না। *মন্ময়া,* আমার যে ঠিক ঠিক স্বরূপ সেই স্বরূপের সাথে এক হয়ে যায়, অভেদ দর্শন, ঈশ্বরের সঙ্গে যাঁর ভাব এক হয়ে গেছে, এইটাই হচ্ছে *মন্ময়া*। যিনি জ্ঞানী তিনি মনে করেন আমি শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে এক। শঙ্করাচার্যের মতে এই অভেদদর্শী যতক্ষণ না হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত তার কিন্তু মুক্তি নেই। অভেদদর্শীর আগে তিনি জানছেন যে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হচ্ছে দিব্য, তাঁর জন্ম সাধারণ লোকের মত হয় না, আর দিব্য কর্ম, মানে আগে অবতারের যে তিনটে কর্মের কথা বলা হল সেটাই হচ্ছে ভগবানের দিব্য কর্ম। এরপর যখন অভেদদর্শী হয়ে যায়, মানে আমি ঈশ্বরের সঙ্গে এক, তারপর আর তার কোন জন্ম হবে না।

ভগবান চতুর্থ অধ্যায়ের মূল বক্তব্যে এখনও প্রবেশ করেননি, এখনও তিনি অর্জুনের মাঝখানে যে হঠাৎ প্রশ্ন এসেছিল, সেই প্রশ্নের মধ্যে ঘুরপাক করছেন। ভগবানের এই কথা শুনে যাতে অর্জুনের মনে আবার কোন প্রশ্ন না আসতে পারে, যেমন অর্জুন হয়তো বলতে পারে, তাহলে তো হে শ্রীকৃষ্ণ, আপনি কাউকে মুক্তি দেন আবার কাউকে মুক্তি দেননা, যে আপনাকে ভালোবাসে, আপনাকে যে জানছে তাকেই আপনি মুক্তি দেন, আর যে আপনাকে জানতে পারছে না, ভালোবাসতে পারছে না, তাকে আপনি মুক্তি দেননা, তাহলে তো আপনি পক্ষপাতিত্ব করছেন, আপনার মধ্যে তাহলে দ্বেষ ভাব আছে। তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, আমার কোন দ্বেষভাব বা পক্ষপাতিত্ব নেই। কেন নেই বলছেন?

**যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্। মম বর্ত্মানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ।।১১।।**

গীতার এই অধ্যায়ের এগারো নং শ্লোকটি একটি অত্যন্ত মূল্যবান শ্লোক, এই কারণে যে ভগবান এখানে সবার জন্য এক আশ্বাস, ভরসার বাণী শোনাচ্ছেন। বলছেন, আমাকে যে যেভাবে চায় আমি তাকে সেইভাবেই কৃপা করি। *যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে,* যার যেমন ভাব, সেই ভাব অনুযায়ী আমার দিকে মানুষ এগিয়ে আসে। ভাব হচ্ছে চারটে, যেটা আবার সপ্তম অধ্যায়ে ভগবান বলবেন, আর্ত, জিজ্ঞাসু, আর্থি আর জ্ঞানী। দুঃখ, রোগ, শোকে কাতর হয়ে যখন ভগবানের কাছে যারা যাচ্ছে এরা হচ্ছে আর্ত, যাদের ভোগ-

বাসনার জন্য, টাকা-পয়সার জন্য, সমাজে মান-যশের আকাঙ্খা করে ভগবানের কাছে যাচ্ছে এরা হচ্ছে আর্থি, তখন তারা সেই রকম ফল পায়, ভগবানের ব্যাপারে পঞ্চাশ রকমের জিজ্ঞাস্য নিয়ে ভগবানকে জানতে চাইছে তারা হচ্ছে জিজ্ঞাসু, আর শেষে হচ্ছে জ্ঞানী। যে জ্ঞানী পুরুষ, মানে যিনি ভগবানের তত্ত্বকে জানে, ভগবান তাঁকে মোক্ষ প্রদান করেন। এরা কিন্তু সবাই আমাকেই অনুসরণ করে। এখানে বলছেন *প্রপদ্যন্তে,* যে আমার শরণাগতী নেয়, শরণাগত হয়ে তুমি যাই চাইবে, সে তুমি এই চারটে যে কোন একটা ভাবকে আশ্রয় করেই এসে থাকো না কেন, আমি আমার শরণাগতকে তার ভাব অনুযায়ীই সব কিছু দিই। শরণাগতীর ভাব না যদি আসে তাহলে কিন্তু কিছুই হবে না। *মম বর্ত্মানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ,* যদিও মানুষ তার নিজের স্বভাব অনুযায়ীই কাজ করে যাচ্ছে, কিন্তু অনুসরণ সে আমাকেই করে চলেছে, আমি যেমনটি পথ দেখিয়ে এসেছি সবাই ঠিক তেমনটিই করে। যেমন ঠাকুর, ঠাকুরের কত ভাব, তিনি কত ভাবে সাধনা করেছেন, একেক সময় একেক দিব্যভাবে থাকতেন। ইদানিং যাঁরা ঠাকুরের ভক্ত তাঁরা এই ভাবগুলোকেই নিজের স্বভাব অনুযায়ী অনুকরণ করার চেষ্টা করে সাধনা করে যাচ্ছেন। শ্রীকৃষ্ণ যেভাবে জীবন যাপন করেছেন, ঠাকুর যেভাবে জীবন পরিচর্যা করে যে আদর্শ স্থাপন করেছিলেন, তাঁদের এই আদর্শ ও ভাব কোন না কোন ভাবে হিন্দু তথা মানবজাতিকে প্রভাবিত করে চলেছে।

হে ভগবান, যখন আপনি এতই দামী কথা বললেন, আপনার কাছে যে যেমনটি চায় আপনি তাকে সেই ফলই প্রদান করেন, কিন্তু সবাই অন্য কিছু আপনার কাছে না চেয়ে মুক্তি চেয়ে নিলেই তো পারে, তাহলেই তো সব ঝামেলা চুকে যায়। ভগবান বলছেন, না সবাই মুক্তি চাইতে পারে না। ঠাকুরের খুব সুন্দর গল্প আছে এই নিয়ে, একবার নারদ ভগবান বিষ্ণুকে বলছেন, সবাইকেই তো আপনি বৈকুণ্ঠেলোকে নিয়ে আসতে চাইলে নিয়ে আসতে পারেন। হ্যাঁ পারি, ঠিক আছে নারদ, তুমি যাকে ইচ্ছে খুশি বৈকুণ্ঠে নিয়ে এসো। মর্তে এসে প্রথমেই নারদের একটা গুবরে পোকার সঙ্গে দেখা হল। গুবরে পোকাকে দেখে নারদের খুব কষ্ট হল, ইস্ কি নোংরা গোবরের মধ্যে পড়ে আছে বেচারা – তুই কি নোংরা গোবরের মধ্যে পড়ে আছিস, চল্ তোকে আমি বৈকুণ্ঠে নিয়ে যাব, কিরে যাবি তো বৈকুণ্ঠে? গুবরে পোকা শুনে বলছে – হ্যাঁ হ্যাঁ, অবশ্যই যাব, কিন্তু বৈকুণ্ঠে এর থেকে ভালো গোবর পাওয়া যাবেতো? এই কথারই উত্তর ভগবান এখানে দিচ্ছেন –

**কাঙ্ক্ষন্তঃ কর্মণাং সিদ্ধিং যজন্ত ইহ দেবতাঃ। ক্ষিপ্রং হি মানুষে লোকে সিদ্ধির্ভবতি কর্মজা।।১২।।**

মানুষের মনে নানান রকমের ভোগ বাসনা গিজ্‌গিজ্ করছে, এই ভোগ যাতে ভালো করে চরিতার্থ করতে পারে সেইজন্য এরা *যজন্ত ইহ দেবতাঃ,* বিভিন্ন দেবতাদের পূজো করে। এখন যত বড় বড় আইএএস, আইপিএস অফিসার আছে, মন্ত্রি, এমপি, এমএলএ আছে এরাই হচ্ছে এখনকার দিনের দেবতা, লোকেরা এদেরকেই পূজো করে, সকালবেলাই গুডমর্নিং দিয়ে *যজন্ত* শুরু হয়। যেমন যেমন এই সব দেবতাদের পেছনে ঘুরতে পারবে তত তার প্রমোশন হবে, এটা সেটা ভালো ফল পাবে। কিন্তু এরাও যে ফলটা দিচ্ছে সেই ফলটাও ভগবানের কাছ থেকেই আসছে। এদের কারুরই ক্ষমতা নেই ফল দেবার। আমার মনে এই ভাবটি আছে যে, আমার প্রমোশন হোক, আমার যাতে খারাপ জায়গায় বদলি না হয়ে যায়, আমার এসিআরে ভালো ভালো কথা লেখা হোক, এই সব কিছু ভগবানই দেন, আমরা এগুলো বুঝতে পারিনা। আমি যে এইসব দেবতার পূজো করছি, ভগবান এগুলোকে কোথাও নিষেধ করবেন না যে তুমি এদের পূজো করো না। তবে নবম অধ্যায়ে গিয়ে ভগবান বলবেন – কি দুঃখের কথা, দেবতাদের খুশি করতে গিয়ে এরা যা পরিশ্রম আর সময়ের অপচয় করছে, অথচ ফল আমিই দিচ্ছি, কিন্তু দেবতাদের পূজো না করে যদি আমাকে পূজো করত তাহলে একই পরিশ্রম আর একই সময় খরচ করে সে দুটোই পেত, আমার প্রতি ভক্তিটাও পেত আর ফলটাও পেত। কিন্তু এতে শুধু একটি জিনিষই পাচ্ছে। যে লোকটি যে পরিশ্রম আর সময় লাগিয়ে পাঁচ হাজার টাকার চাকরি করছে সেই একই পরিশ্রম আর সময় লাগিয়ে যদি সে দশ হাজার টাকার চাকরি পায় তাহলে এই চাকরি করবে কিনা? অবশ্যই করবে। কিন্তু আমরা বেশির ভাগই ভগবানকে ছেড়ে দিয়ে আজকে শীতলার পূজো, কাল শনিদেবতার পূজো, পরশু অমুক বাবার পূজো করে বেড়াচ্ছি। গীতা বলছে, তুমি সব ছাড়, ছেড়ে দিয়ে একমাত্র তোমার ইষ্টকে ধর, তাঁর কাছে তুমি সব কিছুই পাবে। এখান ওখান থেকে, এর তার কাছ থেকে যা কিছু পাচ্ছি সব তিনিই দেন, মাধ্যমটা শুধু আলাদা। মা যখন বাচ্চাকে দুধ খাওয়ায়, তার ব্যবস্থা ভগবানই করেন। সবাইকে ভগবান সবার কর্মানুসারে খাইয়ে যাচ্ছেন, আমাদের এগুলো বোঝার ক্ষমতাই নেই। তার উপর আমাদের না আছে সেই শ্রদ্ধা, না আছে নিষ্ঠা, না আছে ভক্তি, আর না আছে প্রাণপাত করা খাটনি। কম করে কুড়ি বছর খাটুক তারপর অন্য কথা হবে। একটা এমএ ডিগ্রি নিতেই পনেরো ষোল বছর খাটতে হচ্ছে, আর ভগবানের ভক্তি ডিগ্রি চাইছি, দীক্ষা নিয়েই বলছি আমার তো কিছু হচ্ছে না। কুড়ি বছর নাই খাটুক, অন্ততঃ দশ বছর খাটুক। তার উপর আবার ভোগের বিরাট লিস্ট, বাড়ি আছে, জমি আছে, বউ আছে, ছেলেপুলে আছে, টিভি দেখা আছে, জন্মদিন, বিবাহবার্ষিকী, বিয়ে বাড়ি, শ্রাদ্ধবাড়ি, অন্নপ্রাশন এগুলো তো আছেই, সব কিছু মিটিয়ে দিনে দশ পনেরো মিনিট ঠাকুরের জন্য বরাদ্দ করা হচ্ছে। সেখানেও আবার বলবে ঠাকুর তোমার জন্য এই সময়টা দিলাম, তুমি কিন্তু আমাকে দেখো। ভগবানের বয়ে গেছে।

*ক্ষিপ্রং হি মানুষে লোকে সিদ্ধির্ভবতি কর্মজা,* এই মনুষ্যলোকে কাম্য কর্মের ফল গুলি খুব তাড়াতাড়ি পেয়ে যায়। কারণ, শাস্ত্রজ্ঞান, বর্ণাশ্রম ধর্ম থাকাতে সিদ্ধি খুব সহজে পেয়ে যায়। এর পর থেকে ভগবান ধীরে ধীরে মূল বক্তব্য কর্মসন্ন্যাসের দিকে নিয়ে যাবেন।

**চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ। তস্য কর্তারমপি মাং বিদ্ধ্যকর্তারমব্যয়ম্।।১৩।।**

জগতে যে চারটি বর্ণ দেখছ, এই চারটি বর্ণ আমি এই জগৎকে সুষ্ঠু ভাবে চালনা করার জন্য সৃষ্টি করেছি। যদিও এই চারটি বর্ণ আমি সৃষ্টি করেছি কিন্তু এই চারটি বর্ণের সাথে আমার কোন ধরণের সম্পর্ক নেই, এর কোন কিছুর মধ্যেই আমি কিন্তু জড়িয়ে নেই। আমার যদি এই বোধ থাকে আমি এই চারটে বর্ণ তৈরী করেছি, তাই আমিই এদের কর্তা, তাহলে তো আমি সংসারী হয়ে গেলাম। কেন আমি অকর্তা আর অসংসারী? এর পরের শ্লোকে তারই উত্তর দিচ্ছেন –

**ন মাং কর্মাণি লিম্পন্তি ন মে কর্মফলে স্পৃহা। ইতি মাং যোঽভিজানাতি কর্মভির্ন স বধ্যতে।।১৪।।**

*ন মাং কর্মাণি লিম্পন্তি,* কোন কর্ম আমাক স্পর্শ করতে পারে না। এটা গেল বাইরের দৃষ্টি থেকে, আর ভেতরের দিক থেকে *ন মে কর্মফলে স্পৃহা,* কর্মের যে ফল তাতে আমার কোন স্পৃহা নেই। আমরা যে এত বন্ধন বন্ধন বলছি, এই বন্ধন বা বদ্ধাবস্থা কখন আসছে? যখন কাজের প্রতি আমাদের আসক্তি হয় আর কর্মফলের প্রতি স্পৃহা হয় তখনই এই বন্ধনের অবস্থা পাকা হয়। আজকাল অনেক বড় বড় অফিসের সাহেবরা যারা চাকরি করছে বা যারা বড় বড় ডিগ্রি নিয়ে কাজের আশায় বসে আছে তাদের অনেককে বলতে দেখা যায় যে, আমার টাকা পয়সা কে কি দেবে তাতে কোন আগ্রহ নেই, আমার job satisfaction হলেই হল। এইটাই ভগবান এখানে বলছেন, এই যারা job satisfaction বলছে তারা কিন্তু মহা বন্ধনে পড়ে আছে। আর যারা job satisfaction চাইছে না তারা কি বলছে? কাজ যাই করি না কেন তাতে আমার কোন মাথা ব্যাথা নেই আমার package টা কেমন হবে। মানে আমাকে কত মাইনে দিচ্ছে। একজন বলছে I don’t care for perks, I want job satisfaction, আরেকজন বলছে, যে কাজই আমাকে করতে হোক না কেন তাতে আমার কোন মাথা ব্যাথা নেই, আমার কত মাইনে হবে সেটাই আমার লক্ষ্য। দুজনেই কিন্তু গীতার দৃষ্টিতে, আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকোণ থেকে সমান মহা বন্ধনে পড়ে গেল। যে পয়সার প্রতি আসক্ত সে যেমনটি বন্ধনে পড়ে আছে, ঠিক সেই একই বন্ধনে পড়ে আছে যে কর্মের প্রতি আসক্ত। কিন্তু ভগবান বলছেন – আমার কাজের প্রতিও আসক্তি নেই আর কাজ যদি কখনও করি তাহলেও সেই কাজের ফলের প্রতিও আমি আসক্তি শূন্য, করতে হবে তাই করলাম।

এরপর বলছেন, ভগাবানের কর্মে কোন আসক্তি নেই আর কর্মফলেও কোন আসক্তি নেই, ভগবানের এই তত্ত্বকে যিনি জেনে গেছেন তাঁকে আর কোন কর্ম বন্ধনে আবদ্ধ করতে পারবে না।

মানুষকে কখন তার পাপকর্ম কিছু করতে পারেনা, কিন্তু পাপবোধটাই তাকে শেষ করে দেয়, মানে পাপবোধের সঙ্গে যখন কেউ নিজেকে একাত্ম করে নেয় তার আর বাঁচার কোন পথ নেই। স্বামী গম্ভীরানন্দ প্রায়ই একটা খুব প্রচলিত গল্প বলতেন। এক শিবভক্ত রোজ মন্দিরে খুব নিষ্ঠা সহকারে শিবের পূজা করে। ঐ মন্দিরের কাছেই আরেকটি লোক থাকত যে কিনা শিবঠাকুর ঠুকুর বলে কিছু মানে না বিশ্বাসও করে না। সেই লোকটি রোজ মন্দিরে ঢুকে দেওয়ালে পিঠ দিয়ে শিবলিঙ্গের উপর বুট জুতো শুদ্ধু পা দুটো তুলে বসে থাকত। একদিন শিবভক্ত লোকটি মন্দিরে পূজো করতে গেছে। মন্দিরের ভেতরটা খুব সঙ্কীর্ণ, খুব বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে সে নড়াচড়া করে, সেদিন কি করে শিবলিঙ্গে তার একটা পা ঠেকে গেছে। শিবলিঙ্গে পা ঠেকতেই শিব খুব রেগে গিয়ে বলছেন – আমার গায়ে পা ঠেকিয়েছিস! এক্ষুণি ব্যাটা তোকে ত্রিশুল দিয়ে শেষ করে দেব। ভক্তটি শিবের রাগ দেখে অবাক হয়ে গেছে, শিবকে বলছে – ঠিক আছে, আপনি আমাকে শেষ করে দিতে চাইছেন দিন, আমার কোন আপত্তি নেই। কিন্তু তার আগে আমার একটা কথার উত্তর আপনাকে দিতে হবে। আমার এত নিষ্ঠা, এত সেবা, এত ভক্তি সেটাতে কিছু হল না আর একটু পা ঠেকল কি ঠেকল না তাতেই আপনি আমার উপর এত কঠোর দণ্ড চাপিয়ে দিলেন, আর ঐ লোকটা রোজ আপনার মাথার উপর জুতো শুদ্ধু পা রাখছে তাকে কিছু বলছেন না। শিব তখন বলছেন – আরে ব্যাটা, ওতো আমাকে মানে না, ও যদি মানত তাহলে কি করতাম দেখতিস্। তুই মানিস বলে তোকে ক্ষমা করছি না। পাপবোধে একটা যে জিনিষ হয় তা হল, একটা জিনিষে তার পাপবোধ নাও হতে পারে কিন্তু অন্য একটা জায়গায় গিয়ে সে বিপদে পড়ে যেতে পারে। তার ফলে পাপবোধের এই চক্রটা চলতে থাকে। এখানে না হোক অন্য কোথাও গিয়ে এই পাপবোধটা এসে যাবে। কিন্তু মূল কথা হচ্ছে, ঈশ্বরের তত্ত্ব যে বুঝে গেছে, তাকে আর কোন কিছুই স্পর্শ করতে পারেনা।

এরপরে তিনি চতুর্থ অধ্যায়ের মূল দার্শনিক তত্ত্বে প্রবেশ করছেন, বলছেন যোগী কে?

**এবং জ্ঞাত্বা কৃতং কর্ম পূর্বৈরপি মুমুক্ষুভিঃ। কুরু কর্মৈব তস্মাত্ত্বং পূর্বৈঃ পূর্বতরং কৃতম্।।১৫।।**

এর আগের আগের যাঁরা মুক্তি লাভেচ্ছু মুমুক্ষু আধ্যাত্মিক সাধকরা ছিলেন তাঁরা এই মনোভাব নিয়েই কাজ করতেন। অর্জুন, তুমিও এই মনোভাব নিয়েই কাজ কর, সন্ন্যাস তোমার জন্য নয়। এখানে একটা মজার ব্যাপার হচ্ছে, অর্জুনকে ভগবান বলছেন তোমার জন্য সন্ন্যাস নয়, তোমাকে কর্ম করতে হবে, অথচ এই চতুর্থ অধ্যায়ে ভগবান কর্মসন্ন্যাসের শিক্ষা দিচ্ছেন। এখানে ভগবানের কাছে কর্মসন্ন্যাসের তত্ত্ব শোনার পর পঞ্চম অধ্যায়ে গিয়ে আবার অর্জুনের কাছে অন্য এক সমস্যা এসে যাবে। অর্জুন ঠিক করতে পারবে না যে, কাজ করাটা ঠিক, না কাজ না করাটা ঠিক। অর্জুনকে ভগবান এটাকেই আবার পরিষ্কার করে বলতে চাইবেন, তুমি যদি আত্মজ্ঞানী না হয়ে থাক তাহলে তোমার অন্তঃকরণ শুদ্ধির জন্য কাজ কর। আর তুমি যদি মনে কর তুমি জ্ঞানী হয়ে গেছ, তাহলে লোকসংগ্রহের জন্য, মানুষকে পথ দেখাবার জন্য কাজ কর। যে দিকেই যাও না কেন কাজ তোমাকে করতেই হবে, তুমি কাজ একেবারে ছেড়ে দিতে পারবে না। আমি জানি তুমি এখনও জ্ঞানী হওনি, তাই কাজ তোমাকে করতেই হবে। তাই কর্ম বলতে ঠিক কি বোঝায় সেটা তোমাকে বুঝিয়ে দিচ্ছি –

**কিং কর্ম কিমকর্মেতি কবয়োঽপ্যত্র মোহিতাঃ। তত্তে কর্ম প্রবক্ষ্যামি যজ্জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ।।১৬।।**

কর্ম কি আর অকর্ম কি নির্ধারণ করতে গিয়ে বড় বড় পণ্ডিত ঋষিদেরও মাথা ঘুরে যায়, তাঁরাও ঠিক ঠিক ধরতে পারেন না। এই কর্মটা করা ঠিক হবে কি ঠিক হবে না, এই ব্যাপারে আমরা অনেকেই বিমূঢ় হয়ে পড়ি। সাধারণ লোকের কথা ধর্তব্যের মধ্যেই নয়, পণ্ডিতদের কাছেও সহজবোধ্য নয়, তাই আমি তোমাকে কর্ম আর অকর্মের মধ্যে কি পার্থক্য বলব যাতে তুমি অশুভ প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পার।

তোমাকে আমি কর্ম, বিকর্ম আর অকর্ম এই তিনটে জিনিষের পর্যালোচনা করে বুঝিয়ে দেব। কেন তোমাকে ব্যাখ্যা করব? কারণ –

**কর্মণো হ্যপি বোদ্ধব্যং বোদ্ধব্যঞ্চ বিকর্মণঃ। অকর্মণশ্চ বোদ্ধব্যং গহনা কর্মণো গতিঃ।।১৭।।**

কর্মের গতি অতি সূক্ষ্ম, সবাই ধরতে পারেনা। তাই আগে তোমাকে কর্ম, বিকর্ম মানে নিষিদ্ধ কর্ম আর অকর্ম বা নিষ্ক্রিয়তা কি বলে দিলে কর্মের গতিকে কিছুটা ধারণা করতে পারবে। ভগবান এখানে তিনটে শব্দকে নিয় এসেছেন – ১) কর্ম, বিধি – কর্ম বলতে বোঝাচ্ছে শাস্ত্র বিহিত কর্ম। শাস্ত্র যেটা করতে বলছে বা আদেশ করছে সেটাই কর্ম, সেই কর্মই করতে হবে। ২) বিকর্ম, নিষেধ – শাস্ত্র বর্জিত কর্ম, শাস্ত্র যেটা করতে বারণ করছে সেই কাজকে বলা হয় বিকর্ম। যেমন মুসলমানদের শাস্ত্রে বলা আছে চারটে বিয়ে করতে পারে, পঞ্চম বিয়ে করতে পারবে না। এখন যদি কেউ পঞ্চম বিয়ে করে তখন সেটা বিকর্ম হয়ে যাবে। ৩) অকর্ম – কোন কাজ না করে নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকা। কাজ না করে বসে থাকা অজ্ঞানীদের জন্য নয়, এটা জ্ঞানী বা সন্ন্যাসীদের জন্য বলা হচ্ছে।

এর পরের শ্লোকটি খুব কঠিণ শ্লোক, অনেকেই বুঝতে পারেন না। ব্যাসদেব গণেশ ঠাকুরকে অনুরোধ করে বলেছিলেন আমি মহাভারতের শ্লোক বলে যাব আর আপনি সেই শ্লোক গুলোকে লিপিবদ্ধ করুন। গণেশ ঠাকুর বলেছিলেন, আমি লিখতে রাজী আছি কিন্তু আমার কলম যদি একবার থেমে যায় তাহলে আমি কিন্তু আর লিখব না। তার মানে ব্যাসদেবকে অনর্গল বলে যেতে হবে, থামলে চলবে না। তখন ব্যাসদেবও একটি শর্ত আরোপ করলেন – ঠিক আছে আমি অনর্গল বলে যাব, কিন্তু আমার প্রত্যেকটি শ্লোকের অর্থকে আপনার বুঝে নিয়ে লিখতে হবে। বলা হয় ব্যাসদেব মহাভারতে আট হাজার আটশ খানা কূট শ্লোক ঢুকিয়েছেন। এই শ্লোক গুলোর অর্থ এত জটিল যে গণেশ ঠাকুরেরও মাথা ঘুরে গিয়েছিল। অর্থ পরিষ্কার করবার জন্য গণেশ ঠাকুর যতক্ষণ কলম থামাচ্ছেন ততক্ষণে ব্যাসদেবও আরও শ্লোক মাথার মধ্যে নিয়ে এসেছেন। এই আঠারো নং শ্লোকটি অবশ্যই এই কূট শ্লোক গুলোর মধ্যে পড়ে। খুব ধুরন্ধর লোক না হলে এই আঠারো নং শ্লোকের অর্থকে ধরা খুব কঠিন। এই শ্লোকটিই আবার জীব আর ঈশ্বরের মধ্যে যে পার্থক্য, জ্ঞানী ও অজ্ঞানীর মধ্যে যে তফাৎ সেটাকে স্পষ্ট করে দিচ্ছে। বলছেন –

**কর্মণ্যকর্ম যঃ পশ্যেদকর্মণি চ কর্ম যঃ। স বুদ্ধিমান্ মনুষ্যেষু স যুক্তঃ কৃৎস্নকর্মকৃৎ।।১৮।।**

যিনি বুদ্ধিমান, যাঁর সব কর্ম করা হয়ে গেছে, তিনি অকর্মে কর্ম দেখেন আর কর্মে অকর্ম দেখেন। এইটাই হচ্ছে জ্ঞানীর ঠিক ঠিক লক্ষণ। শঙ্করাচার্য এখানে এক বিরাট ব্যাখ্যা দিয়েছেন। যিনি জ্ঞানী, যখন কেউ কাজ করছে তিনি দেখেন আত্মা কিন্তু কোন কর্মই করছেন না, তিনি পরিষ্কার দেখছেন সব কাজ হয়ে যাচ্ছে কিন্তু আত্মা নিষ্ক্রিয়, তিনি কোন কাজই করছেন না। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে উপদেশ দিচ্ছেন, তাঁর হাত পা নড়ছে, মুখ নড়ছে, শরীরের নানা রকমের সঞ্চালন ক্রিয়া চলছে, যিনি জ্ঞানী তিনি তখন দেখছেন,

শ্রীকৃষ্ণের যে বাস্তবিক সত্তা হচ্ছে শুদ্ধ চৈতন্য আত্মা, আর আত্মা এই ক্রিয়ার মধ্যে জড়িয়ে নেই। তার মানে জ্ঞানী এখানে কর্মে অকর্ম দেখছেন। তাহলে কে কর্ম করছে? দেহ আর ইন্দ্রিয়গুলোই কর্ম করে যাচ্ছে, সেখানে আত্মা কোন কর্ম করছে না। আর *অকর্মণি চ কর্ম যঃ*, যারা সাধারণ মানুষ, অজ্ঞানী, তারা কাজ কর্ম থেকে হাত পা গুটিয়ে বসে আছে, এখন এইভাবে সে বিছানায় শুয়ে থাকতে পারে আবার ঠাকুরের সামনে স্থির হয়ে বসে থাকতে পারে। এখন আমরা বাইরে থেকে দেখে বলছি সে কোন কাজ করছে না। কিন্তু যেহেতু সে জিতেন্দ্রিয় নয়, তাই তার মন ভেতরে কাজ করে যাচ্ছে, এমনকি তার মনে আর কিছু না হোক সে কিন্তু ভাবছে আমি চুপ করে বসে আছি, এই যে ভাবছে আমি চুপ করে বসে আছি তার মানে তার বুদ্ধিটা কাজ করে যাচ্ছে। যারা বুদ্ধিমান তারা দেখছেন সে হাত পা গুটিয়ে বসে আছে কিন্তু তার মনটা কাজ করে যাচ্ছে। তার মানে যিনি জ্ঞানী তিনি জ্ঞানীর কাজে অকাজ দেখছেন আর অজ্ঞানীর অকাজে কাজ দেখছেন।

এবার মনে করুন, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের রথে বসে সারথির কাজ করছেন আর অর্জুনকে বিভিন্ন নির্দেশ দিয়ে যাচ্ছেন। সেখানে শ্রীরামকৃষ্ণ দাঁড়িয়ে সব দেখছেন, তিনি বাকিদের বলছেন যে – দ্যাখো সবাই এরা যুদ্ধ করছে। কিন্তু তিনি শ্রীকৃষ্ণের ব্যাপারে কি বলবেন? ঠাকুর বলবেন, শ্রীকৃষ্ণ যত যাই করুন না কেন, তাঁর মনটা সেই আত্মাতেই পড়ে আছে, আত্মা কোন কাজ করেন না, শ্রীকৃষ্ণের ঠিক ঠিক যে বাস্তবিক সত্তা সে কিন্তু কোন কাজ করছেন না। তাঁর দেহ ইন্দ্রিয় সব কাজ করছে, কিন্তু দেহ ইন্দ্রিয়ের সাথে তাঁর কোন সংযোগ নেই। এর বিপরীতে শ্রীকৃষ্ণ যদি দক্ষিণেশ্বরে দাঁড়িয়ে দেখেন তিনিও দেখবেন যে শ্রীরামকৃষ্ণ কোন কাজ করছেন না, তাঁর দেহ ইন্দ্রিয়ই কাজ করছে, শ্রীরামকৃষ্ণের মন আত্মাতে সংলগ্ন হয়ে আছে। শ্রীরামকৃষ্ণের যে বাস্তবিক স্বরূপ সেই আত্মাতে তিনি পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছেন।

দক্ষিণেশ্বরে হাজরা কোন কাজ করছে না, দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের ঘরের উত্তরের বারান্দায় চুপচাপ বসে জপ করছেন। ঠাকুর হাজরাকে বলছেন – ঢ্যাম্না শালা, বাড়িতে মা কান্নাকাটি করছে, টাকা-পয়সা নেই, দেনা শোধের চেষ্টা নেই। ঠাকুর এগুলোকে বলছেন ধাপ্পাবাজী। হাজরা জপ ধ্যান করছে কিন্তু ঠাকুর নিন্দা করছেন। কেন নিন্দা করছেন ঠাকুর? হাজরা এখানে নিষ্কর্মা হয়ে হাত পা গুটিয়ে বসে আছে, কিন্তু মাথার মধ্যে বোঁ বোঁ করে কার থেকে কত টাকা ধার করব, কিভাবে দেনা শোধ করবে এই সব চিন্তা ঘুরছে। মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে, মনটাকে আত্মাতে স্থির করা। কিন্তু আত্মাতে স্থির করতে পারছে না অথচ হাত পা গুটিয়ে চুপ করে নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে আছে। বাইরে থেকে দেখে সবার মনে হচ্ছে সে নিষ্ক্রিয় কিন্তু ভেতরে মন চরকির মত ঘুরছে, মানে মন সক্রিয়। কিন্তু আমি যদি আত্মাতে প্রতিষ্ঠিত থাকি আর তখন আমার হাত পা যদি চলতেও থাকে তাতেও আমি কোন কর্মে যুক্ত হচ্ছি না, আমি স্থির আছি। কিরকম হয় ব্যাপারটা – বাতাসে আমার গায়ের চাদরটা নড়ছে, কিন্তু আমি কি নড়ছি? আমার চাদর নড়ছে আমি নড়ছি না, আমি স্থির আছি। ঠিক এই রকম আত্মজ্ঞ পুরুষের আত্মাটা স্থির আছে। যাঁর এই বোধ হয়ে গেছে, যিনি জ্ঞানী আর অজ্ঞানীর এই পার্থক্যটা নিরূপণ করে নিয়েছেন, *স বুদ্ধিমান্ মনুষ্যেষু*, তিনিই মনুষ্য জাতির মধ্যে বুদ্ধিমান। সেই হচ্ছে *যুক্তঃ*, তিনিই যোগে প্রতিষ্ঠিত, সেই হচ্ছে *কৃৎস্নকর্মকৃৎ*, তিনিই সব কর্মের কর্তা হয়ে নিজেকে ধন্য মনে করেন, তাঁর আর কর্তব্য কর্ম বলে কিছু থাকে না, সমস্ত কর্ম থেকে সে মুক্ত হয়ে গেছে।

শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে যদি বলতেন – চল অর্জুন তোমাকে জগৎটা দেখিয়ে নিয়ে আসি, কে জ্ঞানী আর অজ্ঞানী তোমাকে দেখিয়ে দিচ্ছি। তখন তিনি অর্জুনকে দেখাচ্ছেন – দ্যাখো দ্যাখো অর্জুন ঐ যে শ্রীরামচন্দ্র যুদ্ধ করছেন, উনি হচ্ছেন জ্ঞানি, উনি কিন্তু যুদ্ধ করছেন না, ওনার দেহ ইন্দ্রিয় যুদ্ধ করছে। চিকাগোতে নিয়ে এসেছেন অর্জুনকে – ঐ দ্যাখো স্বামী বিবেকানন্দ বক্তৃতা দিচ্ছেন, এই আরেকজন জ্ঞানী পুরুষ, উনি কিন্তু এখানে কোন লেকচার দিচ্ছেন না, ওনার দেহ ইন্দ্রিয় লেকচার দিচ্ছে। অর্জুনকে নিয়ে আমাদের মত কয়েকজনকে দেখিয়ে বলছেন – এই যে এরা ধ্যান করছে এরা কিন্তু সবাই অজ্ঞানী, চুপ করে হাত পা গুটিয়ে বসে আছে কিন্তু মনে মনে কাজ করে যাচ্ছে আর ভোগ করে যাচ্ছে, এদের দেহ ইন্দ্রিয় সব স্থির কিন্তু মনটা চঞ্চল, আত্মাতে স্থিত নয়। দেহ ইন্দ্রিয়কে ঠিক ঠিক গোটান তখনই হবে যখন তোমার মন আত্মাতে গিয়ে একেবারে স্থির হয়ে যাবে।

আমি এটা ত্যাগ করলাম, আমি কাজ করব না, এটাও কর্ম, কারণ মন থেকে বলা হচ্ছে আমি ত্যাগ করলাম, আমি কাজ করব না। শ্রীরামকৃষ্ণের ক্ষেত্রে এই ভাবটা তাঁর হচ্ছে না, তাঁর এগুলো নিজে থেকেই খসে পড়ে গেছে, আলাদা করে কিছুই ফেলতে হচ্ছে না। অর্জুন বলছিল যে আমি যুদ্ধ করব না, আমি ভিক্ষুক হয়ে যাব, যুদ্ধ না করে কাজ করব না ভেবেছিল অর্জুন সেটা আর হল না, কারণ ভিক্ষা করাটাও তো কাজ। আমরা যখন কাজ করব বলছি, তখন শরীর ইন্দ্রিয় কাজ করছে, মনও বলছে কাজ করছি। ত্যাগের ক্ষেত্রেও এই একই ব্যাপার হচ্ছে, আমি যখন মুখে বললাম আমি কাজ করব না, তখন শরীর ইন্দ্রিয় হয়তো কাজ করছেন না, কিন্তু মনে মনে কাজ চলছে। হিন্দু শাস্ত্র মতে শরীর ও মনকে আলাদা করে দেখা হয় না। শরীর দিয়ে হয়তো কোন পাপ করছি না, কিন্তু মনে মনে কোন পাপ চিন্তা করলাম তখন সেটা পাপযুক্ত কর্মের মধ্যেই গণ্য হবে। মনে মনে যদি ভেবে থাকি আমি ওর ঐ জিনিষটা চুরি করব, আমি যদি চুরি না করেও থাকি তবুও তখন আমার কিন্তু চুরি করা হয়ে গেল। উচ্চ আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে শরীর

দিয়ে চুরি করলে যে পাপ হত, মনে মনে চিন্তা করে নেওয়ার পর সেই একই পাপ হল। ঠাকুর বলছেন, গৃহস্থের মনে ত্যাগ, বাইরে যা করার করুক। কিন্তু সন্ন্যাসীর মনে ত্যাগ আর বাইরে ত্যাগ দুটোই থাকতে হবে। কিন্তু যদি শাস্ত্রাদি পড়ে, সাধুসঙ্গ করার পর সংসারে এমন কিছু কাজ সামাজিক বা পারিবারিক কারণে আমাকে করতে হয় যেগুলো সাধুসঙ্গ করা বা শাস্ত্র অধ্যয়ণ করার আগে কিছুই মনে হত না, কিন্তু এখন মনে হচ্ছে ছিঃ এগুলো আমি কি করতে যাচ্ছি, এটাই হচ্ছে ঠিক ঠিক মনের ত্যাগের ক্ষেত্রে এক ধাপ এগিয়ে গেল। এই রকম ভাবে ভাবতে ভাবতে এক সময় মনে হবে এগুলো এবার না করলেই বাঁচি কিন্তু সামাজিক কারণে আমাকে বাধ্য হয়ে করতে হচ্ছে। এরপরের শ্লোকে বলছেন –

**যস্য সর্বে সমারম্ভাঃ কামসংকল্পবর্জিতাঃ। জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্মাণাং তমাহুঃ পণ্ডিতং বুধাঃ।।১৯।।**

পণ্ডিত কে? যিনি কোন সঙ্কল্প নিয়ে কর্ম করছেন না, আর সঙ্কল্প থাকলেও তার মধ্যে কোন কাম থাকে না। কাম আর সঙ্কল্প বর্জিত কোন কর্ম কর্তাকে কোন ভালো মন্দের বন্ধনে বদ্ধ করতে পারেনা। আমি এখানে গীতার প্রবচন শুনতে আসছি, এখানে আসার উদ্দেশ্যটা একটাই আমি শাস্ত্রের কথা জানতে চাইছি। তাহলে তো এটা সঙ্কল্প হয়ে গেল। কিন্তু এই সঙ্কল্পের পেছনে কোন কাম নেই। কারণ কামনা সব সময় তিন ধরণের হয় – পুত্রৈষণা, বিত্তৈষণা আর লোকৈষণা। এখানে এই তিনটের একটাও পাওয়ার জন্য আসছি না, আমার কটা টাকা হবে এই ভেবেও আসছি না, আমার খুব নাম-যশ হবে তাও ভাবছি না। আমার ভালো লাগে শাস্ত্রের কথা শুনতে তাই এসেছি, আমার আর অন্য কোন উদ্দেশ্য নেই। এইটাই হচ্ছে ঠিক ঠিক কর্মযোগ।

*যস্য সর্বে সমারম্ভাঃ*, যে কোন কর্ম প্রচেষ্টাই হচ্ছে *সমারম্ভাঃ*। এই রকম প্রত্যেকটি কর্ম প্রচেষ্টা কাম সঙ্কল্প বর্জিত হবে। সপ্তাহে দুটো দিন তিন ঘন্টার জন্য আমরা এখানে শাস্ত্র অধ্যয়ণ করতে আসছি, এটা হচ্ছে *কামসংকল্পবর্জিতাঃ*। কিন্তু যখন আমি চাকরি করতে যাচ্ছি তখন আমি জানি চাকরি করলে আমার দুটো টাকা হবে, সেই টাকা দিয়ে আমার সংসার চলবে, এই যে কাজ করতে যাচ্ছি এটা হচ্ছে সঙ্কল্প। আমাকে শরীর ধারণ যখন করতে হয়েছে তখন এই শরীর রক্ষার জন্য আমাকে কাজ করতেই হবে, কিন্তু যে কাজই করি না কেন তাতে যদি কোন সঙ্কল্প আর কাম থাকে তাহলে কিন্তু আমার বন্ধন হয়ে যাবে, বলছেন তুমি যে কোন কাজই করো না কেন তোমার সঙ্কল্প থাকবে, কিন্তু সেই সঙ্কল্পটা যেন কামজনিত না হয়, এখানে কাম মানে কাম, ক্রোধ, লোভ সব মিলিয়ে বলা হচ্ছে। সন্তান যখন অবাধ্যপনা করে তখন মা সেই সন্তানকে যখন শাসন করে দুটো চড় মারে তখন তার সেই চড় মারাটা কাম ক্রোধ মিশ্রিত নয়। কিন্তু যখন দিদি ভাইকে শাসন করে মারতে যায় তার মধ্যে ক্রোধ মেশান থাকে। কিন্তু সব সময় যে মা শিক্ষার জন্য সন্তানকে শাসন করছে তা নয়, অন্য কারুর উপর রাগ বা অভিমান হয়েছে সেটা নিজের সন্তানকে মেরে হয়তো মিটিয়ে নেয়, এই রকম যারা করে তারা সন্তানের কাছ থেকে সম্মান পায় না।

এখানে এইটাই শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে যে কে কি করছে সেদিকে তুমি তাকিও না, তুমি এই রকম কাম আর সঙ্কল্প বর্জিত হয়ে কর্ম কর। এইভাবে কর্মফলের স্পৃহাশূন্য হয়ে যখন তোমার চিত্ত পুরোপুরি শুদ্ধ হয়ে যাবে তখন তোমার জ্ঞানাগ্নি প্রজ্বলিত হবে, সেই জ্ঞানাগ্নিতে তোমার সমস্ত কর্ম দগ্ধ হয়ে যাবে, যাঁর এই রকম সমস্ত কর্ম দগ্ধ হয়ে যায় তাঁকে ঋষিরা পণ্ডিত বলছেন – *তমাহুঃ পণ্ডিতং বুধাঃ*।

সব থেকে উচ্চ অবস্থা হচ্ছে, তুমি জগৎকে বুঝে নিয়েছ, জগতের স্বরূপকে জেনে গেছে এখন তুমি সমস্ত কর্ম পুরোপুরি ত্যাগ করে দাও। এখন কোন কারণে যদি তুমি কর্ম ত্যাগ করতে পারলে না, যারা গৃহস্থ, সমাজে বাস করছেন তাঁদের পক্ষে কর্মত্যাগ অসম্ভব, তাহলেও তুমি কর্ম যা নিরুপায় হয়ে করতে হচ্ছে করে যাও কিন্তু ঐসব কর্মের ফল সমূহকে ত্যাগ করে দাও, ঐ ফলের পেছনে তুমি আর ছুটবে না। আমাকে বিয়ে বাড়িতে নেমন্তন্ন খেতে যেতে হবে, আমি যেতে চাইছি না, কিন্তু সামাজিক ও পারিবারিক কারণে যেতে হল। কিন্তু একবারও ভাবছি না এরা আমাকে কি খেতে দিল, কেমন আপ্যায়ন করল, ভালো হোক খারাপ হোক কোন দিকেই আমার নজর নেই, সব কিছুকে ভালো বলতে বলতে সেখান থেকে বেরিয়ে চলে এলাম। তখন কিন্তু আমাকে আর কর্ম স্পর্শ করতে পারবে না। আমি কেন বিয়ে বাড়িতে গেলাম? আমি জানি আমার পক্ষে এখন নেমন্তন্ন বাড়ি খাওয়াটা ঠিক নয়, কিন্তু এখানে কর্ম পরিত্যাগ অসম্ভব। মঠ মিশনের কোন সন্ন্যাসী যদি বলেন আমি কাল থেকে কোন কাজ করব না, পরের দিন তাঁকে মঠ থেকে বার করে দিয়ে বলবে তুমি রাস্তায় ভিক্ষা করে খাও। রাস্তায় সে ভিক্ষা করতে পারবে না, এখন সে কি করবে? তাকে মঠ থেকে যেমন যেমন কর্ম করতে বলা হবে তাঁকে সেই কর্ম করতে হবে, কিন্তু ঐ কর্ম ফলের ত্যাগ করাটাই হবে তাঁর তখন প্রাথমিক কর্তব্য। সর্বোচ্চ উচ্চাবস্থা হচ্ছে কর্মত্যাগ, কিন্তু জ্ঞানীর জন্য কর্মত্যাগ অজ্ঞানীর জন্য নয়। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ অবস্থা হচ্ছে কর্মফল ত্যাগ। কর্মফল ত্যাগ কি করে করতে বলছেন? যখন তুমি কোন কর্মের প্রচেষ্টা করতে যাচ্ছ, সেই সমারম্ভাতে তুমি কোন কাম বাসনার সঙ্কল্প করে করতে যেও না। আর দ্বিতীয় যখন কর্ম শেষ হয়ে গেলে তখন সেই কর্মের ফলকে নিয়ে মাতামাতি করতে যেও না, সেখান থেকেই তোমার পরিবর্তন হতে থাকবে। তারপরেই ভগবান অর্জুনকে বলছেন –

**ত্যক্ত্বা কর্মফলাসঙ্গং নিত্যতৃপ্তো নিরাশ্রয়ঃ। কর্মণ্যভিপ্রবৃত্তোঽপি নৈব কিঞ্চিৎ করোতি সঃ।।২০।।**

এইভাবে কর্ম করতে করতে, মানে কর্মফলে আসক্তি ত্যাগ করতে থাকলে তার মধ্যে একটা সদাতৃপ্ত ভাব এসে যাবে। তখন কোন কিছু অবলম্বন না করে কর্মে নিযুক্ত থেকেও তিনি প্রকৃত পক্ষে কোন কাজ করেন না, কোন কর্মই তাঁকে আর স্পর্শ করতে পারে না। তারপর বলছেন –

**নিরাশীর্যতচিত্তাত্মা ত্যক্তসর্বপরিগ্রহঃ। শারীরং কেবলং কর্ম কুর্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্।।২১।।**

সমস্ত আশা আকাঙ্খা তিনি ত্যাগ করে দিয়েছেন, কোন কিছুতেই তাঁর আর মন নেই। *শারীরং কেবলং কর্ম*, এই অবস্থায় যাঁরা পোঁছে যান, তাঁরা শরীরের স্থিতির জন্যই কাজ করেন। তিনি যখন বুঝে গেছেন যে আমার কোন বন্ধন নেই শুধু মাত্র শরীর রক্ষার জন্যই কাজ করতে হচ্ছে, তখন পাপ-পূণ্য, ভালো-মন্দ কোন কিছুই তাঁকে স্পর্শ করতে পারবে না। তারপরে বলছেন –

**যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্টো দ্বন্দ্বাতীতো বিমৎসরঃ। সমঃ সিদ্ধাবসিদ্ধৌ চ কৃত্বাপি ন নিবধ্যতে।।২২।।**

যা পেলো, যা এসে গেলো তাতেই সে সন্তুষ্ট। *যদৃচ্ছালাভ*, যেটা নিজে থেকে এসে গেছে তাতেই খুশি, এইটাই অজগরবৃত্তি। কিছু হল তো ভালো, না হলো তাতেও মনের মধ্যে কিছু হচ্ছে না। কোথাও কোন সঙ্কল্প নেই। সঙ্কল্প করে, পরিকল্পনা করে যখনই কিছু করা হয় সে কাজের মধ্যেই বিপদের সম্ভবনা। এই *যদৃচ্ছালাভ* যখন হয়ে যায় তখন সিদ্ধি হোক আর অসিদ্ধি হোক তাতে কোন অসুবিধা হয় না। এই অবস্থায় যদি সে ভিক্ষাদিও করে বেড়ায় সেখানেও সে অকর্তাই থেকে যায়। আসলে সমস্ত কিছুই হচ্ছে মনকে নিয়ে। যখন মন কাজে আসক্ত হচ্ছে, তার সাথে সাথে কাজের ফলেও আসক্ত হচ্ছে, তখনই এসে যাচ্ছে বন্ধন। মনের মধ্যে যদি এই আসক্তি না আসে তাহলে মুক্ত বিহঙ্গ। এখানে মনে রাখতে হবে এই শ্লোকে স্থিতপ্রজ্ঞের কথা বলা হচ্ছে না, যারা সাধক তাদের কথাই এখানে বলা হচ্ছে।

**গতসঙ্গস্য মুক্তস্য জ্ঞানাবস্থিতচেতসঃ। যজ্ঞায়াচরতঃ কর্ম সমগ্রং প্রবিলীয়তে।।২৩।।**

যাদের আসক্তি গত হয়ে গেছে এবং যাদের মন বা চিত্ত আধ্যাত্মিক জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত তারা যা কিছু করেন সবই যজ্ঞভাবে করেন, সেই কাজটাও আবার অনাসক্ত ভাবে করছেন। এদের *সমগ্রং প্রবিলীয়তে*, সমস্ত কর্ম লয় হয়ে যায়, পাপকর্ম, বিকর্ম সব নষ্ট হয়ে যায়। এইবার ভগবান আস্তে আস্তে যে বিষয়টাকে নিয়ে আলোচনা শুরু করেছিলেন সেখানে নিয়ে এসেছেন। এখন সেই বিষয় নিয়েই বলছেন।

তৃতীয় অধ্যায়ে আমরা একটা শ্লোক পেয়েছিলাম যেখানে বলা হয়েছিল, কর্ম যখন করবে তখন সেই কর্ম কিভাবে করবে, ভগবান তখন বলেছিলেন – *যজ্ঞার্থাৎ কর্মণোহন্যত্র লোকহয়ং কর্মবন্ধনঃ*, যখনই কাজ করবে যজ্ঞার্থে মানে যজ্ঞের মনোভাব নিয়ে করবে, যজ্ঞভাব ব্যতিরেকে যে কোন কর্মই কর্ম বন্ধনের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। এইখানে এসে ভগবান আবার সেই তত্ত্বটাকেই নিয়ে আসছেন, যে কর্মই তুমি কর না কেন সব কর্ম যজ্ঞের মনোভাব নিয়ে কর। এই ২৪ নং শ্লোকে যে যজ্ঞের কথা বলা হচ্ছে এটা হচ্ছে সব থেকে উচ্চ অবস্থার কথা, এর পরে আরও সাত আটটি যজ্ঞের কথা বলবেন যেগুলো এর থেকে একটু নিম্ন স্তরের। গীতাতে সব সময় দুটো স্তরের কথা বলা হচ্ছে, একটা হচ্ছে উচ্চ অবস্থার, আরেকটি হচ্ছে যারা এই উচ্চ অবস্থাকে পাওয়ার চেষ্টা করে যে কর্ম করে যাচ্ছে। উচ্চ অবস্থায় তাঁদের কাছে যেটা সিদ্ধি এদের কাছে সেটাই সাধনা। আমাদের এখানে সিদ্ধি আর সাধনায় কোন তফাৎ থাকে না। যদি সিদ্ধি আর সাধনায় কোন তফাৎ থাকে তাহলে সেই কাজটি করতে নিষেধ করা হয়। আধ্যাত্মিক কাজ আর জাগতিক কাজের তফাৎটা এইখানেই পরিষ্কার হয়ে যায়। আধ্যাত্মিক সাধনার ক্ষেত্রে এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

আধ্যাত্মিক কাজে কারক, ক্রিয়া আর ফল এক আর জাগতিক কাজ যারা করে তাদের কারক, ক্রিয়া আর ফল এই তিনটিই আলাদা। যাঁরা উচ্চ চিন্তা করেন তাঁদের কারক আলাদা কিন্তু ক্রিয়া আর ফল আলাদা হয়ে যায়। যেমন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, তাঁর এই বোধ আছে যে তিনি কবিতা রচনা করছেন। কবিতা লেখাটাই তাঁর কর্ম আর কবিতা রচনাতেই তাঁর আনন্দ। গান্ধীজী যখন অহিংসার অনুশীলন করছেন তখন তাঁর এই বোধ আছে যে আমি অহিংসার অনুশীলন করছি, কিন্তু অহিংসার অনুশীলন করে অহিংসাতেই প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাচ্ছেন, এখানে ক্রিয়া আর ফল এক হয়ে গেল। গান্ধীজীর উদ্দেশ্য অহিংসায় প্রতিষ্ঠিত হওয়া, তার জন্য তিনি অহিংসার অনুশীলন করছেন, পুলিশ যখন তাঁর উপর অত্যাচার করছে, তিনি বিনা প্রতিবাদে সহ্য করছেন। জাগতিক ক্ষেত্রে আমার মাংস বিরিয়ানি খেতে খুব ভালো লাগে, আমি যখন বিরিয়ানি খাচ্ছি আমার মনে তৃপ্তি ও আনন্দ হচ্ছে। এখানে ক্রিয়া হচ্ছে বিরিয়ানি খাওয়া কিন্তু ফল হচ্ছে অন্য, মনের তুষ্টি। যিনি ঠিক ঠিক আধ্যাত্মিক পুরুষ তাঁর ক্ষেত্রে কারক, ক্রিয়া আর ফল এই তিনটেই এক

হয়ে যায়। আধ্যাত্মিক পুরুষ দেখেন – কে কাজ করছে? আত্মা করছেন। কি করছেন? আত্মজ্ঞান করছেন। আত্মাকে জানার উপায় কি? আত্মজ্ঞান। সবটাই আত্মা, আত্মা ছাড়া আর কিছু নেই। এই ভাবটাকেই ২৪ নং শ্লোকে প্রস্ফুটিত করা হচ্ছে, যে মন্ত্রটি রামকৃষ্ণ মঠ মিশনের প্রত্যকে জায়গায় খাওয়ার আগে পাঠ করা হয়। কর্মের ব্যাপারে এই ভাবটি সব থেকে উচ্চ ভাব। এখানে এইটাই দেখান হচ্ছে যে আধ্যাত্মিক কর্মে কারক, ক্রিয়া আর ফল এই তিনটেই এক। কারকের আট রকমের বিভক্তি – কর্তা, কর্ম, করণ, সম্প্রদান, উপাদান, অধিকরণ, সম্বন্ধ ও সম্বোধন। আমরা যখন কোন বাক্য রচনা করি তখন কর্তা আর ক্রিয়া আবশ্যক। যেমন – আমি খাচ্ছি। আমি হল কর্তা আর খাওয়াটা হল ক্রিয়া। এখন আমি বললাম – আমি রুটি খাচ্ছি, এখানে ক্রিয়ার সাথে কর্মও এসে গেল। আমি হাতি দিয়ে রুটি খাচ্ছি, এবারে কর্মের সাথে করণটা এসে গেল। এই ভাবে বাক্যকে বিস্তার করা যেতে পারে – আমি থালা থেকে হাত দিয়ে রুটি খাচ্ছি। কিন্তু আত্মার উপরে কোন বিভক্তি লাগে না। ঠিক তেমনি কত রকমের ক্রিয়া আমরা করছি, আর প্রত্যেক ক্রিয়ার ফল আলাদা আলাদা। কিন্তু আত্মজ্ঞানের ক্ষেত্রে কারক, ক্রিয়া আর ফল এই তিনটিই এক।

**ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্। ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্মসমাধিনা।।২৪।।**

যজ্ঞ যখন করা হয় তখন অগ্নিকে প্রজ্বলিত করা হয়, সেই অগ্নিতে আহুতি দেওয়ার জন্য ঘৃত আছে, যেটা দিয়ে অর্পণ করা হবে সেই পাত্র আছে, যজ্ঞকর্তা আছে আর যজ্ঞের ফল আছে। বলছেন *ব্রহ্মার্পণং*, যিনি উচ্চতম জ্ঞানী তিনি সাক্ষাৎ দেখছেন যে পঞ্চ পাত্রাদির দ্বারা অগ্নিতে আহুতি দেওয়া হচ্ছে সেই পাত্রটিও ব্রহ্ম, *ব্রহ্ম হবিঃ*, যেটা অগ্নিতে দেওয়া হচ্ছে সেই ঘৃতও ব্রহ্ম, *ব্রহ্মাগ্নৌ*, যে অগ্নিতে দেওয়া হচ্ছে সেটাও ব্রহ্ম, *ব্রহ্মণা হুতম্*, অগ্নিতে আহুতি দেওয়ার যে ক্রিয়া পদ্ধতি সেটাও ব্রহ্ম, *ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং*, সমাহিত চিত্তে আহুতি দিয়ে যে তার উপলব্ধি হচ্ছে সেটাও ব্রহ্ম, তার যে ফল সেটাও ব্রহ্ম, সবটাই ব্রহ্ম। কারকের যত রকমের বিভক্তি আছে, ক্রিয়ার যত রকমের পদ্ধতি, কর্মের যত রকমের দিক আছে, পুরো কর্মটাই ব্রহ্ম, যিনি কর্তা তিনিও ব্রহ্ম, সব কিছুর যে ফল হচ্ছে সেটাও ব্রহ্ম।

আমরা যখন খাদ্য গ্রহণ করি তখন এই মন্ত্রোচ্চারণের মাধ্যমে এই ভাবটাই আরোপ করি। আমি যা খাচ্ছি সেটা ব্রহ্ম, যেখানে এই খাদ্যটা দেওয়া হচ্ছে সেই জঠরাগ্নি সেটাও ব্রহ্ম, যে হাত দিয়ে মেখে নিয়ে মুখে দিচ্ছি সেই হাত, মুখ এগুলোও ব্রহ্ম, খাদ্য গ্রহণে যে ফল হচ্ছে সেটাও ব্রহ্ম, যেটা আমাকে সেখানে নিয়ে যাবে সেটাও ব্রহ্ম। এটাই হচ্ছে সব থেকে উচ্চ ভাবের কর্ম। সব কর্মে এই ভাবটাকেই রাখা। ঠাকুর এই ভাবটাকেই বলছেন – আমি সত্যিই দেখতে পাচ্ছি, যে ছাগটাকে বলি দেওয়া হচ্ছে সেই ছাগটাও সেই সচ্চিদানন্দ, ছাগটাকে যে খুঁটিতে বাঁধা হয়েছে খুঁটিটাও সচ্চিদানন্দ, খড়্গটাও সচ্চিদানন্দ, যে বলি দিচ্ছে সেও সচ্চিদানন্দ। এই অবস্থাতে কি কারুর ক্রিয়া, কর্মের বোধ থাকবে, সবটাই সচ্চিদানন্দ। অষ্টাদশ অধ্যায়ে এই ভাবটাকেই আরও বিস্তারিত করে বলা হবে, সেখানে কারক, ক্রিয়া আর ফলকে আরও পরিষ্কার করে দেখান হবে। এই তিনটে জিনিষকেই সেই ব্রহ্ম বোধে নিয়ে যাচ্ছে, তাঁর বাইরে আর কিছু নেই।

বলছেন যাঁরা ব্রহ্মজ্ঞানী হয়ে যান তাঁদের কারক বুদ্ধির অভাব বোধ হয়ে যায়। আমি রুটিকে থালা থেকে ডালে ভিজিয়ে হাত দিয়ে খাচ্ছি। এখানে শব্দগুলির সাথে একটা করে বিভক্তি লাগছে আর পাল্টে যাচ্ছে। তখন ব্রহ্মজ্ঞানী কি বলবেন – ব্রহ্ম ব্রহ্মকে ব্রহ্ম দিয়ে ব্রহ্মের মধ্য দিয়ে ব্রহ্মতে আহুতি দিচ্ছে। ক্রিয়াটাও ব্রহ্ম তার ফলটাও ব্রহ্ম, ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছু নেই। পুরো গীতার মূল কথা এইটাই, এই ভেদ বুদ্ধির অভাব দেখানো। এইটাই হচ্ছে সর্বোচ্চ ভাব। কিন্তু আমাদের বেদে অনেক রকমের যজ্ঞের কথা বলা আছে। এই শ্লোকের পর ২৫ থেকে ৩২ শ্লোক পর্যন্ত সব যজ্ঞের সংক্ষেপে বর্ণনা করে শেষে বলবেন সব যজ্ঞই হচ্ছে ব্রহ্মের উপাসনা।

**দৈবমেবাপরে যজ্ঞং যোগিনঃ পর্যুপাসতে। ব্রহ্মাগ্নাবপরে যজ্ঞং যজ্ঞেনৈবোপজুহ্বতি।।২৫।।**

অনেকে আছেন যারা দৈব যজ্ঞ করেন, মানে ইন্দ্রাদি দেবতাদের উদ্দেশ্যে আহুতি দেন। আর ব্রহ্মযজ্ঞ হচ্ছে যখন জীবাত্মাকে ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে আহুতি দেন, তার মানে আত্মজ্ঞানে আহুতি দেওয়া অর্থাৎ যখন ধ্যান ধারণা করছেন। আর –

**শ্রোত্রাদীনীন্দ্রিয়াণ্যন্যে সংযমাগ্নিষু জুহ্বতি। শব্দাদীন্ বিষয়ানন্য ইন্দ্রিয়াগ্নিষু জুহ্বতি।।২৬।।**

অনেকে সংযম অনুশীলন করেন। সংযম করা মানে, নিজের যত শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয় আছে সেই ইন্দ্রিয়গুলিকে বিষয়ের দিকে এগোতে না দেওয়া। আর অনেকে আছে যারা ইন্দ্রিয়াদিকে এগোতে দেয় কিন্তু শাস্ত্র সম্মত যে বিষয়, বিষয় মানে ভোগ, শুধু মাত্র সেই সেই বিষয়ে ইন্দ্রিয়কে গ্রহণ করতে দেয়। এইটাই তার সাধনা। সাধনা অনেক রকমের হতে পারে, যেমন কিছু কিছু যোগী আছেন তাঁরা নিজদের চোখ, কান, নাককে তাদের বিষয়ের দিকে এগোতে দেবেন না, আবার অনেকে আছেন তাঁরা বলেন, না, এই অশান্তি তৈরী করে কোন লাভ নেই, শাস্ত্রে যতটুকু ভোগের কথা বলা আছে আমরা ততটুকুই ইন্দ্রিয়ের ভোগ করব। আবার আত্মসংযমের কথা বলা হচ্ছে –

**সর্বাণীন্দ্রিয়কর্মাণি প্রাণকর্মাণি চাপরে। আত্মসংযমযোগাগ্নৌ জুহ্বতি জ্ঞানদীপিতে।।২৭।।**

আবার কিছু কিছু সাধক আছেন যারা সব কিছু প্রাণে আহুতি দিয়ে দিচ্ছেন, মানে এগুলো হচ্ছে সব প্রাণেরই কাজ, এই বোধে তার কাজ করছেন। আমি কেন কথা বলছি? প্রাণশক্তি যেটা আছে এটাই নানান ভাবে প্রকাশ করছে, এই ভাবকে ধরে রেখে কথা বলছি। অন্য কেউ কেউ সব ব্যাপারে আত্মসংযম করছেন, এইটাই তাঁর কাছে যজ্ঞ।

**দ্রব্যযজ্ঞাস্তপোযজ্ঞা যোগযজ্ঞাস্তথাহপরে। স্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞাশ্চ যতয়ঃ সংশিতব্রতাঃ।।২২।।**

মানুষ অনেক রকমের যজ্ঞ করে, অনেকে দ্রব্য যজ্ঞ করে, মানে যখন তীর্থাদিতে যায় সেখানে মন্দিরে প্রণামী দিচ্ছে, সাধুদের সেবা করাচ্ছে, ভালো কর্মে দানাদি করছে, এটাই *দ্রব্যযজ্ঞা*। *তপোযজ্ঞা*, তপস্যা করছে, এটাই তার কাছে যজ্ঞ। যারা প্রাণায়ামাদি অনুশীলন করে মনকে একাগ্র করার চেষ্টা করছে এটাই *যোগযজ্ঞা*। আবার কেউ কেউ বেদাভ্যাস ও শাস্ত্রার্থজ্ঞানকে আহুতি দিয়ে যজ্ঞ করছে এটাই *স্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞাশ্চ*। এই রকম বিভিন্ন যজ্ঞের দ্বারা যোগীরা জীবনে কিছু পাওয়ার জন্য সাধনা করে যাচ্ছেন। শ্রীশ্রীমা জপযজ্ঞের প্রসঙ্গে বলেছেন, শ্রীশ্রীমা আবার বলছেন – যার আছে সে মাপো যার নাই সে জপো। মাপো মানে দ্রব্যযজ্ঞ, যার আছে সে দানাদি কর, আর যার নেই সে জপো, মানে জ্ঞানযজ্ঞ বলতে পারি আবার তপোযজ্ঞও বলা যেতে পারে। যে কেউ আধ্যাত্মিক জীবনে উন্নতি চাইছে তাকেই যজ্ঞ করতে হবে। শ্রীমা এত কথা না বলে খুব সহজ করে বলে দিলেন, যার আছে সে মাপো, যার নাই সে জপো। যজ্ঞ সবাইকেই করতে হবে।

**অপানে জুহ্বতি প্রাণং প্রাণেহপানং তথাহপরে। প্রাণাপানগতী রুদ্ধা প্রাণায়ামপরায়ণাঃ।।২৯।।**

যারা প্রাণায়াম করেন তারা নিঃশ্বাস গ্রহণ করে ভেতরে প্রাণ বায়ুকে ধরে রাখেন, আবার অনেকে প্রশ্বাস ছেড়ে প্রাণ বায়ুকে বাইরে ধরে রাখেন। প্রাণ ও অপানের গতিকে রুদ্ধ করাটাই তার আহুতি, এইটাই তার যজ্ঞ। যোগে এই প্রাণায়াম অনুমোদিত।

**অপরে নিয়তাহারাঃ প্রাণান্ প্রাণেষু জুহ্বতি। সর্বেহপ্যেতে যজ্ঞবিদো যজ্ঞক্ষপিতকল্মষাঃ।।৩০।।**

*অপরে নিয়তাহারাঃ*, কেউ কেউ নিয়মিত সংযম করে আহার করেন। সকাল, দুপুর, রাত্রি একটা নির্দিষ্ট মাপে আহার করেন, এর বাইরে সে কিছুই আহার করে না, এইটাই তার কাছে তপস্যা। আর, *প্রাণান্ প্রাণেষু জুহ্বতি*, প্রাণ বায়ুর পাঁচ রকমের রূপ আছে, প্রাণ, অপানা, সমানা, উদানা ও ব্যায়ানা। শরীরের বিভিন্ন অংশে প্রাণ বিভিন্ন রকম ভাবে কাজ করে, শরীরের উপরাংশে প্রাণ এক রকম ভাবে কাজ করে, শরীরের নীচের অংশে এক ভাবে কাজ করে তাকে আরেক রকম বলা হয়, এছাড়া হজম যে প্রাণ শক্তিতে হচ্ছে তাকে এক রকম বলা হয়। যাঁরা যোগী তাঁরা পরিষ্কার প্রাণের এই কাজগুলো দেখতে পান, তাঁরা তখন সেই প্রাণে আহুতি দেন। *সর্বেহপ্যেতে যজ্ঞবিদো যজ্ঞক্ষপিতকল্মষাঃ*, যত রকমের যজ্ঞের বর্ণনা করা হল যজ্ঞবিদরা তাঁরা এই যজ্ঞাগ্নিতে নিজেদের সমস্ত পাপকে আহুতি দিয়ে তাঁরা যজ্ঞ তত্ত্বকে জেনে গেছেন। আমাদেরও উচিৎ যা কিছু কর্ম করব, এমনকি জপও যজ্ঞ রূপে করতে হয়, দান করছি সেটাও যজ্ঞ রূপে দান করছি। যখন যজ্ঞ রূপে কিছু করা আরম্ভ হল, তখন যা কিছুই হয়ে যাক না কেন, ঐ কাজটাকে আর বন্ধ করা যাবে না। আমি যদি পশু, পাখিদের রোজ খেতে দিই আর এইটাকে যখন যজ্ঞ রূপে খেতে দেব তখন আমি দুদিন ধরে ট্রেনে করে গেলেও খাওয়াব। এই যে নানা রকমের যজ্ঞের বর্ণনা করা হল, যারা এই যজ্ঞ বুঝে নিয়ে নিত্য অনুশীলন করে তাদের সব পাপ শেষ হয়ে যায়।

**যজ্ঞশিষ্টামৃতভুজো যান্তি ব্রহ্ম সনাতনম্। নায়ং লোকোহস্ত্যযজ্ঞস্য কুতোহন্যঃ কুরুসত্তম।।৩১।।**

যজ্ঞ করার পর যা অবশিষ্ট থাকে সেটাই হচ্ছে সব থেকে পবিত্র, এই পবিত্র অবশিষ্টকে যারা গ্রহণ করেন তারাই সনাতন ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন। যারা যজ্ঞ বুদ্ধি না করে সব কিছু গ্রহণ করে, তারা এই লোকেই কোন সুখ ভোগ করতে পারেনা, পরের জন্মে আর কি সুখ ভোগ করবে। কথায় বলে 'যার আছে হেথা তার আছে সেথা', এখানে যারা ভোগ করছে তারাই ওখানে ভোগ করবে। স্বামীজী বলছেন – I do not believe in a God who cannot give me bread here but will give me eternal heaven after my death, আমি সেই ভগবানকে বিশ্বাস করি না যে ভগবান আমাকে এখানে এক টুকরো রুটি দিতে পারবে না অথচ মরার পর আমাকে স্বর্গে নিয়ে যাবে। সত্যিই আমাদের ধর্মে এই রকম ভগবানকে বিশ্বাস করা হয় না। আসলে যারা গরীব, যারা পতিত, আমাদের শাস্ত্র তাদের কোথাও কোন পথ দেখাচ্ছে না। পরিষ্কার করে বলে দিচ্ছে, তুমি যদি যজ্ঞ রূপে সব কিছু করতে পার তাহলেই তোমার সব কিছু হবে আর যারা যজ্ঞবিহীন, এই লোকের কথা বাদ দাও পরলোকেও তাদের কিছু হয় না। তার মানে, এই লোককে যে জয় করেনি ঐ লোকে তাদের কোন স্থান নেই। এই লোক যদি জয় করে থাক তাহলে ঐ লোক পেতেও পার নাও পেতে পার কিন্তু এই লোকই যদি জয় না করতে পার তাহলে তোমার কিছুই হবে না।

এইখানেই হিন্দু ধর্মের সাথে অন্যান্য ধর্মের বিরাট পার্থক্য ধরা পড়ে। *ইহৈব তৈর্জিতঃ সর্গো,* এই লোক কি তুমি জয় করেছ? তোমাকে এই লোকে সবাই মানে জানে? না মানে না। তাহলে তোমার ঐ লোকেও কিছু হবে না। এখানেই তোমাকে পোকা মাকড় হয়ে থাকতে হবে। স্বামীজীর একটা মজার কাহিনী আছে, এক মন্দিরে পাঁড়েজী বিকট সুরে গান গাইছে। স্বামীজী বলছেন – কি চেঁচাচ্ছ তখন থেকে। পাঁড়েজী বলছে – আমি ভগবানের মন ভজাচ্ছি। স্বামীজী বলছেন – আহাম্মক তুই আমারই মন ভজাতে পারছিস না ভগবানের কি মন ভজাবি। এইখানে যার কিছু নেই কোথাও তার কিছু হবে না। আমাদের যত কজন আধ্যাত্মিক পুরুষ ভারতে এসেছেন প্রত্যেকেই এই দুনিয়ার সর্বেসর্বা ছিলেন। শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, গৌতম বুদ্ধ, রাজা জনক, ঠাকুর, স্বামীজী এনারা এখানেও রাজা সেখানেও রাজা। এমন কি তুলসীদাস, কবীর দাস এনারাও রাজা, যা চাইতেন তাই পেয়ে যেতেন, তাদের প্রয়োজন সামান্যই ছিল কিন্তু দুনিয়াকে জয় করে নিয়েছিলেন। আধ্যাত্মিক জীবন হচ্ছে শক্তির জীবন। যার শক্তি নেই তার দ্বারা কিছুই হবে না, না আধ্যাত্মিক না জাগতিক, না অন্য লোক, কোনটাই হবে না। আগে শক্তি সঞ্চয় কর। কিভাবে শক্তি অর্জন করবে? কাজ কর। কিভাবে কাজ করবে? যজ্ঞ রূপে কাজ কর। তুমি নিজে কি ভাবে ভোগ করে জীবন ধারণ করবে? *যজ্ঞশিষ্টামৃতভুজো,* যজ্ঞের অবশিষ্টটুকু ভোগ কর। এইভাবে যদি সাধনা না কর তাহলে ভাই তোমার দ্বারা কিছুই হবে না। তারপর বলছেন –

**এবং বহুবিধা যজ্ঞা বিততা ব্রহ্মণো মুখে। কর্মজান্ বিদ্ধি তান্ সর্বানেবং জ্ঞাত্বা বিমোক্ষ্যসে।।৩২।।**

এই রকম অনেক যজ্ঞের কথা বেদে বলা আছে, কিন্তু সবটাই *কর্মজান্ বিদ্ধি,* সব যজ্ঞই কর্ম থেকে উৎপন্ন হচ্ছে। যত রকমের যজ্ঞ সব যজ্ঞই হয় কায়িক, নয়তো বাচিক, তা নাহলে মানসিক, এই তিন ভাবেই সব যজ্ঞ হচ্ছে। এইগুলোকে জেনেই তোমার মুক্তি হবে, তার আগে মুক্তি হবে না। যদি তোমার আত্মজ্ঞান হয়ে থাকে তাহলে তোমার সর্বোচ্চ অবস্থা হচ্ছে কর্মত্যাগ। যদি আত্মজ্ঞান না হয় তাহলে কর্মফলত্যাগ, আর এইটাও যদি না করতে পার তাহলে তুমি কর্ম কর আর মনে মনে ঠাকুরকে সব কর্মের ফল সমর্পণ করতে থাক। এইটাও যদি না পার তাহলে তোমার জন্য এই লোকও নয় সেই লোকেও কিছুই হবে না। পোকা মাকড়ের মত জন্মাবে আর মরবে। এই সব শাস্ত্র তোমার জন্য নয়। এইজন্য বলছেন, তুমি এই জগতে যা কিছু চাইছ, ব্রহ্মজ্ঞান চাও, আত্মজ্ঞান চাও, ভোগ চাও যাই চাও, যজ্ঞ ছাড়া তুমি কিছুই পাবে না। যারা মিনমিনে, পিনপিনে, কাঙালী, ভিখারী এরা কেউই যজ্ঞ করে না বলেই এত দুর্গতি। হিন্দু ধর্ম, গীতা কখনই এই ধরণের যজ্ঞ বিহীন কোন কর্মকেই অনুমোদন দেয় না। তোমার ভোগ করারই ক্ষমতা নেই যোগ কি করবে। বেশির ভাগ লোকেরাই হচ্ছে রোগীর পর্যায়ে, ভোগের ক্ষমতাই অর্জন করতে পারল না, যোগী হতে অনেক সময় লাগবে। আগে রোগ সারিয়ে ভোগী হও, তারপর ভোগ করার পর যোগী হতে এস। তুমি এখনও রোগগ্রস্ত, যোগী হওয়ার প্রশ্নই নেই। ভোগই হল না তো ত্যাগ কোথা থেকে আসবে। গীতা এই ব্যাপারে খুব পরিষ্কার, গীতা আমাদের সবাইকেই বলছে তোমার কাপুরষতা ছাড়, দুর্বলতা ছেড়ে কাজ কর, কাজ করতে করতে যখন তোমার শক্তি সঞ্চয় হবে, তখন কাজের ফলত্যাগ করতে শেখ। ফলত্যাগ যখন তোমার স্বাভাবিক হয়ে যাবে তখন তুমি কর্মত্যাগ করবে, কর্মত্যাগ করার অবস্থায় আসা মানে জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার অবস্থায় চলে এসেছ। এগুলো না হলে তুমি ঘুরতেই থাকবে।

২১শে আগস্ট ২০১০

বেদে যত রকমের যজ্ঞ হয় তার ব্যাখ্যা করে ভগবান ৩২ নং শ্লোকে বলেছিলেন, সমস্ত কর্ম এবং দান, ধ্যান যা কিছুই করা হয় এই শরীর, মন ও বাণীর দ্বারাই করা হয়, আত্মা কোন কর্মই করেন না, এই ব্যাপারটাকে তুমি যদি একবার বুঝে নিতে পার তাহলেই তুমি *জ্ঞাত্বা বিমোক্ষ্যসে,* তোমার মুক্তি হয়ে যাবে। ২৪ নং শ্লোক থেকে শুরু করে ৩২ নং শ্লোকে বেদে যে সব কর্মের বিধান দেওয়া হয়েছে, অর্থাৎ যে সব কর্মের দ্বারা স্বর্গপ্রাপ্তির কথা বেদে বলা হয়েছে, সেই সব কর্মের নিন্দা করা হয়েছে। এই জিনিষ গুলো বুঝতে হলে আমাদের আরও কয়েকটি গূঢ় জিনিষকে বোঝা অত্যন্ত আবশ্যক। সমস্ত ধর্মই ধর্মান্তরকে প্রশ্রয় দিয়ে আসছে, একমাত্র হিন্দু ধর্মই ধর্মান্তরকে প্রথম থেকেই দৃঢ় ভাবে প্রত্যাখ্যান করে আসছে, হিন্দু ধর্মে ধর্মান্তরের কোন প্রশ্নই নেই। তার কারণ হচ্ছে, আমাদের মুনি ঋষি যাঁরা ছিলেন তাঁদের বক্তব্য হচ্ছে, তোমার যদি প্রয়োজন হয়, তোমার সময় হয়ে থাকলে তবেই তুমি আমার কাছে আসবে। আমি তোমার কাছে কখনই যাব না। খ্রীশ্চান, ইসলাম ও অন্যান্য ধর্মে ঠিক উল্টোটা হয়, এরা দরকার পড়লে আপনার কাছে পৌঁছে গিয়ে আপনার গলায় তলোয়ার ঠেকিয় আপনাকে ধর্মান্তর করবে। যদিও বৌদ্ধ ধর্মে এই রকম করা হয় না, কিন্তু বৌদ্ধ ধর্মের ইতিহাস এইভাবে ধর্মান্তরের অনেক ঘটনার সাক্ষি দিচ্ছে। এই কিছু দিন আগেই কাশ্মীরে মুসলমানরা বলেছে – কাশ্মীরে যত শিখরা আছে হয় তাদের ইসলাম ধর্ম নিতে হবে তা নাহলে তাদের গর্দান যাবে।

হিন্দু ধর্মে এই জিনিষ কখনই দেখা যায় না, কারণ আমাদের ঋষিরা জানতেন আধ্যাত্মিক তত্ত্ব সবার জন্য নয়, মুষ্টিমাত্র কয়েক জনের জন্যই আধ্যাত্মিকতা। এই মুষ্টিমেয় কয়েক জনের জন্য যে আধ্যাত্মিক তত্ত্বগুলো দেওয়া হয়েছে, তার মধ্যে উচ্চতম তত্ত্ব হচ্ছে, আত্মার অস্তিত্বে নিজেকে পুরোপুরি প্রতিষ্ঠিত করা। এই উচ্চতম তত্ত্বে যত রকমের কর্ম ছিল সব বন্ধ হয়ে যায়। শুধু জাগতিক কর্মই নয়, যত বৈদিক কর্ম, দান, ধ্যানের মত ধর্মকর্ম সেটাও বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। এই তত্ত্বের ঠিক নীচে হচ্ছে কর্ম তুমি কর

কিন্তু তোমার কর্মফলে কোন স্পৃহা থাকা চলবে না। এই কথাটাই ভগবান একটু আগেই বলেছিলেন – *ন মাং কর্মাণি লিম্পন্তি ন মে কর্মফলে স্পৃহা* – বলছেন কর্মফলে তো আমার স্পৃহা নেই, কাজেও স্পৃহা নেই। এই অবস্থায় দেহ, মন ও বাণী কোন দিক দিয়েই কাজ হবে না। আমরা যদি কোন কাজ না করে চুপচাপ বসে থাকি, তখনও কিন্তু আমরা কাজ করছি, আমার মন থেকে, বুদ্ধি থেকে কাজ হয়ে যাচ্ছে। যখন আমি চুপচাপ বসে ইন্দ্রিয়কে নিগ্রহ করছি সেটাও কাজ।

সব কিছু বলে ভগবান বলছেন, ঠিক আছে তুমি কাজ করবেনা বলছ, কিন্তু বেদে যে বিভিন্ন কর্মের বিধান গুলো দেওয়া হয়েছে সেগুলো তো করতে পার। এগুলো তো ধর্মের কাজ। অনেক মনে করেন সন্ন্যাসীদের কাজ হচ্ছে বিধবার চোখের জল মোছান, অনাথ বুবুক্ষু মানুষের মুখে অন্ন তুলে দেওয়া। কিন্তু এগুলো আদপেই সন্ন্যাসীদের কাজ নয়। এই সেবা কাজ কাদের জন্য? যারা অলস, কোন কাজ করতে চায় না, যারা মন্দ বুদ্ধির লোক, যারা গীতার উপদেশ শুনে মনে করছে যে গীতাতে তো বলে দিয়েছে কোন কাজ করতে না। এই ধরণের লোকেদের তাই বলতে হয়, বাপু তুমি নিজে খাওয়া-দাওয়া করছ কি? হ্যাঁ করি। তাহলে তুমি অপরের জন্যও ভাবো, অন্যরাও যাতে দু মুঠো খেতে পারে সেই চেষ্টা কর। কিন্তু সন্ন্যাসীর যেখানে উচ্চতম আদর্শ সেখানে এই ধরণের কোন কর্মের স্থান নেই।

সেই উচ্চ অবস্থার কথাই ভগবান বলছেন – *ন মাং কর্মাণি লিম্পন্তি ন মে কর্মফলে স্পৃহা*। আমার কর্মফলে তো কোন স্পৃহা নেইই এমনকি কর্মেও কোন আসক্ত নেই। আজকালকার ছেলেমেয়েরা যেমন বলে আমাকে কি মাইনে দেবে তা নিয়ে কোন মাথা ব্যাথা নেই I want job satisfaction, যিনি কর্মযোগী তার ফলেও স্পৃহা থাকবে না কর্মেও কোন ধরণের আসক্তি থাকবে না। ইদানিং গীতাকে নিয়ে কত রকমের কোর্স চালু হয়েছে Gita for Modern Management, Gita for Stress Management, এই কথা গুলো বলা হয় ঠিকই। কিন্তু এখানে যে তত্ত্ব গীতা নিয়ে আসছে এটি অত্যন্ত উচ্চ আধ্যাত্মিক তত্ত্ব, এগুলো সাধারণ লোকেদের জন্য নয়। যদি তুমি মনে কর তোমার জীবনে অনেক দুঃখ-কষ্ট আছে, যদি তুমি এই দুঃখ-কষ্টকে অতিক্রম করে উচ্চতম আধ্যাত্মিক তত্ত্বকে উপলব্ধি করতে চাও তাহলে তোমাকে এইভাবে জীবনকে দেখতে হবে, আর যদি তুমি বল, না, আমরা তো ম্যানেজম্যান্ট লাইনে আছি, তাহলে তোমাদের জন্য এই শ্লোক গুলো নয়। যে যাই মনে করুক গীতার সব শ্লোক সবার জন্য নয়, এটা সম্ভবও নয়। কারণ বিভিন্ন মানুষের মানসিকতা বিভিন্ন রকমের হয়। তাই সবার জন্য একই কথা কখনই হতে পারে না। গীতার পাঁচটা কথা পাঁচ জনের জন্য বলা হয়েছে। যখন গীতার আলোচনা করতে হচ্ছে তখন গীতার সব কথাকেই সামনে নিয়ে আসতে হবে, কিন্তু সব কথাই সবার অনুশীলনের জন্য নয়, তবে জেনে রাখা ভালো। এখানে যেটা বলা হয়েছে এটি হচ্ছে উচ্চতম আদর্শ। এরপর বলছেন –

**শ্রেয়ান্ দ্রব্যময়াদ্ যজ্ঞাজ্ জ্ঞানযজ্ঞঃ পরন্তপ। সর্বং কর্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে।।৩৩।।**

দ্রব্যযজ্ঞ অন্নদান, বস্ত্রদান, পশুদান ইত্যাদি। বলছেন এই যে দ্রব্যযজ্ঞ করা হচ্ছে, এর থেকে শ্রেষ্ঠ হচ্ছে জ্ঞানযজ্ঞ। এই জ্ঞানযজ্ঞ বলতে বলা হচ্ছে ২৪ নং শ্লোকে যে যজ্ঞের কথা বলা হয়েছিল সেটাই হচ্ছে জ্ঞানযজ্ঞ, যেখানে বলা হয়েছিল – *ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্,* যে অবস্থায় গিয়ে দেখে সব কিছুই ব্রহ্ম – আমি কথা বলছি, আমি ব্রহ্ম, আমার কথা গুলো ব্রহ্ম, এই মাইক্রোফোনটা ব্রহ্ম, মাইক্রোফোনে যে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হচ্ছে সেটাও ব্রহ্ম, যারা শুনছেন তাঁরাও ব্রহ্ম, এই যে কর্ম করা হচ্ছে এটাও ব্রহ্ম, এই পুরো কর্মের যে ফল হবে শ্রোতা আর বক্তার উভয়ের, সেটাও ব্রহ্ম। এটাই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ ও উচ্চতম যজ্ঞ।

*সর্বং কর্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে* – যত রকমের কর্ম আছে সব ব্রহ্মজ্ঞানে গিয়ে পরিসমাপ্ত হয়। আচার্য এখানে উপমা দিচ্ছেন যেটা আমাদের তাস খেলায় দেখা যায়, যার হাতে যে রঙের তাসই আসুক না কেন, তিন টেক্কা যার হাতে এসে গেছে সে সবাইকে জয় করে নিল, ঠিক সেই রকম যাঁর ব্রহ্মজ্ঞান হয়ে গেল, যিনি এই ২৪ নং শ্লোকের মত সব কিছুতেই ব্রহ্মকে দেখছেন তখন তিনি সব কর্মকেই জয় করে নিয়েছেন, তাঁকে আর পাঁচ রকমের কাজ করতে হয় না। তখন তাঁকে আর হিসেব করতে হয় না যে, এই কর্ম করলে এই ফল, ঐ কর্ম করলে এই ফল। দ্বিতীয় অধ্যায়ে ৪৬ নং শ্লোকে ভগবান যে উপমা দিয়েছিলেন, *সর্বতঃ সংপ্লুতোদকে,* বন্যা হয়ে গেলে চারিদিকে জল প্লাবিত হয়ে গেছে, এখন এই ঘটিতে রান্নার জল, এই বালতিতে স্নানের জল, ঐ বালতিতে কাপড় কাচার জল ধরে রাখার জন্য এত চিন্তা আর করতে হবে না। চারিদিকে জল, যেখান থেকে খুশি জল নিয়ে নিলেই হল, এই একই জলে সব কাজ সমাধান হয়ে যাচ্ছে। যিনি পূর্ণজ্ঞানী তাঁর আর এই সব নিয়ে কিছু ভাবনা চিন্তা করতে হয় না। ঠাকুরও জ্ঞানের খুব সুন্দর উপমা দিয়েছেন – এক গ্রাম থেকে আরেক গ্রামে যাবে, তখন আঁকাবাঁকা পথ দিয়ে নৌকা করে ঘুরে ঘুরে যেতে হয়, কিন্তু যখন বন্যা হয়ে যায় চারিদিকে জলে জল, তখন নৌকা সোজা চালিয়ে দিলেই হল।

অর্জুনের মনে হতে পারে যে, ভগবান তো সেই দ্বিতীয় অধ্যায় থেকে খুব জ্ঞানের কথা বলে যাচ্ছেন, কিন্তু এই জ্ঞান পাওয়া যাবে কি করে? তাই ভগবান বলছেন –

**তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া। উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ।।৩৪।।**

যিনি তত্ত্বদর্শি, যিনি জ্ঞান লাভ করেছেন তিনি তোমাকে বলে দেবেন তুমি কিভাবে জ্ঞান লাভ করবে। তা তুমি তাঁর কাছে কিভাবে যাবে? *তদ্বিদ্ধি*, ঐ জিনিষটা, মানে জ্ঞানের ব্যাপারটা তুমি তাঁর কাছে জানতে পারবে। কিভাবে জানতে পারবে? *প্রণিপাতেন*, তাঁর সমীপে গিয়ে তাঁকে সাস্টাঙ্গ প্রণাম করে নিজেকে পুরোপুরি সমর্পণ করে দিতে হবে তাঁর কাছে। *সেবয়া*, তাঁকে সেবা করতে হবে, সেবার দ্বারা তাঁকে সন্তুষ্ট করতে হবে। ভক্তি শ্রদ্ধা সহকারে প্রণাম করে সেবা করে যখন তাঁকে সন্তুষ্ট করে দিলে, কত দিন সেবা করে খুশি করতে হবে? সত্যকামও এই প্রশ্ন নিয়ে গুরুর কাছে গিয়ে সাস্টাঙ্গ মেরেছিল। গুরু তাকে কয়েকটা গরু দিয়ে বললেন এই গরু গুলো তুমি নিয়ে যাও, এদের পরিচর্যা কর, এই কটি গরু থেকে যখন হাজারটা গরু হবে তখন এসে আমাকে প্রশ্ন করো। আমরা এখন কিছুই করব না, আমাদের না আছে সেবা, না আছে শ্রদ্ধা। ঠাকুরকে একজন এসে বলছে – আমাকে সমাধিটুকু শিখিয়ে দিন। একটা ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি নিতে গিয়ে সেই ছোটবেলা থেকে কত রকমের প্রস্তুতি, তারপর জয়েন্ট এন্ট্রেন্স পরীক্ষা, তারপর কত রকমে ভাইভা ভোসি পাশ করে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভর্তি হচ্ছে, তার উপর কত লক্ষ লক্ষ টাকা ফিস জমা দিতে হচ্ছে, এইভাবে একটা বিদ্যা অর্জন করতে তার জীবনের কুড়িটা বছর কাটিয়ে দিতে হচ্ছে। আর তোমার এই কোটি কোটি জন্মের জীবনকে জন্ম-মৃত্যু চক্রের সংসার সমুদ্রকে অতিক্রম করাবে যে বিদ্যা, সেই বিদ্যাকে নাকি দু'মিনিটের মধ্যে শিখিয়ে দিতে হবে। আরও আছে, ইঞ্জিনিয়ারিং প্রফেসর যেটাই বলেন সবটাই এরা বিশ্বাস করে নেয়, কোন প্রশ্নই নেই, কিন্তু একজন আধ্যাত্মিক জগতের আচার্য যখন কিছু বোঝাতে যান তখন তাঁকে হাজারটা প্রশ্ন করা হয়, তাঁর কোন কথাই এক বাক্যে মেনে নিতে পারিনা। এই কারণেই তখনকার দিনে গুরুরা কারুর কাছে যেতেন না। কিন্তু তুমি যদি এইভাবে তাঁর কাছে যাবে, প্রণিপাত, সেবা করার পর গুরু যদি খুশি হন তখন তুমি পরিপ্রশ্ন করবে।

কে তোমাকে জ্ঞান দিতে পারবেন? সবাই তোমাকে জ্ঞান দিতে পারবে না, যিনি *জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ*, যিনি তত্ত্বদর্শি তিনিই একমাত্র তোমাকে জ্ঞান দিতে পারবেন। আচার্য শঙ্কর এইখানে যোগ করে বলছেন – গুরুর কাছে যখন যাবে তখন সমিৎপাণি, হাতে কিছু দক্ষিণা নিয়ে যেতে হবে। গুরু কে হবেন? শ্রোত্রিয়ম্, বেদ, বেদাঙ্গ, বেদান্তের পণ্ডিত ও উপলব্ধিবান যিনি তিনিই শ্রোত্রিয়ম্। তিনি নিজেকে শ্রোত্রিয়ম্ বললে হবে না, আরও পাঁচ জনকে বলতে হবে। নিজের কয়েক জন চেলাকে দিয়ে বলালেও হবে না। আর সব সময় ব্রহ্মের চিন্তায় নিজেকে নিমগ্ন রেখেছেন, জগতের কোন কিছুর চিন্তা নেই। স্বামীজী আবার বলছেন, যে গুরু পয়সা দিয়ে বিদ্যা দান করে সেই গুরুকে বিশ্বাস করতে নেই। ব্রহ্মনিষ্ঠ আর শ্রোত্রিয় কখনই অর্থের বিনিময়ে বিদ্যা দান করতে যাবেন না। তিনি নিজের মত বসে আছেন, যার প্রয়োজন হবে সে তাঁর কাছে যাবে, কাউকেই তিনি ফিরিয়ে দেবেন না। এই রকম গুরুর কাছ থেকে যখন তুমি জ্ঞান লাভ করবে তখন তোমার আর কোন ধরণের মোহের উৎপন্ন হবে না –

**যজ্জ্ঞাত্বা ন পুনর্মোহমেবং যাস্যসি পাণ্ডব। যেন ভূতান্যশেষেণ দ্রক্ষ্যস্যাত্মন্যথো ময়ি।।৩৫।।**

হে অর্জুন, এই রকম শ্রোত্রিয়, ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর কাছ থেকে জ্ঞান লাভ করলে আর তোমার কখনই কোন মোহ জন্মাবে না। মোহ মানে, জগতে যা কিছু আছে, এই জীবনে যা কিছু আছে এর প্রতি তোমার আর কোন আকর্ষণ আসবে না। জীবনে আমাদের কত কিছুর প্রতি আকর্ষণ। ত্রয়োদশ অধ্যায়ে আচার্য এই মোহের কথা বলবেন, অনেকে আছেন যারা বলেন বাবা এই বুড়ো বয়স পর্যন্ত যেন বেঁচে না থাকতে হয়। বুড়ো বয়সে কত কষ্ট, শরীরের তো কষ্ট আছে, তার উপর কেউ মানেনা, নিজের প্রিয়জনদের কাছ থেকেও কত গঞ্জনা শুনতে হয়, এর থেকে বাবা শরীর চলে যাওয়া অনেক ভালো। আমার শরীরটা যেন আগে চলে যায় এইটাও একটা মোহ।

*যেন ভূতান্যশেষেণ দ্রক্ষ্যস্যাত্মন্যথো ময়ি*, এইভাবে যখন তোমার মোহ চলে যাবে তখন তুমি ঘাসের একটা ছোট্ট টুকরো থেকে ব্রহ্মা পর্যন্ত সব কিছুতে একমাত্র আমাকেই দেখতে পাবে। এই আমি মানে, শ্রীকৃষ্ণ, এই শ্রীকৃষ্ণ ঐতিহাসিক শ্রীকৃষ্ণ নন, শ্রীকৃষ্ণের যে পারমার্থিক সত্ত্বা সেই শ্রীকৃষ্ণের কথা বলা হচ্ছে। শ্রীকৃষ্ণের দুটি রূপ, একটি হচ্ছে তাঁর ঐতিহাসিক রূপ, আরেকটি হচ্ছে পরমাত্মা রূপে যিনি সর্বানুস্যূত হয়ে সবার অন্তরে রয়েছেন আবার সর্বানুস্যূত হয়ে সর্বব্যাপি বিরাজিত। শ্রীরামকৃষ্ণও তাই, তিনিই আছেন, তিনি ছাড়া আর কিছু নেই, বাকি যা কিছু দেখছি তাঁরই বিভিন্ন প্রকাশ। এই জ্ঞান কখন হয়? যখন ঐ রকম গুরুকে প্রণিপাত আর সেবা দ্বারা খুশি করার পর গুরু যখন বলে দেবেন, *সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম*, তখনই ঝট্ করে অজ্ঞানের পর্দাটা সরে গিয়ে জ্ঞানের আলোতে গুরুর ঐ বাক্যটা প্রস্ফুটিত হয়ে যাবে। তত্ত্বদর্শি গুরু কিন্তু কখনই শিষ্যকে টানা তিন ঘন্টা ধরে লেকচার দিয়ে উপদেশ দিতে যান না। আমি হয়তো তাঁর কাছে সেই শ্রদ্ধা ভক্তি নিয়ে হাজির হলাম, তিনি আমাকে দেখেই আপ্যায়ন করে বসাবেন, জিজ্ঞেস করবেন তুমি কি চাও। আমি বললাম, আমি আপনার কাছে শিক্ষা পেতে চাই। খুব ভালো কথা, ঠিক আছে, তুমি আজ থেকে এই পুরো আশ্রমটা রোজ দু'বেলা ঝাঁটা দিয়ে পরিষ্কার করতে থাক। উপনিষদে ঠিক এইভাবেই শিক্ষা দেওয়ার কাহিনী গুলো আছে।

এরপর কিছু দিন ঝাঁটা দেওয়ার পর বলছেন – বাঃ বাঃ খুব ভালো কাজ করছ, চালিয়ে যাও। এইভাবে তিন মাস, দশ মাস, এক বছর, পাঁচ বছর, বারো বছর ঝাঁটাই মেরে যাচ্ছে। রাত্রে গুরু যখন বিশ্রাম করবেন তখন শিষ্যরা পদসেবা করত, উনি তখন রামায়ণ, মহাভারত বা পুরান থেকে কিছু কাহিনী শোনাতেন। এর পর হঠাৎ একদিন গুরু ডেকে আমাকে বললেন, বুঝলে ভায়া, তত্ত্বমসি, তুমিই সেই। সেই মুহুর্তেই জ্ঞানের আলোতে আমার সব কিছু খুলে গিয়ে পরিষ্কার ধারণা হয়ে যাবে যে সত্যি সত্যি আমিই সেই। উপনিষদে যত শিষ্য তারা এইভাবেই জ্ঞান লাভ করেছেন, কাজ করতে করতে, গুরুর সেবা করতে করতে তার হৃদয় মন এত পরিষ্কার হয়ে যেতে যে যখনই গুরু একটা তত্ত্ব কথা বলে দিতেন তখনই সঙ্গে সঙ্গে সেটাকে ধারণা করে মনের মধ্যে বসিয়ে নিয়ে ধ্যানের গভীরে চলে যেতেন। গীতাতে যে এত কাজ কর কাজ কর বলে যাচ্ছে, এই কাজ করাটা কিন্তু উপনিষদেরই কথা। কোন শিবভক্ত গুরুর কাছে কেউ শিষ্য হয়েছেন, যেমনি গুরু শিষ্যকে বলে দেবেন – বল, 'ওঁ নমঃ শিবায়', সঙ্গে তার ধারণা হয়ে যেত যিনি শিব তিনিই ওঁ, যিনি ওঁ তিনিই শিব, তাছাড়া আর কিছু নেই। তখন সে কি দেখবে, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যা কিছু আছে আমিই আছি, আমি ছাড়া আর কিছুই নেই। এই হচ্ছে জ্ঞান, এদের আর গীতা, উপনিষদ, বেদ পুরান পড়তে হয় না, এগুলো পড়ান হত, অন্যান্য বিষয় গুলোকে জানার জন্য। কিন্তু তত্ত্বজ্ঞানের জন্য একটি বা দুটি কথাই বলে দেওয়া হত, তার বেশি একটি কথাও বলা হত না। এর পর বলছেন –

**অপি চেদসি পাপেভ্যঃ সর্বেভ্যঃ পাপকৃত্তমঃ। সর্বং জ্ঞানপ্লবেনৈব বৃজিনং সন্তরিষ্যসি।।৩৬।।**

এই শ্লোকটিতে এসে খ্রীষ্টান ধর্ম আর হিন্দু ধর্ম আলাদা হয়ে যায়। খ্রীষ্টান ধর্মে কেবল পাপ আর পাপ, খ্রীষ্টানদের কাছে যে পাপ করেছে তার আর কোন গতি নেই। কিন্তু হিন্দুধর্মে বলছে, তুমি যদি অত্যন্ত পাপী হও, মহাপাপী হও, মহাপাতক হয়ে থাক, কিন্তু তোমার যদি জ্ঞান হয়ে যায় তাহলে তোমার সব পাপ পুড়ে ছাই হয়ে গিয়ে তুমি মহাত্মা হয়ে যাবে। হিন্দু ধর্মে পাপের কোন গুরুত্বই নেই, এখানে পাপ বলে কোন কিছুকেই ধরা হয় না। এখানে পাপটা হচ্ছে, তোমাকে একটা পথ ঠিক করে দেওয়া হয়েছে, সেই পথ থেকে সরে গিয়ে তুমি অন্য একটা পথ ধরে নিয়েছ। এখন যত দিন তুমি অন্য পথে চলতে থাকবে ততদিন তোমার মুক্তির সময় পিছিয়ে যাবে, এর বাইরে আর কিছু হবে না। কিন্তু তুমি আবার যেই এই পথে ফেরত চলে এলে তখন আবার তুমি মুক্তির পথে চলতে থাকলে। আচার্য এখানে বলছেন, যারা জ্ঞানী পুরুষ, মানে এই জ্ঞান পথে যারা আছে তাদের পক্ষে ধর্ম কাজ, সেবা কাজ, এগুলোও বন্ধনের কারণ। বলছেন, যত বন্ধনেই তুমি থাক, যখনই তোমার জ্ঞান হয়ে যাবে তৎক্ষণাৎ তুমি মুক্ত। এই বক্তব্যের সমর্থনে ভগবান উপমা দিয়ে বলছেন –

**যথৈধাংসি সমিদ্ধোঽগ্নির্ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জুন। জ্ঞানাগ্নিঃ সর্বকর্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা।।৩৭।।**

প্রচুর কাঠ স্তুপাকার করা আছে, তার মধ্যে একটা দেশলাই কাঠি ফেলে দিলে নিমেষের মধ্যে পুরো কাঠের স্তুপ পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। ঠিক তেমনি, কোটি কোটি জন্মের ভালো কর্ম খারাপ কর্ম, যাই জমে থাকুক না কেন, যেই জ্ঞান উদয় হয়ে গেল, জ্ঞান বলতে ঈশ্বরই সব কিছু হয়েছেন, ঈশ্বর ছাড়া আর কিছু নেই, এইটাই প্রকৃত জ্ঞান বা আমি আর ঈশ্বর অভেদ এই বোধ যেমনি হবে সমস্ত কর্ম সঙ্গে সঙ্গে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। তখন আর কোন বন্ধন হবে না, আর জন্ম নিতে হবে না। এই জ্ঞানের প্রশংসা করে বলছেন –

**ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে। তৎ স্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি।।৩৮।।**

এই জগতে জ্ঞানের মত পবিত্র জিনিষ আর কিছুই নেই। পবিত্র করার অনেক জিনিষই এই জগতে আছে, যেমন আগুন পবিত্র করে, বাতাস পবিত্র করে, কিন্তু জ্ঞানের মত আর কোন কিছুই পবিত্র করতে পারে না। দীর্ঘকাল কর্মযোগকে নিষ্ঠা ও যত্নপূর্বক সেবার দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ হলেই মুমুক্ষরা নিজেদের আত্মাতেই এই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করে ধন্য হন। এই ব্রহ্মজ্ঞান আর কার হয়?

**শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ। জ্ঞানং লব্ধা পরাং শান্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি।।৩৯।।**

গুরুর বর্ণনা হয়ে গেছে, শিষ্যের বর্ণনা বলা হয়ে গেছে, জ্ঞানের বিস্তারিত ব্যাখ্যা হয়ে গেল, এখন বলছেন গুরুর কাছে গিয়ে গুরুকে শুধু মাত্র ভক্তি করলেই হবে না। শিষ্যেরও কিছু গুণ থাকতে হবে। বলছেন *শ্রদ্ধাবান লভতে জ্ঞানং,* যিনি শ্রদ্ধাবান তিনিই জ্ঞান লাভ করতে পারেন। কিসের প্রতি শ্রদ্ধা? আচার্যের বাক্যের প্রতি শ্রদ্ধা, আচার্য যেটা বলছেন সেটার প্রতি শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস, শাস্ত্র বাক্যে শ্রদ্ধা, যে মার্গ দেখান হচ্ছে সেই মার্গের প্রতি শ্রদ্ধা। তারপর বলছেন *তৎপরঃ,* শ্রদ্ধা খুব আছে, কিন্তু শুধু শ্রদ্ধা থাকলেই হবে না, গুরু খুব উচ্চ আদর্শের কথা খুব সুন্দর ব্যাখ্যা করে দিচ্ছেন ভাবলেই হবে না, যে তত্ত্বের কথা বলা হয়েছে তাতে একেবারে লেগে থাকতে হবে। *সংযতেন্দ্রিয়ঃ,* শ্রদ্ধাও আছে, লেগেও আছে তাতেও হবে না, বলছেন ইন্দ্রিয় গুলিকে সংযত রাখতে জানতে হবে। ঠাকুর খুব সুন্দর বলছেন – মৌমাছি শুধু মধুতেই বসে, আর সাধারণ মাছি সন্দেশেও বসে আবার বিষ্টাতেও বসে। আমি শ্রদ্ধাবান,

ঠাকুরের কথা শুনতে খুব ভালো লাগে, *তৎপরঃ*, সকাল বিকেল রোজ দু'ঘন্টা করে ধ্যান করে যাচ্ছি, মানে লেগে আছি, আর বাকি সময় ভোগ বাসনাতে লিপ্ত আছি, তাহলেও জ্ঞান আমার কখনই হবে না। ভোগ বাসনা একেবারে বন্ধ করতে হবে। এই শর্তগুলো যদি ঠিক ঠিক পালন না করা হয় জ্ঞান সুদূর পরাহত হয়ে থাকবে।

*জ্ঞানং লব্ধা পরাং শান্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি*, ঈশ্বরের স্বরূপ জ্ঞান, ঈশ্বরের সঙ্গে একত্বের জ্ঞান যেমনি বোধে বোধ হয়ে যাবে, তক্ষুণি যত রকমের অশান্তি, যে অশান্তি অর্জুনের এসেছে, যার বর্ণনা প্রথম অধ্যায়ে বলা হয়েছে, ঐ অশান্তি সব দূরীভূত হয়ে শান্তি লাভ হয়ে যাবে। শোক, মোহাদি কোন কিছুই আর তাকে পর্যুদস্ত করে অশান্তির মধ্যে ফেলে দিতে পারবে না।

আচার্য এখানে খুব সুন্দর বলছেন, যে কপট, ধাপ্পাবাজ, সেও কিন্তু লম্বা সাস্টাঙ্গ প্রণাম করতে পারে, সেও কিন্তু প্রচুর দক্ষিণা দিতে পারে, সেও কিন্তু সেবা পরায়ণ হতে পারে। তাই বলে কি এদের জ্ঞান হবে? কোন প্রশ্নই নেই, কখনই জ্ঞান হবে না। প্রথমের দিকে বলা হয়েছিল শিষ্যের বাহ্যিক আচরণের কথা, এখানে বলা হল ভেতরের আচরণ। তিনটে বাইরের আচরণ হচ্ছে – *প্রণিপাত, সেবা ও পরিপ্রশ্ন* আর ভেতরের তিনটে আচরণ হচ্ছে – *শ্রদ্ধা, তৎপরঃ* আর *সংযতেন্দ্রিয়ঃ*। এই ছয়টি আচরণ যার আছে তারই জ্ঞান লাভ হবে। এই ছয়টি গুণ যার মধ্যে আছে আর সেই ভাবে আচরণ করে যাচ্ছে, ঠিক ঠিক আচার্য যদি হন, শিষ্যের মন শুদ্ধ হয়ে থাকে, তিনি একটি কি দুটি উপদেশ দেবেন, তখনই তার জ্ঞান লাভ হয়ে যাবে। এর উল্টোটা হলে কি হবে? মানে, তোমার যদি শ্রদ্ধা না থাকে, আচার্যের প্রতি যদি ভক্তি না থাকে, তুমি যদি লেগে না থাক, তোমার ইন্দ্রিয় যদি সংযত না হয় তাহলে কি হবে?

**অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি। নায়ং লোকোঽস্তি ন পরো ন সুখং সংশয়াত্মনঃ।।৪০।।**

*অজ্ঞশ্চ*, ধর্ম পথে যারা অজ্ঞ, ধর্ম সম্বন্ধে যারা কিছুই জানেনা। ভারতের আশি কোটি হিন্দুদের মধ্যে সত্তর থেকে পচাত্তর কোটি হিন্দুকে এই শ্রেণীতে অন্তর্ভুক্ত করা যায়, যারা পুরোপুরি অজ্ঞ। *অশ্রদ্দধান*, এই ধর্মের প্রতি যাদের শ্রদ্ধা নেই, *সংশয়াত্মা*, ধর্মের কথা কিছু শুনেছি কিন্তু বিশ্বাস নেই, এরা হচ্ছে *সংশয়াত্মনঃ*, এদের বিনাশ ছাড়া কোন পথ নেই, পরের জন্মে নিম্ন যোনি এদের নিশ্চিত। আর বলছেন, *নায়ং লোকোঽস্তি ন পরো*, যাদের এই ধরণের সংশয়াকীর্ণ মন, ভগবান আছেন কি নেই, স্বর্গলোকাদির কথা আজগুবি, তারা এই লোকেও কোন সুখ পায়না, পরলোকে তো পাওয়ার কোন প্রশ্নই নেই। সুখ, শান্তি এদের কপালে নেই। সেইজন্য হে অর্জুন আমি তোমাকে যে কথা গুলো বলছি এগুলোকে তুমি কখন সন্দেহ করতে যেও না। এর পরেই বলছেন –

**যোগসংন্যস্তকর্মাণং জ্ঞানসংছিন্নসংশয়ম্। আত্মবন্তং ন কর্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয়।।৪১।।**

যারা *যোগসংন্যস্তকর্মাণং*, পরমার্থ জ্ঞান লাভ যার হয়ে গেছে, মানে যোগ বুদ্ধি হয়ে গেছে, আর *সংন্যস্তকর্মাণং*, সব ধরণের কাজকে ত্যাগ করে দিয়েছে, তার তো পরামার্থ প্রাপ্তি হয়ে গেছে, সে আর কাজ করতে যাবে কেন। রামকৃষ্ণ মিশনের দেওঘর স্কুলে যেদিন থেকে ছুটি হয়ে যেত, সেদিন ছুটির ঘন্টা পড়ে যাওয়ার পর যদি ছাত্ররা কোন বদমাইশি বা অন্যায় করে তখন সেই সময় তাদের আর শাস্তি দেওয়া হত না। পরীক্ষা শেষ হওয়ার ঘন্টা পড়া মানেই ছুটি হয়ে যাওয়া, যেই ঘন্টা পড়ে যেত তখন সব ছাত্রদের জীবন্মুক্তির অবস্থা হয়ে যেত। কতক্ষণ জীবন্মুক্তির অবস্থায় থাকত? যতক্ষণ না ছাত্র স্কুলের গেট থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে। স্কুলের গেটের বাইরে চলে গেল মানে পূর্ণমুক্তি। কিন্তু যতক্ষণ স্কুলের ক্যাম্পাসের মধ্যে আছে, মেইন গেট থেকে বাব-মার সঙ্গে বেরিয়ে যায়নি, ততক্ষণ জীবনমুক্ত। আছ তুমি স্কুলেই, যদিও তুমি কিছু বদমাইসি করে ফেল মহারাজরা ঐ দিকে আর নজর দেবেন না আর শাস্তিও দেবেন না। এটা হচ্ছে *যোগসংন্যস্তকর্মাণং*, পরমার্থ দর্শন তার হয়ে গেছে, এখন ভালো মন্দ কোন কিছুই তাকে স্পর্শ করবে না। ছাত্ররা এখন যদি কোন ভালো কাজ করে তার জন্য তাকে পুরস্কৃতও করা হবে না, খারাপ কাজ করলে শাস্তিও দেওয়া হবে না। যাঁদের এই জ্ঞানের দ্বারা সমস্ত সংশয় ছিন্ন হয়ে গেছে আর সব রকম কর্মের ত্যাগ হয়ে গেছে এঁদের আর অনিষ্ট, ইষ্ট বা মিশ্র কোন কর্মই বন্ধনের কারণ হয় না, কারণ এই কর্ম থেকে কোন ফলের প্রসব হয় না।

**তস্মাদজ্ঞানসম্ভূতং হৃৎস্থং জ্ঞানাসিনাত্মনঃ। ছিত্ত্বৈনং সংশয়ং যোগমাতিষ্ঠোত্তিষ্ঠ ভারত।।৪২।।**

বুঝলে অর্জুন, এতক্ষণ তোমাকে যে এতগুলো কথা বললাম শুধু এইটুকু বোঝাতে যে, তোমার হৃদয়ে যে সংশায়ত্মক, অজ্ঞানজনিত পাপ বাসা বেঁধে রয়েছে, সেটাকে নাশ করবার জন্য উঠে দাঁড়াও আর যুদ্ধ কর। এখানে মজার ব্যাপার হচ্ছে, ৪১ নং শ্লোক পর্যন্ত ভগবান অর্জুনকে কর্মত্যাগের কথা বলে গেলেন, আর এই কারণেই এই চতুর্থ অধ্যায়ের নামই হচ্ছে জ্ঞান কর্মসন্ন্যাস যোগ, অথচ ভগবান শেষ শ্লোকে বলছেন, হে অর্জুন, তুমি ওঠো, যুদ্ধ কর। একদিকে বললেন কর্মত্যাগ অন্য দিকে এখানে এসে বলছেন কর্ম কর। এই বিপরীত ভাবটাকে ভগবান পঞ্চম অধ্যায়ে গিয়ে মীমাংসা করবেন। সেখানে অর্জুন প্রশ্ন করবেন, আপনি এতক্ষণ যাবৎ আমাকে বলে গেলেন, গুরুর কাছে যাও, পরমার্থের দীক্ষা নাও, কর্মসন্ন্যাস করতে বললেন কিন্তু শেষে গিয়ে বললেন –

তোমার হৃদয়ে যে অজ্ঞান জমে আছে সেটাকে নাশ করবার জন্য উঠে দাঁড়াও যুদ্ধ কর, মানে আপনি আমাকে কর্ম করতে বলছেন। এইখানে চতুর্থ অধ্যায় শেষ হচ্ছে।

এখানে বলা হচ্ছে মানুষ নিজেকে পশুস্তর থেকে উপরে আনার জন্য তাকে যজ্ঞভাব নিয়ে কাজ করতে হবে। কি যজ্ঞ করবে? তুমি কিছু করতে পারছ না, ঠিক আছে তুমি গরীবকে কিছু দান কর। এর থেকে আরেকটু উপরে হলে আরও বড় যজ্ঞ করতে পার, এরও উপরে উঠলে তুমি প্রাণায়ামাদি কর, আরও উপরে উঠলে শাস্ত্রাদি পাঠ কর, এইভাবে পর পর বলা হয়েছে। কিন্তু শ্রেষ্ঠতম যজ্ঞ তখনই হবে যখন তুমি মনে করবে যা কিছু আছে সবই ঈশ্বর। ঠাকুর দেখছেন কোশাকুশিও চৈতন্য, সর্বত্র তিনি সেই চৈতন্যকেই দেখছেন, তখন তিনি চারিদিকেই ফুল ছুড়ছেন। এইখানে এইটাই বলা হল, দ্রব্যযজ্ঞ, তপযজ্ঞ, যত যজ্ঞই করা হোক না কেন, সব যজ্ঞের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হচ্ছে জ্ঞানযজ্ঞ। খাওয়ার সময়েও তিনি তখন দেখেন যেটা খাচ্ছি সেটাও ব্রহ্ম, থালাটাও ব্রহ্ম, আমার শরীরের জঠরাগ্নিটাও ব্রহ্ম, আমার হাত, মুখ, জিহ্বা সব ব্রহ্ম, যিনি পরিবেশন করছেন তিনিও ব্রহ্ম, খাওয়াটাও ব্রহ্ম। এই কারণে খাওয়ার সময়েও হাসিঠাট্টা করা উচিৎ নয়, কারণ ব্রহ্মার্পণং করে যখনই কিছু খাওয়া হয় তখন সেটা যজ্ঞ হয়ে যাচ্ছে, হাসিঠাট্টা হচ্ছে জাগতিক জিনিষ, পূজা করার সময় যেমন হাসিঠাট্টা করাটা অশোভনীয় তেমন খাওয়ার সময়েও এই ধরণের মজা করাটাও খুবই নিন্দনীয় বলা হয়। যদি তুমি এই রকম ভাব নিয়ে সব কাজ কর তাহলে তোমার জ্ঞান উদয় হবে। এইটাই হচ্ছে শ্রেষ্ঠতম যজ্ঞ। এটা যদি না করতে পার তাহলে ধাপে ধাপে নিজেকে উন্নীত কর, সেটাও যদি না পার তাহলে দ্রব্যযজ্ঞ কর। তোমাকে কোন যজ্ঞই করতে বারণ করা হচ্ছেন, সব যজ্ঞই তুমি করতে পার। কিন্তু জ্ঞানযজ্ঞে তোমাকে বেশি জোর দিতে হবে। এখন জ্ঞানযজ্ঞ করতে গিয়ে যদি দ্রব্যযজ্ঞ বন্ধ হয়ে যায় তাহলে কোন ক্ষতি হবে না। কিন্তু যদি তুমি জ্ঞানযজ্ঞও করছ না আর দ্রব্যযজ্ঞ এবং তার মাঝখানে যত যজ্ঞের কথা বলা হল তার কোন যজ্ঞই করছ না তাহলে তোমার অবস্থা সেই রকমই হবে। ঠাকুর যেমন বলছেন, তামসিক লোকের বাড়ি থেকে যদি কেউ চুরি করে তখন তাকে ধরবে, ধরে প্রথমে তার সব জিনিষ পত্র গুলো কেড়ে নেবে, তারপর খুব করে মারধোর করে পুলিশে দেবে, আর বলবে – জানেনা কার বাড়িতে চুরি করতে এসেছ। এরাই হচ্ছে ঠিক ঠিক আসুরিক বৃত্তি সম্পন্ন মানুষ।

মূল কথা হচ্ছে যজ্ঞের উপরে আধারিত করে যদি তোমার জীবনকে প্রতিষ্ঠিত না করতে পার তাহলে তুমি পশুস্তরে, যেটা তৃতীয় অধ্যায়ে ভগবান বলেছিলেন – *যজ্ঞার্থাৎ কর্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্মবন্ধনঃ*, যজ্ঞ অর্থে যখন তুমি কর্ম করবে তবেই তুমি কর্ম বন্ধন থেকে মুক্তি পাবে। যজ্ঞ তুমি কিভাবে করবে? তোমার অত বুদ্ধি নেই, ঠিক আছে তুমি দান ধ্যান কর। এই কথাটাই আমরা এর আগেও বলেছিলাম যে, শ্রীশ্রীমা বলছেন – যার আছে সে মাপো যার নেই সে জপো। তোমার কিছু নেই তুমি খুব করে জপ করে যাও তাতেই তোমার মঙ্গল হবে, আর তোমার প্রচুর অর্থ আছে, প্রাচুর্য আছে তাহলে তুমি দান করতে থাক।

তৃতীয় অধ্যায় আর চতুর্থ অধ্যায় হচ্ছে কর্মকে নিয়ে। তুমি যদি পারমার্থিক সত্যকে ঠিক ঠিক জেনে থাক, তাহলে তোমাকে আর কোন কাজ করতে হবে না, তুমি সব কিছু থেকে মুক্ত। কিন্তু তার লক্ষণ কি, যদি তুমি কারুর গলা কেটে দাও তাহলে তোমার মনে কোন পাপ বোধ হবে না, উল্টে যদি তোমার গলা কেউ কেটে দেয় তাতে তোমারও কোন বোধই হবে না যে তোমার গলা কাটছে। তোমার কি এই অবস্থা হয়েছে? না হয়নি, আমার হাত ব্লেড দিয়ে একটু কেটে গেলেই চিৎকার করে উঠি। তাহলে তুমি কর্ম করতে থাক। কিভাবে কর্ম করবে? এমন ভাবে কাজ করবে যাতে কর্মফলে তোমার কোন স্পৃহা না থাকে। দ্বিতীয় ধাপ হচ্ছে, কর্তব্য রূপে যেটুকু কর্ম তোমার কাছে এসেছে, ততটুকুই কাজ করবে তার বেশি অতিরিক্ত কোন কাজে নিজেকে জড়াবে না। যদি কর্মফল ত্যাগ করতে পারছ না তাহলে তখন তুমি সব কাজ যজ্ঞ রূপে কর। আমি পড়ছি এটাও যজ্ঞ, আমি নিঃশ্বাস নিচ্ছি যজ্ঞ, খাওয়া, কথা বলা, চিন্তা করা, ইন্দ্রিয় সংযম করা সবটাই যজ্ঞ। এই ধরণের নানা রকমের যজ্ঞের কথা এখানে বলা হল। এই যজ্ঞ রূপে তুমি যদি কর্ম না করতে পার তাহলে তোমার আর কোন গতি নেই। এই রকম যজ্ঞ করার পর যদি তোমার তত্ত্বজ্ঞান লাভের বাসনা উদয় হয় তাহলে তোমাকে গুরুর কাছে যেতে হবে। গুরু কি রকম হবে? তিনি শ্রোত্রিয়, তত্ত্ববিৎ, কোন কামনার বশবর্তি হয়ে তিনি শিষ্যকে উপদেশ দেননা। যারা বলছে আমি কাজ করছি না তারাও কিন্তু কাজ করছে। কারণ কাজ থেকে যে নিজেকে টেনে আনছে সেটাও কাজ হয়ে যাচ্ছে। এই হচ্ছে চতুর্থ অধ্যায়ে কর্মসন্ন্যাসযোগের সার সংক্ষেপ। এরপর আমরা সন্ন্যাসযোগে প্রবেশ করব।

**ওঁ তৎসদিতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসুপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে**
**শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে কর্মসন্ন্যাসযোগো নাম চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।।**

********

**পঞ্চম অধ্যায়**

## সন্ন্যাসযোগ

দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে ভগবান সাংখ্য, সন্ন্যাস, যোগ, জ্ঞান ইত্যাদি অনেকগুলো শব্দ উল্লেখ করেছেন। এই শব্দগুলি এমনিতেই খুব জটিল, আর পর পর বিভিন্ন বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে শব্দ গুলো অনেক বার ব্যবহার হওয়াতে শব্দগুলোকে ধারণা করা খুব কঠিণ হয়ে যায়। অনেক দিন ধরে গীতা অধ্যয়ণ করতে থাকলে এই শব্দগুলোর ব্যাপারে সংশয় কেটে গিয়ে আমাদের মাথায় বসে যাবে। অর্জুনের কাছেও এই শব্দগুলো নতুন, আর এই প্রথম এত উচ্চ তত্ত্বের কথা শুনছেন আবার অজানা অচেনা তত্ত্বের মধ্যে শব্দগুলো ব্যবহার হওয়াতে অর্জুনের মনে বার বার অনেক প্রশ্ন উঠছে। এর থেকেও বড় সমস্যা হয়েছে যে, ২৪ নং শ্লোক, মানে ব্রহ্মার্পণং থেকে শুরু করে ৪১ নং শ্লোক পর্যন্ত ভগবান কর্মসন্ন্যাসের কথা বলে গেলেন। আর এটাকেই ভগবান উচ্চতম আদর্শ হিসাবে মানবজাতির সামনে রাখেলেন। আর শেষ শ্লোকে এসে বলছেন, অর্জুন তুমি জ্ঞান অসি দ্বারা তোমার অজ্ঞান সংশয়কে ছেদন করে উঠে দাঁড়াও আর যুদ্ধ কর। এই বিপরীত বক্তব্য অর্জুনের চিন্তা ভাবনাকে পুরো তালগোল পাকিয়ে দিয়েছে।

যোগ হচ্ছে যারা কর্ম করছেন আর সন্ন্যাসী বলতে বোঝায় যিনি সব কর্ম ত্যাগ করে দিয়েছেন। সন্ন্যাস আবার দু রকমের হয়, এক যার তত্ত্ব জ্ঞান হয়ে গেছে, শঙ্করাচার্য, শ্রীরামকৃষ্ণের মত উচ্চকোটির যাঁরা, তাঁদের ঈশ্বর দর্শন হয়ে যাওয়ার পর তাঁরা সন্ন্যাস নিয়েছেন। আবার ঈশ্বর দর্শন হয়নি, যেমন বিভিন্ন আশ্রমের মহারাজরা, তাঁদের সবারই ঈশ্বর দর্শন হয়নি কিন্তু সন্ন্যাস নিয়ে সংসার থেকে বেরিয়ে এসেছেন। আগে সন্ন্যাসী হয়ে গেছেন তারপর ঈশ্বর দর্শন বা তত্ত্বজ্ঞানের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। এর ফলে অনেক ধরণের সমস্যার আবির্ভাব হয়। সেই সমস্যা অর্জুনেরও হয়েছে তাই এই অধ্যায়ের শুরু হচ্ছে অর্জুনের এই প্রশ্ন দিয়ে –

অর্জুন উবাচ

**সন্ন্যাসং কর্মণাং কৃষ্ণ পুনর্যোগঞ্চ শংসসি। যচ্ছ্রেয় এতয়োরেকং তন্মে ব্রূহি সুনিশ্চিতম্।।১।।**

হে ভগবান, আপনি এই মুহূর্তে বলছেন কর্মসন্ন্যাস করতে আবার পরের মুহূর্তেই বলছেন কর্মযোগ করতে। আপনার কথা শুনে আমার মন বিভ্রান্ত হয়ে যাচ্ছে। আসলে কর্মসন্ন্যাস কাদের জন্য? যাঁরা জ্ঞান উপলব্ধি করতে চাইছেন। কিসের জ্ঞান? ঈশ্বরের জ্ঞান, কিন্তু সর্বোচ্চ অবস্থায় কর্মসন্ন্যাস না হলে ঈশ্বরের জ্ঞান লাভ হবে না। আর যাঁর ঈশ্বর জ্ঞান হয়ে গেছে তিনি আর কর্ম করেন না। অথচ তৃতীয় অধ্যায়ে ভগবান বলেছিলেন জনকাদি রাজর্ষিরা লোকসংগ্রহের জন্য কর্ম করে গেছেন। এখানে মূল কথা হচ্ছে স্বামীজীর মত উচ্চকোটির পুরুষরা লোকসংগ্রহের জন্য কর্ম করলেও তাঁদের কর্তব্য বোধ থাকে না, তাঁরা করুণাপরবশ হয়ে সব কর্ম করেন। কিন্তু অর্জুন এখন এই উচ্চ অবস্থায় পৌঁছাননি, তাই তাঁর মনে সংশয় হওয়াতে ভগবানকে বলছেন, আমার জন্য কোন্ পথটা অনুসরণীয়, কর্মসন্ন্যাস না কর্মযোগ, আপনি আমাকে স্পষ্ট করে বলুন। অর্জুনের কেন, যে কোন মানুষের কাছেই এই সমস্যা হয়, এই বলছেন কর্মত্যাগ করতে আবার বলছেন কর্ম কর।

এবারে গীতা একটা নতুন দর্শনের কথা পরিষ্কার ভাবে আমাদের শোনাচ্ছেন। সেই নতুন দর্শনটা কি? কর্মযোগ আর কর্মসন্ন্যাস এই দুটো আলাদা কিছুই নয়, দুটো একই জিনিষ। কিভাবে আলাদা নয়, কোথায় এদের মিল, পঞ্চম অধ্যায়ে এটাকেই ব্যাখ্যা করা হবে। আসলে পুরো গীতা পড়ে একটা জিনিষ পরিষ্কার হয়ে যাবে যে, আমি যদি আমার লক্ষ্য ও পথের ব্যাপারে পরিষ্কার থাকি, যদি আমার লক্ষ্য ঈশ্বর দর্শন হয়, আমি ঈশ্বরের জ্ঞান লাভ করতে চাই, এই লক্ষ্য যদি ঠিক থাকে তাহলে বাকি সব কিছুই ঠিক ঠিক পথে চলে আসে। তখন আমি কাজ করছি বা কাজ করছি না, এগুলো কোনটাই কোন কিছু ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায় না। যে ঈশ্বরকেই শুধু পেতে চাইছে, তার কাছে এটা সব সময় প্রত্যাশিত যে সে সংসারের কোন কিছুতেই আর জড়াবে না, ঈশ্বরই যদি তার লক্ষ্য হয় তাহলে তার ভুল পথে যাওয়ার সম্ভবনাই থাকবে না। ঠাকুর বলছেন – একজন কামারপুকুর থেকে পুরী যাচ্ছে, যদি সে ভুল পথে চলে যায় তাহলে কেউ না কেউ তাকে বলে দেবে এটা ভুল পথ, বলে দিয়ে তাকে ঠিক পথে তুলে দেবেন। সত্যি সত্যি এইটাই হয়। যখন কারুর সময় হয় তখন গুরু আপনা থেকেই তার কাছে পৌঁছে যান। যার ঠিক ঠিক ব্যাকুলতা এসে যায় তার কাছে গীতার এতো কথার কোন প্রয়োজন নেই। ব্যাকুলতা নিয়ে এগোতে শুরু করলেই পথ দেখাবার কেউ না কেউ এসে যাবে। তার কাছে কর্মযোগও যা কর্মসন্ন্যাসও তাই। এখন অর্জুনের সংশয় দূর করবার জন্য ভগবান বলছেন –

শ্রীভগবানুবাচ

**সন্ন্যাসঃ কর্মযোগশ্চ নিঃশ্রেয়সকরাবুভৌ। তয়োস্তু কর্মসন্ন্যাসাৎ কর্মযোগ বিশিষ্যতে।।২।।**

এখানে ভগবান যা কিছু আলোচনা করছেন এগুলো সবই আমাদের মত অজ্ঞানী সাধারণ মানুষদের জন্যই বলা হচ্ছে। গীতায় কোথাও অজ্ঞানীদের নিয়ে বলছেন, কোথাও জ্ঞানীদের নিয়ে বলছেন, কোথাও আবার বিজ্ঞানীদের নিয়ে বলছেন, এই কারণে

গীতা একা নিজে স্বাধীন মত পড়তে গিয়ে প্রচণ্ড সমস্যা হয়ে যায়। আবার একই শব্দ পাঁচ জায়গায় পাঁচ রকম ভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। সেইজন্য গুরু বা আচার্যের মুখে গীতা যদি না শোনা হয় তাহলে অর্থ বুঝতে গোলমাল হয়ে যাওয়াটা খুবই স্বাভাবিক। এখানে যেমন বলছেন *সন্ন্যাসঃ কর্মযোগশ্চ নিঃশ্রেয়সকরাবুভৌ*, এখানে সোজা অর্থ করলে দাঁড়ায় যারা সন্ন্যাস নিয়েছেন তাদের থেকে কর্মযোগী শ্রেষ্ঠ। যারা কর্মযোগের পথে চলেন তারা এই কথাই বলে বেড়ায়, গীতায় বলছে কর্মসন্ন্যাস থেকে কর্মযোগ শ্রেষ্ঠ। ঠাকুর ছিলেন কর্মসন্ন্যাসী আর স্বামীজী কর্মযোগী ছিলেন, তাহলে স্বামীজী ঠাকুরের থেকে শ্রেষ্ঠ। এই কথা গুলো হচ্ছে অজ্ঞানীদের জন্য, জ্ঞানীদের ক্ষেত্রে এই জিনিষ চলবে না। আমি যদি অজ্ঞানী হই তাহলে আমার কাছে এখন দুটো পথ আছে, এক হচ্ছে কর্মসন্ন্যাস মানে কর্ম ত্যাগ করে দেওয়া আর দুই হচ্ছে কর্মযোগ করা। এখন আমি কোনটা করব?

হিন্দুদের কাছে সন্ন্যাস হচ্ছে শ্রেষ্ঠতম। বলছেন, সন্ন্যাস না হলে জ্ঞান হবে না। তাহলে আমি কাজ কেন করতে যাব? না না তুমি এরকমটি কখন চিন্তা করতে যেও না, তুমি যদি অজ্ঞানী হও তাহলে তোমাকে কর্ম করতে হবে, কর্ম না করতে থাকলে তুমি এগোতে পারবে না। তার আগে এটাও বলা হচ্ছে যে কর্মযোগ আর কর্মসন্ন্যাস একই জায়গাতে নিয়ে যাচ্ছে। সেই জায়গাটা হচ্ছে ঈশ্বর জ্ঞানে। কর্ম করলেও তোমাকে ঈশ্বর জ্ঞানে নিয়ে যাবে, আবার কর্ম না করলেও তোমাকে ঈশ্বর জ্ঞানে নিয়ে যাবে। কিন্তু কখন কাজ না করলে ঈশ্বর জ্ঞানে নিয়ে যাবে আবার কখন কাজ করলে ঈশ্বর জ্ঞানে নিয়ে যাবে তার বিশদ আলোচনা পরে করবেন।

বলছেন যদি জ্ঞানরহিত সন্ন্যাস হয়, যেমন বিভিন্ন মঠ মিশনের মহারাজরা, এনাদের কারুরই জ্ঞান হয়নি কিন্তু সন্ন্যাস নিয়েছেন, এই ধরণের সন্ন্যাসকে বলা হচ্ছে বিবিদিষা সন্ন্যাস। আর যাঁরা জ্ঞান হয়ে যাওয়ার পর সন্ন্যাস নেন তখন তাঁকে বলা হয় বিদ্বৎ সন্ন্যাসী, যেমন ঠাকুর। কিন্তু মহারাজরা সন্ন্যাস নিয়ে জ্ঞান লাভের জন্য সাধনা করে যাচ্ছেন। এখানে এইটাই বলা হচ্ছে যদি তোমার জ্ঞানরহিত সন্ন্যাস হয় তাহলে এর থেকে তোমার কাজ করা অনেক ভাল। তাহলে ঠিক ঠিক সন্ন্যাসী কে, কি করে জানব ইনি জ্ঞানী? তখন বলছেন –

**জ্ঞেয়ঃ স নিত্যসন্ন্যাসী যো ন দ্বেষ্টি ন কাঙ্ক্ষতি। নির্দ্বন্দ্বো হি মহাবাহো সুখং বন্ধাৎ প্রমুচ্যতে।।৩।।**

*জ্ঞেয়ঃ স নিত্যসন্ন্যাসী*, তাঁকেই নিত্যসন্ন্যাসী বলবে জানবে, নিত্যসন্ন্যাসীর কোন কিছুতেই আকর্ষণ নেই, কোন কিছুর প্রতি দ্বেষ নেই, কোন কিছুর থেকে পালিয়ে আসবে, আবার কোন জিনিষকে আলিঙ্গন করার জন্য ছুটে যাবে আর এটা চাই সেটা চাই এই ভাবটাও নেই। তাই বলে কি তাঁর ক্ষিধে পাবে না, খেতে ইচ্ছে করবে না? দিব্যি ক্ষিধে পাবে, খেতেও চাইবেন। রান্না করা খাবারের বদলে তাঁকে ঘাস পাতা খেতে দিলে তিনি কি তাই খেয়ে নেবেন? কক্ষণই খাবেন না। কিন্তু আমি অমুক জিনিষটাই খাব, অমুক জিনিষটাই আমার চাই, এই ভাবটা তাঁর থাকবে না। সপ্তদশ অধ্যায়ে বলা হবে কি ধরণের খাবার তাঁরা গ্রহণ করেন। *নির্দ্বন্দ্বো হি মহাবাহো*, দ্বন্দ্বাত্মক কোন জিনিষ নিত্যসন্ন্যাসীকে আর স্পর্শ করতে পারেনা। যাঁর কোন আশা আকাঙ্ক্ষা নেই, যাঁর কোন ভীতি নেই, কোন কিছু থেকে পালিয়ে আসতে চাইছেন না, তিনিই নির্দ্বন্দ্বো হয়ে গেলেন। জগতের কোন কিছুর প্রতি মোহও নেই কোন কিছুতে ভয়ও নেই যে সেটা থেকে পালাবে। কোথা থেকে সে পালাচ্ছেও না আর কোন কিছু পাওয়ার আশায় দৌড়াচ্ছেনও না। যা আসছে তাতেই সেই সুখী, যৎ আয়াতু তৎ আয়াতু, যৎ প্রয়াতু প্রয়াতু তৎ, আসছে আসুক, যাচ্ছে যাক। *সুখং বন্ধাৎ প্রমুচ্যতে*, সমস্ত বন্ধন থেকে যে তাঁর মুক্তি হচ্ছে সেটা সুখেই হচ্ছে, মানে অনায়াসে, সহজ ভাবেই তিনি মুক্ত হয়ে যান। অনেক কষ্ট করে, অনেক কাঠ খড় পুড়িয়ে যে তাঁকে সমস্ত রকম বন্ধন থেকে মুক্ত হতে হচ্ছে তা নয়। তারপরেই বলছেন –

**সাংখ্যযোগৌ পৃথগ্ বালাঃ প্রবদন্তি ন পণ্ডিতাঃ। একমপ্যাস্থিতঃ সম্যগুভয়োর্বিন্দতে ফলম্।।৪।।**

সাংখ্য হচ্ছে পূর্ণজ্ঞান আর যোগ হচ্ছে কর্মযোগ। ভগবান বলছেন সাংখ্য আর যোগ এই দুটো একই জিনিষ। বহু প্রাচীন কাল থেকেই আমাদের ভারতীয় আধ্যাত্মিক দর্শনে অনেক তত্ত্বের কথাই বলা হয়ে আসছে, যেমন সন্ন্যাস যোগের কথা, কর্মযোগের কথা, সন্ন্যাস যোগ এই রকম হবে, কর্মযোগ এই রকম হবে ইত্যাদি। তার মানে এই সব বিভিন্ন দর্শনের তত্ত্ব আগে থাকতেই ছিল, আর তখন এগুলো অনেকের মধ্যেই বিভিন্ন ধরণের সংশয় উৎপন্ন করত। মহাভারতে ব্যাসদেব যখন গীতা রচনা করছেন তিনি তখন সব পথ ও তত্ত্বগুলোকে সমন্বয় করে দিলেন। কিভাবে সমন্বয় করলেন? বলছেন যে সন্ন্যাসী তিনি যেখানে পৌঁছাবেন কর্মযোগীও সেইখানে পৌঁছাবেন। মনে রাখতে হবে এখানে বিবিদিষা সন্ন্যাসী, যাদের এখনও জ্ঞান হয়নি, সেই জ্ঞানরহিত সন্ন্যাসীদের কথা বলা হচ্ছে। যে জ্ঞানী সন্ন্যাসী আর যে কর্মযোগী তাঁরা কিন্তু এক জায়গায় পৌঁছাবেন না। জ্ঞানী সন্ন্যাসী যে সে অনেক এগিয়ে আছে, তাঁর সঙ্গে কারুর তুলনা করা চলে না। এগুলোকে আচার্য শঙ্কর আলোচনা করে পরিষ্কার করে দিয়েছেন। এখানে বেলুড় মঠের যারা সন্ন্যাসী আর গৃহীদের মধ্যে যারা ঠিক ঠিক ভক্ত তাদের কথা বলা হচ্ছে। গীতার মতে বেলুড় মঠের যিনি সন্ন্যাসী আর গৃহীদের মধ্যে যিনি কর্মযোগী এই দুজনের মধ্যে কর্মযোগী এগিয়ে থাকবেন। কেন এগিয়ে থাকবেন সেটাই এখানে আলোচনা করবেন।

ভগবান বলছেন, *একমপ্যাস্থিতঃ সম্যগুভয়োর্বিন্দতে ফলম্‌*, একটাকে ধরে তুমি যদি তাতেই প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাও তাহলে দুটোরই ফল পাবে। এখানে কিন্তু আবার ভগবান সাংখ্যযোগীদের কথা বলছেন, মানে যে ঠিক ঠিক সাংখ্যযোগী আর ঠিক ঠিক কর্মযোগী, এরা দুজনে একই ফল পাবে। সাংখ্য বুদ্ধির পরিণতি হচ্ছে জ্ঞানে, জ্ঞান মানে এখানে সব সময় পরমার্থ জ্ঞান বা ঈশ্বর জ্ঞানের কথাই বলা হয়। যেখানে জ্ঞান মানে অন্য কিছু বোঝায় তখন সেটা বলে দেওয়া হবে। শঙ্করাচার্য তাঁর ভাষ্যে বলছেন যোগবুদ্ধি বা কর্মযোগ সাংখ্যযোগেই নিয়ে যাচ্ছে, সাংখ্যযোগ জ্ঞানযোগে নিয়ে যায়, সেইজন্য এই দুটোর মধ্যে কোন তফাৎ নেই। এই জিনিষটাকেই আরও বিস্তার করে বলছেন –

**যৎ সাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্‌যোগৈরপি গম্যতে। একং সাংখ্যঞ্চ যোগঞ্চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি।।৫।।**

সাংখ্য মানে জ্ঞাননিষ্ঠ সন্ন্যাস আর কর্মযোগ এক। সাংখ্য হচ্ছে কর্ম ত্যাগ, আর যোগ হচ্ছে কর্ম করা। দ্বিতীয় অধ্যায় থেকে এই জিনিষটা আমরা আলোচনা করে আসছি। যে মানুষ নিজের জন্য কোন কর্মফল কামনা করছে না, দ্বিতীয় সব ফল ঈশ্বরের অর্পণ করে দিচ্ছে, তৃতীয় হচ্ছে এই দুটো পথকে জ্ঞানপ্রাপ্তির পথ বলে মনে করছে। এই তিনটে হচ্ছে যোগীর বৈশিষ্ট্য, ১) কোন ফল কামনা না করে সে সব কর্ম করছে, ২) সব ফল ঈশ্বরের সমর্পণ করে আর ৩) সে জানে এই ভাবে কর্ম করলে তার জ্ঞান উপলব্ধি হবে। আর সন্ন্যাসী বলতে বোঝাচ্ছে যাঁর পরমার্থ জ্ঞান মানে ঈশ্বর জ্ঞান হয়ে গেছে। যিনি যোগী আর যিনি সন্ন্যাসী এই দুজনের মধ্যে কোন তফাৎ নেই, কারণ যোগী যিনি এমন এক অবস্থায় চলে গেছেন যেখানে তিনি নিজের জন্য কিছু ফলাকাঙ্ক্ষা করছেন না, সমস্ত ফল ঈশ্বরে সমর্পণ করে দিয়েছেন আর তিনি ভালো ভাবেই জানছেন যে এতেই আমার জ্ঞান উপলব্ধি হয়ে যাবে, এর জন্য আমাকে অন্য কিছু করতে হবে না।

আমাদের মনে সংশয় হতে পারে যে, একবার বললেন কর্মযোগ কর্মসন্ন্যাসের থেকে শ্রেষ্ঠ, যেমন দুই নং শ্লোকে বললেন *তয়োস্তু কর্মসন্ন্যাসাৎ কর্মযোগ বিশিষ্যতে*, আবার পঞ্চম শ্লোক আসতে না আসতেই বলছেন *একং সাংখ্যঞ্চ যোগঞ্চ*, দুটোই সমান, কর্মসন্ন্যাস যেখানে নিয়ে যাবে কর্মযোগও সেইখানেই নিয়ে যাবে। তাহলে কেন বলা হল কর্মসন্ন্যাস থেকে কর্মযোগ শ্রেষ্ঠ? এই কারণেই বলা হয় গুরুমুখে গীতা শুনতে হয়, নিজে নিজে পড়তে গেলেই সংশয় এসে যাবে।

চার্লি চ্যাপলিনের একটা সিনেমা ছিল, তাতে একটা চরিত্র ছিল যে জীবনের সব কিছু থেকে পরাস্ত হয়ে একটা ঘড়ির মেকানিক্স হয়েছে। একজন খুব দামী একটা ঘড়ি সারাতে তার কাছে এসেছে। সে বেচারা ঘড়িটা নিয়ে চোখে লেন্স লাগিয়ে নজরটা ঘড়ির দিকে না দিয়ে এটা ওটা খুলতে গিয়ে ঘড়ির সব পার্টস গুলোকেই খুলে দিয়েছে। এখন সে কি করবে বুঝতে না পেরে ঘড়ির সব যন্ত্রাংশ গুলোকে একটা কাপড়ের মধ্যে পুটলি করে খদ্দেরকে ফেরত দিয়ে বলছে – এ ঘড়ি সারান যাবে না। আনাড়ি লোকের হাতে গীতা যদি পড়ে যায় তাহলে গীতারও ঐ ঘড়ির মত অবস্থা হবে। শঙ্করাচার্য হচ্ছেন ঘড়ির মেকানিক্স, সব যন্ত্রাংশকে খুলে আবার ঠিক জায়গাতে বসিয়ে দেবেন। আচার্য এখানে বলছেন, জ্ঞানরহিত কর্মসন্ন্যাস হচ্ছে সর্বনাশের পথ।

ঠাকুর বলছেন মনে বাসনা আছে, মাঝে মাঝে পতন হচ্ছে, তার ওপর আবার গেরুয়া পড়া মহা ভয়ঙ্কর, এরা নিজেকে ঠকায় আবার পরকেও ঠকায়। এখানে গীতাতে এই অবস্থারই কথা বলা হচ্ছে। কোন প্রস্তুতি নেই কিন্তু সন্ন্যাসী হয়ে সব কর্মত্যাগ করে দিয়েছে, এরা কিন্তু নিজেদের সর্বনাশকে ডেকে আনছে। কেন সর্বনাশ হবে? কর্মই আমাদের জীবনকে ঠিক পথে পরিচালিত করে। কর্ম যদি না করে তাহলে মানুষ জীবন থেকে কোন শিক্ষা পায়না, নিজেকে সংশোধন করে আর উচ্চ অবস্থার দিকে আরোহণের সম্ভবনাটা নষ্ট হয়ে যায়। অল্প বয়সে অনেক রকম চ্যাংড়ামি, হাসি ঠাট্টা মসকরা নিয়ে থাকে, কিন্তু যখন বিয়ে হয়ে যায়, সন্তানাদি হয়ে যায় তখন তার এইসব চ্যাংড়ামি বন্ধ হয়ে যায়, কারণ তাকে এখন ছেলে মানুষ করতেই যা হিমসিম খেতে হয় তাতেই তাকে সোজা করে দিচ্ছে। গৃহস্থ কর্মের মধ্য দিয়েই মানুষ তার অভিজ্ঞতা অর্জন করে নিজেকে দাঁড় করায়। যারা সন্ন্যাসী হয়ে গেল, তারপরেও যদি তার শাস্ত্র প্রীতি না থাকে, আধ্যাত্মিক সাধনার প্রচেষ্টা না থাকে, তাহলে সেতো বাঁধন ছাড়া গরু হয়ে গেল, তার সর্বনাশ হবেই। কারণ কর্মই হচ্ছে corrective factor, এই corrective factor তাকে এগিয়ে চলার পথে সোজা করে রাখে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এইটাই এখানে বলতে চাইছেন যার মধ্যে এই corrective factor নেই তার জীবনটা বৃথা হয়ে যেতে বাধ্য। এই ধরণের যারা কর্মসন্ন্যাসী, যারা কাজ করছে না, তাদের তুলনায় যারা কর্মযোগী তারা অবশ্যই তাদের থেকে শ্রেষ্ঠ, এরা কাজ করছে বলে এদের corrective factor তাদের পথকে পরিষ্কার করে দিচ্ছে।

প্রথমের দিকে তুলনা করা হয়েছে নিম্ন প্রকৃতির সাধকদের সাথে, আর এখানে তুলনা করা হচ্ছে যারা উচ্চ প্রকৃতির সাধক। দুই নং শ্লোকে দুজনই কাঁচা আর পাঁচ নং শ্লোকে দুজনই পাকা। এখানে পাকা সন্ন্যাসী আর পাকা কর্মযোগী দুজনেই সমান। স্বামীজী গৌতম বুদ্ধকে বলছেন মহান কর্মযোগী। কর্মযোগীর জন্য যে বৈশিষ্ট্য গুলোর কথা এখানে বলা হয়েছে, ভগবান বুদ্ধের জীবনে সব বৈশিষ্ট্যই নিখুঁত ভাবে বিদ্যমান ছিল। আবার অন্য দিকে ঠাকুর ছিলেন কর্মসন্ন্যাসী, এই ক্ষেত্রে ভগবান বুদ্ধ আর ঠাকুর দুজনেই

সমান, কোন পার্থক্য নেই। কাঁচা অবস্থায় কর্মসন্ন্যাস থেকে কর্মযোগ অনেক ভালো। তবে এখানে জেনে রাখা ভালো যে, জপ-ধ্যান করা, শাস্ত্র অধ্যয়ণ এগুলো সবই কর্মযোগ। কিন্তু যিনি ঠিক ঠিক কর্মসন্ন্যাসী, যেমন ঠাকুর, তিনি জপ-ধ্যান করছেন না, শাস্ত্র পাঠাদি করছেন না, কিন্তু তিনি সর্বক্ষণ নিজেকে ঈশ্বর বা ব্রহ্মের সাথে এক করে রেখেছেন। এখন ঠাকুরকে অনুকরণ করে কেউ যদি জপ-ধ্যান, শাস্ত্র পাঠ ছেড়ে দেয় তবে কিন্তু তার সর্বনাশ হয়ে যাবে। মূল কথা হচ্ছে, আদর্শের দিক থেকে কর্ম সেখানেই নিয়ে যাবে যেখানে উচ্চতম কর্মসন্ন্যাসী যান। সেখানে কাজ করা আর কাজ না করা দুটোই সমান। কিন্তু কাঁচা অবস্থায় কাজ করা বাধ্যতামূলক।

**সন্ন্যাসস্তু মহাবাহো দুঃখমাপ্তুমযোগতঃ। যোগযুক্তো মুনির্ব্রহ্ম ন চিরেণাধিগচ্ছতি।।৬।।**

যারা এখন সন্ন্যাসীর জন্য প্রস্তুত নয়, তারা কর্মত্যাগকে উচ্চ আদর্শ মনে করে যদি সব কর্ম ছেড়ে দিয়ে চুপচাপ বসে থাকে তাদের জীবন অত্যন্ত সঙ্কটময় হয়ে যাবে। পরিশ্রম না করে, কোন কর্ম না করে, কর্মযোগ না করে কেউ সন্ন্যাসের অধিকারী হতে পারে না। কাজ না করা পর্যন্ত কর্মমুক্তি কখনই সম্ভব নয়। ঈশ্বরার্পণ বুদ্ধিতে, মানে সব কর্মফল ঈশ্বরের অর্পণ করে সব কর্ম করে যাচ্ছে, বিশেষ করে বৈদিক কর্ম মানে যজ্ঞাদি কর্ম, তার সাথে সাথে ঈশ্বরের স্বরূপের মনন করে যাচ্ছে, ঈশ্বরের মননের ব্যাপারটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, তখন পারমার্থিক সন্ন্যাস তার আপনা আপনিই হয়ে যায়। পারমার্থিক সন্ন্যাস হয়ে গেলে তার জ্ঞানও হয়ে যাবে।

এই পুরো ব্যাপারটা আবার আমরা সংক্ষেপে আলোচনা করে নিচ্ছি। একজন খুব উচ্চস্তরের সন্ন্যাসীকে দেখে, যেমন শ্রীরামকৃষ্ণ হচ্ছেন সন্ন্যাসীদের রাজা, এখন শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখে আমারও প্রেরণা হল যে আমিও সন্ন্যাসী হব। কিন্তু আমি শ্রীরামকৃষ্ণের বাইরের আচরণটুকুই দেখছি, তাঁর ভেতরটা আমি দেখছি না। শ্রীরামকৃষ্ণের বাইরেরটা দেখে আমি কাজ কর্ম বন্ধ করে দিলাম। গীতার মতে এইটাই হচ্ছে সর্বনাশের পথ। সেইজন্য ভগবান বলে দিয়েছিলেন, হে অর্জুন এই পথ তোমার জন্য নয়। অনেককেই দেখা যায় জীবনে অশান্তি এলেই বলে আমি সন্ন্যাস নিয়ে নেব, কিন্তু সন্ন্যাস এদের জন্য নয়। বাস্তবিক সন্ন্যাস তাহলে কার জন্য? যারা কর্ম করছে, সেই কর্মের ফল ঈশ্বরে অর্পণ করে দিচ্ছে, আর ঈশ্বরের স্বরূপকে সর্বদা মনন করে চলেছে, তারাই ঠিক ঠিক কর্মযোগ করছে, এই কর্মযোগই তাকে ঈশ্বরের জ্ঞান লাভ করিয়ে দেবে। বেলুড় মঠের সন্ন্যাসীদের তাই প্রচুর কাজের মধ্যে নিযুক্ত রাখা হয়। একটা সেন্টারে প্রচুর কাজ করে করে যখন তাঁর খুব নাম-ডাক হয়ে গেছে তখনই দুম্ করে তাঁর অন্যত্র বদলি হয়ে গেল। এই সেন্টারে সমস্ত কাজের সঙ্গে এতদিন যে তিনি নিজেকে একাত্ম করে ফেলেছিলেন, একটা বদলির আদেশে সব কিছুর একাত্মকে ত্যাগ করে দিতে হল। দেওঘরের স্বামী শুদ্ধসত্তানন্দজী মহারাজ এক সময় সেক্রেটারী ছিলেন। তিনি কত পরিশ্রম করে দেওঘরে বাড়ি, গাড়ি, স্কুল বিল্ডিং, লাইব্রেরী, মন্দির কত কিছু করে দেওঘর আশ্রমকে ঢেলে সাজিয়ে দিলেন। মন্দির প্রতিষ্ঠার দিন বিরাট অনুষ্ঠান হচ্ছে, স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী তখন মঠাধ্যক্ষ, তিনি আবার সেই অনুষ্ঠানের সভাপতি। সভাপতির ভাষণের মধ্যেই প্রভু মহারাজ খুব প্রশংসা করে বলছেন, এত সুন্দর কাজ হয়েছে, আমরা সবাই খুব খুশি, তাই আমরা ঠিক করেছি স্বামী শুদ্ধসত্তানন্দজীকে এখান থেকে নিয়ে গিয়ে অন্য একটা গুরুত্বপূর্ণ দায়ীত্ব দেওয়া হবে। শুনেই সবাই অবাক হয়ে গেছেন। স্বামী শুদ্ধসত্তানন্দজী দেওঘরে কত কি করেছেন, সব করে টরে এবার রাজ সিংহাসনে বসে একটু তামাক খাবেন ঠিক সেই সময় নোটিশ এলো – তোমার থেকে দেওঘরের সব দায়ীত্ব নিয়ে নেওয়া হল, এখানে অন্য একজনকে দায়ীত্ব দেওয়া হবে। এখন যিনি তিল তিল করে মঠকে এত কষ্ট করে দাঁড় করিয়েছেন, তিনি যদি দেখেন আমার এত কষ্ট করে দাঁড় করান আশ্রম রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে নষ্ট হতে চলেছে, তখন তাঁর মনের কি অবস্থা হবে? কিছুই হবে না, এমনিতেই বৈরাগ্য এসে যাবে। এমন অনেক সন্ন্যাসী আছেন প্রতি দু বছর অন্তর তার বদলি হচ্ছে, এরপর তার কর্মে কি করে আর আসক্তি আসবে, এতেই তিনি ত্যাগে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবেন, কোন কর্মেই তাঁর আর আসক্তি থাকবে না। এখন শরীর চালাতে গেলে কাজ করতে হবে, মঠ তাকে যে কাজটা করতে দিয়েছে সেটা করে দিল। বক্তব্য হচ্ছে, বেলুড় মঠের সন্ন্যাস একটু আলাদা। স্বামীজী এখানে সন্ন্যাসীর যে বিধান দিয়ে গেছেন সেটা গীতার এই বক্তব্যকে মাথায় রেখেই বিধান দিয়ে গেছেন, তুমি কাজ কর, কাজ যদি না কর তাহলে তোমার সর্বনাশটি হবে। এই সর্বনাশ থেকে বাঁচানর জন্যই স্বামীজী কাজের নিদান দিয়ে গেছেন। যার জন্য পরের দিকে অনেক সাধু ও গৃহীভক্তরা শ্রীশ্রীমাকে গিয়ে বলেছিলেন, দোকান চালানো, স্কুল চালানো, হাসপাতাল চালানো, স্বামীজী বিদেশ থেকে এই সব আদর্শ নিয়ে এসেছেন। শ্রীমা বলেছিলেন – নরেন যা করেছে এটাই ঠিক। এটাই হচ্ছে গীতার মত, সন্ন্যাসী যদি কাজ না করে তাহলে কিন্তু গোলমাল লেগে যাবে।

গীতার আলোচনা করার সময় একই কথা বারবার ঘুরে ফিরে বলা হবে, কারণ কয়েকটি ব্যাপারকে বার বার আলোচনা করে করে ভালো ভাবে বুঝে নিলে পুরো গীতাকে বুঝতে আর বেশি কঠিণ মনে হবে না। সেইজন্য একই কথা অনেক বার আমাদের আলোচনায় এসে যাবে। প্রথম কথা আমরা এখানে শঙ্করাচার্যের ভাষ্যকে অনুসরণ করে আলোচনা করছি। শঙ্করাচার্য জীবনের উদ্দেশ্যের ব্যাপারে একেবারে স্পষ্ট ছিলেন, তাঁর মতে জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে জীবন-মৃত্যুর এই চক্র থেকে মুক্তি, একমাত্র আত্মজ্ঞান থেকেই এই মুক্তি আসবে। আত্মজ্ঞান মানে, আমি কে, এটা জেনে নিলেই মুক্তি। আমি কে? এই প্রশ্নের মীমাংসা করতে গিয়ে গীতা বলছে – তুমি ঈশ্বরের সাথে, বা ব্রহ্মের সাথে এক। এই জ্ঞান যাঁর হয়ে গেছে তাঁকে আর কোন কাজে কর্মে জড়াতে হবে না, তাঁদের জন্য কর্মসন্ন্যাস। কিন্তু অধিকাংশ মানুষই এই জ্ঞান লাভের জন্য প্রস্তুত নয়। যারা প্রস্তুত নয় তাদের কাজ করে যেতে হবে। এখন

বলতে পারে যে, কাজ তো সবাই করছে। তখন বলা হয় যে, বাকিরা যেভাবে কাজ করছে সেই ভাবে কাজ করলে হবে না। কাজ করার সময় তাকে আরও তিনটে জিনিষ পালন করতে হবে, প্রথম হল, ফলের কোন আকাঙ্খা করবে না, দ্বিতীয়, ফল সব সময় ঈশ্বরে সমর্পণ করবে আর তৃতীয়, ঈশ্বরের তত্ত্বকে জানার প্রচেষ্টা সর্বক্ষণ করে যেতে হবে। এই তিনটে ঠিক মত করে গেলে আজ হোক কিংবা কাল হোক তার ঠিক ঠিক সন্ন্যাসের ভাব উদয় হয়ে যাবে। যখনই কাজ করছে প্রথমের দিকে এই কাজ করার পেছনে তার কর্তব্য বোধ থাকে।

আমরা এর আগেও আলোচনা করেছি যে সবাই সন্ন্যাসী হতে পারেনা। তার পরিস্থিতি এমন হতে পারে যে সব কিছু ছেড়েছুড়ে দিয়ে ঈশ্বরের ধ্যান ধারণা করতে পারেনা। তার হয়তো কিছু ভোগ বাসনা রয়ে গেছে। সেই বাসনায় প্রেরিত হয়ে সে বিয়ে করে সংসার পেতে বসল, এখন বিয়ে করে সেতো আর বউকে ছেড়ে দিয়ে সন্ন্যাসী হতে পারবে না, স্ত্রীর ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করতে হবে। ঠাকুর এই নিয়ে হাজরাকে তিরস্কার করছেন। তখন তাকে কাজ করতেই হবে, যতটুকু কর্তব্য ততটুকু তাকে কর্তব্য পালন করতে হবে। কিন্তু তার মধ্যেও ফলের কোন আকাঙ্খা থাকবে না। তার মানে সে চাকরি করে যা মাইনে পাচ্ছে তার পুরো টাকা নিতে বারণ করা হচ্ছে না, দশ হাজার টাকা যদি মাইনে হয়, পুরো দশ হাজার টাকাই সে গুণে গুণে নেবে, এক পয়সাও কম নেবে না। আমি একটা সরকারি অফিসে চাকরি করছি, সেখানে আমার মাইনে হয়তো পনেরো হাজার টাকা। এখন আমি মনে করছি আমার এত টাকা না হলেও চলবে। তাই বলে কি আমি পনের হাজার টাকার বদলে দশ হাজার টাকা নেব আর বাকি পাঁচ হাজার টাকা সরকারকে ফেরত দিয়ে আসব? গীতা কোথাও এই কথা বলছে না। দরকার হলে তুমি পুরো টাকা কাজে লাগাবে আর দরকার না হলে পুরো টাকা গরীব দুঃখীদের সেবার জন্য দান করে দাও। যেটা বলা হচ্ছে তা হল, আমার প্রমোশন হবে কি হবে না, আমার আরও মাইনে বাড়বে কি বাড়বে না, এই নিয়ে যেন তোমার মনের মধ্যে কোন রকমের ছটফটানি না হয়। আমি মাইনে পাওয়ার জন্যই তো চাকরি করছি, বাড়িতে বউ বাচ্চা আছে, বিধবা মা আছে, আমি চাকরি না করলে তাদের খাওয়া জুটবে না। এখন এমন ভাবে সে কাজ করবে যাতে তাকে বেশি জড়াতে না হয়। আর ঠাকুরকে গিয়ে প্রাণ খুলে বলা, হে ঠাকুর আমার মন প্রাণ তোমাতেই আছে, আমি সংসারে জড়িয়ে পড়েছি বলেই আমাকে এই কাজ করতে হচ্ছে। তখন ঠাকুরের কৃপা হলে এমন এক অবস্থা তিনি করে দিতে পারেন যে আপনাকে আর কাজই করতে হল না। ঠাকুর বলছেন – ঈশ্বরের প্রতি যদি ব্যাকুলতা থাকে তখন তাঁর কৃপা হলে হয়তো কেউ এসে তার সংসারের দায়ীত্ব নিয়ে নেয়।

গীতায় কোথাও বলছে না যে তুমি তোমার সংসারকে একেবারে ছেড়ে দিয়ে আমার ভজনা কর। কেননা পরিস্থিতি মানুষকে যে কোন জায়গায় নিয়ে যেতে পারে, এই পরিস্থিতিকে মেনে নিয়ে তোমাকে সেই ভাব নিয়ে কাজ করে যেতে হবে। এমন কাজ করবে যাতে কাজে মন না বেশি জড়িয়ে যায়। কিন্তু কোন কিছু পাওয়ার জন্য তোমার ছটফটানিটা বন্ধ করতে হবে। যদি কোন অফিসে ষোল ঘন্টা কাজ করে পঁচিশ হাজার টাকা মাইনে পাচ্ছি, আরেক জায়গায় যদি ছয় ঘন্টা কাজ করে পনের হাজার টাকা পাওয়া যায়, এখন যদি আমার মনে হয় পনের হাজার টাকায় আমার চলে যাবে, তাহলে আমি ষোল ঘন্টার চাকরি কেন করতে যাব। আর যদি সংসারে তোমার সত্যি সত্যিই অসুবিধা হচ্ছে তাহলে ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা কর, তিনিই তোমার কাজ কমিয়ে দেবেন। এই কথা গুলো বলা হচ্ছে তাদের উদ্দেশ্যেই যারা আধ্যাত্মিক জীবনকে বেছে নিয়েছেন, কিন্তু কোন একটা পরিস্থিতির কারণে ফেঁসে গেছেন। সন্তান হয়ে যাওয়ার পর তার আধ্যাত্মিক জীবনের প্রতি আগ্রহ এসেছে বলে কি সে এখন সন্তানকে অনাথ আশ্রমে দিয়ে আসবে? কখনই সে এই কাজ করতে পারেনা। আগে তার সন্তানকে মানুষ করতে হবে। তাকে মানুষ করতে গেলে কাজ করতে হবে। এইবার কর্মযোগ বলছে তুমি কাজটা কিভাবে করবে। কর্মযোগে বলবে তুমি কাজ করে যা মাইনে পাচ্ছ তাতেই সন্তুষ্ট থেকে সৎ ভাবে জীবন যাপন কর, আর ঠাকুরের নাম ধ্যান করতে থাক। এরপর আস্তে আস্তে ঠাকুরই তোমাকে টেনে নেবেন।

আসক্তি আছে বলেই এই শরীর ধারণ করতে হয়েছে, যার আসক্তি নেই সে জন্ম নেবে কিসের জন্য। জন্মাবার জন্য অজ্ঞান দরকার, অজ্ঞান থাকলে আসক্তি আসবে, আসক্তির জন্যই আমাদের এই শরীর ধারণ করতে হয়েছে। সন্ন্যাসীরও যদি জ্ঞান না হয় তাকে আবার জন্ম নিতে হবে। বাসনা থেকেই সংসার, সংসার যখন করে ফেলেছ তখন তোমাকে কাজ করতে হবে, কিন্তু এই সংসার থেকে বেরোতে হলে তোমার আসক্তির বীজকে নাশ করতে হবে। আসক্তি নাশ হয় অনাসক্ত কাজের মাধ্যমে। যে কাজই আসুক না কেন, ভগবান আমাকে এই কাজ দিয়েছেন, এই কাজ থেকে আমি কোন ভাবেই পালাতে পারিনা, এই ভাব নিয়ে যে কাজ করছে সে কিন্তু আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে অনেক উঁচুতে যাবে। ভগবান দিয়েছেন মানে, আমার যেমন কর্ম করা আছে, সেই অনুসারেই এখন আমার এই পরিস্থিতি, এর বাইরে তো ভগবান কিছু দেবেন না। এই পরিস্থিতি থেকে যদি পালিয়ে যাই, আগামী জন্মে আবার এই পরিস্থিতি এই পরিবেশটাই ভগবান আমাকে দেবেন। একজন গায়ক একটা ফাংশানে গান করছিল, গান করার পর সবাই আরেকবার আরেকবার করে চেঁচিয়ে উঠেছে। গায়ক আরেকবার গান করল, আবার সব শ্রোতারা আরেকবার আরেকবার করে চেঁচিয়ে উঠেছে। গায়ক আবার গান করল। এইভাবে যখন কুড়িবার হয়ে গেছে তখন গায়ক বিরক্ত হয়ে বলছে – একই গান কতবার আর গাইব। শ্রোতারা তখন চেঁচিয়ে বলছে যতক্ষণ না তুমি গানের সুর তাল ঠিক রেখে গান করছ তোমাকে স্টেজ থেকে নামতে দেওয়া হবে না।

এইখানেও যতক্ষণ কর্মটাকে ঠিক ঠিক ভাবে না করা হচ্ছে ততক্ষণ ঐ কর্মটাই আমার কাছে ঘুরে ঘুরে আসতে থাকবে। এইটাই আমাদের শাস্ত্রের মত, আর কেউ মানুক না মানুক। মোদ্দা কথা হচ্ছে দায়ীত্ব থেকে কখনই কেউ পালিয়ে বাঁচতে পারবে না।

আসক্তির ব্যাপারে আমরা যত কথাই বলি না কেন, এটা পরিষ্কার যে আসক্তি আছে বলেই আমাদের জন্ম হয়েছে। এই দেহটা এখন চলছে আসক্তি আছে বলেই। এখন এই আসক্তি থেকে বেরোবার উপায়টাকে জানতে হবে। এর মধ্যে কিছু আছেন যাঁরা স্বামীজীর মত এই আসক্তির করাল গ্রাস থেকে বেরিয়ে গেছেন, আর কিছু আছেন যাঁরা বেরিয়ে যাবার জন্য লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন। লড়াই করার কৌশলটা হচ্ছে কর্মযোগ। কর্মযোগ বলছে – প্রথম কথা তুমি ফলের আকাঙ্খা করবে না, দ্বিতীয় ফল ঈশ্বরে সমর্পণ করতে হবে আর তৃতীয় ঈশ্বরের তত্ত্বের চিন্তন মনন সব সময় করে যেতে হবে। গীতার যা কিছু সব এর মধ্যেই ঘুরবে। আমাদের যত শাস্ত্র আছে, উপনিষদ, বেদ, পুরান সব এই কটি জিনিষের মধ্যেই ঘুরছে। এই যে সম্যক জ্ঞানের কথা বলা হয়েছে, এই জ্ঞান কিভাবে পাওয়া যেতে পারে? তখন বলছেন –

**যোগযুক্তো বিশুদ্ধাত্মা বিজিতাত্মা জিতেন্দ্রিয়ঃ। সর্বভূতাত্মভূতাত্মা কুর্বন্নপি ন লিপ্যতে।।৭।।**

এই *বিশুদ্ধাত্মা* যোগীরা যে কোন কাজই করুন না কেন, তাঁরা কিন্তু কোন কাজেই লিপ্ত হন না। কারণ এঁরা সব সময় যোগযুক্ত হয়ে থাকেন, এখানে সন্ন্যাসীদের কথা বলা হচ্ছে। আর এঁদের মন একেবারে *বিশুদ্ধাত্মা,* এখানে আত্মা বলতে আবার মনকে বোঝাচ্ছে, একেবারে শুদ্ধচিত্ত। *বিজিতাত্মা,* সংযতদেহ, এখানে আবার আত্মা বলতে দেহকে বোঝাচ্ছে। আত্মা বলতে সাধারণত আমরা বুঝি চৈতন্য, পরমাত্মা বা ব্রহ্মকে। কিন্তু এখানে আত্মাকে তিনটে অর্থে ব্যবহার করা হচ্ছে। *বিশুদ্ধাত্মার* আত্মা বলতে মনকে বোঝাচ্ছে, *বিজিতাত্মার* আত্মা বলতে দেহ আবার অনেক সময় আত্মা বলতে ইন্দ্রিয়কেও বোঝাবে। কোথায় আত্মাকে কি অর্থে ব্যবহার করা হচ্ছে আচার্যের ভাষ্য না হলে বোঝা যাবে না। এখানে যোগীর চারটি গুণের কথা বলা হল – *যোগযুক্ত,* নিজের আত্মাতে সব সময় মনকে বসিয়ে রেখেছে, *বিশুদ্ধাত্মা,* মন একেবারে শুদ্ধ অবস্থায় চলে গেছে, *বিজিতাত্মা,* সংযতদেহ, দেহের সব কিছুর নিয়ন্ত্রণ তার মুঠোর মধ্যে, আমি কাজ ছাড়া বসে থাকতে পারিনা, আমার job satisfaction দরকার, এই ধরণের বৃত্তি কখন ওঠে না, আর চতুর্থ হচ্ছে *জিতেন্দ্রিয়,* ইন্দ্রিয়কে জয় করে রেখেছে, একটু গান শুনি, একটু টিভি দেখি, একটু আড্ডা মারি, এই ধরণের ছটফটানির কোন লক্ষণই তাঁর মধ্যে পরিলক্ষিত হবে না। মন তাঁর এমন পবিত্র হয়ে গেছে, তাঁকে যদি কোন কাজ করতে না দেওয়া হয় তাতেও সে কাজ করবার জন্য সব সময় নিসপিস করবে না, আবার কাজ দিলেও তিনি বিরক্ত হবেন না। *সর্বভূতাত্মভূতাত্মা,* যখন যোগীর মধ্যে এই চারটে গুণ এসে যায় তখন যোগী দেখেন ভগবান হচ্ছেন সর্বভূতের ভূতাত্মা। এইখানে যে আত্মার কথা বলা হল এই আত্মা হচ্ছেন সেই পরমাত্মা, তিনি হচ্ছেন সর্বভূতের আত্মস্বরূপ। যোগী দেখেন আমার মধ্যে যে আত্মা সেই আত্মাই আবার সর্বভূতের মধ্যে বিরাজিত, সবার মধ্যে সেই এক পরমাত্মাই বিরাজ করছেন। যখন সবার মধ্যে সেই আত্মাকেই দর্শন করে নেয়, তখন তিনি কাজ করলেও তাতে লিপ্ত হন না। তখন তিনি কিভাবে কাজ করেন, আর কিভাবে লিপ্ত হন না?

**নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তো মন্যেত তত্ত্ববিৎ। পশ্যন্ শৃণ্বন্ স্পৃশন্ জিঘ্রন্নশ্নন্ গচ্ছন্ স্বপন্ শ্বসন্।।৮।।**
**প্রলপন্ বিসৃজন্ গৃহ্ণন্নুন্মিষন্নিমিষন্নপি। ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেষু বর্তন্ত ইতি ধারয়ন্।।৯।।**

আমাদের শরীরে, মনে, ইন্দ্রিয়ে নানান রকমের কাজ হয়েই চলেছে। দেখা, শোনা, স্পর্শ, ঘ্রাণ নেওয়া, খাওয়া, যাওয়া, ঘুমনো, নিঃশ্বাস গ্রহণ, কথা বলা, মলমূত্রাদি ত্যাগ, চোখের পাতা ফেলা ইত্যাদি যত কাজ যেগুলো এই দশটি ইন্দ্রিয়ে দিয়ে করা হচ্ছে, এই সমস্ত কাজে যিনি *তত্ত্ববিৎ,* যিনি যোগী তিনি দেখেন *নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি,* আমি এগুলো কিছুই করছি না। তবে কে করছে? *ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেষু,* ইন্দ্রিয় ইন্দ্রিয়ের নিজ নিজ বিষয়ে প্রবৃত্ত। আমার একটা পোষা কুকুর আছে। কুকুরটাকে নিয়ে আমি রাস্থায় ঘুরছি। কুকুরটা ওখানে একটা বল দেখে গপ্ করে মুখে করে ধরে নিল, এতে আমার কিছুই হচ্ছে না। আমি দ্রষ্টা রূপে দেখছি কুকুরটা একটা বলকে গিয়ে ধরল। এই রকম যদি পাঁচটা কুকুর থাকে, একটা কুকুর একটা খরগোশকে দেখে সেদিকে দৌড়ে গেল, আরেকটা কুকুর একটা বেড়ালকে দেখে দৌড় দিল ধরতে, আরেকটা কুকুর একটা ইঁদুর দেখে তাকে তাড়া করে গেল। আমাদের ইন্দ্রিয় গুলো ঠিক কুকুরের মত। চোখের জিনিষকে চোখ গিয়ে ধরল, কানের জিনিষকে কান গিয়ে ধরল। যোগী দেখেন আমার ইন্দ্রিয় এটা শুনতে চলল, আমার ইন্দ্রিয় চলল এটা দেখতে, আমি নির্বিকার। মায়ের দুটো বাচ্চা, তারা যমজ ভাই। মা আরামসে বসে সেলাই করে যাচ্ছে, কিন্তু বাচ্চা দুটো নিজের মত একবার এই খেলনা আরেকবার ঐ খেলনাকে নিয়ে খেলা করে যাচ্ছে। মা দেখছে বাচ্চা দুটো খেলা করছে, দেখে আনন্দ পাচ্ছে। মা জানে, বাচ্চা দুটো আমার, বাচ্চারা নিজেদের মত খেলা করে যাচ্ছে, আমি কোন খেলাতে লিপ্ত নই, আমি আমার মত নিজের কাজ করে যাচ্ছি। কিন্তু কোন মা হয়তো তার বন্ধুর সাথে গল্প করে যাচ্ছে আর বাচ্চা দুটো খেলার মাঝে চেঁচামেচি করছে, বা ঝগড়া করছে, তখন মা আড্ডা মারাতে ব্যাঘাত হচ্ছে বলে হয়তো বাচ্চার গালে দুটো চড় মেরে দিয়ে নিজে চেঁচিয়ে বলবে – তখন থেকে জ্বালাচ্ছিস, শান্তিতে একটু গল্প করতেও দিবি না। আমাদেরও এই একই অবস্থা, আমরাও ইন্দ্রিয়ের সব কিছুতে নিজেকে একাত্ম করে ইন্দ্রিয়ের কাজের মধ্যে নিজেকে জড়িয়ে ফেলি। এই কারণে আমরা যত রকমের

দুঃখ যন্ত্রণায় কষ্ট পাই। কিন্তু যিনি জ্ঞানী, জ্ঞানী মানে যিনি যোগযুক্ত, মনকে, দেহকে ইন্দ্রিয়কে নিয়ন্ত্রণে রেখেছেন আর সর্বভূতে সেই আত্মাকেই দেখেন যে আত্মা তাঁর মধ্যেও আছেন। এঁদের সেই বোধ আছে যে আমি কোন কিছুই করিনা।

যোগীদের এই অবস্থাটা, যে অবস্থায় তাঁরা দেখেন যে ইন্দ্রিয় ইন্দ্রিয়ের নিজের নিজের বিষয়ের প্রতি প্রবৃত্ত হয়ে কাজ করে যাচ্ছে, এই অবস্থাটা আমরা একটু অভ্যাস করলেই বুঝতে পারব। চোখ বন্ধ করে, চুপচাপ কিছুক্ষণ বসে থেকে ঘরের মধ্যে যত শব্দ হচ্ছে, ঘরের বাইরে থেকে যত রকমের শব্দ আসছে সেই শব্দ গুলিকে মন দিয়ে লক্ষ্য করতে হবে। এই শব্দগুলো মন শান্ত হওয়ার আগেও হয়ে যাচ্ছিল, কিন্তু তখন আমি বুঝতে পারছিলাম না। এখন যেই মনকে শান্ত করতে শুরু করলাম, তখন ঘরের মধ্যে যে পাখাটা ঘুরছিল তার যে আওয়াজ সেটা আমার কানে আসছিল না, এখন সেই আওয়াজটা আমার কানে আসছে, বাইরে একটা পাখি অনবরত ডেকে যাচ্ছিল, আমি জানতেও পারছিলাম না, কিন্তু এখন আমার শ্রবণেন্দ্রিয় সম্প্রসারিত হয়ে সেই পাখির ডাকের আওয়াজটাকে গিয়ে ধরছে। আগেও শ্রবণেন্দ্রিয় ধরছিল কিন্তু আমি শ্রবণেন্দ্রিয়ের ব্যাপারে সচেতন ছিলাম না। সব কটা আওয়াজ পরিস্কার আলাদা আলাদা ভাবে বোঝা যায়, আমার শ্রোত্রিয়িন্দ্র আলাদা, আমি আলাদা আর আওয়াজটা আলাদা, এই তিনটে স্পষ্ট আলাদা মনে হবে। তবে এখন আমি আলাদা আর আমার ইন্দ্রিয়গুলো আলাদা আলাদা ভাবে কাজ করে যাচ্ছে এটা বোঝা যাবে না, কেননা আমি আত্মজ্ঞানী নই। এগুলোকে আমাদের চেষ্টা করে আলাদা করতে হচ্ছে, কিন্তু যিনি আত্মজ্ঞানী, যোগযুক্ত তাঁকে আর আলাদা করে চেষ্টা করতে হয় না। তিনি স্পষ্ট দেখতে পান যে তাঁর ইন্দ্রিয় গুলো বিষয়ের দিকে ধাবিত হচ্ছে, আর আমি এগুলো থেকে আলাদা। এরপর বলছেন –

**ব্রহ্মণ্যাধায় কর্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ। লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা।।১০।।**

পদ্মপাতায় যত জলই পড়ুক না কেন, সব জলই ঝড়ে যাবে, পদ্মপত্র যেমনকার তেমনই থাকবে। জল যেমন পদ্মপাতাকে সিক্ত করতে পারেনা, ঠিক তেমনি যিনি জ্ঞানী পুরুষ তাঁকে কোন কর্ম ও পাপ লিপ্ত করতে পারেনা। পাপ বলতে এখানে ধর্ম ও অধর্ম দুটোকেই বোঝাচ্ছে। *ব্রহ্মণ্যাধায় কর্মাণি*, যিনি সব কর্ম ঠাকুরের উপর অর্পণ করে দিয়েছেন তিনি নিঃসঙ্গ হয়ে যান, কোন কিছুই তাঁকে আর স্পর্শ করতে পারেনা। শুধু মুখে সমর্পণ করলেই এই জিনিষ হয় না। ঠিক ঠিক ঐ ভাব যখন আসে তখন সত্যি সত্যিই বলতে পারে হে ঠাকুর তোমার কাছে আমার জন্য কিছুই চাই না, তোমার প্রতি ভক্তিও চাইনা, আমার মোক্ষও পর্যন্ত চাইনা। আমার সব কিছুই তোমাকে দিলাম, যদি আমাকে ভক্তি দেওয়ার থাকে তুমি নিজেই দেবে, যদি আমাকে মোক্ষ দেওয়ার থাকে তাও তুমি নিজেই দেবে। যদি হৃদ্দ ভক্তি বা মোক্ষও চাই কিন্তু তার জন্য আমার কোন অস্থিরতা থাকবে না, আমার সময় হলে তুমি নিজেই আমাকে দেবে।

**কায়েন মনসা বুদ্ধ্যা কেবলৈরিন্দ্রিয়ৈরপি। যোগিনঃ কর্ম কুর্বন্তি সঙ্গং ত্যক্ত্বাত্মশুদ্ধয়ে।।১১।।**

যিনি যোগী তিনিও কাজ করেন, কিন্তু তিনি সেই কাজ তাঁর আত্মশুদ্ধির জন্যই করেন। কিভাবে কাজ করেন? *কায়েন মনসা বুদ্ধ্যা কেবলৈরিন্দ্রিয়ৈরপি*, কেবল মাত্র শরীর, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি দিয়ে এই কাজ গুলো করেন। তাঁর সব কাজই মমত্ব বর্জিত, তিনি যে সকল কাজ করেন তার মধ্যে আমি বোধ থাকে না। একটি বাচ্চা যখন হিজিবিজি কিছু ছবি আঁকে তখন সেই ছবিটাকে নিয়েই তার কত উৎসাহ, একবার মাকে দেখাবে, বাবাকে দেখাবে – দ্যাখো দ্যাখো আমি কি সুন্দর ছবি এঁকেছি। বাচ্চা বয়সে সবাই এই রকমই থাকে, বাচ্চাদের পক্ষে এটা কোন দোষের কিছু নয়, কিন্তু বয়স হয়ে গেলে এই জিনিষগুলো থাকে না। কিন্তু সত্যিই কি বয়স হলে চলে যায়? এগুলো বয়স হলেও যায়না, অন্য ভাবে এই মমত্ব-ভাবটা প্রকাশ পায়। একটা কিছু কাজ করার পর অধীর আগ্রহে বসে থাকি এই কাজটাকে দেখে লোকেরা কি বলছে। কিন্তু যোগী যাঁরা তাঁরা শরীর, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি দিয়ে ফলাকাঙ্খা রহিত হয়ে কাজ করেন, আর কাজের মধ্যে এই ধরণের কোন মমত্ব ভাব থাকেনা। এটা আমার কাজ, আমার লাভের জন্য, আমার নাম-যশের জন্য করছি এই বোধ তাঁর কখনই থাকে না।

**যুক্তঃ কর্মফলং ত্যক্ত্বা শান্তিমাপ্নোতি নৈষ্ঠিকীম্। অযুক্তঃ কামকারেণ ফলে সক্তো নিবধ্যতে।।১২।।**

যে যোগী নয়, সাধারণ লোক, সারা জগতে যাদের সংখ্যাটাই বেশি, এরা সবাই আসক্ত হয়েই কর্ম করে, সবাই কর্মফলে আসক্ত, কোন একটা ইচ্ছা, বাসনার সাথে যুক্ত হয়েই এরা কর্ম করে, এরা কর্মের পরিণতিতে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। কিন্তু যিনি যোগী তিনি *কর্মফলং ত্যক্ত্বা*, কর্মফলে কোন আসক্তি নেই, সব ফল ত্যাগ করে দিয়েছেন, এর পরিণতি হচ্ছে – *শান্তিমাপ্নোতি নৈষ্ঠিকীম্*, তিনি সব সময় একেবারে আত্যন্তিক শান্তিতে অবস্থান করেন। শান্তিটা কিসে হয়? শান্তিটাকে একটু বিশ্লেষণ করা যাক।

কোন একটা পরিস্থিতি থেকে যে পরিমাণ আনন্দ হবে সেটাকে 'ক' ধরা যাক। আমি একটা পার্টিতে যাব, যাওয়ার আগে আমার জানা আছে যে পার্টিতে গিয়ে আমার আনন্দই হবে, পার্টিতে গিয়ে আমার যে আনন্দ হবে সেটাকে ধরছি 'ক' পরিমাণ

আনন্দ। কিন্তু আমরা সবাই, আমাদের যার যেমন মানসিক গঠণ সেই অনুসারে প্রত্যাশা করি যে আমার এই পরিমাণ আনন্দ হবে, এই প্রত্যাশা যুক্ত আনন্দ কে 'খ' ধরা যাক। পার্টিতে যাবার পর বাস্তবে যে পরিমাণ আনন্দটা হচ্ছে সেটা ধারা হচ্ছে 'গ'। মানে দাঁড়াল 'ক' হচ্ছে যে পরিমাণ আনন্দ হবার কথা, আমি যে পরিমাণ আনন্দ প্রত্যাশা করছি সেটা হচ্ছে 'খ', আর 'গ' হচ্ছে বাস্তবে আনন্দ যতটুকু হচ্ছে। এখন এর একটা গাণতিক যোগসূত্র হয়, 'ক' আর 'গ' এর যে সম্পর্ক তার ফল হচ্ছে – ক (-) খ=গ, 'গ' সব সময় হবে 'ক' বিয়োগ 'খ'। এখন 'ক' থেকে 'গ' এর পরিমাণ হয় বেশি হবে অথবা 'ক' থেকে 'গ' এর পরিমাণ কম হবে। 'খ' সব সময় দেখা যাবে 'ক' আর 'গ' এর পরিমাণ থেকে বেশি। যেমন ইঞ্জেকশান যখন দেওয়া হয় তার ব্যাথার পরিমাপ যদি করা যায় তাহলে সেই পরিমাপ সবার ক্ষেত্রে সমান হওয়ার কথা। কিন্তু একজনের কাছে যখন একটা ইঞ্জেকশানের সিরিঞ্জ নিয়ে আসা হয় তখন সে যে পরিমাণ ভয়ে আঁতকে ওঠে আর যখন ইঞ্জেকশান পুশ করা হয় তখন বাস্তবিক যে ব্যাথা অনুভব হচ্ছে, দেখা যায় যে পরিমাণ ব্যাথা সে মনে করেছিল সেই পরিমাণ ব্যাথা তার হয়নি। এইখানে দেখা যাচ্ছে যে 'ক' মানে যে পরিমাণ ব্যাথা হওয়ার কথা সেই তুলনায় 'খ' মানে আমি যে পরিমাণ ব্যাথা কল্পনা করেছি সেটা 'ক' এর থেকে অনেক অনেক বেশি। এইটাই সব সময় হয়ে থাকে। আর 'গ' মানে ইঞ্জেকশান দেওয়ার পর যে ব্যাথাটা হয়েছে সেটাও সব সময় আমার ভয়জনোচিত ব্যাথা 'খ' এর থেকে অনেক কম।

এমন কি অর্থনীতির ক্ষেত্রেও এই একই পদ্ধতির প্রয়োগ হতে দেখা যায়। এক্ষুণি যদি একটা গুজব ছড়িয়ে দেওয়া হয় যে আমেরিকা কুয়েত আক্রমণ করতে যাচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে তেলের দাম হুহু করে বাড়তে শুরু করবে। আবার যদি সত্যি সত্যিই যুদ্ধ হয়ে যায় তখন আবার তেলের দাম কমে যাবে। অর্থনীতির এই পদ্ধতির উপর গবেষণা করে অনেকে ডক্টরেটও পেয়ে গেছে, কিন্তু এটা অতি সাধারণ জিনিষ। মনে করুন আগামীকাল কংগ্রেস, সিপিএম আর তৃণমূল বাংলাবন্ধ ডেকে দিল। তার মানে আগামীকাল বাজারে কোন আনাজ, মাছ মাংস পাবনা। বাজারে পাব কি পাবনা, যাও পাওয়া যাবে তার দামও অনেক বেশি হয়ে যেতে পারে এই ভেবে সবাই তাড়াতাড়ি বাজারে গিয়ে আগামীকালের জন্য কিছু কেনাকাটা করে নেবে। কিন্তু বাস্তবে যখন বাজারে গিয়ে দেখছে যে যতটা দাম বাড়ার কথা সেই রকম বাড়েনি আর যতটা জিনিষপত্র পাওয়া যাবেনা ভাবা হয়েছিল কিন্তু বাজারে সব কিছুই প্রচুর আছে। এখানেও সেই একই ফরমুলা – বাজারে 'ক' পরিমাণ দাম বাড়ার কথা, আমি ভাবলাম 'খ' পরিমাণ দাম বাড়তে পারে, কিন্তু বাজারে গিয়ে দেখছি 'গ' পরিমাণ দাম বেড়েছে। কল্পনার সাথে বাস্তবের কোন যোগ থাকে না। বাচ্চা বয়সে যখন বাবা-মার সাথে প্রথম ট্রেনে করে কোথাও যাবার কথা হয় তখন বাচ্চাদের মনে এত উত্তেজনা তৈরী হয় যে কয়েক দিন ধরে আর ঘুম হবে না, খেতে পারবে না, সারাক্ষণ কি কি করব এই চিন্তা আর বন্ধুদের বার বার বলতে থাকবে আমি ট্রেনে করে বেড়াতে যাব। কিন্তু যখন ট্রেনে চেপে যেতে থাকবে তখন সেই উত্তেজনাটা কমে যায়, তখন ভাবে যেমনটি ভেবেছিলাম ততটা সেই রকম নয়। এখানেও সেই 'ক', 'খ' আর 'গ' এর গাণিতিক খেলা। যেটা হওয়ার কথা তার থেকে আমরা অনেক বেশি কল্পনা করি। আর প্রকৃত পক্ষে যেটা হচ্ছে সেটা খারাপই হোক আর ভালোই হোক, 'খ' এর থেকে অনেক কম।

'ক' আর 'গ' এর কি সম্পর্ক? যেটা হওয়ার কথা 'গ' মানে যেটা বাস্তবে হয়েছে সেটা 'ক' এর থেকে হয় বেশি হবে না হয়তো কম হবে। এই 'ক'(+)(-) 'গ'= 'ফ'(কর্মফল)। 'ক' আর 'গ' এর যোগ বিয়োগ হয়ে যেটা হবে সেটাই হচ্ছে কর্মফল। আমার কর্মানুসারেই এই 'ক'টা বেড়ে 'গ' হয়ে যাবে নয়তো কমে 'গ' হয়ে যাবে। আর 'খ'টাই হচ্ছে ফলাসক্তি। আমার ফলে যত বেশি আসক্তি থাকবে 'খ'টা তত বেশি হবে। ইঞ্জেকশানের ব্যাথার প্রতি যদি বেশি আসক্তি থাকে তখন মনে হবে কি না কি হতে যাচ্ছে। যদি আমার খাওয়ার প্রতি প্রচণ্ড লোভ থাকে তখন নিমন্ত্রণ বাড়িতে খেতে যাওয়ার আগে মনে হবে কত কিছুই না খেতে যাচ্ছি। যাঁরা যোগী তাঁর এই 'খ'টাকে প্রথমেই উড়িয়ে দেন। যোগীদের কাছে 'খ' বলে কিছু থাকেই না। যোগী জানে এটা 'ক' হওয়ার কথা, কিন্তু সেটাও না হতে পারে, যেটা হবে সেটাই হচ্ছে 'গ', 'গ'ই হবে। যখন 'ক' আর 'গ' এর যোগ বিয়োগের পরিণামে 'ফ' যখন প্লাসের দিকে থাকে তখন যোগী আনন্দে উচ্ছ্বসিত হন না, তিনি জানেন এটা আমার কর্মফল, যখন মাইনাস 'ফ' হয়ে যায় যোগী আবার ভেঙ্গে পড়েন না, তখনও দেখেন যে এটা আমার কর্মফল। কিন্তু আমরা 'ক'টাকেও দেখিনা, আমরা সব সময় মাপছি 'খ'টাকে ধরে নিয়ে, আর আমাদের ক্ষেত্রে 'গ' সব সময় 'খ' এর থেকে কম থাকবে। যখন মাইনে বাড়ার কথা চলে তখন আমি ভাবছি আমার দু'হাজার টাকার মত মাইনে বাড়বে। কিন্তু যখন মাইনে বাড়ান হল তখন দেখছি সাতশ টাকা বাড়ার জায়গায় পাঁচশ টাকা বেড়েছে, স্বাভাবিক ভাবেই তখন মনকে হতাশা গ্রাস করে নেবে।

পুরো গীতার শিক্ষা হচ্ছে এই 'খ' টাকে তোমার মাথা থেকে নামাতে হবে। আর 'ক' আর 'গ' কখনই মিলবে না, কারণ যোগ বিয়োগে যেটা 'ফ' দাঁড়াচ্ছে, তার জন্য। এই 'ফ' যেটা আছে সেটাকে তুমি বোঝার চেষ্টা কর, তোমার নিজেরই কর্মফলের জন্য 'ক' আর 'গ' এর যোগ বা বিয়োগের জন্য 'ফ' হচ্ছে। সেইজন্য গীতা বলছে যদি তোমার আনন্দ আসে তাহলে বেশি উৎফুল্ল হয়ো না, দুঃখ-কষ্ট যদি আসে তাহলে কান্নাকাটি করতে যেও না। কারণ 'ক' 'ক'ই থাকে। পুরো আধ্যাত্মিক সাধনার তত্ত্ব হল এইটাই – 'ক', 'খ' আর 'গ'। আর 'খ' সব সময় 'ক' আর 'গ' এর থেকে বেশি হবে।

আধুনিক ম্যানেজমেন্ট বিজ্ঞানে এই জিনিষটাই হয়। মাইনে বাড়া, প্রমোশন হওয়া, মার্কেট সেল বেশি কম হওয়া সবটাই এই ফরমুলা অনুযায়ী হয়। সেইজন্য সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে যদি ভয় দেখিয়ে রাখা যায়, তারপরে দেখে যতটা ভয় পাওয়ার কথা সেই রকম কিছুই হচ্ছে না, তাতে পরে সে একটু রিলিফ পায়। যদি ছেলে মেয়েকে বলে – তোমাকে ছাড়া আমি বাঁচব না। তারপর মেয়েটা ছেলেকে ছেড়ে চলে গেল, তারপর দেখছে ছেলেটা দিব্যি বেঁচে আছে। কারণ বাস্তবে যেটা হওয়ার সেটা সব সময় কম হবে। সেইজন্য সাধারণ মানুষের একটু কষ্ট হওয়া অনেক মঙ্গলের। কারণ যখন কষ্ট হওয়ার সম্ভবনা থাকে তখন মনে করে বিরাট কষ্ট আসছে, বাস্তবে গিয়ে যখন দেখে কষ্টটা কম হচ্ছে তখন সেই আবার অনেক স্বস্থি অনুভব করে। কিন্তু যোগীদের ক্ষেত্রে এই ধরণের কোন সমস্যাই হয় না। তারপর ভগবান বলছেন –

**সর্বকর্মাণি মনসা সংন্যস্যাস্তে সুখং বশী। নবদ্বারে পুরে দেহী নৈব কুর্বন্ন কারয়ন্।।১৩।।**

আমরা এই বাড়িতে বসে আছি, এই বাড়িতে কি হচ্ছে, না হচ্ছে, তাতে আমাদের কিছুই আসে যায় না। এই বাড়ির কোন নর্দমা দিয়ে কি জল যাচ্ছে, কোন ঘরে আলো জ্বলছে কি জ্বলছে না, কোন ঘরের দরজা বন্ধ, কোন ঘরের জানলা খোলা এই নিয়ে আমাদের এখানে কারুর মাথা ব্যাথা নেই। ঠিক তেমনি যিনি পাক্কা সন্ন্যাসী তিনি মনে করেন – এই যে তাঁর শরীর, এই শরীরটা নয়টি দরজা বিশিষ্ট, চোখ, কান, নাক ইত্যাদি। এই শরীরটা যেন একটা শহর, এই শহরের তিনি একজন বাসিন্দা। আমাদের মত সাধারণ মানুষ মনে করি, এখন আমি চেয়ারে বসে আছি, কেউ বলবে আমি মাটিতে বসে আছি, কেউ বলবে আমি বিছানায় শুয়ে আছি। কিন্তু যিনি জ্ঞানী তিনি আরেক ধাপ এগিয়ে যান। তিনি মনে করবেন না যে আমি চেয়ারে বসে আছি বা আমি এই বাড়িতে বাস করি, তিনি মনে করেন আমি এই দেহে বসে আছি। অর্থাৎ আমরা এই দেহটাকে মনে করি আমি, কিন্তু জ্ঞানী আত্মা বা জীবাত্মাকে মনে করেন 'আমি'। আমি এই চেয়ারে বসে আছি, এই চেয়ারটা ভেঙ্গে গেলে আমি কি আর করব, আরেকটা চেয়ার নিয়ে আসব। যোগীও ঠিক জানে যে, আমার এই শরীরটা নাশ হয়ে গেল, আমি আরেকটা শরীরে চলে যাব। সেইজন্য মৃত্যু বা জীবন এঁদের কোন ভাবেই স্পর্শ করতে পারেনা। কারণ এনারা *সর্বকর্মাণি মনসা সংন্যস্যাস্তে সুখং বশী*, বিবেক বুদ্ধির দ্বারা যত রকমের কর্ম আছে, নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য ও নিষিদ্ধ, সমস্ত কর্ম ত্যাগ করে জিতেন্দ্রিয় হয়ে আত্মা ছাড়া আর কোন বাইরের জিনিষের থেকে সুখ অনুভব করেন না, তখন তাঁর এই শরীর থাকলেই বা আর শরীর না থাকলেও কিছু যায় আসে না।

**ন কর্তৃত্বং ন কর্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ। ন কর্মফলসংযোগং স্বভাবস্তু প্রবর্ততে।।১৪।।**

যিনি আমার এই দেহের মধ্যে আত্মা রূপে আছেন, তিনি আমার মধ্যে কোন কর্তৃত্ব সৃষ্টি করেন না, আমি করছি এই বোধটা আত্মা আমাদের দেননা। *ন কর্মাণি*, নানান রকমের যে কর্মসৃষ্টি তার কথা বলা হচ্ছে, কর্ম সৃষ্টির অর্থ হচ্ছে যেটা দিয়ে ভোগ হয়। যেমন, মানুষ বাড়ি, গাড়ি কিনছে, এগুলো কখনই প্রভু সৃষ্টি করেন না। আবার কর্তা আর কর্ম এই দুটোকেও তিনি সংযুক্ত করে দেন না। আমি রুটি খাচ্ছি, এই আমি বোধ আত্মা দেননা, রুটিও আত্মা সৃষ্টি করেন না, আর আমার আর রুটির যে সংযোগ হচ্ছে এটাও আত্মা ঘটান না। তিনি নির্বিকার। সাধারণ মানুষ বলে, সব ভগবানই করিয়ে দিচ্ছেন, তাঁর ইচ্ছাতেই সব কিছু হচ্ছে। সাধারণ লোকেদের জন্য ঠিকই আছে। কিন্তু বাস্তবে কর্তা, কর্ম এগুলোর কোনটার সঙ্গে আত্মার কোন সম্পর্ক নেই। প্রকৃতিই সব করছে, এই তত্ত্বটা গীতার খুব গুরুত্বপূর্ণ আর এটাই গীতার মূল দর্শন। *স্বভাবস্তু প্রবর্ততে*, স্বভাব হচ্ছে প্রকৃতি, বলছেন প্রকৃতি প্রকৃতির নিজের মত চলছে। খেতে বসেছি, হাত নিজে থেকেই খাবারের দিকে যাচ্ছে, খাবার মুখের দিকে যাচ্ছে, এগুলো সবই প্রকৃতি করছে, আত্মা এখানে নির্বিকার। যেমন আমরা এখানে যা কিছু করছি এর সাথে মনমোহন সিংএর কোন সম্পর্ক নেই, ঠিক তেমনি আত্মা যিনি আছেন, তাঁর সাথে এগুলোর কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু মনমোহন সিং আছেন বলেই এই দেশটা চলছে, দেশ চলছে বলে আমাদের এখানে এই কাজ গুলোও চলছে। সেই রকম এই দেহের মধ্যে আত্মা আছেন বলেই দেহটা চলছে, কিন্তু সম্পর্ক কোন ভাবেই নেই। আত্মার আর কিসের সঙ্গে সম্পর্ক নেই?

**নাদত্তে কস্যচিৎ পাপং ন চৈব সুকৃতং বিভুঃ। অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ।।১৫।।**

আত্মা যিনি, তিনি আমাদের কোন পাপও গ্রহণ করেন না আর কোন পূণ্যও গ্রহণ করেন না। *অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং*, আমাদের যে বাস্তব জ্ঞান সেটা অজ্ঞানের দ্বারা আবৃত হয়ে আছে। এই অজ্ঞান আমাদের বাস্তব জ্ঞানকে আবৃত করে রেখেছে বলে আমরা মোহগ্রস্ত হয়ে আছি, তাই আমরা মনে করি ভগবান এটা করছেন, ভগবান এটা করাচ্ছেন, ভগবান সুখ দিচ্ছেন ভগবান কষ্ট দিচ্ছেন। তবে প্রথমের দিকে ভগবানই সব করছেন, করাচ্ছেন এই বিশ্বাসকে ধরে রেখে এগোতে হয়, এগোতে এগোতে যত অজ্ঞানের আবরণ সরতে থাকে তখন দেখে যে ভগবান কিছুই করছেন না। কথামৃতে ঠাকুর এই জিনিষটাকেই তত্ত্বের দ্বারা বলছেন না, তিনি নিজের উপলব্ধি থেকে বলছেন, আমি সব দেখতে পাচ্ছি এগুলো কোন কিছুই নয়। এই ধরণের জ্ঞান যখন হয়ে যায়, মানে সব কিছু প্রকৃতি তার স্বভাবে করে যাচ্ছে, তখন কি হয়?

**জ্ঞানেন তু তদজ্ঞানং যেষাং নাশিতমাত্মনঃ। তেষামাদিত্যবজ্জ্ঞানং প্রকাশয়তি তৎপরম্।।১৬।।**

এই জ্ঞানের দ্বারা যার অনাদি অজ্ঞান বিনষ্ট হয়ে গেছে তার কাছে এই পুরো ব্যাপারটা দিনের আলোর মত পরিষ্কার হয়ে যায়, রাত্রির অবসানে যখন ভোরের পূব আকাশে সূর্যোদয়ের সাথে আলো প্রস্ফুটিত হয় রাত্রির অন্ধকারের সমস্ত কালিমা সরে যায় তখন যেমন সব কিছু পরিষ্কার দেখা যায়, এই জ্ঞানের উন্মেষের সাথে সাথেই তার সমস্ত অজ্ঞান দুরীভূত হয়ে আত্মার ব্যাপারে সব কিছু পরিষ্কার হয়ে যায়। আত্মার সব কিছু ব্যাপার যখন পরিষ্কার হয়ে যায় তখন কি হয়?

**তদ্বুদ্ধয়স্তদাত্মানস্তন্নিষ্ঠাস্তৎপরায়ণাঃ। গচ্ছন্ত্যপুনরাবৃত্তিং জ্ঞাননির্ধূতকল্মষাঃ।।১৭।।**

যাঁরা *অকল্মষঃ*, মানে জ্ঞানের দ্বারা যাদের সমস্ত পাপ বিনষ্ট হয়ে গেছে, এঁদের আর *ন পুনরাবৃত্তিং*, আর এঁদের কখন জন্ম হয় না। এর উপরে তাঁর মধ্যে আবার চারটে বিশেষ লক্ষণ দেখা যায় – *তদ্বুদ্ধি*, তৎ মানে ঈশ্বর, ঈশ্বরের তত্ত্ব, পরামার্থ তত্ত্ব থেকে তাঁর বুদ্ধি আর কখনই ভ্রষ্ট হয় না, মানে তাঁর বুদ্ধিতে একমাত্র তিনিই আছেন, তিনি ছাড়া আর কিছুই নেই। *তদাত্মানঃ*, যাঁর এই বোধ হয়ে গেছে যে তিনিই, সেই ভগবানই আমার আত্মা। *তন্নিষ্ঠঃ*, যিনি সব কর্মে সন্ন্যাস নিয়ে নিয়েছেন, মানে কোন কর্মে তাঁর কোন স্পৃহা নেই আর পুরোপুরি ব্রহ্মজ্ঞানে অবস্থান করছেন। *তৎপরায়ণাঃ*, তিনি সব সময় আত্মজ্ঞানের চিন্তনে মনটাকে লীন করে রেখেছেন, তাঁর যত আনন্দ সেই ব্রহ্ম থেকেই স্ফুরিত হতে থাকে। ঈশ্বরকেন্দ্রিক জীবন যাঁর তার এই চারটে গুণ এসে যায়। তার মানে তাঁর কর্ম, বুদ্ধি, আত্মা আর তার ফল, এই চারটে জিনিষকে এখানে বলা হয়েছে, আর সবটাই *তৎ* এই শব্দ দিয়ে বলা হয়েছে, *তদ্বুদ্ধি, তদাত্মানঃ, তন্নিষ্ঠঃ* আর *তৎপরায়ণঃ*। যিনি মহাপুরুষ, যিনি ব্রহ্মজ্ঞানী তাঁকে আমরা কিভাবে চিনতে পারব? এই চারটে জিনিষ দিয়েই বোঝা যাবে। তিনি ঈশ্বর ছাড়া অন্য কোন কথা বলবেন না, কারণ তিনি *তদ্বুদ্ধি*, আমার স্ত্রী, আমার পুত্র, আমার বাড়ি এই বোধ তাঁর থাকবে না, কারণ তিনি *তদাত্মানঃ*, তাঁর মন সব সময় ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত। কোন কাজ কর্মে স্পৃহা থাকবে না, আমাকে ভাষণ দিতে হবে, আমাকে প্রবন্ধ লিখতে হবে কোন কাজেই তাঁর কোন স্পৃহা থাকবে না, যতটুকু প্রয়োজন হবে, কারুর মঙ্গলের জন্য হয়তো কিছু করে দিলেন, এর বেশি কোন কিছুতে নিজেকে জড়াবেন না। আর তিনি যে আনন্দ অনুভব করেন সেটা ভালোমন্দ খাওয়া দাওয়া করে, গান-বাজনা শুনে, লেকচার শুনে, বিভিন্ন তীর্থে, বিভিন্ন আশ্রমে ঘুরে বেড়ান থেকে তাঁর আনন্দটা আসেনা, একমাত্র ঈশ্বর চিন্তনেই তাঁর সব আনন্দ, ঈশ্বরই তাঁর আনন্দের উৎস। এগুলো গেল একজন ব্রহ্মজ্ঞানীর ভেতরের ব্যাপার, কিন্তু তাঁর বাইরেরটা কি রকম?

**বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি। শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ।।১৮।।**

এই ধরণের যাঁরা পণ্ডিত, মানে ব্রহ্মজ্ঞানীরা, এই জগতে যাবতীয় যা কিছু আছে সব কিছুতেই তিনি সমদর্শী, সম ভাবে দর্শন করেন। যিনি ব্রাহ্মণ, যাঁর মধ্যে বিদ্যা আছে, বিনয় আছে, ব্রাহ্মণ হচ্ছেন শ্রেষ্ঠ, সেই শ্রেষ্ঠর মধ্যে আবার যাঁর বিদ্যা আছে, শুধু শাস্ত্র পড়া পণ্ডিতই নয়, তাঁর মধ্যে আবার বিনয় আছে, এই ব্রাহ্মণই হচ্ছেন শ্রেষ্ঠ, এঁর মধ্যে তিনি ঈশ্বরকেই দেখেন। শুধু এই শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণের মধ্যেই যে তিনি ঈশ্বরকে দেখছেন তা নয়, *গবি*, পশুদের মধ্যে সব থেকে উপকারী পশু হচ্ছে গরু, তার মধ্যেও তিনি ঈশ্বরকে দেখছেন। আবার *হস্তিনি*, হাতি হচ্ছে রজোগুণের প্রতীক আর গরু হচ্ছে সত্ত্বগুণের প্রতীক, শুধু সত্ত্বগুণীর মধ্যেই যে ঈশ্বরকে দেখছেন তা নয়, যে রজোগুণী তাঁর মধ্যেও সেই একই ঈশ্বরকে দেখছেন।

*শুনি চৈব শ্বপাকে চ*, কুকুর আর চণ্ডাল সব কিছুতে দেখেন তিনিই আছেন, তিনি ছাড়া আর কিছুই নেই। শ্রেষ্ঠতম ব্রাহ্মণের মধ্যে যে ভগবান বিরাজ করছেন, আর সব থেকে নিকৃষ্ট বলে যার পরিচয় সেই চণ্ডাল আর কুকুর, শেয়ালের মধ্যেও তিনি দেখছেন সেই একই ভগবান বিরাজ করে আছেন। আবার পশুর দিক দিয়ে গরু হচ্ছে সর্বোৎকৃষ্ট, সেই গরুর মধ্যেও যে ভগবান, হাতিতেও সেই ভগবান আবার কুকুরের মধ্যেও সেই ভগবান। সমগ্র প্রাণী জগৎ আছে তাতে ভগবান ছাড়া আর কিছু নেই। তত্ত্বজ্ঞানী যিনি তিনি কোথাও কিছু ভেদ বুদ্ধি রাখেন না, সব প্রাণীর মধ্যে সেই ঈশ্বরকেই দেখতে পাচ্ছেন বলে তিনি সমদর্শী হয়ে যান।

অনেকে আপত্তি উত্থাপন করে বলে যে, শাস্ত্রে বলেছে যে চণ্ডালদের কখনই শ্রেষ্ঠ বলতে নেই। কিন্তু আচার্য এখানে পরিষ্কার বলছেন – এখানে তাঁর ক্ষেত্রে আর কোন কিছুর কথা চলবে না, তিনি এত উচ্চ অবস্থাতে পৌঁছে গেছেন সেখানে তাঁর কাছে আর শাস্ত্রের কোন কিছুই চলবে না, সব কিছুর পারে চলে গেছেন। তারপর একটি অত্যন্ত মূল্যবান শ্লোকে ভগবান বলছেন –

**ইহৈব তৈর্জিতঃ সর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ। নির্দোষং হি সমং ব্রহ্ম তস্মাদ্ ব্রহ্মণি তে স্থিতাঃ।।১৯।।**

এই শ্লোকটি জীবনমুক্তিকে নিয়ে বলা হচ্ছে। এই শ্লোক থেকেই হিন্দু ধর্ম অন্যান্য ধর্ম থেকে আলাদা হয়ে যায়। হিন্দু ধর্ম ছাড়া আর বাকি যত ধর্ম আছে, এমনকি বৌদ্ধধর্মকেও এর মধ্যে ধরা হয়, সব ধর্মে মানুষ না মরা পর্যন্ত সেই ধর্মের অন্তিম লক্ষ্যকে

লাভ করতে পারবে না। যেমন খ্রীস্টান ধর্মে যে হেভেনের কথা বলা হয়, ইসলাম ধর্মে যে জন্নৎএর কথা বলা হয়, মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত কেউ এই হেভেন বা জন্নৎ পাবে না। বলে কাশীতে মরলে মুক্তি হয়, কিন্তু কাশীতেও আগে মরতে হবে, না মরা পর্যন্ত আমার মুক্তি হবে না। কিন্তু আমাদের শাস্ত্রে তা বলছে না, আমাদের শাস্ত্র বলছে এইখানে, এই জীবন থাকতে থাকতেই তোমাকে মুক্তি পেতে হবে। বেলুড় মঠে জীবিত অবস্থাতেই মুক্তি পেয়ে যেতে পারবে, কিন্তু কাশীতে আগে মরতে হবে তবে গিয়ে মুক্তি হবে।

এখানে বলা হচ্ছে – *ইহৈব তৈর্জিতঃ সর্গো,* এই জীবনেই বেঁচে থাকতে থাকতেই আমাকে সব কিছুকে জয় করে নিতে হবে। কিভাবে? *যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ,* যদি আমার মন সাম্য অবস্থাতে চলে যায়। সাম্য মানে, রাগ-দ্বেষ, শোক-মোহ, শীত-উষ্ণ, এই ধরণের কোন কিছুতে মন আর চঞ্চল হচ্ছে না। কেই একটু ভালোবাসল তাতেই গলে গেলাম, কেউ প্রশংসা করল আমার বুক ফুলে গেল, পর মুহুর্তেই কেউ গালাগাল দিল আমি চুপসে গেলাম, তার মানে আমার মন এখন এই সাম্য ভাব থেকে কোটি কোটি মাইল দূরে অবস্থান করছে। কিন্তু আমার মন যখন সমুদ্রের মত বিশাল হয়ে গেল, তখন কত নদী, খাল, নালা দিয়ে প্রবাহিত হয় কত রকমের জল সমুদ্রে এসে মিশছে তাতে সমুদ্রের কিছুই আসবে যাবে না। সমুদ্রের মত যখন মন বিশাল হয়ে যায় তখন তার মনে সাম্য অবস্থা এসে গেল। সাম্য অবস্থা এসে যাওয়া মানে সে জীবনমুক্ত হয়ে গেল, সর্বোচ্চ অবস্থায় সে এখন পৌঁছে গেছে।

*নির্দোষং হি সমং ব্রহ্ম তস্মাদ্ ব্রহ্মণি তে স্থিতাঃ,* এই রকম অবস্থায় সে যখন বুঝে গেছে যে, কারুর কোন দোষ গুণ তার মনকে চঞ্চল করতে পারবে না, বাইরের কোন কিছুতেই মন আর চঞ্চল হচ্ছে না, তখন সে ব্রহ্ম ভাবেই অবস্থিত হয়ে গেল। এখন আর কোন কিছুই তাকে বিচলিত করতে পারবে না। বিষম ভাবনা তাকে আর ছুঁতে পারেনা, সেইজন্য সে সমদর্শী হয়ে যায়। যিনি ব্রহ্মজ্ঞানী তিনিই প্রকৃত সমদর্শী। সমদর্শী হয়ে গেলে কোন ধরণের পাপ বা পূণ্য তাকে স্পর্শ করতে পারবে না। যখন এই বোধ হয়ে যায় যে, আত্মা যিনি, ব্রহ্ম যিনি তিনি হচ্ছেন নির্দোষ, আর *সমং,* সব সময় সমান, তখন এই ধরণের ঋষিদের কি হয়?

**ন প্রহৃষ্যেৎ প্রিয়ং প্রাপ্য নোদ্বিজেৎ প্রাপ্য চাপ্রিয়ম্। স্থিরবুদ্ধিরসংমূঢ়ো ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মণি স্থিতঃ।।২০।।**

প্রিয় বস্তু থেকেও তিনি আর উৎফুল্ল হন না, আবার অপ্রিয় বস্তু থেকেও তাঁর মন বিক্ষুব্ধ হয় না। আমাদের কি হয়? আমরা ক্ষণে তুষ্ট ক্ষণে রুষ্ট। যদি কাউকে বলা হয় আপনার মত আর কেউ নেই, তাতেই খুব তুষ্ট, আর যদি বলে দেন, আপনার মত আরেকজনকে দেখেছিলাম, তাতেই হয়ে যাবে, নিন্দা আর করতে হবে না। কিন্তু জীবনমুক্ত ক্ষণে তুষ্ট ক্ষণে রুষ্ট হয়ে যান না, মহা অপ্রিয়ও যদি কিছু হয়ে যায় তাতেও এনারা বিরক্ত হন না, আবার মহা প্রিয় কিছু হয়ে গেলেও তাঁরা লাফিয়ে ওঠেন না। এনাদের ক্ষেত্রে 'খ' এর ব্যাপারটা একবারে উড়ে গেছে।

আমার হাতে যদি যদু দুটি টাকা দেয়, তারপর মধুও দিল দুটি টাকা, আমার হাতে এখন চারটি টাকা আছে, দুইয়ে দুইয়ে চার, সহজ হিসাব। এখানে আমার অবাক হওয়ার কিছুই নেই। কিন্তু চারটি টাকার বদলে যদি দেখি আমার হাতে পাঁচটি টাকা বা তিনটি টাকা তখনই আমি অবাক হয়ে যাব। এই জগৎটা ঠিক তাই। যখন পাঁচ টাকা দেখছি তখন অবাক হয়ে আনন্দে লাফিয়ে উঠছি, আর যখন তিন টাকা দেখছি তখন হতাশ হয়ে ভেঙ্গে পড়ছি। কিন্তু যখন আমরা 'ক' আর 'গ' এর যোগ বিয়োগের ব্যাপারটা জেনে যাব তখন বুঝে যাব যে এটা কর্মফলের জন্যই হচ্ছে, তখন হতাশও হবো না আবার আনন্দে লাফিয়েও উঠব না। আধ্যাত্মিক জীবনে শুধু দরকার এই বোধটাকে নিয়ে আসা। 'ক' যেটা হওয়ার কথা, 'খ' যেটা আমি কল্পনা করে নিচ্ছি, এই কল্পনাটাকে বন্ধ করতে হবে, 'গ' যেটা বাস্তবে হচ্ছে আর যেটা কখনই 'ক' এর সঙ্গে মিলবে না, সে জানে 'ক' আর 'গ' এর যোগ বিয়োগে যেটা সেটাই আমার কর্মফল। সেইজন্য তখন তাঁর কি হয়? তখন সে *স্থিরবুদ্ধিরসংমূঢ়ো,* তাঁর বুদ্ধি স্থির হয়ে যায়, মোহ শূন্য হয়ে যায়, তাঁর আর মন চঞ্চল হয় না। *ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মণি স্থিতঃ,* এঁরাই হচ্ছেন ব্রহ্মবিদ্, মানে ব্রহ্মের স্বরূপ তিনি জেনে গেছেন, আর ব্রহ্মেই তিনি বাস করেন। এনাদের আচরণটা কি রকম? বলছেন –

**বাহ্যস্পর্শেষ্বসক্তাত্মা বিন্দত্যাত্মনি যৎ সুখম্। স ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা সুখমক্ষয়মশ্নুতে।।২১।।**

এনারা ব্রহ্মযোগে সর্বদা যুক্ত বলে অক্ষয় সুখ পান করেন। কিভাবে? *বাহ্যস্পর্শেষ্বসক্তাত্মা,* এখানে এই আত্মার অর্থ হচ্ছে অন্তঃকরণ (মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহঙ্কার), এনাদের অন্তঃকরণ বাইরের জগতের যাবতীয় যা কিছু হচ্ছে সেই সব ব্যাপারে পুরো অসক্ত। ভালো-মন্দ যা কিছু হচ্ছে এগুলো জাগতিক লোকেদের জন্য, এগুলো এনাদের জন্য কিছুই নয়। এঁদের যা কিছু আনন্দ, সুখ সব ভেতর থেকেই হচ্ছে, বাইরে কোন জিনিষ থেকেই তাঁর মনে কোন ধরণের ক্রিয়া-বিক্রিয়া হবে না। বাইরের ইন্দ্রিয় সুখের দিকে এনাদের মন যায় না। কিন্তু এগুলো যে শুধু ব্রহ্মজ্ঞানীদের জন্য তা নয়, যারা সাধারণ মানুষ তাদেরকেও এখানে অর্জুনের মাধ্যমে বলা হচ্ছে –

**যে হি সংস্পর্শজা ভোগা দুঃখযোনয় এব তে। আদ্যন্তবন্তঃ কৌন্তেয় ন তেষু রমতে বুধঃ।।২২।।**

ইন্দ্রিয়ের সংস্পর্শে যে ধরণের সুখ হচ্ছে আসলে এইটাই হচ্ছে দুঃখযোনি, এইটাই দুঃখের জন্মস্থান। আমি যদি কারুর দিকে দৃষ্টি দিয়ে আনন্দ পাই, এই আনন্দটা আমার চোখ আর তার চেহারা এই দুটোর মিলনে হচ্ছে, এই মিলনটাকে এখানে বলছেন সংস্পর্শ। সে বুঝতে পারছে না যে আমার চোখটা গিয়ে তার চেহারাকে স্পর্শ করল, আর আমিও আনন্দ পাচ্ছি। এই ধরণের স্পর্শ জনিত যত সুখের জন্ম হচ্ছে এর সবটাই হচ্ছে দুঃখযোনি। শুধু চোখের নয়, হাতের, কানের, নাকের, জিহ্বার যে কোন ইন্দ্রিয়ের স্পর্শ জনিত যে সুখ হচ্ছে, বুঝতে হবে এই সুখটাই দুঃখের জন্ম দেবে। সব ধরণের স্পর্শই সুখের জন্ম দিচ্ছে, আসলে কিন্তু সে দুঃখের জননী। *আদ্যন্তবন্তঃ,* এই সুখের আদি আছে অন্ত আছে, জন্ম হয়েছে, তোমাকে দেখে আমার সুখ হল, তোমার চেহারা যখন সরে যাবে তখন আমার দুঃখ হবে, সুখের অন্ত হয়ে গেল। *ন তেষু রমতে বুধঃ,* যারা বুদ্ধিমান লোক তাঁরা এই ধরণের সুখে কখনই রমণ করেন না। যে সুখ এই মুহুর্তে জন্মাল আবার এই মুহুর্তেই মরে যাবে, সেই সুখের পেছনে বুদ্ধিমানরা দৌড়াবেন না। কেন যাবেন না? কারণ তাঁরা ভালো করে বুঝে গেছেন এগুলো হচ্ছে দুঃখযোনি। কেউ যদি বলে তোমার সাথে কথা বলে কি ভালো যে লাগে, ইচ্ছে করে ঘন্টার পর ঘন্টা তোমার সাথে কথা বলে যাই, তাকে বলে দিতে হবে – ভাই তুমি তোমার বিপদ ডেকে আনছ কিন্তু, সাবধান হয়ে যাও। কালকেই যখন তোমার সাথে কথা বলবে না তখন তোমার দুঃখ হবে। এই জগতে যাবতীয় যা কিছু সুখ সবই স্পর্শ জনিত সুখ, স্পর্শ মানে, আমাদের যত রকমের ইন্দ্রিয় আছে সেই ইন্দ্রিয়ের সাথে বিষয়ের সংস্পর্শ। আচার্য শঙ্কর এই সুখকে খুব নিশ্চিত করে জোর দিয়ে বলছেন – এই সংসারে সুখের কথা ছেড়ে দাও, সুখের যে একটা গন্ধ থাকবে সেই গন্ধটুকুর লেশ মাত্র নেই। বুদ্ধিমান যাঁরা তাঁরা ইন্দ্রিয়ের সংস্পর্শ জনিত সুখের পরিণতি ভালো করে বুঝে গিয়ে এতে আর রমণ করেন না। শঙ্করাচার্য বলছেন, এতে কারা রমণ করে? পশু প্রবৃত্তির যারা তারাই রমণ করে, পশুরা যেমন ইন্দ্রিয় ভোগে আনন্দ পায়, অত্যন্ত মুর্খ যারা তারাও পশুদের মত ভোগে আনন্দ পায়। বর্তমান যুগে এই ভোগবাদ মানুষকে গ্রাস করে ফেলছে, এরা অত্যন্ত মুর্খের মত ভোগের মধ্যেই ডুবে আছে। যখন দুঃখের জন্ম হচ্ছে তখন হয় আত্মহত্যা করছে নয়তো একজন আরেকজনকে খুন করছে, আজকে বিয়ে করছে কালকে ডিভোর্স দিয়ে দিচ্ছে। এইটাই জগৎ, অথচ কয়েক বছর আগেও সমাজের এত বাজে অবস্থা ছিল না। এরপর বলছেন যোগী কিভাবে হওয়া যায় –

**শক্নোতীহৈব যঃ সোঢুং প্রাক্ শরীরবিমোক্ষাণাৎ। কামক্রোধোদ্ভবং বেগং স যুক্তঃ স সুখী নরঃ।।২৩।।**

এই জীবনেই যিনি অত্যুগ্র কাম, বাসনা আর ক্রোধের বেগকে জয় করে নিয়েছেন এনারাই ঠিক ঠিক যোগী, আর এনারাই ঠিক ঠিক সুখী পুরুষ। আর বলছেন –

**যোহন্তঃসুখোহন্তরারামস্তথান্তর্জ্যোতিরেব যঃ। স যোগী ব্রহ্মনির্বাণং ব্রহ্মভূতোহধিগচ্ছতি।।২৪।।**

*যঃ অন্তঃ সুখঃ,* যিনি নিজের অন্তরে আত্মাতেই সুখ পান। কিভাবে সুখ পান? *অন্তঃ আরামঃ,* যোগী ভেতরেই আত্মার সাথে রমণ করেন, বাইরের জগতের সাথে তার কোন যোগ নেই। *অন্তঃ জ্যোতিঃ এব চ,* যোগী অন্তরেই জ্যোতি দেখেন, তিনি নিজেকেও জ্যোতিস্বরূপ দেখেন। এঁরাই জীবিত অবস্থায় মোক্ষ লাভ করে পরম ব্রহ্মানন্দ লাভ করেন। মৃত্যুর পরে যে মোক্ষ পায় তা নয়, জীবিত অবস্থাতেই এনারা মোক্ষ লাভ করেন।

**লভন্তে ব্রহ্মনির্বাণমৃষয়ঃ ক্ষীণকল্মষাঃ। ছিন্নদ্বৈধা যতাত্মানঃ সর্বভূতহিতে রতাঃ।।২৫।।**

*ক্ষীণকল্মষাঃ,* যাঁদের সমস্ত পাপ ক্ষয় হয়ে গেছে, এই ধরণের ঋষিরাই ব্রহ্মনির্বাণ লাভ করেন। *ছিন্নদ্বৈধা,* ভগবানকে নিয়ে যত রকমের সংশয় থাকতে পারে সব সংশয় পরিষ্কার হয়ে গেছে, *যতাত্মানঃ,* জিতেন্দ্রিয় হয়ে গেছেন। তার থেকেও বড় হচ্ছে তিনি *সর্বভূতে হিতে রতাঃ,* এইটি হচ্ছে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ। *সর্বভূতে হিতে রতাঃ,* এই কথাটা গীতাতে অনেকবার আসে। এই ধরণের ঋষিরা সর্বদা সবারই মঙ্গলের জন্য প্রয়াস হন, কিসে জীবের মঙ্গল হবে, কিসে জগতের হিত হবে সেই চেষ্টা করে যান। ঠাকুর বলছেন – শুধু নিজের সন্তানকে ভালোবাসার নাম মায়া আর সবারই সন্তানকে ভালোবাস হচ্ছে দয়া। *সর্বভূতে হিতে রতাঃ,* মানে শুধু যে মানুষের ভালো চাইছেন তা নয়, সমস্ত প্রাণী, কুকুর, বেড়াল, গরু, ছাগল, পাখি, পোকা মাকড় সবারই তিনি মঙ্গল কামনা করেন। আমার মতের লোকগুলোকে বাঁচিয়ে রাখব আর ভিন্ন মতের লোকদের বোমা মেরে উড়িয়ে দেব, এই জিনিষ আমাদের শাস্ত্র কখনই বলবে না।

**কামক্রোধবিযুক্তানাং যতীনাং যতচেতসাম্। অভিতো ব্রহ্মনির্বাণং বর্ততে বিদিতাত্মনাম্।।২৬।।**

একই জিনিষ ঘুরে ঘুরে বলছেন, যিনি কাম আর ক্রোধ থেকে মুক্ত হয়ে গেছেন এঁদের মন, বুদ্ধি পুরো মুঠোর মধ্যে এসে গেছে। এই ধরণের যাঁরা আত্মজ্ঞ সন্ন্যাসী এঁরা জীবিত অবস্থাতেও মোক্ষ পান আবার মরার পরেও মোক্ষ পান, এনাদের আর পুনর্জন্ম

হয় না, মানে মৃত্যুর পর আর দেহধারণ করতে হয় না। এই জীবনে মুক্তি পেয়ে গেছেন মানে তাঁর এই জীবনের সব অশান্তি, দুঃখ-কষ্ট মিটে গেছে।

এরপরে ষষ্ঠ অধ্যায় শুরু হবে, ষষ্ঠ অধ্যায়ে ভগবান যা বলবেন তার ভূমিকাটা এর পরের দুটো শ্লোকে সেরে নিচ্ছেন।

**স্পর্শান্ কৃত্বা বহির্বাহ্যাংশ্চক্ষুশ্চৈবান্তরে ভ্রুবোঃ। প্রাণাপানৌ সমৌ কৃত্বা নাসাভ্যন্তরচারিণৌ।।২৭।।**

যোগী বাইরের সব কিছু থেকে মনটাকে টেনে ভ্রুযুগলের মাঝখানে যেন দৃষ্টি দ্বারা মনটাকে স্থির করেন। নাসিকার মধ্যে বিচরণশীল প্রাণ আর অপান বায়ুর ঊর্দ্ধ গতি আর অধোগতিকে সমান করেন, মূলতঃ এখানে প্রাণায়ামের কথাই বলা হচ্ছে। ভ্রুযুগলের মাঝখানে ধ্যান করার ব্যাপারে আচার্য এখানে খুব সুন্দর বলছেন – জগৎ থেক মনটাকে টেনে অন্তর্মুখী করে নেওয়া, ভ্রুর মাঝখানে ধ্যান করার কথা বলা হচ্ছে না। লোকেরা মনে করে চোখের দৃষ্টিটাকে ভ্রুর মাঝখানে ফেলতে হবে, অনেকে যারা ধ্যান শেখায় তারাও এই ভুলটা করে। আচার্য শঙ্কর এখানে তাঁর ভাষ্যে একেবারে পরিষ্কার করে বলে দিচ্ছেন – *বাহ্যং শ্রোত্রাদিদ্বারেন অন্তর্বুদ্ধৌ প্রবেশিতা* – সমস্ত ইন্দ্রিয়ের দ্বার গুলোকে গুটিয়ে দিয়ে ভেতরের বুদ্ধিতে প্রবেশ করা, এইভাবে নিজের মনকে ভেতরে নিয়ে আর যা কিছু আছে সেটাকে বাইরে থেকে আটকে দেওয়াটাই হচ্ছে ভ্রুযুগলের মধ্যে ধ্যান করা। তারপর বলছেন –

**যতেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধির্মুনির্মোক্ষপরায়ণঃ। বিগতেচ্ছাভয়ক্রোধো যঃ সদা মুক্ত এব সঃ।।২৮।।**

এখানেও সেই একই কথা বলা হচ্ছে। যিনি ইচ্ছা থেকে, ভয় থেকে, ক্রোধ থেকে মুক্ত হয়ে গেছেন এনারাই হচ্ছেন সত্যিকারের বুদ্ধিমান পুরুষ, এঁদের আর কোন কিছু বন্ধনে ফেলতে পারেনা, সব কিছুর থেকে মুক্ত হয়ে গেছেন। যাঁর ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি নিজের করতলে এসে গেছে, যিনি মুনি, মুনি হচ্ছেন যিনি ঈশ্বর স্বরূপে মনন করেন, *মোক্ষপরায়ণঃ*, যিনি এই শরীরে বাস করে সব সময় মুক্তির চিন্তা করেন আর মুক্তির ব্যাপারটা ভালো করে বুঝে গেছেন। এই ধরণের সন্ন্যাসীরা মুক্তির জন্য প্রস্তুত হয়ে গেছেন। এবারে বলছেন এনারা কাকে লাভ করেন?

**ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্বলোকমহেশ্বরম্। সুহৃদং সর্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শান্তিমৃচ্ছতি।।২৯।।**

এই ধরণের যোগী সন্ন্যাসীরা আমাকে লাভ করেন, মানে ঈশ্বরকে জানতে পারেন আর ঈশ্বরকে জেনে শান্তি লাভ করেন। ভগবান কি রকম? এখানে ভগবানের কয়েকটি গুণের বর্ণনা করা হচ্ছে। *ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং*, যত রকমের যজ্ঞাদি করা হয় আমরা জানি দেবতারা এই যজ্ঞের ফল গ্রহণ করেন, এখানে বলছেন আমিই সব যজ্ঞের ভোক্তা, তার মানে যত দেবতা আছে সব আমারই রূপ। *সর্বলোকমহেশ্বরম্*, সর্ব লোকের আমি মহেশ্বর, আমিই হচ্ছি মহা ঈশ্বর, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যা কিছু সৃষ্টি হয়েছে সেটা আমিই করেছি। *সুহৃদং সর্বভূতানাং*, আমি সবারই মঙ্গল করে থাকি, আমি ভালো যখন করি তখন কোন কিছুর অপেক্ষা না রেখেই আমি ভালো করি, আমি তার ভালো করলে সেও আমার ভালো করবে এই অপেক্ষা আমি রাখিনা। তৃতীয় অধ্যায়ে ভগবান বলেছিলেন – *পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ*, তুমি দেবতাদের উপাসনা কর তার বদলে দেবতারা তোমাকে বৃষ্টি দেবে, শস্যাদি দেবে। ভগবানের মধ্যে কিন্তু দেবতাদের এই ভাব নেই, তুমি আমাকে সব কর্মফল দাও তার বদলে আমি তোমাকে ভালো ভালো ফল দেব, ভগবান কখনই এই কথা বলছেন না। এখানে আচার্য পরিষ্কার করে দিয়ে বলছেন – তুমি ভগবানকে চাও আর নাই চাও, তুমি ভগবানকে পূজো কর আর নাই কর, তিনি তোমার মঙ্গল করবেনই, দেবতাদের মত তিনি নন। যে নিজেকে ভগবানের দিকে এগিয়ে গিয়ে তাঁর সেবা করছে তার তো কোন কথাই আসে না। আর আমি হচ্ছি সবারই হৃদয়ের ঈশ্, *সর্ব কর্মফলাধ্যক্ষম্*, যত রকমের কর্মফল মানুষ পায় তার অধ্যক্ষ আমি। যেমন আমেরিকা, আফ্রিকা বা অন্য কোন দেশের লোকেদের মধ্যে যারা ঈশ্বরকে মানে না, কিন্তু তারা যা কাজ করে তার ফল তো তারা পাচ্ছে। কিভাবে পাচ্ছে? কারণ ভগবান আছেন, আর সমস্ত কর্মফলের তিনি অধ্যক্ষ। তুমি ভগবানকে মানো আর নাই মানো তাতে কিছু যায় আসে না, তোমার যেটা পাওয়ার কথা সে সেটা পাবেই। আফ্রিকার ট্রাইবালরা ঈশ্বরের সম্বন্ধে কোন ধারণাই নেই, তাই বলে কি সে যা কাজ করছে তার ফল পাবে না? সেও ঈশ্বরের সন্তান, আর ঈশ্বর হচ্ছেন কর্মফলাধ্যক্ষ।

*জ্ঞাত্বা মাং শান্তিমৃচ্ছতি*, আমাকে লাভ করলে শান্তি পায়, কিসের শান্তি? *সর্ব সংসার উপরতি*। সংসারটা কি? শোক আর মোহই সংসার, এই সংসারের উপরতি হয়ে যায়, মানে শেষ হয়ে যায়। এই হচ্ছে পঞ্চম অধ্যায়। সংক্ষেপে পঞ্চম অধ্যায় হচ্ছে – যিনি কর্মসন্ন্যাসী আর যিনি কর্মযোগী এই দুজন একই জায়গায় যান। কিন্তু তুমি যদি কাঁচা লোক হও তাহলে তোমার পক্ষে কর্মযোগই বাঞ্ছনীয়। কর্মযোগ করতে করতে তোমার মন, বুদ্ধি পরিষ্কার হতে থাকবে, মন বুদ্ধি পরিষ্কার হলে তুমি উচ্চ চিন্তন করতে পারবে। কাঁচা আর পাকাতে তফাৎটা কোথায়, পাকা যিনি তিনি সব কিছুতে নির্বিকার। কাঁচা কে? যে সব সময় কর্মফলে লিপ্ত থাকে। পুরো ভাবটা কি? ভগবানের স্বরূপের কথা একটু বলা হল, মোক্ষের স্বরূপের কথা বলা হল। দ্বিতীয় অধ্যায়ে স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণের কথা যেমন বলা হয়েছিল, এখানেও তাঁর কিছু লক্ষণের কথা বর্ণনা করা হয়েছে, যেখানে বলছেন *তদ্বুদ্ধয়স্তদাত্মানস্তন্নিষ্ঠাস্তৎপরায়ণাঃ।*

তৃতীয় অধ্যায় ছিল কর্মযোগ, চতুর্থ অধ্যায় ছিল কর্মসন্ন্যাস এই দুটো অধ্যায়কে পঞ্চম অধ্যায়ে সমন্বয় করে দিলেন। তোমাকে তৃতীয় অধ্যায়ে যা বলেছি, চতুর্থ অধ্যায়ে যা বলেছি এর মধ্যে কোন প্রভেদ নেই।

**ওঁ তৎসদিতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসুপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে**
**শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে সন্ন্যাসযোগো নাম পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।।**

২২শে আগস্ট ২০১০

## ষষ্ঠ অধ্যায়

# ধ্যানযোগ

ষষ্ঠ অধ্যায়ের নাম হচ্ছে ধ্যানযোগ। দ্বিতীয় অধ্যায়ে দুটো দর্শনের কথা এসেছিল, একটা হচ্ছে সাংখ্যযোগীদের দর্শন, যাঁরা তত্ত্ব জেনে গেছেন, তত্ত্বদর্শী, মানে যাঁরা ঠিক ঠিক তত্ত্ব দর্শনের পথে এগিয়ে গেছেন তাঁদের সম্বন্ধে বলা হয়েছিল। দ্বিতীয় দর্শন হচ্ছে যাঁরা তত্ত্বদর্শী নন, যাঁদের এখন জ্ঞান লাভ হয়নি কিন্তু অধ্যাত্ম জীবনে এগোতে চাইছেন তাঁদেরকে বলা হচ্ছে কর্মযোগী, এই কর্মযোগীরা কেমন হবেন সেই সম্বন্ধে কিছু আলোচনা হয়েছিল। কর্মযোগে বলা হয়েছিল তোমার কর্মফল সব ঈশ্বরে সমর্পণ করে দাও। এখন প্রশ্ন হচ্ছে যারা কর্ম করছেন, যেমন বাড়ির মায়েরা সবার জন্য রান্নাবান্না করছেন, ধরে নিলাম মায়েরা কর্মযোগানুসারে সব কর্মের ফল ঈশ্বরে সমর্পণ করে যাবতীয় কাজ করে যাচ্ছেন, এই যে সব কর্মের ফল ঈশ্বরে সমর্পণ করে দেওয়া হচ্ছে শুধু এইটুকুতেই কি তাঁদের চরম জ্ঞান লাভ হবে? গীতাতে এই প্রশ্নের উত্তর পরিষ্কার ভাবে কোথাও দেওয়া হয়নি। শঙ্করাচার্য তাঁর গীতার ভাষ্যে বলছেন – জ্ঞান প্রাপ্তির পথে যিনি সাধনা করে অগ্রসর হতে চাইছেন, কর্ম হচ্ছে তাঁর বহিরঙ্গ সাধনা, আর অন্তরঙ্গ সাধনা হচ্ছে ধ্যানযোগ। এই বক্তব্যকে এক কথায় বলতে গেলে বলা যায়, ধ্যান যদি না করা হয় তাহলে তাঁর কোন দিন জ্ঞান হবে না। যদিও বলা হয় জপাৎ সিদ্ধি, বা ইদানিং কত নতুন নতুন যোগ পথের কথা বলা হচ্ছে, কিন্তু যাই বলা হোক না কেন, হিন্দুদের পরম্পরা মতে বলা হয় যে, যতই তুমি পূজো কর, যতই তুমি ঢাক পেটাও বলি দাও, আর যতই কর্ম করা হোক আর কর্মফল ঈশ্বরে সমর্পণ করা হোক, ধ্যানের গভীরে যতক্ষণ না যেতে পারছে ততক্ষণ কিন্তু তাকে জ্ঞান প্রাপ্তির যোগ্য বলে বিবেচিত করা যাবে না।

কিন্তু একটা জিনিষ আমাদের মনে রাখতে হবে ধ্যান আর কর্ম এই দুটো পরস্পর সম্পর্ক যুক্ত। কর্ম হচ্ছে বহিরঙ্গ সাধনা, বহিরঙ্গ সাধনা হচ্ছে বাইরের ইন্দ্রিয়গুলোর সাহায্যে যে সাধনা করা হয় সেইটাই হচ্ছে কর্ম, আর মনকে যখন বাইরের সমস্ত কিছু থেকে গুটিয়ে এনে অন্তর্মুখী করে নেওয়ার যে সাধনা করা হয় একে বলা হচ্ছে অন্তরঙ্গ সাধনা। তাই যদি প্রশ্ন করা হয়, যে সাধক সব সময় কর্মযোগই করে যাচ্ছে তাহলে কি তার জ্ঞান হবে? এইখানে তার উত্তর আমরা পেয়ে যাচ্ছি, শুধু কর্ম করলেই হবে না, সাথে সাথে ধ্যানকে অবলম্বন করা বাধ্যতামূলক।

হিন্দুধর্ম অনেক ধরণের মত ও পথকে এক সঙ্গে নিয়ে চলে। গীতা সমস্ত মত ও পথকে সমন্বয় করে দেখাচ্ছে যে সব মত ও পথেরই দরকার আছে, আবার প্রত্যেকটি মত ও পথকে স্বতন্ত্র ভাবেও গীতাতে দেখান হয়েছে। যেমন ষষ্ঠ অধ্যায়ে ধ্যানের গুরুত্বের ব্যাপারেই শুধু আলোচনা করা হয়েছে, আর ধ্যান কিভাবে করতে হয়, ধ্যান করার জন্য কি রকম পরিবেশ আর ধ্যানের প্রয়োজনীয় শর্তগুলি কি কি এই নিয়ে খুব গভীর ভাবে আলোচনা করা হয়েছে। আচার্য শঙ্কর তাঁর ভাষ্যে নিজের তরফ থেকে একটা বাক্যে স্পষ্ট করে বল দিচ্ছেন যে, গীতার ষষ্ঠ অধ্যায়ে যে ধ্যানযোগকে ভগবান উপস্থাপনা করেছেন, এই ধ্যানযোগ গৃহস্থের জন্য নয়। আচার্য তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে বলছেন যে, ধ্যানযোগে বলা হচ্ছে *একাকী যতচিত্তাত্মা*, তিনি একাকী থাকবেন, *নিরাশীরপরিগ্রহঃ*, কোন কিছুর উপর নির্ভর করবেন না, *ব্রহ্মচারিব্রতে স্থিতঃ*, ব্রহ্মচর্যে প্রতিষ্ঠিত থাকতে হবে। এই যে কথাগুলো বলা হয়েছে এগুলোতে তিনি বলছেন *স্ত্রী সহায়ত্বক আশঙ্কা*। এইসব ক্ষেত্রে স্ত্রী কখনই সাধকের সাধনার সহায়ক হতে পারে না। স্ত্রী থাকা মানে এই কথাগুলোর সাথে বিপরীত হয়ে যাচ্ছে। আচার্য শঙ্করের একটা মত যে যারা সংসারে রয়েছে এদের সরাসরি জ্ঞান লাভ হবে না। কোথাও সরাসরি আবার কোন কোন ক্ষেত্রে ঘুরিয়ে একটা কথাই বলতে চেয়েছেন যে, যত দিন না তোমার সন্ন্যাস হয়ে যাচ্ছে তত দিন তোমার জ্ঞান লাভ হবে না। ইদানিং শঙ্করের এই মতের উপর অনেক তর্ক-বিতর্কাদি হয়, সন্ন্যাসী কে, গৃহস্থ কে, গৃহস্থ কেন সন্ন্যাস নিতে পারবে না, গৃহে থেকে কেন ঈশ্বর লাভ হবে না, এই ধরণের অনেক প্রশ্নকে সামনে নিয়ে আসা হয়। এগুলো আমাদের বিষয় নয়, আমরা এর আলোচনার মধ্যেই যাবো না।

আচার্য শঙ্কর কিন্তু কোথাও নিজের মত বলে কিছু বলছেন না, উনি শাস্ত্র থেকে একটা দুটো উদ্ধৃতি দিয়ে দেখিয়ে দেবেন, এই রকম হলে এই মত ভুল হয়ে যাবে, এই দিক দিয়ে বললে এই মত ঠিক আছে। শঙ্করাচার্যকে যদি প্রশ্ন করা হয় তাহলে যিনি গৃহে আছেন তার কি কোন দিন ঈশ্বর লাভ হবে না? উনি বলবেন, কেন হবে না, কর্ম করে যাও, কর্ম করতে করতে মন যখন শুদ্ধ হয়ে যাবে তখন তুমি অন্তর থেকেই একাকী হয়ে যাবে, বাড়িতে থাকলেও তুমি যেন সবার থেকে আলাদা হয়ে গেছে, তোমার মধ্যেও তখন সন্ন্যাসীর ভাব এসে যাবে। কিন্তু সন্ন্যাসীর ভাব যতক্ষণ না আসবে ততক্ষণ কিন্তু এই জ্ঞান হবে না, তুমি যতই ভক্তি কর, যতই পূজাপাঠ আর কর্ম কর, সন্ন্যাসীর ভাব এলে তুমি গেরুয়া পড়লে কি পড়লে না তাতে কিছুই এসে যাবে না। সন্ন্যাসীর ভাব না হলে কিন্তু কিছুই হবে না।

সেইজন্য দেখা যায়, যেসব ধর্ম মতে বলছে গৃহস্থ ধর্ম করলেও হবে, বিয়েথা করলেও কোন অসুবিধা নেই, সেই সব ধর্মের প্রচুর জনপ্রিয়তা হয়। মানুষ তো এইটাই চায়, যে ডাক্তার রুগীর মনোমত যা যা চাইবে সেই রকমই ওষুধ লিখে দেবে, রুগীর মনের মত পথ্য ঠিক করে দেবে, সেই ডাক্তারদেরই পসার বেশি হয়। কিন্তু আবার এটাও দেখা যায় যেসব ধর্ম এই ধরণের একটা সস্তা নিদান দিয়ে দিচ্ছে সেই সব ধর্মের আধ্যাত্মিক সংগ্রাম আস্তে আস্তে দুর্বল হয়ে যায়, এইটাই নিয়ম। ধর্মের ভিতকে ধরে রাখেন সন্ন্যাসীরাই, সন্ন্যাসী মানে ত্যাগী পুরুষ যাঁরা। যে ধর্মে সন্ন্যাসীদের প্রাধান্য সেই ধর্মকে কেউ কোন দিন নাশ করতে পারবে না, যদিও অন্যান্য ধর্মের মত জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারবে না। দুটোকে এক সাথে সামলান কখনই সম্ভব নয়, একদিকে বউ, বাচ্চা, সংসার সামলান আবার অন্য দিকে ধর্মকে সামলান কখনই হয় না। মহম্মদের নামে বলা হয় ওনার তো এগার জন বউ ছিল, কিন্তু মহম্মদের এগার জন বউ বাচ্চা ছিল ঠিকই কিন্তু তিনি নিজের ঘর সংসার বউ বাচ্চা নিয়েই মত্ত হয়ে ছিলেন না, তিনি সন্ন্যাসীর মতই চলতেন, সন্ন্যাসীর ভাবটা তাঁর মধ্যে পুরো মাত্রায় ছিল।

আচার্য শঙ্কর এখানে পরিষ্কার বলছেন যে, যদি কোন গৃহস্থ যোগে আরূঢ় হতে চায় তাহলে তাকে প্রথমে মননশীল হতে হবে, দ্বিতীয় আত্মশুদ্ধির জন্য নিষ্কাম ভাবে কর্ম করে যেতে হবে। কর্ম বলতে যে কোন কর্ম, অফিসের কাজ হোক, বাড়ির কাজ হোক, ব্যবসা হোক, সমাজ সেবা হোক । এইভাবে নিষ্কাম কর্ম করে করে তার মন যখন শুদ্ধ হয়ে যাবে তখন সে ধ্যানযোগে আরূঢ় হওয়ার যোগ্যাতা অর্জন করে নেবে। কিন্তু এই সব কিছু না করে যদি সোজা এসে বলে যদি আমাকে ধ্যানটুকু শিখিয়ে দিন, এদের জন্য ধ্যানযোগ নয়। সংসারে, অফিসে, কাজকর্মে যখন নানা ঝামেলায় জড়িয়ে মনে শান্তি পায়না তখন এসে বলবে আমাকে একটু ধ্যান শিখিয়ে দিনতো যাতে আমি শান্তি পেতে পারি। এইভাবে ধ্যান কখনই করা যায় না। ধ্যানযোগে আরূঢ় হতে গেলে আগে প্রচুর কাজ করতে হবে, তার আগে দেখতে হবে তুমি সব কর্ম নিষ্কাম ভাবে, কোন ফলাকাঙ্ক্ষা না করে নিজের চিত্ত শুদ্ধির জন্য কাজ করেছ কিনা। আর মননশীল, মনকে অন্তর্মুখী করে সব রকম পরিস্থিতির মধ্যেও ঈশ্বরের চিন্তায় নিজেকে সব সময় নিয়োজিত রাখতে পারছ কিনা। আর ঈশ্বরের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করে তাঁকে পাবার জন্য তুমি প্রস্তুত কিনা। এতগুলো অবস্থাকে আয়ত্ত করতে পারলে তবেই তোমাকে ধ্যানযোগের জন্য উপযুক্ত বলে গণ্য করা হবে। এই রকম নিজেকে তৈরী না করে যদি ধ্যান করতে বসে তাহলে দক্ষিণেশ্বরের বানর গুলো যেমন চোখ বন্ধ করে গাছের ডালে বসে থাকে আর মনের মধ্যে সব সময় ঘুরপাক করছে কার বাগানে কি হয়েছে, কি কি লুট করা যায়, এই বানরগুলোর মতই মন এদিক ওদিক ছুটে বেড়াবে। আমরা বেশির ভাগই যারা ধ্যান করছি মনে করি, তারা এই দক্ষিণেশ্বরের বানরের মতই ধ্যান করি।

ষষ্ঠ অধ্যায়ের ধ্যানযোগের যে যে বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করতে যাওয়া হচ্ছে, এটি অত্যন্ত উচ্চ তত্ত্ব আর খুবই কঠিন, সবার পক্ষে ধারণা করাও যেমন কঠিন আবার এর অনুশীলনও সবার দ্বারা সম্ভব নয়। কিন্তু এই ধ্যানযোগ না হওয়া পর্যন্ত আত্মজ্ঞান বলুন, ঈশ্বর দর্শন বলুন, ব্রহ্মজ্ঞান বলুন যাই বলুন কিছুই হওয়া সম্ভব নয়। ধ্যানযোগ হচ্ছে আধ্যাত্মিক জ্ঞানের চরম প্রাপ্তির পক্ষে অত্যাবশ্যক ধাপ। এর আগে পঞ্চম অধ্যায়ে বলা হয়েছে সন্ন্যাসী হচ্ছেন যিনি সব কিছু ছেড়ে দিয়েছেন, আর যোগী হচ্ছেন যিনি কর্ম করছেন। কিন্তু এখানে প্রথম শ্লোকে বলছেন –

শ্রীভগবানুবাচ

**অনাশ্রিতঃ কর্মফলং কার্যং কর্ম করোতি যঃ। স সন্ন্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্নির্ন চাক্রিয়ঃ।।১।।**

যিনি কর্মফলের আশ্রয় না করে, কোন রকমের আকাঙ্খা না রেখে কাজ করে যাচ্ছেন এখানে তাঁর কথা বলা হচ্ছে। তার মানে এই নয় যে আমি চাকরি করছি মাসের শেষে আমি আমার প্রাপ্য মাইনেটা নেব না। এই ব্যাপারে আমাদের খুব স্বচ্ছ ধারণা থাকা চাই। এর মূল অর্থ হচ্ছে, আমি সংসার করছি, আমার পরিবার আছে, সেই পরিবারের ভরণ-পোষণের জন্য আমাকে অর্থোপার্জন করতে হবে, তার জন্য আমার একটা চাকরি করতে হবে। চাকরির শর্তাবলী অনুসারে আমাকে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ দেওয়া হয়। সংসারের দেখভালের জন্য ঐ অর্থ আমাকে অবশ্যই নিতে হবে। যখন ইনক্রিমেন্টের সময় হবে তখন ঠিক সময় ঐ ইনক্রিমেন্টটাও দাবী করতে হবে। কিন্তু আমার মাইনে আরও কত বাড়বে, আমার প্রমোশন হবে কি হবে না এই সব ব্যাপারে ছটফটানিটা বন্ধ করতে হবে। এই জিনিষগুলোকে চিন্তা না করাটাই হচ্ছে কর্মফল ত্যাগ করা। গীতাতে কোথাও বলবে না যে তুমি যে চাকরিটা করছ সেই চাকরিটা ছেড়ে দাও। আর কোথাও বলবে না যে তুমি যে মাইনেটা পাচ্ছ, সেই মাইনেটা তুমি নিও না, ইনক্রিমেন্ট নিও না, প্রমোশন পেলে নিও না। একমাত্র বলছে এগুলোর জন্য তুমি অধীর হয়ে অস্থির চিত্ত হয়ে পড়ো না। গীতাকে যদি ঠিক ঠিক অনুসরণ করে চলা হয়, তবে আমার যদি মারুতি থাকে আর আমার যদি ক্ষমতা থাকে তাহলে মারুতির থেকে আরেকটা ভালো গাড়ি কিনতে পারি। গীতা কখনই বলছে না যে তুমি সব কিছু ছেড়ে দাও। গীতা শুধু বলবে যে, যদি তোমাকে রোলস রয়েস ছেড়ে মারুতি চাপতে হয় বা মারুতি ছেড়ে যদি বাসে চেপে যাতায়াত করতে হয় তাহলে সেই নিয়ে তুমি মাথা খারাপ করে ভেঙ্গে পড়ো না। আবার মারুতি ছেড়ে যদি রোলস রয়েস চাপার সুযোগ হয় তার জন্য তুমি নিজেকে মন কর না যে, আহা আমি ধন্য হয়ে গেলাম, এই ভাবটা যেন তোমার না থাকে। গীতার মূল কথা এইটাই, পরিস্থিতি যেমন আছে সেই পরিস্থিতিতে অবস্থান করে মনকে চঞ্চল না হতে দেওয়া। কর্মযোগ বলতে এইটাই বোঝায় যেটা আসছে আসুক, যেটা যাচ্ছে সেটা চলে যাক।

যিনি কাজ করার সময় কর্মফলে অনাশ্রিত থাকেন, তিনিই হচ্ছেন ঠিক ঠিক সন্ন্যাসী, তিনিই হচ্ছে প্রকৃত যোগী। আমি একটা গেরুয়া ধারণ করে নিলাম বলেই আমি সন্ন্যাসী হয়ে যেতে পারিনা, আবার কেউ একজন বড় আইএএস অফিসার হয়ে গেলেই সে বড় কর্মযোগী হয়ে যাবে না। গীতাতে যোগী বলতে কর্মযোগীকে বোঝায়, আর কর্মযোগী তাঁকেই বলা হচ্ছে যিনি কর্মফলে অনাশ্রিত। সন্ন্যাস কথার অর্থ হচ্ছে ত্যাগ, সম্যক রূপে ত্যাগ, আর চিত্তের সমাধান, চিত্তের সমাধান হচ্ছে মনটাকে পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসা, এটাকে বলা হচ্ছে যোগ। কর্মযোগী মানে যার মনটা পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে আছে। কর্মযোগীর মন নিয়ন্ত্রণে আছে মানে কর্মফলের আশা করে তার মনটা চঞ্চল হয় না। সেইজন্য বলা হয় অনাসক্ত কর্ম, কাজ তুমি করবে কিন্তু কর্মফলের দিকে তোমার মন থাকবে না। কিন্তু আমাদের মত সাধারণ মানুষের জীবনে ঠিক উল্টোটা হয়ে যায়, কর্ম থেকে অনাসক্ত হয়ে কর্ম ত্যাগ করে কর্মের ফলটা চাইছি। আমাদের সমস্যাটা এইখানেই আটকে আছে। যোগী আর ভোগীর তফাৎ এইখানেই। বিদেশীরা বলে আমি কাজ করেছি আমি ফল চাই। যোগী বলছেন আমি কাজ করেছি কিন্তু আমি ফল চাই না, যা আসবার আসবে। আর ভারতের লোকেরা বলে আমি কাজ করব না কিন্তু ফলটা আমার চাই।

এখানে একটা শব্দ ব্যবহার করা হচ্ছে - *নিরগ্নির্ন চাক্রিয়ঃ, নিরগ্নি* বলা হয় সন্ন্যাসীদের। বৈদিক সভ্যতায় বেদের মতটাই ছিল একমাত্র পালনীয়, বেদের মতে বিভিন্ন যজ্ঞ-যাগ করাটা ছিল বাধ্যতামূলক। সবাইকেই যজ্ঞ-যাগ করতে হত। এই ধরণের যজ্ঞের মধ্যে ছিল অগ্নিহোত্র যজ্ঞ, যে যজ্ঞ সকাল সন্ধ্যে দুবেলাই করা হত, এই রকম ছিল গার্হ্যপত্য যজ্ঞ। কিন্তু যখন কেউ সন্ন্যাসী হয়ে যেতেন, তিনি বলতেন আমি বেদকে অতিক্রম করে গেছি, বেদের কোন বিধি নিষেধ আমার উপর প্রযোজ্য হবে না। তখন সন্ন্যাসীরা আর যজ্ঞাদি করতেন না। যজ্ঞাদি করব না যখন বলে দিতেন তখন তিনি নিরগ্নি হয়ে যেতেন। মানে আমি আগুন আর স্পর্শ করবই না। এখনও কোথাও কোথাও সন্ন্যাসীরা নিরগ্নীর এই প্রথাটাকে অনুসরণ করেন। বেলুড় মঠে ব্রহ্মচারীরা সন্ন্যাস নেওয়ার পর তিন দিন নিরগ্নী হয়ে থাকেন। এই তিন দিন সন্ন্যাসীরা কোন ধরণের আগুনের ধারে কাছে যাবেন না। ঐ তিন দিন সন্ন্যাসীরা ভিক্ষে করে খাবেন, কিন্তু ফল মিষ্টি আর রান্না করা জিনিষ ছাড়া কোন জিনিষ গ্রহণ করবেন না, মানে রান্না করতে হবে এমন কোন কাঁচা সজ্জী বা চাল-ডাল গ্রহণ করেন না। আসলে নিরগ্নীর অর্থ হচ্ছে যজ্ঞ না করা। সাধারণত যজ্ঞ কেন করা হচ্ছে? স্বর্গে যাওয়ার জন্য। সন্ন্যাসীর কাছে ইহলোক আর পরলোকের সাথে কোন সম্পর্কই নেই। কিন্তু এখন স্বর্গের ব্যাপারটাকে ছেড়ে আগুন না ছোঁওয়ার ব্যাপারটাতেই জোর দেওয়া হয়। অক্রিয় কথার অর্থ হচ্ছে, যিনি কাজ-কর্ম ছেড়ে দিয়েছেন। কিন্তু মূল কথা হচ্ছে, তুমি সন্ন্যাসী হও আর যোগী হও বা কর্মিই হও, জীবনে তুমি যদি উচ্চতম আধ্যাত্মিক সত্যকে উপলব্ধি করতে চাও প্রথমে কর্মফলের প্রতি যে আসক্তি সেইটাকে আগে ত্যাগ কর। তুমি নিরগ্নী হও আর যাই হও না কেন, কর্মফলের আসক্তিকে ত্যাগ না করলে তোমার কিছুই হবে না। গীতাতে ধাপে ধাপে বলা হচ্ছে, যখন কর্মফলের আসক্তি ত্যাগ হয়ে গেল, তারপর ধীরে ধীরে মন যখন শুদ্ধ হয়ে যায় তখন কর্মের প্রতি যে দায়ীত্ব বোধটা থাকে সেটাও আস্তে আস্তে খসে যায়। তারপর যখন ধ্যানাদি করবে তখন মনের মধ্যে অজ্ঞানের পর্দাটা সরতে সরতে আস্তে করে জ্ঞানের আলোটা জ্বলে যায়।

আচার্য খুব সুন্দর করে বলছেন – কর্মযোগ যখন করা হয়, যেখানে ফলের প্রতি কোন ইচ্ছা নেই, তখন এটা হয়ে যাচ্ছে ধ্যানযোগের বহিরঙ্গ সাধন। বহিরঙ্গ সাধনের তাৎপর্য হচ্ছে, তুমি যদি ধ্যানযোগের পথে এগোতে চাও, আগে কিন্তু তোমাকে কর্ম করতে হবে। ধ্যানযোগে যে ধ্যান করা হচ্ছে এটাও কর্ম, আমি শ্রীরামকৃষ্ণের ধ্যান করছি, এটাও কিন্তু কর্মের মধ্যে পড়ে গেল। এই বোধ যখন হচ্ছে আমি কিছু করছি, সেটাই কর্ম, আমি ধ্যান করছি এই বোধ যতক্ষণ থাকবে ততক্ষণ ধ্যানটাও কর্ম, তবে আরও সূক্ষ্ম স্তরের কর্ম। কিন্তু হাত, পা ইত্যাদি বহিরিন্দ্রিয় দিয়ে যে কাজ করা হচ্ছে এটা হচ্ছে বহিরঙ্গের কাজ। আর ধ্যানটা ভেতরের কাজ, এছাড়া আর কিছু তফাৎ নেই। আবার কাজ যদি না করা থাকে তাহলে তোমার কিন্তু কখনই ধ্যান হবে না। কি কাজ? আচার্য বলছেন – *ফলেচ্ছারহিত*, ফলের ইচ্ছাকে বাদ দিয়ে কাজ করে যেতে হবে।

মা মেয়েকে বললেন, এই তরকারীটা রান্না কর। এখন মেয়ের ইচ্ছে নেই রান্না করাতে। মা বলেছে রান্না করতে হচ্ছে, এখন সজীটা পুড়ে গেল না কাঁচা থাকল সেদিকে কোন যত্ন না নিয়ে বানিয়ে দিয়ে বলে দিল, তুমি বলেছ তাই যেমন পেরেছি বানিয়ে দিয়েছি, আর কোন কথা নেই। না, এইভাবে কর্মযোগ হবে না। কর্ম করে দেওয়া মানে এই নয় যে ভালো হল কি মন্দ হল সেদিকে দেখা আমার কাজ নয়। তোমাকে দেখতে হবে কর্মটা সুষ্ঠু ভাবে করা হয়েছে কিনা, ভালো হয়েছে কিনা দেখতে হবে। এইভাবে যদি কর্ম না করা হয় তাহলে কোন দিনই কর্মযোগী হতে পারবে না। আবার অমুক অতিথি আসবেন, তিনি আমার রান্না আস্বাদন করে তিনবার বলবেন, বাঃ কি দারুণ রান্না হয়েছে, এই আশাটাও থাকবে না। কাজকে নিখুঁত ভাবে সব দিক দিয়ে সুসম্পন্ন করতে হবে, কিন্তু তার জন্য কে প্রশংসা করবে সেই আশাও করবে না আর কে নিন্দা করল সেই দিকেও মন দেবে না। তোমার সামনে যে কাজটা এসে গেছে, বা জন্মসূত্রে তোমাকে যে যে কাজ করতে হচ্ছে সেই কাজ করার ক্ষেত্রে যেন খুঁত না থাকে, পুরো নিষ্ঠা সহকারে সমস্ত কাজ করে যেতে হবে। কাজ শেষ করার পর তার বিনিময়ে আমার যা পারিশ্রমিক নিয়ে বেরিয়ে আসব। এরপর কে কি বলল,

কেউ খুশি হয়ে আমাকে পুরস্কৃত করছে কিনা ঐদিকে মন দিতে বারণ করা হচ্ছে। যারা আধ্যাত্মিক জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে চাইছেন তাদের জন্য ধ্যানযোগ বাধ্যতামূলক, আর ধ্যানযোগ করার আগে কর্মযোগ বাধ্যতামূলক। পরের শ্লোকে বলছেন –

**যং সন্ন্যাসমিতি প্রাহুর্যোগং তং বিদ্ধি পাণ্ডব। ন হ্যসংন্যস্তসংকল্পো যোগী ভবতি কশ্চন।।২।।**

সন্ন্যাসী আর যোগী আপাত ভাবে মনে হয় যেন দুটো বিপরীত, সন্ন্যাসী সব কর্ম ত্যাগ করে দিচ্ছে অপর দিকে যোগী কর্মকে ধরে রাখে। ভারতে যত বড় বড় মহাপুরুষের জন্ম হয়েছে এনারা সবাই ছিলেন ঋষি ও সন্ন্যাসী। যার জন্য ভারত সন্ন্যাসীদের প্রচুর সম্মান দেয়। এই কারণে ভারতের লোকেদের মনে একটা ধারণা হয়ে আছে যে আমি যদি সন্ন্যাসী হয়ে যাই তাহলে আমিও অনেক সম্মান পাব। কিন্তু সবার জন্য গীতার বাণী হচ্ছে তোমরা সবাই কর্ম কর, কারণ তোমরা সন্ন্যাসের জন্য উপযুক্ত নও। সাধারণ মানুষের মনেও বিভিন্ন সময় একটা ইচ্ছে উঁকি মারে যে আমি সন্ন্যাসী হয়ে যাব। অর্জুনেরও এই ইচ্ছেটা এসেছিল। গীতা এটাকে আটকে দিচ্ছে। গীতার মতে যিনি সন্ন্যাসী আর যিনি যোগী দুজনেরই দৃষ্টিভঙ্গী এক। কি দৃষ্টিভঙ্গী? কর্মফল সঙ্কল্প ত্যাগ। আমার এই ফল চাই, সেইজন্য আমি কাজ করছি, এই ভাবনাটাকে এনারা ত্যাগ করে দেন। যে সাধারণ সংসারী সে বাজারে যাওয়ার আগে ভেবে নিচ্ছে, আমি বাজারে গিয়ে এই রকম মাছ কিনব, এই রকম আনাজ কিনব। গীতার মতে যিনি ঠিক ঠিক সন্ন্যাসী বা যোগী তিনি যখন বাজারে যাবেন তখন তিনি বলবেন, আমি বাজারে যাচ্ছি, বাজারে যে রকমটি পাওয়া যাবে আমাকে সেই রকমটিই কিনতে হবে। ভালো হোক খারাপ হোক, দাম কম থাকুক কি বেশি থাকুক এই নিয়ে তাঁদের মন চঞ্চল হবে না। কিন্তু আমাদের এখানে পরের দিকে সমস্যা হয়ে যায় যে, সাধারণ মানুষ কাজ এমন ভাবে করে যে, আমার কাজ করার কথা যেমন ইচ্ছে করে দিলাম, আমি পুরো ত্যাগী। কাজটা কেমন হল সেই দিকে কোন নজর দিচ্ছে না, একটা দায়সারা ভাবে করে দেওয়াটাই এদের লক্ষ্য। কিন্তু তা নয়, গীতা যেটা বারবার বলছে, কাজ তোমাকে যেমন ভাবে করার কথা তুমি ঠিক সেইভাবে একেবারে নিষ্ঠার সাথে করবে, কিন্তু ফল যেটা হবে সেইদিকে তোমার দৃষ্টি থাকবে না। এইটাই হচ্ছে সার কথা। যখনই আমার ফলের থেকে দৃষ্টি সরে এল, সেটাই হল সন্ন্যাসী আবার সেটাই হবে যোগী। এই কথাটাই এখানে বলছেন – *ন হ্যসংন্যস্তসংকল্পো যোগী ভবতি কশ্চন*, যতক্ষণ কর্মফলের সঙ্কল্প না ত্যাগ করতে পারছ ততক্ষণ তুমি যোগী হতে পারছ না। এর পরের শ্লোক হচ্ছে –

**আরুরুক্ষোর্মুনের্যোগং কর্ম কারণমুচ্যতে। যোগারূঢ়স্য তস্যৈব শমঃ কারণমুচ্যতে।।৩।।**

যিনি যোগে আরূঢ় হতে চাইছেন, তাঁর জন্য সিদ্ধির সোপান হচ্ছে নিষ্কাম কর্ম, ফলাসক্ত রহিত হয়ে কাজ করে করে তাঁরা সিদ্ধি লাভ করেন। কিন্তু যখন একবার যোগে অবস্থিত হয়ে গেল, যখন কর্মের সাহায্য আর লাগছে না, তখন *শমঃ কারণমুচ্যতে*, তখন মনের সংযমটাই তাঁর একমাত্র কর্ম অন্য কর্ম আর তাঁর থাকবে না। ঠাকুরও এই জিনিষটাকে উপমার দ্বারা বলছেন – বউমা অন্তঃসত্ত্বা হলে শাশুড়িমা তার কাজ কমিয়ে দেয়। আমি যখন অনাসক্ত ভাবে প্রচুর কাজ করে যাচ্ছি, আর ঈশ্বরার্পণ বুদ্ধিতে প্রভুকে সব ফল অর্পণ করছি, এই ভাবে কর্ম করতে করতে আমার মন কিন্তু ভেতরে ভেতরে তৈরী হয়ে যাচ্ছে। যখন এইভাবে মন তৈরী হয়ে যায়, তখন ভগবান কিন্তু নিজে থেকেই আমার কাজ কমিয়ে দেবেন।

ঠিক ঠিক সত্যি কথা হচ্ছে আমাদের ভগবানে আদৌ সেই বিশ্বাস নেই, আত্মাতে এক পয়সার ধারণা নেই, শাস্ত্রের কথাতেও সন্দেহ সংশয় লেগে আছে, ঈশ্বরের ইচ্ছাতে সব কিছু হচ্ছে বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়। আমরা ছোটবেলা থেকে ঈশ্বর আছেন, তাঁর ইচ্ছেতে সব হয়, এইসব শুনে আসছি এইটুকুই, এর বেশি কিছু না। ঠাকুর কথামৃতে বলেছেন, বড়রা, গুরুজনরা বলে আসছেন, সেইজন্য মুখে এগুলো বলতে হয় তাই বলছি। কিন্তু কথাগুলো যে ভেতরে গিয়ে নাড়া দিয়ে গেঁথে যাবে সেই বিশ্বাস আমাদের হয় না। এই কথা এই কারণেই বলা হল যে, ঠাকুরের কথায়, শাস্ত্রের কথায়, গুরুবাক্যে যদি কিঞ্চিৎ মাত্র বিশ্বাস হয় তাহলেই কিন্তু আমাদের জীবনের আমূল পরিবর্তন হয়ে যাবে। এই যে ঠাকুর বলছেন, যার ভেতরে সত্যিকারের ভক্তি আছে, সে যেমন যেমন সাধনা করে এগোতে থাকে তেমন তেমন ভগবান তার কাজ কমিয়ে দেন, এই কথাতে বিশ্বাস রাখাটাই ধর্ম। আর সমাজ যখন বার্ধক্যের জন্য কাজ কমিয়ে দেয়, কর্মক্ষেত্র থেকে যখন অবসর নেয় তখন লোকে বলে আমি তো কাজ ছাড়া থাকতে পারিনা, আমি তাহলে কি করব। আসলে মানুষ কোন বয়সেই কাজ ছাড়া থাকতে পারেনা, ঠাকুর যদিও বা আমাদের কাজ কমিয়ে দেন তখন আমরা করবটা কি। এখন তো তাও হাতের কাছে মোবাইল রয়েছে, টেলিভিশন রয়েছে, ইন্টারনেট আছে, যে কোন একটাতে মন লাগিয়ে সময়টাকে কাটিয়ে দিচ্ছে, তা নাহলে তো লোকে পাগল হয়ে যেত। যারা ঠিক ঠিক ঈশ্বরের দিকে এগোতে চাইছেন তাদের জন্যই ঠাকুর ধাপে ধাপে কাজ কমিয়ে দেন। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে মনে প্রাণে আমরা আধ্যাত্মিক পথে এগোতে চাইছি না, এগুলো যা বলছি সব মুখের কথা। তাই ভগবান যদি এক্ষুণি আমাদের কাজ কমিয়ে দেন তাহলে আমরা আরও গভীর সমস্যার মধ্যে পড়ে যাব।

ভগবান বলছেন মানুষ যত কাজ থেকে নিজেকে আলাদা করতে থাকে তত তার মন, চিত্ত সমাহিত হতে থাকে। সমাহিত হওয়া মানে মনকে উচ্চ ভাব ও চিন্তনে একাগ্র করে নেওয়া। কারণ কাজ করা মানেই ইন্দ্রিয় আর মন চঞ্চল হওয়া। তার মানে, আমি

সারাদিন যে আট দশ ঘন্ট কাজ করছি আর তার সাথে যাতায়াতের সময়কে ধরে নেওয়া হয় এতেই জাগ্রত অবস্থার নব্বুই শতাংশ চলে গেল, আর বাকি সময়ে যে জপ ধ্যান করতে বসব তখন শরীরের সমস্ত শক্তি নিঃশেষিত হয়ে গেছে, এই ক্লান্ত শরীর ও মন নিয়ে কি আর জপ ধ্যান হয়, বা করা যায়। শুধু শরীর মনের ক্লান্তিই নয়, আজকে বসের সাথে ঝগড়া হয়েছে, কালকে পিওনের সাথে ঝগড়া হয়েছে, বাড়িতে বউএর সাথে মনোমালিন্য, সন্তানের অবাধ্যপনা তার ওপর পারিবারিক ও সামাজিক নানান ঝঞ্ঝাট লেগেই থাকে, জপ ধ্যান করার সময় এগুলো মাথার মধ্যে বন্‌বন্ করে ঘুরতে থাকে। কিন্তু অন্য দিক দিয়ে দেখতে গেলে দেখা যায়, কাজ যখন করতে শুরু হয় তখন মনটা সমাহিত হতে সুবিধা হয়। আবার যাদের কাজকর্ম কম তারাও জপ ধ্যানটাও ঠিক মত করতে পারেনা, কারণ ইচ্ছে নেই বলে। পার্কিনসনসের একটা থিয়োরি আছে যাতে বলছেন – **Work stretches to feel the available time**, আমাকে যদি একটা কাজ দেওয়া হয় সেই কাজের কোন সময় সীমা নির্ধারিত থাকে না। কাজ কতক্ষণ ধরে হবে? মানুষের যতক্ষণ সময় থাকে। যেমন, যেদিন অফিসে যাওয়ার তাড়া থাকে, জলের সরবরাহ যদি কম থাকে, তখন আমি স্নান দু'মিনিটেই সেরে নিই। এবার যদি ছুটিতে কোথাও বেড়াতে চলে যাই, তখন প্রচুর সময়, তখন কতক্ষণ ধরে স্নান করব? তখন স্নান করার সময়ই পাওয়া যাচ্ছে না, এই করছি বলে বারটা, একটা বেজে যাচ্ছে তবুও স্নান করা আর হচ্ছে না। কারণ স্নান করাটাও একটা কাজ, এটা কতক্ষণে এখন হবে, যতটা সময় আমার আছে কাজটা আস্তে করে টেনে নিয়ে যাবে। জগতের এইটাই নিয়ম। মানুষের কাজ কমিয়ে দিলেই যে তার মন সমাহিত হয়ে যাবে, তা কখনই হবে না। কিন্তু এখানে যোগীদের কথা বলা হচ্ছে, যোগীদের যত কাজ কমতে থাকে ততই এদের মন সমাহিত হতে থাকে। আমরা অতি সাধারণ লোক, আমাদের কাজ কমে গেলে, কিছু করার না থাকলে আমরা পাগল হয়ে যাবে, সেইজন্য যদি কাজ না থাকে তখন আমাদের জন্য একটাই পথ – সীতারাম সীতারাম সীতারাম কহিয়ে, যহি বিধি রাখে রাম তহি বিধি রহিয়ে। জাগতিক ব্যাপারে ঠাকুর যেমনটি রাখবেন তেমনটি থাকতে হবে, আর যতটুকু সময় অবসর পাবো শুধু প্রভুর নাম করে যেতে হবে, এ ছাড়া আমাদের আর কোন রাস্থা নেই, ধ্যান করা, মনকে সমাহিত করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। আমরা এখানে গীতার যে কথা গুলো আলোচনা করছি এগুলো অত্যন্ত উচ্চ জিনিষ, এই উচ্চ তত্ত্বকে হৃদয়ঙ্গম করা দূরে থাকুক ধারণা করাই কঠিন, তবে শুনে রাখা ভাল। তারপর বলছেন –

**যদা হি নেন্দ্রিয়ার্থেষু ন কর্মস্বনুষজ্যতে। সর্বসংকল্পসন্ন্যাসী যোগারূঢ়স্তদোচ্যতে।।৪।।**

আমরা যদি শরীরকে সোজা করে বসে মনকে স্থির করে বাইরের আওয়াজ গুলিকে লক্ষ্য করতে থাকি তখন পরিষ্কার বুঝতে পারি যে আমার শ্রবণেন্দ্রিয় যেন নিজেকে প্রসারিত করে ঐ শব্দটাকে ধরে নিল। বাইরের জগত সব সময় নানান রকমের উত্তেজনা পাঠিয়েই চলেছে, আমার ইন্দ্রিয়গুলো চোখ, কান, নাক সেই উত্তেজনা গুলোকে গিয়ে ধরতে থাকে। আমি যদি এখন চোখ বন্ধ করে থাকি তাহলেও বাইরের উত্তেজনা আসতেই থাকবে কিন্তু চোখ বন্ধ বলে আমার ভেতরে যে চৈতন্য আছেন তিনি চোখ দিয়ে সেই উত্তেজনাকে ধরতে পারছে না। যতক্ষণ না চৈতন্য ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে এই উত্তেজনা গুলোকে না ধরছে ততক্ষণ কিন্তু আমার কোন বোধ হবে না। আমি কাউকে কোন কাজের কথা বলছি, কিন্তু বুঝতে পারছি সে আমার কথাতে মন দিচ্ছে না, আমি তাকে বললাম, তুমি অন্যমনস্ক কেন, আমার কথা গুলো কি তোমার কানে যাচ্ছে না? কথার শব্দগুলো তার কানে ঠিকই ধাক্কা মারছে, কিন্তু কি করে সে অন্যমনস্ক হচ্ছে? টেপরেকর্ডার কি কখন অন্যমনস্ক হয়, সেতো সব কিছুই রেকর্ড করে যাচ্ছে। কিন্তু সে কি করে আমার কথাগুলো শুনতে পাচ্ছে না? বেদান্তে বলা হয়, যখন ঐ উত্তেজনাটা আসে তখন আমার ভেতরে যে চৈতন্য সত্তা আছেন, তিনি শ্রবণেন্দ্রিয় আর দর্শনেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে ঐ বস্তুটাকে জড়িয়ে ধরে আবার ভেতরে ফেরত চলে আসেন। আমরা যেমন হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে একটা বস্তুকে মুঠোর মধ্যে নিয়েনি, ঠিক সেই রকম কানের যে শক্তি সেটা নিজেকে বিস্তার করে ঐ জিনিষটাকে ধরে নেয়। তবে কানের শক্তি খুব ছোট্ট, বেশি দূর বিস্তার করতে পারেনা, চোখের শক্তি অনেকটাই যেতে পারে। এই ধরাটা যতক্ষণ না হবে ততক্ষণ তার চোখের সামনে যতই ছবি নাড়াতে থাকুক না কেন, মস্তিষ্ক ঐ ছবিকে গ্রহণ করবে না।

*ন কর্মস্বনুষজ্যতে*, যিনি সমস্ত রকমের সঙ্কল্পকে ত্যাগ করে দিয়েছেন, এই ইন্দ্রিয়ের ব্যাপারে তার আর কোন আসক্তি থাকে না। একটা খুব সুন্দর দৃশ্যকে দেখতে ভালো লাগা ভালো না লাগা কোনটাতেই আমি নেই, আমার ইন্দ্রিয়ের ভালো লাগছে। মিষ্টি গান ভেসে আসছে, খুব ভালো লাগছে। কার ভালো লাগছে? শ্রবণেন্দ্রিয়ের, কর্ণের ভালো লাগছে। তাতে আমার কি যায় আসে, আমি তো শুদ্ধ আত্মা। এই রকম যার হয়ে যায় সেই হচ্ছে *সর্বসংকল্পসন্ন্যাসী*। এনারা কোন রকমের সংকল্প করেন না। সংকল্প মানে, মনে করা যাক, আমাদের পাড়ায় প্রত্যেক শনিবার একটা উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের আসর বসে, আমিও প্রত্যেক শনিবার যাই, আর কি দারুণ দারুণ সব উচ্চাঙ্গের কণ্ঠসঙ্গীত, সেতার, সরোদের কি চমৎকার আসর চিন্তাই করা যায় না। এখন আমি বেশ কয়েক দিন ধরে শাস্ত্র অধ্যয়ণ করে করে ঠিক করলাম এখন থেকে আমি যোগ সাধনা করব। যখন ঠিক করে নিলাম যোগ সাধনা করব তখন হঠাৎ খেয়াল হল, প্রত্যেক শনিবার যে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের আসর হয় সেটার কি হবে, এত দিনের ভালো লাগার জিনিষকে ছাড়া যাবে না। কিন্তু যোগ সাধনা করতে হলে এই জিনিষ গুলোকেও ছাড়তে হবে। এখন কিভাবে ছাড়ব? তখন আমি নিজেকে বলব আমি হচ্ছি শুদ্ধ আত্মা। এই গান কার ভালো লাগছে? আত্মার কাছে তো কোন ভালো লাগা খারাপ লাগার ব্যাপার নেই। আমার যে শ্রবণেন্দ্রিয় আছে,

এই গান ওর ভালো লাগছে। শুদ্ধ আত্মার সাথে ইন্দ্রিয়ের কোন সম্পর্ক নেই। আমি তো ইন্দ্রিয় নই, আমি শুদ্ধাত্মা, আমি ওকে তোয়াজ করতে যাব কেন।

কোন অপরিচিত লোক আমাকে এসে যদি বলে – দাদা, বেলুড় স্টেশন থেকে আপনি আমার একটা টিকিট কেটে আনবেন? এখন তার সাথে যদি আমার খুব ভালো সম্পর্ক থাকে তাহলে টিকিট কাটতে যাব, আর যদি তার সাথে যদি আমার কোন সম্পর্ক না থাকে আমি কেন তার টিকিট কাটতে যাব, আমি কি তোমার চাকর নাকি। যোগী ঠিক এই কথাই নিজের শ্রবণেন্দ্রিয়কে বলে, আমি কি তোমার চাকর নাকি, তোমার হয়ে আমি কাজ করতে যাব কেন? চোখ বলবে, ঐ নদীর ধারে কি সুন্দর সুন্দর ফুল ফুটে আছে আমাকে নিয়ে চল, নাক বলবে ঐ ফুল গুলোর কি সুন্দর গন্ধ, কাছে গেলে ফুলের গন্ধেই মনটা কেমন অন্য জগতে চলে যায়, তুমি আমাদের নিয়ে চল। কেননা চোখ নাক এরাতো নিজেরা যেতে পারবে না। চোখ আর নাকের দরকার পায়ের, চোখ নাকের পায়ের সাথে সম্পর্ক করবে হেড অফিস, মানে মস্তিষ্ক, মস্তিষ্কের বস্ হচ্ছে আত্মা। আত্মা তখন মস্তিষ্ককে বলবে, চোখ ঐ দৃশ্য দেখবে, নাক ওর গন্ধ আঘ্রাণ করবে, তাতে আমার কি, এদের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। তখন ধ্যানের সময় চোখ নাক এরা চাঞ্চল্য সৃষ্টি করতে চেষ্টা করবে। বাচ্চাদের মত জেদ করতে থাকবে, চলো না, চলো না, একবারটি দেখে আসি। আত্মা তখনও বলে যাবে, ওগুলো তোমার ব্যাপার, সে তুমি বুঝে নাও, আমি তোমাকে তোয়াজ করতে যাব কোন্ দুঃখে। ব্যস্, চোখ নাক আপনা থেকেই শান্ত হয়ে যাবে। এরা শান্ত হয়ে গেলেই যে যোগী নিশ্চিন্ত হয়ে যাবে তা নয়, এরা ঘুষুর ফুসুর করতেই থাকবে। কিছু সময়ের জন্য শান্ত হয়ে যাবে ঠিকই কিন্তু এরা অত সহজে ছেড়ে দেবে না, বসে থাকবে ঘাপটি মেরে। মাথাটা খারাপ করে দেবার জন্য সব সময় খুঁচিয়েই যাবে। বেশির ভাব সাধু সন্ন্যাসীদের যে মাথা খারাপ হয়ে যায়, এই কারণেই খারাপ হয়। শরীরের বিভিন্ন ইন্দ্রিয় সব সময় দাবী করে যাচ্ছে, আমাকে এটা দাও সেটা দাও বলে, যোগী জোর করে বলছে না, দেওয়া যাবে না। ইন্দ্রিয়গুলো বলবে – তুমি দেবে নাতো! বলে চুপ করে বসে থাকবে আর ভেতরে মন যেটা আছে তার কানের কাছে ফিস্‌ফিস্ করে করে ওর মাথাটা খারাপ করে দেবে। তারপর একদিন দেখা গেল যোগীর মাথাটা খারাপ হয়ে গেছে।

সেইজন্য বলা হয়, আধ্যাত্মিক সাধনায় ধাপে ধাপে এগোতে হয়, তড়বড় করে কোন কিছুকে বন্ধ করে দিতে নেই। কিভাবে এগোবে? প্রথমে তুমি খুব করে কাজ করে যাও, কারণ ইন্দ্রিয় গুলো কাজ করতে খুব ভালোবাসে। কি কাজ করবে? অফিসের কাজ কর, গান শুনতে যাও, বেড়াতে যাও, বন্ধুবান্ধবদেরকে পার্টি দাও, খুব কাজ করতে থাক, খুব তেড়েফুড়ে যদি কাজ না করে থাক তাহলে কোন দিনই আধ্যাত্মিক পথে সাফল্য আসবে না। অনেক কাজ করা যখন হয়ে গেল, একটা সময়ের পর এই কাজ করাটাকে ধীরে ধীরে রাশ দিতে হবে। ভাই অনেক দিনই তো শনিবার শনিবার গান শুনতে গিয়েছ, এবার ক্ষ্যামা দাও, শনিবারের প্রোগ্রামে এবার আর যাওয়া চলবে না। বছরে এক আধবার যেতে চাও ঠিক আছে যাওয়া যেতে পারে। একটু আমি ওকেও ছাড়লাম, সেও একটু ছাড়ল। তারপর ধীরে ধীরে ঐ ইচ্ছেটা নিষ্ক্রিয় হয়ে খসে পড়ে যায়। তারপর আরেকটা ইন্দ্রিয়কে এইভাবে নিয়ন্ত্রণে আনতে হবে, সেটা নিয়ন্ত্রণে এসে গেলে, আবার আরেকটা ইন্দ্রিয়কে ধরতে হবে। এইভাবে সংযম করতে করতে আত্মার এত শক্তি এসে যায় আর মনকে এমন মুঠোর মধ্যে নিয়ে নেয় যে তখন চোখ, কান, নাক এরা যখন নাচানাচি করবে চৈতন্য সত্তা তখন বলবে তোমরা তো আমার থেকে আলাদা, আর তোমরা তো আমার চাকর, চাকরের কথা আমি শুনতে যাব কেন, আমি তোমাদের মালিক, মালিক হয়ে আমি কেন ভৃত্যের সেবা করতে যাব! আমি তোমাকে হুকুম করব, আমি যেটা চাই সেটাই তুমি আমাকে দিতে বাধ্য।

মূল কথা তোমার ইন্দ্রিয়গুলোকে বশে আনতে হবে। কিভাবে বশে আনবে? ইন্দ্রিয় আলাদা, মন আলাদা, আমি আলাদা। কঠোপনিষদে এই জিনিষটাকে খুব সুন্দর উপমার সাহায্যে বর্ণনা করছে – একটা রথে বসে আমি যাচ্ছি, রথের ঘোড়াগুলো হচ্ছে ইন্দ্রিয়, ঘোড়ার লাগাম হচ্ছে মন, সারথি হল বুদ্ধি। রথের উপরে যিনি বসে আছেন, তিনি হচ্ছেন মালিক, জীবাত্মা। রথ গন্তব্যের দিকে ছুটছে, এখন যদি ঘোড়া গুলির খুব ভালো প্রশিক্ষণ দেওয়া থাকে তাহলে ঘোড়া গুলো ঠিক পথে যাবে। যদি প্রশিক্ষণ না দেওয়া থাকে, ঘোড়া গুলো যদি বুনো জংলী হয় তাহলে রাস্থা থেকে সোজা মাঠে নামিয়ে দেবে। ঘোড়াগুলো যদি মাঠের দিকে চলে যায় তখন তাকে লাগাম দিয়ে পথে নিয়ে আসতে হবে। লাগাম যদি আলগা থাকে, তখন ঘোড়াগুলোকে সঠিক পথে নিয়ে আসাটা দুঃসাধ্য হবে। লাগামটা হয়তো খুব শক্তোপোক্ত আছে, কিন্তু যদি সারথি দুর্বল হয়, মানে বুদ্ধি যদি দুর্বল হয় তখন লাগাম দিয়েও কোন কাজ হবে না, ঘোড়া যেদিক খুশি চলে গিয়ে মালিককে রথ থেকে ছিটকে ফেলে দেবে।

সেইজন্য সব সময় বলা হয়, প্রথমে গুরু মুখে, বা আচার্যের মুখে শাস্ত্র শুনে শুনে বুদ্ধিটাকে আগে শুদ্ধ করে পাকা করে নিতে হয়। বুদ্ধিটা পাকা হওয়ার পর মনটাকে বশে নিয়ে আসতে হয়। মন সব সময় চঞ্চল আর সঙ্কল্প-বিকল্প করে যাচ্ছে, করব কি করব না এই দোদুল্যমানতায় অবস্থান করে, বুদ্ধি তখন লাগামটাকে শক্ত করে হাতের মুঠোতে ধরে মনকে বশে নিয়ে আসে। আর ইন্দ্রিয়গুলো হচ্ছে পুরো বন্য পশুর মত। এখনকার ছেলেমেয়েদের দেখলে মনে হয় যমরাজ যখন নচিকেতাকে রথ, সারথি, লাগাম আর ঘোড়ার উপমা দিয়ে উপদেশ দিয়েছিলেন, তখন এদের দিকে তাকিয়েই এই উপমা নিয়ে এসেছিলেন। তখনই যমরাজ

দিব্যদৃষ্টিতে দেখতে পেয়েছিলেন যে বর্তমান যুগে যুব সমাজের অবস্থা এই ধরণের হবে। সব ছেলেমেয়েরা দৌড়ে চলেছে, কেউ টাকার পেছনে, কেউ ভোগের পেছনে, কেউ অন্য কিছুর পেছনে, তারপর যখন দেখছে কিছুই হচ্ছে না তখন হয় গলায় দড়ি দিচ্ছে না হলে ট্রেনের তলায় গলা পেতে দিচ্ছে। বেশির ভাগ লোকেরই মন, ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধি কিছুই বশে নেই, যার ফলে ইদানিং কালে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদেরকেও মনস্তাত্ত্বিকদের কাছে নিয়ে যেতে হচ্ছে। অথচ কয়েক বছর আগেও বেশির ভাগ মানুষ মনস্তাত্ত্বিক ডাক্তার বলে একটা যে কিছু আছে জানতই না। মধ্যবিত্তদের মধ্যে এই জিনিষটা এখনও একটু কম, কিন্তু উচ্চবিত্তদের মধ্যে এই জিনিষ গুলো একেবারে পশুস্তরে চলে গেছে। যাদের একটু বিবেক আছে, যারা নিজেদের ভালোমন্দের বিচার করতে জানেন তারা বোঝেন যে আমাকে এগোতে হবে। এগোতে গেলে আমার ইন্দ্রিয় মন ও বুদ্ধির কার্যাবলির ব্যাপার স্যাপার গুলো বুঝতে হবে। যোগীরা এদের ব্যাপার গুলো জানেন বলেই ইন্দ্রিয়কে মনের দ্বারা, মনকে বুদ্ধির দ্বারা বশে নিয়ে আসেন। কেন যোগী এগুলোকে বশে আনতে চান? তখন বলছেন –

**উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ। আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ।।৫।।**

নিজের আত্মাকে নিজের আত্মা দিয়েই উদ্ধার করতে হবে, তোমাকে কেউ উদ্ধার করতে পারবে না। এই যে ভক্তরা প্রায়ই বলেন গুরুই উদ্ধার করবেন, ঠাকুরই উদ্ধার করবেন, কিন্তু এনারা কেউই কাউকে উদ্ধার করেন না, আমাকে আমাকেই উদ্ধার করতে হবে, নিজেকে নিজেই উদ্ধার করতে হয়। আমাদের এতদিনের এই জাগতিক জীবনে আজ পর্যন্ত একটি ঘটনাও দেখিনি যেখানে গুরু তাঁর চেলাকে উদ্ধার করেছেন। *আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুঃ,* আত্মাই আত্মার বন্ধু। *আত্মৈব রিপুরাত্মনঃ,* আবার আত্মাই আত্মার সবচেয়ে বড় শত্রু। বাইরে আমার কোন শত্রু নেই, আমিই আমার শত্রু। কি করে আমি আমারই শত্রু হচ্ছি? বলছেন, মানুষ যদি নিজেকে বশে না রাখে, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধিকে যদি সংযত না রাখে, তাহলেই সে নিজেই নিজের সব থেকে বড় শত্রু হয়ে যায়। আর যখন সব কিছুকে সংযত রাখে তখন নিজেই নিজের শ্রেষ্ঠ বন্ধু হয়ে যায়। এই জগতে আমি ছাড়া আমার আর কোন বন্ধু নেই, এই জগতে আমি ছাড়া আমার আর কোন শত্রুও নেই।

এই শ্লোকটিও স্বামীজীর খুব প্রিয় ছিল, তিনি এটাকে একটু অন্য ভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। মানুষের যখন সর্দি-জ্বর হয় তখন আমরা বলি বাইরের ভাইরাস থেকে তার এই শরীরের অসুখ হয়েছে। স্বামীজী বলছেন – কখনই বাইরে থেকে অসুখের আক্রমণ হয় না, যা হয় সব ভেতর থেকে হয়। ভাইরাস থেকেই যদি অসুখ হয়, এই ঘরে যে আমরা বসে আছি এখানে হাজার হাজার ভাইরাস ঘুরে বেড়াচ্ছে, কই এখন তো ভাইরাস আমাদের কিছু করতে পারছে না। কারণ, আমরা যেমন যেমন রকমের সুষম খাদ্য খেয়েছি সেই অনুসারে শরীরের প্রতিরোধ ক্ষমতা এমন ভাবে তৈরী হয়ে আছে যে ভাইরাস গুলো কিছুই করতে পারছে না। যখন সুষম খাদ্যের অভাব হয়ে শরীর দুর্বল হয়ে গেলে এই ভাইরাস আমাকে অতি সহজে আক্রমণ করে বসবে। তার মানে বাইরের কারণ অতি নগণ্য, বাইরের কারণ যদি শতকরা পাঁচ শতাংশ হয় তাহলে ভেতরের কারণ পঁচানব্বুই শতাংশ। দোষ ভাইরাসের নয়, দোষ আমার শরীরের। আমি শরীরের ঠিক মত যত্ন নিইনি বা আমার আগের আগের জন্মে এমন এমন কর্ম করা আছে যার কারণে ঠিক করা হয়ে আছে যে আমার শরীর দুর্বল হবে, সেই দুর্বল শরীরের ভাইরাস সংক্রামণ হবে। শুধু পারমার্থিক ব্যাপারেই নয়, জাগতিক ব্যাপারেও আমিই আমার ক্ষতি করছি। এই জগতের মধ্যে শক্তি কোথায়, এই যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড দেখছি এর কোন শক্তিই নেই, এই জগত তো প্রকৃতি, প্রকৃতির শক্তিতো জড়ের শক্তি, আর আমার মধ্যে যে শক্তি সেটা হচ্ছে চৈতন্যের শক্তি। যে মুহুর্তে আমি ঠিক করে নিলাম আমার কিছু হবে না, এই জগতকে আমার উপর কিছু করতে দেব না, কারুর ক্ষমতা হবে না আমাকে কিছু করে দেবে।

সারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড হচ্ছে একটা কেরোসিন বা পেট্রোলের জ্যারিকেন, আর আমি হচ্ছি ছোট্ট একটা দেশলাই। একটা দেশলাই মেরে দিলে জগত ছাই হয়ে যাবে। কিন্তু আমরা বেশির ভাগ সময় নিজেদের পেট্রোল মনে করি, তার ফলে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড হচ্ছে পেট্রোলের একটা সমুদ্র আর আমি সেই সমুদ্রের একটা ছোট্ট পেট্রোলের বুদ্‌বুদ্‌। তখন এই জগতের কাছে আমাকে মনে হবে অতি নগণ্য। কিন্তু যখন দেখব যে আমি পেট্রোলের বুদ্‌বুদ্‌ নয়, আমি হচ্ছি আগুন, তখন জগতই আমার ভয়ে প্রাণ ছেড়ে পালাবে। যিশু, মহম্মদ, স্বামীজী এনারা জগতকে দেখিয়ে দিলেন, দ্যাখ্‌, আমি হচ্ছি আগুন, আর এই জগতটা হচ্ছে পেট্রোল, জগত তাঁদের কাছ থেকে ভয়ে পালাচ্ছে। এগুলো যে তাঁদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে আর আমাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না, তা নয়। একবার যখন বুঝে নিলাম আমি হচ্ছি সেই চৈতন্য, আমার মধ্যে আত্মশক্তি আছে, তখন জগতের কোন দম থাকবে না এই আত্মশক্তির সামনে দাঁড়ানোর। কারণ আমার আর জগতের ধর্ম হচ্ছে বিপরীত। একটা লোকের সারা গায়ে পেট্রোল ঢালা হয়েছে, এখন আপনি একটা দেশলাই কাঠি জ্বেলে তার দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন, তখন সেই লোকটা কি করবে, আপনার ভয়ে সে উর্দ্ধশ্বাসে পালাবে। কিন্তু আমিই এখন নিজের গায়ে পেট্রোল ঢেলে আতঙ্কিত হয়ে আছি। কিন্তু যেই মুহুর্তে আমি বুঝে যাব আমি আর জগত বিপরীত ধর্মা, সে পেট্রোল আর আমি আগুন, জগত প্রাণ ছেড়ে পালাবে। যখনই আমি নিজেকে চৈতন্য শক্তি মনে করে নেব তখনই আমি উঠে দাঁড়াব, যখন আমি মনে করব আমি প্রকৃতি, আমি জড়, মানে আমি শরীর, আমি ইন্দ্রিয়, আমি মন, আমি বুদ্ধি, তখনই আমি অতল গহ্বরে

হারিয়ে যাব। কিন্তু যখন আমি মনে করতে শুরু করব আমি সেই শুদ্ধ আত্মা, তখন আমি আমাকে উপরে দিকে টানতে শুরু করলাম। যখন আমি নিজেকে জড়ের সঙ্গে একাত্ম করছি তখনই আমি নিজেই নিজের শত্রু হয়ে গেলাম, যখন আমি চৈতন্যের সঙ্গে একাত্ম করছি তখন আমিই আমার শ্রেষ্ঠ বন্ধু হয়ে গেলাম।

**বন্ধুরাত্মাত্মনস্তস্য যেনাত্মৈবাত্মনা জিতঃ। অনাত্মনস্তু শত্রুত্বে বর্তেতাত্মৈব শত্রুবৎ।।৬।।**

যিনি নিজের মনকে জয় করে নিয়েছেন, যাঁর মন একেবারে শুদ্ধ হয়ে গেছে, যিনি জিতেন্দ্রিয় হয়ে গেছেন, সেই জিতেন্দ্রিয় পুরুষের আত্মা তাঁর এখন বন্ধু হয়ে গেছে। এমন চাবুক মারা হয়েছে যে, সব ইন্দ্রিয় গুলো ভয়ে কেঁচো হয়ে হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে আছে প্রভুর আদেশের অপেক্ষায়। আর যে ব্যক্তি ইন্দ্রিয় গুলোকে জয় করতে পারেনি, অজিতেন্দ্রিয়, তার কি অবস্থা? ঠাকুর খুব সুন্দর গল্পের সাহায্যে বোঝাচ্ছেন – অনাবৃষ্টির জন্য চাষবাস হচ্ছে না, একজন চাষা ঠিক করেছে নদী থেকে খাল কেটে নিজের চাষের জমির সাথে যোগ করে দিতে হবে। অনেক বেলা পর্যন্ত খাল কেটেই যাচ্ছে। বেলা হয়েছে দেখে চাষার মেয়ে এসেছে – বাবা, মা বলেছে বেলা হয়ে গেছে, স্নান করে খেয়ে নাও। মেয়েকে চাষা বলে পাঠিয়ে দিল – এখন যা, আমার অনেক কাজ আছে, আমি যেতে পারব না। তারপর চাষার বউ এসে চেঁচামেচি করে বলছে – তোমার সব তাতেই বাড়াবাড়ি। চাষা তখন কোদাল নিয়ে বউকে মারতে এসেছে – পোড়ার মুখী তোর মুণ্ডুই আজ কেটে দেব, জানিসনা বৃষ্টি হয় নাই বলে চাষবাস নেই, ছেলেমেয়েদের কি খেতে দেব! চাষার ঐ উগ্রমুর্তি দেখে বউতো ভয়ে পালিয়ে গেল। এরপর সারাদিন ধরে খাল কেটে কেটে যখন নদীর সঙ্গে যোগ করে দিল, কুলকুল করে জল জমিতে ঢুকতে লাগল, তখন তার কি আনন্দ। তারপর সে বাড়িতে গিয়ে বউকে বলল, দে তেল দে, একটু তামাক সাজ। তারপর স্নান করে খেয়েদেয়ে বিশ্রামে গেল। আরেকজন চাষা সেও জমিতে জল আনবে বলে খাল কাটছিল, তার বউ যখন এসে বলল, তোমার সব তাতেই বাড়াবাড়ি, বাকিটা কালকে করলেও তো পার। তখন সেই চাষা সঙ্গে সঙ্গে কোদাল টোদাল ফেলে দিয়ে বউএর সাথে বাড়ি গিয়ে তেলটেল মেখে স্নানে চলে গেল। তার আর জমিতে জল আনা হল না। এই হচ্ছে জিতেন্দ্রিয় আর অজিতেন্দ্রিয়ের পরিণাম। এই জিতেন্দ্রিয় আর কি রকম হয়?

**জিতাত্মনঃ প্রশান্তস্য পরমাত্মা সমাহিতঃ। শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু তথা মানাপমানয়োঃ।।৭।।**

এই ধরণের জিতেন্দ্রিয় পুরুষের বুদ্ধি পূর্ণ রূপে নিয়ন্ত্রণে থাকে। আর যত রকমের শরীর ইন্দ্রিয়ের বিষয়ের যে সংঘাত ক্রিয়া সব পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে। সব কিছু নিয়ন্ত্রণে হয়ে যায় বলে মন প্রশান্ত হয়ে গিয়ে সব সময় ঈশ্বরেই নিবিষ্ট চিত্ত হয়ে থাকে। আর সব কিছুতেই সমবুদ্ধি এসে যায়। *শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু তথা মানাপমানয়োঃ*, তাকে কেউ সম্মান দিল, কি কেউ অপমান করল, শীত, উষ্ণ সর্ব ক্ষেত্রে তাঁর বুদ্ধিটা সমান। তাই বলে কি তাঁর গণ্ডারের চামড়া হয়ে যাবে? কখনই না, তাঁরও গরম লাগবে, তাঁরও ঠাণ্ডা লাগবে কিন্তু তিনি যে এই নিয়ে ছটফট, চেঁচামেচি করবেন তা নয়। কেউ তাঁকে মন্দ কথা বলল তাতেও তিনি মন খারাপ করে ভেঙ্গে পড়বেন না, আবার কেউ বিরাট সম্মান দিল তাতেও তাঁর বুকটা বেলুনের মত ফুলে উঠবেন না। একটা ছয় বছরের বাচ্চা আমাকে জিজ্ঞেস করল, কাকু ইংল্যাণ্ডের রাজধানীর নাম কি? আমি সঙ্গে সঙ্গে তাকে বলে দিলাম লণ্ডন। বাচ্চাটা অবাক হয়ে বলছে, কাকু তুমি কত কিছু জান, তুমি এত কিছু কি করে জানলে? বাচ্চার এই কথাতে আমার কি খুব গর্ব অনুভব হবে? আবার যদি বাচ্চাটা বলে, তুমি কিচ্ছু জাননা, লণ্ডন কি কখন ইংল্যাণ্ডের রাজধানী হতে পারে? তখন কি আমার কোন অপমান বোধ হবে, মন খারাপ করে ভেঙ্গে পড়ব? এই জগতটাকে যখন দেখব একটা পাঁচ বছরের বাচ্চার মত, তখন এই জগৎ যদি আমাকে সম্মানও দেয় তাতেও আমার কিছু মনে হবে না, অপমান করলেও ভেঙ্গে পড়ব না। যোগীরা এই জগতকে পাঁচ বছরের বাচ্চার মতই দেখেন আর বাচ্চাদের সাথে যে রকমটি ব্যবহার হয়, সেই রকমই এই জগতের সাথে তাঁর ব্যবহার হয়। আমরা এই জগতকে আমার মত মনে করি বলে আমাদের এত সমস্যা। এইটাই আমাদের সমস্যা যে আমরা জগতকে বড্ড বেশী মূল্য দিয়ে ফেলি, কিন্তু ভুলে যাই যে এই জগৎ হচ্ছে প্রকৃতি, প্রকৃতি মানে জড়, চৈতন্য শক্তির তুলনায় এই প্রকৃতির কোন মূল্যই নেই। তারপরে এই একই কথা বলে যাচ্ছেন –

**জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা কূটস্থো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ। যুক্ত ইত্যুচ্যতে যোগী সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ।।৮।।**

এনারা কূটস্থ হয়ে যান, মানে যোগে আরূঢ় হয়ে যান, তাঁর নিজের স্বরূপে স্থিত হয়ে থাকেন। প্রকৃতিতে কোথায় কি হচ্ছে সেদিকে এঁদের আর দৃষ্টি থাকে না। *বিজিতেন্দ্রিয়ঃ*, সব ইন্দ্রিয়গুলোকে সংযমে নিয়ে আসা হয়েছে। ইন্দ্রিয় যতক্ষণ সংযমে থাকে না, ততক্ষণই যত অশান্তি লেগে থাকে। আমাদের এই যে বেশি ঠাণ্ডা লাগা, বেশি গরম লাগা, মান অপমানে কাতর হওয়া এইগুলো সবটাই ইন্দ্রিয়ের অসংযমিত অবস্থার লক্ষণ। *জ্ঞানবিজ্ঞান*, যখন শাস্ত্রের কথা গুরু মুখে শুনে শুনে ধর্ম ও ঈশ্বরের ব্যাপারে ধারণা হচ্ছে তখন একে বলা হচ্ছে জ্ঞান, আর যখন এই জ্ঞানকে জীবনে উপলব্ধি হয়ে গেল সেটাই তখন হয়ে গেল বিজ্ঞান। এই জ্ঞানবিজ্ঞানের সঙ্গে *তৃপ্তাত্মা* যুক্ত করা হচ্ছে, আমি স্বপ্নে একদিন ঠাকুরকে দর্শন করলাম, কিংবা দক্ষিণেশ্বরে মা ভবতারিণীর মুর্তির সামনে দাঁড়িয়ে মাকে দর্শন করতে করতে দেখছি মায়ের মুর্তি আলোতে ঝলমল করে উঠল, তখন মনে হল মা ভবতারিণী সত্যি সত্যিই বিরাজ

করছেন। *তৃপ্তাত্মা* মানে শুধু এইটুকুই নয়, শাস্ত্রোক্ত জ্ঞান পুরোপুরি আমার জানা থাকতে হবে। ঠাকুর তোতাপুরীকে বলছেন – যতক্ষণ না আমাকে সব শিখিয়ে দিচ্ছ ততক্ষণ তোমার এখান থেকে ছাড়া নেই। তোতাপুরী তিন দিনের বেশি কোথাও থাকতেন না, কিন্তু ঠাকুরের জন্য দক্ষিণেশ্বরে মাসের পর মাস অবস্থান করতে হয়েছিল। শুধু বিজ্ঞান হলে হবে না, জ্ঞানও থাকতে হবে। ঠাকুরকে একজন বলছেন – আপনি কি জানেন, আপনি তো কোন শাস্ত্রই পড়েননি। ঠাকুর বলছেন – আমি শুনেছি কত। যার জন্য কথামৃতে ঠাকুরের কোন কথায় শাস্ত্রের অপসিদ্ধান্ত পাওয়া যাবে না। মুর্খ ভক্তরা বলে বেড়ায়, বই পড়ার কি দরকার, ঠাকুর কি বই পড়েছিলেন? ঠাকুর বলেছিলেন গ্রন্থ না গ্রন্থি। কিন্তু গীতা এখানে বলছে শাস্ত্র জ্ঞান যদি না থাকে তাহলে সে পুরোপুরি অসম্পূর্ণ। ঠাকুর নিজে পুরো শাস্ত্র জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি কোথায় অধ্যাত্ম রামায়ণ পাঠ হত খবর পেলেই ছুটে যেতেন, গীতা শুনতেন, আর বিভিন্ন পণ্ডিতরা ঠাকুরের কাছেএসে বিচার করত সেগুলো ঠাকুর সব শুনতেন। এখন আমি বই পড়ে জ্ঞান অর্জন করেছি, কি গুরু মুখে শাস্ত্রের কথা শুনে জ্ঞান লাভ করেছি তাতে কিছু আসে যায় না। এই জ্ঞানটা থাকতে হবে, এই জ্ঞান যখন হয়ে গেল তখন অর্দ্ধেক হল। বাকি অর্দ্ধেক হচ্ছে বিজ্ঞান, ঐ জ্ঞানটা এবার নিজেকে উপলব্ধি করতে হবে।

*যুক্ত ইত্যুচ্যতে যোগী*, ঠিক ঠিক যোগী কখন হয়? যখন ঠাকুর বলেছিলেন টাকা মাটি মাটি টাকা, *সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ*, লোষ্ট অশ্ম হচ্ছে মাটি, পাথর ইত্যাদি, আর কাঞ্চন মানে টাকা পয়সা। ঠাকুর ঠিক এইটাই করেছিলেন, টাকা মাটি মাটি টাকা, *যুক্ত ইত্যুচ্যতে যোগী সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ*, যোগীর কাছে মাটি, পাথর, ঢেলা যা, টাকা, পয়সা, সোনা, রূপাও তাই, সবটাই অপ্রয়োজনীয় তাঁর কাছে। যেমন জগতকে পাঁচ বছরের বাচ্চার মত দেখেন, ঠিক তেমনি যত ধন দৌলত আছে সবেতেই মাটির ঢেলার মত দেখেন। জগতের থেকে তাঁর কোন কিছুর দরকার নেই। টাকা পয়সা তো এই জগতের bartery unit, মানে আমি কিছু চাইছি, তার বদলে আমাকেও কিছু দিতে হবে, আগেকার দিনে আমি চাল-গম চাইছি তার বিনিময়ে আমাকে অন্য কিছু দিতে হবে, এখন হয়ে গেছে টাকা, টাকার বিনিময়ে আমাদের যা যা প্রয়োজন সব কিছু পেয়ে যাচ্ছি। কিন্তু আমারতো কিছুর প্রয়োজন নেই, আমি টাকা নিয়ে কি করব।

অস্ট্রেলিয়াতে এক ভদ্রলোক গাড়ি করে একটা প্রত্যন্ত গ্রাম্য রাস্থা দিয়ে যাচ্ছেন। যেতে যেতে মাঝ রাস্থায় তার গাড়ি খারাপ হয়ে যায়। রাস্থার ধারে এক ট্রাইবাল লোককে দেখে জল চাইল। লোকটা কোথা থেকে জল এনে দিয়েছে, ভদ্রলোকও গাড়ির রেডিয়েটরে জল ঢালার পর পকেট থেকে কয়েকটা ডলার বার করে লোকটির হাতে দিয়েছে। লোকটি ডলারটা হাতে নিয়ে দেখছে এটা আবার কি জিনিষ। বেচারা জানেই না ডলার কি জিনিষ, সে ঐ ডলার গুলো উল্টেপাল্টে দেখে নিয়ে আবার রাস্থার উপর রেখে চলে গেছে, তারপর সেগুলো আবার বাতাসে উড়িয়ে অনেক দূরে নিয়ে ফেলেছে। সে জানেই না ডলার কি পদার্থ, এটা দিয়ে কি হয়। আমাকে যদি কেউ কেনিয়ার পাঁচশ টাকার কারেন্সি নোট দেয়, এখন এই নোট নিয়ে আমি কি করব, এখানে এই নোট আমার কোন কাজেই লাগবে না, ভারতীয় কারন্সির নোট দিলে কাজে লাগত, কিন্তু এই নোট গুলোর মূল্য আর খবরের কাগজের টুকরো মূল্য আমার কাছে সমান। যিনি ঋষি তাঁর এই জগত থেকে নেওয়ার কিছুই নেই, অল্প একটু যাও দরকার সেটা এমনিই তাঁর কাছে এসে যায়। এরপর আবার বলছেন –

**সুহৃন্মিত্রার্যুদাসীনমধ্যস্থদ্বেষ্যবন্ধুষু। সাধুষ্বপি চ পাপেষু সমবুদ্ধির্বিশিষ্যতে।।৯।।**

সুহৃদ, যিনি আমার উপকার করছেন, মিত্র, যিনি আমার বন্ধু, অরি মানে শত্রু, উদাসীন, যে কোন কিছুকে ভ্রুক্ষেপ করে না, বন্ধু, সাধু, পাপী, এই ধরণের যত রকমের লোক আছে সবার প্রতি তাঁর সমান দৃষ্টি। কারুর প্রতি কোন আসক্তিও নেই বিদ্বেষও নেই, একজনকে দেখে কাছে ছুটে যাচ্ছেন, আরেকজনকে দেখে বিরক্ত হয়ে পালিয়ে যাচ্ছেন, যোগীর মধ্যে এই ধরণের কোনটাই হয় না, সবার প্রতি সমান ভাব। সাধু সন্ন্যাসীরা সত্যিই এই ভাব নিয়েই জগতের সব কিছুকে দেখেন, শত্রুভাবও কারুর প্রতি থাকে না, কারুর কাছ থেকে পালানও না। কাঁচা সাধকদের প্রাথমিক অবস্থায় কারুর প্রতি একটু ভালোবাসা থাকে, সাধনা করতে করতে সেটাও আস্তে আস্তে কেটে যায়, কে এলো কে গেলো তাতে তাঁর কিছুই আসে যায় না। কিন্তু যার সঙ্গে তাঁর ঈশ্বরীয় কথা হবে শাস্ত্রীয় কথাবার্তা হবে, তার সঙ্গ তাঁর ভালো লাগে। আবার যে বিষয়ের কথা বলছে, তাকে হয়ত তাঁর ভালো লাগবে না, কিন্তু দূর দূর করে তাড়িয়েও দেবেন না। এরপর বলছেন –

**যোগী যুঞ্জীত সততমাত্মানং রহসি স্থিতঃ। একাকি যতচিত্তাত্মা নিরাশিরপরিগ্রহঃ।।১০।।**

এই শ্লোক থেকে ভগবান যোগের অনুশীলন কিভাবে করতে হবে বলছেন। তুমি যদি যোগী হতে চাও তাহলে তোমাকে কতকগুলো শর্ত পালন করতে হবে। *সততং*, সব সময়, *আত্মানং*, মনকে বহির্মুখী না রেখে অন্তর্মুখী রাখতে হবে। যারা বেশি কথা বলে, অনেক কাজে জড়িয়ে রয়েছে, প্রচুর বই পড়ে, লেখালেখি করে, মন চঞ্চল, এরা কখনই যোগী হতে পারবে না। যোগী মানেই হচ্ছে অন্তর্মুখী। *রহসি স্থিতঃ*, রহসি মানে নির্জনে একা একা থাকা। এই অধ্যায়ের প্রথমেই শঙ্করাচার্য ভাষ্যের ভূমিকাতে বলছেন যে

ধ্যানযোগ গৃহস্থের জন্য নয়। গৃহীরা একা একা থাকতে পারে না, কিছু দিনের জন্য যদিও বা একা থাকবে তারপরেই ছটফটানি শুরু হয়ে যায়। তাছাড়া যে গৃহস্থ তার যে বউ, বাচ্চা, নাতি-পোতা রয়েছে এদেরকে কোথায় ছেড়ে দিয়ে নির্জনে একাকী বাস করবে। বলছেন – *রহসি* হচ্ছে নির্জন জায়গা, একান্ত স্থান, আর *একাকি* হচ্ছে নির্জন জায়গায় নিজেকে সবার থেকে আলাদা করে একা একা রাখা। *যতচিত্তাত্মা,* নিজের দেহ ইন্দ্রিয়কে যিনি জয় করে রেখেছেন। *নিরাশিরপরিগ্রহঃ,* নিরাশিঃ হচ্ছে কোন কিছুর প্রতি তাঁর তৃষ্ণা নেই, *অপরিগ্রহ,* মানে কেউ যদি কিছু দিতেও আসে গ্রহণ করবেন না। অপরিগ্রহ মানে কিছুই না নেওয়া নয়, আমার যতটুকু দরকার ততটুকুই নেব। তাও যার তার কাছে থেকে নেবেন না, তাঁর কয়েকজন পছন্দের লোক আছে, তাদের ছাড়া আর কারুর কাছ থেকে কিছু নেবেন না। যার তার কাছে থেকে, অচেনা অপরিচিত লোকের কাছ থেকে কেন নেবেন না? কেননা তিনি তো জানেন না, সে কিভাবে অর্থ উপার্জন করছে, তার কি মতলব আছে, তাই যোগীকে সবার কাছে থেকে সব কিছু নিতে নেই।

**শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিরমাসনমাত্মনঃ। নাত্যুচ্ছ্রিতং নাতিনীচং চৈলাজিনকুশোত্তরম্।।১১।।**

এইসব হয়ে যাওয়ার পর এবার নিজের আসনকে ঠিক করতে হবে। কোথায় আসন পাততে হবে? পবিত্র স্থানে, যেখানে সেখানে বসে পড়লে চলবে না। *শুচৌ দেশে,* আগে দেখতে হবে জায়গাটা পবিত্র কিনা। *স্থিরমাসনম্ আত্মনঃ,* নিজের আসনটিকে স্থির, অচল করতে হবে। *নাত্যুচ্ছ্রিতং,* আসন খুব উঁচুও হবে না আবার *নাতিনীচম্,* একবারে নীচু হওয়াও ঠিক হবে না। উঁচু জায়গায় বসে ধ্যান করার সময় মনে হবে আমি যেন পড়ে যাব, সেইজন্য উঁচু আসনে বসতে নেই। *নাতিনীচম্,* আসনের স্থান নীচু হলে বৃষ্টি পড়লে জল গড়িয়ে আসতে পারে, যেসব পোকামাকড় মাটিতে চলাফেরা করে সেগুলো গায়ে উঠে যেতে পারে। *চৈলাজিনকুশোত্তরম্,* আগেকার দিনে মুনি ঋষিরা যে ধরণের আসনে বসে ধ্যান করতেন, তাতে প্রথমে থাকত কুশের একটি আসন, তার ওপর ব্যাঘ্র চর্ম, বা হরিণের চর্ম, তার ওপরে কম্বলের আসন। এইটাই হচ্ছে স্থিরাসন। তবে এখন আর এগুলো অতটা বাধ্যতামূলক নয়। বলছেন –

**তত্রৈকাগ্রং মনঃ কৃত্বা যতচিত্তেন্দ্রিয়ক্রিয়ঃ। উপবিশ্যাসনে যুঞ্জ্যাদ্ যোগমাত্মবিশুদ্ধয়ে।।১২।।**

এই রকম আসনে বসে বহিরেন্দ্রিয় আর অন্তরেন্দ্রিয়কে সংযত করে মনকে একাগ্র করার চেষ্টা করে চিত্তশুদ্ধির জন্য যোগাভ্যাস করতে হবে। শরীরটা কি রকম থাকবে?

**সমং কায়শিরোগ্রীবং ধারয়ন্নচলং স্থিরঃ। সংপ্রেক্ষ্য নাসিকাগ্রং স্বং দিশশ্চানবলোকয়ন্।।১৩।।**

মেরুদণ্ড, গ্রীবা, মস্তক সোজা এক সরল রেখায় থাকবে। মেরুদণ্ড সোজা না থাকলে কখন উচ্চ চিন্তন হয় না। যাদের কোমরে ব্যাথা আছে তাদেরকেও সোজা হয়ে বসতে হবে, দরকার হলে কোমরে বেল্ট বেঁধেও বসা যেতে পারে। *সংপ্রেক্ষ্য নাসিকাগ্রং স্বং দিশশ্চানবলোকয়ন্,* কোন দিকে দৃষ্টি থাকবে না, একমাত্র নাসিকার অগ্রে দৃষ্টি থাকবে। আচার্য শঙ্কর এইখানে বলছেন যে, এখানে নাকের অগ্রভাগকে দেখার কথা বলা হচ্ছে না। বলা হচ্ছে বাইরের জগৎ থেকে মনটাকে টেনে অন্তর্মুখী করতে। যদি নাকের ডগায় কেউ ধ্যান করে তাহলে মন ঐ নাকের ডগাতে কেন্দ্রীভূত হয়ে ঐখানেই আটকে থাকবে, কিন্তু যোগের উদ্দেশ্য হচ্ছে মনকে আত্মাতে একাগ্র করা। সেইজন্য শাস্ত্র কখনই বলতে পারেনা যে নাকের ডগাতে ধ্যান করতে হবে। অথচ ইদানিং অনেক ক্ষেত্রে দেখা যারা যোগ শিক্ষক তারা নাকের অগ্রভাগে দৃষ্টিকে নিবদ্ধ করতে বলে। শুধু তাই নয়, এরা আবার বিধান দেয়, এইখানে তাকিয়ে ধ্যান করলে এই হবে, অমুক জায়গায় দৃষ্টি নিবদ্ধ করে ধ্যান করলে তমুক হবে। এই ধরণের পদ্ধতি পুরোপুরি শাস্ত্র বিরোধী, শাস্ত্র না পড়ে কিছু এদিক ওদিক শুনে নিয়ে যোগ শিক্ষক হয়ে বোকাদের ধ্যান শেখাচ্ছে। বক্তব্য হচ্ছে বাইরের জগত থেকে মনটাকে গুটিয়ে ভেতরের দিকে অন্তর্মুখী করা।

**প্রশান্তাত্মা বিগতভীর্ব্রহ্মচারিব্রতে স্থিতঃ। মনঃ সংযম্য মচ্চিত্তো যুক্ত আসীত মৎপরঃ।।১৪।।**

*প্রশান্তাত্মা,* মনটাকে শান্ত করে, *বিগতভীঃ,* কোন ভয়ভীতি থাকবে না, ব্রহ্মচর্য ব্রত নিষ্টাপূর্বক পালন করে মনটাকে সংযত করে যোগাভ্যাস করবে। মনটা কোথায় থাকবে? বলছেন *মৎ-চিত্তঃ* আর *মৎপরঃ,* আমাতে মনটাকে একাগ্র করতে হবে। শঙ্কর এই *মৎপরঃ* শব্দের উপর খুব সুন্দর ব্যাখ্যা করে বলছেন যে, সাধারণ বিষয়ী লোক যদি স্ত্রী প্রেমিক হয়, তখন তার স্ত্রীর প্রতি তার চিত্তটা লেগে থাকে, চিত্তটা স্ত্রীচিত্ত হয়ে যায়। এমনকি যে খুব কামুক লোক, তার মনটা সব সময় স্ত্রীর প্রতি পড়ে আছে। তখন তাকে কি বলবে? স্ত্রীচিত্ত, সে কিন্তু *মচ্চিত্তঃ* নয়। কিন্তু সেও ভালো করে জানে যে, দেশের রাজা আমার স্ত্রীর থেকে বেশি ক্ষমতাশালী। বা সে যদি শিবভক্ত হয় তখন সেও জানে যে, ভগবান শিব তার স্ত্রীর থেকে বেশি ক্ষমতাবান। কিন্তু যে ঠিক ঠিক ভক্ত, সেই ভক্তের চিত্ত পুরোপুরি আমাতে মানে ভগবানেই পড়ে থাকে। ভক্তের কাছে সবচেয়ে বড় কে? আমি শ্রীকৃষ্ণ। যে ভোগী তার চিত্ত থাকে একটা ভোগের জিনিষে আর সে শ্রেষ্ঠ মনে করে আরেকটা জিনিষকে। কিন্তু যে প্রকৃত ভক্ত, তার চিত্তটা যাঁর কাছে থাকে তাঁকেই সে মহৎ বলে, শ্রেষ্ঠ বলে জানে। সে কে? ভগবান। আমাদের মন একেক সময় একেক জিনিষে ছোপান থাকে, কখন প্রমোশনের রঙে, কখন

প্রেমিকার রঙে আবার অন্য সময় অন্য কিছুর রঙে। ভক্তের ভালোবাসা আর শক্তির বোধ একটাই রঙে ছোপান থাকে, সেই রঙ হচ্ছে ঈশ্বরের রঙ, ভক্ত জানে ঈশ্বরই সব, ঈশ্বরের উপরে আরে কেউ নেই। আমাদের কাছে ঠাকুর হচ্ছে পরমপুরুষ, কিন্তু চিত্তটা ঠাকুরে না গিয়ে একেক সময় একেক জায়গাতে পড়ে থাকে। যারা আরও সাধারণ তাদের চিত্তটা আরও চারটে জিনিষে পড়ে থাকে আর তাদের কাছে পরঃ মানে শ্রেষ্ঠ হচ্ছে কোন নেতা বা ফিল্মস্টার, ভগবানে এদের বিশ্বাস নেই। পরের শ্লোকে বলছেন –

**যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী নিয়তমানসঃ। শান্তিং নির্বাণপরমাং মৎসংস্থামধিগচ্ছতি।।১৫।।**

এই ধরণের যোগীরা যোগাভ্যাস করে করে মনটাকে যখন পুরো নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসেন, তখনই সে শান্তি পায়, তখনই নির্বাণ লাভ করে। এই দুটো জিনিষ আমার নিয়ন্ত্রণে থাকে, সেইজন্য যখন নির্বাণ পেয়ে যায় তখন সে আমার স্থানও পেয়ে যায়। আমার যে স্থান সেইটাই ঠিক ঠিক শান্তির স্থান।

গীতার প্রত্যেক অধ্যায়ে কিছু না কিছু তত্ত্ব কথা আছে। গীতার মূল কথা গুলো আমাদের আলোচনা করা হয়ে গেছে, এখন একই কথা অনেকবার ঘুরে ফিরে আলোচনার মধ্যে চলে আসবে। শঙ্করাচার্য বলছেন, মানুষের বুদ্ধি অতি সাধারণ তাই ভগবান লোককল্যাণের জন্য, মানুষ যাতে ধারণা করতে পারে তাই একই কথা বার বার বলছেন। এখন বলছেন যিনি যোগী হতে চাইছেন তাঁকে কি কি করতে হবে –

**নাত্যশ্নতস্তু যোগোঽস্তি ন চৈকান্তমনশ্নতঃ। ন চাতিস্বপ্নশীলস্য জাগ্রতো নৈব চার্জুন।।১৬।।**

যোগী হতে গেলে প্রথমে তাঁর খাওয়া, ঘুমনো, জাগা সব কিছুকে নিয়মিত করতে হবে। খুব বেশিও খাবে না আর একেবারেই কিছু না খেয়ে থাকাটাও যোগীর পক্ষে কখনই উচিত নয়। ঘুমনোটাও ঠিক সেই ভাবে, খুব বেশি ঘুমোবে না আবার সারাক্ষণ জেগে থাকাটাও ঠিক না। যোগী কতটা খাওয়ার গ্রহণ করবে এই ব্যাপারে আচার্য শঙ্কর বলছেন, পেটে যতটা খালি জায়গা আছে তার অর্দ্ধ ভাগ খাদ্য দিয়ে পূরণ করতে হবে, চার ভাগের এক ভাগ জল দিয়ে ভরতে হবে, আর বাকি অংশ বায়ু চলাচলের জন্য রাখতে হয়। যোগীদের পেট সব সময় হাল্কা রাখতে হয়। সপ্তদশ অধ্যায়ে ভগবান আলোচনা করবেন যোগী কি ধরণের খাবার খাবেন যাতে শরীরটাও হাল্কা থাকবে আবার শক্তিরও ঘাটতি হবে না। এরপর বলছেন –

**যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্মসু। যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা।।১৭।।**

যাঁরা আধ্যাত্মিক পুরুষ তাঁদের সব কিছুই যুক্ত, যুক্ত বলতে আচার্য বলছেন, নিয়ত পরিমাণ, সব কিছু মেপে ও নিয়মিত। আহার, কথা বলা, হাঁটাচলা, পরিশ্রম করা সবটাই পরিমিত, কোনটাই অতিরিক্ত নয়। যারা সব সময় কাজে কর্মে মেতে থাকে, প্রচুর খাওয়া-দাওয়া করছে, ভোজনবিলাসী, সারাক্ষণ বকবক করে যাচ্ছে, এদের দ্বারা যোগী হওয়া কখনই সম্ভব নয়। খাওয়া-দাওয়া একদিন বেশি করে নিলেই শরীর গোলমাল করতে শুরু করবে, আবার সময়ে খাওয়া-দাওয়া করা, খাওয়ার সময় যদি অতিক্রম করে যায় তাহলে ভালো হয় সেদিন না খাওয়া। যোগীর ঘুমোতে যাওয়াটাও নিয়মিত, জেগে থাকাটাও নিয়মিত। এই ভাবে যখন যুক্ত হয়ে যে যোগ হয় তখন এই যোগে সব দুঃখ নাশ হয়ে যায়। কিসের দুঃখ নাশ হয়? সংসারের দুঃখ, শঙ্করাচার্য আগেও বলেছেন যে এই সংসার হচ্ছে দুঃখময়, সংসারই দুঃখের উৎপত্তি। আমাদের দুঃখের শেষ নেই কারণ আমরা কোন ব্যাপারেই, খাওয়া-দাওয়া, বিশ্রাম, কথাবার্তা, ঘোরা-ফেরা কোন কিছুই যুক্ত হয়ে করিনা। আবার গর্ব করে বলি আমি যেটাতে লেগে আছি সেটাতেই লেগে থাকি, এখানে কিন্তু সেটাতেই লেগে থাকতে বলা হচ্ছে না। সব কিছুই নিয়মিত করতে হবে। যখন কাজ করা হবে, একটা সময় গিয়ে আমাকে থেমে যেতে হবে, তারপর অন্য একটা, সেখান থেকে আরেকটা সব কিছুই সুনিয়ন্ত্রিত আর সুনিয়মিত ভাবে করতে হবে। অনিয়ন্ত্রিত আর অসংযত জীবন যাপনে যারা অভ্যস্ত তারা কখনই যোগী হতে পারেনা। যোগী হওয়ার জন্য জীবন পরিচর্যার সব কিছুকে গভীর ভাবে সুনিয়ন্ত্রিত করতে হবে।

**যদা বিনিয়তং চিত্তমাত্মন্যেবাবতিষ্ঠতে। নিঃস্পৃহঃ সর্বকামেভ্যো যুক্ত ইত্যুচ্যতে তদা।।১৮।।**

কামনা রহিত মন, মানে যার মন সমস্ত কামনা থেকে মুক্ত, তখন সেই মন বিশেষ ভাবে একাগ্র হয়ে যায়, অর্থাৎ বাইরের চিন্তাগুলো থেকে নিজেকে টেনে এনে গুটিয়ে নিয়ে ভেতরে ঢুকে গেল। মন একাগ্র হলেই যোগী হয়ে যাবে না, যারা অসুর তাদেরও মন একাগ্র হয়, যারা টিভিতে ভারত পাকিস্থানের ক্রিকেট ম্যাচ দেখছে তাদেরও মন একাগ্র থাকে। যোগীর একাগ্র মন আর এই ধরণের একাগ্রতার মধ্যে তফাৎ কোথায়? বলছেন, এদের বাইরের জাগতিক জিনিষের প্রতি মন একাগ্র আর যোগীর মন অন্তর্জগতের গতি প্রকৃতি, যে গতি প্রকৃতিতে সমস্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপি অনুসৃত হয়ে চলেছে তার উপর একাগ্র। যোগীর যখন জগতের সব কিছুর

থেকে তৃষ্ণা চলে যায়, ছড়ান মনকে সব কিছু থেকে কুড়িয়ে ভেতরে নিয়ে আসেন তখন তাঁর মন সমাধিস্থ হয়ে যায়। ঐ মন যখন সমাধিস্থ হয় তখন কি রকম হয়?

**যথা দীপো নিবাতস্থো নেঙ্গতে সোপমা স্মৃতা। যোগিনো যতচিত্তস্য যুঞ্জতো যোগমাত্মনঃ।।১৯।।**

বাতাস বিবর্জিত স্থানে যদি একটা প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখা হয় তখন প্রদীপের শিখার দিকে তাকালে দেখা যায় প্রদীপের শিখা একটুও কম্পিত হয় না, স্থির হয়ে থাকে। বাতাসে প্রদীপের শিখাটা নড়ে কেন? প্রদীপের মধ্যে তেল আছে আর সলতে আছে। তেলটা হচ্ছে তরল পদার্থ, আর ক্যাবিলারি প্রথায় সলতে তেলটাকে টানতে থাকে। এখন সলতেতে আগুন দিলে সেই আগুনের তাপে প্রদীপের তেলটা গ্যাসে রূপান্তরিত হয়ে যায়, ঐ গ্যাসটা সলতের আগুনের সংস্পর্শে এসে জ্বলতে থাকে বলে প্রদীপের শিখাটা তৈরী হয়। গ্যাস মানে বায়বীয় পদার্থ, গ্যাস আর বাতাস একই। এখন ঘরে যে বাতাস বইছে, সেই বাতাসের মলিক্যুলস্ গুলি গ্যাসের মলিক্যুলসকে ধাক্কা মারতে থাকলে প্রদীপের শিখাটা নড়তে থাকে। এই কারণেই প্রদীপের শিখাটা কম্পিত হয়। আগুনের তাপে তেল যখন গ্যাসে রূপান্তরিত হচ্ছে তখন গ্যাসের কয়েকটা মলিক্যুলস্ পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়, কয়েকটা মলিক্যুলস্ পালিয়ে যাচ্ছে বলেই আমরা প্রদীপের গন্ধে বুঝতে পারে এটা ঘিয়ের প্রদীপ, এটা কেরোসিনের প্রদীপ। কি করে বুঝতে পারছি? কিছু পার্টিকেলস্ যে পালিয়ে যাচ্ছে তাদের গন্ধ থেকেই আমরা বুঝতে পারি কোনটা ঘিয়ের প্রদীপ আর কোনটা কেরোসিনের প্রদীপ। পেট্রোল ডিজেলের গাড়ি থেকে যে ধোঁয়া বেরোয়, আসলে এগুলোই হচ্ছে যে গ্যাসটা জ্বলছে না সেই গ্যাসেরই না জ্বলা পার্টিকেলস্। গ্যাস পার্টিকেলস্ যদি না পুড়তে পারে তখন ধোঁয়া হয়ে বেরোয়। একটা গাড়ির ক্ষমতা এই ভাবেই দেখা হয়, যে গাড়ির ইঞ্জিন পুরো গ্যাসকে পুড়িয়ে দিতে পারে সেই গাড়ির ক্ষমতা সব থেকে বেশি। কিন্তু পুরো গ্যাসকে পুড়িয়ে দেওয়া অসম্ভব।

ঘরে যদি পাখা চলতে থাকে তখন প্রদীপের শিখা নিবু নিবু হয়ে যায়। কারণ তখন হাওয়ার মলিক্যুলস্ গুলি চলতে চলতে প্রদীপের তেলের মলিক্যুলস্ গুলিকে ধাক্কা মারছে, তখন শিখাটা নড়ে ওঠে। এই কারণে হ্যারিকেনের আলোর চারপাশে একটা কাঁচ দিয়ে দেওয়া হয়, তখন বাতাস আর সরাসরি এসে আঘাত করতে পারবে না, হ্যারিকেনের আলোটা স্থির থাকে। আমরা যখন ধ্যান করতে বসি তখন এই মনকে নিয়েই ধ্যান করতে হবে। মনটা হচ্ছে জড় পদার্থ, আর জগতের যা কিছু আছে সবই জড়। এই জড় পদার্থ মনকে সব সময় ধাক্কা মারছে, আর তাতেই মন চঞ্চল হয়ে ওঠে। কিন্তু ধ্যানে মনটাকে এমন ভাবে সব কিছু থেকে গুটিয়ে নেওয়া হয়েছে যে জাগতিক যা কিছু আছে মনের কাছে পৌঁছাতেই পারছে না, যার ফলে মনটা স্থির হয়ে যায়। প্রদীপের আলোটাও গ্যাস আর বাতাসটাও গ্যাস, গ্যাস যখন গ্যাসকে ধাক্কা মারছে তখন শিখাটা চঞ্চল হয়ে ওঠে। প্রদীপের শিখার এই চাঞ্চল্যকে কিভাবে আটকানো যাবে? বাইরের বাতাসকে প্রদীপের শিখার কাছে আসতে না দিলেই সে আর চঞ্চল হবে না। ঠিক একই ব্যাপার হয় মনকে সমাহিত করার ক্ষেত্রে। মনটাও জড় আর বাইরে যা আছে সেটাও জড়, চোখ, কান, নাক সব সময় জড় পদার্থ ছেড়েই যাচ্ছে, আর এগুলো গিয়ে মনকে ধাক্কা মারছে, আর মনও চঞ্চল হয়ে উঠছে। মন যখন চঞ্চল হয়ে গেল তখন সেই মনকে আর অন্তরের দিকে ফেরান যাবে না। ফেরানোর উপায় কি? বাইরের থেকে যেগুলো ধাক্কা মারছে ঐ ধাক্কা মারাটাকে আটকে দেওয়া। আটকে দিলে জাগতিক বস্তু সমূহের যে প্রবাহ চলছিল সেটা থেমে যাবে। যেই থেমে যাবে তখন মন আর চঞ্চল হবে না।

যোগীর মন সমাধি অবস্থায় প্রদীপের নিবাত শিখার মত স্থির হয়ে যায়, পরমাত্মার দিকে তখন মন চলে যায়, পরমাত্মাতেই মন স্থিত হয়। এই যে বার বার জিতেন্দ্রিয় বলা হচ্ছে, জিতেন্দ্রিয় শব্দের প্রকৃত অর্থ হচ্ছে জগৎ থেকে মনটাকে সরান। জগৎ থেকে যদি মন না সরান হয় তাহলে কিন্তু মন চঞ্চল থাকবে। মন চঞ্চল মানে বাতাসের মধ্যে মনটা পড়ে রইল। ঠাকুর এই জন্যই বলছেন নির্জন বাস, নির্জনে একান্তে কিছু দিন সাধনা করে মনকে স্থির করতে হয়। সংসারে থেকে মনকে স্থির করতে চেষ্টা করা খুবই দুঃসাধ্য। সংসারে প্রতি মুহুর্তে কিছু না কিছু বিঘ্ন লেগেই থাকে, এই সব বিঘ্নতেই মনের সাম্য ভাব নষ্ট হয়ে বসে। এখানে আচার্য বলছেন যোগীর নিরুদ্ধ চিত্ত সবিকল্প সমাধিতে নিষ্কম্প দীপশিখার মত স্থির হয়ে যায়। যোগীর নিরুদ্ধ মনের অবস্থা এই নিষ্কম্প দীপশিখার সাথে তুলনা করে বোঝান হল।

**যত্রোপরমতে চিত্তং নিরুদ্ধং যোগসেবয়া। যত্র চৈবাত্মনাত্মানং পশ্যন্নাত্মনি তুষ্যতি।।২০।।**

মনকে এই ভাবে সব কিছু থেকে সরিয়ে আনার পর মন যখন সমস্ত বৃত্তিশূন্য হয়ে যায়, তখন যোগীর ভেতরে পরমজ্যোতির দর্শন হয়। পরমজ্যোতি হচ্ছে চৈতন্যের আলো, এটা এই জাগতিক আলো নয়। কিন্তু সব সময়ই যে জ্যোতি দর্শনই হবে তা নয়, বিভিন্ন যোগীর দর্শনের অভিজ্ঞতা ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে।

আল্ গাজালী বলে একজন খুব নামকরা মুসলিম দার্শনিক পণ্ডিত ছিলেন, তিনি কয়েক বছর সুফি সাধনাও করেছিলেন। সাধক যখন সাধনা করে জ্যোতি দর্শন করে তখন তার আসলে কি রকম দর্শন ও অনুভূতি হয়, এর উপর তাঁর অনেক বর্ণনা আছে।

সেখানে তিনি বলছেন যে, মাঝে মাঝে জোনাকির আলোর মত ঝিকমিক করে ওঠে, তবে এই টুনি লাইটের আলোর কথা বলা হচ্ছে না। এই জ্যোতির আলোটা একেবারেই আলাদা, যাদের দর্শন হয় তারাই বোধ করতে পারেন, যাদের জ্যোতি দর্শন হয়নি তাদের পক্ষে এর ধারণা করাটা একটা কাল্পনিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে। এই জ্যোতির ভেতরে অনেক রকমের রঙ ও বৈচিত্র্য খেলা করে। অনেক সময় দেখেন যে নিজের শরীরটাই জ্যোতির্ময় হয়ে গেছে। আবার কখন দেখেন পুরো জগতটাই জ্যোতির্ময় হয়ে গেছে। এই জ্যোতিটাও চৈতন্য সত্তার একটা রূপ। তবে এই জ্যোতি দর্শনের দিকে বেশি মন দিতে নেই, কারণ এই জ্যোতি দর্শনই সব কিছু নয়। এতে মন দিলে এইখানেই আটকে থাকতে হবে।

*পশ্যন্নাত্মনি*, আত্মাকে দেখেন জ্যোতিঃস্বরূপ, আচার্য শঙ্কর নিজের তরফ থেকে এখানে কিছু মন্তব্য যোগ করেছেন, এই হচ্ছে সাধারণ পণ্ডিত আর আচার্যের তফাৎ। সাধারণ পণ্ডিত নিজের তরফ থেকে এই ধরণের কথা লিখতে পারবে না। ঠাকুর বলছেন শঙ্করাচার্য হচ্ছেন অবতার, অবতার জানেন যোগীরা ঠিক কি দেখতে পান। মানুষ যখন সমাধি অবস্থায় নিজের আত্মাকে দর্শন করে, দর্শন করে যখন সে পরমতুষ্টি লাভ করে, তখন সেই অবস্থায় মানুষ আত্মাকে কি রূপে দেখে? শঙ্করাচার্য বলছেন, পরমজ্যোতিঃ স্বরূপ দেখে। এই পরমজ্যোতি দর্শনের পর কি হয়?

**সুখমাত্যন্তিকং যত্তদ্ বুদ্ধিগ্রাহ্যমতীন্দ্রিয়ম্। বেত্তি যত্র ন চৈবায়ং স্থিতশ্চলতি তত্ত্বতঃ।।২১।।**

যোগী এই অবস্থায় আত্যন্তিক সুখ লাভ করেন। ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যত রকমের সুখ লাভ হয় সেই সুখের সাথে এই সুখের কোন তুলনাই করা যায় না, বলছেন *সুখমাত্যন্তিকং*, আত্যন্তিক সুখ লাভ, যে সুখের সাথে অন্য কোন সুখের তুলনাই করা যায় না। এই পরমজ্যোতি দর্শন লাভের পর তার সব কিছু স্থির হয়ে যায়, জাগতিক কোন কিছুতেই সে আর বিচলিত হয় না। এখানে একটা জিনিষ স্পষ্ট করে বুঝতে হবে যে, যার ঈশ্বর জ্ঞান বা আত্মজ্ঞান হয়ে গেছে, তাদের জাগতিক বস্তু থেকে সুখের অনুভব বা দুঃখ অনুভব চলে যাবে না। তাকে যদি মিষ্টি খেতে দেওয়া হয় তার মিষ্টি খেতে কি ভালো লাগবে না? খুবই ভালো লাগবে। কিন্তু ঈশ্বর দর্শনে তার যে আনন্দ হয় সেই আনন্দ এত বিশাল, এই আনন্দের কাছে জাগতিক সুখটা এতই নগণ্য যে, এইগুলোর দিকে তার আর মন যায় না। ঠাকুর সেইজন্য দুটো কথা বলছেন। একটা কথা হচ্ছে – ব্রহ্মজ্ঞান হয়ে যাওয়ার পর তিলোত্তমা-রম্ভার মত সুন্দরীকে চিতাভস্ম মনে হয়। তার মানে এই নয় যে তিলোত্তমার মত রূপকে তিনি হেয় জ্ঞান করছে, এইখানে আমরা অনেকে ভুল বুঝে থাকি। ঠাকুর এখানে হেয় জ্ঞানের কথা বলছেন না, চিতাভস্ম বলা মানে তাৎপর্য শূন্য। আরেকটি কথা হচ্ছে – মিছরির পানা খাওয়ার পর চিটে গুড়ের পানা আর খেতে ইচ্ছে করে না। যাকে সারা জীবন ফেনা ভাতে চিনি দিয়ে পায়সে বলে খাওয়ান হয়েছে, তাকে যদি বেলুড় মঠের পায়েস একবার খাওয়ান হয় সেকি আর ফেনা ভাতের পায়েস খেতে চাইবে, তার আর ফেনা ভাতের পায়েস মুখেই উঠবে না। ফেনা ভাতের পায়েস যে ত্যাজ্য হবে তা নয়, ত্যাজ্য গ্রাহ্য কোনটাই আর তখন হবে না। এইটাই এইখানে ভগবান অর্জুনকে বলছেন –

**যং লব্ধা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ। যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে।।২২।।**

ভগবানকে সে পেয়ে গেছে এখন জগৎ তার কাছে ত্যাজ্য গ্রাহ্য কোনটাই হবে না, তার কাছ থেকে জগতের তাৎপর্য হারিয়ে গেছে। এই অবস্থায় একবার পৌঁছে গেলে *গুরণাপি বিচাল্যতে*, যত দুঃসহ ব্যাথাই হোক না কেন, কোন ব্যাথাই তাকে আর কাবু করতে পারেনা। এ্যাডুইন এ্যালড্রিচ যখন মহাকাশ যানে করে চন্দ্রাভিযানে প্রায় চাঁদের কাছে চলে গিয়েছিল, সেইখান থেকে একটিবার পৃথিবীর দিকে তাকিয়েছে। মহাকাশ থেকে পৃথিবীকে নীল রঙের দেখায় এইজন্য পৃথিবীর নামই হচ্ছে Blue Planet, পৃথিবী থেকে চাঁদকে যত বড় দেখায় চাঁদ থেকে পৃথিবী তার ছয় গুণ বড় দেখায়। ঐ দৃশ্য দেখার পর এ্যডুইন পৃথিবীতে ফিরে আসার পর তার আর কোন দৃশ্যই ভালো লাগেনা। পরে মাথাটাই খারাপ হয়ে গিয়েছিল। তিন চারটে বিয়ে হয়েছিল, আর সব বিয়েই ডিভোর্স হয়ে গিয়েছিল। তার স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে পেতে অনেক বছর লেগে গিয়েছিল। ঐ সৌন্দর্য দেখার পর সব কিছুই তার কাছে অর্থহীন হয়ে গিয়েছিল। যখন বিরাট কিছু অনুভব হয়ে যায় তখন ছোট বড় সবটাই সমান হয়ে যায় তার কাছে। আধ্যাত্মিক পুরুষ হচ্ছেন আত্মারাম, তার জন্য সে যে পাগল হয়ে যাবে, মাতাল হয়ে যাবে তা হবে না। কিন্তু এইটাই হয়।

যারা খুব depression এ ভোগে, জীবন খুব দুঃখ-কষ্টে ভারাক্রান্ত, তারা যদি জীবনে কোনও ভাবে একটা বিরাট কিছু উন্নতি করে ফেলে তাহলে তার হতাশা ভাবটা কেটে গিয়ে সব অশান্তি গুলো মিটে যায়। যারা জীবনে শান্তি পেতে চায় তাহলে প্রথমেই তাদের জীবনে বড় একটা কিছু কাজে সাফল্য লাভ করতে হবে। একবার বড় কিছু করে যদি উপরে উঠে যায়, তারপর যদি নেমেও যায়, সেই নেমে যাওয়াটাকে যদি গ্রহণ করে নিতে পারে, তখন তার সবটাই সমান মনে হবে, কে তার প্রশংসা করল, কে নিন্দা করল, ওতে আর সে বিচলিত হবে না। কোন ভক্ত যদি দুঃখ কষ্টে কাতর হয়ে মহারাজদের কাছে আসে, তাকে মহারাজরা বলেন – খুব করে ঠাকুরের নাম কর। এখন সে যদি কথা মত ঠাকুরের নাম করতে থাকে, আর এই ভাবে যদি তিন চার বছর ধরে

এমনকি সাত বছর ধরে করতে থাকে তখন তার কাছে জগৎটা একেবারে তুচ্ছ হয়ে যাবে। অন্য দিকে যাদের ভক্তি নেই তারা জাগতিক কাজ করে করে যদি বড় কিছু একটা করে ফেলতে পারে করে তাহলে তারও সব কিছু ঠিক হয়ে যায়। জাগতিক ক্ষেত্রে বড় কিছু করতে হলে তাকে অনেক লড়াই, সংগ্রাম ও ঝামেলার মধ্য দিয়ে এগোতে হয়, কিন্তু আধ্যাত্মিক জগতে ভক্তির দিকে গেলে শান্তি অনেক বেশি পাওয়া যায়। আধ্যাত্মিক জগতে প্রতিযোগিতার কিছু নেই, ঠাকুরের নাম জপ, ধ্যানে প্রতিযোগিতামূলক কিছু থাকে না। জাগতিক ক্ষেত্রে উপরের দিকে যেতে হলে অনেক প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যে দিয়ে যেতে হয়।

মূল কথা কিন্তু থেকে যাচ্ছে, *যং লব্ধ্বা,* এই শব্দটি খুব মূল্যবান। *যং লব্ধ্বা,* যেটা লাভ করার পরে, অন্য যা কিছু লাভ হবে সেটা কিছুই নয়, আর যেটা ঘাটতি হবে সেটাও কিছু নয়। সমুদ্র থেকে এক বালতি জল নিয়ে নিলে সমুদ্রের কিছুই হয় না। আমাদের জীবনে এত দুঃখ-কষ্ট কেন? কারণ আমরা জীবনে কোন ক্ষেত্রেই কোন উন্নতি করে দেখাতে পারিনি, না জাগতিক ক্ষেত্রে না পারমার্থিক ক্ষেত্রে। আমাদের বেশির ভাগই তালগোলের বাজারে যে কোন একটা চাকরি যোগাড় করে নিই, এ ছাড়া আর কোন achievement নেই। ফলে কেউ একটু গালাগাল দিলে ভেঙ্গে পড়ছি, কেউ একটু প্রশংসা করে দিলে সঙ্গে সঙ্গে ফুলে উঠছি।

যদি শান্তি চাও মা, তাহলে কি করতে হবে? জীবনে কিছু উপলব্ধি করে দেখাও। কি উপলব্ধি করবে সেটার কোন গুরুত্ব নেই, উন্নতি যদি না করতে পার তাহলে সারা জীবন আকুল হয়ে হেঁদিয়ে হেঁদিয়ে কাঁদতে হবে। শ্রীমা অন্নপূর্ণা দেবীর মাকে বলেছিলেন – যদি শান্তি চাও মা, তাহলে কারুর দোষ দেখনা। কেন তাকে মা এই কথা বলেছিলেন? সে মহিলা সব কিছুতে দোষ দেখত, মহা খুঁতখুঁতে ছিল, সবার নিন্দা করত আর সবার সাথেই ঝগড়া করত, এটাই ঐ মহিলার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ছিল। শ্রীমা ওকে সাবধান করে এই শেষ কথাটা বলে গেছেন। কবীর দাসেরও এই রকম একটি দোঁহা আছে, আমি যখন চারিদিকে বাজে কিছু খুঁজতে গেলাম কোথাও বাজে কিছু পেলাম না, যখন নিজের হৃদয়ে খুঁজতে গেলাম তখন দেখি আমারই হৃদয়ে বাজে জিনিষকে খুঁজে পেলাম। মানে কারুর দোষ দেখতে নেই, যদি শান্তি পেতে চাও তাহলে দোষ দেখবে নিজের। কিন্তু শ্রীমা জীবনের শেষ এই কথাটা বলেছিলেন বিশেষ একজনের উদ্দেশ্যে, আর এইটাই হয়ে গেল যে শ্রীমার শেষ চরম বাণী। শ্রীমা ঠিকই বলেছিলেন, আর এটাই আমাদের জীবন-বাণী।

কিন্তু গীতা বলছে জীবনে যদি শান্তি পেতে চাও উপলব্ধি কর, উপলব্ধি না থাকলে কিছুই হবে না। জাগতিক জীবনে ও আধ্যাত্মিক জীবনে কিছু একটা করে দেখাও। এটাই গীতার বাণী, এটাই স্বামীজীর বাণী, এটাই শাস্ত্রের বাণী। একবার উপলব্ধি কর, একবার উপলব্ধি করে নিয়ে স্বামীজী যখন আমেরিকা ঘুরে এলেন তখন সমস্ত জগৎ তাঁর পায়ে এসে লুটিয়ে পড়ল। এখন স্বামীজীকে কে মানছে আর কে মানছে না তাতে তাঁর ভারী বয়ে গেছে। ঠাকুরের প্রশংসা যখন করা হচ্ছিল তখন ঠাকুর বলছেন – এর আগে কত বড় সাধুরা, পণ্ডিতরা আমার নামে কত কি বলে গেল আর এখন একজন ডাক্তারি করে আরেকজন থেটারি করে এরা এসেছে আমাকে অবতার সাজাতে। আধ্যাত্মিক উপলব্ধি একবার হয়ে গেলে প্রশংসা, নিন্দা, সম্মান, অপমান এগুলো সব খেলো মনে হয়।

পুরো গীতা এই কথাই বলছে উপলব্ধি কর, প্রথমে কর্মের দ্বারা উপলব্ধি কর তারপর সর্বোচ্চ উপলব্ধি হবে যখন ঈশ্বরোপলব্ধি হবে। কারণ জাগতিক যে কোন উপলব্ধির সাথে ঈশ্বরোপলব্ধির কোন তুলনাই হয় না, জাগতিক উপলব্ধিকে যদি এক ইউনিট ধরা হয় সেখানে ঈশ্বরোপলব্ধি লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি ইউনিটে চলে যাবে। তাই এইখানে আমি যদি বিল গেটসের মত ধনী হয়ে যাই তাতে কিছুই আসবে যাবে না। কিন্তু ঈশ্বোরপলব্ধি করতে হলে জগতে আগে আমাকে কিছু করে দেখাতে হবে। আমরা বেশির ভাগই হচ্ছি কুমড়ো কাটা বট্‌ঠাকুর। কোন কাজ করবে না, খাটবে না, সারাক্ষণ বসে বসে তামাক খাবে আর মেয়েদের কুমড়ো কাটতে নেই বলে কখন সখন রান্না ঘরে গিয়ে কুমড়োটা কেটে দিয়ে আসতে হয়। জগতে আগে খাটতে হবে, খেটে আগে নিজেকে কিছু একটা করে জগতকে দেখাতে হবে, আর তাতে নিজেও তৃপ্তি অনুভব করবে। তারপর গিয়ে আধ্যাত্মিক পথে এগোনর জন্য খাটা শুরু করতে হবে। জাগতিক কাজে যে কোন দক্ষতা ও পারদর্শিতা অর্জন করতে পারেনি, আধ্যাত্মিক জগতে সে এক পাও এগোতে পারবে না, তার জন্য আধ্যাত্মিক জীবন নয়। আগে জগতের মাঝখানে দাঁড়িয়ে তোমার ক্ষমতা অর্জন করার জন্য খাটতে হবে। সেই খাটনিটাই খাটা হল না আধ্যাত্মিক জীবনে চলা শুরু করবে কিভাবে!

*যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে,* আচার্য বলছেন, *যং লব্ধ্বা চাপরে,* সেই অবস্থা লাভ হলে তোমার উপর যদি কেউ তলোয়ার চালিয়ে দেয় তাতেও তোমার কোন আঘাতজনিত কষ্ট বা ব্যাথা অনুভব হবে না। স্বামীজী আলেকজাণ্ডার আর এক ভারতীয় যোগী সাধুর কাহিনী বলে বলছেন, এগুলো সত্যিকারের এই রকমই হয়। ঠাকুরও বলছেন, ঐ অবস্থায় যার হাত কেটে দর্‌দর্‌ রক্ত পড়ছে সে তখন বলছে, কই আমার তো কিছু হয়নি। এগুলো কোন বইয়ের কথা নয়, এই রকমই হয়, একেবারে আক্ষরিক সত্য। তাঁকে যদি মহারাজা বানিয়ে দেওয়া হয় তাতেও তাঁর কোন রকম ভিন্ন অনুভূতি হবে না আবার তাকে যদি ধরে জেলে পুরে দেন তাতেও তাঁর কিছুই এসে যাবে না। হাত কেটে গেলে চিকিৎসা করাবেন কিন্তু *ন বিচাল্যতে,* মন বিচলিত হবে না।

**তং বিদ্যাদ্দুঃখসংযোগবিয়োগং যোগসংজ্ঞিতম্। স নিশ্চয়েন যোক্তব্যো যোগোঽনির্বিণ্ণচেতসা।।২৩।।**

যোগের এই অবস্থাটা হচ্ছে দুঃখ-সংযোগের বিয়োগরূপ অবস্থা। কি সুন্দর গভীর ব্যঞ্জনা, মনের যে জায়গাটাতে গিয়ে লেগে দুঃখের মিলন হয় সেই জায়গাটাকে কেটে উড়িয়ে আলাদা করে দেওয়া হল। রেলের ইঞ্জিনের সাথে কোচগুলোকে কাপ্লিং এর সাহায্যে আটকে রাখা হয়। এখন কাপ্লিংটা যদি খুলে দেওয়া হয় ইঞ্জিন বেরিয়ে চলে যাবে, কোচগুলো এক সময় চলতে চলতে থেমে যাবে। দুঃখ-সংযোগের এই কাপলিংটা যেই খুলে যাবে জগৎটা এক জায়গাতে থেমে গিয়ে থমকে পড়ে থাকবে, ইঞ্জিন নিজের মত বেরিয়ে চলে যাবে। কোচগুলো হচ্ছে জগৎ। *যোগোঽনির্বিণ্ণচেতসা*, নির্বিণ্ন হচ্ছে, কখন শান্ত নয়, সব সময় ছটফট্ করছে, *অনির্বিণ্ন* হচ্ছে এর উল্টো, তার সব ছটফটানি বন্ধ হয়ে গেছে। যোগ সাধনা করার সময়ও বলবে না যে, আর কত দিনে হবে, দু' বছর তো জপ করলাম। লেগে আছে, যোগ সাধনাতে এসে গেছ, এখন তো আর কিছু করার নেই, তাই এতেই লেগে থাকে। এই ভাব নিয়ে নির্বেদশূন্য হয়ে অধ্যবসায় সহকারে এই দুঃখ-সংযোগের আত্যন্তিক নিবৃত্তির অভ্যাস করতে হবে। তারপর বলছেন –

**সংকল্পপ্রভবান্ কামান্ ত্যক্ত্বা সর্বানশেষতঃ। মনসৈবেন্দ্রিয়গ্রামং বিনিয়ম্য সমন্ততঃ।।২৪।।**

এখন যোগের যে অবস্থার বর্ণনা করা হচ্ছে, এই অবস্থায় এখানে কিন্তু আর কোন কর্ম চলছে না। আমরা মেনে নিয়েছি যে যোগীর কথা এখানে বলা হচ্ছে, তিনি জীবনে অনেক কাজ করে নিয়েছেন, অনেক কাজ করার পর তিনি কর্মফলের আসক্তি ত্যাগ করেই কাজ করেছেন, ফলাসক্তি শূন্য হয়ে কাজ করার পর ঈশ্বরে সব ফল সমর্পণ করে কাজ করেছেন, সব শেষে তিনি মননশীল হয়েছেন। যখনই সুযোগ পাচ্ছেন তখনই চিন্তা করছেন আমি কে, আমি কোথা থেকে এলাম, এবার তিনি নেমে পড়েছেন ধ্যানে। প্রথমে হচ্ছে প্রচণ্ড ভাবে কাজের মধ্যে থাকবে। যখন ব্রহ্মচারীরা মঠে যোগ দেয় তখন তারা এমন কাজের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়বে যে মঠের সেক্রেটারীরাও কোমড় ধরেও কাজ থেকে তাদের আটকাতে পারেন না। হয়তো একটা কোন কাজ তার করার কথা নয়, একবার তার কানে যাওয়ার অপেক্ষা যে কাজটা করার কেউ নেই, একবার কানে যেতেই সে যে অবস্থাতেই থাকুক না কেন সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ে কাজটা করে দেবে। এইভাবে কাজ করে করে সব কাজে পুরো পারদর্শিতা চলে আসে। সেইখান থেকে একটা সময়, বিশেষ করে ব্রহ্মচারী থেকে যখন সন্ন্যাস হয়ে যায়, কাজের প্রতি এই প্রচণ্ড স্পৃহাটা কমতে থাকে, তারপর আর কোন কাজ তাকে আকর্ষণ করে না। এর পরের অবস্থা হচ্ছে যা কিছু কাজ করছে তখন সবই ঠাকুরের কাজ, যেমন যেমন কাজ আসছে পুরো নিষ্ঠা নিয়ে করে দিচ্ছে। এর পরেই আসে ভক্তি। এই ভক্তি এসে গেলে তখন কি হবে ? *সংকল্পপ্রভবান্ কামান্*, কোন ধরণের সংকল্প তার আসবেই না। সংকল্প মানে, মানুষ যখনই কোন কাজ করার কথা ভাবে, যেমন এখানে আমরা শাস্ত্র আলোচনা করছি, এই কাজটা এখন সংকল্পের মধ্যে পড়ে না, কিন্তু প্রথম যখন আমরা ঠিক করেছিলাম যে আমি শাস্ত্র কথা শুনতে যাব তখন সংকল্প ছিল, কিন্তু এখন এই কাজটা রুটিনের মধ্যে এসে গেছে। এখানে গীতাতে সব সংকল্পের কথা বলা হচ্ছে, যিনি যোগী তাঁর সব সংকল্পগুলি চলে গেছে, কারণ তাঁর সব কিছু করা হয়ে গেছে। কিন্তু অমুক বাড়িতে নেমন্তন্ন খেতে যাব, অমুক সিনেমাটা দেখতে যাব, অমুক হোটেলের পার্টিতে যাব, বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা মারব, এই ধরণের সংকল্প গুলি পুরোপুরি চলে যায়। কর্তব্য হিসেবে যেটা এসে যাবে সেই কাজটা করে দেবেন, কিন্তু নিজে আগে থেকে প্ল্যান করে কিছু করতে যাবেন না। অনেক দিন বেড়াতে যাইনি চল একটু গোয়া ঘুরে আসি, এই ধরণের সংকল্প যোগী কখনই করবেন না।

তারপরে বলছেন – *মনসৈবেন্দ্রিয়গ্রামং*, *ইন্দ্রিয়গ্রামং* মানে, ইন্দ্রিয় সমূহ, চোখ, কান, নাক ইত্যাদি, এই ইন্দ্রিয় সমূহ সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে এসে গেছে। কার দ্বারা ইন্দ্রিয় সমূহকে নিয়ন্ত্রিত করা হয়েছে? মনের দ্বারা ইন্দ্রিয়কে পুরো বশে নিয়ে আসা হয়েছে। ইন্দ্রিয়কে বশে রাখা মানে চোখকে অন্ধ করে দেওয়া, কানের মধ্যে গরম সিসে ঢেলে দেওয়া নয়, সব কটা ইন্দ্রিয়কেই প্রচণ্ড সতেজ ও সক্রিয় রাখতে হবে, কিন্তু মনের দ্বারা এই শক্তিশালী ইন্দ্রিয়গুলোর লাগামকে ধরে রাখতে বলা হচ্ছে। এরপর বলছেন –

**শনৈঃ শনৈরুপরমেদ্ বুদ্ধ্যা ধৃতিগৃহীতয়া। আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ।।২৫।।**

ধীরে ধীরে মনটাকে বুদ্ধি দিয়ে ভেতরে টেনে নিয়ে আসতে হয়। এইটাই হচ্ছে যোগের ঠিক ঠিক পথ। বেশির ভাগ সাধক যোগ সাধনায় নেমে তাড়াহুড়ো লাগিয়ে দেয়, দুদিনেই যেন নির্বিকল্প সমাধি হয়ে যাবে। কিন্তু না, গীতা বলছে *শনৈঃ শনৈঃ*, ধীরে ধীরে। ধীরে ধীরে কিভাবে মনটাকে ভেতরে নিয়ে আসবে? *বুদ্ধ্যা ধৃতিগৃহীতয়া*, বলছেন বুদ্ধিটাকে খুব ধৈর্যের সঙ্গে টেনে ধরে থাকতে হবে। যদি আমি ছেড়ে দিই তাও যোগ হবে না, যদি তড়বড় করি তাও যোগ হবে না। মনটাকে সব সময় *আত্মসংস্থম্* করে রাখতে হবে। *আত্মসংস্থমের* ব্যাপারে আচার্য বলছেন – যা কিছু আছে আত্মা ছাড়া কিছু নেই। আমি কিসের জন্য প্রলুব্ধ হব? মানুষ কখন প্রলুব্ধ হয়? যখন দেখে এটা আমার থেকে আলাদা, আর যেটা আমার কাছে নেই। কিন্তু সবটাই তো আত্মা, কাকে আলাদা দেখব, আত্মা ছাড়া তো আর কিছু নেই, তাই আমি কিসে প্রলুব্ধ হব, প্রলুব্ধ হওয়ার তো কিছুই নেই। এই বোধ যখন হয়ে গেল তখনই সে *আত্মসংস্থম্*, তখন তাঁর আর কোন দিকেই মন যায় না, যাবেও না।

আমাদের খুব ভালো করে জেনে নেওয়া দরকার যে গীতা, উপনিষদের সব তত্ত্ব বোঝা আমাদের পক্ষে সত্যিই খুব কঠিন, ক্ষুদ্র বুদ্ধি দিয়ে ধারণা করা প্রায় অসম্ভব। আমরা যদি মনে করে থাকি যে কিছুই বুঝতে পারছি না, ধারণা করতে পারছি না, এটা দোষের কিছু নয়। কিন্তু আমাদের দীর্ঘকাল ধরে গীতার আলোচনা শুনতে শুনতে আর নিয়মিত গীতার স্বাধ্যায় করতে করতে একটা সময় বুঝতেও পারব আর ধারণা করার দুর্লভ সৌভাগ্যও আমাদের হবে। গীতার যে কোন শ্লোকের অর্থ খাপছাড়া ভাবে করলে অর্থ স্পষ্ট হবে না, যতক্ষণ না সামগ্রিক ভাবে সেই শ্লোকের অর্থকে ব্যাখ্যা না করা হবে ততক্ষণ অর্থ স্পষ্টিকরণ হবে না। একট দুটো শ্লোকের অর্থ আলাদা করে বুঝে নেবার পর মনে হবে খুব ভালো করে বুঝে নিয়েছি, কিন্তু যখন পুরো অধ্যায়টাকে নিয়ে পড়তে যাওয়া হবে তখন সেই শ্লোকের অর্থ করতে গিয়ে গোলমাল হয়ে যাবে। কারণ, একটা শ্লোকের অর্থ আরেকটা শ্লোকের সঙ্গে মেলাতে গিয়ে অর্থটা অন্য রকম হয়ে যাচ্ছে দেখে গোলমাল হয়ে যায়। সেইজন্য গীতার অর্থ ধারণা না করতে পারাটা আশ্চর্যের কিছু নয়। যারা দিনরাত পড়াশোনা নিয়ে আছেন, শাস্ত্র চর্চা করছেন তাদেরই গোলমাল হয়ে যায়। কিন্তু যে ভাবেই হোক গীতা অধ্যয়ণ আর অনুধ্যান করার চেষ্টাটা আমাদের চালিয়ে যেতে হবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়ের চব্বিশ নং এই শ্লোকটি খুবই উল্লেখনীয়। এখানে ভগবান বলছেন – *সংকল্পপ্রভবান কামান্*, এখানে বলা হচ্ছে যে কোন সংকল্প কামনা থেকে উৎপন্ন হয়। ঋষি আর সাধারণ মানুষের পার্থক্য এই শ্লোকেই পরিষ্কার করে দিচ্ছে। শ্রীশ্রীমা আর একজন সাধারণ মহিলা পার্থক্য হচ্ছে এই *সংকল্পপ্রভবান কামান্*। শ্রীশ্রীমা খাওয়া-দাওয়া করছেন, জামা কাপড় পড়ছেন, তীর্থে যাচ্ছেন সবই করছেন, শ্রীরামকৃষ্ণও সবই করছেন, আমরাও এই একই জিনিষ করছি, তাহলে আমি আর শ্রীরামকৃষ্ণ কি এক হয়ে যাব? এখানে কামনা বলতে একেবারে ভোগের কথা বলা হচ্ছে, যেটাকে সমাজে খারাপ দৃষ্টিতে দেখা হয়। যাঁরা মহাপুরুষ হন তাঁদের যে কামনাগুলো হয়, সেই কামনার পেছনে কোন সংকল্প থাকে না, সংকল্পের বদলে ধর্ম থাকে। আমরা সবাই কখন না কখন তীর্থে যাই। তীর্থ করতে আমরা যখন যাই, বেশির ভাগ সময় আমরা হুজুগে যাই, আরও অনেকে যাচ্ছে আমিও যাব। কিংবা, অনেকদিন বাইরে কোথাও যাইনি চল কোথাও ঘুরে আসা যাক। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে আমরা এই মনোভাব নিয়েই তীর্থে যাই। এই বয়সে গোয়াতে যেতে নেই, সবাই বীচে গিয়ে নাচ করে, তার চেয়ে বরং হরিদ্বারে যাওয়া যাক। এই কামনা গুলো কিসের? এই কামনা গুলো হচ্ছে *সংকল্পপ্রভবান্*, আমি সংকল্প করেছি এই কামনা পূরণ করব, এমনকি ভালো কাজেও, তীর্থাদিতেও সংকল্প করা আছে। ঠাকুরও তীর্থে গেলেন। এখন যদি প্রশ্ন করা হয় ঠাকুর কেন তীর্থে গেলেন? দেখি অন্য জায়গার লোকেরা কিভাবে ভগবানের আরাধনা করছেন, ঈশ্বর অন্য এক রূপে আরাধিত হচ্ছেন, সেই রূপটা দেখে আসি, ওখানে আগে আগে অনেক মুনি ঋষিরা তপস্যা করেছিলেন, তাই সেখানকার ভাবই আলাদা, এই তীর্থে ভগবান লীলা করেছিলেন, সেই লীলা তরঙ্গের ভাব এখনও শুদ্ধ মনের ভেতর সেখানে অনুরণিত হয়। আমাদেরও এই ভাব নিয়ে তীর্থে যাওয়া উচিৎ।

এর থেকে আরেকটু নীচে হল, আমার ছেলের খুব অসুখ করেছে, এখন আমি মানত করেছি যে আমার ছেলে যদি ভালো হয়ে যায় আমি কালীঘাটে গিয়ে পূজো দেব। ছেলে ভালো হয়ে যাওয়ার পর অনেকদিন পরে আমার মনে পড়ল যে আমার একটা মানত ছিল। তখন আমি কালীঘাটে গিয়ে পূজো দিলাম। কালীঘাটে যাওয়াটা যখন হচ্ছে তখন এই যাওয়াটা সংকল্প থেকে হচ্ছে না, এটা ঠিক ঠিক ধর্ম কার্য, আমার মনের সংকল্প থেকে এটা উৎপন্ন হয়নি। অথবা আমি ঠিক করলাম আমি অমরনাথ যাব। কেন যাব ঠিক করলাম? শুনেছি অমরনাথের শিব হচ্ছেন সাক্ষাৎ। স্বামীজীও অমরনাথ গিয়েছিলেন। সেইজন্য আমারও মনে হয়েছে অমরনাথে গিয়ে একবার সাক্ষাৎ শিবের দর্শন করে আসি। এই যে আমি অমরনাথ গিয়ে শিবের দর্শন করব, এইটা কিন্তু সংকল্পের জন্য জন্ম হয়নি, ধর্মের জন্য এই কামনাটা এসেছে।

অগস্ত্য মুনি ঠিক করলেন আমি বিয়ে করব। কিন্তু অগস্ত্য মুনির বিয়ে করার কোন ইচ্ছে ছিল না। কেন বিয়ে করলেন? অগস্ত্য মুনির পূর্বজরা তাঁকে বললেন, তোমার যদি সন্তান না হয় তাহলে আমরা নরক থেকে উদ্ধার পাবো না। পূর্বজদের জন্য অগস্ত্য মুনি তারপর লোপমুদ্রাকে বিয়ে করলেন, ওনার নিজস্ব কোন সংকল্প ছিল না। আমাদের ক্ষেত্রে, আমরা সকাল থেকে রাতে ঘুমোতে যাওয়া পর্যন্ত যা কিছু করছি, সব কাজের পেছনে একটা সংকল্প থাকবেই। কিন্তু আধ্যাত্মিক জীবন যাপন যদি করতে চাই তাহলে কোন কাজেই সংকল্প থাকবে না। যদি এটা কর্তব্য বলে মনে হয়, এটা আমার কর্তব্য, তখন সেই কাজটা করবে, কিন্তু সংকল্পের জন্য করবে না। অনাসক্ত ভাবে কর্ম করা আর সংকল্প ত্যাগ এই দুটো একই। আমার এমন এক পরিস্থিতি হয়ে গেছে যার জন্য আমাকে অফিসে চাকরি নিতে হয়েছে। অফিসে গিয়ে সকালে অফিসারকে গুডমর্নিং করতে হয়, খুব ভালো কথা। প্রথম সাক্ষাতে এইভাবে সম্বোধন করাই উচিৎ, এতে ব্যক্তিত্বের বিকাশ হয়। কিন্তু মাথায় আমার রয়েছে রোজ যদি সাহেবকে গুডমর্নিং বলা যায় তাহলে প্রমোশনের সময় কাজে লাগবে। তখনই কিন্তু সংকল্প হয়ে গেল, তার মানে আমার ভেতরে গোলমাল আছে।

*মনসৈবেন্দ্রিয়গ্রামং*, গ্রাম মানে হচ্ছে সমূহ, যেমন অনেক বাড়ির সমূহ নিয়ে একটা গ্রাম হয়, এখানেও ইন্দ্রিয়াদি না বলে বলছে ইন্দ্রিয়গ্রাম, আমাদের মনে যেন পুরো একটা গ্রামের পত্তন হয়ে আছে। এমনিতে ইন্দ্রিয়গ্রাম মানে ইন্দ্রিয় সমুদয়, কিন্তু

ইন্দ্রিয়ের প্রভাব ও ক্ষমতার বিশালত্বকে ধারণা করার জন্য ইন্দ্রিয়গ্রাম বলছেন। এখন কিভাবে ইন্দ্রিয়ের এই বিশাল ব্যপ্তিকে আটকানো যাবে? চোখটাকে অন্ধ করে দিতে হবে? কানে সিসা ঢেলে দেবো? নাকের মধ্যে এ্যাসিড ঢেলে দেব? না, তোমাকে এগুলো কিছুই করতে হবে না। তাহলে কি করব? এর পরের শ্লোকে ভগবান বলছেন কি করবে। ২৫ নং শ্লোকটাই হচ্ছে সাধনা, এবং একমাত্র এইটাই সাধনা – *শনৈঃ শনৈরুপরমেদ্ বুদ্ধ্যা ধৃতিগৃহিতয়া। আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ।*

যারা সত্যি সত্যি আধ্যাত্মিক উন্নতি চান, তারা এই শ্লোকটাকে মুখস্ত করে নিয়ে আর সকাল থেকে রাত পর্যন্ত এটাকেই অনুশীলন করে যেতে হবে, এইভাবে পাঁচ বছর পর কি দশ বছর অনুশীলন করার পর তাদের আধ্যাত্মিক উন্নতি হতে বাধ্য।

*শনৈঃ শনৈঃ উপরমেৎ*, আধ্যাত্মিক জগতে তাড়াহুড়ো করে কিছু হয় না। প্রথম কথা আমি যে অবস্থায় আছি সেই অবস্থা থেকে আমাকে নিজেকে টেনে ওঠাতে হবে। এখন গাছকে তুলে অন্য জায়গায় নিয়ে যাওয়ার সময় দুম্ করে শেকড় শুদ্ধু টেনে তুলতে গেলে কিন্তু এর মধ্যে অনেক কিছুর গোলমাল হতে পারে, হয়তো শেকড়টাই মাটির ভেতরে থেকে যাবে আর গাছের কাণ্ডটা হাতে চলে আসবে। কিভাবে আমি নিজেকে তুলব? *শনৈঃ শনৈঃ উপরমেৎ* ধীরে ধীরে বাইরের যে ইন্দ্রিয় জগৎ রয়েছে সেইখান থেকে আস্তে করে মনটাকে টেনে নিয়ে আসতে হবে, *উপরমেৎ* মানে টেনে আনা। হুটহাট্ করে তাড়াহুড়ো করে কিছু করতে নেই। যে প্রচুর খেতে ভালোবাসে, সে একদিন গীতার ক্লাশ শুনে নিয়ে ঠিক করল কাল থেকে আমি আর ভালো মন্দ খাওয়া দাওয়া করব না, তাহলে কিন্তু তার সর্বনাশ হয়ে যাবে। বলা হচ্ছে *শনৈঃ শনৈঃ*, যেখানে আগে প্রত্যেক দিন মাংস বিরিয়ানি খেতাম, এবার থেকে সপ্তাহে একদিন কি দু'দিন খাবো, যেখানে প্রচুর খেতাম সেখানে একটু কম খাব। ইন্দ্রিয়ে গুলিকে এই ভাবে সব কিছু থেকে আস্তে আস্তে টেনে নিয়ে আসতে হবে। আর কি দিয়ে এটাকে টানতে হবে? *বুদ্ধ্যা*, মানে বুদ্ধি দিয়ে, বিবেক দিয়ে টানতে হবে। আর ধৃতি, দিনের পর দিন বুদ্ধির পেছনে লেগে থাকতে হবে। লেগে থাকতে থাকতে বুদ্ধিটা প্রবল হয়ে যাবে। প্রথমে বলছেন, যা কিছুই সংযত করবে ধীরে ধীরে, তারপর সেটার সাথে বুদ্ধি ও বিবেককে আঠার মত লাগিয়ে রাখতে হবে, বুদ্ধি ও বিবেক থাকলেই হবে না, লেগে থাকার অদম্য মনোভাব থাকতে হবে, যেটাকে বলা হচ্ছে ধৃতি। এইভাবে যদি ইন্দ্রিয়ের রাশ না টানা যায় তাহলে ঐ দুদিন তিন দিন ছেড়ে থাকবে, তারপর আবার ছাড়া পেলে ইন্দ্রিয় গুলো ভোগের মধ্যে আগের থেকে আরও বেশি শক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে। আমরা যে কথায় কথায় বলি নিজে না বুঝে থাকলে তাকে কে বোঝাবে। এই কথাটাই এখানে বলা হচ্ছে, তবে অন্য ভাষায় বলা হচ্ছে। বুদ্ধি দিয়ে টেনে না নিয়ে এলে দুদিন পরেই ছেড়ে পালাবে।

আর বলছেন, *আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা*, পুরো জিনিষটাকে টেনে নিয়ে মনটাকে আত্মাতে বসাতে হয়। আচার্য শঙ্কর এখানে ব্যাখ্যা করে বলছেন – যাবতীয় যা কিছু আছে সবই আত্মা। তাহলে আমি কিসের জন্য ছুটে মরছি? সবই তো ঠাকুরেরই একেকটি রূপ, তাহলে একে কেন ভালোবাসছি, ওকে কেন কম ভালোবাসতে যাব, তাকে কেন ঘৃণা করতে যাব। যদি একজনকে বেশি ভালোবাসছি, আরেকজনকে এড়িয়ে যাচ্ছি, তার মানে সবার মধ্যে ঠাকুরের রূপ দেখতে পাচ্ছি না। এই ভাবেই আমাদের বিচারকে ক্ষুরধার করতে হবে। তাই এইসব শ্লোক সাধারণ বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষের জন্য নয়। সাধারণ মানুষ সমদৃষ্টিকে ধরে রাখতে পারবে না, তাই তাদের বলা হয় যতটা পার সবার প্রতি সমদৃষ্টি রাখ। এইসব শ্লোক হচ্ছে তাদেরই জন্য যারা পুরোপুরি আধ্যাত্মিক জীবনে নামতে চাইছে। তাই বুদ্ধি দিয়ে বিচার করে দেখতে হবে কোথায় কোথায় আমার দুর্বলতা আছে। আমার সকালে ঘুম ভাঙতে চায় না, সেখান থেকেই আগে শুরু করতে হবে। ঘুম ভাঙার পড়ে ঘরদোর পরিষ্কার করতে ইচ্ছে করে না। তারপর জপ করতে বসলেই মনের যা অবস্থা হয়, গুরু বলে দিয়েছেন তাই বসতে হয় বলে বসি। কেন আমি বেশি ঘুমোতে চাইছি, আসলে আমার মস্তিষ্কের মধ্যে অলসতা বাসা বেঁধে আছে, আলস্য ভাব আমাকে ধরে রেখেছে। কেন আমি কাজ করতে চাইছি না, আমার পেশীগুলো শ্লথ হয়ে গেছে তাই কাজ করতে চাইছে না। কেন জপ করতে বসে ছটফট করি, কারণ মন ঠাকুরের প্রতি কাতর হতে চায়না। সবটাই গোলমাল হয়ে আছে। আর যারা প্রচুর খাওয়া দাওয়া করতে ভালোবাসে, ভালো দামী জামা কাপড় পড়তে ভালোবাসে, বাজার হাট, সিনেমা, পার্টিতে যেতে ভালোবাসে তাদের কথা এখানে বলা হচ্ছে না, আমরা ধরেই নিয়েছি যারা এই আধ্যাত্মিক পথে আসতে চাইছেন তাদের মধ্যে এই জিনিষগুলো একেবারেই নেই। কারণ বাইরের এই ধরণের সমস্যাগুলোকে সমাপ্ত করে দেওয়াটা কিছুই না, এগুলোকে ঠিক করা খুব সহজ, কালকে যেই পেট খারাপ হয়ে যাবে, ব্লাড সুগার হয়ে যাবে আপনার ভালো মন্দ খাওয়া বন্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু মন হচ্ছে আপনার সম্পদ, মনকে নিয়েই আমাকে চলতে হবে, তাই মনের সমস্যাটাই হল আসল সমস্যা। মনের এই সমস্যা অত সহজে মিটে যাবে না।

তখন আমি নিজেকে একটা নিয়মের মধ্যে বেঁধে ফেলব। সাড়ে সাতটার আগে আমার কোন দিন ঘুম ভাঙতে চায় না। আমি ঠিক করে ফেললাম কাল সকাল সাতটার মধ্যে উঠবই উঠব। সাতটার মধ্যে ওঠাটা যেই অভ্যেসে দাঁড়িয়ে যাবে, তখন ঠিক করলাম কাল থেকে ছটা পঞ্চাশের মধ্যে উঠব। আবার এক মাস পরে ছটা পয়তাল্লিশ। তখন আস্তে আস্তে মন শক্ত হতে শুরু হয়। এইভাবে যখন আমি ছটা পনেরোতে নিয়ে এলাম, তারপর হঠাৎ পরের দিন মন বিক্ষুব্ধ হয়ে সাড়ে সাতটায় উঠতে বাধ্য করে দিল। ঠিক আছে

একদিন করেছ তো কি হয়েছে। তারপরের দিন থেকে আবার টেনে নিয়ে আসতে হবে, *শনৈঃ শনৈঃ*। বেশি জোরাজুরি করলে মন বিগড়ে গিয়ে উল্টে ফেলে দেবে। বেশির ভাগই যারা আধ্যাত্মিক জীবনে আসে পাগল হয়ে যায় নয়তো মনের মধ্যে প্রচণ্ড বিতৃষ্ণা এসে যায়। সেইজন্য প্রথম থেকেই বেশি করে কিছু করতে নেই, অল্প অল্প করে মনের সঙ্গে সমঝোতা করে করে এগোতে হবে। আচার্য শঙ্কর এর সাথে যোগ করেছেন যে, মনের মধ্যে সব সময় এই বিচার আনতে হবে যে যা কিছু আছে সবটাই আত্মা, আত্মাই আছেন, আর কিছু নেই। আমরা যারা আত্মা সম্বন্ধে ধারণা করতে পারিনা, তারা ভাববেন সবটাই তো ঠাকুরের, ঠাকুর ছাড়া আর কি আছে। অথবা, এগুলো তো সবই অনিত্য, ভোগের মধ্যে কি আছে, কেন আমি এই সব ভোগের পেছনে দৌড়াব, আমার এসব কিছুই লাগবে না। ঠাকুরও বলছেন – সব সময় নিত্য অনিত্যের বিচার করে চলতে হবে।

এখানে কিন্তু সব কিছু থেকে মনটাকে একেবারে তুলে নিতে বলা হচ্ছে না, মনটাকে সব জায়গা থেকে আস্তে আস্তে গুটিয়ে এনে একটা জায়গাতে রাখার কথা বলা হচ্ছে। এই সব ক্ষেত্রে তাই অনেক সন্ন্যাসীদের সমস্যা হয়ে যায়। সন্ন্যাসীর স্ত্রী নেই, সন্তান নেই, সংসার নেই, মনতো তাঁর স্বাভাবিক ভাবেই সেখান থেকে উঠে থাকবে, কিন্তু তারপরেও যদি মনটাকে একটা জায়গাতে না রাখতে পারে তখন এসে যায় অনেক রকমের সমস্যা। সন্ন্যাসীর তো এখন কিছুই করার নেই, কিন্তু সারাদিন সে করবেটা কি। এখন সে যদি মনটাকে একটা জায়গাতে না রাখে তখন মাথাটা খারাপ হয়ে যাবে। তার কারণ হচ্ছে এই শ্লোকের দ্বিতীয় লাইনটা, *আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা*, তোমার মনকে যদি *আত্মসংস্থং* না কর, আত্মাতে যদি না রাখতে পার তাহলে তোমার মাথাটি খারপ হয়ে যাবে। তোমার তো সংসারকে ছেড়ে দেওয়া হয়ে গেছে, ছেড়ে দিয়ে তো তুমি শূন্যে ভেসে থাকতে পারবে না। এতদিন তুমি একটা গাছের ডালকে ধরে রেখেছিলে, এখন তুমি সেই ডাল থেকে হাতটা ছেড়ে দিয়েছ অন্য ডালকে ধরার জন্য, ছেড়ে দিয়ে এখন বলছ আমি এই ডাল ধরব না। এখন তোমার কি হবে? তোমার পতন হয়ে যাবে। এই দুটো এক সঙ্গে চলে, একদিকে ত্যাগ আর অন্য দিকে একটা জিনিষকে ধরা। যদি ঈশ্বরকে না ধরা হয়, আত্মাকে যদি না ধরা হয় তাহলেই গোলমাল শুরু হয়ে যাবে। বেশির ভাগ ভক্তদের এই কারণে গোলমাল হয়। ভক্তরা প্রথমে সব বন্ধ করে দেবে, বিয়ে বাড়ি যাওয়া, বন্ধু বান্ধবদের সাথে গল্প কর, সব বন্ধ করে হাতে এত সময় এসে যায় তখন এত সময় নিয়ে সে কি করবে ভেবে পায়না। বই পড়তে বললে বলবে, সব বই পড়া হয়ে গেছে। অথচ কোন বইয়ের ধারণাই এখনও করে উঠতে পারেনি। বই গুলো পড়ে যে ধারণা করবে তার জন্য যে বুদ্ধির দরকার সেই বুদ্ধিই এখনও তৈরী হয়নি। বুদ্ধি কোথা থেকে হবে? আত্মজ্ঞানে যদি নিজের বুদ্ধিকে নিবেশিত করে তবেই তো তার বুদ্ধি হবে। *আত্মসংস্থং* যখন হয়ে গেছে, মানে যা কিছু আছে আত্মাই আছেন, ঠাকুরই সব, এই বুদ্ধিতে মনকে লাগিয়ে রেখেছি, আর ইন্দ্রিয় সুখের পেছনে আমি আর দৌড়াব না, এরপর কি করবে?

**যতো যতো নিশ্চরতি মনশ্চঞ্চলমস্থিরম্। ততস্ততো নিয়ম্যৈতদাত্মন্যেব বশং নয়েৎ।।২৬।।**

মনকে এখন স্থির করে দেওয়া হয়েছে, তার মানে এই নয় ইন্দ্রিয়গুলো সব বশে চলে এসেছে। সুযোগ পেলেই আবার ইন্দ্রিয় তার বিষয়ের দিকে দৌড়ে যাবে। চোখ সব সময় ভালো জিনিষকে দেখতে চায়, কান সব সময় ভালো জিনিষ শুনতে চায়। তখন সে ইন্দ্রিয়কে বুঝিয়ে দেয়, যে জিনিষটাকে তুমি ভালো বলছ, এটা কিন্তু আত্মার স্বরূপ নয়, এটা জাগতিক জিনিষ, সারা জগৎ এতেই মেতে থাকে, ওদিকে তুমি যেও না। মন আর ইন্দ্রিয় এত চঞ্চল যে সব সময় পালিয়ে যেতে চেষ্টা করবে, তখন একে বুঝিয়ে বাঝিয়ে বলতে হয়, মন এই রকমটি করো না। নতুবা অল্প কিছু সময়ের জন্য মন আর ইন্দ্রিয়কে তাদের বিষয় গুলোকে দেখিয়ে নিয়ে ফেরত চলে আসতে হয়।

আমাদের হিন্দু শাস্ত্র মতে ইন্দ্রিয় গুলো হচ্ছে অক্টোপাসের মত। যেখানেই সুখের বা ভোগের জিনিষ পাবে দৌড়ে সেটাকে গিয়ে পেঁচিয়ে ধরবে। যোগী যিনি সাধনা করছেন, তিনি যখন দেখেন মন ইন্দ্রিয়ের সাথে দৌড়ে ভোগের জিনিষকে গপ্ করে ধরতে যাচ্ছে, যদি বুঝিয়ে বলতে যান – মন তুমি এসব কি করতে যাচ্ছ, এগুলো করোনা। মন তখন বিদ্রোহ করে যোগীকে উল্টে ফেলে দেবে। তাই যোগী তখন তাকে প্রথমে স্বরূপটাকে দেখিয়ে দেয়। তার মানে, ঠিক আছে যখন চাইছে একটু স্পর্শ করে নাও। ঠাকুর বলছেন, আমার মনেও ইচ্ছে হয়েছিল এই ভোগ কর সেই ভোগ কর। তখন ঠাকুর একটু করে ছুঁইয়ে দিয়ে মনকে বলে দিলেন মন তুই দেখতে চাইছিলি তো, এই দ্যাখ্ এরই নাম শাল, এই দ্যাখ্ এরই নাম গড়িগড়িতে তামাক খাওয়া। এই বলে সেইখানেই ফেলে দিয়ে থু থু করে চলে এলেন। একটু ছুঁইয়ে দিয়ে চলে এলেন, আর তৎক্ষণাৎ ত্যাগ। এইভাবে না করলে এগোন যায় না।

যারা নতুন সাধক, আমাদের মত, আমরা যদি পুরো ভোগে লিপ্ত হয়ে যাই, তাহলে সর্বনাশ হয়ে যাবে, আবার পুরোপুরি যদি ছেড়ে দিই তাহলেও সর্বনাশ। এইজন্য সাধু সন্ন্যাসীদের ভেতরে যে তীব্র সংগ্রাম ও লড়াই করতে হয় এই লড়াইটাকে বাইরের লোকেরা কিছুই বুঝতে পারবে না। এনাদের এই অভিযান যে অন্য ধরণের সেটাকে কিছুতেই ভক্তরাও বোঝেন না, আর যারা ভক্ত নয় তারাতো কিছুই বুঝতে পারে না, তারা সব সময় সাধু সন্ন্যাসীদের বুদ্ধ, যিশুর তুলনা টেনে গালমন্দ করবে। বুদ্ধ, যিশু, শ্রীরামকৃষ্ণ, এনারাতো শেষ অবস্থায় পৌঁছে গিয়েছিলেন, যোগীরা সেই জায়গাটাতে পৌঁছাবার জন্য লড়াই করে যাচ্ছেন। এই লড়াই

যে কি ভয়ঙ্কর, আর কি দুঃসাহসিক অভিযান সাধারণ মানুষ কল্পনাই করতে পারবে না। মঠের যাঁরা প্রাজ্ঞ সন্ন্যাসী তাঁরা এই জিনিষটাকে বোঝেন, কিন্তু অল্প বয়সী সন্ন্যাসীদের এই তীব্র লড়াইয়ের মধ্য দিয়েই এগোতে হয়। সংসারে থেকেও যারা আধ্যাত্মিক এই অভিযানে অংশ নিয়েছেন তাদের ক্ষেত্রেও এই একই পরিস্থিতি আসে। সংসারীদের মধ্যে যাদের ভোগ করা হয়ে গেছে, ভাল খাওয়া, ভাল পড়া, ভালো ঘোরা সবই যার হয়ে গেছে তাদের দ্বারা কেন যোগ হচ্ছে না? কারণ তাদের মনে এখনও প্রচুর অঙ্কট-বঙ্কট ভর্তি হয়ে আছে।

গীতার এই দুটো শ্লোককে মাথায় বসিয়ে নিয়ে যখন এইভাবে সাধনার পথে নামা হবে তখন সমস্যা গুলো ঠিক ঠিক বোঝা যায়, কোথায় কোথায় সমস্যা, দুর্বলতা রয়েছে দেখা যায়। এইভাবে সাধনা করে করে মন যখন শান্ত হয়ে যায় তখন কি হয় –

**প্রশান্তমনসং হ্যেনং যোগিনং সুখমুত্তমম্। উপৈতি শান্তরজসং ব্রহ্মভূতমকল্মষম্।।২৭।।**

এইভাবে মন যখন শান্ত হয়ে যায় তখন এই যোগীরা *অকল্মষম্* হয়ে যান, *অকল্মষম্* মানে নিষ্পাপ হয়ে যাওয়া। আসলে পাপ কর্ম কোন্ গুলো? ঠাকুরও খাচ্ছেন, একজন ভোগীও খাচ্ছেন, পার্থক্যটা কোথায়। আমরা কাউকে যোগী বলছি কাউকে লোভী বলছি কেন? একটা সংকল্প করে যখন কিছু করা হচ্ছে, যেমন আমি বলছি আজকে বিয়ে বাড়িতে খুব খাবো, এটাই সংকল্প হয়ে গেল, তার মানে আমি লোভী। আবার যখন আমি বলছি আমাকে সামাজিকতা রক্ষা করতে বিয়ে বাড়িতে যেতে হবে, বিয়ে বাড়িতে কিছু না খেলে নিমন্ত্রণ কর্তার অমঙ্গল হবে তাই একটু কিছু খেলাম, এখন আমি আর লোভী নয়, আমি তখন যোগী হয়ে গেলাম। সমস্ত কর্মের পেছনে যত সংকল্প গুলো আছে সব কটাকে নাশ করে দিয়ে শুধু যা কর্তব্য, যেটা ধর্ম সেই অনুসারে যে কাজ করছে তখনই সে যোগী হয়ে গেল। এর ফলে, যখন লোভ মোহ শোক সব চলে যাবে, তখন তার মন আস্তে আস্তে শান্ত হয়ে আসবে। এইভাবে মন যখন শান্ত হয়ে গেল তখন ব্রহ্মজ্ঞানে যে শান্তি সুখ হয়, সেই সুখপ্রাপ্তির জন্য প্রস্তুত হয়ে গেল।

**যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী বিগতকল্মষঃ। সুখেন ব্রহ্মসংস্পর্শমত্যন্তং সুখমশ্নুতে।।২৮।।**

*যুঞ্জন্নেবং*, যিনি চব্বিশ ঘন্টা মনকে সেই আত্মাতে যুক্ত করে রেখেছেন, সকাল বিকেল একশ আটবার জপ করা আধ্যাত্মিক জীবন নয়, যিনি চব্বিশ ঘন্টা লেগে আছেন, এক মিনিটেরও ফাঁক থাকবে না। বলতে পারেন, তাহলে যখন দেহের যে কর্মাদি করা হচ্ছে তখন কি করে হবে, দাঁত ব্রাশ করছি, স্নান করছি, শৌচাদি করছি। ভগবান পঞ্চম অধ্যায়ে এই ব্যাপারটাকে একটা শ্লোকে পেরিয়ে এসেছেন – *পশ্যন্ শৃণ্বন্ স্পৃশন্ জিঘ্রন্নশ্নন্ গচ্ছন্ স্বপন্ শ্বসন্*, মানে নিঃশ্বাস প্রশ্বাস পর্যন্ত যেটা নিচ্ছি, ঘুমোচ্ছি, তখন আমি দেখছি ইন্দ্রিয় গুলো যার যার নিজের কাজ করে যাচ্ছে, আমি তো ইন্দ্রিয়গুলো থেকে আলাদা। *প্রলপন্ বিসৃজন্ গৃহ্ণন্নুন্মিষন্নিমিষন্নপি*, কথা যখন বলছি, শৌচাদি যখন করছি, আমি যখন কিছু ধরছি, আর চোখের পাতা নাড়ছি, সবটাই ইন্দ্রিয় নিজের নিজের কাজ করে চলেছে, আমি এদের সঙ্গে যুক্ত নই, আমার সাথে ইন্দ্রিয়ের কোন সম্পর্ক নেই। এই হচ্ছে যোগের অবস্থা। আর ভোগের অবস্থায় হবে, আমার বিরিয়ানি চাই, আমার চাউমিন চাই, আমার এই চাই সেই চাই, তার মানে আমার যখন সংকল্প এসে গেলে এটা চাই ওটা চাই করে, তখন এগুলো কে করছে বলবে? তখন আর ইন্দ্রিয় কিছুই করছে না, আমিই সব করছি। আমি যদি কাউকে খুব ভালোবাসি আর তার দিকে যদি হাঁ করে তাকিয়ে থাকি, এবার ইন্দ্রিয় ইন্দ্রিয়ের কাজ করছে না, ইন্দ্রিয়ের মধ্যে আমি জড়িয়ে গেছে, সঙ্গে সংকল্প ঢুকে গেছে। আমি আর সংকল্প যখন ঢুকে গেল তখন এই কাজটা আর যোগ হবে না, তখন এটাই ভোগ হয়ে যাবে।

যখন কর্ম হচ্ছে তখন কর্মের যে ক্রিয়া হচ্ছে তা যোগ আর ভোগের ক্রিয়া, এই ক্ষেত্রে একই ভাবে হবে, কোন পার্থক্য নেই। একজন মহাভোগী আর ভগবান বুদ্ধের মত একজন মহাযোগীকে একসাথে দাঁড় করিয়ে দিলে দুজনের মধ্যে কোন তফাৎ পাওয়া যাবে না। তফাৎটা কোথায় থাকে? মাথায়। কিসের তফাৎ? একজনের সংকল্প আছে, আরেকজনের সংকল্প নেই, ব্যস্ হয়ে গেল, এইটুকুই পার্থক্য। অগস্ত্য মুনি লোপমুদ্রাকে বিয়ে করলেন। অনেক দিন পরে অগস্ত্য মুনি লোপমুদ্রাকে বলছেন, তোমাকে আমি বিয়ে করেছিলাম যাতে আমাদের সন্তান হয়, যাতে আমার পূর্বজরা নরক থেকে উদ্ধার হন। তাহলে তো আমাদের গৃহস্থ কর্ম করতে হবে। লোপমুদ্রা বলছেন, এর জন্যই তো আপনি আমাকে বিবাহ করেছিলেন, অবশ্যই গৃহস্থ কর্ম করবেন। এখানেও কিন্তু সেই ধরণের কোন সংকল্প নেই, নারীকে বিয়ে করার পরে যে গ্রহণ করছে, এটাই স্বাভাবিক, কিন্তু এখানেও কোন সংকল্প নেই, এটাই হচ্ছে উচ্চ অবস্থা। আমার এটা কর্তব্য, আমি করে দিলাম। কিন্তু এখন সব উল্টো, তুমি আমাকে বিয়ে কর না কর, সন্তান দাও না দাও, আমার ভালোবাসা চাই। এখন ভোগটাই চূড়ান্ত হয়ে গেছে, দুদিন পাঁচ দিন ভোগটা করে যে মিটিয়ে দিয়ে বেরিয়ে আসবে, তাও হয় না।

কিন্তু এই উচ্চ অবস্থায় যোগ আর শরীর ধারণের জন্য যেটুকু ভোগ করতে হয়, খাওয়া পড়া, শোওয়া, বসা সবটাই এক রকম। কিন্তু এখানে যোগ আর ভোগের তফাৎ হচ্ছে দৃষ্টিভঙ্গিতে। ভোগের ক্ষেত্রে সংকল্প থাকে যোগের ক্ষেত্রে সংকল্প থাকে না।

সংকল্পহীন যখন ক্রিয়া হয় তখন যোগ হয়ে যাবে আর সংকল্পযুক্ত ক্রিয়া হচ্ছে ভোগ। এই যে এতক্ষণ ধরে যে কথাগুলো বলা হল এতে কি হবে?

**সর্বভূতস্থমাত্মানং সর্বভূতানি চাত্মনি। ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্বত্র সমদর্শনঃ।।২৯।।**

যখন এই ভাবে কেউ সাধনা করতে থাকেন, তখন এর ফলে তাঁর একত্ব বোধ হয়ে যায়। একত্ব বোধ মানে, তিনি তখন দেখতে পান *সর্বভূতস্থমাত্মানং*, এখানে আচার্য শঙ্কর একটা খুব সুন্দর কথা প্রায়ই ব্যবহার করেন সেটা হচ্ছে, ব্রহ্মা থেকে শুরু করে খড়কুটো পর্যন্ত, যে খড়কুটো হচ্ছে সর্ব নিম্ন অবস্থা, এই ব্রহ্মা থেকে শুরু করে সর্ব নিম্ন অবস্থা একটা খড়কুটো পর্যন্ত তিনি আত্মা ছাড়া আর কিছুই দেখেন না। যখন এই ভাব তাঁর হয়ে যায় তখন তিনি একত্ব অনুভব করে *ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা,* যাঁর সমাধি অন্তঃকরণ, সমাহিতচিত্ত, যাঁর মন পুরো ভেতরের দিকে চলে এসেছে, আর বাইরের দিকে যাচ্ছে না, তখন *সর্বত্র সমদর্শনঃ,* সব জায়গাত তিনি সমান দেখেন। সমান মানে, সেই ভগবান, সেই আত্মাই সব কিছুতে অবস্থিত, বাইরের যা কিছু আকার আছে সেগুলো খোলস মাত্র।

বাড়িতে আমার যে পাঁচ বছরের বাচ্চা আছে, তাকে আমি খুব ভালোবাসি, এটাই স্বাভাবিক। আর বাচ্চার ঠাকুরমা তার ভালোবাসার তো কোন প্রশ্নই নেই। এখন এই বাচ্চাটি একটা মোচ লাগিয়ে, মাথায় পাগড়ি বেঁধে ডাকাতের মত সেজে একটা খেলনা পিস্তল নিয়ে এসে যদি বলে, নিকালো সব কুছ্। তখন কি আমি পুলিশে ফোন করতে যাব একে ধরিয়ে দেবার জন্য? না, দেখে আমি মজা পেয়ে আনন্দে বাচ্চাকে আদর করব? আমি যখন বুঝে নিয়েছি যে, এই যে ডাকাতের পোষাক পড়েছে, এই পোষাকের পেছনে আমার ছেলে, তখন কি আমার ভয়, হিংসা কিছু আসবে? কিছুই হবে না। যখন আমি বুঝে নেব জগতে যা কিছু আছে সবার মধ্যে ঠাকুরই আছেন, ঠাকুরই আলাদা আলাদা রূপে বিরাজ করে আছেন, তখন আমার কি অনুভব হবে? ঐ অবস্থায় পৌঁছালে এই একই অনুভব হয়, তখন দেখে এই মাইক্রোফোনে তাঁরই সত্তা, এই জলে তাঁরই সত্তা, সবার মধ্যে সেই সচ্চিদানন্দই বিরাজ করছেন। তখন সমত্ব ভাব এসে যায়, একজনকে বেশি ভালোবাসতে আরেকজনকে কম ভালোবাসতে যাবে না। ছবির এ্যলবামে আমার নাতির বিভিন্ন পোষাকে, বিভিন্ন সাজে অনেক ছবি আছে, আমি দেখছি আমার নাতিরই ছবি, কোন ছবিকে দেখে বলছি এই ছবিটাতে নাতিকে খুব সুন্দর দেখাচ্ছে, আরকটা ছবিতে রাগী রাগী লাগছে, অন্য একটা ছবিতে গোমড়া লাগছে। তাই বলে কি মনে হবে এই ছবিটা পুড়িয়ে ফেলি, ঐ ছবিটাকে ফেলে দিই। কখনই তা মনে হবে না। জগতে যত জীব আছে সবই সেই ঈশ্বরের বিভিন্ন রূপ, কোনটাই ফেলে দেওয়া যাবে না। যখন সব কিছুতেই ঈশ্বরীয় রূপকে দর্শন করে, তখন তার ভালো মন্দ বোধ চলে যায়। যোগীর মন যখন সমাহিত চিত্তে অবস্থান করেন, সমাধি লাভের পর তাঁরা সত্যি সত্যিই এইভাবেই জগৎকে দেখেন। ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে দেখছেন যে পাঁঠাকে বলি দেওয়া হবে সেও সচ্চিদানন্দ, খড়্গ সেটাও সচ্চিদানন্দ, হাড়িকাঠ, যেখানে বলি দেওয়া হবে সেটাও সচ্চিদানন্দ, যে বলি দিচ্ছে সেও সচ্চিদানন্দ, আর বলি দেওয়া হচ্ছে সেটাও সচ্চিদানন্দ। এই অবস্থায় ফল কি হয়?

**যো মাং পশ্যতি সর্বত্র সর্বং চ ময়ি পশ্যতি। তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি।।৩০।।**

তখন তিনি সব জায়গায় আমাকেই দেখেন আর সব কিছুতে আমাকেই দেখেন। আমার অভাব বোধ তার কখনই হয় না, তার মানে সে কখনই আমাকে ভুলে যায় না। উল্টো দিক দিয়ে আমিও তাকে কখন ভুলে থাকতে পারিনা। এই অবস্থাটা হচ্ছে নিজের আত্মস্বরূপের অবস্থা। এই অবস্থাতে সব কিছুতেই আমি ভগবানকেই দেখছি, তখন কি করে আমার নাশ হবে! তাই ভগবান বলছেন – *তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি,* সেও আমার অদৃশ্য হয় না, আমিও তার অদৃশ্য হই না। আর কি হচ্ছে?

**সর্বভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ। সর্বথা বর্তমানোহপি স যোগী ময়ি বর্ততে।।৩১।।**

যোগী যখন দেখে আমিই সব কিছুতে অবস্থান করছি, তখন *সর্বথা বর্তমানোহপি,* তাঁর সব রকমের ব্যবহার সব সময় আমাতে বিদ্যমান থেকেই হবে। যখন সর্বভূতে সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণকেই দেখছেন, শ্রীকৃষ্ণ ছাড়া আর কিছুই নেই, আর নিজের আত্মা রূপে অভেদ জ্ঞানে শ্রীকৃষ্ণের ভজনা করছেন, তখন তিনি শ্রীকৃষ্ণের সাথে এক হয়ে গেলেন। এটাই হচ্ছে সাযুয্য মুক্তি, তাঁর সাথে এক হয়ে যাওয়া। এতক্ষণ তাঁর যে অস্তিত্ব বোধ ছিল সেটা পুরোপুরি শ্রীকৃষ্ণের সাথে একীভূত হয়ে এক হয়ে গেল, আলাদা করে তাঁর আর কোন অস্তিত্ব থাকল না।

**আত্মৌপম্যেন সর্বত্র সমং পশ্যতি যোহর্জুন। সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ।।৩২।।**

*আত্মা উপম্ এন, আত্মৌপম্যেন,* মানে নিজের মধ্যে যখন সারা জগৎকে দেখে নিয়েছে, *সমং পশ্যতি যোহর্জুন,* নিজের মতই সবাইকে দেখে। তখন অপরের যেমন সুখ হবে তেমনই তারো সুখ হবে, যেমন অপরের দুঃখ হয় তেমন তারও দুঃখ হয়।

আমাকে কটূ কথা বললে আমার খারাপ লাগে, তাহলে আমিও কাউকে কটূ কথা বলতে পারবো না। কেউ যদি কখন আমাকে উপদেশ দেয় আমার ভালো লাগে না। তার মানে আমারও কাউকে বেশী উপদেশ দেওয়া ঠিক না। আমাকে কেউ যদি চিমটি কাটে আমার ব্যাথা লাগবে, সেইজন্য আমারও অপর কাউকে চিমটি কাটা ঠিক হবে না। আমাকে যদি কেউ ঠেস দিয়ে কথা বলে আমার ভালো লাগবে না, ঠিক তেমনি আমারও ঐ ভাবে কাউকে ঠেস দিয়ে কথা বলা উচিৎ নয়। আমি যেমনটি জগতের কাছ থেকে ব্যবহার চাইছি, ঠিক সেইরকমটি ব্যবহার আমাকে জগতের সাথে করতে হবে। এখানে কিন্তু এই কথা বলা হচ্ছে না, এখানে বলছেন যোগী দেখেন জগতের যা কিছু এটা আমরই রূপ, সেইজন্য যোগীর যেটা ভালো লাগছে না সেটা তিনি করবেনই না। কখন তাঁর চিন্তাতেও আসবে না যে আমি এই রকমটি করি।

হিংসা ভাব যে কত সূক্ষ্ম ভাবে করা হয় আমরা চিন্তাই করতে পারিনা। আমার সাথে তুমি দুর্ব্যবহার করেছ, আমি এক সেকেণ্ডের জন্য মনে মনে চাইলাম তোমার নাশ হোক, তাতেই কিন্তু আমার হিংসা করা হয়ে গেল। মানুষ যখন দেখে সবই আমি, তখন কাকে সে হিংসা করবে। খাওয়ার সময় আমার দাঁতের মাঝখানে জিভের কামড় পড়েছে, জিভ থেকে রক্ত ঝরছে। এখন কি আমি আমার দাঁতের উপর আক্রোশ মেটাতে পাথর দিয়ে দাঁত ভাঙতে শুরু করব? কিন্তু আমার সাথে যখন কেউ খারাপ ব্যবহার করে, তখন তার প্রতি পাল্টা দুর্ব্যবহার না করতে পারলেও মনে মনে তাকে গালাগাল দেব, নয়তো তার সর্বনাশ যাতে হয় সেই প্রার্থনা করতে শুরু করব। কিন্তু যে দেখছে সব আমিই, আমারই সব রূপ, তখন তার কি কোন হিংসা ভাব আসতে পারবে? কখনই আসবে না। দাঁতটাও আমার জিভটাও আমার, দাঁতটাও আমি জিভটাও আমি। কেউ যদি আমার কোন ক্ষতি করল তখন আমি দেখছি আমার জিভটা দাঁতের মাঝখানে পড়ে গেল। তখন কি আর করা যাবে? ভবিষ্যতে সাবধানে চিবোতে হবে, যাতে দাঁতে আর কামড় না পড়ে। আমার ক্ষতি করেছ, এর ফল ভগবান তোমাকে একদিন না একদিন দেবেনই দেবেন, মনের মধ্যে এই চিন্তাটাও যেন না আসে। যোগীর মনে এই চিন্তা আসবেই না। খুব বেশি কষ্ট দিলে যোগী আহাঃ রে করে একটু হয়তো সহানুভূতি প্রকাশ করবে, জিভটা বেশি কেটে গেলে একটু ওষুধ লাগিয়ে নেবে। জগতের প্রতি যোগীরা ঠিক এইভাবেই ব্যবহার করেন। আর আমরা কি করি? ঠাকুর খুব সুন্দর বলছেন, একটা চোর চুরি করতে এসে ধরা পড়ে গেছে। প্রথমে গৃহস্থ চোরের সব জিনিষপত্র কেড়ে নেবে, তারপর আচ্ছা করে প্রহার করবে, প্রহার করার পর পুলিশে দেবে। আবার চোরকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলবে – এত বড় দুঃসাহস! আমার বাড়িতে চুরি করতে আসা! জানোনা আমি কে! আসলে সাধারণ লোকেদের পক্ষে যোগী হওয়া সম্ভবই না। যোগী কিভাবে হওয়া যায়, এই কথাই ষষ্ঠ অধ্যায়ে নানা ভাবে বলা হচ্ছে। অর্জুন তখন বলছেন –

অর্জুন উবাচ

**যোহয়ং যোগস্ত্বয়া প্রোক্তঃ সাম্যেন মধুসূদন। এতস্যাহং ন পশ্যামি চঞ্চলত্বাৎ স্থিতিং স্থিরাম্।।৩৩।।**

হে মধুসূদন, আপনি যে এতক্ষণ যে সমত্বযোগের কথা ব্যাখ্যা করলেন কিন্তু মনের চঞ্চল স্বভাববশতঃ আমি এর নিশ্চল স্থিতি দেখতে পাচ্ছিনা।

এত কিছু বলে দেওয়ার পর অর্জুন ভগবানকে বলছেন, হে প্রভু, আপনি তো খুব সুন্দর সুন্দর কথা বলে দিলেন, কিন্তু এত কিছু করা তো সম্ভব নয়। কারণ মনের স্বভাব এতই চঞ্চল যে এতো কখন স্থিরই হয় না।

**চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদ্দৃঢ়ম্। তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব সুদুষ্করম্।।৩৫।।**

মনকে বশে আনার ব্যাপারে উপমা দেওয়া হয়, একটা পশু আছে সংস্কৃতে বলে তন্তুনাগ, এর চামড়া এতো মোটা যে ছ্যাঁদা করা যায় না, গণ্ডারের মত আর কি। এখানে দুটো জিনিষ হচ্ছে, এক মনটা হচ্ছে বড় চঞ্চল, দ্বিতীয়, শুধু যে চঞ্চল তাই নয়, আবার প্রমাথি, প্রমথনশীল। ওয়াশিং মেশিনে যখন স্পিনারটা চালিয়ে দেওয়া হয় তখন জলটা তীব্র বেগে ঘুরতে থাকে, মানে জলটা প্রচণ্ড চঞ্চল হয়ে গেল। শুধু চঞ্চলই না, ওর মধ্যে যে জামা কাপড় দেওয়া হয়েছে, সেগুলোকেও সে নাচাচ্ছে, একবার এইদিকে আরেকবার ঐদিকে। এই জিনিষটা আগেকার দিনে ভালো দেখা যেত, যখন দই থেকে মাখন তোলা হত। দইয়ের মধ্যে একটা দণ্ড রেখে দণ্ডটাকে দড়ি লাগিয়ে দুজনে দু'দিক থেকে টেনে ঘুরিয়েই চলেছে, দইটা যে শুধু চঞ্চলই হচ্ছে তা নয় একেবারে মন্থন করে দিচ্ছে। মন যে নিজেই শুধু চঞ্চল তা নয়, তার সাথে সাথে সে ইন্দ্রিয় গুলোকেও মন্থন করে দিচ্ছে। এমন মন্থন করে দিচ্ছে কেউ আর শান্তিতে থাকতে পারছে না। হে ভগবান, আপনি যে এত যোগের কথা বললেন সবটাই খুব সুন্দর কথা এতে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু ব্যবহারিক ক্ষেত্রে বাতাসকে যেমন কোন কিছুতে আবদ্ধ করা যায় না, ঠিক তেমনি মনকে তো বশে আনা এক প্রকার দুঃসাধ্য। এখানে অর্জুন বলছেন, *চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ*, আচার্য বলছেন – কৃষ্ণ শব্দ এসেছে কৃশ ধাতু থেকে, কৃশ ধাতুর অর্থ হচ্ছে হরণ করে নেওয়া, যিনি ভক্তজনের পাপকে হরণ করে নেন তিনি হচ্ছেন কৃষ্ণ। ভগবান অর্জুনের কথা শুনে বলছেন, তুমি ঠিকই বলছ –

শ্রীভগবানুবাচ

**অসংশয়ং মহাবাহো মনো দুর্নিগ্রহং চলম্। অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে।।৩৫।।**

হে কৌন্তেয়, তুমি যা বলছ ঠিকই বলছ এতে কোন সংশয়ই নেই, মন প্রচণ্ড *দুর্নিগ্রহং*, মনকে এমনিতে নিগ্রহ করা যায় না। তবে কি জান, কিন্তু অভ্যাস আর বৈরাগ্যের দ্বারা এই দুর্নিগ্রহ মনকে নিগ্রহ করা সম্ভব। বৈরাগ্য হচ্ছে, মানুষ যখন কোন কিছু ভোগ করে, ভোগ করতে করতে যখন ঐ ভোগের মধ্যে দোষ দেখতে শুরু করে, তখন সে ঐ ভোগ থেকে সরে আসে। যে কোন জিনিষ থেকে সরে আসার একমাত্র উপায় হচ্ছে ঐ জিনিষে দোষ দেখা। ঠাকুর বলছেন, যে লোকের একটা মেয়ের প্রতি আসক্তি আছে, সে যদি দেখে ঐ মেয়েটির সব অঙ্গ দ্বিগুণ হয়ে গেছে, স্বাভাবিক যে চোখ সেটা দ্বিগুণ, কান দ্বিগুণ, নাক দ্বিগুণ আকার হয়ে গেছে, হাত দুটো দ্বিগুণ আকারের, তখন তো মেয়েটিকে একটি রাক্ষুসী মনে হবে। বার বার যদি এই রকম কল্পনা করতে থাকে তারপর তো মেয়েটার দিকে তাকাতেই পারবে না। আর বার বার ওর মধ্যে দোষ দেখতে হয়। যেমন ধরুন একজনের মদ খাওয়ার নেশা আছে, কিন্তু সে মদের নেশা থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছে। এখন যদি দিনরাত ভাবতে থাকে, মদ খাওয়াটা খুব বাজে নেশা, আমি কেন মদ খাচ্ছি। এখানে কিন্তু যোগীর কথা আলোচনা হচ্ছে, সাধারণ মনের কথা বলা হচ্ছে না, একদিকে যোগীর মন আস্তে আস্তে দৃঢ় হচ্ছে আর অন্য দিকে বারংবার দোষ দেখে যাচ্ছে। কিসে দোষ দেখছে? সব কিছুতে। যোগী প্রথমে ভোগ দিয়ে শুরু করে তারপর সব কিছুতেই দোষ দেখে। দোষ দেখা মানে, ঐ জিনিষটা আর ব্যবহার করা চলবে না। যখন কোন জিনিষের প্রতি দোষ দেখা শুরু হয় তখন সেই জিনিষের প্রতি আকর্ষণটাও শেষ হয়ে যায়। আকর্ষণ যখন চলে গেল, এবার কিন্তু সে এগিয়ে যাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেল। এই জিনিষটার ভালো নমুনা দেখা যায় স্বামী-স্ত্রীর ক্ষেত্রে, প্রথমে একে অপরের প্রতি কি ভালোবাসা, পরে শুধু ঝগড়াই করে, একে অপরের দোষই দেখে। কিন্তু কোথাও একটা এদের পরস্পরের ভোগটা মিটে গেছে। যাদের কোন কিছু খাবারে এলার্জি থাকে, যেমন অনেকের চিংড়ি মাছ খেলেই সারা শরীরে এলার্জি বেরিয়ে যাবে। যে জেনে গেছে আমার এই খাবারে এলার্জি আছে সেকি আর সেই খাবারের প্রতি আসক্ত হবে? তখন সেই খাবার দেখলেই সরে আসবে। বৈরাগ্য হচ্ছে যখন বোধ হয়ে যায় যে এই জিনিষটা আমার পক্ষে ভালো নয়, তখন সেই জিনিষের দোষ গুলোকে দেখতে হয়। বৈরাগ্য মানেই হচ্ছে দোষ দেখা। আর শরীরের প্রতি বৈরাগ্য কিভাবে হয়? যখন বলবে – উঃ, এই শরীরের জন্ম হয়, এই শরীরে ব্যাধি আশ্রয় করে, এই শরীরের বৃদ্ধাবস্থা আসে, তারপর মৃত্যু। এই জিনিষ গুলিকেই যখন বারবার চিন্তাতে নিয়ে এসে বিচার করতে থাকবে তখন একটা সময় শরীরের প্রতিও ঘেন্না এসে যাবে।

বৈরাগ্যের পর বলছেন অভ্যাস। শঙ্করাচার্য অভ্যাসে অপূর্ব ব্যাখ্যা দিচ্ছেন – কোন একটা বস্তুতে নিরন্তর সমান ভাবে মনটাকে বারবার লাগিয়ে রাখার নামই হচ্ছে অভ্যাস। আমি ঠিক করে নিলাম রোজ আধ ঘন্টা করে ধ্যানে চেষ্টা করব। প্রথম দিন আমার বসতে ইচ্ছে করছে না, কিন্তু আমি বসলাম, এই যে বসলাম এখান থেকেই আমার অভ্যাস শুরু হল। প্রথম দিন না হয় তিন মিনিটই বসলাম। তিন মিনিটে যখন দেখলাম কিছুই হল না, এরপর তিন মিনিটটাকে বাড়িয়ে পাঁচ মিনিট করলাম। দুদিন করে দেখছি পাঁচ মিনিট থেকে আবার পিছিয়ে তিন মিনিটে চলে গেছে।

এই যে ধ্যান করতে পারছি না এর কারণ কিন্তু বাইরের কোন কিছুর গোলমাল নয়, এর সবটাই আমাদের মনের ভেতরের ব্যাপার। আসলে আমরা বাইরের জগতকে বড্ড বেশি গুরুত্ব দিয়ে বসেছি। সব গোলমালের উৎস এইখানেই, কামিনীই হোক, কাঞ্চনই হোক, ফাঁকিবাজিই হোক আর ভোগবৃত্তিই হোক সবটাই এইখানে মস্তিষ্কে বাসা বেঁধে আছে, বাইরে কিছু নেই। যদি দেখি কোন লোক কোন কিছুই ভোগ করছে না, কোন হিংসা করছে না তাই বলে কি সে মহাত্মা হয়ে গেল? এর ভেতরে কি আছে আমরা কি করে জানব, জানার কোন উপায়ই নেই। সত্যি সত্যিই যদি তার ভেতর থেকে সব ভোগবৃত্তি চলে গিয়ে থাকে, যদি কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগী মহাপুরুষ হত, তাহলে সে তো পরমহংস। আমাদের ভূতটা সরষেতে গিয়ে বসে আছে। সেইজন্য বলা হয় আগে তোমার চিত্তটাকে সাফ সুতরো কর। সাফসুতরো করবে কি ভাবে? অভ্যাস করে করে, একটা জিনিষে লেগে থাকতে হবে। বাইরে কিছু করতে হবে না, মনকে বলতে হবে এটা আমাকে করতেই হবে। আমি যদি মনে করি প্রথম দিন থেকেই আসনে ঝাঁপ দিয়ে বসে পড়ে ঠিক করলাম আধ ঘন্টা ধ্যান করব। এতে কিছুই হবে না। অনেক দিন অভ্যাস করে করে মনকে বোঝাতে হবে। কোন জিনিষের ভালো দিকটাকে সমান ভাবে একাগ্র হয়ে চিন্তন করে যাওয়াটা হচ্ছে অভ্যাস, আর খারাপ জিনিষের যে দোষ গুলো আছে সেগুলিকে চিন্তন করে খারাপ জিনিষ থেকে বেরিয়ে আসাটা হচ্ছে বৈরাগ্য। অভ্যাসটা সব সময় ভালো জিনিষকে অবলম্বন করে সেই ভালো জিনিষের প্রতি মনকে একাগ্র করা। আর বৈরাগ্য হচ্ছে খারাপ জিনিষ থেকে বেরিয়ে আসা। অভ্যাস করার সময় সৎ গুণের উপর চিন্তা করতে হয়, আর বৈরাগ্যের ক্ষেত্রে বাজে জিনিষের যে দোষ সেইটাকে চিন্তন করতে হয়। বারবার করাটাই হচ্ছে অভ্যাস আর বৈরাগ্য, ভালো জিনিষের অভ্যাস আর খারাপ জিনিষে বৈরাগ্য।

**অসংযতাত্মনা যোগো দুষ্প্রাপঃ ইতি মে মতিঃ। বশ্যাত্মনা তু যততা শক্যোঽবাপ্তুমুপায়তঃ।।৩৬।।**

যার *অসংযতাত্মা* তার দ্বারা কোন দিন যোগ হবে না। আর যে ইন্দ্রিয় ও আত্মাকে মানে মনকে বশে নিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছে তার দ্বারা যোগ হবেই হবে। তার মানে বলতে চাইছেন, যার অভ্যাস আর বৈরাগ্য নেই তার দ্বারা কিছুই হবে না। ঠাকুর উপমা দিচ্ছেন, গরুর লেজে যদি হাত দিলে গরু শুয়ে পড়ে তাহলে ঐ গরু নিয়ে কিছু হবে না। আধ্যাত্মিক জীবনে যারাই আসে তাদের বেশির ভাগই এই রকম, লেজে হাত দিলেই নেতিয়ে পড়ে। যে গরুর লেজে হাত দিলেই তিড়িংবিড়িং করে ওঠে সেই গরুই লোকে নিয়ে যায়। যার মধ্যে তেজ আছে সেই ব্যক্তিই অভ্যাস বৈরাগ্যকে অবলম্বন করতে পারবে।

এই আলোচনাটা ভগবান এইখানেই শেষ করছেন। প্রথমে যোগের বর্ণনা করা হল। কিন্তু এই যোগ তো সকলের দ্বারা সম্ভব নয়। কিন্তু ভগবান বললেন, সম্ভব, তবে ধীরে ধীরে মনটাকে বুদ্ধি ও ধৈর্যের দ্বারা বাইরের জগত থেকে টেনে ভেতরের দিকে নিয়ে আসতে হবে। পথ হচ্ছে অভ্যাস আর বৈরাগ্য, যোগী হওয়ার এইটাই একমাত্র পথ, এ ছাড়া আর কোন পথ নেই। আধ্যাত্মিক পথে এগোতে পথ এই একটাই, যেটা ভালো সেটার দিকে অভ্যাস দাও, যেটা বাজে সেটার প্রতি বৈরাগ্য নিয়ে এসো। এই দুটিকে অবলম্বন না করার আগে কিছুই হবে না। এই দুটো যদি না করি তাহলে কি হবে? কি আর হবে, পশুর মত জীবন যাপন করবে। আধ্যাত্মিক জীবনে কেউ কারুর জন্য কিছু করে দিতে পারেনা, সব নিজেকেই করতে হবে। কিন্তু নিজেরা কিছু করবে না, অভ্যাস বৈরাগ্য কিছুই করবে না অথচ গুরুকে বলবে আপনি আশীর্বাদ করলেই সব হয়ে যাবে। এই করে কিছু হয় না। আগে কিছু করতে হবে, কিছু করার পর গুরুর আশীর্বাদ নেওয়ার ক্ষমতা হবে। এরপর অর্জুন বলছেন –

অর্জুন উবাচ

**অযতিঃ শ্রদ্ধয়োপেতো যোগচ্চালিতমানসঃ। অপ্রাপ্য যোগসংসিদ্ধিং কাং গতিং কৃষ্ণ গচ্ছতি।।৩৭।।**

একজন যোগী জগতের যত রকমের ভোগ হতে পারে সব কিছু ত্যাগ করে দিয়ে সারা জীবন ধরে যোগ সাধনা করে গেছে, কিন্তু সে এই জীবনে সিদ্ধিলাভ করতে পারল না। ব্রহ্মজ্ঞান না হলে তো যোগীর মুক্তি হবে না। ভোগও হল না মুক্তিও পেল না, দুদিক থেকেই সে ব্যর্থ, এখন তার কি হবে? যোগী সব চেষ্টা করল কিন্তু সাফল্য পেল না, সব সময় যে সফল হবে তা তো নয়। আমি একটা ব্যবসা শুরু করে এক বছর করলাম, দু বছর করলাম, তারপর দেখলাম এতে কিছু সুবিধা হচ্ছে না। তারপর আমি পথ পাল্টে নিলাম। কিন্তু যোগের ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে লেগে থাকতে হবে। এখন কত দিন লেগে থাকতে হবে কোন ঠিক নেই, পঁচিশ বছর না তিরিশ বছর কিছুই জানিনা। সব ছেড়েছুড়ে লেগে থাকলাম কিন্তু আমার দ্বারা এই জন্মে সিদ্ধি লাভ হল না। এখন আমি কি করব? কারণ সংসারে জীবন ধারণ করতে যে অভিজ্ঞতার দরকার সেই জাগতিক বুদ্ধিও আমার হয়নি, কেননা যে বয়সে সাংসারিক বুদ্ধি হবে সেই বয়সে সব কিছু ছেড়ে দিয়ে যোগের পথে নেমে পড়েছিলাম। এখন তো আমার দুদিকটাই গেল? যারা সংসার করেছে, ভোগ করেছে তারা না হয় পূণ্য কর্মাদি করার জন্য ভালো লোকে যাবে। কিন্তু আমার কি হবে? আমি কি তাহলে ত্রিশঙ্কু হয়ে থাকব? এই প্রশ্নটা অর্জুনের মধ্যেও এসেছে। ভগবানকে অর্জুন তাই জিজ্ঞেস করছেন, যোগী যদি মৃত্যুর আগে সিদ্ধি লাভ না করতে পারে তাহলে তার কি গতি হবে?

**কচ্চিন্নোভয়বিভ্রষ্টশ্ছিন্নাভ্রমিব নশ্যতি। অপ্রতিষ্ঠো মহাবাহো বিমূঢ়ো ব্রহ্মণঃ পথি।।৩৮।।**

ব্রহ্মপ্রাপ্তির পথে যোগী এগিয়ে চলেছে, চলতে চলতে তার ব্রহ্মজ্ঞান হল না, তার তো তখন এদিকও গেল ঐদিকও গেল, যোগ তো পেলই না ভোগও পেল না। তখন এরা শরৎকালের মেঘের মত, যে মেঘ কোন কাজেই লাগে না, ছিন্নভিন্ন হয়ে আকাশে ভেসে বেড়ায়, সেই মেঘে বৃষ্টিও হয় না, ছায়াও হয় না। এই রকম শরৎ কালের ছিন্নভিন্ন মেঘের মত কি সে ভেসে বেড়াবে?

**এতন্মে সংশয়ং কৃষ্ণ ছেত্তুমর্হস্যশেষতঃ। ত্বদন্যঃ সংশয়স্যাস্য ছেত্তা ন হ্যুপপদ্যতে।।৩৯।।**

হে কৃষ্ণ, আমার এই সংশয়টা আপনি দূর করে দিন। আপনি ছাড়া আর কেউই আমার এই সংশয় নাশ করতে পারবে এমন কাউকেই আমি দেখছি না।

অর্জুনের এই সংশয় দূর করতে গিয়ে ভগবান যেটা বলছেন এটাকে শঙ্করাচার্য বলছেন যোগভ্রষ্ট বর্ণন। চল্লিশ থেকে পয়তাল্লিশ শ্লোক কয়টি হচ্ছে যোগভ্রষ্ট বর্ণন। যাঁরা যোগ পথে অগ্রসর হওয়ার জন্য চেষ্টা করছেন তাদেরকে আশ্বাস বাণী দিয়ে ভগবান প্রথমেই বলে দিচ্ছেন –

শ্রীভগবানুবাচ

**পার্থ নৈবেহ নামুত্র বিনাশস্তস্য বিদ্যতে। ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিদ্দুর্গতিং তাত গচ্ছতি।।৪০।।**

হে পার্থ, তুমি যেটা ভাবছ সেই ত্রিশঙ্কু অবস্থা এদের কখনই হয় না, এদের শুভ প্রচেষ্টার ফল কখনই নাশ হয়ে যায় না। যারা ধ্যান ধারণা করেছে, তারা তো ভাল কাজই করেছে, *কল্যাণকৃৎ* মানে ভালো কাজ করেছে, এদের কখনই কোন দুর্গতি হয় না। যে কোন শুভ কাজ যাঁরা করেছেন তাদের কখনই দুর্গতি হয় না। তাহলে তাদের কি অবস্থা হয়?

**প্রাপ্য পুণ্যকৃতাং লোকানুষিত্বা শাশ্বতিঃ সমাঃ। শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে।।৪১।।**

যোগভ্রষ্ট মানে সন্ন্যাসীকেই বোঝাচ্ছে, এখানেও এটিকে পরিষ্কার করে আচার্য বলে দিচ্ছেন সন্ন্যাসী ছাড়া যোগভ্রষ্ট হয় না। ষষ্ঠ অধ্যায়ে আমরা প্রথমের দিকেই আলোচনার সময় বলেছিলাম যে ষষ্ঠ অধ্যায় গৃহস্থদের জন্য নয়। তার কারণ এই অধ্যায়ে এমন কয়েকটি সাধনার কথা বলা হয়েছে, বাড়িতে মহিলা ও পরিবার পরিজনদের মাঝখানে এই সাধনা করা সম্ভব নয়। যারা যোগী তারা সাধনা করে করে এগোচ্ছেন, তারপর একটা সময় লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারলেন না, শেষের দিকে সব ভেঙ্গে গেল। যত গণ্ডগোল শেষের দিকেই হয়, প্রথমের দিকে গণ্ডগোল হলে শুধরে নিয়ে আবার চলতে থাকবে। কিন্তু শেষের দিকে শোধরানোর আর সেই শারীরিক ও মানসিক বল ধৈর্য থাকে না, একটা সময় এসে মনে হবে আমার দ্বারা আর কিছু হবে না, বাকী জীবনটা কোন রকমে কাটিয়ে দিই। এখন এরা মৃত্যুর পর *শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে,* এমন একটা বাড়িতে গিয়ে তারা জন্ম নেন যারা অত্যন্ত *শুচীনাং,* মানে পবিত্র পরিবার, *শ্রীমতাং,* মানে খাওয়া পড়ার কোন কষ্ট নেই। এখানে যারাই শাস্ত্র অধ্যয়ণ করতে এসেছেন এদের সবারই পরিবার *শ্রীমতাং,* মানে খাওয়া পড়ার মোটামুটি ব্যবস্থা আছে, আর *শুচীনাং,* এদের বাড়ির কেউ চোর গুণ্ডা বদমাইস নয়। যেসব বাড়িতে খাওয়া পড়ার ব্যবস্থা আছে, রোজ নিয়মিত পূজা অর্চনা হচ্ছে, এই সব বাড়িতে যত সন্ন্যাসীরা যোগভ্রষ্ট হবে তারা গিয়ে সেই সব বাড়িতে জন্ম নেবে। এখন যে যোগভ্রষ্ট হয়েছে, সে রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীই হোক বা অন্য সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীই হোক, সুফী হোক, খ্রীশ্চান সন্ন্যাসী হোক, যারা যোগ পথে চলতে চলতে ভ্রষ্ট হয়ে গেছে, তাকে তো আবার সাধনা করতে হবে, সাধনা করতে হলে একটা শরীর দরকার, শরীর ধারণ করত হলে একটা জায়গায় জন্মাতে হবে। এরা এখন কোথায় জন্মাবে? জন্মাবার জন্য একটা বাড়ি খুঁজতে হবে, তখন এরা এই *শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে,* শুচী আর শ্রী সম্পন্ন পরিবার খুঁজে নিয়ে সেখানে জন্মাবে। এখানে যারা শাস্ত্রের কথা, ধর্মের কথা শুনতে আসছেন, এরাও সবাই কিন্তু যোগভ্রষ্ট, যোগভ্রষ্ট না হলে ধর্মের কথা শুনতে কেউ আসবেই না। আসলে যখন যোগ পথে চলতে থাকে, তখন মনের মধ্যে কিছু চিন্তার উদয় হয়, এই ভোগ করা হল না, এটা সেটা ভোগ করতে ইচ্ছা জাগে। তখন সে ঐ ভোগের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়তে যায়। ঝাঁপিয়ে পড়লেই গোলমাল হয়ে যায়। এর থেকে আরও উচ্চাবস্থার কিছু দুর্লভ যোগী যাঁরা, তাঁদের যদি জন্ম নিতে হয় তখন তাঁরা কিভাবে কোথায় জন্ম নেয় পরের শ্লোকে ভগবান তার বিবরণ দিচ্ছেন –

**অথবা যোগিনামেব কুলে ভবতি ধীমতাম্। এতদ্ধি দুর্লভতরং লোকে জন্ম যদীদৃশম্।।৪২।।**

কেউ কেউ যাঁরা অতি ভাগ্যবান, যোগীদের বাড়িতে গিয়ে তাঁদের জন্ম হয়। তবে এই ধরণের যোগী গৃহে জন্ম জগতে অতি দুর্লভ। এর দুটো কারণ, প্রথম কথা হচ্ছে উচ্চকোটির ধার্মিক ব্যাক্তি, যাঁরা সব সময় যোগ সাধনা করছেন, এই রকম যোগীদের সংখ্যা অত্যন্ত কম বলে এই রকম জন্ম খুব বেশি একটা দেখা যায় না। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, যে ভোগের ইচ্ছার জন্য তাঁর যোগসিদ্ধি হল না, যোগীর বাড়িতে জন্ম নিলে সেই ভোগটা পূরণ হবার সুযোগটা কম থাকে। যেমন, একজন সন্ন্যাসীর খুব দেশ বিদেশে ঘুরে বেড়াবার ইচ্ছে ছিল। এখন যদি সে অসচ্ছল যোগীর বাড়িতে জন্ম নেয় তখন সেখানে যোগীর বাড়িতে থেকে বিদেশে ঘুরে বেড়াবার সম্ভবনা কম হবে। তখন সেই ভোগটা তো আর পূরণ হবে না। তাহলে সেখানে জন্ম নিয়ে কোন লাভ হবে না। এমনিতেই যোগী পরিবার খুব কম। সেইজন্য সব *শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে* গিয়ে জন্ম নেয়। যদি এই রকম কোন যোগীর গৃহে গিয়ে কোন উচ্চতম যোগভ্রষ্ট জন্ম নেয় তখন সেখানে তাঁরা –

**তত্র তং বুদ্ধিসংযোগং লভতে পৌর্বদেহিকম্। যততে চ ততো ভূয়ঃ সংসিদ্ধৌ কুরুনন্দন।।৪৩।।**

যোগী আগের আগের জন্মে যে তপস্যা করেছেন, যোগ সাধনা করেছেন, তাঁর এমনই কপাল খুলে যাবে যে, কোন না কোন ভাবে তার সব যোগাযোগ হয়ে যায়। যদি একটু এদিক ওদিক ছিটকে গিয়েও জন্ম নিয়ে নেয়, তখন কিছু না কিছু বিচিত্র ভাবে যোগাযোগ হয়ে যায় যেখান থেকে তাঁর উন্নতি হতে থাকবে। বেলুড় মঠের মহারাজদের যদি ইতিহাস দেখা যায় তাহলে দেখা যাবে কেউ জাপানে জন্ম নিয়েছেন, কেউ আমেরিকাতে, কেউ ইরাকে জন্ম নিয়েছেন, কেউ হয়তো হঠাৎ একটা ঠাকুরের ছবি দেখল, কিংবা কারুর হাতে একটা কোন বই এসে পড়ল তাতেই তাঁর মনের মধ্যে এমন কিছু হয়ে গেল যেটা তাঁকে টেনে বেলুড় মঠে নিয়ে ফেলে দিল। এতো লোকে ঠাকুরের ছবি দেখছে, বই পড়ছে কিন্তু কারুর মনে কোন কিছু রেখাপাত করছে না, কিন্তু মুষ্টিমেয় কয়েকজনের মনেই রেখাপাত করছে। ইরাকের এক মুসলমানের হাতে কিভাবে স্বামীজীর বই এসে গিয়েছিল। স্বামীজীর বই পড়েই তিনি চমকে উঠেছেন, তারপর তাঁর কি যে হল, ফ্রান্সের এক সেন্টারে গিয়ে যোগাযোগ করে তিনি সন্ন্যাসী হয়ে গেলেন। এই কথাই এখানে বলা হচ্ছে, *যততে চ ততো ভূয়ঃ সংসিদ্ধৌ কুরুনন্দন,* সংসিদ্ধির নিমিত্তে, মানে সিদ্ধি পাওয়ার জন্য বুদ্ধির সঙ্গে যোগ হয়ে যায়, আর –

**পূর্বাভ্যাসেন তেনৈব হ্রিয়তে হ্যবশোঽপি সঃ। জিজ্ঞাসুরপি যোগস্য শব্দব্রহ্মাতিবর্ততে।।৪৪।।**

যোগভ্রষ্ট পুরুষ কেন যোগ থেকে ভ্রষ্ট হলেন? কারণ তাঁর ভোগের কিছু বাসনা ছিল, একটা কিছু গোলমাল তাঁর জীবনে ঘটে গেছে। এখন ছিটকে অন্য কোথাও জন্ম নিয়েছে, এবার তাঁকে যোগাযোগ করাতে হবে, তারপর তাঁকে নাকে দড়ি দিয়ে টানবেন, ঠাকুর যেন বলছেন – অনেক হয়েছে, আমার কাছে চলে আয়। তাঁর যোগ অভ্যাস এমনই হয়ে আছে, ঠাকুর ঠিক তাঁকে আস্তে আস্তে টানতে শুরু করবেন। যোগ ছিল তাঁর অসম্পূর্ণ, এবার তাঁর সেই অসম্পূর্ণ যোগাভ্যাস শুরু হয়ে যাবে। কিন্তু এমন কিছু একটা তাঁর আসক্তি ছিল, কোন মেয়ের প্রতি দুর্বলতা এসে গিয়েছিল কিংবা বিরাট নাম-যশ পাওয়ার বাসনা জেগেছিল। যোগীর এগুলো অধর্ম। এখন তাঁর নাকে আগে দড়ি দিয়ে বেঁধে নেবে, তারপর তাঁকে খেলাতে শুরু করবে, ভোগ দেখতে চেয়েছিলি তো, এই নে দ্যাখ্ ভোগ কি জিনিষ। যেটা আগের জন্মে তাঁর চাপা ছিল, আগে সেখানে তাঁকে ঘোরাবে। কারণ কর্ম আমাদের অনেক রকমের জমা আছে, হাজার হাজার রকমের কর্ম সব জমা আছে, যেমন হিংসা বৃত্তি আছে তেমনি অহিংসা বৃত্তিও আছে, যোগ বৃত্তি যেমন আছে ভোগ বৃত্তিও আছে, বিদ্যা বৃত্তি আছে অবিদ্যা বৃত্তিও আছে। কিন্তু সবটাই চাপা থাকে। এর মধ্যে যেটা বেশি প্রবল সেটার দিকেই বেশি আকর্ষণ হয়। জিনের ক্ষেত্রে এই জিনিষটাই হয়, যে জিনটা বেশি চেঁচামেচি করে, এই চাই সেই চাই, আমার খাওয়া চাই, সেই জিন গুলিই বেশি প্রবল হয়ে যায়। তখন মনস্তাত্ত্বিকরা যে চিকিৎসা করেন তাতে যে জিনগুলোকে দমাতে হবে তখন সেই রকম ড্রাগস দিয়ে দেন যাতে করে ঐ জিনগুলো নিস্তেজ হয়ে দমে যায়। মূল কথা হচ্ছে যে বাড়িতে যে ছেলে বা মেয়ে বেশি চেঁচামেচি করছে, উৎপাৎ করে তার দিকেই বেশি দৃষ্টি দেওয়া হয়। আমাদের সংস্কারের ক্ষেত্রেও এই একই জিনিষ হয়, যে সংস্কার গুলো বেশি প্রবল, বেশি চেঁচামেচি করছে, সেই সংস্কারগুলোর দিকে বেশি নজর যায়। যোগীর যে দুর্বলতার জন্য যোগ পথ থেকে পতন হয়ে গিয়েছিল, নতুন জন্ম নেওয়ার পর এখন সেই সংস্কারটাই আগে বেশি প্রবল থাকবে। এই সংস্কারের দিকে যখন বেশি নজর দেওয়া হবে তখন তার চেঁচামেচি কম হবে। এই ভাবে কতদিন সংস্কার প্রবল থাকবে? যেমনি একে একটু ঠাণ্ডা করে দেওয়া হল, তারপরে তাঁর যে যোগ সংস্কার গুলো আছে সেই সংস্কার গুলো চাড়া মেরে উঠবে। এই সংস্কার গুলো যখন চাড়া মেরে ওঠে তখন তার তো আগে থাকতেই নাকে দড়ি লাগান হয়ে গেছে, তখন এই যোগ সংস্কার গুলো বাকি সংস্কারগুলোকে ছিটকে ফেলে দিয়ে আবার জোর কদমে এগিয়ে যায়। এখন এগিয়ে চলতে গিয়েই কি সে লক্ষ্যে পৌঁছে যাবে? বলা খুব মুশকিল, আবার সে যোগভ্রষ্ট হয়ে যেতে পারে। শেষ কালে আবার যদি পড়ে যায় তখন আবার এই একই জিনিষ হবে, কিন্তু সে এগোতেই থাকবে।

আর বলছেন *শব্দব্রহ্মাতিবর্ততে*, বেদে যে কর্মাদি করতে বলা হয়েছে, যোগী সেই কর্মাদি আর তার ফলকে অতিক্রম করে চলে যায়। যে পাপকর্ম গুলি তাঁর ছিল, যেমন কামিনী-কাঞ্চনে আসক্তি, লোকমান্যতার ইচ্ছে, রাজা হওয়ার ইচ্ছে, যেটার জন্য তাকে এই শরীর ধারণ করতে হয়েছে, সেগুলো যখন ক্ষয় হয়ে গেল, সে আর ঐদিকে তাকাবে না, এখন সে সব কিছু বুঝে গেছে। যদি আমরা ভগবান বুদ্ধকে এখানে বিচার করি, যদিও বুদ্ধদেবকে আমরা ভগবান রূপে দেখি। কিন্তু ভগবান বুদ্ধকে যদি এই শ্লোকের দৃষ্টিতে বিচার করি – কোন জন্মে ভগবান বুদ্ধের রাজা হওয়ার ইচ্ছে ছিল, রাজার ঘরে গিয়ে জন্ম নিলেন, কদিন যখন রাজকুমার হয়ে থাকলেন তখন তার রাজা হওয়ার ভোগটা মিটে গেল, ব্যস্, সব মিটে গেছে, এখন ভগবান বুদ্ধকে কে আর আটকাতে পারবে। তবে বুদ্ধকে আমরা ভগবান রূপেই দেখি, বোঝাবার জন্য এইভাবে বলা হল। লালাবাবু রাস্থা দিয়ে যেতে যেতে শুনতে পেলেন ধোপার মেয়েকে তার বাবা বলছে, বাসনায় কবে আগুন দিবি। এই একটা কথা কানে যেতেই জমিদার লালাবাবু সব কিছু ছেড়ে দিয়ে বৃন্দাবনে চলে গেলেন। আগের জন্মে কোথাও তাঁর ইচ্ছে ছিল জমিদার হবেন, জমিদার ঘরে জন্ম নিয়ে জমিদার হলেন, জমিদার হওয়ার বাসনাটা মিটে গেছে, তাঁর সময় হয়ে গেল তিনি একটা কথা শুনে নিলেন, আর সেইখান থেকে সোজা বৃন্দাবনে চলে গেলেন। সবারই ক্ষেত্রে এই জিনিষই হয়। বলছেন, যোগ সংস্কার কখনই নষ্ট হয়ে যায় না, সংস্কারটা থেকেই যায়। তাই এই ধরণের যাঁরা যোগভ্রষ্ট সন্ন্যাসী এখন যাই করুক না কেন, আজ হোক কাল হোক ঠিক সে আবার উঠে দাঁড়িয়ে যাবে। এই জন্মে যদি নাও দাঁড়াতে পারে এর পরের জন্মে আবার যোগ সাধনায় নেমে পড়বে। *জিজ্ঞাসুরপি* বলতে বোঝাচ্ছে যিনি জানতে চাইছেন, এখানে জিজ্ঞাসু সন্ন্যাসীকেই বোঝাচ্ছে। সন্ন্যাস মানে কর্মসন্ন্যাস হতে পারে বা শুধু সন্ন্যাসও হতে পারে, মানে তিনি এখন এই জগৎ থেকে নিজেকে আলাদা করে নিয়েছেন। তারপর বলছেন–

**প্রযত্নাদ্ যতমানস্তু যোগী সংশুদ্ধকিল্বিষঃ। অনেকজন্মসংসিদ্ধস্ততো যাতি পরাং গতিম্।।৪৫।।**

যে প্রযত্ন করে যাচ্ছে, মানে চেষ্টার পর চেষ্টা করে যাচ্ছে, তার একটু একটু করে সংস্কার জমতে থাকছে। এইভাবে যখন ভালো সংস্কার জমতে শুরু করে, ভালো সংস্কার জমতে জমতে এমন একটা অবস্থা হবে যে ভালো সংস্কারগুলো যত রকমের অধর্মের সংস্কার, পাপ সংস্কার জমে ছিল সেগুলোকে উপড়ে ফেলে নাশ করে দেবে। এই নাশ যখন হয়ে গেল তখন তার সম্যক জ্ঞান হয়ে গেল। এই পাপের বোঝা সৃষ্টির আদিকাল থেকে জমা হতে থেকেছে। এই বোঝাকে এক জন্মে নাশ করা খুব কঠিন, অসম্ভবই বলা যায়। যখন এক জন্মে পারছে না তখন অনেক জন্ম ধরে সাধনা করে করে ভালো সংস্কার জমিয়ে জমিয়ে এই পাপ সংস্কারগুলিকে শেষ করে দিচ্ছে। এইটাও একটা পথ। হিন্দু দর্শনে এই কারণে পূর্বজন্মের উপর এতটা গুরুত্ব দেওয়া হয়ে আসছে। মানুষের মনে

যদি এই ধারণাটাই বদ্ধমূল হয়ে থাকে যে, এই জন্মটাই যদি শেষ হয়ে থাকে, আর আমি যদি মরেই যাই, আর সিদ্ধি যদি না পাই তাহলে এই জন্মেই যা কিছু ভোগ করার আছে সব ভোগ করেই মরি। কিন্তু যখন আমি জানছি যে এইভাবে চলবে না, আমার আবার জন্ম হবে তখন মনে হবে যে বাজে জিনিষে মন দিয়ে কোন লাভ নেই, এর চেয়ে বরং মুক্তির পথকে অবলম্বন করাই শ্রেয়। যদি এক জন্মে মুক্তি নাও পাই তাতে কোন ক্ষতি নেই, একটু একটু করে জমাতে থাকি। এইভাবে একটু একটু করে জমতে জমতে আমার সিদ্ধি হয়ে যাবে। এরপর বলছেন –

**তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোঽপি মতোঽধিকঃ। কর্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্ যোগী ভবার্জুন**।।৪৬।।

গীতার এই ষষ্ঠ অধ্যায়ে ভগবান অর্জুনকে যোগী হওয়ার জন্য উপদেশ দিচ্ছেন। এখানে তাই বলছেন, যিনি জ্ঞানী, এখানে জ্ঞানী বলতে বোঝাচ্ছে যিনি শাস্ত্র বিষয়ক জ্ঞান লাভ করে পাণ্ডিত্য অর্জন করেছেন, শাস্ত্র অধ্যয়ণ করে যাঁর বুদ্ধি পরিষ্কার হয়েছে। এঁর উপরে হচ্ছেন যাঁরা যজ্ঞাদি কর্ম করছেন বা সমাজসেবা করছেন, মানে জ্ঞানীদের অর্থাৎ পণ্ডিতদের থেকে কর্মি শ্রেষ্ঠ। আর যারা কৃচ্ছসাধন করে তপস্যা করছে, যে জ্ঞানী বা পণ্ডিত, যে কর্মি, এদের সবার থেকে যোগী শ্রেষ্ঠ। যোগসাধনার সমান আর কোন সাধনাই হয় না কিনা, তাই যোগী সব সময় সবার থেকে শ্রেষ্ঠ।

**যোগিনামপি সর্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা। শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ**।।৪৭।।

এই যোগীদের মধ্যে যিনি শ্রদ্ধাবান আর আমাতে যাঁর চিত্ত সমাহিত এবং সব সময় আমার ভজনা করছেন তিনিই হচ্ছেন শ্রেষ্ঠতম যোগী। *যোগিনামপি সর্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা,* এটাকেই আবার সপ্তম অধ্যায়ে গিয়ে ভগবান ব্যাখ্যা করবেন।

পুরো ষষ্ঠ অধ্যায় হচ্ছে যোগের উপরে, যোগ কি, যোগ কিভাবে অনুশীলন করা হয়, যোগ সাধনা কঠিন হলেও করা যেতে পারে, যোগে যদি সাফল্য নাও আসে তাহলে কি হবে, আর শেষ কথা হচ্ছে যোগ হচ্ছে শ্রেষ্ঠ পথ। গীতাতে কোথাও যোগকে কোন সাধনার নীচে বলা হয় না, কারণ যোগ হচ্ছে অন্তরঙ্গ সাধনা। যতক্ষণ না কেউ যোগ সাধনা করছে আধ্যাত্মিক জীবনে অগ্রসর হওয়া কখনই সম্ভব হবে না।

**ওঁ তৎসদিতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসুপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে**
**শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে ধ্যানযোগো নাম ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।।**

********

২৯শে আগস্ট ২০১০

## সপ্তম অধ্যায়

# জ্ঞানবিজ্ঞান যোগ

ষষ্ঠ অধ্যায়ের শেষ শ্লোকে ভগবান বলছেন – *যোগিনামপি সর্বেষাং মদ্‌গতেনান্তরাত্মনা,* এখানে বলতে চাইছেন যে যোগীদের মধ্যে অনেক ধরণের যোগী হয়, কিন্তু তাঁদের মধ্যে যিনি আমাতে, মানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণে পুরোপুরি মন দিয়ে রেখেছেন, তিনিই হচ্ছেন শ্রেষ্ঠ যোগী। যিনি শ্রীকৃষ্ণে পুরোপুরি সমর্পিত, শ্রীকৃষ্ণে চিত্ত সমাহিত করে রেখেছেন, এই জিনিষটাকেই সপ্তম অধ্যায়ে বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করা হবে।

প্রথম থেকে ষষ্ঠ অধ্যায় পর্যন্ত গীতা এক ভাবে চলেছে, কিন্তু সপ্তম অধ্যায় থেকে গীতার ধারাটা হঠাৎ পাল্টে গিয়ে নিজের গতিতে এগিয়ে যাবে। এখান থেকে ঈশ্বরের ব্যাপার গুলো, ঈশ্বরীয় তত্ত্বগুলো বেশি করে আলোচিত হতে শুরু হয়েছে। সপ্তম থাকে দ্বাদশ অধ্যায় পর্যন্ত ভগবানের বিভিন্ন রূপ, তারমধ্যে নিরাকার, সাকার, ঈশ্বরের বিভূতি, ঈশ্বরে ভক্তির বিভিন্ন রকমের অভিব্যক্তি, এই জিনিষগুলোকে নিয়েই আলোচনা করা হয়েছে। সপ্তম অধ্যায়ের নাম হচ্ছে জ্ঞানবিজ্ঞানযোগ। কিন্তু যে নামই দেওয়া হোক না কেন এই ছয়টি অধ্যায় হচ্ছে ঈশ্বরের উপর আলোকপাত। আবার ত্রয়োদশ অধ্যায় থেকে অষ্টাদশ অধ্যায় পর্যন্ত ঈশ্বরের কথা থাকবে কিন্তু এতটা জোরের সাথে আর বিস্তারিত ভাবে থাকবে না। সেইজন্য অনেকে গীতাকে এইভাবে কয়েকটি ভাগে ভাগ করে নিয়েছেন – প্রথম ছয়টি অধ্যায় হচ্ছে কর্ম নিয়ে আলোচনা, সপ্তম থেকে দ্বাদশ অধ্যায় হচ্ছে ভক্তি নিয়ে আলোচনা আর ত্রয়োদশ থেকে অষ্টাদশ অধ্যায়ে জ্ঞান নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু গীতার এই রকম বিভাজনে সবাই একমত নন। প্রথমেই ভগবান বলছেন –

শ্রীভগবানুবাচ।

**ময্যাসক্তমনাঃ পার্থ যোগং যুঞ্জন্মদাশ্রয়ঃ। অসংশয়ং সমগ্রং মাং যথা জ্ঞাস্যসি তচ্ছৃণু।।১।।**

*ময্যাসক্তমনাঃ,* যার মন পুরোপুরি *ময়ি,* মানে আমাতে লেগে আছে, আর শেষে বলছেন *মদাশ্রয়ঃ,* মদাশ্রয়ঃর অর্থ হচ্ছে যার আশ্রয় একমাত্র ঈশ্বর, ঈশ্বর ছাড়া আর কিছু অবলম্বন নেই। হিন্দু ধর্মানুসারে মনুষ্য জীবনের চারটি পুরুষার্থ, অর্থাৎ মানুষ যখন জীবনে কিছু করতে চাইছে, পেতে চাইছে, সেটাকে করার জন্য, পাওয়ার জন্য যে যে উপায় আছে সেই সেই উপায়কে সে অবলম্বন করে। যেমন কেউ কর্ম করে, কেউ তপস্যা করে, কেউ দান করে, কেউ শাস্ত্র অধ্যয়ণ করে, এগুলোকে অবলম্বন করে সে জীবনে কিছু জিনিষকে লাভ করতে চাইছে। কিন্তু এগুলো থেকে একেবারেই আলাদা এক ধরণের যোগী হন যাঁরা শুধুমাত্র ঈশ্বরকেই অবলম্বন করে থাকেন, তাঁদের চিন্তা ভাবনা শুধু ঈশ্বরকেই নিয়ে। তাঁরা যা কিছু করেন সব ঈশ্বরের জন্যই করেন, তাঁর তপস্যাটাও ঈশ্বরার্থে, দান করছেন সেটাও ঈশ্বরের জন্য, মানে ঈশ্বরের কথা চারজনকে শোনাচ্ছেন এটাই তাঁর দান, ঈশ্বরে যে ভক্তি করছেন এটাই তাঁর কর্ম, মূল কথা ঈশ্বর ছাড়া তিনি আর কিছুই দেখেন না। হে অর্জুন, যিনি এই রকম আমাতে মন দিয়েছেন, যিনি আমাকেই আশ্রয় করে আছেন, তিনি নিঃসংশয়ে আমাকে যেভাবে জানতে পারে, এই ব্যাপারে সব কিছুই তোমাকে আমি পরিষ্কার করে সব বোঝাব, এটা বুঝে গেলে তোমার আর কোন সমস্যা থাকবে না, সব কিছু মানে ঈশ্বরের ব্যাপার, তাঁর ভক্তের ব্যাপার স্যাপার গুলো তোমার কাছে পরিষ্কার হয়ে যাবে।

**জ্ঞানং তেহহং সবিজ্ঞানমিদং বক্ষ্যাম্যশেষতঃ। যজ্জ্ঞাত্বা নেহ ভূয়োহন্যজ্ জ্ঞাতব্যমবশিষ্যতে।।২।।**

অর্জুন তোমাকে এমন সব কথা বলে দেব যেটা জানলে আর কিছু জানার অবশিষ্ট থাকবে না। তোমাকে তাই আমি জ্ঞান আর বিজ্ঞানের কথা বলব। বৈদিক যুগে যখন মুক্তির ধারণা অত জোরাল ছিল না তখন কর্ম, যজ্ঞ, তপস্যা, জ্ঞান এগুলোকে আলাদা করে দেখা হত না, কিন্তু পরে যখন শাস্ত্র জ্ঞান আর শাস্ত্র জ্ঞান থেকে মুক্তির ধারণা এসে গেল তখন জ্ঞানকে আলাদা করে দেওয়া হল। কারণ শাস্ত্র তো যে কোন লোকই পড়ে নিতে পারে। এখন গীতাতো ঘরে ঘরে পাওয়া যাবে, যে কোন লোকই তো গীতা পড়ে নিতে পারে, আর যার যেমন বুদ্ধি সে তেমন ভাবে কিছু একটা বুঝে নেবে। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর মুখ দিয়ে যে কথাগুলো বলেছেন সেই কথাগুলো আমরা সবাই মোটামুটি জেনে গেছি, কথামৃত পড়া মানেই ঠাকুরের কথা গুলো জেনে গেলাম। তাহলে জ্ঞানী আর অজ্ঞানীর তফাৎটা কোথায় রইল। এখন একজন কাঙালী যদি যজ্ঞ করতে যায়, সে এখন কি যজ্ঞ করবে? যদি যজ্ঞ করতে চায় তাহলে খুব হলে একজন সাধারণ কোন পুরোহিতকে গিয়ে ধরে বলবে আজকে আপনি আমার বাড়িতে একটু পূজো করে দিন। কিন্তু যখন একজন রাজা যজ্ঞ করতে চাইবে, মনে করা যাক রাজা অশ্বমেধ যজ্ঞ করতে চাইছেন। এখানে আমরা পরিষ্কার বুঝতে পারব যে রাজার ফল বিরাট আর কাঙালী যে যজ্ঞ করছে তার ফল সাধারণ। আমরা সবাই জানি যে একজন আইএএস অফিসার আর সাধারণ এক পিওনের মাইনে আলাদা। একজন কথামৃত পড়ে বলছে জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে ঈশ্বর দর্শন, আবার শ্রীরামকৃষ্ণও বলছেন জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে ঈশ্বর দর্শন, এই দুটোর মধ্যে তফাৎ আছে কি নেই? এই তফাৎটাকে বোঝাবার জন্য এনারা দুটো পরিভাষা

নিয়ে এলেন, জ্ঞান আর বিজ্ঞান। জ্ঞান হচ্ছে শাস্ত্র পড়ে যেটা যে কোন লোক বুঝে নিতে পারছে, আমি যখন পড়ে নিলাম ঈশ্বর দর্শনই হচ্ছে জীবনের উদ্দেশ্য, তখন আমার জ্ঞান হয়ে গেল। আবার যাঁরা এই জ্ঞানকে নিয়ে অনেকদিন ধরে চিন্তন করছেন, ধ্যান করছেন, নিদিধ্যাসন করছেন, এগুলো করে করে তাঁর মধ্যে যে ধারণা তৈরী হচ্ছে সেটা কিন্তু আমার আপনার জ্ঞান থেকে একেবারেই আলাদা। আবার যিনি ঈশ্বরকে সাক্ষাৎ দেখেছেন, ঈশ্বর এই রকম, তিনি আবার আলাদা। এই দুটোকে আলাদা করার জন্য বলা হচ্ছে জ্ঞান আর বিজ্ঞান। জ্ঞান হচ্ছে, গুরুমুখে শাস্ত্রের কথা শুনে যখন ঐটাকে ঠিক ঠিক বুঝে নেওয়া। চতুর্থ অধ্যায়ে কয়েকবার জ্ঞানীর কথা আলোচনা করার সময় বলা হয়েছিল, যিনি জ্ঞানী তার নামে ঠাকুর বলছেন, জ্ঞানীও কিন্তু ভয়তরাসে। যিনি জ্ঞানী তারও ভয় আছে। জ্ঞানীও বুঝে গেছে ঈশ্বরের স্বরূপ এই রকম, আমার স্বরূপ এই রকম, জগতের স্বরূপ এই রকম। কিন্তু এখনও বোধে বোধ হয়নি, ঠাকুরের ভাষায় বলতে গেলে বলা যায় দুধ খেয়ে এখনও হৃষ্টপুষ্ট হয়নি।

ঠাকুর কথামৃতে এক জায়গায় বলছেন – মেয়েদের মা দেখবে। আবার ঠাকুরই অন্য এক জায়গায় বলছেন – মা, তুমি তোমার লেজ দেখাও। মেয়ে মানে সর্পিণী, সর্পিণীকে ঠাকুর লেজ দেখাতে বলছেন, কথামৃতেই আছে। একজন আধ্যাত্মিক সাধক কিভাবে এই জিনিষটাকে দেখবে? সাধকের বিভিন্ন ধাপ আছে, যখন জ্ঞানের অবস্থায় আছে, মানে শাস্ত্র যখন পড়ে কিছু কিছু ধারণা হয়েছে, তাকে সমস্ত প্রলোভন থেকে সরে আসতে হবে। ভোগের জিনিষ দেখলেই মনে হবে যেন ৪৪০ ভোল্ট, এতে হাত দিয়েছি কি গেছি। বিজ্ঞানী দেখছেন সবটাই ঈশ্বরের রূপ। স্বামী হিরণ্ময়ানন্দজী খুব মজার লোক ছিলেন, তিনি বলতেন – সব মেয়েকেই মা দেখবি কিন্তু তাই বলে ম্যা ম্যা করে মেয়েদের পেছনে দৌড়াবি না। স্বামী হিরণ্ময়ানন্দজী জানতেন যে, এই ব্রহ্মচারী আর অল্প বয়সী সন্ন্যাসীরা এখন জ্ঞানীর অবস্থাতে আছে, জ্ঞানীরও আবার অনেক শ্রেণী বিভাগ আছে, এদের কিন্তু সবারই পতন হবার সম্ভবনা আছে। বিজ্ঞানী হচ্ছেন যিনি সব বুঝে গেছেন, বুঝে যাওয়া মানে প্রত্যক্ষ দেখতে পাচ্ছেন এটা এই রকম। এই অবস্থা থেকে আর পতনের ভয় নেই, বেতালা পা তার আর কখনই পড়বে না, শাস্ত্রে যেটাকে অধর্ম বলা হয়েছে, সেই অধর্ম কর্ম তাঁর দ্বারা আর হবে না। তপস্যা যখন করা হচ্ছে, কর্ম যখন করা হচ্ছে, দান যখন করা হচ্ছে তখন এগুলোকে আমরা পরিষ্কার বুঝতে পারি যে ইনি এই রকমই করছেন, উনি অন্য কিছু করছেন না। কিন্তু জ্ঞানের ব্যাপারে বোঝা যায় না, বিজ্ঞানের ব্যাপারে আরও আমরা বুঝতে পারিনা। এই দুটোকে আলাদা করে বোঝাবার জন্য বলা হয়েছে জ্ঞান আর বিজ্ঞান। জ্ঞান মানে শাস্ত্রে যা বলা হয়েছে সেটাকে জানা, শাস্ত্রের জ্ঞানকে চিন্তন করে, ধ্যান করে ঠিক ঠিক ধারণা করে নেওয়া যে এটা এই রকম, আর সেই ভাবে নিজের জীবনে প্রতিফলিত করার চেষ্টা করে যাওয়া। জীবনে প্রতিফলিত করার চেষ্টাকে যদি আমরা বিশ্লেষণ করি – যে অজ্ঞানী, তাকে বলে দেওয়া হয়েছে এই রকমটি করবি। কিরকম করবে? সত্যি কথা বলবি। একজন সত্যি কথা কেন বলে? কারণ তার বাবা-মা, গুরুজনরা বলে দিয়েছে তাই সত্যি কথা বলছে। কিন্তু একজন সন্ন্যাসী কেন সত্যি কথা বলেন? তখন বলবে, কেননা তিনি শাস্ত্র পড়েছেন, শাস্ত্র পড়ে জেনেছেন ঈশ্বরের আরেকটি নাম হচ্ছে সত্য, ঈশ্বরের রূপ হচ্ছে সত্য, ঈশ্বর হচ্ছেন সত্যস্বরূপ, সেইজন্য সন্ন্যাসী মিথ্যে কথা বলবেন না। তার মানে, শাস্ত্রে যেটা বলা হয়েছে সেটাকে বুঝে সেই রকম আচরণ করার চেষ্টা করছেন। কিন্তু যিনি বিজ্ঞানী তিনি সাক্ষাৎ দেখছেন ঈশ্বর সত্যস্বরূপ, এখন তিনি যদি মিথ্যে কথা বলতে চান তখন দেখেবেন কে যেন তাঁর মুখটা চেপে ধরেছে। বিজ্ঞানী ইচ্ছে করলেও মিথ্যা কথা বলতে পারবে না। এই হচ্ছে জ্ঞানী আর বিজ্ঞানীর তফাৎ। ধর্ম অধর্মের দৃষ্টি দিয়ে দেখলে এই পার্থক্য করা হয়।

ঈশ্বরের সাক্ষাৎ দর্শন মানে, তাঁর জীবনের সব কিছু পাল্টে যায়, এঁদেরকে বলা হচ্ছে বিজ্ঞানী। যখন জ্ঞানী আর বিজ্ঞানীর এই ব্যাপার গুলো যে বুঝে ফেলে তখন সে মৎতত্ত্বজ্ঞ হয়ে যায়, ঈশ্বরের তত্ত্বজ্ঞান তার হয়ে যায়। ঈশ্বরের তত্ত্বজ্ঞান যখন হয়ে যায় সে তখন সর্বজ্ঞ হয়ে যায়। আমাদের পরম্পরাতে সর্বজ্ঞ শব্দটিকে গীতা থেকে উপনিষদ থেকে শুরু করে সব জায়গায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শব্দরূপে গণ্য করা হয়। সব জায়গাতে সর্বজ্ঞ শব্দের অর্থ হয় ঈশ্বর তত্ত্বজ্ঞ। আমাদের মধ্যে অনেকেই সর্বজ্ঞ বলতে মনে করি যে তাঁর সামনে যে কোন ভাষায় কথা বললে তিনি বুঝে যাবেন, আমার গরু হারিয়ে গেছে, সর্বজ্ঞকে গিয়ে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলে দেবেন আমার গরুটা কোথায় আছে। কিন্তু তা নয়, যেটাকে জানা হয়ে গেলে সব জানা হয়ে যায়। কোনটাকে জানা হলে? ঈশ্বরের তত্ত্বকে। সর্বজ্ঞ মানে এই নয় জগতে যা কিছু আছে সব কিছুই তিনি জানেন। কিন্তু সর্বজ্ঞ হচ্ছেন যিনি ঈশ্বরের তত্ত্বটা জানেন। কিভাবে জানেন? জ্ঞানবিজ্ঞান দিয়ে। এখন যিনি বিজ্ঞানের অবস্থায় চলে গেছেন তার আর জ্ঞানের দরকার আছে কি নেই? যো সো করে ঈশ্বর দর্শন হয়ে গেছে, এখন সেতো বিজ্ঞানী হয়ে গেছে, তাহলে তার কি আর জ্ঞানের প্রয়োজন আছে? এই অধ্যায়ের নাম হচ্ছে জ্ঞানবিজ্ঞান যোগ, বিজ্ঞান হলেই হবে না, তাঁরও জ্ঞানের প্রয়োজন আছে। প্রথমে ঠাকুরের সব রকম উপলব্ধি ও দর্শন হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু পরে ঠাকুর সব শাস্ত্র শুনেছেন, শাস্ত্রে কোন জিনিষের কি রকম বর্ণনা আছে তার প্রত্যেকটি জিনিষ তিনি শুনেছেন। যার জন্য ঠাকুরকে কেউ যদি বোকার মত জিজ্ঞেস করত, আপনি তো শাস্ত্র পড়েননি, আপনি এত সব কি করে জানলেন? ঠাকুর বলছেন – আমি শুনেছি কত। ঠাকুর শাস্ত্রের কথা সব শুনেছিলেন, যার জন্য কথামৃতের কোথাও কোন শাস্ত্র বিরোধী কথা পাওয়া যাবে না। তিনি শুনেছিলেন অনেক, তাই তাঁর যখন বিজ্ঞানীর অবস্থা হয়ে গেছে তখন দেখছেন সব শাস্ত্রের সঙ্গে মিলে যাচ্ছে। যা কিছু শুনছেন, তখন তিনি বলছেন আমিও এই রকম দেখেছিলাম। এখানে জ্ঞান হচ্ছে শাস্ত্রে তত্ত্বের কথা যেমনটি বলা আছে, সেটাকে ঠিক ঠিক ধারণা করা। যিনি অবতার তাঁরও যদি জ্ঞান না থাকে তাহলে কিন্তু অসম্পূর্ণ হয়ে যাবে। এইজন্য বলছেন *অবশিষ্যতে*, যেটা

জানার পর আর কোন কিছু অবশিষ্ট থাকে না। আগের আগের যাঁরা অবতার হয়েছিলেন, যেমন যিশু তিনিও ওল্ড টেস্টামেন্টে কি আছে সব জানতেন। তুমি বিজ্ঞানী যদি হয়েও যাও, তোমাকে কিন্তু এই জ্ঞানটা নিতেই হবে। যদি জ্ঞান না নেওয়া হয় তাহলে কিন্তু অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। এইখানে যেমন বলছেন *যজ্জ্ঞাত্বা নেহ ভূয়োঽন্যজ্*, এখানে কিন্তু শুধু জ্ঞানের কথাই বলা হচ্ছে না, জ্ঞান আর বিজ্ঞান দুটোরই কথা বলা হচ্ছে। বিজ্ঞানী মানে লাউ কুমড়ো আগে ফল পরে ফুল, তাঁরা আগে বিজ্ঞানীর অবস্থায় চলে গেছেন, কিন্তু তাঁরাও শাস্ত্র শোনেন, শাস্ত্র এই ব্যাপারে কি বলেছে দেখেন। শাস্ত্র যদি না জানা থাকে তাহলে সে কিন্তু কাঁচা। এইজন্য ষষ্ঠ অধ্যায়ে বলছেন *জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা*, গীতাতে তাই বারবার এই জ্ঞানবিজ্ঞান কথাটা উল্লেখ করা হচ্ছে। যিনি অবতার তিনিও তাঁর অনুভূতিকে শাস্ত্রের সাথে যাচাই করে নিচ্ছেন, শাস্ত্র এই ব্যাপারে কি বলছে। আর আমরা তো কাঁচা অবস্থায় আছি। ঠাকুর যেটাতে আপত্তি করছেন সেটা হচ্ছে পাণ্ডিত্য। পাণ্ডিত্যের পেছনে যদি দৌড়াতে থাক, তাহলে নাম-যশের আকাঙ্খা হয়ে ঐখানেই আটকে থাকবে। জ্ঞানবিজ্ঞান অতি দুর্লভ। কেন দুর্লভ? তখন বলছেন –

**মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্ যততি সিদ্ধয়ে। যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ।।৩।।**

সারা বিশ্বে কত লোক আছে, কিন্তু তাদের মধ্যে মুষ্টিমেয় কয়েকজন এই পথে আসে। আর তাদের মধ্য থেকে মাত্র কয়েকজন আমাকে তত্ত্বতঃ জানতে পারে। এখানে কেউ কেউ জানতে পারেন যে বলছেন – *যততামহপি সিদ্ধানাং*, সিদ্ধ বলতে বোঝাতে চাইছেন যাঁরা মোক্ষ পথে আছেন। মোক্ষ পথের যারা পথিক গীতা তাদেরকেও সিদ্ধ বলছে। বাউলদের পরম্পরাতে বলে কত রকমের সাধক আছে – প্রবর্তক, সিদ্ধ ও সিদ্ধের সিদ্ধ। শঙ্করাচার্যও বলছেন, যারাই মোক্ষ পথে নেমেছেন তারাও এক ধরণের সিদ্ধ পুরুষ। এই সিদ্ধ পুরুষদের মধ্যে কেউ কেউ আমাকে জানতে পারে। এখানে মনে রাখতে হবে, যেদিন আমি আধ্যাত্মিক পথে পা রেখেছি, সেই দিন থেকেই আমাকে সিদ্ধ বলে সম্বোধন করা হবে। সন্ন্যাস মানেও তাই, যিনি তত্ত্ব জেনে নিয়ে সব কিছুকে ছেড়ে দিয়েছেন। কিন্তু সব সন্ন্যাসীরা তো তত্ত্ব জানেন না, কিন্তু তাও সন্ন্যাসী বলা হচ্ছে। তার পেছনে এইটাই কারণ। যেদিন আমি বলে দিলাম আমি সব কিছু ত্যাগ করে শুধু ঈশ্বর তত্ত্ব জানতে চাই, সেদিনই আমি সিদ্ধ নামে সম্বোধিত হওয়ার উপযুক্ত হয়ে গেলাম। এই কথা গুলো আমাদের আচার্য পণ্ডিতরা বলে গেছেন।

ঈশ্বর কি, ঈশ্বরের তত্ত্বটা কি, যে তত্ত্বটা জানার পর আর কিছু জানতে হবে না, এই সব বলে ভগবান অর্জুনের আগ্রহটা একটু বাড়িয়ে দেওয়ার পর এইবার তত্ত্ব কথা বলতে আরম্ভ করছেন। তত্ত্বের কথা বলতে গিয়ে ভগবান প্রথমে প্রকৃতির স্বরূপ সম্বন্ধে বলছেন। চার, পাঁচ ও ছয় নম্বর শ্লোকে ভগবানের প্রকৃতির বর্ণনা করা হচ্ছে। ভগবানের প্রকৃতি মানে তাঁর স্বরূপ। ভগবানের স্বরূপের বর্ণনা করতে গিয়ে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর দুটি স্বরূপের কথা বলছেন – অপরা প্রকৃতি আর পরা প্রকৃতি। অপরা প্রকৃতি হচ্ছে পদার্থ বা জড় জগৎ আর পরা প্রকৃতি হচ্ছে চৈতন্য, জড় আর চৈতন্যের কথা বলা হচ্ছে। জড় জগৎ মানে পদার্থ জগৎ এইটিও ভগবানের স্বরূপ আবার চৈতন্যও ভগবানের স্বরূপ। জড় জগতের সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলছেন –

**ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ। অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা।।৪।।**

প্রকৃতি যে ঠিক কি জিনিষ এটা বোঝা খুব মুশকিল। আমরা এই মাইক্রোফোনের স্ট্যাণ্ডটা দেখতে পাচ্ছি। এই স্ট্যাণ্ডটা লোহা দিয়ে তৈরী, আর লোহা বলতে মোটামুটি বুঝছি যে এটি একটি শক্ত নিরেট পদার্থ। এই লোহাটা আবার কি দিয়ে তৈরী হয়েছে? আমরা বলব কতকগুলি সূক্ষ্ম জিনিষের সংমিশ্রণে এটি তৈরী হয়েছে, বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে বলবে লোহার অনুর সমাবেশে তৈরী হয়েছে। এবারে এই লোহার অনুগুলিকে ভাঙতে ভাঙতে শেষে ১০৮/১১০ এ্যটমসে গিয়ে দাঁড়িয়ে যাবে। সারা বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড এই কটি জিনিষ দিয়েই সৃষ্টি হয়েছে। এই এ্যটমস গুলিকেও যদি ভাঙতে থাকে তখন ইলেক্ট্রন প্রোটন বেরিয়ে আসবে। ইলেক্ট্রন প্রোটন আবার কি দিয়ে তৈরী? এগুলোকে যখন আবার ভাঙা হবে তখন আরও সূক্ষ্ম জিনিষে পৌঁছে যাবে, যার খবর কয়েক বছর আগেও বিজ্ঞানীরা জানতেন না, এটাকে বলছেন কোয়ার্ক। এই কোয়ার্ক আবার ছয় রকমের হয়। এইভাবে পেছনের দিকে যেতে থাকে, যদিও এগুলো বিজ্ঞানের ব্যাপার।

বহু প্রাচীন কালে আমাদের সাংখ্য তত্ত্বেও এইভাবে কোন বস্তুর পেছনের দিকে অনুসন্ধান করতে গিয়ে তারা বস্তুর সূক্ষ্ম, সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর, সূক্ষ্মতর থেকে আরও সূক্ষ্মতরের দিকে পৌঁছে গিয়েছিলেন। এইভাবে সব থেকে যে সূক্ষ্মতর যেটাকে তাঁরা পেলেন সেটা হচ্ছে মহৎ (Cosmic Mind)। মহৎ এত সূক্ষ্ম যে একে বলা যাবে না যে এটা কি বস্তু না এটা অন্য কিছু। এই মহতের ঠিক ওপরে রয়েছে প্রকৃতি, মানে সবার মা। প্রকৃতিটা কি? প্রকৃতির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলা হচ্ছে, তিনটে গুণের সমষ্টি। সত্ত্বঃ, রজঃ ও তমঃ, এই তিনটে গুণের একত্র সমাহারে প্রকৃতি। এই সত্ত্বঃ, রজঃ ও তমঃ এত সূক্ষ্ম যে এটা বস্তু কণিকা না তার গুণ বলা খুব কঠিণ। যখন আমি বলছি এটা কালো রঙ, তখন এই কালো রঙটা একটা বস্তুর গুণকেই বলছি। এই বস্তুর কণিকা গুলি হচ্ছে কালো কণিকা, একটা বিশেষ আলোর তরঙ্গ এখান থেকে গিয়ে আমার চোখে প্রতিফলিত হচ্ছে, এই রঙটা যখন চোখে যাচ্ছে এটা অত্যন্ত

সূক্ষ্ম অবস্থাতে আছে। কিন্তু যখন লোহার ডাণ্ডাটাকে যখন ধরছি তখন একটা সলিড বস্তুকে ধরছি, কিন্তু চোখে অত্যন্ত সূক্ষ্ম বস্তু যাচ্ছে। প্রকৃতি এত সূক্ষ্ম যে তখন আর তাকে পার্টিকেল বলা চলে না, সেইজন্য ঐটাকে বলা হয় গুণ। এই কারণের প্রকৃতির আরেকটা নাম হচ্ছে ত্রিগুণাত্মিকা। আসলে প্রকৃতি হচ্ছে সলিড পদার্থ কিন্তু এত সূক্ষ্ম, এত সূক্ষ্ম অবস্থায় থাকে যে ঐটাকে আর পদার্থ বলা চলে না। সেইজন্য তখন একে বলা হচ্ছে তিনটে গুণ, সত্ত্বঃ, রজঃ ও তমঃ, এই তিনটে গুণ এমন ভাবে মিশে থাকে যে আলাদা করে বোঝার উপায় নেই।

প্রকৃতির উপরে কি আছে? সেই বিশুদ্ধ চৈতন্য। এখানে বলা হচ্ছে, ঈশ্বর যিনি, যিনি চৈতন্য, তিনিই আছেন। তিনি থাকার ফলে প্রকৃতির এই তিনটে গুণ, সত্ত্বঃ রজঃ আর তমঃ সাম্য অবস্থাতে রয়েছে। কিন্তু কোন এক রহস্যময় কারণে, রহস্য এই কারণেই বলা হয় যে, যখন সৃষ্টি হয়েছিল তখন তো সেখানে কেউ ছিল না, তাই কি করে জানবে যে কি করে এই সৃষ্টিটা হয়েছে, আমরা যা কিছুই সৃষ্টির ব্যাপারে বলব সেটা আমাদের চিন্তা প্রসূতই হবে, তাই এই রহস্যময় শব্দ ব্যবহার করা হচ্ছে। কোন এক রহস্যময় কারণে প্রকৃতির এই তিনটে গুণ, যেটা সাম্য অবস্থায় ছিল সেই সাম্য ভাবটা নষ্ট হয়ে যায়। যেই সাম্য ভাবটা নষ্ট হয়ে গেল তখন এই তিনটে গুণ পরস্পরে বিভিন্ন অনুপাতে মিশতে শুরু করে, যখন এইভাবে পরস্পর মধ্যে মিশ্রণ প্রক্রিয়া শুরু হয় তখন এদের সেই সূক্ষ্ম ভাবটা যেন একটু কমতে থাকল। সূক্ষ্মভাবটা যেই কমতে থাকল তখন সেখান থেকে মহৎ মনের সৃষ্টি হল। মহৎ মনের মধ্যে তখন চিন্তার কাজ শুরু হয়। মহৎ নিজে চিন্তা করে না, তার পেছনে যে চৈতন্য আছে, সেই চৈতন্য মহৎ এর উপর প্রতিফলিত হতে শুরু করে দেয়, আর এই চৈতন্যের শক্তিতে সে চিন্তা করার ক্ষমতা পেয়ে যায়। চৈতন্য যখন মহতের মধ্যে প্রতিবিম্বিত হয় তখন মহৎ যেন চৈতন্যময় হয়ে যায়। কি রকম? যেমন এই টিউব লাইটটা কাঁচের, এই কাঁচটি আবার স্বচ্ছ, কিন্তু আমরা দেখছি সাদা কাঁচ। কারণ কাঁচের উপর এক ধরণের রাসায়নিক পাউডারের সাদ প্রলেপ দেওয়া থাকে, আর তার ভেতরে গ্যাস দেওয়া থাকে। যখন বিদ্যুতের তরঙ্গ টিউব লাইটের মধ্যে যাচ্ছে তখন টিউব লাইটের মধ্যে যে গ্যাস আছে সেই গ্যাসের পার্টিকেলস গুলি আইয়োনাইজড হয়ে যায়। যেই আইয়োনাইজড হয়ে যায় তখন ঐ পাউডারটাকে সেটা চনমনে করে দেয়, তখন মনে হয় যেন টিউব লাইটটা জ্বলে উঠেছে, আসলে টিউব লাইটে আলো জ্বলে না, পাউডারটা বিদ্যুতের স্পার্ক যেটা যাচ্ছে সেটাকে ধরে নেয়, তখন মনে হয় টিউব লাইটা যেন জ্বলে উঠল। আমরা মনে করছি টিউবের কাঁচটা যেন জ্বলে আছে। তাহলে বলবে কাঁচের গায়ে যে পাউডারের প্রলেপ আছে সেটা জ্বলছে। না, পাউডারের প্রলেপটাও জ্বলছে না। তাহলে জ্বলছেটা কি? তাহলে তার ভেতরে যে গ্যাস রয়েছে সেটা জ্বলছে। না, গ্যাসও জ্বলছে না, গ্যাস পার্টিকেলস গুলো আইয়োনাইজড হয়ে গেছে, আবার তারও পেছনে আছে ইলেক্ট্রিক্যাল চার্জ। ইলেক্ট্রিক্যাল চার্জ হচ্ছে বলে গ্যাস পার্টিকেলস আইয়োনাইজড হচ্ছে, গ্যাস পার্টিকেলস আইয়োনাইজড হচ্ছে বলে কোটিনটা ঝলমল করে উঠছে, তারই জন্য পুরো কাঁচটাকে আলোকিত মনে হচ্ছে। আমি যদি বলি টিউবলাইট আলো দিচ্ছে, তাহলে কি ঠিক বলা হবে? না, টিউবলাইট আলো দেয় না, ইলেক্ট্রিসিটি আলো দিচ্ছে।

এটা কিন্তু একটা উপমা, উপমা দিয়ে কোন জিনিষকে কখন প্রমাণ করা যায় না, জিনিষটা বোঝার জন্য উপমা নিয়ে আসা হয়। ঠিক তেমনি আমরা যে এই মহৎ কে চৈতন্য বলছি, মনটা হচ্ছে ঐ সাদা কোটিনের মত। প্রকৃতির তিনটে গুণের সাম্য ভাবটা যখন নষ্ট হয়ে যায়, এই নষ্ট হয়ে যাওয়ার ফলে যখন মহৎ মনের সৃষ্টি হয়ে গেল তখন যেন একটা কোটিন এসে গেল। ঈশ্বরের চৈতন্য যখন তার উপরে এসে পড়ে তখন মন যেন আলোকিত হয়ে ঝলমল করে ওঠে। এই ঝলমল যখন করে ওঠে এটাকে যখন আমরা উল্টো দিক থেকে দেখি তখন বলি ওর কি বুদ্ধি। যে বুদ্ধিকে দেখে আমরা চমকিত হচ্ছি, ওটা আসলে হচ্ছে চৈতন্যেরই প্রতিবিম্ব।

আমরা দেখতে পাই কিছু কিছু টিউব লাইট পিট পিট করে জ্বলছে নিবছে, আবার কিছু টিউব লাইট ভালো আলো দিচ্ছে না। কেন এরকম হয়? টিউবের মধ্যে যে কোটিন দেওয়া রয়েছে, সেটা পড়ে থেকে থেকে নিস্তেজ হয়ে যায়, তখন আর ভালো আলো আসে না। যাদের বুদ্ধি কম, মন্দ বুদ্ধি, বুঝতে হবে ওদের মনের যে পার্টিকেলস গুলো রয়েছে, সেগুলো ভোঁতা হয়ে গেছে। মনটাও একটা জড় পদার্থ, কিন্তু খুব সূক্ষ্ম বস্তু কণিকা দিয়ে তৈরী। সেইজন্য ভগবান সপ্তদশ অধ্যায়ে বলবেন কি কি খাওয়া দাওয়া করলে বুদ্ধিটা একটু তীক্ষ্ণ হবে। প্রথমেই তাদের মাছ-মাংস খাওয়া বারণ করা হয়। বুদ্ধির পার্টিকেলস গুলো যদি ভারী হয়ে যায় তাহলে কিন্তু চৈতন্যের প্রতিফলন ঠিক মত হতে পারেনা।

এখানে ভগবান পর পর বলে গেছেন কিভাবে অপরা প্রকৃতি সৃষ্টি হচ্ছে – এই মন, অহঙ্কারের পর পঞ্চ তন্মাত্রা, তারপর ইন্দ্রিয়গুলো আসছে, এইগুলোকে বলা হচ্ছে ভগবানের অষ্টধা প্রকৃতি, এগুলো ভগবানের নিকৃষ্ট প্রকৃতি, আরেকটি প্রকৃতি হচ্ছে পরা –

**অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্। জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্যতে জগৎ।।৫।।**

পরা প্রকৃতিকে বলা হচ্ছে প্রকৃষ্ট আর অপরা প্রকৃতি হচ্ছে নিকৃষ্ট। কেন? অপরা প্রকৃতি জীবকে সংসারে বাঁধে কিন্তু পরা প্রকৃতি বন্ধন মুক্ত করে দেয়। এটাকেই ঠাকুর বলছেন বিদ্যা শক্তি আর অবিদ্যা শক্তি। গীতাতে বিদ্যা শক্তি ও অবিদ্যা শক্তি বলা হয় না, এখানে বলা হয় পরা প্রকৃতি আর অপরা প্রকৃতি। অপরা প্রকৃতি হল পদার্থ জগৎ আর পরা প্রকৃতি হচ্ছে চৈতন্য। আমরা যে জীবন দেখছি, প্রাণীর যে জীবন, যে জীবন সমস্ত প্রাণীকে ধরে রেখেছে, পরা প্রকৃতির জন্যই জীবন ধরে রাখতে পারছে। অপরা প্রকৃতিতে জীবন ধারা চলতে পারে না। এই যে ডাস্টারটা রয়েছে, এটাও অপরা প্রকৃতি, কিন্তু এর মন এত স্থূল অবস্থাতে আছে যে, একে আমি যদি বলি এই বোর্ডাকে মুছে দাও, ও পারবে না। এর মন কিন্তু আছে কিন্তু একেবারে জড় অবস্থাতে আছে, এর মধ্যে কিন্তু চৈতন্য যেটা সেই পরা প্রকৃতি নেই। ফলে পরা প্রকৃতি আর অপরা প্রকৃতির এই তফাৎ থেকেই জীবন তৈরী হয়।

*জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্যতে জগৎ*, বলছেন – ঈশ্বর নিজে প্রবেশ করেন। কোথায়? তাঁর নিজেরই প্রকৃতিতে। এই তত্ত্বটি আমরা বেদে আগেই পেয়েছি, তিনি নিজে এটাকে সৃষ্টি করলেন, সৃষ্টি করে তিনি নিজেই এটাতে প্রবেশ করে গেলেন। যেমন আমি একটা বাড়ি তৈরী করলাম, তৈরী হয়ে গেলে আমি এবার তার মধ্যে বসবাস করতে থাকলাম। ঈশ্বরই আছেন, তিনি ছাড়া আর কিছু নেই। কিন্তু তাঁরই একটা খুব ছোট্ট অংশ অপরা প্রকৃতি হয়ে যায়। ঐ অপরা প্রকৃতিতে আবার তিনি নিজেই পরা প্রকৃতি হয়ে, চৈতন্য রূপে ঢুকে পড়েন। যেই ঢুকে পড়লেন সেখান থেকেই সৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। সৃষ্টি করতে গেলে দুটোই লাগবে, পরাও লাগবে অপরাও লাগবে। এই জিনিষটাকে কাহিনী রূপে পুরাণে বলবে, প্রজাপতি নিজেকেই পুরুষ আর নারীতে বিভক্ত করে নিল। জড় আর চৈতন্য এই দুজন না হলে সৃষ্টি হবে না।

জড় আর চৈতন্য যখন সাংখ্যে আসবে তখন সেখানে এই দুটোকে বলবে প্রকৃতি আর পুরুষ নামে। পুরুষ আর প্রকৃতি, পরা আর অপরা, জড় আর চৈতন্য, বিদ্যা অবিদ্যা যেটাই বলা হোক না কেন, এই দুটোই হচ্ছে অনাদি, অনন্ত কাল থেকে পর পর চলে আসছে। সাংখ্য মতে পুরুষ আর প্রকৃতি, চৈতন্য আর জড় দুটো নদীর ধারার মত সমান ভাবে চলে আসছে। মাঝে মাঝে এরা দুজন খুব কাছাকাছি এসে মিলে যাবে, তারপর একসাথে কিছু দিন চলার পর আলাদা হয়ে যাবে, আবার কিভাবে এরা দুজনে কাছাকাছি চলে এলেই সৃষ্টির প্রক্রিয়াও শুরু হয়ে যায়। বাংলা চার কিংবা ইংরাজী আটকে আড়াআড়ি করে লিখলে যে রকম দেখাবে (∞∞∞) এইভাবে জড় আর চৈতন্য একবার এক হয়ে যাচ্ছে, কিছু দিন একসাথে চলার পর আবার ছাড়াছাড়ি হয়ে যাচ্ছে – পুরুষ আর প্রকৃতি মিলে গেল সৃষ্টি শুরু হয়ে গেল, আবার দুজন যখন আলাদা হয়ে যায় তখন সৃষ্টি বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, আবার জুড়ে যাবে আবার সৃষ্টি হতে থাকবে, আবার আলাদা হয়ে যাবে সৃষ্টিও আবার বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। এই ভাবে চলতেই থাকবে এর কোন সমাপ্তি নেই, সৃষ্টি হয়ে কিছুদিন চলবে আবার সৃষ্টি ধ্বংস হয়ে যাবে এইটাই অনাদি কাল থেকে চলে আসছে আর অনাদি কাল ধরে চলতেই থাকবে।

আমাদের হিন্দু ধর্মে যত দর্শন আছে সব কটি দর্শনের পিতা হচ্ছে সাংখ্য দর্শন। সাংখ্য দর্শন মতে পুরুষ অনাদি, প্রকৃতিও অনাদি। যখন এদের মিলন হয় তখন সৃষ্টি হয় যখন বিচ্ছেদ হয়ে যায় তখন সৃষ্টি থেমে যায়। সাংখ্যের এই মতটাকে মেনে নিলে সব কিছুর সমস্যা সমাধান হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু বেদান্তীরা বলবেন, বিশেষ করে শঙ্করাচার্য বলছেন, আমরা যদি সাংখ্যের এই মতটা নিয়ে নিই, তাহলে কিন্তু শাস্ত্রে ঈশ্বরের যে সর্বজ্ঞত্ব, সর্বশক্তিমানের কথা যেটা বলা হয়েছে সেই ঈশ্বরের প্রয়োজন শেষ হয়ে যাচ্ছে। সাংখ্য বহু যুগ আগে যেটা বলেছিল, প্রকৃতি আছে আর পুরুষ আছে, জড় আছে আর চৈতন্য আছে, জড় আর চৈতন্যের মিলনে সৃষ্টি হচ্ছে, জড় থেকে চৈতন্য যখন বেরিয়ে যাচ্ছে তখন আর সৃষ্টি নেই, দুটো পুরো আলাদা হয়ে গেছে। তাহলে আমরা পাচ্ছি চৈতন্য, জড় আর পাচ্ছি চিজ্জড়গ্রন্থি, চিজ্জড়গ্রন্থিতে সৃষ্টি হয়ে যাচ্ছে। আজকে বিজ্ঞানতো এই একই কথা বলছে, বিগ্ বাং থেকে শুরু করে ব্ল্যাকহোল পর্যন্ত এই একই কথা বলা হচ্ছে। বিজ্ঞান বলে এই জড়ের মধ্যে কোন একটা ভাবে এনার্জি সক্রিয় হয়ে ঢুকে পড়ে, তাহলে সবইতো মেনে নেওয়া হয়ে গেল। সাংখ্য দর্শনকে তাই খুব যুক্তিযুক্ত বলে মানা হয়, আর বেদান্ত পুরো সাংখ্য দর্শনের উপরে নিজেকে বসিয়ে রেখেছে। এই যে আমরা গীতার আলোচনা করতে গিয়ে কতবার ত্রিগুণাত্মিকা বলছি, এই ত্রিগুণাত্মিকা শব্দ সাংখ্য দর্শন থেকে এসেছে, পুরুষ প্রকৃতির ধারণা সাংখ্য থেকে এসেছে, মুক্তির ধারণা সাংখ্য থেকেই এসেছে, ঐযে পুরুষ প্রকৃতির মেলবন্ধন হচ্ছে, ঐটা থেকে সরে যাওয়াটাই পুরুষের মুক্তি। সব কিছুই সাংখ্য থেকে এসেছে। সাংখ্যের কোন কথাকে এরা না করছেন না। স্বামীজীও বলছেন কপিল মুনি হচ্ছেন ভারতীয় দর্শনের জনক। বাবা যদি গোলমাল করে থাকেন তাহলে তো সব কিছুই গোলমেলে হয়ে যাবে।

সাংখ্যে আর বেদান্তে তফাৎ আছে, আর তফাৎটাও খুব গুরুত্বপূর্ণ তফাৎ। গীতাতে সাংখ্য দর্শন আর বেদান্ত দর্শনকে সমন্বয় করা হয়েছে। সেইজন্য ভাসা ভাসা কেউ যদি গীতা পড়ে তাহলে গীতা কি বলতে চাইছে সেটা ধরতেই পারবে না। সাংখ্যের সাথে বেদান্তের অনেক কিছুই মিলবে না, কিন্তু গীতাতে সাংখ্য দর্শন দিয়েও বলা হয়েছে আবার বেদান্তের দৃষ্টি দিয়েও বলা হয়েছে। সেইজন্য উপযুক্ত আচার্যের কাছে গীতা না পড়লে সব কিছুই গুলিয়ে যাবে। সাংখ্য বলছে পুরুষ আর প্রকৃতি এই দুটো যদি থাকে

তাহলেই আমার সব কিছু ব্যাখ্যা করে দেওয়া হল। বেদান্ত বলবে – হ্যাঁ, তুমি ঠিকই বলছ, সব কিছুই ব্যাখ্যা করে দেওয়া যাবে, কিন্তু একটা জায়গায় গোলমাল থেকে যাবে। তুমি পুরুষ আর প্রকৃতির কথা বলছ এটা তুমি শাস্ত্রকে আধার করে বলছ। যদি তাই হয়, তাহলে শাস্ত্র বলছে ঈশ্বর হচ্ছেন সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান, কিন্তু পুরুষ আর প্রকৃতিই যদি সব কিছু করে নেয় তাহলে ঈশ্বরের সর্বজ্ঞত্ব, সর্বশক্তিমানের তত্ত্বটা কোথায় যাবে। সাংখ্য বলবে, আমি যদি পরিষ্কার ব্যাখ্যা করে দিতে পারি তাহলে তার জন্য ঈশ্বরের আর কি প্রয়োজন আছে। আমার হাতে যদি আমি নিজেই জোরে একটা ঘুষি মারি, তাতে আমার হাতে যদি ব্যাথা হয়ে যায়, তাহলে এর ব্যাখ্যা করার জন্য কি আর ঈশ্বরের দরকার হবে? এটা তো পরিষ্কার নিউটনের ল'জ অফ মোশান, যদি জোরে মারা হয় তাহলে ব্যাথা লাগবে। আপনি রান্না করে খেলে আপনার পেট ভরবে এতে ঈশ্বরের ইচ্ছার কোথায় প্রয়োজন আছে। কিন্তু বেদান্ত এই একই কথা বলবে – তুমি যাকে আধার করে এই সব কথা বলে যাচ্ছ, সেখানে পরিষ্কার বলা আছে যে ঈশ্বর হচ্ছেন সর্বশক্তিমান, আর সৃষ্টির যে শেষ কথা তাতেই যদি ভগবানের কোন নিয়ন্ত্রণ না থাকে তাহলে ভগবানের ভগবানত্ব কোথায় থাকল। যেটা ঠাকুর বলছেন – যে বাবুর বাগান নেই সেই বাবু কিসের বাবু। যে ভগবান সৃষ্টি সংহার কিছুই করতে পারছেন না, তাহলে সেই ভগবান কিসের ভগবান। তাহলে এই দুটোকে মেলানো হবে কিভাবে? সাংখ্যরা মানতে চায় না। বেদান্ত সাংখ্যের আরও কিছু কিছু ব্যাপারে আপত্তি জানায়। তখন তারা নিয়ে আসেন যোগদর্শন। যোগদর্শনে ঈশ্বরের কথা বলবে ঠিকই, কিন্তু এরাও বলে ঈশ্বরের কোন দরকার নেই। তিনি উপস্থিত থাকলেই এই সব হয়ে যায়। ঈশ্বর আছেন, আর আছেন বলেই তাঁর সন্নিধি মাত্রেই এই জিনিষ গুলো হতে থাকে। সেই পুরুষ আর প্রকৃতি আছে, আর এই অষ্টধা প্রকৃতিও পাল্টাচ্ছে না, ভগবান কোথাও বাইরে রাজার মত বসে আছেন। তিনি আছেন বলেই এগুলো হচ্ছে। সাংখ্যের যোগদর্শনে ঈশ্বরের একটা গুরুত্ব দেওয়া হল, কিন্তু সম্পূর্ণ গুরুত্ব দেয়নি। বেদান্ত আবার এটাকে আরেক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যাবে, এগিয়ে নিয়ে সাংখ্যবাদীদের বলবে – এই যে তুমি পুরুষ আর প্রকৃতির কথা বলছ, এই দুটো ভগবানরই রূপ, যেটা এখানে গীতা বলছে – পরা প্রকৃতি আর অপরা প্রকৃতি। ভগবানের উপস্থিতিতে সব হচ্ছে তা নয়, এগুলো ভগবানরই রূপ। ঈশ্বর থেকেই এই সব কিছু হচ্ছে। এই ব্যাপারটাকেই গীতা এখানে আলোচনা করছে।

সাংখ্যের অনাদি তত্ত্ব মানে অনন্ত কাল ধরে সৃষ্টি, স্থিতি আর প্রলয় চলছে, আর কিছু কিছু পুরুষ প্রকৃতির মধ্য থেকে বেরিয়ে চলে আসতে পারবে, এই দুটো মত গীতাতে থেকে গেল, কোন আপত্তি নেই। কিন্তু প্রকৃতি থেকে বেরিয়ে পুরুষ কোথায় যাচ্ছে তখন? ঈশ্বরের নির্গুণ নিরাকারে চলে যাচ্ছে। এই ঈশ্বর হচ্ছেন বেদান্তের ঈশ্বর, গীতারও। ঈশ্বর অনন্ত, এই অনন্তের মধ্যে অনন্ত পুরুষ অনন্ত প্রকৃতি। সাংখ্য মতে পুরুষ হচ্ছে অসংখ্য। আমরা সবাই আলাদা আলাদা পুরুষ, এখানে পুরুষ মানে ব্যাটাছেলে কে বোঝাচ্ছে না, এই পুরুষের মধ্যে নারী পুরুষের কোন ব্যাপার নেই। এই অনন্ত পুরুষের মধ্যে কোন এক পুরুষের হঠাৎ নজর পড়ল যে, এই প্রকৃতির পাল্লায় পড়ে আমি কি সব করছি। সে তখন বলছে প্রকৃতির কোন কিছুই আমার লাগবে না। তখন এই প্রকৃতি থেকে বেরোবার জন্য এই পুরুষ আপ্রাণ চেষ্টা করতেই থাকবে। একদিন দেখা গেল সে এই পুরুষ আর প্রকৃতির নদী থেকে উঠে যাচ্ছে। উঠে যেতেই দেখে তার সামনে অনন্ত, এই যে বিরাট অনন্ত, এই অনন্তের সঙ্গে সে এক। যখন সে দেখে নিল আমি এই বিরাটের সঙ্গে এক, তখন প্রকৃতি তাঁকে এর পরে আর কোন মতেই ধরে রাখতে পারবে না।

দ্বিতীয় ব্যাপার যেটা হচ্ছে সেটা শাস্ত্র মতে, প্রকৃতির বন্ধন থেকে বেরিয়ে এসে এই বিরাটের সঙ্গে নিজেকে এক দেখে। এতক্ষণ যে সে এই পুরুষ আর প্রকৃতিকে আলাদা আলদা দেখছিল, অসংখ্য পুরুষ, আদপে এগুলো কিছুই না, তিনি ছাড়া আর কিছুই নেই। আর তিনি হচ্ছেন অদ্বিতীয়, তিনি এক নয় দুইও নয়, এক দুইয়ের পার। আমাদের শাস্ত্র যখন কিছু বলছে, তখন শুরু করে আমরা যেখানে যে অবস্থায় আছি সেখান থেকে, তারপর নিয়ে চলে যাচ্ছে একেবারে অদ্বৈতে। কিভাবে? আমি আছি, জড় আছে, চৈতন্য আছে, আমি আর আপনি আলাদা, পুরুষ অসংখ্য, নদীর মত চলছে, প্রকৃতি হচ্ছে জড়, সেও অনন্ত নদীর মত চলছে। প্রকৃতি আর পুরুষ যেখানে যেখানে এসে মিশছে সেখানে সেখানে সৃষ্টির খেলা চলছে। যখনই পুরুষ আর প্রকৃতি আলাদা হয়ে যাচ্ছে তখনই সৃষ্টি থেমে যাচ্ছে। এখন যার মুক্তির ইচ্ছে হল সেটা একজনেরই হবে, ওর যখন মুক্তির ইচ্ছা হল, আর যখন মুক্ত হয়ে গেল তখন সে দেখে, আমি যে এতক্ষণ ভাবছিলাম, পুরুষ আর প্রকৃতি আলাদা, এখন দেখছি ঈশ্বরেরই পুরুষ আর প্রকৃতি, আর এই যে অসংখ্য পুরুষ ছিল, কোথাও কোন অসংখ্য কিছু নেই, তিনি ছাড়া আর কিছু নেই। তিনি হচ্ছেন অনন্ত, এই অনন্তকেই অসংখ্য পুরুষ বলে আমার বোধ হচ্ছিল। কেন বোধ হচ্ছিল? মায়ার দরুণ, আমি মায়াতে আবদ্ধ ছিলাম বলে অসংখ্য দেখছিলাম। এখন দেখছে সব সেই এক, এক ছাড়া আর কিছু নেই, তুইও যা আমিও তাই। এটাই হচ্ছে আধ্যাত্মিক জগতের শেষ কথা।

এই জিনিষ গুলো কিভাবে হয়, বিশেষ করে সৃষ্টি কেন হয় এর উত্তর কোন ধর্ম কোন দিন দিতে পারবে না। একটা জায়গার পর তাঁরা আর কিছু বলতে পারেন না। কারণ আমাদের যা কিছু জানার সেটা মনের দ্বারাই জানতে পারি, মন হচ্ছে সীমিত, মনের বাইরে কি আছে সেটাকে কি করে বলতে পারবে। একটা বাচ্চা ছেলেকে জন্ম থেকে যদি একটা ঘরে তালা বন্ধ করে রেখে দেওয়া হয়, আর সেখানে সে বড় হচ্ছে। এখন এই ঘরের মধ্যে যা কিছু আছে সে বলে দিতে পারবে, কিন্তু ঘরের বাইরে কি আছে সে বলতে পারবে না। ঠিক তেমনি আমরা জন্ম জন্ম ধরে মনের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে আছি, মনের বাইরে কি আছে আমরা কি করে

বলব। তবে এনারা ধরেই নেন যে এই ঘরের মধ্যে যা কিছু আছে, ঘরের বাইরে এই রকমই কিছু আছে। এইভাবে একটা যুক্তি তর্ক দিয়ে এটাকে ব্যাখ্যা করেন। এর সাথে এটাও সত্য যে, এক আধ জন কেউ আছেন যাঁরা ঐ বদ্ধ ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে পারেন। বাইরে যখন চলে আসছেন, তখন তাঁরা একটা কিছু দেখছেন কিন্তু বোঝাতে পারছেন না। কিছু আভাস মাত্র দিচ্ছেন, তাঁর অত্যন্ত কাছের যারা শিষ্যরা আছে তারা সেই জিনিষটাকে শুনছে। এখন এই শিষ্যদের মধ্যে আবার যার তুখোড় বুদ্ধি সে তার বুদ্ধি দিয়ে ঐ আভাসের কথা শুনে একটা তত্ত্বকে দাঁড় করিয়ে দেয়। এখন এই তত্ত্বটা ঠিক না ভুল এটা কেউই বলতে পারবে না। কোন দার্শনিকই বলতে পারবে না যে, এই তত্ত্বটা পুরোপুরি সঠিক না ভুল। সেইজন্য সৃষ্টি কেন হয়, কিভাবে হয়, কেউ বলতে পারে না। নাসদীয় সূক্তে সরাসরি বলে দিচ্ছেন – সৃষ্টি কি করে হয়েছে কে জানবে, কারণ তখন দেবতাদেরই জন্ম হয়নি।

অধ্যাত্ম শাস্ত্রের একটাই লক্ষ্য মুক্তি। তুমি আছ এটা বুঝতে পারছতো? তুমি এখানে কষ্টে আছ এটা অনুভব করতে পারছতো। যদি কষ্টটা অনুভব করতে পার, আর এই কষ্ট থেকে রেহাই পেতে যদি চাও তাহলে বেরোবার উপায়টাকে জানবার চেষ্টা কর। তোমার উদ্দেশ্য হচ্ছে এখান থেকে বেরনো, যখন বেরিয়ে আসবে তখন তোমার কাছে সব কিছু স্পষ্ট হয়ে যাবে। তার আগে যদি তোমার দু'চারটে প্রশ্ন থাকে, তার উত্তর আমরা এইভাবে ব্যাখ্যা করে দেব। এই প্রশ্নের উত্তরে তোমার মন শান্ত হয়েছে? যদি বল না হয়নি, তাহলে এই পথ তোমার জন্য নয়। আমাদের প্রত্যেকটি ধর্মশাস্ত্রে প্রথমেই বলে দেবে, যেমন এই গীতা যখন অধ্যয়ণ করতে আসবে তখন বলে দেবে এই গীতা পাঠের কে অধিকারী। যে কোন শাস্ত্র যখন সৃষ্টি হয় তখন বলে দেওয়া হয় এটা কার জন্য লেখা হয়েছে, এর বিষয় কি, তারপর সম্বন্ধ আর প্রয়োজন। এই শাস্ত্র পড়লে আমার কি লাভ হবে। বলবে এই শাস্ত্র পড়লে তোমার মুক্তি হবে। আমি বলতে পারি আমি মুক্তি চাইনা, তাহলে এই শাস্ত্র আমার জন্য নয়।

গীতা থেকে আরম্ভ করে যত শাস্ত্র আছে, কোথাও বলবে না যে আমি ভগবান থেকে শুরু করে যা আছে সব ব্যাখ্যা করে দিয়েছি। কোথাও একটু হাল্কা ছুঁয়ে বুঝিয়ে দিয়ে বলে দেবে আমরা এর বেশি আর কিছু বলতে পারছি না। কিন্তু আমাদের সাধারণ মন ব্যাখ্যা চায়, যুক্তি চায়। তখন সেটাকেই একটা কাহিনীর মাধ্যমে যুক্তির দ্বারা এমন ভাবে বলে দেবে যাতে আমাদের মনটা পরিষ্কার হয়ে শান্ত হয়ে যায়। এই যে পুরুষ আর প্রকৃতির কথা বলা হয়, এই পুরুষ আর প্রকৃতিকে কি কেউ কোন দিন দেখেছে? পুরুষ আর প্রকৃতি একটা মিলনের ব্যাপার, যখন মিলন হচ্ছে সৃষ্টির প্রক্রিয়া শুরু হল তারপর এক এক করে কি হচ্ছে সেটাকে দেখার কেউ না কেউ আছে, কিন্তু যখন পুরুষ আর প্রকৃতির ছাড়াছাড়ি হয়ে যাচ্ছে, আর ছাড়াছাড়ি হওয়ার পর কি হচ্ছে সেটা তখন কে দেখবে, ভগবান ছাড়া তো আর কারুর দেখার কোন সুযোগ নেই। আমরা তো আর ভগবান নই, তাহলে আমরা জানব কি করে? যেটা হচ্ছে সেটা ধারণা করা ছাড়া আর কোন উপায় নেই। প্রাথমিক ভূমিকায় আমরা আমাদের সাধারণ যুক্তি দিয়ে বুঝি যে যেভাবে আমরা জগৎকে দেখছি এটা যেন এইভাবেই হয় আর এইটাই নিয়ম, এর বাইরে আর কিছু জানিনা। আর এই পুরুষ প্রকৃতির যে মিলনের কথা বলা হচ্ছে এটা সাধারণ দার্শনিকদের নয়, এগুলো হচ্ছে ঋষিদের আবিষ্কার। তাঁরা সাধনা করে করে শুদ্ধ মনের অধিকারী হয়ে যেটা উপলব্ধি করে আমাদের বলেছেন সেটাকে আমরা মেনে নিয়েছি। এটাকে মেনে নিয়ে তুমি যদি সেইভাবে চলতে পার তাহলে তোমারও মুক্তি হয়ে যাবে। আমার প্রকৃত প্রয়োজনটা কি? আমার প্রয়োজন হচ্ছে এই দুঃখ কষ্টের যন্ত্রণা থেকে মুক্তি। ঋষিরা আমাদের পথটা দেখাচ্ছেন। আমার যখন প্রচণ্ড ক্ষুধা থাকে, ক্ষুধার সময় বাড়িতে মা তখন যা খেতে দেন তখন আমি মাকে পাঁচটা প্রশ্ন করিনা যে কিভাবে রান্না হল, সব্জীটা কোন্ দোকান থেকে কেনা হয়েছে। আর যদি মাকে বলি আমাকে ঠিক ঠিক উত্তর না দিলে আমি খাবোই না, তাতে কার কি হবে মাঝখান থেকে আমি অভুক্ত থেকে খিদের জ্বালায় কষ্ট পাব। আমাদের বেশির ভাগ প্রশ্নই অবান্তর, আর বেশ কিছু প্রশ্নের উত্তর সাধন সাপেক্ষ। ঠিক ঠিক সাধনা করলেই অনেক প্রশ্নের উত্তর নিজে থেকেই পাওয়া যায়।

অপরা প্রকৃতির আরেকটি নাম হচ্ছে ক্ষেত্র, পরা প্রকৃতির আরেকটি নাম ক্ষেত্রজ্ঞ। ত্রয়োদশ অধ্যায়ে এই ক্ষেত্র আর ক্ষেত্রজ্ঞের ব্যাপারে ভগবান আবার অর্জুনকে বলবেন। এখন ভগবান বলছেন যা কিছুই এই জগতে হচ্ছে সৃষ্টি, প্রলয়, যাইই হোক না কেন এই দুটো প্রকৃতির জন্যই সব হচ্ছে। এখন তাই বলছেন –

**এতদ্‌যোনীনি ভূতানি সর্বাণীত্যুপধারয়। অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা।।৬।।**

এই দুটো প্রকৃতিই আমার, আমি শ্রীকৃষ্ণ, আমিই ভগবান, আর জগতের যা কিছু হচ্ছে এর কারণ আমি। জগতের স্থিতির কারণ আমি, জগতের সৃষ্টির কারণ আমি আর এই জগতের সংহারের কারণও আমি। কিভাবে এগুলো করছি? পরা আর অপরা প্রকৃতির মাধ্যমে। পরা আর অপরা প্রকৃতিটা কার? ওটা কারুর নয় ঐ দুটো প্রকৃতি আমি নিজেই। আমার এই উভয় প্রকৃতি থেকে সমস্ত জড় ও চেতন উৎপন্ন হয়েছে, এটা তুমি ধারণা কর। যেমন এই রথটা তোমার কিন্তু রথটা তুমি নও। এই প্রকৃতি কিন্তু রথের মত নয়, এটা আমিই, আমারই একটা অঙ্গ। আমি হচ্ছ অনন্ত, তাই এই পরা ও অপরা প্রকৃতিও অনন্ত। আর অপরা প্রকৃতিতে যে রূপটা পাল্টে যাচ্ছে তাতে আমার কিছু হচ্ছে না, যেটা পাল্টে যাচ্ছে সেই রূপটাও আমার, আবার পরাটাও আমারই রূপ।

পুরুষসূক্তমে ব্যাখ্যা করছে, যখন পুরুষের থেকে সব সৃষ্টি হচ্ছে তখন পুরুষের কোন অংশ কমে যাচ্ছে তা নয়, ঐটাই পুরুষের রূপ, কারণ পুরুষ অনন্ত। তারপর বলছেন –

**মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়। ময়ি সর্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব।।৭।।**

আমার বাইরে কিছু নেই, সৃষ্টি, প্রলয় যা কিছু বল আমা ব্যতিরেকে কিছু নেই। আমার থেকে যে কিছু সর্বশ্রেষ্ঠ হবে, সেটা তো দূরের কথা, আমার বাইরেই কিছু নেই। এই জগতে যা কিছু আছে, জীব, জগৎ, চেতন, অচেতন, প্রাণী সব আমাতেই অবস্থিত, মালাতে যেমন নানা রকমের পাথর বা মুক্তো রয়েছে, কিন্তু কেউ আলাদা নেই, সবাইকে একটা সূতো যেন একসূত্রে বেঁধে রেখেছে, আমি হচ্ছি সেই সূতোটা। পরা ও অপরা প্রকৃতি, সেখান থেকে জীব, জগৎ, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার যাবতীয় যা কিছু আছে সব আমাতেই গ্রথিত, আমি আছি বলেই এই সব কিছু আছে, আমি না থাকলে এগুলোর কোন মূল্য নেই। আর যে জিনিষগুলো তুমি দেখছ সেগুলো কি? সেইগুলোও আমি। ঈশ্বর সৃষ্টি করেছেন বললেই আমাদের প্রথমে মনে হয়, কুমোর যেমন মাটি দিয়ে হাড়ি কলসি তৈয়ার করে ঈশ্বরও সেই রকম মাটি নিয়ে আমাদের এই জগৎ সৃষ্টি করে আমাদেরও তৈরী করলেন। কিন্তু তা নয়, তিনি একবার পরা আর অপরা প্রকৃতিকে ছেড়ে দিয়েছেন, আর পরা প্রকৃতি আর অপরা প্রকৃতি অনন্ত কালের জন্য চলতেই থাকছে, এর আর থামার বিরাম নেই। আর এই প্রকৃতি দুটোও তিনি নিজে।

এটা হচ্ছে একটা দর্শন, ব্যাসদেব নিজে একজন ঋষি আর বিরাট দার্শনিক, তিনি ভগবানের মুখ দিয়ে এই তত্ত্বকে বলিয়েছেন, আমরা যারা হিন্দু এই তত্ত্ব পূর্ণ সত্য বলে গ্রহণ করি আর এই উক্তিগুলো ভগবানের কথা বলেই বিশ্বাস করে আসছি। সাধনা করতে করতে আমাদের মন একটা জায়গায় গিয়ে থেমে যায়, তারপরে যা কিছু হয় সেটা ধারণা ছাড়া আর কিছুই করার থাকে না, সেই ধারণা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে জিনিষগুলো এইভাবেই এগিয়েছে। সমাধিতে যিনি নির্গুণ নিরাকারে যা কিছু দর্শন করছেন বা অনুভব করছেন তার সাথে এই জগৎ একেবারেই মেলেনা, অথচ বুঝতে পারছেন এই জগৎ ওখান থেকেই এসেছে। এখন এই দুটোকে যেভাবেই মেলাতে যাওয়া হোক না কেন, এই দুটো কখনই মিলবে না। এই দুটো যদি মিলে যায় তাহলেই বুঝতে হবে কিছু গোলমাল আছে, না মিললেই বুঝতে হবে ঠিক ঠিক দর্শন হয়েছে। এর ফলে কি হয়, যখন এনারা ব্যাখ্যা করতে যান তখন নানান ভাবে ব্যাখ্যা করেন। দর্শনের যত তর্ক-বিতর্ক এই জায়গাতে এসেই হয়। জগতে যেটা আছে প্রত্যক্ষ যা কিছু দেখছে সেটা নিয়ে কোন বিতর্ক নেই, আর পরমতত্ত্ব নিয়েও খুব একটা কোন বিবাদ নেই। কিন্তু মাঝামাঝি যেখানে এই দুটোকে মেলাতে যাচ্ছে সেই জায়গাতে গিয়েই যত রকরমের ঝামেলার সৃষ্টি হয়।

আমরা চোখের সামনে যা দেখছি, এটা যে ঠিক ঠিক দেখছি আমরা কখনই বলতে পারিনা। এই টেবিলটাকে খালি চোখে এখন এক রকম দেখছি, একটা মাইক্রোস্কোপের লেন্স দিয়ে যখন দেখব তখন দেখতে পাবো যে টেবিলটাকে যতটা মসৃণ দেখছিলাম আদপে সেটা তত মসৃণই নয়। আমরাতো কোনটাই ভালো ভাবে জানছি না। তবে শাস্ত্র কথা শুনতে শুনতে আর সাধন ভজন করতে করতে মনটা পরিষ্কার হয়, মন পরিষ্কার হলে বুদ্ধিও কুশাগ্র হয়। তীক্ষ্ণ বুদ্ধি না হলে আধ্যাত্মিক তত্ত্ব বোঝা যায় না। এই বুদ্ধি বিষয়-বুদ্ধি নয়, যারা কত বুদ্ধি করে শেয়ার মার্কেট চালাচ্ছে, বড় বড় কোম্পানী চালাচ্ছে, কত বুদ্ধি লাগিয়ে টাকা রোজগার করছে, এই বুদ্ধিকে এখানে লাগালে কিন্তু কিছুই ধরতে পারবে না। আর যারা অধ্যাত্মবিদ্যাতে লেগে আছে তাদেরও বুদ্ধি যদি তীক্ষ্ণ না থাকে শাস্ত্র কি বলতে চাইছে ধরতেই পারবে না। জ্ঞান আর বিজ্ঞান যদি পরিষ্কার না থাকে তাহলে কিন্তু সর্বজ্ঞত্ব, যেটাতে ব্রহ্মজ্ঞান হয়, সেটা কিন্তু হয় না। শ্রীরামকৃষ্ণের পার্ষদ, লাটু মহারাজ (স্বামী অদ্ভূতানন্দ) লেখাপড়া জানতেন না, ঠাকুর তাঁকে 'ক' পর্যন্ত শেখাতে পারেননি। কিন্তু আধ্যাত্মিক ব্যাপারে লাটু মহারাজের কি প্রচণ্ড তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ছিল, লাটু মহারাজের জীবনী গ্রন্থে তাঁর কিছু কথাবার্তা পড়লে আমরা অবাক বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যাই। মন্দবুদ্ধির লোকেরা কখনই আধ্যাত্মিক জীবনে এগোতে পারে না। আমাদের অনেকের ধারণা হয়ে গেছে যে ঠাকুর, লাটু মহারাজের যে কালে বইটই না পড়ে জ্ঞান হয়ে গেছে আমাদেরও শুধু কথামৃতটুকু পড়লেই হয়ে যাবে। হবে, হবে না কেন, যেখানে কিছু না পড়লে কিছুই হত না, সেখানে এটা অনেক ভালো। যেখানে কিছুই করছে না সেখানে কথামৃত পড়া অনেক ভালো। অধমের থেকে একটু ভালো। কিন্তু এই জীবনেই আমার যারা আধ্যাত্মিক কিছু উপলব্ধি করতে চাইছি তাহলে কিন্তু আমাদের পুরো জীবনধারাটা পাল্টে ফেলতে হবে।

ভগবান বললেন, এই জগতে যাবতীয় যা কিছু আছে সব আমার মধ্যে মালার মত গাঁথা হয়ে আছে। এটা বলার পর ভগবান এবার তাঁর এই পরা ও অপরা প্রকৃতির কিছু কিছু ঐশ্বর্যের বর্ণনা করছেন, যেটা দশম অধ্যায়ে আরো বিস্তৃত ভাবে বলবেন।

**রসোহহমপ্সু কৌন্তেয় প্রভাস্মি শশিসূর্যয়োঃ। প্রণবঃ সর্ববেদেষু শব্দঃ খে পৌরুষং নৃষু।।৮।।**

অপ্সু মানে জল, জলের সার হচ্ছে রস। ভগবান বলছেন যত বস্তু আছে সেই বস্তুর যে সার পদার্থ, সেটা আমি। জলের সার হচ্ছ রস, এই রসটা আমি। ঠাণ্ডা পানীয়ের যে সুস্বাদুতাটা আমরা পাই সেটা ভগবান, জলের জলত্বটা আমি। ভগবান না হলে জলের জলত্বটা হবে না। জলের আত্মা হচ্ছে রস, এই আত্মা কিন্তু সর্বব্যাপী সেই আত্মার কথা বলা হচ্ছে না, জলের সারটার কথা বলা হচ্ছে। জলের রসটা যদি চলে যায় তখন আর এটা জল থাকবে না। যেমন মানুষের মানের হুঁশ যদি চলে যায় তাহলে সে আর মানুষ থাকবে না। এখানে বস্তুর আত্মা বলতে বস্তুর সারটাকে বলা হচ্ছে। ঠাকুর বলছেন, মানুষ কে? যার আছে মানে হুঁশ। আমিত্ব বোধ যার আছে সেই মানুষ, এই আমিত্ব বোধ যার হারিয়ে যায় সেতো পশু হয়ে গেল। *প্রভাস্মি শশিসূর্যয়োঃ*, চন্দ্র আর সূর্যের যে জ্যোতি সেটা আমি, তার মানে চন্দ্র আর সূর্য কৃষ্ণগহ্বরে পরিণত হয়ে যাবে তখন ভগবান এদের যে সার পদার্থ সেই প্রভা বা জ্যোতিকে তুলে নেবেন। এটাই তখন চন্দ্র আর সূর্যের মৃত্যু। *প্রণবঃ সর্ববেদেষু*, এই চারটি বেদের মধ্যে আমি হচ্ছি প্রণব, মানে ওঁ। *শব্দঃ খে,* খে মানে আকাশ, আকাশে শব্দটা আমি, কারণ আকাশতত্ত্বের সার হচ্ছে শব্দ। *পৌরুষং নৃষু*, মানুষের মধ্যে যে পৌরুষত্ব সেটা আমি। মিনমিনে, পিনপিনে লোক স্বামীজী পছন্দ করতেন না, কারণ এই সব মানুষের মধ্যে পৌরুষ নেই, পৌরুষ না থাকার অর্থ হচ্ছে ঈশ্বরের ঈশ্বরত্বটা তার মধ্যে নেই। এর সাথে অহিংসাকে এক করে দেখলে চলবে না। গান্ধীজীর অহিংসা পৌরুষত্বের লক্ষণ। গান্ধীজী যে অহিংসার কথা বলছেন সেটা কিন্তু পুরো পৌরুষত্বের কথাই বলছেন। তারপর বলছেন –

**পুণ্যো গন্ধঃ পৃথিব্যাঞ্চ তেজশ্চাস্মি বিভাবসৌ। জীবনং সর্বভূতেষু তপশ্চাস্মি তপস্বিষু।।৯।।**

ভগবান পঞ্চভূতের মধ্যে কোনটিতে কিভাবে আছেন বলছেন, পৃথিবী, এই পৃথিবী আমরা যে পৃথিবীতে বাস করছি সেই পৃথিবীর কথা বলা হচ্ছে না, এখানে পঞ্চভূতের ভূমির কথা বলা হচ্ছে। এই ভূমির সারতত্ত্ব হচ্ছে *পুণ্যো গন্ধঃ*, এই পুণ্যো গন্ধটা আমি। *তেজশ্চাস্মি বিভাবসৌ*, আগুনের যে তেজ সেটা আমি। *জীবনং সর্বভূতেষু*, যত প্রাণী আছে, তাদের যে জীবন, যে জীবনী শক্তিতে সে চলে ফিরে বেড়াচ্ছে, সেই জীবনটা আমি। তার মানে কোন প্রাণীর শরীর থেকে যখন জীবনটা চলে যায়, তখন তাকে আর প্রাণী বলা হবে না। *তপশ্চাস্মি তপস্বিষু*, যাঁরা তপস্যা করেছেন, তাঁদের মধ্যে আমি তপঃশক্তি রূপে বিরাজ করি।

কোন জিনিষে যখন অপবিত্রতা এসে যায়, যেমন জলে দুর্গন্ধ এসে যাওয়া, এটা কখনই ভগবানের জন্য হয় না। এটা হচ্ছে সাংসারিক বিষয়ে সংসর্গের জন্য। যখন একটা তত্ত্ব কথা বলা হচ্ছে, একটা জিনিষকে যখন সুসংস্কৃত রাখার প্রয়াস করা হচ্ছে তখন সেই প্রয়াসটা হচ্ছে সেই জিনিষে যে ঈশ্বরীয় রূপ আছে সেটাকে বাড়ানোর প্রয়াস। তাই আমাকে যখনই জল পান করতে হবে তখন বিশুদ্ধ জলপান করতে হবে। যখন অপরিশুদ্ধ জল পান করছি, জলে দুর্গন্ধ হয়ে গেছে তখন কিন্তু ঐ জলে ঈশ্বরত্ব নেই।

**বীজং মাং সর্বভূতানাং বিদ্ধি পার্থ সনাতনম্। বুদ্ধির্বুদ্ধিমতামস্মি তেজস্তেজস্বিনামহম্।।১০।।**

যত রকমের প্রাণী আছে সমস্ত প্রাণীর বীজ আমি। *বুদ্ধির্বুদ্ধিমতামস্মি*, যারা বুদ্ধিমান, বিবেকবান লোক, তাদের যে বুদ্ধি সেটা আমি। আইনস্টাইন ছিলেন প্রখর বুদ্ধি ও মেধা সম্পন্ন, তাঁর যে বুদ্ধি, যে বুদ্ধির সাহায্যে তিনি বিজ্ঞানের কত কিছু রহস্যের উন্মোচন করেছেন, সেই বুদ্ধিটা ভগবান নিজে। অপরা প্রকৃতির যেটা সর্বশ্রেষ্ঠ অংশ সেটা ভগবান। আর বাকি যা আছে, অজ্ঞান, অধর্ম আছে সেগুলোও তাঁরই, কিন্তু এখানে জ্ঞান ও ধর্মকে বর্ণনা করছেন। যেখানে জ্ঞান, ধর্ম, পূণ্য, সুখ থাকে তখন বুঝতে হবে সেখানে ঈশ্বরের সত্ত্বগুণের প্রকাশটা বেশি মাত্রায় হচ্ছে। আধ্যাত্মিক পুরুষরা দুই ধরণের হয়, এক ধরণের সাধু হন যাঁরা কারুর সঙ্গে কথা বলবেন না, নিজের মত থাকেন, যেমন ত্রৈলঙ্গস্বামী ছিলেন, যাঁরা এই জগতের সাথে কোন সম্পর্ক রাখবেন না। আবার কিছু কিছু সাধু সন্ন্যাসী আছেন, তাঁদের মধ্যে যাঁর উপলব্ধি হয়ে গেছে তাঁরও আর যাঁর উপলব্ধি নাও হয়ে থাকে তিনিও কিছু কিছু জিনিষের প্রতি তাঁর আসক্তিটাকে রেখে দেন, বা আমরা এটাকে বলতে পারি, অবলম্বন থাকে। এই অবলম্বন গুলো কিন্তু সব সময় সত্ত্বগুণের আধারের হয়। এখন আমাকে একজন ভালোবাসেন, আমি কি করে বুঝবো তিনি সাধুপুরুষ। সন্ন্যাসীর ভালোবাসা সবার প্রতি, সাধু মানেই তারমধ্যে ভালোবাসা থাকবেই। তবে সাধুর ভালোবাসা আর অসাধুর ভালোবাসার মধ্যে তফাৎ থাকবে, সাধুর ভালোবাসা সত্ত্বগুণের আর অসাধুর ভালোবাসা তমোগুণের আশ্রিত। সত্ত্বগুণের ভালোবাসাও বন্ধন সৃষ্টি করে, চতুর্দশ অধ্যায়ে বলবেন, *সুখসঙ্গেন বধ্নাতি*, আমি সুখী এই সুখাসক্তি সত্ত্বগুণীকে বন্ধন করে। আবার তমোগুণের ভালোবাসাতো বন্ধন করবেই, তোমাকে আমার কাছে থাকতেই হবে, তুমি যদি আমাকে ছেড়ে চলে যাও তাহলে আমি আমার গলা কাটব নয়তো তোমার গলা কাটব, এটা হচ্ছে তমোগুণী বন্ধন। সবটার ক্ষেত্রেই বন্ধন হবে, যদিও ঠাকুরের ক্ষেত্রে ভালোবাসাটা বন্ধন হয় না, তিনি নরেন, রাখাল, লাটুর উপরে মনটাকে অবলম্বন করে রেখেছেন। আমাদের ক্ষেত্রে ভালোবাসাটা বন্ধন, তবে এই বন্ধনও দুই রকমের হয়, সত্ত্বগুণের বন্ধন আর তমোগুণের বন্ধন। সত্ত্বগুণে সে একটা আনন্দ পাচ্ছে, এটাও বন্ধন। যেমন আমি একজনের হাতে একটা ঘড়ি দেখে বললাম – বাঃ, ঘড়িটাতো খুব সুন্দর। এখানে আমি সত্ত্বগুণের বন্ধনে আছি, একটা জিনিষকে দেখে আমার আনন্দ হচ্ছে। তমোগুণি কি বলবে? বাঃ খুব সুন্দরতো ঘড়িটা, কোথা থেকে কিনলেন, কত দাম নিয়েছে। এবার সব শুনে মনে মনে ঠিক করলাম ঠিক এরকম একটা ঘড়ি আমাকেও সংগ্রহ

করতে হবে, ঠিক এই রকম একটা ঘড়িই আমারও চাই। এটা হয়ে গেল তমোগুণী বন্ধন। সত্ত্বগুণও বন্ধন কিন্তু ক্ষতি করেনা। এর মাঝামাঝি হচ্ছে রজোগুণের বন্ধন, এরাও ঘড়িটার প্রশংসা করবে, আর সংগ্রহ করার জন্য নেমে পড়বে কিন্তু তার আগে একবার দুবার চিন্তা করে আবার পিছিয়ে আসবে। সবটাই বন্ধন, সাধনার পথে যারা আছে, সাধু সন্ন্যাসী সবারই এই সমস্যা আছে, কিন্তু দেখতে হবে তাদের এই সমস্যাটা সত্ত্বগুণের সমস্যা না তমোগুণের সমস্যা। যদি সত্ত্বগুণের সমস্যা হয় তাহলে তার যদি জপ-ধ্যান না থাকে, তখন এই সত্ত্বগুণী সমস্যাই কিছু দিন পরে রজোগুণী সমস্যা হবে তারপরে সেখান থেকে সেটা তমোগুণী সমস্যাতে চলে আসবে। এখানে এটাই বলা হচ্ছে যেটা ভালো সত্ত্বগুণের আধার সেটা আমি। আর *তেজস্তেজস্বিনামহম্,* যারা প্রচণ্ড প্রভাবশালী ব্যক্তিত্বের অধিকারী, লোকেরা যাকে দেখেই বলছে – দেখছেন কি তেজী পুরুষ, তার তেজটা সব সময় ঝলমল করছে। অর্থাৎ তার সেই তেজ সবাইকে প্রভাবিত করছে, ভগবান বলছেন এই তেজটাও আমারই।

**বলং বলবতাং চাহং কামরাগবিবর্জিতম্। ধর্মাবিরুদ্ধো ভূতেষু কামোঽস্মি ভরতর্ষভ।।১১।।**

বলবান, শক্তিমান পুরুষের যে বল সেটা হচ্ছি আমি। বলবানের যে শক্তি সেটা একটা হয় যে, কাম আর রাগ মেশানো, এই জিনিষ চাই, একটা কিছুর প্রতি আসক্তি আছে, সেই আসক্তিকে মেটানোর জন্য বা সেই জিনিষের সংগ্রহের জন্য যে প্রচেষ্টা করা হয় তার জন্য একটা শক্তির দরকার। আর আরেকটা হয় দেহ ধারণ করার জন্য শক্তির দরকার হয়। এখানে *কামরাগবিবর্জিতম্* বলতে বোঝাচ্ছে এই কাম আর রাগশূন্য শুদ্ধ শক্তি। এমন একজন আছেন, যাঁর শরীরে সহজে কোন রোগ হয় না, সুস্বাস্থ্য, খুব ভালো ও সৎ লোক, তখন বুঝতে হবে তাঁর যে এই সুস্বাস্থ্য এখানে ভগবানের বিশেষ শক্তি আছে। আমাদের বেশির ভাগ লোকেরই সারা বছর নাক দিয়ে জল পড়ছে, একটু কিছু খেলেই অম্বল হয়ে যাচ্ছে, তার উপর আবার মাঝে মাঝেই এই রোগ সেই রোগ লেগেই আছে, কাজ করলেই হাঁপিয়ে পড়ছে, বুঝতে হবে এর মধ্যে ভগবানের বিশেষ শক্তির অভাব আছে।

*ধর্মাবিরুদ্ধো ভূতেষু কামোঽস্মি ভরতর্ষভ,* হে অর্জুন, মানুষের মধ্যে যে কামনা বাসনা ধর্মের অবিরোধী, মানে ধর্ম যে কাম পূরণে অনুমতি দিচ্ছে, যে কোন কামনা বাসনা একমাত্র ধর্মানুসারেই পূরণ করা হয় সেটা আমি। সেইজন্য যেখানে ধর্মবিরোধী কাম হয় সেখানে ভগবান থাকেন না। তারপর বলছেন –

**যে চৈব সাত্ত্বিকা ভাবা রাজসাস্তামসাশ্চ যে। মত্ত এবেতি তান্ বিদ্ধি ন ত্বহং তেষু তে ময়ি।।১২।।**

সমস্ত প্রাণীর মধ্যে যা কিছু ভাব, সেটা সত্ত্বগুণেরই হোক, কিংবা রজোগুণেরই হোক বা তমোগুণেরই হোক, সমস্ত ভাব মানে সমস্ত প্রাণীর যে সার, এটা কিন্তু আমার থেকেই এসেছে। *মত্ত এবেতি তান্ বিদ্ধি,* এগুলো সব আমার থেকেই বেরিয়েছে, কিন্তু *ন ত্বহং তেষু তে ময়ি,* আমি কিন্তু এই সকল ভাবের অধীনে নই, এগুলো আমার বশীভূত হয়ে আমার অধীনে থাকে। এইখানটা একটু জটিল, নবম অধ্যায়ে এটাকে আরও পরিষ্কার করে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। সব ভাব আমার থেকেই আসছে কিন্তু কোন ভাবের দ্বারাই আমি লিপ্ত হইনা। মরুভূমিতে যে মরীচিকা, সেই মরীচিকাতে যে জল দেখা যাচ্ছে, সেই জল মরুভূমির একটা বালিকণাকেও সিক্ত করেনা। কিন্তু মরুভূমি আছে বলেই ঐ জলটা দেখা যাচ্ছে। ঈশ্বর আছেন বলেই এই জিনিষগুলোকে দেখা যাচ্ছে, কিন্তু এই জিনিশ গুলো ঈশ্বরকে স্পর্শ করতে পারেনা। শাস্ত্রের বক্তব্যকে ব্যাখ্যা করার জন্য এনারা এই ধরণের উপমা নিয়ে আসেন। ঠাকুর বা আচার্য শঙ্করের মত অবতাররা শাস্ত্রের কথাকে যুক্তি দিয়ে বোঝাতে যাবেন না। এনারা প্রথমেই বলে দেবেন যা শাস্ত্র বলছে সব সত্য, তুমি বিশ্বাস করছ তো সব সত্য? হ্যাঁ, আমি বিশ্বাস করছি। তাহলে এসো আমি ব্যাখ্যা করে তোমাকে বুঝিয়ে দিচ্ছি। তখন যদি আমি বলি – না আপনি আগে যুক্তি দিয়ে বোঝান। তিনি তখন বলে দেবেন আমার দ্বারা যুক্তি দিয়ে বোঝান যাবে না, এই জিনিষ তোমার জন্য নয়, তুমি আসতে পার। এখানে একটি কথাতেও যুক্তি দেবেন না, এনারা মেনেই নিয়েছেন এগুলো সব সত্য। যদি এটা মেনে থাক, তাহলে তুমি আমার কাছে এসো। আর যদি বলি এটা তো যুক্তিতে দাঁড়াচ্ছে না, তখন তিনি বলে দেবেন – ভাই এই জিনিষ তোমার জন্য নয়। আচার্য শঙ্কর গীতার ভাষ্যে, উপনিষদের ভাষ্যে যা কিছু বলছেন এগুলো সত্য মেনে এর ব্যবহারটা কি রকম সেটা বলে দিচ্ছেন, যুক্তি দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করছেন না। যুক্তিতে দাঁড় করান তোমার ব্যাপার, আমি শুধু এর অর্থটা বলে দেব।

ভগবানের স্বরূপ হচ্ছে নিত্য-বুদ্ধ-শুদ্ধ-মুক্ত। তিনিই আবার প্রত্যেকটি জীবের আত্মা, আর সংসারের যাবতীয় যা দোষ, সংসারের দোষ হচ্ছে শোক আর মোহ, এই দুটোকে তিনি নাশ করেন, অথচ জগৎ তাঁকে চিনতে পারেনা। দক্ষিণ আমেরিকার বিখ্যাত নদী হচ্ছে আমাজন নদী, বলে আমাজন নদীর জলের প্রবাহ এত তীব্র যে, সমুদ্রে গিয়ে যেখানে আমাজন নদী মিলিত হচ্ছে সেখানকার সমুদ্রের লবণাক্ত জলকে একশো কিলোমিটার পর্যন্ত দূরে ঠেলে নিয়ে যায়। একটা জাহাজ আমাজন নদী যেখানে মিলছে তার কাছাকাছি সমুদ্রের উপর দিয়ে যাচ্ছিল। জাহাজের নাবিকরা মিষ্টি জলের সন্ধানের জন্য ব্যস্ত হচ্ছে দেখে পাশের জেলেরা যেখানে ছোট নৌকা করে মাছ ধরছিল তাদের গিয়ে নাবিকরা বলল – আমাদের একটু খাবার জল দিতে পারবে তোমরা। জেলেরা অবাক হয়ে নাবিকদের দিকে তাকিয়ে রইল, এরা পাগল নাকি। নাবিকদের বলছে – তোমরাতো মিষ্টি জলের উপরেই জাহাজকে দাঁড়

করিয়ে রেখেছ। তখন জাহাজের ক্যাপ্টেনের মনে পড়ে গেল, তাইতো আমাজন নদী একশো কিলোমিটার পর্যন্ত সমুদ্রের জলকে ঠেলে দেয়, এটা সমুদ্র কিন্তু এর জলটা মিষ্টি জল। মিষ্টি জলের উপর দাঁড়িয়েই মিষ্টি জলের জন্য হাহুতাশ করে যাচ্ছে, আর তৃষ্ণায় ছটফট করছে। যখন বুঝে নিল, তখন পাম্প চালিয়ে মিষ্টি জল তুলে নিলেই সব সমস্যা মিটে গেল। ক্যাপ্টেন সবই জানতো, কিন্তু মাথা থেকে হারিয়ে গেছে যে আমাজন নদী সমুদ্রের যেখানে গিয়ে মিশছে সেখানে সমুদ্রের নোনা জলকে ঠেলে একশ কিলোমিটার পর্যন্ত ঠেলে দেয়, এত তার জলের তোড় আর এত জলের তার পরিমাণ। আমাদের সবারই ঠিক এই নাবিকদের মত অবস্থা, তৃষ্ণার্ত হয়ে আমরা চারিদিকে ছুটে মরছি। আমি যদি কোন মহাত্মার কাছে যাই তিনি বলবেন তুমি তো মিষ্টি জলের উপরই দাঁড়িয়ে আছ, তোমাকে কে সাহায্য করতে যাবে। মিষ্টি জলের উপর দাঁড়িয়ে আমরা কেন কষ্ট পাচ্ছি, তার কারণটা কি? তখন বলছেন –

**ত্রিভির্গুণময়ৈর্ভাবৈরেভিঃ সর্বমিদং জগৎ। মোহিতং নাভিজানাতি মামেভ্যঃ পরমব্যয়ম্।।১৩।।**

প্রকৃতির তিনটে গুণ, সত্ত্ব, রজো আর তমো শোক মোহাদি সৃষ্টি করছে। যখন এই জগৎ মোহিত হয়ে যায় তখন তার দৃষ্টিটা অন্য দিকে চলে যায়। সূর্যের আলো যখন একটা দেওয়ালে প্রতিফলিত হয়ে নানান রকমের রঙের খেলা খেলতে থাকে, তখন আমি মুগ্ধ হয়ে সেই রঙের খেলা দেখতে দেখতে মোহিত হয়ে যাব। কিন্তু আসল সূর্যটা আমার পেছনে রয়েছে। এখন এই রঙের খেলাতেই আমি আনন্দ পাব, মোহিত হব, শোক হবে, সবই হতে থাকবে কিন্তু আসল বস্তুর দিকে আর দৃষ্টি যাবে না। জগতটাও ঠিক এই রকম, এখানে সত্ত্ব, রজো আর তমোর এমন খেলা চলছে, এই খেলাতেই আবদ্ধ হয়ে মোহিত হয়ে গিয়ে কখন আনন্দ পাচ্ছি, কখন দুঃখ কষ্ট আর হতাশায় ভেঙ্গে পড়ছি। সূর্যের আলো পড়ে এমন ঝকঝক করছে যে সূর্যের দিকে আর কেউ তাকাচ্ছে না। সূর্য কি রকম? রঙ ছাড়া, কিন্তু তার যে তেজ, তার যে প্রকাশ সেই তুলনায় এই প্রতিবিম্ব কিছুই নয়। সূর্যের তেজ আর প্রকাশ অনেক বিশাল। আমরাও এই রঙিন খেলাতে হারিয়ে গিয়ে কষ্ট পাচ্ছি। *মোহিতং নাভিজানাতি*, যে এই সত্ত্ব, রজো ও তমোর খেলাতে মুগ্ধ হয়ে গেছে, অর্থাৎ এই জগতকে নিয়েই যে মুগ্ধ হয়ে আছে, সে আমার যে স্বরূপ, ঈশ্বর, যিনি পরমব্যয়ম্, যিনি অবিনাশী, অবিকারী, সব রকমের বিকারহীন, ঈশ্বরের এই ভাবকে তারা জানতে পারেনা। জানেনা বলেই তারা কষ্ট পায়। আমি আছি মাঝখানে, পেছনে ঈশ্বর এবং সামনে জগৎ। জগতের দিকে দৃষ্টি থাকাতে আমি শোক মোহের জাঁতাকলে পড়ে কাতর হয়ে ছটফট করছি। এই জগতটা কি? এটাও ঈশ্বরের, কিন্তু এটা হচ্ছে ঈশ্বরের নিকৃষ্ট প্রকৃতি। প্রকৃতিতে তিনটে গুণের খেলা চলছে। এই খেলাতে কখন আমি কাঁদছি কখন আনন্দে নৃত্য করছি। কিন্তু একবার যদি সূর্যের দিকে দৃষ্টিটা ফেলতে পারি, তখন অবাক হয়ে যাব এই ভেবে যে, যে আলোর খেলা দেখে আমি কখন কাঁদছি আবার কখন নৃত্য করছি, আসলে এটাতো সূর্যেরই আলো, সত্ত্ব, রজো আর তমোর খেলাতে ঝলমল করছে। যেই ধরে ফেলা হল, তখন আর এই ঝলমলানি মনোমুগ্ধকর দৃশ্য আর আমাকে আকৃষ্ট করতে পারবে না। তখনও আমি এই খেলা দেখতে পাব, শ্রীরামকৃষ্ণও এই জগৎ দেখছেন, কিন্তু এই জগৎ তাঁকে আর মোহিত করে মুগ্ধ করতে পারছে না। তাই বলে জগতের খেলা কি বন্ধ হয়ে যাবে? কখনই না, জগতের খেলা যেমন চলছিল সেই রকমই চলতে থাকবে। ব্রহ্মজ্ঞানী এই জগতের খেলাও দেখতে পান আর আসলটাও দেখতে পান, কিন্তু কোনট নিত্য আর কোনটা অনিত্য সেটাকে ধরে ফেলেন। জগতের এই খেলা থেকে বেরোবে কি করে? তখন বলছেন –

**দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া। মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে।।১৪।।**

আমাদের হিন্দুধর্মে ভক্তির যে বিশাল দর্শন আর ভক্তিমার্গের যে বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা, সেই ভক্তির বীজ এই শ্লোকেই প্রথম পাওয়া যাচ্ছে। বলছেন আমার যে মায়া, পরা ও অপরা প্রকৃতি এটা কোন ম্যাজিক নয়, দৈবী। এই দৈবী মায়াকে কখনই ব্যাখ্যা করে বোঝান যাবে না। জাদুকর যখন ম্যাজিক দেখান, তাঁর যে কোন ম্যাজিকের ব্যাখ্যা যদি জাদুকরকে করতে বলা হয়, তা তিনি ব্যাখ্যা করে দিতে পারবেন, কিন্তু এই দৈবী মায়ার ব্যাখ্যা করা যাবে না। মায়ার ব্যাপারে একটা কথাই বলা যায় তা হল এই মায়া হচ্ছে গুণময়ী, সত্ত্ব, রজো ও তমো, আমার এই জগতে তিনটি গুণই আছে, এই তিনটে গুণের বাইরে আর কিছু নেই। মায়ার ব্যাপারে আরেকটা বলা যেতে পারে এই মায়া *দুরত্যয়া*, এই মায়াকে অতিক্রম করা খুব কঠিন। তাহলে মায়ার ব্যাপারে কি কি বলা যেতে পারে? তিনটে জিনিষ এখানে বলছেন – প্রথম হচ্ছে এই মায়া দৈবী, ঈশ্বরের সঙ্গে এক, দ্বিতীয় গুণময়ী অর্থাৎ ত্রিগুণাত্মিকা আর তৃতীয় হল এই মায়া *দুরত্যয়া*।

এই মায়াকে অতিক্রম করা অত্যন্ত দুরূহ, কিন্তু *মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে*, যে আমার শরণ নেয়, প্রভুর চরণে যে আশ্রয় নেয় – প্রভু আমি আপনার শরণাগত আপনি আমাকে এই মায়ার কঠিন সুদৃঢ় বন্ধন থেকে রক্ষা করুন, এই মায়ার সমুদ্রকে পার করিয়ে দিন। তখন আমি কৃপা করে আমার শরণাগত ভক্তকে এই মায়া থেকে উদ্ধার করে দিই, তা নাহলে এই মায়াকে অতিক্রম করা কারুর পক্ষেই সম্ভব নয়। আমাদের শাস্ত্রাদিতে অনেক ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে কিভাবে এই মায়াকে পার করা যায়। অন্যান্য শাস্ত্র যাই বলুক না কেন, গীতার মতে এই মায়াকে অতিক্রম করতে তখনই পারবে যখন কেউ ঈশ্বরের শরণাগত হয় তখনই এই মায়ার হাতে থেকে মুক্ত হয়ে যেতে পারবে। তন্ত্র মতে এই মায়াই হয়ে যাচ্ছে শক্তি, তন্ত্রে বলবে তুমি শক্তির আরাধনা

কর, কিন্তু গীতায় মায়ার আরাধনা করতে কোথাও বলা হচ্ছে না, এখানে মায়াকে জয় করার কথা বলা হচ্ছে। গীতা আর তন্ত্রের মধ্যে এই ব্যাপারে বিরাট পার্থক্য এসে যাচ্ছে। বেদান্ত মতে মায়াকে অতিক্রম করতে হয় কিন্তু তন্ত্র মতে শক্তির কাছে প্রার্থনা করতে হয়, গীতার মতে ঈশ্বরের শরণাগত হতে হবে। কিন্তু দুটো ক্ষেত্রেই এই মায়া দৈবী। ভগবান অর্জুনকে বললেন যে আমার শরণ নেয় সেই মায়াকে অতিক্রম করতে পারে, কিন্তু মানুষ কেন ঈশ্বরের শরণ নিচ্ছ না, তার ফলে কেন এত দুঃখ-কষ্ট আর যন্ত্রণাকে ভোগ করে চলেছে? তখন ভগবান বলছেন –

**ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ। মায়য়াপহৃতজ্ঞানা আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ।।১৫।।**

এতক্ষণ গীতা বিশেষ করে পঞ্চম অধ্যায় পর্যন্ত পুরোপুরি হিন্দুধর্মের দর্শনের মূল তত্ত্ব গুলিকে আলোচনা করে গেছে, কিন্তু সপ্তম অধ্যায় থেকে আমাদের হিন্দুধর্ম বর্তমান যে অবস্থাতে এসে যে যে ধারণা গুলোর উপর দাঁড়িয়ে আছে সেই ধারণা গুলো রূপ নিতে শুরু করে। এই শ্লোকে ভগবান বলছেন, কয়েকজন আমার শরণ নেয় না। তারা কারা? *দুষ্কৃতি,* মানে যারা পাপ কর্ম করে, *মূঢ়াঃ,* মুর্খ আর *নরাধমাঃ,* মানুষ কিন্তু মনুষ্য পদবাচ্য নয়, নিকৃষ্ট মানুষ। *মায়য়াপহৃতজ্ঞানা,* মায়া এদের বুদ্ধিকে অপহরণ করে নিয়েছে। মায়া অপহরণ করার অর্থই হল, রাগ ও দ্বেষ, শোক ও মোহ এদের বুদ্ধিকে এমন ভাবে আচ্ছন্ন করে দিয়েছে যে কোনটা ঠিক কোনটা ভুল, কোনটা সত্য কোনটা মিথ্যা, কোনটা ন্যায় কোনটা অন্যায় ধরতেই পারেনা। এরা কখনই ভগবানের আশ্রয় নেয় না। তাহলে এরা কার আশ্রয় নেয়? আচার্য বলছেন – হিংসার আশ্রয় নেয়, মিথ্যার আশ্রয় নেয়। আমার যদি শরীর খারাপ করল আর ঈশ্বরের আশ্রয় নিয়ে ঘরে পড়ে না থেকে ডাক্তারের কাছে যাওয়াটা কিন্তু দোষের কিছু নয়। এটা হচ্ছে ধর্ম, অসুখ হলে ডাক্তারের কাছে যেতে হবে। কিন্তু লোভ, আসক্তি মেটাবার ক্ষেত্রে বিফল হলে, কেউ দুঃখ দিলে, অপমান করলে তার প্রতিশোধ নিতে যখন কোর্টে মামলা করা হয় তখন কত মিথ্যা, ছলচাতুরি আর মিথ্যার আশ্রয় নিচ্ছে। কোর্টে দাঁড়িয়ে সত্যি কথা বলতে গেলে উল্টে ফেঁসেই যেতে হয়। এগুলো হচ্ছে সব অনৃত, মিথ্যে কথার আশ্রয় নাও, হিংসাকে আশ্রয় নাও, তুমি যদি আমার দলের একজনকে খুন কর আমি তাহলে তোমার দলের পাঁচ জনকে খুন করব। এইগুলোই তো আমরা এখন চারিদিকে দেখছি। এরা কখনই ভগবানের আশ্রয় নেয় না। আবার কেউ কেউ যখন খুব বিপদে পড়ে তখন এই দেবতা সেই দেবতার কাছে গিয়ে মানত করবে, পূজো চড়াবে, চরণামৃত খাবে। এগুলোকে ঈশ্বরের আশ্রয়ের মধ্যে গণ্য করা হয় না, তবে মন্দের ভালো। কিন্তু যাঁরা উচ্চ কোটির সন্ন্যাসী তাঁদের শরীর খারাপ হলেও ঈশ্বরের আশ্রয় ছাড়া আর কারুর আশ্রয়ে যাননা, বলবেন – আমি তুলসীপাতা খাব গঙ্গাজল সেবন করব, তাতে শরীর ভালো হওয়ার হলে হবে না হলে মরে যাব। উত্তরকাশীতে একজন সাধুবাবা ছিলেন, ওনার নিত্য কাজ ছিল প্রত্যেক দিন গঙ্গা স্নান করা। যখন খুব বার্ধক্যে আর নড়াচড়া করতে পারতেন না, তখন তাঁর কয়েকজন শিষ্য বহু কষ্টে কোন রকমে গঙ্গার কাছে গঙ্গা দর্শনের জন্য নিয়ে আসত। একদিন এক স্বামীজী সেই বুড়ো সাধুকে বললেন – আপনি এতো কষ্ট পাচ্ছেন, প্রত্যেক দিন কেন এত কষ্ট করে আসছেন? শুনে বুড়ো সাধুটি প্রচণ্ড রেগে গেছেন – এই দু-পয়সা শরীরের জন্য আমি গঙ্গামাঈয়ের দর্শন বন্ধ করে দেব নাকি! এই হচ্ছে আশ্রয়। গঙ্গামাঈয়ার যিনি সাধনা করে আসছেন এত দিন ধরে, শরীর অথর্ব হয়ে গেছে, নড়তে চড়তে পারছে না, শিষ্যদের বলছেন আমাকে ধরে ধরে নিয়ে চল। আর রোজ নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, নিজের চলার ক্ষমতাই নেই, তাঁর কুঠিয়া থেকে গঙ্গার তীরে আসতে এক ঘন্টা লেগে যাচ্ছে, কিন্তু তাতেও তিনি কিছুতেই ছাড়বেন না। শরীর আমার কাছে গুরুত্ব নয়, আমি যাঁকে অবলম্বন করেছি, যাঁর আশ্রয়ে এসেছি তিনি হচ্ছেন আমার কাছে সব থেকে মূল্যবান। তাহলে ভগবানের আশ্রয় কারা নিচ্ছে? তখন বলছেন –

**চতুর্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জুন। আর্তো জিজ্ঞাসুরার্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ।।১৬।।**

চার ধরণের মানুষ ভগবানের আশ্রয় নেয়। আর্ত, যে কষ্টে পড়ে আছে, কোন একটা কিছুর প্রতি তার মোহ আছে, মোহ থেকে কষ্ট হচ্ছে, তখন সেও ভগবানের কাছে যাচ্ছে, কোন জিনিষের প্রতি শোক আছে, কষ্ট আছে, কোন জিনিষ থেকে ভয় আছে, এরাই হচ্ছে আর্ত, তখন বলে – প্রভু আমার খুব কষ্ট হচ্ছে তুমি আমাকে কৃপা করে এই কষ্টটা লাঘব করে দাও। জিজ্ঞাসু, তার কিছুই লাগছে না, কিন্তু মনে ভগবানের ব্যাপারে জানবার ইচ্ছে হয়েছে। অর্থার্থী, যে টাকা-পয়সা চাইছে বা কোন কিছু চাইছে সে ভগবানের কাছে যায়। শ্রীরামকৃষ্ণ যখন সাধনা শুরু করেছিলেন তখন তিনি জিজ্ঞাসু রূপেই সাধনা আরম্ভ করেছিলেন – মা, তুই নাকি কমলাকান্ত, রামপ্রসাদের কথা শুনেছিস, তুই নাকি তাদেরকে দেখা দিয়েছিলি, তুই আমাকেও দেখা দে। অর্থার্থীতে সব রকমই আছে, কেউ চাকরি চাইছে, সেও অর্থার্থী, যে বিয়ে করতে চাইছে কিন্তু বিয়ে হচ্ছে না সেও অর্থার্থী, মানে যার মনে কোন কামনা বাসনা আছে, সে জানে ভগবানই পারবেন আমার এই কামনা বাসনা পূরণ করতে, এই বিশ্বাসই তাকে ভগবানের আশ্রয়ে নিয়ে যায়। চতুর্থ হচ্ছেন জ্ঞানী, যিনি শাস্ত্রাদি অধ্যয়ণ করেছেন, ভগবানের ব্যাপারে কিছু জেনে মনটাকে ঠিক করে নিয়েছেন আর মনটাকে ভগবানেই লাগিয়ে রেখেছেন, বিজ্ঞানীও হতে পারেন, কারণ গীতাতে জ্ঞানী শব্দের অনেক রকম অর্থে প্রয়োগ করা হয়, এখানে বলা হচ্ছে যিনি বিষ্ণু তত্ত্ব বা ঈশ্বরের তত্ত্ব জানেন। এদের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ ভক্ত?

**তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তির্বিশিষ্যতে। প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোহত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ।।১৭।।**

জ্ঞানীদের মধ্যেও যাঁরা আমার তত্ত্ব ঠিক ঠিক জানে, আর একনিষ্ঠ ভাবে আমাকে ভক্তি দিয়ে ভজনা করে যাচ্ছে, সেই রকম জ্ঞানী আমার অতিব প্রিয়। এই ভক্তের কাছে আমিও অত্যন্ত প্রিয়, সে আমাকে ছাড়া আর অন্য কোন দিকে তাকাবে না। জগতে চলতে গিয়ে জীবনধারণের জন্য একটু এদিকে হাত দেব, একটু ওদিকে পা বাড়াব, একটু এটা ওটা করবে কিন্তু তাঁর প্রিয় ব্যাপারটা আমাতে, মনটা আমাতেই লেগে থাকে। জ্ঞানীদের ব্যক্তিত্বের কেন্দ্রবিন্দুতে আমিই বিরাজ করি, আর আমিও তাঁকে ভালোবাসি। আমরা দুজন দুজনের আত্মা। মা নিজের সন্তানকে আত্মা রূপে দেখে সেইজন্যই তো সন্তানকে মা এতো ভালোবাসে। যিনি জ্ঞানী তিনি ঈশ্বরকে নিজের আত্মা দেখছেন, আত্মস্বরূপ দেখেন, এখন আর সে কাকে ভালোবাসতে চাইবে। আর ভগবান তিনিও নিজের আত্মাকে ভক্তের মধ্যে দেখছেন। তাহলে অন্য যে তিন জনের কথা বলা হল তারা কি ভগবানের প্রিয় নয়?

এরা যে ভক্ত নয় তা নয়, এরাও ভক্ত, এরাও মহান কিন্তু জ্ঞানীর সাথে তফাৎটা হচ্ছে তীব্রতায় আর ভালোবাসার প্রগাঢ়তায়। ভগবান এদেরকেও ভালোবাসেন। এরা যেভাবেই আমার কাছে আসুক না কেন, তুমি দুঃখ-কষ্টে চোখের জল ফেলেই আস, টাকা-পয়সা চাইতেই আস, আমার ব্যাপারে জানতে চেয়েও যদি আস, কিংবা সত্যিই আমাকে ভালোবেসে আস, কিন্তু আমার কাছেইতো আসছে। এইজন্য ভগবান যখন দেখেন, ব্যাটা কিছুতেই আমার দিকে মন দিচ্ছে না, তখন তিনি বেশ ভালো করে কিছু কষ্ট দিয়ে দেন, তিনিও জানেন কষ্ট পেলেই আমার দিকে মন আসবে, ভগবানের দিকে এই মন আসাটাই বড়। ভগবানতো ভক্তকে ছাড়া থাকতে পারেন না, তাই একটু কষ্ট তাকে দিয়ে দেন। এইগুলোও একটা মত, লোকেরা বিশ্বাস করে যে ভগবান যাকে ভালোবাসেন তাকে কষ্ট দেন, যাতে ভগবানের দিকে মন দেয়। কষ্ট পেয়ে ভগবানের দিকে মন না দিয়ে যদি দিনরাত হিংসা আর অনৃতম্, মানে মিথ্যা এই দুটোই করতে থাক তাহলে ভগবান দেখে নিলেন যে এই কষ্ট দিয়ে তার কিছুই হবে না, তখন ভগবানের ইচ্ছে করবে আরও বেশি করে তোমাকে মারার, কারণ তোমাকে এইটুকু কষ্ট দিয়েও ভগবান তোমাকে টানতে পারছেন না, তার মানে এইটুকু কষ্টে তোমার অনেক সময় লেগে যাবে।

ব্যাথার উদ্দেশ্য কি? আমাকে যখন ব্যাথা দেওয়া হল মানে আমি এবার বুঝে নিলাম *অনিত্যং সুখং লোকম্*, এই সংসারে সুখ নেই, এই সংসার হচ্ছে অনিত্য। অনিত্যকে যখন বুঝে গেছি তখন নিত্যকে বুঝে নিতে আর দেরী হবে না, নিত্য হলেন সেই ভগবানই, এখন আমাকে ভগবানের উপর আশ্রয় নিতে হবে। যখন নানান রকমের ঝামেলা আসে তখন সেই ঝামেলার মাঝখানে দাঁড়িয়ে যে ঠাকুরের কাছে গিয়ে বলছে, ঠাকুর এটা কি হয়ে গেল, তুমি রক্ষা কর, বুঝতে হবে সে সত্ত্বগুণী। আবার আরেকজন বলবে – ও, তুমি খুব পেয়ে বসেছ তাই না, ঠিক আছে তোমাকে দেখাচ্ছি, আমি থানায় চললাম। থানায় একটা কেস ঠুকে দিয়ে আবার পাড়ার মস্তানদের গিয়ে বলবে, দেখেছিস আমার কি অবস্থা করেছে, ব্যাটাকে দেতো শেষ করে। আর যারা ভক্ত তারা বলে – দেখো কষ্ট যখন এসেছে তাহলে এবার ভগবানের দিকে মন দাও। কিন্তু অনেক ভক্তদের দেখা যায় যে তাদের মন এমন সংসারে আসক্ত হয়ে আছে যে খালি ভোগ, শুধুই ভোগ করে যাচ্ছে, যখন দুঃখ যন্ত্রণা আসে, সঙ্কটে পড়ে তখন ঠাকুরকে ডাকতে বললে বলবে – কই এতো তো ঠাকুরকে ডাকছি সমস্যা তো যাচ্ছে না। তার মানে যে সমস্যা এসেছে সেই সমস্যা চলে গেলে তার সমস্যার কোটা শেষ হয়ে যাবে না, আবার তাকে সমস্যা দিয়ে মারবে। সংসারের দুঃখ-যন্ত্রণায় যদি না শুধরে যায় ভগবান আবার তাকে মারবে, পরের এই মারাটা আগের থেকে আরও তীব্র হবে। অর্থার্থির তত তীব্রতা থাকে না, জিজ্ঞাসুরও বেশি জোর থাকে না, কিন্তু যখন আর্তের অবস্থায় যাবে তখন তার তীব্রতার মাত্রাটা অনেক বেশি থাকে। কারণ মানুষ যখন কষ্টে পড়ে প্রার্থনা করে তখন তার আন্তরিকতা খুব গভীর থাকে। জিজ্ঞাসুর তো কোন কামনা বাসনা থাকেনা কোন কিছু পাওয়ার জন্য সে ঠাকুরকে ডাকছে না, সেইজন্য জিজ্ঞাসুর অবস্থাটা অনেকটা উঁচু। আর জ্ঞানীর ব্যাপারে ভগবান বলছেন সে আমাকে প্রচণ্ড ভালোবাসে আমিও তাকে সাংঘাতিক ভালোবাসি – *অহং স চ মম প্রিয়ঃ*। কিন্তু ভগবানের প্রতি ভক্তি এই চার ভাবেই হয়। এই চারটে না হলে ভগবানকে ভালোবাসা যায় না, এই চারটে ছাড়া পঞ্চম কোন পথ হয় না।

চণ্ডীতে সুরথ রাজা আর বৈশ্যের যে কথা বলা হয়েছে সেখানেও এই আর্ত ও অর্থার্থীরই কথা বলা হয়েছে। দুজনেই খুব কষ্টে পড়েছে। একজনের রাজ্য চলে গেছে, আরেকজনকে তার স্ত্রী আর ছেলে এক জোট হয়ে সব টাকা পয়সা কেড়ে মারধোর করে বাড়ি থেকে বার করে দিয়েছে। দুজনেই শোকে দুঃখে কাতর হয়ে জঙ্গলে ঘুরতে ঘুরতে মেধস ঋষির আশ্রমে দুজনের দেখা হয়েছে। মেধস ঋষির উপদেশে তারা দুজনেই মহামায়ার আরাধনা করতে তপস্যাতে চলে গেল। মা যখন তাদের দুজনের তপস্যাতে সন্তুষ্ট হয়ে বর দিতে চাইলেন তখন একজন তার হৃত সাম্রাজ্য ফেরত চাইল, আরেকজন বলল আমার ওসব কিছুই লাগবে না আমি মুক্তি চাই। মা ভোগ আর অপবর্গ দুটোই দেন। এরা দুজনেই এসেছিল নিজেদের দুঃখের কথা বলতে, তাদের মধ্যে একজন নিজের দুঃখের কথা বলতে বলতে মুক্তির পথে চলে গেল।

**উদারাঃ সর্ব এবৈতে জ্ঞানী ত্বাত্মৈব মে মতম্। আস্থিতঃ স হি যুক্তাত্মা মামেবানুত্তমাং গতিম্।।১৮।।**

জ্ঞানী আমার আত্মা, সে আমার সব থেকে প্রিয়। তাই বলে বাকি যে তিন ধরণের ভক্ত এরাও কিন্তু কেউ কম নয়, *উদারাঃ সর্ব এবৈতে,* এরাও মহান, এরাও শ্রেষ্ঠ। কিন্তু এদের সবার থেকে জ্ঞানী আমার বেশি প্রিয়। কেন প্রিয়? কারণ জ্ঞানী আমার স্বরূপ। বৃহদারণ্যক উপনিষদে যাজ্ঞবল্ক্য-মৈত্রেয়ী সংবাদে যাজ্ঞবল্ক্য তাঁর স্ত্রী মৈত্রেয়ীকে বলছেন – মানুষ নিজের স্ত্রীকে সন্তানকে, টাকা পয়সা ঐশ্বর্যকে এই জিনিষ গুলোর জন্যই ভালোবাসছে না, আত্মার জন্যই ভালোবাসছে। নিজের আত্মাকে এই সব জিনিষের মধ্যে সে দেখে। এই ঘরে অনেক ধরণের আয়না লাগনো আছে, এখন যে আয়নাতে আমার মুখ সব থেকে পরিষ্কার দেখা যাবে সেই আয়নাতেই আমি নিজেকে দেখব। সন্তানের মধ্যে সে সব থেকে ভালো নিজের ছবি দেখতে পায় বলে সন্তানকে প্রচণ্ড ভালোবাসে। আবার অনেক জায়গায় দেখা যায় নিজের সন্তানকে কোন কারণে অনেক অর্থের বিনিময় বিক্রী করে দিচ্ছে, কেন? তার কাছে টাকা পয়সা বেশি প্রিয়, সে নিজের ছবিটা টাকা পয়সার মধ্যে ভালো দেখছে। আবার অনেকে আছে যারা নিজের মান-যশের মধ্যে নিজের ছবিটা ভালো দেখে, তারা বলবে আমি কোন কিছুতেই থাকব না, যদি প্রয়োজন হয় পাঁচ দশ হাজার টাকা খরচও করব, টিভিতে যেন আমাকে দেখায়, খবরের কাগজে আমার ছবি যেন ছাপা হয়। ভগবান বলছেন, এই যে জ্ঞানীভক্ত এ হচ্ছে আমার আত্মা, জ্ঞানীর হৃদয়ে আমার যে ছবি এর থেকে ভালো জগতে আর কোন কিছুর মধ্যে দেখা যাবে না। বাকী যা কিছু আছে এই *রসোহহমপ্সু কৌন্তেয়* থেকে পরে যা বলা হল, এর মধ্যে কোথাও ভগবানের ছবি এত ভালো দেখা যায় না, যত ভালো দেখা যাবে জ্ঞানীর হৃদয়ের মধ্যে, সেইজন্য জ্ঞানী ভগবানের অত্যন্ত প্রিয়। আর জ্ঞানীর কাছে ভগবানই হচ্ছেন একমাত্র সার। এই যে জ্ঞানীর কথা বলা হল, যাঁরা বলছেন ভগবান ছাড়া আর কিছু নেই, এনারাও কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ভগবানকে লাভ করতে পারেন না, মানে এঁদের মধ্যে বিজ্ঞানী সবাই হতে পারেন না। তাই ভগবান বলছেন –

**বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে। বাসুদেবঃ সর্বমিতি স মহাত্মা সুদূর্লভঃ।।১৯।।**

কবে তাঁরা তাহলে ভগবানকে লাভ করেন, বলছেন বহু বহু জন্মের সাধনার ফলেই সম্ভব হয়। ভগবান একটু সাবধান করে দিচ্ছেন, শাস্ত্র অধ্যয়ন করে, গুরু মুখে শুনে সব বুঝে গেলেই যে সব হয়ে যাবে ভাবছ তা নয়, ব্যাপারটা অত সহজ নয়, সময় লাগে, বহু জন্মের সাধনা না থাকলে হবে না। আর বলছেন, *বাসুদেবঃ সর্বমিতি, সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম,* সমুদয় জীব-জগৎ ভগবান বাসুদেবই – তিনিই আছেন, তিনি ছাড়া আর কিছুই নেই, এই বোধ প্রত্যক্ষ হয়ে গেছে, এই ধরণের মহাত্মা জগতে সত্যিই খুব দুর্লভ। বাকি সব কিছু হয়ে যাওয়া যায়, আর্ত, অর্থার্থী, জিজ্ঞাসু সব এমনকি জ্ঞানীও হয়ে যেতে পারেন কিন্তু আধ্যাত্মিক রাজ্যের শেষ কথা ভগবানই সব হয়েছেন, এই বোধ প্রত্যক্ষ হওয়া খুব কঠিন। কি রকম প্রত্যক্ষ? নিজের অন্তরাত্মাকে যিনি প্রত্যক্ষ দেখছেন যে এই হৃদয়ে যিনি বিরাজ করে আছেন, তিনি স্বয়ং ভগবান আর তার সঙ্গে দেখেন হৃদয়ে যিনি বিরাজ করে আছেন এর বাইরে যা কিছু আছে সব তিনিই হয়ে আছেন। এই অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া খুবই দুরূহ। কিন্তু যিনি এই অবস্থাকে প্রত্যক্ষ করেছেন তিনিই হচ্ছেন মহাত্মা, মহাত্মা বলতে যা বোঝায় সেই রকম আর কেউ নেই, অথবা তাঁর থেকে কেউ বড় হবার কোন প্রশ্নই নেই। জগতে এই ধরণের মহাত্মা অত্যন্ত দুর্লভ।

এই ভাবে কয়েক ধরণের আধ্যাত্মিক সাধকের শ্রেণীবিন্যাস করা হল, আর্ত, অর্থার্থি, জিজ্ঞাসু আর জ্ঞানী। এই জ্ঞানীর পরে হচ্ছে জ্ঞানবান, এই জ্ঞানবানকে এখানে মহাত্মা শব্দে সম্বোধিত করা হয়েছে। এটাই হচ্ছে বিজ্ঞানীর অবস্থা। আমরা বেশির ভাগই জিজ্ঞাসুর অবস্থাতে আছে, এখান থেকে জ্ঞানীর অবস্থাতে যাওয়াও খুব কঠিন। যখন কেউ তত্ত্বগত ভাবে বুঝে গেলেন যে ঈশ্বর ছাড়া আর কিছু নেই। তাত্ত্বিক দিক দিয়ে বুঝে নেওয়ার পর যতক্ষণ এই জ্ঞান প্রত্যক্ষ না হবে ততক্ষণ তাঁর কিন্তু মুক্তি হবে না। সেইজন্যই বলা হয়ে থাকে আধ্যাত্মিক অনুভূতির রাজ্য সর্বসাধারণের জন্য নয়। ধর্ম সর্ব সাধারণের জন্য হতে পারে কিন্তু আধ্যাত্মিকতা কখনই সবার জন্য নয়। এই শ্লোকে এইটাই বলতে চাইছেন যে, *বাসুদেবঃ সর্বমিতি,* এটাই হচ্ছে আধ্যাত্মিক অবস্থার চরম অবস্থা, এই অবস্থা প্রাপ্ত হওয়াটা খুবই দুর্লভ।

৪ঠা সেপ্টেম্বর ২০১০

গীতাতে একই শব্দ বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে সেইজন্য আমাদের প্রথম প্রথম গীতার অর্থ করতে গিয়ে সংশয় হওয়াটা কোন অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়। যেমন এই জ্ঞানী শব্দটি দুটো অর্থে ব্যবহার করা হয়, একটা অর্থ করা হয় জ্ঞানীর অর্থে, আরেকটির অর্থ করা হয় বিজ্ঞানীর অর্থে। জ্ঞানী বলতে গীতাতে প্রায়ই বোঝায় যিনি শাস্ত্র কথা গুরু মুখে শুনে ঠিক ঠিক ধারণা করে নিয়েছেন যে ঈশ্বরতত্ত্ব, পরমতত্ত্ব ঠিক এই রকমটি। এই জ্ঞানী থেকে বিজ্ঞানী হওয়ার পর ধারণার কোন ব্যাপার স্যাপার থাকবে না, এখনে সব কিছুই প্রত্যক্ষ, প্রত্যক্ষ দেখতে পান সেই ঈশ্বরতত্ত্ব বা পরমতত্ত্বকে। ঠাকুর এই জ্ঞানীর ব্যাপারটাকে বিশেষ গুরুত্ব দিতেন না, তিনি বলতেন ঈশ্বরের বিষয়ে তোমার ধারণা করে কি লাভ হবে, ঈশ্বরের সাক্ষাৎ করতে হবে, তাঁর সাথে প্রত্যক্ষ কথা বলা চাই। আমরা এখানে যাঁরা শাস্ত্র অধ্যয়ণ করতে এসে গীতার অনুধ্যান করছি, এখানে সবারই কিছু না কিছু পূর্বজন্মের সুকৃতি আছে, আগের আগের জন্মে কিছু জ্ঞান না হলে এই জন্মে আমরা কেউই শাস্ত্রের কথা বিশেষ করে গীতার কথা শুনতে আসতাম না, কিন্তু তাই বলে

কি আমাদের সবারই বিজ্ঞানীর অবস্থা হয়ে যাবে? না, কখনই হওয়া যাবে না। তবে কবে হব? *বহূনাং জন্মনামন্তে,* অনেক জন্মের পর। অনেক জন্মে মানে কি বলতে চাইছেন ভগবান? বলছেন শাস্ত্র কথা শুনে নিয়ে অনেক বছর ধরে সাধনা করে করে মরে গেলাম, তারপর আবার জন্ম হল, আবার সাধনা শুরু হল, এই ভাবে একের পর এক জন্ম সাধনা করতে করতে প্রত্যক্ষ অনুভব হয়। ষষ্ঠ অধ্যায়ে এই নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছিল, যখন সফল হয় না তখন সে আবার জন্ম নেবে, জন্ম নিয়ে আবার সাধনা করা শুরু করে। এই করতে করতে একটা অবস্থায় তার কি হয়? *জ্ঞানবান মাং প্রপদ্যতে,* মাং মানে আমাকে একবারে প্রত্যক্ষ ভাবে, এইটা এই রকমই দেখার পর আমাকে ভজনা করে। ঠাকুর বলছেন – কেউ দুধের কথা শুনেছে, কেউ দুধ দেখেছে আর কেউ দুধ খেয়ে হৃষ্টপুষ্ট হয়েছে। অবতারের প্রত্যেকটি শব্দের দাম আছে, এখানে বলছেন শুধু কেউ দুধ খেয়েছে বলে ছেড়ে দিচ্ছেন না, বলছেন দুধ খেয়ে হৃষ্টপুষ্ট হয়েছে, হৃষ্টপুষ্ট এই শব্দটার প্রচণ্ড তাৎপর্য আছে। এটাই হল বিজ্ঞানীর অবস্থা। যখন প্রত্যক্ষ দর্শন হয়ে যাবে তখন তাঁর জীবনধারা পুরো পাল্টে যাবে। জীবনধারা যদি না পাল্টে থাকে তাহলে কিন্তু তাঁর জীবনে ধর্ম আর আধ্যাত্মিকতার কোন ব্যবহারিক বা পারমার্থিক মূল্যই থাকবে না।

ঈশ্বর দর্শন বা ব্রহ্মজ্ঞান যাঁর হয় শুধু তিনিই জানেন যে তাঁর ব্রহ্মজ্ঞান হয়েছে, কারণ এটা হচ্ছে স্বসংবেদ্য। কিন্তু যিনি দুধ খেয়ে হৃষ্টপুষ্ট হয়েছেন তাঁর আচার আচরণে বোঝা যাবে যে তিনি বিজ্ঞানী। কিন্তু তার জন্য সাধুকে দিনেও দেখতে হবে রাতেও দেখতে হবে। কিন্তু ঠিক ঠিক বিজ্ঞানী, যিনি ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করেছেন, এই ধরণের মহাত্মা জগতে অতি দুর্লভ। একটু জ্যোতি দর্শন, ধ্যানে ঠাকুরের জ্যোতির্ময় রূপ একটু দর্শন হল, আধ্যাত্মিক সাধনায় এগুলো কিছুই নয়, কিন্তু এই দর্শনের একটা ভূমিকা আছে যা কিনা সাধককে আরও গভীর সাধনাতে প্রযোজিত হওয়ার উৎসাহ প্রদান করে। কিন্তু এটা জেনে রাখতে হবে আধ্যাত্মিক চরম জ্ঞান একদিনে কখনই হবে না।

আধ্যাত্মিক চরম জ্ঞানটা কি? বলছেন *বাসুদেবঃ সর্বমিতি,* ভগবান শ্রীকৃষ্ণই সব কিছু, ঐ চরম অবস্থায় সব কিছুতেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণকেই দেখেন। এইটাই উপনিষদে বলছে – *সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম,* তুলসীদাস বলছেন – সিয়া রাম ম্যায় সব জগ জানু, এইটাই হচ্ছে শেষ কথা। সবই হচ্ছে জড় আর চৈতন্যের খেলা, আমাদের সাধারণ অবস্থায় আমরা জড়টাকেই চৈতন্য মনে করি, চৈতন্যের কোন অস্তিত্ব আছে আমরা ভাবতেই পারিনা। আর যখন এই চরম অবস্থায় যায় তখন দেখে জড়ের কোন অস্তিত্ব নেই, শুধু চৈতন্যই আছে, তখন সমস্ত কিছুই চৈতন্যময় দেখেন। দক্ষিণেশ্বরে যখন ঠাকুর মা ভবতারিণীর পূজো করছেন তখন দেখছেন কোশাকুশিও চৈতন্য। যখন তিনি সব কিছুতে শ্রীকৃষ্ণময় দেখছেন, তখন তিনি কার প্রতি হিংসা করবেন আর কাকে নিয়েই বা শোক করবেন, কার প্রতি তাঁর মোহ হবে। তখন তিনি সব দুঃখ-কষ্টের পারে চলে যান। কিন্তু কেন আমাদের এই অবস্থা হয় না? তখন বলছেন –

**কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেঽন্যদেবতাঃ। তং তং নিয়মমাস্থায় প্রকৃত্যা নিয়তাঃ স্বয়া।।২০।।**

মানুষ জন্মজন্মান্তরে কর্মের পর কর্ম করে আসছে, আর প্রত্যেক কর্মের পশ্চাতে রয়েছে কামনা, কারুর পুত্র চাই, কারুর অর্থ চাই, কারুর নাম যশ চাই, কারুর ইন্দ্রিয়ের সুখভোগ চাই। *প্রকৃত্যা নিয়তাঃ স্বয়া,* কেউ আমাদের ভগবানের দিকে নিয়ে যাচ্ছে না, কেউ আমাদের খারাপ পথে নিয়ে যাচ্ছে না, এগুলি সব বিভিন্ন মতের কথা মাত্র, আমি নিজেই আমার ভালোর জন্য দায়ী আমার খারাপের জন্য আমি নিজেই দায়ী। এগুলোকে নিয়ে শাস্ত্রে অনেক আলোচনা করা হচ্ছে, তুমি ঠিকই বলছ ভগবানই আমাকে খারাপ পথে ভালো পথে নিয়ে যাচ্ছেন, অজ্ঞানীরা এই রকমই দেখে। কিন্তু জ্ঞানী দেখেন *স্বভাবস্তু প্রবর্ততে,* পঞ্চম অধ্যায়ে এই কথাই ভগবান বলেছিলেন, আমার প্রকৃতি মানে আমার স্বভাবই খারাপ বা ভালো পথে আমাকে নিয়ে যাচ্ছে। ভগবান হচ্ছেন কর্মাধক্ষ্য। তিনি দেখেন যে যেটা কর্ম করছে সেই কর্মের ফলটা ঠিক তার কাছেই যেন যায়। ভগবান না থাকলে সেই কর্মের ফলটা ফলবে না। তাই ফলটা ভগবানই দিচ্ছেন। দৈনিক মজুর যারা কাজ করছে, সারা দিন কাজ করার পর তার দৈনিক মজুরীটা তাকে তার মালিক দিচ্ছে। কিন্তু কাজটা কে করছে? সেই মজুর কাজ করেছে, যেমনটি কাজ করেছে তেমনটি তাকে তার সুপারভাইজার মজুরি দিচ্ছে। এ ছাড়া সুপারভাইজের আর কোন ভূমিকা নেই এখানে। ভগবান আছেন বলে কর্মফলটা আমার কাছে চলে আসছে।

বলছেন *কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ,* ভেতরে এত কামনা বাসনা যে, এই কামনা বাসনার প্রভাবে আমাদের জ্ঞান অপহৃত হয়ে গেছে। এই কামনা বাসনার পুর্তির জন্য মানুষ কত কি করছে, কেউ করবে ষষ্টি মায়ের ব্রত, কেউ সন্তোষীমায়ের ব্রত, কেউ বিভিন্ন গ্রহদেবতাদের পূজো করছে, কত রকমের ব্রত আর পূজো যে করছে তার ইয়ত্তা নেই। কেন করছে? শুধু কামনা পূরণ যাতে হয়, কামনাগুলো এদের বিবেক জ্ঞানকে অপহরণ করে নিয়েছে। বিবেক জ্ঞান অপহৃত হয়ে যাওয়াতে সে তখন বিভিন্ন দেবতাদির আশ্রয়ে চলে গিয়ে তাদের পূজো করে। আমরা এখানে যারা আছি আমরা সবাই ঠাকুরকে অবতার বলে মানছি, বলছি ঠাকুরই একমাত্র ভরসা, তারপরেও আমরা আজকে এই বাবাজী, কাল ঐ বাবাজীর কাছে দৌড়াচ্ছি। কেন দৌড়াচ্ছি? কারণ আমাদের মধ্যে যে দুর্বলতা আছে সেটাকে এখনও জয় করতে পারিনি, আর এইভাবে আজ এখানে কাল সেখানে ছুটোছুটি করলে কখনই নিজের দুর্বলতাকে

কাটিয়ে ওঠা যায় না। *তং তং নিয়মমাস্থায়,* যে যে দেবতার যা যা নিয়মের দ্বারা অর্চনা করা হয় সেই সেই নিয়মের অনুশীলন করে আমরা ভগবান বাসুদেব ভিন্ন অন্যান্য দেবতাদের পূজো করে যাচ্ছি। তখন ভগবান কি করেন?

**যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়ার্চিতুমিচ্ছতি। তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহম্।।২১।।**

যে যেমনটি প্রবৃত্তি নিয়েছে এবং সেই অনুসারে সে যে যে দেবতাদির প্রতি ভক্তি করছে, তখন তার সেই নিষ্ঠাটা সেই দেবতার প্রতি স্থির করে দিই। এখানে ভগবান স্থির করে দেন এর মূল কথা হচ্ছে, আমি সেই জিনিষটা নিয়ে বারংবার চিন্তা করছি বলেই স্থির হয়ে যাচ্ছে। এখন একজন লোক আমাকে খুব ভালোবাসছে, দিনরাত আমার চিন্তাই করছে তার ফলে তার বুদ্ধিটা আমার প্রতি স্থির হয়ে গেছে। এখন এখানে দুই রকম হতে পারে। এক, তিনি সব সময় আমার চিন্তা করছেন বলেই তাঁর বুদ্ধিটা আমার প্রতি স্থির হয়ে গেছে, দুই, ভগবান তাঁর মতিগতি এমন করে দিয়েছেন যে তাঁর বুদ্ধিটা আমার প্রতি স্থির না হয়ে অন্য আর কোথাও স্থির হচ্ছে না। গীতার মতে ভগবান এই বুদ্ধি স্থির হওয়ার জন্য মোটেই দায়ী নন। আমার মনে কামনা বাসনা আছে, সেই কামনা বাসনার পুর্তির জন্য আমি এর ওর কাছে যাচ্ছি। ভগবান তখন বলেন যে – ও, তুই এটাতেই খুশী হচ্ছিস, ঠিক আছে নে এইটাতেই তোর নিষ্ঠা হোক, তাই সেইখানেই তোর বুদ্ধিকে স্থির করে দিলাম। কিন্তু ভগবান এখানে কোথাও পক্ষপাতিত্ব করছেন না, তিনি আমার স্বভাব অনুযায়ীই যা করার করছেন। আবার তিনি যখন দেখেন এত দেবদেবীর কাছে দৌড়াদৌড়ি করে তাদের কষ্ট হচ্ছে, তখন তিনি নিজে সেই কষ্ট দূর করতে অবতার হয়ে নেমে আসেন। অবতার হয়ে এসে তিনি সবাইকে উপদেশ দিয়ে বলেন – দ্যাখ্, তোরা এই রকম দৌড়াদৌড়ি করিস না, *সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ,* সব কিছু ছেড়ে তোরা আমার কাছে চলে আয়। তখন কি হয়?

**স তয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তস্তস্যারাধনমীহতে। লভতে চ ততঃ কামান্ ময়ৈব বিহিতান্ হি তান্।।২২।।**

যে, যে কামনা করে যে যে দেবতার পূজা করছে, ষষ্ঠি মায়ের ব্রত করছে, ছট্ পূজা করছে, শনি পূজা করছে, সন্তোষী মায়ের পূজা করছে, যে দেবতারই পূজা করুক না কেন সেই পূজার ফল সে অবশ্যই পাবে। কিন্তু এই ফলটা কে দিচ্ছেন? ভগবান নিজেই দিচ্ছেন, *ময়ৈব বিহিতান্ হি তান্,* আমি নিশ্চিত করে দিয়েছি যে শীতলা মায়ের পূজা করলে এই ফল হবে, শনি পূজা করলে এই ফল হবে, আর এর ফল সে পাবেই পাবে, এমন কোন অবস্থা নেই যে সে ফল পাবে না। এই হচ্ছে গীতার স্থির সিদ্ধান্ত, আমি যারই পূজা করিনা কেন, গণেশ ঠাকুরের পূজাই করি, কিংবা শিব ঠাকুরের পূজাই করি। মেয়েরা শিবরাত্রির দিন শিবরাত্রি ব্রত করছে যাতে ভালো বর পায়, আবার সন্ন্যাসীরাও শিবরাত্রির দিন উপোশ করে শিবরাত্রি ব্রত করছেন যাতে পূর্ণজ্ঞানী হন। শিব ঠাকুর দুটোই একদিকে তিনি পূর্ণজ্ঞানী আবার আরেক দিকে পাক্কা গৃহস্থ। তাই দুজোনেরই ইচ্ছা পূরণ হবে। কেন পূরণ হবে? *ময়ৈব বিহিতান্ হি তান্,* আমিই এটা ঠিক করে দিয়েছি। এই সিদ্ধান্ত দেওয়ার পর বলছেন –

**অন্তবত্তু ফলং তেষাং তদ্ভাবত্যল্পমেধসাম্। দেবান্ দেবযজো যান্তি মদ্ভক্তা যান্তি মামপি।।২৩।।**

কিন্তু ভগবান যেন খুব দুঃখ করে বলছেন – আহা, এই লোকগুলোর কি কষ্টের ব্যাপার, এদের কত মন্দবুদ্ধি, একই পরিশ্রম করে, এই একই শ্রদ্ধা দিয়ে সে যদি আমার ভজনা করত তাহলে সেই ফলটাও পেত আবার আমার প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তিটাও পেত আবার আমার ভালোবাসাটাও পেত, কিন্তু তা না করে সেই একই পরিশ্রম আর নিষ্ঠা নিয়ে সে যা করছে তাতে ফলটা সে পেয়ে যাচ্ছে ঠিকই, কিন্তু জীবনের আসল বস্তুটি থেকে সে বঞ্চিত হয়ে যাচ্ছে। মন্ত্রী সারা জীবন রাজার সেবা করে এসেছে। শেষ জীবনে কি একটা ভুল কাজের জন্য রাজা মন্ত্রীর উপর রেগে গেছে। রেগে গিয়ে রাজা মন্ত্রীর ফাঁসির হুকুম দিয়ে দিলেন। ফাঁসি দেওয়ার সময় মন্ত্রী হাসছে। মন্ত্রীর হাসি দেখে রাজা জিজ্ঞেস করছে, তোমার আর কিছুক্ষণের মধ্যে মৃত্যু হবে জেনেও তুমি হাসছ কেন? মন্ত্রী তখন রাজাকে বলছে – দেখুন, সারা জীবন আমি আপনার সেবা করে গেলাম, তার ফলে আমার এই লোকও বৃথা গেল আর পরকালটাও নিষ্ফল হয়ে গেল। কিন্তু আমি যদি আপনার ভজনা না করে ভগবানের ভজনা করে থাকতাম তাহলে আমি ইহকালটাও পেতাম পরকালটাও পেতাম। অন্তিম কালে মন্ত্রীর এই উপলব্ধি হয়েছিল। আমার কাছে দশটি টাকা আছে, সেই দশটি টাকা নিয়ে বাজারে গিয়েছি, বাজারে খারাপ সব্জীও আছে টাটকা সব্জীও আছে। দুটোর একই দাম। এখন আমি কোন্ সব্জীটা কিনব? টাটকা সব্জী ছেড়ে কখনই বাসি সব্জী কিনতে যাব না। মানুষ যখন বাজারে কিছু জিনিষ কিনতে যায় তখন কম দামে বেশি ভালো জিনিষ কেনার দিকেই তো তার বেশি নজর থাকবে। আমি যদি আজকে ঘাস কাটার জন্য লোক খুঁজি মুড়িমুড়কির দরে লোক পেয়ে যাব, কিন্তু কম্প্যুটার চালানর লোক যদি চাই তাহলে কম লোক পাব, মিসাইল চালাবার জন্য আরও কম লোক পাব। মস্তিষ্কের বেশি খাটুনির দিকে যত যাব তত লোক কমে যাবে, কায়িক শ্রমের ক্ষেত্রে বেশি লোক পাওয়া যাবে। মস্তিষ্কের বেশি পরিশ্রম করার লোক কম বলে তার দাম বেশি দেওয়া হচ্ছে। যেটা দুষ্প্রাপ্য আর প্রয়োজনও আছে তারই দাম বেশি দেওয়া হয়। ভগবান এখানে তাই বলতে চাইছেন, অনেক কষ্টে এই মনুষ্য জীবন পাওয়া গেছে, আর এই জীবনও তো মাত্র কয়েকটা দিনের জন্য, এই মূল্যবান সময়টা যদি এই দেবতা সেই দেবতার পেছনে ঘুরে ঘুরে নষ্ট করে দাও তাহলে আসল যিনি আছেন, যাঁকে লাভ করাই এই মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য, সেই উদ্দেশ্যকে তাহলে তুমি কিভাবে সফল করবে। আজকে আমার চাকরি চাই, এই চাকরির জন্য অমুক দেবতার পূজা করে যাচ্ছি, তার

জন্য চাকরি তুমি অবশ্যই পাবে কিন্তু ঐ সময়টা যদি শ্রীরাম, শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীরামকৃষ্ণের ভজনা করতে তাহলে এই একই ফল হত, কিন্তু তার সাথে তোমার জীবনের গুণগত মান অনেক গুণ বেড়ে যেতে, কিন্তু অন্য দেবতার ভজনা করে তোমার জীবনের উৎকর্ষতা কখনই বৃদ্ধি পেত না। ভগবান তাই খুব দুঃখ করে বলছেন, এত সুন্দর আর এত সহজ পথ তবু মানুষ কেন ঈশ্বরের দিকে আসে না। তখন বলছেন –

**অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যন্তে মামবুদ্ধয়ঃ। পরং ভাবমজানন্তো মমাব্যয়মনুমত্তমম্।।২৫।।**

আমি শ্রীকৃষ্ণ, আমি সেই পরমাত্মা কিন্তু আমার বাস্তবিক স্বরূপটা কি? *অব্যক্তং*, এখানে ভগবান নিজেকে অব্যাক্ত রূপে বলছেন। যেটা ব্যক্ত নয় সেটাকেই অব্যক্ত বলা হয় এটা আমরা সবাই জানি, কিন্তু তিনি অব্যক্ত না বলে অদৃশ্যও তো বলতে পারতেন, কেন অব্যক্তই বলছেন? কারণ যেটাকে কোন ইন্দ্রিয় দ্বারা জানা যায় না সেটাকেই বলা হয় অব্যক্ত। ঈশ্বরকে ইন্দ্রিয়সমূহের দ্বারা জানা যায় না বলে ঈশ্বরকে অব্যক্ত বলা হয়। কেন ইন্দ্রিয় দ্বারা জানা যায় না? ঠাকুর বলছেন, এক সের ঘটিতে কি পাঁচ সের দুধ ধরে? আমাদের মন বুদ্ধি ইন্দ্রিয়ের ক্ষমতা হচ্ছে সীমাবদ্ধ, একটা নির্দিষ্ট মাপ আছে, ওই মাপের বেশি হলে মন বুদ্ধি সেটাকে ধরতে পারবে না। কিন্তু ঈশ্বর হচ্ছেন অনন্ত, সান্ত দিয়ে অনন্তকে ধরবে কি ভাবে? সেইজন্য বলছেন মন, বুদ্ধি এগুলো হচ্ছে সীমিত, সেইজন্য এই মন বুদ্ধি দিয়ে ঈশ্বরকে জানা যায় না। একটা জিনিষ কত বড় সেটাকে দেখাবার জন্য আমরা হাত দিয়ে দেখাই এই এত বড়। আর যে জিনিষটা বিশাল বড়, হাত দিয়ে তাকে মাপা যাচ্ছে না তাকে আমি কি করে বোঝাব। বোঝান যায় না। সেই রকম ঈশ্বরকে বুদ্ধি দিয়ে মাপা যাবে না। ইন্দ্রিয় ঠিক তাই করতে যায়, ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি থেকে আরও ছোট, ইন্দ্রিয় দিয়ে মাপা যায় না বলে ঈশ্বরকে বলা হচ্ছে অব্যক্ত। অব্যক্ত বলছে বলে এখানে অভাব হয়ে যাবে তা নয়, ঈশ্বর যে নেই তা নয়। একটু করে ছুঁয়ে ছুঁয়ে বলবে তিনি আছেন। তিনি কত বড়? সেটা বলতেও পারবে না, ধরতেও পারবে না। কিন্তু তিনি আছেন, অথচ অব্যক্ত। আচার্য শঙ্কর অব্যক্তকে অনুবাদ করছেন অপ্রকাশম্।

*অব্যক্তং* বলে তারপর বলছেন তিনি *অব্যক্তিমাপন্নং*, তিনি ব্যক্তির মত হয়ে গেছেন। ভগবানের বাস্তবিক স্বরূপ হচ্ছে *অব্যাক্তং* অথচ ব্যক্ত হয়ে গেছেন, শ্রীকৃষ্ণ রূপধারি ব্যক্তি হয়ে গেছেন। এটা কি করে হয়, অব্যক্ত ব্যক্ত কি করে হতে পারে? ভগবান বলছেন, যারা মুর্খ তারা মনে করে যে আমি সেইদিন জন্ম গ্রহণ করেছি, শ্রীরামকৃষ্ণদেব ফাল্গুনীর শুক্লা দ্বিতীয়ায় জন্ম গ্রহণ করেছেন, তার মানে ঠাকুর জন্মের আগে থেকেই আমাদের মধ্যে ছিলেন না। তারপর তিনি জন্ম নিলেন, আমাদের মধ্যে প্রকাশ হলেন, আবার তিনি মারা গেলেন, মানে আমাদের মধ্য থেকে চলে গেলেন। এগুলো হচ্ছে মুর্খদের কথা। আমি চিরন্তন, শাশ্বত, চিরদিনই আছি, এখনও অব্যক্ত, আবার অন্য দিক দিয়ে আমি আছি, অমুক সময় আমি ছিলাম না, তা কখন হবে না। কিন্তু সাধারণ মানুষ মনে করে আমি আগে কখন ছিলাম না, কিন্তু এখন আমি ব্যক্ত হয়ে গেছি। এদের ধারণা হল, ভগবান হচ্ছেন জন্মমরণশীল, ভগবান বলতে এখানে শ্রীকৃষ্ণ। আমি হচ্ছি *নিত্য প্রসিদ্ধম্ ঈশ্বরম্*, আমি হচ্ছি অবিনাশী পরমেশ্বর। কিন্তু লোকেরা মনে করে আমি কংসের কারাগারে অমুক দিনে জন্ম গ্রহণ করেছি। যাদের বুদ্ধি নেই তারাই আমাকে এই রূপ ভেবে নিয়েছে। সেইজন্য বলা হয় শ্রীরামকৃষ্ণ কিন্তু ভগবান নন, যিনি ভগবান তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ রূপে অবতীর্ণ হয়েছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ যদি ভগবান হন, তাহলে ভগবানের জন্ম হল, ভগবানের ক্যান্সার হল, ভগবানের মৃত্যু হল, তাহলে তো ভগবান জন্মমরনশীল হয়ে গেলেন, তিনি তাহলে কিসের ভগবান। কিন্তু যিনি ভগবান তিনিই শ্রীকৃষ্ণ হয়েছিলেন, তিনিই আবার শ্রীরামকৃষ্ণ হয়েছেন। তাহলে এগুলো কি, কিছুই নয়, এটা একটা খোলস মাত্র। সাধারণ মানুষের মত তাঁর জন্ম-কর্ম নয়। কিন্তু মুর্খরা কিভাবে দেখেন এটাকে বোঝাবার জন্য তিনি বলছেন যে তাঁর যেন জন্ম হল, তাঁর আবার মৃত্যু হয়ে গেল।

এরপর বলছেন *পরং ভাবমজানন্তো মমাব্যয়মনুত্তমম্*, আমার থেকে উত্তম আর কেউ নেই, আমার থেকে শ্রেষ্ঠ কেউ নেই। আর *অব্যয়ম্*, আমার কখন কোন ক্ষয় হয় না। এই ভাবটা কেউ বুঝতে পারেনা। শ্রীকৃষ্ণের হাত কেটে গেলে রক্ত বেরোবে, আমরা দেখছি তাঁর হাত কেটে গেছে, তাঁর দেহের কষ্ট হতে পারে কিন্তু তাঁর দেহের সাথে তাঁর কোন সম্পর্ক নেই। যারা ঠিক ঠিক ভক্ত শ্রীকৃষ্ণের হাত কেটে গেলে তাদেরও কিন্তু কষ্ট হবে। স্বামীজী জানতেন শ্রীরামকৃষ্ণ ভগবান, কিন্তু তিনিও ঠাকুরের শরীর চলে যাবার পর কাঁদছেন। কেন কাঁদছেন? কারণ এই নরদেহে আর লীলা হবে না। আবার কত কত বছর পর আবার তিনি নরদেহ ধারণ করে মর্তভূমিতে লীলা করবেন আমরা কেউই জানিনা। তাই ঠাকুরের শরীর চলে যাবার সময় স্বামীজী দেখছেন ঠাকুরের কিছুই হয়নি কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ রূপী যে শরীর সেই শরীরে আর ঈশ্বরীয় লীলার আস্বাদন করা যাবে না। মেয়ে বিয়ের পর যখন প্রথম শ্বশুরবাড়ী চলে যায় তখন মা কাঁদে, মেয়ে মরে যায়নি, অসুখ হয়নি, একটা ভালো জায়গায় মেয়ে আনন্দে নতুন জীবনকে বরণ করতে চলেছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও মা কাঁদে, কারণ এই রূপে এই ভাবে মেয়েকে আর সে পাবেনা। ঠাকুরের শরীর চলে যাবার পর ঠাকুরকে আর স্থূল চোখে দেখা যাবেনা, এরপর ভাব চক্ষু দিয়েই দেখা যাবে। নরেন, রাখাল, লাটু এনারা অজ্ঞানবশতঃ কাঁদছেন না, এই শরীরে ঈশ্বরের লীলাকে আর স্থুল ভাবে উপভোগ করা যাবে না বলেই এত কষ্ট। অধ্যাত্ম রামায়ণে এই ব্যাপারটার উপরে বিস্তৃত ভাবে আলোকপাত করা হয়েছে, সেখানে বলা হচ্ছে শ্রীরাম কোথাও যান না, শ্রীরাম কোন কথাও বলেন না। তাহলে সবাই কি দেখছে, এইটাই মায়া,

তিনি সাক্ষাৎ ভগবান। যিনি সাক্ষাৎ ভগবান তিনি আবার কেন কাঁদতে যাবেন, কেনই বা তিনি সীতা হরণে উদ্বিগ্ন হতে যাবেন। সাধারণ লোক দেখছে – সেদিন তাঁর জন্ম হয়েছে, সেদিন তাঁর জ্ঞান হয়েছে, সেদিন তিনি যুদ্ধ করলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের ঠিক কবে থেকে জ্ঞান হয়েছে? তাঁর আবার কি জ্ঞান হবে, তিনি তো পূর্ণজ্ঞানী, পূর্ণজ্ঞানীর আবার অজ্ঞান আসবে কোত্থেকে! কেন মানুষ এই রকম অজ্ঞানের মত আচরণ করে?

**নাহং প্রকাশঃ সর্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ। মূঢ়োঽয়ং নাভিজানাতি লোকো মামজমব্যয়ম্।।২৫।।**

যোগমায়া হচ্ছেন, যখন সত্ত্ব, রজো আর তমো মিশে যায়। শুদ্ধ চৈতন্যই সর্বব্যাপী পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে, শুদ্ধ চৈতন্য ছাড়া আর কিছুই নেই। কিন্তু শুদ্ধ চৈতন্যে এত পদার্থ কি করে হল? হীরে হচ্ছে সবচেয়ে শক্ত পদার্থ, এখন এই শুদ্ধ চৈতন্যে এত শক্ত পদার্থ কি করে এলো। লোহা, ইস্পাত এই সব পদার্থ কোথা থেকে এলো। আমাদের শাস্ত্রে এর ব্যাখ্যা হচ্ছে, এই লোহাগুলো তৈরী হয়েছে পঞ্চ মহাভূত থেকে। এই পঞ্চ মহাভূত আবার এসেছে পঞ্চ সূক্ষ্ম মহাভূত থেকে। এই পঞ্চ সূক্ষ্ম মহাভূত এসেছে মন থেকে। সব গুলোই হচ্ছে বস্তু কণিকা মাত্র, বস্তু কণাকে আরো ভাঙতে ভাঙতে মনকে পাওয়া যাবে। সবই পার্টিকেলস্ মানে বস্তু কণা। তাহলে মন হচ্ছে পঞ্চ সূক্ষ্ম মহাভূতের থেকে আরও সূক্ষ্ম কণা দিয়ে তৈরী। লোহাটা জড় বস্তু, এই লোহা হচ্ছে পঞ্চ মহাভূতের সমষ্টি, এই পঞ্চ মহাভূত আবার সৃষ্টি হচ্ছে এর থেকে আরও সূক্ষ্ম বস্তু কণা দিয়ে যাকে বলা হয় পঞ্চ সূক্ষ্ম মহাভূতগুলো থেকে। এই পঞ্চ সূক্ষ্ম মহাভূত বেরিয়ে আসছে মন থেকে। তাহলে লোহা যদি জড় পদার্থ হয় তাহলে মনটাও জড়, ইলেক্ট্রন প্রোটনের মত জড়, কিন্তু অত্যন্ত সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর। তার মানে আমি যখন কারুর চিন্তা করছি, তখন আমার মধ্য থেকে জড়ের একটা স্রোত বেরিয়ে আসছে। ইলেক্ট্রিসিটি আর ম্যাগনেটিজিমে দুটো বস্তু কণা পরস্পরকে গুণীতক হারে টানতে থাকে। আর যত এদের দূরত্ব বাড়তে থাকে এদের এণার্জি তত ক্ষয় হয়ে যায়। পজিটিভ নেগেটিভকে টানছে নেগেটিভ পজিটিভকে টানছে, সাউথ পোল নর্থ পোলকে টানে আর নর্থ পোল সাউথ পোলকে টানে। কিন্তু মাধ্যাকর্ষণের ক্ষেত্রে যখন আসে তখন সে আর এত পোলারিটি দেখে না, তখন এক অপরকে মাল্টিপ্লাই করে টানে। নিউটনের থিওরিতে এইটাই বলা হচ্ছে। বস্তু যত দূরে থাকবে তার আকর্ষণ তত কম হবে। বস্তুর যত ভর তাকে মাল্টিপ্লাই করে টানে। মাধ্যাকর্ষণের ক্ষেত্রে সব জিনিষ সবাইকে টানছে। কিন্তু যত দূরে থাকবে টানাটা তত কম হবে। ইলেক্ট্রিসিটিতে পজিটিভ নেগেটিভকে টানে আর নেগেটিভ পজিটিভকে টানে।

মনও টানে, তার দূরত্ব যত কমে যায় তার টানার শক্তিটা কমে যায়, ইংরাজীতে প্রবাদ আছে out of sight out of mind, কিন্তু যখন কাছে থাকে তখন মনের পছন্দের মত যা কিছু হবে তারা পরস্পরকে টানবে। ইলেক্ট্রিসিটির ক্ষেত্রে যত পছন্দের হবে প্রতিফলন ক্ষমতা তত বেশি হবে, আর বিপরীত হলে টানবে। মনের ক্ষেত্রে ঠিক উল্টো হয়, পছন্দের হলে টানবে, আর যত অপছন্দের হবে তত ঠেলতে থাকবে। আমি যাকে পছন্দ করছি না, যত তার কাছাকাছি আসব তত আমাদের মধ্যে অপছন্দের মাত্রাটা বাড়তে থাকবে। মন হচ্ছে জড় বস্তু, জড় বস্তু মানেই সে এণার্জিকে বহন করছে। এণার্জিকে বহন করছে বলে আমার মন আপনার মনের কাছাকাছি আসলেই পরস্পরের মধ্যে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া হতে থাকবে। কিভাবে ক্রিয়া করবে? আমি যদি আপনাকে ভালোবাসি আর আপনার মধ্যে যদি আমার প্রতি পছন্দের ভাব থাকে তাহলে আকর্ষণটা বাড়বে। যদি আপনাকে অপছন্দ করি তাহলে আপনার প্রতি আমার বিরক্তির ভাবটা বেড়ে যাবে।

এই যে আমরা এখানে সবাই একসাথে বসে আছি, আমরা সবাই গীতা শুনতে চাইছি, এক মন সবার, আমাদের সবার মনে একই চিন্তার তরঙ্গ প্রবাহিত হচ্ছে। তাই এখানকার তন্মাত্রা এখন শক্তিশালী গীতার তন্মাত্রা হয়ে গেছে। কারণ আমার যে মনের তন্মাত্রা আর আমাদের সবার মনের তন্মাত্রা এক হয়ে মিশে গিয়ে একটি মাত্র তন্মাত্রাতে দাঁড়িয়ে গেছে, সেটা হচ্ছে গীতার তন্মাত্রা। এখন যদি কোন মহা বিষয়ী লোক এখানে এসে গীতার কথা শুনতে থাকে, আস্তে আস্তে তার মনটা ঝিমিয়ে পড়বে, তার ভেতরে কোন বিষয় চিন্তা উঠতে পারছেনা আর অন্য দিকে গীতার ভাবকেও নিতে পারছে না, তখন সে এমনিতেই ঝিমিয়ে পড়বে। আর তা নাহলে সে এখান থেকে ছিটকে বেরিয়ে যাবে। বেলুড় মঠে ঠাকুরের মন্দিরে সব সময়, পূজো অর্চনা, জপ-ধ্যান হচ্ছে তার ফলে মন্দিরের তন্মাত্রাতে ভক্তিভাবের তন্মাত্রা খুব শক্তিশালী হয়ে আছে। এখন যারা খারাপ লোক তারা যখন মন্দিরে যাচ্ছে তাদেরও মন শান্ত হয়ে যায়। কাদের মন শান্ত হবে না? যারা অত্যন্ত নিকৃষ্ট মানের খারাপ লোক। বেলুড় মঠের গঙ্গার ধারে বসলেও মন শান্ত হয়ে যাবে, কারণ এই গঙ্গার পারে কত সাধুরা তপস্যা করে গেছেন, তপস্যা মানেই তাঁদের পবিত্র মন থেকে খুব শক্তিশালী উচ্চমানের তন্মাত্রা গুলোকে ছাড়া হয়েছে, এই তন্মাত্রা গুলো তো আসলে পদার্থ। শ্রীমা বলছেন, গঙ্গার তীর থেকে যারা এক মাইল দূরে থাকে তাদের সবার দেহমন সব শুদ্ধ হয়ে যায়। কারণ গঙ্গা যে তাঁর পবিত্র সূক্ষ্ম কণিকা গুলোকে ছাড়ছে সেগুলো এসে আমাদের তন্মাত্রা গুলোকে পাল্টে দেয়।

আমরা যখনই মনের জগতে এসে যাচ্ছি তখন জড়কে আমরা আর সেইভাবে দেখতে পাইনা। এই মনের উপরে হচ্ছে প্রকৃতি, প্রকৃতির ঠিক উপরে হচ্ছে চৈতন্য। কিন্তু এই প্রকৃতি যে আসলে কি সেটা বোঝা যায় না। প্রকৃতি হচ্ছে জড়ের মা, সেইজন্য

প্রকৃতিকে বলা হয় ত্রিগুণাত্মিকা। যেমন এই চকটা হচ্ছে সাদা রঙ। এই চকের মধ্যে ধবলত্ব আছে আর জড় কণিকা বা পার্টিকেলস আছে। এবার যদি চকের সব জড় কণিকা গুলোকে ছেড়ে দিই তখন যদি শুধু এর ধবলত্বটা থেকে যাবে, এবার সে প্রকৃতিতে চলে এল। যখন এর শুধু ধবলত্বটা থাকছে, এইভাবে যদি বস্তুর লালত্ব, হলুদত্ব থাকে তখন বস্তু তার প্রকৃতিতে চলে গেল। সেখান থেকে আবার যখন আস্তে আস্তে বিবর্তন হতে শুরু করবে তখন একটু একটু করে ঘন হতে থাকবে, এইভাবে হতে হতে প্রথমে মনে চলে এলো। সেটা যখন আরও ঘন হল তখন পঞ্চ সূক্ষ্ম মহাভূত হল, সেটাও যখন আরও ঘন হল তখন পঞ্চ স্থূল ভূত হল, সেখান থেকে বিভিন্ন বস্তুর রূপ নিতে শুরু করে। শুদ্ধ চৈতন্য যখন ঘন হতে শুরু হয় তখন তাঁর মধ্যে গুণ এসে যায়, এই গুণই আস্তে আস্তে বস্তুতে রূপান্তরিত হয়ে যায়। তাই মনও হচ্ছে জড় পদার্থ।

এখানে বলছেন *নাহং প্রকাশঃ সর্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ*, ভগবান, যিনি শুদ্ধ চৈতন্য, তাঁকে যোগমায়া তাঁর এই তিনটে গুণ দিয়ে ঢেকে রেখেছেন। ফলে ভগবানকে দেখা যায় না। সেইজন্য ভগবানকে দেখতে হলে একমাত্র অবতারের মধ্যেই দেখতে হয়। ভগবান কোন একটা গুণকে অবলম্বন করে অবতরণ করেন। যেমন আমরা শ্রীরামকৃষ্ণকে বলছি তিনি শুদ্ধ সত্ত্বগুণের আধার, বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণকে অবলম্বন করেছিলেন। শ্রীরামচন্দ্র রজোগুণকে ধারণ করেছিলেন বলেই তিনি এই ভাবে রাবণকে বধ করতে পারলেন। আবার কুর্মাবতারে তিনি তামস গুণকে ধারণ করেছিলেন। ভগবান যে গুণকেই অবলম্বন করুন না কেন, তাতে কিছু আসে যায় না, সবটাই তিনি, তিনটে গুণও তাঁরই।

ভগবান নিজেকে যোগমায়া দ্বারা আচ্ছাদিত করে রেখেছেন, যোগমায়া মানে এই প্রকৃতিতে আবদ্ধ করে রেখেছেন। ভগবান তাই বলছেন – এই কারণে আমাকে কেউ বুঝতে পারেনা। আমি যে অজম, অব্যয়ম্ আমার যে জন্ম হয় না, আমার যে কোন ক্ষয় হয় না, আমার মৃত্যু নেই, আমার কোন ধরণের নাশ হয় না, আমার এই জিনিষ গুলোকে সাধারণ লোকেরা বুঝতেই পারেনা। কারণ সাধারণ মানুষ এই তিনটে গুণের অধীন। তবে কি অবতারকে কেউই বুঝতে পারেনা? না, কেউ কেউ বুঝতে পারেন। কারা বুঝতে পারে? যারা প্রত্যক্ষ করে নিয়েছেন যে *বাসুদেবঃ সর্বমিতি*, সবটাই তিনি।

যদি বলি, হে প্রভু আপনি তো যোগমায়াতে ঢাকা পড়ে গেছেন, আপনি তো তাহলে নিজেই এই মায়ার জালে আবদ্ধ হয়ে গেলেন। এই নিয়ে আমাদের শাস্ত্র বিভিন্ন ভাবে অনেক আলোচনা করেছে, যেমন বলা হয় সাপের মুখে বিষ, কিন্তু সেই বিষে সাপের কিছু হয় না। জাদুকর জাদু দেখাচ্ছে, তার জাদুতে সবাই মোহিত হয়ে যাচ্ছে কিন্তু জাদুকর মোহিত হয় না। ভগবান হচ্ছেন জাদুকরের মত, লাগ ভেলকি লাগ করেই যাচ্ছেন, এতে তাঁর কিছুই হচ্ছে না আমরা সবাই হাঁ হয়ে যাচ্ছি। কিন্তু আমি যদি একবার বুঝে যাই জাদুকরের খেলাটা কি ভাবে হচ্ছে, তখন আমিও খুব হাততালি দেব, কিন্তু আমি জানি যে এটা হাতের কারসাজি। সেইজন্য অর্জুনকে বোঝাবার জন্য বলছেন, যোগামায়া আমাকে ঢেকে রেখেছে বলে তুমি ভেবো না যে আমিও যোগমায়াতে আবদ্ধ হয়ে আছি, যে জীবনমুক্ত সেই আবদ্ধ হয় না, আমি আর কি করে আবদ্ধ হব। তাই ভগবান বলছেন –

**বেদাহং সমতীতানি বর্তমানানি চার্জুন। ভবিষ্যাণি চ ভূতানি মাং তু বেদ ন কশ্চন।।২৬।।**

হে অর্জুন এই জগতের সব কিছুই আমার অবগত। জগতে এর আগে আগে যা কিছু হয়ে গেছে তার সব খবরই আমি জানি, এখন যেটা হচ্ছে সেটাও জানি, আগামীকাল কি হবে তাও আমি জানি। কারণ আমি জাদুকর কিনা সব কিছু প্রোগ্রামিং করা আছে। কিন্তু, *মাং তু বেদ ন কশ্চন*, আমাকে কেউ জানতে পারেনা। কথামৃতে ঠাকুর এটারই উপমা দিতে গিয়ে বলছেন, সার্জেন্টে সাহেবের হাতে লন্ঠন আছে, সেই লন্ঠনের আলোটাকে সবাই দেখতে পায়, সেই আলোতে সবাই সবাইর মুখ দেখতে পায়, সার্জেন্ট সাহেব সবাইকে দেখতে পায়, কিন্তু সার্জেন্ট সাহেবকে কেউ দেখতে পায় না, এইটাই গীতাতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলছেন *মাং তু বেদ ন কশ্চন*। আচার্য এখানে আবার যোগ করছেন, যারা শরণাগত ভক্ত তারা দেখতে পায়। আচার্যের এই কথাটাকেই ঠাকুর বলছেন, কেউ যদি সাহেবকে প্রার্থনা করে বলে, হে সাহেব আলোটা একবার তোমার মুখের উপর ফেল তাহলে তোমার মুখটা একবার দেখতে পাই। ভগবান জগতের ব্যাপারে সবটাই জানেন কিন্তু ভগবানকে কেউ জানতে পারেনা। ভগবানকে জানার উপায় কি? কেউ যদি ভগবানের শরণাগত হতে পারে সেই শুধু ভগবানকে জানতে পারে। গীতাতে যে গূঢ় তত্ত্বের কথা বলা হচ্ছে, ঠাকুর এইটাকেই খুব সহজ উপমা দিয়ে বলে দিলেন। সার্জেন্টকে কেন আমরা দেখতে পাইনা? এর কারণটা আসলে কি? তখন ভগবান বলছেন –

**ইচ্ছাদ্বেষসমুত্থেন দ্বন্দ্বমোহেন ভারত। সর্বভূতানি সম্মোহং সর্গে যান্তি পরন্তপ।।২৭।।**

এই ভাবটা আবার অষ্টম অধ্যায়েও আসবে। সমস্ত প্রাণীজগৎ কেন মোহিত হয়ে আছে? কেন মানুষ ঈশ্বরের দিকে যেতে চায় না? কেন তাঁকে জানতে ইচ্ছে করে না? অথচ মুখে আমরা সবাই বলি ঈশ্বরই আমার সব কিছু, তাঁকেই আমি চাইছি। কিন্তু তাঁকে সেই চাওয়ার মত চাইছিনা। ঈশ্বরকে পেতে গেলে, জানতে গেলে যা যা করার কথা অবতাররা বলে গেছেন তার ষোল ভাগের

এক ভাগও করতে বললে আমরা আঁতকে উঠব। কেন পারিনা? ভগবান বলছেন, *ইচ্ছাদ্বেষসমুত্থেন,* নানা রকরমের ইচ্ছা আর দ্বেষ মনের মধ্যে সব সময় সমুত্থিত হয়ে আছে। ইচ্ছা রাগেরই নামান্তর, আমি আগে একটা জিনিষকে পেয়ে খুব আনন্দ পেয়েছি, সেটাকে আবার পেতে চাইছি, এইটাই হচ্ছে রাগ। আগে একটা জিনিষ থেকে আমার খুব তিক্ত অভিজ্ঞতা হয়েছিল, সেই জিনিষটা যেন আবার না ফিরে আসে, ফিরে এলে সেই জিনিষ থেকে পালানোর চেষ্টা করছি, এইটাই হচ্ছে দ্বেষ। এই ইচ্ছা আর দ্বেষ সব সময় মনের মধ্যে চাড়া মেরে উঠছে। ইচ্ছা আর দ্বেষের এই চাড়া মারার জন্য ঈশ্বরকে মানুষ ভুলে যায়। তার ফলে ইচ্ছা আর দ্বেষের সমুত্থ জন্ম দিচ্ছে দ্বন্দ্বকে। কিসের দ্বন্দ্ব? শোক আর মোহের দ্বন্দ্ব, শোক হচ্ছে দুঃখ আর মোহ হচ্ছে একটা জিনিষকে পাওয়ার ইচ্ছা। রাগ আর দ্বেষ দ্বন্দ্বকে তৈরী করছে, দ্বন্দ্ব তৈরী হয়ে গেলে শোক আর মোহের জন্ম হয়ে গেল, শোক আর মোহ যখন চালু হয়ে গেল, তখন জগৎও পুরোদমে চালু হয়ে গেল। শোক আর মোহ জন্ম নিয়ে মানুষকে পুরোপুরি গ্রাস করে ফেলে।

আমাদের একটা প্রচণ্ড সমস্যা এই যে, আমরা একটা কাজ শুরু করে আরেকটা কাজের কথা ভাবতে আরম্ভ করে দিই। জপ-ধ্যানে বসার আগে ঠিক করলাম আজকে আমি আধ ঘন্টা টানা জপ ধ্যান করব। কিছুক্ষণ পরেই মনে হল, আহা রে, অনেক দিন কথামৃত পড়া হচ্ছে না, একটু কথামৃত পড়ে নিয়ে জপ ধ্যান করব। প্রথমেই মনের সাথে একটা গাঁটছাড়া বাঁধা হয়ে গেল। তারপরে আবার জপ করতে করতে হঠাৎ মনে হল, সবাই বলে জপের থেকে ধ্যান ভালো, ঠিক আছে একটু ঠাকুরের ধ্যানই করি। তারপরে মনে হবে – গুরুদেব ঠাকুরের যে মুর্তির ধ্যান করতে বলেছিলেন সেটাতো ঠিকই আছে, কিন্তু বেলুড় মঠের মন্দিরে ঠাকুরের যে মুর্তি আছে সেই মুর্তির ধ্যান করি। এই ভাবে একের পর এক মন একটা একটা করে কম্প্রোমাইজ করতে থাকে আর তার সাথে সাথে মনও নামতে থাকে। তারপরই হঠাৎ করে মনটা আরও নীচে নেমে গিয়ে বলবে – আরে তাইতো আমার ছেলেকে অনেক দিন ফোন করা হয়নি, ধ্যান থেকে উঠেই একটা ফোন করতে হবে। আমার মেয়ের সাথে পাড়ার যে মেয়েটি কলেছে পড়তে যায়, ওকে সেদিন একটা ছেলের সাথে ঘুরতে দেখেছিলাম, তাহলে আমার মেয়েও এই রকম কোন ব্যাপার আছে কিনা বুঝতে পারছি না, আজকেই মেয়েকে বারণ করে দেব ঐ মেয়েটির সাথে যেন বেশি না মেশে। অমুকের আজকের আসার কথা আছে, এই ভাবে পর পর একটার পর একটা চিন্তার ঢেউ আসতেই থাকবে। জপ ধ্যান করতে বসে দশ মিনিটের মধ্যে এত রকমের কাজের কথা মনে পড়ে যাবে যে আধ ঘন্টার জায়গায় পাঁচ মিনিটেই উঠে পড়তে পারলে মনে হবে বাঁচি। এর সবটা ইচ্ছা আর দ্বেষের সাথে জড়িত। এতো গেল মনের অবস্থা, আর শরীরের! বসার একটু পরেই এইখানটা চুলকাচ্ছে, বসে থাকতে থাকতে মনে হবে অনেক দিন ব্যায়াম করা হয়নি, আসনে বসেই একটু ফ্রী হ্যাণ্ড করা শুরু করে দেবে। তারপরে হঠাৎ চোখটা খুলে যাওয়াতে দুটো মশা নজরে আসতেই ফটাস করে মশা গুলোকে মারা শুরু করবে, তারপরে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল যে মাত্র ছয় মিনিট হয়েছে, ও, মাত্র ছয় মিনিট, ঠিক আছে আর পাঁচ মিনিট বসেই উঠে পড়ব। কোথাও কিছু নেই, যা কিছু আছে সব মাথায় কিলবিল করছে। ইচ্ছা আর দ্বেষের জন্য যত রকমের দ্বন্দ্ব আছে, শোক মোহাদি সব এসে নাড়িয়ে দিয়ে চলে যাবে। কিছু করতে দেবে না, ভগবানের ইচ্ছা তো অনেক দূরে। জপ ধ্যান করাটা খুব মজার ব্যাপার হয়, মন কিভাবে বাচ্চা শিশুর মত খেলা করে দেখে অবাক হয়ে যেতে হয়। জপ ধ্যান করতে বসে মনের মধ্যে যা যা হয় সেটাকে যদি লিপিবদ্ধ করা যায়, এক মাস পরে দেখা যাবে যে সেটা একটা খুব বিরাট মোটা বই হয়ে গেছে। অনেকে বলে জপ ধ্যান করতে বসলেই ঘুম পেয়ে যায়। ঘুম পাওয়াটা কিন্তু ভালো লক্ষণ, কারণ তমো আর রজো থেকে তার মনটা সত্ত্বগুণের দিকে যাচ্ছে। কারণ সত্ত্বগুণ বেঁধে ফেল, চতুর্দশ অধ্যায়ে ভগবান তিনটে গুণ কিভাবে আমাদের বাঁধে বলবেন। সেখান বলবেন সত্ত্বগুণ সুখ দিয়ে বেঁধে ফেলে, *সুখ সঙ্গেন বধ্নাতি*। জপ যখন করছি তখন সত্ত্বগুণ বাড়ছে, সত্ত্বগুণ মানে সুখ, সুখের সঙ্গে নিদ্রার যোগ আছে। জপ করতে গিয়ে যে ঘুমটা আসে সেই ঘুমটা খুবই ভালো লাগে, আর ঐ ঘুমে কখন দুঃস্বপ্ন আসবে না। যদি ঘুম পেয়ে যায়, তখন মনকে বলতে হবে, তুই ঘুমোবি, ঠিক আছে খুব ভালো করে ঘুমো শালা। তবে ঐ আসনে বসেই ঘুমোতে হবে। ঐ সময় যদি বিছানায় গিয়ে ঘুমোতে যাওয়া হয় তাহলে তখন আর কিন্তু ঘুম হবে না। কারণ জপের সময় শরীরের ঘুমের কোন প্রয়োজন হয় না, ঘুমটা তখন মনের একটা খেলা মাত্র।

তারপর বলছেন, *সর্বভূতানি সম্মোহং সর্গে যান্তি পরন্তপ,* এই দ্বন্দ্ব জাত মোহ সমস্ত প্রাণীকুলের প্রজ্ঞাকে স্ববশীভূত করে ঈশ্বরকে জানতে দেয় না, একেবারে সম্মোহিত হয়ে যায়। আর এই সম্মোহ নিয়েই এরা মারা যায় আবার যখন জন্ম নেয় তখন এই সম্মোহ নিয়েই আবার জন্ম নেয়। জন্ম-মৃত্যুর খেলা এই সম্মোহের জন্যই হয়। যে লোকটি শোক মোহে, সুখ দুঃখে এই রকম সম্মোহিত হয়ে আছে, সে ভগবানকে কি জানবে। শঙ্করাচার্য এখানে খুব মূল্যবান একটি কথা বলছেন – দ্যাখো ভাই, যার মন এই ইচ্ছা দ্বেষে পড়ে গেছে, সেই এই জগতের যে জাগতিক জ্ঞান, সেটাকেই ঠিক মত বুঝতে পারেনা, কোনটা ভালো, কোনটা মন্দ সেটাই ধরতে পারেন, সে কি করে পরমার্থ তত্ত্ব বুঝবে! ঠাকুর বলছেন – হারু খুব ভালো ছেলে, হঠাৎ দেখা গেল হারুর কোন কিছুতে মন নেই, আসলে হারুকে প্রেতনীতে ধরেছে। তার মানে, বাইরের যে জগৎ সেটার দিকেও তার দৃষ্টি নেই। তরকারীতে নুন হয়নি, নুন ছাড়াই খেয়ে নিয়ে চলে গেছে, মাথায় তার অন্য চিন্তা ঘুরছে। এই রকম সব মানুষকে হারুর মত প্রেতনীতে পেয়ে আছে তার পারমার্থিক জ্ঞান কি করে হবে! যারাই জন্ম গ্রহণ করেছে, যাদের মৃত্যু গ্যারান্টি হয়ে আছে, এরা সবাই কিন্তু সম্মোহিত হয়ে আছে, মোহগ্রস্ত, তাই ভগবানকে জানতে পারে না, ভগবানের দিকে মনও যায় না। কিন্তু কে ভগবানকে জানতে পারে?

**যেষাং ত্বন্তগতং পাপং জনানাং পুণ্যকর্মণাম্। তে দ্বন্দ্বমোহনির্মুক্তা ভজন্তে মাং দৃঢ়ব্রতাঃ।।২৮।।**

কারা দ্বন্দ্বমোহ থেকে মুক্ত, কারা ঠিক ঠিক হৃদয় দিয়ে ভগবানের ভজনা করেন? যারা পূণ্যকর্মা তারাই একমাত্র ঈশ্বরের ভজনা করতে পারে। পূণ্যকর্মা মানে, যে মানুষের পাপ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। যা ছিল সব ভোগ করা হয়ে গেছে, এখন আর ইচ্ছা দ্বেষ নেই, এখন আর পাপ কর্ম করেনা। এর পরে এনারা যা কিছু কর্ম করে সেটা করে অন্তঃকরণ শুদ্ধির জন্য। মোহের বশে বা নিজের কোন লোভের জন্য কোন কর্ম আর করে না। এঁরাই দ্বন্দ্ব মোহ থেকে মুক্ত হন। *ভজন্তে মাং দৃঢ়ব্রতাঃ*, দ্বন্দ্ব মোহ থেকে মুক্ত হয়ে এনারা আমাকে দৃঢ় নিষ্ঠার সাথে ভজনা করে। দৃঢ়ব্রতী বলতে বোঝাচ্ছে, যাঁরা পরমার্থ তত্ত্বকে বুঝে নিয়েছেন, পরমার্থ তত্ত্ব ঠিক এই রকম, এই ধারণা যাঁদের দৃঢ় হয়ে গেছে। ধারণা করার পর সেই তত্ত্বকে ধরে থাকা, শ্রীরামকৃষ্ণই সত্য বাকি সব মিথ্যা এই ভাবকে ধারণা করে লেগে থাকা, যত যা কিছুই হোক না কেন আমি জেনে গেছি শ্রীরামকৃষ্ণই সত্য আর সেইভাবে জীবন ধারাকে চালিয়ে নিয়ে যাওয়াই হচ্ছে দৃঢ়ব্রতী। এই দৃঢ়ব্রতী যতক্ষণ না হচ্ছি আর ইছা দ্বেষ ও দ্বন্দ্ব মোহ থেকে মুক্ত না হচ্ছি ততক্ষণ ভগবানকে জানা বা বোঝার কোন উপায় নেই, জানা বা বোঝাতো দূরের কথা ভগবানকে জানার ইচ্ছাও জাগবে না। প্রশ্ন আসতে পারে ভগবানকে জানার ইচ্ছা আমার কখন হবে, কি হলে ভগবানকে ভজনা করব? এর উত্তর দিতে গিয়ে ভগবান বলছেন –

**জরামরণমোক্ষায় মামাশ্রিত্য যতন্তি যে। তে ব্রহ্ম তদ্ বিদুঃ কৃৎস্নমধ্যাত্মং কর্ম চাখিলম্।।২৯।।**

যারা এই জন্ম-মৃত্যু চক্র থেকে মুক্তি চাইছে তারাই ভগবানকে ভজনা করে। মানুষ হচ্ছে মৃত্যু ধর্মা, জন্মাচ্ছে মরছে, আবার জন্ম নিচ্ছে আবার মরছে, বারবার এই জন্ম-মৃত্যুর খেলাই চলছে – *পুনরপি জননং পুনরপি মরণং পুনরপি জননীজঠরে শয়নম্* - জন্ম ও মৃত্যু পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠিত হয়, পুনর্বার মায়ের উদরে বাস করতে, *ইহ সংসারে খলু দুস্তারে কৃপয়াঽপারে পাহি মুরারে* – হে মুরারি, এই দুরতিক্রমণীয় অকূল সংসার থেকে কৃপাপূর্বক ত্রাণ কর। যিনি এই জন্ম মৃত্যুর চক্র থেকে মুক্তি পেতে চাইছে তখন তিনি কয়েকটি জিনিষকে জানার চেষ্টা করেন। এই কয়েকটি জিনিষকে ঠিক ঠিক জেনে গেলে সে তখন মুক্তির পথে অগ্রসর হয়। একটা বাড়ি তৈরী করার আগে যেমন কয়েকটা জিনিষের খবরাখবর তাকে নিতে হয়, যেমন একটা জমির খোঁজ করতে হবে, বাড়ি বানাতে কত খরচ পড়বে, বাড়ি বানাতে কি রকম জিনিষ ব্যবহার করা হবে। ঠিক তেমনি যারা আধ্যাত্মিক পথে আসতে চাইছে তাদেরকেও কয়েকটি জিনিষকে বুঝে নিতে হয়। আমরা বেশির ভাগই মনে করি গুরুর কাছে মন্ত্র দীক্ষা নিয়ে দিনে দুবার একশ আট বার জপ করলেই হয়ে যাবে। কিন্তু এটুকুতে কিছুই হবে না। যে ঠিক মুক্তির পথে চলতে চায় তাকে অনেক কিছু জানতে হয় বুঝতে হয়। এগুলো না বুঝে না জেনে মুক্তির পথে এগোলে সে হারিয়ে যাবে, যত এগোতে চাইবে ততই সে অথই জলে ডুবে যাবে।

কি কি জানতে হবে? বলছেন সাতটা জিনিষ তাকে আগে জানতে হবে – *তে ব্রহ্ম তদ্ বিদুঃ কৃৎস্নমধ্যাত্মং কর্ম চাখিলম্* - ব্রহ্মের ব্যাপারে জানতে হবে, অধ্যাত্ম কি জানতে হবে, কর্মকে জানতে হবে এর সাথে তাকে জানতে হবে –

**সাধিভূতাধিদৈবং মাং সাধিযজ্ঞং চ যে বিদুঃ। প্রয়াণকালেঽপি চ মাং তে বিদুর্যুক্তচেতসঃ।।৩০।।**

ব্রহ্ম কি, অধ্যাত্ম কি, কর্ম কি, অখিলম্ কি, এর সাথে তাকে অধিভূত, অধিদৈব ও অধিযজ্ঞ কি জানতে হয়। সপ্তম হচ্ছে *প্রয়াণকালেঽপি চ মাং তে বিদুর্যুক্তচেতসঃ*, মৃত্যুর সময় কোনটাকে জানলে আর জন্ম গ্রহণ করতে হয় না, মানে মৃত্যুর সময় ভগবানকে তাঁরা কিভাবে জানতে পারেন। মোট এই সাতটা জিনিষকে জানতে হয়। এই সাতটা প্রশ্নকে নিয়ে অষ্টম অধ্যায় শুরু হচ্ছে। এই সাতটা জিনিষকে না জানা পর্যন্ত মানুষ কিন্তু আধ্যাত্মিক পথে এগোতে পারে না। যাদের ইচ্ছা, দ্বেষাদি গুলো বশে এসে গেছে, তারা তখন কয়েকটি জিনিষকে বোঝার চেষ্টা করে। এর আগে যেমন বলা হল দৃঢ়ব্রতাঃ, যাঁরা পরমার্থ তত্ত্বকে ঠিক ঠিক জানে, এই পরমার্থ তত্ত্বকে জানার জন্য এই সাতটা জিনিষকে আগে জানতে হবে।

**ওঁ তৎসদিতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসুপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে**
**শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে জ্ঞানবিজ্ঞানযোগো নাম সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।।**

অষ্টম অধ্যায়

# অক্ষরব্রহ্মযোগ

এই অক্ষরব্রহ্মযোগের আলোচনা শুরু করার আগে আমাদের কয়েকটি জিনিষকে ভালো করে বুঝে নেওয়া প্রয়োজন। আমরা যত রকমের জ্ঞান লাভ করি সবই পরোক্ষ। পরোক্ষ মানে non-direct আর অপরোক্ষ হল non-non-direct। একটা কিছুর মাধ্যম ছাড়া আমরা জ্ঞান লাভ করতে পারিনা। ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি এগুলোই হল আমাদের জ্ঞান লাভের প্রধান মাধ্যম। কিন্তু ঈশ্বরের বা ব্রহ্মের বা আত্মার জ্ঞান লাভ এগুলোর কোন কিছুর মাধ্যমেই সম্ভব নয়। ভগবান বলে একজন কেউ আছেন, এই এককে আমরা যে অদ্বৈত বলবো তা বলা যাবে না। তাহলে কি একেশ্বরবাদ হয়ে যাবে? না তাও নয় তাহলে তো হিন্দু ধর্মের সাথে খ্রীশ্চান ধর্মের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকবে না। অদ্বৈত হল দ্বৈত নয়, এর মানে একের পরে কি আছে মুখে বলা যায় না। বোঝাবার জন্য ব্রহ্মকে অদ্বিতীয় বলা হয়। ভগবানকে এক বললে দুইও বলা যেতে পারে। একজন দ্রষ্টা আছে আর আছে দৃশ্য বস্তু, আমি দ্রষ্টা আর ভগবান দৃশ্য, এখানে এসে এককে দুই বোধ হচ্ছে, জড় আর চৈতন্য দুই বোধ থেকে আসছে। অদ্বৈত বললেই বুঝে নিতে হবে দ্রষ্টাও নেই দৃশ্যও নেই। তাহলে কি শূন্য বলব? না, তাও বলা যাবেনা। শূন্য নয়, একও নয়, দুইও নয়, ব্রহ্ম এই এক ও দুইয়ের পারে। এই এক দুইয়ের পারে যে অবস্থা – অস্তি মাত্র জ্ঞান, এই জ্ঞানকে এই ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি দিয়ে ধরা যায় না, যা আছে তাই আছে, এই বোধটাকে বোধে বোধ করাই হল অপরোক্ষ অনুভূতি বা অপরোক্ষ জ্ঞান।

অষ্টম অধ্যায়ের নাম অক্ষরব্রহ্মযোগ। অক্ষর কথার অর্থ হল যার কোন ক্ষয় নেই। ক্ষর মানে যার ক্ষয় আছে। সেই একমেবমদ্বিতীয়ম্ ব্রহ্মকেই অক্ষর বলা হয়। ব্রহ্ম মানেই অক্ষর, অক্ষর ব্যাপারটা বোঝার জন্য দুই একটা মূল জিনিষকে বুঝতে হবে। আমরা আগের অধ্যায়ে জ্ঞানবিজ্ঞানযোগে ঈশ্বরের দুই রকম প্রকৃতি পরা ও অপরা প্রকৃতির কথা আলোচনা করেছিলাম। এখন পরাকে নিয়ে সাধনা করলে কি রকম হয় আবার অপরাকে নিয়ে সাধনা করে কি রকম হয় তারই বিস্তৃত আলোচনা এই অষ্টম অধ্যায়ে করা হয়েছে। আধ্যাত্মিক রাজ্যে বিভিন্ন রকমের সাধনা আছে। মৃত্যু আমাদের অবশ্যাম্ভাবি, আমরা জীবনভর সাধনা করে যাচ্ছি, কিন্তু এই অবশ্যম্ভাবি মৃত্যু যখন শিয়রে এসে দাঁড়াবে তখন সাধকের সাধনা কি রকম হবে, সেই সম্বন্ধে এই অধ্যায়ে খুব সুন্দর ও বিস্তৃত ভাবে বলা হয়েছে।

সৃষ্টি তত্ত্বের কথা বলতে গিয়ে স্বামীজী দুটো জিনিষকে সামনে নিয়ে এসেছেন – আকাশ ও প্রাণ। আকাশ হচ্ছে জড়, প্রাণ হচ্ছে শক্তি বা এণার্জি। আকাশে গিয়ে প্রাণ যখন আঘাত করে তখন সৃষ্টির প্রক্রিয়া শুরু হয়। আকাশ ও প্রাণ মহৎ, সমষ্টি মন বা ঈশ্বর থেকে উৎপন্ন হচ্ছে। স্বামীজীর সময় আমেরিকাতে টেস্‌লা নামে একজন খুব বিখ্যাত electrical scientist ছিলেন। টেস্‌লা স্বামীজীর সৃষ্টিতত্ত্বের উপর বৈদান্তিক দৃষ্টিভঙ্গীর ব্যাখ্যা শুনে খুব অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। তিনি এত মুগ্ধ হয়েছিলেন যে, মনে মনে ঠিক করে রেখেছিলেন যে গণিতের সাহায্যে এটাকে প্রমাণ করা যেতে পারে। আকাশ থেকে জড় বা এই স্থূল জগৎ সৃষ্টি হচ্ছে, যে শক্তিতে এই সৃষ্টি কার্য হচ্ছে সেই শক্তি বা এণার্জি হল প্রাণেরই একটা রূপান্তর মাত্র। আকাশও পাল্টাতে পাল্টাতে স্থূল জগতের রূপ নিচ্ছে, প্রাণও পাল্টাতে পাল্টাতে এই বিদ্যুৎ শক্তি, আমরা যে নিঃশ্বাস নিচ্ছি, হজম করছি, চিন্তা করছি এই শক্তিতে রূপান্তরিত হচ্ছে। আমাদের শরীরের স্নায়ু, মন, বুদ্ধিতে যা কিছু হচ্ছে সবই সেই প্রাণেরই কার্য, প্রাণেরই একটি পরিবর্তিত প্রকাশ।

কিন্তু এই প্রাণ ও আকাশের একটা জায়গায় খুঁটি বাঁধা আছে। বেদান্ত বলছে এই আকাশ ও প্রাণ একই। ঠাকুর যেমন বলছেন ব্রহ্ম আর শক্তি অভেদ, কালী ও ব্রহ্ম এক। স্বামীজীর খুব ইচ্ছে ছিল আধুনিক বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত দিয়ে যদি বেদান্তের এটাকে প্রমাণ করে দেওয়া যায় তাহলে বেদান্তের এই সিদ্ধান্তটি একটা দৃঢ় ভিত্তির উপরে দাঁড়িয়ে যাবে। পরে অবশ্য আইনস্টাইন বিজ্ঞানের যে নতুন তত্ত্ব দাঁড় করালেন তাতে বেদান্তের এই সিদ্ধান্ত বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত দিয়ে প্রমাণ হয়ে গেছে।

কিন্তু বিজ্ঞান আমাদের শাস্ত্রের একটা মতবাদের হদিস এখনও দিতে পারেনি, তা হল – পরলোক সম্বন্ধে অদ্বৈতবাদের যে মতবাদ, অর্থাৎ যোগীর মতে আত্মা মৃত্যুর পর কোথাও যায় না, যেমন ছিল তেমনই থাকে। কেননা অদ্বৈতবাদীরা বলেন যার জন্ম নেই মৃত্যু নেই সে কেমন করে আর কিভাবে অন্য কোথাও যাবে। কিন্তু দ্বৈতবাদীরা বলেন মৃত্যুর পর মানুষ প্রথমে আদিত্যলোকে, অর্থাৎ সূর্য লোকে যায়, সেখান থেকে চন্দ্রলোক, তারপর চন্দ্রলোক থেকে দ্যুতলোকে বা বিদ্যুৎলোকে যায়। সেখানে একজন পুরুষ এসে তাকে ব্রহ্মলোকে নিয়ে যায়। ব্রহ্মলোকে সে ঈশ্বরের সঙ্গে বাস করে।

স্বামীজীর ইচ্ছে ছিল এই যে দ্বৈতবাদীরা বলছে মৃত্যুর পর বিভিন্ন লোকে যেতে থাকে, আর অদ্বৈতবাদীরা বলছে কোথাও যায় না – এই দুটো মতকে সমন্বয় করা। স্বামীজীর পত্রাবলীতে এই ব্যাপারট নিয়ে স্বামীজীর কিছু আলোচনা পাওয়া যায়, সেখানে তিনি টেস্‌লার নামও করছেন। স্বামীজীর মতে সূর্যলোক বলতে যেটা বলা হচ্ছে সেটা হচ্ছে আমাদের physical universe এখানে

জড় আর চৈতন্যকে পৃথক রূপে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় এবং এই সূর্যলোক হচ্ছে একেবারে স্থূল জগৎ, মানে আমাদের এই পরিদৃশ্যমান জগৎ। এখানে প্রাণ জড়শক্তি রূপে আর আকাশ স্থূলভূত রূপে প্রকাশ পাচ্ছে। এরপর আসছে চন্দ্রলোক, যা এই আদিত্যলোককে ঘিরে রেখেছে। আকাশে আমরা যে চাঁদ দেখি, এখানে কিন্তু সেই চাঁদের কথা বলা হচ্ছে না। এই চন্দ্র আদিত্যলোকেরই স্থূলভূত রূপ। শাস্ত্রে যে চন্দ্রলোকের কথা বলা হয়েছে, সেখানে বলা হচ্ছে, চন্দ্রলোক হল দেবতাদের আবাসভূমি। সূর্যের প্রাণীরা সেখানে যেতে পারে না। চন্দ্রলোকের অধিবাসীরা সূর্যলোকে আসতে পারবে না, মশারির মত নেটিং করা আছে, বাতাস আসা যাওয়া করতে পারবে কিন্তু মশা প্রবেশ করতে পারবে না। এখানে জড় আছে কিন্তু আরও সূক্ষ্ম রূপে তন্মাত্রা অবস্থায় আছে এবং প্রাণ মনঃশক্তি রূপে প্রকাশ পাচ্ছে। এই মনঃশক্তি বা psychic energy বা দিব্যশক্তি থেকেই যা কিছু এণার্জি দেখছি তার জন্ম হচ্ছে।

এরপর দ্যুলোক বা বিদ্যুৎলোক – এখানে জড় আর শক্তি এক হয়ে যায়, তার মানে এটা জড় আর এটা শক্তি আলাদা করে বোঝা যাবে না। এই মুহুর্তে শক্তি জড়ের মত আচরণ করবে আবার পর মুহুর্তেই জড় শক্তির মত আচরণ করবে। দুটো এত অভিন্ন অবস্থায় থাকে যে বলা খুব কঠিন হয়ে যায় বিদ্যুৎ জড় না শক্তি। জীব ওখানে গেলে নিজেকে অমুর্ত অবস্থাতে দেখবে, সেখানে কোন স্থূলের ব্যাপারই যে থাকবে না তা নয়, সূক্ষ্মকেও বোঝা যাবে না।

তারপর আসছে ব্রহ্মালোক। এই ব্রহ্মালোকে জীব গেলে দেখতে পাবে এখানে প্রাণও নেই আকাশও নেই, জড় আর শক্তি উভয়েই মূল শুদ্ধ আত্মশক্তিতে সম্মিলিত হয়ে যায়। আর যেহেতু শক্তি আর জড় থাকছে না সেইহেতু জীব বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডকে দেখে বিরাট মন রূপে। বিরাট মন যখন দেখে তখন নিজেকে দেখে পুরুষ বা হিরণ্যগর্ভ রূপে। এই ঘরে অসংখ্য জল কণিকা বায়ুর মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে, জলকণা গুলিকে দেখতে পাচ্ছিনা। জলকণা গুলো যখন জলের আকার ধারণ করবে তখন তার একটা আকার আসছে, এই জলই আবার ঠাণ্ডাতে বরফের আকার ধারণ করছে। মনও এই জলকণার মত অবস্থা প্রাপ্ত হয়। আমাদের মনই হল সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ। এখন আমাদের কাছে শরীর, শরীরের বিভিন্ন শক্তি সব আলাদা হয়ে আছে, যখন ব্রহ্মালোকে যাবে তখন সব এক হয়ে যাবে, সব কিছুই তখন বিরাট মন বা মহৎ বা হিরণ্যগর্ভ বা বিরাট পুরুষ রূপ নিয়ে থাকবে। দ্বৈত এখানে এসে শেষ হয়ে যায়।

অদ্বৈত বলছে, এই বিরাট মন, বিরাট আমি, এগুলো কিছুই থাকে না। সূর্য্যলোক, চন্দ্রলোক বলে কোন লোকই নেই। চিন্তা করছি আমি, ভাবছি শুদ্ধ আত্মা এর আগে কোথাওতো ছিল, হয় সূর্য্যলোকে নয়তো চন্দ্রলোকে। দ্বৈতবাদীদের কাছে এগুলো হচ্ছে events, কিন্তু অদ্বৈতবাদীদের কাছে এগুলো দৃশ্য। সিনেমার পর্দায় একটার পর একটা দৃশ্য আসছে আবার চলে যাচ্ছে কিন্তু দৃশ্যগুলির সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। ঠিক তেমনি অদ্বৈতবাদীরা বলে যে আত্মার কাছেও এই সব বিভিন্ন লোক একটার পর একটা দৃশ্য আসছে আর যাচ্ছে। আমার কাছে এগুলো বাস্তব মনে হবে কিন্তু জ্ঞানীর কাছে সব দৃশ্য মাত্র। আমি একজন অভিনেতা, একটা দৃশ্যে আমি অভিনয় করছি যে আমাকে পুড়িয়ে মারা হচ্ছে। এই দৃশ্যটাই যখন আমি পর্দায় দেখছি তখন কি আমি চেঁচিয়ে বলব যে আমাকে পুড়িয়ে মারা হচ্ছে, আমার কাছে এটা একটা দৃশ্য মাত্র। জ্ঞানীদের ঠিক এইটাই হয়। বিজ্ঞানের এই অবস্থাকে প্রাপ্ত হতে গেলে আমাদের সাধনা কি রকম হবে এই কথাই শ্রীকৃষ্ণ এই অষ্টম অধ্যায়ে বলছেন।

অর্জুনের সাতটি প্রশ্ন নিয়ে এই অধ্যায়ের শুরু হচ্ছে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছে অর্জুন এই সাতটি প্রশ্ন রাখছেন।

অর্জুন উবাচ

**কিং তদ্ব্রহ্ম কিমধ্যাত্মং কিং কর্ম পুরুষোত্তম। অধিভূতং চ কিং প্রোক্তমধিদৈবং কিমুচ্যতে।।১।।**

**অধিযজ্ঞঃ কথং কোঽত্র দেহেঽস্মিন্ মধুসূদন। প্রয়াণকালে চ কথং জ্ঞেয়োঽসি নিয়তাত্মভিঃ।।২।।**

সপ্তম অধ্যায়ের শেষে ভগবান বলছেন যারা জরামরণ থেকে মোক্ষ চাইছে তাদের আগে কি কি জানতে হবে বলে দিলেন। এখন যেমন বলা হচ্ছে ভগবান আসার পর সব সহজ হয়ে গেছে, শুধু কৃষ্ণ নাম কর, ঠাকুরের নাম কর তাতেই সব কিছু হয়ে যাবে। এখন কৃষ্ণ নাম কিভাবে করব, কৃষ্ণ নাম করলে আমি কত দূর যাব এই সব নিয়েই অষ্টম অধ্যায়ে এখন আলোচনা করা হবে। তত্ত্বের দিক দিয়ে অষ্টম অধ্যায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, বিশেষ করে যারা ভক্তি, মুক্তি আলোচনা করতে চান তাদের কাছে অষ্টম অধ্যায় খুব তাৎপর্যপূর্ণ। অষ্টম অধ্যায়ের শুরুতেই অর্জুন ভগবানের কাছে মোট সাতটা প্রশ্ন রাখছেন, ব্রহ্ম কি, অধ্যাত্ম কি, কর্মটা কি, অধিভূত কি, অধিদৈব কি, অধিযজ্ঞ কি আর মৃত্যুর সময় ভগবানকে যোগীরা কিভাবে জানেন। এগুলো সপ্তম অধ্যায়ে ভগবানই বলেছেন যে জরামরণ থেকে মোক্ষ পেতে হলে এগুলো তোমাকে জানতে হবে। এই শরীরের মধ্যে যা কিছু চলছে এগুলো কিন্তু এই শরীরকে নিয়েই চলছে। অর্থাৎ এই সাত খানা প্রশ্ন কিন্তু জগৎকে নিয়ে হচ্ছে না, হচ্ছে আমাকে নিয়ে। এইটাই হচ্ছে ঠিক ঠিক জ্ঞানযোগ, নিজের ব্যাপারে বিশ্লেষণ। ভগবান সাকার না নিরাকার এই ধরণের প্রশ্ন এখানে করা হচ্ছে না। এই সাত খানা প্রশ্ন হচ্ছে সরাসরি আমার অস্তিত্ব, আমি যে আছি, কিভাবে আছি এই নিয়েই প্রশ্ন। সেইজন্য গীতা খুব বাস্তবধর্মি, যেটা আমার জন্য দরকার সেটাকেই আলোচনা করছে, পাঁচ রকমের তত্ত্ব নিয়ে হাজির হচ্ছে না। এখন আমার এই শরীরের ভেতরে ব্রহ্ম কি, অধ্যাত্ম কি, কর্ম

কি, অধিভূত কি, অধিদৈব কি, অধিযজ্ঞ কি, আর মৃত্যুর সময় ভগবানকে কিভাবে জানা যাবে, যাঁকে জানলে আর পুনর্জন্ম হয় না। ভগবান এবার অর্জুনের এই সাতটা প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন –

শ্রীভগবানুবাচ

**অক্ষরং ব্রহ্ম পরমং স্বভাবোঽধ্যাত্মমুচ্যতে। ভূতভাবোদ্ভবকরো বিসর্গঃ কর্মসংজ্ঞিতঃ।।৩।।**

ভগবান এই শ্লোকে খুব সহজবোধ্য ভাবে বলছেন, এর মধ্যে কোন রকমের জটিলতা নেই। অর্জুনের প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে ব্রহ্ম কি? ভগবান বলছেন *অক্ষরং ব্রহ্ম পরমং*, অক্ষর মানে যার কোন ধরণের ক্ষয় হয় না, যার কোন ক্ষয় নেই তার নাশও কখন হবে না। অক্ষর যখনই বলা হবে তখনই এর আগে আত্মার যে গুণের কথা আমরা আলোচনা করেছিলাম তার সব কটি গুণই এসে যাচ্ছে। যার ক্ষয় হয় না, সে অব্যয়। যে অব্যয় সে অবিনাশী, যে অবিনাশী সে অজর, মানে তার জন্ম নেই, জন্ম যার হয় না তার মৃত্যুও নেই, সে অমর। আত্মার যত রকমের গুণ আছে সব কটি গুণই এই একটি শব্দ অক্ষর বললেই সাথে সাথে এসে যাবে। এই অক্ষর বলতে আবার কয়েকটি জিনিষকে বলা হয়। অনেক সময় অক্ষর বলতে ওমকে (ওঁ) বোঝায়, অক্ষর হচ্ছে পরমাত্মা। কিন্তু এখানে ওঁ বলা হচ্ছে না, অক্ষর বলতে পরম ব্রহ্মকেই বলছে। *ন ক্ষরতি ইতি পরমাত্মা*, যার কোন ক্ষয় নেই তিনিই পরমাত্মা, তিনিই হচ্ছেন পরম ব্রহ্ম। এই ডাস্টারটা একদিন ক্ষয় হয়ে যাবে, এই বিল্ডিংটা একদিন ক্ষয় হয়ে যাবে, হিমালয়ও একদিন ক্ষয় হয়ে যাবে, পুরো ব্রহ্মাণ্ডও একদিন ক্ষয় হয়ে ব্ল্যাক হোলে চলে যাবে, তাই এগুলো কোনটাই ঈশ্বর নয়। যার কোন ক্ষয় হয় না তিনিই সেই। কিন্তু এটাকে তো আমরা জানতে পারব না, এখন কিভাবে জানতে পারব এই নিয়েই গীতা শাস্ত্র। এই অক্ষরকে বলছেন নিরতিশয়, মানে যার থেকে বড় আর কেউ নেই। সেই যে পরম ব্রহ্ম, যাঁর কথা বলা হল, তিনিই আবার প্রত্যেক প্রাণীর শরীরে বাস করেন। রক্ত, মাংস, মজ্জা, হাড়, হৃদয় যেমন ভাবে শরীরের মধ্যে অবস্থিত পরম ব্রহ্ম কিন্তু সেই ভাবে শরীরের বাস করেন না। আমাদের প্রায়ই মনে হয় তিনি হৃদয়ে ছোট্ট আকারে জ্যোতির্ময় রূপে আত্মা হয়ে আছেন, সেই আত্মা আর পরমাত্মা এক। এখানে তাও বলা হচ্ছে না। তিনি কিভাবে আছেন? চৈতন্যস্বরূপে আছেন। সেইজন্য বারবার বলা হয় যে জীবাত্মা আর পরমাত্মা অভেদ। আমরা সব সময় মনে করছি সমুদ্র যদি সচ্চিদানন্দ সাগর হন তাহলে সেই সমুদ্রের এক ফোঁটা জল আমাদের শরীরের মধ্যে আছে। মুক্তি মানে এই এক ফোঁটা জল সমুদ্রে মিশে যাওয়া। আসলে তা নয়। যিনি শুদ্ধ চৈতন্য পরব্রহ্ম, তিনিই আমাদের মধ্যে বিরাজ করে আছেন। কিন্তু তিনি বোকার মত ভাবছেন আমি এই শরীর, আমি এই মন, আমার এই দুঃখ হচ্ছে, আমার এই আনন্দ হচ্ছে, আমি লেকচার দিচ্ছি, আমি লেকচার শুনছি। মায়ার দরুণ ভ্রান্ত হয়ে শুদ্ধ চৈতন্য জড়ের সাথে একাত্ম বোধ করছে, এই ভ্রান্ত ধারণাটাকে দূর করার জন্যই শাস্ত্র।

প্রত্যেক দেহে যে প্রত্যগাত্মা আছেন, প্রত্যগাত্মা মানে ভেতরে যিনি আছেন, এইটাই হচ্ছে স্বভাব। এখানে বোঝা যায় যে গীতা পড়া আর তার অর্থ অনুধাবন করা কত কঠিন। পঞ্চম অধ্যায়ে বলছেন – *স্বভাবস্তু প্রবর্ততে*, সেখানে এই স্বভাব হচ্ছে প্রকৃতি। সেখানে বলা হয়েছিল যে প্রভু আর বিভু সমান, তাঁরা যে কিছু করছেন তা নয় – যিনি আত্মা তিনি কি করেন? *ন কর্তৃত্বং ন কর্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ*, আত্মা যিনি তিনি আমার মধ্যে কর্তৃত্বও সৃষ্টি করেন না, আমার কর্মও সৃষ্টি করেন না আবার – *ন কর্মফলসংযোগং*, কর্মফলের সৃষ্টিও করেন না, তিনি কিছুই করেন না। তাহলে কে করছে? *স্বভাবস্তু প্রবর্ততে*, স্বভাব হচ্ছে প্রকৃতি, জড় পদার্থ, সে নিজের মত খেলা করে যাচ্ছে। কিন্তু এখানে অষ্টম অধ্যায়ে বলছেন *স্বভাবোঽধ্যাত্মমুচ্যতে*, তার মানে অধ্যাত্ম হয়ে যাচ্ছে স্বভাব। পঞ্চম অধ্যায়ে স্বভাব বলতে প্রকৃতিকে বোঝাচ্ছেন আবার অষ্টম অধ্যায়ে স্বভাব হচ্ছে জীবাত্মা, মানে ভেতরে আত্মা যিনি আছেন। একটা জায়গায় স্বভাব হচ্ছে প্রকৃতি, আর অন্য জায়গায় স্বভাব মানে চৈতন্য। একই শব্দ অন্য ভাবে অর্থ করা হচ্ছে। ভাষ্যকাররা সমাধান করে বলছেন একটা জায়গায় ব্যাকরণের এই নিয়ম অনুসারে স্বভাব হবে কর্মধারয় সমাস আরেকটা জায়গায় ব্যকরণের নিয়মে তৎপুরুষ সমাস হবে। এখন কর্মধারয় সমাস আর ষষ্টির তৎপুরুষ সমাসকে একই রকম মনে হবে।

এখানে বলছেন *স্ব স্ব ভাবঃ*, নিজের যে ঠিক ঠিক ভাব, নিজের যে প্রকৃত সার, আমি যেটা, সেটাই হচ্ছে অধ্যাত্ম। মানুষ ঠিক ঠিক কি? মানুষ হচ্ছে সেই পূর্ণ ব্রহ্ম, এইটাই তার স্বভাব। তাহলে ব্রহ্ম কি? যেটা আছে, যার কোন ক্ষয় হয় না। আর অধ্যাত্ম হচ্ছ স্বভাব, আমার যে প্রকৃত ভাব, বাস্তব সত্তা, সেইটাই কিন্তু পূর্ণ ব্রহ্ম। কিন্তু মনে হচ্ছে প্রত্যগাত্মা, যেন ভেতরে একটা ফোঁটার মত আছেন। মূল কথা হল, আমার ভেতরে যিনি আত্মা তিনিই পূর্ণ ব্রহ্ম, এটাকে বলার জন্য বলা হচ্ছে পূর্ণ ব্রহ্মের যে গুণ বা পরিচয় সেটা হচ্ছে অক্ষর, আর অধ্যাত্ম যে তার যে পরিচয় সেটা হচ্ছে স্বভাব, স্ব স্ব ভাবঃ, আমার যে প্রকৃত অস্তিত্ব, যেটা সার সেটাই স্বভাব।

এই যে আত্মা, যিনি পূর্ণ ব্রহ্ম, তিনি এই শরীরকে আশ্রয় করে খেলা করছেন। এই যে বোতল এখানে, এই বোতলকে আশ্রয় করেও সেই পূর্ণ ব্রহ্মই খেলা করছেন। ঠাকুর বলছেন, তিনি কি করেন? নরলীলা, দেবলীলা, জগতলীলা সব তিনিই করছেন। প্রত্যেকটি দেহকে, প্রতেকটি বস্তুকে আশ্রয় করে সেই পূর্ণ ব্রহ্মই খেলা করছেন। একই সাথে অনেক কিছুকে আশ্রয় করে খেলা

করছেন। আমার ক্ষেত্রে এই দেহকে আশ্রয় করে তিনি যে খেলা করছেন সেটা হচ্ছে স্বভাব আর এই শরীরে পূর্ণ ব্রহ্মের অবস্থিতি হচ্ছে অধ্যাত্ম।

*ভূতভাবোদ্ভবকরো বিসর্গঃ কর্মসংজ্ঞিতঃ*, জগতে যা কিছুর উৎপত্তি হচ্ছে, সব কিছু একমাত্র বেদের কর্ম দ্বারা উৎপত্তি হচ্ছে, বেদের কর্ম মানে যজ্ঞ। একমাত্র যজ্ঞ থেকেই যা কিছু আছে সব উৎপন্ন হচ্ছে। এই ভাবটাই আমরা তৃতীয় অধ্যায়ে পেয়েছিলাম, যেখানে বলা হয়েছিল *অন্নাদ্ভবন্তি ভূতানি পর্জন্যাদন্নসম্ভবঃ। যজ্ঞাদ্ভবতি পর্জন্য যজ্ঞঃ কর্মসমুদ্ভবঃ।। কর্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি ব্রহ্মাক্ষরসমুদ্ভবম্। তস্মাৎ সর্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্।।* যা কিছু আছে সব যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত। কারণ, এই যত ভূত বা প্রাণী আছে সবার অন্নের দ্বারা শরীর তৈরী হচ্ছে, বৃষ্টি থেকে অন্নের জন্ম হচ্ছে, যজ্ঞ থেকে মেঘের জন্ম হচ্ছে, কারণ পর্জন্য দেবতা যিনি, ইন্দ্র এই যজ্ঞ দ্বারা তুষ্ট হন, এই যজ্ঞ আবার কর্ম দ্বারাই সম্ভব হচ্ছে। এখানে প্রশ্ন হচ্ছে কর্মটা কি। বলছেন যে জিনিষের দ্বারা পুরো সৃষ্টিটা চলছে, যত প্রাণী আছে সমস্ত প্রাণীর যেখান থেকে সৃষ্টি সম্ভব হচ্ছে, সেটা আবার কিভাবে সম্ভব হচ্ছে? যজ্ঞ দ্বারাই একমাত্র সম্ভব হচ্ছে। এখন যজ্ঞে যে আহুতি দেওয়া হচ্ছে, এই আহুতি দেওয়ার সময় যে হবিঃ অগ্নিতে ছাড়া হচ্ছে এটাকেই বলা হচ্ছে কর্ম। *বিসর্গঃ*, মানে ছাড়া, বিসর্জন দেওয়া, ওঁ নমো ভগবতে শ্রীরামকৃষ্ণায় স্বাহাঃ, এই স্বাহা বলে যে ছাড়া হচ্ছে এটাকে বলা হচ্ছে কর্ম। এই যে যজ্ঞ করা হচ্ছে, যেখান থেকে সব সৃষ্টি প্রক্রিয়া চলছে, এই যজ্ঞের বাইরে যত কর্ম সবই কর্মবন্ধনের হেতু। তৃতীয় অধ্যায়ে ভগবান বলেছিলেন – *যজ্ঞার্থাৎ কর্মণোহন্যত্র লোকহয়ং কর্মবন্ধনঃ।* এই যজ্ঞ যখন করা হচ্ছে তখন *ভূতভাবোদ্ভবকরো*, সমস্ত ভূত ভাবের উদ্ভব করা হচ্ছে। তাই যজ্ঞ যদি নাশ হয়ে যায় তাহলে কিন্তু সব কিছু স্তব্দ হয়ে বিনাশের দিকে চলে যাবে। মানুষ ধর্মপ্রাণ কোন দিনই ছিল না, আমরা বলি বটে আগেকার মানুষরা ধর্মপ্রাণ ছিলেন, আসলে কিছুই ছিল না। রাবণ, কংস, দুর্যোধন চিরকালই সমাজে ছিল, এখনও আছে ভবিষ্যতেও থাকবে। বদলোক, বদমাইস লোক চিরকালই ছিল। কিন্তু পাশাপাশি ধরিত্রীর বুকে যুগে যুগে সন্ত মহাত্মারও অনেক জন্ম নিয়েছেন। তাঁরা যখন ভগবানের কাছে জগতের জন্য প্রার্থনা করেন তখন সেটাই যজ্ঞ হয়ে যায়, তাদের সেই প্রার্থনাতেই বৃষ্টি নেমে আসে। এর অর্থ হচ্ছে, যজ্ঞ করলে যা ফল হয়, সাধু মহাত্মাদের শুভ ইচ্ছাতে একই জিনিষ হয়। এটা আমাদের একটা ভাব ও ধারণা।

তাহলে পুরোটা কি দাঁড়াল – ব্রহ্ম হচ্ছেন যিনি অক্ষর, অধ্যাত্ম হচ্ছে যিনি আমার মধ্যে শুদ্ধ চৈতন্য, এই শুদ্ধ চৈতন্য আর পরম ব্রহ্ম এক। কর্ম হচ্ছে, যজ্ঞ যখন করা হয় তখন অগ্নিতে যে আহুতিটা ঢালা হচ্ছে, এই ঢালাটা হচ্ছে কর্ম, এর বাইরে কোনটাই কর্মের মধ্যে পড়ে না। তার মানে, আমি যদি যজ্ঞাদি না করি তাহলে কিন্তু আমি কর্ম করছি না। সব থেকে উচ্চ স্তরের কর্ম কি? *ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্* - এমন কি আমরা যে খাওয়া-দাওয়া করছি সেটাও যাতে ব্রহ্ম ভাব নিয়ে যজ্ঞ রূপে করা যায়। তখন খাওয়াটাও যজ্ঞকর্ম হয়ে যাবে। এরপর বাকি প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হচ্ছে –

**অধিভূতং ক্ষরো ভাবঃ পুরুষশ্চাধিদৈবতম্। অধিযজ্ঞোহহমেবাত্র দেহে দেহভৃতাং বর।।৪।।**

*অধিভূতং ক্ষরো ভাবঃ* – এই শরীরের যা কিছু পরিবর্তনশীল সেটা হচ্ছে অধিভূত। এই শরীরের যা কিছু আছে, মাংস, মজ্জা, রক্ত সব পরিবর্তনশীল, খেলে পুষ্ট হয়, না খেলে সব নিস্তেজ দুর্বল হয়ে ক্ষয় হয়ে যাবে। *পুরুষঃ চ অধিদৈবতম্*, পুরুষ হচ্ছেন যিনি চৈতন্য, আত্মা রূপে, পরম ব্রহ্ম রূপে আছেন তিনিই আবার অধিদৈব হয়ে আছেন। অধৈদবের ধারণা আমাদের শাস্ত্রে বারবার আসবে, অধিদৈবের ধারণাটার প্রচণ্ড তাৎপর্য আছে, ভালো করে না বুঝলে শাস্ত্রের অন্যান্য জিনিষ গুলো বোঝা যায় না।

আমাদের যত ইন্দ্রিয় আছে এর প্রত্যেকটি হচ্ছে জড় পদার্থ। তাহলে ইন্দ্রিয় কাজ করবে কি করে? তখন বলছেন, প্রত্যেকটি ইন্দ্রিয়ের পেছনে একজন চৈতন্য সত্তা আছে সেইজন্য ইন্দ্রিয়গুলো কাজ করে। সেই চৈতন্য সত্তাটা কে? তিনি হচ্ছেন একজন দেবতা। প্রত্যেকটি ইন্দ্রিয়ের একজন করে দেবতা আছেন। যেমন এই চোখ, চোখ হচ্ছে তেজ তন্মাত্রা দিয়ে তৈরী, তেজের আধিপুরুষ হলেন সূর্য, তাই চোখ ইন্দ্রিয়ের যে দেবতা তিনি হচ্ছেন সূর্য। আমরা আকাশে যে সূর্য দেখছি সেই সূর্য নয়, সূর্য একজন দেবতা, সেই সূর্য দেবতা আবার আমাদের ইন্দ্রিয়ে বাস করেন একজন দেবতা হিসেবে। এই দেবতাকে বলা হয় অধিদৈব, অধিদৈব আছেন বলে চোখ ইন্দ্রিয় কাজ করছে, তা নাহলে চোখ কোন কাজ করতে পারবে না। ঠিক সেই রকম জিহ্বা হচ্ছে রস তন্মাত্রার, আর বরুণ হচ্ছেন জলের দেবতা, জলের সার হচ্ছে রস, তাই জিহ্বার অধিদৈব হচ্ছেন বরুণ। নাসিকার দেবতা হচ্ছে অশ্বিনী, চর্মের দেবতা বায়ু, বায়ু হচ্ছেন স্পর্শ ক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত, কর্ণের দেবতা হচ্ছে দিক্, দিক্ হচ্ছে দিশা, দিশা আবার আকাশের সঙ্গে সংযুক্ত। এই রকম মনের দেবতা হচ্ছেন চন্দ্রমা, যাদের মস্তিস্কে গোলমাল আছে তাদের ইংরাজীতে বলা হয় লুনাটিক, এই লুনাসি শব্দ চাঁদ থেকে এসেছে। মনের দেবতা যদি দুর্বল থাকে কিংবা রুষ্ট থাকেন, পুর্ণিমা অমাবস্যাতে পাগলগুলোর পাগলামিটা বাড়াবাড়ির পর্যায়ে চলে যায়।

কিন্তু আসল অধিদৈব কে? আসল অধিদৈব হচ্ছেন সেই চৈতন্য সত্তা, পুরুষ। সেই পুরুষ যিনি তিনিই ইন্দ্রাদি দেবতা রূপে দেবতাদের দ্বারা ইন্দ্রিয়ের কাজ করাচ্ছেন। এর পরের প্রশ্ন হচ্ছে অধিযজ্ঞ কে? বলছেন *অধিযজ্ঞোঽহমেবাত্র দেহে দেহভৃতাং বর*, আমাদের বেদে একটা মন্ত্র আছে *যজ্ঞবৈ বিষ্ণুঃ*, ভগবান বিষ্ণু তিনি যজ্ঞ। এই বিষ্ণু কিন্তু আমাদের সাক্ষাৎ নারায়ণ বিষ্ণু নন, বিষ্ণু একজন দেবতা। কিন্তু পরে বেদের বিষ্ণু দেবতা সাক্ষাৎ ভগবান নারায়ণের সঙ্গে এক করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু বেদের সময় বিষ্ণু একজন সাধারণ দেবতা, মানে ইন্দ্রাদি দেবতাদের থেকেও ছোট। এই বিষ্ণু দেবতাকেই পরে ওনারা মহৎ করে ভগবান বিষ্ণু বানিয়ে দিলেন। যেমন আল্লা, আল্লা মহম্মদের সময় ছিলেন সাধারণ দেবতা, পরে আল্লাই হয়ে গেলেন মহৎ। *যজ্ঞবৈ বিষ্ণুর* এই বিষ্ণু কিন্তু ভগবান নারায়ণ নন, ইনি এখন একজন দেবতা। যাই হোক, বলছেন বিষ্ণুই হচ্ছেন যজ্ঞ, এই শরীরে যা কিছু হচ্ছে সবটাই যজ্ঞ রূপে চলছে, কারণ আধ্যাত্মিক পুরুষের কাছে সবটাই যজ্ঞ। এখন বাইরের জগতের যে যজ্ঞ সেটা হচ্ছেন বিষ্ণু কিন্তু ভেতরের যজ্ঞটা কে? ভগবান বলছেন – *অধিযজ্ঞোঽহমেবাত্র*, আমিই সেই যজ্ঞ। অধিযজ্ঞ হচ্ছেন সব যজ্ঞের অধিষ্ঠাতা, যিনি আছেন বলে এই যজ্ঞ হচ্ছে। বিষ্ণু দেবতা যদি নাইই থাকেন তাহলে আর যজ্ঞ হবেই না, শুধু বিষ্ণু দেবতা থাকলেই যে যজ্ঞ হবে তা নয়, বলা হচ্ছে যজ্ঞবৈ বিষ্ণুঃ, বিষ্ণুই যজ্ঞ। এই শরীরের যে যজ্ঞ চলছে সেই যজ্ঞের অধিষ্ঠাতা হচ্ছেন সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ, মানে সাক্ষাৎ ভগবান।

আমরা ছয়টি প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গেলাম। ব্রহ্ম হচ্ছেন অক্ষর, অধ্যাত্ম হচ্ছেন আত্মা, কর্ম হচ্ছে যজ্ঞে যখন আহুতিটা ছাড়া হচ্ছে, এই ছাড়াটা হচ্ছে কর্ম, শরীরে যা কিছু পদার্থ আছে সেটা হল অধিভূত, ইন্দ্রিয়গুলির যিনি অধিষ্ঠাত্রি দেবতা তিনি হচ্ছে অধিদৈব। এখানে শরীরের অধিদৈব কে? সেই শুদ্ধ চৈতন্য, যিনি পুরুষ, অন্তর্যামি, ছয় হচ্ছে অধিযজ্ঞ, শরীররূপী যজ্ঞের যিনি মালিক তিনি হলে অধিযজ্ঞ, তাহলে এই যজ্ঞের অধিষ্ঠাতা কে? ভগবান বিষ্ণু। গীতা হল মহাভারতের অন্তর্গত, মহাভারতের সময় এই শব্দগুলো, অক্ষর, অধ্যাত্ম, অধিভূত ইত্যাদি শব্দগুলো খুব প্রচলিত ছিল, কিন্তু অর্থ অনেকেই জানতেন না, তাই এই ধরণের প্রশ্ন হওয়া খুব স্বাভাবিক। কিন্তু বর্তমান যুগে এই শব্দগুলোর আগের মত প্রাসঙ্গিকতা নেই। প্রাসঙ্গিকতা এই অর্থে আছে যে, এখানে যা যা জিজ্ঞেস করা হচ্ছে এই প্রশ্ন গুলো এখনও থেকে গেছে, আমার শরীরের মধ্যে চৈতন্যটা কি, কাজ আর অকাজ কি, শরীর আর আত্মাতে কি তফাৎ, আমাদের ইন্দ্রিয় গুলো কিভাবে কাজ করে, আর শেষে এই শরীরের সত্যিকারের কোন মালিক আছেন কিনা। এইসব প্রশ্ন চিরকালই থাকবে, কিন্তু শব্দগুলো এখন আর সেইভাবে ব্যবহৃত হয় না। এই শব্দগুলো বৈদিক যুগের, আর মহাভারত হচ্ছে বেদ ও বেদ পরবর্তি যুগের সন্ধিক্ষণ, বেদ থেকে বিবর্তিত হয়ে বর্তমান যুগের দিকে এগোচ্ছে। এরপর সপ্তম প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন -

**অন্তকালে চ মামেব স্মরণমুক্ত্বা কলেবরম্। যঃ প্রয়াতি স মদ্ভাবং যাতি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ।।৫।।**

অর্জুনের প্রশ্ন ছিল, মৃত্যুকালে জিতেন্দ্রিয় যোগিরা কিভাবে আপনাকে লাভ করে? ভগবান বলছেন – *অন্তকালে চ মামেব স্মরণমুক্ত্বা কলেবরম্* - মৃত্যুর সময় যে আমার স্মরণ মনন ও ধ্যান করতে করতে দেহত্যাগ করে, সে *মদ্ভাবং যাতি*, সে আমারই ভাব পেয়ে যায়। *নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ*, এই ব্যাপারে তুমি কোন সংশয় করো না। এখানে বলছে *স মদ্ভাবং*, আমার ভাব। শ্রীকৃষ্ণের ভাব মানে ভগবানের ভাব। ভগবানের ভাবটা কি? শুদ্ধ চৈতন্য স্বরূপ। এখানে শঙ্করাচার্য বলছেন – *মদ্ভাবং বৈষ্ণবম্*, বিষ্ণুর পরম তত্ত্ব পেয়ে যায়। এখন পরম তত্ত্বটা কি? যারা শাস্ত্রাদি অধ্যয়ণ করেছেন, গুরুমুখে শাস্ত্র কথা শুনেছেন তাঁদের না হয় পরম তত্ত্ব সম্বন্ধে একটা ধারণা আছে। কিন্তু সাধারণ লোকেদের তিনি পরম তত্ত্ব লাভ করেন বললে কি বুঝবে। তাই বলা হয় বিষ্ণুলোক আছে, বৈকুণ্ঠে আছে, সেই বিষ্ণুলোকে ভগবান বিষ্ণু লক্ষ্মীর সঙ্গে বাস করেন। তাঁর দ্বারপাল হচ্ছে জয় বিজয়। যারা কৃষ্ণ ভক্ত তারা ওখানে যায়, সেখানে শুধু সুখ আর সুখ, আর ভোগের কত অফুরন্ত সামগ্রী। গীতায় কোথাও কিন্তু এই ধরণের কথা বলা হচ্ছে না। গীতা বলছে – সে আমার পরম তত্ত্ব পেয়ে যায়, আমার ভাব পেয়ে যায়। এখন ঠাকুরের কোন ভক্তের যখন শরীর চলে যায় তখন যেমন বলা হয় তিনি পরমধাম শ্রীরামকৃষ্ণলোকে চলে গেলেন। আসলে তা নয়, শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবটাকে প্রাপ্ত হয়ে যাচ্ছেন। ঠিক তেমনি শিবলোকে যাবেন, মানে শিবের ভাব পেয়ে যাচ্ছেন। যখনই কেউ বিষ্ণুর ভাব পেয়ে গেলে, তারপর তার আর পাওয়ার কিছু থাকল না, মানে তাঁর মুক্তি হয়ে গেল। এইটাই হচ্ছে সপ্তম প্রশ্নের উত্তর। যদি তুমি মৃত্যুর সময় আমার অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের চিন্তন করতে পার তাহলেই তুমি *মদ্ভাবং*, আমার ভাব পেয়ে যাবে। সেইজন্য এখনও বলে মরার সময় হরিনাম করে যাও, যদি তার কানে একটু হরিনাম যায় এই আশায়, যদি সেই সময় অন্য চিন্তা না করে হরির কথা মনে পড়ে যায়। গীতা বলছে মৃত্যু কালে তুমি ভগবানের নাম কর, মানে তাঁর কথা চিন্তা কর। কে চিন্তা করবে? যে মারা যাচ্ছে তাকে করতে হবে। কিন্তু সে তো করে না, তার বাড়ির লোকেরা, আর না হয় বন্ধু বান্ধবরা করে। এতে কিছুই হয় না। আমরা ভাবি মৃত্যুর সময় ইন্দ্রিয় গুলো যখন ছেড়ে দিতে থাকে তখন এই হরিনাম কানে গিয়ে তার মনে একটা কিছু হয়তো ছাপ পড়ে, তখন হয়তো কিছু কাজ করে। এতে আমরা শান্তি পাই, আর আমরা একজন মৃত্যু পথযাত্রীর কানে হরিনাম দিয়ে দায়ীত্ব পালন করছি। আমাদের আবার এও বলা হয় যে, সারা জীবন যদি তুমি ভগবানের কথা নাই ভাব মরার সময় যতই হরিনাম করা হোক না কেন ভগবানের কথা কিছুতেই মনে আসবে না। কারণ মৃত্যুর সময় সবার আগে ইন্দ্রিয় গুলো অস্তমিত হয়ে যায়, মস্তিষ্ক আর মন যদিও বা তখন কাজ করে, কিন্তু ইন্দ্রিয় গুলো আর কাজ করে না। এখন সবাই হরিনাম করছে, সেই হরিনামতো তার কানে যাচ্ছেই না। তখন মস্তিষ্ক আর মন কি করবে? যে ভোগী মানুষ তার ভোগের কথাই মনে আসবে।

আমার আপনার জন্য গীতা কি বলছে? ঈশ্বরে জো সো করে আগে ভক্তি লাভ কর। প্রথমেই যদি এটা কি ওটা কি প্রশ্ন নিয়ে সংশয় মেটাতে যাও তাহলে তোমার আর ভক্তি লাভ হবে না, প্রশ্ন আর সংশয়ের মধ্যে ঘুরপাক খেতে খেতে এক সময় দেখবে মৃত্যুর ঘন্টা বেজে গেছে। ঠাকুর বলছেন জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে ঈশ্বরের জ্ঞান, ভক্তির ঐশ্বর্য লাভ করা। তোমার মুক্তি আছে কি নেই এই ব্যাপারে তুমি কি বুঝবে। তুমি তো জন্মান্তরেই বিশ্বাস করতে পারছ না, যতক্ষণ জন্মান্তরকে চোখে না দেখছ ততক্ষণ তুমি কি করে বিশ্বাস করবে। কারণ এগুলো তোমার সব শোনা কথা। যে জন্মান্তরকেই বুঝতে পারছে না, সে মুক্তি আছে কি নেই কি করে বিশ্বাস করবে। সেইজন্য বলছেন, আগে জ্ঞান, ভক্তির ঐশ্বর্য অর্জন কর, ঐশ্বর্য মানে বিরাট সম্পত্তি। ঈশ্বরের প্রতি এমন জ্ঞান অর্জন করতে হবে যে জাগতিক জ্ঞানের যেটা অত্যন্ত দুরূহ সেটাও সহজ হয়ে যাবে, আর ঈশ্বরের প্রতি এমন ভালোবাসা হবে যে তাতে জাগতিক সুখ সম্পদ সব কিছু ঢাকা পড়ে যাবে। মানুষ সারা জীবন ধরে অনেক কিছু অর্জন করে আশা করে শেষ জীবনে ঐ অর্জিত জিনিষই তাকে সাহায্য করবে। যে প্রচুর টাকা পয়সা রোজগার করেছে সে ভাবছে শেষ জীবনে এই অর্জিত অর্থই আমাকে নিরাপত্তা দেবে। যে পরিবার বন্ধু বান্ধবদের নিয়ে চলেছে, অনেক সন্তান নাতিপুতি, বন্ধু বান্ধব জুটিয়েছে সে আশা করে এরাই আমার শেষ জীবনে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবে। কিন্তু যে সারা জীবন ধরে ভগবানের জ্ঞান, ভক্তি, ঐশ্বর্যকে অবলম্বন করে চলেছে, শেষ বয়সে তাকে কে রক্ষা করে? এই জ্ঞান ভক্তির ঐশ্বর্যই তাকে রক্ষা করে। তাই বলে মৃত্যুর সময় সে কি কষ্ট পাবে না? খুব পাবে। যার টাকা পয়সা আছে সে কি মৃত্যুর সময় কষ্ট পায় না, যার বউ বাচ্চা, নাতিপুতি বন্ধু বান্ধব অনেক আছে সে কি কষ্ট পায় না? সেও খুব কষ্ট পায়। একটা অবস্থার পর কেউ কারুর কষ্ট ভাগ করে নিতে পারে না। আমার যখন শরীর খারাপ করে তখন ডাক্তার ভালো ভালো দামী ওষুধ দিয়ে চিকিৎসা করতে পারে কিন্তু আমার যে কষ্ট সেটা আমাকেই সহ্য করতে হবে। টাকা আমার যতই থাকুক আর সেই টাকা দিয়ে সেরা ডাক্তার, সেরা নার্সিংহোম সব করা যেতে পারে, কিন্তু কষ্টটা কেউ নিয়ে নিতে পারবে না।

কথামৃতে ঠাকুর কোথাও জন্মান্তর, মুক্তির কথা নিয়ে বেশি আলোচনা করছেন না, এমনকি জন্মান্তর প্রসঙ্গ উঠলে তিনি এড়িয়ে গিয়ে অন্য প্রসঙ্গ নিয়ে আসছেন, পাপপূণ্যের প্রসঙ্গ এড়িয়ে যাচ্ছেন। ঠাকুর সমস্ত কিছুকে এক করে শুধু একটা জায়গাতে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন, তা হচ্ছে তোমার এই জীবন, আর জ্ঞান ভক্তির ঐশ্বর্য। বলছেন মানব জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে ঈশ্বর দর্শন। এই জীবনেই তুমি জ্ঞান ভক্তির ঐশ্বর্য অর্জন কর, তার মানে তিনি জীবন্মুক্তির কথা বলতে চাইছেন। ঠাকুর কোথাও বলছেন না যে তুমি মৃত্যুর পর মুক্তি লাভের চেষ্টা কর। তোমাকে যা যা করার এই জীবনে এক্ষুণি করতে হবে। পঞ্চম অধ্যায়ে আমরা দেখেছি ভগবান শ্রীকৃষ্ণও এই কথাই বলছেন – *ইহৈব তৈর্জিতঃ সর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ,* আমাদের পুনর্জন্ম আছে কিনা সেটাই জানিনা, শাস্ত্রের মাধ্যমেই শুধু জানছি, কিন্তু তোমার এই জন্মটা সামনে আছে এইটাতো মানছ, এই জন্মেই তুমি জ্ঞান ভক্তির ঐশ্বর্য লাভ করে মুক্তির চেষ্টা কর। সেইজন্য এটা ওটার দিকে বেশি মনকে যেতে দিতে নেই, এই প্রশ্নের উত্তর না পেলে আমি শান্ত হতে পারছি না, এই ধরণের মনোভাবকে ত্যাগ করে আগে ঈশ্বরের দিকে মনটাকে নিয়ে যাও। যারা শুধু শাস্ত্র চর্চা করতে ব্যস্ত এগুলো তাদের মাথা ব্যাথার কারণ হতে পারে, শাস্ত্র চর্চাতো তোমার জীবনের উদ্দেশ্য নয়, শাস্ত্র কি বলছে জেনে নিয়ে এবার ঝাঁপিয়ে পড়ে জ্ঞান, ভক্তি, ঐশ্বর্য লাভের জন্য।

৫ই সেপ্টম্বর ২০১০

অষ্টম অধ্যায় অর্জুনের সাতটি প্রশ্ন নিয়ে শুরু হয়েছে। এই সাতটি প্রশ্নের প্রাসঙ্গিকতা ভগবান সপ্তম অধ্যায়তেই নিয়ে এসেছিলেন। যে মানুষ জন্ম-মৃত্যু সংসার চক্র থেকে বেরোতে চাইছে, তাকে আগে কয়েকটা জিনিষ বুঝে নিতে হবে, এই জিনিষ গুলো যখন বুঝে নেবে তখন সে ঠিক জায়গায় নিজের দৃষ্টিটাকে নিয়ে যাবে। না বুঝে নিলে অনেক ভ্রান্ত জিনিষে মানুষের মনটা চলে গিয়ে তার মধ্যে সংশয় তৈরী করে দেবে, তখন সে আর সাধনার পথে সেই ভাবে অগ্রসর হতে পারবেনা। ভ্রান্ত জিনিষ থেকে মনটাকে সরিয়ে নিয়ে ঠিক জায়গায় মনটাকে লাগানোর জন্য এই জিনিষ গুলো আগে জেনে নিতে হয়। একটা জায়গায় মন লাগাতে গেলে আমাকে আগে জানতে হবে আমি কোথায় আমার মনটাকে লাগাব। অষ্টম অধ্যায়ে কোথা থেকে মনটাকে সরাতে হবে সেটা বলবে না, আমার মনটাকে কোথায় লাগাতে হবে সেই কথাই বলবেন। জগতের যে স্বরূপ, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ এগুলো নিয়ে আলোচনা করা হবে না। কিন্তু কোথায় মন দিতে হবে আর সেখানে মন দিলে কি হবে, এই জিনিষ গুলোকে নিয়েই আলোচনা চলছে।

সেই আলোচনা করতে গিয়ে বলছেন, আমাদের এই যে শরীর মন ইন্দ্রিয়, মানুষ যে বেঁচে থাকে, তাঁর যে জীবন এটা হচ্ছে দিব্য। যার জন্য তার ভেতরে যিনি অন্তর্যামী আছেন, তিনি হচ্ছেন ভগবান নিজেই। কিন্তু এই শরীরের যা কিছু আছে এর সবটাই জড় পদার্থ, এটাকে বলা হচ্ছে অধিভূত। সব বলে বলছেন যা কিছু কাজ হবে সেটা হচ্ছে যজ্ঞ আহুতি, যজ্ঞে যে আহুতি হয় সেটাই হচ্ছে একমাত্র কর্ম আর বাকি সব অকর্ম। মূল বক্তব্য হল, যে জিনিষটাকে যজ্ঞ হিসাবে করা হচ্ছে সেটাই একমাত্র কর্ম বাকি সব বন্ধন সৃষ্টি করে। শেষ প্রশ্ন ছিল, মৃত্যুকালে যোগী আপনাকে কিভাবে জানে। এখানে কিন্তু জীবন্মুক্তির কথা বলা হচ্ছে না। জীবন্মুক্তির কথা কিছু কিছু পঞ্চম অধ্যায়ে করা হয়ে গেছে। অষ্টম অধ্যায়ে বলা হচ্ছে যার জীবন্মুক্তি হয়নি, সে মৃত্যুকালে আপনাকে কিভাবে জানতে

পারবে। তখন ভগবান বলেছিলেন – *অন্তকালে চ মামেব স্মরণ্মুক্ত্বা কলেবরম্,* অর্থাৎ মৃত্যুর সময় আমাকে স্মরণ করে, আমাকে চিন্তন করতে করতে যদি সে তার দেহকে ত্যাগ করে দেয় তাহলে সে কি হয়? *স মদ্ভাবং,* সে আমার ভাবকে প্রাপ্ত করে। শুধু আমার চিন্তা করেই যে এই রকম হচ্ছে তা নয়, মৃত্যু কালে তুমি যা চিন্তা করবে মৃত্যুর পরে তুমি তাই হবে। মৃত্যুর সময় যদি শ্রীকৃষ্ণকে চিন্তা করে তাহলে সে কৃষ্ণ ভাব পায়, শুধু তাই নয় –

**যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্। তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ।।৬।।**

যে ভাবকে মাথায় রেখে সে শরীর ত্যাগ করে, ঠিক সেই ভাবটাকেই সে প্রাপ্ত করে, *তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ।* এখন আমাদের প্রশ্ন হতে পারে যে, মরার সময় বাবা ছেলের চিন্তা করছে, এখন বাবা মরার পর ছেলেকে কি প্রাপ্ত হবে? না, তা হবে না। এখানে বলা হচ্ছে যে ভাব, আমাদের আধ্যাত্মিক জীবনে গুরুত্ব হচ্ছে ভাবের। তার মানে, বিষয় চিন্তা করতে করতে সে যদি মারা যায় তাহলে কিন্তু সে ঐ বিষয়তেই গিয়ে জন্ম নেবে। আধ্যাত্মিক চিন্তন করতে করতে যদি মারা যায় তাহলে তার আধ্যাত্মিক ভাবে গিয়ে জন্ম নেবে। আমরা মনে করি মৃত্যুর সময় যে চিন্তা নিয়ে মরবে সে তাই হবে, কিন্তু তা হচ্ছে না, যে চিন্তাটা করছে তার ভাবটা পাবে। এই তত্ত্বের উপর আধারিত আমাদের বিখ্যাত কাহিনী হচ্ছে জড়ভরতের কাহিনী। রাজা জড়ভরত শেষ বয়সে সন্ন্যাস নিয়ে জঙ্গলে তপস্যা করছেন। একদিন একটা বাঘ হরিণকে আক্রমণ করেছে, হরিণটা পালাতে গিয়ে একটা বাচ্চা প্রসব করেই মারা যায়। রাজা জড়ভরত হরিণের বাচ্চাটাকে তুলে নিয়ে এসেছেন। এবার তিনি হরিণের বাচ্চাটাকেই সেবা যত্নাদি করে বড় করে তুলছেন। বাচ্চাটাকে সেবা করতে করতে তার প্রতি রাজার প্রচণ্ড স্নেহ ভালোবাসা জন্মে গেছে। রাজার যখন মৃত্যুর সময় এসেছে, তখন হরিণটা রাজার মৃত্যু শয্যার পাশেই দাঁড়িয়ে আছে। রাজা দেখছেন হরিণের চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে। রাজা জড়ভরত সারা জীবন এমন কঠোর তপস্যা করে এসেছেন কিন্তু মৃত্যুর সময় এই হরিণের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে মৃত্যুর সময় তাঁর হরিণের চিন্তাই এসে গেল। কাহিনীতে বলা হচ্ছে রাজা জড়ভরত মৃত্যুর পর হরিণ হয়ে জন্মালেন। হরিণ হয়ে জন্মে তার ভাব যাই হোক না কেন, তাঁর জ্ঞান কিন্তু চলে যাবে না। রাজার ঐ জ্ঞানটুকু থেকে গেল যে আমি তপস্যায় ছিলাম। এগুলো সবই আখ্যায়িকা, একটা ভাব, একটা বিচার ধারাকে সুস্পষ্ট করার জন্য এই আখ্যায়িকা গুলোকে রাখা হয়। এখানে কেউ প্রশ্ন করতে পারে যে, রাজা জড়ভরত মারা যাওয়ার পর যে হরিণ হল কিন্তু তার মাঝখানে তিনি কতদিন স্বর্গে ছিলেন বা নরকে ছিলেন। কারণ কর্মের যে ফল সেটা কাটবে স্বর্গে বা নরকে, সেই ফলটা কোথায় কাটল।

এসব কিছুই নয়, এখানে মূল বক্তব্য হচ্ছে ভাব, যা ভাব মৃত্যুর সময় উদয় হবে সেই ভাব অনুসারেই তার পরের জন্ম নির্ধারিত হবে। আমি যদি স্বর্গের চিন্তা করতে করতে মরি তাহলে হয়তো স্বর্গের অপ্সরা হয়ে জন্মাব, যদি অন্য কিছুর চিন্তা করতে করতে মরি অন্য কিছু হয়ে জন্মাব। ইদানিং কালে সবাই বাড়িতে কুকুর বেড়াল পুষছে, নিজের বাচ্চার থেকে এদের যত্ন বেশি। মরলে এরাই আবার কুকুর বেড়াল হয়ে জন্মাবে। জ্ঞানটা কিন্তু যাবে না। যত বেড়াল কুকুর আছে সব কটা বেড়াল কুকুর যোনি থেকে এসেছে তা নয়, এর মধ্যে অনেকেই আছেন যারা সাধক ছিলেন, কোন কারণে ফেঁসে গিয়ে কুকুর বেড়াল হয়ে জন্ম নিতে হয়েছে। এরা মৃত্যুর পর আবার পশু যোনি থেকে উচ্চ যোনিতে গিয়ে জন্ম নেবে।

অষ্টম অধ্যায়ে যা কিছু আলোচনা করা হচ্ছে সাধারণ মানুষকে নিয়ে কোন কথা বলা হচ্ছে না, যারা সাধক তাদের কথাই বলা হচ্ছে। এই অধ্যায় একমাত্র আলোচনা করা হচ্ছে সাধক আর সাধকের গতিকে নিয়ে। অষ্টম অধ্যায়ে ধরেই নেওয়া হয়েছে যে এখানে সাধক একজন দেবতা বা তার একজন ইষ্টের প্রতি সম্পূর্ণ রূপে একনিষ্ঠ হয়ে আছে। যিনি শিবভক্ত, এখানে ধরেই নেওয়া হয়েছে যে সে মরার সময় শিবের চিন্তা করেই মারা যাচ্ছে। যে গণেশের ভক্ত সে গণেশের চিন্তা করছে। আমরা সাধারণত বলি যে সে বিষয় চিন্তা করে মারা গেল, এখানে তা নয়, এখানে আরেকটু উপরে। পুরোপুরি সাধকদের কথাই এখানে বলা হচ্ছে। এখন যে স্বর্গের দেবতাদের চিন্তা করে করে মারা যাচ্ছে সে মৃত্যুর পর ইন্দ্রাদি দেবতাদের ভাব পাবে, তারপর আবার সেখান থেকে এগোতে থাকবে। আবার যে শ্রীকৃষ্ণের চিন্তা করে করে মারা যাচ্ছে সে শ্রীকৃষ্ণের ভাব পাবে – *সদা তদ্ভাবভাবিতঃ।* এখানে মূল বক্তব্য হচ্ছে আমি সারা জীবন যে দেবতার ভজনা করেছি, মৃত্যুর সময় সেই দেবতার চিন্তাই কিন্তু আমার মাথায় আসবে, অন্য দেবতা বা ইষ্টের চিন্তা আসবে না। যে সারা জীবন শিবের পূজা করে এসেছে, শিবকে ভক্তি করে এসেছে, শিবের চিন্তা করে এসেছে, এটা আমি কখনই বলতে পারব না যে মরার সময় হঠাৎ করে সে বিষ্ণুর চিন্তা করতে শুরু করে দেবে। এটা হল একটা দিক, দ্বিতীয় যেটা সেটা আরও গুরুত্বপূর্ণ, এটাও ধরেই নেওয়া হচ্ছে যে, যিনি সারাটা জীবন একনিষ্ঠ ভাবে শিবের চিন্তাই করে গেছেন, মরার সময় হঠাৎ তিনি বিষয় চিন্তা করবেন না। এটা ধরেই নেওয়া হচ্ছে যে এই রকম একনিষ্ঠ শিবভক্ত মরার সময় হঠাৎ শিবের চিন্তা ছেড়ে দিয়ে তার বউ বাচ্চা, সম্পত্তির কথা চিন্তা করবে না। এই ধরণের লোকদের কথা এখানে বলাই হচ্ছে না, এই ধরণের চরিত্রের লোকেদের কথা গীতা আলোচনাতেই আনছে না। গীতা ধরেই নিচ্ছে যে আপনি একজন সাধক, আর আপনি সাধনা করছেন। এর আগে দ্বিতীয় অধ্যায়ে দুই ধরণের সাধকের কথা বলা হয়েছিল, এক, যিনি নিষ্কাম কর্ম করছেন, আর দুই, যিনি জ্ঞান সাধন করছেন, কর্মযোগী আর সাংখ্যযোগী। এখন যারা সাংখ্যযোগী বা কর্মযোগী এনারা নিশ্চয়ই কোন না কোন দেবতা বা ইষ্টের আরাধনা করছে, আমরা

যেমন শ্রীরামকৃষ্ণের আরাধনা করছি। এর আগে আমাকে চিন্তা করতে হবে কোন্ দেবতার ভাব আমার ভালো লাগে, আমাদের যেমন শ্রীরামকৃষ্ণের ভাব ভালো লাগে। আবার অন্য কারুর শিবের বা কালীর বা কৃষ্ণের ভাব ভালো লাগে। তখন ঐ ভাবটাকে ধরে সারাটা জীবন সাধনা চালিয়ে যেতে হবে। শেষ বয়সে যখন চলে আসছি তখনও ঐ ভাবটাকেই চিন্তন করে যাচ্ছি, তারপর যখন মৃত্যুর সময় এসে গেল, তখন এইটাই হবে *সদা তদ্ভাবভাবিতঃ*, আমি সেই ভাবটাকে চিন্তা করতে করতেই শেষ নিঃশ্বাসটা ছেড়ে দেব। সেইজন্য ভগবান বলছেন, যখন এই রকমই নিয়ম, নিয়মটা হচ্ছে যে শ্রীকৃষ্ণের চিন্তা করে এসেছে সারা জীবন সে মৃত্যুর সময় শ্রীকৃষ্ণরই চিন্তা আসবে আর সে শ্রীকৃষ্ণকেই পাবে, তাই অর্জুনকে ভগবান বলছেন –

**তস্মাৎ সর্বেষু কালেষু মামনুস্মর যুধ্য চ। ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্মামেবৈষ্যস্যসংশয়ম্।।৭।।**

এখানে অর্জুনের মূল সমস্যা হচ্ছে, অর্জুন যুদ্ধ করতে চাইছে না, আমার পাপ হবে, আমার এই হবে সেই হবে, হাজার রকমের কথা বলেছিল। কিন্তু নিয়ম হচ্ছে সারাটা জীবন তুমি যা চিন্তা করবে, যে দেবতার চিন্তা করবে মৃত্যুর সময় তোমার ঠিক সেই চিন্তাটাই আসবে, আর মরার সময় ঐ যে চিন্তাটা করতে করতে মরবে তুমি তারই ভাব পাবে, এই নিয়মটা যখন বাধ্যতামূলক হয়ে আছে, তাহলে তুমি যুদ্ধকে নিয়ে এত দুশ্চিন্তা করছ কেন, যুদ্ধ করার সময় তুমি আমাকে মনে রেখেই যুদ্ধ করবে, যুদ্ধ করতে করতে যদি মর তাহলে তুমি আমার ভাবটাই পেয়ে যাবে। ভগবান তাই বলছেন, *তস্মাৎ*, সেইজন্য, *সর্বেষু কালেষু*, সব সময়, *মাম্*, আমাকে *অনুস্মর*, স্মরণ করে, *যুধ্য চ*, যুদ্ধ করতে থাক। এখানে *যুধ্য চ* বলতে জেহাদীরা কথায় কথায় বোমা মেরে যাচ্ছে সেই রকম করতে বলছেন না, আচার্য বলছেন – *স্বধর্মং কুরু*। *যুধ্য চ* বলতে শুধু যুদ্ধ করার কথাই বলা হচ্ছে না, মা যেমন রান্না করেন, বিছানা পরিষ্কার করেন, কাপড় কাচছেন, ঝাঁটা দিচ্ছেন, এখানে এই সব কাজকেই ধরা হচ্ছে। যখনই যা কাজ করবে *মামনুস্মর যুধ্য চ*, আমাকে স্মরণ করে কাজ করবে, যুদ্ধ বলতে স্বধর্মের কথা বলা হচ্ছে, *যুধ্য চ* কে একটা শব্দ রূপে সব কর্মকেই বোঝান হচ্ছে, নিজে যা কিছু কর্ম করছে। তাহলে কি শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করে চুরি চামারি করা যাবে? আদপেই করা যাবে না। কেন করা যাবে না? কারণ চুরি চামারি করাটা স্বধর্মের মধ্যে পড়ছে না, যেটা স্বধর্মের মধ্যে পড়ে না, সেই ধরণের কোন কিছুই এই আলোচনার মধ্যে আসবে না। যেটা আমার ধর্ম, যে ধর্মানুসারে আমি এই শরীরে জন্ম নিয়েছি, সেই ধর্মানুসারে যে কর্মগুলো আসবে সেই কর্মের কথাই এখানে বলা হচ্ছে, আর আমার যিনি ইষ্ট, যে দেবতাকে আমার ভালো লাগছে সেই ইষ্ট বা দেবতার ভাবে ভাবিত হয়ে এই কর্মগুলো করতে হবে।

এখানে ভগবান বলছেন *সর্বেষু কালেষু*, আমরা মনে করি সকালে উঠে একশ আটবার জপ করব, একটু পূজো করব, মুখে একটু গঙ্গাজল ছেটাব, আর আটকে প্রসাদ খাব তাতেই আমাদের সব কিছু হয়ে যাবে। ভগবান বলছেন এতে কিছুই হবে না, কারণ তিনি বলছেন *সর্বেষু কালেষু*। তবে হ্যাঁ, কিছু না করার থেকে এটুকু করাও ভালো। যদি কেউ ঈশ্বরে ভক্তি চায়, যদি কেউ এই জীবনে মুক্তি পেতে চায় তাহলে *সর্বেষু কালেষু*, সারাটা জীবন, চব্বিশ ঘন্টা *মামনুস্মর*, আমাকে স্মরণ করে স্বধর্ম পালন কর। আর কি বলছেন?

*ময়ি*, আমাতে, *অর্পিত-মনঃ-বুদ্ধি*, মন বুদ্ধি অর্পণ করলে, *মাম্ এষ্যসি*, তুমি আমাকেই পাবে এতে কোন সংশয়ের অবকাশ নেই। এতক্ষণ ভগবান যেটা বললেন, যার তুমি চিন্তা করবে তুমি সেখানেই যাবে। মন আর বুদ্ধি, মন হচ্ছে সঙ্কল্প বিকল্পাত্মিকা আর বুদ্ধি হচ্ছে নিশ্চয়াত্মিকা। মনের ভাব আবার চার রকমের হয়, চিত্ত, মন, বুদ্ধি আর অহঙ্কার। চিত্ত মানে বসে আছি সেই সময় নানান রকমের চিন্তা আসছে, ঐ নানান রকমের চিন্তা বন্ধ করে চিত্ত ভগবানের প্রতিই থাকবে, এই জন্য যারা ভক্ত তারা দেওয়ালের সর্বত্র ঠাকুরের ছবি লাগিয়ে থাকে, যেদিকেই তাকাবে ঠাকুরের ছবি দেখবে আর ঠাকুরের দিকেই মন যাবে। মন সব সময় ভাবছে এটা করব, নাকি সেটা করব, বলছেন তখনও ভগবানের চিন্তা করবে। বুদ্ধি হচ্ছে নিশ্চয়াত্মকি, সে ঠিক করে রেখেছে যা কিছু করব ভগবানের জন্যই করব ওখান থেকে কোন নড়াচড়া নেই, একেবারে দৃঢ় করে রেখেছে। শেষে আসছে অহঙ্কার, মনের মধ্যে যে অহঙ্কারাদি হচ্ছে সেটাও ভগবানকে নিয়ে করতে হবে, আমি ভগবানের দাস, আমি ভগবানের সন্তান। এইভাবে মনের যত যা কিছু আছে সবটাই ভগবানকে দিয়ে দিতে হবে। তোমার মন বুদ্ধি আমাতে দিয়ে দাও, তাহলে তুমি আমাকেই পাবে। দ্বাদশ অধ্যায়ে ভগবান এই জিনিষটাকে নিয়েই আবার আলোচনা করবেন। সাধারণ লোকের মন বুদ্ধি মাছির মত, কখন সন্দেশে বসছে, কখন ভালো জিনিষে মন লাগাচ্ছে, আবার কখন মাছি পচা ঘায়ে বসছে, আবার মন খারাপ জিনিষের দিকেও দিচ্ছে। আবার বুদ্ধি বলছে ঈশ্বরই সব, ঈশ্বরকে ভক্তি করাই ভাল, কিন্তু ভক্তি করার সময় মন একটু এদিকে একটু সেদিকে চলে যায়, মানে সব কিছুতেই মন দিচ্ছে কিন্তু ভগবানের দিকে মন যেতে চাইছে না। কিন্তু এখানে বলছেন মন বুদ্ধি সবটাই আমাতেই দেবে। আমি মনে মনে জানছি ঈশ্বরই সত্য, তারপর মন্দিরে প্রণাম করে, জপ থেকে উঠেই কম্প্যুটার নিয়ে ইন্টারনেটে নানান জিনিষের খবর নিতে বসে গেলাম, টিভি খুললে এই নাচ, এই সিরিয়াল দেখতে বসে গেলাম, ভারত-পাকিস্থানের ম্যাচে ভারত কত রান করল, কে সেঞ্চুরি করল এই সব খবর নিতে থাকলাম, এই করে হবে না। তার মানে আমার মন পুরোটাই বিষয়ে পড়ে আছে। বিষয়ে যদি মন পড়ে থাকে মরার সময় তাহলে মন কোথায় যাবে? গীতা এই কথা আলোচনাই করবে না, গীতা আমাকে ধর্তব্যের মধ্যে আনবে না। এটা সোজা কথা

যে যারা বিষয় চিন্তা করে মরবে তারা আবার বিষয়কেই প্রাপ্ত হবে। গীতার এই শ্লোকের যা বক্তব্য ঠিক একই বক্তব্য আমরা মাণ্ডুক্য উপনিষদেও পাই, যে ভাব গুরু শিষ্যকে দেখিয়ে দিয়েছেন, শিষ্য যখন সেই ভাবকে আস্তে আস্তে পাকা করে নেয়, তখন মৃত্যুর পর সে ঐ ভাবের সাথে এক হয়ে যায়। আমাদের গুরুদেবরা যখন শ্রীরামকৃষ্ণের ভাব আমাদের দেখিয়ে দিলেন, এইবার যখন শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবকে মনের মধ্যে বসিয়ে নিয়ে বড় হচ্ছি তখন মরার সময় শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবের সাথে আমরা এক হয়ে যাব। এই ভাবের সাথে এক হবার জন্য *তস্মাদ্ সর্বেষু কালেষু*, এক সেকেণ্ডের জন্য এই ভাবকে ছাড়া যাবে না। *মামনুস্মর যুধ্য চ*, যা কিছু করছ, শুধু যুদ্ধ নয়, স্বধর্মে যা কর্ম আসছে, হাত পা ইন্দ্রিয় দিয়ে যা কিছু করছ সব কর্ম আমাকে মনে রেখে কর। আর তোমার মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহঙ্কার আমাকে দিয়ে দাও। এর ফলে তুমি আমাকেই প্রাপ্ত হবে এতে কোন সংশয় নেই। এরপর বলছেন –

**অভ্যাসযোগযুক্তেন চেতসা নান্যগামিনা। পরমং পুরুষং দিব্যং যাতি পার্থানুচিন্তয়ন্।।৮।।**

মৃত্যুর পর কি হয় এই নিয়ে দুটো পথের আলোচনা করা হচ্ছে। আট, নয় ও দশ নং শ্লোক একটা পথের কথা বলা হয়েছে এবং এগারো থেকে পনেরো নং শ্লোক দ্বিতীয় আরেকটা পথের কথা বলা হয়েছে। এই দুটো পথ দুই ধরণের সাধকের কথা বলা হচ্ছে। যারা সাধক নয় তাদের কথা গীতা একেবারেই আনছে না। বলছেন যারা কর্মযোগী, নিষ্কাম ভাবে সাধনা করেন, নিষ্কাম ভাবে সাধনা করা মানে কি আমি যদি চুরি ডাকাতি করি সেটা নিষ্কাম ভাবে করার কথা বলছে? না, তা কখনই বলা হচ্ছে না, স্বধর্ম, শাস্ত্রে যে কর্মের কথা বলা হয়েছে, সমাজ যে কাজগুলোকে অনুমোদন দিয়েছে, মনুস্মৃতিতে বলা আছে কি কি কর্ম তোমার করা উচিৎ, সেই কর্মগুলো নিষ্কাম ভাবে যিনি সাধনা করছেন তিনিই একমাত্র কর্মযোগী বলে বিবেচিত হবেন।

যিনি যোগী তিনি সারাটা জীবন নিষ্কাম কর্মের অভ্যাস করে এসেছেন, স্বধর্ম পালন করছেন, ধ্যান করছেন, জপ করছেন। এরপর তিনি *অভ্যাসযোগযুক্তেন* হচ্ছেন। অভ্যাস কি জিনিষ? বাচ্চাকে যখন অ, আ, ক, খ শেখানো হয় তখন তাকে বলা হয় অ, আ অভ্যেস কর, মানে ঐ লেখার মধ্যে দাগা বুলোতে থাক। শঙ্করাচার্য বলছেন – এক, আমার পরমাত্মাতে বার বার মনকে বসান, আর দুই, যত বিজাতীয় জিনিষ আছে, এই বাধা গুলোকে আটকে দেওয়া। অর্থাৎ, আমি শ্রীকৃষ্ণের ধ্যানে বসেছি, কিছুক্ষণ পরে মনে পড়ল আরে আমাকে তো অমুক কাজটা করতে হবে, এটা হয়ে গেলে ধ্যানের পথে একটা বাধা, এখন এটাকে আটকে দিলাম, এখন ওসব নয় এখন শুধু শ্রীকৃষ্ণের চিন্তন করতে হবে। আবার আমি শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান করছি তখন আবার মনে পড়ল অমুককে এই কথাটা বলা হয়নি, আবার এই চিন্তাটাকে আটকে দেওয়া হল। এই ভাবে একটার পর একটা চিন্তা বাধা হয়ে আসছে আর সেই চিন্তা গুলোকে আটকে আটকে মনটা এক সময় একটা বিষয়ের দিকে নিয়ে চলে গেলাম। একটা জিনিষকে নিষ্ঠার সঙ্গে বারবার করা, সেইটাকে করতে গিয়ে যা যা বাধা আসছে সেই বাধা গুলোকে আটকে দেওয়া, এইটাই হচ্ছে অভ্যাস।

বলছেন, *চেতসা নান্যগামিনা*, মনকে অন্য দিকে আর যেতে দেওয়া যাবে না। তখন কি হয়? *পরমং পুরুষং দিব্যং যাতি পার্থানুচিন্তয়ন্*, অনুচিন্তয়ন্, অনুধ্যান করা, যখন মৃত্যুর সময় আসে তখন যোগীর একটাই চিন্তা করেন। কি এক চিন্তা করেন? আচার্য বলছেন – *শাস্ত্র আচার্য উপদেশম্ অনুধ্যায়ম্*, শাস্ত্র আর আচার্যের কাছে সারা জীবনব্যাপী যা শিক্ষা পেয়েছে। কি শিখেছে? শ্রীরামকৃষ্ণই সত্য, এখন শুধু মাত্র এইটাকেই চিন্তা করবে। এখন একজন আছেন, যিনি সারা জীবন কর্মযোগ করেছেন, জপ-ধ্যান করেছেন, এখন তিনি বুঝে গেছেন যে এইবার আমার শরীর চলে যাবে। তখন তিনি নিশ্চিত হয়ে বসে পড়লেন, কেননা তিনি তো জেনে গেছেন আমার তো আর শরীর থাকবে না। এই ভাবনা থেকেই আমাদের ভারতে সন্ন্যাসের ধারণা এসেছে। আগেকার দিনে মানুষ যখন বুঝে নিতে যে আমার শরীর আর বেশি দিন থাকবে না, তখন সে তার যা কিছু সম্পদ সারা জীবন অর্জিত করেছিল, সব সন্তান বা পরিবারের হাতে তুলে দিয়ে ঘড়বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পড়ত। আর যতক্ষণ না শরীর চলে যাচ্ছে ততক্ষণ সকাল বিকাল অভ্যাসযোগের অনুশীলন করবে আর পরমেশ্বরের চিন্তা করবে। এইভাবে অনুধ্যান করলে কি হয়? *পরমং পুরুষং দিব্যং*, দিব্য পরম পুরুষকে সে প্রাপ্ত করে নেয়। কারণ এইভাবেই সে সারা জীবন প্রশিক্ষণ পেয়ে এসেছে আর সে প্রশিক্ষণের উপর অভ্যাসযোগের দ্বারা খালি দাগা বুলিয়ে গেছে। এই পরম দিব্য পুরুষ, যাঁর চিন্তা সে করছে, সে কি রকম?

**কবিং পুরাণমনুশাসিতারমণোরণীয়াংসমনুস্মরেদ্ যঃ। সর্বস্য ধাতারমচিন্ত্যরূপমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।।৯।।**

অষ্টম অধ্যায়ের এই নয় নং শ্লোকটি মূলতঃ উপনিষদের মন্ত্র। গীতার সব শ্লোকই যে ব্যাসদেব রচনা করেছেন তা নয়, কিছু কিছু শ্লোক উপনিষদ থেকেও নেওয়া হয়েছে। মূল কথা হচ্ছে উপনিষদের যা বক্তব্য গীতারও সেই একই বক্তব্য। এই নয় নং শ্লোকটি খুব উচ্চ ভাবের শ্লোক, ঈশ্বরের স্বরূপের বর্ণন করা হচ্ছে এতে, এটিকে সবারই মুখস্ত করে মাঝে মাঝে আবৃত্তি করলে, কিংবা ঠাকুরকে যখন প্রণাম করছেন তখন এই শ্লোকটি আবৃত্তি করে এর ভাবটাকে ঠাকুরের উপর আরোপ করলে প্রচুর শক্তি পাওয়া যায়, বাসে ট্রামে চলার সময় মনে মনে আবৃত্তি করলেও খুব ভালো কাজে দেবে, আর মনটাও খুব ভালো থাকবে, এটি একদিকে উপনিষদের মন্ত্র আবার ঈশ্বরের স্বরূপের বর্ণনা তাই এই শ্লোকটি আলাদা একটা তাৎপর্য বহন করছে। ভগবানের স্বরূপ বর্ণনা করে

যত মন্ত্র ও শ্লোক আছে তার মধ্যে এটি একটি শ্রেষ্ঠতম শ্লোক। সাধারণত উপনিষদে ঈশ্বরকে নেতি নেতি করেই জানার কথা বলা হয়েছে, কিন্তু এখানে ঈশ্বরকে সবটাই ইতি ইতি করে বলা হচ্ছে। ঈশ্বর হচ্ছেন নির্গুণ নিরাকার, কিন্তু তিনি যদি সগুণ সাকার হন তাহলে তিনি কি রকমটি হবেন? এখানে সেটাকেই বর্ণনা করা হচ্ছে।

ভগবানের একটি নাম হচ্ছে *কবি*, কবি মানে ক্রান্তদর্শি, আবার ক্রান্তদর্শি মানে, যিনি ভূত, ভবিষ্যত ও বর্তমান এই তিনটে কালকে এক সঙ্গে দেখতে পান। আমাদের ক্ষেত্রে কি হয়, আমরা বর্তমানটাই শুধু দেখতে পাই, গতকাল কি হয়েছে সেটাই মনে থাকে না, আবার ভবিষ্যতে কি হবে সেটাও আমাদের বোধগম্যের বাইরে। ভগবান তিনট কালকেই সামগ্রিক ভাবে দেখতে পান, তাই তাঁর কাছে কোন কিছুই অজ্ঞাত নেই, এই কারনে তিনি হচ্ছেন সর্বজ্ঞ। *পুরানম্*, সেই আদিমকাল থেকে তিনি চলে আসছেন, কে তাঁকে জন্ম দিয়েছে, কিভাবে তিনি সৃষ্টি হয়েছেন এই ব্যাপারে কোন প্রশ্নই হয় না, তাই তিনি হলেন চিরন্তন। *অনুশাসিতারম্*, জগতে যা কিছু আছে সব কিছুর তিনি নিয়ন্তা, তাঁর অধীনে তাঁর নিয়ন্ত্রণেই সব কিছু চলছে। উপনিষদও বলছে – *ঈশা বাস্যমিদং সর্বং*, ঈশা কে? যিনি নিয়ন্ত্রণ করেন, যাঁর শাসনে সবাই চলে। আমাদের শাস্তি দেওয়ার যদি কেউ থাকে তিনি হচ্ছেন একমাত্র ভগবান। *অণোরণীয়াম্*, মানুষ যত সূক্ষ্মতম চিন্তা করার ক্ষমতা রাখে, ভগবান তার থেকেও অনেক সূক্ষ্মতম। প্রকৃতিকে আমরা জানি সব থেকে সূক্ষ্ম, এত সূক্ষ্ম যে বোঝাই যায় না, এটা কোন বস্তুর সূক্ষ্ম অবস্থা নাকি বস্তুর গুণ বলা খুব মুশকিল। ভগবান হচ্ছে তার থেকেও সূক্ষ্ম, আমরা তাই কি করে ভগবানকে বুঝতে পারব। শুধু সূক্ষ্মই নয়, সূক্ষ্মতম যেটা হতে পারে ভগবান তার থেকেও সূক্ষ্মতর। *অনুস্মরেদ্ যঃ*, এই যে কয়েকটি ভগবানের স্বরূপের কথা বলা হল, যোগী এই স্বরূপের চিন্তা করতে থাকেন, *অনুস্মরেদ্* মানে স্মরণ করতে থাকেন।

ভগবানের আর কি কি গুণ? বলছেন *সর্বস্য ধাতারম্*, যত রকমের কর্ম করা হচ্ছে, সে কর্মের যত ফল হচ্ছে, সেই ফল ভগবানই প্রদান করেন। ভগবান যদি না থাকেন তাহলে মানুষ কোন কর্মের ফল পাবে না। *ধাতারম্*, ভগবান সব কিছু ধারণ করে আছেন, যাকে যা যা দেওয়ার তাকে সেটাই দিচ্ছেন। *অচিন্ত্যরূপম্*, তাঁর রূপের চিন্তা কখনই করা যায় না। যদিও এখানে ভগবানের গুণের কথা বলা হচ্ছে, কিন্তু তাঁর রূপ চিন্তন হয় না। *আদিত্যবর্ণং*, তিনি হচ্ছে নিত্য চৈতন্যের প্রকাশ। সূর্য আজকে আছে ভবিষ্যতে ব্ল্যাকহোলে চলে যাবে। এই ঘরে এত আলো ঝলমল করছে, আমরা এই ঘর থেকে বেরিয়ে চলে যাব সব লাইটের সুইচগুলো অফ্ করে দেওয়া হবে ঘরটা অন্ধকারের মধ্যে ডুবে যাবে। ভগবানের ক্ষেত্রে কখনই এই রকম হবে না, আজকে ভগবানের চৈতন্য আছে আগামীকাল তার মধ্যে জড়ত্ব এসে যাবে তা নয়। ভগবানের যে নিত্য চৈতন্যই আছে তা নয়, তাঁর মধ্যে সেই নিত্য চৈতন্যের প্রকাশ হচ্ছে। আমার খুব বুদ্ধি আছে, কিন্তু বুদ্ধি থাকলেই হবে না, সেই বুদ্ধির প্রকাশ চাই তবে গিয়ে সেই বুদ্ধির দাম হবে। আমার ব্যাঙ্কে একশ কোটি টাকা আছে, ব্যাঙ্কে স্ট্রাইক চলছে, আমার ছেলেকে হাসপাতেলে ভর্তি করা হয়েছে, এক্ষুণি এক লক্ষ টাকা অপারেশনের জন্য জমা দিতে হবে, কিন্তু ব্যাঙ্ক থেকে সেই টাকা আমি তুলতে পারছি না, এই টাকার কি দাম আছে এখন, না থাকারই মত। দাম কখন হবে? যখন প্রকাশ হবে। ভগবানের চৈতন্য হচ্ছে, নিত্য চৈতন্যের প্রকাশ। *তমসঃ পরস্তাৎ*, যে কোন ধরণের অন্ধকারের তিনি পারে, তার মানে, ভগবান অজ্ঞান, তমসার পারে। এই রকম ভাবে ভগবানের যখন চিন্তা করা হয় তখন কি হয় –

**প্রয়াণকালে মনসাহচলেন**
**ভক্ত্যা যুক্তো যোগবলেন চৈব।**
**ভ্রুবোর্মধ্যে প্রাণমাবেশ্য সম্যক**
**স তং পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্।।১০।।**

এই যে পুরুষের বর্ণনা করা হল, এই ভাবে চিন্তা করতে করতে সেই পুরুষকে পেয়ে যায়। কিভাবে পেয়ে যায়? আট নং শ্লোকে সূচনা করা হল, নয় নং শ্লোকে বর্ণনা করা হল এখন দশ নং শ্লোকে বলা হচ্ছে কিভাবে এটাকে করা হয়। *প্রয়াণকালে*, যোগী বুঝে গেছেন আমার মৃত্যুর সময় এসে গেছে, সারা জীবন সে কর্মযোগী হয়ে সাধনা করে এসেছে, ধর্মের শিক্ষাদীক্ষা সে পেয়েছে, এখন সে *মনসাহচলেন*, তখন তিনি মনকে আর এদিকে সেদিক যেতে দেবে না, মনকে একেবারে অচল করে দিয়েছে। তারপর বলছেন, *ভক্ত্যা যুক্তো যোগবলেন চৈব*, এখানে আচার্য শঙ্কর বলছেন, এত দিন যে যোগের অনুশীলন করে এসেছে সে, সেই যোগের শক্তির দ্বারা, আর এত দিন সমাধির অনুশীলনও করেছেন, এখানে সমাধির অর্থ সবিকল্প বা নির্বিকল্প সমাধি নয়, সমাধি হচ্ছে ধ্যান করে মনটাকে ভেতরে নিয়ে যাওয়া, মনকে পুরোপুরি একাগ্র করার ক্ষমতা সে পেয়ে গেছে, চিত্তকে স্থির করতে পারছে তার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে, হৃদয়ে যে হৃদপদ্মে ইষ্ট দেবতা আছেন, সেখানে মনকে স্থির করে ধরে রাখে। হৃদয়ে যখন মন স্থির হয়ে যায় যোগী তখন দেখে নাভির নীচ থেকে সুষুম্নার মধ্য দিয়ে প্রাণশক্তি উপরের দিকে উঠতে থাকে, যত উপরে উঠতে থাকে তত সে একটার পর একটা ভূমিকে জয় করতে থাকে। আমাদের প্রত্যেকের সাতটা ভূমি আছে, হৃদয়ের নীচে তিনটে আর হৃদয়ের উপরে তিনটে ভূমি, মোট সাতটা ভূমি। তলা থেকে উঠতে উঠতে যখন হৃদয়কে জয় করা হয়ে গেলে তখন যোগী দেখছে আমার হৃদয়কে জয় করা হয়ে

গেছে, তারপর কন্ঠকে জয় করে যখন ভ্রুর মাঝখানে আসে – *ভ্রুবোর্মধ্যে প্রাণমাবেশ্য সম্যক্*, এই ভ্রূযুগলের মধ্যে নিজের পুরো প্রাণশক্তি টেনে এনে ধরে রাখে। তখন কি হয়? *স তং পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্*, এই ভাবে তখন সে পরম পুরুষকে লাভ করে যায়।

এই তিনটে শ্লোকের তাৎপর্য হচ্ছে, এই তিনটে শ্লোক সাধারণ মানুষের ব্যাপারে কিছু বলছে না, যারা যোগী, সারা জীবন যোগ সাধনা করে এসেছেন, এখন সে বুঝে গেছে আমার মৃত্যুর সময় এসে গেছে, তখন এই যোগী কি করে সেই পরম পুরুষকে লাভ করে তার কথা বলা হচ্ছে। মৃত্যুর সময় এসে গেছে বুঝে গেলেই যোগী উঠে পাল্কি মেরে বসে পড়ে এবার তার শাস্ত্রে যা যা পড়েছে, গুরুর মুখে যা যা শুনেছে, আর সেইভাবে যা যা সাধনা করেছে সব এখানে লাগিয়ে দেবে। ঈশাবাস্যোপনিষৎএ এই ভাবটাকে খুব সুন্দর করে বলা হয়েছে – *ওঁ ক্রতো স্মর কৃতং স্মর ক্রতো স্মর কৃতং স্মর* – মন, সারা জীবন যা কিছু ভালো কাজ করেছ, যা কিছু ভালো চিন্তন করেছিলে সেইগুলো এখন চিন্তা কর। এখন তার যাবার সময় হয়ে গেছে, এখন মনকে উচ্চ চিন্তনে নিয়ে গেছে, আজেবাজে কিছুতে মন এখন যেতে দেওয়া চলবে না। শরীরকে বসিয়ে দিয়ে মনকে উচ্চ চিন্তাতে নিয়ে গেল, কি চিন্তা করবে? পরম পুরুষের চিন্তা করে। কি রকম পরম পুরুষের চিন্তা করে? এর আগে যে নয় নং শ্লোকে ঈশ্বরের যে যে গুণের কথা বলা হয়েছিল সেই গুণগুলির চিন্তা করতে থাকে। আমি সারা জীবন শ্রীরামকৃষ্ণের আরাধনা করে এসেছি, এখন আমার মৃত্যু কাল উপস্থিত, আমি বসে পড়ে শ্রীরামকৃষ্ণের চিন্তা করতে থাকলাম, শ্রীরামকৃষ্ণ হচ্ছেন এই রকমটি, কি রকমটি? স্বামীজী যেমন বলছেন – *আচণ্ডালাপ্রতিহতরয়ো যস্য প্রেমপ্রবাহঃ* বা *ওঁ হ্রীং ঋতং ত্বমচলো গুণজিৎ গুণেড্যঃ* বা *খণ্ডন ভব-বন্ধন জগ-বন্দন বন্দি তোমায়*, এই ধরণের যে কোন একটা প্রার্থনা যেখানে ঠাকুরের বর্ণনা আছে, কোন একটা কে নিয়ে চিন্তন শুরু করে দেবে।

অর্জুনের শেষ প্রশ্ন ছিল আপনাকে শেষ কালে মানুষ কিভাবে পায়। ভগবান এখানে কর্মযোগীর কথা বলছেন, কিভাবে পায়? এখানে ভগবান আমাদের একটা সাহায্য করে দিচ্ছেন, *কবিং পুরাণমনুশাসিতারমণোরণীয়াংসমনুস্মরেদ্ যঃ* চিন্তা করে সোজা হয়ে আসনে বসে পড়ল, আসন করে বসে পড়ে এবার হৃদয়ে মনটাকে গুটিয়ে নিয়ে এল, হৃদয়ে যে পদ্ম আছে সেখানে মনকে একাগ্র করা হল। এখানে মনকে একাগ্র করার পর যোগী ভূমি জয় করতে শুরু করল, তখন সে দেখছে সুষুম্না দিয়ে প্রাণশক্তি এইবার উপরের দিকে উঠছে, উপরের দিকে উঠতে উঠতে একটা একটা করে ভূমি জয় করে করে হৃদয়ে এসে পুরো শক্তিটাকে সমাহিত করার পর কণ্ঠে নিয়ে গেল, কণ্ঠকে জয় করার পর কি হয়? *ভ্রুবোর্মধ্যে প্রাণমাবেশ্য সম্যক্*, দুই ভ্রূর মধ্যে প্রাণকে সংহত করার পর তার শরীরটা চলে গেল। তখন কি হয়? *স তং পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্*, এইভাবে সে পরম দিব্য পুরুষকে লাভ করে। এইখানে সে কিন্তু যোগী শ্রীকৃষ্ণকে পায়নি, শ্রীকৃষ্ণকে পেয়ে গেলে সে মুক্তি পেয়ে যাবে।

এখানে প্রাণটাকে যে সংহত করা হচ্ছে, এই প্রাণ হচ্ছে তার চেতনা, তার চিন্তাভাবনা গুলোর কথা বলা হচ্ছে। স্বাভাবিক অবস্থায় আমাদের চিন্তা ভাবনা গুলো বাইরের জগতে পড়ে থাকে, যদি আমার হাত কেটে যায় তখন আমার মন হাতে চলে যাবে, যেমন দাঁতে ব্যাথা হলে মনটা দাঁতেই পড়ে থাকে। কিন্তু যিনি যোগী তিনি তার মনটা সব সময় হৃদয়ে দিয়ে রাখেন। তাহলে যোগীর দাঁতে ব্যাথা হলে তার মন কোথায় যাবে, কোথাও যাবে না, এটা শরীরের ব্যাপার। তাই যখন তার শরীর চলে যাবে বুঝে নেয় তখন তার যে প্রাণ বায়ু চলছিল, বায়ু থেকে যে প্রাণ সে টেনে নিচ্ছিল সেটা সে আর টানবে না কারণ সে বুঝে গেছে ওর সময় হয়ে গেছে, যোগীর হার্ট বন্ধ হয়ে যাবে মস্তিষ্ক স্তব্দ হয়ে যাবে, এবার ভ্রূর মধ্য দিয়ে চৈতন্য সত্তা যিনি ছিলেন তিনি বেরিয়ে যাবেন, সাথে সাথে শরীরের সমস্ত ক্রিয়াকলাপ বন্ধ হয়ে যাবে।

এখানে বলছেন এই সময় যোগী যদি সেই *কবিং পুরাণমনুশাসিতরম্* এর চিন্তা করতে থাকে তবেই সে সেই পুরুষকে লাভ করবে। এই শ্লোকে বলে দেওয়া হচ্ছে তুমি ভ্রূর মধ্যে চিন্তা করবে। এখন যদি ভ্রূর মধ্যে চিন্তা না করে হৃদয়ের মধ্যে চিন্তা করে তখন কি হবে? তন্ত্র মতে, যোগ মতে আর বেদের কিছু কিছু অঙ্গ আছে তাদের মতে বলা হয় যে আগে ভূমি জয় করতে হয়, ভূমি জয় করে কুণ্ডলীনিকে এখানে নিয়ে ভ্রূর মধ্যে নিয়ে আসতে হয়। এখানে কুণ্ডলীনি শক্তির বর্ণনা করা হচ্ছে। কিন্তু হৃদয়ে যদি ধ্যান করা হয়, তাই বলে কুণ্ডলিনী শক্তি উপরে যাবে না তা নয়।

আমরা দুই ধরণের যোগীদের আলোচনা করেছিলাম। এতক্ষণ প্রথম ধরণের যোগীরা কিভাবে মৃত্যুর সময় সাধনা করেন তার বর্ণনা করা হল। এরা সারাটা জীবন কর্মযোগের সাধনা করেছেন, শাস্ত্র ও গুরুর উপদেশ অনুসারে জীবন যাপন করে এসেছেন, মৃত্যুকালে তার প্রাণশক্তিকে ভ্রূর মাঝখানে নিয়ে এসে ঈশ্বরের চিন্তন করতে করতে শরীর ছেড়ে দিয়ে বেরিয়ে গেল। বেরিয়ে গিয়ে যোগী কোথায় যাচ্ছে? এই যে পরম পুরুষের বর্ণনা দেওয়া হয়েছিল, যিনি সূর্যমণ্ডলে অবস্থিত, মানে সগুণ সাকার ঈশ্বরকে পেয়ে যায়। এর পর তার কি হয়, সেটা পরে আবার বলা হবে। এবার দ্বিতীয় ধরণের যে যোগী আছেন তিনি মৃত্যুর সময় কিভাবে সাধনা করেন বলা হচ্ছে –

**যদক্ষরং বেদবিদো বদন্তি**
**বিশন্তি যদ্ যতয়ো বীতরাগাঃ।**
**যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্যং চরন্তি**
**তৎ তে পদং সংগ্রহেণ প্রবক্ষ্যে।।১১।।**

এই শ্লোকের ভাবটাও কঠোপনিষদ থেকে এসেছে। এর আগে কর্মযোগীরা কিভাবে মৃত্যুর সময় ঈশ্বরকে লাভ করেন বলা হয়েছে, এবারে যারা জ্ঞান মার্গী, যারা অক্ষর ব্রহ্মের উপাসক তাদের কথা বলা হচ্ছে। তার মানে এরা হচ্ছেন আরও কঠোর সাধনা করা যোগী। *যদক্ষরং বেদবিদো বদন্তি*, এখানে অক্ষর বলতে ব্রহ্ম, যারা ব্রহ্মোপাসক, এঁরা হচ্ছেন ঋষি, *বেদবিদো বদন্তি*, যাঁরা বেদের অর্থ জানেন, বেদ বিশারদ। এখানে কাদের কথা বলা হচ্ছে? যাঁরা মহর্ষি, বিশ্বামিত্র, বশিষ্ঠ, বাল্মীকির মত ঋষিদের কথা বলা হচ্ছে। *বিশন্তি যদ্ যতয়ো বীতরাগাঃ*, যাঁরা বীতরাগ হয়ে গেছেন, কোন কিছুর প্রতি যাঁদের কোন আসক্তি নেই, যাঁরা আধ্যাত্মিক জীবন যাপনের চেষ্টা করে যাচ্ছেন, এখানে সন্ন্যাসীদের কথা বলা হচ্ছে। প্রথমে বলা হচ্ছে ঋষিদের কথা যাঁরা বেদবিদ্, যাঁরা শুধুই অক্ষর ব্রহ্মোপসাক, আর দ্বিতীয় ধরণের কথা বলছেন, সন্ন্যাসী যাঁরা সারাটা জীবন সাধনা করে যেখানে গিয়ে প্রবেশ করেন। যাঁরা পাক্কা সন্ন্যাসী তাঁরা সাধনা করে কোথায় প্রবেশ করবেন? সেই নিরাকার ব্রহ্মে এক হয়ে যাবেন।

*যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্যং চরন্তি*, যেটাকে পাওয়ার জন্য মানুষ ব্রহ্মচর্য ব্রত পালন করে। আগেকার দিনে ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় বংশের ছেলেরা ঘরবাড়ি ছেড়ে গুরুগৃহে গিয়ে বারো বছর চৌদ্দ বছর পড়ে থাকত। বাড়ির সুখ স্বাছন্দ্য ত্যাগ করে, বাবা মায়ের স্নেহ ভালোবাসাকে ত্যাগ করে গুরুগৃহে চলে আসত। গুরুগৃহে গুরুমাতা থাকতেন, কিন্তু গুরুমাতা গর্ভধারিনী মায়ের মত স্নেহ কত আর দিতে পারবেন, যতই স্নেহ করুন নিজের মায়ের স্নেহ আদরের সঙ্গে তো কোন মতেই তুলনা করা যাবে না। তবুও মায়ের স্নেহকে ছেড়ে দিয়ে কেন মানুষ গুরুগৃহে যেত? বলছেন, *যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্যং চরন্তি*, যেটাকে পাওয়ার জন্য মানুষ ব্রহ্মচর্য পালন করে যেত, *তৎ তে পদং সংগ্রহেণ প্রবক্ষ্যে*, যার জন্য এত কষ্ট করে গুরুগৃহে ব্রহ্মচর্য পালন করত তার কথা আমি তোমাকে সংক্ষেপে বলছি। এই কথা ভগবান অর্জুনকে বলছেন, কঠোপনিষদে যমরাজ এই একই কথা নচিকেতা বলেছেন। প্রশ্নোপনিষদেও এই একই ভাব আমরা পাই। কঠোপনিষদে যমরাজ বলছেন –

*সর্ব বেদা যৎ পদমামনন্তি*
*তপাংসি সর্বাণি চ যদ্ বদন্তি।*
*যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্যং চরন্তি*
*তত্তে পদং সংগ্রহেণ ব্রবীমি –ওমিত্যেৎ।*।১/২/২৫।।

বলছেন তোমাকে সংক্ষেপে বলছি, এই ওম্কে পাওয়ার জন্য এরা ব্রহ্মচর্য ব্রত পালন করে। ঋষিরা, সন্ন্যাসীরা এই ওঁএ লয় হয়ে যান। শুধু গীতা উপনিষদেই ওঁএর কথা বারবার আসবে না, তন্ত্রেও ওঁএর কথা বলা হয়েছে। আমাদের যত মন্ত্র আছে সব মন্ত্রের আগে ওঁ দিতে হয়, আমাদের পরম্পরাতে ওঁ এর বিরাট মাহাত্ম্য। ওঁ হচ্ছে পরব্রহ্মের বাচক, দূর্গাপ্রতিমার বলতে যেমন দূর্গার ভাবকে বোঝায়, ওঁ বলতে পরব্রহ্মের ভাকে বোঝায়। যারা মন্দ বুদ্ধির সাধক এবং মধ্যম বুদ্ধির সাধক এরাও বারবার ওঁকার উপাসনা করতে করতে মুক্তির পথে এগিয়ে যায়। এখানে যারা অসাধক তাদের ধর্তব্যের মধ্যেই আনা হচ্ছে না। আর যারা উত্তম সাধক তাকে একবার তত্ত্বমসি বলে দিলেই সে বুঝে নিল, তার এইসব উপাসনার কিছুর প্রয়োজন হয় না। এগুলো দরকার কেবল যারা মন্দ বুদ্ধি আর মধ্যম বুদ্ধির সাধক। এদেরকে ওঁকার সাধন করতে বলা হয়, তাদের বলা হয় এই ওঁ ঋষিদের কাছ থেকে এসেছে আর সন্ন্যাসীরা এতেই লয় হওয়ার জন্য কঠোর ব্রহ্মচর্য পালন করেন। আর যারা গুরুগৃহে দীর্ঘকাল ব্যাপি কঠোর ব্রহ্মচর্য ব্রতকে ধরে রেখে সাধনা করে তারাও এই ওঁকারকে পাওয়ার জন্যই করে। কালান্তরে যারা এর সাধনা করেন তাঁদের সিদ্ধি হয়ে যায়। কিভাবে সাধনা করেন –

**সর্বদ্বারাণি সংযম্য মনো হৃদি নিরুধ্য চ। মুর্দ্ধ্যাধায়াত্মনঃ প্রাণমাস্থিতো যোগধারণাম্।।১২।।**

*সর্বদ্বারাণি সংযম্য*, জ্ঞানমার্গি সাধকরা মৃত্যুর সময় ইন্দ্রিয়ের সমস্ত দ্বারগুলোকে সংযত করে রুদ্ধ করে দেন, কোন দিকে ইন্দ্রিয়কে যেতে দেবেন না। প্রথমে বলা হল, যারা সগুণ সাকারের সাধনা করেন তারা মৃত্যুর সময় ঈশ্বরের সগুণ সাকারের চিন্তন করেন, দ্বিতীয় ধরণের সাধকরা ওঁকারের সাধনা করে। পরের শ্লোকে আরও বিশ্লেষণ করবেন। দ্বিতীয় ধরণের সাধকরা মৃত্যুর সময় কুণ্ডলিনী শক্তিকে মস্তকে নিয়ে এসে ধ্যান করেন। এখন যদি কেউ বলেন *কবিং পুরাণমনুশাসিতরম্*এর সাধনা আমি শিরোদেশে করব, এটা করা যাবে না, শাস্ত্র থেকেই নিষেধ করা হয়েছে, এটা ভ্রূর মধ্যেই সাধনা করতে হবে। ওঁকার সাধনা শিরোদেশে করতে হবে। এইজন্যে অনেক বলে যে, যাদের মুক্তি হয় তারা মস্তকে ধ্যান করেন, কুণ্ডলিনী শক্তি নাকি মাথার তালু ভেদ করে বেরিয়ে আসে।

অথচ আমরা এটা কোথাও পাইনা, বিশেষ করে ঠাকুর স্বামীজী কারুরই আমরা দেখতে পাইনি যে মৃত্যুর সময় তাঁদের মাথার তালু ফেটে প্রাণ বায়ু বেরিয়েছে। আসলে তা হয় না, এখানে দুই ধরণের সাধকের কথা বলা হচ্ছে, ওঁকার সাধনা হচ্ছে নিরাকার সাধনা, নিরাকার সাধনা ব্রহ্মতালুতে হয় আর সাকার সাধনা ভ্রূযুগলের মাঝখানে হয়। দুটো ক্ষেত্রেই তাঁরা নিজেদের মনটাকে গুটিয়ে এই জায়গাগুলোতে নিয়ে আসেন। তফাৎ হচ্ছে কি ধ্যান করছে, সাকার না নিরাকার। যিনি কর্মযোগী তার প্রথম থেকেই কর্তা আর কর্ম এই ভাবটা আলাদা, সেইজন্য তাকে সাকার সাধনাই করতে হবে। আর যারা নিরাকার সাধক তারা কি করেন, ভগবান বলছেন –

**ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্ মামনুস্মরন্। যঃ প্রয়াতি ত্যজন্ দেহং স যাতি পরমাং গতিম্।।১৩।।**

ওঁ, এই যে এক অক্ষর রূপী ব্রহ্ম, এই ওঁ উচ্চারণ করে আর এর অর্থরূপ আমার চিন্তা করতে করতে যিনি দেহত্যাগ করেন, *স যাতি পরমাং গতিম্*, তাঁর মুক্তি হয়ে গেল। এই শ্লোকের মূল বক্তব্য হচ্ছে, গীতাতে প্রথম থেকে কর্মযোগীকে জ্ঞানযোগীদের থেকে নিম্নস্তরে রাখা হয়েছে, ভগবান বলছেন যারা কর্মযোগী তারা সারা জীবন সাকার সাধনা করতে থাকেন, আর যখন মৃত্যুর সময় এসে গেল, তখন উঠে বসে জপ করতে শুরু করল, ধ্যান করতে থাকল, আর দেখতে পায় তার প্রাণশক্তি আস্তে আস্তে উপরে দিকে উঠতে থাকে, নীচের দিকটা অবশ হতে থাকে, তখন মনটাকে ভ্রূযুগলের মাঝখানে একাগ্র করে প্রাণটাকে ছেড়ে দেয়। যিনি জ্ঞানমার্গী সাধক, তিনি সারা জীবন জ্ঞান সাধনা করা যাচ্ছেন, মৃত্যুর সময় যখন এসে গেছে বুঝে গেলেন, তখন তিনিও ধ্যানে বসে গিয়ে সমস্ত চেতনাকে মস্তকে একাগ্র করে ওঁএর  চিন্তা করতে থাকেন, ওঁম চিন্তা করতে করতে তিনি দেহকে ছেড়ে দেন। এই ওঁকে বা শ্রীকৃষ্ণকে বা তাঁর ইষ্টকে মৃত্যুর সময় চিন্তা করছে, মৃত্যুর পর তাঁর পরম মুক্তি হয়ে যাচ্ছে, তাঁকে আর জন্ম নিতে হবে না। তারপর বলছেন –

**অনন্যচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ। তস্যাহং সুলভঃ পার্থ নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ।।১৪।।**

শ্রীভগবান বলছে, এই রকম যাঁদের চিত্ত, এঁরা সব সময় আমার চিন্তন করে যাচ্ছেন, *নিত্যশঃ সততং*। আচার্য এখানে নিজের তরফে আবার যোগ করছেন, ছয় মাস, এক বছর ধরে চিন্তন করেছেন তা নয়, *নিত্যশঃ*, দীর্ঘকাল নিয়মিত ভাবে, *সততং*, নিরন্তর, মানে সর্বক্ষণ। *তস্যাহং সুলভঃ পার্থ*, এই ধরণের নিত্যযুক্তদের কাছে আমি সহজলভ্য, এরা অন্তিমে আমাকে খুব সহজে পেয়ে যায়। এখন যারা সারা জীবন ভোগের মধ্যে কাটিয়ে বয়স কালে মনে করছে যে আমাদের দেহ মনকে শুদ্ধ করতে হবে, এই ভেবে তারা মন্ত্রদীক্ষা নেবে। মন্ত্রদীক্ষা নিয়েই এরা যদি এখন ভাবে মৃত্যুর সময় আমার নিশ্চয় মুক্তি হয়ে যাবে, না, এদের কিন্তু কখনই মুক্তি হবে না? কি করে হবে! তবে মন্দের ভালো, কিছুই যেখানে হচ্ছিল না সেখানে কিছুটা এগিয়ে রইল। যারা অল্প বয়স থেকে ব্রহ্মচর্য পালন করে আসছে, সারা জীবন সাধনা করে আসছে, তাদের সমান সমান হওয়া কিছুতেই সম্ভব নয়। অন্য কোন দিকে মন না দিয়ে অনন্য চিত্তে দীর্ঘকাল ব্যাপি যে আমাকে স্মরণ করতে থাকে, এই রকম যোগীর কাছে আমি খুবই সহজলভ্য, অর্থাৎ *নিত্যযুক্তস্য*, সদা স্মরণশীল যোগীরা আমাকে খুব সহজ ভাবেই পেয়ে যায়। এই রকম সাধক না হলে যোগীজনচিত মৃত্যু হওয়া কিছুতেই সম্ভব নয়। তারপর বলছেন –

**মামুপেত্য পুনর্জন্ম দুঃখালয়মশাশ্বতম্। নাপ্নুবন্তি মহাত্মানঃ সংসিদ্ধিং পরমাং গতাঃ।।১৫।।**

এইভাবে আমাকে যখন সে পেয়ে যায়, ঈশ্বরের রূপকে যখন সে সাক্ষাৎ করে নেয়, তারপর আর তাঁর পুনর্জন্ম হয় না। পুনর্জন্মটা কি? *দুঃখালয়মশাশ্বতম্*, যে কোন পুনর্জন্ম হচ্ছে *অশাশ্বতম্*, অনিত্য, অস্থায়ী, যে পুনর্জন্মটা হল সেটাই অস্থায়ী আর *দুঃখালয়ম্*, দুঃখের আকর, শুধু দুঃখ আর দুঃখই। *নাপ্নুবন্তি মহাত্মানঃ*, এই যে পুনর্জন্ম লেগেই থাকে, দুঃখ লেগেই থাকে, অশাশ্বতই থেকে যাচ্ছে, এইটা আর তাঁদের হয় না। কারণ এনারা *সংসিদ্ধিং পরমাং গতাঃ*, পরম সিদ্ধিটা মানে মোক্ষ পেয়ে যান বলে এঁদের আর পুনর্জন্ম রূপ দুঃখ আর অশাশ্বতের মুখ দর্শন করতে হয় না। যারা অতি সাধারণ লোক তাদের এখানে ধর্তব্যের মধ্যে আনা হচ্ছে না, এরা জন্মাবে মরবে, আবার জন্ম নেবে আবার মরবে, এইভাবেই চলতে থাকবে। কাদের ধর্তব্যের মধ্যে আনা হচ্ছে? যারা কর্মযোগের সাধনা করেছেন, মানে যারা সাধক, সগুণ সাকারের চিন্তন করে গেছে। তাদের কি হবে? সেটা পরে বলবেন। আর যারা জ্ঞানযোগী, যাঁরা ওঁ এর উপসনা করছেন, তাঁদের মুক্তি সহজ। মুক্তি বলতে কি বলছেন? তাঁর আর পুনর্জন্ম হবে না। পুনর্জন্মটা কি? *দুঃখালয়ম্*, যত রকম দুঃখের আকর, আর *অশাশ্বতম্*, এখানে কোন কিছুই স্থায়ী নয়, সব কিছুই অস্থায়ী, তুমি যেখানেই জন্ম নাও, স্বর্গে যাও, নরকে যাও, পৃথিবীতে যাও, সাপ বিছে হয়ে জন্মাও সবটাই অস্থায়ী। এইটাই হচ্ছে এই শ্লোকের মূল বক্তব্য।

এত যে আলোচনা হল এখানে কিন্তু জীবন্মুক্তির কথা বলা হচ্ছে না, সাধারণ মানুষের কথাও বলা হচ্ছে না। অর্জুনের প্রশ্ন ছিল মৃত্যুর সময় যোগীরা আপনাকে কিভাবে পায়। জীবন্মুক্তির কথা দ্বিতীয় অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে বলা হচ্ছে, যারা সমস্ত জীবনব্যাপী সাধনা করেও জীবনমুক্ত হতে পারল না, শেষ সময়ে তারা আপনাকে কিভাবে পাবে। ভগবান তখন কয়েকটি শ্লোকে কি ভাবে এই ধরণের সাধকরা তাঁকে লাভ করেন বলে দিলেন। যাঁরা জীবনমুক্ত পুরুষ হয়ে গেছেন, তাঁরা তো মুক্তই হয়ে

গেলেন তাদের কথা এখানে ভগবান কেন বলতে যাবেন, নরেন, রাখাল, লাটুর কথা এখানে বলা হচ্ছে না। এটা হচ্ছে জীবনমুক্তের নীচে যারা আছেন তাদের কথা বলা হচ্ছে। এরপর যারা এইভাবে ভগবানকে পায়না, তাদের কি পরিণাম হয় বলতে গিয়ে বলছেন –

**আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্তিনোঽর্জুন। মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে।।১৬।।**

আমাদের শাস্ত্রে যত লোকের কথা বলা হয়, তার মধ্যে ব্রহ্মলোক হচ্ছে সব থেকে উচ্চলোক। কিন্তু যত লোক আছে, সে পাতাল লোক থেকে ব্রহ্মলোক পর্যন্ত সব লোকই *পুনরাবর্তি*, এর সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় চলতেই থাকবে। কিন্তু আমাকে যখন পেয়ে যায়, *মামুপেত্য তু কৌন্তেয়*, তার আর পুনর্জন্ম হবে না, *পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে*। মানে যে যেখানেই থাকুক না কেন, পাতালেই থাকুক আর ব্রহ্মলোকেই থাকুক পুনর্জন্ম সবারই হবে, কিন্তু যিনি ভগবানকে পেয়ে যান তার আর পুনর্জন্ম হয় না। উপনিষদও এই একই কথা বলছে, সেখানে বলছে যার আত্মজ্ঞান হয়ে যায় তার আর পুনর্জন্ম হয় না। আত্মজ্ঞান কি? তোমার যে স্বভাব, ঠিক ঠিক তোমার যে স্বরূপ। তোমার স্বরূপ কি? তুমি ঈশ্বরের সাথে এক। অর্থাৎ নিজেকে জানা আর শ্রীকৃষ্ণকে বা শ্রীরামকৃষ্ণকে জানা এক। উপনিষদ যাকে আত্মজ্ঞান বলছে, গীতা তাকেই ঈশ্বরজ্ঞান বলছে।

কেন এই রকম হয়? বলছেন এই ব্রহ্মাণ্ডে যা কিছু আছে সবই কাল অবিচ্ছিন্ন। সব কিছু কাল দিয়ে, সময়ের দ্বারা বাঁধা হয়ে আছে, শাশ্বত কিছুই নয়। ঘড়ির এ্যালার্মের মত সময়কে বা কালকে নির্দিষ্ট করা আছে, সময় হলেই সব এ্যালার্মের মত বাজতে শুরু করবে, ঠিক তেমনি সমগ্র সৃষ্টিতে টাইমার লাগানো আছে, একটা নির্দিষ্ট সময়ে এর সংহার হয়ে যাবে। আবার একটা সময় অতিক্রান্ত হয়ে গেলে আবার সৃষ্টি হতে থাকবে। এখন বলছেন কিভাবে এগুলো কালে আবদ্ধ হয়ে আছে আর কিভাবে সব আবার পুনর্জন্ম হয় –

**সহস্রযুগপর্যন্তমহর্যদ ব্রহ্মণো বিদুঃ। রাত্রিং যুগসহস্রান্তাং তেঽহোরাত্রবিদো জনাঃ।।১৭।।**

পুরানে ব্রহ্মার দিন ও রাত্রি, দেবতাদের দিন ও রাত্রি, মানুষের দিন ও রাত্রির হিসাব আরও বিস্তৃত ভাবে বলা হয়েছে। বলা হয় চার সহস্র যুগে ব্রহ্মার বার ঘন্টার একটা দিন হয়, এইভাবে ব্রহ্মার রাত্রিও চার সহস্র যুগ ব্যাপী। বলছেন ব্রহ্মার এই দিন ও রাত্রির তত্ত্বটাকে যিনি জানেন তিনি হচ্ছেন তত্ত্ববেত্তা। তখন কি হয়?

**অব্যক্তাদ্ ব্যক্তয়ঃ সর্বাঃ প্রভবন্ত্যহরাগমে। রাত্র্যাগমে প্রলীয়ন্তে তত্রৈবাব্যক্তসংজ্ঞকে।।১৮।।**

এই ব্রহ্মাণ্ডে যা কিছু আছে ব্রহ্মার রাত হলে এরা যেন সবাই ঘুমিয়ে পড়ে, আর ব্রহ্মার দিন হলে এরা সবাই যেন জেগে ওঠে। নাসদীয়সূক্তমে বলা হচ্ছে – *নাসদাসীন্নো সদাসীৎ*, তখন সৎও ছিল না অসৎও ছিল না, এই কথা বলে শেষের দিকে বলা হচ্ছে *কো অদ্ধা বেদ ক ইহ প্রবোচৎ*, কে বলবে সৃষ্টির সময় কি ছিল, কেননা সৃষ্টির সময় তো কেউ ছিল না। তাহলে এখানে এত হাজার যুগ রাত, এত হাজার যুগ দিন বলছে, এগুলো কেন বলা হচ্ছে? এই সময়কে কে মেপে দেখেছে? এগুলোকে যদি আমরা আক্ষরিক ভাবে নিই তাহলে আমরা আর কোন কুল কিনারা পাবো না। এগুলো বলার কথা তাই একটা বলা হচ্ছে, সৃষ্টি যবে থেকে শুরু হয়েছে তবে থেকেই চলছে। এই সৃষ্টিটাই আবার সংহারে চলে যাবে। কোথায় চলে যায়? বীজ রূপে। ঠাকুর এটাকে কথামৃতে খুব সহজ করে বলছেন – বাড়ির গিন্নীর কাছে পুঁটলি থাকে তাতে শশার বীচি, কুমড়োর বীচি, সমুদ্রের ফেণা রাখা থাকে, যখন যেটার দরকার পড়ে তখন সেই পুঁটলি থেকে বার করে দেয়। মহামায়াও তেমনি সব কিছুকে বীজ রূপে রেখে দেন। এখন মুক্তি তো সবার হচ্ছে না, যার মুক্তি হচ্ছে না, তার কর্মগুলো তো বীজ রূপে থেকে গেলে। এবারে নতুন যখন সৃষ্টি হবে তখন কিভাবে সৃষ্টি হয়?

**ভূতগ্রামঃ স এবায়ং ভূত্বা ভূত্বা প্রলীয়তে। রাত্র্যাগমেঽবশঃ পার্থ প্রবত্যহরাগমে।।১৯।।**

আজকে যদি সৃষ্টির সংহার হয়ে যায়, এখন আমার তো মুক্তি হয়নি, এখন আমার যে সংস্কারগুলো আছে এগুলো সব বীজাকারে থেকে গেল। এখন ব্রহ্মার হাজার যুগ, মানে কত শত কোটি বছর এগুলো বীজাকারে পড়ে থাকবে। তারপর আবার যখন নতুন করে সৃষ্টি শুরু হল, তখনও আমার সংস্কারগুলো বীজাকারে পড়ে রয়েছে। তারপর আবার যখন পৃথিবীর সৃষ্টি হল, তারপর কিভাবে পৃথিবীত প্রথম জীবনের স্পন্দন শুরু হল, তখন আবার আমার জন্ম হবে, জন্মের পর সুপ্ত সংস্কারগুলো তৈরী হবে। কোথা থেকে এই সংস্কারগুলো এল? আগের যে সহস্র যুগ ব্রহ্মার সৃষ্টি হয়েছিল সেই সময় থেকে। এখানে আচার্য খুব সুন্দর করে বলছেন – মানুষ যে কর্ম করে দেখা যায় তার ফল সে পাচ্ছে না, আবার এমন জিনিষ সে পেয়ে যায়, যার জন্য তাকে কোন কর্ম করতে হয়নি। এই যে অসঙ্গতি বা দোষ, এই দোষকে পরিহার করার জন্যে বলছেন – প্রথম হচ্ছে, বন্ধন আর মুক্তির পথ এর মাধ্যমে দেখান যাচ্ছে, দ্বিতীয়, নানান রকমের যে কর্মসংস্কার রয়েছে, এই কর্মসংস্কার থেকে বেরিয়ে আসার কথা, আর তৃতীয় হচ্ছে সব কিছু থেকে

বৈরাগ্য। এতগুলো জিনিষকে মোকাবিলা করার জন্য এই তত্ত্বের ধারণাকে নিয়ে আসা হয়েছে। আমাদের যাতে এই সৃষ্টি থেকে বৈরাগ্য হয়, বন্ধন আর মুক্তির পথকে পরিষ্কার করে দেখান আর আমি আজকে এই রকমটি কেন হয়েছি, এই জিনিষটাকে ব্যাখ্যা করার জন্য এই ধারণাটাকে নিয়ে আসা হয়েছে। আচার্য শঙ্করও বলছেন হাজার যুগ ব্রহ্মার দিন আর হাজার যুগ ব্রহ্মার রাত্রি, এই ধারণাটা কতটা ঠিক, আর এটা বাস্তব না কাল্পনিক বলা খুব মুশকিল, তবে হিন্দুধর্ম এই কাল্পনিক ব্যাপারটাকে পুরোপুরি গ্রহণ করে নিয়েছে। অনেকে তাই প্রশ্ন করেন, আমাদের যে পুনর্জন্মের কথা বলা হয়, এটা কি সত্যি, না কাল্পনিক কিছু? এর উত্তর দেওয়াটা খুব মুশকিল। আচার্য শঙ্করও বলছেন, আমাদের সব কিছুই ব্যাখ্যা করতে হয়, এই তিন চারটে জিনিষকে ব্যাখ্যা করার জন্য এই শ্লোকটাকে আনা হয়েছে। এই তিন চারটে জিনিষকে যেই নিয়ে আসা হল, আর তখনই সব কিছুর উত্তর স্পষ্ট হয়ে মনটাও শান্ত হয়ে গেল। এ কেন গরীব, সে কেন এত ধনী, আমার এত ক্ষমতা, ওর কেন ক্ষমতা নেই, আমার স্বাস্থ্য খারাপ ওর শরীরে কেন রোগ নেই, এই সব অসঙ্গতি গুলোকে পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে এই একটি ধারণাতে – তুমি তো জন্ম জন্মান্তরে এই রকম করেছ বলে তোমার এই রকম সংস্কার নিয়ে এসেছ। সেই সংস্কার কোথা থেকে এল? এই সৃষ্টির আগে আরেকটা সৃষ্টি ছিল। তার আগে? সেই সৃষ্টির আগে আরেকটা সৃষ্টি ছিল। অনাদি কাল থেকে এইভাবেই চলে আসছে। তার মানে ঈশ্বরের ইচ্ছাতে তোমার আজকের এই অবস্থা হয়নি, এখানে যা কিছু তোমার হচ্ছে সব তোমারই জন্য হয়েছে, তুমিই তোমার অবস্থার জন্য একশ ভাগ দায়ী। খ্রীশ্চানিটি আর আর ইসলামে যেটা সমস্যা হয়, তা হচ্ছে একটা নির্দিষ্ট সময়ে সৃষ্টি হয়ে গেছে, ব্যস্ এর পর আর কিছু নেই, এর পরে আমি কেন গরীব হলাম, সে কেন বড়লোক হল এর কোন ব্যাখ্যা দেওয়া যায় না। কিন্তু হিন্দুধর্মের কাছে এই ব্যাপারে কোন সমস্যা হয় না। এখানে তুমি এখন যা হয়েছ সেটা তোমার নিজের জন্যই হয়েছে। আমাদের হিন্দুধর্মে জগৎ সৃষ্টি হওয়ার পর কিছুদিন চলল, তারপর একটা সময়ের পর সংহার হয়ে গেল। সংহারে সব বীজাকারে কত কোটি বছর পড়ে রইল, তারপর আবার সৃষ্টি আবার কিছুদিন চলল, এইভাবে অনন্তকাল ধরে সৃষ্টি আর সংহার চলে আসছে। এইটাকে দেখে মানুষের মধ্যে বৈরাগ্য আসে – এই পুরো ব্যপারটা এইভাবেই চলতে থাকবে আর আমিও এর মধ্যে এই ভাবে ঘুরপাক খেতেই থাকব, আর দুঃখ কষ্টের মধ্যে হাবুডুবু খেতেই থাকব? তখন মানুষের মধ্যে মুক্তির ইচ্ছা জাগে।

ব্রহ্মার যখন রাত হয় তখন এই সৃষ্টি যেন সংহারে চলে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। আর ব্রহ্মার যখন ভোর হয়, বাচ্চা ঘুম থেকে না উঠলে যেমন জোর করে টেনে তোলা হয়, ঠিক তেমনি আগের সৃষ্টিতে যত জীব ছিল সব কটাকে টেনে এই নতুন সৃষ্টিতে লাগিয়ে দেওয়া হয়। আমি যদি বলি আমি আর সৃষ্টিতে আসব না, আমার কথা কেউ শুনবে না, আমাকে টেনে নামিয়ে দেওয়া হবে। *রাত্র্যাগমেঽবশঃ*, রাত কেটে যখন দিন শুরু হবে তখন যেন সবাই অবশ হয়ে থাকে, মানে কিছুই করার উপায় নেই, যদি নাও আসতে চায় তবুও তাকে টেনে অবশ করে সৃষ্টির কাজে নামিয়ে দেবে, যার যা সংস্কার ছিল সেই অনুসারে তাকে সব ভোগ করতে হবে। *প্রভবত্যহরাগমে*, দিন হলে, মানে সৃষ্টি হলে আবার জন্ম নিতে হবে। এই ভাবে জন্ম নিতে নিতে, জন্ম জন্মাতরে ঘুরতে ঘুরতে যখন শেষ জন্মের কাছাকাছি চলে আসে তখন একটু বৈরাগ্য হওয়ার পর সাধনা শুরু করবে, এর আগের অধ্যায়ে যেমন বলেছিলেন, *বহুনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে*, এরপর অনেক জীবন ধরে এবার সাধনা করে যাবে, দুই এক জন্মের সাধনার কথা এখানে বলা হচ্ছে না, বহু জন্ম ধরে সাধনা করার পর সে এবার মুক্তির পথে পা বাড়ায়। এই কথা বলার পর আবার ব্রহ্মের যে স্বরূপ, এর আগে যেটা বলা হয়েছিল, তার বর্ণনা করছেন –

**পরস্তস্মাৎ তু ভাবোঽন্যোঽব্যক্তোঽব্যক্তাৎ সনাতনঃ। যঃ স সর্বেষু ভূতেষু নশ্যৎসু ন বিনশ্যতি।।২০।।**

এই যে এতক্ষণ যে সকল ভূত সমূহের কথা বলা হল, যারা ব্রহ্মার রাত্রিতে অবিদ্যারূপ বীজে অব্যক্ত হয়ে চলে যাচ্ছে আবার ব্রহ্মার দিনে আবার ব্যক্ত হচ্ছে, এই সব ভূতের থেকে ব্রহ্ম বিলক্ষণ স্বতন্ত্র। ব্রহ্মের কোন পরিবর্তন নেই, তাঁর যে জন্ম হওয়া আবার না জন্ম হওয়া এই ধরণের কোন কিছু পরিবর্তন নেই। এই সব কিছু থেকে তিনি সম্পূর্ণ আলাদা, এই সব ভূতের যা কিছুই হোক না কেন তাতে তাঁর কিছুই আসে যায় না, সব কিছুর পারে তিনি। ব্রহ্ম যেন সমুদ্র, সমুদ্রের ঢেউ হচ্ছে কিন্তু সমুদ্রের তলদেশে দশ মিটার নীচে চলে গেলেই আর কিছুই বুঝতে পারার উপায় নেই, সমুদ্র শান্ত গম্ভীর। তারপর বলছেন –

**অব্যক্তোঽক্ষর ইত্যুক্তস্তমাহুঃ পরমাং গতিম্। যং প্রাপ্য ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম।।২১।।**

এই যে ব্রহ্মের স্বরূপের বর্ণনা করতে গিয়ে অব্যক্ত, অক্ষর ইত্যাদি বলা হচ্ছে, এই অব্যক্ত, অক্ষরের ভাবটাই হচ্ছে *পরমাং গতিম্*, এই ভাবটাকে যে পায় সেই পরম গতি পেয়ে যায়। এর বাইরে অন্য যা কিছু ভাবই তুমি পাওনা কেন সেটা কিন্তু পরম গতি নয়, এই পরম গতির ভাব না পাওয়া পর্যন্ত তোমাকে বারবার জন্ম গ্রহণ করতে হবে। কিন্তু তুমি যদি শ্রীরামকৃষ্ণের যে ভাব, তিনি অব্যক্ত, তিনি অক্ষর, তিনি অনন্ত এই ভাবটা পেয়ে গেলে তোমার আর জন্ম হবে না। এই কথাই বলা হচ্ছে – *যং প্রাপ্য ন নিবর্তন্তে*, যেটাকে পেলে মানুষ আর ফেরত আসে না, আর *তদ্ধাম পরমং মম*, সেইটাই হচ্ছে আমার পরম ধাম। এই পরম ধামকেই বলা হচ্ছে বৈষ্ণব ধাম। বিষ্ণুর পরম ধাম, বৈষ্ণব ধাম বা মুক্তি সব একই। এই পরম ধাম কি ভাবে পাওয়া যাবে –

**পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লভ্যস্ত্বনন্যয়া। যস্যান্তঃস্থানি ভূতানি যেন সর্বমিদং ততম্।।২২।।**

যিনি সেই পুরুষের ধ্যান করেছেন, কোন পুরুষের? সেই পরমশ্বের, যিনি আমাদের সবার শরীরের বাস করেন, যাঁকে অধ্যাত্ম বলা হল, যিনি হচ্ছেন সর্বত্রপরিপূর্ণ পরমাত্মা, যিনি পরমাত্মা তিনিই আবার অন্তরাত্মা। এই অন্তরাত্মা আর পরমাত্মার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। এই অনন্ত পরমাত্মা ছাড়া আর কিছুই নেই, এই ভাবটাকে যিনি বুঝে যান তখন তিনি এই ভাবেই ধ্যান চিন্তন করতে থাকেন। এই ভাবে ধ্যান চিন্তন করতে করতে মৃত্যুর সময় এই ভাবটাকেই অবলোকন করে পরম ধাম প্রাপ্ত হন।

**যত্র কালে ত্বনাবৃত্তিমাবৃত্তিং চৈব যোগিনঃ। প্রয়াতা যান্তি তং কালং বক্ষ্যামি ভরতবর্ষভ।।২৩।।**

এর আগে আমি তোমাকে কর্মযোগী আর সাংখ্যযোগীদের কথা বলেছিলাম। এখন কারা জন্ম নেয় আর কাদের আর জন্ম নিতে হয় না, অর্থাৎ কে মোক্ষ লাভ করে আরে কে পুনর্জন্ম লাভ করে এবারে আমি তোমাকে আবার ব্যাখ্যা করে দিচ্ছি। এর আগে দুটো পথ আগেই বলে দিয়েছিলেন, একটা হচ্ছে পুরুষের ধ্যান আরেকটি বলছেন ওমকার সাধনা।

**অগ্নির্জ্যোতিরহঃ শুক্লঃ ষণ্মাসা উত্তরায়ণম্। তত্র প্রয়াতা গচ্ছন্তি ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদো জনাঃ।।২৪।।**

প্রথমে জ্ঞানযোগীদের কথা বলছেন। যাঁরা *ব্রহ্মবিদো জনাঃ*, মৃত্যুর সময় যাঁরা ব্রহ্মের চিন্তন করছিলেন, মনে রাখতে হবে এখানে বলছেন চিন্তন করছিলেন, মানে একমাত্র ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছুই নেই এই জ্ঞানে গভীর ভাবে নিমগ্ন, আর কপালে সব প্রাণকে কেন্দ্রীভূত করে নিয়েছেন, যেটা আগেই বলা হয়েছে, এইভাবে এঁদের শরীর যখন চলে যায় তখন এঁদের আত্মা যে রাস্তা দিয়ে মুক্তির পথে চলে যান সেই রাস্তাটার মালিক হচ্ছেন *অগ্নিঃ জ্যোতিঃ অহঃ শুক্লঃ*, এগুলো হচ্ছে কিছু দেবতার নাম। এটা একটা রাস্তা, এই রাস্তার মালিক কে, এই রাস্তাটা কি রকম, এখানে তার বর্ণনা করছেন।

এগুলো হচ্ছে বেদের ধারণা, স্বামীজীও এক জায়গায় বলছেন, এনারা এখানে ঠিক কি বলতে চাইছেন পরিষ্কার বোঝা যায় না। তখনকার সময় এই রকম একটা ধারণা ছিল যে, যাঁরা জ্ঞানমার্গী তাঁদের যখন মৃত্যু হয় তখন এনারা উত্তরায়ণেই দেহত্যাগ করাটাকে প্রশস্ত মনে করতেন, যেটা ভীষ্মের ক্ষেত্রে আমরা পাই, তিনি সবাইকে বলে দিয়েছিলেন সূর্য যতক্ষণ উত্তরায়ণ না হয় ততক্ষণ তিনি তাঁর দেহ ছাড়বেন না। মকর সংক্রান্তির দিন থেকে সূর্যের উত্তরায়ণ শুরু হয়, তারপর ছয়টি মাস সূর্য উত্তরায়ণে থাকে। আগস্ট মাসের পর থেকে সূর্যের দক্ষিণায়ন শুরু হয়। এখন উত্তরায়ণকে মোটামুটি একটা তারিখের মধ্যে বেঁধে দেওয়া হয়েছে, ১৪ই জানুয়ারী থেকে ১৪ই জুলাই পর্যন্ত। এনাদের ধারণা যে যখন সূর্যের উত্তরায়ণ চলে তখন এই পথ দিয়ে জ্ঞানীদের আত্মা গমন করেন। এই পথের মালিক হচ্ছেন অগ্নি দেবতা, এই পথটা হচ্ছে জ্যোতির্ময়। এখন আমরা আমাদের বুদ্ধি দিয়ে এই পথ সম্বন্ধে আর বিশদ কিছু বলতে পারব না, এগুলো বাস্তবকিই এই রকম না কাল্পনিক কিছু বলা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়, স্বামীজীর মত আধিকারিক পুরুষই বলে দিয়েছেন যে এই জিনিষগুলো পরিষ্কার নেই। তখনকার দিনে এই রকম কোন ধারণা ছিল, বা যোগীরা এই রকম কিছু দেখেও থাকতে পারেন, যে পথে অগ্নি দেবতা, জ্যোতির দেবতারা আছেন, যাঁরা ব্রহ্মবেত্তা তাঁরা যখন শরীর ছেড়ে দেন তখন তাঁদের জীবাত্মা ঐ পথ দিয়ে গমন করে উপরের দিকে উঠতে থাকেন। তারপর সেখান থেকে তাঁরা মুক্তির জন্য এগিয়ে যান। এখানে আচার্য শঙ্কর নিজের থেকে একটা বক্তব্য রাখছেন, যাঁরা জীবনমুক্ত, যাঁরা সদ্যমুক্তি প্রাপ্ত, তাঁদের কথা কিন্তু এখানে বলা হচ্ছে না। তাঁদের আত্মা কোথাও গমনাগমন করে না, মুক্তির সাথে সাথেই তাঁদের আত্মা তখনই অখণ্ড সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের সাথে লীন হয়ে যাচ্ছে। এই পথে তাঁরাই গমন করেন যাঁরা সাধনা করেছেন কিন্তু মৃত্যুর আগে সিদ্ধ হতে পারেননি। মৃত্যুর সময় যাঁরা সিদ্ধি পান তাঁদের কি হয়? তখন তাঁদের জীবাত্মা এই পথ দিয়েই গিয়ে বিলীন হয়ে যায়। আর যাঁরা কর্মযোগী, তাঁরাও যোগী কিন্তু তাঁদের পথটা অন্য রকম। এই পথটা কি রকম –

**ধূমো রাত্রিস্তথা কৃষ্ণঃ ষণ্মাসা দক্ষিণায়নম্। তত্র চান্দ্রমাসং জ্যোতির্যোগী প্রাপ্য নিবর্ততে।।২৫।।**

যখন সূর্যের দক্ষিণায়ন হয় তখন এঁদের শরীরটা যায়। মজার ব্যাপার হল, ঠাকুরের শরীর ১৬ই আগস্ট এই দক্ষিণায়নেই গিয়েছিল। তাতে কিছু আসে না, অবতারের ক্ষেত্রে এগুলো কিছুই প্রযোজ্য হয় না। এমনকি শ্রীশ্রীমায়ের শরীরও দক্ষিণায়নে গিয়েছিল। যাই হোক, সবক্ষেত্রে এগুলোকে অত আক্ষরিক নেওয়ার প্রয়োজন আছে বলে মনে করা হয় না। যেহেতু গীতায় বলা হচ্ছে তাই ব্যাখ্যার দরকার হয়, এখানে বলছেন যাঁরা কর্মযোগী এনারা যে পথ দিয়ে যান সেই পথটা ধূম্রময়, এই পথের দেবতা হচ্ছেন রাত্রি, এই পথের মালিক হলে চন্দ্রমা দেবতা। চন্দ্রমা মালিক হওয়াতে এনারা খুব উচ্চলোকে চলে যান, সেই উচ্চলোকে গিয়ে যেহেতু ভালো ভালো কর্ম করেছেন বলে তাঁরা অনেক ভোগ করার সুযোগ পান। এখন যদি কেউ সারা জীবন খুব দান, ধ্যান, আর প্রচুর

সমাজসেবামূলক কাজ করেছেন আর মরার সময় ঈশ্বরের চিন্তন করতে করতে শরীর ত্যাগ করেছেন, এখন মরার পর এনারা দক্ষিণায়নে ধূম্রমার্গ দিয়ে খুব উচ্চ স্বর্গলোকে চলে গিয়ে প্রচুর ভোগ করতে পারবে।

অষ্টম অধ্যায়ে আমরা মোট চার ধরণের পথ পাচ্ছি। প্রথম হচ্ছে জীবনমুক্ত, তাঁদের কোন আসা যাওয়া নেই। দ্বিতীয় হচ্ছে যাঁরা ব্রহ্মোপসাক, এনারা জ্যোতির্মার্গ দিয়ে মুক্তির দিকে এগিয়ে যান। তৃতীয় হচ্ছে যাঁরা কর্মযোগী, এনারা ধূম্রমার্গ দিয়ে উচ্চলোকে গিয়ে ভোগ করার পর আবার ফিরে আসবেন। চতুর্থ হচ্ছে যারা অসাধক, তাদেরকে এর মধ্যে ধরাই হচ্ছে না, তারা জন্মাবে মরবে, আবার জন্ম নেবে আবার মরবে। যাঁরা কর্মযোগী এনারা যদিও ফিরে আসেন, কিন্তু এনারা সাধারণ মানুষের ঘরে জন্ম নেন না। দু চারটে জন্ম নিতে নিতে এনারাও জ্ঞানমার্গী হয়ে যান। এরপর বলছেন –

**শুক্লকৃষ্ণে গতী হ্যেতে জগতঃ শাশ্বত মতে। একয়া যাত্যনাবৃত্তিমন্যয়াবর্ততে পুনঃ।।২৬।।**

এই যে দুটো পথের কথা বলা হল, শুক্লপথ আর কৃষ্ণপথ, এই দুটো পথ কিন্তু চিরন্তন, এই পথে কোন ছাড়োন ছোড়ন নেই। এই পথের একটা পথে মানুষকে ফেরত আসতে হয়, অন্য পথে তাকে ফেরত আসতে হয় না। এই জগৎ হচ্ছে অনাদি, সেইজন্য এই পথ দুটোও সনাতন, নিত্য। এই পথে তার যাতায়াত লেগেই থাকবে, কিছু কিছু মানুষ একটা পথে মুক্তির দিকে চলে যাচ্ছে, কিন্তু বেশির ভাগই দ্বিতীয় পথে গিয়ে আবার ফেরত চলে আসে। আর যারা সাধারণ লোক তাদের এই পথের মধ্যে ধরাই হচ্ছে না, তারা এখানেই জন্মাবে আবার এখানেই মরবে। কিন্তু শাস্ত্র তো তাদের জন্যও স্বর্গ নরকের কথা বলছে, কিন্তু এদের স্বর্গ নরক অনেক নিম্ন স্তরের স্বর্গ নরক। সেই সব লোক থেকে এরা খুব কম সময়ের মধ্যে ফেরত চলে আসে। আচার্য শঙ্কর আবার এখানে নিজে থেকে যোগ করছেন – এই গতির কথা যে বলা হল, এটা সবার জন্য নয়, এগুলো মুষ্টিমেয় কয়েকজনের জন্যই বলা হচ্ছে, যারা কর্মযোগী আর যারা জ্ঞানযোগী তাদের জন্যই বলা হচ্ছে। এদের বাইরে বাকী যারা আছে তাদের কথা এখানে বলাই হচ্ছে না।

**নৈতে সৃতী পার্থ জানন্ যোগী মুহ্যতি কশ্চন। তস্মাৎ সর্বেষু কালেষু যোগযুক্ত ভবার্জুন।।২৭।।**

হে অর্জুন, এই যে আমরা এত কিছু আলোচনা করলাম, অধ্যাত্ম, অধিদেবতা, অধিভূত ইত্যাদি, এত আলোচনা এই উদ্দেশ্যেই করা হয়েছে যাতে তুমি ভালো করে বুঝে নিতে পার যে একটা হচ্ছে মোক্ষের কারণ আরেকটি হচ্ছে বন্ধনের কারণ। মুক্তির দিকে যেটা নিয়ে যাচ্ছে সেটি এইজন্যই তোমাকে বলা হল তুমি তো আর জীবনমুক্ত হতে পারবে না, সাধারণ মুক্ত হয়ে আসল মুক্তির পথে এগিয়ে যাতে পারবে। সেটা তুমি কিভাবে হবে? *তস্মাৎ সর্বেষু কালেষু যোগযুক্ত ভবার্জুন*, হে অর্জুন সেইজন্য বলছি তুমি সর্বদা সর্বক্ষণ যোগযুক্ত হও। এর আগে বলেছিলেন *মামনুস্মর যুধ্য চ*, আমাকে মনে রেখেও যদি তুমি যুদ্ধ কর তাহলেও তুমি মুক্ত হবে, কারণ মৃত্যুর সময় তুমি আমাকেই মনে রাখবে, আমাকে মনে রেখে দেহত্যাগ করলে তুমি মুক্তির পথে চলে যাবে। তারপর শেষ শ্লোকে বলছেন –

**বেদেষু যজ্ঞেষু তপঃসু চৈব**
**দানেষু যৎ পূণ্যফলং প্রদিষ্টম্।**
**অত্যেতি তৎ সর্বমিদং বিদিত্বা**
**যোগী পরং স্থানমুপৈতি চাদ্যম্।।২৮।।**

যিনি ঠিক ঠিক জ্ঞানযোগী তিনি বেদ, যজ্ঞ, তপস্যা, দান এই শ্রেষ্ঠ কর্ম, এর যে ফল, এর ফল মানে সেই উচ্চ স্বর্গ বা নরক, যা কিছু বর্ণনা করা হয়েছে এর সব কিছুকে *অত্যেতি তৎ*, অতিক্রম করে যান, এর কোন কিছুর বন্ধনে তিনি আবদ্ধ হন না। *ইদং বিদিত্বা*, এইরূপে সব কিছু জানার পর জ্ঞানী আবদ্ধ না হয়ে কোথায় চলে যান? *স্থানমুপৈতি চাদ্যম্*, ঈশ্বরের দিকে যাওয়ার যে পথ, সেই পথ দিয়ে শ্রীকৃষ্ণের সাথে এক হওয়া, শ্রীরামকৃষ্ণের সাথে এক হওয়ার যে স্থান সেখানে চলে যান।

এত কিছু আলোচনাতে গীতার মূল বক্তব্য হচ্ছে – সংসার আছে আর এই সংসারে বন্ধন আছে, ভেতরে আমাদের জীবাত্মা আছে, পরমাত্মা আছেন, ব্রহ্ম আছেন। এবার যে অতি সাধারণ জীবন-যাপন করছে তাতে কোন অসুবিধার কিছু নেই, এদের আবার পুনর্জন্মাদি হতে থাকবে। যখন এই সংসারের সংহার হয়ে যাবে, যে মুক্ত হয়নি তার যে সংস্কারগুলো রয়েছে, সমস্ত সংস্কার জীবাত্মার সাথে থেকে যাবে। যদিও বলা হয় জীবাত্মা আর পরমাত্মা এক, তথাপি আপাত ভাবে একটা বন্ধন জীবাত্মার মধ্যে লেগে থাকে। এরপর আবার যখন সৃষ্টি হবে তখন আবার এই জীবাত্মাকে সৃষ্টির মধ্যে টেনে নিয়ে আসা হবে। এই চক্র চলতেই থাকবে। এই ভাবে চলতে চলতে একটা সময় এমন আসবে যে সে কর্মযোগী হয়ে যাবে। কিভাবে হবে? যখন অবতারের আবির্ভাব হয়, তখন একটা তরঙ্গ প্রবাহিত হয়ে জগতে আধ্যাত্মিক বিবর্তন আসে। অবতারের কথা শুনে শুনে বেশ কিছু মানুষের মনের মধ্যে একটা পরিবর্তন

আসে, এই পরিবর্তন তাকে উন্নত মানুষে রূপান্তরিত করে, তখন সে কর্মযোগী হয়ে যায়, সমাজসেবা করা, লোকের ভালো করা, ধর্মের প্রচার করা, এই ধরণের কাজ করতে শুরু করে। এই কর্ম করতে করতে সে কিছু কিছু ঈশ্বরের তত্ত্বও বুঝতে থাকে। এরপর যখন সে শরীর ত্যাগ করে তখন মৃত্যুর পর সে খুব উচ্চ লোকে চলে যায়। সেখানে অনেক দিন ভোগ করার পর আবার সে এসে জন্ম নেয়। জন্ম নিলেও তার সংস্কারগুলো থেকে যাবে। এর পর যে সে পুরো ভোগী হয়ে জন্মাবে তা নয়, কর্মযোগী হয়েই আবার জন্মাবে। এইভাবে চলতে চলতে এক সময় তার মধ্যে একটা বিবেক জাগ্রত হবে যে বিবেকবশতঃ তার মনে ইচ্ছে হবে যে আমি আর কর্মবন্ধনে যেন না পড়ি। কর্মবন্ধন থেকে বেরিয়ে এসে সে জ্ঞানযোগীর হওয়ার জন্য মন দেয়। তখন সে তার বেশির ভাগ সময় ওঁকার সাধনায় লেগে থাকবে বা ঈশ্বর চিন্তনে থাকবে। তার যা কাজ সবই করবে কিন্তু তার মনটা সব সময় ঈশ্বর চিন্তনেই লেগে থাকবে। ব্রহ্ম আর ঈশ্বর সেই একই বস্তু, এই চিন্তন যখন সে করতে থাকবে তখন তার দুটো সম্ভবনার পথ খুলে যাবে। এক হচ্ছে, শরীর থাকতে থাকতেই তার জ্ঞান হয়ে যেতে পারে, তখন সে এমনিতেই মুক্ত হয়ে যাবে, এতে কোন প্রশ্নই নেই। শরীরটা তখন যত দিন চলবে চলতে থাকবে, তারপর এক সময় শরীরটাও খসে পড়ে যাবে। আর দ্বিতীয় যে সম্ভবনাটা আছে, সেটা হচ্ছে, শরীর থাকতে থাকতে জ্ঞান হয়তো তার হল না, কিন্তু শরীর ত্যাগের সময় তার ঐ ভাবটা মনের মধ্যে প্রস্ফুটিত হয়ে যায়। তখন তার যে জীবাত্মা ছিল, সেই জীবাত্মা শরীর ছেড়ে দিয়ে এগোতে শুরু করবে। কিন্তু নীচে যে ভোগাদির লোক আছে, পিতৃলোক, স্বর্গলোক এই সব লোকগুলিকে সাঁ সাঁ করে ফেলে দিয়ে উপরে দিকে চলে যায়। সমস্ত লোককে যখন নীচে ফেলে দিয়ে উপরের দিকে যেতে থাকে, তখন ঐ পথের যত দেবতারা আছেন, যেমন অগ্নির দেবতা, জ্যোতির দেবতা, এনারা আস্তে করে তাকে ওপরের দিকে ঠেলে দেন। এই জিনিষ গুলোই আবার কাহিনী আকারেও দেওয়া হয়। যেমন বলা হয় কাশীতে যদি কেউ মারা যায়, শিব তখন তার কানে তারক মন্ত্র দিয়ে তাকে দেখিয়ে দেন এই দ্যাখ্ আমার অখণ্ড স্বরূপ। অখণ্ড স্বরূপ দেখিয়ে তাকে মুক্তির মার্গে ঠেলে দেন।

অষ্টম অধ্যায়ের পুরো বক্তব্য হচ্ছে, যে মানুষ জীবনমুক্ত নয় আবার ঘোর সংসারীও নয়, এই দুই জনকে বাদ দিয়ে যাঁরা আছেন, তাঁরা কিভাবে জীবন যাপন করেন আর মৃত্যুর সময় তাঁদের কি হয় এবং মৃত্যুর পরে কি হয় এই জিনিষটাকে একমাত্র এই অধ্যায়েই আলোচনা করা হয়েছে। এই অধ্যায়ের যদিও নাম হচ্ছে তারকব্রহ্ম যোগ, কিন্তু এখানে স্তুতি করা হয়েছে অক্ষর ব্রহ্মোপসনার, তাই এর আরেক নাম হল অক্ষরব্রহ্মযোগ। ওঁ এর উপাসনা করা হলে মানুষের আর পুনর্জন্ম হয় না, এই ব্যাপারটাকে এখানে স্তুতি করা হচ্ছে। এই অষ্টম অধ্যায়ের কয়েকটি জিনিষকে যদি সরিয়ে দেওয়া হয়, যেমন *সহস্রযুগপর্যন্তমহর্যদ ব্রহ্ম বিদুঃ*, এই শ্লোকটাকে বাদ দিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে এর পুরো দর্শন ইসলামিক ও খ্রীশ্চানিটি দর্শনের সাথে এক হয়ে যাবে। যদি এই জীবনে জ্ঞান উপলব্ধি হয়ে থাকে তাহলে এই জীবনেই সে মুক্ত হয়ে গেল, তার আর কোন চিন্তা নেই। কিন্তু শেষ অবস্থায়, মানে মৃত্যুর সময় তার আল্লার চিন্তন বা যিশুর চিন্তন কি রকম ছিল সেই অনুসারে তার স্বর্গ নরকের স্থান নির্ধারিত হয়ে যাবে। যারা সাধারণ লোক, যারা পাপ কর্মাদি করেছে তারা নরকে যাবে, যারা আল্লার চিন্তা করেছে বা যিশুর চিন্তা করেছে তারা সবাই স্বর্গে যাবে।

এখানে যে কর্মযোগীদের আর জ্ঞানযোগীদের পথের কথা বলা হয়েছে, এখন প্রশ্ন যে সবাইকে কি এই পথ দিয়েই যেতে হবে? না, এখানে একটা তৃতীয় পথ আছে যারা এখানেই সব কিছু পেয়ে যায় তাদের আর এই দুটো পথ দিয়ে যেতে হয় না, এই তৃতীয় পথের কথা নবম অধ্যায়ে গিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। অষ্টম অধ্যায়ের কিছু কিছু জিনিষ বেদের সময় থেকে এসেছে, এর কিছু কিছু জিনিষ আবার উপনিষদেও দেওয়া আছে। আর এই ধারণা গুলো এতো প্রাচীন যে ঠিক বোঝা যায় না কি বলতে চাইছে। তবে যে জিনিষটা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে তা হল, মানুষ যেমন কর্ম করছে সেই অনুসারে সে পথ নেয়, একটা পথে সে আবার ফেরত চলে আসে আরেকটা পথে তাকে আর ফিরে আসতে হয় না। আর যারা সাধারণ লোক তারা এই দুটো পথের ধারে কাছেই যেতে পারেনা, তারা জন্মায় আর মরে, মরেই অল্প কিছু দিনের মধ্যে আবার জন্ম নেয়। আর এই ধারণাকে যুক্তির উপর দাঁড় করাবার জন্য আরও কয়েকটা ধারণাকে সংযুক্ত করা হয়েছে, যে ধারণা গুলো আমরা পরবর্তি কালে পুরাণে পেয়ে যাই। এই সব কিছু মিলিয়ে একটা সামগ্রিক দর্শনকে এখানে দাঁড় করান হয়েছে।

**ওঁ তৎসদিতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসুপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়ং যোগশাস্ত্রে**
**শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে অক্ষরব্রহ্মযোগো নাম অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।।**

********

নবম অধ্যায়

# রাজযোগ

নবম অধ্যায়ের আলোচনা শুরু করার আগে অষ্টম অধ্যায়ের মূল বক্তব্যে আবার একটু আলোকপাত করে নিলে এই অধ্যায়ের বক্তব্যকে বুঝতে সুবিধা হবে। যদিও গীতা বলতে চাইছে ঈশ্বরই আছেন, ঈশ্বর ছাড়া আর কিছুই নেই, কিন্তু তাত্ত্বিক ভাবে শুধু এইটুকু জেনে নিলে আধ্যাত্মিক জীবন যাত্রার চলার পথে রসদে ঘাটতি পড়ে যায়। রসদ বাড়াবার জন্য আরও অনেক কিছু বিশদ ভাবে জানার প্রয়োজনীয়তা থেকেই যাচ্ছে। অষ্টম অধ্যায়ে দেখান হয়েছে যোগীরা দেহত্যাগের সময় কিভাবে ঈশ্বরকে লাভ করেন মানে কিভাবে তাদের মুক্তি হয়। অষ্টম অধ্যায়ে মূল আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু ছিল এইটাই। তখন সেখানে ব্যাখ্যা করে বোঝাবার জন্য বলা হচ্ছে, যে মুক্তি চাইছে তাকে কয়েকটি জিনিষ বুঝে নিতে হয়। আমাদের ভাষায় সেগুলো হচ্ছে জড় কি, চৈতন্য কি, ভগবান কি, আত্মা কি। এই জিনিষ গুলোকে জেনে নিয়ে সেই অনুসারে মুক্তিপথগামীকে জীবন-যাপন করতে হয়। আর মৃত্যুকালে, যখন সে বুঝে গেল আমার অন্তিম সময় এসে গেছে, তখন সে বিশেষ ভাবে ধ্যান করতে থাকে। ঐভাবে ধ্যান করতে করতে শরীর চলে গেলে, যারা জ্ঞানমার্গের সাধক তাঁরা মুক্তির দিকে চলে যান, আর যাঁরা কর্মোপসাক তাঁরা যেমন যেমন কর্ম করেছেন সেই অনুসারে খুব উচ্চ লোকে চলে যান, সেখানে গিয়ে ভোগটোগ করার পর আবার ফেরত চলে এসে আবার কর্ম করতে করতে উপরে দিকে অর্থাৎ মুক্তির দিকে এগোতে থাকেন। এই ভাবে মুক্তির পথে যেতে তাঁদের সময় বেশি লাগাটাই স্বাভাবিক। সেইজন্য যারা এখন প্রচুর জপ-ধ্যান করছে, তারা যে এই জন্মেই এত জপ-ধ্যান করতে শুরু করেছেন তা নয়, এর আগের আগের জন্ম থেকেই করে আসছেন।

যারাই গীতা অধ্যয়ন করছেন, শুনছেন, মানছেন, তাদেরকে এটা বিশ্বাস করতেই হবে যে, সৃষ্টি অনাদি কাল থেকে চলে আসছে, জীবাত্মা এই সৃষ্টির মধ্যে অবিরত ঘুরপাক খেয়ে চলেছে। এই তত্ত্ব বা ধারণাকে যে বিশ্বাস করছে না, গীতা কিন্তু তার জন্য নয়। তাদের সেই ধর্মে যেতে হবে যে ধর্ম বিশ্বাস করে যে, সবারই এই একটাই জন্ম আর এই জন্মে মৃত্যুর পরই সব শেষ। যদি আমি মানি যে সৃষ্টি অনাদি, আর এই সৃষ্টির মধ্যে আমি অসংখ্য বার জন্ম নিয়েছি আর অসংখ্য বার আমি মরেছি, আর এই জন্ম-মৃত্যুর মধ্য দিয়েই আমার ক্রমোন্নতি হচ্ছে, তবেই গীতা আমার জন্য। ক্রমোন্নতি এই শব্দটাতে এই কথাই বলা হচ্ছে যে, সব মানুষই মুক্তির দিকে এগিয়ে চলেছে, এগোবার পথে চলতে চলতে কখন একটা হোঁচট খেয়ে নীচে পড়ে গেল, আবার উঠে দাঁড়িয়ে আবার উপরের দিকেই চলতে শুরু করে। এই ভাবে চলতে চলতে একটা অবস্থা আসে, যেখানে এসে সে ঠিক ঠিক কর্ম করতে শুরু করে, মানে ধর্ম কর্মে মন দেয়, যজ্ঞ-যাগ করে, দান-ধ্যান করে। এইসব করে সে স্বর্গে যায়, সেখানে ভোগ করে, ভোগ শেষ হয়ে গেলে আবার এসে জন্ম নেয়। আবার এইভাবে চলতে চলতে একটা সময়ে এসে সে জ্ঞানমার্গের সাধনা করতে শুরু করে। জ্ঞানমার্গের সাধনা করা মানে, যেখানে সে বিচার করতে শুরু করে জড় বলতে কি, চৈতন্য কি, জড় আর চৈতন্যের কি সম্পর্ক। বিচার করতে করতে যখন মৃত্যুর সময় আসে তখন এই চিন্তনটাকেই মাথায় রেখে সে শরীর ত্যাগ করে। এরপর তার জীবাত্মা মুক্তির দিকে এগিয়ে যায়, সে আর এই পার্থিব জগতে ফিরে আসে না।

এই দুটোর বাইরে একটা তৃতীয় শ্রেণী আছে, এরা হচ্ছে সাধারণ মানুষ, যারা ভোগেই লিপ্ত হয়ে আছে। এদের কি হবে? কিছুই হবে না, কাল মরবে আবার কিছু দিন পরেই জন্ম নেবে। কত দিন এইভাবে চলবে? হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ জন্ম এইভাবে চলতে থাকবে। এই তিন শ্রেণীর বাইরে আরকটি চতুর্থ শ্রেণী আছে যারা জীবন মুক্ত। এনারা এই জীবনে এত গভীর আর কঠোর সাধনা করেছেন যে এই জীবনেই তাঁরা মুক্তি পেয়ে যান। বেদান্তের মূল লক্ষ্যও হছে এই জীবনমুক্ত হওয়া। জীবনমুক্তি না হলে বেদান্ত ঠিক সেই রকম খুশি হয় না। মৃত্যুর পর মুক্তি হলে বলবে এটা মন্দের ভালো, কাশীতে মরলে মুক্তি হল এটা যেন বেদান্তে ঠিক জমে না। বেদান্তে জমবে কখন? তুমি যদি ছোটবেলা থেকে ঈশ্বরই সত্য আর জগৎ মিথ্যা এই ধারণাকে মাথায় রেখে সব কিছু ত্যাগ করে গভীর ভাবে কঠোর সাধনা করে তিরিশ বছর কি পয়ত্রিশ বছর বয়সে তুমি মুক্তি লাভ করে নাও। কিন্তু মানুষ পারেনা, বুড়ো বয়সেও ঈশ্বরের দিকে মন না দিয়ে বাকি পঞ্চাশটা জিনিষে জড়িয়ে থাকে। যদি না জড়িয়ে থাকে তাহলে জড়াবার ব্যবস্থা করে নেওয়া হয়। যার জন্য ঠাকুর বলছেন, মহামায়া কিছু না হলে একটা বেড়াল পুষিয়েও তাকে দিয়ে সংসার করিয়ে নেন। মহামায়া আর কি করাবে, একটা সম্বল না থাকলে মানুষ থাকতে পারেনা, তাই একটা সম্বল জোগাড় করে নেয়। সম্বল আর কি, একটা বেড়াল, না হয় একটা কুকুর তা নাহলে কয়েকটা পাখি খাঁচায় পুরে সেটাকেই সম্বল করে নেবে। এসব না করলে একটা ব্যবসা শুরু করে দেবে, আজকাল তো শেয়ার মার্কেটের রমরমা কারবার, হয়তো তাতেই টাকা ঢেলে খবরের কাগজ আর ফোনের মাধ্যমে খোঁজ নেবে শেয়ারের দাম বাড়ল না কমল। কিছু একটা করে নেবে, আর তাতেই ফেঁসে থাকবে। তাহলে মুক্তি হবে কোথা থেকে। মুক্তি হবে কার? যে মুক্তি চাইছে। যারা একটু ধর্ম পথে এসেছে তারা কয়েকটা শাস্ত্রের কথা শুনে, সাধুদের দু একটা ভাষণ শুনে বলছে হ্যাঁ, আমি মুক্তিই চাই। আসলে কিছুই চাইছে না, সুযোগ পাচ্ছে না বলে, সুযোগ পেলেই ভোগে ঝাঁপিয়ে পড়বে।

কিন্তু এর পরে সমস্যা হচ্ছে, আমাদের মত যারা কিছু শাস্ত্র অধ্যয়ণ করে নিয়েছে, আমরা মনে করছি এইভাবে জন্মাব আর মরব এটা যেন এখন আর ঠিক মন থেকে সায় দিচ্ছে না, আবার অন্য দিকে জীবনমুক্ত হওয়াটাও কেমন যেন হাতের বাইরে মনে

হয়, কারণ অনেক ভোগ বাসনা এখনও ভেতরে গিজ্গিজ্ করছে। জীবনে আমাদের এখনও কোন কিছুই ত্যাগ করতে পারছি নি, আবার অন্য দিকে যারা সর্বস্ব ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হচ্ছে তাদেরকে পলায়নবাদী বলতেও ভ্রূক্ষেপ করিনা। যদি জগৎ এদের আদর করতে এগিয়ে আসে তক্ষুনি দু-বাহু মেলিয়া তাকে জড়িয়ে ধরবে, এরা আবার ত্যাগের কথা বলে। যুবক ছেলেরা সব কিছু ছেড়ে সন্ন্যাসীর আদর্শ নিচ্ছে এদের ত্যাগের মূল্য এই সব লোকের চোখেই পড়বে না, তখন বলছে এরা সব পলায়নবাদী। কিন্তু এদের মধ্যেও যারা ভাবছে আমি অতটা ভোগীও হব না, সব কিছু ত্যাগও করতে পারছি না, জীবনমুক্ত হওয়া তো সম্ভবই না, আর মৃত্যুর সময় ধ্যানে বসে গিয়ে মনটাকে ভ্রূর মধ্যে নিয়ে আসা ইত্যাদি করব, বাবাঃ এই জিনিষ তো আমার পক্ষে সম্ভব হবে না। তাহলে এ ছাড়া কি আর কোন পথ নেই? ভগবান এই শঙ্কাটাকে সরাবার জন্যই এই নবম অধ্যায়কে বেছে নিয়েছেন। অষ্টম অধ্যায়ে যে কটি মুক্তির পথ বলা হয়েছে, শুধু এই কটি পথই নেই, এর বাইরে অন্য অনেক পথও আছে। নবম, দশম, একাদশ, দ্বাদশ অধ্যায়ে আরও আলাদা আলাদা পথ ভগবান দেখাবেন। নবম অধ্যায়ে নতুন পথের কথা বলার আগে ভগবান বলছেন –

শ্রীভগবানুবাচ

**ইদং তু তে গুহ্যতমং প্রবক্ষ্যাম্যনসূয়বে। জ্ঞানং বিজ্ঞানসহিতং যজ্জ্ঞাত্বা মোক্ষসেহশুভাৎ।।১।।**

হে অর্জুন, তোমার দোষদৃষ্টি নেই, সেইজন্য তোমাকে অতি গুহ্য একটা উপদেশ দেব, এই উপদেশ হচ্ছে *জ্ঞানং বিজ্ঞানসহিতং*, জ্ঞান ও বিজ্ঞান যুক্ত। এই উপদেশ তুমি প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করতে পারবে। তোমাকে আমি দেখিয়ে দেব এই উপদেশকে কি ভাবে উপলব্ধি করা যায়। এখানে বিজ্ঞানের অনেক কিছুর অর্থ করা যেতে পারে, বিজ্ঞানের একটা অর্থ হচ্ছে প্রত্যক্ষ জ্ঞান, আরেকটা হতে পারে সাক্ষাৎ অনুভব। জ্ঞান ও বিজ্ঞান যখন একসাথে গীতায় উল্লেখ করা হয়, তখন এর একটা অর্থ হতে পারে সম্পূর্ণ জ্ঞান, এই জ্ঞানে কোন লুকোচুরির কিছু থাকবে না, এই জ্ঞানকে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করা যেতে পারে। এরপর বলছেন *যজ্জ্ঞাত্বা মোক্ষসেহশুভাৎ*, অশুভ থেকে তুমি মুক্তি পেয়ে যাবে। এখানে অশুভ মানে সংসার আর মুক্তি মানে জন্ম-মৃত্যুর চক্র থেকে বেরিয়ে আসা। অশুভ বলতে আমাদের মনের আবর্জনাও হতে পারে। কিন্তু এই অধ্যায়ের সামগ্রিক চিত্রের সাথে সঙ্গতি রেখে অশুভ শব্দের অর্থ হয়ে যাবে সংসার। এর পরে ভগবান বলছেন –

**রাজবিদ্যা রাজগুহ্যং পবিত্রমিদমুত্তমম্। প্রত্যক্ষাবগমং ধর্ম্যং সুসুখং কর্তুমব্যয়ম্।।২।।**

তোমাকে যে জ্ঞানের কথা বলব, এই জ্ঞান প্রত্যক্ষ অনুভবযুক্ত, সাক্ষাৎ চোখের সামনেই তুমি দেখতে পাবে। তার মানে মৃত্যুর পরে আমি জানতে পারব তা নয়, এই জ্ঞানকে প্রত্যক্ষ অনুভব করার জন্য তোমাকে মৃত্যু পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে না। এই যে বলা হয় কাশীতে মরলে মুক্তি, কিন্তু কাশীতে মরলে মুক্তি হল কি হল না এটা আমি কবে জানতে পারব? মৃত্যুর পরই আমি জানতে পারব যে আমার মুক্তি হল। কিন্তু মরার পর আমার কি হল আমি কি করে জানব, সেটা তো না জানার মতই হল। ইসলাম ও খ্রীশ্চান ধর্মে লোক মারা যাওয়ার পর স্বর্গে বা নরকে যায়, মরার পর স্বর্গে গেল কি গেল না, আমরা কি করে জানব, জানার তো কোন উপায় নেই। কিন্তু এই নবম অধ্যায়ে ভগবান বলছেন, তুমি একেবারে চোখের সামনে প্রত্যক্ষ দেখতে পাবে। তবে গীতা থেকে থেকেই ব্রহ্মজ্ঞানের প্রশংসা এই ভাবেই করবে, যা উপলব্ধি হবে সেটা তোমার চোখের সামনেই দেখতে পারবে। আর বলছেন, এই জ্ঞান *সুসখম্*, এই জ্ঞান অতি সহজসাধ্য, এর মধ্যে জটিলতা বলে কিছু নেই। *রাজবিদ্যা রাজগুহ্যং*, এই বিদ্যা হচ্ছে রাজকীয়, রাজপথ বরাবর যেমন সোজা থাকে, কোনও ট্যারাব্যাকা থাকে না, এই বিদ্যাতেও কোন ট্যারাব্যাকা কিছু পাওয়া যাবে না এবং অতি গুহ্য। *গুহ্যম্* এখানে হচ্ছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, সিবিআই আর মন্ত্রী এমএলএদের মধ্যে যেমন অনেক গুহ্য ব্যাপার থাকে এখানে সেই গুহ্যের কথা বলা হচ্ছে না। বাবা-মা যেমন গুহ্য কথা বলেন যেটা বাচ্চাদের জানার কথা নয়, সেই গুহ্যের কথাও এখানে বলা হচ্ছে না। এই জ্ঞানের আর কি বৈশিষ্ট্য? *পবিত্রম্ ইদং উত্তমম্*, এটি অত্যন্ত পবিত্রকারি। পবিত্র করার জিনিষ অনেক আছে, স্নানের সময় সাবান মাখি, সাবান পবিত্র করছে, গঙ্গাজল মাথায় ছিটাই ও পান করি, গঙ্গাও পবিত্র করছে কিন্তু যে জ্ঞানের কথা তোমাকে বলতে যাচ্ছি, পবিত্র করে এমন যা কিছু আছে তার মধ্যে এই জ্ঞান পবিত্রতম। *ধর্ম্যং*, এই জ্ঞান কিন্তু শাস্ত্রবিরোধী নয়, পুরোপুরি শাস্ত্রসম্মত।

ভগবান তো এই জ্ঞানের এত প্রশংসা করছেন তবে সবাই জানে না কেন, আর জানতে চায়ও না কেন? নিশ্চয়ই কোন লুকনো কোন রহস্য আছে। কিন্তু এই জ্ঞান হচ্ছে পরিষ্কার খোলাখুলি। তবে অনেক সময় দেখা যায়, অনেক জ্ঞানের মধ্যে প্রচুর ভালো ভালো জিনিষ পাওয়া যায়, কিন্তু ঐ জ্ঞান হয়তো ধর্মবিরোধী। যেমন, যদি কাউকে ব্যাঙ্ক ডাকাতি শিখিয়ে দেওয়া হয়, এখন এই বিদ্যাটা আয়ত্তে এসে গেলে অনেক টাকা হাতে এসে যাবে, হাতে অনেক টাকা এসে গেলে সেই টাকা দিয়ে সাধু সেবা করা যায়, জনকল্যাণমূলক কাজ করা যায়। কিছু দিন আগে একটা খবরে দেখাচ্ছিল বড় বড় বাবাজীরা প্রচুর ক্রিমিনালদের তাদের আশ্রমে আশ্রয় দিচ্ছে তার বদলে অনেক টাকা নিচ্ছে, সেই টাকা দিয়ে জনকল্যাণে ব্যয় করা হচ্ছে। এটা খুবই ভালো কাজ, ক্রিমিনালদের আশ্রয় দিয়ে তাদের জীবন রক্ষা করা হচ্ছে আবার তাদের টাকা দিয়ে মানুষের সেবায় লাগান হচ্ছে। কাজটা ভালো হতে পারে কিন্তু অধর্ম হয়ে যাচ্ছে। এই জ্ঞানে অধর্মের কিছু নেই।

জগতে দেখা যায় যে কাজটা অল্প পরিশ্রমে করা হয়েছে তার ফলটা অল্প আর যে কাজটা বেশি পরিশ্রম করে করা হয়েছে সেই কাজের ফলটা ভালো, এই যে বিদ্যাটা এখানে বলা হচ্ছে এটি অতি সুগম। যেমন কিছু বিদ্যা আছে বোঝা ও আয়ত্ত করা খুব কঠিন মনে হয় আবার কিছু বিদ্যা আছে খুব সহজেই বোঝা যায়। কিন্তু তাই বলে মনে করা ঠিক হবে না যে এই বিদ্যা অতি সুগম আর সহজে আয়ত্ত করা যায় বলে এর ফলও সামান্য, ভগবান নিজেই বলছেন এই বিদ্যা অনুষ্ঠানের ফল *অব্যয়ম্*, এর ফল কখনই ক্ষয় হবে না। এই বিদ্যার এত সব প্রশংসা করা হচ্ছে, এটা এক প্রকার গ্রন্থস্তুতি, গ্রন্থস্তুতি করে আমাদের মনটাকে টেনে নিয়ে আসা হচ্ছে। খুব ভালো জিনিষ তোমাকে দেওয়া হচ্ছে, খুব মঙ্গলযুক্ত, আর এই জ্ঞান যদি তুমি একবার ধারণা করে নাও তাহলে এর ফল তুমি সব সময়ই পাবে, কারণ এই জ্ঞানের ফল অব্যয়, এর কোন ক্ষয় নেই, তুমি চিরদিনের মত মুক্ত হয়ে যাবে। এরপর যারা এই বিদ্যাকে মানে না, মানতে চায় না, জানতে চায় না, তাদের কথা বলছেন –

**অশ্রদ্দধানাঃ পুরুষা ধর্মস্যাস্য পরন্তপ। অপ্রাপ্য মাং নিবর্তন্তে মৃত্যুসংসারবর্ত্মনি।।৩।।**

যারা এই বিদ্যাকে, এই বিদ্যার কথাগুলোকে অশ্রদ্ধা করে, বুঝতে হবে এদের মধ্যে আস্তিক ভাব নেই, এরাই হচ্ছে নাস্তিক। এখানে নাস্তিক কথার অর্থ হচ্ছে যারা ঈশ্বরের কথাতে বিশ্বাস করে না। আমাদের দর্শনে আস্তিক কথার ঠিক ঠিক অর্থ হচ্ছে যারা বেদ মানেনা, কিন্তু এখানে নাস্তিক কথার অর্থ হচ্ছে যারা ভগবানের কথায় বিশ্বাস করে না। যারা ধর্মের কথা বিশ্বাস করেনা, যারা দেহমাত্রকে নিজের আত্মা বলে বোঝে, আত্মা এরাও মানে, কিন্তু এরা ইন্দ্রিয়কেই আত্মা মানে, তাই দেহের সব ভোগের কাজে এরা নিজেদের লাগিয়ে দিচ্ছে। এরা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যের বাইরে কিছু বুঝতে চায় না, তাই এদের ভগবানের দিকে মন যায় না। ভগবানের দিকে মনই যদি না থাকে তাহলে ভগবানকে পাওয়ারও কোন প্রশ্নই আসে না। সেইটাই এখানে বলছেন, *অপ্রাপ্য মাং*, আমাকে না পেয়ে এরা *নিবর্তন্তে মৃত্যুসংসারবর্ত্মনি*, এই জন্ম-মৃত্যুরূপী সংসারের মধ্যেই ঘুরতে থাকে। ঘুরতে ঘুরতে কখন উপরে যাচ্ছে কখন নীচে পড়ে যাচ্ছে।

এখন যদি সবাইকে বলা হয় প্রত্যেককে দশ লাখ করে টাকা দেওয়া হবে কিন্তু তার আগে যার যা কিছু আছে সব নিয়ে নেওয়া হবে। এখন যার কাছে যা কিছু আছে তার মূল্য দু লাখ টাকা, সে দেখবে আমার দু লাখ টাকা চলে যাবে কিন্তু আমি দশ লাখ টাকা তো পেয়ে যাব। কিন্তু যার সব কিছুর মূল্য পঞ্চাশ লাখ টাকা, তাকে তো হতাশা এসে গ্রাস করে নেবে, চল্লিশ লাখ টাকার সম্পদ তার হাত থেকে চলে যাচ্ছে। যোনির ক্ষেত্রে ঠিক তাই হয়। যোনিতে কিছু লোক নীচু থেকে উপরে এসেছে, কিছু লোক উপর থেকে নীচে এসেছে। যে নীচু যোনি থেকে ভালো কোন যোনিতে জন্ম নেয় সে ভাবে বেশ আছি, সে এক লাখ থেকে দশ লাখে এসেছে। আবার কিছু আছে যে এক কোটি থেকে দশ লাখে এসেছে। সে নিজেও বুঝতে পারছে না, কিন্তু ভেতরে ছটফটানি একটা হতেই থাকবে। আজ পর্যন্ত কাউকে বলতে দেখা যায়নি যে, আমার প্রচুর টাকা হয়ে গেছে তাই আমার মধ্যে হতাশা এসে গেছে। কিন্তু টাকা নেই হতাশা আছে, বিয়ে হচ্ছে না হতাশা আছে, বিয়ে হয়ে গেছে তাও হতাশ হচ্ছে, সন্তান হচ্ছে না হতাশা আছে, এমন সন্তান হয়েছে যে তার জন্য সব সময় উদ্বিগ্ন হয়ে আছে, জগতে সব কিছুর জন্য হতাশার ভাব আছে কিন্তু এখনও পর্যন্ত জগতে এমন কাউকে দেখা যায়নি যে বলছে আমার অনেক টাকা হয়ে গেছে এর জন্য আমি হতাশাগ্রস্ত হয়ে আছি। টাকা আমাদের সবার প্রাণ, কিছুতেই ছাড়তে চাইব না। যোনির ক্ষেত্রে যখন উপর থেকে নীচে চলে যায় তখন অবস্থা খুবই শোচনীয় হয়, নিজেও বুঝতে পারে না কেন মন খারাপ লাগছে। মন খারাপের কারণকে যদি অনুসন্ধান করা হয়, তাহলে দেখতে পাওয়া যাবে যে হয়তো তিন ঘণ্টা আগে তার সাথে কেউ দুর্ব্যবহার করেছে, কিংবা কেউ হয়তো কোন কটূ কথা বলেছে। ভেতরে ভেতরে এটা কাজ করতে থাকে। অনেক সময় কোন মানুষ হয়তো কোন অশান্তিতে ভুগছে, কিছুতেই মনে শান্তি পাচ্ছে না, সব সময় খিঁচখিঁচ করে যাচ্ছে, কিছুই তার ভালো লাগছে না। তার মানেই হচ্ছে, সে এমন কোন পাপ কর্ম করেছে যার ফলে সে ওপর থেকে নীচে নেমেছে। এখন যেখানে আছে সেখানে মনের মত পরিবেশ পাচ্ছে না বলে তৃপ্ত হতে পারছে না, তার ফলে সে শান্তি পাচ্ছে না। কিছু কিছু কুকুর আছে সব সময় ঘেউ ঘেউ করে যায়, আবার কিছু কিছু কুকুর শান্ত শিষ্ট হয়ে থাকে। যে শান্ত শিষ্ট হয়ে আছে বুঝতে হবে সে বেড়াল বা বেজী থেকে কুকুর হয়েছে, আর যে কুকুর সব সময় অশান্ত হয়ে ছটফট করছে আর যাকে তাকে ঘেউ ঘেউ করছে বুঝতে হবে সে উপর থেকে নীচে নেমেছে, বাঘ, সিংহ থেকে এবার কুকুর হয়েছে।

এখন যদি কেউ মনে করে আমি যদি হতাশাগ্রস্ত হয়ে আত্মহত্যা করি তাহলে তো আমার বোধ থাকবে না। না, বোধ অবশ্যই থাকবে। আত্মহত্যা করলে প্রেতযোনীতে গিয়ে অনেকদিন থাকার পর মশা মাছি হয়ে জন্মাবার পরও কিন্তু সে শান্তিতে থাকতে পারবে না। শান্তিতে না থাকার ফলে তাকে আরও নীচে পাঠিয়ে দেবে। মানুষ যখন মনে করে আমার জীবনে কোন কিছুই ভালো লাগছে না, এই ভালো না লাগার জায়গাটা থেকেই কিন্তু তার ধর্ম শুরু হয়। তোমার কোন কিছু ভালো লাগছে না মানেই হচ্ছে তুমি ওপর থেকে নীচে পড়েছ। আর এই ভালো না লাগাকে যদি তুমি এক্ষুনি কাজে না লাগিয়ে ধর্মের দিকে মন না দিয়ে হতাশায় পড়ে থাক তাহলে তুমি এর থেকে আরও নীচে পড়বে। যখন সাপ ব্যাঙ হবে তখন আরও খারাপ লাগবে, তুমি নিজেও বুঝতে পারবে

না। এর পরেও যদি মন থেকে হতাশা ভাব না চলে যায়, পরের জন্মে সে গাছপালা হয়ে জন্মাবে। গাছপালা হয়ে যদি তখনও ভালো না লাগে, তখন তুমি ভালো ফল যদি না দিতে পার, ভালো ফল না দিলে মানুষ এসে বলবে, এই গাছটা কোন ফলটল দেয় না দে গাছটাকে কেটে। এইভাবে আরও নীচে যেতেই থাকবে। তারপর হয়তো পাথর হয়ে পড়ে থাকবে। পাথর হয়েও ভালো লাগছে না, তখন ডিনামাইট দিয়ে ফাটিয়ে রাস্তার খোয়া বানিয়ে দেবে আর তোমার উপর দিয়ে দিনরাত ভারী ভারী সব ট্রাক গুলো চলতে থাকবে। এইটাই জগতের নিয়ম, জীবাত্মা যখন ওপর থেকে নীচে পতন হয়ে যায় তখন সে এক অসন্তুষ্টির অবস্থায় চলে যায়, নীচ থেকে যখন উপরে যায় জীবাত্মা সন্তুষ্ট থাকে। একটা নকল সোনার মোহর বলছে – আমি নকল সোনার মোহর হওয়ার ফলে জগতকে অন্যদের তুলনায় অনেক বেশি দেখেছি, আসল হলে এত বেশি জগৎ দেখতে পারতাম না। কারণ আসল মোহরকে মানুষ সামলে রাখে, নকল বলে তাড়াতাড়ি অন্যকে গচিয়ে দেওয়া দেওয়ার চেষ্টা থাকে। মানুষ যখন একটা জায়গায় নিজেকে অনুপযুক্ত দেখে তখন তার নড়াচড়া শুরু হয়ে যায়। ঠাকুর বলছেন – যে পায়ের উপর পা তুলে মনে করছে বেশ আছি, এদের দ্বারা কিছুই হবে না। এরা এখন নিম্ন যোনি থেকে উপরে এসেছে তাই এরা এখন সুখ ভোগ করছে। নীচু যোনি থেকে ওপরে যাওয়ার চেষ্টা কে করে? যার ওপরের বোধ আছে, এর ওপরেও একটা অবস্থা আছে। যারাই জীবনে উন্নতির চেষ্টা না করে, তারা কিন্তু আরও নীচে পড়ে যাবে। সেইজন্য শ্রীকৃষ্ণ এখানে বলছেন, আমাকে যদি এরা না পায় তাহলে *মৃত্যুসংসারবর্ত্মনি*, তার আধ্যাত্মিক চেতনা যদি না জাগ্রত হয় তাহলে গোত্তা খেতেই থাকবে।

ভগবান বলছেন আমাকে না পেলে এরা সবাই এই মৃত্যুরূপা সংসারে ঘুরপাক খেতেই থাকবে। যে ভগবানকে পাওয়ার কথা বলছেন, এখন এই ভগবানের পরিচয়টা কি, অর্থাৎ তাঁর স্বরূপটা কি, ভগবানের কার্যটা কি রকম? এর পর ভগবানের স্বরূপ সম্বন্ধে কিছু কিছু বর্ণনা করা হচ্ছে। এর আগে সপ্তম অধ্যায়ে ভগবান তাঁর স্বরূপের কিছু কিছু বর্ণনা করেছিলেন, অষ্টম অধ্যায়ে খুব অল্প একটু বর্ণনা করেছেন, কিন্তু এই নবম অধ্যায় থেকে দ্বাদশ অধ্যায় পর্যন্ত ভগবান পুরোপুরি নিজেকে মেলে দিয়েছেন, ভগবান নিজের কথাই বলে যাবেন।

**ময়া ততমিদং সর্বং জগদব্যক্তমূর্তিনা। মৎস্থানি সর্বভূতানি ন চাহং তেষ্বস্থিতঃ।।৪।।**

*জগদব্যক্তমূর্তিনা*, ভগবান বলছেন আমার যে স্বরূপ এটা হচ্ছে অব্যক্ত। অব্যক্ত মানে হচ্ছে, মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়ে দিয়ে যেটাকে জানা যায় না সেটাই হচ্ছে অব্যক্ত। যারা ভগবান মানে না, ভগবান বলে কিছু আছে নাকি, যদি ভগবান বলে কেউ থেকে থাকে তাহলে এসে দেখা দিক। ভগবান তো তোমাকে দেখা দেবেন, তিনি তো তোমাকে দেখা দেবার জন্য সর্বদা উদ্‌গ্রীব হয়ে আছেন, ইচ্ছে করলেই তিনি তোমার সামনেই দাঁড়িয়ে যাবেন কিন্তু তুমি কি তাকে এই চোখ দিয়ে অবলোকন করতে পারবে? তুমি পারবে না তাকে এই চোখ দিয়ে দেখতে, কারণ ভগবান হচ্ছে *জগদব্যক্তমূর্তিনা*, অব্যক্ত বলতে এখান নৈর্ব্যক্তিক ভগবানকে বোঝাচ্ছে না। যদি কেউ এসে বলে ইলেক্ট্রন প্রোটন বলে যদি কিছু থাকে তাহলে আমাকে দেখিয়ে দিক, আরে বাবা ইলেক্ট্রন প্রোটনকে তোমাকে দেখাতে হলে সেই রকম মাইক্রোস্কোপের দরকার পড়বে। যদিও দেখান হয় তাও দেখতে পারবে না ওর কার্যগুলিকেই দেখতে পারবে। এই জগতে সব কিছু এই স্থূল চোখ দিয়ে দেখা যায় না। ভগবানের ক্ষেত্রে এই একই সমস্যা। তোমার এই মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় দ্বারা ভগবানের দর্শন হয় না। তার জন্য তোমার বিশেষ ইন্দ্রিয়, বিশেষ মন দরকার।

*মৎস্থানি সর্বভূতানি ন চাহং তেষ্বস্থিতঃ*, বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে যা কিছু আছে, ছোট থেকে বড়, সবটাই *মৎস্থানি*, মানে আমাকে আশ্রয় করে আছে। এই জলটা যেমন এই বোতলকে আশ্রয় করে আছে, ঠিক এই বোতলের মত, জগতে যাবতীয় যা কিছু আছে সব আমাকেই আশ্রয় করে থাকে। যা কিছুর প্রতীতি হচ্ছে, এই আমার সামনে এত লোকজন দেখছি, কেন দেখছি? আমার মধ্যে তিনি অন্তর্যামী রূপে বিরাজ করে আছেন বলে, আমাকে তিনি আশ্রয় করে আছেন বলেই সব কিছু আমার কাছে প্রতীতি হচ্ছে। তারপরেই বলছেন, *ন চাহং তেষ্বস্থিতঃ*, কিন্তু কোন কিছুর মধ্যেই আমি অবস্থিত নই, এইখানে আবার বিপরীত কথা এসে যাচ্ছে। প্রথমে বললেন, সমস্ত জীবের মধ্যে যে প্রাণের প্রতীতি হচ্ছে, সবার মধ্যে জীবন চলছে এটা চলছে আমি এদের মধ্যে আছি বলে, এখন বলছেন আমি কিন্তু এদের কারুর মধ্যে নেই। এই বিপরীত তত্ত্বটাকেই ভগবান আবার পরে ব্যাখ্যা করবেন।

এই বোতলের মধ্যে যে জল আছে, এই জল আর বোতলের মধ্যে একটা সংসর্গ আছে, দুটো বস্তুই জড়, এই সংসর্গ হচ্ছে জড়ের সাথে জড়ের সম্পর্ক, কিন্তু জড় আর পরমাত্মা এই দুটোর সঙ্গে কখনই সম্পর্ক হতে পারেনা, কারণ দুটোই বিপরীত ধর্মী। সেইজন্য ভগবান বলছেন আমি ওখানে বাস করি না। এই শরীরের মধ্যে ঈশ্বরের বাস, এখন কেই যদি এই শরীরকে চিড়ে দেখতে চায় ঈশ্বর এই শরীরের কোথায় অবস্থিত, সে কোন দিন এইভাবে ঈশ্বরকে দেখতে পারবে না। কেন বাস করিনা পরপর কয়েকটি শ্লোকের মাধ্যমে পরিষ্কার করা হবে।

**ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্। ভূতভৃন্ন চ ভূতস্থো মমাত্মা ভূতভাবনঃ।।৫।।**

গীতার এই ধরণের কয়েকটি শ্লোক তত্ত্বের দিক দিয়ে অত্যন্ত গূঢ়, এর ভাবার্থকে প্রথম প্রথম যারা গীতা অধ্যয়ন করতে যান তাদের পক্ষে ধরা খুব কঠিন। দর্শনের দিক থেকে এই শ্লোক গুলো খুবই কঠিন। অনেক দিন ধরে গীতা ভাষ্যাদি সহ অধ্যয়ন করতে থাকলে আর তার ভাবার্থকে নিয়ে অনেক দিন চিন্তন করতে থাকলে আস্তে আস্তে শ্লোকের অর্থ গুলো পরিষ্কার হতে থাকে। *পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্* আমার যে যোগৈশ্বর্য, আমার যে মাহাত্ম্য সেটা তুমি দেখ। আমার কি রকম মাহাত্ম্য? যাবতীয় যা কিছু ভূত আছে সবই আমার মধ্যে অবস্থিত, অথচ কোন কিছুই আমার মধ্যে নেই, এদের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই, এইটাই হচ্ছে যোগমায়া।

আচার্য শঙ্কর খুব সহজ করে এই জায়গাটাতে ব্যাখ্যা করে বলছেন – ঈশ্বর আর তাঁর সৃষ্টির মধ্যে সম্পর্ক হচ্ছে মরুভূমি আর তার মরীচিকার জল। মরুভূমি হচ্ছে বালির সমুদ্র, মরুভূমির সাথে বালির একটা প্রত্যক্ষ সংযোগ আছে কিন্তু মরীচিকার সাথে মরুভূমির কোন সম্পর্ক নেই। মরুভূমি আছে বলেই মরীচিকা আছে। মরুভূমি যদি না থাকত তাহলে মরীচিকা দেখা যেত না। মরীচিকাতে যে জলের প্রতীতি হচ্ছে সেই জলে মরুভূমির এক কণা বালিও ভিজবে না, কারুর তৃষ্ণা নিবারণ করা যাবে না। ঈশ্বর আর তাঁর সৃষ্টির মধ্যে ঠিক এই সম্পর্ক। সেইজন্য এখানে বলছেন *মৎস্থানি সর্বভূতানি ন চাহং তেষ্বস্থিতঃ,* সব কিছুই আমার মধ্যে অথচ আমি কোন কিছুর মধ্যেই নেই, মরুভূমির মধ্যে মরীচিকা আছে অথচ মরীচিকাতে মরুভূমি নেই, মরুভূমি আছে বলেই মরীচিকা দেখা যাচ্ছে। বেদান্তের এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপর্ণ তত্ত্ব। এই জগতে যা কিছু দেখা যাচ্ছে ঈশ্বর ছাড়া কিছু নেই। ঠাকুরকে একজন বলছেন, আমাদের কত কষ্ট। ঠাকুর বলছেন – তিনি ছাড়া আর কে আছেন, সে তো তুমি বোধ করছ তুমি কষ্ট পাচ্ছ। একটা দুটো কথার পর ঠাকুরকে সেই ভক্ত বলছেন – তাঁর তো লীলা কিন্তু আমাদের প্রাণ যায়। তখন ঠাকুর বলছেন – তুমি মানো আর নাই মানো, তুমি সেই রাম, রাম ছাড়া আর কিছু নেই। মরীচিকা বলতে কি বোঝায়, একটা নাম আর রূপ বই আর কিছু নয়। আমাদের ক্ষেত্রে আমার একটা নাম আমার একটা আকৃতি, এইটাই নাম আর রূপ, এইটাই মরীচিকা। আসলে সবই হচ্ছে সেই সচ্চিদানন্দ, আসলে সবটাই মরুভূমি, সেই মরুভূমিতে মরীচিকাতে জল দেখা যাচ্ছে। এইজন্যে ভগবান প্রথমে বললেন *মৎস্থানি সর্ভূতানি*, যাবতীয় যা কিছু আছে সব আমাতেই অবস্থিত, তারপরেই বলছেন, *ন চাহং তেষ্বস্থিতঃ,* আমি কোন কিছুতেই নেই। কি করে থাকবে? এতো সেই মরুভূমি আর মরীচিকার জল। *ভূতভৃন্ন চ ভূতস্থো,* আমার জন্যই সব চলছে, আমিই এদের ধারক ও জনক, আমি আছি বলেই এরা বড় হচ্ছে, এরা কাজ করছে, এরা খাওয়া দাওয়া করছে।

যখন মানুষ লৌকিক বুদ্ধির আচরণ করে তখন বলে আমার আত্মা এই করতে চাইছে, আমার আত্মা তোমার আত্মা থেকে আলাদা। এই যে ভাব আমি আলাদা তুমি আলাদা, এই ভাবগুলো সবই হচ্ছে মিথ্যা জ্ঞান, অজ্ঞান প্রসূত। মূল কথা বলতে চাইছেন, ঈশ্বর ছাড়া আর কিছু নেই। এরপরে বলছেন, মানুষের ভেতরে যে ভগবান ঢুকে বসে আছেন এটা কখনই সম্ভব নয়। কেন সম্ভব নয়? কারণ জড়ের মধ্যে কখন চৈতন্য থাকতে পারেনা। তাহলে যা কিছু দেখছি এগুলো কি? বলছেন, এগুলো হচ্ছে সব নাম আর রূপ। নাম আর রূপ হচ্ছে মিথ্যা। কি রকম মিথ্যা? মৃগ মরীচিকার মত, মরীচিকার জলের মত মিথ্যা। তাহলে লোকে যে আলোচনা করে ঈশ্বরই সব কিছু করছেন। কিছু করার নেই, এ সবই হচ্ছে লৌকিক জ্ঞান।

আমরা কয়েক দিন আগে পঞ্চম অধ্যায়ে চৌদ্দ নং শ্লোকের *স্বভাবস্তু প্রবর্ততে* এই জিনিষটাকে নিয়ে আলোচনা করেছিলাম, এর অর্থ হচ্ছে যা কিছু কর্ম হচ্ছে সব প্রকৃতিই করছে। মধুসূদন সরস্বতি বলছেন – লোকেরা যে বলে ভগবান করছেন, ভগবানই সব কিছু করাচ্ছেন। আমাদের স্মৃতি শাস্ত্র, মহাভারতও বলছে ভগবানই এটা সেটা করান, ভগবানই সব কিছু দেন, আবার কৌশিকী উপনিষদেও আছে – ভগবান যার ভালো করেন সে স্বর্গের দিকে যায় আর ভগবান যার মন্দ করেন সে নরকের দিকে যায়। আবার রামপ্রসাদও গাইছেন 'সকলি তোমারি ইচ্ছা'। তাহলে শ্রুতি, স্মৃতি, ন্যায় তিনজনই বলছেন ভগবান করাচ্ছেন, হঠাৎ গীতা বলছে ভগবানের এতে কোন সম্পর্কই নেই, এগুলোর সঙ্গে আত্মার কোন সম্পর্কই নেই, এগুলো সব প্রকৃতিই করছে। প্রকৃতিটা কি? প্রকৃতি হচ্ছে নিজে জড়। জড় হচ্ছে অচেতন, এখন গীতার এই কথাকে কিভাবে শ্রুতি, স্মৃতি আর ন্যায়ের সাথে মেলানো যাবে?

তখন মধুসূদন সরস্বতি এইটাই বলছেন, অতি সাধারণ লোকের যে বুদ্ধি, সেই বুদ্ধিতে যে তারা এই সব বলে তাতে তারা কোন অন্যায় করছে না। কিন্তু যখন অদ্বৈত জ্ঞানে ঠিক ঠিক অবস্থিত হয়ে যায়, তখন সে ঠিক ঠিক দেখতে পায় যে, আত্মা কখনই কোন কিছুতে জড়িয়ে নেই। এই জড়ের যে জ্ঞান এটা হচ্ছে মিথ্যা জ্ঞান। কিন্তু এই মিথ্যা জ্ঞানটা সেই কারণেই হচ্ছে যে কারণে আত্মা আছেন। স্বামীজী সমুদ্রের উপমা দিয়ে বলছেন – সমুদ্রের জলে ঢেউ উঠছে, সমুদ্র আছে বলেই জলের ঢেউ উঠছে, আবার সব ঢেউ ওঠা যখন বন্ধ হয়ে যায় তখন সমুদ্রই আছে, সমুদ্র এখন শান্ত হয়ে আছে। এই ঢেউ গুলো দেখা যাচ্ছে আর তার আশ্রয় সমুদ্র নেই এটা কখন বলা যায় না। অন্য দিকে সমুদ্র ছাড়া ঢেউ এর কোন অস্তিত্ব নেই, তাই অস্তি তাকে বলা যায় না। সেইজন্য তাঁকে বলা হয় তিনি অস্তি নাস্তির পার। যখন ঢেউ দেখাচ্ছে তখন সত্যিই দেখাচ্ছে তাতে কোন দোষ নেই, অথচ ঢেউটা একটা নাম আর রূপ, এগুলো মিথ্যা। এইটাই মায়া। সমুদ্র আর তার ঢেউ, সমুদ্র আছে বলে তার ঢেউ আছে, সমুদ্রটাই সত্য, ঢেউটা দেখা যাচ্ছে

তাহলে এটাও সত্য, অথচ সমুদ্র ছাড়া ঢেউয়ের কোন অস্তিত্ব নেই, তাই এর কোন অস্তিত্ব নেই। আত্মা বা ঈশ্বর আছেন বলেই এই দেহ, মন, ইন্দ্রিয় বুদ্ধিযুক্ত সব জীবজগৎ দেখা যাচ্ছে, সেইজন্য এটাকে না বা মিথ্যা বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। কিন্তু যখন তত্ত্বজ্ঞান হয়ে যায় তখন দেখে এই দেহ, মন, ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি কিছুই ছিল না, তখন দেখে যে এতক্ষণ যা কিছু আলাদা দেখছিলাম সবটাই মিথ্যা জ্ঞান। ভগবান এইটাই এখানে বলছেন। প্রথম শ্লোকটা সাধারণ লোকেদের জন্য, যেখানে বলছেন আমি সমস্ত প্রাণীদের মধ্যে আছি বলে সেইজন্য সব কিছু আছে। তারপরেই বলছেন সব কিছু আমাতে আশ্রয় করে আছে। শেষে বলছেন আমিও ওতে নেই ওরাও আমাতে নেই। কেন বললেন? মরুভূমি আর তার মরীচিকার মত, মরুভূমি আছে বলে তাতে মরীচিকা দেখাচ্ছে কিন্তু এদের প্রত্যক্ষ কোন সংযোগ নেই। যেমন এই বোতলে যে জল আছে এই জলের সাথে একটা সরাসরি যোগ আছে কিন্তু মরুভূমি আর মরীচিকার কোন সরাসরি সম্পর্ক নেই অথচ মরীচিকা হচ্ছে মিথ্যা। এইটাই এখানে বলা হচ্ছে। কিন্তু এদের সম্পর্কটা কি রকম দেখাচ্ছে, ভগবান দৃষ্টান্ত দিয়ে বোঝাচ্ছেন –

**যথাকাশস্থিতো নিত্যং বায়ুঃ সর্বত্রগো মহান্। তথা সর্বাণি ভূতানি মৎস্থানীত্যুপধারয়।**।৬।।

সাধারণ লোকেরা যেমন মনে করে সর্বত্র বিচরণশীল বায়ু আকাশে স্থির হয়ে আছে, ঠিক তেমনি এই জগতের যাবতীয় যা কিছু সব আমাতে আশ্রিত। এখন বায়ু যদি দূষিত হয়ে যায় তাহলে আকাশের কি কিছু হবে? কিছুই হবে না, কারণ বায়ুর সাথে আকাশের কোন সম্পর্কই নেই। সেই রকম, জীবের ধর্মের সাথে ঈশ্বরের কিছু আসে যায় না।

নবম অধ্যায়ের প্রাথমিক যে তত্ত্ব তা হচ্ছে, ভূত বা জীবাত্মার অস্তিত্ব হল ভেতরে ভগবান আছেন বলে, ভগবান ভেতরে থাকলেও ভূতের সাথে প্রত্যক্ষ কোন সম্পর্ক নেই, যেমন এই বোতল আর তার ভেতরের জলের প্রত্যক্ষ সংযোগ আছে, কিন্তু ভগবানের সাথে এই ভূতের এই ধরণের কোন প্রত্যক্ষ সংযোগ নেই। এই তত্ত্ব দেওয়ার পর বলছেন, এই সব যা কিছু আছে সব আমাতেই আশ্রিত আছে। তারপরেই বলছেন, কিন্তু এদের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। মূল ব্যাপারে হচ্ছে এই যে সৃষ্টিটা দেখাচ্ছে, এটা আসলে মিথ্যা। মিথ্যা মানে, একেবারে নেই তা নয়, আছে অথচ মিথ্যা। এটাকে বোঝাবার জন্য মরুভূমি আর মরীচিকার উপমা দেওয়া হয়। মরীচিকাতে জল দেখা যাচ্ছে কিন্তু সে জলে কারুর তৃষ্ণা মিটবে না। আর মরুভূমি আছে বলেই মরীচিকা আছে, মরীচিকার সঙ্গে মরুভূমির কোন সম্পর্ক নেই। তারপর বলছেন –

**সর্বভূতানি কৌন্তেয় প্রকৃতিং যান্তি মামিকাম্। কল্পক্ষয়ে পুনস্তানি কল্পাদৌ বিসৃজাম্যহম্।**।৭।।

*কল্পক্ষয়ে পুনস্তানি*, যখন সৃষ্টির বিনাশ হয়ে যায়, সেই বিনাশের সময় সৃষ্টিতে যত জীব আছে সব ভগবানের অপরা প্রকৃতিতে চলে যায়। সপ্তম অধ্যায়ে আমরা দেখেছিলাম ভগবানের দুটো প্রকৃতি আছে, একটা পরা প্রকৃতি আরেকটা অপরা প্রকৃতি। অপরা প্রকৃতি হচ্ছে জড়, আমাদের সামনে এই যা কিছুর প্রকাশ দেখছি, আমি আছি, বাকিরা আছে, জল আছে, বোতল আছে, মাইক্রোফোন আছে, বিনাশের সময় এগুলো আস্তে আস্তে সব অপরা প্রকৃতিতে চলে গিয়ে single but undifferentiated mass এ পরিণত হয়ে যায়। একজন স্যাঁকড়া সোনার ব্যবসা চালায়, তার অনেক রকমের ডিজাইনের গয়না কিছু লকারে আর কিছু দোকানের শো কেসে সাজান আছে। একদিন সে ঠিক করল আমি এখান থেকে ব্যবসা গুটিয়ে চলে যাব। এখন সে সব গয়নাগুলো একত্র করে আগুনে গলিয়ে একটা সোনার বাট করে নিল। এখন যদি বলি দোকানের গয়না গুলো এই মুহূর্তে কোথায় গেল? কোথাও যায়নি, সব গয়না সোনা দিয়েই তৈয়ার কর হয়েছিল, সেইগুলো আবার সোনাতেই থেকে গেল। আবার কিছু দিন পরে তার ইচ্ছে হল আমি আবার ব্যবসা শুরু করব। তখন ঐ সোনার বাট থেকে আবার সব নানা রকমের অলঙ্কার গুলো বানিয়ে নিল। ভগবান ঠিক এই রকমটিই করেন। যখন সংহারের সময় হয় তখন ভগবান সব কিছু এই ভাবে স্যাঁকরার মত সব গলিয়ে একটি জড় পিণ্ডে পরিণত করে দেন। আবার যখন সৃষ্টি শুরু করবেন তখন *কল্পাদৌ বিসৃজাম্যহম্*, সেই একটা যে জড় পিণ্ড তৈরী হয়েছিল, সেখান থেকে আবার আগের জিনিষ গুলোই বেরিয়ে আসে। এইভাবেই একবার সৃষ্টি, একবার প্রলয়, কিছু কাল পর আবার সৃষ্টি এইটাই অনাদিকাল থেকে ক্রমাগত হয়ে চলেছে।

এই পরা ও অপরা ভগবানের দুটো প্রকৃতি, পরা হচ্ছে চৈতন্য আর অপরা হচ্ছে জড়। তন্ত্র দর্শনে বা শাক্তদের কাছে এই পরা আর অপরা প্রকৃতিই হয়ে যায় শিব আর শক্তি। অধ্যাত্ম রামায়ণে এই পরা ও অপরা প্রকৃতিকে শ্রীরামচন্দ্র আর সীতার সাথে এক করে দেওয়া হয়েছে। দুটো বলা হচ্ছে বটে এই দুটোই মিলে একটাই জিনিষ। কিন্তু এক যদি থাকে তাহলে তাকে দিয়ে কখন সৃষ্টি হতে পারবে না, সৃষ্টি হতে গেলে দুই হতে হবে। এই দুই থেকে তৃতীয় একটা জিনিষ তৈরী হল, এই তৃতীয় থেকে চতুর্থ এই ভাবে পর পর সৃষ্টিটা এগোতে থাকে। সেইজন্য বলা হয় সচ্চিদানন্দ ছাড়া আর কিছু নেই। সচ্চিদানন্দের দুটো রূপ, ঠাকুর এই জন্য বারবার বলছেন – সাপ আর তির্যক গতি, সাপের একটা অবস্থা হচ্ছে সে কুণ্ডলি পাকিয়ে চুপ করে পড়ে আছে, আরেকটি হচ্ছে তার তির্যক গতি, ঠিক সেই রকম ব্রহ্ম আর তাঁর শক্তি, এইভাবে না বললে এই জিনিষটাকে ব্যাখ্যা করা যায় না। যারা ঘোর অদ্বৈতী,

তারা সব সময় বলতে থাকেন যে সৃষ্টি আদৌ হয়নি। কারণ সৃষ্টিকে মানলে অনেক সমস্যা এসে যায়, যিনি শুদ্ধ চৈতন্য তাঁর থেকে এত কিছু বেরিয়েছে, এই জিনিষ কিছুতেই মাথায় ঢুকবে না। সেইজন্য অদ্বৈতবাদীরা যুক্তি দিয়ে দিয়ে দেখাবেন সৃষ্টি বলে আদপে কিছু নেই। কিন্তু ঠাকুরের কথা মত যদি আমরা ব্রহ্ম আর শক্তি কে মেনে নিই, ব্রহ্ম আর তাঁর শক্তি অভেদ, এরপর সৃষ্টির খেলা শুরু হয়ে গেলে সমস্যা হয় না। ব্রহ্মের শক্তি এক সময় প্রকাশ হতে হতে এই ব্রহ্মাণ্ডের রূপ নেয় আবার একটা সময়ের পর গুটোতে গুটোতে সৃষ্টির যখন প্রলয় হয়ে যায় তখন সব কিছু আবার সেই শক্তিতে মিশে যায়। ঠাকুর আবার এর উপমা দিচ্ছেন – বাড়ির গিন্নীর একটা ন্যাতা কাঁথার হাড়ি থাকে তাতে অনেক কিছু শশার বীচি, সমুদ্রের ফেণা রাখা থাকে, যখন দরকার পড়ে তখন সেই হাড়ি থেকে বার করে দেয়। সাধারণ মানুষ এত কথা বুঝতে পারেনা, তাই বলা হয় সংসারের গিন্নী হচ্ছেন শক্তি। সেই শক্তি কে? মা দুর্গা, শ্রীমা সারদা দেবী। তিনি সৃষ্টির বীজ গুলো সব গুছিয়ে তুলে রাখেন। আবার যখন সময় হয় তখন তিনি সৃষ্টি প্রসব করেন। এর মানে হচ্ছে, এই যা কিছু আছে সব একটি অভেদ বস্তুতে চলে যেতে শুরু করে। এই যে সৃষ্টি হল, সৃষ্টি শেষ হয়ে গেল, সৃষ্টি কবে হল, কখন হল এগুলো কে জানছে, মনই তো জানছে। কিন্তু যে মহৎ থেকে মনের উৎপত্তি সেই মহৎও যখন পরমাত্মার মধ্যে বিলীন হয়ে যাবে তখন সৃষ্টিকে কে মাপতে যাবে? ভগবান বলছেন –

**প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য বিসৃজামি পুনঃ পুনঃ। ভূতগ্রামমিমং কৃৎস্নমবশং প্রকৃতের্বশাৎ।।৮।।**

আমার এই অপরা প্রকৃতিকে বশীভূত করে, অপরা প্রকৃতি, বেদান্ত মতে যাকে মায়া বলা হচ্ছে, তন্ত্র মতে হচ্ছে শক্তি, সেই মায়া বা শক্তিকে বশীভূত করে *বিসৃজামি পুনঃ পুনঃ*, এই সৃষ্টির বীজ ছাড়লাম আবার প্রলয়ের সময় সব সৃষ্টিকে আমি আমার মধ্যে গিলে ফেলি। মুণ্ডোকোপনিষদে বলছে – *যতোর্ণাভিঃ সৃজতে গৃহ্নতে চ*, উর্ণনাভিঃ মানে মাকড়সা, মাকড়সা নিজের পেট থেকে জালটাকে ছড়িয়ে দেয়, আবার জালটাকে টেনে গিলে ফেলে। ভগবান এখানে দুটো হয়ে যান, পরা প্রকৃতি আর অপরা প্রকৃতি। এটাকেই আবার তন্ত্রে বলছে, সেই সচ্চিদানন্দ দু ভাগে বিভক্ত হয়ে সৃষ্টির কাজ করেন, শিব আর শক্তি। কেননা দুই না হলে সৃষ্টি হবেই না।

শ্লোকের পরের অংশে বলা হচ্ছে *ভূতগ্রামমিমং কৃৎস্নমবশং প্রকৃতের্বশাৎ*, এইসব শ্লোকের জন্য বেদান্ত দর্শন খুব জটিল হয়ে গেছে। কারণ, আমাকে যতই বলা হোক সেই এক সচ্চিদানন্দই আছেন, তিনি ছাড়া আর দ্বিতীয় কিছু নেই, কিন্তু আমি সামনে সব সময় বহু বহু দেখে যাচ্ছি, এই এক আর বহুকে মেলানো খুব কঠিন। এখানে ভগবান বলছেন, সচ্চিদানন্দের বাইরে কিছু নেই, এই যে আমার সামনে মাইক্রোফোনের লোহার দণ্ড এটিও সচ্চিদানন্দের বাইরে নয়, আমিও সচ্চিদানন্দের বাইরে নই। এখন আমার মধ্যে আমি বোধ আছে কিন্তু এই লোহার দণ্ডের আমি বোধ নেই। এখন সৃষ্টির সংহারের সময় আমার যদি মুক্তি না হয়ে থাকে, তাহলে আমার যে এই আমি বোধটা থেকে যাচ্ছে, সেই আমি বোধ নিয়ে আমি অনেক লোকের ভালোবাসায় আবদ্ধ হয়ে আছি, এই আমি বোধ দিয়ে কিছু লোকের প্রতি বিদ্বেষ পুষে রেখেছি। এখন সংহারের পর এই আমি বোধ আর এই আমি বোধের সাথে সম্পর্ক যুক্ত সমস্ত কিছুই বীজাকারে চলে যাবে। অপরা প্রকৃতির তো নাশ হয়নি, সেতো ভগবানের সাথে এক হয়ে আছে। সেখান থেকে আবার অপরা প্রকৃতি বেরোবে, সেখান থেকে প্রকৃতি রূপে আলাদা হয়ে যাবে, সেখান থেকে মহতের সৃষ্টি হবে, মহৎ থেকে আবার সব সৃষ্টি বেরোবে। তখন দেখা যাবে আগের কল্পে আমার যে আমি বোধ যুক্ত চৈতন্যকে ছাড়া হয়েছিল আবার এই কল্পে সেটা ফিরে আসবে, আবার সেইখানে থেক আমি বোধের সঙ্গে যা যা সম্পর্ক যুক্ত ছিল সেগুলো আবার এসে জুটে যাবে, যত দিন না আমার মুক্তি হচ্ছে তত দিন এইভাবেই চলতে থাকবে।

ভালোবাসা আর ঘৃণা এই দুটোই প্রকৃতির। তাই যদি হয় তাহলে কি আমরা কাউকে ভালোবাসব না? কিছু দিন আগে এক বয়স্ক ভক্ত স্বামী ভূতেশানন্দজীর স্মৃতিকথার আলোচনা করতে গিয়ে বলছিলেন যে, স্বামী ভূতেশানন্দজীর মধ্যে কি গভীর ভালোবাসা ছিল, সবার প্রতি তিনি এই ভালোবাসা ঢেলে দিতেন। তাই বলে কি স্বামী ভূতেশানন্দজী মায়ায় আবদ্ধ ছিলেন? আসলে আমরা বেদান্তের মূল তত্ত্বটাই বুঝতে পারিনা বলে এই ধরণের উদ্ভট চিন্তা আমাদের মাথার মধ্যে আসে। প্রকৃতপক্ষে মানুষ কাকে ভালোবাসে? বৃহদারণ্যক উপনিষদের ঋষি বলছেন মানুষ যেখানে আত্মার ছবি দেখে তাকেই সে বেশি ভালোবাসে। অত উচ্চ ব্যাপারে না গিয়ে যদি আমরা আরও সাধারণ স্তরে গিয়ে বিশ্লেষণ করি তাহলে মানুষ যে জিনিষকে মনে করে এটি আমার ব্যক্তিত্বের সম্প্রসারিত রূপ, মানুষ সেটাকেই ভালোবাসে, এর বাইরে মানুষ কখনই ভালোবাসতে পারেনা। স্বামী তার অস্তিত্ব স্ত্রীর মধ্যেও সম্প্রাসারিত দেখছে তাই সে স্ত্রীকে ভালোবাসছে। ঠিক একই কারণে মানুষ নিজের বাচ্চাকে ভালোবাসা, নিজের সম্পদ, গাড়ী, বাড়ি, ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স, নিজের কুকুরকে ভালোবাসে, সব ক্ষেত্রেই কিন্তু তার ব্যক্তি সত্তার প্রসার হচ্ছে বলে ভালোবাসছে। যে জায়গাটেতে গিয়ে তার ব্যক্তিত্বের সীমানা শেষ হয়ে গেল তারপর আর ভালোবাসা থাকে না, একটা ব্যবহারিক সম্পর্ক থাকে মাত্র। আজ থেকে পঞ্চাশ বা একশ বছর আগে বা তারও আগে বেশির ভাগ মানুষই গ্রামে থাকত, আর গ্রামের সবার প্রতি তাদের ব্যক্তি সত্ত্বার একটা একত্ব বোধ থাকত, এটাই হচ্ছে তাদের ব্যক্তি সত্ত্বার একটা বিরাট সম্প্রসারিত রূপ। গ্রামের বাইরে শহরে চাকরি করতে গিয়ে তো কত লোকের সঙ্গেই পরিচয় হত, কিন্তু তার গ্রামের কেউ যদি শহরে আসত তখন খবর চলে যেত তার কাছে যে, তোমার দেশওয়ালি

ভাই এসেছে। সব কাজ ফেলে তার আদর যত্ন করতে ছুটে যেত। আগেকার দিনে নতুন বিয়ে করে শ্বশুড় বাড়িতে চলে আসার কিছু দিন পর যদি তাকে বলা হত তোমার গ্রাম থেকে কেউ এসেছে, শুনেই একগাল হাসি বেরিয়ে যেত, এমনই গ্রামের লোকের সাথে একাত্ব বোধ ছিল।

এখন স্বামী ভূতেশানন্দজীর মত যে কোন সন্ন্যাসী, যাঁরা সারা জীবন প্রচুর আধ্যাত্মিক সাধনা করেছেন তাঁদের জাগতিক বন্ধন গুলো শিথিল হয়ে যায়। জাগতিক বন্ধন যত আলগা হয়ে যায় ততই কিন্তু তাঁর একত্ব বোধটা বাড়তে থাকে। তাঁর একমাত্র একত্ব বোধটা হচ্ছে *মত্তঃ সর্বং প্রবর্ততে*, এই জগতের যা কিছু আছে সব আমার থেকেই বেরিয়েছে, সব কিছু আমিই হয়েছি, *সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম*, যা কিছু আছে সব ব্রহ্ম। এবার ভাবুন এঁর ব্যক্তিত্ব এখন কোথায় গিয়ে ঠেকছে? কোথাও গিয়ে আর ব্যক্তিত্ব থেমে যাচ্ছে না। একটা ছোট্ট পোকা থেকে শুরু করে যত প্রাণী আছে সবার মধ্যেই তিনি নিজের অস্তিত্ব অনুভব করছেন। সাধারণ মানুষ শুধু নিজের স্ত্রী, সন্তান, বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যেই নিজের অস্তিত্বকে অনুভব করে, আবার কিছু মানুষ আছে যারা শুধু নিজের মধ্যেই নিজের অস্তিত্বকে অনুভব করে। যিনি মহাত্মা, মহাপুরুষ তিনি তখন দেখেন যে অসৎ সেও আমি, যে সৎ সেও আমি। শ্রীমা আরও এক ধাপ এগিয়ে বলছেন আমি অসতেরও মা সতেরও মা। মূল ভাবটা কিন্তু একই। এখন আমাদের ক্ষেত্রে ব্যক্তিত্বের কত দূর বিকাশ হতে পারে? একটা কুকুর যখন তিন চারটে বাচ্চা দেয়, তখন কুকুর কিন্তু তার বাচ্চার সাথে নিজেকে একত্ব বোধ করে। কিন্তু একটা সময়ের পর তার এই একত্ব বোধটাকে বাচ্চা থেকে সরিয়ে দেয়, বাচ্চাগুলো থেকে পুরো আলাদা হয়ে যায়। কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে তা হয় না, বাবা-মার কাছে তার ছেলে-মেয়ে সারা জীবন বাচ্চাই থেকে যায়। বাচ্চা বড় হয়ে যাওয়ার পরও মা-বাবার সঙ্গে একত্ব থাকে। ভালোবাসার এই পরিধিটা বিরাট। মানুষ আধ্যাত্মিক আলোকে যত উদ্ভাসিত হতে থাকবে তার কিন্তু একত্ব বোধের সীমানাটা ক্রমশই বিস্তার হতে থাকবে। ঠাকুর এইটাকেই একটা সীমানা টেনে দিয়ে বললেন – শুধু নিজের সন্তান, আত্মীয় বন্ধু বান্ধবকে ভালোবাসার নাম মায়া আর সবাইকে ভালোবাসার নাম হচ্ছে দয়া। দয়া থেকে মুক্তি হয়, মায়া থেকে বন্ধন তৈরী হয়। যার মধ্যে ঠিক ঠিক আধ্যাত্মিক চেতনা জাগ্রত হয়েছে তার ভালোবাসা মুষ্টিমেয় কয়েকজনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না। তার ভালোবাসা, করুণা, দয়া সমস্ত প্রাণীর প্রতি প্রবাহিত হবে। স্বামীজী বলছেন – যত দিন সবার মুক্তি না হচ্ছে তত দিন আমিও মুক্তি চাইনা। এই ভালোবাসা বন্ধনের কারণ হয় না। ভালোবাসা দুই রকমের হয়, একটা ভালোবাসা আছে, আমি তোমাকে ভালোবাসি তুমি আমার হয়ে থাকবে, তুমি অপরের দিকে মন দিও না। আর দ্বিতীয় ভালোবাসা হয় ভগবানের প্রতি, আমি তোমাকে ভালোবাসি, তুমি আমাকে ভালোবাস আর নাই বাস তাতে আমার কিছু আসে যায় না। এই ধরণের ভালোবাসাই মুক্তির পথে নিয়ে চলে যায়।

আমরা যে অর্থে ভালোবাসাকে দেখি, সেই অর্থে ভালোবাসা কিন্তু অত্যন্ত খারাপ, কিন্তু বিষের ওষুধ হচ্ছে বিষ, ভালোবাসা দিয়েই ভালোবাসার বিষত্বটাকে নাশ করতে হবে। *সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম* যখন বলছে তখন আমাকে সমস্ত জগতকে ভালোবাসার কথাই বলা হচ্ছে। কিন্তু সেই চরম উচ্চ অবস্থার কথা আমরা এখন চিন্তা বা ধারণাই করতে পারবো না। সেইজন্য কোথাও প্রথমে একটা ভালোবাসা দিয়ে শুরু করতে হয়, তা নাহলে মানুষ খিটখিটে আর রুক্ষ মেজাজের হয়ে যায়। যত কম লোককে আমি ভালোবাসছি তত কিন্তু আমি বাঁধনে আছি আর একেবারেই যদি কাউকে না ভালোবাসি তাহলে আমি অসুর, সাপ যেমন নিজের বাচ্চাকে খেয়ে নেয়, এদেরও সেই অবস্থা হয়। সৃষ্টির অনাদি কাল থেকে এই জিনিষ চলে আসছে। এটা কবে থেকে চলছে কেউ বলতে পারবে না, একমাত্র ভগবানই জানেন।

ভগবান এখানে বলছেন *অবশং প্রকৃতের্বশাৎ*, মূল কথা হচ্ছে যাদের মুক্তি হয়নি তাদের আবার সবাইকে ফেরত আসতে হবে। আর ভগবান হচ্ছেন সচ্চিদানন্দ, জীবাত্মা তৈরী করা তার কাছে কিছুই না। জীবাত্মা যখন প্রথম সচ্চিদানন্দ থেকে বেরোবে তখন একেবারে শুদ্ধ চৈতন্য অবস্থায় থাকে। ভগবান প্রথম যে সৃষ্টিটা করেন তখন সে থাকে একেবারে শুদ্ধাত্মা, তাঁর দ্বারা সৃষ্টির কোন কাজই সম্ভব হয় না। যেমন সনৎকুমাররা যে চার ভাই ছিলেন, এঁনারাই ছিলেন ভগবানের প্রথম সৃষ্ট জীবাত্মা, জন্ম নিয়েই এনারা ত্যাগ বৈরাগ্যকে অবলম্বন করে পুরোপুরি নিবৃত্তির পথে চলে গেলেন। তারপর আস্তে আস্তে যে সব জীবাত্মারা তৈরী হল, সংসারের সংসর্গ করতে করতে তাদের ত্যাগ বৈরাগ্য কমতে থাকে, আর ভোগের দিকে বেশি মন দিতে থাকে, তখন ভগবানেরও কাজ কমে যায়, তখন জগৎ তার নিজের মতই চলতে থাকে। তখন জগৎ এত ভোগের প্রতি একাত্ব হয়ে যায় যে, যে ভগবান সব সৃষ্টি করলেন তাঁকেই আবার অবতার হয়ে ত্যাগ বৈরাগ্যের শিক্ষা দিতে জন্ম নিতে হয়। এই হচ্ছে লীলা। ত্যাগ বৈরাগ্যের দ্বারা যার জ্ঞানলাভ হয়নি, জ্ঞান লাভের দ্বারা যাদের মুক্তি হয়নি তাদের পুনঃপুনঃ সৃষ্টির মধ্যে ঘুরপাক খেতে হবে, প্রকৃতি তখন যেন এদের অবশ করে টেনে ঘোরাতে থাকে, *অবশং প্রকৃতের্বশাৎ*। এরপর বলছেন –

**ন চ মাং তানি কর্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয়। উদাসীনবদাসীনমসক্তং তেষু কর্মসু।।৯।।**

এই যে ভগবান সৃষ্টি করে দিলেন, সেই শুদ্ধ চৈতন্য সৃষ্টির মধ্যে এসেই মায়ার খপ্পরে পড়ে সম্পূর্ণ অশুদ্ধের মত আচরণ করতে শুরু করে দিল, কামিনীর পেছনে দৌড়াতে শুরু করল, অর্থের পেছনে দৌড়াচ্ছে, নাম-যশের পেছনে দৌড়াচ্ছে, বৃষ্টি হলে

চেঁচাচ্ছে, বৃষ্টি না হলে চেঁচাচ্ছে আবার এই বৃষ্টিকে নিয়ে কত কবিতাও লিখছে, ছবি আঁকছে। এরই মধ্যে কখন আনন্দে লাফাচ্ছে, কখন দুঃখ, যন্ত্রণায় কাতর হয়ে ভেঙ্গে পড়ছে। এগুলোর জন্য দায়ী কে? ভগবানই তো সৃষ্টি করেছেন। প্রায়ই লোকের এই প্রশ্ন করে, আমাকে তো ভগবানই সৃষ্টি করেছেন তাহলে আমার সব পাপের জন্য দায়ী তো তিনিই। কিন্তু ভগবান বলছেন – না, আমি দায়ী নই, কারণ এই কর্মগুলো আমাকে কোন বন্ধনে ফেলে না। কারণ আমি *উদাসীনবৎ চ আসীনম্*, সব কিছুতে আমি উদাসীন এবং *অসক্তম্*, সম্পূর্ণ ভাবে অনাসক্ত।

এই নবম অধ্যায়ের সাত, আট ও নয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শ্লোক। সাত নং শ্লোকে ভগবান বলছেন আমি সংহার করি আবার আমিই সৃষ্টি করি। তারপর আট নং শ্লোকে বলছেন আমার যে প্রকৃতি তার সাহায্যে সমস্ত কিছুকে অবশ করে টেনে নিয়ে আসি, জেলে যেমন মাছকে জালের মধ্যে টেনে নেয়। তাহলে এতো যে কাণ্ড ঘটছে এর জন্য দায়ী কে? ভগবান বলছেন আমি আদপেই দায়ী নই। তাহলে কে দায়ী? কেউই নয়। এখানে আচার্য খুব সুন্দর ব্যাখ্যা করছেন – এটা শুধু ভগবানের ক্ষেত্রেই নয়, যে কোন লোকের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, ১) কর্তৃত্ব অভিমান অভাব এবং ২) ফলসঙ্গ অভাব। সহজ ভাষায় এর অর্থ হচ্ছে কর্মেও আসক্তি নেই আর কর্মফলেও কোন আসক্তি নেই। এই দুটো জিনিষের বোধ যদি কারুর মধ্যে থাকে তাহলে সে যদি কারুর গলাও কেটে দেয় তাহলেও তার কিছু এসে যাবে না। আজকালকার ছেলেমেয়েরা যেমন বলে I want job satisfaction, আরে আগে নিজের self satisfaction নিয়ে এসো তারপর job satisfaction আসবে। আবার কিছু ছেলেমেয়ে কোন কাজ করতে যাওয়ার আগে খোঁজ নেবে pay package কি রকম দিচ্ছে। যে job satisfaction, চাইছে তার কর্মে আসক্তি আর যে আগে খোঁজ নিচ্ছে কি রকম pay package দিচ্ছে, তার কর্মফলে আসক্তি। ভগবান যখন এই সৃষ্টির কাজ করেন কিংবা আবার সংহারের কাজ করেন তখন তাঁর না আছে এই কর্মে স্পৃহা, না তাঁর আছে এই কর্মফলের প্রতি কোন স্পৃহা। চতুর্থ অধ্যায়েই ভগবান বলেছেন – *ন মাং কর্মাণি লিম্পন্তি ন মে কর্মফলে স্পৃহা*, আমার কাজ চাই, কাজ ছাড়া আমি থাকতে পারবো না, এতেও ভগবানের কোন স্পৃহা নেই, আবার যখন আমি কাজ করব সেই কাজের ফলেও আমার কোন আসক্তি নেই। এই দুটো, কর্মে স্পৃহা আর কর্মফলে আসক্তি যদি থাকে তাহলে বুঝে নিতে হবে তাকে কত জন্ম যে ঘুরতে হবে কেউ বলতে পারবে না। আমরা মনে করি আমার কাজ করার এতটুকু বাসনা নেই আর যে কাজটুকু করে দিলাম তাতে কে কি বলল, কে কি পুরস্কার দিল সেই নিয়ে আমি কিছু ভাবিনা। এগুলো কিন্তু আমাদের মনের কথা নয়। কেউ যদি কাজ নাও করে সে কিন্তু চেষ্টা করে যাতে কাজ না করতে হয়, এটাও কিন্তু আসক্তি। ভগবান সৃষ্টি করছেন প্রলয় করছেন, এতে যে তাঁর করার যে ইচ্ছা আছে তাও নেই, করার যে ইচ্ছে নেই তাও না, করার পর সৃষ্টি কেমন হল সেই নিয়েও তাঁর কোন মাথা ব্যাথা নেই। আমরা যখন দু'লাইনের কবিতা লিখি আমাদের যত কাছের লোক আছে সবাইকে ফোনে কবিতাটা পড়ে না শোনালে মন শান্ত হয় না। আমরা বেশির ভাগ লোকই কাজ করতেই চাই না, আসলে কাজ করার ক্ষমতাই এখন আমাদের হয়নি। কাজ করার ক্ষমতা অর্জন করতে এখনও অনেক জন্ম বাকী। আর যখন কাজ করার ক্ষমতা হবে তখন কর্মের ফলে যে তার কি প্রচণ্ড আসক্তি আসবে আমরা কল্পনাই করতে পারব না। আবার অনেকের হয়তো কর্মফলে স্পৃহা নেই, কিন্তু মাঝে মাঝেই তাদের কর্ম করার স্পৃহাটা চাগিয়ে ওঠে তখন কোন কাজ না করে শান্তি পায়না। এদের এই কর্ম করার স্পৃহাটাও এক সময় চলে যাবে। শঙ্করাচার্য এইটাই এখানে বলছেন, এই দুটো জিনিষ কর্মে আসক্তি আর কর্মফলে অনাসক্তি যখন কোন মানুষের এসে যায় তখন সেই মানুষ ভগবানের মত হয়ে যায়। আর যদি কর্মেও আসক্তি কর্মফলেও যদি সমান স্পৃহা থাকে তাহলে রেশমের গুটিপোকার মত নিজের জালে নিজেই ফেঁসে আটকে থাকবে। এর পরের শ্লোকে বলছেন –

**ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্। হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্বিপরিবর্ততে।।১০।।**

এখানে সাত আর আট এই দুটো শ্লোক মিলিয়ে ভগবান একটা তত্ত্ব দিচ্ছেন, নবম শ্লোকে আরেকটি তত্ত্ব দিচ্ছেন। দশম শ্লোকে তৃতীয় আরেকটি তত্ত্ব দিচ্ছেন। এই দশম শ্লোকটিও খুব জটিল। এই অর্থে জটিল বলা হচ্ছে যে, এর অর্থকে অন্য শ্লোকের সাথে সামঞ্জস্য করা খুব কঠিন। প্রথমে বললেন, সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় ভগবানই করছেন। এখানে ভগবানের কর্তৃত্ব এসে যাচ্ছে, কর্তৃত্ব যদি এসে যায় তাহলে এই কর্মের পাপ-পূণ্য যাই হোক না কেন ভগবানের উপর বর্তাবে। নয় নং শ্লোকে এসে ভগবান পুরো দু হাত তুলে বলে দিলেন যে, এই সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় রূপ কার্যে আমার কোন আসক্তি নেই তাই এই কর্মের কোন কিছু আমাকে বাঁধতে পারেনা, হ্যাঁ আমিই করেছি কিন্তু আমি নির্লিপ্ত হয়ে করেছি। এবার দশ নং শ্লোকে একেবারে হাত ঝেড়েপুছে সাফ করে দিচ্ছেন।

*ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্*, যা কিছু গোলমাল করার সব প্রকৃতি করছে। আমি এসবে নেই, এগুলো আমি কিছুই করিনি। ভগবান এই তিনটে শ্লোকের মধ্যে তিন রকমের কথা কেন বলছেন এটাকে ব্যাখ্যা করা সত্যিই খুব কঠিন। এর মধ্যে দুটো সম্ভবনা থাকতে পারে। একটা হচ্ছে 'অরুন্ধতি ন্যায়', কোন মেয়ে যখন বিয়ের পর শ্বশুর বাড়ী আসে তখন শ্বশুর বাড়ির লোকের আশা করে পুত্র আর পুত্রবধু এরা দুজন যেন বশিষ্ঠ আর অরুন্ধতির মত সুখী দম্পতি হয়ে চিরদিন দাম্পত্য জীবন যাপন করতে পারে। সেইজন্য নববধুকে রাতের আকাশে অরুন্ধুতি তারা দেখান হত। অরুন্ধতি তারাটা খুব ছোট্ট, চট্ করে সহজে কারুর চোখে পড়বে না। তখন তাকে বলা হত – ঐ যে গাছের ডালটা দেখছ, ঐ ডালের সব থেকে উপরের পাতার দিকে নজর দাও। ঐ পাতার

সোজা যে উজ্জ্বল তারাটা দেখতে পাচ্ছো, সেই উজ্জ্বল তারার পাশে একটা ছোট্ট তারা দেখতে পাবে, ঐটি হচ্ছে অরুন্ধুতি তারা। এটাকে বলা হয় 'অরুন্ধুতি ন্যায়'। প্রথমে একটা বিরাট ঢাউস জিনিষকে দেখান হল, তারপর ঢাউস জিনিষকে দেখিয়ে তার থেকে আরেকটু ছোট, তারপর তার থেকে আরও ছোট জিনিষকে দেখান হত। শাস্ত্রের কথা খুবই সূক্ষ্ম, খুব সূক্ষ্ম বুদ্ধি না হলে শাস্ত্রের কথাকে বোঝা অত্যন্ত দুষ্কর। বুদ্ধিকে এত তুখোড় আর ধারালো করতে হবে যে, যত রকমের অবাঞ্ছিত জিনিষকে কচকচ করে কেটে সরিয়ে দিয়ে আসল জিনিষটাকে বার করে নিয়ে আসবে। শাস্ত্রের কথা বোঝার থেকে বিজ্ঞানের যে কোন বিষয় বোঝা অনেক সহজ। আধ্যাত্মিক জীবন অনুর্বর মস্তিষ্ক সম্পন্ন মানুষের জন্য নয়, অনুর্বর মস্তিষ্করা যদি ধর্ম জানতে চায় তাহলে কি করবে? এদের আগে সব সময় হাততালি দিয়ে হরিনাম করে যাওয়া ছাড়া আর কোন উপায় নেই। হরিনাম করে করে মস্তিষ্কের সেলগুলো যেগুলো জমাট বেঁধে পাথর হয়ে আছে সেগুলোকে আগে একটু নরম করতে হবে। ঠাকুরও যোগীন মহারাজকে বলছেন – ভক্ত হবি তো বোকা হবি কেন। আধ্যাত্মিক রাস্তা বোকাদের জন্য নয়, শাস্ত্র বোকাদের জন্য নয়, আর শাস্ত্রজ্ঞান যাদের নেই তারা কখনই আধ্যাত্মিক পুরুষ হতে পারে না। এইসব কথা বললেই লোকেরা বলবে ঠাকুর কি শাস্ত্র পড়েছিলেন? লাটু মহারাজের তো অক্ষর জ্ঞানই ছিল না। কিন্তু কথামৃতে ঠাকুরের একটি বাক্যও নেই যেটা শাস্ত্র বিরোধী, লাটু মহারাজের কি তুখোড় বুদ্ধি ছিল, লাটু মহারাজ মাঝে মাঝে যে টুকরো টুকরো মন্তব্য করতেন তাতে স্বামীজীও অবাক হয়ে যেতেন।

মানুষ যখন আধ্যাত্মিক পথে আসে তখন তাকে শাস্ত্রের এইসব সূক্ষ্ম ও জটিল তত্ত্বগুলিকে বোঝানোর ক্ষমতা কারুরই থাকে না, তাই প্রথমে স্থূল জিনিষ দিয়ে তাকে বোঝান হয়। মধুসূদন সরস্বতিও বলছেন, উপনিষদেও বলছে ভগবানই সব কিছু করান, মহাভারতেও তাই বলছে, সাধকও গানে বলছেন সকলি তোমারি ইচ্ছা। এখানেও তাই বলা হচ্ছে – আমিই সব করি, তারপরে বলছেন, আমি করি ঠিকই কিন্তু আমি এসবে নির্লিপ্ত, তারপরেই বলছেন আমি কিছুই করি না, যা কিছু করার প্রকৃতিই করে। পঞ্চম অধ্যায়েও চৌদ্দ নং শ্লোকে বলছেন – *স্বভাবস্তু প্রবর্ততে*। যদি বলা হয় ভগবানই সব কিছু করেন বা করান তাহলে দর্শনের যুক্তির দিক দিয়ে এমন অনেক সমস্যা সৃষ্টি হয়ে যায় যার কোন সমাধান দেওয়া যায় না। ইসলাম ও খ্রীশ্চান ধর্মকে যখন এই নিয়ে যুক্তিবাদীরা প্রচণ্ড আক্রমণ করে তখন তাদের কিছু বলার থাকে না, তাদের কাছে তখন একটাই উত্তর, ভগবানের ইচ্ছাকে কখন বোঝা যায় না। বেদান্তে এই নিয়ে কোন সমস্যা হয় না। বেদান্ত প্রথমে শুরু করবে ভগবান সব কিছু করেন, তারপর যখন দেখবে এর বুদ্ধি কিছুটা খুলে গেছে তখন বলবে ভগবান করেন কিন্তু তিনি এসবে নির্লিপ্ত, কোন কিছুতে তিনি আসক্ত নন। যেমন শ্রীকৃষ্ণ এখানে বলছেন – *য এনং বেত্তি হন্তারং যশ্চৈনং মন্যতে হতম্। উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হন্তি ন হন্যতে* – তুমি যদি কাউকে বধ কর তাতেও কিছু হচ্ছে না, তার সাথে তোমাকেও যদি কেউ বধ করে তাতেও তোমার কিছু আসে যায় না। এখানে তাহলে এগুলো কে করছে? *স্বভাবস্তু প্রবর্ততে*, প্রকৃতিই সব করে যাচ্ছে, জড় জড়ের উপর কাজ করে চলেছে। আমি রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে দেখছি দুটো গুণ্ডা পরস্পর মারামারি করছে, আমি তখন কি করব? ঐদিকে তাকাতে নেই মনে করে আমি নিজের মত ঐ জায়গা ছেড়ে এগিয়ে চলে যাব। কিন্তু আমি যদি দেখি একজন গুণ্ডা আমার ভাইকে ধরে মারছে, তখন আমি ঝাঁপিয়ে পড়ব ভাইকে বাঁচানর জন্য। ভাইয়ের সাথে আমি নিজেকে একাত্ম করে রেখেছি বলেই ঝাঁপিয়ে পড়েছি। সারা জগৎকে যখন দেখব দুজন গুণ্ডা মিলে মারামারি করছে তখন আমার কিছুই বোধ হবে না, ঠিক সেই রকম যখন দেখব প্রকৃতি তার নিজের মত আচরণ করে যাচ্ছে তখন আমার কোন বিকার থাকবে না। এটা হচ্ছে ভাবের ব্যাপার।

আমরা এখানে একত্র বসে শাস্ত্র আলোচনা শুনছি। বেলুড়, কলকাতা, হাওড়া, উত্তরপাড়াতে এত লক্ষ লক্ষ লোক থাকতে কেন আমরা এই কজনই এখানে জড়ো হয়েছি? এর অনেক ব্যাখ্যা হতে পারে। কেউ বলবে ঈশ্বরের ইচ্ছায় আমরা এখানে একত্র হয়েছি, কেউ বলবে আমাদের কর্মফল ছিল তাই এখানে এক জায়গায় জড়ো হয়েছি, কেউ বলবে আমাদের মধ্যে পূর্বজন্মেই কোন সম্পর্ক ছিল তাই এখানে এক হয়েছি, এই রকম হাজারটা কারণ এসে হাজির হয়ে যাবে। কিন্তু বেদান্ত এই ব্যাপারে একেবারে দৃঢ় হয়ে আছে, প্রকৃতিই সব করছে। এখানে যারা শাস্ত্র শুনতে এসেছে তাদের শাস্ত্র শোনার আগ্রহ ছিল বলেই এখানে এসেছে। কিন্তু কলকাতায় আরও অনেকে আছে যাদের শাস্ত্র শোনার আগ্রহ আছে, কিন্তু কই তারা তো এখানে আসছে না। আমি বলতে পারি তাদের যোগাযোগ হচ্ছে না। কেন যোগাযোগ হচ্ছে ন? *স্বভাবস্তু প্রবর্ততে*। আমরা বাই চান্স একসঙ্গে এসে গেছি, তারাও বাই চান্স আসতে পারছে না, যদি তাদের বাই চান্স সুযোগ হয়ে যায় তাহলে তারাও আসবে। অনেকে বলবে – এটাই কর্মফল, এর আগের জন্মে আমি গরুকে ঘাস খাইয়ে ছিলাম সেই পূণ্যে আজ শাস্ত্র কথা শুনতে আসছি। খুব ভালো কথা মেনে নিলাম। কিন্তু এই বক্তব্যের বিরুদ্ধে যখন পাঁচটা প্রশ্ন করা শুরু হবে তখন একটা জায়গায় গিয়ে থেমে যেতে হবে। আরেকজন বলবেন – এটা তাঁর ইচ্ছে, তিনি আগে থেকেই সব ঠিক করে রেখেছেন। কিন্তু তাকে যদি জিজ্ঞেস করা হয় *আপ্তকামস্য কা স্পৃহা*, ভগবান আপ্তকাম, তাহলে তাঁকে কেন এত সব করার দরকার পড়ল। মানুষ কেন কাজ করে আর কখন কাজ করে? যখন তার অভাব বোধ হয় তখনই সে কাজ করতে এগিয়ে যায়। তাহলে ভগবানের অভাব বোধ কিসের, তিনি তো আপ্তকাম, তিনি কেন এই সব করেন? তখন আর উত্তর দেওয়া যায় না। এখানে এসে বেদান্তের কথাই থেকে যায়, *স্বভাবস্তু প্রবর্ততে*, প্রকৃতিই সব কিছু করছে। প্রকৃতি হচ্ছে জড়, মনটাও জড় পদার্থ।

প্রকৃতিই সব কিছু করছে, এই কথার মাধ্যমে আমাদের বেদান্ত কি করতে বলছে? তোমার আমিত্বটাকে ছাড়। এই কথাই ভগবান তৃতীয় অধ্যায়ে বলছেন *অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্তাহমিতি মন্যতে*, অহঙ্কারে তার বুদ্ধিটা বিমূঢ় হয়ে গেছে, মনে করছে আমিই করছি। এবারে এটাকে আমাদের আগের কথার সাথে মেলালে কি দেখব? আমি এখানে কেন এলাম? প্রকৃতিই নিয়ে এসেছে, এখানে ওখানে ধাক্কা খেতে খেতে এখানে পৌঁছে গেছি, এখানে আমার কিছুই করার নেই। এটাকে যখন বুঝে নেব তখন এখানেই আমার আমিত্বটা নাশ হয়ে গেল। আবার যদি বলি আমার কর্মই আমাকে এখানে নিয়ে এসেছে, তার মানে সেই একই হল, আমার আমিত্বটা নাশ হয়ে গেল। যদি বলি প্রভু নিয়ে এসেছেন বলেই আমি এখানে শাস্ত্র কথা শোনার সুযোগ পেয়েছি বলেই এখানে এসেছি, এতেও আমার আমিত্ব নাশ হয়ে গেল। ঈশ্বরের ইচ্ছা ছিল বলেই আমি এখানে এসেছি, আমার আমিত্বটা নাশ হয়ে গেল। এই চারটি তত্ত্বের যে কোন একটি তত্ত্বকে দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে ধরে রাখলেই আমার আমিত্বটা নাশ হয়ে যাবে। আধ্যাত্মিক জীবনের উদ্দেশ্য কি? আমিত্বকে নাশ করা। ঠাকুর বলছেন জো সো করে ঈশ্বর দর্শন করা, ঈশ্বর দর্শন করা মানে আমিত্বটাকে নাশ করা।

বেদান্তের *স্বভাবস্তু প্রবর্ততে* এই তত্ত্বটি যুক্তির দিক দিয়ে বেশি মজবুত। কিন্তু যুক্তি দিয়ে আমি কি করব? যদি আমার মনের খেদ ঈশ্বরের ইচ্ছা এই তত্ত্বেই মিটে যায়, এতে যুক্তি থাকুক আর নাই থাকুক তাতে কিছুই আমার যায় আসে না। সেইজন্য কোন তত্ত্বই ভুল নয়, যদি বলি আমার কপালে এটাই ছিল, মানে কর্মফলে বিশ্বাস আর এতেই যদি আমার মনের সমস্যা পূরণ হয়ে যায় তাহলে এটাই ঠিক। ঈশ্বরের ইচ্ছা, এইটাই বিধান, যদি বলে এর কোনটাই নয় এটা বাই চান্স তাও ঠিক। কিন্তু তোমার *কর্তাহমিতি মন্যতে*, আমি কর্তা এই ভাবটাকে কি ত্যাগ করতে পারছ? যদি আমি কর্তা এই ভাবকে ত্যাগ করতে পার তাহলে যে যুক্তিকেই আঁকড়ে থাকো না কেন তাতে কিছুই যায় আসে না।

এই যে এখানে বলছেন, *ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ*, প্রকৃতিই সব কিছু করছে, কিন্তু প্রকৃতি তো জড়, জড়তো নিজে কিছুই করতে পারেনা, কিন্তু আমি আছি বলেই প্রকৃতি সব করতে পারছে। আমি না থাকলে, আমার অধিষ্ঠান যদি না থাকত তাহলে প্রকৃতি এসব কিছুই করতে পারত না। জগতের ভালোমন্দ যা কিছুই ঘটছে সব তাঁর প্রকৃতিতেই ঘটে চলেছে। এখানে একটা কথা বারবার বলা হয় যে, সৃষ্টি কি, সৃষ্টি কিভাবে হয়, এই প্রশ্ন গুলো করা যায় না। শঙ্করাচার্য খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি কথা বলছেন – সৃষ্টির ব্যাপারে শুধু যদি প্রকৃতিকেই নেওয়া হয় তাহলেও কিন্তু সব পরিষ্কার হয় না। অন্য দিকে যদি শুধু চৈতন্যকেই নেওয়া হয় তাও সৃষ্টির রহস্য উন্মোচন হয় না। এই মন্তব্য করেই আচার্য নাসদীয় সূক্তমের বক্তবের মূল ভাবটি যে লাইনে বলা হয়েছে সেই লাইনের একটি অংশ তুলে বলছেন, *কো অদ্ধা বেদ ক ইহ প্রবোচৎ কুত আজাতা কুত ইয়ং বিসৃষ্টিঃ*, এই সৃষ্টি কোথা থেকে এসেছে আর কিভাবেই এসেছে, এর উত্তর কে দেবে? কারণ দেবতারা, যাঁদেরও জন্ম সৃষ্টির পড়ে, তাঁরাও সৃষ্টির রহস্য জানেন না। এই সৃষ্টি ভগবান করছেন, না তাঁর মায়া করছে, না প্রকৃতি করছে, এগুলো আমরা কি করে জানব? কারণ আমরা তো সৃষ্টির অনেক পরে এসেছি, তাই সৃষ্টির আগে কি হয়েছিল কি করে জানব আমরা।

এ সবই হচ্ছে বিভিন্ন মত, কিন্তু বিভিন্ন মতকে সঙ্গতিপূর্ণ ও যুক্তিযুক্ত একটা সূত্রে দৃঢ় করবার জন্য প্রথমে বললেন ভগবানই সব করেন। তারপরে বললেন ভগবান সব কিছুই করছেন বটে কিন্তু তিনি অনাসক্ত, তাঁর কর্মেও স্পৃহা নেই আর কর্মফলেও কোন আসক্তি নেই। এই কথা বলার পর একেবারে শেষে বলে দিলেন, আমি কিছুই করিনা প্রকৃতিই সব কিছু করে, যদিও আমি সব কিছুর আধার আর আমি আছি বলেই প্রকৃতি সব কিছু করতে সক্ষম হচ্ছে। আমি হচ্ছি নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত স্বভাব, ভগবান হচ্ছে নিত্য, আজকে আছেন কালকে থাকবেন না, তা নয়, তিনি কখনই কোন বন্ধনে থাকেন না। কিন্তু মানুষ আমাকে বুঝতে পারে না, আমাকে না জানার জন্য তাদের কি হচ্ছে? –

**অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্। পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্।।১১।।**

এই শ্লোকে একদিকে শ্রীকৃষ্ণ নিজের কথাও বলছেন অন্য দিকে আবার অবতার তত্ত্বের কথাও বলে দিলেন। সাধারণ মানুষের মন অজ্ঞানে এমন ভাবে আবৃত হয়ে আছে তারা আমাকে মনে করে *মানুষীং তনুমাশ্রিতম্*, আমাকে ভাবে আমি বসুদের সন্তান কৃষ্ণ হয়ে এই মনুষ্য দেহধারণ করে আছি। শ্রীরামকৃষ্ণ হচ্ছে ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায়ের সন্তান। যিশু সাধনা করার পর নিজের জন্মস্থানে এসেছেন, তাঁকে দেখে লোকেরা তাঁর পেছন পেছন দৌড়াচ্ছে, কিন্তু তাঁকে যারা আগে জানত তারা বলছে আরে এতো সেই মেরীর ছেলে, যিশু নিজেই বলছেন। যিনি আধ্যাত্মিক পুরুষ তিনি একটা গর্ভকে আশ্রয় করতে হবে বলে তাও একটা গর্ভকে আশ্রয় করে জন্ম নেন, কিন্তু অবতারের এর সঙ্গে কোন সম্পর্কই নেই। এখানে কিন্তু আমাদের একটা ধারণাকে পরিষ্কার করে বুঝতে হবে, শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু ভগবান নন, শ্রীরামকৃষ্ণ কিন্তু ভগবান নন, যিনি ভগবান তিনিই শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরামকৃষ্ণ নাম ও রূপী শরীর ধারণ করেছেন। আমরা কথায় কথায় বলে থাকি শ্রীরামকৃষ্ণ ভগবান, তাতে কিছু দোষ নেই। কিন্তু যখন অবতার তত্ত্বের বিচার হবে তখন এই ব্যাপারটা মাথায় বসিয়ে রাখতে হবে। শ্রীরামকৃষ্ণ যদি ভগবান হন তাহলে কি হবে? *মানুষীং তনুমাশ্রিতম্*। কাদের কাছে? *অবজানন্তি মাং মূঢ়া*, মুর্খ যারা তারা মনে করে আমি মানবদেহ ধারণ করেছি। *পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্*, যত জীব আছে আমি যে তাদের

মহেশ্বর, আমি যে ভগবান এটা তারা বুঝে উঠতে পারেনা। তারা মনে করে আমি ক্ষুদিরামের সন্তান, আমি অমুক দিন জন্ম নিলাম আর অমুক দিন মারা গেলাম। ইনি দক্ষিণেশ্বর সাধনা ভজন করে মহাপুরুষ হয়েছিলেন, এর বেশি তারা ভাবতে পারবে না। যিনি অবতার তিনি জন্ম নেন না, তিনি দেহ ধারণ করেন। আমি আপনি দেহ ধারণ করি না, আমরা জন্মাই, আমাদের ক্ষেত্রে *ভূতগ্রামমিমং কৃৎস্নমবশং প্রকৃতের্বশাৎ*, অবশং, আমরা অবশ, আমরা চাইলেও এই জন্ম-মৃত্যু থেকে বেরোতে পারব না, নাকে দড়ি দিয়ে আমাদের কর্ম টেনে নিয়ে আসবে। যখন কুকর্ম করে করে শুঁয়ো পোকা হয়ে জন্মাবার সময় হয়েছে তখন আমাকে নাকে দড়ি দিয়ে টেনে ওখানেই নিয়ে যাবে। কিন্তু ভগবান যখন অবতার হয়ে আসেন তাঁকে এই রকম টেনে আনা হয় না, তিনি তাঁর ইচ্ছায় দেহ ধারণ করেন। একজন কয়েদী যখন বাইরে কোথাও যায় তখন তাকে চার পাঁচজন পুলিশ ঘিরে থাকে, পুলিশ তাকে যেদিকে টেনে নিয়ে যাবে তাকে ঐদিকেই যেতে হবে, এটা হচ্ছে আমাদের অবস্থা। প্রধানমন্ত্রী যখন কোথাও যান তাঁকেও তাঁর আগে পিছে ব্ল্যাক ক্যাট কমাণ্ডোরা ঘিরে রাখে, কিন্তু প্রধানমন্ত্রী যেদিকে যাবেন কমাণ্ডোগুলো সেই দিকেই যাবে, ভগবানের ক্ষেত্রে এইটাই হয়। দুজনকেই প্রকৃতি ঘিরে রেখেছে। পুলিশও কয়েদীকে ঘিরে রাখে আবার প্রধানমন্ত্রীকেও ঘিরে রাখে। কিন্তু পুলিশ যেদিকে যাবে কয়েদীকে সেই দিকেই যেতে হবে, আর প্রধানমন্ত্রী যেদিকে যাবেন পুলিশকে সেই দিকেই যেতে হবে। আমাদের প্রকৃতি যেদিকে নাকে দড়ি দিয়ে অবশ করে টেনে নিয়ে যাবে সেই দিকেই আমাদের যেতে হবে। অবতার হয়ে ভগবান যখন দেহ ধারণ করেন তখন তিনি যেদিকে যাবেন প্রকৃতি তাঁর পেছনে পেছনে যাবে।

সেইজন্য এই শ্লোকে বলছেন, যারা মুর্খ তারা মনে করে আমি একজন এদেরই মত মানুষ, দেবকীর গর্ভ থেকে আমি জন্ম নিয়েছি। হে অর্জুন তুমি কিন্তু এই রকম কখনই মনে করো না। আমি স্বেচ্ছায় এই দেহ ধারণ করেছি, দেহ ধারণ করা মানে গর্ভের মাধ্যমে নয়, মনে হচ্ছে আমি গর্ভজাত। কিন্তু তা নয়, এটা আমিই দেখাই, কারণ হঠাৎ যদি আমি কোন গর্ভ ছাড়াই সোজা নেমে এসে দাঁড়িয়ে বলি আমি ভগবান, তাহলে লোকে আমার কথা কি শুনবে, যাও বা একটু শুনত তাও তখন শুনবে না। আর এই ভাবে দেখতে চাইলেও আমাকে দেখতে পারবে না, কারণ এই ইন্দ্রিয় আর এই মন দিয়ে আমাকে কখনই দেখা বা জানা যায় না। এই ইন্দ্রিয় আর এই মন নিয়ে যাকে জানা হয় তাকে বাধ্য হয়ে মানুষ রূপেই আসতে হবে। আমরা তো তন্মাত্রাই দেখতে পাইনা, আকাশতত্ত্বকেই দেখতে সক্ষম নই ভগবানকে আমরা কোথা থেকে দেখব। তার ফলে মানুষরূপে যদি তিনি আকাশ থেকে নেমে আসেন তাহলে মনে করব ইনি আমাদেরই মত একজন। যদি কোন সন্ন্যাসী আমার সাথে হাসি গল্প করেন তখন আমি মনে করব ইনি আমাদেরই মত একজন, এতে সন্ন্যাসীর কিছু হবে না, মাঝখান থেকে আমার সর্বনাশ হয়ে যাবে। সেই রকম আমরা যদি মনে করি শ্রীরামকৃষ্ণ আমাদেরই মত একজন, তবে আমাদের থেকে একটু এগিয়ে ছিলেন, এতে ঠাকুরের কিছু হবে না, আমাদেরই ক্ষতি হবে। উচ্চ স্তরের সম্মানীয় মহারাজরা আমাদের সাথে কত মিষ্টি করে কথা বলেন, কত আপনার মত সহজ ব্যবহার করেন আমাদের সাথে, এটা তাঁর মহত্ত্ব, কিন্তু তাই বলে আমিও তাঁর সাথে মুর্খের মত ব্যবহার করতে পারিনা। এই রকম ব্যবহার কারা করে যারা মূঢ়াঃ, এরাই আমাকে মানুষের মত ভেবে ব্যবহার করে। এর ফলে কি হয়?

**মোঘাশা মোঘকর্মাণো মোঘজ্ঞানা বিচেতসঃ। রাক্ষসীমাসুরীঞ্চৈব প্রকৃতিং মোহিনীং শ্রিতাঃ।।১২।।**

এরা, যারা ভগবানকে মানুষের মত ভাবে আর ভগবান, সাধুসন্তদের সাথে সাধারণের মত ব্যবহার করে, এদের *মোঘাশা*, মানে এদের সব আশা, কামনা ব্যর্থ হয়। *মোঘকর্মাণো*, এরা যত রকমের কর্ম করে, মানে, যত যজ্ঞ-যাগ, পূজো অর্চনা যাই করুক না কেন, কোন কর্মরেই ফল হয় না। *মোঘজ্ঞানা*, যত জ্ঞান অর্জন করছে, যত চিন্তন করছে সবই এদের নিষ্ফল হয়ে যায়। কেন সব কিছু নিষ্ফল হয়ে যাচ্ছে? কারণ, অন্তরাত্মা যিনি, তাঁকে অনাদর করা হচ্ছে। এখানে আলোচনার বিষয় হচ্ছে, শ্রীরামকৃষ্ণকে যারা মনে করছে একজন সাধারণ মহাত্মার স্তরের মানুষ, কিংবা যাঁরা আধ্যাত্মিক পুরুষ, যাঁরা আধ্যাত্মিক পথে এসেছে তাঁদেরকে অবজ্ঞার চোখে দেখে, এই ধরণের লোকদের নিয়েই ভগবান আলোচনা করছেন। এদের সব কিছুই নিষ্ফল হয়ে যায়। যিনি অন্তরাত্মা তাঁকেই এরা সরিয়ে দিয়েছে, অন্তরাত্মাকে সরিয়ে যে দিয়েছে সেতো অসুর হয়ে গেল। তখন তার সব কিছুই আসুরিক শক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে, কারণ দৈবী শক্তিকে নিষ্প্রভ করে দেওয়া হয়েছে। যখন সব কিছু আসুরিক শক্তিতে চালিত হয় তখন এক রকম অবস্থা তৈরী হয়, আর যখন দৈবী শক্তিতে চলে তখন অন্য রকম ভাবে সব কিছু চলবে। আসুরিক শক্তিতে সব সময় শক্তি আর ক্ষমতার জোরেই চলে, তবে এই জিনিষ বেশি দিন চলে না, কারণ যখন দৈবী আর আসুরিক শক্তির লড়াই হয়ে তখন আসুরিক শক্তি সব সময়ই মার খায়। ভারতের আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের উপর কত হাজার হাজার অত্যাচার হয়েছে, এখনও হচ্ছে, কিন্তু কোন অশুভ শক্তিই ভারতের সনাতন ধর্মের কিছুই ক্ষতি করতে পারছে না। এখানে তাই বলা হচ্ছে, অন্তর্যামীকে যে অবহেলা করে, অবজ্ঞা করে তাদের যাবতীয় ভালো কর্ম নষ্ট হয়ে যায়। মোঘাশা, মোঘ মানে মিথ্যা, সমস্ত আশা তার মিথ্যা হয়ে যায়। কিন্তু যাঁরা মহাত্মা, যাঁরা মহাপুরুষ তাঁদের কি হয়?

**মহাত্মানস্তু মাং পার্থ দৈবীং প্রকৃতিমাশ্রিতাঃ। ভজন্ত্যনন্যমনসো জ্ঞাত্বা ভূতাদিমব্যয়ম্।।১৩।।**

যাঁরা মহাত্মা তাঁরা দৈবী প্রকৃতিকে আশ্রয় করেন। দৈবী প্রকৃতির আশ্রয় নেওয়ার ফলে এঁরা আমাকে ঠিক ঠিক জেনে নেয় যে, আমিই এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের যা কিছু সবার আদি কারণ এবং আমি অবিনাশী। এই ভাবে আমাকে বুঝে নেওয়ার পর শ্রদ্ধাদিযুক্ত হয়ে মহাত্মারা শুধু মাত্র আমারই ভজনা করেন।

১২ই সেপ্টেম্বর ২০১০

যাঁরা মহাত্মা তাঁরা বিশেষ ভাবে ভগবানকে বোঝার চেষ্টা করেন। শাস্ত্র ও আচার্যের মুখে শুনে শুনে একটা জিনিষকে তাঁরা খুব ভালো করে বুঝে নেন। সেটা কি? *ভূতাদিম্*, আমাকে মনে করেন আমি সমস্ত ভূতের আদি, জগতের যা কিছু আছে আমিই হচ্ছি সব কিছুর অবলম্বন, আমি না থাকলে কোন কিছুই কিছু নয়। আমার ব্যাপারে আর কোনটা বিশেষ ভাবে জেনে নেন? আমি *অব্যয়ম্*, ভগবানই আছেন, চিরদিন তিনিই থাকবেন। এখানে ভগবানের একটা বিশেষ দিকের বর্ণনা করা হচ্ছে। গীতাতে বিভিন্ন জায়গায় ঈশ্বরকে বিভিন্ন দিক দিয়ে বর্ণনা করা হয়েছে। ঠিক এই মুহূর্তে আমরা ঈশ্বরকে যে ভাবে ভজনা ও চিন্তন করি, ঠিক এই জিনিষটাই গীতাতেও আসবে। আমরা যেহেতু ভারতের আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যকে জানতে চাইছি, সেইজন্য আমাদের জেনে নেওয়া উচিৎ যে ভারতের বিভিন্ন শাস্ত্রে ঈশ্বরকে কত ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, বেদে একভাবে ঈশ্বরকে বর্ণনা করা হয়েছে, বাল্মীকি রামায়ণে অন্য ভাবে দেখানো হয়েছে। তবে বাল্মীকি রামায়ণে ঈশ্বরের বর্ণনা ঠিক এই ভাবে আসেনি, যে বর্ণনা আমরা গীতাতে পাচ্ছি। কিন্তু বর্তমান যুগে হিন্দুরা, একজন রিক্সাওয়ালা থেকে শুরু করে আপামর হিন্দু সমাজ ঈশ্বর সম্বন্ধে যে ভাব ও ধারণা পোষণ করে আসছে তার সাথে গীতাতে যে ঈশ্বর সম্বন্ধে ধারণার কথা বলা হয়েছে সেটা এক। গীতার ভাবগুলো সাধারণ মানুষ হয়তো ধরতে পারবে না কিন্তু বেশ কিছু ঈশ্বরের ধারণা গীতা থেকেই এসেছে। কারণ ঈশ্বর বলতে যা বোঝায় সেই ব্যাপারে গীতার ভাব আর পুরানের ভাব এক। আর পৌরানিক কথা ও কাহিনী সাধারণ মানুষ শৈশব কাল থেকে পরম্পরা গত ভাবে শুনে আসছে, ইদানিং কালের বাচ্চারা হয়তো আগের মত অতটা শুনতে পায় না, কিন্তু সাধারণ ভাবে ঈশ্বরীয় ভাবগুলো হিন্দুরা ভালো ভাবেই জানে। এখানে বলা হচ্ছে, ঈশ্বরের ঐ যে ভাব, তিনি অব্যয়, সমস্ত ভূতের আদি কারণ, তিনিই একমাত্র অবলম্বন, এইটাই যার ভাব আর এই ভাবকে যে আশ্রয় করে নেয় তিনিই মহাত্মা। মহাত্মারা এই ভাবটাকে বুঝে নিয়ে এই ভাবটাকে দৃঢ় করে ধরে নেয়। সাধারণ লোক সেও এইটুকু জানে যে ঈশ্বরই সব কিছুর কারণ, কিন্তু সে এই ভাবকে ধরে রাখতে পারেনা।

গীতাতে তিন রকম মানুষের বর্ণনা করা আছে। প্রথম ধরণের যারা, তারা ঈশ্বর সম্বন্ধে কিছুই জানেনা, বোঝে না আর আদিম বর্বর লোকেদের মত পাথর, গাছ এই সবের পূজো করে যাচ্ছে। এদেরকে নিয়ে ভগবান দুঃখ প্রকাশ করছেন। দ্বিতীয় ধরণের যারা, তারা ভগবানের কি স্বরূপ সেটা মোটামুটি বোঝে, এরা মনে করছে এইটুকু বুঝে নিলেই চলে যাবে, এর বেশি কিছু করার দরকার নেই। মানে এরা জানে, কিন্তু ভজনা করে না। আর তৃতীয় যারা, তার জানে এবং ভজনা করে। প্রথম ধরণের লোকেদের নিয়ে এখন আর কোন সমস্যা নেই, এই সমস্যাটা গীতার সময়কার। এখন সমস্যা হচ্ছে দ্বিতীয় আর তৃতীয় শ্রেণীর লোকেদের নিয়ে, যে জানে করবে না, বা একটু নমো নমো করে সেরে নিল, না করলে মনে খুঁতখুঁত করবে, কারণ ভেতরে পাপের ভয় আছে। আর কিছু কিছু আছেন যাঁরা ঈশ্বরের ভাব সম্বন্ধে জেনে নিয়েছেন তাঁরা এটাকেই ধরে রাখবেন, ঈশ্বরে ভক্তি করতে যা বোঝায় এর সবচেয়ে বেশি বর্ণনা নবম অধ্যায়ে করা হয়েছে। যদিও দ্বাদশ অধ্যায়কে ভক্তিযোগ বলা হচ্ছে কিন্তু নবম অধ্যায়ের মত ভক্তির বর্ণনা দ্বাদশ অধ্যায়েও করা হয়নি। সেইজন্য ভক্তির দিক দিয়ে নবম অধ্যায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়।

তেরো নং শ্লোকে বললেন – এই মহাত্মারা আমাকে বুঝে নিয়ে একমনে দৃঢ় ভাবে ভজনা করেন, *ভজন্ত্যনন্যমনসো*, এক মন দিয়ে ভজনা করেন। কি রকম এক মন দিয়ে ভজনা করেন?

**সততং কীর্তয়ন্তো মাং যতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ। নমস্যন্তশ্চ মাং ভক্ত্যা নিত্যযুক্তা উপাসতে।।১৪।।**

ঠিক ঠিক যে ভক্ত, যে ভগবানকে পেতে চাইছে, এই জন্ম-মৃত্যু চক্র থেকে যে বেরোতে চাইছে আর একমাত্র ভগবানকেই অবলম্বন করে রাখতে চাইছে তারা *সততং কীর্তয়ন্তো মাং*, সতত, মানে সব সময়, সর্বদা। সকাল বেলা দশ মিনিট জপ করল আর সারাদিন নিজের মত ঘুরে বেড়াচ্ছে তা নয়, যতক্ষণ জেগে আছে সব সময় তাঁকে অবলম্বন করে থাকবে। আচার্য এর আগে বলেছিলেন – ছয় মাস কি এক বছর নয়, দীর্ঘকাল যাবৎ ভজনা করে যেতে হবে। একটা সাধারণ পিএইচডি ডিগ্রী নিতে গিয়ে কত পড়াশুনো, কত খাটতে হয়, আর ভগবানের পিএইচডি নিতে গিয়ে সকাল বিকেল পাঁচ দশ মিনিট জপ ছয় মাস করার পরেই সাধুদের এসে জিজ্ঞেস করবে এখনতো কিছুই হল না। *কীর্তয়ন্তো মাং*, ভগবানের যে স্বরূপ, তাঁর সেই ব্রহ্মস্বরূপের সব সময় চিন্তা করবে। কিভাবে করবে? *যতন্তঃ*, মানে ইন্দ্রিয় উপসংহার, এর সাথে আচার্য শঙ্কর আরও কিছু যোগ করছেন, এই জিনিষ গুলোই গীতায় ঘুরে ঘুরে আসে। যেখানে যেখানে ব্যাখ্যার করার প্রয়োজন মনে করেছেন আচার্য সেখানে সেখানে ব্যাখ্যা করে দিয়ে বেরিয়ে গেছেন। যেমন এখানে বলছেন, *যতন্তঃ*, মানে প্রযত্ন করছে। কিভাবে প্রযত্ন করছে? ইন্দ্রিয় উপসংহার, আমাদের দশটি ইন্দ্রিয় সব সময় চারিদিকে দৌড়ে চলেছে, উপসংহার বলতে এখানে বললেন ইন্দ্রিয়ের এই দৌড়াদৌড়িটাকে বন্ধ করে ইন্দ্রিয়গুলোকে বশে নিয়ে

আসা। আমরা গুরুজনদের কাছে, শাস্ত্রে যত ভালো কথা শুনি, তাকে বলা হচ্ছে বুদ্ধি। একটা বাচ্চাকে যদি চকলেট না খেতে দেওয়া হয় তাহলে এমন চেঁচাতে থাকবে যে সারা বাড়ি অস্থির করে তুলবে। বাচ্চারা পুরোপুরি ইন্দ্রিয়ের বশে। আর যাদের কাছে শ্রীরামকৃষ্ণ হচ্ছে আদর্শ, তিনি গুরুজনের কাছে, শাস্ত্রের কাছে যা ভালো কিছু শুনেছেন, তাঁর ব্যক্তিত্ব এই ভালোগুলোর মধ্যে পুরোপুরি বসে গেছে, এইটাই বুদ্ধি। বুদ্ধি আর ইন্দ্রিয়ের সাথে যে মিলন হচ্ছে এটা হচ্ছে মনকে দিয়ে। অর্থাৎ বুদ্ধি আর ইন্দ্রিয়ের মাঝখানে রয়েছে মন। মন আবার বাড়ির মায়েদের মতন, বাবারা হচ্ছে বুদ্ধি আর বাচ্চারা হচ্ছে ইন্দ্রিয়ের মত। বাচ্চারা সব সময় চঞ্চল হবেই আর তারা বদমাইশি করবেই। মায়েরা করেন কি, তারা একবার বাড়ির কর্তা বাবার কথা শুনতে যায় আরেকবার সন্তানের কথা শুনতে যায়, একবার ছেলেকে সামলায় একবার বাবাকে সামলায়। বাবা হচ্ছে বুদ্ধি, সে বলছে – না না, এসব করা চলবে না। ইন্দ্রিয়ের সাথে বুদ্ধির সরাসরি যোগ নেই, মনের মাধ্যমেই ইন্দ্রিয়ের সাথে বুদ্ধির যোগ। বুদ্ধি যে ইন্দ্রিয়কে বশে আনবে সেটা তাকে মনের সাহায্যেই বশে আনতে হয়। মন বেচারি বাচ্চা বয়স থেকে ইন্দ্রিয় মানে বাচ্চাগুলোকে প্রশ্রয় দিয়ে ছেড়ে রেখেছে, তারপর হঠাৎ একদিন যদি বাচ্চাকে বলে – না এই রকমটি করা যাবে না। ইন্দ্রিয় তখন মনের কথা কেন শুনতে যাবে, মনকে সে গ্রাহ্যই করবে না। এখন আমরা এখানে শাস্ত্রাদি শুনে ঠিক করে নিলাম সন্ধ্যে বেলা ধ্যান করতে হবে। ইন্দ্রিয় তখন বলবে আমিতো এই সময় টিভিতে এই সিরিয়ালটা দেখি, এখন কেন ধ্যান করতে যাব, ওসব চলবে না। বুদ্ধিও আড়াল থেকে ফিস ফিস করে ইন্দ্রিয়কে বলে যাচ্ছে – উঁহু, উঁহু, ওরকম করা চলবে না। ইন্দ্রিয়ও ছাড়বে না, সে বলবে পঞ্চাশ বছর ধরে সন্ধ্যে বেলা এই সব করে যাচ্ছি, আর আজকে হঠাৎ তুমি আমাকে এই সব কি করতে বলছ! মন তাই একটু বসেই উঠে পড়ে, মন নিতে পারেনা। আর যদি মন বেশি বাড়াবাড়ি করতে যায় তাহলে সে পাগল হয়ে যাবে। যত পাগল আছে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই হচ্ছে ইন্দ্রিয় আর বুদ্ধির তীব্র লড়াই। মন বেচারি আর কি করবে, সে মা কিনা। ছেলে অবাধ্য হয়ে গেছে, বাবার কথা শুনছে না, মাকে তো পাত্তাই দিচ্ছে না, তখন বেচারি মা বসে কাঁদতে থাকে। ইন্দ্রিয় আর বুদ্ধির লড়াই হচ্ছে ছেলের আর বাপের লড়াই, সেখান মন বেচারি মা অসহায় হয়ে ভেঙ্গে পড়ে একবার স্বামীকে সামলায় আরেকবার ছেলেকে সামলায়, বুঝে উঠতেই পারেনা কার পক্ষ অবলম্বন করবে। যখন কাউকেই সামলাতে পারেনা তখনই তার মাথাটি বিগড়ে যায়। সেইজন্য আধ্যাত্মিক জীবনে দুম্ করে একদিনেই জোর জবরদস্তি করে বেশি কিছু করতে নেই। একটু একটু করে শুরু করতে হয়। ইন্দ্রিয়গুলোকে ভালো করে মিষ্টি ভাবে বলতে হয়, ভাই এত কিছু অনেকদিন তো ভোগ করলে, আজ থেকে এইটুকু বন্ধ কর, সবটা করতে হবে না, এতটুকু তুমি বন্ধ কর। কিছু দিন চলার পর ইন্দ্রিয়কে বোঝাতে হয়, ঐটুকু বন্ধ করে তোমার কি কোন কষ্ট হয়েছে? কিছুইতো অসুবিধা হয়নি, বরং বেশ ভালই লাগছে। তাহলে আজ থেকে এটাকেও বন্ধ কর। এইভাবে ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধিকে একজোট করে আধ্যাত্মিক সাধনার লড়াই চালিয়ে যেতে হয়।

শুদ্ধ বুদ্ধি আর শুদ্ধ আত্মা এক। কারণ শুদ্ধ আত্মা আর ইন্দ্রিয়ের ব্যবহার এক রকম হয়ে যায়। এই হচ্ছে *যতন্তঃ*, প্রথমে ইন্দ্রিয়কে বশে আনতে হবে। যদি ইন্দ্রিয় সংযমে না থাকে, ধ্যান করার সময় মাথায় যদি ঘোরে এখন টিভিতে এই সিরিয়াল চলছে, বা আজকে এক্ষুনি একটু জপ ধ্যান করেই উঠে পড়তে হবে কারণ আজকে ভালো ওয়ান ডে ম্যাচ আছে। তাহলে বুঝে নিতে হবে এখনও তার *যতন্তঃ* হতে অনেক দেরী আছে। এখন তাড়াহুড়ো করার কিছু নেই, গীতাতেও বলছে কত জন্ম তোমার এখনও পড়ে আছে। এই ব্যপারেও গীতাতে শেষে বলবে কি করতে হবে, কেন করতে হবে। হাতে সময় থাকতে থাকতে না করে নিলে অনেক মুশকিল। মৃত্যুর সময় হঠাৎ একটা কিছু দেখে নিলাম আর মনটা সেইদিকে চলে গেল, আর সেই কিছু যেটা দেখে নিলাম এখন সেই কিছুর সংস্কার নিয়ে হয়তো আমার কেঁচো যোনিতে জন্ম নিতে হল। সারা জীবন ভালো সব কিছু করে এলাম আর মৃত্যুর সময় হঠাৎ কেঁচোর কথা মনে পড়তেই কেঁচো কেঁচো করতে করতেই প্রাণবায়ু বেরিয়ে গেল। এখন মাথার মধ্যে কেঁচো ছিল মরে গিয়ে আমাকে সেই কেঁচোই হতে হবে। এবার কেঁচোর যত সংস্কার আমার মধ্যে আগে থাকতে সঞ্চিত ছিল সেগুলো বেরোতে থাকবে, হয়তো খুব ভালো কেঁচোই হব, আমারতো বোধ থাকবে যে মানুষ থেকে কেঁচো হয়েছি। তাই গীতা থেকে শুরু করে যত আমাদের শাস্ত্র আছে সবাই বলে যাচ্ছে বাপু তুমি অতি ভাগ্য করে এই মনুষ্য জন্মটি পেয়েছ, এই মনুষ্য জন্মকে তুমি কাজে লাগাও, এই জন্মকেই যদি কাজে না লাগাত পারো তাহলে তোমার সর্বনাশ হবে, এই সুযোগকে হাতছাড়া করো না। এরপর কোথায় আবার ঘুরপাক খাবে কোন ঠিক নেই। কেননা একমাত্র মানব শরীরেই ঈশ্বর চিন্তন করা যায়, আর কোন যোনিতে জন্ম নিলে ঈশ্বর সাধনা করতে পারবে না।

তাই আচার্য ইন্দ্রিয় উপসংহারের কথা বললেন। তারপর বলছেন শম আর দমের কথা, এই দুটোতেও সেই ইন্দ্রিয় সংযমের কথাই বলা হচ্ছে। দয়ার ভাব, মানে সবার প্রতি করুণা দেখাতে হবে। আমাদের চারিদিকে তাকালে দেখি কারুর মধ্যে এতটুকু শান্তি নেই, তার ফলে সবাই সবাইকে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে চিৎকার করে কথা বলে যাচ্ছে। কেউ একটু মিষ্টি করে কথা বলে ঠাণ্ডা করতে গেলে চেঁচিয়ে বলবে – আপনি কি আমাদে দয়া দেখাচ্ছেন! আরে ভাই তুমি তো আমার বিরাট প্রশংসা করে দিলে, আমি যদি দয়া দেখাতে পারতাম তাহলে তো আমি নিজেই ধন্য হয়ে যেত, মানুষের মধ্য দয়া কোথায়? দয়া তো একমাত্র ভগবানের হয় আর অবতার পুরুষের হয়। যখন কারুর প্রতি আমার দয়া হয় তাহলে বুঝে নিতে হবে আমি তাকে ভালোবেসে ফেলেছি। যাঁরা সাধু মহাত্মা তাঁরা যেখানেই কারুর কষ্ট দেখেন তখনই তাঁর প্রতি তাঁদের মনটা করুণায় ভরে ওঠে। করুণা যখন হয়ে যায় তিনি তখন সব সময় চাইবেন তার যাতে ভালো হয়। সাধু আর বিছের গল্প আমরা অনেকেই জানি। এক সাধু নদীত স্নান করতে গিয়ে দেখেন জলের

স্রোতে একটা বিছে ভেসে যাচ্ছে। সাধু গিয়ে বিছেটাকে তুলে ফেলতে গিয়ে বিছেটা সাধুর হাতে হুল ফুটিয়ে দিয়েছে। বিছেটা আবার কিভাব জলে মধ্যে পড়ে আবার ভেসে যাচ্ছে দেখতে পেয়ে সাধু আবার গিয়ে বিছেটাকে তুলতে গেছে বিছেটা আবার তার হাতে হুল ফুটিয়ে দিয়েছে। যারা নদীর পারে দাঁড়িয়ে এই দৃশ্য দেখছিল তারা সাধুকে বলছে, আরে, আপনাকে বিছেটা বারবার কামড়াচ্ছে তাও আপনি তাকে বাঁচাতে যাচ্ছেন কেন, বিছেটা জলে ভেসে যাচ্ছে যাক। সাধু বলছেন – এই বিছে অতি ক্ষুদ্র জীব, এ তার স্বভাবকে ছাড়তে পারছে না, কিন্তু আমিতো সাধু মহাত্মা, আমার এই যে দয়ার স্বভাব, করুণার স্বভাব, আমি কি করে আমার স্বভাবকে ত্যাগ করতে পারি। এইটাই হচ্ছে প্রকৃত দয়া। আমি যার ভালো করছি সে আমার উপর বিষ ঢেলে দিচ্ছে, আমিও আঁতকে উঠছি, আমার এই শরীর, শরীরের স্নায়ু, রক্তপ্রবাহ, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস সবই স্বাভাবিক, শুধু স্বাভাবিকই নয় যাঁরা সাধু সন্ত, সাধনা করে করে তাঁদের শরীর অত্যন্ত কোমল ও প্রচণ্ড স্পর্শকাতর হয়ে যায়। তাই একটুতেই তাঁদের প্রচণ্ড কষ্ট হয়, কষ্টে আঁতকেও ওঠেন। লুচি খেতে গিয়ে ঠাকুরের গাল ছড়ে যেত, মাখনের মত এতই তাঁর শরীর কোমল ছিল। যাঁরা সাধনা করেন তাঁদের এটা একটা লক্ষণ, শরীরের চামড়া খুব নরম হয়ে যায়, কণ্ঠস্বর খুব মিষ্টি হয়ে যায় আর মনটাও খুব কোমল হয়ে যায়। আধ্যাত্মিক উন্নতি আমার হচ্ছে কিনা এগুলো হল তার লক্ষণ।

দয়ার পর বলছেন, *হিংসাদিলক্ষণৈঃ,* হিংসাদি এগুলো খসে যায়। হিংসা কোন কার্য নয়, হিংসা হচ্ছে মনের একটা অবস্থা। একটা মানুষ বাইরে দিয়ে মিষ্টি কথা বলতে পারে কিন্তু ভেতরটা হিংসায় পরিপূর্ণ, হিংসাতে ভেতরে গজ্‌গজ্ করতে থাকে। কারুর বাড়িতে গেলে বা রাস্তায় দেখা হলেই বলবে – So nice to meet you, কিন্তু মনে মনে বলবে তুমি আমার বাড়িতে থেকে বেরিয়ে গেলে আমি হাঁফ ছেড়ে বাঁচি। হিংসাতে ভেতরটা ভর্তি কিন্তু বাইরে মিষ্টি হাসি, ছোট থেকে শেখান হয়েছে এইভাবে কথা বলতে। এখানেও বুদ্ধি আর মনের সাথে লড়াই, কিন্তু কি করবে সমাজ বলে দিয়েছে কটূ ব্যবহার করতে নেই। তারপর কদিন পর পর ডাক্তারকে গিয়ে বলবে, ডাক্তারবাবু, আমার রাত্রে ঘুম হয় না। ভেতরে এতো হিংসা নিয়ে ঘুম হবে কি করে।

তারপরে ভগবান বলছেন *দৃঢ়ব্রতাঃ,* মানে তাঁর যা কিছু ধারণা হয়ে গেছে সেটাতে সে স্থির। অনেকে চুপচাপ বসে আছে কিন্তু অনবরত পা নাচিয়েই যাবে, পা নাচান কিছুতেই থামাবে না, কেউ হয়তো টেবিলে আঙুল দিয়ে তবলা বাজিয়েই যাবে, এগুলো হচ্ছে চঞ্চল মনের লক্ষণ। মন যখন চঞ্চল থাকে, তখন মন নার্ভগুলিকে চঞ্চল করে দেয়, নার্ভ যখন চঞ্চল হয় তখন একেক জনের শরীরের একেকটি অঙ্গের মাধ্যমে সেটাকে অভিব্যক্ত করতে থাকবে। সুউচ অন্ করলেই যেমন লাইট জ্বলে, পাখা ঘুরতে থাকে, এখানেও ব্রেন যখন চঞ্চল হয় তখন ব্রেন থেকে ফায়ারিং হতে থাকে। নিউরোলজিতে বলে দুটো নিওরনের মাঝখানে একটু ফাঁক থাকে সেখানে আক্ষরিক ভাবে ইলেক্ট্রিক্যাল স্পার্ক জাম্প করে। সেখান থেকে কনেকশন হয় আর তা থেকে ফায়ারিং হতেই থাকে। কিন্তু যাঁরা সাধু সন্ন্যাসী তাঁদের এই ফায়ারিংটা বন্ধ হয়ে যায়। যাদের ফায়ারিং বন্ধ হয় না, আবার কিছু করতেও পারছে না তখন আপন মনে বিড়বিড় করে যাবে, আপন মনে কথা বলেই যাবে, আসলে ব্রেনে ফায়ারিং হচ্ছে, এগুলো চঞ্চল মনের লক্ষণ। *দৃঢ়ব্রতাঃ* হয়ে গেলে এই জিনিষ গুলো বন্ধ হয়ে যায়, শুধু শারীরিক ভাবেই সে স্থির হয়ে যায় না, মানসিক ভাবেও একেবারে স্থির। ঈশ্বরের যখন ভজনা করছে, ধ্যান করছে তখনও সে এই রকম স্থির হয়ে যায়।

আর কি করেন? *নমস্যন্তঃ,* যিনি হৃদয়ে বাস করছেন তাঁকে প্রণাম করছেন। *ভক্ত্যা নিত্যযুক্তা উপাসতে,* ভক্তিভাবে পরম প্রীতিপূর্বক সে সর্বদা আমারই উপাসনা করে। এখানে কয়েকটি লক্ষণ বলে দিলেন। সব সময় সে আমার নাম করে যাচ্ছে, স্থির হয়ে সব সময় প্রযত্ন করে যাচ্ছে, যা কিছু করছে সেটা আমারই সেবা, পূজা অর্চনা মনে করে সব সময় আমাতে যুক্ত হয়ে ভক্তি সহকারেই করে। কি ভাবে, আর কার পূজা অর্চনা করছে? ভক্তির কথাই পর পর বলে যাবেন –

**জ্ঞানযজ্ঞেন চাপ্যন্যে যজন্তো মামুপাসতে। একত্বেন পৃথক্ত্বেন বহুধা বিশ্বতোমুখম্।।১৫।।**

এর আগে যারা ভক্তির অনুশীলন করেন তাদের কথা বলা হল, এখন বলছেন যারা জ্ঞানের অনুশীলন করেন তাঁরা কি করেন? *জ্ঞানযজ্ঞেন* বলতে আচার্য শঙ্কর বলছেন ভগবদ্ বিষয়ক জ্ঞান, ঈশ্বর সম্বন্ধীয় যে জ্ঞান সেটাকেই সে সব সময় চিন্তন করে যাচ্ছে। এই ধরণের সাধক যে সব সময় ভক্তদের মত পূজা অর্চনা, যোগীদের মত কর্ম করছে তা নয়, কিন্তু সে শাস্ত্র থেকে ঈশ্বরের সম্বন্ধে যা শুনেছে, শাস্ত্র অধ্যয়ণ করে ঈশ্বরের সম্বন্ধে যে জ্ঞানের ধারণা হয়েছে সেটাই তার মনে সব সময় চিন্তন চলতে থাকে।

এদের যে উপাসনা তার যে বিশেষত্ব তা হচ্ছে *একত্বেন,* আচার্য শঙ্কর বলছেন, *একমেবং পরং ব্রহ্ম ইতি পরমার্থ দর্শনম্।* এদের কাছে পরম ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছু নেই, এই ভাবটাই সব সময় সে ধরে রাখে। অর্থাৎ, যাঁরা জ্ঞানযজ্ঞ করছেন, তাঁরা আমাকে এক ও অদ্বিতীয় মনে করেই উপাসনা করছেন, *একত্বেন,* মানে একমাত্র ব্রহ্মই আছেন, ব্রহ্ম ছাড়া কিছু নেই। তাহলে আমাদের সামনে এত কিছু দেখছি এগুলো তাহলে কি? এগুলোও তিনিই, প্রত্যেকেই সেই ব্রহ্মেরই স্বরূপ। তাহলে আমার যদি রাগ হয় এবং রাগ হলে আমি অপরকে দুটো মন্দ কথাও বলছি। কিন্তু আমি কি করে তাকে গালাগাল দেব, সেতো আমারই স্বরূপ, নিজের স্বরূপের

উপর তো কোন ক্রিয়া করা যায় না। তাহলে আমি অপরকে নিয়ে কোন লোভ করতে পারব না, কোন শোক করতে পারব না, কোন মোহ করতে পারব না। কোন কিছুই করা যাবে না। কি করে করবে? যখনই সব এক বোধ হয়ে গেল, আমারই স্বরূপ সব কিছুতে দেখছি, তখন নিজের উপর নিজে কি করে কার্য হবে। আমি আমার ডান হাত দিয়ে জগতের সব কিছু ধরে নিতে পারি, কিন্তু আমার ডান হাত দিয়ে আমি কখনই আমার ডান হাতকে ধরতে পারব না।

আমি যখন সেই ব্রহ্ম স্বরূপকেই দেখছি, সবটাই সেই এক আত্মা দেখছি, তখন লোভ, শোক, মোহ কি করে আর আসবে। মানুষ লোভ কখন করে? যখন সে অভাববোধ করে তখনই সে লোভ করে, মোহ করে, আমার এটা চাই সেটা চাই করে। শোকটাও সেই অভাব বোধ থেকেই হচ্ছে, একটা জিনিষ তার কাছ থেকে চলে গেল, তখন সেই জিনিষটার অভাব বোধ থেকে শোক উৎপন্ন হচ্ছে। কিন্তু যিনি সব সময় পুরো বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডকে ব্রহ্মস্বরূপ দেখছেন তখন তার আর কিসের থেকে অভাব বোধ আসবে। দুই বোধ থাকলেই অভাব আসবে, আমি আর তুমি আলাদা, আমার ওকে না হলে চলবে না, বা এই লোকটি আমার কাছ থেকে চলে গেলে বাঁচি, কিন্তু যখন দেখছি সেও যা আমিও তাই, তখন আর কে কাকে চাইবে আর কেই বা কার কাছে থেকে সরে আসবে। এই কথাগুলো খুবই উচ্চ অবস্থার কথা, প্রথম প্রথম শুনলে কিছুই ধারণা করে যায় না। কিন্তু অনেক দিন ধরে এই উচ্চ তত্ত্বকে নিয়ে চিন্তন করতে থাকলে একটা সময় এই তত্ত্বের ধারণা একটু একটু করে স্পষ্ট হতে থাকে। যখনই কোন সঙ্কট আসে, রাগ, লোভ, দুঃখ যখনই মনের মধ্যে আসে, তখন আমরা যারা বিশেষ করে এতদিন ধরে শাস্ত্র আলোচনা করে আসছি, দু তিন মিনিট যদি শান্ত হয়ে চিন্তা করি আমি তো এত পাঠ শুনলাম, পাঠেতো কতবার শুনেছি আমি তো সেই ব্রহ্ম বা আমি তো শ্রীরামকৃষ্ণের সন্তান, যা কিছু আছে সবই শ্রীরামকৃষ্ণ, তাহলে আমি কোনটাকে নিয়ে লোভ করছি, কেনই বা শোক করতে যাচ্ছি, কেন রাগ আসবে, কেন দুঃখ করব। এইভাবে একটু চিন্তা করলেই দু মিনিটের মধ্যে নেতিমূলক সব ভাবগুলো উধাও হয়ে যাবে।

*জ্ঞানযজ্ঞেন* যাঁরা করেন তাঁরা একটা এই ভাবে করেন, আরেকটা তাঁরা করেন *পৃথকত্বেন*। যেমন একত্ব বোধে সাধনা করে আবার *পৃথকত্বেন* দিয়েও সাধনা করা হচ্ছে। *পৃথকত্বেন* কি? আমরা এখানে গীতা অধ্যয়ণ করছি, মহাভারতের সময়ে বেদের প্রভাব সমাজে তখনও ভালো ভাবেই ছিল, অর্থাৎ বেদের যত দেবতারা আছেন, সেই দেবতারা তখনও পূজো অর্চনা পেয়ে আসছিলেন। কিন্তু বেদের দেবতাদের জায়গায় এখন মা কালী, মা দূর্গা, গণেশ চতুর্থী, শিব ঠাকুরের পূজো হচ্ছে, কিন্তু সবই হচ্ছেন সেই পরম ব্রহ্মেরই একেকটি রূপ। সবাই সেই অনন্তেরই একেকটি মুখোশ পড়ে আছেন, এই অনন্তের মুখোশ যার উপর চাপিয়ে দেওয়া যাবে তিনিই পরম দেবতা বলে পূজিত হতে থাকবেন। সেই পূর্ণ ব্রহ্মই কালী, তিনিই আবার শিব, দূর্গা, তিনিই ইদানিং শ্রীরামকৃষ্ণ। এই দুটো ভাবের কথা বলা হচ্ছে, একটা ভাবে সেই পূর্ণ ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছুই নেই, একমাত্র তিনিই আছেন, এইটাই *একত্বেন* ভাব। তাঁকে যদি জিজ্ঞেস করা হয় শিব কি, বিষ্ণু কি? সে তখন বলবে আমি জানিনাতো শিব কি, বিষ্ণু কি, আমি ব্রহ্ম ছাড়া কিছুই জানিনা। দ্বিতীয় ভাব হল, আমি জানি যে শিব আছেন, কালী আছেন, বিষ্ণু আছেন, রামকৃষ্ণ আছেন। তাঁরা কে? সেই পূর্ণ ব্রহ্মেরই একটি রূপ বিশেষ মাত্র।

আরেকটি ভাব হচ্ছে *বহুধা বিশ্বতোমুখম্*। *বিশ্বতোমুখম্* হচ্ছে নানান ভাবে যে জগৎ লীলা হচ্ছে এটাকেই *বিশ্বতোমুখম্* বলছেন। স্বামীজী বলছেন – জীবে প্রেম করে যেই জন, সেইজন সেবিছে ঈশ্বর। এর ভাবটাই হল *বিশ্বতোমুখম্*, এই জগতে যা কিছু আছে সব তিনিই হয়েছেন, জগতের সবাইকে সেবা করলে সেই ঈশ্বরের সেবাই করা হচ্ছে। স্বামীজী এইখান থেকে এই ভাবটাকে নিয়েছেন। আমি পূজোটুজোতে বিশ্বাস করিনা, আমি মানুষেই বিশ্বাস করি। তুমি পূজোতে বিশ্বাস করতে চাইছ না, তুমি যোগ সাধনা করতে পারবে না, ঠিক আছে তোমাকে পূজোও করতে হবে না, আর যোগ সাধনাও করতে হবে না, মানুষেই যদি তোমার বিশ্বাস তাহলে মানুষের সেবাই কর। মানুষের সেবা যখন করা হচ্ছে তখন সেই বিরাটেরই সেবা করা হচ্ছে। ঠাকুর বলছেন ভগবান কত রূপে লীলা করেন, ঈশ্বরলীলা, নরলীলা, দেবলীলা, জগৎলীলা। এটাও একটা লীলা, জগৎলীলাটাও তাঁরই লীলা। বিশ্বরূপী ভগবানের অনেক রূপ। এই কথা নানা ভাবে ঘুরে ঘুরে গীতাতে আসবে।

ঠাকুর কাঁচা আমি আর পাকা আমির কথা বলছেন। কাঁচা আমি বন্ধন করে, পাকা আমি বন্ধন থেকে মুক্ত করে। পুরো গীতাতে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখান হবে কি ভাবে কাঁচা আমিকে ত্যাগ করতে হবে। যার মধ্যে কর্তা বোধ, মানে *অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্তাহমিতি মন্যতে*, আমি কর্তাবোধ যার আছে তার মানে সে অহঙ্কারে মত্ত হয়ে আছে, গীতা বলছে প্রথমে তুমি এই কাঁচা আমি থেকে বেরিয়ে এসো। কুয়োতে যখন বালতি ডুবে হারিয়ে যেত তখন কুয়োর মধ্যে এক ধরণের লোহার কাঁটা ফেলে দেওয়া হত, আর ঐ কাঁটার মধ্যে অনেক গুলো কাঁটা থাকে। ঐ কাঁটাটাকে কুয়োতে ডুবিয়ে নাড়তে থাকে, তখন বালতিটা কোন না কোন একটা কাঁটাতে ফেঁসে যাবে, যখনই ফেঁসে যেত তখন ঐ কাঁটাটাকে টেনে বালতিটাকে উপরে নিয়ে আসা হত। গীতা হচ্ছে এই আঁকশি কাঁটার মত, আমরা হচ্ছি বালতি, আর কুয়োটা হচ্ছে সংসাররূপী গহন কুপ। ভগবান এখন গীতা রূপ আঁকশি দিয়ে নাড়াচ্ছেন, কোন না কোন কাঁটাতে আমরা ফেঁসে যাব তখন ভগবান এই সংসার রূপ অন্ধকার গহন কুপ থেকে আমাদের উপরে তুলে উদ্ধার করবেন।

এটা একটা উপমা দেওয়া হল। এই গীতা রূপ আঁকশি দিয়ে ভগবান নাড়িয়ে যাচ্ছেন, কোন না কোন একটা কাঁটাতে ফাঁসবেই। যে কাঁটাটাই লাগুক না কেন, আমাদের এই অহং বুদ্ধিটাকে নাশ করতে হবে। আমি কর্তা এই বোধ যার নাশ হয়ে গেছে সেতো ভগবান হয়ে গেল। যত রকমের উচ্চ চিন্তন হতে পারে, সব উচ্চ চিন্তন দিয়ে আমাদের টানার চেষ্টা হচ্ছে। *একত্বেন পৃথকত্বেন বহুধা বিশ্বতোমুখম্,* গীতার এটি একটি খুব সুন্দর ও গভীর তাৎপর্যাত্মক শ্লোক। ভগবানের ভজনা তুমি কিভাবে করছ তাতে কিছু আসে যায় না। তুমি যদি বল শ্রীকৃষ্ণ আমার ইষ্ট, তুমি যদি বল শ্রীরামচন্দ্র আমার ইষ্ট, কিংবা শ্রীরামকৃষ্ণ আমার ইষ্ট কোন অসুবিধা নেই। আর যে তার নাতিকে খুব ভালোবাসে আর তাকেই ইষ্ট ভাবছে তাতেও হবে, ঠাকুরও এই একই কথা বলছেন। এইজন্য স্ত্রীদের বলা হয়েছিল তোমাদের কোন সাধনা করতে হবে না। নিজের স্বামীকে যদি স্ত্রী ঈশ্বর বলে মনে করে তাহলেই তার মুক্তি হয়ে যাবে। আধ্যাত্মিক উন্নতি তুমি যদি চাও, আধ্যাত্মিক উন্নতিই যদি তোমার উদ্দেশ্য হয়ে থাকে তাহলে এর যে কোন একটা পথ ধরে আগে তোমার অহং বোধ থেকে বেরিয়ে এসো। এখন বলছেন কিভাবে এই আধ্যাত্মিক সাধনা করা হয়, আর আপনি যে বলছেন সবই আপনি হয়েছেন, এটা কি করে সম্ভব? তখন ভগবান নিজের কিছু কিছু স্বরূপের বর্ণনা করছেন, এর আগেও করেছেন এর পরেও আবার করবেন। এত ভাবে এই কারণেই বলা হচ্ছে যে, এগুলো পাঠ করতে করতে কার মনে কখন কোন কথাটা গেঁথে যাবে বলা যায় না, এর একটা কথা যদি মনে গেঁথে যায় তাহলে তাকে আর কোন চিন্তা না করে ঐ একটা ভাবকে নিয়েই সে চড়্চড়্ করে এগিয়ে যাবে।

এর আগে চতুর্থ অধ্যায়ে চব্বিশ নং শ্লোকে যেমন ভগবান বললেন – *ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্,* এটিও গীতার খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি শ্লোক, প্রত্যেক দিন খাওয়ার সময় এটিকে নিত্য পাঠ করতে হয়। *ব্রহ্মার্পণং* শ্লোকে কি বলা হচ্ছে? যা কিছু আছে সবই তিনি। একটা কাজ করতে অনেক কিছুই লাগে, একজন কর্তা লাগে, একটা বিষয় চাই যাকে ব্যকরণে কর্ম বলছে, কর্মের আবার ক্রিয়া, কারকের বিভক্তি যেমন, করণ, সম্প্রদান, অপাদান, সম্বোধন, অধিকরণ সম্বন্ধ ইত্যাদি আবার এর পরেও একটি আছে, তা হল ফল। যখনই যে কোন কর্ম হয় তখন কর্ম এই নটির বাইরে যেতে পারেনা – ক্রিয়া, কর্ম আর কারকের সাতটি বিভক্তি। এই নয়টির বেশি হবে কিন্তু কম কখন হবে না যেমন আমি দুধ খাচ্ছি – আমি হয়ে গেল কর্তা, দুধ হচ্ছে কর্মের দ্বিতীয়া, খাচ্ছিটা ক্রিয়া। দুধ খেলে কি হয়? হৃষ্টপুষ্ট হয়। এটা হয়ে গেল ফল। আমি গ্লাশে করে দুধ খাচ্ছে, আরেকটা বেড়ে গেল। আমি গ্লাশটা হাতে নিয়ে দুধ খাচ্ছি, আরেকটা বেড়ে গেল, এই ভাবে বাড়তেই থাকবে। ব্রহ্মার্পণং মন্ত্রে বলা হচ্ছে যজ্ঞ করতে গিয়ে যা যা লাগছে কর্তা, কর্ম, ক্রিয়া, কারকের বিভক্তি সবটাই হচ্ছেন ব্রহ্ম। যেটা দেওয়া হচ্ছে, মানে কাউকে কিছু যে সম্প্রদান করা হচ্ছে সেটাও তিনি, যে দিচ্ছে সেও তিনি, যাকে দেওয়া হচ্ছে সেও ব্রহ্ম, যেটা দিয়ে দেওয়া হচ্ছে সেটাও ব্রহ্ম আর এর ফলটাও তিনি। এই ভাবটাকেই আবার এই শ্লোকের অন্য ভাবে পুনরোল্লেখ করছেন –

**অহং ক্রতুরহং যজ্ঞঃ স্বধাহহমহমৌষধম্। মন্ত্রোহহমহমেবাজ্যমহমগ্নিরহং হুতম্।।১৬।।**

যে যজ্ঞটা হচ্ছে, যজ্ঞ করতে গিয়ে যা কিছু হচ্ছে তার সবটাই আমি। *ক্রতু* বলতে বেদের যজ্ঞ গুলিকে বলা হচ্ছে, শ্রুতি বিশেষ কর্ম বলতে ক্রতুকেই বোঝায়, আর যজ্ঞ বলতে স্মার্ত কর্ম, স্মৃতিতে যে কর্মের কথা বলা হয়েছে সেই কর্মগুলিকে এখানে যজ্ঞ বলা হচ্ছে। পিতৃদের উদ্দেশ্যে যা কিছু অর্পণ করা হয়ে সেটা স্বধা মন্ত্রে অর্পণ করা হয়। যখন দেবতাদের উদ্দেশ্যে অর্পণ করা হয় তখন স্বাহা মন্ত্রে অর্পণ করা হয়। দাঁড়িয়ে যখন অর্পণ করা হয় তখন ওঁ ষট্ আর বসে যখন অর্পণ করা হয় তখন ওঁ স্বাহা বলে। স্বাহা মন্ত্রে দেবতারা গ্রহণ করছে, স্বধা মন্ত্রে পিতৃরা গ্রহণ করছেন আর ঔষধ হচ্ছে যেটা মানুষ খাচ্ছে। অনেক সময় মানুষের ক্ষেত্রেও যা কিছু খাওয়া-দাওয়া করা হয় তাকেও স্বধা বলা হয় আবার রোগ উপশমের জন্য যে ঔষুধ সেবন করা হয় সেটাকেও ঔষধ বলে, ঔষধ দুটো অর্থেই হয়। ভগবান বলছেন, এই ক্রতু, যজ্ঞ, স্বধা, স্বাহা, ঔষধ সবই আমি। আর বলছেন, *মন্ত্রোহহম্,* অর্পণের সময় যত মন্ত্র পাঠ করা হয় সেটাও আমি, *হবিঃ,* ঘি দিয়ে যেটা তৈরী করে অর্পণ করা হচ্ছে সেটাও আমি, *অগ্নি,* যেখানে অর্পণ করা হচ্ছে সেটাও আমি, *হুতম্,* এই যে কর্মটা মানে ক্রিয়া হচ্ছে সেটাও আমি, এই সমগ্র কর্মের ফলটাও আমি। বেদ পড়া থাকলে গীতা বুঝতে খুব সুবিধা হয়। মহাভারতের সময়ের যে হিন্দুধর্ম আর বৈদিক যুগের যে হিন্দুধর্ম এই দুটোকে গীতা মেলবন্ধন করাচ্ছে। মহাভারতের আগে সবাই মনে করত বেদের ধর্মই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ, কিন্তু মহাভারতের সময় আগেকার অবস্থা থেকে ধর্মে ও দর্শন অনেক সরে এসেছে। কিন্তু দুটো দর্শনকে মেলাতে হবে, এই দুটোকে মেলাবার জন্য গীতা বলছে, বেদের সময়ে তুমি যা কিছু করতে তার সবটাই আমি।

যদি খ্রীশ্চানদের বলা হয় শ্রীরামকৃষ্ণই যিশু, তাহলে আমেরিকার লোকেদের কোন সমস্যা হয় না। অনেক মুসলিম ভক্তরা মনে করেন মহম্মদ হচ্ছেন প্রফেট, মহম্মদের পরেই শ্রীরামকৃষ্ণ প্রফেট, এদের কোন সমস্যা হয় না, কারণ মুসলমানদের মধ্যে অনেকের ধারণা আছে যে মহম্মদ আবার আসবেন। ইসকন আমেরিকাতে এত সাফল্য এই কারণেই পেয়েছে, তাঁরা আমেরিকাতে বললেন শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন যিশু, এখন যিশুর খেলা শেষ। সঙ্গে সঙ্গে আমেরিকার খ্রীশ্চানরা সব শ্রীকৃষ্ণকে ধরে নিল। কিন্তু যদি বলত শ্রীকৃষ্ণও সত্য আর যিশুও সত্য, তখন খ্রীশ্চানরা কিছুই বুঝতে পারেনা, কোনটাকে ধরব। এখানেও তাই বলা হল, বেদের সময় যত যজ্ঞাদি ছিল সবই শ্রীকৃষ্ণ, তাই মহাভারতের পর বেদের দেবতাদের ছেড়ে দিয়ে শ্রীকৃষ্ণকে ধরে নিল। কিন্তু যদি বলত তুমি যজ্ঞকেও

ধরে রাখতে পার, শ্রীকৃষ্ণকেও ধরে রাখত পার, শ্রীরামকেও ধরে রাখতে পার, তাহলে মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়ে গিয়ে সব কিছু তালগোল পাকিয়ে যেত। তাই এখানে পরিষ্কার ও স্পষ্ট করে বলে দিল যজ্ঞাদি আগে যা ছিল সবই শ্রীকৃষ্ণ, লোকে তাই সঙ্গে সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকেই মেনে নিল। একবার লোকে যদি বুঝে নিল যে যা কিছু খেটেখুটে করা হোত তার সবটাই শ্রীকৃষ্ণ, তাহলে লোকে এত বিরাট আয়োজন করে কেন যজ্ঞ করতে যাবে। এই কারণে যজ্ঞের ব্যাপারটা উঠেই গেল। মানুষ এখন পূজা অর্চনার দিকে চলে গেছে। মানুষ সব সময় সহজ ও কম পরিশ্রমের কাজ করতে চায়, যদি দেখে ভারী কাজ করার যা ফল, সহজ কাজ করেও তাই ফল তাহলে মানুষ কেন ভারী কাজ করতে যাবে। শ্রীকৃষ্ণ যে শুধু যজ্ঞ, ক্রতু, স্বধা, স্বাহা এই সব কিছু হয়েছেন তাই নয়, তিনি এর থেকেও আরও অনেক উপরে। কিভাবে?

**পিতাহহমস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ। বেদ্যং পবিত্রমোঙ্কার ঋক্ সাম যজুরেব চ।।১৭।।**

জগতে যাবতীয় যা কিছু ভালো সবই আমি। *পিতাহহমস্য জগতো,* এর আগে দশ নং শ্লোকে ভগবান বলেছিলেন যে *ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্,* আমার অধ্যক্ষতায় প্রকৃতি সব কিছু করে, তার মানে আমি হলাম পিতা, এখানে দশ নং শ্লোকের সাথে সতেরো নং শ্লোকে মিল খাওয়ান হল। *মাতা ধাতা পিতামহঃ,* ভগবানই হলেন মা। এখানে কেন ভগবানকে মা বলা হল? কারণ এই ব্রহ্মাণ্ড, জগৎ প্রকৃতিরই সৃষ্টি, আর ভগবানই তো প্রকৃতি, পরা ও অপরা প্রকৃতি তাঁরই, তাই তিনি মা। ধাতা, ভগবানই সব কিছু ধারণ করে আছেন বলে তিনি ধাতা। ধাতা বলতে আচার্য এখানে বলছেন – *কর্মফলস্য প্রাণীভ্যো বিধাতা,* তিনি প্রাণীদের যার যার যা কর্মফল প্রাপ্য সেটা তাকে দিয়ে দেন, এইভাবে তিনি সব প্রাণীকে ধারণ করে আছেন। *পিতামহঃ,* তিনি আবার ঠাকুর্দা। ভগবান কেন পিতামহ? প্রকৃতির দুটো রূপ আছে, একটা রূপে ভগবানই প্রকৃতি আবার আরেকটা দৃষ্টিতে তিনিই প্রকৃতিকে জন্ম দিয়েছেন, যোগমায়া তাঁরই। তাই প্রকৃতি যেন ভগবানের মেয়ে, সেই মেয়েটি আবার মা, সেইদিক দিয়ে ভগবান আবার ঠাকুর্দা। প্রকৃতি একদিক দিয়ে ভগবানের মেয়ে, কারণ প্রকৃতি তাঁর থেকেই বেরিয়েছে। যখন আমি দেখছি তিনিই প্রকৃতি, তখন ভগবান হচ্ছেন মা। প্রকৃতি সব কিছু করছে কেন? ভগবান আছেন বলে, সেইজন্য তিনি বাবা। একদিকে থেকে তিনি আবার প্রকৃতিরও বাবা, তাই তিনি যখন প্রকৃতির বাবা তাই তিনি জগতের পিতামহ। এটা যে শুধু একটা কবিতার ছন্দের তালে বলে দিয়েছেন তা নয়, এর পেছনে স্পষ্ট যুক্তিটাও পাওয়া যাচ্ছে।

*বেদ্যং পবিত্রমোঙ্কার ঋক্ সাম যজুরেব চ, বেদ্যং* মানে ভগবানই একমাত্র জানার, *পবিত্রম্,* যা কিছু পবিত্র করে তিনিই সেটা, তিনিই ওঁ, আর তিনিই ঋক্, সাম যজুর্বেদ। এখানে প্রশ্ন আসতে পারে ভগবান কেন অথর্ব বেদের উল্লেখ করলেন না? এখানে ঋক্, সাম আর যজু হচ্ছে তিনটে ছন্দের কথা বলা হচ্ছ। অথর্বটা ছন্দের মধ্যে পড়ে না। তিনটে ছন্দের জন্য বেদকে ত্রয়ী বলা হয়, ত্রয়ী হচ্ছে তিনটে ছন্দ ঋক্, সাম ও যজু। কিন্তু যখন বেদ বলবে তখন চতুর্বেদ বলবে। এখানে ভগবানের বিভিন্ন স্বরূপের বর্ণনা চলছে। এরপর ভগবানের স্বরূপের কথা বলতে গিয়ে বলছেন –

**গতির্ভর্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ। প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্।।১৮।।**

সবই ভগবানের স্বরূপ আর ভগবান মানুষের জন্য কি কি করেন বলা হচ্ছে। বলছেন তিনি *গতির্ভর্তা,* আগে বলা হয়েছিল তিনি ধাতা। এখানে বলছেন *গতিঃ,* মানে *কর্মফলম্,* সব কর্মের কর্মফল যা আছে সেটা আমি। মানুষ যখন কোন ভালো কাজ করে সেই কাজের ফল পায়, সেই ফলটাও তিনি। আমি চাকরি করে মাসের শেষে মাইনে পাচ্ছি, সেই মাইনেটা তিনি, যা কিছু ফল আমরা পাচ্ছি সবই তিনি। তিনি না থাকলে কোন কর্মের ফল প্রসব হবে না, হলেও সব এলোমেলো হয়ে যাবে, এর কর্মের ফল তার ঘাড়ে তার কর্মের ফল এর ঘাড়ে গিয়ে পড়বে। *ভর্তা,* মানে পোষনকর্তা, যিনি ভরণ করেন। সেইজন্য স্বামীকে বলা হয় ভাতার, স্বামী ভরণ পোষণ করেন, ভর্তা থেকে ভাতার শব্দ এসেছে। ঈশ্বরই সমস্ত প্রাণীর ভরণ পোষণ করেন তাই তিনি ভর্তা। *প্রভুঃ,* ঈশ্বর সবারই স্বামী। *সাক্ষী,* আমরা যা কিছু করে যাচ্ছি তিনি কোন কিছুতে না জড়িয়ে সাক্ষী রূপে সব দেখে যাচ্ছেন। *নিবাসো,* যেখানে মানুষ বাস করে, এই জগতে যা কিছু আছে সব তাঁতেই বাস করছে, তিনিই নিবাস স্থল, কারণ ঈশ্বরের বাইরে কিছুই নেই। *শরণং,* শঙ্করাচার্য বলছেন, যারা দুঃখ কষ্টে পড়ে আছে তারা যখন ভগবানের শরণ নেয় তিনি তখন তাদের দুঃখ কষ্টটা হরণ করে নেন, সেইজন্য ভগবান হচ্ছেন শরণদাতা, একমাত্র আশ্রয়স্থল। শরণ মানে তিনি শুধু আশ্রয়ই দেন না, তিনি দুঃখ কষ্টকে হরণ করে নেন। *সুহৃৎ,* আচার্য সুহৃৎ শব্দের অর্থ করছেন *প্রত্যুৎকার অনপেক্ষঃ।* সুহৃৎ হচ্ছে উপকারী, কিভাবে তিনি উপকার করেন? প্রত্যুৎকারের অপেক্ষা না রেখে যিনি উপকার করেন তিনিই সুহৃৎ। রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে দেখলাম রাস্তার মাঝখানে একটা কলার খোসা বা পাথর পড়ে আছে। কেউ এই রাস্তায় এলে পা পিছলে পড়ে গিয়ে হাত পা ভেঙে যেতে পারে। আমি জানিনা কে আসবে কিন্তু আমি পা দিয়ে পাথরটা বা কলার খোসাটা সরিয়ে দিলাম। দিয়ে আমি এগিয়ে চলে গেলাম। এখন আমি কি অপেক্ষা করে থাকব, আমার পরে যে পথচারী আসবে সে আমাকে ধন্যবাদ দেবে বলে? যারা এই রকম করে বুঝতে হবে তার মধ্যে একটা উচ্চ মূল্যবোধের সচেতনতা এসেছে। এইটাই হচ্ছে প্রকৃত সুহৃৎ। বাচ্চাদের মধ্যে কিন্তু এই মূল্যবোধের সচেতন থাকে না, তাদের মধ্যে এই সচেতনতাকে

বড়দের জাগাতে হয়। কিন্তু মানুষ যখন বড় হয় তখনও তার মধ্যে বাচ্চা বয়সের মূল্যবোধের অভাবটা থেকে যায়। আমাদের বেশির ভাগের মধ্যেই এই প্রত্যুৎ উপকারের ইচ্ছা থাকে। মা বাবারাও আশা করে সন্তান বড় হয়ে আমার দেখাশোনা করবে। একমাত্র যারা ঠিক ঠিক সাধু সন্ত তাঁরা এই প্রত্যুৎকারের অপেক্ষা রাখেন না। গৃহীরাও এইভাবে সাধু হতে পারেন, যাঁরা উপকার করেন কিন্তু বিনিময়ে কোন কিছুই প্রত্যাশা করেন না তাঁরাই সন্ত।

*প্রভবঃ,* ভগবান হচ্ছেন জগতের উৎপত্তির কারণ, ভগবান থেকেই সব কিছুর উৎপত্তি হচ্ছে। *প্রলয়ঃ,* পুরো জগতের যে বিনাশ হয় সেটাও ভগবানেই গিয়ে লয় হচ্ছে। *স্থানং,* যেখানে গিয়ে সব কিছু স্থায়ি ভাবে বাস করে, তিনিই সব কিছুর আশ্রয়। মানুষ যা কিছু কর্ম করে সমস্ত কর্মের সব ফল যেন একটা ভাণ্ডারের মত জমা থাকে, এটাকেই বলা হচ্ছে *নিধানং,* সেই নিধানটাও আমি। শেষে বলছেন, *বীজমব্যয়ম্,* অব্যয় বীজ। আচার্য বলছেন – বীজ না থাকলে সৃষ্টি হবে না। যখন প্রলয় হয়ে সব কিছু বীজাকারে চলে যায় তখন সেই বীজটাও আমি। চাষ করে ধান গম হল, কিছুটা রেখে দিয়ে বাকিটা খাওয়া দাওয়া হল। আবার ঐ বীজ দিয়ে চাষ করলাম, আবার কিছু রেখে দিয়ে বাকিটা খরচ করা হল। এটাই হচ্ছে অব্যয় বীজ, এই বীজের কখন নাশ হয় না। একটা বীজ আরেকটা বীজকে জন্ম দেয়, সেই বীজ আরেকটা বীজকে জন্ম দিচ্ছে, এইভাবে চলতেই থাকে। বীজের এই পরম্পরা কখনই নাশ হয় না। এই অব্যয় বীজ ভগবান নিজে। এত কিছু বলার একটাই উদ্দেশ্য, আমি যত ভাবে, যেদিক দিয়েই চিন্তা করি না কেন সবটাই তিনি। তারপর বলছেন –

**তপাম্যহমহং বর্ষং নিগৃহ্ণাম্যুৎসৃজামি চ। অমৃতঞ্চৈব মৃত্যুশ্চ সদসচ্চাহমর্জুন।।১৯।।**

বলছেন এই যে রৌদ্র এটাও আমি, এই যে বৃষ্টি এটাও আমি। গরমের সময় আট মাস ধরে আমি পৃথিবীর জলাশয় গুলো থেকে জল শুষতে থাকি আর বাকি চার মাস ধরে সেই জলকেই বৃষ্টি রূপে বর্ষণ করতে থাকি। তাই যখন খরাতে সব জ্বলে পুড়ে ছারখার হচ্ছে সেটাও তাঁরই একটা রূপ আবার বন্যায় যখন সর্বত্র প্লাবিত হয়ে যাচ্ছে সেটাও তাঁরই আরেকটি রূপ। কিন্তু আমরা যা কিছু দেখি সব নিজেদের স্বার্থ বুদ্ধির দৃষ্টিতেই দেখি, যখনই স্বার্থ হানি হচ্ছে তখনই বলি হে ভগবান এ তুমি কি করলে! কিন্তু ভগবান নির্বিকার। যখন তাপ প্রবাহ চলছে সেটাও তিনি, যখন বসুন্ধরা জলে জলমগ্ন হয়ে যাচ্ছে সেটাও তিনি, জন্মটাও তিনি মৃত্যুটাও তিনি। স্বামীজীকে একবার একজন বলছেন – এই যে এত লোক বন্যায় মারা যাচ্ছে, একে মা কালীর সাথে কি করে মেলান হয়? স্বামীজী বলছেন – চিত্রকর ক্যানভাসে ছবি আঁকছে, সেই ছবিতে সব রঙ আছে, তার মধ্যে লাল রঙটাও আছে। মা কালীর অনেক রূপ আছে, তার মধ্যে মৃত্যুরূপাটাও তাঁর একটা রূপ। সাধারণ মানুষের গণ্ডীটা অতি সঙ্কীর্ণ, বউ, বাচ্চা, বাড়ি আর চাকরি এর মধ্যেই তার গণ্ডী শেষ। যখনই ওখানে একটু ধাক্কা লাগে তখনই ওটা নড়ে ওঠে আর আমরাও খ্যাঁক্ করে উঠি।

মঠের এক ভক্ত অনেক দিন ধরে মঠে আসা যাওয়া করতেন। এক সময় তার পরিবারে একটা দুর্যোগ নেমে আসে, তাতে তার ছেলে মারা যায়। তখন সেই ভক্ত কয়েকজন সাধু সন্ন্যাসীকে বললেন, এইতো ঠাকুরকে এতো ভালোবাসতাম, এতো মঠে আসা যাওয়া, কই তিনি তো আমার পরিবারকে রক্ষা করতে পারলেন না। পরের দিকে তিনি মঠে আসা বন্ধই করে দিলেন। তার এক পরিচিত মহারাজ ছিলেন, তাঁকে ঠাকুর-মা-স্বামীজীর যত বই ছিল সব ফেরত পাঠিয়ে দিলেন, তার মধ্যে কথামৃতও ছিল। মহারাজ শুধু তাকে বললেন আপনি সব বই ফেরত দিচ্ছেন ঠিক আছে, কিন্তু কথামৃতটা আপনার কাছে রেখে দিন। পরের দিকে অবশ্য তার মনের আবার পরিবর্তন হয়েছিল।

ভগবান নিজের মত আছেন, বৃষ্টিটাও তাঁর আর রোদটাও তাঁর, ঠাণ্ডাটাও তাঁর, গরমটাও তাঁর, জীবনটাও তাঁর মৃত্যুটাও তাঁর, কিন্তু আমাদের সমস্যা হচ্ছে এটাকে যদিও বা বিশ্বাস করি কিন্তু সব রকম পরিস্থিতিতে এই বিশ্বাসকে ধরে রাখা আমাদের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। শ্রীমা বলছেন – ঠাকুরের পূজো করার এখন অনেক লোক হয়ে গেছে, ভালো ভালো রান্না করে ঠাকুরকে ভোগ দেয় যাতে নিজেরাও খেতে পারে। ঠাকুর যখন বেঁচে ছিলেন তখন কজন ঠাকুরের সেবা করেছিল! ঠাকুর বলছেন – আগে খুব ধুমধাম করে দুর্গাপূজা করতে এখন আর করো না কেন? তখন সে বলছে এখন দাঁত পড়ে গেছে, পাঁঠার মাংস খেতে পারিনা তাই দুর্গাপূজাও বন্ধ হয়ে গেছে। এখন তো ঠাকুরের জন্মদিনে বাড়িতে বিশেষ পূজো করে ভালো ভালো ভোগ দিয়ে নিজেরাই খায়, খুব কম লোকই পাওয়া যাবে যে সেই ভোগ পাড়াপড়শি সবাইকে নিয়ে মিলেমিশে গ্রহণ করছে। আগেকার দিনে গ্রামে জমিদারের বাড়িতে কারুর জন্ম দিনে তাকে দাড়িপাল্লাতে চাপিয়ে চাল ডাল গম ওজন করে যত হত পরে সেই চাল ডাল গম গ্রামের গরীব দুঃখীদের মধ্যে বিতরণ করে দেওয়া হত। এখন বার্থডে পার্টিতে কারা কারা তাকে নিমন্ত্রণ করেছিল তাদের হিসেবের মধ্যে ধরে বাচ্চার জন্মদিনে তাদেরকেই নিমন্ত্রণ করে এলাহি আয়োজন করে আমোদ ফুর্তি করবে, পার্টি চুকে যাওয়ার পর সব গিফটগুলো সাজিয়ে বসে হিসেব করবে কে কি গিফট দিয়েছে। মানুষ কত স্বার্থপরায়ণ হয়ে গেছে ভাবাই যায় না, এরা কি করে ধারণা করতে পারবে যে ভালোটাও ঈশ্বরের খারাপটাও ঈশ্বরের। সেইজন্য যখন দুর্দিন আসছে নিতে পারছি না, দুঃখ যখন আসছে তখন তাকে

বরণ করতে পারছি না, মৃত্যুটাও তাঁর মনে করে এগিয়ে না গিয়ে এড়িয়ে পালাতে চাইছি। কারণ আমাদের মনের জগৎটা খুব ছোট্ট ও সঙ্কীর্ণ, ঐ ছোট্ট জগৎটা দিয়ে আমরা ভগবানকে মাপতে যাই।

এর আগে যখন দশ নং শ্লোকের আলোচনা করা হয়েছিল, *হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্বিপরিবর্ততে,* এখানে শঙ্করাচার্য সব আলোচনা করে করে শেষে বলছেন – এই যে সৃষ্টি এর মধ্যে একমাত্র চৈতন্য যিনি তিনি হচ্ছেন ভগবান, এর আগের শ্লোকে ভগবান বলছেন আমি হচ্ছি নির্লিপ্ত, *উদাসীনবদাসীনমসক্তং তেষু কর্মসু,* তাহলে আর কোন সাক্ষী রইল না। প্রকৃত হচ্ছে জড়, ভগবান চৈতন্য, ভগবান নির্লিপ্ত, নির্বিকার, আমার সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। জড় পদার্থ খেলা করছে, ভগবানই এর মধ্যে একমাত্র চৈতন্য। আচার্য এইটাই বলছেন, ভগবান ছাড়া চৈতন্য বলে আর কোন কিছু নেই। সেইজন্য এই সৃষ্টিটা কেন, কার জন্য, এই প্রশ্ন আর এর উত্তর হতে পারেনা। যারা দর্শন নিয়ে খুব গভীর ভাবে চিন্তন মনন করতে চান তাদের এই জায়গাটাকে ভালো করে বুঝতে হবে। জড় প্রকৃতি নাচ করছে, সে যখন নাচ করছে তখন কেউতো দেখছে। কে দেখছে? ভগবান দেখছেন, কারণ চৈতন্য একমাত্র তিনিই, তিনি ছাড়া আর কোন চৈতন্য নেই। কিন্তু তিনি *উদাসীনবদাসীনম্,* আমি নাচ করছি আর আপনি চৈতন্য কিন্তু আপনি নাচ দেখছেন না, তাহলে আমি কার জন্য নাচছি, কিসের নিমিত্তে প্রকৃতির এই নাচ? এইটাই আচার্য বলছেন যে এই প্রশ্ন হতে পারে না, আর এর প্রত্যুত্তরও হয় না। তখন আচার্য নাসদীয় সূক্তম্ থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে বলছেন – *কো অদ্ধা বেদ ক ইহ প্রবোচৎ কুত আজাতা কুত ইয়ং বিসৃষ্টিঃ।* বেদেই বলে দিচ্ছে, কে জানে এই সৃষ্টি কোথা থেকে এসেছে, কিভাবে সৃষ্টি রচনা হয়েছে, কেন সৃষ্টির রচনা হয়েছে, এই প্রশ্ন গুলো হয় না। বেদের এই ভাবটাই গীতাতেও নিয়ে আসা হয়েছে, প্রকৃতি নাচ করে যাচ্ছে, তার নাচ যে দেখার একমাত্র দর্শক ঈশ্বর, কারণ একমাত্র চৈতন্য সত্ত্বা বলতে তিনিই আছে, আবার অন্য দিকে সেই ঈশ্বরের এই নাচে কোন আগ্রহই নেই। তাহলে প্রকৃতি কার জন্য নাচ করে যাচ্ছে, এই প্রশ্ন আর হয় না। আর এর উত্তর? এই প্রশ্নই হয় না, তাহলে এর উত্তর কোথা থেকে হবে। এই তত্ত্ব গুলো অত্যন্ত সূক্ষ্ম, একটু সাধন ভজন, তপস্যা না থাকলে এই সূক্ষ্ম তত্ত্বগুলোকে ধরা যাবে না। অত্যন্ত সূক্ষ্ম বুদ্ধি না হলে এই জিনিষ ধরা অসম্ভব।

কেউ কেউ মনে করে সব কিছুর বীজ হয়, তাহলে যখন এই সৃষ্টির প্রলয় হয়ে যাবে তখন তার বীজ কোথায় যাবে। এখন তাকে বলে দেওয়া হল, ভগবানের কাছে ঐ বীজ থাকবে। তিনি কোথায় রাখবেন? যে পুটলিতে রাখবে সেই পুটলি ভগবানকে কে দিল? একটা অবস্থার পরে এই ধরণের প্রশ্ন গুলো অবান্তর হয়ে যায়। আধ্যাত্মিক আলোচনা ফিজিক্স, কেমেস্ট্রির মত একবার পড়ে বুঝে নিলেই সব হয়ে গেল তা নয়। আধ্যাত্মিক তত্ত্ব বুঝতে হলে মনের পুরো আলাদা গঠন হওয়া দরকার। বেশি প্রশ্ন না করে আগে বল তোমার কি সমস্যা। আমি অশান্তিতে আছি। তাহলে তুমি আমার কাছে এসো আমি তোমাকে শান্তি লাভের পথ বলে দিচ্ছি, কিন্তু তার আগে তুমি বেশি কিছু প্রশ্ন না করে যা যা তোমাকে করতে বলা হবে সেগুলো গভীর শ্রদ্ধা আর নিষ্ঠা সহকারে করে যেত থাক। গীতা হচ্ছে মোক্ষ শাস্ত্র, সাধারণত যেভাবে আমরা দর্শনের কথা বলি গীতা তা নয়। গীতাতে কতকগুলো আধ্যাত্মিক সত্যের কথা বলা হয়েছে, এর মধ্যে যেটা আমার পক্ষে উপযুক্ত মনে হবে তার কোন একটাকে ধরে এই সংসার কূপ থেকে বেরিয়ে আসতে হবে।

এরপরে বলছেন, *অমৃতঞ্চৈব মৃত্যুশ্চ সদসচ্চাহমর্জুন,* দেবতাদের দেবলোকে যে অমৃত সেটাও আমি আর মর্ত্য লোকে যে মৃত্যু সেটাও আমি, সবটাই তিনি। *সদসচ্চাহমর্জুন,* এখানে সৎ আর অসৎ বলতে বোঝান হচ্ছে, যা কিছু আছে সেটা সৎ, সেটা আমি, এর বিপরীত যা কিছু যেটা অসৎ, সেটাও আমি। এই গ্লাশটাও আমি, আর এই গ্লাশের যে অভাব সেটাও আমি। অভাবটাও তিনি ভাবটাও তিনি। যা কিছু জগতে সৎ ভাবে আছে, যেটাকে আমরা ইন্দ্রিয়ের দ্বারা দেখতে পাচ্ছি, যেমন একটা জিনিষ ভালো, সেই ভালোটাও তিনি, আবার যে জিনিষের ভালোর যে অভাব, সেটা হচ্ছে অসৎ, সেটাও তিনি। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বক্তব্য একটাই তিনি ছাড়া আর কিছু নেই। সবই তিনি কিন্তু আমরা আলাদা আলাদা এখানে মাইক্রোফোন দেখছি, গ্লাশ দেখছি, ফ্যান দেখছি, সবাই সবাইকে আলাদা আলাদা দেখছি, এটাকে মেলানো যায় না। মেলানো যায় না বলে তাঁরা একটা দর্শন নিয়ে আসেন, সেই দর্শন বা তত্ত্ব নিয়ে এগিয়ে যেতে যেতে মানুষ যখন অদ্বৈত জ্ঞানে পৌঁছে যায় তখন সত্যিই দেখে ঈশ্বর ছাড়া আর কিছু নেই। আসলে বেশির ভাগ লোকই জানে যে ঈশ্বর বলে কিছু নেই, এই সব হচ্ছে ধাপ্পাবাজী, তাদের কোন অশান্তি নেই। এর বিপরীতে যাঁরা ব্রহ্মজ্ঞানী তাঁরা জানেন ঈশ্বর ছাড়া কিছু নেই, তাঁরাও শান্তিতে আছেন তাঁদের কোন সমস্যা নেই। আমাদের মত যারা মাঝখানে আছি, যারা জগৎটাকেও দেখতে পাচ্ছি আবার ঈশ্বরের উপরেও অগাধ বিশ্বাস আছে, এদের জন্যই যত দর্শন, তত্ত্বের কচকচানি। আমাদের এই অশান্তি থাকবেই, হয় আমাকে শাস্ত্র পড়া ছেড়ে দিতে হবে আর তা নাহলে তড়িঘড়ি করে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করে নিতে হবে। ব্রহ্মজ্ঞান লাভ না হওয়া পর্যন্ত এই সমস্যা থাকবে, আর বিজ্ঞানে সব থিয়োরিকে যেভাবে মেলানো হয়, শাস্ত্রের সব তত্ত্বকে বাস্তবে মেলানো যায় না, কারণ যে মনের দ্বারা মেলানো হবে সেই মনটাই অনেক নীচের জিনিষ, আর অতি ক্ষুদ্র, তাও আবার জড়।

*জ্ঞানযজ্ঞেন চাপ্যন্যে* এই পনেরো নং শ্লোক থেকে শুরু করে ঊনিশ নং শ্লোকে যেটা বলা হয়েছে, তাতে জ্ঞানীদের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, অর্থাৎ জ্ঞানীরা ঈশ্বরের স্বরূপকে কিভাবে দেখেন। আর যারা অজ্ঞানী, অজ্ঞানী বলতে এখানে বলা হচ্ছে যারা উচ্চ স্বর্গ

প্রাপ্তির জন্য বেদ বিষয়ক যজ্ঞ-যাগের কর্ম করছে কিন্তু ঈশ্বরের স্বরূপের ব্যাপারে কোন ধারণা নেই। যারা একেবারে বিষয় বাসনার ভোগের মধ্যে ডুবে অজ্ঞানী হয়ে আছে তাদের কথা এখানে বলা হচ্ছে না। এরপর যারা বেদের মার্গ অবলম্বন করে যজ্ঞ-যাগ করে যাচ্ছে তাদের কথা বলতে গিয়ে ভগবান বলছেন –

**ত্রৈবিদ্যা মাং সোমপাঃ পূতপাপা**
**যজ্ঞৈরিষ্ট্বা স্বর্গতিং প্রার্থয়ন্তে।**
**তে পুণ্যমাসাদ্য সুরেন্দ্রলোক-**
**মশ্নন্তি দিব্যান্ দিবি দেবভোগান্।।২০।।**

ঋক্, সাম ও যজু এই তিনটে বেদকে যারা জানেন, বেদে যত দেবতারা আছেন, যেই দেবতারা সোমরস পান করেন, সেই দেবতাদের মাধ্যমে তারা স্বর্গপ্রাপ্তির কামনা করেন। *তে পুণ্যমাসাদ্য*, বেদের যজ্ঞ যাগ করার ফলে মৃত্যুর পর তারা স্বর্গে যায়। যে উচ্চতম স্বর্গের অধিপতি হচ্ছেন ইন্দ্র, সেই স্বর্গলোকেই তারা গমন করেন। সে ইচ্ছে করলে এমন যজ্ঞ করতে পারে যে সে ইন্দ্র পর্যন্ত হয়ে যেতে পারে। সেখানে গিয়ে তারা *দিব্যান দিবি দেবভোগান্*, দেবলোকে গিয়ে তারা সবাই দিব্য ভোগ করতে পারে। কোরানে এই স্বর্গের খুব সুন্দর বর্ণনা দেওয়া আছে, সেখানে সব ছেলেদের বয়স পঁয়ত্রিশ বছরের হবে, সব মেয়েরা পঁচিশ বছরের হবে, যখন যা চাইবে সব তার কাছে তক্ষুনি হাজির হয়ে যাবে ইত্যাদি। সেখানে এই ভোগ আমাদের মর্তের ভোগের তুলনায় অনেক গভীর। এই ভোগের পর –

**তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং**
**ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশন্তি।**
**এবং ত্রয়ীধর্মমনুপ্রপন্না**
**গতাগতং কামকামা লভন্তে।।২১।।**

এখন সে এই ইন্দ্রলোকে কত দিন ভোগ করবে? যতটা যজ্ঞ করেছিল ততটাই ভোগ করবে। হোটেলে যতটা টাকা দেবে ততটাই খেতে দেওয়া হবে। যতটা যজ্ঞ যাগ করেছে তত দিনই সে স্বর্গে ভোগ করতে পারবে, যখন যজ্ঞের কোটা শেষ হয়ে যাবে তখন স্বর্গে থাকার মেয়াদও শেষ হয়ে যাবে। তখন কি হবে? *ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশন্তি*, যেই পূণ্য শেষ হয়ে যাবে তখন স্বর্গ থেকে আস্তে করে আবার এই মনুষ্যলোকে ফেরত চলে আসবে।

শ্রীমাকে একজন জিজ্ঞেস করছে, দেবতারা কিভাবে স্বর্গ থেকে নেমে আসেন। শ্রীমা বলছেন, বরফ যেমন গলে যায়, আস্তে আস্তে বরফটা গলে গেল। আমরা বলতে পারব না কি হয়। হয়তো যারা স্বর্গে আছেন তারা দেখতে পান কি হচ্ছে না হচ্ছে। হঠাৎ একজনের পূণ্য শেষ হয়ে গেল, তখন বাকি যারা স্বর্গে আছেন তারা দেখতে পান সে আস্তে আস্তে নীচে চলে যাচ্ছে। স্বর্গলোকে তো কোন শোক তাপ নেই, সব সময়ই আনন্দ তাই বাকী যারা আছে তাদের কোন দুঃখ হবে না, কিন্তু যে পড়ে যাচ্ছে সে তো হা হুতাশ করে কাঁদবে। কোম্পানী থেকে যখন কারুর চাকরি চলে যায় তখন বাকিদের প্রমোশন হল আর অন্য দিকে একজনের হাতে নোটিশ ধরিয়ে বলে দিল যে তোমার চাকরি শেষ, সে তখন গেট দিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বেরিয়ে যাবে, বাকিরা আনন্দে থাকবে। এখানে তাও মানুষ বোধ থাকবে দেবলোকে সেই বোধটাও থাকে না। যেখানে মৃত্যুধর্মা সেখানে ফেরত চলে এলো। *ত্রয়ীধর্মমনুপ্রপন্না*, যারা ঋক্, সাম ও যজু এই তিনটে বেদের ধর্ম পালন করে, মানে বেদের এই যজ্ঞ কর্মাদি করে তাদের এই অবস্থাই হয়। কি হয়? *গতাগতং কামকামা লভন্তে*, একবার উপরে যায় একবার নীচে আসে এই ভাবেই তারা সংসারে যাতায়াত করতেই থাকে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে ভগবান অর্জুনকে বলেছিলেন *অথ চৈনং নিত্যজাতং নিত্যং বা মন্যসে মৃতম্*, তুমি যদি মনে কর আত্মার নিত্য জন্ম হচ্ছে নিত্য মৃত্যু হচ্ছে তাহলেও তো তোমার কোন শোক করা উচিৎ হবে না, এখানে ঠিক এই জিনিষটাকেই বলা হচ্ছে। যারা বেদের যজ্ঞাদি কর্ম করছে তাদের এই অবস্থাই হয়, স্বর্গে যায় সেখানে যখন সব পূণ্য শেষ হয়ে গেল তখন আবার মনুষ্যলোকে চলে এল, এইভাবে আসা আর যাওয়া চলতেই থাকে। কিন্তু যারা সম্পূর্ণ নিষ্কাম ভাবে সব কর্ম করছে, কোন কামনা বাসনা নিয়ে কিছু করছে না, তাদের কি হয়?

**অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্যুপাসতে। তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্।।২২।।**

এতক্ষণ যারা সকাম ভাবে কর্ম করছে তাদের কথা বলা হল। এখন নিষ্কাম কর্মীরা কি করেন সেটা বলা হচ্ছে। *অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং*, আচার্য শঙ্কর বলছেন – যিনি সন্ন্যাসী তিনি চিন্তা করছেন আমি আর ঈশ্বর এক, পৃথক ভাব থাকে না। কিভাবে এক থাকে? আত্মভাবে বা মাতা, ধাতা, পিতামহ যে কোন একটা ভাবে ঈশ্বরের সাথে নিজেকে জুড়ে দেন, এইটাই হচ্ছে অপৃথকীকরণ ভাব। মা আর তার সন্তান কি কখন নিজেদের পৃথক মনে করে নাকি। আমি যে নারায়ণ, আমি যে সেই ভগবান এই

ভাব নিয়ে আমাতে যোগী আত্মভাবে থাকে, সে মনে করে আমার হৃদয়ে তিনিই আছেন, আমি তাঁর সাথে অভিন্ন। *যে জনাঃ*, আচার্য এখানে পরিষ্কার বলছেন *যে জনাঃ* মানে যারা সন্ন্যাসী। এই ব্যাপারে শঙ্করাচার্য খুব কট্টর ছিলেন, সন্ন্যাসী না হলে মুক্তি লাভ করতেই পারবে না। যার জন্য দেখা যায় যেখানে যেখানে সন্ন্যাসীর কোন শব্দ নেই সেখানেও তিনি সন্ন্যাসীকে ঢুকিয়ে দিয়েছেন। এমনকি ষষ্ঠ অধ্যায়ে যেখানে যোগ সাধনার কথা বলা হয়েছে সেখানেও তিনি বলে দিলেন স্ত্রী থাকলে এই সাধনা কখনই করা যাবে না, এই অধ্যায়ের সব কথা সন্ন্যাসীদের জন্য। ঠাকুর সেইজন্য বলছেন – সন্ন্যাসীদের কাছে আর কিছু না থাকুক একটা গীতা থাকবে। গীতা হচ্ছে ঠিক ঠিক সন্ন্যাসীর ভাব। গৃহস্থরা যা কিছু করে সেগুলোকে মোটামুটি গীতাতে উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। এখানে *যে জনাঃ* মানে হচ্ছে যে ব্যক্তি, শঙ্করাচার্য এই ব্যক্তিকে সন্ন্যাসী বলেই ধরে নিয়েছেন। এখন আমরা এখানে যোগ করতে পারি যারা মন থেকে সন্ন্যাসী তাদের কথাও বলা হচ্ছে। মূল কথা হল যিনি সন্ন্যাসী তিনি দেখেন আমি আর ঈশ্বর অভিন্ন। আমাদের সমস্যা হচ্ছে আমাদের ঘর, বাড়ি, স্ত্রী, পুত্র, পরিবার, বন্ধু বান্ধব, টাকা পয়সা আছে আর এগুলোর সাথেই আমরা একাত্ম হয়ে আছি বলে ঈশ্বরের সঙ্গে একাত্ম বোধ হয় না। কিন্তু এই সব কিছুকে ত্যাগ করে দিল সেতো সন্ন্যাসীই হয়ে গেল। তবে কি, যার একটু কোথাও সামান্যতম বন্ধনও যদি থাকে তার পক্ষে এই ধরণের সাধনা, যেগুলো গীতাতে বলা হয়েছে, কখনই সম্ভব নয়।

এই শ্লোকের ব্যাখ্যাতে আচার্য বলছেন – *নিত্যযুক্তানাং*, মানে একেবারে সর্বদা ঈশ্বরে মন লেগে আছে, ঈশ্বরের বাইরে আর কোন কিছুতে মন নেই। এদের কি হয়? *যোগক্ষেমং বহাম্যহম্*, এখানে *যোগ* শব্দের অর্থ হচ্ছে যে জিনিষটা নেই সেই জিনিষটার প্রাপ্তি। *ক্ষেম* হচ্ছে, যে জিনিষটা আছে সেই জিনিষটাকে রক্ষণ করা। অনেক ক্ষেত্রে *যোগক্ষেমং* এর অর্থ করা হয়, যোগের জন্য যে যে জিনিষের দরকার লাগে। আধ্যাত্মিক জীবনে এগুলো অত্যন্ত সাধারণ জিনিষ। যারা ভগবানের দিকে মন দিয়ে দিয়েছেন, তাদের যাবতীয় যা নিত্য প্রয়োজনীয় দরকার সেটা ভগবানই জুটিয়ে দেন। ভগবানের উপর যতই তার নির্ভরতা বৃদ্ধি পেতে থাকে, যেমন বাচ্চা শিশুকে সব কিছু করিয়ে দেওয়া হয়, ভগবানও তাঁর উপর একান্ত নির্ভরশীল ভক্তের সব কিছু ব্যবস্থা করে রাখেন। ঠাকুর তাই বলছেন – যে ঠিক ঠিক সন্ন্যাসী, তালগাছ থেকে যখন পড়ে যাবে তখনও সে সব হাত পা ছেড়ে দেবে, বাঁচাবার হলে তিনিই বাঁচাবেন। ঈশ্বরের উপর এই নির্ভরতাকে নিয়ে অনেক কাহিনী আছে। লীলাপ্রসঙ্গে আছে, ঠাকুরের একবার ইচ্ছে হলে পঞ্চবটীতে সাধন-ভজনের জন্য একটা ছোট্ট কুঁড়ে ঘর হবে, তারপর তিনি দেখেন গঙ্গার বানে দক্ষিণেশ্বরের ঘাটে অনেক বাঁশটাশ ভেসে এসেছে। ঈশ্বরই সব ব্যবস্থা করে দেন।

যারা অন্য ধরণের ভক্ত তাদেরও তো ভগবানই দেখেন। আগে বললেন যারা *অনন্যাশ্চিন্তয়ঃ*, মানে শ্রীরামকৃষ্ণের মত যাঁরা ভক্ত তাঁর সব ব্যবস্থা ভগবানই করে দিচ্ছেন। কিন্তু যারা সাধারণ ভক্ত তাদের কে সব কিছু দেন? তখন আচার্য শঙ্কর বলছেন, না, সবাইকে ভগবানই দেন। তবে সাধারণ ভক্ত যারা, তারা নিজেদের জন্য কিছু কিছু প্রচেষ্টা করে কিন্তু এনারা কোন কিছুর জন্যই চেষ্টা করেন না, এমনকি জীবন ধারণ করার বাসনাটুকুও তাঁদের থাকে না আবার অন্য দিকে মৃত্যুর প্রতিও কোন বাসনা নেই। যদি কোন আধ্যাত্মিক সাধক বলেন আমার আর বেঁচে থেকে কি হবে, মরে গেলেই হয়, তার মানে ভেতরে কিছু গোলমাল আছে তার। আবার যদি বলে আমি বেঁচে থাকতে চাই, তাহলেও বুঝতে হবে কিছু গোলমাল আছে। কিন্তু যাঁরা ঠিক ঠিক আধ্যাত্মিক পুরুষ তাঁদের এমন নির্বাসনা হয়ে যায় যে জীবনমুক্তি যেটা হচ্ছে শেষ কথা, সেটার জন্যও তাঁদের কোন ইচ্ছা বা বাসনা থাকে না।

মধুসূদন সরস্বতি আবার এই শ্লোকের ব্যাখ্যা করে বলছেন যে, ভগবান সবাইকেই দেন। যারা সাধারণ ভক্ত তাদের পুরুষকারের মাধ্যমে ভগবানই দেন, তাকে দিয়ে কাজটুকু করিয়ে নেন। রাজবাড়িতে যারা থাকে তাদের সবাইকে রাজাই সব কিছু দেয়, কিন্তু যে রাজকুমার তাকে রাজা সরাসরি দিয়ে দেন, কিন্তু যে রাজবাড়ির কর্মচারি তাকে কাজ করিয়ে তবে দেন। এই জগতেও ঠিক তাই হয়, যারা রাজার ব্যাটা তাদের এমনিই সব কিছু এসে যাবে। ঠাকুর এটাকেই খুব সুন্দর করে বললেন – রাজার ব্যাটা তার মাসোয়ার এসে যায়। যারা সত্যিকারের সাধু সন্ন্যাসী তার যেটার দরকার সেটা আসবেই, দরকার মানে তার মাথায় যদি একবার কিছু একটা চেপে যায় সেই জিনিষ এমনিতেই এসে যাবে। মাথায় কোন কিছুর ইচ্ছা জেগে গেল আর সেটা হবে না এ জিনিষ কখনই হবে না, চৈতন্য শক্তি কিনা। চৈতন্যের সামনে জড়ের কোন ক্ষমতাই নেই। কত লম্বা মালগাড়ি, ষাট সত্তরটা করে মাল ভর্তি ভারী ভারী কোচকে একটা ছোট্ট ইলেক্ট্রিক ইঞ্জিন কি প্রচণ্ড গতিতে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এই ইলেক্ট্রিসিটিকে আমি দেখতে পাচ্ছি না তারই এত ক্ষমতা। আর চৈতন্য সত্তার কি ক্ষমতা আমরা চিন্তাই করতে পারিনা। আর যিনি এই চৈতন্য সত্তার সাথে এক করে রেখেছেন তার মধ্যে তো কোটি কোটি ঐ ছোট্ট ইঞ্জিনের থেকেও হাজার গুণ ক্ষমতা, সে যদি সূর্যকে বলে থেমে যেতে সূর্য থেমে যেতে বাধ্য, সূর্যের কোন উপায় নেই তাকে থামতেই হবে। একটা সাধারণ ইলেক্ট্রিসিটির, একটা সাধারণ এ্যটমিক শক্তির কত ক্ষমতা, এগুলো তো জড় শক্তি, এই জড় শক্তি চৈতন্য শক্তির সামনে কিছুই নয়। চৈতন্য শক্তির সত্তা এদের থেকে পুরো আলাদা ধরণের, সে শুধু ইচ্ছা মাত্র করবে, তাতেই ইচ্ছা ফলপ্রসু হতে বাধ্য। কিন্তু তাঁরা এই ধরণের কোন কিছু করেন না, কারণ সৃষ্টির নিয়মের মধ্যে তাঁরা হস্তক্ষেপ করতে চান না। মুক্তির ঠিক আগে তিনি ব্রহ্মার সঙ্গে এক হয়ে যান, তখন তিনি প্রকৃতিলীন পুরুষ হয়ে হিরণ্যগর্ভের সঙ্গে এক হয়ে যান, তখন তাঁর মধ্যে এমন ক্ষমতা এসে যাবে যে তিনি যদি চান তাহলে পুরো একটা নতুন সৃষ্টিকে দাঁড় করিয়ে দিতে

পারবেন। নির্বাসনা না হওয়া পর্যন্ত তিনি ঐ অবস্থায় যেতেই পারবেন না, কিন্তু সৃষ্টি করার ইচ্ছাটা হচ্ছে একটা বাসনা। নতুন সৃষ্টি করার ক্ষমতাটা মুক্তির ঠিক আগে তিনি পেয়ে যাবেন, কিন্তু তার আগে তাঁকে ঐ ইচ্ছাটাকেও পুড়িয়ে শেষ করে দিতে হবে। তার ফলে যখন তিনি ঐ অবস্থায় চলে যান তখন তিনি আর কিছু করতে চাইবেন না। যিনি মহাপুরুষ, তাঁর পায়ে যদি খুব করে মাথা ঠুকে যদি বলেন আমার ছেলে মরে যাচ্ছে, আপনি আশীর্বাদ করুন যাতে ভালো হয়ে যায়। উনি কোন মতেই এই আশীর্বাদ করবেন না। কারণ প্রকৃতির নিয়মকে তিনি কখনই উল্লঙ্ঘন করবেন না, প্রকৃতির নিয়মে তিনি হস্তক্ষেপ করতে চাইবেন না। কিন্তু যদি তিনি আশীর্বাদ করে দেন তখন মৃত্যুর কোন ক্ষমতাই হবে না কিছু করার। মৃত্যু চৈতন্য সত্তার সামনে মাথা নত করে থাকে। কিন্তু সাধারণত এনারা এই জিনিষ কখন করেন না। কেন তিনি করতে যাবেন, তিনি যে শক্তি পেয়েছেন সেটা এসেছে নির্বাসনা থেকে, কেন তিনি আপনার আমার বাসনার সাথে নিজেকে জড়াবেন। তবে অনেক সময় দেখা যায় তাঁরা কিছু কিছু ক্ষেত্রে টুকটাক করে থাকেন। ঠাকুরও মথুরবাবুর জন্য একটু এদিক সেদিক করেছিলেন। কিন্তু মূল কথা হচ্ছে ভগবান বাকিদের একটা নিয়মে কাজ করিয়ে সব কিছু দিয়ে দেন। আর যে ঠিক ঠিক *অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো* ভক্ত, সে মাসোহারা পেয়ে যায়। এরপর বলছেন –

**যেহপ্যন্যদেবতা ভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়াহন্বিতাঃ। তেহপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্বকম্।।২৩।।**

যারা অন্য অন্য দেবতাদের পূজো করছে তারা *অবিধিপূর্বকম্*, অজ্ঞানবশতঃ আমারই পূজা করে, এতে তাদের কোন দোষ হয় না। এখানে এসে ইসলাম ও হিন্দু ধর্মের অনেক তফাৎ এসে যায়। ইসলাম বলছে, যারা অন্য দেবতাদের পূজা করে তারা কাফের, তাদেরকে শেষ কর। কিন্তু এখানে ভগবান বলছেন, যারা অন্য দেবতাদের পূজা করছে তারা আমারই পূজা করছে। কিভাবে পূজা করছে? *অবিধিপূর্বকম্*, অজান্তে অজ্ঞানপূর্বক। কেন এদের পূজাটা অবিধিপূর্বকম্? তখন ভগবান বলছেন –

**অহং হি সর্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ। ন তু মামভিজানন্তি তত্ত্বেনাতশ্চ্যবন্তি তে।।২৪।।**

*অহং হি সর্বযজ্ঞানাং*, যত রকমের যজ্ঞ হয়, যা কিছু যজ্ঞ হচ্ছে, ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ যত দেবতাদের পূজা হচ্ছে, অন্য দিকে কালী, শিব, গণেশ, সন্তোষীমা, যারই পূজা হচ্ছে, যত ভাবে যত রকমের যজ্ঞ ও পূজা হচ্ছে, শরীরের যে যজ্ঞ হচ্ছে, শরীরের বাইরে যে যজ্ঞ হছে, সব যজ্ঞের প্রভু হচ্ছি আমি। অষ্টম অধ্যায়েও ভগবান বলেছিলেন *অধিযজ্ঞোহহমেবাত্র*, যজ্ঞের অধিদেবতা আমি। যজ্ঞে যাই আহুতি দেওয়া হোক না কেন সব আহুতি শ্রীকৃষ্ণের কাছেই যাচ্ছে। কিন্তু যারা যজ্ঞ করছে তারা মনে করছে আমি ইন্দ্রের নামে আহুতি দিচ্ছি, *ন তু মামভিজানন্তি তত্ত্বেনাতশ্চ্যবন্তি তে*, তারা ঠিক ঠিক তত্ত্বতঃ জানে না যে এই আহুতি আমাকেই দেওয়া হচ্ছে, সব আহুতি আসলে আমার কাছে আসছে। যেমন সমস্ত নদীর জল সমুদ্রে গিয়ে মিলে যায়, তেমনি সব যজ্ঞের সব আহুতি আমার কাছেই আসে। এই জিনিষটা তারা তত্ত্বতঃ জানে না। তত্ত্বতঃ জানেনা বলে কি হচ্ছে? *অতঃ চ্যবন্তি তে*, তাদের স্বর্গ থেকে পতন হয়ে যায়, আবার এই সংসারে প্রত্যাবর্তন করে। যদিও যা কিছু যাগ যজ্ঞ করা হচ্ছে তার সব কিছু ভগবানের কাছেই যাচ্ছে, কিন্তু যে করছে তার মনটা আসলে কোথায় পড়ে আছে দেখতে হবে, মন যেখানে পড়ে আছে মৃত্যুর পর সেখানেই যাবে, কেননা সে ভগবানকে তত্ত্বতঃ জানে না। মৃত্যুর পর তারা কোথায় যাবে?

**যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিত্রন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ। ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্‌যাজিনোহপি মাম্।।২৫।।**

পুরো গীতাতে ভূত বলতে জীবকে বোঝাচ্ছে কিন্তু এই শ্লোকে ভূত বলতে ভূতকেই বোঝাচ্ছে। যারা ব্রত নিয়মাদির দ্বারা যে দেবতার উপাসনা করছে, সেই উপাসক মৃত্যুর পর সেই দেবলোককেই প্রাপ্ত হয়ে সেখানে বাস করবে। যেমন, যারা ইন্দ্রের উপাসক তারা মৃত্যুর পর ইন্দ্রলোকে গিয়ে বাস করবে। ইন্দ্রলোক থেকেও পতন হয়, এই রকম পতনের ভুরি ভুরি বর্ণনা আমরা পাই। যে বিষ্ণুর উপাসনা করছে, মৃত্যুর পর সে বিষ্ণুলোকে যাবে। যারা দেবতাদের বিধিপূর্বক পূজা করে তারা সেই সেই দেবলোকেই যাবে। *পিত্রন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ*, আমাদের যারা পিতৃপুরুষরা আছেন, আবার পিতৃদের মধ্যে কিছু দেবতারাও আছেন, তবে পিতৃদেবতারা এই দেবতাদের থেকে অনেক নীচে, যে যে পিতৃদেবতাদের যারা উপাসক তারা মৃত্যুর পর সেই সেই পিতৃলোকেই যায়। ঠাকুর সেইজন্য ভক্তদের শ্রাদ্ধ বাড়ির খাবার খেতে নিষেধ করেছেন। তবে নিজের যারা সম্বন্ধী তাদের বাড়ির শ্রাদ্ধের অন্ন তো খেতেই হয়, সেখান না খাওয়ার কিছু নেই। কিন্তু আগকার দিনে ব্রাহ্মণরা খুঁজে বেড়াত কোথায় শ্রাদ্ধবাড়ি হচ্ছে। শ্রাদ্ধবাড়ির অন্নটা হচ্ছে পিতৃদের উদ্দেশ্যে অর্পিত, তাই শ্রাদ্ধবাড়ির অন্ন বেশি খেলে পিতৃলোক প্রাপ্তি হয়। এটাকে আটকাবার জন্যই ভক্তদের শ্রাদ্ধবাড়ির অন্ন খেতে নিষেধ করা হয়েছে। শ্রাদ্ধবাড়ি অন্ন খাওয়া মানে পিতৃদের উচ্ছিষ্ট অন্ন খাওয়া, যার উচ্ছিষ্ট খাওয়া হয় তার সত্তাই সে পায়, এতে ভক্তের ভক্তির হানি হয়। তাই আমাদের বলা হয় যা কিছু গ্রহণ করবে ঠাকুরকে অর্পণ করে গ্রহণ করতে হয় তাহলে সে ঠাকুরের সত্তা পায়। দেবতাদের অর্পণ করলে দেবতাদের সত্তা পাবে আর পিতৃদের অর্পণ করে খেলে পিতৃদের সত্তা পাবে। যদি কেউ বলে আমি পিতৃলোকেই যেতে চাই, তাহলে তার কাছে পিতৃদের নিবেদিত অন্ন খেতে কোন অসুবিধা নেই। আমি রামকৃষ্ণলোকে যেতে চাই আর অন্য দিকে শ্রাদ্ধবাড়ির অন্ন খেয়ে বেড়াব তাহলে তার রামকৃষ্ণলোকে যাওয়া হবে না। এইজন্য ঠাকুর যারা বিশেষ ভক্ত তাদের শ্রাদ্ধবাড়ির অন্ন খেতে নিষেধ করছেন, কারণ এটা হচ্ছে উচ্ছিষ্ঠ অন্ন। যখন ঠাকুরকে অর্পণ করা হয় তখনও সেটা উচ্ছিষ্ঠ অন্ন, কিন্তু

সেটা কার উচ্ছিষ্ঠ? ঠাকুরের, তখন উচ্ছিষ্ঠ না বলে বলা হয় প্রসাদ। কিন্তু যখন পিতৃদের উদ্দেশ্যে অর্পণ করা হয় তখন প্রসাদ বলা হয় না, বলা হয় শ্রাদ্ধ, গুণগত মান অনেক নেমে গেল, সেই অন্ন খেলে শরীর মনও অন্য রকম হবে।

*ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যো,* আদিবাসী অঞ্চলে, গ্রামাঞ্চলেও অনেকে ভূত প্রেতদের উদ্দেশ্য মোরগ বলি দিয়ে সেই মোরগের মাংস খায়। এখন মরার পর তারা ভূতযোনিতে যাবে, বিভিন্ন ভূতেদের, মাতৃগণ, চতুর্ভগিনী, ষোড়শমাতৃকাগণ ইত্যাদি আছে, তারা সব এদের মধ্যে বাস করবে, যারা ভূতেদের দেবী তাদের সঙ্গে ঘুরবে। যার প্রসাদ, মানে উচ্ছিষ্ঠ যার খাবে তার মতই সে হবে। সেইজন্য যারা সত্ত্বগুণী তাঁরা নিজের উচ্ছিষ্ঠ কাউকে দেননা। এঁঠো যদি খেতে হয় তাহলে একমাত্র ভগবানেরই এঁঠো খাবো। আবার রাজা মহারাজ ঠাকুরের সামনে বলছেন, আমি বাবার এঁঠো কেন খাব? ঠাকুর শুনে বলছেন – তোর হয়েছেটো কিরে, বাবার এঁঠো খাবি না কেন তুই! বলেই ঠাকুর আবার যোগ করছেন – সত্ত্বগুণী লোক এমনিতে কারুকে এঁঠো খেতে দেয় না, তাঁরা তাঁদের পাতে একটি দানাও ছেড়ে দেননা।

*যান্তি মদ্‌যাজিনোঽপি মাম্,* যে আমার ভজনা করে মৃতুর পর সে আমার কাছেই আসবে, এই ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। এখানে আচার্য খুব সুন্দর একটা কথা বলছেন – কি দুঃখের কথা, দেবতাদের, পিতৃদের, ভূতদের পূজা করতে আর আমার পূজা করতে সমান পরিশ্রম অথচ অজ্ঞানবশতঃ মানুষ আমাকে ভজনা না করে আমার যারা অধঃস্তন তাদের ভজনা করে, ফলে তারা আমার অধঃস্তনদের মতই হবে। কেউ যদি দারোগার কাছে যেতে পারে আবার সে যদি একজন এসপির কাছেও যেতে পারে আবার একজন পুলিশের ডিজির কাছে যাওয়ারও সুযোগ থাকে, এদের যার কাছেই যাওয়া হোক না কেন, পরিশ্রম তার একই হবে। কিন্তু প্রথমেই যদি পুলিশের ডিজির কাছে যাওয়ার সুযোগটাকে কাজে লাগান যায় তাহলে দারোগা, এসপিও তাকে মানবে আবার কাজও খুব তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে। আর প্রথমেই দারোগার কাছে গেলে কাজটা হয়তো হয়ে যাবে কিন্তু তারপরে আর কিছুই হবে না, ওপরের কর্তারাও বেশি পাত্তা দেবে না। সেইজন্য বলে ওপরওয়ালার সাথে যোগাযোগটা করতে হয়। এখন ওপরওয়ালাটা কে? দেবতারা, পিতৃগণ ও ভূতেরা বড় না ভগবান বড়? এইভাবে বিচার করে এগোতে হবে। এইজন্যই বলা হয় শাস্ত্র পড়তে, শাস্ত্র পড়লে বোঝা যায় যে এই ভূতগুলো হচ্ছে অনেক নীচে ভগবান হচ্ছেন সবার ওপরে। শুধু কি তাই, দেবতা, ভূতেদের পূজা করার সময় অনেক খাটতে হয়। কোন অধঃস্তন কর্মচারীর কাছে কিছু কাজের জন্য গেলে ঘুষ ছাড়া কোন কাজই হবে না, কিন্তু কোন রকমে একেবারে ওপর মহলে পৌঁছে যাওয়া যায় তাহলে কেউ ঘুষ চাইবেই না। ওখানে পৌঁছান খুব কঠিন, কিন্তু পৌঁছাতে পারলে সব কাজ হয়ে যাবে। এই জন্য বলছে যে ভগবানের পূজা খুব সোজা, খুব বেশি খাটুনি নেই। ভগবানের পূজোতে কি রকম খাটুনি?

**পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি। তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ।।২৬।।**

যে ভক্ত শুদ্ধ বুদ্ধি দিয়ে আমাকে *পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং,* পাতা, ফুল, ফল আর জল এই চারটে দ্রব্যের কথা ভগবান বলছেন, একটু তুলসীপাতা, তুলসীপাতা না হলেও চলবে, যে কোন একটা পাতা, দুটো ফুল, একটু সামান্য ফল আর গঙ্গাজল, গঙ্গাজল না পেলে একটু বিশুদ্ধ জল আমাকে দিয়ে দাও, তাতেই আমি খুশি। সামান্য এই চারটে জিনিষ, যা সবারই সাধ্যের মধ্যে, কিন্তু কিভাবে দিতে হবে? *ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি,* ভক্তির সাথে নিবেদন করতে হবে, কোন রকমে দায়সারা ভাবে নিবেদন করলে কিছুই হবে না। পরে কি করতে বলছেন?

**যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোসি দদাসি যৎ। যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্।।২৭।।**

এর আগের শ্লোকে বললেন আমাকে ভক্তিযুক্ত চিত্তে একটা পাতা, দুটো ফুল, সামান্য একটু ফল আর খানিকটা জল দিলেই হবে। এই শ্লোকে এসে আরও সহজ করে দিচ্ছেন, বলছেন তোমাকে এতটাও করতে হবে না। *যৎ করোষি,* যা কিছু করছ, *যদশ্নাসি,* যা কিছু খাওয়া দাওয়া করছ, *যজ্জুহোসি,* যা কিছু তুমি যজনা করছ বা হোম করছ, *দদাসি যৎ,* যা কিছু দানাদি করছ, *যৎ তপস্যসি কৌন্তেয়,* হে কুন্তিপুত্র, তুমি যা জপ ধ্যান তপস্যাদি করছ সব *তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্,* ওঁ ব্রহ্মার্পণম বলে সব আমাকে অর্পণ করে দাও, আমরা যেমন সব কিছু করার পর বলি শ্রীরামকৃষ্ণার্পণমস্তু। কেউ যদি সারাদিনে চারবার অন্তত ঠাকুরকে মনে মনে স্মরণ করে বলতে পারে, ঠাকুর এই চার ঘন্টায় যা কিছু করেছি, যা চিন্তা করেছি, যাকে যাকে যত কথা বলেছি সব তোমাকে অর্পণ করে দিলাম, কিছু দিনের মধ্যে তার ব্যক্তিত্বের পরিবর্তন হতে বাধ্য, শুধু তাই নয়, খারাপ কাজগুলো করাও বন্ধ হয়ে যাবে। ভগবান নিজে থেকে গীতাতে বলে দিয়েছেন, যা কিছু করছ সব আমাকে অর্পণ করে দাও। গুরু দীক্ষা দেওয়ার পর বলে দেন জপ সমাপ্ত করে জপের সব ফল ইষ্টে সমর্পণ করে দেবে। এর ফলে কি হয়?

**শুভাশুভফলৈরেবং মোক্ষ্যসে কর্মবন্ধনৈঃ। সন্ন্যাসযোগযুক্তাত্মা বিমুক্তো মামুপৈষ্যসি।।২৮।।**

এইভাবে সব কিছু আমাকে অর্পণ করে দিলে শুভ আর অশুভ এই দুই ধরণের কর্ম থেকে যত রকমের কর্মবন্ধন সৃষ্টি হয় তার থেকে মুক্ত হয়ে যাবে, কোন কর্মই তোমাকে আর স্পর্শ করতে পারবে না। অশুভ কর্ম যখন করে তখন মানুষের নিম্ন গতি প্রাপ্ত হয়ে অসুরযোনি থেকে শুরু করে তির্যকযোনি, মানে সাপ বিছে হয়ে জন্ম নেয়। আর শুভ কর্মের বন্ধনে সে দেবলোকাদিতে গমন করে। কিন্তু দুটোই হচ্ছে বন্ধন, এই দুটো থেকেই তুমি মুক্তো হয়ে মুক্তির দিকে এগিয়ে যাবে। এই ধরণের কর্ম হল *সন্ন্যাসযোগযুক্ত*, যোগ মানে কর্মযোগ করা হচ্ছে, খাচ্ছি দাচ্ছি, যা করছি সব যোগ, সন্ন্যাস হচ্ছে সব কিছু ফেলে দেওয়া, এই যোগের যা ফল সব ঠাকুরের কাছে অর্পণ করে দিচ্ছি, এই নাও তোমার ভালো এই নাও তোমার মন্দ, এই নাও তোমার পাপ এই নাও তোমার পূণ্য, এইটাই সন্ন্যাস হয়ে গেল। স্কুল থেকে ফিরে এসে বাচ্চা স্কুলের ব্যাগটা পিঠ থেকে নামিয়েই ছুড়ে ফেলে দিয়ে খালাস, তারপরই বন্ধুদের সাথে খেলতে চোঁচা দৌড়। সব ফেলে দিল মানে সন্ন্যাস, কিন্তু এখানে সে মায়ের সঙ্গে যুক্ত থাকছে না তাই ঝামেলাকে ডেকে আনছে। কিন্তু ভক্ত ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত, সেইজন্য এটাকে বলা হচ্ছে সন্ন্যাস। যোগ মানে কর্মযোগ, যে এই কর্মগুলো করছে সে হচ্ছে যোগী। আবার কি কর্ম করছে? ত্যাগ যুক্ত কর্ম করছে, কেননা সব কর্মের ফল ত্যাগ করে দিচ্ছে বলে সেটা হয়ে গেল সন্ন্যাস। এই কারণে বলা হচ্ছে *সন্ন্যাসযোগযুক্ত*। এই *সন্ন্যাসযোগযুক্ত* হওয়ার ফলে কি হচ্ছে? *বিমুক্তো মামুপৈষ্যসি*, তখন সে মুক্ত হয়ে আমার কাছে চলে আসে। ভগবানের কাছে চলে আসে তার মানে ভগবানের পক্ষপাতিত্ব আছে। কারণ যারা অজান্তায়, অজ্ঞানবশতঃ অন্যান্য দেবতাদিদের পূজা করছে তারা ভগবানের কাছে আসতে পারল না। আর আপনি বলছেন তারা অজান্তে আমারই পূজা করছে, আর তাদের ফল আমার কাছ থেকেই আসছে, কিন্তু তারা মুক্তি পেল না, আর যারা আপনাকে জেনে নিয়ে পূজো করছে তারা মুক্তি পেয়ে যাচ্ছে, তাহলে তো আপনি পক্ষপাতদুষ্ট আচরণ করছেন। ঠাকুরকে একজন বলেছিলেন – ঈশ্বরের তো পক্ষপাত দোষ আছে। শুনে ঠাকুর খুব রেগে গেলেন – শালা, নিজের যেমন বেণে বুদ্ধি, সেই বুদ্ধি ভগবানের উপরেও লাগাচ্ছে। আসলে ভগবান তা নয়, ভগবান একেবারে কখনই পক্ষপাত করেন না। এই ব্যাপারে ভগবান পরিষ্কার, জাগতিক ব্যাপারে তুমি যেমনটি কর্ম করেছ সেই রকমটিই পাবে কিন্তু ভক্তির ব্যাপারে –

**সমোহহং সর্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোহস্তি ন প্রিয়ঃ। যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্।।২৯।।**

*সর্বভূতেষু*, সমস্ত প্রাণীর প্রতি *সমোহহং*, আমার সমান দৃষ্টি, আমার কেউ প্রিয় বলে নেই আবার কারুর প্রতি কোন দ্বেষও নেই, সবার প্রতি আমার সমান দৃষ্টি। কিন্তু *যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা*, যে প্রেম প্রীতি পূর্বক নিজে থেকে আমাকে ভজনা করে সে, *তে তেষু চাপ্যহম্*, সে আমাতে বাস করে। সে আমাতে বাস করে বলে স্বাভাবিক ভাবে আমি তার মধ্যেই বাস করি। আমি গঙ্গায় গিয়ে একটা ঘটিকে গঙ্গায় চুবিয়ে রাখলাম, এখন ঘটিটার কোথায় বাস? গঙ্গায়। ঘটিটার ভেতরে কি বাস করছে? গঙ্গাজল। যেমনটি গঙ্গাজলে ঘটিটা ডোবাব সেই রকমটি গঙ্গাজল ভরবে। আচার্য উপমা দিয়ে বলছেন, খুব ঠাণ্ডাতে যখন আগুন জ্বালান হয় তখন যে আগুনের কাছে যাবে তার আগুনের তাপ তত লাগবে, যে আগুনের কাছ থেকে যত দূরে থাকবে সে আগুনের তাপ তত কম পাবে। এখন যে আগুনের কাছে আছে আগুনের তাপের শরীর আরাম বোধ হওয়াতে আনন্দে চেঁচাতে থাকে, ওঃ কি দারুণ আগুন আমার সব ঠাণ্ডাকে দূর করে কি আরাম করে দিচ্ছে, তখন যে আগুনের থেকে দূরে আছে সে যদি বলে আগুনের কি পক্ষপাত মনোভাব আমাকে তো আগুন গরম করল না। আগুনের এতে কোথায় দোষ, তোমাকে কে বারণ করেছে আগুনের কাছে যেতে, তুমি তো নিজেই আগুনের কাছে যাওনি। যে ভগবানকে যেমন ভজনা করে সে তেমন তেমন ভগবানকে পায়, যদি ভজনা আদৌ না করে সে কখনই ভগবানকে পাবে না। এর আগে আগে যত কথা বলা হয়েছে সেখানে কোথাও বলা হয়নি যে ভগবান কাউকে বেছে বেছে উপরে তুলে দিয়েছেন আর কাউকে নিজের খুশি মত নীচে নামিয়ে দিয়েছেন, তা কখনই হয় না। যতই গানে বলুক সকলি তোমারি ইচ্ছা, আদপেই নয়, সকলই আমাদেরই ইচ্ছা, আমি যেমনটি করব তেমনটিই হবে। যারা বলেন ভগবানের ইচ্ছা না হলে কিছু হবে না, তাদেরকে গীতার এই শ্লোক কয়টি ধরিয়ে দিতে হয়। ভগবান কেন কাউকে করাতে যাবেন, তার ভারি বয়ে গেছে। জাগতিক যা কিছু তোমার হচ্ছে সেটা তোমার কর্মের জন্য হচ্ছে, আধ্যাত্মিক জগতে যা কিছু পাচ্ছ তুমি যেমনটি ভগবানকে ভালোবাসবে তুমি ভগবানকে তেমনটিই পাবে। ভগবান কোন কিছুর মধ্যে নেই। এর আগেও ভগবান বলছেন, *স্বভাবস্তু প্রবর্ততে*, প্রকৃতি প্রকৃতির মত চলে, তার সাথে চৈতন্যের কোন সম্পর্কই নেই। তাহলে মহাভারতে, ভক্তিশাস্ত্রে যেসব কথা আছে সব ভগবান করেন, এগুলো তাহলে কি? এসব কথা সাধারণ মানুষের জন্য। ভগবান কাউকে বেশি ভালোবাসবেন কাউকে কম ভালোবাসবেন এই ধরণের কোন পক্ষপাত ভগবানের মধ্যে কখনই থাকতে পারে না। তুমি যত ভগবানকে ভালোবাসবে তত তুমি ভগবানের মধ্যে বাস করবে আর তত ভগবানও তোমার মধ্যে বাস করবেন। এইভাবে তুমি জগতকে যত ছাড়তে থাকবে ভগবান ততই তোমার মধ্যে গভীর ভাবে বাস করতে থাকবেন। একটা অবস্থা আসবে যখন তুমি আর ভগবান পুরোপুরি এক হয়ে যাবে, সেই অবস্থাতে ভগবান আর ভক্তকে আলাদা করা যাবে না। এই রকম যখন হয়ে যায় তখন কি হয় বলছেন?

**অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্। সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ব্যবসিতো হি সঃ।।৩০।।**

এই শ্লোকটিও খুব মজার শ্লোক। *অপি চেৎ সুদুরাচারো,* দুরাচার মানেই অত্যন্ত খারাপ আচরণ করাকে বলা হয়, কিন্তু এখানে শুধু দুরাচারের কথাই বলছেন না, *সুদুরাচারঃ,* দুরাচারের আগে 'সু' যোগ করছেন, মানে যে আচ্ছা করে গর্হিত কর্ম, পাপ কর্ম করে বেড়াচ্ছে, এই রকম সুদুরাচার ব্যক্তিও *যদি ভজতে মামনন্যভাক্,* অনন্যা ভক্তির সাথে যদি আমার ভজনা করে, হে অর্জুন, তুমি তাকেও *সাধুরেব স মন্তব্যঃ,* সাধুপুরুষ বলে মনে করবে। *সমগ্ব্যবসিতো হি সঃ,* যে মুহূর্তে সে ঠিক করে নিয়েছে নিষ্কাম ভাবে অনন্যা ভক্তি সহকারে আমার ভজনা করবে, আর এখনও গর্হিত কর্ম করে যাচ্ছে, তাতে কোন দোষ নেই। যে ঈশ্বরের দিকে পা বাড়িয়ে দিয়েছে আর যে লক্ষ্যে পৌঁছে গেছে, গীতাতে এই দুজনকেই এক ধরা হয়। সেইজন্য যে জ্ঞান প্রাপ্ত করে নিয়েছেন মানে যিনি বিজ্ঞানী হয়ে গেছেন আর যে জ্ঞানের পথ ধরে নিয়েছে দুজনেই জ্ঞানী। যে গীতা অধ্যয়ণ করে বুঝে নিয়েছে যে ঈশ্বরই সত্য, এইটা বুঝে যে এক পা এই পথে ফেলেছে সেই জ্ঞানী হয়ে গেল। কেন জ্ঞানী বলা হচ্ছে? এখানে প্রশংসা করা হচ্ছে, আসলে সে হয়তো জ্ঞানী নয়, কিন্তু তাকে উৎসাহ দেওয়ার জন্য প্রশংসা করা হচ্ছে। তাই যে দুরাচারী, শুধু যে দুরাচারী তাই নয়, সুদুরাচারী সেও যদি অনন্যচিত্তে আমার ভজনা করে তাকে সাধু বলে গণ্য করতে হবে, কারণ *সমগ্ব্যবসিতো হি সঃ,* তার যে ব্যবসায়, তার যে নিঃশ্রেয়, সেটা দৃঢ় হয়ে গেছে, সত্যিকারের সাধু হতে এখন শুধু অপেক্ষার বাকী, আর বেশি দেরী নেই। আন্তরিক ভাবে যে যথার্থ ভগবানকে চাইছে তখন তার বাইরের এই দুরাচার গুলো খসে পড়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে খসে পড়বে না, কিছু সময় লাগবে, কিন্তু পড়ে যাবে। তখন কি হবে –

**ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি। কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি।।৩১।।**

এই ধরণের সুদুরাচারী কেউ যদি ভগবানে মন দেয় খুব শীঘ্রই তার মন শান্ত, স্নিগ্ধ ও পবিত্র হয়ে যায়। হে অর্জুন তুমি দুই বাহু তুলে জগতকে চিৎকার করে বলতে থাক *ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি,* আমার যে শরণাগত ভক্ত তার কখনই বিনাশ নেই। শুধু যে শ্রীকৃষ্ণের ভক্তরই নাশ হয় না তাই না, যে কোন আধ্যাত্মিক পুরুষ, ঈশ্বরে ভক্তিমান পুরুষের নাশ হয় না। কিন্তু তাঁকে *অনন্যভাক্* হতে হবে, ঈশ্বরের প্রতি অনন্য ভক্তি থাকতে হবে, ভক্তির মধ্যে কোন পাটোয়ারি থাকলে চলবে না। অর্থাৎ ঈশ্বরে ঠিক ঠিক ভক্তি থাকলে তার আর কখন কোন গোলমাল হবে না, সেই কারণে এই রকম ভক্তের কখনই পতন হয় না। তারপর বলছেন –

**মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ। স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্।।৩২।।**

যে আমার আশ্রয় নিয়ে নিয়েছে, সে যে কোন পাপযোনিরই হোক না কেন, যেখান থেকেই সে জন্ম নিয়ে থাকুক না কেন তাতে কিছুই যায় আসে না, সে *পরাং গতিম্,* শ্রেষ্ঠ পুরুষ সে হয়ে যাবেই। কারা *পরাং গতিম্* পাবে? *স্ত্রিয়ঃ, বৈশ্যাঃ তথা শূদ্রাঃ।* বেদের সময় স্ত্রীরা যজ্ঞে অংশ নিতে পারত না, বৈশ্যদের প্রত্যক্ষ ভাবে যজ্ঞে অধিকার ছিল না আর শূদ্রদের তো কোন অধিকারই ছিল না। তাহলে এদের বেদের ধর্মকর্মে কোন অধিকার না থাকাতে কি এরা *পরাং গতিম্* লাভ করতে পারবে না? না, কৃষ্ণভক্তি লাভ বা ঈশ্বরে ভক্তি করার ক্ষেত্রে এই ধরণের কোন বাধাই নেই, এরা শ্রীকৃষ্ণে ভক্তি করতে পারবে আর এদের কৃষ্ণভক্তিতে কোন অধিকার নেই, এই ধরনের কোন শ্রেণীবিভাগ করা নেই। যে কেউই ঈশ্বরে ভক্তি করতে পারে, সবারই সমান অধিকার। অনেকে গীতার এই শ্লোকটিকে ভুল বুঝে বলেন যে স্ত্রী, বৈশ্য ও শূদ্রদের নিন্দা করা হচ্ছে, আসলে কিন্তু তা নয়। বেদের ক্ষেত্রে এদের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হয়েছিল, কারণ সব জিনিষ সবাইকে তো দেওয়া যায় না। কিন্তু ঈশ্বরে ভক্তির ব্যাপারে সবারই সমান অধিকার। বেদে যাদের অধিকার খর্ব করা হয়েছিল এরাই ঈশ্বরে ভক্তি লাভ করে মহাপুরষ হয়ে যাচ্ছে, ব্রাহ্মণদের কথা আর কি কথা। এই কথাই ভগবান পরের শ্লোকে বলছেন –

**কিং পুনর্ব্রাহ্মণাঃ পুণ্যা ভক্তা রাজর্ষয়স্তথা। অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্।।৩৩।।**

আর যে উচ্চ বংশের, ভালো সংস্কার নিয়ে ব্রাহ্মণ বংশে জন্ম নিয়েছে, আর যিনি রাজর্ষী, একাধারে রাজা আর ঋষি তাদের কথা আর কি বলব, যারা কিছুই নয় তারাই মহাপুরুষ হয়ে যাচ্ছে। *অনিত্যমসুখং লোকমিমম্,* এই জগৎ অনিত্য, আর এই জগতে সুখের লেশ মাত্র নেই, তাই *ইমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্,* মানে এই মনুষ্যলোক প্রাপ্ত হয়ে, যে দুর্লভ মানব শরীর পেয়ে এই মনুষ্য লোকে এসেছ, যেখানে কর্ম করা যায়, এই দুর্লভ সুযোগ পেয়ে সব কিছু ছেড়ে একমাত্র আমার ভজনা কর। এই মনুষ্যলোকে যে অমূল্য সময় পেয়েছ এই সময়কে বৃথা নষ্ট হতে দিও না। কত জন্ম ধরে কর্ম করে সুখ ভোগ করছ, দুঃখ ভোগ করেছ, এখন সব কিছু ছেড়ে আমার প্রতি ভক্তি রেখে এক মন দিয়ে আমারই ভজনা করে যাও। তুমি যেখানেই থাক, যা কিছু কর্মই কর না কেন, তুমি চাইলেই উপরে চলে আসতে পারবে। সেইজন্য *ইমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্* এই মনুষ্য জগতকে পেয়েছ, এইখানেই ঈশ্বরের ভজনা হয়, আর কোন লোকে হয় না, সেইজন্য সব ছেড়ে তুমি শুধু আমারই ভজনা করে যাও। কিভাবে ভজনা করবে?

**মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু। মামেবৈষ্যসি যুক্ত্বৈবমাত্মানং মৎপরায়ণঃ।।৩৪।।**

এই শ্লোকে ভগবান বলছেন তুমি ঈশ্বরে কিভাবে ভক্তি করবে। *মন্মনা,* মানে মৎ মন, তোমার মন যেন আমাতেই থাকে। মানুষ যদিও বা ভগবানকে ভয় পায়, ভগবানকে যদিও বা শ্রেষ্ঠ মনে করে কিন্তু তার মন থাকে কামিনী-কাঞ্চনে, কামিনী-কাঞ্চনে মন না দিয়ে যে কোন একটা ভাবকে অবলম্বন করে তুমি তোমার পুরো মনটা আমাতে ফেলে রাখ। *মদ্ভক্তঃ,* আমার ভক্ত হও, *মদ্‌যাজী,* মানে আমারই পূজা কর, *মাং নমস্কুরু,* আমাকেই প্রণাম কর। আমাকে মন দিলে, আমাকে ভক্তি করলে, আমাকেই পূজন অর্চন করলে, আমাকে শুধু নমস্কার করলে কি হবে? *মামেবৈষ্যসি যুক্তৈবম্* মৃত্যুর পর তুমি আমাকেই পাবে। *আত্মানাং মৎপরায়ণঃ,* সব কিছু ছেড়ে আমার কাছে যদি চলে আস, তাহলে জগতে যত জীব আছে তার সবার আত্মা আমি আর *পরং গতিম্,* আমিই সবার স্থান, এই ভাবটা তুমি পেয়ে যাবে। অর্থাৎ আমার যেটা বাস্তবিক স্বরূপ, সমস্ত জীব জগতের উৎপত্তির স্থান, আমি হলাম সবার নিবাস, এই স্বরূপের সঙ্গে তুমি এক হয়ে যাবে। এইটাই হচ্ছে নবম অধ্যায়ের মূল বক্তব্য।

**ওঁ তৎসদিতি শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতাসুপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়ং যোগশাস্ত্রে**
**শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে রাজবিদ্যারাজগুহ্যযোগো নাম নবমোহধ্যায়ঃ।।**

১৮ই সেপ্টেম্বর ২০১০

দশম অধ্যায়

# বিভূতিযোগ

সপ্তম অধ্যায় থেকে ভগবান ভক্তি মার্গের তত্ত্বগুলিকে গীতাতে ঠিক ঠিক নিয়ে আসা শুরু করেছেন। ভক্তি ও ভক্তি বিষয়ক তত্ত্ব বলতে হিন্দুধর্মে যেভাবে এখন বোঝান হয় সেগুলিকে বিভিন্ন ভাবে সপ্তম থেকে দ্বাদশ অধ্যায় পর্যন্ত বলে গেছেন। সপ্তম অধ্যায়ে এক ভাবে দেওয়া হয়েছে, অষ্টম অধ্যায়ে একভাবে নবম অধ্যায়ে অন্য ভাবে নিয়ে আসা হয়েছে, দশম আর একাদশ অধ্যায়ে ভক্তিকে সম্পূর্ণ রূপে উন্মোচন করে দিয়েছেন। আর দ্বাদশ অধ্যায়ে গিয়ে ভক্তির তত্ত্বগুলিকে সমন্বয় করা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায় থেকে ষষ্ঠ অধ্যায়ে ভগবানের নিরাকার ভাবের কথাই যেন বেশি বলা হয়েছে, কোথাও আমি ভাবটা নেই। সপ্তম অধ্যায় থেকে একাদশ পর্যন্ত সাকার ভাবকে নিয়ে আসা শুরু হয়, বেশির ভাগটা সাকার কিছুটা নিরাকার ভাবকে নিয়ে ভগবান তাঁর আলোচনাকে এই কটি অধ্যায়ে এগিয়ে নিয়ে গেছেন, এই দুটো ভাবকে অর্থাৎ দ্বিতীয় অধ্যায় থেকে ষষ্ঠ অধ্যায় যেখানে ভগবানের নিরাকার ভাবেরই কথা বেশি বলা হয়েছে আর সপ্তম অধ্যায় থেকে একাদশ অধ্যায়ে যেখানে ভগবানের সাকার ভাবের কথা বেশি নিয়ে আসা হয়ছে, এই দুটো ভাবকে, মানে পাঁচ আর পাঁচ এই দশটি অধ্যায়কে সমন্বয় করা হচ্ছে দ্বাদশ অধ্যায়ে। ত্রয়োদশ অধ্যায় থেকে আবার ঠিক ঠিক হিন্দুধর্মের যে বাস্তবিক দর্শন সেটাকে নিয়ে আলোচনা করেছেন। ভক্তিতে যাদের বেশি আস্থা ও নিষ্ঠা তাদের জন্য নবম, দশম ও একাদশ অধ্যায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দ্বাদশ অধ্যায়ের নাম যদিও ভক্তিযোগ কিন্তু মূলতঃ এই অধ্যায়ে সাকার আর নিরাকার ভাবকে সমন্বয় করা হয়েছে।

যখনই সাধক ঈশ্বরের ধ্যান করে তখন ঈশ্বরকে দুই ভাবে ধ্যান করা হয়, একটা হচ্ছে ঈশ্বরের নির্গুণ নিরাকারের ধ্যান। নির্গুণ নিরাকারের ধ্যান সবার পক্ষে সম্ভব নয়, খুবই মুষ্টিমেয় কয়েকজন সাধকই ঈশ্বরের নির্গুণ নিরাকার ধ্যানের জন্য যোগ্য বলে বিবেচিত হয়ে থাকেন। বেশির ভাগ সাধকই হয় ঈশ্বরের সগুণ সাকারের ধ্যান করেন নয়তো অধ্যারোপ অপবাদের সাধনা করেন। একটা জিনিষকে বোঝাবার জন্য সেই জিনিষের উপর প্রথমে কিছু জিনিষকে আরোপ করা হয়, পরে আবার ঐ আরোপিত জিনিষকে সরিয়ে দেওয়া হয়, সরিয়ে দেওয়ার পর ঐ আসল জিনিষটা তখন স্পষ্ট রূপে ধারণা হয়ে যায়। এর সহজ উপমা হচ্ছে যখন বাচ্চাকে চাঁদ দেখান হয়। আকাশে চাঁদ উঠেছে, শিশু জানেনা কোনটা চাঁদ, তখন বাচ্চাকে কোলে নিয়ে নিজের আঙুলটা চাঁদের দিকে লক্ষ্য করে বলে – তুমি আমার আঙুলের দিকে তাকাও। বাচ্চা মায়ের আঙুলের দিকে তাকাল, এবারে মা বলছেন – এই আঙুলের সোজা যেটা দেখতে পাচ্ছ সেটাই চাঁদ। মা তখন তার আঙুলটা সরিয়ে নেয়, আঙুলটা আর তখন নেই, তখন দৃষ্টিটা শুধু চাঁদের দিকেই চলে যায়। অধ্যারোপ আর অপবাদের ক্ষেত্রে ঠিক এই ব্যাপারটাই হয়, একটা জিনিষকে বোঝানোর জন্য আরেকটা জিনিষকে নিয়ে আসা হল, তারপর যে জিনিষটাকে নিয়ে আসা হয়েছিল সেটাকে সরিয়ে নেওয়া হয়। উপনিষদে বেশির ভাগ তত্ত্বকে এইভাবেই ঋষিরা উপস্থাপন করেছেন। বেশির ভাগ সাধকই হল সাধারণ মনের অধিকারি। শঙ্করাচার্যের মত গুরু শিষ্যকে বলে দিল 'তত্ত্বমসি' আর সঙ্গে সঙ্গে অহংব্রহ্মাস্মি চিন্তা করতে শুরু করে দেবে, এটা আমাদের মত সাধারণের পক্ষে সম্ভব নয়। শঙ্করাচার্যও অনেকবার বলেছেন যে, যারা আধ্যাত্মিক সাধনা করতে আসে তাদের তিন প্রকার শ্রেণীতে ভাগ করা হয় – উত্তম, মধ্যম ও মন্দ। উত্তম সাধককে একবার বলে দেবে 'তত্ত্বমসি' তুমিই সেই, সে এইটাকে নিয়েই সাধনা শুরু করে দেবে, তার আর কোন কিছুর অবলম্বনের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু যারা মধ্যম আর মন্দ তাদের এই 'তত্ত্বমসি' বারবার বলতে হয়, বারবার বলতে বলতে শুনতে শুনতে হয়তো কিছুটা ধারণা হয়, কিন্তু সাধনা তখনই শুরু করতে পারেনা। এর মধ্যে যখন সগুণ সাকার চিন্তন আসে তখন নানা ভাবে চিন্তন করে। গুরু বলে দিয়েছে তোমার হৃদয়ে ইষ্টের এই মুর্তির উপর ধ্যান করবে, শিষ্যও সেইভাবে ভগবানের একটা বিশেষ মুর্তির উপর ধ্যান করে যাচ্ছে। কিন্তু এর বাইরেও সগুণ সাকারের অনেক রকম ধ্যান হয়, যেমন যারা নতুন সাধক তাদের পক্ষে শুধু ইষ্টের মুর্তির উপর ধ্যান করা খুব কঠিন হয়ে যায়। সেইজন্য তাদের ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে অন্য ভাবে ধ্যান করানর চেষ্টা করা হয়। অন্য ভাবে করানোর মধ্যে একটা হচ্ছে তত্ত্বচিন্তন, ঈশ্বরের যে তত্ত্ব সেটার চিন্তন করা। তত্ত্বচিন্তনের মতই হতে পারে গুণচিন্তন, ঈশ্বরের যা যা গুণ আছে সেই গুণের উপর চিন্তন করা। বেলুড় মঠে স্বামীজী রচিত যে আরাত্রিক ভজন করা হয়, সেই খণ্ডন ভববন্ধন এবং ওঁ হ্রীং ঋতম্ ত্বমচলো, এই দুটো আরাত্রিক ভজনই ঠাকুরের তত্ত্বচিন্তন আর গুণচিন্তন। তত্ত্বচিন্তন আর গুণচিন্তনের পর আসে লীলাচিন্তন। লীলাচিন্তনে তার ইষ্ট অবতার হয়ে আসার পর যা যা করেছেন সেইগুলো নিয়ে বসে বসে চিন্তা করতে থাকে। যাদের জপ ও ধ্যানে মন খুব একটা বসতে চায়না তাদের পক্ষে ভগবানের লীলাচিন্তন খুবই উপযোগী। লীলাপ্রসঙ্গ বা কথামৃত পড়ার সময় মনটাকে সেই স্থানে আর সেই সময়ের পটভূমিতে নিয়ে যেতে হয়, দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের সেই ঘর, সেই খাট, খাটের উপর ঠাকুর বসে আছেন, মেঝেতে ভক্তরা বসে আছেন, কথামৃতের এই কথাগুলো ঠাকুরের শ্রীমুখ থেকে নির্গত হচ্ছে, ভক্তরাও অবাক বিস্ময়ে শুনছেন, আমিও সেই ভক্তদের মাঝখানে বসে ঠাকুরের এই অমৃতবাণী শ্রবণ করছি। লীলাপ্রসঙ্গ আর কথামৃত শুধু পড়লে হবে না, এইভাবে নিজেকে সেই দৃশ্যের একজন দ্রষ্টা ও

শ্রোতা রূপে চিন্তন করে পড়তে হবে। এই বোধ নিয়ে কথামৃত পড়লে ঠাকুরের কথাগুলো মাথাতে বসে যাবে, বোধগম্য হবে আর কথামৃত পড়তে পড়তেই ধ্যান হয়ে যাবে।

ইদানিং কালের বিখ্যাত দার্শনিক জে কে কৃষ্ণমুর্তি এই awareness এর কথা বলতেন। এই awareness আসলে হচ্ছে বৌদ্ধদের ধ্যানের একটা বিশেষ পদ্ধতি। বৌদ্ধ ধর্মে যারা নতুন ভিক্ষুক রূপে প্রবেশ করে তাদের প্রথমে এই awareness এর প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। বলা হয় চব্বিশ ঘন্টা তুমি awareness থাক। সব সময় আমি ঠিক পথে আছি এই ব্যাপারে awareness থাকা। যখন এই বোতলটা ধরছি তখনও আমি সচেতন যে আমি বোতলটা ধরছি। যখন কথামৃত পড়া হচ্ছে তখন লীলা চিন্তনটাও এক ধরণের awareness, এই সচেতনতাকে ধরে রাখলে আমার ভেতরে যে চৈতন্য সত্তা আছে সে জাগ্রত হয়ে যায়। বেশির ভাগ সময় আমরা কত রকমের বই পাতার পর পাতা পড়ে যাচ্ছি কিন্তু মনের ভেতরে কোন দাগ কাটেনা, কারণ এই সচেতনতার অভাব। অথচ স্বামীজী এনসাইক্লোপেডিয়ার পাতার পাতা এক এক করে উল্টে যাচ্ছেন আর সবটাই তাঁর মাথার মধ্যে বসে যাচ্ছে। এর মানে হচ্ছে স্বামীজীর awareness খুব উচ্চ স্তরে রয়েছে। অনেক দিন যাবৎ ধ্যান ধারণা করতে করতে awareness এত বেড়ে যায় যে যেটাই একবার দেখবে, শুনবে বা পড়বে সেটাই মাথায় বসে যাবে। আমাদের ক্ষেত্রে আমরা এক সাথে বিভিন্ন কাজের মধ্যে নিজেদের জড়িয়ে ফেলি, তার ফলে কোনটাতেই awareness ঠিক মত থাকে না। ভগবানও গীতাতে বলছেন – *বহুশাখা হ্যনন্ত্যশ্চ বুদ্ধয়োহব্যবসায়িনাম্,* অব্যবসায়ীরা এক সঙ্গে অনেক গুলো কাজ হাতে নিয়ে নেয়। একটা শাখাকে ধরে নিলে তখন awareness ঠিকমত আসে। এই awareness যখন আসে তখনই ভেতরের চৈতন্য সত্তা জেগে ওঠে।

সব থেকে উচ্চাবস্থায় তত্ত্ব চিন্তন বা গুণ চিন্তন হয়। তার নীচে আসে লীলাচিন্তন। এরও নীচে রূপ চিন্তন, ভগবানের যে কোন একটা রূপের চিন্তন করা। সচরাচর আমাদের যখন দীক্ষাদি দেওয়া হয় এখানে আমাদের ইষ্টমন্ত্রের সাথে ভগবানের একটি বিশেষ রূপকে দিয়ে দেওয়া হয়। এই রূপটাকে এইবার চিন্তন করে যেতে হবে। এইভাবে রূপ চিন্তন করতে করতে মন যখন একাগ্র হতে থাকে, নিজের চিন্তা ভাবনাগুলো আর চৈতন্যের ভাবটা খুব স্বচ্ছ ও গভীর হতে থাকে তখন চৈতন্যের আলোটা যেন একটা জায়গায় কেন্দ্রীভূত হতে থাকে। আলোটা যখন কেন্দ্রীভূত হতে থাকে তখন ভগবানের ঐ রূপটা ভেসে উঠতে থাকে। তখন যে রূপটা ছবি আকারে ভাবা হচ্ছিল সেই রূপটা তিন মাত্রায় মানে মুর্তিরূপে চলে আসে। ঐ মুর্তিই গভীর ধ্যানে আরও আলোময় হয়ে ঝলমল করতে থাকে। তারপরে মনে হয় যেন তিনি জীবন্ত সত্তা রূপে আমার মধ্যে বিরাজ করে আছেন, আমরা যেমন সামনে মানুষ দেখি, ঠিক সেই রকম ভাবে চিন্তন হতে শুরু হয়। এটা সবে শুরু হল বলা যায়, এইখান থেকে ধ্যানটা ঠিক ঠিক গভীর হতে শুরু করে। প্রায়ই লোকেরা এসে বলে আমার ধ্যান হয় না। এখানে বোঝা যায় বাস্তবে ধ্যান কি জিনিষ। আমাদের বেশির ভাগ লোকেরাই ধ্যানের সময় মাছের চিন্তা করে আর মাছ কেনার সময় ধ্যানের চিন্তা করে। এইজন্য আমাদের শাস্ত্রে নানান রকমের ধ্যানের কথা উল্লেখ করা হয়, শুধু আমাদের মনটাকে বেঁধে নেওয়ার জন্য। তুমি যখন গীতা ভাগবদ্ পড়ছ তখনও তুমি ধ্যান করতে পার, হাঁটাচলা করছ তখনও ধ্যান করতে পার, নাম জপ করছ তাও ধ্যান করতে পার, জোরে জোরে শাস্ত্র পাঠ করছ তখনও ধ্যান হতে পারে। গীতার দশম আর একাদশ অধ্যায়ের এটাই বিশেষত্ব, দশম অধ্যায়কে বলা যেতে পারে ভগবানের তত্ত্ব চিন্তন আর একাদশ অধ্যায় হচ্ছে বস্তু চিন্তন। লীলাচিন্তন গীতাতে পাওয়া যাবে না, লীলাচিন্তন শ্রীমদ্ভাগবতে পাওয়া যাবে। দশম অধ্যায়ে ভগবানকে বিভিন্ন ভাবে কিভাবে চিন্তন করা যায়, আর এই চিন্তনের মাধ্যমে নিজেকে কিভাবে উন্নত করা যায় বলা হয়েছে। কারণ ঠিক ঠিক ঈশ্বরের যে তত্ত্ব সেটা আগের আগের অধ্যায়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলে দিয়েছেন। কিন্তু ঈশ্বরের তত্ত্বকে ধারণা করে চিন্তন করা খুব কঠিন। যেমন ভগবানের পরা প্রকৃতি, যেটা একেবারেই নির্গুণ নিরাকার, এটাকে সবাই ধরতে পারেনা। ঈশ্বরের আরেকটু সাকার রূপকে এই অধ্যায়ে নিয়ে আসা হচ্ছে।

ভগবানের বিভূতির কথা সপ্তম অধ্যায় আর নবম অধ্যায়ে সামান্য একটু বলা হয়েছে। কিন্তু ভগবানের তত্ত্বকে ধারণা করা এতই কঠিন যে আমাদের এই স্থূল বুদ্ধি দিয়ে কিছুই ধরতে পারা যায় না। স্থূল বুদ্ধি হচ্ছে অনেকটা এই রকম, যে কুড়াল দিয়ে একটা বড় গাছ কাটা যায়, সেই কুড়াল দিয়ে গালের দাড়ি কাটা যায় না। আমাদের সবারই বুদ্ধি হচ্ছে এই কুড়ালের বুদ্ধি। এই বুদ্ধি দিয়ে জাগতিক কাজ মানে বড় বড় গাছ কাটা যাবে কিন্তু গীতার তত্ত্ব বুঝতে হলে খুব সূক্ষ্ম বুদ্ধির দরকার। সাধারণ মানুষের এই সূক্ষ্ম বুদ্ধি নেই, তাই ভগবান কৃপা করে তাঁর তত্ত্বকে নানান ভাবে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলছেন। ঠাকুর এই কুড়ুলে মার্কা বুদ্ধিকে বলতেন চিড়ে ভেজা বুদ্ধি।

নবম অধ্যায়ে ভগবান শেষ করেছিলেন এই বলে যে হে অর্জুন তুমি *মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু,* যা কিছু করবে সব আমাকে মাথায় রেখে কর, তোমার চিত্ত আমাতে দাও, আমারই ভজন পূজন কর, কায়মনোবাক্যে আমাকেই প্রণাম কর। কিন্তু এই আমিটা কে? সব কথাতেই যদি বলা হয় তোমার এত দুঃখ-কষ্ট তুমি ভগবানের ভজনা কর, তোমার শোক মোহকে দূর করবার জন্য ভগবানের শরণাগত হও, কিন্তু ভগবান জিনিষটা কি? ভগবানের তত্ত্বতো সাধারণ লোকেদের বোঝান যাবে না। তাই

এখানে ভগবানের তত্ত্বকে ছেড়ে তাঁর বিভূতির কথা বলা হচ্ছে। বিভূতি শব্দের একটা অর্থ হচ্ছে বিস্তার। একজন জমিদার তার অনেক জমি, জায়গা আছে, অনেক লেঠেল আছে, এছাড়াও আরও অনেক কিছু আছে, তার মানে জমিদার নিজেকে এত কিছুর মধ্যে বিস্তার করে রেখেছেন। ঠিক সেই রকম বিভূতি হচ্ছে ভগবানের সম্প্রসারিত রূপ। প্রথম শ্লোকে বলছেন –

শ্রীভগবানুবাচ

**ভূয় এব মহাবাহো শৃণু মে পরমং বচঃ। যৎ তেহহং প্রীয়মাণায় বক্ষ্যামি হিতকাম্যয়া।।১।।**

হে মহাবাহো অর্জুন, *হিতকাম্যয়া,* যেহেতু তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয় তাই তোমার যাতে হিত হয়, তোমার মঙ্গলের জন্য কয়েকটি কথা আবার বলতে যাচ্ছি। এই কথাগুলো আমি এর আগেও তোমাকে বলেছি, কিন্তু আবার তোমাকে বলছি, তুমি মন দিয়ে আমার এই পরম কথাগুলো শোন। কেন মন দিয়ে শুনতে বলছেন? বেশির ভাগ সময় যখন কোন বক্তা শ্রোতাদের সামনে কথামৃতের আলোচনা করেন তারা নানান গল্প করে করে বেশি সময় কাটিয়ে দেন, শুনতে তখন খুবই ভালো লাগে, কিন্তু পরে দেখা যায় শ্রোতারা সেই রকম কিছুই জানতে পারল না। কেন? কারণ বেশি তত্ত্ব আলোচনা করা যাবে না। কেননা যখনই কথামৃতের তত্ত্বের দিকে ঢুকবে কিছুক্ষণ পরেই দেখা যায় শ্রোতাদের মাথায় কিছুই ঢুকছে না। কারণ? ভগবান এই শ্লোকে তার উত্তর দিচ্ছেন –

**ন মে বিদুঃ সুরগণাঃ প্রভবং ন মহর্ষয়ঃ। অহমাদির্হি দেবানাং মহর্ষীণাঞ্চ সর্বশঃ।।২।।**

কারণ আমাকে এবং আমার বিভূতি, আমার জন্ম, আমার আদি, আমার যে উৎপত্তি, *প্রভবং* আমার যে প্রভাব, আমি কোথা থেকে এসেছি, আমার কি ক্ষমতা, *ন মে বিদুঃ সুরগণাঃ,* দেবতাদের কথা ছেড়ে দাও, ব্রহ্মা যিনি প্রজাপতি পিতা, তিনিও বুঝতে পারেন না, এখানে ভগবান ব্রহ্মাকেও ধরে নিয়েছেন। মুক্তির দিক থেকে দেবতাদের থেকে আরও উচ্চ অবস্থার যারা আছেন, সেই মহর্ষীরাও আমাকে বুঝতে বা ধরতে পারে না। এখানে দেবতাদের ক্ষমতার দিক থেকে আর ঋষিদের বুদ্ধির দিক থেকে বিচার করা হয়েছে। মানে তোমার সাথে যদি দেবতাদের মত ঐশ্বর্য ও ক্ষমতা থাকে তাও আমার তত্ত্বকে বুঝতে পারবে না, অন্য দিকে ঋষিদের যে জ্ঞান, তাঁদের যে তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সেই দিয়েও আমাকে বুঝতে পারবে না। কি বুঝতে পারেনা? *প্রভবং,* আমার যে প্রভাব, আমার যে উৎপত্তি আর তার কারণ এটা বুঝতে পারেনা। কেন বুঝতে পারেনা? কারণ *অহমাদির্হি দেবানাং,* আমি হলাম দেবতা, ঋষি বা মহর্ষী সবারই আদি। যেটা মূল, সেই জিনিষটাকে তার পরে যে আসছে সে কখনই জানতে পারবে না। যে কোন যৌগিক বস্তুকে জানতে হলে তাকে টুকরো টুকরো করে ভেঙ্গে দেওয়া হয়, টুকরো করে যখন বস্তুকে বিভিন্ন অংশে বিভক্ত করে দেওয়া হল, তখন তার একটা অংশকে নিয়ে কোন যৌগিক বস্তুকে বিশ্লেষণ করে দেওয়া হয়। মৌলিক পদার্থকে কখনই যৌগিক পদার্থ দিয়ে বিশ্লেষণ করা যাবে না। যেমন কেউ যদি বলে ৫+৩ কত হয়, আমাদের ছোটবেলাতেই যোগের অঙ্ক শিখিয়ে দেওয়া হয়েছে, সেই থেকে আমরা সবাই জানি যে পাঁচ আর তিনে আট। কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞান বা কম্প্যুটার বিজ্ঞানে যদি যাই সেখানে ৫+৩ কত হয় এই প্রশ্ন হয় না। সেখানে পাঁচকে টুকরো করে দেওয়া হয় ১+১+১+১+১ এই ভাবে, ঠিক এই ভাবে তিনকেও ১+১+১ টুকরো করে দেওয়া হয়। এইবার এক যুক্ত একের উত্তর আছে। কিন্তু ৫+৩ এটা হচ্ছে যৌগিক সমস্যা, এটাকেই যখন টুকরো করে দিয়ে ১ এর মৌলিকে নিয়ে গেল দিল তখন এর উত্তরটা সঙ্গে সঙ্গে বার করে নেওয়া যায়। কারণ মৌলিক দিয়ে সব সময় যৌগিককে বার করা হয়। এখন যদি কেউ প্রশ্ন করে কেন এই রকম হয়? তখন এর কোন উত্তর দেওয়া যায় না। উত্তর নেইতো দেবে কোত্থেকে। কারণ ঐ জায়গাটা অযৌগিকের চরম অবস্থায় চলে গেছে। অযৌগিকের যেটা চরম অবস্থা তা হচ্ছে, যোগ যেটা হচ্ছে সেটাও চরম বিন্দুতে চলে গেছে, ওর নীচে আর যাওয়া যাবে না। ওপরে কি যোগ হয়? ১+০ কত হয়, এর কোন অর্থই হয় না। এটাকেই বুঝিয়ে দিচ্ছে যে যৌগিকের চরম অবস্থাতে চলে গেছে।

জগতের যা কিছু আছে সব কিছুকে টুকরো টুকরো করতে করতে অযৌগিক করতে করতে একেবারে অযৌগিকের চরম অবস্থায় চলে যায় তখন কম্প্যুটার সেটাকেই জিরো আর ওয়ানে নিয়ে চলে যায়। কম্প্যুটারে ইন্টারনেটে যা কিছু দেখছি সবই এই জিরো আর ওয়ানের খেলা। জিরো আর ওয়ানের পরে আর ওটাকে ভেঙ্গে অযৌগিক করা যাবে না। জগতের ক্ষেত্রেও ঠিক একই জিনিষ হয়, যাবতীয় যত যৌগিক পদার্থ আছে সব ভেঙ্গে ভেঙ্গে সব কিছুর ব্যাখ্যা করে করে পৌঁছে যাব ঈশ্বরে, ঈশ্বর হচ্ছেন সব কিছুর মূল। এবার ঈশ্বরকে যদি ব্যাখ্যা করতে যাই তাহলে আর ব্যাখ্যা করা যাবে না। কারণ ঈশ্বর হয়ে গেছেন অযৌগিকের বা মৌলিকের চরম স্তর। ঠাকুর বার বার বলছেন – ঈশ্বর হচ্ছেন সহজ। সহজ না হলে সহজকে ধরা যাবে না। এরপর আর জিনিষটাকে সহজ করা যাবেনা, ঐখানেই সহজের শেষ অবস্থা। বাকি যা কিছু আছে সবই তাঁর পরের সৃষ্টি, তাই ঈশ্বর ছাড়া সবটাই যৌগিক। দেবতারা, ঋষিরা তাঁর পরের সৃষ্ট। সর্বব্যাপী যে একটা অস্তিত্ব আছে যেখানে কোন ধরণের বহুত্ব নেই, কোন যৌগিক নেই, জটিলতা নেই। তাই ঈশ্বর হচ্ছেন মূল, মূলকে কখনই ব্যাখ্যা করা যায় না। সেইজন্য সাংখ্যের প্রকৃতিকে বলা হয় মূলা প্রকৃতি, এই মূলা প্রকৃতিকে ব্যাখ্যা করা যায় না। যে কোন জিনিষের যখন মূলে চলে যাওয়া যাবে সেটাই হচ্ছে সহজতম। সহজকে দিয়ে যৌগিককে ব্যাখ্যা করবে কিন্তু সহজকে ব্যাখ্যা করার কোন উপায় নেই। যেমন আমাকে যদি জিজ্ঞেস করা হয় – What is happiness?

Happiness কে ব্যাখ্যা করা যাবে না। বেশি খুশি না কম খুশি সেটাকে ব্যাখ্যা করা যাবে, কারণ এটা যৌগিক স্তরে এসে যাচ্ছে, কিন্তু খুশিত্বকে কখনই ব্যাখ্যা করা যায় না। তারপরেই ভগবান বলছেন –

**যো মামজমনাদিঞ্চ বেত্তি লোকমহেশ্বরম্। অসংমূঢ়ঃ স মর্ত্যেষু সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে।।৩।।**

ভগবান হচ্ছেন *অজম্ অনাদিম্*, আমার কোন জন্ম নেই, আমি অনাদি। যে কোন জিনিষের ব্যাখ্যা দুভাবে করা হয়, একটা হচ্ছে realistic solution, আরেকটা হল simplistic solution, একটা সহজ ভাবে ব্যাখ্যা করে দেওয়া হল। যখন কোন জিনিষকে সহজ ভাবে ব্যাখ্যা করে দেওয়া হয় তখন ওটা এত সহজ ভাবে ব্যাখ্যা হয়ে যায় যে শুনতে খুবই ভালো লাগে, কিন্তু এটা কোন ব্যাখ্যাই নয়। এই সহজ সমাধানটা কিন্তু মারত্মক বিপজ্জনক, বিজ্ঞানীরা এই সহজ সমাধানের পথটাই নেন আর ধর্মের ব্যাপারে তো দিন রাত সহজ সমাধানকেই অনুসরণ করা হয়। এই সহজ সমাধানের মধ্যে একটা হচ্ছে ঠাকুরের ইচ্ছা, একটা জিনিষ খারাপ হচ্ছে ঠাকুরের ইচ্ছা, ভালো হচ্ছে তাও ঠাকুরের ইচ্ছা, এটাই হচ্ছে সহজ সমাধান। কর্মবাদেও এই সহজ সমাধানকেই নেওয়া হয়, তোমার কর্মে ছিল তাই হয়েছে বা তোমার কর্মে ছিল না তাই হয়নি – এইটাই সব কিছুর সহজ সমাধান হয়ে গেল। ঠিক তেমনি জগতে যা কিছু আছে সব জন্মাচ্ছে আর মরছে আবার জন্ম নিচ্ছে আবার মরছে। ফলে কি হচ্ছে একটা সহজ সমাধান বেরিয়ে আসছে, যেটা খ্রীশ্চান আর ইসলাম ধর্মে নিয়ে আসা হয় – সৃষ্টি ভগবানের ইচ্ছায় হয়েছে, ভগবানের ইচ্ছায় অমুক সময় মরছে। এর আগে তারা কি ছিল, কিছুই ছিল না। একটা মানুষ তো একবারই জন্ম নেবে আর একবারই মারা যাবে। আমাদের হিন্দু মতে আবার যখন জন্ম নেবে তখন এই জীব হয়েই হয়তো আর জন্মাবে না, অন্য জীব হয়ে জন্মাবে। এটাকে সৃষ্টির উপর লাগিয়ে দেওয়া হল, সৃষ্টি এককালীন, প্রলয়ও এককালীন আর স্বর্গ নরকও এককালীন। এটাই হচ্ছে সহজতম সমাধান, এর চাইতে আর সহজ সমাধান হতে পারেনা, আমি চোখের সামনে যা দেখছি সেটাকেই ভগবানের উপর লাগিয়ে দেওয়া হল।

একবার যখন সহজ সমাধান দিয়ে দেওয়া হল, এরপর এই সহজ সমাধানের উপরই প্রশ্ন আসতে শুরু হবে। এরপর স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন আসবে ভগবানের জন্ম কে দিল? ইসলাম আর খ্রীশ্চানিটিতে যে সহজ সমাধান দিয়ে দেওয়া হয় – তিনি কৃপানিধান, ভগবান যা কিছু করেন মঙ্গলের জন্যই করেন, তিনি হচ্ছে ন্যায় প্রিয়, কাউকে কম, কাউকে বেশি দেননা। এরপরেই যদি প্রশ্ন করা হয় একটা বাচ্চা ছেলে জন্ম থেকে অন্ধ কেন? নিশ্চয় কোন একটা পাপ করেছিল বলেই সে অন্ধ হয়েছে, আর তা নাহলে ভগবান কাউকে ভালো করেছেন কাউকে খারাপ করেছেন। তাহলে তাঁর ন্যায় প্রিয়তা কোথায় দাঁড়াবে, তাঁর সবার প্রতি ভালোবাসা, করুণা কোথায় গেল? এই প্রশ্নগুলোর আর উত্তর দেওয়া যায় না, উত্তর দিতে গেলেই যুক্তির তোড়ে দাঁড়াতেই পারবে না। হিন্দুরা এখানে বলে দেয় যা হচ্ছে সব তোমার কর্মের জন্যই হচ্ছে, এখানে ভগবানের ঘাড়ে কিছু ফেলে দেওয়া হয় না। এই জন্মে কোন পাপ হয়তো করোনি কিন্তু তার আগের জন্মে করেছিলে। এইভাবে কত দূর নিয়ে যাবে? কোটি কোটি আগের আগের জন্মে নিয়ে যাবে। তারও আগে কোথায় ছিল? তার আগের সৃষ্টি বা কল্পে নিয়ে যাবে, যেটা এর আগে ভগবান অষ্টম অধ্যায়ে আলোচনা করেছেন, যার ভাষ্যে শঙ্করাচার্য বলছেন – আসলে জগতে যে বৈষম্য দেখা যাচ্ছে এটাকে বোঝাবার জন এই জিনিষগুলিকে এই ভাবে ব্যাখ্যা করা হয়। কিন্তু মানুষ যখন ঠিক ঠিক অদ্বৈত জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় তখন দেখে এগুলো সবই মিথ্যা, আমার জন্মও হয়নি মৃত্যুও কোন দিন হবে না। হিন্দুদের যে সহজ সমাধান দেওয়া হয় সেখানে তারা বলেই দেন – দ্যাখ বাপু এর চাইতে বেশি সহজ সমাধান দেওয়া যাবে না, আর এর থেকে যদি বেশি প্রশ্ন করতে যাও তাহলে তুমি এর মধ্যেই উত্তর খুঁজতেই থেকে যাবে কোন দিন উত্তর পাবে না। মহারাষ্ট্রের ভূমিকম্পের পরে স্বামী ভূতেশানন্দজীকে একজন জিজ্ঞেস করেছিলেন – মহারাজ সবারই কি কর্মে লেখা ছিল যে সবাই ঐ লাটুরেই এক সঙ্গে জন্ম কর্ম হবে আর একই দিনে একসাথে মারা যাবে? মহারাজ সঙ্গে সঙ্গে নিজের স্বভাব সুলভ ভঙ্গিতে বললেন – লঙ্কা খেলে ঝাল লাগে এটা মানতো? হ্যাঁ মহারাজ মানি। তাহলে এটাই তো হচ্ছে কর্ম আর তার ফল, এই নিয়মটাকেই বৃহত্তর ক্ষেত্রে বাড়িয়ে দাও তাহলে তাই হবে, কোথাও এদের কর্ম ছিল যে এরা একসঙ্গে ছিল আর একসাথেই মারা যাবে। এর বেশি যদি তুমি কিছু খুঁজতে যাও তাহলে সারা জীবনব্যাপি খুঁজেও এর উত্তর তুমি পাবে না। আর তোমার পুরো মনটা ঐ উত্তর খোঁজাতেই চলে যাবে, জীবনের যে উদ্দেশ্য ভগবানের জ্ঞান, ঐশ্বর্য ও ভক্তি লাভ করা সেটা থেকে মন সরে গিয়ে তোমার জীবনের উদ্দেশ্যটাই ব্যর্থ হয়ে যাবে। এই কারণেই আমাদের একটা সহজ কথা বলে দিলেন যে, সবই ঈশ্বরের ইচ্ছা, যা হচ্ছে তোমার কর্মফলে হচ্ছে, এইগুলো বলে আমাদের মনের খেদটাকে একটু পুষিয়ে দিয়ে সেখান থেকে সরিয়ে জীবনের উদ্দেশ্যের দিকে ঠেলে দিলেন। এই সহজ উত্তরে তোমার মনটা শান্ত হয়ে যাওয়ার পর তোমার মনটা পুরোপুরি ঈশ্বরের দিকে দিয়ে দাও।

ভগবান এই শ্লোকে অর্জুনকে বলতে চাইছেন যে, মানুষ যেমন জন্মায় আর মরে, এই ভাবটাকে তুমি আমার উপরে নিয়ে এসো না। আমি ভগবান, আমি অজম্, আমার জন্ম হয়নি, আমি অনাদি মানে আমিই আছি। আমিই যখন আছি তাহলে আমার আর জন্ম কিসের, আমার মৃত্যু কিসের আমার আবার আদি কোথায়। আমার এই অজম্, অনাদি ভাবটাকে তুমি যখন অবলম্বন করে নেবে তখন তুমি বুঝতে পারবে যে জগতে যাবতীয় যা কিছু আছে তারা তিনটি অবস্থাতে থাকে – জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি। এই তিনটে অবস্থার পারে আরকটি বিলক্ষণ অবস্থা হয় তুরীয়। তুরীয় অবস্থায় যে কোন বস্তুর যে বাস্তবিক স্বরূপ সেই স্বরূপে অবস্থান করে। ঈশ্বর

হচ্ছেন সব কিছুর বাস্তবিক স্বরূপ, তাই তিনি জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই তিন অবস্থার পারে। আমাদের এই অবস্থাকে বোঝার জন্য আগে সমাধিতে গিয়ে এই জ্ঞানটা লাভ করতে হবে। এই বোধ যখন এসে যাবে তখন কি হবে? *অসংমূঢ়ঃ স মর্ত্যেষু*, তখন সে মোহশূন্য হয়ে গিয়ে সর্ব জ্ঞানের অধিকারী হবে। এখন আমরাও তো শাস্ত্র অধ্যয়ণ করে জানি যে ভগবান অজম্, অনাদি, ভগবানের জন্ম নেই মৃত্যু নেই। আমাদের কাছে এসব কথা সবই মুখের কথা, কিন্তু যখন সত্যিই আধ্যাত্মিক জীবনে প্রবেশ করব, এখন যেটাকে স্পষ্ট মনে হচ্ছে তখন এই স্পষ্ট ধারণার উপরেই হাজারটা প্রশ্ন এসে মনকে সংশায়িত করে দেবে।

কালির দোয়াত অনেক দিন পড়ে থাকার পর যখন কালি শুকিয়ে যাবে বাইরে থেকে মনে হবে দোয়াতটা পরিষ্কার, কিন্তু যখনই একটু একটু করে জল ঢালা যাবে ততই দোয়াত থেকে প্রথমে হাল্কা নীল রঙের জল বেরোবে, যত জল ঢালা হতে থাকবে তত গাঢ় নীল রঙের জল বেরোতেই থাকবে। আমাদের সবার মনের অবস্থাও ঠিক এই বহু পুরনো পরিত্যাক্ত কালির দোয়াতের মত। যতক্ষণ সাধনা না করা হয় তত দিন মনের যত নোংরা আবর্জনা ভেতরে শুকিয়ে জমে নীল রঙ হয়ে থাকবে, তখন খুব বলা যায় ঠাকুর ছাড়া কি কিছু আছে নাকি। কিন্তু যেমনি ধ্যান করতে শুরু করবে, ঠাকুরের নাম, রূপ, তত্ত্বরূপ জল মনের ভেতরে ঢালতে শুরু করবে তখনই মনের যত আবার্জনা গুলো বেরোতে শুরু হবে। তখন মনে হবে আমার মধ্যে এত ময়লা জমে ছিল, এর থেকে ধ্যান না করাইতো ভাল ছিল। বেলুড় মঠের সন্ন্যাসীদের দেখে অনেকেই বলে – এরা বেশ আছে, খাচ্ছে দাচ্ছে আর ঠাকুরের নাম করছে। যারা এসব বলে তারা এই সব সন্ন্যাসীদের থেকে কোথায় কত দূরে পিছিয়ে আছে সে সম্বন্ধে কোন ধারণাই করতে পারছে না।

যার ঠিক ঠিক বোধ আছে যে ভগবান হচ্ছেন অজম্ ও অনাদি তখনই সে ঠিক ঠিক জ্ঞানীর অবস্থা লাভ করে আর *সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে*, যা কিছু পাপ সে করেছে, এখানে আবার আচার্য শঙ্কর বলছেন, অজান্তে আর জেনে যত পাপ করেছে সব পাপ থেকে সে মুক্ত হয়ে যায়। ঈশ্বরের জ্ঞান হচ্ছে একটা বিরাট আলোক বর্তিকার মত, আর জাগতিক যা কিছু আছে, ভালো মন্দ ছোটখাটো যা কিছু আছে, এগুলো হচ্ছে প্রদীপের মত, বিরাট আলো জ্বলে উঠলে প্রদীপের আলো নিবে যায় না, প্রদীপের আলো তখনও থাকে কিন্তু সেই আলোর আর কোন তাৎপর্য থাকে না, প্রদীপের আলোর দিকে কারুর আর নজর যাবে না। কর্মের ঐ বীজগুলোর আর বাঁধার ক্ষমতা থাকে না। তখন আত্মশক্তির এমন বিকাশ হয়ে যায় যে মনের ভালো মন্দ, ধর্ম অধর্ম তাকে আর বাঁধতে পারেনা। এখানে সমস্যা হচ্ছে অর্জুনকে নিয়ে, অর্জুন বলছিল আমি যে আমার আত্মীয়স্বজন, গুরুজনদের বধ করব এতে আমার পাপ হবে। তাই ভগবান বলছেন, তুমি একবার যদি বুঝে নাও যে আমি অজম্ ও অনাদি, ঈশ্বরের এই বোধ হয়ে গেলে তুমি এই জগতের জ্ঞানী হয়ে যাবে আর তুমি জ্ঞানত আর অজ্ঞানত যা পাপ করেছ বা করবে সব পাপ থেকে *প্রমুচ্যতে*, মুক্ত হয়ে যাবে। সেইজন্য ভগবান বারবার বলছেন – *ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে*। সব থেকে গর্হিত পাপ হচ্ছে মানুষ বধ, মানুষকে হত্যা করার চেয়ে আর কোন গর্হিত পাপকর্ম হয় না। বিদেশী পণ্ডিতরা এই নরহত্যাকে নিয়ে অনেক গবেষণামূলক প্রবন্ধ লিখেছেন। সেখানে বলছেন যে মানুষ রাগের মাথায়ও যদি কাউকে খুন করে দেয় দেখা যায় পরে তার মাথাটা খারাপ হয়ে যায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর দেখা গেছে, যদিও তারা যুদ্ধের খাতিরে মানুষ মেরেছিল কিন্তু পরে অনেকেরই মানসিক রোগের সমস্যা দেখা দিয়েছিল। আমাদের এখানে প্রথম থেকে এইসব যুদ্ধকে ধর্মযুদ্ধ বলা হয়ে এসেছে। ধর্মযুদ্ধ হলে এই পাপটা তার লাগেনা, কিন্তু না লাগলেও কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পরে যুধিষ্ঠিরকেও পাপবোধে আক্রান্ত হতে হয়েছিল, যার জন্য তিনি এই পাপ থেকে মুক্তি পেতে তপস্যাতে চলে যেতে চেয়েছিলেন। এই পাপবোধ থেকে বাঁচার একমাত্র পথ হচ্ছে আধ্যাত্মিক জ্ঞান, যাঁর আধ্যাত্মিক জ্ঞান হয়ে যায় তাঁরই এসব কোন কিছুতে আসে যায় না। যখন কালীমন্দিরে বলি হচ্ছে সেই দেখে ঠাকুর বলছেন – আমি দেখলাম সবটাই চৈতন, যে বলি দিচ্ছে সেও তাই, সেই ছাগলটাও তাই, যেটা দিয়ে বলি দিচ্ছে সেই খড়্গাটাও তাই, যে হাড়িকাঠে বলি দিচ্ছে সেটাও তাই। এই বোধ যখন হয়ে যায় তখন তার মধ্যে কোন পাপবোধই থাকে না।

এখানে ভগবানের আলোচনা চলছে। আমি কেন মহেশ্বর? আমার কি বৈশিষ্ট্য? ঈশ্বর, যিনি শাসন করেন, ঈশ্ ধাতু থেকে ঈশ্বর, ঈশ্ মানে শাসন করা। আমার চিন্তা শক্তিতে নিয়ন্ত্রণ কর্তাকে যত দূর ভাবা যায় তিনি তারও মহেশ্বর, মানে ঈশ্বরের ঈশ্বর, সূক্ষ্ম থেকেও তিনি সূক্ষ্মতম। ভগবান বলছেন *ন মে বিদুঃ সুরগণাঃ প্রভবং ন মহর্ষয়ঃ*, আমাকে দেবতা, ব্রহ্মা, মহর্ষীরা কেউই জানতে পারেনা কিন্তু –

**বুদ্ধির্জ্ঞানমসংমোহঃ ক্ষমা সত্যং দমঃ শমঃ। সুখং দুঃখং ভবোহভাবো ভয়ং চাভয়মেব চ।।৪।।**

মানুষের যা কিছু গুণ সব গুণই আমার থেকে আসে। কি কি সেই গুণ? বুদ্ধি, জ্ঞান, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, ক্ষমা, সত্য, দম, শম এগুলো হচ্ছে মানুষের উচ্চ গুণ। বুদ্ধি হচ্ছে কোন জিনিষের সূক্ষ্মতম অবস্থাকে বুঝে নেওয়ার মনের যে ক্ষমতা। অন্তঃকরণের করণ হচ্ছে যেটা দিয়ে কর্ম করা হয়, কারকের যে বিভক্তি – কর্তা, কর্ম ও করণ, করণ হচ্ছে তৃতীয়া। যেমন হাত দিয়ে গ্লাশটা ধরলাম, এখানে হাতটা হয়ে গেল করণ। এমনিতে করণ বলতে বোঝায় ইন্দ্রিয়কে, যেটা দিয়ে বাইরের বস্তুকে ধরা হয়। কিন্তু অন্তঃকরণের করণ হল যে তৃতীয়াগুলো ভেতরে আছে। অন্তঃকরণ নানান রকম ভাবে কাজ করে, যেমন একটা জিনিষকে সন্দেহ করে, কোন

জিনিষকে খুঁজে বেড়ায়, কোন ব্যাপারে নিশ্চয় করে দেয়, আবার কোন কিছুর সাথে নিজেকে জুড়ে দেয়। আমি আপনাকে ছাড়া কোথাও বেড়াতে যাবো না, এটা হচ্ছে অভিমানত্মিকা, আমি আপনার সঙ্গে নিজেকে জুড়ে দিলাম। একেই বলা হয় অন্তঃকরণবৃত্তি। যে অন্তঃকরণবৃত্তি সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর জিনিষকে চটপট করে ধরে ফেলে তাকে বলা হয় বুদ্ধি। জ্ঞান হচ্ছে, আত্মার স্বরূপকে ঠিক ঠিক জানার নাম জ্ঞান। *অসংমোহঃ হচ্ছে*, একটা জিনিষ ভুল না ঠিক এটাকে জেনে গেলাম, ঠিক যেটা সেটাকে জেনে নিয়ে এবার তার দিকে যে প্রবৃত্তি হচ্ছে, এটাকেই বলা হচ্ছে *অসংমোহঃ*। কিন্তু একটা বাচ্চা ছেলে পড়তে চাইছে না, মা তাকে একটা চড় মেরে পড়তে বসালেন, বাচ্চাটা পড়তে শুরু করল, এটা কিন্ত অসংমোহঃ হবে না। কারণ বাচ্চা নিজে থেকে তার বিবেককে সেখানে লাগায়নি। কিন্তু আমি অনেক চিন্তা ভাবনা করে বুঝলাম এটাই করা উচিৎ, উচিৎ বুঝে নিয়ে এবার এটাই করতে থাকলাম তখন এটাই হবে অসংমোহঃ। ভগবান বুদ্ধ করুণার কথা বলত গিয়ে বলছেন – যতক্ষণ তুমি একটা জিনিষকে না বুঝতে পারছ ততক্ষণ তুমি সেই জিনিষটাকে ভালোবাসবে কি করে? একটা অচেনা শিশুকে যদি আমার কোলে বসিয়ে দেওয়া হয় তখন আমার যে আনন্দ হবে আর যদি বলে দেওয়া হয় এই শিশুটি আপনার নাতি তখন সেই আনন্দটা অন্য রকম হয়ে যাবে। একটা জিনিষকে যখন মানুষ বুঝে নেয়, বুঝে নেওয়ার পর সেটার প্রতি যে প্রবৃত্তি হয় সেটা খুব গভীর হয়। এটাই হচ্ছে অসংমোহঃ। ঠিক তেমনি আচার্যের কাছে শুনে ও শাস্ত্র অধ্যয়ণ করে ঈশ্বর তত্ত্বকে যে ভালোভাবে বুঝে নিল, তখন ঈশ্বরের দিকে মনটাকে যে গভীর ভাবে নিবিষ্ট করছে সেটাকেই বলছেন অসংমোহঃ। *ক্ষমা* হচ্ছে, যখন কেউ আমার প্রতি দুর্ব্যবহার করল, আমাকে শারীরিক নিগ্রহও পর্যন্ত করতে ছাড়ল না, কিন্তু তাতে আমার চিত্তে কোন ধরণের বিকার হল না, এটাকে খুব উচ্চস্তরের ক্ষমা বলা হচ্ছে। আমাকে কেউ মারল, আমার সেই শারীরিক ক্ষমতা নেই যে আমি তাকে উল্টে একটা চড়ও মারব। অফিসার আমাকে খুব গালাগাল দিল, অফিসারকে উল্টে গালাগাল দিলে আমার চাকরির ক্ষতি হয়ে যাবে, আমি কিছু না বলে মনে মনে অফিসারকে গালাগাল দিলাম। এখানে তা বলা হচ্ছে না, মনে আমার কোন বিকারই আসবে না। এই উচ্চস্তরের ক্ষমা একমাত্র ভগবান থেকেই আসে। *সত্য,* আমি একটা জিনিষকে যেমনটি দেখেছি শুনেছি, দেখে বা শুনে আমার যেমনটি ধারণা হয়েছে, অপরকে বলার সময় অপরের যে বুদ্ধি ও মনকে বোঝানর জন্য যে ক্রিয়া হবে সেটা একেবারে তেমনটি হবে যেরকমটি আমি ধারণা করেছি। সেই ঘটনাকে ব্যক্ত করার সময় কোন ধরণের অতিরঞ্জিত বা পরিবর্তন থাকবে না, এটাই হচ্ছে সত্য। *শম* আর *দম* হচ্ছে সাধনা। দম হচ্ছে, বাইরের ইন্দ্রিয়গুলিকে যখন সংযমে আনা হয়, আর শম হচ্ছে অন্তঃকরণগুলিকে যখন নিয়ন্ত্রণ করা হয়। শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা এগুলো হচ্ছে বেদান্তের সাধনার অঙ্গ।

এরপর বিপরীত জিনিষগুলো নিয়ে বলছেন, যেমন সুখ, সুখ হলে আমাদের আরাম হয়, এই সুখটা আসছে ভগবানের থেকে, সুখের বিপরীত দুঃখ এটিও ভগবানের কাছ থেকে আসে। সুখটা ভগবানের আর দুঃখটা ভগবানের নয়, তা নয়, দুটোই তাঁর কাছ থেকেই আসছে। *ভব,* ভব মানে কোন কিছু হওয়া, যেটা হচ্ছে সেটা ভগবানের কাছ থেকেই হচ্ছে, আর *অভাব*ও তাঁর কাছ থেকেই হয়। একটা জিনিষের যে উৎপত্তি সেটাও ভগবানের কাছ থেকে উৎপত্তি হচ্ছে, আর সেই জিনিষের যে বিনাশ সেটাও তাঁর থেকেই হয়। ভয় আর অভয় এই দুটোই ভগবানের কাছ থেকেই হয়।

**অহিংসা সমতা তুষ্টিস্তপো দানং যশোহযশঃ। ভবন্তি ভাবা ভূতানাং মত্ত এব পৃথগ্বিধাঃ।।৫।।**

এছাড়া আর কি কি? অহিংসা হচ্ছে অপর কোন প্রাণীকে কষ্ট না দেওয়া। এই অহিংসাকেই আরও টেনে নিয়ে গিয়ে বৌদ্ধধর্মে মাছ, মাংস খাওয়াকে নিষিদ্ধ করে দেওয়া হল, কারণ প্রাণী হত্যা করে তাদের কষ্ট দেওয়া হয়। তবে কি, প্রত্যেকে জীবকে শরীর ধারণ করবার জন্য অপর জীবের উপর নির্ভর করতে হয়, সেইজন্য বলা হয় শরীর ধারণের জন্য যতটুকু দরকার ঐটুকুর বাইরে জীবহত্যা করতে নেই। যদি একটা মাছেই আমার প্রয়োজন মিটে যায় তখন দুটো মাছকে মারা কখনই উচিত হবে না। কারণ মানুষকে জীবন ধারণ করতে গেলে একটু হিংসা করতেই হয়, হিংসা ছাড়া জীবন চলবেই না। আমরা যে চাল, গম আহারের জন্য ব্যবহার করছি তখনও জীবহিংসা হচ্ছে। এই হিংসা করতে যখন বাধ্য হচ্ছি তখন আমারও উচিৎ প্রয়োজনের বাইরে কোন খাবার নষ্ট হতে না দেওয়া। যখনই খাবার-দাবারের অপচয় হচ্ছে তখনই কিন্তু হিংসা হয়ে যাচ্ছে। ঠাকুরকে যেখানে দুটো ফুল দিলেই হয়ে যায়, সেখানে দশটা ফুল তুলে বাকি ফুল নষ্ট করে দিলাম এতে হিংসা হয়ে গিয়ে আমাদের পাপ লেগে যায়। কারণ হিংসা মানেই পাপ। ছাগল, মাছ, সব্জী, ডাল, ভাত যাই আমি খাচ্ছি, এই খাওয়াতে আমাকে অনেক জীব হিংসা করতে হচ্ছে, তার পাপটা কিন্তু আমার লাগবে। কিন্তু যখন খাবার আগে ঠাকুরকে নিবেদন করছি, অতিথি সৎকার করছি, দানপূণ্যাদি করছি, এই পূণ্যগুলো ঐ পাপগুলোকে সমান করে দেয়। সেইজন্য বলা হয়, জীবনে কিছু পূণ্যার্জন করতে হয়, পূণ্য অর্জন না করলে এই পাপগুলো বাড়তেই থাকে। হিংসা যত কম করা যায় ততই ভালো, অল্প যে হিংসা শরীর ধারণের জন্য করতে হচ্ছে সেটাকেও পূণ্য কাজের মাধ্যমে সমান করতে হয়। তারপর আসছে *সমতা,* সমতা হচ্ছে সমচিত্ততা, একে বেশি ভালোবাসলাম তাকে কম ভালোবাসছি তা নয়। এই মন চঞ্চল হয়ে যাচ্ছে এই মন শান্ত হয়ে গেল তা নয়। *তুষ্টিঃ,* তুষ্টি হচ্ছে সব কিছুতে সন্তোষ, পর্যাপ্তবুদ্ধিঃ, যা পেলাম তাতেই খুশি। আরো চাই আরো চাই খালি চাই চাই চাই, আর যেটা পেয়েছি সেটাতে তৃপ্ত হচ্ছি না, এটা হচ্ছে অসন্তোষ। এরা অল্প অর্থে সন্তুষ্ট হয় না, বিয়ে করলে কয়েক বছরের মধ্যে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে কলহ বিবাদ লেগেই থাকবে। কোন ভাবে যদি সন্তানাদি হয়ে যায় তখন সন্তানের থেকে

তুষ্টি হবে না, সেই সন্তানকে পরিপালন করতে গিয়ে সমাজের থেকে শান্তি পাবে না। হাজার হাজার বছর ধরে আমাদের গুরুজনরা শিখিয়ে এসেছেন, তুমি এই জীবনটাকে যেমনটি পেয়েছ তাকে সেই ভাবেই গ্রহণ করে সেটাতেই সন্তোষপূর্বক জীবন যাপন কর।

আর বলছেন *তপঃ*, তপঃ হচ্ছে তাপ। আমি ঠিক করে নিয়েছি যে আমি ঈশ্বরের দিকে যখন মন দিয়েছি তখন শরীর, মন, ইন্দ্রিয়কে সংযম করব। বলছেন শরীরকে পীড়া দেওয়া। কিভাবে পীড়া দেওয়ার কথা বলছেন? *ইন্দ্রিয়সংযমপূর্বকম্*। তাই বলে আত্মহত্যা করার জন্য ব্লেড দিয়ে হাত পা চিড়তে থাকবে তা নয়। এখানে পীড়া দেওয়া হচ্ছে ইন্দ্রিয়সংযম পূর্বক। একাদশীর দিন উপবাস করব আর সারাদিন ঈশ্বরের নামজপ করে যাব, পূর্ণিমা অমবস্যায় কম আহার করব, এটা হল তপস্যা। ইন্দ্রিয় সংযম করে শরীরকে যখন পীড়া দেওয়া হয় তখন এই পীড়া দেওয়াটাকেই বলা হয় তপস্যা। এরপর বলছেন *দান*, যেমনটি আমার ক্ষমতা সেই অনুসারে যোগ্য পাত্রে দান করা। খ্রীশ্চান ধর্মে বলা হয় যত আয় করবে তার দশ শতাংশ দান করতে হবে, ইসলাম ধর্মে উপার্জনের পাঁচ শতাংশ দান করার কথা বলা হয়। হিন্দুদের কোন নির্দিষ্ট দানের কথা না বলা হলেও যার যা ক্ষমতা সেই অনুযায়ী যোগ্য পাত্রে দানের কথা বলা হয়, এই দান করার ভাবটা ঈশ্বরের কাছ থেকেই আসে। *যশ* হচ্ছে কীর্তি বা সুনাম কিন্তু ধর্মে নিবেদিত হতে হবে, মানে যখন ধর্ম কাজে কীর্তি হয়। সমাজের দশের জন্য যখন কোন ভালো কাজ করা হল আর সেই কাজের জন্য যখন কীর্তি হয় সেটাকেই এখানে যশ বলা হচ্ছে, এই যশও ভগবানের কাছ থেকেই আসে। অযশ হচ্ছে অধর্ম কাজ, অসৎ কাজ করে যখন সবার নজরে খারাপ হয়ে যায়, যেমন দুর্নীতির দায়ে বড় নামকরা খ্যাতিমান লোকেরা ধরা পড়ে যায় তখন তাদের অযশ হয়ে যায়।

মানুষের মধ্যে এই ধরণের যত নানা রকমের ভাব দেখতে পাওয়া যায়, এই সমস্ত ভাব ঈশ্বর থেকেই আসে। কিভাবে ঈশ্বরের কাছ থেকে আসে? আচার্য বলছেন *স্বকর্ম অনুরূপেণ*, ভগবান নিজের ইচ্ছে মত যাকে যা খুশি ভাব দিচ্ছেন না, এর আগে আগে যে যেমনটি কর্ম করেছে সেই অনুসারেই এই ভাবগুলো তার মধ্যে আসে। কিন্তু তিনি আছেন বলেই আমার কর্ম অন্যের ঘাড়ে যাচ্ছে না, অন্যের কর্ম আমার ঘাড়ে আসছে না। ব্যাঙ্কে এই ধরণের ভুল হতে পারে, আমার এ্যাকাউন্টে টাকা জমা দিলাম কিন্তু অন্যের এ্যাকাউন্টে চলে গেল, পাসবুকে এন্ট্রি করতে গিয়ে যখন গরমিলটা নজরে এলো তখন ব্যাঙ্কে অভিযোগ দায়ের করার পর ভুলটা আবার ঠিক করে দেয়। ভগবানের ক্ষেত্রে এই ভুলটা কখনই হয় না, আমি পূণ্য করলাম সেই পূণ্যটা অন্যের এ্যাকাউন্টে চলে যাবে না। কেন যাবে না? ঈশ্বর আছেন বলে, তাই ঈশ্বরকে বলা হয় কর্মাধ্যক্ষ। আমার যে স্বভাব এই স্বভাব আমার কর্মের অনুসারেই হয়েছে, আর এই স্বভাবটা তিনি আছেন বলেই কর্মটা ঠিক ঠিক জায়গায় গিয়ে এই স্বভাবটা তৈরী হয়েছে। ঈশ্বর না থাকলে কি হত? একদিন সকালে উঠে কলার খোসা ছাড়িয়ে কলাটা খেতে গিয়ে দেখছি কলাটা লঙ্কার মত ঝাল লাগছে। সকালে উঠে যদি কলা খেয়ে ঝাল লাগে আর লঙ্কা কামড় দিয়ে মিষ্টি লাগে তাহলে কি হবে? বুঝতে হবে প্রকৃতির ভারসাম্য পুরো নষ্ট হয়ে সর্বনাশ হয়ে যাবে। ঠাকুর বলছেন – ঈশ্বরের বিধান তাই লঙ্কা খেলে ঝাল লাগে। এই যে প্রত্যেকটা জিনিষ তার ধর্মকে ধরে রেখেছে, কেউ কারুর ধর্মকে ছেড়ে চলে যাচ্ছে না, এটা ঈশ্বর আছেন বলেই সম্ভব হচ্ছে। এরপর বলছেন –

**মহর্ষয়ঃ সপ্ত পূর্বে চত্বারো মনবস্তথা। মদ্ভাবা মানসা জাতা যেষাং লোক ইমাঃ প্রজাঃ।।৬।।**

আজকে পৃথিবীতে যত মানুষ আছে এই মানুষ প্রথম কিভাবে সৃষ্টি হয়েছে এই ব্যাপারে পুরানে বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করা হয়েছে। প্রথমে ভগবানের মন থেকে কিছু কিছু সৃষ্টি হয়েছে। মন থেকে প্রথম চারজন সৃষ্টি হয়েছিলেন, এই চারজন হচ্ছেন সনক, সনন্দন, সনাতন ও সনৎকুমার ঋষিরা। আবার সাতজন ঋষিও মন থেকে সৃষ্ট হয়েছিলেন, এনারা হলেন ভৃগু, মরীচি, অত্রি, পুলহ, অঙ্গিরা, ক্রতু ও পুলস্ত। এই সাতজন ঋষি বিভিন্ন মন্বন্তরে পাল্টে যান। এরপর হলেন চারজন মনু, আসলে মনু চৌদ্দজন, কিন্তু এই চারজন হচ্ছেন খুব বিখ্যাত, এই চারজন মনুর নাম হচ্ছে – সাবর্ণি, ধর্মসাবর্ণি, দক্ষসাবর্ণি আর সাবর্ণ। এনারা সবাই হচ্ছেন ভগবানের মানসপুত্র। পরে এনারাই আবার সৃষ্টিটাকে বিস্তার করে গেছেন। যদি বলা হত ভগবান প্রথমে নারী আর পুরুষকে সৃষ্টি করলেন, এই নারী আর পুরুষ থেকে অনেক সন্তানের জন্ম হল। তাহলে বলা যেতে পারে ভাই বোনকে বিয়ে করেছে। কিন্তু এখানে তা হয়নি। এখানে অনেক কিছুই প্রথমে ভগবানের মন থেকেই সৃষ্টি হয়েছে। এনারাও আবার মন থেকে চিন্তা করে করে কিছু কিছু সৃষ্টি করলেন। তারাও আবার মন থেকে কিছু কিছু সৃষ্টি করলেন। মনু দেখলেন এইভাবে মন থেকে সৃষ্টি করতে অনেক সময় লেগে যাচ্ছে। তখন উনি নিজেকে দুই ভাবে বিভক্ত করে দিলেন, তখন হয়ে গেল মনু আর শতরূপা। ছেলে আর মেয়ের যখন সৃষ্টি হয়ে গেল তখন সৃষ্টির প্রক্রিয়ায় অনেক গতি এসে গেল। প্রথম সাতজন ঋষিদের কোন সন্তান হয়নি, কিন্তু পরের দিকে আরও যত ঋষিদের সন্তান হল, মনুদের যত সন্তান হল এদের পরস্পরের মধ্যে সংযুক্তি হয়ে আরও সন্তানের সৃষ্টি হল। এইভাবে চলতে চলতে সৃষ্টির কলেবর বেড়ে গেল। খ্রীষ্ট ধর্মে সৃষ্টির ব্যাপারে আদম ও ঈভের কাহিনী আছে, আমাদের হিন্দুদের পুরানাদিতে এই ধরণের কাহিনী নেই, এখানে প্রথমে মন থেকে সৃষ্টির কাজ চলছিল, কিন্তু মন থেকে সৃষ্টিতে অনেক সময় লাগছে বলে নিজেদের দুটো শরীরে বিভক্ত করে দিয়ে শরীরের মাধ্যমে সৃষ্টি কাজ চলতে শুরু হল। কিন্তু আমাদের আদি পুরুষ যাঁরা, তাঁরা ভগবানের মন থেকে সৃষ্ট হয়েছেন, শারীরিক সৃষ্ট প্রথমে ছিল না, শারীরিক সৃষ্টি অনেক পরের দিকে শুরু হয়েছিল।

ভগবান অর্জুনকে বলছেন, এই যা কিছু সৃষ্টি দেখছ সব আমার থেকেই বেরিয়েছে, প্রথমের দিকে যত ঋষি, মনু আদিরা ছিলেন সব আমার মন থেকেই সৃষ্টি হয়েছে। আমি ভগবান, আমি সত্যসঙ্কল্প, আমি শুধু মনে একবার চিন্তা করব তাতেই সৃষ্টি হয়ে যাবে। সৃষ্টি করতে আমাকে কোন পুরুষ আর নারীর শরীর আনতে হবে না। তিনি হচ্ছেন একেই ভগবান, আবার একেবারে শুদ্ধসত্ত্বগুণের আশ্রিত মন, সেই শুদ্ধসত্ত্ব থেকে যা কিছু সৃষ্টি হয়েছে এনারাও অত্যন্ত শুদ্ধসত্ত্ব। তাই এই মহর্ষিরা যেহেতু ভগবানের মানসপুত্র সেই কারণে ঋষিরাও অত্যন্ত শুদ্ধসত্ত্বশীল সম্পন্ন।

**এতাং বিভূতিং যোগং চ মম যো বেত্তি তত্ত্বতঃ। সোঽবিকম্পেন যোগেন যুজ্যতে নাত্র সংশয়ঃ।।৭।।**

আমার এই যে বিস্তার আর আমার যে যোগ, যোগ মানে যা কিছু ঘটছে। একটা হচ্ছে জড়ের বিস্তার, আরেকটা হচ্ছে ঘটনাগুলো। *মম যো বেত্তি তত্ত্বতঃ*, এটাকে যিনি ঠিক ঠিক তত্ত্বত জানেন তার কি হয়? *সোঽবিকম্পেন যোগেন যুজ্যতে নাত্র সংশয়ঃ*, সে পুরোপুরি যোগে নিশ্চিত ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। যা কিছু দেখছি সবই হচ্ছে ভগবানের বিস্তার, যা কিছু ঘটছে তাঁর মাধ্যমেই ঘটছে, এটাকে বুঝে গেলে মনটা স্বাভাবিক ভাবেই স্থির হয়ে যায়। এর আগে ভগবান বলেছিলেন *স্বভাবস্তু প্রবর্ততে*, যা কিছু প্রকৃতিই করছে। আবার মাণ্ডুক্যকারিকাতে বলছে কোন কিছুর জন্মই হয়নি, অজাতবাদ। কিন্তু আমরা তো দেখছি কত কি ঘটে চলেছে, তাহলে এগুলো কি দেখছি? এগুলো যা কিছু তুমি দেখছি এ সবই তোমার মায়ার কল্পনা। কিন্তু এখানে এসে বলা হল যা কিছু সব ভগবানই করছেন। এখন কোনটা ঠিক, আর এই দুটোকে কিভাবে সামঞ্জস্য করা হবে? এই সমস্ত কথার মূল হচ্ছে বিভিন্ন মানুষের আধ্যাত্মিক চিন্তার স্তর বিভিন্ন রকম। তৃতীয় অধ্যায়ে ভগবান বলছেন – *অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্তাহমিতি মন্যতে*, যে নিজেকে কর্তা মনে করে সে আসলে নিজের অহঙ্কারের সঙ্গে একাত্ম, সে হচ্ছে মহামুর্খ, বিমূঢ়াত্মা। যিনি বলছেন কিছুই হচ্ছে না, সবই তোমার মায়ার কল্পনা, তিনি কি করে এই কথা বলছেন? তার মানে তিনি বলছেন না, অর্থাৎ তাঁর আমিটা চলে গেছে। যিনি বলছেন প্রকৃতিই সব নিজের মত করে যাচ্ছে, সেখানেও তাঁর আমিটাকে কোথাও দেখতে পাচ্ছেন না, প্রকৃতিকেই সর্বক্ষেত্রে দেখছেন, তার মানে তাঁর আমি বোধটা চলে গেছে। আবার যখন দেখছেন ভগবানই সব করছেন, তখনও আমি বোধটা চলে গেছে। আধ্যাত্মিক শাস্ত্রের উদ্দেশ্যই হচ্ছে এটাকে বোঝান যে যাবতীয় যা কিছু আছে সব কিছু থেকে নিজের মমত্বকে সরিয়ে নাও। এই মমত্বকে যদি না সরিয়ে নাও তাহলে তোমার সম্পূর্ণ বিনাশ অবশ্যাম্ভাবি। তোমার মমত্বকে তুমি কিভাবে সরাবে? সেটা তুমি যেভাবে খুশি সরাতে পার। তুমি যদি যথার্থ কট্টর জ্ঞানী হও তাহলে তুমি বলবে অজাতবাদ, সৃষ্টিই হয়নি, সব স্বপ্ন। যদি তুমি নেতি নেতি করে এগোও তাহলে বলবে এগুলো সবই প্রকৃতির খেলা, প্রকৃতিই সব কিছু করে যাচ্ছে। আর যদি ইতি ইতি করে বিজ্ঞানীর অবস্থাতে যাও তখন দেখবে সব তিনিই করছেন, সবই ভগবান করছেন। যারা একেবারেই সাধারণ স্তরে রয়েছে তাদেরকে বলা হয় অজাতবাদ বলার তোমার উপায় নেই, নেতি নেতি তুমি কেন করবে তোমাকে তো ঘর সংসার চালাতে হবে, সেইজন্য বল তিনিই সব করছেন। কিন্তু আসলে কি হচ্ছে, সেটাকে বুঝতে গেলে তোমার মনকে বিজ্ঞানের অবস্থায় যেতে হবে। কিন্তু সাধারণ অবস্থাতে একটা যে কোন পথকে ধরে এগিয়ে চলাই হচ্ছে সঠিক পথ, সাথে সাথে তোমার যে কাঁচা আমি যেটাকে বলা হচ্ছে *অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা*, এই অহঙ্কার থেকে তুমি আগে বেরিয়ে এসো। এই অহঙ্কার থেকে বেরিয়ে আসার পর কি দেখে –

**অহং সর্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্বং প্রবর্ততে। ইত মত্বা ভজন্তে মাং বুধা ভাবসমন্বিতাঃ।।৮।।**

যারা বুদ্ধিমান লোক, তারা আমার তত্ত্বটাকে বুঝে নিয়ে কেবল আমারই ভজনা করে। আমার কি তত্ত্বটা বুঝে নেয়? *অহং সর্বস্য প্রভবো*, আমি হচ্ছি সব কিছুর উৎপত্তির স্থান, আর *মত্তঃ সর্বং প্রবর্ততে*, আমার থেকেই সব কিছু প্রবর্তিত হচ্ছে, জগতে এমন কিছু নেই যেটা আমার থেকে প্রবর্তিত হচ্ছে না। *অহং সর্বস্য* বলতে আচার্য শঙ্কর এখানে বলছেন – যিনি পরব্রহ্ম, যাঁকে বাসুদেব নামে আখ্যায়িত করা হচ্ছে, সেই বাসুদেব থেকেই জগতের যা কিছু আছে সবার উৎপত্তি হচ্ছে। ঈশ্বরই হচ্ছেন সব কিছুর মূল আর তাঁর থেকেই সব কিছুর জন্ম, ঈশ্বরের এই তত্ত্ব যার মধ্যে বসে গেছে, এই ভাব যখন হয়ে যায় তখন তার লোভ, মোহ, শোক এগুলো ক্ষীণ হয়ে যায়। এই তত্ত্বটাকেই ঠাকুর খুব সহজ করে বলছেন – ভগবান দুবার হাসেন, একবার যখন ডাক্তার রোগীকে বলে আমি তোমাকে বাঁচিয়ে দেব তোমার কোন চিন্তা নেই, আরেকবার হাসেন যখন দুই ভাই ঝগড়া করে দড়ি ফেলে বেলে এই দিকটা আমার ঐদিকটা তোর। তার মানে কি? আরে সবটাই তো আমার, জীবন আমিই দিয়েছি মৃত্যুও আমিই দিয়ে থাকি। অর্থাৎ যত মৃত্যু ধর্মা সব আমার থেকেই বেরিয়েছে, আর যত স্থাবর জিনিষ আছে, এই পৃথিবী তার যত জমি জায়গা, গ্রহ নক্ষত্র সব আমারই ব্যবস্থা, এখানে তুমি ও তোমার কোত্থেকে আসছে। এগুলো হচ্ছে কাঁচা আমির লক্ষণ। এখন জীবন নির্বাহ করতে গেলে কিছু কিছু জিনিষের প্রয়োজন হয়ে পড়ে, সেই জিনিষ গুলো তিনিই দেন আবার যখন সেই জিনিষ গুলো চলে যায় তখন তিনিই আবার নিয়ে নিলেন। এখানে বলতে চাইছেন যে, সবটাই ভগবান দিয়েছেন, ভালোটাও তিনি দেন খারাপটাও তিনি দিয়েছেন। এখন যদি কেউ আমার গলার সোনার চেনটা ছিনতাই করতে আসে তাহলে কি আমি চুপচাপ দিয়ে দেব? কখনই না। ধর্মতো বলেনি যে চেনটা আপনি কেড়ে নিতে পারেন। আচ্ছা তাহলে এই সোনার চেনটা কাউকে দান করে দাও। তাও দান করা যাবে না। কারণ দান হচ্ছে *যথা শক্তি বিভাগঃ*, এটা আমার শক্তির বাইরে তাই আমি এই চেন কখনই দান করে দিতে পারিনা। তুমি যদি বন্দুক দেখিয়ে ছিনতাই করত

চাও করে নাও, আমি থানাতে ডাইরি করব, এটা ধর্মের মধ্যে পড়ে। কিন্তু কোথাও ভিড়ের মধ্যে চেনটা গলা থেকে আলগা হয়ে পড়ে গেল, আমি অনেক করে খুঁজলাম, কিন্তু পেলাম না। এরপর আমি তিন মাস ধরে হারিয়ে যাওয়া চেনের জন্য শোকে কাঁদতেই থেকে গেলাম। গীতা এইটাকে আটকাতে বলছে। তিনি দিয়েছিলেন তিনিই আবার নিয়ে নিয়েছেন, এটা আমার সাধ্যের বাইরে, এরপর থেকে আমি সাবধানে থাকব, এইটাই হচ্ছে মোদ্দা কথা। তখন বলছেন –

**মচ্চিত্তা মদ্গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্। কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ।।৯।।**

ঠাকুর কথামৃতে বলছেন – ভক্তের স্বভাব হচ্ছে গাঁজাখোরের স্বভাব, গাঁজাখোর যেমন গাঁজাখোরকে দেখলে আনন্দ পায়, একবার তুমি এক টান দাও, ঐ কলকেতে আমিও আরেক টান দেব। তেমনি ঈশ্বরের যে ভক্ত সেও আরেক ভক্ত দেখলে আনন্দ পায়। যে ঈশ্বরের ভক্ত সে সব সময় আমার কথাই দিনরাত বলবে, ভগবানের কথা শোনার মত সেই রকম ভক্ত কেউ পেলে তাই তার খুব আনন্দ হয়, আমার কথাতেই সে রমণ করে। *মচ্চিত্তা মদ্গতপ্রাণা,* কারণ ভক্তের চিত্ত, মন, তার প্রাণ, কর্মের শক্তি সব আমাকে নিয়েই, আমার বাইরে তার আর কিছু নেই। *বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্,* যারা ভক্ত তাদের পরস্পর যখন দেখা হয় তখন তারা আমাকে নিয়েই আলোচনা করে। ভক্তরা ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ ছাড়া আর অন্য কোন ধরণের বিষয়ের আলোচনা করবে না। ঈশ্বরের ভক্তের প্রথম ধাপ হচ্ছে *অহং সর্বস্য প্রভবো,* আমার থেকেই সব কিছু এসেছে, দ্বিতীয় ধাপ হল, ভক্ত যখন ভক্তের সঙ্গে কথা বলবে তখন ঈশ্বরীয় কথাই বলবে, তার বাইরে আর কোন কথা হবে না, আমার তত্ত্ব কথা বলতে বলতে সে নিজে পরম সন্তোষ ও বিপুল আনন্দ সাগরে ভাসতে থাকে।

**তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্বকম্। দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে।।১০**

এই শ্লোকটিও খুব তাৎপর্যপূর্ণ। *তেষাং সততযুক্তানাং,* যে আমার সাথে সর্বদা যুক্ত হয়ে আছে আর প্রীতিপূর্বক আমার ভজনা করছে, *দদামি বুদ্ধিযোগং তং,* তাকে আমি বুদ্ধিযোগ প্রদান করি। বুদ্ধিযোগটা কি? আচার্য শঙ্কর বলছেন, সম্যগ্ দর্শন, ঈশ্বরীয় তত্ত্বের ঠিক ঠিক জ্ঞানকে ধারণা করাকে বলা হয় বুদ্ধি আর সেই জ্ঞানের সাথে যুক্ত হয়ে যাওয়াকে বুদ্ধিযোগ বলছেন। নিজের চেষ্টায় কেউ কখন ঈশ্বরের তত্ত্ব জ্ঞান লাভ করতে পারেনা। ঈশ্বর যখন কৃপা করেন তখন তিনি তাঁর ভক্তকে একটা বিশেষ ধরণের বুদ্ধি দেন, এই বুদ্ধিকে নিজে থেকে অর্জন করা মানুষের ক্ষমতার বাইরে। কিন্তু যাঁরা জ্ঞানী তাঁর এই কথা মানবেন না, যেমন বুদ্ধ, তিনি এই কথা কখনই মানতে যাবেন না। কিন্তু একটা জায়গায় গিয়ে মানুষের নিজের প্রচেষ্টা আটকে যায়, তা নাহলে আধ্যাত্মিক তত্ত্বটাই মিথ্যা হয়ে যাবে। নিজের প্রচেষ্টাতে যদি আধ্যাত্মিক তত্ত্ব লাভ করা যায় তাহলে সেটা কর্ম দিয়ে পাওয়া হয়ে গেল। কিন্তু যখনই কর্ম দিয়ে যা কিছু পাওয়া হয় সেটা কর্মজাত হয়ে গেল, আধ্যাত্মিক তত্ত্ব যদি কর্মজাত হয় তাহলে আধ্যাত্মিকতার পুরো দর্শনটাই মিথ্যা হয়ে যাবে, দর্শনের কোন কিছুই আর যুক্তির নিরিখে দাঁড়াতে পারবে না। শেষ দিকে কি হয়, নিষ্কাম ভাবে কর্ম করে করে যখন চিত্তশুদ্ধি হয়ে গেল তখন নিজে থেকে একটা জিনিষ ঘটে যায়। যেমন আমি একটা ক্ষেতে চাষ করলাম, বীজ সার সব কিছুই দেওয়া হল, কিন্তু এর পর যখন ফলটা হবে সেটা নিজে থেকেই হবে। এই ফল যেটা হবে সেটা কিভাবে হবে, কেন হবে, এগুলো বলা যায় না। যে যোগই করা হোক না কেন, রাজযোগ, জ্ঞানযোগ, সাংখ্যযোগ, অক্ষরব্রহ্মযোগ, ধ্যানযোগ, সন্ন্যাসযোগ যে যোগই করা হোক না কেন চরম লক্ষ্য হচ্ছে ঈশ্বরের তত্ত্ব বা ব্রহ্মতত্ত্ব বা আত্মতত্ত্ব যে রকমটি আছে ঠিক সেই রকমটি বুঝতে হবে। এই চরম তত্ত্বটাকে বুঝতে পারার ক্ষমতা যেটা এটাই হচ্ছে বুদ্ধি, যেটা দিয়ে ধারণা করা হচ্ছে। আর এই বুদ্ধির সঙ্গে যে যুক্ত হওয়া এটাকে বলা হচ্ছে বুদ্ধিযোগ। বলছেন শুধু বুদ্ধি থাকলেই হবে না, যেমন কোন নোবেলজয়ী বড় বিজ্ঞানী, তাঁর কি তুখোড় বুদ্ধি, তিনি চেষ্টা করে বুদ্ধিটা লাগালে ঈশ্বরীয় তত্ত্বটা ধরে নিতে পারবেন, কিন্তু সেই বুদ্ধির সাথে তাঁর যোগ নেই, অর্থাৎ যে বুদ্ধি দিয়ে ঈশ্বরের সঙ্গে যোগ হওয়া যায় সেই যোগ তাঁর নেই। আবার অনেক ভক্ত আছেন যাঁর ঈশ্বরীয় তত্ত্বের সাথে যোগ হওয়ার প্রবল ইচ্ছে আছে, ঈশ্বরের সাথে যুক্ত হওয়ার ইচ্ছে আছে কিন্তু সেই বুদ্ধিটা নেই। কারুর বুদ্ধি আছে তো যোগ নেই, আবার কারুর যুক্ত হওয়ার ইচ্ছে আছে কিন্তু বুদ্ধি নেই। কিন্তু বুদ্ধিযোগ, যার মধ্যে বুদ্ধি ও যুক্ত হওয়ার ইচ্ছে এই দুটোই থাকবে এটা হচ্ছে ঈশ্বর প্রদত্ত। বুদ্ধি হচ্ছে জিনিষটাকে স্পষ্ট ভাবে বোঝার ক্ষমতা, আর তার সঙ্গে যুক্ত করে দেওয়ার ইচ্ছেটা যার হয় সেটা হচ্ছে যোগ। এই দুটো জিনিষ যুগপৎ খুবই দুর্লভ, ঈশ্বর কৃপা না হলে হয় না। যেমন লাটু মহারাজ, তিনি এক বাড়িতে ভৃত্যের কাজ করতেন, ঈশ্বরীয় তত্ত্বের কোন ধারণাই তাঁর বোধ ছিল না। কিন্তু সাধনা করতে করতে তিনি এমন একটা অবস্থায় চলে গেলেন, যেখানে তাঁর শুদ্ধ জিনিষটাকে ধারণা করার ক্ষমতা এসে গেল, শুধু ক্ষমতাই এসে গিয়েই শেষ হয়ে গেল না, তিনি সেই ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে দিলেন, তখন এটাই হয়ে গেল বুদ্ধিযোগ। যখন বুদ্ধিযোগ এসে গেল তখন –

**তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ। নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা।।১১।।**

মানুষ মোহবশতঃ এমন অজ্ঞান অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে আছে যে তারা কখনই ঈশ্বরের তত্ত্বজ্ঞান লাভ করতে পারেনা। কিন্তু তিনি কি করেন? *আত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা,* এই জ্ঞানদীপ যখন প্রজ্জ্বলিত হয় তখন তার একটা উজ্জ্বল কিরণ সেই মোহরূপী

অন্ধকার হৃদয়ের মধ্যে গিয়ে পড়ে আর সেই আলোতে সব অজ্ঞান নাশ হয়ে যায়। এই দীপের বৈশিষ্ট্য কি? আচার্য শঙ্কর যেমন জ্ঞানী তেমনি আবার বড় কবিও ছিলেন, একাধারে দার্শনিক ও কবি হওয়া খুব কঠিন। কারণ দার্শনিকরা একটু কাঠখোট্টা হন, কবিরা আবার খুব সংবেদনশীল হন, আচার্য শঙ্করের মধ্যে দুটো গুণই ছিল। তিনি এই দীপের বর্ণনা করে বলছেন – দীপে যে ঘৃত দেওয়া হয় সেটা হচ্ছে ভক্তি, আমার যে স্বরূপের ভাবনা বা ঈশ্বরের যে চিন্তন সেটা হচ্ছে অভিনিবেশ রূপ বায়ু, যে বাতাসটা প্রদীপকে জ্বালাচ্ছে সেটা হচ্ছে আমার স্বরূপের ভাবনা চিন্তা, ঈশ্বরের চিন্তন যদি না থাকে যতই ভক্তি বা জ্ঞান থাকুক না কেন, সেই ভক্তি বা জ্ঞান দিয়ে কিছুই হবে না। ব্রহ্মচর্যাদি রূপ যে সাধন, যার দ্বারা ভেতরে যে ভক্তির সংস্কার তৈরী হয়েছে সেটা হচ্ছে প্রদীপের সলতে, যাতে অগ্নিকে স্থাপন করা হয়। আসক্তি রহিত অন্তঃকরণ সেটা হচ্ছে প্রদীপের আধার বা পাত্রটা। বাইরের কম্পিত বাতাস যাতে প্রদীপের আলোকে নিবারণ না করতে পারে তাই প্রদীপটা কাঁচ দিয়ে ঢাকা আছে, রাগ ও দ্বেষকে দুরে সরিয়ে অন্তঃকরণকে ঢাকা দেওয়া আছে, এই রাগ ও দ্বেষ এসে মনকে ছিটকে দিচ্ছে না। সব সময় যে ঈশ্বরের কথা চিন্তন কছে, ধ্যান করছে, এটা হচ্ছে প্রদীপের আলো, এই ধরণের আলো দিয়ে সমস্ত অন্ধকারটাকে সরিয়ে রাখা হয়েছে। এগুলো হচ্ছে কাব্যাত্মিক বর্ণনা, বলতে চাইছেন – ঈশ্বরের চিন্তন, ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি, নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখা, রাগ ও দ্বেষকে বশে রাখা, আধ্যাত্মিক সাধনায় সচরাচর যা যা বলা হয় সেগুলোকেই কাব্যিক ভাবে বলছেন। এগুলো হলে কি হয়? তার সমস্ত অজ্ঞান, মোহ, শোক, তাপ সব নাশ হয়ে যায়। যখন এগুলো নাশ হয়ে যায় তখন জানতে পারে আমার কি স্বরূপ। এরপর অর্জুন বলছেন –

অর্জুন উবাচ

**পরং ব্রহ্ম পরং ধাম পবিত্রং পরমং ভবান্। পুরুষং শাশ্বতং দিব্যমাদিদেবমজং বিভুম্।।১২।।**

এই প্রথম অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে ঈশ্বর বলে সম্বোধন করতে শুরু করেছেন, আপনি হচ্ছেন *পরং ব্রহ্ম পরং ধাম*, আপনিই হচ্ছে একমাত্র আশ্রয়। *পবিত্রং পরমং ভবান্*, এই জগতে পবিত্রকারী যা কিছু আছে সবই আপনার কাছ থেকেই পবিত্র হচ্ছে, অর্থাৎ আপনি পরম পাবন, আপনিই সর্বশ্রেষ্ঠ। *পুরুষং শাশ্বতং দিব্যম্*, এগুলো সবই ভগবানের গুণের বর্ণনা – বেদে যে পুরুষের কথা বলা হয়েছে আপনি সেই পুরুষ, আপনি সর্বব্যাপী, সনাতন, জন্মরহিত, দিব্যপুরুষ ও আদিদেব।

**আহুস্ত্বামৃষয়ঃ সর্বে দেবর্ষিনারদস্তথা। অসিতো দেবলো ব্যাসঃ স্বয়ং চৈব ব্রবীষি মে।।১৩।।**

অসিত, দেবল, নারদ, বশিষ্টদেব, ব্যাসদেব এনারা হচ্ছে তাঁদের নিজেদের সময়কার বিখ্যাত সব ঋষি। অর্জুন প্রার্থনা করছেন, দেবর্ষি নারদ, ব্যাসদেব, অসিত, দেবল, বশিষ্টদেব এনারাও সবাই আপনার সম্বন্ধে এই একই কথা বলছেন আর এখন আপনি স্বয়ং নিজেও আমাকে এই একই কথা বলছেন।

**সর্বমেতদৃতং মন্যে যন্মাং বদসি কেশব। ন হি তে ভগবন্ ব্যক্তিং বিদুর্দেবা ন দানবাঃ।।১৪।।**

আপনি যা বলছেন এগুলো আমরা ঋষিদের কাছ থেকেও শুনে এসেছি যে, *ন হি তে ভগবন্ ব্যক্তিং বিদুর্দেবা ন দানবাঃ*, দেবতা, মানুষ, দানব, অসুর এরা কেউই আপনার এই স্বরূপ জানতে পারেনা। আপনি যা বলছেন সবই সত্য বলে আমি মনে করি।

**স্বয়মেবাত্মনাত্মানং বেত্থ ত্বং পুরুষোত্তম। ভূতভাবন ভূতেশ দেবদেব জগৎপতে।।১৫।।**

একমাত্র আপনিই আপনাকে জানতে পারেন। আপনি হচ্ছেন *ভূতভাবন*, সমস্ত জীবের উৎপত্তিস্থল, *ভূতেশ*, আপনি যেমন সমস্ত জীবের নিয়ন্তা আবার দেবতাদের প্রকাশক এবং *জগৎপতে*, আপনিই বিশ্বপালক। আপনাকে তাই কেউই জানতে পারবে না, কারণ, ঠাকুর বলছেন একসের ঘটিতে পাঁচ সের দুধ ধরে। ভগবান হচ্ছেন সব কিছুর আধার, আধেয় আধারকে জানবে কি করে। মহর্ষি, ঋষি, দেবতা এরা সবাই ভগবানের অনেক নীচে, এদেরই উৎপত্তি হচ্ছে ভগবান থেকে, তাই এনারাও তাঁকে জানতে পারেন না। এই হাত দিয়ে যদি আমাকে বলা হয় পুরো বিল্ডিংটাকে ধরে নিতে, কোন দিনই তা সম্ভব হবে না। এই বিল্ডিংটা কত বড় যদি কেউ জিজ্ঞেস করে তখন এই হাত দিয়েও মেপে দেখাতে পারব না। আপনাকে একমাত্র আপনিই জানতে পারেন।

**বক্তুমর্হস্যশেষেণ দিব্যা হ্যাত্মবিভূতয়ঃ। যাভির্বিভূতিভির্লোকানিমাংস্ত্বং ব্যাপ্য তিষ্ঠসি।।১৬।।**

আপনার যা যা বিভূতি আছে, যে বিভূতির দ্বারা আপনি সর্বলোক পরিব্যাপ্ত হয়ে আছেন, সেই বিভূতিকে বিস্তৃত করে ব্যাখ্যা আপনিই একমাত্র করতে পারেন।

**কথং বিদ্যামহং যোগিংস্ত্বাং সদা পরিচিন্তয়ন্। কেষু কেষু চ ভাবেষু চিন্ত্যোঽসি ভগবন্ ময়া।।১৭।।**
**বিস্তরেণাত্মনো যোগং বিভূতিং চ জনার্দন। ভূয়ঃ কথয় তৃপ্তির্হি শৃণ্বতো নাস্তি মেঽমৃতম।।১৮।।**

এই দুটো শ্লোকে অর্জুন ভগবানের কাছে প্রার্থনা করছেন যে আপনার যে নানান বিভূতি আছে সেগুলো আপনি ছাড়া আর কেউ বর্ণনা করতে পারবে না, আপনি আমাকে তাই বলুন আপনাকে কিভাবে চিন্তা করলে আমি আপনার স্বরূপ জানতে পারব, আপনাকে কোন্ কোন্ বস্তুতে ধ্যান করব? এগুলো পুনরায় বিস্তৃতভাবে বলুন। অল্প একটু শুনে আমি পরিতৃপ্ত হতে পারছি না, আরও শুনতে ইচ্ছে করছে।

এবার ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে তাঁর বিভিন্ন বিভূতির কথা এক এক করে বলা শুরু করছেন –

শ্রীভগবানুবাচ
**হন্ত তে কথয়িষ্যামি দিব্যা হ্যাত্মবিভূতয়ঃ। প্রাধান্যতঃ কুরুশ্রেষ্ঠ নাস্ত্যন্তো বিস্তরস্য মে।।১৯।।**

আমার সমস্ত বিভূতির কথাতো তোমাকে বলা যাবে না, কেননা সারা জীবন ধরে বলে গেলেও আমার বিভূতির কথা শেষ হবে না। সমুদ্র যদি দোয়াত হয়, হিমালয় যদি কালি হয়, কল্পতরুর বৃক্ষের ডালের যদি কলম হয় আর পৃথিবী যদি মসিপত্র হয় আর সরস্বতি যদি সেই মসিপত্রে ভগবানের বিভূতির কথা লিখতেই থাকেন তবুও ভগবানের বিভূতির কথা লিখে শেষ করা যাবে না। তাই আমি তোমাকে আমার প্রধান প্রধান মূল বিভূতির কথা গুলোই বলব। আচার্য শঙ্কর নিজের তরফ থেকে বলছেন – একশ বছর ধরে যদি ভগবানের বিভূতির কথা বলতে থাকি তাও শেষ করা যাবে না। যিনি অনন্ত তাঁর বিভূতিও অনন্ত। আমার প্রথম প্রধান বিভূতির কথা তোমাকে বলছি –

**অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্বভূতাশয়স্থিতঃ। অহমাদিশ্চ মধ্যঞ্চ ভূতানামন্ত এব চ।।২০।।**

যাঁরা উচ্চশ্রেণীর সাধক তাঁদের জন্য ভগবান অর্জুনের মাধ্যমে বলছেন। হে জিতেন্দ্রিয় অর্জুন, *অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্বভূতাশয়স্থিতঃ*, সর্বভূতের হৃদয়ে অবস্থিত যে আত্মা আমি হলাম সেই আত্মা। চেতন আর জড়ের মধ্যে যা দিয়ে পার্থক্য করা হয় তার মূল পার্থক্য দেখান হয় যে, চেতন পদার্থে আত্মা আছেন কিন্তু জড়ের মধ্যে আত্মা নেই। সজীব পদার্থের মধ্যে যে আত্মার কথা বলা হচ্ছে, যে আত্মার জন্য সজীব বা চেতন পদার্থকে চেতন বলা যাচ্ছে, আমি সেই আত্মা রূপে সমস্ত প্রাণীর মধ্যে বাস করি। তাহলে কি জড়ের মধ্যে ভগবান নেই? এই মাইক্রোফোনের মধ্যে কি ভগবান নেই? তা নয়, এই মাইক্রোফোনের মধ্যেও ভগবানই আছেন, এটিও ভগবানের একটি রূপ। এখানে আমাদের আলোচনা চলছে ভগবানের বিভূতি বা বৈশিষ্ট্যের কথা, একটা জিনিষের যে বৈশিষ্ট্যতা সেটা ভগবানই। তাহলে লোহাতে ভগবান কোনটা? এই লোহার যে কাঠিণ্যতা এটাই এই লোহার ভগবান। আমার আপনার ক্ষেত্রে বৈশিষ্ট্য হচ্ছে আমরা সজীব বস্তু। আমাদের যে এই সজীবত্বটা হচ্ছে জীবাত্মার জন্য, এই জীবাত্মা হচ্ছেন ভগবান নিজে। যেমন জলের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে আর্দ্রতা। প্রত্যেকটি জিনিষের একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য থাকতে হবে। সেই বৈশিষ্ট্যটা যদি চলে যায় তাহলে যে বৈশিষ্ট্য পড়ে থাকবে সেটাও সেই ভগবানই। জলের বৈশিষ্ট্য আর্দ্রতা যদি জল থেকে চলে যায় তখন জল আবার একটা অন্য বৈশিষ্ট্য নিয়ে নেবে তখন সেই রূপেই ভগবান জলের মধ্যে থাকবেন। লবণের যে লবণত্ব সেটা ভগবান, লবণত্ব আছে বলেই এটা লবণ। লবণের লবণত্ব যদি চলে যায় তাহলে ভগবানও চলে যাবেন তা নয়, কারণ লবণের মধ্যে যে ইলেক্ট্রন প্রোটন যা কিছু রয়েছে সবটা তিনিই। লবণত্বটা চলে গেলে তখন সেটা পাথর হয়ে যাবে, তখন পাথরের যে বৈশিষ্ট্যতা, তার কাঠিণ্যত্বটাই হয়ে যাবে ভগবান। লতা মঙ্গেশকরের মত একজন গায়িকা, তাঁর কণ্ঠের যে মাধুর্যতা, গানের ব্যাপারে যে নিপুণতা, সঙ্গীতের যে কুশলতা সেটা কে? ভগবান। লতা মঙ্গেশকরের কন্ঠ থেকে যদি গান চলে যায় তাহলে ভগবান কিভাবে থাকবেন? জীবন রূপে, লতা মঙ্গেশকর তিনি মানুষতো, তাঁর যে দয়া ভাব, স্নেহ মমতার ভাব এটাও ভগবান। সিনেমার নায়ক নায়িকাদের চেহারায় যে সৌন্দর্যতা, অভিনয় কুশলতা সেটাও তিনিই। তাদের সৌন্দর্যতা যখন চলে যাবে তখন বাকি যেটুকু থাকবে সেটাও তিনি। সেইজন্য ভগবান এখানে জীবের রূপ দিয়ে শুরু করে বললেন – *অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্বভূতাশয়বস্থিতঃ*, আমি সমস্ত জীবের আত্মা সমস্ত প্রাণীর হৃদয়ে বাস করি। তার মানে এই নয় যে তিনি এই মাইক্রোফোনে, জলের মধ্যে নেই, এখানে তিনি কাঠিণ্য ও আর্দ্রতা রূপে আছেন।

*অহমাদিশ্চ মধ্যঞ্চ ভূতানামন্ত এব চ*, আমি হলাম সমস্ত কিছুর আদি, আমি হলাম সব কিছুর মধ্য ও অন্ত। যিনি এইটা ভাবতে পারছেন যে, ঈশ্বর সবারই ভিতরে আছেন, একটা মানুষের জন্ম হল ঈশ্বরের জন্য, এই মানব শরীরে তার অবস্থিতি ঈশ্বরের জন্য, তার মৃত্যুও ঈশ্বরের জন্য, তখন অন্য কিছু তাঁকে চিন্তা করতে হয় না। আমরা মুখে বলতে পারি সব কিছু ঈশ্বরের জন্যই, কিন্তু আমরা ধরে রাখতে পারিনা। আমি যদি ঠিক ঠিক জানি যে আমার সামনে যে লোকটি আছে তার হৃদয় হচ্ছে ঈশ্বরের নিবাস, তখন তার প্রতি আমার কোন দ্বেষ আসবে না, তাকে নিয়ে আমি কোন লোভ করতে পারব না, কোন মোহও করতে পারব না, তার জন্য কোন শোক করাও সম্ভব হবে না। সেইজন্য এই ভাবগুলো হচ্ছে যারা খুব উচ্চশ্রেণীর সাধক তাদের জন্য। কিন্তু যারা উচ্চশ্রেণীর

সাধক নয়, অতি সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন যারা, তারা এই উচ্চভাবকে ধারণা করতে পারবে না, ধারণা করলেও ধরে রাখতে পারবে না, তাই তাদের জন্য এরপর অর্থাৎ একুশ নং শ্লোক থেকে বর্ণনা করা হচ্ছে।

**আদিত্যানামহং বিষ্ণুর্জ্যোতিষাং রবিরংশুমান্। মরীচির্মরুতামস্মি নক্ষত্রাণামহং শশী।।২১।।**

বারোজন আদিত্যের মধ্যে আমি বিষ্ণু। বারোজন আদিত্য হচ্ছেন ধাতা, মিত্র, অর্যমা, রুদ্র, বরুণ, সূর্য, ভগ, বিবস্বান্ পূষা, সবিতা, ত্বষ্টা ও বিষ্ণু। এখানে এই বিষ্ণু ভগবান বিষ্ণু নন। বেদের সময় এই বারোজন দেবতাদের মধ্যে বিষ্ণু একজন সামান্য দেবতা মাত্র ছিলেন। এই বিষ্ণুকেই পরে মহাভারতে এবং পুরানে বেদে যাকে সেই পুরুষ বলা হয়েছিল তার সাথে মিলিয়ে দেওয়া হল, তখন এই বিষ্ণু দেবতা হয়ে গেলেন ভগবান বিষ্ণু। এখানে যে বিষ্ণুর কথা বলা হয়েছে এই বিষ্ণু হলেন দেবতা, বিষ্ণু দেবতা আর ভগবান বিষ্ণু আলাদা। *জ্যোতিষাং রবিরংশুমান্*, আলোর প্রকাশকারী যা কিছু আছে তাদের মধ্যে আমি হলাম কিরণশালী সূর্য। *মরীচির্মরুতামস্মি*, বায়ু সম্বন্ধীয় ঊনপঞ্চাশ যত দেবতা আছে তাদের মধ্যে আমি মরীচি এবং *নক্ষত্রাণামহং শশী*, যত নক্ষত্র আছে তাদের মধ্যে আমি হলাম চন্দ্রমা। সূর্য আর চন্দ্র যে আলাদা, চন্দ্র যে পৃথিবীর চারিদিকে প্রদক্ষিণ করছে, এই ব্যাপারটা আমাদের ঋষিরা জানতেন। সেইজন্য এখানে সূর্য আর চন্দ্রকে এক সঙ্গে রাখা হয়নি।

**বেদানাং সামবেদোঽস্মি দেবানামস্মি বাসবঃ। ইন্দ্রিয়াণাং মনশ্চাস্মি ভূতানামস্মি চেতনা।।২২।।**

বেদের মধ্যে আমি সামবেদ। কেন সামবেদ বলছেন? কারণ চারটে বেদের থেকে মূল মন্ত্রগুলোকে নিয়ে সামবেদে সংগ্রহিত করা হয়েছে, সামবেদ তাই শ্রেষ্ঠতম সঙ্কলন, এই কারণেই বলছেন *বেদানাং সামবেদোঽস্মি*। সামবেদের মূলে হচ্ছে ত্রিসন্ধ্যা, ত্রিসন্ধ্যা থেকে গায়ত্রী, গায়ত্রী লয় হচ্ছে ওঁকারে। সমস্ত বেদে যা কিছু বলা হয়েছে সেটা একটা শব্দে বলা হচ্ছে ওঁ। এখানে বলছেন বেদের মধ্যে হচ্ছে সামবেদ, অন্য দিকে সামগানকে শ্রেষ্ঠ মনে করা হত। *দেবানামস্মি বাসবঃ*, সমস্ত দেবতাদের মধ্যে আমি দেবরাজ ইন্দ্র। *ইন্দ্রিয়াণাং মনশ্চাস্মি*, একাদশ ইন্দ্রিয়ের মধ্যে আমি মন, *ভূতানামস্মি চেতনা*, সজীব বলতে যা কিছু আছে তাদের মধ্যে যে বুদ্ধিবৃত্তি বা চৈতন্যবোধ সেটা আমি। যা কিছু করা হচ্ছে সেটাতে আমিটা লাগিয়ে যে বলা হচ্ছে আমি করছি এই যে বোধ, এইটাই হচ্ছে চেতনা। এটা কিন্তু আসল চৈতন্য নয়, এর আগে যাকে জীবাত্মা বলা হয়েছে সেই জীবাত্মাও নয়। এই বোধটা হচ্ছে বুদ্ধিবৃত্তি, আমি করছি, আমি খাচ্ছি, এই যে আমি বোধের যে চেতনা তার কথা বলা হচ্ছে।

**রুদ্রাণাং শঙ্করাশ্চস্মি বিত্তেশো যক্ষরক্ষসাম্। বসূনাং পাবকশ্চাস্মি মেরুঃ শিখরিণামহম্।।২৩।।**

বেদে একাদশ রুদ্রের কথা আছে, এই একাদশ রুদ্র হলেন অজ, একপাদ, অহির্বধ্ন, পিনাকী, অপরাজিত, ত্র্যম্বক, মহেশ্বর, বৃষাকপি, শম্ভু, হরণ ও ঈশ্বর। একাদশ রুদ্রের মধ্যে আমি হলাম শঙ্কর। বেদের সময় বিষ্ণু যেমন একজন যজ্ঞ দেবতা ছিলেন, শঙ্করও হচ্ছে একজন রুদ্র। পরে এই শঙ্করকেই ভগবান শিবের সঙ্গে এক করে দেওয়া হয়েছে। এই রূপান্তর গুলো মহাভারতের অবদান। এইজন্য কিছু কিছু পাশ্চাত্য পণ্ডিতরা মহাভারতকে বেদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ বলে মনে করে। কিন্তু এই একটা দুটো জিনিষকে দিয়ে তো আর সামগ্রিক ভাবে একটা মূল সিদ্ধান্তে আসা যায় না, আসলে পাশ্চাত্য পণ্ডিতরা উপর উপর কিছু পড়াশোনা করে সব সিদ্ধান্ত নেন, ভেতরে যদি ঢুকতেন তাহলে এভাবে বলতে পারতেন না। তবে এটা ঠিকই যে বেদে যাঁকে বিষ্ণু বলা হচ্ছে আর যাঁকে শঙ্কর বলা হচ্ছে, মহাভারতে এসে এই দুজনই পালটে গেছেন। মহাভারতে বিষ্ণু হয়ে গেলেন চাষবাশের দেবতা আর শঙ্কর হয়ে গেলেন পাহাড় জঙ্গলের আদিবাসীদের দেবতা। তারপর ধীরে ধীরে এই বিষ্ণু আর শিবের শ্রেষ্ঠত্বকে উপরের দিকে নিয়ে আসা হয়েছে। এর আগে বেদের সময়ে ইন্দ্রের যে শ্রেষ্ঠত্ব ছিল সেটা নষ্ট হয়ে গেল। বেদের দেবতাদের মধ্যে একমাত্র অগ্নি দেবতাই পরের দিকে থেকে গেলেন, তাও বেদের সময়কার গুরুত্বটা ছিল না।

*বিত্তেশো যক্ষরক্ষসাম্*, যক্ষ ও রাক্ষসদের মধ্যে আমি হচ্ছি কুবের। *বসূনাং পাবকশ্চাস্মি*, অষ্টবসুদের মধ্যে আমি হলাম অগ্নি। অষ্টবসুরা হলেন – আপ, ধ্রুব, সোম, ধর, অনিল, অনল, প্রত্যুষ ও প্রভাস। *মেরুঃ শিখরিণামহম্*, যত উচ্চ শৃঙ্গযুক্ত পর্বত আছে তাদের মধ্যে আমি হলাম সুমেরু পর্বত। বিভিন্ন শাস্ত্রে বলা হয় যে সুমেরু পর্বতের চূড়া নাকি সোনার আর সূর্য সুমেরু পর্বতের চারিদিকে পরিক্রমা করে চলেছে। তবে এখন আমাদের জানা নেই সুমেরু পর্বতটা ঠিক কোথায় অবস্থিত।

**পুরোধসাং চ মুখ্যং মাং বিদ্ধি পার্থ বৃহস্পতিম্। সেনানীনামহং স্কন্দঃ সরসামস্মি সাগরঃ।।২৪।।**

যত রাজ পুরোহিত আছে তাদের মধ্যে আমি দেবতাদের পুরোহিত বৃহস্পতি, যত সেনাপতি আছে তাদের মধ্যে আমি কার্তিকেয়, কার্তিক একমাত্র সেনাপতি যিনি কখন কারুর কাছে পরাজিত হননি। *সরসামস্মি সাগরঃ*, যত জলাশয় আছে তাদের মধ্যে আমি হলাম সমুদ্র।

**মহর্ষীণাং ভৃগুরহং গিরামস্ম্যেকমক্ষরম্। যজ্ঞানাং জপযজ্ঞোঽস্মি স্থাবরাণাং হিমালয়ঃ।।২৫।।**

যতজন মহর্ষি আছেন তাঁদের মধ্যে আমি মহর্ষি ভৃগু। *গিরাম্ অস্মি একম্ অক্ষরম্,* কথা বলার সময় যে শব্দ হয় তাকে বলা হয় গিরাম্। কথা দুই রকমের, এক হচ্ছে অনর্থক কথা আর দুই হচ্ছে অর্থবোধক কথা। বেশির ভাগ সময় আমরা অনর্থক শব্দই উচ্চারণ করি। অর্থপূর্ণ শব্দ যখন উচ্চারণ করা হয় তখন তাকে গিরাম্ বলা হয়। যত অর্থপূর্ণ শব্দ আছে তার মধ্যে আমি হলাম একাক্ষর ব্রহ্মবাচক ওঁকার। তার মানে, মুখ দিয়ে যত রকমের অর্থপূর্ণ শব্দ উচ্চারণ করা হয় তার মধ্যে শ্রেষ্ঠতম শব্দ হচ্ছে ওঁ। *যজ্ঞানাং জপযজ্ঞোঽস্মি,* মহাভারতের সময়েই জপযজ্ঞ এসে গিয়েছে। যত রকমের যজ্ঞ করা হয় তার মধ্যে আমি হলাম জপযজ্ঞ। তাহলে বাকি যজ্ঞগুলো কে? সেগুলোও তিনি, কিন্তু এখানে তাঁর বিভূতিটা বেশি। যেমন হরিপ্রসাদ চৌরাশিয়ার বাঁশির রেকর্ডের উপর লেখা থাকে বেস্ট অফ্ হরিপ্রসাদ চৌরাশিয়া, এখন হরিপ্রসাদের বাকি রেকর্ডগুলো কি তাঁর নয়? সবটাই হরিপ্রসাদ চৌরাশিয়া বাজিয়েছেন কিন্তু তার মধ্যে বেস্ট কালেকশন্স গুলো নিয়ে একটা রেকর্ড বাজারে ছেড়ে দেওয়া হল। জগতে যা কিছু আছে সবটাই ভগবানের, কিন্তু যেটা বেস্ট সেগুলোর কথা এখানে বলা হচ্ছে, বিভূতিযোগ হল বেস্ট অফ্ গড্। স্বামী বিবেকানন্দও তাঁর বিভূতি আর আমিও তাঁরই বিভূতি, কিন্তু আমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্বামী বিবেকানন্দকে বলবে স্বামীজী আমার বিভূতি, কিন্তু তাই বলে আমরা কি ভগবানের বিভূতি নই? আমরাও তাঁর বিভূতি কিন্তু আমাদের মধ্যে তাঁর বিভূতি কম প্রকাশিত হচ্ছে, কিন্তু এখানে ভগবান সেই জিনিষেরই বর্ণনা করছে যেখানে তাঁর বিভূতি সব থেকে বেশি প্রকাশ হচ্ছে। এখানে বড়টার কথা বলে দিলেন, বড়টাকে যখন বলে দিলেন তখন ছোটটাও এর মধ্যে চলে এল। সেই রকম বলছেন *স্থাবরাণাং হিমালয়ঃ,* যেগুলো স্থাবর জিনিষ, এক জায়গাতে স্থির হয়ে পড়ে আছে, নড়াচড়া করে না, এই স্থাবর জিনিষের মধ্যে আমি হলাম হিমালয়।

**অশ্বত্থঃ সর্ববৃক্ষাণাং দেবর্ষীণাঞ্চ নারদঃ। গন্ধর্বাণাং চিত্ররথঃ সিদ্ধানাং কপিলো মুনিঃ।।২৬।।**

সমস্ত বৃক্ষের মধ্যে আমি অশ্বত্থঃ বৃক্ষ, তাই বৃক্ষদের মধ্যে অশ্বত্থ অতি পবিত্র বৃক্ষ। দেবর্ষিগণের মধ্যে আমি নারদ, গন্ধর্বদের মধ্যে আমি চিত্ররথ, গন্ধর্ব, যক্ষ এরা হচ্ছে সব নিম্ন শ্রেণীর ছোট ছোট দেবতা। যাঁরা সিদ্ধ তাঁদের মধ্যে আমি কপিল মুনি। সিদ্ধরা হচ্ছেন ঋষিদের মতই। সিদ্ধ শব্দের এখানে দুটো অর্থ হতে পারে। এক হচ্ছে যাঁরা ঋষিদের মত সাধনা করে সিদ্ধিলাভ করেছেন, দ্বিতীয় হচ্ছে যাঁরা জন্ম থেকেই ধর্ম ও শাস্ত্রজ্ঞানাদিতে প্রতিষ্ঠিত, এঁদের মধ্যে আমি হলাম কপিল মুনি।

**উচ্চৈঃশ্রবসমশ্বানাং বিদ্ধি মামমৃতোদ্ভবম্। ঐরাবতং গজেন্দ্রাণাং নরাণাঞ্চ নরাধিপম্।।২৭।।**

অশ্বগণের মধ্যে আমি হলাম শ্রেষ্ঠ অশ্ব উচ্চৈঃশ্রবা। বড় বড় হাতিদের মধ্যে আমি ঐরাবত, ঐরাবত হচ্ছে ইন্দ্রের হাতি। অমৃত লাভের জন্য যখন সমুদ্রকে মন্থন করা হয়েছিল তখন সমুদ্র থেকে উচ্চৈঃশ্রবা আর ঐরাবত উদ্ভূত হয়েছিল। *নরাণাঞ্চ নরাধিপম্,* মানুষের মধ্যে আমি হলাম রাজা। এখনকার দিনে রাজা আর নেই, কিন্তু বর্তমানে মন্ত্রী, এমপি, এমএলএ এরাই রাজা, এরা যাই করুক না কেন, এদের মধ্যে ভগবানের বেশি বিভূতি। সেইজন্য কোন রাজা যখন অতিরিক্ত মাত্রায় শোষণ নিপীড়ন করতে থাকে তখন ভগবান সেই রাজার থেকে তাঁর বিভূতি সরিয়ে নেন, সেই রাজাও তখন খসে পড়ে যায়। কেউ যখন রাজার মত ক্ষমতা পেয়ে যায় তখন বুঝতে হবে তার মধ্যে ঈশ্বরের বিভূতি এসে গেছে, সেই ক্ষমতার অপপ্রয়োগ করে যখন অত্যাচার অনাচারাদি করতে থাকে তখন সে ঐ ক্ষমতায় থাকতে পারেনা। তখন সে নরাধিপ থাকে না, আবার নর হয়ে যায়। রাজ ক্ষমতা মানে ঈশ্বরেরই এক বিশেষ শক্তি, যার মধ্যে ঈশ্বরের এই বিশেষ শক্তি এসে যায় সেই তখন রাজা হয়ে যায়, আর এই ক্ষমতার অপব্যবহার করলে ভগবান এই ক্ষমতাটা নিয়ে নেন। সমস্ত প্রাণীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হচ্ছে মানুষ, কিন্তু মানুষ হয়ে যদি ধর্মে প্রতিষ্ঠিত না থাকে তাহলে ভগবান আবার তাকে পশুযোনিতে ফেরত পাঠিয়ে দেবেন। জানোয়ারের মধ্যে যদি আবার যে জানোয়ারের স্বাভাবিক আচরণ না করে তখন তাকে আবার গাছপালা বানিয়ে দেবে। ঈশ্বরের বিভূতির জন্যই আজকে আমরা সমস্ত প্রাণীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ প্রাণী মানুষ হয়েছি, মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হচ্ছেন রাজা, রাজাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হচ্ছেন ইন্দ্র। যখন ইন্দ্রই গোলমাল করতে শুরু করেছিল তখন তার পতন হয়ে গিয়েছিল। রাজা যখন গোলমাল করবে তখন তার পতন হয়ে মানুষ হয়ে যাবে, মানুষ গোলমাল করলে পশু হয়ে যাবে, পশু গোলমাল করলে গাছপালা হয়ে যাবে, গাছপালা হয়ে গোলমাল করলে পাথর হয়ে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ বছর পড়ে থাকবে। যেখানে যা কিছু ভালো জিনিষ হচ্ছে সেটাই ঈশ্বরের বিভূতি। বিভূতি ঈশ্বরের কাছ থেকে আসছে তাই এর অপব্যবহার ও অপপ্রয়োগ কখনই করতে নেই।

**আয়ুধানামহং বজ্রং ধেনূনামস্মি কামধুক্। প্রজনশ্চাস্মি কন্দর্পঃ সর্পাণামস্মি বাসুকিঃ।।২৮।।**

যত অস্ত্র আছে তার মধ্যে আমি হলাম বজ্র। গাভীগণের মধ্যে আমি কামধেনু, বলা হয় যে কামধেনু বশিষ্ট মুনির কাছে ছিল, বশিষ্টের আগে বলা হয় এই কামধেনু স্বর্গে ছিল। *প্রজনশ্চাস্মি কন্দর্পঃ,* আমাদের ঐতিহ্যে প্রজাকুলের সৃষ্টির অনেক ধরণের পথ আছে। কিছু কিছু জিনিষ নিজে থেকেই ভেঙ্গে গিয়ে সৃষ্টি হচ্ছে, কিছু কিছু জিনিষের সৃষ্টি অযোনিজ, যেমন দ্রোণাচার্যকে আজকের

দিনের বিজ্ঞানের ভাষায় বলা যেতে পারে তিনি টেস্ট টিউব বেবী। এছাড়া ক্লোনিং পদ্ধতিতে সৃষ্টি হয়, ভালো জাতের কোন ফল গাছের ডাল কলম করে আরেকটা গাছের জন্ম দেওয়া যায়। কিন্তু যত রকম ভাবে জন্ম দেওয়া হয় তার মধ্যে আমি কন্দর্প, কামদেব। যে কোন প্রাণীর স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে কামভাব থেকে যে সৃষ্টি হয় এটাই হচ্ছে সৃষ্টির সহজ পথ। ভগবান যখন মন থেকে সৃষ্টি করছিলেন তখন সৃষ্টির গতি খুব মন্থর ছিল। এই প্রক্রিয়ায় সৃষ্টি আশানুরূপ ভাবে এগোচ্ছিল না বলে তিনি নারী আর পুরুষকে আলাদা করে দিলেন। আলাদা করে তাদের মধ্যে কাম ভাব এনে দিলেন, তখন প্রজাকুলের বৃদ্ধি খুব দ্রুত গতিতে এগিয়ে গেল। কারণ কামদেবের একটাই কাজ হচ্ছে শুধু প্রজাকুলের বৃদ্ধি, কামদেবের একটাই ভূমিকা প্রজনন কার্য। সেইজন্য ছেলেমেয়েরা বিয়ের আগে যে নানা ধরণের শারীরিক আনন্দ করছে এই জিনিষের অনুমতি আমাদের শাস্ত্রে একেবারেই দেওয়া হয় না। কারণ কামের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রজাবৃদ্ধি করা। প্রজাবৃদ্ধি যদি উদ্দেশ্য না হয় তাহলে কামদেবের আশ্রয় নেওয়া কখনই চলবে না। শুধু ইন্দ্রিয়সুখ চরিতার্থ করার জন্য কামদেবের আশ্রয় নেওয়াকে আমাদের শাস্ত্র প্রচণ্ড ভাবে নিষেধ করছে। বিশেষ করে সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী, যোগীরা কখনই কামদেবের প্রতি তাকাবে না। কামদেবকে বাদ দিয়ে অন্য ভাবে যদি প্রজাবৃদ্ধি করা হয় তাতে দোষের কিছু নেই। সেইজন্য ক্লোনিং, টেস্ট টিউব, কলমের সাহায্যে যে সৃষ্টি হচ্ছে হিন্দুদের কাছে এগুলো কোন সমস্যাই নয়, খ্রীশ্চানদের কাছে এগুলো সমস্যার কারণ হয়। তবে সব থেকে সহজ ও শ্রেষ্ঠ উপায় হচ্ছে স্বামী-স্ত্রীর থেকে যে প্রজাকুলের সৃষ্টি হয়। *সর্পাণামস্মি বাসুকিঃ*, সর্পদের মধ্যে আমি বাসুকি। সর্প হচ্ছে একটা বিশেষ জাতি। কিন্তু কখন একে জাতি রূপেও নেওয়া হয় আবার কখন আক্ষরিক সাপ অর্থেও নেওয়া হয়।

**অনন্তশ্চাস্মি নাগানাং বরুণো যাদসামহম্। পিতৃণামর্যমা চাস্মি যমঃ সংযমতামহম্।।২৯।।**

নাগেদের মধ্যে আমি হচ্ছি অনন্তনাগ, এই অনন্তনাগের উপর ভগবান নারায়ণ শয়ন করে থাকেন। সর্প, নাগ এগুলো সবই হচ্ছে একটা জাতি, যেমন আমাদের মধ্যে উপাধি হয় সিংহ, হাতি, নাগ, সেই রকম এগুলোও একেকটি সম্প্রদায়ভুক্ত জাতি। *বরুণো যাদসামহম্*, যত জলের দেবতা আছে তাদের মধ্যে আমি বরুণ দেবতা। *পিতৃণামর্যমা চাস্মি*, পিতৃগণদের মধ্যে আমি পিতৃরাজ অর্যমা। *যমঃ সংযমতামহম্*, যাঁরা যাঁরা শাসন করে থাকেন, সব কিছুকে সংযমে রাখেন এঁদের মধ্যে আমি হচ্ছি মৃত্যুরাজ যম। আমাদের সব কিছু ছেড়ে দেবে, পাপ, ধর্ম, অধর্ম সবাই ছেড়ে দেবে কিন্তু যমরাজ কখনই ছাড়বেন না। যার জন্য রাবণ যখন যমলোকে গিয়ে হামলা করতে এসে যমরাজকে পরাস্ত করে দিয়েছে তখন যমরাজ কালদণ্ড তুলে নিলেন, কালদণ্ড তুলে নেওয়া মানে রাবণ আর কোন ভাবেই বাঁচতে পারবে না। এদিকে রাবণের উপর ব্রহ্মার বর ছিল কোন দেবতা রাবণকে হারাতে পারবে না, অন্য দিকে যমরাজ যার উপর কালদণ্ড চালাবে সে বাঁচতে পারবে না। তখন ব্রহ্মা এসে যমরাজের কালদণ্ডকে আটকে দিয়ে বললেন – হে যমরাজ, রাবণকে আমি বর দিয়ে রেখেছি, তুমি ওকে মেরো না, তা নাহলে আমার বর মিথ্যা হয়ে যাবে। যমরাজ তখন ব্রহ্মাকে বললেন – ঠিক আছে, আপনার সম্মানার্থে রাবণের উপর কালদণ্ড আমি চালাব না, কিন্তু ওকে বলে দিন এর পর থেকে এই যমলোকে এসে যেন বাঁদরামো না করে। এইটাই বলছেন, শাসন করার সময় যমরাজের সামনে কেউ দাঁড়াতে পারবে না। যে যাই বর দিয়ে দিক, কালদণ্ড যার উপর চালাবেন সে আর বাঁচতে পারবে না, কিন্তু সম্মান রক্ষার জন্য কখন সখন প্রয়োজন হলে একটা সমাধানের পথ বার করে দেন।

**প্রহ্লাদশ্চাস্মি দৈত্যানাং কালঃ কলয়তামহম্। মৃগাণাঞ্চ মৃগেন্দ্রোহহং বৈনতেয়শ্চ পক্ষিণাম্।।৩০।।**

যত দৈত্য আছে তাদের মধ্যে আমি প্রহ্লাদ, দৈত্যটাও একটা জাতি বিশেষ। *কালঃ কলয়তামহম্*, গণনাকারীদের মধ্যে আমি কাল। যত পশু আছে তাদের মধ্যে আমি সিংহ, পাখিদের মধ্যে আমি বিনতাপুত্র গরুড়, যিনি হচ্ছেন ভগবান বিষ্ণুর বাহন।

**পবনঃ পবতামস্মি রামঃ শস্ত্রভৃতামহম্। ঝষাণাং মকরশ্চাস্মি স্রোতসামস্মি জাহ্নবী।।৩১।।**

পবিত্র করার যত রকম জিনিষ আছে তাদের মধ্যে আমি হচ্ছি বায়ু। বায়ুই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ পবিত্রকারী, জলকেও পবিত্র করে বাতাস। বলা হয়ে থাকে যে নদী প্রবহমান থাকে সেই নদীর জল পবিত্র হয়, বাতাসের জন্যই জলের প্রবহমানতা, জলের যে গতি সেটা বাতাসের জন্যই হচ্ছে। জামা কাপড়ে যখন সোঁদা গন্ধ হয় তখন তাকে বাইরে বাতাসের মধ্যে ঝুলিয়ে রেখে দেওয়া হয় যাতে তার স্যাঁতস্যাঁতে ভাবটা কেটে যায়। অনেকক্ষণ বদ্ধ ঘরের মধ্যে কাজকর্ম করার পর বাইরে বাতাসের মধ্যে ঘুরে এলে মনটা আবার সতেজ হয়ে যায়। *রামঃ শস্ত্রভৃতামহম্*, যাঁরা শস্ত্র চালনাকারী তাঁদের মধ্যে আমি দাশরথি পুত্র শ্রীরামচন্দ্র। *ঝষাণাং মকরশ্চাস্মি*, জলচরদের মধ্যে আমি মকর, মকর হচ্ছে কুমির। *স্রোতসামস্মি জাহ্নবী*, প্রবাহিত জলধারার মধ্যে আমি জাহ্নবী, মানে গঙ্গা।

**সর্গাণামাদিরন্তশ্চ মধ্যঞ্চৈবাহমর্জুন। অধ্যাত্মবিদ্যা বিদ্যানাং বাদঃ প্রবদতামহম্।।৩২।।**

সর্গ মানে সৃষ্টি, যা কিছু সৃষ্টি হয়েছে তার আদি অন্ত ও মধ্য এই তিনটেই আমি। আগের কুড়ি নং শ্লোকে বলেছিলেন ভগবান যত জীব ও মানুষ তার উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রলয়ের স্থান, এখানে এসে বলছেন *সর্গাণামাদিরন্তশ্চ*, সমস্ত সৃষ্টির আমিই সব কিছু।

*অধ্যাত্মবিদ্যা বিদ্যানাং*, যত বিদ্যা আছে তার মধ্যে আমি অধ্যাত্ম বিদ্যা এবং *বাদঃ প্রবদতামহম্, প্রবদতামের* অর্থ হচ্ছে কয়েকজন মিলে যখন কোন আলোচনা হয়। যত রকমের বাক্যালাপ হয় তার মধ্যে আমি হচ্ছি বাদ। বাক্যালাপ চার রকমের হয়, প্রথম হচ্ছে বাদ, বাদ হচ্ছে আমি একটা জিনিষ জানতে চাইছি, যেমন গুরু আমাকে কিছু বলছেন তখন আমার মনে কিছু প্রশ্ন জাগল, তখন আমি জিজ্ঞেস করছি, আমরা এখন যে গীতার তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করছি এগুলো হচ্ছে বাদ। দ্বিতীয় হচ্ছে জল্প, জল্প হচ্ছে আমি আমার কথা বলে যাব তুমি তোমার কথা বলে যাবে, আমি আমার জায়গা থেকে সরব না, তুমিও তোমার জায়গা ছাড়বে না, লোকসভা বা বিধানসভাতে বিরোধী পক্ষ আর সরকার পক্ষের মধ্যে যে ভাবে আলোচনা হয় তাকে আমরা বেশির ভাগ সময়ই এই জল্পই বলতে পারি। তৃতীয় হচ্ছে বিতণ্ডা, বিতণ্ডাতে আমারও কিছু বলার নেই, তোমারও কিছু বলার নেই, আমি যা বলব তাতে আমি আপনার মতকে উড়িয়ে দেব, আবার আপনি যা বলবেন তাতে আমার মতটাকে উড়িয়ে দেবেন। আমাদের কারুরই কোন নিজস্ব বক্তব্যই নেই অপর পক্ষ যা বলবে সেটাকে উড়িয়ে দেওয়া ছাড়া আর কোন কাজ নেই। চতুর্থ আরেকটি হয় যাকে বলা হয় কোলাহল, কিছুই নেই একসাথে সবাই চেঁচামেচি করে মরছে, কেউ কারুর কথা শুনতেও পায়না, দুজনেই এক তরফা একসাথে বক্‌বক্‌ করেই যাবে।

**অক্ষরাণামকারোঽস্মি দ্বন্দ্বঃ সামাসিকস্য চ। অহমেবাক্ষয়ঃ কালো ধাতাঽহং বিশ্বতোমুখঃ।।৩৩।।**

সব অক্ষরের মধ্যে আমি অকার, *দ্বন্দ্বঃ সামাসিকস্য চ*, সব কয়টি সমাসের মধ্যে আমি দ্বন্দ্ব সমাস। *অহমেবাক্ষয়ঃ কালো*, অবিনাশী কাল আমি, *ধাতাঽহং*, আমি হচ্ছি বিধাতা, সর্বকর্মফলের বিধান কর্তা। *বিশ্বতোমুখঃ*, সর্বতোমুখে পরমেশ্বর, এর আগে নবম অধ্যায়ে পনেরো নং শ্লোকে ভগবান বলেছিলেন *একত্বেন পৃথকত্বেন বহুধা বিশ্বতোমুখম্*, সেখানে বলা হয়েছিল কেউ আমাকে বিশ্বমুর্তি পরমেশ্বর রূপে আরাধনা করেন।

**মৃত্যুঃ সর্বহরশ্চাহমুদ্ভবশ্চ ভবিষ্যতাম্। কীর্তিঃ শ্রীর্বাক্ চ নারীণাং স্মৃতির্মেধা ধৃতিঃ ক্ষমা।।৩৪।।**

ডাকাত এসে যেমন সব কিছু হরণ করে নেয়, তেমনি মৃত্যু যখন যার কাছে আসে তার সব কিছুকে হরণ করে নেয়। মৃত্যুর আরেকটি নাম সর্বান্তক, যার অর্থ হচ্ছে সে সব কিছুর অন্ত করে দেয়, আমিই সেই প্রাণহননকারি মৃত্যু। *উদ্ভবশ্চ ভবিষ্যতাম্*, ভবিষ্যতে মানুষের যে উৎকর্ষতা হয়, ভবিষ্যতে জগতের যে কল্যান হবে অভ্যুদয় হবে তার কারণ আমি। একদিকে আমি যেমন মৃত্যু রূপে সব কিছু নাশ করে দিই আবার ভবিষ্যতে ভালো যেটা হবে সেটাও আমিই দিই। *কীর্তিঃ শ্রীর্বাক্ চ নারীণাং স্মৃতির্মেধা ধৃতিঃ ক্ষমা*, বেদে ধর্ম দেবতার উল্লেখ আছে, এই ধর্মের সাতজন পত্নী এনাদের নাম হচ্ছে কীর্তি, শ্রী, বাক, স্মৃতি, মেধা, ধৃতি ও ক্ষমা। এই সাতটি হল নারীর সাতটি গুণ। বলা হয় কারুর পত্নীর মধ্যে এই সাতটি গুণের মধ্যে একটি গুণ যদি থাকে তাহলে সেই পতি ধন্য হয়ে যাবে। নারীদের মধ্যে এই সাতটি গুণ আমি।

**বৃহৎসাম তথা সাম্নাং গায়ত্রী ছন্দসামহম্। মাসানাং মার্গশীর্ষোঽহমৃতূনাং কুসুমাকরঃ।।৩৫।।**

বৃহৎ-সাম একটি যজ্ঞের নাম, সামসমূহের মধ্যে আমি মোক্ষপ্রতিপাদক বৃহৎ-সাম। *মাসানাং মার্গশীর্ষোঽহম্*, বারোটি মাসের মধ্যে আমি হলাম অগ্রহায়ণ, বর্ষার পর আর শীতের আগের সময়টা হচ্ছে সব থেকে উৎকৃষ্ট কাল। অগ্রহায়ণ মাসে অনেক রকমের ভালো কাজ হয়, বিবাহ, উপনয়ন, নবান্ন। *ঋতুনাং কুসুমাকরঃ*, ছয়টি ঋতুর মধ্যে আমি বসন্ত ঋতু।

**দ্যূতং ছলয়তামস্মি তেজস্তেজস্বিনামহম্। জয়োঽস্মি ব্যবসায়োঽস্মি সত্ত্বং সত্ত্ববতামহম্।।৩৬।।**

*দ্যূতং ছলয়তামস্মি*, ছলনাকারিদের মধ্যে আমি হলাম জুয়া খেলা। *তেজস্তেজস্বিনামহম্*, তেজস্বিদের মধ্যে যে তেজ সেটা আমি। *জয়োঽস্মি ব্যবসায়োঽস্মি*, বিজয়িদের মধ্যে যে বিজয় হয় সেই জয়টা আমি, আর উদ্যমকারীদের যারা দৃঢ় নিশ্চয় করে কিছু করে তাদের সেই দৃঢ়তা, অধ্যাবসায়টা আমি। *সত্ত্বং সত্ত্ববতামহম্*, যাঁরা সাত্ত্বিক পুরুষ তাঁদের মধ্যে যে সত্ত্বগুণ সেটা আমার থেকেই হয়েছে, মানে সত্ত্বগুণটা আমারই।

**বৃষ্ণীনাং বাসুদেবোঽস্মি পাণ্ডবানাং ধনঞ্জয়ঃ। মুনীনামপ্যহং ব্যাসঃ কবীনামুশনা কবিঃ।।৩৭।।**

বৃষ্ণী বংশে আমি বাসুদেব রূপে, বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণের নাম। এতে বলতে চাইছেন বৃষ্ণীদের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের ভেতর ঈশ্বরের বিভূতি সব থেকে বেশি। *পাণ্ডবানাং ধনঞ্জয়ঃ*, পাণ্ডবদের মধ্যে আমি অর্জুন। বৃষ্ণী বংশের মধ্যে আমি শ্রেষ্ঠ আর পাণ্ডবদের বংশে তুমি শ্রেষ্ঠ, আমি আর তুমি এখন এই আলোচনা করছি। অথচ শ্রীকৃষ্ণ নিজে ভগবান, তাই শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু ভগবান নন, যিনি ভগবান তিনি শ্রীকৃষ্ণ হয়ে এসেছেন। যিনি ভগবান তাঁর বিভূতি বৃষ্ণী বংশে সবচেয়ে বেশি প্রকাশ পাচ্ছে শ্রীকৃষ্ণ মানে বাসুদেবের মধ্যে। এখন যদি বৃষ্ণী বংশকে সরিয়ে দিয়ে বলা হয়, তখন ভারতের ঐ অঞ্চলে কার মধ্যে ভগবানের বিভূতি সবেচেয়ে বেশি ছিল? তখনও এই

উত্তরই হবে শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে। ঐ অঞ্চলকে সরিয়ে যদি বলা হয়, পুরো ভারতবর্ষে সেই সময় ঈশ্বরের বিভূতি সবচেয়ে বেশি কার মধ্যে প্রকাশিত ছিল? শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে। দু হাজারের সময়ে কার মধ্যে ঈশ্বরের বিভূতি সবচেয়ে বেশি ছিল? শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে। আমাদের এই সীমিত বুদ্ধি দিয়ে ঈশ্বরের ব্যাপারে কতটুকুই বা কল্পনা করতে পারি। ঈশ্বরের বিভূতির যখন প্রকাশ কোথাও হয় তখন তাঁকে নিয়েই আমরা ঈশ্বরের কল্পনা করা অনেক সহজ হয়, এখন যখন বলা হল বৃষ্ণীদের ভেতর কার মধ্যে সব থেকে বেশি বিভূতি? আমার মধ্যে। এই যুদ্ধ ক্ষেত্রে যত বীর যোদ্ধারা আছেন তাদের মধ্যে কার ভেতর? আমার মধ্যে। আচ্ছা সারা ভারতে কার মধ্যে? আমার মধ্যে। আগামী দু হাজার বছরে কার মধ্যে? আমার মধ্যে। এইজন্য শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে ঈশ্বরের ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি উচ্চ কল্পনা করতে পারি। *মুনিনামপ্যহং ব্যাসঃ*, মুনিদের মধ্যে আমি বেদব্যাস, *কবীনামুশনা কবিঃ*, কবিদের মধ্যে আমি কবি উশনা, উশনা হলে দৈত্যদের গুরু শুক্রাচার্য। কবি বলতে সংস্কৃতে ত্রিকালদর্শিদের বোঝায়, কবিতা রচনাকারি কবিকে বোঝাচ্ছে না।

**দণ্ডো দময়তামস্মি নীতিরস্মি জিগীষতাম্। মৌনং চৈবাস্মি গুহ্যানাং জ্ঞানং জ্ঞানবতামহম্।।৩৮।।**

শাসকগণরা যে শাস্তি প্রদান করেন তার মধ্যে দমন, দমিয়ে দেওয়ার ক্ষমতাটা আমি। যেখানে অবাধ্য প্রজাদের ঠাণ্ডা করবার জন্য দোর্দণ্ড প্রতাপশালী কাউকে দিয়ে যে তাদের দমন করা হয় সেটা ভগবান। *নীতিরস্মি জিগীষতাম্*, যারা বিজয় চাইছে তারা যে নীতির মাধ্যমে জয় লাভ করছে সেই নীতিটা আমি। নীতি ছাড়া জয়ের কোন দাম নেই, দুর্নীতি অবলম্বন করে, অধর্ম ভাবে কোন কিছু জয় করাতে কোন ভালো কিছু হয় না। *মৌনং চৈবাস্মি গুহ্যানাং*, গোপনীয় বিষয় সমূহের মধ্যে আমি হলাম মৌন। যত বড় প্রশাসক বা রাজনীতিবিদ হোন না কেন তার ট্রেড সিক্রেট কারুর না কারুর সাথে শেয়ার করতেই হয়, হয় তার বউয়ের সাথে না হয় খুব নির্ভরশীল কারুর সাথে কিন্তু এটাই আবার কোন না কোন ভাবে বেরিয়ে গিয়ে জানাজানি হয়ে যায়। কিন্তু যারা পাক্কা ধুরন্ধর রাজনীতিবিদ বা প্রশাসক তাদের পেট চিড়ে দিলেও মুখ থেকে কোন কথা বেরোবে না, যেটা চাণক্যের একটা বড় নীতি, আসল কথা কখনই মুখ থেকে বেরোবে না। প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট ঠিক এই রকম ছিলেন। *জ্ঞানং জ্ঞানবতামহম্*, যাঁরা জ্ঞানবান পুরুষ তাঁদের মধ্যে যে জ্ঞান সেটা আমি। এত বিভূতির কথা বলার পর ভগবান অর্জুনকে বলছেন –

**যচ্চাপি সর্বভূতানাং বীজং তদহমর্জুন। ন তদস্তি বিনা যৎ স্যান্ময়া ভূতং চরাচরম্।।৩৯।।**

সর্ব ভূতের উৎপত্তির কারণ যে বীজ সেটা আমি। এই জগতে স্থাবর বা জঙ্গম যা কিছু আছে তার মধ্যে এমন কোন কিছু নেই যে যেটা আমি ছাড়া, আমি যদি না থাকি তাহলে সেটা সত্তাবিহীন হয়ে যাবে। আমার জন্যই সব কিছু সত্তাবান হতে পারছে। কি রকম সত্তাবিহীন হয়ে যাবে? আকাশকুসুমবৎ, আকাশে ফুল হয়েছে, ফুলটা কি রকম? ঈশ্বরবিহীন। ঈশ্বরবিহীন হওয়ার জন্য আকাশের ফুলের কোন সত্তা নেই। যারই সত্তা আছে, আমি সেটা।

**নান্তোঽস্তি মম দিব্যানাং বিভূতীনাং পরন্তপ। এষ তূদ্দেশতঃ প্রোক্তো বিভূতের্বিস্তরো ময়া।।৪০।।**

আমার বিভূতির অন্ত নেই। হে অর্জুন, তুমি মনে করো না যে তোমাকে যা যা বিভূতির কথা বললাম এইটুকুতেই আমার সব বিভূতির কথা বলা শেষ হয়ে গেল। আমার বিভূতির কথাগুলো আমি খুব সংক্ষেপে তোমাকে বললাম এর বেশি বলার সময় কোথায় আর। তবে তুমি জেনে রাখো –

**যদ্ যদ্ বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জিতমেব বা। তত্তদেবাগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশসম্ভবম্।।৪১।।**

এখানে শ্রীকৃষ্ণ তিনটি শব্দ উচ্চারণ করছেন *বিভূতিমৎ*, মানে ঐশ্বর্যযুক্ত, বিশেষ শক্তি আছে, *শ্রীমদ্*, মানে সমৃদ্ধিমান, লক্ষ্মীযুক্ত, যে কোন ধরণের ঐশ্বর্য আছে, যেমন কারুর প্রচুর ধনসম্পদ আছে, কারুর মধ্যে বিদ্যার ঐশ্বর্য আছে, কারুর মধ্যে ভক্তির ঐশ্বর্য আছে, কারুর মধ্যে জ্ঞানের ঐশ্বর্য আছে আর *উর্জিতম্*, মানে বলশালী বা উৎসাহসম্পন্ন, সে যখন তর্ক করতে দণ্ডয়মান হয় তখন সবাই কেঁচো হয়ে যায়, শচীন তেণ্ডুলকার যখন ব্যাট করতে নামে তখন রানের ফুলঝুড়ি, বোলাররা সবাই তটস্থ হয়ে যায়, এটাও ঈশ্বরের শক্তি, আবার ওরই বন্ধু বিনোদ কাম্বলি কত ভালো ক্রিকেটার ছিল কিন্তু শচীনের মত ধরে রাখতে পারল না, তার মানে ওর মধ্যে ঈশ্বরের সেই শক্তিটা নেই। যেখানে যেখানে যার মধ্যে এই তিনটে জিনিষ, ঐশ্বর্যযুক্ত, বিশেষ শক্তি আর সমৃদ্ধিমান দেখবে তুমি বুঝে নাও যে, *মম তেজোঽংশসম্ভবম্*, আমার তেজের একটু সামান্য অংশতেই এদের এই রকম হয়ে গেছে।

**অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জুন। বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ।।৪২।।**

হে অর্জুন, আর বেশি কথা তোমাকে কি বলব, একটা কথা তোমাকে সংক্ষেপে বলে দিচ্ছি, আমার বিভূতির এত কথা জেনে তোমার কি হবে! আম খেতে এসেছ আম খেয়ে যাও, আমের কটা ডাল, কটা পাতা জেনে কি লাভ তোমার। শুধু জেনে নাও, *একাংশেন স্থিতো জগৎ*, এই যে পুরো বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যা দেখছ, তোমার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যের মধ্যে যতটা জগৎকে তুমি দেখতে পাচ্ছো, আমার

একটা খুব ছোট্ট একটা অংশে এই পুরো বিশ্বব্রহ্মাণ্ড অবস্থান করছে। পুরুষসূক্তমেও ঠিক এই ভাবটা আমরা পাই – *পাদোঽস্য বিশ্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি*, কালত্রয়বর্তী সমস্ত জীব পুরুষের মাত্র একপাদে অবস্থিত, তাঁর অবশিষ্ট ত্রিপাদ অবিনাশিরূপে ও স্বপ্রকাশ স্বরূপে অবস্থিত আছে।

বিভূতিযোগ হচ্ছে ঈশ্বরের গুণচিন্তন, যেখানে কোন কিছু বিভূতি, ঐশ্বর্যের প্রকাশ দেখছি তখন ঈশ্বরেরই এই শক্তি এই ঐশ্বর্য দেখছি এই ভাবে চিন্তন করতে হয়। তখন কি হয়, জাগতিক জিনিষটাই চলে যাবে ঈশ্বরের দিকে, সাথে সাথে মনটাও উচ্চ অবস্থায় চলে যায়।

**ওঁ তৎসদিতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসুপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়ং যোগশাস্ত্রে**
**শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে বিভূতিযোগো নাম দশমোঽধ্যায়ঃ।।**

১৯শে সেপ্টেম্বর ২০১০

একাদশ অধ্যায়

# বিশ্বরূপদর্শনযোগ

যারা সাধারণ ভক্ত তাদের জন্য গীতার দশম আর একাদশ অধ্যায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। গীতার বাকি অধ্যায়গুলোর দর্শন ও তত্ত্ব এত গভীর যে সাধারণের পক্ষে বোঝা বা ধারণা করা খুবই কঠিন। আমাদের বুদ্ধি অতি সাধারণ, এই বুদ্ধি দিয়ে ঈশ্বরীয় তত্ত্ব, জীব, জগৎ আর ঈশ্বরের মধ্যেকার সম্বন্ধে যে তত্ত্বকে গীতার দ্বিতীয় অধ্যায় থেকে নবম অধ্যায়ে বলা হয়েছে, বিশেষ করে দ্বিতীয় অধ্যায়ে স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ সম্বন্ধে যা বলা হয়েছে তাকে ধারণা করা সত্যি সত্যিই অসম্ভব। কিন্তু এই দশম ও একাদশ অধ্যায়কেই সাধারণ মানুষ ঠিক ঠিক বুঝতে পারে। কেউ যদি ঈশ্বরের প্রতি ভক্তির অনুশীলন করতে চায় তাহলে এই দুটো অধ্যায়কে খুব ভালো করে শ্রদ্ধা, ভক্তি ও নিষ্ঠা সহকারে প্রত্যেক দিন আবৃত্তি করা উচিৎ। ভগবানের স্তুতি যদি করতে হয় তাহলে যাদের প্রচুর সময় আছে তবে এই দুটি অধ্যায়কে নিত্য স্নানের পর পাঠ করে গেলে ধীরে ধীরে ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি গভীর হয়। এই দুটো অধ্যায়ে তত্ত্ব কথাও আছে আর ভক্তির কথাতো আছেই। দশম আর একাদশ অধ্যায়ের মত এত ভক্তি ভাবের সমাবেশ আর কোন অধ্যায়েই নেই। ভক্তি ছাড়াও ঈশ্বরের গুণ চিন্তন আর রূপ চিন্তন এই দুটোও এই অধ্যায় দুটিতে সুন্দর ভাবে প্রস্ফুটিত করা হয়েছে। তাই ধ্যানের জন্যও এই অধ্যায় দুটো খুবই সহায়ক। রোজ পাঠ করতে করতে ধীরে ধীরে দেখা যাবে ঠাকুরের অশেষ কৃপায় দশম ও একাদশ অধ্যায়ের বক্তব্য স্পষ্ট হয়ে যাবে। আর এই দুটো অধ্যায় যদি স্পষ্ট হয়ে যায় তাহলে ভগবানের যে সাকার রূপ সেটা আমাদের অন্তঃচক্ষুর সামনে স্পষ্ট হয়ে যাবে। অবতার বিশেষ যিনি তাঁর নিরপেক্ষ সার্বিক গুণ, তত্ত্ব ও রূপের মিলন ঘটান হয়েছে, তাই এর গুণ, রূপ ও তত্ত্বের বর্ণনাকে যেমন আমরা শ্রীরামচন্দ্রের উপরে আরোপ করতে পারি, তেমনি শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরামকৃষ্ণ যে কোন অবতারের উপরই আরোপ করতে পারি।

দশম অধ্যায়ের শেষ শ্লোকে ভগবান একটা খুব মারাত্মক গুহ্য কথা বলে দিলেন, সেটা হল *বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ*, হে অর্জুন, আমার একটা ছোট্ট অংশে এই জগৎ অবস্থিত। এই একাংশেন, ভগবানের ছোট্ট একটা অংশে সারা জগৎ কিভাবে অবস্থান করছে, এই তত্ত্বের বিস্তার আমরা একাদশ অধ্যায়ে এসে পাচ্ছি। যারা কৃষ্ণ ভক্ত তারা এই শ্লোকটাকে খুব ব্যবহার করে, *একাংশেন স্থিতো জগৎ* এই একটি তত্ত্বকে ভিত্তি করে বৈষ্ণবরা বলে কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং। *একাংশেন স্থিতো জগৎ* এই তত্ত্বটা কি আর কিভাবে তত্ত্বটা প্রতিষ্ঠা পাচ্ছে, এই ভাবটাকে একাদশ অধ্যায়ে ভগবান স্পষ্টিকরণ করে দিচ্ছেন। এই দুটো অধ্যায়ের আগে পর্যন্ত ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে যেন আচার্যের মত উপদেশ দিয়ে যাচ্ছেন। দ্বিতীয় অধ্যায় থেকে শুরু করে অষ্টম অধ্যায় পর্যন্ত শ্রীকৃষ্ণ যা যা বলেছেন সেগুলো যে কোন আচার্যই বলে দিতে পারেন, কিন্তু নবম অধ্যায় আসতেই ভগবান শুরু করলেন আর দশম অধ্যায়ে এসে আচার্য ভাব উড়ে গেছে এখানে এসে পুরো ভগবান নিজেই তাঁর খোলস ছেড়ে বেরিয়ে এসেছেন। দশম অধ্যায়ে ভগবানের যে বিভূতি ও রূপের কথা বলতে শুরু করেছিলেন একাদশ অধ্যায়ে এসে তিনি সেটা অর্জুনের সামনে দাঁড় করিয়ে দেখিয়ে দিলেন। একাদশ অধ্যায়ে এসে ভগবান যেন বলতে চাইছেন তোমাকে আমার আর শক্তির কথা কি বলব, এই দেখে নাও আমার শক্তি কেমন হতে পারে। পাড়ার মস্তানরা যেমন বলে তোকে আমার ক্ষমতার কথা কি বলব এই নে আমার হাতের দুটো থাপ্পড় খেলেই বুঝতে পারবি, বলেই গালে দুটো চড় কষিয়ে দিল। ভগবানও এতক্ষণ বলে গেছেন আমি এই, আমি সেই। তারপর বললেন, আর তোকে কত বলব এই দ্যাখ্ আমার রূপ। প্রথম শ্লোকে অর্জুন ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে বলছেন –

অর্জুন উবাচ

**মদনুগ্রহায় পরমং গুহ্যমধ্যাত্মসংজ্ঞিতম্। যৎ ত্বয়োক্তং বচস্তেন মোহোহয়ং বিগতো মম।।১।।**

অর্জুন বলছেন, আপনি আমার উপর কৃপা করে এতক্ষণ অধ্যাত্মের আত্মা ও অনাত্মার বিচার করে সব অতি গুহ্য কথা শোনালেন। এই সব শোনার পর *মোহহয়ং বিগতো মম*, আমার মোহ কেটে গেছে। আমি এখন বুঝতে পারছি আমার এখন কি কর্তব্য, আমি কে, আপনি কে। একটা মানুষকে যখন শাস্ত্রের অনেক কিছু বোঝান হয় তখন প্রথম প্রথম সব জিনিষ বুঝতে বা ধারণা করতে পারেনা, কিন্তু একটা স্তরে গিয়ে যেটা এতক্ষণ বুঝতে পারছিল না, হঠাৎ সেই না বোঝা জিনিষটাকে বুঝে ফেলে। সেই তত্ত্বটাকে শুধু যে বুঝে ফেলে তা নয়, এতক্ষণ ধরে যেটা শুনে আসছিল সেটাই কিন্তু তার ভেতরে কাজ করতে শুরু করে দেয়। কিন্তু শেষে গিয়ে এমন কিছু একটা ধাক্কা লাগে, সেটা খুব সাধারণ ধাক্কাও হতে পারে আবার বড় ধাক্কাও হতে পারে, তাতেই সব কিছু পরিষ্কার হয়ে যায়। আমাদের মনে হতে পারে ভগবান এতক্ষণ এত তত্ত্ব কথা বলে আসছিলেন আর এই অতি সাধারণ একটা কথা বলতেই সব বুঝে ফেলল! আসলে কিন্তু তা হয় না, প্রথম থেকেই ধাক্কা মেরে মেরে তাকে আগে থেকেই আলগা করে দেওয়া হচ্ছিল, যখন একটু বাকি থাকছে তখন সামান্য একটা ছোট্ট ধাক্কাতেই সব খসে পড়ে গেল। এরপর থেকে অর্জুন কিন্তু কোথাও সন্দেহ ব্যক্ত

করছেন না, এরপর যে যে প্রশ্ন করবেন সেটা স্পষ্টিকরণের জন্য, এখন আর সন্দেহাত্মক কিছু নেই। দশম অধ্যায়ে ভগবান শেষে যে কথাটি বলেছিলেন, *একাংশেন স্থিতো জগৎ,* সেই প্রসঙ্গ টেনে অর্জুন বলছেন –

**ভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাং শ্রুতৌ বিস্তরশো ময়া। ত্বত্তঃ কমলপত্রাক্ষ মাহাত্ম্যমপি চাব্যয়ম্।।২।।**

*ভব-অপ্যয়ৌ,* উৎপত্তি আর বিনাশ, একটা জিনিষ হওয়া আর নাশ হওয়া, জীবের এই দুটোর কথা আপনি বিস্তারিত ভাবে পরিষ্কার করেই আমাকে বললেন। হে পদ্মপলাশলোচনে, আপনার যে অব্যয় স্বরূপ সেটাকেও আপনি স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন। দশম অধ্যায়ে ভগবান জীবের উৎপত্তি ও বিনাশ, জগতের উৎপত্তি আর বিনাশ আর তার মধ্যে ভগবানের অব্যয় অবিনাশী তত্ত্ব এই সব কিছুরই আলোচনা হয়েছে, সেইটাই অর্জুন বলছেন।

**এমমেতদ্ যথাত্থ ত্বমাত্মানং পরমেশ্বর। দ্রষ্টুমিচ্ছামি তে রূপমৈশ্বরং পুরুষোত্তম।।৩।।**

জীব ও জগতের সৃষ্টি আর লয়ের মূলে হচ্ছেন আপনি, কিন্তু এটা হল তত্ত্বগত দিক। সপ্তম অধ্যায় থেকে দশম অধ্যায়ের অনেক জায়গায় আপনি নিজের তত্ত্বের কথা বলে গেছেন। স্বয়ং আপনার শ্রীমুখ থেকে আপনারই তত্ত্বের কথা শুনে আমি খুবই তৃপ্তি পেয়েছি, আর কিছু যে বুঝিনি তা নয়, সবই বুঝেছি। তবে কি, *দ্রষ্টুমিচ্ছামি তে রূপমৈশ্বরং পুরুষোত্তম,* আপনি যে সব কিছুর মহেশ্বর, আপনিই সব কিছুকে জন্ম দিচ্ছেন, নিয়ন্ত্রণ করছেন আবার সংহার করে নিজের মধ্যে টেনে নিচ্ছেন, আপনার এসব তত্ত্ব সবই মেনে নিতে পারছি, কিন্তু আমার একান্তই ইচ্ছে যে আপনার এই বিশাল কর্মকাণ্ডটাকে একটু চাক্ষুস করি। জামসেদপুরে টাটার স্টীল কারখানা পরিদর্শন করতে গেছি, সেখানকার কর্তারা অফিসের এসি ঘরে চা স্ন্যাকস্ খেতে খেতে বুঝিয়ে দিলেন এখানে কি কি জিনিষ তৈরী হয় আর কিভাবে তৈরী হচ্ছে। সব শোনার পর আমি বললাম যদি আপনারা একটু কারখানাটা ঘুরিয়ে দেখিয়ে দেন কিভাবে এই কাজগুলো আপনারা করছেন। তখন কর্তাব্যক্তিরা আমাকে কারখানার সব মেশিন গুলো ঘুরিয়ে দেখিয়ে দিল। অর্জুনও ভগবানকে বলছেন – আপনার এই ঐশ্বরীয় রূপটা কি রকম সবই তো শ্রবণ করলাম, কিন্তু সেটাকে একটু চাক্ষুস করতে চাই। কিন্তু চাইলেই তো আপনি সবাইকে আপনার ঐশ্বরীয় রূপ দেখিয়ে দেবেন তা তো নয়, যার উপর আপনার কৃপা হবে, ঐশ্বরীয় রূপকে দেখার মত যার ক্ষমতা ও যোগ্যতা আছে তাকেই তো আপনি দেখাবেন। তাই অর্জুন বলছেন –

**মন্যসে যদি তচ্ছক্যং ময়া দ্রষ্টুমিতি প্রভো। যোগেশ্বর ততো মে ত্বং দর্শয়াত্মানমব্যয়ম্।।৪।।**

যদি আপনি মনে করে এই অর্জুনকে আপনার অবিনাশী স্বরূপ, আপনার এই অব্যয় রূপ দেখানো যেতে পারে, একে দেখানো সম্ভব, কারণ যা আপনার কাছ থেকে শুনেছি তাতে মনে হচ্ছে, যে যোগ্যতা অর্জন করেনি তাকে আপনার এই অব্যয় রূপকে দেখানো যেতে পারেনা। দশম অধ্যায়ে অর্জুন বলেছিলেন – *আহুস্ত্বামৃষয়ঃ সর্বে দেবর্ষির্নারদস্তথা। অসিতো দেবলো ব্যাসঃ স্বয়ঞ্চৈব ব্রবীষি মে।।* মহর্ষিরা যারা আছেন, দেবর্ষিরা সবাই একই কথা বলেছেন। *ন হি তে ভগবন্ ব্যক্তিং বিদুর্দেবা ন দানবাঃ,* মানুষ তো দূরের কথা দেবতা, দানব যারা তারাও আপনার এই অব্যয় রূপকে জানতে পারেনা। অসুর, দানব বলতে আমরা যে বাজে জিনিষ বলে মনে করি তা নয়, দৈত্য, দানব এরা সব জাতি। এরা মানুষের থেকেও উঁচু স্তরে অবস্থান করছে, *প্রহ্লাদশ্চাস্মি দৈত্যানাং,* দৈত্যদের মধ্যে আমি প্রহ্লাদ। যদিও দৈত্য দানবদের থেকে মানুষ শক্তি ও অন্যান্য অনেক কিছুর থেকে নীচে কিন্তু এরা ভগবান মানে না। দেবতা আর দৈত্য দানবদের মধ্যে খুব বেশি পার্থক্য না থাকলেও দেবতারা সবাই ভগবানকে মানে এটাই সব থেকে বড় পার্থক্য। তবে এখনতো বিশ্বের জনসংখ্যা হচ্ছে ছশ কোটি, কিন্তু কজন আর ভগবানকে ঠিক ঠিক মানছে। কিন্তু পাশ্চাত্য জাতির তুখোড় বুদ্ধি, দৈত্য দানবরাও তুখোড় বুদ্ধি ধরে। তুখোড় বুদ্ধি থাকলেই যে আপনাকে জানতে পারবে তা নয়, মানুষ, দেবতা, দৈত্য, দানব এরা কেউই আপনাকে জানতে পারেনা। যখন কেউই জানতে পারেনা, মহর্ষিরা, ঋষিরাও যেখানে আপনাকে জানতে পারছে না সেখানে আমি কোন ছাড়। কিন্তু *মন্যসে যদি তচ্ছক্যং,* আপনি যদি মনে করেন আমাকে আপনার অব্যয় রূপ দেখানো যেতে পারে, আমাকে যোগ্য মনে করেন তাহলে আপনার যে অব্যয় রূপ, অবিনাশী রূপ, *দর্শয়াত্মানমব্যয়ম্* আপনার জগদাত্মরূপটা দেখান। অর্জুন যখন খুব শ্রদ্ধা সহকারে স্তুতি করে ভগবানের অবিনাশী রূপ দেখার জন্য প্রার্থনা করছেন, তখন ভগবান বলছেন –

শ্রীভগবানুবাচ

**পশ্য মে পার্থ রূপাণি শতশোঽথ সহস্রশঃ। নানাবিধানি দিব্যানি নানাবর্ণাকৃতীনি চ।।৫।।**

ভগবান হচ্ছেন ভক্তবৎসল, ভক্তের উপর তাঁর অহেতুক কৃপা। যখন গিরিশ ঘোষ ঠাকুরকে একদিন নেশার ঘোরে খুব গালমন্দ করেছেন, তখন সবাই ভাবছেন ঠাকুর এবার গিরিশকে নিয়ে কি করবেন। ঠাকুর কিন্তু গিরিশ ঘোষকে ক্ষমা করে দিয়ে তাঁর বাড়িতে গিয়ে দেখা করতে নিজেই সশরীরের হাজির হয়ে গেলেন। ঠাকুরকে দেখেই গিরিশ ঘোষের দু চোখ বেয়ে অবিরত ধারায় জলধারা নেমে এসে তাঁর বক্ষকে সিক্ত করে দিয়েছে। ক্রন্দন রত আবেগ জড়িত কণ্ঠে গিরিশ ঠাকুরকে বলছেন – প্রভু, আপনি যদি

আমার গালাগালে রেগে গিয়ে আমাকে ত্যাগ করে দিতেন তাহলে আমি মনে করতুম আপনি একজন সাধারণ সাধু মহাত্মা, কিন্তু এর পরেও আপনি যে আমার সব গালাগাল হজম করে আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন, এ জিনিষ ভগবান ছাড়া আর কেউই করতে পারে না। আজ আমি বুঝে গেছি আপনিই সেই ভগবান এই নররূপ ধারণ করে জীবের পরিত্রাণের জন্য অবতীর্ণ হয়েছেন। ভগবানের বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে তিনি সব সময় ভক্তবৎসল। ঠাকুর বলছেন – ভগবান হচ্ছেন সহজ। সহজ মানে, বাচ্চারা যেমন সহজ সরল হয়। বাচ্চাদের কোন কিছুতে আঁট নেই, সবাইকেই জড়িয়ে নেয়। জড়িয়ে নেওয়ার মধ্যেও আঁট থাকবে না, যেটা এক্ষুণি ধরল, কিছুক্ষণ পরেই দুম্ করে সেটাকে তৎক্ষণাৎ ছেড়েও দেবে, কিন্তু ভালোবাসাটা তার কখনই চলে যায় না। কথামৃতে বাচ্চার এই স্বভাবের খুব সুন্দর বর্ণনা আছে, পায়খানা করে শৌচ করে নিজেই সবাইকে দেখিয়ে বেড়াবে, দেখতো আমার পরিষ্কার হয়েছে কিনা। এই কিছু একটা হল তাতেই বন্ধুদের সঙ্গে আড়ি করে দেবে, আবার কিছুক্ষণ পরে গলা জড়িয়ে একসাথে ঘুরবে। কিন্তু বয়স্ক লোককে একটা কিছু খারাপ কথা বলে দিলে সে আর তাকে ছাড়বে না। বাচ্চাদের যেমন কোন কিছুতেই আঁট থাকে না তেমনি বুড়োদের সব কিছুতেই আঁট। ঠাকুর বলছেন সরল না হলে, সহজ না হলে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না, সহজ হওয়া, সরল হওয়া এইটাই, কোন কিছুতে আঁট থাকবে না। যে সহজ সরল হয় তার কোন কিছুতেই, সত্ত্বগুণ, রজোগুণ, তমোগুন কোন গুণেই আঁট থাকবে না, একমাত্র শুদ্ধ নিঃস্বার্থ ভালোবাসাটা থাকবে। ভগবান হচ্ছেন ত্রিগুণাতীত, সত্ত্ব, রজো ও তমো কোন গুণের আঁট নেই। শ্রীকৃষ্ণের অবতারে অর্জুনের প্রতি ভগবানের বিশেষ ভালোবাসা, যেমন শ্রীরামকৃষ্ণ অবতারে নরেনের প্রতি ভগবানের বিশেষ ভালোবাসা।

দশম অধ্যায়ে একটি শ্লোকে আগেই অর্জুন বলছিলেন যে আপনাকে দেবতারা, ঋষিরা, দৈত্য, দানব, মানুষ কেউই জানতে পারেনা, তারপরেই এখানে কৃতাঞ্জলী হয়ে ভগবানকে বলছেন *মন্যসে যদি তচ্ছক্যং ময়া দ্রষ্টুমিতি প্রভো*, হে প্রভু আপনি যদি মনে করে আপনার এই অব্যয়, অবিনাশী জগদাত্মিকা রূপ দেখার আমি যোগ্য তাহলে একবারটি আমাকে দেখান না। শুনেই ভগবান বলছেন – ঠিক আছে, তুমি যখন দেখতে চাইছ আমি তোমাকে আমার শত শত হাজার হাজার রূপ দেখাচ্ছি। এখানে শত শত হাজার হাজার বলতে যে কোন সংখ্যার হতে পারে। *নানাবিধানি দিব্যানি নানাবর্ণাকৃতীনি চ*, এই অসংখ্য রূপের কোনটাই জাগতিক রূপ নয়, সবটাই দিব্য রূপ, যে রূপগুলো এই পৃথিবীতে চর্মচক্ষু দিয়ে দেখা যায় না। আর কি দেখবে? *নানাবর্ণাকৃতীনি চ*, নানান রকমের রঙের, নানান রকমের আকৃতি বিশিষ্ট আমার দিব্য রূপ। এই রূপের মধ্যে তুমি কি কি দেখবে?

**পশ্যাদিত্যান্ বসূন্ রুদ্রানশ্বিনৌ মরুতস্তথা। বহূন্যদৃষ্টপূর্বাণি পশ্যাশ্চর্যাণি ভারত।।৬।।**

আমার এই দিব্য রূপের মধ্যে তুমি দ্বাদশ আদিত্য, অষ্টবসুদের, একাদশ রুদ্র, অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে, ঊনপঞ্চাশ জন বায়ুদেবতাদের দর্শন করতে পারবে। আর কি দেখবে? *অদৃষ্টপূর্বাণি পশ্যাশ্চর্যাণি*, যেসব আশ্চর্যময় রূপ আগে কেউ কখন দেখেনি সেগুলো তুমি দেখতে পারবে। কারা আগে দেখেনি? মনুষ্যলোকে কেউই কখন কোন দিন এইসব রূপ দেখেনি, কিন্তু আমি তোমাকে দেখাচ্ছি। কারণ আমি ভগবান আর ভক্তবৎসল বলে তোমাকে দেখাচ্ছি। ঠাকুর খুব সুন্দর করে বলছেন – একটা বাচ্চা ছেলে ধুতি বগলে করে ঘুরছে, একজন বলছে আমাকে ধুতিটা দেবে, বাচ্চাটি বলছে না আমি দোবো না, আমার বাবা আমাকে এনে দিয়েছে। আবার একজন একটা এক পয়সার পুতুল দিতেই সে ধুতিটা খুলে তাকে দিয়ে দেবে, তার কোমরে কাপড় আছে কি নেই সেটারও খেয়াল নেই। শ্রীমাও বলছেন, ভগবান হচ্ছেন বালক স্বভাব, কাকে দিয়ে তিনি যে কি করাবেন কিছু বলার জো নেই। অথচ আমরা যখন কোন দর্শন দিয়ে যাব, সাংখ্য বলুন, যোগ বলুন, বেদান্ত বলুন তখন আবার ভগবানের এই বালক স্বভাবের পেছনে যুক্তিকে হাতড়াবো। কিন্তু এই এখন আমরা এখানে অনেক লোক বসে আছি, আমাদের মধ্যে কারুকে ভগবান একটু কৃপা করে দিলেন, তখন তো বাকিরা ভাববে আমার সাধনা করার কি দরকার, ভগবানের কৃপা হলে তিনি নিজেই দেবেন, এরপর তো কেউ কিছুই করবে না। এটাকে আটকাবার জন্যই বিভিন্ন যুক্তিকে দাঁড় করান হয়। ভগবান যার উপর খুশি কৃপা করবেন ঠিকই বলছেন, কিন্তু আধ্যাত্মিক ইতিহাসে আজ পর্যন্ত দেখা যায়নি যার মন অপরিষ্কার, নোংরা তার উপর ভগবান কৃপা করেছেন। এখন আবার কেউ বলতে পারেন নোংরামিটা কি ব্যাখ্যা করুন। এটাও সত্যি যে নোংরামি কাকে বলে ব্যাখ্যা করা খুব কঠিন। শ্রীকৃষ্ণ যেমন বলছেন, সবাইকে মেরে দিলেও আমার কিছু আসে যায় না, কারণ তিনি অনাসক্ত। কিন্তু আমরা এই কথা বলতে পারব না, কারণ আমরা এখনও অনাসক্ত হতে পারিনি। কিন্তু আমাদের জন্য, শাস্ত্রে যেটা বলা হয়েছে, শাস্ত্রবিহিত সাধনা অনেক দিন করতে করতে একটা সময়ের পর ভগবান কার উপর যে কৃপা করবেন কোন ঠিক নেই। আমাদের যে আধ্যাত্মিক ইতিহাস, বেদ, উপনিষদ, বাল্মীকি রামায়ণ, মহাভারতে আজ পর্যন্ত যেটা লিপিবদ্ধ হয়ে আছে তাতে অর্জুনকেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রথম তাঁর বিশ্বরূপকে দেখিয়েছিলেন। এইসব বলার পর ভগবান বলছেন আর কি কি দেখবে?

**ইহৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং পশ্যাদ্য সচরাচরম্। মম দেহে গুড়াকেশ যচ্চান্যদ্ দ্রষ্টুমিচ্ছসি।।৭।।**

হে অর্জুন, তোমার মনে বার বার পঞ্চাশ রকমের প্রশ্ন ঘুরছে যে আমি এই যুদ্ধে জিতব কি হারব, মরব কি মারব, পাপ হবে কি হবে না। কিন্তু এইবার আমার এই যে রূপ, আর এই বিরাট যে শরীর, এই শরীরের মধ্য যখন চর অচর সব দেখে নেবে

তোমার এই নানান রকমের প্রশ্নগুলো চিরদিনের মিটে যাবে। যা কিছু জগতে আছে তা এই একটি শরীরের মধ্যে *একস্থং*, বসে আছে, এই মাইক্রোফোন, এই বোতল থেকে শুরু করে সবটাই এই *একস্থং* শরীরের মধ্যে দেখতে পারবে। এই একটি শরীরের মধ্যে চর অচর যা কিছু আছে সব কিছুকে দেখে নেবে তখনই ঠিক ঠিক বুঝতে পারবে যে ঠাকুরের ইচ্ছাতেই সব হয়। এখানে দুটো জিনিষ দেখা যাচ্ছে, আমি এই দৃশ্যকে দেখছি আবার আমি নিজেকেও ওই দৃশ্যের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি। আমি যে মারামারি করব, মারামারি করছি সবটাই দেখতে পাচ্ছি। যতক্ষণ বিশ্বরূপ দর্শন না হয় ততক্ষণ ঈশ্বরের উপর সত্যিকারের পাঁচ সিকে পাঁচ আনা বিশ্বাস হয় না। আর যতক্ষণ না আমি জাতিস্মর না হচ্ছি, আমার পূর্ব পূর্ব জন্মকে না দেখছি ততক্ষণ কিন্তু জন্ম-মৃত্যুর উপর বিশ্বাস হয় না। জন্মান্তর, ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ দর্শন না হলে ঠিক ঠিক বিশ্বাস হয় না। ভগবান অর্জুনকে বলছেন, এইবার তুমি সব প্রত্যক্ষ দেখ। প্রত্যক্ষ দেখার পর তুমি বুঝতে পারবে ভগবানের ইচ্ছাতেই সব হয়। এর সাথে আমাদের মাথায় রাখতে হবে বিশ্বরূপ দর্শন হওয়া মানে মুক্তি হয়ে যাওয়া নয়। ভগবানের বিশ্বরূপ দর্শন করার পরেই অর্জুনের কিন্তু মুক্তি হয়নি। বিশ্বরূপ দর্শনের সাথে মুক্তির কোন সম্পর্ক নেই। আধ্যাত্মিক সাধনার জগতে অনেক রকমের দর্শন হতে পারে, এই সব দর্শনের সাথে মুক্তির কোন যোগ নেই। অর্জুনকে ভগবান বলছেন, জগতকে নিয়ে, ঈশ্বরকে নিয়ে তোমার যত রকমের সংশয় আছে সব এইখানে এসে কেটে যাবে।

আমি যদি বলি এই হাত দিয়ে দেখাও তো এই বিল্ডিংটা কত বড়, এই হাত দিয়ে বোঝান যাবে না। এই হাত দিয়ে আমি বোতলটা ধরতে পারি, কিন্তু এই হাত দিয়ে বিল্ডিংটাকে ধরতে পারব না, কারণ বিল্ডিংএর তুলনায় হাতটা ছোট। সেইজন্য ভগবান বলছেন –

**ন তু মাং শক্যসে দ্রষ্টুমনেনৈব স্বচক্ষুষা। দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্।।৮।।**

হে অর্জুন, তোমার এই চর্মচোখ দিয়ে আমার এই দিব্য বিশ্বরূপ দর্শন করতে পারবে না। ঠিক তেমনি এই কর্ণ দিয়ে ঈশ্বরের কথা শ্রবণ করা যায় না। আধ্যাত্মিক সাধনা করতে করতে সাধকের আলাদা একটা শরীর তৈরী হয়। মূল কথা হল, এই চর্ম চক্ষু দিয়ে ঈশ্বরীয় কোন রূপের দর্শন হয় না, ঠাকুর এটা অনেকবার বলেছেন, যিশুও বলেছেন। এই কাঁচা আমির যতক্ষণ না বিনাশ হচ্ছে ততক্ষণ কিছুই হবে না। এই নিয়ে অনেকে অনেক ধরণের ভুল ধারণা করে থাকেন, অনেকে মনে করেন আমি যদি ঠাকুরের নাম করতে করতে গঙ্গায় ঝাঁপ দিই তাহলে আমার মুক্তি হয়ে যাবে। কিছুই হবে না, ঠাকুর বলছেন মরে গিয়ে প্রেতনী হবে। আত্মজ্ঞান যতক্ষণ না হচ্ছে ততক্ষণ কিছুই হবে না। আমরা ভাবি মরার সময় ঈশ্বরের নাম করতে করতে মরলে আমরা মুক্ত হয়ে যাবে, কিন্তু তাতে কিছুই হবে না, মৃত্যুর সময় প্রাণ চিন্তাটা এসে যায়, প্রাণ চিন্তা এসে গেলে আর কিছু করার থাকে না। এই চর্ম শরীর দিয়ে হবে না। তাই ভগবান অর্জুনকে বলছেন, এই চর্ম চক্ষু দিয়ে তুমি এই বিশ্বরূপ দেখতে পারবে না বলে আমি তোমাকে দিব্য চক্ষু দিচ্ছি। এই দিব্য চক্ষু দিয়ে কি হবে? *পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্*, আমার যে ঐশ্বর্যপূর্ণ ঐশ্বরীয় যোগশক্তিকে তুমি অবলোকন করতে পারবে। এতক্ষণ ছিল ভগবানের বিভূতি যোগ এবার ঐশ্বর্যযোগ, পরিষ্কার তুমি এখন চোখের সামনে দেখতে পারবে। দশম অধ্যায়ে শুধু বর্ণনা করে গেছেন, কিন্তু বর্ণনা শুনে তো কিছু হবে না, এখন তুমি সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ ভাবে দেখ।

এতক্ষণ অর্জুন আর শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে কথা চলছিল, এরপরে কাহিনীটা আবার সঞ্জয়ের কাছে ফেরত চলে গেছে। এবার সঞ্জয় বর্ণনা করতে শুরু করলেন। দুজনের মধ্যে কথাবার্তা চলছিল, একটা একঘেঁয়েমি যাতে না হয় সেটাকে কাটাবার জন্য সঞ্জয় কাহিনীর মধ্যে ঢুকে পড়লেন। এটা হচ্ছে ব্যাসদেবের সাহিত্য রচনার একটা শৈলী। প্রথমে ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়ের কাছে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের বর্ণনা প্রথম থেকে শুনতে চেয়েছিলেন। সঞ্জয় অর্জুনের মানসিক অবস্থার বর্ণনা আর শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে যেভাবে যত উপদেশ দিয়ে গেছেন সব বর্ণনা করে বলে গেলেন। এখানেও অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে পরস্পর যা যা কথাবার্তা হয়েছে সব বলে বলছেন – হে রাজন্, শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে যে তাঁর বিশ্বরূপ দেখিয়েছিলেন, আমি যা দেখেছিলাম সেটা আপনাকে বলছি –

সঞ্জয় উবাচ

**এবমুক্ত্বা ততো রাজন্ মহাযোগেশ্বরো হরিঃ। দর্শয়ামাস পার্থায় পরমং রূপমৈশ্বরম্।।৯।।**

শ্রীকৃষ্ণকে বলা হয় মহাযোগেশ্বর, যোগে যিনি মহান। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান নারায়ণ, ভগবান ছাড়া মহাযোগী আর কাউকে বলা হয় না, সেইজন্য শিবকেও বলা হয় মহাযোগী। মহাযোগী মানে একেবারে যোগে সর্বদা অবস্থিত। সঞ্জয় বলছেন, হে ধৃতরাষ্ট্র, এই রকম বলার পর শ্রীকৃষ্ণ, যিনি ভগবান নারায়ণ, তিনি *দর্শয়ামাস পার্থায় পরমং রূপমৈশ্বরম্*, ভগবান তাঁর অলৌকিক ঐশ্বর্যময় রূপ অর্জুনকে দেখালেন। হিন্দী বেল্টে অনেক জায়গায় এখানে ভগবানের বিশ্বরূপের যে বর্ণনা দেওয়া আছে সেই রকম ছবি পাওয়া যায়, অনেকে দেখে ভয়ও পান। গীতা প্রেস থেকেও এই বর্ণনাকে আধার করে ছবি ছাপা হয়েছে, কিন্তু এখানে যে ভাবে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে ঠিক ঠিক এই রূপটাকে ছবির মধ্যে ফুটিয়ে তোলা খুব কঠিন, কোন শিল্পী এই বর্ণনাকে ছবিতে আনতে পারবে কিনা বলা মুশকিল। খ্রীশ্চানদের মধ্যে নোয়জাদ বলে একটা ছবি আছে, এই ছবিটাকে খ্রীশ্চানরা বলে খুব জটিল ছবি কিন্তু বিশ্বরূপের

বর্ণনার ধারে কাছেও সেই ছবিকে রাখা যাবে না। বিশ্বরূপের বর্ণনার উপর একটাই ছবি নানা জায়গায় পাওয়া যায়, কিন্তু গীতার বর্ণনানুযায়ী ছবিতে বিশ্বরূপকে ফুটিয়ে তোলা অত্যন্ত কঠিন বলে এই ছবিটিও ঠিক সেই মাত্রায় যেতে পারেনি। বিশ্বরূপের বর্ণনা দিয়ে সঞ্জয় বলছেন –

**অনেকবক্ত্রনয়নমনেকাদ্ভুতদর্শনম্। অনেকদিব্যাভরণং দিব্যানেকোদ্যতায়ুধম্।।১০।।**

এই বিশ্বরূপের এক সঙ্গে অনেক গুলো মুখ সেইজন্য অনেক চোখ। এখানে কোন অসুরের বর্ণনা করা হচ্ছে না, ভগবানের বিশ্বরূপের বর্ণনা চলছে। তাই অনেক মুখ যখন আছে স্বাভাবিক ভাবে তার সাথে অনেক নয়নও থাকবে, এখানে বর্ণনাকে কবিত্বময়ের পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এমন এক দৃশ্যের অবতারণ করা হয়েছে যে এই রকম দৃশ্য এর আগে দেখাই যায়নি, সবটাই অদ্ভুত। এই বিশ্বরূপের সমস্ত অঙ্গে কত রকমের যে দিব্য আভূষণ বলে শেষ করা যাবে না। এখন যিনি বিশ্বরূপের ছবি আঁকবেন তিনি কত অলঙ্কারের কথা চিন্তা করবেন, আমরাতো মুষ্টিমেয় কয়েকটি অলঙ্কারের ডিজাইনের বাইরে চিন্তা করতেই পারব না। *দিব্যানেকোদ্যতায়ুধম্*, এই বিশ্বরূপে সহস্র সহস্র যে হাত রয়েছে তার সব হাতে যত অস্ত্র আছে সবই দিব্য অস্ত্র। বাল্মীকি রামায়ণে এই ধরণের অনেক দিব্যাস্ত্রের বর্ণনা পাওয়া যায়, বিশ্বামিত্র শ্রীরামচন্দ্রকে অনেক দিব্যাস্ত্র দিয়েছিলেন। অগস্ত্য মুনিও এমন অনেক দিব্যাস্ত্র দিয়েছিলেন যার মধ্যে একটা দিব্যাস্ত্র যার উপর ছাড়া হবে তাকে বধ করে আবার ফিরে আসবে, আবার একটাই বাণ নিক্ষেপ করা হয়েছে কিন্তু যখন লক্ষ্যের দিকে ধাবিত হতে থাকবে তখন ঐ একটা বাণই শত শত বাণে বিস্তার হয়ে যাবে। কোন একটা বিশেষ কাজের জন্য দিব্যাস্ত্রকে প্রয়োগ করা হত। এই বিশ্বরূপ যে হাজার হাজার অস্ত্র ধারণ করে আছেন তার সব কটিই দিব্যাস্ত্র।

**দিব্যমাল্যাম্বরধরং দিব্যগন্ধানুলেপনম্। সর্বাশ্চর্যময়ং দেবমনন্তং বিশ্বতোমুখম্।।১১।।**

যে মালা ও বস্ত্র পরিধান করে আছেন সবই দিব্য বস্ত্র ও দিব্য মালা, অঙ্গে যে সকল অঙ্গরাগ দেওয়া হয়েছে সেই অঙ্গরাগও দিব্য। *সর্বাশ্চর্যময়ং দেবম্*, সমস্ত ব্যাপারটাই যেন একটা আশ্চর্যময়, এই জিনিষ কখন কেউ দেখাতো দূরে থাক কল্পনাতেও আনতে পারবে না। *অনন্তং বিশ্বতোমুখম্*, গীতার এই বিশ্বতোমুখম্ শব্দটা একটু জটিল। এর আগে নবম অধ্যায়ে আছে – *একত্বেন পৃথক্ত্বেন বহুধা বিশ্বতোমুখম্*। বিশ্বতোমুখমের একটা অর্থ হতে পারে যিনি ভগবান তাঁর মুখ সব দিকে আছে। আরেকটা অর্থ হতে পারে, যেটা শঙ্করাচার্যও বলছেন, যত জীব আছে সবারই আত্মা তিনি, তাই যত গুলো মুখ আছে সবটাই তিনি, এইটাই *বিশ্বতোমুখমের* সঠিক অর্থ। সব কিছুকে একসাথেই দেখা যাচ্ছে, শ্রীকৃষ্ণকেও দেখা যাচ্ছে আবার শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে আবার *বিশ্বতোমুখম্ও* দেখা যাচ্ছে। এটা তো হয় না, এক সঙ্গে এক দেখছি আবার বহুও দেখছি, দুটো একসাথে হয় না। এই ধরণের একটা ডায়াগ্রাম দেখা যায় যাতে একটা ছোট সাইজের ফুলকে সাজিয়ে সাজিয়ে ঠিক ঐ ফুলেরই মত একটা বিরাট ফুল বানিয়ে দেওয়া হয়, কোলাজ্ যে ভাবে করা হয় ঠিক সেইভাবে অনেক ছোট ছোট ফুল দিয়ে ঐ ফুলেরই একটা বিরাট ফুল বানান হয়। যদি এইভাবে একটা পদ্মফুল বানান হয় তখন একটা বড় পদ্মফুলও দেখা যাবে আর তার সাথে হাজার হাজার ছোট পদ্মফুলও একসাথে দেখা যাবে। শ্রীকৃষ্ণ এক, শ্রীকৃষ্ণরই ছোট ছোট শরীর দিয়ে ঐ একটা শ্রীকৃষ্ণ হয়েছেন, *বিশ্বতোমুখম্* অনেকটা এই ধরণের হবে। তারপর সঞ্জয় বলছেন –

**দিবি সূর্যসহস্রস্য ভবেদ্ যুগপদুত্থিতা। যদি ভাঃ সদৃশী সা স্যাদ্ ভাসস্তস্য মহাত্মনঃ।।১২।।**

পৃথিবীর আকাশে একটাই সূর্য তাতেই সারা পৃথিবী আলোয় ঝলমল করে, গরমকালে সূর্যের তেজে সবাই ত্রাহি ত্রাহি অবস্থা হয়। সেই সূর্য যদি মেঘে ঢাকা থাকে তাও পৃথিবীতে আলোর ঘাটতি হয় না, সেই আলোতেই আমরা সব কাজ করতে পারি। এখন অন্তরীক্ষে যদি এই রকম হাজারটা সূর্য এক সঙ্গে জ্বলে ওঠে তখন যে আলোর দ্যুতি হবে তার সাথে এই বিশ্বরূপের দ্যুতির সামান্য একটু তুলনা করা যেতে পারে।

ম্যানহাটন প্রজেক্টের এ্যটমিক রিসার্চের প্রধান ছিলেন রবার্ট ওপেনহ্যাইমার। আণবিক বোমার প্রথম পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ করা হয়েছিল খুব ভোরবেলা। মরুভূমির মত এক বিরাট অঞ্চলে এই পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণটা ঘটান হয়েছিল। তার আগে বিশাল জায়গাটাকে ঘিরে রাখা হয়েছিল। বিজ্ঞানীরা জানতেন যে বিস্ফোরণ হওয়ার সাথে সাথে সাত আট কিলোমিটার জুড়ে আণবিক বিকিরণ ছড়িয়ে পড়বে। যেখানে পরীক্ষামূলক ভাবে বিস্ফোরণ করা হয়েছিল সেখান থেকে অনেক দূরে নিরাপদ একটা বিল্ডিং এর মধ্যে বিজ্ঞানীরা পর্যবেক্ষণ করছিলেন। যে তারিখটা বিস্ফোরণের জন্য নির্ধারিত করা ছিল তার কয়েক দিন আগে থেকে প্রচণ্ড বৃষ্টি পড়ছিল, কিন্তু বিজ্ঞানীরা আর অপেক্ষা করতে রাজী ছিলেন না, কারণ জাপানে বোমাটা ফেলতে হবে। ৯ই আগস্ট জাপানের হিরোসিমায় বোমা ফেলা হয়েছিল, তারও এক মাস আগে জুলাই মাসে এই পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ করা হয়েছিল তখন প্রচণ্ড বৃষ্টি পড়ছিল। ভোর ছটার সময় নির্ধারিত হয়ে আছে তখনও সব পুরো অন্ধকারে ঢাকা। কাউন্ট ডাউন শুরু হয়ে গেছে। মজার ব্যাপার হল সেই সময় রেডিওতে একটা গান বাজছিল, রেডিওর ফ্রিকোয়েন্সির সাথে এই কাউন্ট ডাউনের ফ্রিকোয়েন্সি কি করে মিশে যায়। যারা

রেডিওতে গান শুনছিল গানের মধ্যে তারা টেন, নাইন, এইট কাউন্ট ডাউনও শুনতে পাচ্ছিল। আরও মজার বর্ণনা যেটা আছে তাতে বলছে যে, সেদিন মাঝ রাত থেকে টানা বৃষ্টি পড়ে যাচ্ছিল, বৃষ্টির জল ব্যাঙের গর্তে ঢুকে যেতে যত সোনা ব্যাঙ ছিল হাজার হাজার সোনা ব্যাঙ সব গর্ত থেকে বেরিয়ে এসে একসাথে টর্‌র্ টর্‌র্ গ্যাঁগোঁ শব্দ করতে শুরু করে দিয়েছে। এবার হয়েছে কি রেডিও স্টেশন থেকে গান সম্প্রচারিত হচ্ছে, এদিকে কাউন্ট ডাউন চলছে, অন্য দিকে ব্যাঙের আওয়াজ হচ্ছে, তিনটে শব্দ একই ফ্রিকোয়েন্সিতে মিশে গিয়ে এমন এক অদ্ভুত শব্দ তৈরী হল যে কেউ বুঝতেই পারছিল না রেডিওতে কি হচ্ছে। ম্যানহাটনের বিজ্ঞানীরা বুঝতে পারছিলেন কি হচ্ছে। তারপর ওয়ান্ যেই হল যেমনি সুইচটা অন করা হয়েছে বোমাট ফেটে গেল। আণবিক বোমার বিস্ফোরণ হতেই যে প্রচণ্ড আলোর ঝলকানি হয়েছিল সেই দৃশ্য দেখতেই তখন রবার্ট ওপেনহ্যাইমারের মুখ থেকে একাদশ অধ্যায়ের এই শ্লোকটা বেরিয়ে এসেছিল – *দিবি সূর্যসহস্রস্য ভবেদ্ যুগপদুত্থিতা। যদি ভাঃ সদৃশী সা স্যাদ্ ভাসস্তস্য মহাত্মনঃ* – যদি আকাশে সহস্র সূর্যের যুগপৎ উদয় হয় তখন সেই সহস্র সূর্যের যে দীপ্তি হবে ভগবানের জগদাত্মিকা বিশ্বরূপের দীপ্তির তুলনায় তাও সেটাকে ম্লান দেখাবে।

এই আণবিক বোমার প্রথম পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণের যে বর্ণনা পরবর্তি কালে পাওয়া গিয়েছিল তাতে একটা ঘটনার উল্লেখ আছে। এক ভদ্রলোক গাড়ি চালিয়ে তার শ্যালিকাকে নিয়ে ঠিক সেই সময় ভোর বেলা পিয়ানো বাজান শেখাতে নিয়ে যাচ্ছিলেন। শ্যালিকাটি আবার জন্মান্ধ ছিল। হঠাৎ করে মেয়েটি চিৎকার উঠেছে – জামাইবাবু এত আলো কোত্থেকে আসছে, এটা কিসের আলো। বাচ্চা মেয়েটি জন্মান্ধ, জীবনে আলোর কোন রেখা পর্যন্ত দেখেনি, যেখানে বিস্ফোরণ ঘটান হয়েছে তার থেকে অন্ততঃ দশ কিলোমিটার দূর দিয়ে গাড়ি চালিয়ে ভদ্রলোক তার শ্যালিকাকে নিয়ে যাচ্ছিলেন, অত দূর থেকে ঐ আলো যে জন্মান্ধ তারও চোখে এসে ধাক্কা মারছে। ঐ বিস্ফোরণের পর কে কে কি কি দেখেছিল সব রেকর্ড করা হয়েছিল, তার মধ্যে এই জন্মান্ধ মেয়েটির কথাও রেকর্ড করা হয়েছিল। এই হচ্ছে – *দিবি সূর্যসহস্রস্য ভবেদ্ যুগপদুত্থিতা,* হাজারটা সূর্য যেন দুম্ করে আকাশে জ্বলে উঠল। বিশ্বরূপের সাথে তুলনা করার জন্য সহস্র সূর্যের কথা বলা হল, তুলনাত্মক হলেও বিশ্বরূপের দীপ্তি তার থেকে অনেক অনেক বেশি। আসলে জাগতিক কোন কিছু দিয়েই বিশ্বরূপের এই দীপ্তিকে তুলনা করা যাবে না বলে হাজারটা সূর্যের উপমাকে নিয়ে আসা হয়েছে। বিশ্বরূপের ঐ দীপ্তির মধ্যে অর্জুন কি দেখছেন –

**তত্রৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং প্রবিভক্তমনেকধা। অপশ্যদ্দেবদেবস্য শরীরে পাণ্ডবস্তদা।।১৩।।**

তখন অর্জুন সেই বিরাট জগদাত্মিকা বিশ্বরূপের শরীরে এক শ্রীকৃষ্ণকেই দেখছেন, সেই শ্রীকৃষ্ণের একই অবয়বের মধ্যে সমস্ত জগৎকে দেখতে পাচ্ছেন। *প্রবিভক্তমনেকধা,* সেই শরীরে সব পরিষ্কার আলাদা আলাদা ভাবে দেবতাদের, পিতৃগণদের, মানুষ, পশু, গাছপালা সবাইকে দেখতে পাচ্ছেন।

**ততঃ স বিস্ময়াবিষ্টো হৃষ্টরোমা ধনঞ্জয়ঃ। প্রণম্য শিরসা দেবং কৃতাঞ্জলিরভাষত।।১৪।।**

এই বিশ্বরূপ দর্শন করে অর্জুন বিস্ময়ে একেবারে আবিষ্ট হয়ে গেছে। *হৃষ্টরোমা,* শরীরের রোমগুলো দাঁড়িয়ে গেছে, মানে রোমাঞ্চিত হয়ে গেছে। হৃষ্টরোমা এই শব্দটা কথামৃতে অনেকবার উল্লেখ করা হয়েছে, ঠাকুর যখন সমাধিতে চলে যেতেন, সমাধি ছাড়াও যখনই ভাবের উচ্চ অবস্থায় চলে যেতেন তখন ঠাকুরের শরীরের সব রোমকূপ শজারুর কাঁটার মত সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে যেত। অর্জুনেরও এখন সেই অবস্থা, রোমগুলো সব দাঁড়িয়ে গেছে, বিস্ময়ে আবিষ্ট, ভাবে গদগদ হয়ে অবনত মস্তকে বিশ্বরূপধারী ভগবানকে প্রণাম করে করজোড়ে অর্জুন এবার নিজের অনুভূতির কথা, নিজে কি দেখছেন বলতে লাগলেন –

অর্জুন উবাচ

**পশ্যামি দেবাংস্তব দেব দেহে**
**সর্বাংস্তথা ভূতবিশেষসঙ্ঘান্।**
**ব্রহ্মাণমীশং কমলাসনস্থ-**
**মৃষীংশ্চ সর্বানুরগাংশ্চ দিব্যান।।১৫।।**

হে ভগবন্, আমি অবাক হয়ে দেখছি চর অচর, স্থাবর জঙ্গম নানান রকমের যা কিছু আছে, দেবতা, ঋষি, মানুষ, দৈত্য, দানব, ঋষি, সর্পসমূহ, গাছপালা যাবতীয় যা কিছু হতে পারে সবটাই আপনার এই শরীরের মধ্যে বিদ্যমান। শুধু তাই নয়, *ব্রহ্মাণমীশং কমলাসনস্থং,* ব্রহ্মা যিনি প্রপিতামহ, আসলে সবাইকে পিতা বলা হয় আর ব্রহ্মাকে প্রপিতামহ বলা হয়, সৃষ্টি ব্রহ্মার থেকেই এসেছে, সেই ব্রহ্মা সব সময় পদ্মের উপর আসনে উপবিষ্ট। জগৎ স্রষ্টা যিনি সাক্ষাৎ সেই ব্রহ্মাকে কমলাসনে আপনার মধ্যেই বসে আছেন দেখছি। ব্রহ্মা হচ্ছেন সৃষ্টির আদিকর্তা, একই শরীরে দেখছেন সেই ব্রহ্মাও বসে আছেন আর সেই শরীরেই অন্যান্য সব জীব জগৎ সব বসে আছে, দেখে অবাক হওয়ারই তো কথা। সেইজন্য ভগবান ছাড়া বাকি সব কিছুই হচ্ছে নিকৃষ্ট, অসুরলোক যতটা

নিকৃষ্ট দেবলোকও ততটাই নিকৃষ্ট, মানুষযোনি যতটা নিকৃষ্ট দেবতাযোনিও আসলে ততটাই নিকৃষ্ট। কারণ ভগবানের কাছে, ভগবানের যে স্বরূপ সেখানে সবটাই সমান, কোনটারই কোন দাম নেই। অর্জুন আরও কি দেখছেন? *সর্বানুরগাংশ্চ দিব্যান্*, বিশিষ্ট যত ঋষি আছেন, বশিষ্টাদি যত ঋষির নাম শুনেছেন তাঁরাও ঐ বিশ্বরূপের শরীরে বসে আছেন, *উরগান্*, বাসুকির মত সর্পাদিরা সব আপনার শরীরের মধ্যে বসে আছেন।

**অনেকবাহূদরবক্ত্রনেত্রং**
**পশ্যামি ত্বাং সর্বতোহনন্তরূপম্।**
**নান্তং ন মধ্যং ন পুনস্তবাদিং**
**পশ্যামি বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ।।১৬।।**

হে বিশ্বেশ্বর, হে বিশ্বরূপ, হে অনন্তরূপধারী, আপনার সর্বত্র অনেক বাহু দেখতে পাচ্ছি, আপনার কত যে উদর দেখছি, কত যে মুখ, কত যে চোখ দেখছি। আপনার না আছে আদি, না আছে মধ্য, না আছে অন্ত। তার মানে, আপনার মুখ দেখা যাচ্ছে ঠিকই কিন্তু তাই বলে ঐখানেই শেষ হয়ে যাচ্ছে না, আপনার আদি, অন্ত, মধ্য কিছুই বুঝবার উপায় নেই। *পশ্যামি বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ*, হে বিশ্বরূপ, হে বিশ্বেশ্বর আপনাকে আমি এইভাবেই দেখতে পাচ্ছি।

**কিরীটিনং গদিনং চক্রিণঞ্চ**
**তেজোরাশিং সর্বতো দীপ্তিমন্তম্।**
**পশ্যামি ত্বাং দুর্নিরীক্ষ্যং সমন্তাদ্**
**দীপ্তানলার্কদ্যুতিমপ্রমেয়ম্।।১৭।।**

আপনি ভগবান বিষ্ণু কিনা তাই আপনার কিরীট, গদা ও চক্র দেখতে পাচ্ছি। তেজঃপুঞ্জ স্বরূপ আপনি চারিদিক দীপ্তিমান করে রেখেছেন। *দুর্নিরীক্ষ্যং*, আপনার দিকে তাকান যাচ্ছে না, আপনার এমন দীপ্তি আর তেজ যে চোখ ঝলসে যাচ্ছে। আপনার সব কিছুকে যে অবলোকন করব সেটাও সম্ভব হচ্ছ না, এত আপনার দীপ্তি। *দীপ্তানলার্কদ্যুতিমপ্রমেয়ম্*, অনল আর অর্ক, আগুন আর সূর্যকে একসঙ্গে যোগ করে একদিকে আগুন জ্বলজ্বল করছে অন্যদিকে সূর্যও প্রদীপ্ত হয়ে দীপ্যমান হয়ে অপরিচ্ছিন্ন ভাবে জ্বলজ্বল করছে। এই রূপ দেখার পর অর্জুন হতবম্ব হয়ে গেছেন। অর্জুনের এইটাই মূল বক্তব্য, আমরা ছোটবেলা থেকে যা যা শুনে এসেছি সবটাই আপনার মধ্যে অবস্থিত দেখছি আর আপনার সমস্ত কিছুই আগুন আর সূর্যের মত জ্বলজ্বল করছে। এত দিন যাঁকে অর্জুন এক রকম দেখে এসেছেন আজ তাঁর কাণ্ডকারখানা দেখে তাঁর ব্যাপারে মুহূর্তের মধ্যে অর্জুনের ধারণাটাই পাল্টে গেছে। ফিল্ড মার্শাল ম্যানেকশ্ যখন সেনাবাহিনীর জেনারেল ছিলেন সেই সময় একজন আর্মি অফিসারের দুর্নীতি ধরা পড়তে তিনি সেই আর্মি অফিসারকে ডেকে এনে তার দুর্নীতির কথা বলতেই আর্মি অফিসার বলছে – আপনি কি আমাকে দোষী সন্দেহ করছেন? ফিল্ড মার্শাল ম্যানেকশ্ বলছেন – সন্দেহ কেন, আমি সন্দেহাতী যে তুমি হচ্ছ একটা চোর, এক্ষুণি রেজিগনেশান লেটারে সই কর। অর্জুনেরও সব সন্দেহের অবসান হয়ে গেছে, তিনি তাঁর ধারণাটা বলছেন –

**ত্বমক্ষরং পরমং বেদিতব্যাং**
**ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।**
**ত্বমব্যয়ঃ শাশ্বতধর্মগোপ্তা**
**সনাতনস্ত্বং পুরুষো মতো মে।।১৮।।**

ঠাকুরকে পূজা অর্চনাদি করার সময় এই শ্লোকটি মুখস্ত করে ঠাকুরকে উদ্দেশ্য করে বা যার যিনি ইষ্ট তিনি যেই হোন না কেন, সেই ইষ্টকে উদ্দেশ্য করে এই শ্লোকটি আবৃত্তি করলে প্রচুর শক্তি পাওয়া যায়। যখন মনের মধ্যে দুঃখ-কষ্ট হতাশা আসবে, ঠাকুরের প্রতি শরণাগতি আনতে ইচ্ছে হবে তখন খুব করে এই শ্লোকটি পাঠ করতে হবে। অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের ব্যাপারে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হচ্ছেন সেটাকেই প্রার্থনা রূপে তিনি ভগবানকে নিবেদন করে তাঁর ধারণাটাকে অভিব্যক্ত করছেন। গীতার দশম আর একাদশ অধ্যায় হচ্ছে ঠিক ঠিক ভক্তিশাস্ত্র, ভক্তিশাস্ত্র বলতে ঈশ্বরকে ঠিক ঠিক যেভাবে আরাধনা করতে হয়, ঈশ্বরকে স্তুতি করতে হয়ে সেই স্তুতি গুলোই এই দুটি অধ্যায়ে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। পুরো গীতা পাঠ না করলেও এই দুটি অধ্যায়কে নিত্য খুব শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে পাঠ করলেই ভগবানের আরাধনা ও স্তুতি করা হবে। যেমন খণ্ডন ভব বন্ধন, আর ওঁ হ্রীং ঋতম্ এই দুটি আরাত্রিক স্তব হচ্ছে ঠাকুরের ঠিক ঠিক স্তুতি, ঠিক তেমনি দশম আর একাদশ অধ্যায় হচ্ছে ঈশ্বরের স্তুতি। সারাদিনে আমরা অনেক অহেতুক সময় আড্ডা মেরে, টিভি দেখে, ইন্টারনেট ঘেটে, খবরের কাগজ পড়ে, পরনিন্দা পরচর্চা করে প্রচুর সময় নষ্ট করি, এইভাবে সময় নষ্ট না করে এই দুটি অধ্যায়কে নিষ্ঠা সহকারে রোজ দীর্ঘ দিন পাঠ করে গেলে আমাদের ঈশ্বরের প্রতি বিশেষ ভক্তি আসবে, কারণ

এটা হচ্ছে ঈশ্বরের স্তুতি, ঈশ্বরের যে সাক্ষাৎ রূপ যেটা সাধারণ মানুষরা ধারণা করতে পারেনা, সেই অচিন্তনীয় রূপকে আধার করে এইসব স্তুতি করা হচ্ছে। গীতার প্রথম অধ্যায়কে ছেড়ে দিলে, আর এই দুটি অধ্যায় ছাড়া বাকি যে পনেরটি অধ্যায় আমাদের মত সাধারণ জীবের জন্য নয়।

আজকের কাগজেই কঙ্কণ রেলওয়ের যিনি স্রষ্টা আর দিল্লীর মেট্রো রেলের যিনি রূপকার, সত্তর বছরের শ্রীধরণের সম্বন্ধে একটা লেখা বেরিয়েছে। শ্রীধরণকে ভারতের একজন শ্রেষ্ঠ ইঞ্জিনিয়ার বলে গণ্য করা হয়। ওনাকে সাংবাদিকরা জিজ্ঞেস করছেন এই বয়সেও আপনি এতো শক্তি, এতো প্রেরণা কোথা থেকে পান? সাংবাদিকদের শ্রীধরণ বলছেন – এই এনার্জী বা প্রেরণার ব্যাপারে আমি কিছু জানিনা, কোথা থেকে আসছে তাও জানিনা, তবে আমি রোজ সাড়ে চারটের সময় ঘুম থেকে উঠে পড়ি, টানা ধ্যান করি, ধ্যান করার পর গীতা নিয়ে পুরো গীতা সংস্কৃতে রোজ পাঠ করি আর নটার মধ্যে তৈরী হয়ে অফিসের কাজে বসে পড়ি।

জগতে আমার কাছে একজনরেই গুরুত্ব, সে হচ্ছে আমি নিজে। যখন মানুষ নিজের শরীর মনকে অপব্যবহার করে তখন এসে যায় হতাশা। যখন হতাশা এসে যায় তখন সে খোঁজে কেউ যেন এসে তার শরীরকে তোয়াজ করুক মনকে খুশি রাখুক। কিন্তু যে ব্যক্তি শরীর মনকে অপব্যবহার করে না সে জগতকে থোরাই কেয়ার করবে। তখন সে ধর্মে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। ধর্মে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরে কি হয়? ভগবান বুদ্ধ শিষ্যকে বলছেন – সংসারের মধ্য দিয়ে তুমি কি রকম হাঁটবে, যেমন জঙ্গলে গণ্ডার হেটে বেড়ায়, সিংহ নয় গণ্ডার। যে নিজের ধর্মে প্রতিষ্ঠিত সে জগতের কারুকেই থোরাই কেয়ার করতে যাবে। দিল্লীর মেট্রোর কনস্ট্রাকশনের একটা পিলার ভেঙ্গে পড়ে গিয়েছিল, শ্রীধরণ তখন ব্যাঙ্গালোরে। তিনি খবর পেয়েই ছটার ফ্লাইটে দিল্লী পৌঁছে নটার সময় অফিসে গিয়ে সোজা রেজিগনেশন দিয়ে বেড়িয়ে এলেন। দিল্লীর মুখ্যমন্ত্রী দৌড়ে তাঁর হাতেপায়ে ধরলেন রেজিগনেশন তুলে নেওয়ার জন্য। একজন মুখ্যমন্ত্রী সামান্য একজন ইঞ্জিনিয়ারের হাতেপায়ে ধরছেন কেউ ভাবতে পারবে! কেন রেজিগনেশন দিলেন শ্রীধরণ? আমার ত্রুটি থাকতে পারে, যে ভাবে তৈরী হওয়ার কথা সেই ভাবে তৈরী হয়নি। যে অধর্ম করে না তাকে কখনই হতাশা গ্রাস করতে পারবে না, মন খারাপ করে কখনই সে ঘরে বসে থাকবে না। ধর্মটা কি? তোমার যা দেবার, সেটাকে দিয়ে তুমি এগিয়ে যাও, তোমার যেটা প্রাপ্য সেটুকু নিয়েই তৃপ্তিতে ভরপুর হয়ে যাও। আমরা বেশির ভাগ সময়ই শরীর মনকে প্রশ্রয় দিয়ে যাচ্ছি, ভালো বাড়িতে থাকব, ভালো গাড়ি চাপব, ভালো খাওয়া দাওয়া করব, আমাকে লোকে মানবে, সম্মান দেবে। এইগুলোই হল অধর্ম। এই অধর্মগুলো রাতারাতি করতে শুরু করে দেয়নি, বাচ্চা বয়স থেকে শরীর মনকে প্রশ্রয় দিয়ে আসছে। বড় হলেই বলবে আমার যা পাওনা আমি পেলাম না। আমাদের শাস্ত্র সমূহ, গীতা উপনিষদ থেকে শুরু করে মহাভারত সহ যত শাস্ত্র আছে সবাই আমাদের বলে দিচ্ছে তুমি ধর্মে কি করে প্রতিষ্ঠিত থেকে তোমার নিজের পথে এগিয়ে যাবে। আমরা কাজ করছি কেন? কটি পয়সা আয় করার জন্য? কেন পয়সা উপার্জন করছি? নিজের ও বউ ছেলে মেয়ের খাওয়া পড়ার জন্য। এটাই আমাদের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য নয়, জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছ ধর্মলাভ, ধর্মে প্রতিষ্ঠিত থাকা। শ্রীধরণের নামটা এইজন্যই নেওয়া হল যে তিনি তাঁর নিজের জীবনের ব্যাপারে পরিষ্কার, বাকিরা তাঁকে কি বলল, কি না বলল তাতে তাঁর কিছুই যায় আসে না। বাকিরা তো সবাই মৃত্যুধর্মা। নচিকেতা যেমন তাঁর পিতাকে বলছেন – *সস্যমিব মর্ত্যঃ পচ্যতে সস্যমিবাজায়তে পুনঃ,* প্রত্যেক জীবই মরণশীল, শস্যের মতো মানুষ মৃত্যুগ্রস্ত, বিনষ্ট হয়, শস্যের মতোই পুনরায় জন্মা।

এই শ্লোকে বলছেন, *ত্বমক্ষরং পরমং,* আপনার কখন ক্ষয় হয় না, আপনি অব্যয়, অবিনাশী আপনি পরব্রহ্ম। বেদিতব্যম্, মুমুক্ষু যাঁরা, সন্ন্যাসী যাঁরা, যাঁরা জ্ঞানী তাঁরা কাকে জানবার জন্য সন্ন্যাসব্রত নিয়েছেন? আপনাকেই জানবার জন্য। শুধু আপনাকে জানতেই তাঁরা ইচ্ছুক, সা চাতুরি চাতুরি, সেইটাই চাতুরি যে চাতুরিতে আপনাকে জানা যায়। *বেদিতব্যম্,* জানার মধ্যে একটাই বস্তু, ঈশ্বরই একমাত্র *বেদিতব্যম্*। *ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্,* যেটার উপর কোন জিনিশকে রাখা হয় সেটাকে নিধান বলা হয়। ভগবান হচ্ছেন একমাত্র আশ্রয় ও আধার। এই জলটা কোথায় আছে? বোতলে আছে। বোতলটা কোথায় আছে? টেবিলে আছে। টেবিলটা কোথায় আছে? মেঝেতে আছে। মেঝেটা কোথায় আছে? মাটিতে আছে। মাটিটা কোথায় আছে? পৃথিবীতে আছ। পৃথিবী কোথায় আছে? সৌরমণ্ডলে আছে। সৌরমণ্ডলটা কোথায় আছে, এই যে এতগুলো নিধান বলা হচ্ছে, কিন্তু আপনি হচ্ছে *পরং নিধানম্,* আপনিই একমাত্র আশ্রয়, আধার। *ত্বমব্যয়ঃ,* আপনি অব্যয়, *শাশ্বতধর্মগোপ্তা,* আপনি এই সনাতন ধর্মের রক্ষক। *সনাতনস্ত্বং পুরুষো মতো মে* – আপনিই হলেন সনাতন পুরুষ, এইটাই আমার মত।

**অনাদিমধ্যান্তমনন্তবীর্য-**
**মনন্তবাহুং শশিসূর্যনেত্রম্।**
**পশ্যামি ত্বাং দীপ্তহুতাশবক্ত্রং**
**স্বতেজসা বিশ্বমিদং তপন্তম**।।১৯।।

হে ভগবান, আপনার কোন আদি, মধ্য ও অন্ত নেই। *অনন্তবীর্যম্*, আপনার সামর্থ অনন্ত, বীর্য মানে করার সামর্থ, অনন্তশক্তিশালী। *অনন্তবাহুং শশিসূর্যনেত্রম্*, আপনার অনন্ত বাহু, অর্থাৎ আপনার অনন্ত ক্ষমতা, চন্দ্র ও সূর্য আপনার চক্ষু। *পশ্যামি ত্বাং দীপ্তহুতাশবক্ত্রং*, আপনার মুখমণ্ডলের যে জ্যোতি তা যেন আগুনের ন্যায় দীপ্যমান। *স্বতেজসা বিশ্বমিদং তপন্তম্*, আপনার নিজের তেজের তাপে সমস্ত জগৎ সন্তপ্ত হচ্ছে। কেননা যাঁর চোখ চন্দ্রমা আর দিবাকর, মুখ যাঁর অগ্নি, সেই তেজ থেকে সারা বিশ্ব তাপিত হবে এতে আর আশ্চর্য কি!

**দ্যাবাপৃথিব্যোরিদমন্তরং হি**
**ব্যাপ্তং ত্বয়ৈকেন দিশশ্চ সর্বাঃ।**
**দৃষ্ট্বাঽদ্ভুতং রূপমুগ্রং তবেদং**
**লোকত্রয়ং প্রব্যথিতং মহাত্মন্।**।২০।।

আমরা মা কালীর যে রূপের বর্ণনা করি, এই রূপটাই যখন শ্রীকৃষ্ণের উপর আরোপিত হবে তখন এই শ্লোকটি তার উপযুক্ত বর্ণনা হবে। আমরা কৃষ্ণ বলতে বুঝি বৃন্দাবনে বাঁশি বাজিয়ে গোপিদের সাথে লীলা করে বেড়াচ্ছেন। শ্রীকৃষ্ণের এই রূপটুকুই সব নয়। কৃষ্ণ আর কালী যে এক, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এই রূপ তারই সাক্ষ্য দিচ্ছে। কি রকম সেই রূপ? *দ্যাবাপৃথিব্যোরিদমন্তরং হি ব্যাপ্তং ত্বয়ৈকেন দিশশ্চ সর্বাঃ*, নীচে এই পৃথিবী, উপরে সেই স্বর্গ মাঝখানে যে অন্তরীক্ষ, এই সমগ্রটাই আপনাকে নিয়ে ব্যপ্ত হয়ে আছে, পুরোটা আপনিই ছেয়ে আছেন, আপনি ছাড়া আর কিছু নেই। *দৃষ্ট্বাঽদ্ভুতং রূপমুগ্রং তবেদং*, আপনার এই রূপটি হচ্ছে উগ্ররূপ, তাই *লোকত্রয়ং প্রব্যথিতং মহাত্মন্*, আপনার এই উগ্ররূপ সন্দর্শনে তিনটে লোক ভয়ে কাঁপছে। ভাগবতে ভগবান যখন নৃসিংহ রূপ ধরেছিলেন তখন রাগে তাঁর কেশর, থাবার নখ, শরীর সব লোম এমন কাঁপছিল তাই দেখে সমস্ত জগতও ভয়ে থরহরি হয়ে কম্পমান হয়ে গিয়েছিল। ভগবানের এই উগ্ররূপের সামনে কে দাঁড়াবে! এখন যে ব্যাপক হারে মানুষ অধর্মের দিকে চলে গিয়ে ভোগে লিপ্ত হচ্ছে, যে ভাবে অনাচার বেড়েই চলেছে ভগবানের এই উগ্ররূপ এলো বলে, খুব বেশি দেরী নেই। এখন যা পরিস্থিতি, ভগবানের এই উগ্ররূপের দিকে এগোচ্ছে। যখন জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার প্রচণ্ড বেড়ে যায় তখন রোগ শোকে বেশি লোকক্ষয় হয় না, একটা বড় সড় যুদ্ধই লোকসংখ্যাকে নামিয়ে দেবে।

**অমী হি ত্বাং সুরসঙ্ঘা বিশন্তি**
**কেচিদ্ভীতাঃ প্রাঞ্জলয়ো গৃণন্তি।**
**স্বস্তীত্যুক্ত্বা মহর্ষিসিদ্ধসঙ্ঘাঃ**
**স্তুবন্তি ত্বাং স্তুতিভিঃ পুষ্কলাভিঃ।**।২১।।

এই রূপ হচ্ছে ভয়ঙ্কর, কোন চিত্রকর যদি এই শ্লোকটাকে রঙ তুলি দিয়ে ফোটাতে চায় সে হাঁকপাক করতে থাকবে। *অমী হি*, যারা কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে যুদ্ধ করতে নেমেছে, *সুরসঙ্ঘা*, মনুষ্যদেহধারী দেবতারা। মহাভারতে উল্লেখ আছে যে দেবতারা যারা মানব দেহধার ধারণ করে জন্ম নিয়েছিলেন তাঁরা পাণ্ডবদের পক্ষ অবলম্বন করে যুদ্ধ করেছিলেন, যেমন ধৃষ্টদ্যুম্ন যজ্ঞ থেকে জন্ম নিয়েছিলেন। অন্য দিকে অসুররা যারা জন্ম নিয়েছিল তারা কৌরবদের হয়ে যুদ্ধে অংশ নিয়েছিল। বাল্মীকি রামায়ণে দশরথ যখন পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করছিলেন তখন বিষ্ণু এসে দেবতাদের বললেন আমি রামের অংশে জন্ম নিচ্ছি তোমরা সবাই বানর, ভল্লুক হয়ে জন্ম নিতে থাক, রাবণ বধের সময় তোমরা সবাই শ্রীরামচন্দ্রকে সাহায্য করবে। পরে হনুমান যেমন বায়ু দেবতার অংশ থেকে জন্ম নিয়েছিলেন, সেই রকম অন্যান্য দেবতাদের অংশ থেকে সবাই বানর ও ভাল্লুকের মধ্যে জন্ম নিয়েছিলেন। ভারতে যত শাস্ত্র আছে আর সমস্ত শাস্ত্রের মধ্যে বিভিন্ন যে ধারণাগুলো পাওয়া যায় তার বীজগুলোকে বাল্মীকি রামায়ণের মধ্যেই পাওয়া যাবে, সেই কারণে বাল্মীকি রামায়ণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শাস্ত্র। বাল্মীকি রামায়ণ আগে যদি ভালো করে পড়া থাকে তাহলে অন্যান্য শাস্ত্র বুঝতে অসুবিধা হবে না। অসুরের অংশ থেকে জন্ম নিয়েছে বলে যে তারা যে শাস্ত্র পড়বে না, যজ্ঞ করবে না, তপস্যা করবে না, তা নয়। অসুর মানে তাদের প্রাণ শক্তিটা বেশি। যখন কারুর সাথে স্বার্থের বিবাদ হয় তখন ওরা প্রাণশক্তির উপর বেশি নির্ভর করে, মানে দেহ আর ইন্দ্রিয়ের শক্তির দিকে বেশি চলে যায়। অসুররাও শাস্ত্রাদি ভালো মতই জানত। ইন্দ্র দেবতাদের রাজা আর বিরোচন অসুরদের রাজা, দুজনেই ব্রহ্মার কাছে শাস্ত্র অধ্যয়ণ করতে গিয়েছিল। ইংল্যাণ্ড, আমেরিকার লোকেরাও শাস্ত্র পড়ে, তারা তো বাইবেল পড়ছে, জেহাদীরাও শাস্ত্র পড়ে, কারণ কোরান তো শাস্ত্রই। তাহলে গোলমালটা কোথায়? যখন স্বার্থের সংঘাত হয় তখন এরা শাস্ত্রকে অবলম্বন না করে প্রাণশক্তি মানে দেহ আর ইন্দ্রিয় শক্তিকে অবলম্বন করে।

এই শ্লোকে অর্জুন বলছেন, পৃথিবীর ভার হরণ করার জন্য বসু আদি এনারা শরীর ধারণ করে যুদ্ধ করতে নেমেছেন। কৌরবদের দিকেই যে সব অসুররা আছেন তা নয়, দ্রোণাচার্য আছেন, ভীষ্মদেব আছেন, ভীষ্ম হলেন অষ্টবসুদের একজন। এরা বেশির ভাগই কি করছে? সবাই আপনার মধ্যে প্রবেশ করে যাচ্ছে। *কেচিদ্ভীতাঃ প্রাঞ্জলয়ো গৃণন্তি*, অনেক আবার প্রাণের ভয়ে

হাতজোড় করে আপনারই গুনগাণ করছে, মৃত্যুভয় সাংঘাতিক। ভগবান বুদ্ধ বলছেন, প্রাণী মাত্রই মৃত্যুভয়ে সর্বদা তটস্থ, মৃত্যুভয়কে কেউ এড়াতে পারে না, তাই জীবহত্যা করো না। একটা মাছকে ধরতে গেলে মৃত্যুভয়ে সেও পালিয়ে বেড়ায়। দেবতারা পর্যন্ত হাতজোড় করে শ্রীকৃষ্ণের ঐ বিশ্বরূপের সামনে দাঁড়িয়ে স্তুতি করছে।

এখানে কি হচ্ছে, যারা যুদ্ধ করতে এসেছে তাদের অনেকেই শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে, কিভাবে ঢুকে যাচ্ছে পরে তাও বলবেন। আবার অনেকে ভয়ে কাঁপছে। মিলিটারির এক ব্রিগেডিয়ারের মুখ থেকে খুব সুন্দর কয়েকটি কথা শোনা গিয়েছিল। ব্রিগেডিয়ারকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল এটা কি ঠিক যে শুধু শিখরাই খুব সাহসী ও ভালো সৈনিক হয়? এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলছেন – এটা অনেকেরই ভুল ধারণা যে শিখরাই শুধু ভালো মিলিটারি পার্সোনাল হয়, আসলে every man by nature is coward, প্রত্যেকটি মানুষই স্বাভাবিক ভাবে কাপুরুষ, আর মৃত্যুকে সবাই ভয় পায়। আমরা মনে করি বিহারী, বাঙ্গালী, তামিল, পাঞ্জাবী সবাই মিলিটারিতে আলাদা আলাদা মনোভাবের হয়ে থাকে, কিন্তু এরা সবাই যখন মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে আছে বুঝতে পারে তখন সবাই ভয় পায়। এই ভয়টা যাতে না হয় তাই আগে থাকতেই অনেক রকম ট্রেনিং দেওয়া হয়, কিন্তু যতই ট্রেনিং দেওয়া হোক না কেন, যখন বুঝে যায় যে আমাকে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়াতে হয়েছে তখন সবাইকেই এই মৃত্যু ভয় আচ্ছন্ন করে দেয়। এখানে এইভাবে কোন পার্থক্য করা যাবে না, শিখরা কম ভয় পায় আর তামিলরা বেশি ভয় পায়।

যাঁরা এই যুদ্ধে লিপ্ত নয় তাঁরা হচ্ছেন মহর্ষি, সিদ্ধগণ। এনারা সবাই ঋষি, সিদ্ধরা আবার মহর্ষিদের থেকে আরও ওপরে। *স্বস্তীত্যুক্ত্বা মহর্ষিসিদ্ধসঙ্ঘাঃ*, চারিদিকে যা লক্ষণ দেখা যাচ্ছে তাতে বোঝা যাচ্ছে মহা উৎপাত ও মহা প্রলয় হতে যাচ্ছে, তাই মহর্ষি, সিদ্ধগণরা স্বস্তী বচন করছেন, জগতের কল্যাণ হোক, শান্তি হোক, বলে প্রচুর স্তুতি করে যাচ্ছেন। আগেকার দিনের রাজারা সব সময় রাজপুরোহিতদের সঙ্গে রাখতেন, যখনই কিছু অশুভ জিনিষ দেখা যাচ্ছে তাড়াতাড়ি করে তখনই তাঁরা রাজপুরোহিতদের দিয়ে স্বস্তীবচন করাতেন। যেমন আঠার নং শ্লোকে অর্জুন স্তব করছেন – *ত্বমক্ষরং পরমং বেদিতব্যং*, বা চণ্ডীতে *সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থসাধিকে*, এগুলো হচ্ছে স্বস্তীবচন। গৃহে যদি অশান্তি চলতে থাকে, নানা ধরণের উৎপাত হয় তখন এই সব স্বস্তীবচন পাঠ করলে সংসারে শান্তি ফিরে আসে। চণ্ডী পাঠ করলে এমনিতে যেমন শক্তি বৃদ্ধি হয় তেমনি আবার স্বস্তীবচনও, যদি উৎপাতাদি হতে থাকে তাহলে সেগুলো শান্ত হয়ে যায়। কারণ ভগবান বা দেবতারা কখন অশান্তি করেন না, অশান্তি আসে নিজের মন থেকে আর বাইরের ছোটখাট জিনিষ থেকে, পোকা মাকড়ের মতই এরা। ঈশ্বরীয় শক্তি তো বিরাট শক্তি, তাই যখন ঈশ্বরী শক্তির আবাহন করতে শুরু করে দেবে তখন এই আসুরিক শক্তি, দানবিক শক্তি গুলো দমে যায়। তারপর অর্জুন বলছেন –

**রুদ্রাদিত্যা বসবো যে চ সাধ্যা**
**বিশ্বেঽশ্বিনৌ মরুতশ্চোষ্মপাশ্চ।**
**গন্ধর্বযক্ষাসুরসিদ্ধসঙ্ঘা**
**বীক্ষন্তে ত্বাং বিস্মিতাশ্চৈব সর্বে।।২২।।**

নানান রকমের যে দৈবী শক্তি, যেমন রুদ্র, আদিত্য, বসু, সাধ্য, বিশ্বেদেব, অশ্বিনীকুমার, বায়ু আর উষ্মপা, উষ্মপা হচ্ছেন একধরণের পিতৃগণ, যাঁরা অন্য কিছু খাওয়া দাওয়া করেন না, শুধু সূর্যের রশ্মিই পান করে থাকেন, গন্ধর্বদের মধ্যে হাহা হূহূ, দশম অধ্যায়ে ছিল *গন্ধর্বানাং চিত্ররথঃ*, কিন্তু চিত্ররথের থেকেও আরও বিখ্যাত গন্ধর্ব হলে হাহা হূহূ। গন্ধর্বরা সাধারণত সঙ্গীতে পারঙ্গম, কিন্তু হাহা হূহূরা হচ্ছেন আধ্যাত্মিক মনোভাবাপন্ন গন্ধর্ব। ঠিক তেমনি পিতৃগণরা ততটা আধ্যাত্মিক নন কিন্তু উষ্মপারা আধ্যাত্মিক গুণ সম্পন্ন পিতৃগণ। এঁদের সবার সাথে যক্ষ, সুরসিদ্ধসঙ্ঘরা সবাই বিস্মিত হয়ে এই বিশ্বরূপ দর্শন করছেন। এটা এই নয় যে শুধু অর্জুনই এখন শ্রীকৃষ্ণের এই বিশ্বরূপ দেখতে পারছেন, কিন্তু এনারা সবাই মহর্ষি কিনা, সাধারণ কেউ নন এনারা, এখানে চিত্ররথের নাম বলা হচ্ছে না, অর্যমার নামও বলা হচ্ছে না, এখানে বলছেন হাহা হূহূ, উষ্মপা, এঁনারা সবাই আধ্যাত্মিক গুণসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব, এখানে যাঁদের নাম করা হচ্ছে তাঁরা তাঁদের নিজেদের জাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ পুরুষ। তাই এনাদেরও এই বিশ্বরূপ দেখার সৌভাগ্য হয়েছে। সবাই কি দেখছে?

**রূপং মহৎ তে বহুবক্ত্রনেত্রং**
**মহাবাহো বহুবাহূরুপাদম্।**
**বহূদরং বহুদংষ্ট্রাকরালং**
**দৃষ্ট্বা লোকাঃ প্রব্যথিতাস্তথাহম্।।২৩।।**

হে ভগবান, আপনার এই বিরাট রূপের মধ্যে কত মুখ, কত চোখ, কত বাহু, উরু, কত চরণ আর বহু উদর, কত রকমের পেট। আর আপনার হাজার হাজার মুখগুলোর সাথে বিরাটাকার দাঁত গুলো দেখে পুরো ব্যাপারটা এত ভয়ঙ্কর লাগছে যে আমিও অতি

মাত্রায় ভয়ে কাতর হয়ে পড়ছি। ঠাকুর বলছেন, যদি কোন মেয়ের প্রতি আসক্তি হয়ে যায় তখন ঐ মেয়ের সব অঙ্গগুলি যদি দ্বিগুণ করে দেখা হয়, তাহলে সব আসক্তি চলে যাবে। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের সখা, সে নিজেই সখার এই রূপ দেখে ভয়ে কাঁপছে তাহলে অন্য প্রাণীর কি অবস্থা হবে ভাবাই যাচ্ছে না, সমস্ত প্রাণী ভয়ে তটস্থ হয়ে কাঁপতে শুরু করেছে। মাকে যতই ছেলে ভালোবাসুক, মা যখন রেগে যায় বা বাপ মা মিলে ঝগড়া শুরু করে তখন সন্তানও ভয়ে কাঁপতে থাকে। আমেরিকাতে একটা গবেষণা করা হয়েছিল বাচ্চারা কিসে সব থেকে বেশি ভয় পায়। গবেষণার পর যেটা বেরিয়েছে তাতে বলছে যে বাচ্চারা বাবা-মার ঝগড়া আর ডিভোর্সকে বেশি ভয় পায়, আর স্কুলের হেডমাস্টার যদি কোন বাচ্চাকে ডেকে পাঠায়।

**নভঃস্পৃশং দীপ্তমনেকবর্ণং**
**ব্যাত্তাননং দীপ্তবিশালনেত্রম্।**
**দৃষ্ট্বা হি ত্বাং প্রব্যথিতান্তরাত্মা**
**ধৃতিং ন বিন্দামি শমং চ বিষ্ণো।।২৪।।**

হে ভগবন্, আপনার এই বিশাল রূপ আকাশকে স্পর্শ করছে, *দীপ্তমনেকবর্ণং*, নানান বর্ণযুক্ত এই বিশাল রূপ সব সময় জ্বলছে, তেজোময়। যে বিস্ফারিত মুখ চারিদিকে ছড়িয়ে আছে, চোখগুলো জ্বলজ্বল করছে। *দৃষ্ট্বা হি ত্বাং প্রব্যথিতান্তরাত্মা*, একাদশ অধ্যায়ে প্রব্যথিত কথাটা অনেকবার আসে, অর্জুন বলছেন আপনার এই ভয়ঙ্কর রূপ দেখে আমার অন্তরাত্মা ভয়ে কাঁপছে। তার ফলে কি হচ্ছে? *ধৃতিং ন বিন্দামি শমং চ বিষ্ণো, ধৃতিং*, মানে ধৈর্য রাখতে পারছি না, ফলে মন চঞ্চল হয়ে যাচ্ছে, মনের সাম্যভাব নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। দুটো জিনিষ অর্জুনের হচ্ছে, মনের যে শান্তি সেটা হারিয়ে ফেলছি, মনের যে শান্তি হারিয়ে ফেলছি তাই নয়, ধৈর্য, যেটা দিয়ে মনের সব কিছু ধরে রাখা সম্ভব হয়, সেই ধৈর্যও হারিয়ে ফেলছি, নিজের আত্মনিয়ন্ত্রণ হারিয়ে যাচ্ছে। অর্জুন আর কি দেখছে?

**দংষ্ট্রাকরালানি চ তে মুখানি**
**দৃষ্ট্বৈব কালানলসন্নিভানি।**
**দিশো ন জানে ন লভে চ শর্ম**
**প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস।।২৫।।**

মানুষ যখন ভগবানকে জগদাত্মিকা রূপে, মানে এই জগৎ রূপে দেখে তখন সে কখনই শান্তি পায়না। ভগবানের ভক্ত কখনই ভগবানের জগতলীলা দেখতে চায়না, কারণ ভগবানের জগতলীলার মধ্যে জগতের অনেক কিছু বাস্তব জিনিষ থাকে যেটা সাধারণ মানুষ স্বাভাবিক ভাবে মেনে নিতে পারেনা। এই জগতলীলার মধ্যে ভয়ঙ্কর রূপও এসে যাবে। কি রকম ভয়ঙ্কর? এই যে বিশাল আকৃতি, সেটা আবার দীর্ঘ দন্ত দ্বারা বিকৃত আর প্রলয়কালের যে অগ্নি, আমাদের প্রলয়কালে আবার সব কিছু শীতল হয়ে যায় না, এখানে ভীষণ গরমের সাথে তুলনা করা হয়। মজার ব্যাপার হল, ফিজিক্সের ভাষায় প্রলয় হল ব্ল্যাকহোল, ব্ল্যাকহোল যখন তৈরী হয় তখন প্রচুর তাপের উৎপন্ন হয়, কিন্তু খ্রীশ্চানদের ঐতিহ্যে বলা হয় প্রলয় কালে সব ঠাণ্ডা হয়ে যায়। এই ভয়ঙ্কর বিশাল রূপ আর কালাগ্নি দেখে *দিশো ন জানে ন লভে চ শর্ম*, আমার দিগ্‌ভ্রম হয়ে যাচ্ছে, কোনটা পূব কোনটা পশ্চিম কিছুই বুঝতে পারছি না, মাথা ঘুরে যাচ্ছে। মানুষের যখন প্রচুর কষ্ট হয়, মানসিক উদ্বেগ উৎকণ্ঠাতে ভেঙ্গে পড়ে তখন টের পায়না কি করছে কোন দিকে যাচ্ছে। *ন লভে চ শর্ম*, আমি শান্তি পাচ্ছি না, আমার সুখ হারিয়ে গেছে। আপনি ঈশ্বর, ঈশ্বরকে দেখে যদি শান্তি না পাই, সুখ না হয় তাহলে সেই ঈশ্বরকে দেখে আমার কি লাভ, সুখ তো দূরের কথা আমি দিক হারিয়ে ফেলছি কিছুই বুঝতে পারছি না। *প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস*, হে জগন্নিবাস, তাই আপনার কাছে আমার প্রার্থনা আপনি আমার উপর প্রসন্ন হউন।

**অমী চ ত্বাং ধৃতরাষ্ট্রস্য পুত্রাঃ**
**সর্বে সহৈবাবনিপালসঙ্ঘৈঃ।**
**ভীষ্মো দ্রোণঃ সূতপুত্রস্তথাহসৌ**
**সহাস্মদীয়ৈরপি যোধমুখ্যৈঃ।।২৬।।**

বড় বড় বীর রাজন্যবর্গ, যোদ্ধা, অবনীপাল, যারা কৌরব আর আমাদের উভয় পক্ষের হয়ে লড়াই করতে এসেছেন, ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণের সাথে এরা সবাই এক এক করে পরের পর আপনার ঐ আগুনের মত মুখ গহ্বরে দ্রুত প্রবেশ করে যাচ্ছে। এই শ্লোকটি পরের শ্লোকের সঙ্গে সম্পর্কিত। প্রবেশ করে কি হচ্ছে?

**বক্ত্রাণি তে ত্বরমাণা বিশন্তি**
**দংষ্ট্রাকরালানি ভয়ানকানি।**
**কেচিদ্বিলগ্না দশনান্তরেষু**
**সংদৃশ্যন্তে চূর্ণিতৈরুত্তমাঙ্গৈঃ।।২৭।।**

আপনার ঐ লম্বা লম্বা ভয়ানক দাঁতের মধ্যে দিয়ে সব আপনার ভেতরে প্রবেশ করে যাচ্ছে। *কেচিদ্বিলগ্না দশনান্তরেষু সংদৃশ্যন্তে চূর্ণিতৈরুত্তমাঙ্গৈঃ*, মাংস খাওয়ার সময় আমাদের সবটাই পেটে চলে যায় না, কিছু কিছু মাংসের টুকরো দাঁতের ফাঁকে আটকে থাকে, এখানেও ভগবান যখন ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ আর যত লক্ষ লক্ষ বীর যোদ্ধারা আর রাজাদের ভক্ষণ করে নিচ্ছেন, ভক্ষণ করার সময় দাঁতের চাপে অনেকের মাথা ফেটে গেছে, অনেকের মাথা আপনার দাঁতের ফাঁকে আটকে রয়েছে, মাংসগুলো ঝুলছে, যেমন সিংহ যখন হরিণকে শিকার করে মুখের মধ্যে ঢুকিয়ে দেয় তখন হরিণের মাংসগুলো যেভাবে ঝুলতে থাকে। এই দৃশ্য দেখে আমি স্থির থাকতে পারছি না, ভয়ে কাঁপছি। কোন চিত্রশিল্পীর ক্ষমতা নেই এই দৃশ্যটা রঙ তুলি দিয়ে ফুটিয়ে তুলবে। এই দৃশ্য অবলোকন করা দূরে থাক, কল্পনা করলেই গা শিউড়ে উঠবে। এইটাই হচ্ছে ভগবানের রূপ, ভগবান বারবার বলছেন আমিই হলাম সব কিছুর উৎপত্তির স্থল আবার প্রলয়টাও সব আমার মধ্যেই। উৎপত্তিটা দেখান হয়েছে, এবার প্রলয়টাও দেখে নাও, দুটোই আমার রূপ। জীবনটাও তাঁর মৃত্যুটাও তাঁর, অথচ আমরা ভগবানের এই মৃত্যুরূপাকে মানতে পারিনা, মৃত্যু আমাদের কাছে আতঙ্ক। আমরা যেমন ভাবে খাদ্য ভক্ষণ করি, ভগবানও ঠিক ঐভাবে একটা একটা করে গ্রাস তুলে খাচ্ছেন? না না ঐভাবে তিনি খাচ্ছেন না। কিভাবে ভক্ষণ করছেন?

**যথা নদীনাং বহবোঽম্বুবেগাঃ**
**সমুদ্রমেবাভিমুখা দ্রবন্তি।**
**তথা তবামি নরলোকবীরা**
**বিশন্তি বক্ত্রাণ্যভিবিজ্বলন্তি।।২৮।।**

নদীর জলাধারা যেমন সমুদ্রে গিয়ে মিশে যায়, ঐভাবে জলের স্রোতের মত দলে দলে সব প্রাণী আপনার মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে। আপনার মুখটা আগুন, জ্বলজ্বল করছে, আর ঐ আগুনের মধ্যে মানুষের ধারা, এক দিক থেকে না, চারিদিক থেকে মানুষের ধারা স্রোতের মত আপনার মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে। এখন যুদ্ধ হবে বলে এই রকম হচ্ছে তাতো নয়, সারা বিশ্ব জুড়ে প্রতি মুহুর্তে কত লক্ষ লক্ষ লোক, কত কোটি কোটি প্রাণী মৃত্যু মুখে পতিত হচ্ছে, মৃত্যু মানেই তো সেই ঈশ্বরের জ্বলন্ত মুখ গহ্বরে ঢুকে যাওয়া। অর্জুন আরেকটি উপমা দিচ্ছেন –

**যথা প্রদীপ্তং জ্বলনং পতঙ্গা**
**বিশন্তি নাশায় সমৃদ্ধবেগাঃ।**
**তথৈব নাশায় বিশন্তি লোকা-**
**স্তবাপি বক্ত্রাণি সমৃদ্ধবেগাঃ।।২৯।।**

আগুন যখন জ্বালান হয় তখন পতঙ্গগুলো আলোর দিকে ধাবিত হয়ে আগুনে এসে পড়ে। যখন গ্রাম দেশে পোকার খুব উপদ্রব হয়, এমন উপদ্রব হয় যে চোখে মুখেও পোকা যখন তখন ঢুকে যায়, সাইকেল চালানও খুব মুশকিল হয়ে যায়, চোখের মধ্যে ঢুকে গেলে এমন জ্বালা করবে যে সাইকেল থেকে নেমে পোকা না বের করা পর্যন্ত কিছুই চোখে দেখবে না। তখন পোকাগুলোকে শেষ করবার জন্য আগুন জ্বালান হয়, এতে পোকার উপদ্রব অনেক কমে যায়। মজার ব্যাপার হল, যেটা বিজ্ঞানীর বলে যে পোকা গুলো যখন আগুনের আলোর দিকে ছুটে যায় তখন পোকাগুলো ভাবে যে আগুন থেকে ওরা দূরে সরে যাচ্ছে, কিন্তু আসলে আগুনের ভেতরে যেতে থাকে। বিজ্ঞানীরা অনেক থিওরী দেন, কোনটা সত্য কোনট ঠিক আমরা বলতে পারব না, কারণ অনেক কারণে ওরা আগুনের দিকে ছুটে যায় আর ওর মধ্যেই সব জ্বলেপুড়ে মরে। *তথৈব নাশায় বিশন্তি লোকাস্তবাপি বক্ত্রাণি সমৃদ্ধবেগাঃ*, ঠিক এইভাবে সমস্ত প্রাণী পোকাগুলোর মত মরছে, আপনার মুখের মধ্যে বেগে ঢুকে যাচ্ছে, আর এই বেগ *সমৃদ্ধবেগাঃ*, মানে বেগ ক্রমশ বেড়েই চলেছে। এইসব দেখেই ভগবান বুদ্ধের মধ্যে প্রচণ্ড করুণার উদ্রেক উথলে উঠেছিল – আহাঃ কিভাবে মানুষগুলো মরছে, যে জীবনধারণ করবার জন্য জন্ম নিচ্ছে সেই মরছে, এইতো জীবন তার উপর আবার এই জগৎ, ইন্দ্রিয়সুখ এইসবের প্রতি এতো আসক্তি। কিন্তু বুঝতে পারছে না কিভাবে সে মৃত্যুর দিকে দৌড়াচ্ছে, *সমৃদ্ধবেগাঃ*, দৌড়ানর গতিটা বেড়েই যাচ্ছে আর মৃত্যুও ততই সন্নিকটে চলে আসছে, মানুষের এই ব্যাপারে কোন হুঁশই নেই, ভগবান বুদ্ধ এইটাই চেয়েছিলেন কিভাবে এটাকে আটকানো যায়।

**লেলিহ্যসে গ্রসমানঃ সমন্তাৎ**
**লোকান্ সমগ্রান্ বদনৈর্জ্বলদ্ভিঃ।**
**তেজোভিরাপূর্য জগৎ সমগ্রং**
**ভাসস্তবোগ্রাঃ প্রতপন্তি বিষ্ণো।।৩০।।**

আপনার এই সংহার মুর্তি, দাঁতের ফাঁকে কারুর মাথা, কারুর মাংস আটকে ঝুলছে, তার মধ্যে আপনি আবার *লেলিহ্যসে*, লেহন করছেন, চেটেপুটে সব খাচ্ছেন। দই, পায়েস যেমন চেটে চেটে খায়, ভগবানও তেমনি চেটে চেটে খাছেন। কাকে? ঐ যে মানুষগুলো ভীষ্ম, দ্রোণ, দুর্যোধন, কর্ণ সব কটাকে। এটাই হচ্ছে মৃত্যুরূপা কালীর রূপ। তাই বলা হয় যে মৃত্যুকে ভালোবাসতে পারেনা, ঈশ্বরকে মৃত্যুরূপে না দেখতে পারলে চরম উপলব্ধি তার কখনই হতে পারবে না। কারণ মৃত্যুটাও ঈশ্বরের একটা অবশ্যম্ভাবি বাস্তব রূপ। হিন্দুধর্মের এটাই বৈশিষ্ট্য মৃত্যুকে অন্য কারুর কাঁধে চাপিয়ে দেওয়া হয় না, এটাও ঈশ্বরের, জীবন থেকে মৃত্যু সবটাই তাঁর। *তেজোভিরাপূর্য জগৎ সমগ্রং*, আপনার দেদীপ্যমান তেজ সমস্ত জগতকে প্লাবিত করে দিচ্ছে।

**আখ্যাহি মে কো ভবানুগ্ররূপো**
**নমোঽস্তু তে দেববর প্রসীদ।**
**বিজ্ঞাতুমিচ্ছামি ভবন্তমাদ্যং**
**ন হি প্রজানামি তব প্রবৃত্তিম্।।৩১।।**

আমি তো জানি আপনি আমার সখা কৃষ্ণ, কিন্তু এই ভয়ঙ্কর জগদ্ব্যাপী রূপে আপনি কে, এই রূপ দেখে আমি স্থির থাকতে পারছি না, আমার মাথা ঘুরছে, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না, আপনিই কি আমার সেই সখা শ্রীকৃষ্ণ, কিন্তু আমার বন্ধু শ্রীকৃষ্ণের সাথে আপনাকে আমি মেলাতে পারছি না। *নমোঽস্তু তে দেববর প্রসীদ*, আপনাকে আমি প্রণাম করছি, আপনি দেবতাদেরও দেবতা, আপনি আমাকে কৃপা করুন আপনি কে আমার জানতে খুব ইচ্ছে করছে। *ন হি প্রজানামি তব প্রবৃত্তিম্*, আপনি কি করতে চাইছেন কিছুই বুঝতে পারছি না। আপনার প্রবৃত্তিটা কি? প্রবৃত্তি মানে হচ্ছে কোন কিছু কাজ করতে নামার যে উদ্দেশ্য। আপনার প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য আমি বুঝতে পারছি না। তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে আশ্বস্ত করে উত্তর দিতে শুরু করছেন।

শ্রীভগবানুবাচ
**কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধো**
**লোকান্ সমাহর্তুমিহ প্রবৃত্তঃ।**
**ঋতেঽপি ত্বাং ন ভবিষ্যন্তি সর্বে**
**যেঽবস্থিতাঃ প্রত্যনীকেষু যোধাঃ।।৩২।।**

আমি হচ্ছি কাল, লোকক্ষয়ের জন্য আমি এখন এই বিরাট রূপ ধারণ করে নিয়েছি। ভগবান একদিকে যেমন লোকহিতায় তিনিই আবার কোন কোন সময় লোকক্ষয়কারী কাল। *লোকান্ সমাহর্তুমিহ প্রবৃত্তঃ*, আমি এখন লোকের সংহার করার জন্য নেমেছি, আমার সেই শান্ত রূপের কথা এখন ভুলে যাও। *ঋতেঽপি ত্বাং ন ভবিষ্যন্তি সর্বে যেঽবস্থিতাঃ প্রত্যনীকেষু যোধাঃ*, আর অর্জুন, তুমি যদি এখন যুদ্ধ নাও কর তাতেও কিছু এসে যাবে না, আমি এখন নিজের থেকেই নেমে পড়েছি এই যুদ্ধ করার জন্য, বিপক্ষ দলের যত বীরেরা আছে তারা কেউই আর এখন জীবিত থাকবে না, কেউ এদের বাঁচাতে পারবে না। এই কারণেই বলা হয় রাখে হরি তো মারে কে, মারে হরি তো রাখে কে। মারতেও তিনি বাঁচাতেও তিনি। হরিই এখন মারতে নেমে মেরেছেন তুমি যুদ্ধ কর আর নাই কর, আমিই সব মেরে শেষ করে রাখব। সেইজন্য অর্জুন তুমি –

**তস্মাৎ ত্বমুত্তিষ্ঠ যশো লভস্ব**
**জিত্বা শত্রূন্ ভুঙ্ক্ষ্ব রাজ্যং সমৃদ্ধম্।**
**ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূর্বমেব**
**নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্।।৩৩।।**

হে অর্জুন, তুমি এখন যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়ার জন্য উঠে দাঁড়াও, তোমাকে এইজন্যই বলেছিলাম যুদ্ধ করতে। যুদ্ধ করে যশ লাভ কর আর শত্রুকে জয় করে এই নিষ্কন্টক রাজ্য ভোগ কর। *ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূর্বমেব নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্*, নিমিত্ত দুই রকম অর্থে ব্যবহার করা হয়, একটা হচ্ছে লক্ষণ আরেকটি অর্থ হচ্ছে উপলক্ষ যেটার দ্বারা করা হয়। এখানে অর্জুনকে নিমিত্ত হতে বলা হচ্ছে, অর্থাৎ অর্জুন উপলক্ষ মাত্র। যখন অশুভ কোন লক্ষণ দেখা যায় হয় তখন সেটাকেও বলা হয় নিমিত্ত, যেমন রাস্তা দিয়ে যেতে বেড়াল রাস্তা কেটে চলে গেল, তারপর দেখা গেল খারাপ কিছু হয়ে গেল। এখন বেড়াল রাস্তা কাটল বলে খারাপ হল না কি

খারাপ হবার ছিল বলেই বেড়াল রাস্তা কেটে দিল। আমরা মনে করি বেড়াল রাস্তা কাটল বলেই খারাপ কিছু হল। কিন্তু তা নয়, পর পর কিছু খারাপ হতে যাচ্ছে, বেড়াল কাটা একটা লক্ষণ, এটাকেও বলা হয় নিমিত্ত। তবে সব কিছু সবার ক্ষেত্রে খাটে না। ভগবান এটাই বলছেন, অর্জুন তুমি নিমিত্ত মাত্র হও, যে বিরাট সংহার হতে যাচ্ছে *ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূর্বমেব*, এদের আমি আগেই মেরে রেখেছি। আর তুমি যদি নিমিত্ত না হও তাহলে আমি আরেকজনকে নিমিত্ত বানিয়ে নেব। মাস্টারমশাই তখন ঠাকুরের কথাগুলো লিপিবদ্ধ করছিলেন, কিছু একটা অসুবিধা হওয়াতে লেখা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। তখন ঠাকুর মাস্টারমশাইকে বলছেন – কারিগরের কাছে অনেক নল থাকে, একটা নল কাজ না করলে আরেকটা নল লাগিয়ে নেয়। ঠাকুরের কথাগুলো মাস্টারমশাই তখন লিখছিলেন, মাস্টারমশাই হলেন নল, ঠাকুর হলেন কারিগর। কোন কারণে একটা সময় মাস্টারমশাই লিখতে চাইছিলেন না। ঠাকুরের বক্তব্য হচ্ছে তুমি যদি না লেখ তাহলে কারিগরের কাছে অনেক নল আছে, আরেকটা নল লাগিয়ে নেবে। তুমি যদি কাজে লেগে যাও তাহলে তুমি নিজে ধন্য হয়ে যাবে। স্বামীজী বলছেন – শ্রীরামকৃষ্ণ রূপী এই জগৎ রথ চলতে শুরু করেছে, যে এই রথকে আটকাতে যাবে সে পিষে যাবে, আর যারা হাত লাগাবে তারা ধন্য হয়ে যাবে। এই রথতো যাবেই এটাকে কে আটকাবে! আমি যদি হাত না লাগাই তাহলে ভগবান আরও পাঁচজনকে দাঁড় করিয়ে নেবেন। অর্জুনকে ভগবান এই কথাই বলছেন, আমি এদের সব কটাকে শেষ করতে যাচ্ছি, এরা কেউই বাঁচবে না, মাঝখান থেকে তোমাকে দাঁড় করিয়ে দিয়ে আমি তোমাকে নিমিত্ত করে দিলাম, তুমি যদি যুদ্ধ না কর তাহলে আমি অন্য কাউকে দাঁড় করিয়ে দেব, আর যুদ্ধ করলে তোমারই কীর্তি, যশ হবে।

ঠিক ঠিক এই জিনিষটা না দেখা পর্যন্ত 'ঠাকুরের ইচ্ছাতেই সব কিছু হয়' এই সারতত্ত্বটা বোঝা যায় না। ঠাকুরই যে সব করেন এটা এখানে এসেই পরিষ্কার বোঝা যায়, তার আগে যতই বলি ঠাকুরের ইচ্ছা, সেগুলো সবই মুখের কথা হয়ে যায়। আমরা যখন কিছু করি তখন মনে করি আমরাই করছি, কিন্তু ঠাকুরই সব আগে থাকতে করে রেখেছেন। ঠাকুর খুব সুন্দর দুটো উপমা দিচ্ছেন, একটা বলছেন – গাছ কাটার সময় কাটতে কাটতে যখন একটু বাকি থাকে তখন সবাই গাছ কাটা বন্ধ করে গাছ থেকে দূরে সরে দাঁড়ায়, তখন গাছটা নিজে থেকেই হুড়মুড় করে পড়ে যায়। মানুষের কি ক্ষমতা আছে যে এই বিশাল সংসারচক্রকে কেটে বেরিয়ে আসতে পারবে। এদের মধ্যে যারা জপ-ধ্যান করছে, শাস্ত্র কথা শুনছে বুঝতে হবে এটা তাদের এক বিশাল সৌভাগ্য। বর্তমান সমাজের দিকে একটু তাকিয়ে দেখলে বোঝা যায়, মানুষ কি অবস্থার দিকে অগ্রসর হচ্ছে, খালি ইন্দ্রিয়সুখ, ভোগসর্বস্ব জীবনকে আলিঙ্গন করে চরম স্বার্থপরতায় নিমজ্জ হয়ে সর্বনাশের দিকে চলেছে। এরা শাস্ত্র কথা শুনবে আর সংসার থেকে বেরোবে, এটা কি কখন সম্ভব!! যখন ভগবান গুরুরূপে এসে এই গাছটাকে কেটে দেন, মানে এই সংসার বন্ধন কেটে দেন, তখন এই গাছটা নিজে থেকে ধড়মড় করে পড়ে যাবে। নিজে থেকে কোথায় পড়ছে, ভগবান যখন গুরুরূপে আসেন তখনই তিনি নিজে থেকে আগেই কেটে দেন। সেইজন্য আমরা অমুক গুরু তমুক গুরু বলিনা, আমাদের কাছে গুরু হচ্ছেন শ্রীরামকৃষ্ণ নিজে। আমরা যে বলি আমি শাস্ত্র পড়ছি, আমি জপ-ধ্যান করছি, কিন্তু একবারও ভাবিনা আমার দ্বারা কি জপ-ধ্যান করা সম্ভব, তিনি সব করে রেখে দিয়েছেন। এই যে বোধটুকু হচ্ছে আমি করছি, গাছটাকে কাটা হয়েছিল বলেই নিজেই পড়ে যাবে ঐ বোধ, তিনি কেটেছেন বলেই তুমি জপ-ধ্যান করতে পারছ।

ঠিক তেমনি আরেকটি উপমাতে বলছেন – নদী থেকে যখন খাল কেটে জমির সঙ্গে যোগ করা হয় তখন শেষটায় এসে ছেড়ে দেয়, তখন মাটি ভিজে ভিজে হয়ে আপনা থেকেই ভেঙ্গে যায় তখন নদীর জল কুলকুল করে ঢুকতে থাকে। আসল যে খাল কাটার সেটা তিনিই কেটে দিয়েছেন, এখন যেটা ভাঙ্গন ধরছে সেটা আমি মনে করছি আমি ভেঙ্গে দিচ্ছি। কিন্তু তা নয়, *নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্*। তুমি নিমিত্ত মাত্র, তুমি যদি না কর আরেকজনকে দিয়ে তিনি করিয়ে নেবেন। মূল কথা হল এইটাই – *অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্তাহমিতি মন্যতে*। তুমি যদি অহঙ্কারে বিমূঢ় হয়ে নিজেকে কর্তা মনে কর তাহলে তুমি মরবে। এইটাই মনে রাখতে হবে আমরা যা কর্ম করছি সব *নিমিত্তমাত্রং*, তিনি আমাকে এই কাজের জন্য নির্দিষ্ট করে রেখেছেন বলেই আমি করছি, আমি না করলে তিনি আরেকজনকে দিয়ে করিয়ে নেবেন। আর কি বলছেন ভগবান –

**দ্রোণঞ্চ ভীষ্মঞ্চ জয়দ্রথঞ্চ**
**কর্ণং তথাহন্যানপি যোধবীরান্।**
**ময়া হতাংস্তং জহি মা ব্যথিষ্ঠা**
**যুধ্যস্ব জেতাসি রণে সপত্নান্।।৩৪।।**

মহাভারতে যে চারজন বীরকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে গীতাতেও এখানে সেই চারজন বীরের নাম করা হচ্ছে। প্রথম জন হচ্ছেন দ্রোণ, দ্রোণাচার্যের বিশেষত্ব হচ্ছে, যতক্ষণ তিনি অস্ত্র ধারণ করে থাকবেন ততক্ষণ কেউ তাঁকে বধ করতে পারবে না। ভীষ্ম, ওনার ছিল স্বেচ্ছামৃত্যু, যতক্ষণ তিনি নিজে না মরতে চাইছেন ততক্ষণ তিনি মরবেন না, জয়দ্রথের বর ছিল যার হাত থেকে তার মুণ্ডু মাটিতে পড়বে সেও মারা যাবে। কর্ণের ব্যাপারে আচার্য শঙ্কর বলছেন যে, কর্ণ হচ্ছেন সূর্যের তেজে কন্যাজাত পুত্র। আচার্য কর্ণকে কন্যা পুত্র কেন বলছেন এটা খুব তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ কর্ণের জন্মদাত্রী কুন্তির তখনও বিবাহ হয়নি, কুমারী অবস্থায় কুন্তি তখন

পবিত্রতমা কুমারী ছিলেন, আর সেই পবিত্রতায় সূর্যের তেজে জন্ম হয়েছিল বলে কর্ণের মধ্যে বিশেষ শক্তি ও ক্ষমতা এসে গিয়েছিল। জয়দ্রথের বাবা ছিলেন বিরাট তপস্বী অন্য দিকে দুর্যোধনদের একমাত্র বোন দুঃশলার স্বামী। পাণ্ডবরা যখন বনবাসে ছিলেন তখন জয়দ্রথ একদিন দ্রৌপদীকে জঙ্গলে একা পেয়ে অপহরণ করে নিয়েছিল, আমি হলাম রাজা আর তোমার স্বামীরা সব অপদার্থ তোমাকে রানীর মর্যাদায় না রেখে এখানে জঙ্গলে ফেলে রেখেছে, তোমাকে আমি রানী মত রাখব, আমার সাথে চলে এস। খবর পেয়ে ভীম অর্জুন সবাই মিলে জয়দ্রথকে পেছনে ধাওয়া করে আক্রমণ করেছিল। যখন জয়দ্রথকে বন্দী করে নিয়েছিল তখন যুধিষ্ঠির এসে ভীম আর অর্জুনকে বললেন – মনে রেখো, জয়দ্রথ আমাদের ভগ্নীপতি ওকে প্রাণে মেরে আমাদের বোনকে বিধবা করে দিও না। যুধিষ্ঠিরের আজ্ঞায় জয়দ্রথকে প্রাণে না মেরে মাথা মুড়িয়ে চারটে টিকি রেখে ছেড়ে দিয়েছিল। এতে জয়দ্রথ নিজেকে খুব অপমানিত বোধ করে। তখন সে শিবের তপস্যা করতে চলে যায়। তপস্যাতে শিবকে সন্তুষ্ট করার পর শিব বর দিতে চাইলে জয়দ্রথ বলল আমি পাণ্ডবদের হারাতে চাই। তখন শিব বললেন – অর্জুনের কাছে আমার পাশুপত অস্ত্র আছে তাই অর্জুনকে কেউ হারাতে পারবে না, তবে একটা দিন বাকি চারজন পাণ্ডবকে হারাতে পারবে, অর্জুনকে তুমি কোন দিন হারাতে পারবে না, এই ব্যাপারে আমার কিছু করার নেই। অন্য দিকে জয়দ্রথের বাবা ছেলেকে আশীর্বাদ দিয়ে রেখেছেন যার হাত থেকে তোমার মাথা মাটিতে পড়বে তার মাথা সঙ্গে সঙ্গে হাজারটা টুকরো হয়ে উড়ে যাবে।

এবার যেদিন কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময় চক্রব্যূহ রচনা করা হয়েছে সেইদিন কায়দা করে অর্জুনকে দুর্যোধনরা চ্যালেঞ্জ করে অন্য দিকে নিয়ে গেছে। আর চক্রব্যূহের মুখে জয়দ্রথকে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। অভিমন্যু চক্রব্যূহে ঢোকার কৌশলটা জানত বলে কায়দা করে ঢুকে গেছে। পরে যুধিষ্ঠির, ভীম, নকুল আর সহদেবরা একে একে যখন ঢুকতে গেছে জয়দ্রথ চারজনকে পিটিয়ে ভাগিয়ে দিয়েছে। চক্রব্যূহে শেষ পর্যন্ত কেউ প্রবেশ করতে পারল না, যার জন্য অভিমন্যু একা লড়াই করে মারা গেল। অর্জুন খবর পেয়ে দিব্যি করে বসল যে পরের দিন জয়দ্রথকে না মারতে পারলে আমি নিজেই আগুনে প্রবেশ করে যাব। তখন আবার শ্রীকৃষ্ণ চিন্তায় পড়ে গেলেন। অর্জুন যদি বাণ চালিয়ে জয়দ্রথকে মারে আর তার মুণ্ডু মাটিতে পড়লে অর্জুনও তো মারা যাবে। অর্জুন মারা গেলে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সব শেষ, জয়দ্রথকে মেরে তো তাহলে কোন লাভ হবে না। তখন অর্জুনের জন্য শ্রীকৃষ্ণ একটা বিশেষ বাণ ঠিক করলেন। জয়দ্রথের বাবা ছেলের ভালোর জন্যই ঐ বর দিয়েছিলেন। অর্জুনেরও দিব্যশক্তি ছিল, অর্জুন ঐ বিশষ বাণটা মারতেই বাণটা জয়দ্রথের মুণ্ডুটাকে কেটে চিল পাখির মত উড়িয়ে নিয়ে ওর বাবা যেখানে তপস্যা করছিলেন সেইখানে বাবার কোলের উপর মুণ্ডুটা উড়ে এসে ফেলেছে। জয়দ্রথের বাবা তখন ধ্যান করছিলেন, কোলের মধ্যে একটা কাটা মুণ্ডু পড়তেই তিনি হাতে করে তুলে দেখেনে তাঁর ছেলেরই মুণ্ডু, ছেলের মুণ্ডু দেখতেই – এ কি! বলেই হাতে করে তুলে মাটিতে ফেলে দিলেন। এখন তাঁর হাত থেকেই মুণ্ডুটা পড়তেই জয়দ্রথের বাবার নিজের মাথাটাই হাজারটি টুকরো হয়ে ফেটে গেল।

এই চারজন হচ্ছেন বিশেষ ক্ষমতাবান যোদ্ধা, দ্রোণাচার্যের হাতে যতক্ষণ অস্ত্র থাকবে সে মরবে না, ভীষ্মের ইচ্ছামৃত্যু, কর্ণ হচ্ছেন সূর্যপুত্র আবার তাঁর কাছে রয়েছে ইন্দ্রের অমোঘশক্তি। কর্ণের কাছে যে ইন্দ্রের অমোঘ শক্তি ছিল সেটা যার উপর চালাবে সে মরবেই। শ্রীকৃষ্ণ তাই কায়দা করে ঐ অস্ত্রটাকে ঘটোৎকচের উপর কর্ণকে ঐ অমোঘশক্তির অস্ত্রটা চালাতে বাধ্য করালেন, আর রইল জয়দ্রথ, যার কাহিনী একটু আগে আলোচনা করা হল। এই চারজন প্রধাণ যোদ্ধা, অর্জুনের পক্ষে সম্ভব ছিল না এই চারজনেক পরাস্ত করা। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, *ময়া হতাংস্তং জহি মা ব্যথিষ্ঠা,* আমি এঁদের সবাইকে আগেই মেরে রেখেছি তোমার চিন্তার কিছু নেই, তুমি নিশ্চিন্ত মনে যুদ্ধ করে তোমার শত্রুদের জয় কর। তোমার জয় হবেই কারণ আমি এদের আগেই মেরে রেখেছি। দৃশ্যপট আবার সঞ্জয়ের কাছে চলে গেছে, সঞ্জয় বলছে –

সঞ্জয় উবাচ

**এতচ্ছ্রুত্বা বচনং কেশবস্য**
**কৃতাঞ্জলির্বেপমানঃ কিরীটী।**
**নমস্কৃত্বা ভূয় এবাহ কৃষ্ণং**
**সগদ্গদং ভীতভীতঃ প্রণম্য**।।৩৫।।

একদিকে ঐ বিশাল বিশ্বরূপ, তার ওপর আবার হাজারটা সূর্যের মত প্রদীপ্ত তেজঃপূর্ণ জ্বলন্ত মুখ, তার মধ্যে ক্ষত্রিয়কুলের সব রাজারা, যোদ্ধারা নদীর স্রোতের মত ঢুকে যাচ্ছে, তাদের আবার তিনি চর্বণ করে যাচ্ছেন, কারুর মাথা ফেটে যাচ্ছে, কারুর মাংস দাঁতের ফাঁকে আটকে গিয়ে ঝুলছে অন্য দিকে সব মহর্ষি, সিদ্ধগণ স্তুতি করছেন, এই সব দৃশ্য দেখে অর্জুন ভীত কম্পিত কলেবরে যে স্তব করেছিল তার উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে সান্ত্বনা দিয়ে যা যা বললেন, সব শুনে অর্জুন গদগদ কন্ঠে নিজের কথা বলতে শুরু করলেন। এখানে আচার্য বলছেন গদগদ কন্ঠে মানুষ কখন কথা বলে? যখন মানুষ প্রচণ্ড দুঃখ পায় বা ভয় পেয়ে যায় অথবা প্রচণ্ড আনন্দ যখন হয় এই কয়টি অবস্থায় চোখে জল এসে যায়, চোখে জল এসে গেলে স্বরনালীতে শ্লেষ্মা জমে যায়, সেই অবস্থায় তার মনের যে কথা গুলো থাকে সেগুলোকে প্রকাশ করার সময় বাক্যস্ফুরণে অপটুতা এসে যায়, কথাগুলোকে স্পষ্ট উচ্চারণ করতে পারেনা, আর শব্দগুলো ধীরে ধীরে বেরোয়। এই আওয়াজটাকে বলা হচ্ছে গদগদ। এখানে ক্রিয়াবিশেষক, ভয়ের জন্য গদগদ কন্ঠে

বলছেন, আনন্দে অভিভূত হয়ে বলছেন না। ভগবানের ঐ রূপ দেখে অর্জুন ভয়ে ঠকঠক করে কাঁপছে। তাই অত্যন্ত ভীত হয়ে কাঁপতে কাঁপতে হাতজোড় করে গদগদ কন্ঠে বলছেন –

অর্জুন উবাচ
**স্থানে হৃষীকেশ তব প্রকীর্ত্যা**
**জগৎ প্রহৃষ্যত্যনুরজ্যতে চ।**
**রক্ষাংসি ভীতানি দিশো দ্রবন্তি**
**সর্বে নমস্যন্তি চ সিদ্ধসঙ্ঘাঃ।।৩৬।।**

অর্জুন বলছেন – হে হৃষীকেশ আপনার এই ভয়ঙ্কর রূপ দেখে যত রাক্ষস, অসুর, সব ভয়ে চারিদিকে ছুটে ছুটে পালাচ্ছে, অন্য দিকে যাঁরা সিদ্ধ, সিদ্ধরা হলেন ঋষিদের থেকেও উপরে, যেমন দশম অধ্যায়ে বলেছিলেন *সিদ্ধানাং কপিলো মুনিঃ*, সিদ্ধদের মধ্যে আমি কপিল মুনি, সিদ্ধরা সবাই আপনার নমস্কার করছেন। একদিকে যে রাক্ষসরা ভয়ে পালাচ্ছে আর অন্য দিকে সিদ্ধরা যে আপনাকে প্রণাম করছে এতে কোন ভুল কিছু নেই এটাই যুক্তিযুক্ত। এখানে মধুসূদন সরস্বতি নিজের তরফ থেকে একটা মন্তব্য করেছেন, যারা খুব ভয় পায়, সে যে কোন কারণেই ভয় পাক, সাপের ভয়, বিছের ভয়, ডাকাতের ভয়, ভূতের ভয়, কোন কারণ নেই অকারণে ভয় পাচ্ছে, কিছু কিছু লোকের মনের ভেতরে অকারণেই ভয় ঢুকে থাকে, তারা যদি রোজ 'ওঁ নমো নারায়ণায়' বলে গীতার এই মন্ত্রটা সকালে কিংবা বিকালে বারোবার জপ করতে পারে তাহলে যে কোন ভয় তার চলে যাবে। যে কোন দানবিক বা আসুরিক শক্তি নাশ হয়ে যায় এই মন্ত্রটা এইভাবে জপ করলে, কারণ গীতার সব শ্লোকই মন্ত্র শক্তির মত কাজ করে। অর্জুন কৃতাঞ্জলি হয়ে বলছেন –

**কস্মাচ্চ তে ন নমেরন্ মহাত্মন্**
**গরীয়সে ব্রহ্মণোঽপ্যাদিকর্ত্রে।**
**অনন্ত দেবেশ জগন্নিবাস**
**ত্বমক্ষরং সদসৎ তৎ পরং যৎ।।৩৭।।**

হে অনন্ত, হে দেবেশ, হে জগন্নিবাস, আপনি হলেন সবার বড়, আপনার থেকে আর কেউ শ্রেষ্ঠ নেই। কারণ সেই হিরণ্যগর্ভ, যাঁর থেকে সব কিছু সৃষ্টি হয়েছে, আপনি তাঁরও পিতা, আদি কর্তা। নবম অধ্যায়ে বলা হয়েছিল – *পিতাহহমস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ*, আপনি পিতা, আপনি মাতা, আপনি ধাতা আবার আপনি হলে পিতার পিতা, পিতামহ। সুতরাং এটাই স্বাভাবিক আপনাকে সবাই প্রণাম করবে। *ত্বমক্ষরং সদসৎ তৎ পরং যৎ*, বেদান্তে যাঁকে পরম পুরুষ বলা হয়েছে, বেদেও যাঁকে পুরুষ বলা হয়েছে, আপনিই সেই পরম আদি পুরুষ, আপনি সেই পরম ব্রহ্ম। আর আপনি হচ্ছেন *সদসৎ*, সৎ হচ্ছে যেখানে সৎ বুদ্ধিটা আছে, যেমন এই বোতলটা আছে, এই বোতলের মধ্যে গরু নেই এই বোধটা আমার আছে, এই বোতলটাও আছে এই বোধ আছে, যেখানে এই বোধ বুদ্ধিটা আছে সেটা হচ্ছে সৎ, আর যেখানে বোধ বুদ্ধির অভাব সেটা হচ্ছে অসৎ। *তৎ পরং যৎ*, আপনি এই সৎ ও অসতেরও বাইরে। যে জিনিষটাকে ইন্দ্রিয় দিয়ে জানা যায় সেটা সৎ আর যে জিনিষটাকে ইন্দ্রিয়ে দিয়ে জানা যায় না সেটা হয়ে গেল অসৎ, আপনি এই দুটোরই পারে। একদিকে আপনি আছেন, আপনি আছেন এই কথা বেদে বলা হয়েছে, ঋষিরা বলেছেন, অথচ আপনাকে ইন্দ্রিয় দিয়ে জানা যায় না। ইন্দ্রিয় দিয়ে আপনাকে জানা যায় না তাহলে আপনি অসৎ, কিন্তু ঋষিরা বলছেন আপনি আছেন, বেদ-বেদান্তে বলছে আপনি আছেন, অথচ আপনি ইন্দ্রিয়ের গোচর নয়, তাই আপনি সৎ অসতের পারে। ভগবানকে অনেক ভাবে বলা যায়, কখন বলা যেতে পারে ভগবান হলেন অসৎ, কখন বলা হয় সৎ আবার কখন বলা হয় সৎ অসতের পার। ভগবানের উপর এই তিনটে শব্দই আনা হয়, কারণ যাকে ইন্দ্রিয় দিয়ে জানা যায় তাকে বলা হয় সৎ যাকে ইন্দ্রিয় দিয়ে জানা যায় না তাকে বলা হয় অসৎ। ভগবানকে জানা যায়, ঠাকুর বলেছেন ভগবানকে জানা যায় সেইজন্য তিনি সৎ। কিন্তু আমি আপনি জানতে পারছি না, সেইজন্য তিনি অসৎ। অথচ তিনি যে আছেন এই বুদ্ধিটাও নেই, তিনি যে নেই, তাঁর যে অভাব বোধ হচ্ছে সেই বোধটাও হচ্ছে না। এই বোতলটা আছে এর সৎ বুদ্ধিটা আমার আছে, এই বোতলের মধ্যে গরু নেই এই অভাব বোধের বুদ্ধিটাও আছে। কিন্তু ভগবানের ক্ষেত্রে সৎবুদ্ধিও লাগান যায় না অসদ্বুদ্ধিও লাগান যায় না। এখানে গরু নেই পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু এখানে যে ভগবান নেই এটা কি পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে? আদপেই না, কারণ শাস্ত্রে বলছে ভগবান আছেন, ঠাকুর বলছেন হ্যাঁ আছে, মাইরি বলছি আছে। সেই কারণে না বলা যাবে না। ভগবান সেইজন্য সৎ অসৎএর পার।

২৫শে সেপ্টেম্বর ২০১০

আমরা যে বিশ্বরূপ দর্শন নিয়ে আলোচনা করছি, অর্জুনকে ভগবান তাঁর যে বিশ্বরূপ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধভূমিতে দেখিয়েছিলেন, এই বিশ্বরূপ দর্শন কিন্তু ভাবের দর্শন। এই বিশ্বরূপের মধ্যে ভবিষ্যতের অনেক কিছু দেখা যাচ্ছে, আবার ভূতকালটাও অনেক কিছুর মধ্যে দেখা যাচ্ছে, এর সবটাই হল ভাবের দর্শন। অর্জুন ছাড়া আর বাকি যত যোদ্ধারা তখন সেখানে সেই সময় উপস্থিত ছিলেন

তারাও যে এই দৃশ্য দেখতে পাচ্ছিল, তা নয়। অর্জুনই একমাত্র দেখতে পাচ্ছিল, অর্জুন ছাড়া আর কারুরই এই দৃশ্য দেখার সৌভাগ্য হয়নি। এই ধরণের দর্শন যখন হয়, এই সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় ঈশ্বরের মধ্যেই হচ্ছে তখন মানুষ ঠিক ঠিক বুঝতে পারে যা কিছু সব ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই হচ্ছে। তবে মহাভারত পড়লে বোঝা যায় যে এই বিশ্বরূপ দর্শন করে যে অর্জুনের মোহ নাশ হয়ে গিয়েছিল, তা কিন্তু হয়নি। অর্জুনের মধ্যে আবারও মোহের জন্ম হয়েছিল। অভিমন্যুর মৃত্যুতে শোকগ্রস্ত হয়ে ভেঙ্গে মুহ্যমান হয়ে পড়েছিলেন, তাছাড়া বাকি সারাটা জীবন অজ্ঞান জড়িত সম্মোহ অর্জুনের মধ্যে থেকে গিয়েছিল।

এই নিয়ে এক সময় স্বামী মাধবানন্দজী মহারাজের সঙ্গে একজন খুব বরিষ্ঠ মহারাজের আলোচনা হচ্ছিল। কথায় কথায় উঠল যে ঠাকুর বলেছিলেন স্বামী যোগানন্দজী মহারাজ হলেন অর্জুনের অবতার। অর্জুন তো সাক্ষাৎ ভগবানের বিশ্বরূপ দর্শন করে নিয়েছিলেন তাহলে তাঁকে আবার কেন জন্ম নিতে হল। তখন স্বামী মাধবানন্দজী বলছেন – এটা কোথায় পেলে যে বিশ্বরূপ দর্শন হলে মুক্তি হবে? বিশ্বরূপ দর্শন হলেই মুক্তি হয়ে যাবে এটা কোথাও বলা হচ্ছে না। আমাদের শাস্ত্র বলছে, আত্মজ্ঞান না হলে মুক্তি নেই। কেউ যদি ঠাকুরকে দর্শন করে নেয় তাহলেও তার কিন্তু মুক্তি হবে না। হিন্দু ধর্মের সিদ্ধান্তকে যদি ঠিক ঠিক মানা হয় তাহলে কোন রকম দিব্য দর্শনেই মুক্তি হবে না, যতক্ষণ না আত্মজ্ঞান লাভ করছে। ভগবান অর্জুনকে বিশ্বরূপ দর্শন করিয়ে দিলেন কিন্তু অর্জুনের তাতে মুক্তি হয়নি। মুক্তিতো দূরের কথা অর্জুনের মোহনাশটাও তো ঠিক ঠিক হয়নি। মহাভারতের বর্ণনা অনুযায়ী শ্রীকৃষ্ণের যেমন মোহ বলে কিছু ছিল না, শ্রীরামচন্দ্রের মোহ বলে কিছু ছিল না, স্বামীজীর মোহ বলে কিছু ছিল না, সেই দিক দিয়ে অর্জুনের মোহ কিন্তু চিরদিন থেকে গিয়েছিল। সুতরাং ঈশ্বর দর্শন হলেই যে মোহ নাশ হবে, বিশ্বরূপ দর্শন হলে যে মোহ নাশ হবে এমনটি কোথাও কোন শাস্ত্রে পাওয়া যাবে না। তবে হ্যাঁ, একটা যে আধ্যাত্মিক সত্তা আছে সেই সত্তাতে দৃঢ় বিশ্বাস হয়ে যাবে। সেইজন্য মহাভারতাদি শাস্ত্র যদি না পড়া থাকে তাহলে শাস্ত্রের এই তত্ত্বগুলির তাৎপর্যটা বোঝা যায় না। যতই আমি গভীর ধ্যানে ডুবে যায়, যতই আমার জ্যোতি দর্শন হয়ে যাক, যতই আমি অনাহত শব্দ শ্রবণ করি, যতই ঈশ্বরীয় রূপ দর্শন হয়ে যাক, ঠিক ঠিক মোহ নাশ হবে যখন আত্মজ্ঞান লাভ করবে। আধ্যাত্মিক তত্ত্বের ব্যাপারে আমার শ্রদ্ধা বেড়ে যাবে, উদ্দীপন হবে সবই হবে কিন্তু মোহ নাশ হবে না। সাময়িক ভাবে হয়তো মোহটাও নাশ হতে পারে, মনের মধ্যে দুঃখ আছে, একটু ভালো কথা শুনলাম তখনকার মত দুঃখটা কেটে গেল, কিন্তু পুরোপুরি যাবে না, কিছু সময় পর আবার সেই দুঃখটা ঘিরে ফেলবে।

৩৭ নং শ্লোক পর্যন্ত কিছুটা আলোচনা হয়ে গেছে। অর্জুন এই বিশ্বরূপ দর্শন করে গদগদ হয়ে গেছে আর সব অসুর, রাক্ষস, জন্তু, জীব ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে চারিদিকে পালাচ্ছে, অন্য দিকে সিদ্ধরা হাতজোড় করে ভগবানের স্তুতি করছেন। এই সব দেখে অর্জুন বলছেন – কেনই বা সিদ্ধরা আপনার স্তুতি করবেন না, আপনি হচ্ছেন *গরীয়সে*। কার থেকে শ্রেষ্ঠ? এই জগতের যিনি আদিকর্তা হিরণ্যগর্ভ থেকেও আপনি বড়। আমরা যখন সৃষ্টির কথা বলি, সৃষ্টির প্রথম যেটা হয় তাঁকে ব্রহ্মা বলা হয়। এই ব্রহ্মাকে অনেক রকম শব্দ দিয়ে সম্বোধন করা হয়ে থাকে। বেদান্তে এই ব্রহ্মাকে বলা হয় হিরণ্যগর্ভ, আপনি এই হিরণ্যগর্ভেরও কর্তা। নিম্নশ্রেণির লোকেরা নিজেদের বাবা আর তার বাবার বাবাকে, মানে ঠাকুর্দাকে হয়তো মনে রাখে, তার আগে আর যেতে পারেনা। আমাদের ধর্মের দিক থেকে যখন দেখা হয় তখন বলবে শেষ আদিকর্তা হলেন ব্রহ্মা, বেদান্ত যাঁকে বলছে হিরণ্যগর্ভ বা প্রকৃতি। তারপরে যেটা আছে তার সাথে সৃষ্টির সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই। *গরীয়সে ব্রহ্মণোঽপ্যাদিকর্ত্রে*, আপনি ব্রহ্মার থেকেও বড়। বাকি যাঁরা আছেন *সিদ্ধসঙ্ঘা*, রাক্ষসাদি এরাতো সবাই ব্রহ্মার নীচে, সেইজন্য এরাতো আপনাকে প্রণাম করবেই, এতে আর আশ্চর্যের কি আছে।

একটা হাসির গল্প আছে – এক উকিল মরার পর স্বর্গে গেছে। স্বর্গে যত লোকজন আছে সবাই যে যার জায়গা ছেড়ে দিয়ে উকিলকে আসুন আসুন বলে খুব আদর আপ্যায়ন করছে। উকিল তখন জিজ্ঞেস করছে, হঠাৎ করে আমাকে এত সম্মান দিচ্ছেন কেন? কেন সম্মান দেবো না বলুন, আপনি আপনার ক্লায়েন্টদের আজ কাল করে যত সময় দিয়েছেন সেই সময়ের হিসেব করে দেখা যাচ্ছে, যত সময় আপনি দিয়েছেন সেই অনুসারে আপনার বয়স দুশোর ওপরে চলে যাচ্ছে, সেইজন্য আপনি আমাদের সবার থেকে বয়সে বড় তাই আপনাকে সম্মান দিয়ে আপ্যায়ন করা হচ্ছে। যারা কম্প্যুটার সারাতে যায় তারা দু ঘন্টা কাজ করে পার্টিদের থেকে লিখে নেয় পাঁচ ঘন্টা কাজ করা হয়েছে। এখন সারা দিন হয়তো তিনজনের কাছে দু ঘন্টা করে কাজ করেছে, কিন্তু কাগজে কলমে দেখাচ্ছে সারাদিনে সে ষোল ঘন্টা কাজ করেছে। এরপর তার বাড়িতে স্নান, খাওয়া-দাওয়া, ঘুমানো সবই আছে। উকিল সাহেবরাও ক্লায়েন্টদের কাছে গিয়ে বলে আমি তোমার জন্য তিন দিন কাজ করেছি। একটা মাসে পঁচিশ জন ক্লায়েন্টদের কাছে বলে গেছে প্রত্যেকের জন্য তিন দিন কাজ করেছে, মাসে তো তিরিশটাই দিন হবে এখন উকিল সাহেবের কাছে সেই মাসটা যেন পঁচাত্তরটা দিন হয়ে গেছে। এই রকম করে ভগবান যখন তার বয়স হিসেব করেছেন তখন দেখাচ্ছে তার বয়স প্রায় দুশো বছর পেরিয়ে গেছে। সিনিয়র লোককে সবাই সম্মান দেয়, সিনিয়র সিটিজেনদের সরকার থেকেও অনেক রকম সুবিধে দেওয়া হয়। এখানেও অর্জুন বলছেন, আপনি তো সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মারও আগে তাই আপনাকে তো সবাই নমস্কার করবেই।

*ত্বমক্ষরং সদসৎ তৎ পরং যৎ*, এই অক্ষর শব্দেরও অনেক অর্থ হয়, যেমন *ন ক্ষরন্তি ইতি*, যে জিনিষের কখনই ক্ষয় হয় না। এখানে অক্ষর বলতে বলছেন *বেদান্তেষু সূয়তে*, বেদান্তে যাঁকে অক্ষর বলা হয়েছে, মানে ব্রহ্ম, আপনি সেই সাক্ষাৎ ব্রহ্ম। তার মানে শ্রীকৃষ্ণকে বলা হচ্ছে তিনি সেই বেদান্তের সাক্ষাৎ ব্রহ্ম, বেদান্তে যাঁকে অক্ষরও বলা হয়েছে। সেইজন্য আপনাকে সবাই প্রণাম করবেই। জগতে যা কিছু আছে সবই আপনার থেকে প্রসারিত হয়েছে। বেদান্ত মতে সৃষ্টি হচ্ছে একমাত্র ব্রহ্ম থেকে। এই জগৎ ব্রহ্মা থেকে কিন্তু ব্রহ্ম আলাদা, ব্রহ্মা সৃষ্টি করছেন, ব্রহ্মা নিজের বাইরে সৃষ্টি করছেন। কিন্তু ভগবানের বাইরে না। আমরা কিন্তু ইন্দ্র, মিত্র, অগ্নি, বরুণ সব দেবতার বাইরে, ব্রহ্মা, যিনি প্রপিতামহ তিনি আমাদের থেকে বাইরে, কিন্তু ভগবানের বাইরে কেউ নয়। ভগবানেরই একটা অংশে এমন একটা মায়ার খেলা হয়ে যায় তার ফলে ভগবানের সেই অংশে জীব জগৎ সব সৃষ্টি হয়ে যাচ্ছে। এই জীব জগৎ যখন হচ্ছে তখন প্রথম হচ্ছেন ব্রহ্মা, তাই আপনি ব্রহ্মার থেকে ওপরে। শুধু তাই নয়, আপনি *সদসৎ তৎ পরং যৎ*। যেখানে এই সদসৎ এর কথা আসে সেইখানেই ব্যাপারটা খুব জটিল হয়ে যায়। কোথায় সৎ বলতে কি বোঝাচ্ছে অসৎ বলতে কি বোঝাচ্ছে, ভাষ্যকার যতক্ষণ না এটাকে ধরিয়ে দিচ্ছেন ততক্ষণ সদসৎ এর অর্থটা ধরা যায় না। যিনি ভাষ্যকার তিনি ব্যপারটার একটা সঙ্গতিপূর্ণ সমন্বয় করে দেন। সৎ কথার অর্থ হচ্ছে যেটা ইন্দ্রিয়গোচর, মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়ের দ্বারা জানা যাচ্ছে সেটাকে সৎ বলা হচ্ছে। অসৎ কথার অর্থ হচ্ছে যেটা ইন্দ্রিয়ের অগোচর, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি দিয়ে যেটাকে ধরা যায় না। বেদে যখন সৃষ্টির কথা বলা হয় তখন কখন বলে সৃষ্টি সৎ থেকে কখন বলে সৃষ্টি অসৎ থেকে। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে সৎ আর অসৎ বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন অর্থে বলা হয়, সেইজন্য ব্রহ্ম বলতে কখন সৎ বলে আবার ব্রহ্মকে কখন অসৎ অর্থেও বলা হয়। বলা হয় ব্রহ্মই সৎ আর বাকি সব অসৎ। আবার ব্রহ্মকে অসৎ কেন বলা হচ্ছে? ঠাকুর এই জিনিষটা খুব সহজ ভাবে বিদ্যাসাগর মশাইকে বোঝাচ্ছেন – ব্রহ্ম কি জিনিষ সেটা মুখে বলা যায় না। ঠাকুর বলছেন – জগতের সব কিছু উচ্ছিষ্ট হয়ে গেছে, ব্রহ্ম কিন্তু কখন উচ্ছিষ্ট হয় না। কারণ ব্রহ্মকে কেউ জানতে পারেনা, যখন কেউ জানতে পারবে না তাহলে মুখ দিয়ে তাঁর বর্ণনা করবে কিভাবে, মুখ দিয়ে যেটা বলা হয় সেটাই উচ্ছিষ্ট হয়ে গেল, কিন্তু যেহেতু ব্রহ্ম কি মুখ দিয়ে বলা যায় না তাই ব্রহ্ম কখন উচ্ছিষ্ট হয় না।

আসলে বলতে চাইছেন যে ব্রহ্মকে মন ধরতে পারেনি, মন যেটা ধরতে পারেনা সেটাই অব্যক্ত, আর অব্যক্তকে অসৎ বলা হয়, তাই ব্রহ্ম অসৎ। অসৎ এর আরেকটি অর্থ হয় যে জিনিষটা নেই। যেমন বন্ধ্যা পুত্র। বন্ধ্যার কখন সন্তান হবে না, যদি তার পুত্র হয় তাহলে সে আর বন্ধ্যা থাকবে না, তাই বন্ধ্যা পুত্র বলে কিছু হয় না। বাংলাতে যেমন বলা হয় ঘোড়ার ডিম, ঘোড়ার ডিম মানে যে জিনিষটা নেই। এখানে অসৎ বলতে বোঝাচ্ছে যার কোন সত্তা নেই। শাস্ত্রে বিভিন্ন জায়গায় একই শব্দের বিভিন্ন অর্থ হতে পারে।

এখানে বলছেন, ব্রহ্মকে কখন সৎ বলা হয়। কেন সৎ বলা হয়? কারণ একমাত্র তিনিই আছেন, তিনি ছাড়া আর কিছু নেই। খুব সূক্ষ্ম বুদ্ধি না হলে এই সৎ শব্দের সঠিক তাৎপর্যটা বোঝা যাবে না। আমরা আমাদের করে বুঝবার চেষ্টা করছি। এই মাইক্রোফোনের সাথে স্টীলের রডটা আছে, এটাকে আমরা ইংরাজীতে বলতে গেলে বলব this is steel rod, এই is শব্দটা, এটাকে বাংলায় বলতে গেলে বলব – এটা হচ্ছে স্টীলের রড। ইনি কে? ইনি হচ্ছেন আমার বাবা। বাংলাতে হচ্ছে লাগিয়ে দেওয়া হয় আর ইংরাজীতে isness লাগিয়ে দেওয়া হয়। এখন লোহা আর লোহার ডাণ্ডাটা কি আলাদা? নাম আর রূপের তফাৎ মাত্র। এখন এই রূপ আর নামটাকে যদি সরিয়ে দেওয়া হয় তাহলে এটা স্টীলই থাকবে, ইংরাজীতে বলবে this is steel আর বাংলাতে বলবে এটা হচ্ছে লোহা, is আর হচ্ছেটা কিন্তু থেকে যাচ্ছে। নাম ও রূপের যখন পরিবর্তন হল তখন এটা হয়ে গেল স্টীলের ডাণ্ডা আর নাম ও রূপকে যখন সরিয়ে দেওয়া হল তখন সেটা হয়ে গেল স্টীল, কিন্তু হচ্ছে, এটা আছে এই ব্যপারটা থেকে যাচ্ছে। স্টীলটা কোথা থেকে এসেছে? লোহা থেকে। লোহার নাম রূপ যখন পাল্টে আরও কিছু জিনিষ সংযুক্ত করে দেওয়া হচ্ছে তখন সেটা স্টীল হয়ে গেল। তার মানে যেটা লোহা সেটাই স্টীল, আবার যেটা স্টীল সেটাই ডাণ্ডা হয়েছে। কিন্তু isness যেটা, হচ্ছে বা আছে সেটা থেকেই যাচ্ছে। কেমেস্ট্রির দিক থেকে লোহাটা কতকগুলি মৌলিক পদার্থের উপাদান দিয়ে তৈরী হয়েছে, তাহলে লোহাটা মূলতঃ হয়ে গেল কতকগুলি রাসায়নিক পদার্থের উপাদানের সংমিশ্রণ, ইংরাজীতে বলবে this is a chemical element, এখানেও সেই isness টা থেকেই যাচ্ছে। এই এলিমেন্টকে যদি আরও পেছনের দিকে নিয়ে যাই তখন দেখতে পাব এগুলো ইলেক্ট্রন প্রোটনের তৈরী। আবার আইনস্টাইনের থিয়োরিতে নিয়ে যাই তখন বলবে This is condensed energy, energy যখন condensed form চলে যাবে তখন সেটাই matter, আসলে এটা ম্যাটারই, বলছে this is condensed energy, কিন্তু isness থেকেই যাচ্ছে। জগতে যা কিছু দৃশ্য বস্তু আছে, নাম রূপ যাই হোক না কেন, সমস্তটাই কিন্তু matter, নাম ও রূপের জন্য সব আলাদা হয়ে যাচ্ছে। আগে আমরা জানতাম matter, আর energy আলাদা কিন্তু এখন জানি দুটো একই, এখন আমরা বলি energy হচ্ছে basis, মানে ভিত্তি। ঐ energy কে basis করেই এটা হয়ে গেছে প্লাস্টিকের বোতল, এটা হয়ে গেছে মাইক্রোফোন। কিন্তু সর্ব ক্ষেত্রে isness জিনিষটা সাধারণ, যেটা প্রথম থেকে চলে আসছে। এই isness কেই শঙ্করাচার্য বলছেন সৎ, যেটা আছে। এই সৎকেই যখন বলা হয় শুদ্ধ ও সহজ তখন এই সৎটাই থাকবে, এই সৎ ছাড়া আর কিছু নেই। এই সৎই যখন দর্শনের তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ থেকে আধ্যাত্মিকতায় চলে আসে তখন আধ্যাত্মিক ভাষায় বলা হচ্ছে ব্রহ্ম। এই একই জিনিষ দার্শনিক ভাষায় সৎ হয়ে যায় আধ্যাত্মিক ভাষায় ব্রহ্ম হয়ে যায়। যেমন আমি বাড়িতে যখন আছি তখন আমি কারুর বাবা,

কারুর দাদা, অফিসে আমিই আবার হয়ে যাচ্ছি বাবু, আবার পাড়াতে আমিই হয়ে যাচ্ছি কাকু। ব্রহ্মও ঠিক তাই, দর্শনের ভাষায় ব্রহ্মকে বলা হচ্ছে সৎ আর আধ্যাত্মিক ভাষায় বল হয় ব্রহ্ম। এখন ব্রহ্মই বলি আর সৎই বলি তাতে কিছু যায় আসে না, তত্ত্বটাকে বোঝা নিয়ে কথা। কি তত্ত্ব? যাবতীয় যা কিছু আছে সবটাই সৎ, মানে আছে, অস্তি। কিসের অস্তি? শুদ্ধ চৈতন্যের। সেইজন্য সেটা জড় না শক্তি, চিন্তা না কল্পনা কোন কিছুই নয়, যে জিনিষটাই আছে এই বোধ, অস্তি, এইটাই হচ্ছে সৎ। এই সৎ আর ব্রহ্ম এক, আলাদা নয়। তাই ব্রহ্মই হচ্ছেন সৎ। আবার তিনি অসৎ। কেন অসৎ? কারণ ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি দিয়ে এই সৎ বা ব্রহ্মকে জানা যায় না। কিন্তু যাঁরা বেদবেত্তা, তাঁরা এটাকেই আবার বলেন অক্ষর, যাঁর কোন ক্ষয় হয় না। আমাদের কাছে ঈশ্বর বলতে আমরা শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণকে মনে করছি, তখন ঈশ্বর সগুণ সাকার হয়ে গেলেন। ঈশ্বর যখন সগুণ সাকার হয়ে গেলেন তখন আমি ঈশ্বরকে বেঁধে দিলাম। আবার যখন বলছি *সত্যং জ্ঞানং অনন্তম্‌*, ঈশ্বর কি? সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত, সচ্চিদানন্দ। ঈশ্বর অনন্ত, ব্রহ্ম অনন্ত যখন বলছি তখনও কিন্তু তাঁকে বেঁধে দেওয়া হচ্ছে। যখন ঈশ্বরকে সগুণ বলছি তখনও যেমন ঈশ্বরকে বেঁধে ফেলা হচ্ছে আবার নির্গুণ বললেও কিন্তু তাঁকে বেঁধে ফেলা হচ্ছে। সেইজন্য বেদ বলছে ব্রহ্ম কি বস্তু মুখে বলা যায় না। কিন্তু ঠাকুরও তো পরিষ্কার বলছেন তিনি নির্গুণ নিরাকার, কেন বলছেন? এটাকে বেদান্তে বলে উপচার মাত্র, আঙুল দিয়ে দেখানোর মত।

সেইজন্য বলছেন ব্রহ্ম কি? সৎ। ব্রহ্ম আর কি? অসৎ। তারপর বলছেন তৎ পরং যৎ, ব্রহ্ম আবার সৎ অসতের পার। সৎ অসতের পার কেন? কারণ সৎ আর অসৎটা হচ্ছে উপচার মাত্র, সৎ ও অসৎ শুধু ইঙ্গিত করা, তার বেশি কিছু নয়। নির্গুণ নিরাকার বলাটাও উপচার মাত্রই। এইসব তত্ত্ব কথা একদিন শুনলে কিছুই বোঝা যায় না, অনেক সাধনা করতে করতে আর তত্ত্ব কথা শুনতে শুনতে ভেতরে একটা দাগ কাটে, দাগ কাটা হলে তখন একটু ধারণা করতে পারা যায়। ভগবানের সম্বন্ধে যদি শেষ কথা বলতে হয় তাহলে এইটাই *ত্বমক্ষরং সদ্‌সৎ তৎ পরং যৎ*, তিনি অক্ষর ব্রহ্ম, তিনি সৎ, তিনি অসৎ আবার সৎ ও অসতের পার। ঠাকুর বলছেন তিনি সগুণ নির্গুণ, সাকার নিরাকার আবার এই সব কিছুর পারে আরও কত কি। নির্গুণ নিরাকার বলে যে উপচার মাত্র করে ইঙ্গিত করা হয় তার কারণ এটাই বলার জন্য যে তাঁকে বোঝান যায় না।

আবার অনেক সময় সৎ বলা হয় জগতের সব বস্তুকে আর অসৎ বলা হয় প্রকৃতিকে। আবার অনেক সময় অসৎ বলা হয় অসৎ বস্তুকে যেমন বন্ধ্যাপুত্র। এইজন্য বলা হয় শাস্ত্র গুরুর কাছে পড়তে হয়। তা নাহলে কি হবে? আমি সৎ মানে শুনে রেখেছি যেটা আছে, অসৎ মানে শুনে রেখেছি মায়া বা অলীক মানে যেটা নেই। ভারতের উপর প্রথম যে ঠিক ঠিক ইতিহাস পাই, আজ থেকে প্রায় হাজার বছর আগে বিখ্যাত ঐতিহাসিক আলবেরুনি সেটা লিখেছিলেন। সেখানে সংস্কৃত ভাষাকে ব্যঙ্গ করে বলছেন – সংস্কৃত ভাষা একটা জঘন্য ভাষা, এই ভাষাকে নিয়ে হিন্দুরা আবার গর্ব করে। সংস্কৃতে একটা শব্দ দিয়ে পাঁচটা বস্তুকে বোঝায়, আবার একটা বস্তুর জন্য পাঁচটা শব্দ আছে, এটা একটা কোন ভাষা হল! আলবেরুনি যে মন্তব্য করেছেন এটা সত্যিই সংস্কৃতের একটা বিরাট সমস্যা। একই শব্দের পাঁচ রকম অর্থ, একটা শব্দ আছে মনে করুন 'এক্স' এখন এই 'এক্স' মানে জলও হতে পারে আবার আগুনও হতে পারে, 'এক্স' মানে লোহাও হতে পারে। অন্য দিকে একটাই জিনিষ তার আবার পাঁচ খানা নাম, জলকে 'এ', 'বি', 'সি', 'ডি' আর 'ই' পাঁচটাই বলছে। এর ফলে যারা ভাষ্যকার তাঁরা একটার উপরই জোর দেবেন, তখন তারা বলেন যে অমুক শব্দের এই অর্থ করলে ভাবটা অন্য রকম হয়ে যাবে। সেইজন্য শঙ্করাচার্য বলছেন, গুরু পরম্পরা বিদ্যা যদি না থাকে বেদান্তে পুরো গোলমাল লেগে যাবে। তাই যখন তর্ক করছেন তখন শঙ্করাচার্য পরিষ্কার বলে দিচ্ছেন এটা কিন্তু পরম্পরায় নেই। অন্য দিকে রামানুজাচার্য একেবারেই কোন পরম্পরায় শেখেননি। রামানুজ ও মাধ্বাচার্য এনারা নিজেদের গুরুকেই প্রত্যাখ্যান করে দিলেন। সেইজন্য সব আচার্যকে পরম্পরায় নেওয়া যায় না। কিন্তু কেউ যদি বলে আমি পরম্পরাতেই বিশ্বাস করি না, তখন কিছুই বলার নেই, সে তার যুক্তি তর্ক দিয়ে কিছু বলবে। এখানে কাউকে ছোট বড় করা হচ্ছে না, কিন্তু পরম্পরা বিদ্যা না হলে শাস্ত্র জ্ঞান হবে না। ঠাকুর তোতাপুরীকে বলছেন – যতক্ষণ বেদান্ত না বুঝিয়ে দিচ্ছ আমি তোমাকে এখান থেকে যেতে দেব না। যে লোকটি তিন দিনের বেশি কোথাও থাকতেন না, সে কিনা এগারো মাস দক্ষিণেশ্বরের মাটিতে পড়ে রইলেন শুধু ঠাকুরের কথায় পরম্পরা বিদ্যাতে বেদান্তকে যে ভাবানুযায়ী দেখানো হয়েছে ঠিক সেই ভাবটাকে ঠাকুরের মাথায় বসিয়ে তারপর দক্ষিণেশ্বর থেকে বিদায় নিলেন। তোতাপুরীর মত যদি গুরু হয় আর ঠাকুরের মত যদি শিষ্য সেখানে বেদান্ত বোঝার জন্য এগারো মাস অনেক সময়। বিদ্যা যদি পরম্পরা না হয় তখন অনেক সমস্যা এসে যাবে, কোনটা কার ঘাড়ে চলে যাবে কোন ঠিক থাকবে না। যেমন নিত্য অনিত্য বা মিথ্যা এই শব্দ দুটি অনেক জায়গায় অনেক ভাবে ব্যবহৃত হয়। শঙ্করাচার্যের ব্রহ্মসূত্র ভাষ্য যদি কেউ পড়ে থাকেন তাহলে সেখানে দেখতে পাবেন মিথ্যা শব্দের কিভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

শঙ্করাচার্য ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে প্রথম সূত্রের ব্যাখ্যা যেখান থেকে শুরু করছেন, মানে প্রথম বাক্যটা যেখান থেকে শুরু হচ্ছে সেটাকে বলা হয় অধ্যাসভাষ্য, অধ্যাস মানে মিথ্যা। আরেকটা বলা হয় চতুঃসুত্রী, চারটে সূত্র তার উপরে ভাষ্য দিয়েছেন। এর একটা পাতা পড়ার পর কান ধরে বলতে হবে জীবনে আর বেদান্ত পড়ব না। এই চারটে সূত্রে কি বলছেন শঙ্করাচার্য যেটাকে পড়তে গিয়ে দুচার পাতার পর বড় বড় পণ্ডিতরা বলেন জীবনে আর ব্রহ্মসূত্র ছোঁব না? শুধু মিথ্যাটা কি এটাকেই ব্যাখ্যা করতে গিয়ে পাতার পর

পাতা তিনি ভাষ্য রচনা করে গেছেন। সাধারণ লোকেদের মতে মিথ্যা কি, সাংখ্যদের মতে মিথ্যা কি, বৌদ্ধদের মতে মিথ্যা কি, ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদ মতে মিথ্যা কি, এইভাবে নানান রকম দর্শনের মতে মিথ্যার বিবরণ দিয়ে শঙ্করাচার্য বলছেন, মিথ্যা মানে এই। তখন যে সব দর্শনের নাম করা হল তাদের বড় বড় পণ্ডিতরা সবাই শঙ্করাচার্যকে চেপে ধরবে। ষড়দর্শন হচ্ছে আস্তিক দর্শন, যারা বেদ মানে। আবার নাস্তিক দর্শনও ছয়টি, এদের মধ্যে জৈন, বৌদ্ধ আর চার্বাকের কথাই বেশি বলা হয়। কিন্তু বৌদ্ধদের মধ্যে চারটি চার রকমের মত আছে তখন আবার এই চারটেকেই এক সঙ্গে ধরা হয়, তাই চার আর দুই ছয়, এই ছয়টি নাস্তিক দর্শন। এবারে বেদান্তকে বাদ দিয়ে আস্তিক নাস্তিক মিলিয়ে মোট এগারটি দর্শন হয়ে গেল। শঙ্করাচার্য বাদে বেদান্তে আবার আরও দুটি মত আছে একটা হল রামানুজ আর দ্বিতীয়টি হল মাধ্বাচার্যের মত। তাহলে মোট দর্শন গিয়ে দাঁড়াল এগারো যোগ এই দুই তেরো। যখন শঙ্করাচার্য মিথ্যার সম্বন্ধে বলবেন তখন এই তেরোটি দর্শনে মিথ্যা বলতে কি বলেছে পুরো তেরোটি মতকে সামনে নিয়ে এসে দেখাবেন এই তেরোটি মতই কিভাবে মিথ্যাকে ভুল ব্যাখ্যা করছে। এখন এই তেরোজন শঙ্করাচার্যকে ছেড়ে দেবে নাকি! তারা সবাই এবার ঝাঁপিয়ে পড়ে বলবে আপনি যেটা বলছেন সেটা ভুল। এবারে ভাবুন শঙ্করাচার্যকে কত রকমের যুক্তি প্রমাণ জানতে হবে, তেরোটা যুক্তি তাকে খণ্ডন করার জন্য, আর নিজের মত যেটা বলবেন সেটার উপর যে আক্রমণ হবে, সেটার আবার তেরোজনের জন্য তেরোটা উত্তর জানতে হবে। তাই যুক্তিতর্কের বিচারে যে নিজেকে দাঁড় করাচ্ছে, তাঁকে আগে ছাব্বিশটা দর্শনকে জানতে হবে। পুরো ছাব্বিশট দর্শনের উপর দখল হলে মিথ্যা জিনিষটা কি তখন বোঝা যাবে। কে কোথায় কি বলেছে সেখানে বললে চলবে না, নিজেকে পুরো যুক্তি তর্ক দিয়ে দেখাতে হবে। স্বামীজী একবার কোথাও বলছেন না যে আমাদের বেদে এই বলেছে, আমাদের উপনিষদে এই বলেছে, এমনকি আমেরিকাতে ঠাকুরের নাম পর্যন্ত নিয়ে কিছু বলতে চাইতেন না, নিজে পুরো জিনিষটাকে প্রখর যুক্তি দিয়ে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিলেন। শঙ্করাচার্যও ঠিক এইভাবে পুরো যুক্তিতর্ক দিয়ে দাঁড় করিয়েছেন।

শঙ্করাচার্য যখন নিজের মত দিচ্ছেন তখন ঐ তেরোজন আবার তাঁকে আক্রমণ করছে, সেই আক্রমণের ধারকে যুক্তি দিয়ে ভোঁতা করে নিজের মতকে বলে যাচ্ছেন। পণ্ডিতদের মধ্যে প্রচলিত যে, ব্রহ্মসূত্র পড়তে গিয়ে সবার বুদ্ধির পরীক্ষা হয়ে যায়। কিন্তু বড় বড় পণ্ডিতরাও ব্রহ্মসূত্রে এসে হাবুডুবু খেতে আরম্ভ করে দেয়, সেইজন্য বেশির ভাগ লোকই ব্রহ্মসূত্রকে শুধু মুখস্ত করে নেয়।

সৎ ও অসৎ এর মত নিত্য, অনিত্য ও মিথ্যাকেও কোথায় জিনিষটাকে নিত্য বলা হচ্ছে, কোথায় অনিত্য বা মিথ্যা বলা হচ্ছে ঐ দৃষ্টিকোণ থেকে আমাকে তখন বিচার করতে হবে। এই তেরো যোগ তেরো ছাব্বিশটা দর্শনেই আলোচনা করা হচ্ছে মিথ্যা জিনিষটা কি। মিথ্যাকে আমি যেভাবে পরিভাষিত করব আমার দর্শন ঠিক সেইভাবেই দাঁড়াবে। একটু এদিক ওদিক হয়ে গেলে সেটা সাংখ্য দর্শনে ঢুকে পড়তে পারে, আবার একটু এদিকে চলে গেলে সেটাই ন্যায় বৈশাষিক দর্শনে চলে যাবে বা রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ হয়ে যাবে বা মাধ্বাচার্যের দ্বৈতবাদ হয়ে যাবে। আবার অদ্বৈত বেদান্তের যে মিথ্যা সেটা যদি একটু এদিক থেকে সেদিক হয়ে যায় তাহলে হয় সেটা বৌদ্ধদের শূন্যবাদ হয়ে যাবে তা নয়তো বৌদ্ধদের ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদ হয়ে যাবে। বৌদ্ধদের একটা মতে হচ্ছে শূন্যবাদ, এরা বলে এই জগতে কিছু নেই। তাহলে কি আছে? শূন্য আছে। তাহলে এগুলো কি দেখছি? মানুষ যেমন স্বপ্ন দেখে এগুলো সব স্বপ্ন, স্বপ্ন ছাড়া কিছু নয়। কি রকম শূন্য? বন্ধ্যাপুত্রের মত শূন্য। আমাদের শাস্ত্রও বলছে ঈশ্বর ছাড়া আর কিছু নেই। ঠাকুরও বলছেন – ব্রহ্মই বস্তু বাকি সব অবস্তু। তাহলে বেদান্তও তো শূন্যবাদ হয়ে গেল, বেদান্ত আর বৌদ্ধ দর্শনের তফাৎ কোথায় রইল।

তখন বেদান্ত বলবে – তুমি যে বুদ্ধি দিয়ে বলছ এটা নেই, তাহলে সেই বুদ্ধিটাও নেই। এই বোতলটা যদি শূন্য হয় তাহলে যে বুদ্ধি দিয়ে এই বোতলটাকে শূন্য বলছি সেই বুদ্ধিটাও তো শূন্যই হয়ে গেল। তোমার বুদ্ধিটাই যদি শূন্য হয় তাহলে তোমার কথাকে আমি বিশ্বাস করব কি করে? শূন্যবাদের বিরুদ্ধে এটা হচ্ছে প্রধান আপত্তি। সবটাই যদি স্বপ্ন হয় তাহলে যে বুদ্ধি দিয়ে স্বপ্ন বলছি তখন সেই বুদ্ধিটাও তো স্বপ্ন। স্বপ্ন স্বপ্নকে কি আলোচনা করবে। শঙ্করাচার্যও যখন বলেন তখন তিনি স্বপ্ন কখনই বলেন না। আচার্য শঙ্কর বার বার যেটা বলছেন তা হল স্বপ্নবৎ, ঠাকুরও পুরো কথামৃতে যেটা বলছেন সেখানেও স্বপ্নবৎ বলছেন। স্বপ্ন আর স্বপ্নবৎএর মধ্যে অনেক তফাৎ। যিনি বলবেন এই জগৎটা একটা স্বপ্ন তখন এটা হয়ে যাবে বৌদ্ধদের শূন্যবাদ। কিন্তু যেমনি বলবে এই জগৎ স্বপ্নবৎ, তখন এটা হয়ে যাবে বেদান্ত। আচার্য শঙ্কর বলবেন, এই ইস্পাতের যে রডটি এখানে আছে, নেই বলতে পারব না, পুরোমাত্রায় এখানে আছে। কারণ যে বুদ্ধি দিয়ে বলব এই রডটা এখানে নেই, তাহলে তক্ষুণি সেই বুদ্ধিকে নিয়েই প্রশ্ন করে দেওয়া যাবে। কিন্তু এই ইস্পাতের যে রড এর থেকে বেশি সত্য হচ্ছে ইস্পাতের আসল জিনিষটা লোহা। আমি যদি টাটার স্টীল ফ্যাক্টরীতে চলে যাই তখন সেখানে ইস্পাত দিয়ে চামচ, থালা, গ্লাশ সব কিছুই তৈরী করে নিতে পারি। তাহলে এখানে কোনটা বেশি সত্য, লোহাটাই বেশি সত্য। এখান থেকে যদি আমি কোন জিনিষের পরমাণুর স্তরে চলে যাই যেখানে কয়েকটা পরমাণুকে লাগানোর পরে যে কোন জিনিষ তৈরী করে দিতে পারব বা আমরা যদি তন্মাত্রার মালিক হয়ে যাই তখন ঐ তন্মাত্রা দিয়ে যে কোন জিনিষ তৈরী করে দেওয়া যাবে, ঐ একটা জিনিষ দিয়েই জলও তৈরী করে দেওয়া যাবে আবার ঐ একই জিনিষ দিয়ে ইস্পাত তৈরী করে দেওয়া যাবে, সেটতো আরো গভীর সত্য হয়ে গেল। এখন যেটা কম গভীর সত্য সেটাকে বলছেন মিথ্যা বা অনিত্য। আমরা যে স্বপ্ন দেখছি

সেই স্বপ্ন হচ্ছে কম গভীর সত্য। যখন স্বপ্ন দেখার পর ঘুম ভেঙ্গে গেল তখন বুঝতে পারছি যে এটা স্বপ্ন ছিল, এতক্ষণ আমি স্বপ্ন দেখছিলাম। তাহলে এটাকে কি মিথ্যা বলা যাবে? না, এটা পুরোপুরি সত্য। কিন্তু যখন জাগ্রত অবস্থায় দেখছি তখন বুঝতে পারছি যে ওটা স্বপ্ন ছিল, তখন স্বপ্নটা হয়ে যাচ্ছে কম সত্য। স্বামীজী অনেকবার বলছেন – আমরা সবাই নিম্ন সত্য থেকে উচ্চতর সত্যের দিকে চলেছি। আমি যতক্ষণ স্বপ্ন দেখছিলাম তখন সেটা আমার কাছে পুরোপুরি সত্য ছিল, ঘুম ভাঙার পর আমি দেখছি ঐ জিনিষটা নেই, শুধু তাই নয় বাকি যত কজন আছেন তাদের কাছেও ওটা নেই। এই স্টীল রডটাকে আমি দেখতে পাচ্ছি স্টীল রড, এখানে আর কেউ এটাকে গাধা বা ঘোড়া দেখছেন না, সবাই স্টীল রডই দেখতে পাচ্ছেন। স্বপ্নে যে স্টীল রড দেখেছিলাম আর এখন যে স্টীল রড দেখছি এই দুটো স্টীল রডের মধ্যে তফাৎ আছে। স্বপ্নে ওটা আমি দেখতে পাচ্ছিলাম বাকি কেউ দেখতে পাচ্ছিল না, এখন এই স্টীল রড আমিও দেখতে পাচ্ছি বাকি সবাই যারা আছেন তাঁরাও দেখতে পাচ্ছেন। তাই এই স্টীল রড স্বপ্নের স্টীল রডের থেকে বেশি নিত্য। এইভাবে যখন ব্রহ্মতে চলে যাব তখন দেখব ব্রহ্মই একমাত্র নিত্য, ব্রহ্মের উপরে আর কোন নিত্য হয় না। ব্রহ্মের তুলনায় বাকি যা কিছু সব অনিত্য। আজকে এই মুহুর্তের দিনটা যেমন আমার কাছে নিত্য মনে হচ্ছে স্বপ্নটা হচ্ছে অনিত্য ঠিক তেমনি ব্রহ্ম হচ্ছেন নিত্য আর এই জীবনটা হচ্ছে অনিত্য। সেইজন্য বেদান্ত বলছে যেটা দেশ ও কালের মধ্যে আবদ্ধ সেটাই অনিত্য। অসতের এইটাই বেদান্তের সংজ্ঞা, *যৎ দেশতো কালতো বা পরিচ্ছিনঃ*, যে জিনিষটাকে কাল আর দেশের মধ্যে বেঁধে দেওয়া যায় সেটাই অসৎ।

এখন এই যে স্টীলের রডটি আজ থেকে পাঁচশ বছর আগে কি ছিল? ছিল না। তখন কি ছিল এটা? লোহার খনিতে আকরিক পাথর হয়ে পড়ে ছিল, তাহলে এটা সময় ও দেশকালের মধ্যে বাঁধা, দেশ ও কালের মধ্যে বাঁধা বলে এটা অনিত্য। তাহলে যদি বলি লোহার খনি এই লোহা পাথর হয়ে পড়েছিল, সেটা তো ছিল। হ্যাঁ ছিল। কিন্তু পৃথিবী যখন সৃষ্টি হয়নি তখন কি ওটা ছিল? ছিল না। তাহলে এই খনির পাথরটাও অনিত্য। তাহলে নিত্যটা কি? যখন এই লোহাটা একেবারে শুদ্ধ আণবিক অবস্থায় আছে। তাহলে সেটা অনিত্য। না সেটাও অনিত্য হবে না। কেন হবে না? কারণ ওটা এণার্জি থেকে এসেছে। তাহলে এণার্জিটা কি বেশি নিত্য? অবশ্যই বেশি নিত্য। তাহলে এটাই কি চরম নিত্য? না না, তা কি করে হবে। ওটাতো প্রকৃতি থেকে এসেছে। তাহলে প্রকৃতিটা বেশি নিত্য? এখানে এসে সাংখ্যরা দাঁড়িয়ে পড়ে। প্রকৃতির ঠিক আগে যারা জড়বাদী, বিজ্ঞানীরা থেমে যায়, তারা বলে দেন এণার্জী হচ্ছে শেষ কথা। এণার্জীকে যদি বলে দিই চিরনিত্য, তখন আমি হয়ে গেলাম বিজ্ঞানী। তার আগে যদি আমি বলে দিই এণার্জী আসছে মহৎ থেকে, তখন আমি চলে গেলাম ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদে। আমি যদি তার ওপরে চলে যাই, আর বলি প্রকৃতিই হচ্ছে শেষ কথা, তাহলে আমি হয়ে গেলাম সাংখ্যবাদী। সেখান থেকে আমি যদি আরেকটু এগিয়ে বলি ঈশ্বরই হচ্ছেন শেষ কথা তখন আমি রামানুজের বিশিষ্টদ্বৈতবাদী হয়ে গেলাম। তারও ওপরে গিয়ে যখন বলব ব্রহ্ম ছাড়া কিছুই নেই তখন আমি হয়ে গেলাম অদ্বৈত বেদান্তবাদী।

আসলে এগুলো কিছুই নয়, সব ধাপে ধাপে চলছে, এই কারণে এরটা ঠিক আর ওরটা ভুল কখনই বলা যাবে না। যখন যেটাকে নিয়ে নাড়াচাড়া করব, পড়াশোনা করব তখন মনে হবে ঐটাই ঠিক। ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদ যখন পড়ব তখন মনে হবে বেদান্ত ভুল এটাই ঠিক, এদের এমন যুক্তি তর্ক আছে। যখন বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা করব তখন মনে হবে এণার্জিটাই শেষ কথা, মন আবার কি, মনতো জড় পদার্থ। সেইজন্য এই জিনিষ গুলোকে তর্ক দ্বারা পরিবর্তন করান যায় না। এটা হচ্ছে তুমি যদি এই বিষয়ে জানতে চাও আমি তোমাকে বলতে রাজী আছি, আমি তোমার মনকে পরিবর্তন করে দেব সেটা হবে না। পরিবর্তন কারা করতে পারেন? যেমন ভগবান বুদ্ধ করলেন, শঙ্করাচার্য মণ্ডন মিশ্রকে পরিবর্তন করলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ পারতেন, এঁদের এমন একটা শক্তি থাকে যে তাঁর সামনের লোকের বুদ্ধিটা আস্তে আস্তে কেঁচো হয়ে যায়।

সংক্ষেপে নিত্য মানে যেটা আছে, কিন্তু সৎ বলতে যেমন একটা সাধারণ বস্তুকেও সৎ বলা হয় আবার প্রকৃতিকেও সৎ বলা হয় আবার ব্রহ্মকেও সৎ বলা হয়। কিন্তু নিত্যতে এভাবে অনেক কিছু হবে না, নিত্য বলতে সব সময় ভগবানকে বা ব্রহ্মকেই বলা হয়। নিত্য মানে যেটা সব সময় আছে অনিত্য মানে যেটা সব সময় থাকবে না। নিত্যের উপর যখন মিথ্যা এসে যায় তখন সেটা অনিত্য হয়ে যায়। যেমন একটা মরুভূমি এটা হচ্ছে নিত্য, মিথ্যা জ্ঞান যখন আসে তখন মনে হবে ওখানে মরীচিকা। মরীচিকাটা অনিত্য আর পুরো জিনিষটা হচ্ছে মিথ্যা জ্ঞানের জন্য। বেদান্ত মতে তাই প্রকৃতি থেকে শুরু করে যা কিছু আছে সবই অনিত্য। কিন্তু যারা বিজ্ঞানী তারা এণার্জী অনিত্য কখনই বলবে না। শাস্ত্রের এই ব্যাপার গুলো এত জটিল যে এগুলো গুরু মুখে না শুনলে আর সাধন-ভজন ও তপস্যা না করা থাকলে সব গোলমাল হয়ে যাবে। কি রকম গোলমাল? ঠাকুর যেমন বলছেন – আমার মামার গোশালায় এক গোয়াল ঘোড়া আছে, এই গোলমালটা লেগে যায়। অর্জুন এই স্তুতি করে বলছেন –

**ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণ-**
**স্ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।**
**বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ পরঞ্চ ধাম**
**ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপ।।৩৮।।**

হে অনন্তরূপ, আপনি হচ্ছেন আদিদেব, আদিদেব মানে জগতের স্রষ্টা, আপনি সেই পুরুষ। পুরুষের পুর মানে নগর বা শহর, পুরুষ হচ্ছেন যিনি এই নগরে বাস করেন। কোন্ শহরে? এই দেহরূপ নগরে। এই শরীরটা একটা নগরের মত, যার জন্য বর্ণনা করা হয় এই শরীরের চোখ, কান, নাক, মুখ ইত্যাদি হচ্ছে নগরের দ্বার। একটা শহরে অনেক লোক বাস করে কিন্তু এই শরীররূপী যে শহর, এই শহরে একজনই বাস করেন, তিনি হচ্ছে ভগবান বিষ্ণু। *পুরাণঃ*, আপনি হচ্ছেন সবার আদি, তাই আপনার থেকে পুরনো আর কেউ নয়। *ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্*, যে জিনিষটা যেটার উপর রাখা হয় সেটাকে বলা হয় নিধান। যেমন এই জলটা কোথায় আছে? এই গ্লাশে আছে, এই গ্লাশটা হচ্ছে জলের নিধান। গ্লাশটা আবার কোথায় আছে? টেবিলে আছে, টেবিলটা গ্লাশের নিধান। টেবিলটা কোথায় আছে? এই মেঝেতে আছে। মেঝেটা কোথায় আছে এই বিল্ডিং এর মধ্যে আছে। এই বিল্ডিংটা কোথায় আছে? এই পৃথিবীতে আছে। পৃথিবী কোথায় আছে? এই সৌরমণ্ডলে আছে। একটা জিনিষ একটার মধ্যে রাখা আছে, সর্বশেষে যেটাতে রাখা থাকে তাকে বলা হয় *পরং নিধানম্*, সেটাই হচ্ছে ঈশ্বর, ঈশ্বরই হচ্ছেন *পরং নিধানম্*। *বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ পরঞ্চ ধাম*, যাবতীয় যা কিছু এই জগতে আছে সব কিছুকে ছাড়িয়ে কাকে জানার আছে আর তাকে কে জানছে? বলছেন আপনিই হচ্ছে একমাত্র জ্ঞাতা। এই যে এখানে জলের গ্লাশটা রয়েছে এটাকে কে ঠিক ঠিক জানতে পারছেন? ঈশ্বর। আমরা মনে করি আমি জানছি। কিন্তু আমিটা কে? আমি সেই ঈশ্বরের সঙ্গে এক। ভেতরে ঈশ্বরের চৈতন্য সত্তা আছে বলে মন বুদ্ধিকে মনে হচ্ছে যেন চৈতন্যময়, মন বুদ্ধি জানছে ঠিকই কিন্তু আসল জ্ঞাতা হচ্ছেন সেই শুদ্ধ চৈতন্য। *বেদ্যং চ*, জানার মত বস্তু সেটাও আপনি। জানার যোগ্য বলতে আসলে বোঝাচ্ছে আধ্যাত্মিক জ্ঞান। সেই আধ্যাত্মিক জ্ঞানটাও আপনি। *পরঞ্চ ধাম*, আপনি হচ্ছেন পরম ধাম, যাঁকে জানার পর সেখানে পৌঁছাবে, সেটাও আপনি। মুক্তি পাওয়ার জন্য ঈশ্বরকে জানতে হবে। ঈশ্বরকে জানতে পারলে কোথায় যাবে? ঈশ্বরের মধ্যেই চলে যাবে। সেই জ্ঞাতাটি কে? ঈশ্বর নিজেই। সেইজন্য বলা হয় জ্ঞাতা, জ্ঞেয় আর জ্ঞান এবং জ্ঞানের যে ফল সবটাই সেই এক বস্তু, ঈশ্বর। এই জিনিষটাকেই অন্য ভাবে এখানে বলা হল – *বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ পরঞ্চ ধাম*। *ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপ*, আপনি হচ্ছেন অনন্তরূপী, আপনাকে বলা যাবে না আপনি সগুণ না নির্গুণ, আপনি সাকার না নিরাকার। এই বুদ্ধি দিয়ে আপনার অনন্তরূপের কোন বিচারই করা যাবে না। আমরা বিপরীতটা জানি, আমাদের কাছে তিনি যদি সগুণ না হন তাহলে তিনি হবে নির্গুণ, এটা না হলে ওটা হবে, ওটা না হলে এটা হবে, সগুণ নির্গুণ ছাড়া আর কি হতে পারেন সেটা আমরা কি করে জানব, তৃতীয় বলে কিছু হতে পারে আমরা জানিনা। কারণ আমাদের বুদ্ধিতো এইতো এতটুকুন। এরপর অর্জুন ভগবানের প্রশংসা করে বলে যাচ্ছেন –

**বায়ুর্যমোঽগ্নির্বরুণঃ শশাঙ্কঃ**
**প্রজাপতিস্ত্বং প্রপিতামহশ্চ।**
**নমো নমস্তেঽস্তু সহস্রকৃত্বঃ**
**পুনশ্চ ভূয়োঽপি নমো নমস্তে।।৩৯।।**

বিভিন্ন দেবতাদের নাম করে অর্জুন বলছেন, আপনি হচ্ছেন বায়ু, যম, অগ্নি, বরুণ, চন্দ্রমা ও প্রজাপতি এবং পিতামহ ব্রহ্মারও জনক আপনি। কঠোপনিষদে আছে – *ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্যঃ। ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চম*।।২/৩/৩।। বায়ু, অগ্নি, ইন্দ্র, সূর্য এরা সবাই যার যার নিজের কাজ করছে পরমেশ্বর আছেন বলে, পরমেশ্বরের ভয়ে অর্থাৎ তাঁর শাসন মেনে দেবতারা তাঁদের নিজস্ব কাজ করে যাচ্ছেন। হে প্রভো, আপনাকে হাজার বার প্রণাম, লক্ষ বার প্রণাম, বারে বারে প্রণাম জানাই। বন্ধুদের কারুর উপর রেগে গিয়ে আমরা অনেক সময় বলে ভাই তোমাকে হাজার বার প্রণাম, এখানে সেই অর্থে অর্জুন বলছেন না, শ্রদ্ধার সঙ্গে বলছেন। অত্যন্ত গভীর ভাবে মনটাকে একেবারে ঈশ্বরীয় ভাবে তুঙ্গে নিয়ে গিয়ে বলছেন –

**নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে**
**নমোঽস্তু তে সর্বত এব সর্ব।**
**অনন্তবীর্যামিতবিক্রমস্ত্বং**
**সর্বং সমাপ্নোষি ততোঽসি সর্বঃ।।৪০।।**

হে ভগবান, আপনাকে আমি আপনার সম্মুখ থেকে প্রণাম করছি, আপনার পশ্চাদ্দেশ থেকে প্রণাম করছি, আপনাকে চারিদিক থেকে ঘুরে ঘুরে প্রণাম করছি। গর্ভমন্দিরের বাইরে থেকে ভক্তরা যেমন প্রদক্ষিণ করে ঠাকুরকে প্রণাম করে এসে আবার সামনে এসে প্রণাম করেন। আবার অনেকে পুরো মন্দিরকেই জপ করতে করতে প্রদক্ষিণ করেন। এইটাই অর্জুন এখানে বলছেন –

*নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে।* আপনি হচ্ছেন *অনন্তবীর্য,* প্রচণ্ড সামর্থ আপনার আর *অমিতবিক্রমস্ত্বং,* আপনার শুধু যে সামর্থ আছে তা নয়, আপনি অসীম বিক্রমশালী, আপনার বিক্রমের পরিমাপ করার ক্ষমতাই কারুর নেই। আপনার যে অন্তর্নিহিত শক্তি, সামর্থ আর বিক্রম সেটা যে শুধু নিহিত হয়ে আছে তা নয়, আপনি আপনার সামর্থ ও বিক্রমকে পরাক্রমের মাধ্যমে দেখিয়ে দিচ্ছেন। অনেকে যেমন মনে করে আমি প্রচণ্ড বুদ্ধিমান, কিন্তু বুদ্ধিকে কাজে লাগায় না। বুদ্ধিকে যদি কাজে না লাগায় তাহলে সেই বুদ্ধি দিয়ে কি হবে। দু রকমের হয়, একজনের বুদ্ধি আছে লাগায় না, আরেকটা হয় বুদ্ধি যেটুকু আছে লাগিয়ে দিয়ে শেষ করে দিয়েছে। এখানে তা নয়, *অমিতবিক্রমস্ত্বং,* আপনার অসম্ভব সামর্থ, শুধু সামর্থ যে আছে তা নয়, আপনি সেই সামর্থকে আপনার কার্য দ্বারা দেখিয়ে দিচ্ছেন। *সর্বং সমাপ্নোষি ততোঽসি সর্বঃ,* আপনি সমস্ত জগতে ব্যপ্ত হয়ে আছেন, আপনার বাইরে কিছু নেই। জগতে যা কিছুর কল্পনা করা যায় সবটাই আপনার মধ্যে। এতদিনে অর্জুন তাঁর সখা শ্রীকৃষ্ণ আসলে কে বুঝতে পেরেছেন, বুঝে যেতেই অর্জুন ভয়ে কাঁপছে –

**সখেতি মত্বা প্রসভং যদুক্তং**
**হে কৃষ্ণ হে যাদব হে সখেতি।**
**অজানতা মহিমানং তবেদং**
**ময়া প্রমাদাৎ প্রণয়েণ বাপি।।৪১।।**

একটা পুকুরের জলে পূর্ণিমার চাঁদ প্রতিবিম্বিত হয়েছে। জলের মধ্যে সেই চাঁদের প্রতিবিম্বকে পুকুরের মাছেরা মনে করেছে এটি আমাদের মতই কোন মাছ, সারা রাত চাঁদের সেই প্রতিবিম্বের সাথে খুব আনন্দে খেলা করছে। সকাল হতেই দেখে সেই মাছটি আর নেই। ঠিক সেই রকম অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে মনে করেছিলেন তিনি আমাদেরই মত একজন। যে কোন সন্ন্যাসীকে প্রথম থেকেই নিষেধ করে দেওয়া হয় ভক্তদের সাথে বেশি মেলামেশা করতে। এতে সন্ন্যাসীর খুব বিশেষ ক্ষতি হয় না, ক্ষতি হয় ভক্তদেরই। কারণ বেশি মেলামেশা করলে ভক্তরা মনে করে ইনিও আমাদেরই মত একজন। ঠাকুর একবার সমাধি অবস্থায় গাড়ি থেকে নামছেন, সেই অবস্থায় ঠাকুরকে একজন ধরে ধরে নামাতে গেছেন। ঠাকুর তাঁকে ধরতে নিষেধ করছেন, আমাকে ধরলে লোকে মনে করবে আমি মদ খেয়ে মাতাল হয়ে গেছি। এখন ভগবানকে সমাধি অবস্থায় দেখে কেউ যদি মনে করে যে ইনি মদ্য পান করেছেন, এতে ভগবানের কিছু এসে যাবে না, কিন্তু যে এই রকমটি ভাবছে তার কিন্তু অপরাধ হয়ে যাবে। সেইজন্য ঠাকুর বারণ করছেন, এমন কিছু করো না যাতে সাধারণ লোকের ভুল ধারণা হয়। অর্জুনও এতদিন পর বুঝতে পারলেন – ওরে বাব্বা, আমি কার সঙ্গে এত দিন ধরে আছি। *সখেতি মত্বা প্রসভং যদুক্তং,* আমি তো আপনাকে জানতাম না, আপনি যে স্বয়ং পরমেশ্বর ভগবান আমি বুঝিনি, ফলে অনেক রকমের বিপরীত বুদ্ধি বশতঃ নানান ভাবে অসৌজন্য মূলক কথাবার্তা বাক্যালাপ ও সম্বোধন করেছি। কি রকম সম্বোধন করেছি? হে কৃষ্ণ, হে যাদব, হে সখা, এইভাবে আপনাকে সম্বোধন করেছি। অর্জুন আর শ্রীকৃষ্ণ প্রায় সমবয়সী বন্ধুর মত ছিলেন। *অজানতা মহিমানং তবেদং,* আপনার এই মহিমা তো আমি জানতাম না, না জেনে আমি অনেক সময় আপনার সাথে বালসুলভ আচরণ করেছি। ভগবানকে নাম ধরে সম্বোধন করা, হে কৃষ্ণ, হে যাদব, হে সখা ইত্যাদি, আবার কখন প্রমাদ বশতঃ মানে রেগেমেগে না বুঝে, আবার অনেক সময় *প্রণয়েন বাপি,* আপনার প্রতি অত্যন্ত ভালোবাসায় আপনাকে আমি নিজের মতই মনে করে অসৌজন্য মূলক কথাবার্তা বলেছি। কোন্ কোন্ সময়ে আপনার সাথে এই রকম অশোভন আচরণ করেছি –

**যচ্চাবহাসার্থমসৎকৃতোঽসি**
**বিহারশয্যাসনভোজনেষু।**
**একোঽথবাপ্যচ্যুত তৎসমক্ষং**
**তৎ ক্ষাময়ে ত্বামহমপ্রমেয়ম্।।৪১।।**

আমরা দুজনে এক সঙ্গে হাঁটাচলা, খাওয়া-দাওয়া, বিছানায় শোওয়া-বসা করতাম, কত হাসিঠাট্টা করেছি। আবার আপনার সাক্ষাতে বা আড়ালে, একাকী বা বন্ধুবান্ধবদের সমক্ষে পরিহাসচ্ছলে আপনাকে যে অসম্মান ও অসৌজন্যমূলক ব্যবহার বা অমার্যাদা করেছি, *তৎ ক্ষাময়ে ত্বামহমপ্রমেয়ম্, হে অপ্রমেয়ম,* হে প্রমাণাতীত আপনার কাছে আমি তার জন্য ক্ষমাপ্রার্থি। আপনাকে কেন আমায় ক্ষমা করতে বলছি?

**পিতাঽসি লোকস্য চরাচরস্য**
**ত্বমস্য পূজ্যশ্চ গুরুর্গরীয়ান্।**
**ন ত্বৎসমোঽস্ত্যভ্যধিকঃ কুতোঽন্যো**
**লোকত্রয়েঽপ্যপ্রতিমপ্রভাব।।৪৩।।**

আপনি হলেন এই জগৎসৃষ্টিকারী পিতা, আপনি গুরুরও গুরু পরমগুরু, আপনিই পূজ্য। সেইজন্য ঠাকুর সব সময় বলছেন সচ্চিদানন্দই গুরু। তাই এই ত্রিভুবনে আপনার থেকে বড় তো দূরের কথা হয়ে গেল, আপনার সমানও আর কেউ নেই।

*লোকত্রয়েহপ্যপ্রতিমপ্রভাব, অপ্রতিমপ্রভাব*, ঈশ্বরের সমকক্ষ আর কেউ হতে পারেনা। প্রতিমা কথা অর্থ হচ্ছে সমানতা, দুর্গা প্রতিমা বলতে বোঝাচ্ছে দুর্গার যে বর্ণনা শাস্ত্রে দেওয়া আছে সেই বর্ণনানুসারে সমান ভাবে দুর্গার মুর্তি তৈরী করা হয়ে গেলে বলা হয় দুর্গা প্রতিমা। কিন্তু এখানে বলা হচ্ছে অপ্রতিম, যার কখন প্রতিমা হতে পারে না। তাই আমি –

**তস্মাৎ প্রণম্য প্রণিধায় কায়ং**
**প্রসাদয়ে ত্বামহমীশমীড্যম্।**
**পিতেব পুত্রস্য সখেব সখ্যুঃ**
**প্রিয়ঃ প্রিয়ায়ার্হসি দেব সোঢুম্।**।৪৪।।

সেইজন্য আমি আপনার সামনে মাথা নীচু করে দণ্ডবৎ করছি, *তস্মাৎ প্রণম্য প্রণিধায় কায়ং*, আপনার পায়ে মাথা রেখে প্রণাম করছি। *ঈশম্ ঈড্যম্*, আপনি ঈশ্বর, আপনিই স্তুতি করার একমাত্র যোগ্য, আপনিই একমাত্র প্রণম্য। তাই আপনাকে প্রণাম করে আমি আপনার প্রসন্নতা প্রার্থনা করছি। আপনি আমাকে ক্ষমা করুন, পিতা যেমন পুত্রের সব অপরাধ ক্ষমা করে দেয়, বন্ধু যেমন বন্ধুর অপরাধ ক্ষমা করে, প্রিয় যেমন প্রিয়ার সব অপরাধ ক্ষমা করে দেয়। সন্তান, বন্ধু আর প্রেমিকা এই তিনজনের সাথে অর্জুন নিজেকে ঈশ্বরের সাথে সম্পর্ক তৈরী করে ক্ষমা প্রার্থনা করছেন। প্রেমিকা অপরাধ করবে এটা ধরেই নেওয়া হয়েছে, যে প্রেমিক সে ক্ষমা করবেই, ভগবানই হচ্ছেন একমাত্র প্রেমিক। বাবা যেমন সন্তানকে সহ্য করে নেয়, বন্ধু যেমন বন্ধুকে সহ্য করে নেয় আর যে প্রেমিক সে যেমন প্রেয়সীর অত্যাচার সহ্য করে নেয় ঠিক তেমনি হে ভগবান, আমি যে অন্যায় করেছি তা ক্ষমা করে দিন।

**অদৃষ্টপূর্বং হৃষিতোহস্মি দৃষ্ট্বা**
**ভয়েন চ প্রব্যথিতং মনো মে।**
**তদেব মে দর্শয় দেব রূপং**
**প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস।**।৪৫।।

আপনার এই রূপ *অদৃষ্টপূর্বং*, আগে কেউ কখন দেখেনি, এতে আমি আনন্দও পাচ্ছি আবার ভয়ও পাচ্ছি। তাই হে জগন্নিবাস, আপনি আপনার সে আগের সেই শান্ত রূপে, আমার যে সখা, বন্ধু শ্রীকৃষ্ণ রূপ, সেই রূপে ফিরে আসুন। কেমন সেই রূপ আপনার?

**কিরীটিনং গদিনং চক্রহস্ত-**
**মিচ্ছামি ত্বাং দ্রষ্টুমহং তথৈব।**
**তেনৈব রূপেণ চতুর্ভুজেন**
**সহস্রবাহো ভব বিশ্বমূর্তে।**।৪৬।।

আপনি যখন বসুদেবের পুত্র হয়ে কংসের কারাগারে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন তখন আপনার যে রূপ দেবকী মাতা দর্শন করেছিলেন, কিরীটিধারি, গদাধারি আর চক্রধারি। এখানে কিন্তু শঙ্খ আর পদ্মের কথা বলা হচ্ছে না, শ্রীকৃষ্ণকে যখন দেখান হয় তখন তাঁকে গদা আর চক্র হস্তে দেখান হয়ে থাকে। *তেনৈব রূপেণ চতুর্ভুজেন সহস্রবাহো*, খুব হলে আপনি চতুর্ভুজ রূপটাকে রাখুন কিন্তু আপনার ঐ উগ্র *সহস্রবাহোর* বিশ্বরূপকে প্রশমিত করুন। তখন ভগবান বলছেন –

শ্রীভগবানুবাচ
**ময়া প্রসন্নেন তবার্জুনেদং**
**রূপং পরং দর্শিতমাত্মযোগাৎ।**
**তেজোময়ং বিশ্বমনন্তমাদ্যং**
**যন্মে ত্বদন্যেন ন দৃষ্টপূর্বম্।**।৪৭।।

ভগবান যখন নৃসিংহ রূপ ধারণ করেছিলেন তখনও ঠিক এই একই অবস্থা হয়েছিল। ভগবানের ঐ ভয়ঙ্কর নৃসিংহ রূপ দেখে জগতের সমস্ত প্রাণী ভয়ে কাঁপতে শুরু করেছিল, তখন প্রহ্লাদ গিয়ে ভগবানের স্তুতি করাতে ভগবান তাঁর সেই ভয়ঙ্কর রূপকে শান্ত করলেন। এখানেও ভগবান বলছেন – অর্জুন তুমি চিন্তা করো না, *ময়া প্রসন্নেন তবার্জুনেদং*, আমি তোমার উপর প্রসন্নই আছি, আমি প্রসন্ন হয়েই তোমাকে আমি আমার ঈশ্বরীয় যোগপ্রভাবে আমার এই তেজোময় অন্তহীন বিশ্বরূপ দেখালাম। এর আগে আমার এই তেজোময় রূপ কেউ কোন দিন দেখতে পায়নি। এই রূপের বর্ণনা করে ভগবান বলছেন –

**ন বেদযজ্ঞাধ্যয়নৈর্ন দানৈ-**
**র্ন চ ক্রিয়াভির্ন তপোভিরুগ্রৈঃ।**
**এবংরূপঃ শক্য অহং নৃলোকে**
**দ্রষ্টুং ত্বদন্যেন কুরুপ্রবীর।।৪৮।।**

মহাভারত যখন রচনা হয়েছিল তখনও বেদের যজ্ঞাদির বিজ্ঞানকে জানা, বেদ অধ্যয়ন করা, দানাদি ক্রিয়া আর উগ্র তপস্যা এগুলো ভালোমতই সমাজে প্রচলিত ছিল। এমনকি ভগবান বুদ্ধের সময়েও বেদের অধ্যয়ন, উগ্র তপস্যাদি ছিল। এখানে ভগবান বলছেন, যে চারটে বেদ ঠিক ঠিক অধ্যয়ন করেছে, যজ্ঞ কিভাবে অনুষ্ঠিত করা হয় সেটাও যারা অধ্যয়ন করেছে, তারাও তুমি যে আমার বিশ্বরূপ দর্শন করেছ, এই রূপ দেখতে পারেনা। শুধু তাই নয়, যে প্রচুর দান করেছে, কি রকম দান? নিজের শরীরের ওজনের সমান সোনা দান করেছে, এই দানেও এই রূপ দর্শন করা যায় না। আর উগ্র তপস্যার দ্বারাও এই রূপ দর্শন হয় না। *এবংরূপঃ শক্য অহং নৃলোকে দ্রষ্টুং ত্বদন্যেন কুরুপ্রবীর,* হে অর্জুন তুমি এই মাত্র যে রূপ আমার দেখলে, এগুলোর কোনটার দ্বারাই এই নরলোকে এই রূপ দর্শন করা যায় না।

**মা তে ব্যথা মা চ বিমূঢ়ভাবো**
**দৃষ্ট্বা রূপং ঘোরমীদৃঙ্মমেদম্।**
**ব্যপেতভীঃ প্রীতমনাঃ পুনস্ত্বং**
**তদেব মে রূপমিদং প্রপশ্য।।৪৯।।**

আমার এই রূপ দেখে তুমি ভয়ে বিমূঢ় হয়ে ব্যথিত হয়ো না। ভগবানের কি রূপ দেখে অর্জুন ভয় পেয়ে বিমূঢ় হয়ে গিয়েছিলেন? অর্জুন দেখছিলেন কৌরবদের যত বীর এমনকি পাণ্ডবদেরও অনেক বীর সব ঐ বিশ্বরূপের মুখে জ্বলন্ত আগুনের মধ্যে নদীর স্রোতের মত ঢুকে যাচ্ছে। ভগবান নিজেই বলছেন *কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধো,* আমি এখন কাল, সংসারে লোকক্ষয় করার জন্য আমার এই বিশাল আকৃতি, এখন আমি সব কটাকে উপড়ে গিলে খেয়ে নেব। কিন্তু ভগবান অর্জুনকে আশ্বাস দিয়ে বলছেন, তুমি ভয় পেয়ো না, ভয় পাওয়ার তোমার কোন কারণ নেই, এই দ্যাখো – *পুনস্ত্বং তদেব মে রূপমিদং প্রপশ্য,* তোমার জন্য আমি আবার আমার আগের রূপে ফিরে এসেছি। কাহিনী আবার সঞ্জয়ের কাছে চলে গেছে, সঞ্জয় বলছেন –

সঞ্জয় উবাচ

**ইত্যর্জুনং বাসুদেবস্তথোক্ত্বা**
**স্বকং রূপং দর্শয়ামাস ভূয়ঃ।**
**আশ্বাসয়ামাস চ ভীতমেনং**
**ভূত্বা পুনঃ সৌম্যবপুর্মহাত্মা।।৫০।।**

এরপর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে এই বলে বসুদেবের গৃহে নিজে যে চতুর্ভুজ ধারণ করেছিলেন, সেই রূপ দেখিয়ে আবার তাঁর সৌম্য রূপ ধারণ করে অর্জুনকে আশ্বস্ত করলেন। এই রূপ দেখার পর অর্জুন খুব খুশি হল। তখন অর্জুন বলছেন –

অর্জুন উবাচ

**দৃষ্ট্বেদং মানুষং রূপং তব সৌম্যং জনার্দন। ইদানীমাস্মি সংবৃত্তঃ সচেতাঃ প্রকৃতিং গতঃ।।৫১।।**

হে ভগবান, আপনার এই সৌম্য রূপ ধারণ মাত্রই সমস্ত প্রকৃতি হাঁফ ছেড়ে যেন বাঁচল, চারিদিকের প্রকৃতি এতক্ষণ ভয়ে কাঁপছিল। যখন খুব গরম পড়ে, আবার ঠিক ঝড় আসার মুখে প্রকৃতি যেন ভয়ে থমকে যায়, যেন কি একটা হতে যাচ্ছে। ঠিক তেমনি ভগবানের এই রূপে সমস্ত প্রকৃতি যেন ভয়ে অস্থির হয়ে গিয়েছিল। তখন শ্রীভগবান বলছেন –

শ্রীভগবানুবাচ

**সুদুর্দর্শমিদং রূপং দৃষ্টবানসি যন্মম। দেবা অপ্যস্য রূপস্য নিত্যং দর্শনকাঙ্ক্ষিণঃ।।৫২।।**

হে অর্জুন, তুমি যে আমার এই রূপ দেখলে এই রূপ অতি দুর্লভ, সচরাচর এই রূপ কেউ দেখতেই পায় না। দেবতারাও *দর্শনকাঙ্ক্ষিণঃ,* দেবতারাও এই রূপ দেখতে ইচ্ছা করেন কিন্তু দেখার সৌভাগ্য তাঁদেরও হয় না। আমাদের শাস্ত্রেও এমন কোন বিবরণ পাইনা যে দেবতারা এই রকম কিছু দেখেছেন। কেন কেউ দেখতে পায়না, আবার সেই একই জিনিষ ব্যক্ত করছেন –

**নাহং বেদৈর্ন তপসা ন দানেন ন চেজ্যয়া। শক্য এবংবিধো দ্রষ্টুং দৃষ্টবানসি মাং যথা।।৫৩।।**

*শক্য এবংবিধো দ্রষ্টুং দৃষ্টবানসি মাং যথা,* তুমি আমার যে এই বিশ্বরূপ দর্শন করলে, এই রূপ চারটে বেদের জ্ঞানের দ্বারাও দেখা যাবে না, উগ্র তপস্যা করছে তাতেও হবে না, প্রচুর দান করলেও দেখার সোভাগ্য লাভ করতে পারেনা, *ন চ ইজ্যয়া,* ইজ্য মানে যজ্ঞ, যজ্ঞের দ্বারাও কেউ দেখতে পায় না। মহাভারত এবং পরে ভাগবতাদি পুরানে এটা প্রথম থেকেই বলা হয়ে আসছে যে, ঈশ্বরকে বেদ অধ্যয়ন দিয়ে, তপস্যা, দানাদির দ্বারা পাওয়া যায় না। এটা না হয় বোঝা গেল এগুলো কোন কিছুর দ্বারাই ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না, তাহলে কিভাবে ঈশ্বরকে পাওয়া যাবে?

**ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্য অহমেবংবিধোঽর্জুন। জ্ঞাতুং দ্রষ্টুং চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুং চ পরন্তপ।।৫৪।।**

একমাত্র আমাতে অনন্যা ভক্তির দ্বারাই আমাকে পাওয়া যায়। আমাদের শাস্ত্রে দু রকমের ভক্তির কথা বলা হয়, একটা হচ্ছে অপরা ভক্তি আর দ্বিতীয় হল পরা ভক্তি। যজ্ঞ, দান, তপস্যা, বেদ অধ্যয়ন, জপ, ধ্যান এগুলো সবই হল অপরা ভক্তি। তবে এই অপরা ভক্তির অনুশীলন করতে করতে পরা ভক্তির উদয় হয়। আবার ঠাকুর বলছেন লাউ কুমড়ো ফুলের মত, ফল আগে ফুল পরে, তার মানে পরা ভক্তিটা আগে এসে যায় অপরা ভক্তিটা পরে আসে। কিন্তু বেশির ভাগ মানুষের অপরা ভক্তিটাই আগে আসে। এখন কেউ যদি মনে করেন বেদ অধ্যয়ন দিয়েও হবে না, তপস্যা, জপ, ধ্যান, দান করেও হবে না, তাহলে এগুলো করার কি প্রয়োজন আছে। তা নয়, এগুলো দিয়েও হবে না, আর এগুলো যদি না কর তাহলে তো একেবারেই হবে না। লটারির টিকিট কাটলেই যে লটারিতে টাকা পেয়ে যাবে তা তো নয়, কাটলে পেলেও পেতে পারি, আর না কাটলে নিশ্চিত যে কোন কালেই পাওয়া যাবে না। জপ, ধ্যান, অধ্যয়ন যদি না কর তাহলে নিশ্চিত যে কোন কালেই তোমার কিছু হবে না। কিন্তু এগুলো করে গেলে পরা ভক্তি একদিন হবেই। কি সেই পরা ভক্তি – *ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া,* অনন্যা ভক্তি হয়, অনন্যা ভক্তিটাই পরা ভক্তি। আমার এই যে রূপ তুমি দেখলে একমাত্র অনন্যা ভক্তির দ্বারাই এই রূপকে দেখা সম্ভব।

অন্যনা ভক্তিতে শুধু যে ঈশ্বরের রূপই দেখা যাবে তাই নয়, *জ্ঞাতুং দ্রষ্টুং চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুং চ পরন্তপ,* শাস্ত্রে ঈশ্বরের সম্বন্ধে ঠিক ঠিক যেমনটি বলা হয়েছে, যেমন এখানে গীতাতে যে রকমটি বলা হয়েছে, ঠিক এই রকম সেইভাবেই তারা আমাকে জানতে পারে। শুধু জেনেই শেষ হয়ে যায় না, তত্ত্বতঃ আমি যেমনটি ঠিক তেমনটি আমাকে দেখতে পায়। আমাকে জানতে পারে, আমাকে দেখতে পায়, দেখার পর *প্রবেষ্টুং,* আমার সাথে এক হয়ে যায়। পরা ভক্তি বা রাগাত্মিকা ভক্তি যখন হয় তখনই ঈশ্বরকে ঠিক ঠিক জানতে পারে যায়। তখন আর ধারণার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না, তখন সাক্ষাৎ দর্শন হয়। দর্শন করে ঈশ্বরের মধ্যে প্রবেশ করে যায়, মানে ঈশ্বরের সাথে এক হয়ে যায়। এই কথা বলার পর ভগবান পঞ্চান্ন নং শ্লোকে মূল তত্ত্ব কথা বলে দিচ্ছেন। আচার্য শঙ্করের মতে গীতার একাদশ অধ্যায়ের শেষ শ্লোক অর্থাৎ পঞ্চান্ন নং শ্লোকটি হচ্ছে গীতার সার। পরা ভক্তির শেষ কথা, সেইজন্য এই শ্লোকটিকে সবারই মুখস্ত করে রোজ অন্ততঃ কয়েকবার আবৃত্তি করা উচিৎ।

**মৎকর্মকৃন্মৎপরমো মদ্ভক্তঃ সঙ্গবর্জিতঃ। নির্বৈরঃ সর্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাণ্ডব।।৫৫।।**

*মৎকর্মকৃৎ,* আমি পরমেশ্বর, পরমেশ্বরের জন্যই যে সব কাজ করছে, *মৎপরমো,* আমাকেই যে পরম মনে করে। আচার্য পরম মানে বলছেন – অনেকের বাড়িতে বিশ্বাসী ভৃত্য থাকে, হয়তো এক পুরুষ বা দুই পুরুষ ধরে কাজ করে যাচ্ছে। সে যা কিছু করে, এমনকি সে যে নিঃশ্বাসটি নিচ্ছে সেটিও তার স্বামীর জন্যই নেয়। কিন্তু এই ধরণের একনিষ্ঠ বিশ্বাসী ভৃত্যও জানে আমার মৃত্যুর পর আমার মালিক আমার পরম গতি হবেন না, আমার পরম গতি হচ্ছেন ঈশ্বর, ঈশ্বরকেই সে পরম জানে। সে জানে মৃত্যুর পর আমাকে ভগবানের কাছেই যেতে হবে, নিজের স্বামী বা মালিককে পরম মনে করে না। যা কিছু করে আমার জন্যই করে আর আমাকেই পরম মনে করে। *মদ্ভক্তঃ,* যত রকমের ভজনা আমারই প্রতি ভক্তি নিয়ে করে। *সঙ্গবর্জিতঃ,* কোন কিছুর প্রতি তার আসক্তি থাকে না, নিঃসঙ্গ। *নির্বৈরঃ,* কারুর প্রতি তার শত্রুভাব, দুষমনি ভাব নেই। *সর্বভূতেষু,* কোন জীবের প্রতি তার কোন বৈরী ভাব নেই। ইসলাম ধর্মে আল্লাকে খুব ভালোবাসে কিন্তু যারা মুসলমান নয় তাদের মেরে শেষ করতে হবে, এখানে তা নয়, শুধু মানুষই নয়, কোন প্রাণী, কীট, পতঙ্গ, পশু, পাখি কারুর প্রতি তার বৈরী ভাব নেই। *যঃ স মামেতি পাণ্ডব,* হে পাণ্ডব, এই ধরণের যারা হয় তারাই *মামেতি,* তারা আমাকেই পায়, সে আমার মধ্যেই চলে আসে।

মূল কথা হল, ভক্ত যে কর্ম করছে, ভক্ত যে কথা বলছে, ভক্ত যে চিন্তন নিয়ে আছে, সব কিছু আমাকে নিয়েই। এই রকম যারা হন তারাই আমাকে পায়, এর বাইরে আর কেউ আমাকে পায় না। যে কাজ আমার জন্য করা হয় না, সেটা কাজের মধ্যে গণ্য নয়। তাহলে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, উকিল, অফিসাররা যে কাজ করছে সেটা কি কাজ নয়? আরে ভাই, তাদের জীবনের উদ্দেশ্য তো ঈশ্বর লাভ নয়। তুমি যদি আমাকে পেতে চাও, আমি যদি তোমার জীবনের লক্ষ্য হই তাহলে তোমাকে এইভাবে কর্ম করতে হবে। কিন্তু এরা এখন কামিনী-কাঞ্চন ভোগ করতে চাইছে, নাম-যশ ভোগ করতে চাইছে, তাহলে এদের আর এই সবের দরকার নেই,

এদের অন্য পথ নিতে হবে। বিশ্বরূপ দর্শন লাভ যদি তোমার উদ্দেশ্য হয়, ঈশ্বর জ্ঞান লাভ যদি তোমার জীবনের উদ্দেশ্য হয় তাহলে তোমাকে এই ভাবে কাজ করতে হবে, এইভাবে চলতে হবে, তোমার মানসিকতাকে এইভাবে তৈরী করতে হবে।

এইখানে একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত হল। এরপর দ্বাদশ অধ্যায়ে ভক্তি নিয়ে যত রকমের আলোচনা এর আগে করা হয়েছে, সব আলোচনাকে সমন্বয় করে ভক্তিযোগের কথা বলবেন।

**ওঁ তৎসদিতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসুপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়ং যোগশাস্ত্রে**
**শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে বিশ্বরূপদর্শনযোগো নাম একাদশোঽধ্যায়ঃ।।**

২৬শে সেপ্টেম্বর ২০১০

দ্বাদশ অধ্যায়

# ভক্তিযোগ

একাদশ অধ্যায়ের শেষের দিকে চুয়ান্ন নং শ্লোকে ভগবান ভক্তির বর্ণনা করতে গিয়ে বলছেন – *ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্য অহমেবংবিধোঽর্জুন। জ্ঞাতুং দ্রষ্টুং চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুং চ পরন্তপ।।* ভক্তির অনুশীলন যাঁরা করেন তাঁদের জন্য বলছেন, ভক্তির উদ্দেশ্য হল তিনটি। প্রথম হচ্ছে *জ্ঞাতুং*, ভগবানের যে তত্ত্ব এটাকে জানা। কারণ যে জিনিষটা আমি জানিনা সেখানে আমি কিভাবে প্রবেশ করব আর কেনই বা প্রবেশ করব। ভগবান বুদ্ধ চত্বারি আর্য সত্যাদি বলতে শুরু করলেন, সেখানে প্রথম যেটা সবাইকে শিক্ষা দিতে শুরু করলেন যেটার ব্যাপারে ইংরাজীতে খুব সুন্দর একটা প্রবাদ আছে – To know is to love, জানাই ভালোবাসা, ভালোবাসাটাই জানা। মার কোলে যখন সন্তানকে দেওয়া হয় আর যখন জানে যে এ আমার সন্তান, তখনই কিন্তু মায়ের ভালোবাসাটা বেরিয়ে আসে। মাঝে মাঝে শোনা যায় হাসপাতালে বাচ্চাদের পাল্টে দেওয়া হয়, সেখানে যখনই মায়ের মাথায় আসে বাচ্চাটা আমার নয়, তখন আর তার সেই ভালোবাসা থাকে না।

সচ্চিদানন্দের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে এটাই বলা হয় যে যিনি সৎ তিনি চিৎ আবার তিনিই আনন্দ। চিতিটা হচ্ছে জানা, consciousness, যার চৈতন্য আছে। যেটার চৈতন্য আছে সেটার প্রতিই আনন্দ আসাটাই স্বাভাবিক, চিতি আর আনন্দ দুটো একই জিনিষ। একটা জিনিষকে যতক্ষণ না জানা হয় ততক্ষণ সেই জিনিষকে আমরা ভালোবাসতে পারিনা। যে কোন সত্য, যে কোন আদর্শকে যতক্ষণ না জানা হয় ততক্ষণ তাকে ভালোবাসা যাবেই না। কারুর সাথে পরিচয়ের পর বন্ধুত্ব হয়ে গেলেই তাকে ভালোবাসা যায় না, তার প্রতি ভালোবাসাটা আসতে সময় লাগে। এই সময় যেটা লাগছে সেটা ভালোবাসা বাড়ার জন্য লাগছে না, তাকে জানতে বুঝতে গিয়ে সময়টা লেগে যায়। তাই যতক্ষণ একটা জিনিষকে না জানা হয় ততক্ষণ কিন্তু তার প্রতি ভালোবাসা আসা সম্ভব নয়। এখন ভগবানের তত্ত্বকে আমরা জানিই না, তাঁকে ভালোবাসব কি করে। বলে যে ঠাকুরের প্রতি ভক্তিতে তিনি গদগদ অথচ তিনি ঠাকুরের তত্ত্বটা জানেনই না, তা এখন ভক্তিটা কোথা থেকে এল। একটা ছেলের সাথে মেয়ের বিয়ে হল, এখন দুজন দুজনকে জানেই না, চেনেও না, এখন তাদের ভালোবাসা কি করে হবে? ভালোবাসা না হলে একজন একজনের বোঝা হয়ে যাবে। ভগবানের ক্ষেত্রে ঠিক এইটাই হয়, বেশির ভাগ ভক্তই হচ্ছে ভগবানের কাছে বোঝা, আর তা নাহলে তারা নিজের গুরুর জন্য বোঝা। একবার এক মহারাজের কাছে একজন এসে বলছে, সাধু সন্ন্যাসী হওয়ার জন্য লেখাপড়ার কি দরকার, আমি সন্ন্যাসীই যদি হই পড়াশোনা কেন করতে যাব। মহারাজ শুনে বললেন – ভগবান তোমার মত মুর্খকে নিয়ে করবেন। ভগবানও নিজের কাজের জন্য সেরা মানুষটিকেই বেছে নেন। শ্রীরামচন্দ্র আধ্যাত্মিক জ্ঞান কাকে দিলেন? হনুমানকে, নিজের প্রিয় ভাই লক্ষ্মণকেও দিলেন না। অধ্যাত্ম রামায়ণে এইটাই বলছে, শ্রীরামচন্দ্র সীতাকে বলছেন – হে সীতা, হনুমান আমার পরম ভক্ত ওকে আমার তত্ত্বটা জানিয়ে দাও। শ্রীরামচন্দ্রের আজ্ঞাতে সীতা সব বলে দেওয়ার পরেও শ্রীরামচন্দ্রের মনে সন্তুষ্টি হল না বলে তিনি নিজেই আবার হনুমানকে সব বলতে শুরু করেছেন আমি এই আমি সেই। শ্রীকৃষ্ণ এত জ্ঞানীগুণী লোক থাকা সত্ত্বেও বেছে বেছে শুধু অর্জুনকেই গীতার উপদেশ দিলেন, কলকাতায় এতো লোক থাকতে শ্রীরামকৃষ্ণ নরেনকে বেছে নিলেন। গোটা চারেক মুর্খকে নিয়ে ভগবান কি করবেন, শ্রীরামকৃষ্ণ যদি আগে চারটে ঢাকি পেছনে চারটে ঢাকি সামনে নিয়ে ঢাক পেটাতে পেটাতে বলতে থাকতেন আমি ভগবান, আমি অবতার, তাহলে কেইবা বুঝত আর কেইবা তাঁকে চিনত, আমাদের মত মুর্খরা শুনে হাসতাম আর টিপ্পণি কাটতাম। কিন্তু নরেন সব শুনে বললেন ঠাকুর আমাকে যা দিয়ে গেছেন সেটা আমি জগতকে দেখিয়ে দেব। কারণ হচ্ছে এই শ্লোকটি, *জ্ঞাতুং দ্রষ্টুং চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুং চ পরন্তপ*। ভগবানের তত্ত্ব না জানলে পরা ভক্তি আসবে কি করে, তাই আগে ভগবানের তত্ত্বটা বুঝতে হবে।

তত্ত্বটা জানার পর কি বলছেন? *দ্রষ্টুং*। ঠাকুর বলছেন – ঈশ্বরের তত্ত্ব কথা চিন্তা করে করে তাঁকে ধারণা করা বা বোঝা এক রকম কিন্তু তিনি যখন সাক্ষাৎ দর্শন দেন তখন আরেক রকম। আমি গীতা, উপনিষদ, কথামৃত, লীলাপ্রসঙ্গ পড়ে যতই ধারণা করে নিইনা কেন যে ঈশ্বর এই রকম, তাতেও কিছুই হবে না। বলছেন *দ্রষ্টুং*, তিনি সাক্ষাৎ দেখেন ঈশ্বর এই রকম। এরপর আরও মজার ব্যাপার হচ্ছে To know is to love and to love is to know, যদি জানা ভালোবাসা হয় তাহলে ভালোবাসা মানে জানা, দুটোই এক। আমি যদি আপনাকে জানি তাহলে আমি আপনাকে ভালোবাসব। যদি জানি আপনি দুমুখো সাপ তাহলে আপনার কাছ থেকে শত যোজন দূরে থাকতে চাইব। ঠাকুরের কাছে কোন কোন মহিলা এলে ঠাকুর বলতেন – মা এবার তোমার লেজ দেখাও। মানে তুমি সর্পিণী, সাপের লেজ দেখাও, মানে তুমি এখান থেকে চলে যাও। যখন আদর্শকে জেনে যাব তখনই ভালোবাসব, ভালোবাসা মানেই জানা। *তত্ত্বেন প্রবেষ্টুং*, আমি ঈশ্বরে প্রবেশ করে যাব। কিভাবে প্রবেশ করবে? সে কি বৈকুন্ঠধামে গিয়ে ঢুকে যাবে? না, *তত্ত্বেন প্রবেষ্টুং*, তত্ত্বের দিক থেকে দুটো এক হয়ে যাবে। কঠোপনিষদে বলছে – *যথোদকং শুদ্ধে শুদ্ধমাসিক্তং তাদৃগেব ভবতি। এবং মুনের্বিজানত আত্মা ভবতি গৌতম*।।২/১/১৫।। হে নচিকেতা, নির্মল জলবিন্দু শুদ্ধ জলাশয়ে নিক্ষিপ্ত হলে যেমন শুদ্ধ জলাশয়ই হয়ে যায়, ঠিক তেমনি আত্মতত্ত্ব সাক্ষাৎকারী মননশীল তত্ত্বদর্শীর আত্মাও সেইরূপ অর্থাৎ ব্রহ্ম হয়ে যায়। মুণ্ডকোপনিষদে

বলছে – *শরবত্তন্ময়ো ভবেৎ*(২/২/৪), কেউ একটা লক্ষ্য ভেদ করার অনুশীলন করছে, এখন তীরটা সেই লক্ষ্যকে ভেদ করে দিল, যেই ভেদ করে দিল তখন সেই লক্ষ্য আর তীরটা এক হয়ে যায়, লক্ষ্যবস্তু আর তীরের মধ্যে আর কোন পার্থক্য থাকে না, তত্ত্বতঃ ওটা এক হয়ে গেল। তখন আর বলা যাবে না যে এটা আলাদা আর ওটা আলাদা। লক্ষ্যের মধ্যে তীরের স্থূল আকারটা প্রবেশ করেনা। কিন্তু সাধারণ মানুষ এটা বুঝতে পারে না বলেই বলা হয়, বৈকুন্ঠধাম আছে, শিবলোক আছে, এখন নতুন হয়েছে রামকৃষ্ণলোক, সেখানে ভক্তরা গিয়ে ভগবানের সঙ্গে বাস করে। গীতা কিন্তু কোন লোকের কথা বলছে না, বলছে তুমি প্রবেশ করবে। কোথায় প্রবেশ করবে? *তত্ত্বেন*, আমার যে বাস্তবিক সত্তা আর ঈশ্বরের যে সত্তা এই দুটো মিলে এক হয়ে যায়। এক হয়ে যায় বলাটাও ঠিক মত বলা হয় না, বোঝাবার জন আমাদের ভাষায় এই ভাবেই বলতে হয়। এক ঘটি গঙ্গা জল নিয়ে গঙ্গায় ঢেলে দিলাম, তাতে কি আর হল, যা ছিল তাই থাকল। এতে গঙ্গার জল বৃদ্ধি পেল না কমে গেল? কোন কিছুই হয় না, যা ছিল তাই রইল। এক ছিল একই রইল। এক বলাটা আমাদের কাছে সব থেকে সহজ ব্যাখ্যা। কিন্তু তিনি এক না দুই, না শূন্য, না এক দুইয়ের পার কোন কিছুই তাঁকে নির্দিষ্ট করে বলা যায় না, যা আছে তাই আছে। যা আছে তাই আছে এটাও মুখে বলা যায় না। মানুষ হচ্ছে অল্প বুদ্ধি সম্পন্ন, এই অল্প বুদ্ধি বলে এদেরকে বোঝাবার জন্য বলা হয় এক হয়ে যায়।

এখন ঈশ্বরের সাথে এক কিভাবে হবে? তখন ভগবান অর্জুনকে শেষ শ্লোকে বললেন, অর্জুন তুমি যদি এই এই কর তাহলে সম্ভব হবে। ঠাকুর বলছেন ঈশ্বরকে দেখা যায়। কিভাবে দেখা যাবে এই পঞ্চান্ন নং শ্লোকে ভগবান বলছেন – *মৎকর্মকৃন্মৎপরমো মদ্ভক্তঃ সঙ্গবিবর্জিতঃ। নির্বৈরঃ সর্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাণ্ডব*।। যা কিছু করবে সেটা আমার জন্যই করবে, আমাকে পরম গতি মনে করবে। তখন শঙ্করাচার্য উপমা দিয়ে বলছেন, বাড়ির যে অনুগত ভৃত্য সে সব কাজ মালিকের জন্য করে কিন্তু সেও জানে মৃত্যুর পর আমি মালিকের সঙ্গে এক হব না, ঈশ্বরের কাছেই যাব। মৃত্যুর পর যে গতিই হোক স্বর্গ হোক কি নরকই হোক কিন্তু মালিকের সঙ্গে এক হবো না, পরম আমার মালিক নয়, পরম আমার ভগবান। অন্য জায়গাতেও ভগবান বলছেন *মচ্চিত্তঃ মৎপরঃ*, এই একই ভাব, এই ভাবটাকে ভগবান বারবার বলছেন। এক তরুণের চিত্ত তরুণীর প্রতি লেগে আছে কিন্তু সেও জানে ভগবান যিনি তিনি এই মেয়েটির থেকে ওপরে। কথামৃতে ঠাকুর বলছেন – ঈশ্বরের যখন কৃপা হয় তখন সবাই তার বশে আসে, সবাই তাকে মানে, এমনকি নিজের স্ত্রী পর্যন্ত। যারা চাকরি বাকরি করছে তারা কার জন্য উপার্জন করছে, নিজের খাওয়া-পড়ার জন্য কত টাকা আর লাগবে আর বাকি উপার্জিত টাকা সব বিশালাক্ষির দ'য়ে ঢুকে যাচ্ছে। কিন্তু যারা অতি প্রাকৃত, যাদের বুদ্ধি বলে কিছু নেই তারা স্ত্রীকে বলে মরার পর আমি আর তুমি আলাদা হয়ে যাব কিন্তু তুমি যখন মরে যাবে আবার আমি আর তুমি এক হয়ে যাব। যারা অতি মন্দ বুদ্ধির তারাই এই ধরণের চিন্তা করে। কিন্তু যাদের একটুও চৈতন্যোদয় হয়েছে তারা জানে যে মৃত্যুর পর ভগবানই পরম গতি, সেইজন্য মরার পর যখন শশ্মানে নিয়ে যায় তখন বলে রাম নাম সত্য হ্যায়। তুমি যে স্ত্রীর কাছে যাবে স্বামীর কাছে যাবে এটা কখন বলে না। আসল গতি তিনিই। এইটাই এখানে বলা হচ্ছে *মৎকর্মকৃন্মৎপরমো*, যখন সংসারের জন্য কাজ করছ তখনও মনে করবে আমার জন্যই করছ, তখন তোমার দৃষ্টভঙ্গীটা অন্য রকম হয়ে যাবে। এটাকে অন্যান্য ধর্মে অন্য ভাবে গ্রহণ করছে। যেমন ভগবান বুদ্ধ বলছেন, যদিও ভগবান বুদ্ধ ঈশ্বরের কথা বলতেন না, তিনিও বলছেন সব সময় নিজের চৈতন্যকে জাগ্রত রেখে সব কিছু করে যাও, এটাই হচ্ছে Awareness, আমি যখন হাঁটা চলা করছি সেটা সৎ কিনা, আমি খাওয়া-দাওয়া করছি এটা সৎ কিনা, কথা বলছি, যা কিছু করছি সব সৎ কিনা এই ব্যাপারে সজাগ রাখা। এখানেও এই একই কথা বলা হচ্ছে, যা কিছু করবে আমার জন্য করবে।

তারপর বলছেন, *সঙ্গবর্জিতঃ*, কোন কিছুতে আসক্ত হয়ে পড়ো না। ঠাকুর বলছেন – সংসারে আছি কি, আমড়া, আঁটি আর চামড়া, খেলে আবার অম্লশূল। তাই এই সংসারে আসক্তি কিসের জন্য করতে যাবে। আর *নির্বৈরঃ*, জগতের কোন প্রাণীর প্রতি বৈরীভাব মনের মধ্যে রাখবে না। সাপের ডিম থেকে যখন সাপের বাচ্চাগুলো বেরোতে থাকে তখন সর্পিণী বাচ্চা সাপ গুলো খেতে শুরু করে। আসলে সর্পিণী তফাৎটা বুঝতে পারেনা, যেটাই সামনে নড়াচড়া করে মনে করে এটাই বুঝি আমার দুষমন, সঙ্গে সঙ্গে তাই গপ্ গপ্ করে গিলে ফেলে। কিন্তু এমনিতে মা কখনই সন্তানের কোন ক্ষতি হোক চায় না, সন্তান যতই ক্ষতি করুক না কেন মা সব সময় মাফ করে দেয়। সেটাই শঙ্করাচার্য ক্ষমাপনস্তোত্রে বলছেন – *কুপুত্রো জায়তে ক্বচিদপি কুমাতা ন ভবতি*। মা কখনই কুমাতা হয় না। মা সন্তানের সব অপরাধ ক্ষমা করে দেন বলে মা কখন কুমাতা হয় না। ঠাকুর আবার বলছেন – শুনেছি মা ছেলের ওপর নালিশ করলে কোর্টে কেস তেমন চলে না। ছেলেই কেস ছিনতাই করে নিয়ে বলে – যাঃ যা করার করগে যাও। মায়ের উপর ছেলের জোর চলে।

অধ্যাত্মের শেষ কথা – *মত্তঃ সর্বং প্রবর্তন্তে*, এই জগৎ আমার থেকেই বেরিয়েছে। যিশু বলছেন God in Heaven, I and God in Heaven are one, এখানে যিশু নিজের ব্যাপারে বলছেন, কিন্তু হিন্দুরা বলে তুমি আর ঈশ্বর এক, ঈশ্বরের পুত্র আর ঈশ্বরই শুধু এক নয়, তুমিও তাঁর সঙ্গে এক। গীতাতে ভগবান বলছেন যে ঠিক ঠিক ভক্ত সে আমার আত্মা। এই জগৎটা যদি তাঁরই সৃষ্টি হয় তাহলে যে ঠিক ঠিক ভক্ত সেতো তাঁরই সৃষ্টি। ঠিক ঠিক ভক্তও দেখছেন সবই যদি তাঁর সন্তান হয় এখন সে কার প্রতি বৈরীভাব পোষণ করবে? দুটো সন্তান যদি ঝগড়া করে মা যখন তাদের একটাকে কান ধরে যদি চড়ও মারে তখন সেটা বৈরীভাব

থেকে করে না। বৈরীভাব বা হিংসাভাব এটা আলাদা, মনের একটা বিশেষ অবস্থা, আমি পুরো জগতের সবাইর গলা কেটে দিতে পারি কিন্তু মনের মধ্যে হিংসা ভাব নাও থাকতে পারে। যিনি সাধুপুরুষ তিনি যখন দেখেন সারা জগৎ আমার থেকেই বেরিয়েছে তখন কারুর প্রতি তাঁর বৈরীভাব আসবেই না, সবারই প্রতি করুণার ভাব এসে যাবে। ভগবান বুদ্ধের যেটা ছিল, সবার প্রতি তাঁর করুণার ভাব। এক সাধু নদী স্নান করার সময় দেখে একটা বিছে জলে ভেসে যাচ্ছে, ঐ দেখে সাধুর মনে করুণার উদয় হল, তিনি হাতে করে বিছেটাকে জল থেকে তুলে ডাঙ্গার দিকে ফেলতে গিয়ে সাধুর হাতে দংশন করেছে। সাধুর হাতটা কেঁপে উঠতে বিছেটা আবার জলে পড়ে যেতেই সাধুটি আবার বিছেটাকে হাত দিয়ে তুলতে গেছে বিছেটাও আবার তাকে দংশন করেছে। এই ভাবে তিনবার চারবার একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি চলতে থাকল, যারা ঘাটে দাঁড়িয়ে ছিল তারা সাধুবাবাকে বলছে – মহারাজ, কেন আপনি বিছেটাকে রক্ষা করতে যাচ্ছেন, এতো আপনাকে ছোবল মেরেই যাচ্ছে। সাধুবাবা বলছেন – এই ক্ষুদ্র প্রাণী সে নিজের স্বভাবকে ছাড়তে পারছে না, আর আমি সাধু মহাত্মা হয়ে আমার স্বভাবকে কি করে ছেড়ে দিই। সাধু এমন ক্ষমাতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছেন যে তার মধ্যে নির্ভয় সর্বভূতেষু এসে গেছে। আমাদের নির্ভয় শুধু নিজের সন্তানের প্রতি, সেইজন্য ঠাকুর বলছেন নিজের সন্তান, আত্মীয়স্বজনকে ভালোবাসার নাম মায়া আর সব প্রাণীকে ভালোবাসার নাম দয়া। সাধুবাবাকে যখন বিছেটা ছোবল দিচ্ছে বিষের জ্বালায় তাঁরও হাতটা কেঁপে উঠছে, এটা শারীরিক প্রতিক্রিয়া, কিন্তু মানসিক স্তরে তার মধ্যে কোন বৈরীভাব, হিংসাভাব আসছে না। আমরা কি করব এই ক্ষেত্রে? বিছে ছোবল মারার আগেই পাথর দিয়ে বিছেটাকে থেঁতলে দেব। যদি নাও মেরে ফেলা হয় ভয়ের চোটে কাঁপতে থাকব, আর অস্থির হয়ে ভাবতে থাকব কখন এটা এখান থেকে চলে যাবে। তার মানে আমাদের মধ্যে বৈরীভাব আছে। সাপকে দেখে ভয় পাওয়া মানে মনের মধ্যে বৈরীভাব আছে। কিন্তু যিনি সত্যিকারের বৈরীভাব শূন্য তাঁর মনে কোন প্রতিক্রিয়াই হবে না সাপ দেখলে। এগুলো কোন কাহিনী নয় এটাই বাস্তব। এই রকম যাদের হয় তাদের কি হয়? *যঃ স মামেতি পাণ্ডব*, এরাই আমাকে পেয়ে যায়।

একাদশ অধ্যায় এই দুটো শ্লোককে দিয়ে শেষ করা হয়েছে। এই দুটো শ্লোকের মাধ্যমে দ্বাদশ অধ্যায়ের প্রেক্ষাপটকে তৈরী করা হল। এতক্ষণ অর্জুন সব কিছু মন দিয়ে শুনে যাচ্ছিলেন, দ্বিতীয় অধ্যায়ে ভগবান কিছু কিছু আত্মতত্ত্বের কথা বললেন, তৃতীয় অধ্যায়ে এসে ভগবান হঠাৎ বলতে শুরু করলেন আমি ভগবান, আমি ঈশ্বর। এই যে তিনি বললেন আমি ঈশ্বর তারপর সেখান থেকে দশম অধ্যায় পর্যন্ত ক্রমাগত এইভাবে সেইভাবে বলে গেছেন আমি সেই ঈশ্বর, যদিও ষষ্ঠ অধ্যায়ে সেইভাবে নিজেকে ঈশ্বর না বললেও সপ্তম, অষ্টম অধ্যায়ে পুরোদমে বলে গেছেন। কিন্তু কি রকম ঈশ্বর? আচার্য বলছেন, *পরমাত্মনো ব্রহ্ম অক্ষরস্য*, অক্ষর, যার কোন ক্ষয় হয় না, যার কোন নাশ হয় না, এই রূপে ঈশ্বরকে সামনে রাখা হয়েছে। তিনি সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম, শ্রীকৃষ্ণ রূপে নয়, শ্রীরামচন্দ্র রূপে নয়, কোন উপাধি আরোপ না করে। এটাকে বলা হয় নিরুপাধিক ঈশ্বর। কোন উপধি নেই, ঈশ্বর, ব্যস্ এইটুকু। ঈশ্বর কে? তিনি জগতনিয়ন্তা, যিনি জগতকে চালাচ্ছেন। তাঁর কি রূপ, সেটা বলা হচ্ছে না। শুধু বলে গেছেন আমার পরা প্রকৃতি আছে আমার অপরা প্রকৃতি আছে, আমাকে যে ভক্তি করে তার এই রকম হয়, এই ধরণের নানান কথা বলে গেছেন। এর মধ্যে থেকে থেকে বলছেন ভগবান হচ্ছেন অনন্ত ঐশ্বর্য সম্পন্ন। এর আগেও আমরা আলোচনা করেছিলাম যে ভগবান হচ্ছেন ষড়ৈশ্বর্য সম্পন্ন, ভগবানের ছয়টি ঐশ্বর্য সব সময় এক সঙ্গে থাকবে। জ্ঞান, ঐশ্বর্য, শক্তি, বল, বীর্য ও তেজ, ভগবানের এই ছয়টি ঐশ্বর্য কখন ক্ষয় হয় না।

আবার অন্য দিকে বলছেন তিনি নিরুপাধিক, তাঁর কোন উপাধি নেই। আপনি বললেন ভগবান কি? ভগবান জ্ঞানবান, সম্পূর্ণ জ্ঞান তাঁর মধ্যে আছে, এখানে তো তাহলে উপাধি দিয়ে দিলাম। আমরা যেই বললাম ভগবান হলেন সর্বশক্তিমান, সঙ্গে সঙ্গে ভগবানের একটা উপাধি চলে এল। ভগবানের ছটি উপাধি সব সময় লাগান আছে। কিন্তু ভগবানের বিভূতি হচ্ছে বিস্তার, অর্জুনকে নিজের বিভূতির কথা বলতে গিয়ে ভগবান বলছেন – অর্জুন আমি যদি শত শত বছর ধরে আমার বিভূতির কথা বলতে থাকি তাও শেষ হবে না, দশম অধ্যায়ে এই কথা বলছেন। এরপর তাই ভগবান অর্জুনকে সংক্ষেপে তাঁর বিভূতির কথা বললেন। কিন্তু ভগবানের ঐশ্বর্যেরও শেষ নেই বিভূতিরও শেষ নেই, তবে ভগবানের ছয়টি ঐশ্বর্যের কথা বলা হয় আর ঐ ছটি ঐশ্বর্য থেকেই বাকি সব ঐশ্বর্য বেরিয়ে আসে।

আধ্যাত্মিক তত্ত্ব আর আধ্যাত্মিক সত্তাকে কখন ব্যাখ্যা করা যায় না। ব্যাখ্যা যখন করা হয় তখন একটা উপাধি আরোপ করে ব্যাখ্যা করে বলা হয় যে ভগবান এটা নয়, সেটা নয় ইত্যাদি করে। এই জগৎট কি? বলছেন তিনটে গুণের, সত্ত্বঃ, রজঃ ও তমো, জগতের যা কিছু আছে সব এই তিনটে গুণ দিয়ে নির্মিত। এটা বলেই বলা হবে ভগবান ত্রিগুণাতীত, মানে ভগবান তিনটে গুণের পার। এখন তিনটে গুণের পার এই কথার অর্থটা কি? এর ব্যাখ্যা করা যায় না। আমাদের সব চিন্তা ভাবনা দেশ কাল দ্বারা আবদ্ধ, দেশ কালের বাইরে কোন কিছুর চিন্তা করতেই পারিনা। যেমন এই জলটা কোথায়? বোতলে। এই বোতলটা কতটুকু? বোতলের এই সাইজ। ভগবান কি? ভগবান অনন্ত। অনন্ত মানে কি? অনন্তের তো কোন সংজ্ঞা দেওয়া যায় না। আমাদের কাছে সব কিছুর একটা অন্ত আছে, সব কিছুর একটা শেষ আছে, সীমা আছে, কিন্তু ভগবানকে বলা হয় অনাদি অনন্ত। তাহলে অনন্তটা কি

উপাধি? উপাধি অর্থে ভগবানকে কখনই অনন্ত বলা হচ্ছে না, অনন্ত বলা হচ্ছে নিরুপাধিক অর্থে। আবার অন্য দিকে তাঁর উপাধিও আছে, এই যে বলা হল তিনি ষড়ৈশ্বর্য সম্পন্ন।

এখন ভগবান যখন পরা প্রকৃতির রূপে থাকেন, শুদ্ধ চৈতন্য রূপে থাকেন তখন এই মন দিয়ে সেই শুদ্ধ চৈতন্যের চিন্তা ভাবনা করা যায় না। আমরা যেটা বুঝতে পারি জিনিষটা আছে কিনা, যেমন এখানে ইলেক্ট্রিকের তার রয়েছে, এই তারের মধ্যে দিয়ে যে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হচ্ছে আমরা কি এটা দেখতে পাচ্ছি বা বুঝতে পারছি? পারছি না। কিন্তু যখন ইলেক্ট্রিসিটি টিউবলাইট হয়ে জ্বলে, পাখার ব্লেডগুলো যখন ঘুরছে তখন বুঝতে পারি যে ইলেক্ট্রিসিটি এই তার দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। কিন্তু শুদ্ধ চৈতন্যকে যখন একটা মাধ্যম দিয়ে দেওয়া হয় তখন তাঁকে দেখা যায়। মাধ্যমটা কি? এই তিনটে গুণ, সত্ত্বঃ, রজঃ ও তমো। ভগবানের যে মাধ্যম সেটা অত্যন্ত সত্ত্বাধিক্য, সত্ত্বগুণের যা যা আছে তার সবই ভগবানের মধ্যে দেখা যায়, যেমন তমোগুণের যা যা জিনিষ সেটা ভগবানের মধ্যে দেখা যায় না। তমোগুণ হচ্ছে প্রমাদ, আলস্য, নিদ্রা। প্রমাদ মানে যেটা কর্তব্য সেটা করবে না, আলস্য, কাজ করা ইচ্ছে নেই, নিদ্রা, পড়ে পড়ে খালি ঘুমনো। ভগবান যখন অবতার হয়ে আসেন তখন তাঁর মধ্যে এই দুটি জিনিষ দেখা যায় একটা হচ্ছে এই সুখ, আর জ্ঞান, জ্ঞানটা তাঁর মধ্যে সব সময় টগবগ করবে, জ্ঞান তাঁর কখনই ঢাকা পড়বে না। এইটাই এতক্ষণ বলা হচ্ছে, একদিকে তিনি ঈশ্বর ত্রিগুণাতীত, যেখানে কোন উপাধির কোন ব্যাপার নেই, বলেই আবার থেকে থেকে উপাধি গুলোকে বলে দেওয়া হচ্ছে। ব্যাপারটা সত্যিই খুব গোলমেলে। মাস্টারমশাইরও এই গোলমাল হয়েছিল। প্রথম যখন দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে গেছেন মাস্টারমশাইকে ঠাকুর জিজ্ঞেস করছেন – তোমার সাকারে বিশ্বাস না নিরাকারে বিশ্বাস? যার কোন চৈতন্যবোধই নেই তার কাছে সাকার আবার নিরাকার! স্বামীজী সাধুদের বলতেন একটা কিছু কর, ভগবান দেখতে এসেছিস, একটা ভূত পর্যন্ত দ্যাখ্ তবে অন্তত কিছু আছে বলে বিশ্বাসটা হবে। ভগবান একদিকে বলে যাচ্ছেন তিনি ঈশ্বর তাঁর কোন উপাধি নিয়ে আলোচনা করা যাবে না, আবার থেকে থেকে উপাধিও বলে দেওয়া হচ্ছে।

তারপর একাদশ অধ্যায়ে এসে ভগবান সব কিছু ভেঙ্গে চুরমার করে দিলেন। এখানে এসে এই দ্যাখ্ আমার রূপ, উপাধিকে সরিয়ে রেখে এখানে রূপও দেখিয়ে দিলেন। একদিকে তিনি তাঁর জগদাত্মিকরূপম্ বিশ্বরূপ দেখিয়ে দিলেন। একদিকে জগতের যত রকমের ঐশ্বর্যাদি হতে পারে আর অন্য দিকে তিনি সমস্ত জগতের যে তিনি আত্মা সেটাকেও দেখিয়ে দিলেন। সাথে সাথে শেষ শ্লোকে এসে ভক্তির পরাকাষ্টা কি দেখিয়ে দিলেন, কিভাবে তাঁকে পাওয়া যাবে বলে দিলেন। এইসব কারণে অর্জুনের মধ্যে একটা সমস্যা এসে গেছে, এই ধরণের সমস্যা প্রত্যেক আধ্যাত্মিক সাধকের আসবে। দ্বাদশ অধ্যায়ে অর্জুন তাই প্রথম শ্লোকে ভগবানকে জিজ্ঞেস করছেন –

অর্জুন উবাচ

**এবং সততযুক্তা যে ভক্তাস্ত্বাং পর্যুপাসতে। যে চাপ্যক্ষরমব্যক্তং তেষাং কে যোগবিত্তমাঃ।।১।।**

হে ভগবান আপনি এক্ষুণি বললেন আপনি ভগবান, আমাকে ভক্তি কর, সেবা কর। কিন্তু এর আগে আগে আপনি নিজেকে *অক্ষরং অব্যক্তং*, অক্ষর ব্রহ্ম বলছিলেন, আর আপনাকে ইন্দ্রিয়াদি দিয়ে জানা যায় না, অব্যক্ত মানে যাকে ইন্দ্রিয় দ্বারা জানা যায় না। তাহলে যে জিনিষটা নেই তাকে তো জানা যাবে না। কিন্তু না তা হয় না, একটা মরীচিকা যখন দেখছি তখন সেটা এক রকম, আবার যখন আমাকে কেউ জিজ্ঞেস করে আপনি কি আকাশ কুসুম দেখতে পাচ্ছেন। না তো দেখতে পাচ্ছি না। কানে শুনতে পাচ্ছেন? না শুনতে পাচ্ছিনা। তাহলে আকাশ কুসুম নেই। ভগবানকে চোখ দিয়ে দেখতে পাচ্ছেন? না পাচ্ছি না। কান দিয়ে ভগবানকে শুনতে পাচ্ছেন? না পাচ্ছি না। তাহলে ভগবান নেই। কিন্তু না ঈশ্বরের সম্বন্ধে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া যাবে না। এগুলো দিয়ে বলা যায় না বলে বলা হয় ভগবান অব্যক্ত। এই অব্যক্ত আর আকাশ কুসুম বা বন্ধ্যাপুত্র এক হবে না। বন্ধ্যাপুত্র যেমন কখনই হতে পারে না, তার যদি পুত্র হয় তাহলে সে বন্ধ্যা হবে না, আর যদি বন্ধ্যা হয় তাহলে তার পুত্র হবে না। তাহলে ভগবান কি বন্ধ্যাপুত্রের মত? না, তা নয়। অক্ষর। কিভাবে জানা যাবে? কিছুই নয়, ধ্যানের গভীরেই জানতে পারবে।

মূল সমস্যা হচ্ছে, দ্বিতীয় অধ্যায় থেকে দশম অধ্যায় পর্যন্ত ভগবান বলে গেলেন আমি ঈশ্বর। কি রকম ঈশ্বর? নিরাকার, কোন উপাধি নেই। কিন্তু মাঝে মাঝে ভগবান বলে যাচ্ছেন আমার এই গুণ, আমি নিয়ন্তা। আর একাদশ অধ্যায়ে ভগবান একেবারে আর কিছুর বলাবলি নেই নিজের রূপটাকে দেখিয়ে দিয়ে বললেন এই দেখো আমার এই রূপ। একাদশ অধ্যায়ে ভগবান তাঁর যে রূপ দেখালেন এটা তো কোন কল্পনা নয়, অর্জুন সাক্ষাৎ সামনে দেখছেন, দেখে ভয়ে রীতিমত কাঁপতে শুরু করেছেন।

গীতার এই আপাত পরস্পর বিরোধী মত গুলোকে শঙ্করাচার্য যে ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন আমরা সেইভাবেই বুঝবার চেষ্টা করব। শঙ্করের যে মত ঠাকুরেরও এই একই মত। সেই মতে বলছেন – ঈশ্বর হচ্ছেন সাকার, ঈশ্বর আবার নিরাকার, ঈশ্বর আবার সাকার নিরাকারের পরেও আরো অনেক কিছু। ঠাকুর বলছেন তিনি আরও কত কি হতে পারেন। আমাদের মস্তিষ্ক এমন ভাবে সাজান

আছে যে আমরা একটা জিনিষকে যখন বিচার করি তখন ভাবি জিনিষটা এই রকম হবে আর তা নাহলে এর বিপরীত ঐ রকম হবে, তৃতীয় যে একটা কিছু হতে পারে সেটা আমাদের মস্তিষ্ক গ্রহণ করতেই পারেনা। জিনিষটা হয় ঠাণ্ডা হবে, না হয়তো গরম হবে, না হলে ঠাণ্ডা আর গরমের মাঝামাঝি কিছু, কিন্তু ঠাণ্ডা গরমের বাইরে তৃতীয় কিছু হতে পারে সেটা আমাদের মাথায় আসে না। সমুদ্রের গভীর জলে মাছ বলতে পারে আমি জল আছে বুঝতে পারছি, বাতাসও যে আছে সেটাও না হয় বুঝে নিতে পারব কিন্তু স্থল বলে কিছু আছে আমি ভাবতেই পারছি না। আমরাও হয় এটা না হয় ওটা, ঠাণ্ডা না হয় গরম, জীবন আর মৃত্যু আছে বুঝতে পারি কিন্তু ত্রিশঙ্কু বলে একটা অবস্থা হতে পারে আমাদের মাথায় আসবে না। ঈশ্বরও হয় সাকার হবেন না হয় নিরাকার হবেন সাকার নিরাকারের বাইরে তৃতীয় কি হবেন সেটা আমরা কি করে জানতে পারব, মাথাতেই আসবে না। সেইজন্য ঠাকুর বলছেন – ঈশ্বর সাকার, ঈশ্বর নিরাকার, ঈশ্বর আরও কত কি হতে পারেন। যেমনি আমি বলে দেব ঈশ্বর সাকার তখন আমি ঈশ্বরকে বেঁধে দিলাম তার মানে ঈশ্বর নিরাকার হতে পারেন না। আবার যখন ঈশ্বরকে নিরাকার করে দিলাম তখনও ঈশ্বরকে সীমিত করে বেঁধে দিলাম তিনি সাকারও হতে পারেন না। যে ঈশ্বরকে বেঁধে দেওয়া যায় তাহলে সেই ঈশ্বর কিসের ঈশ্বর। যে বাবুর বাগান নেই, বাড়ি নেই সেই বাবু কিসের বাবু। যে ভগবানের ক্ষমতাই নেই ঐশ্বর্যই নেই সেই ভগবান কিসের ভগবান। সেই রকম যে ভগবান নিরাকার কিন্তু সাকার হতে পারেন না, সেই ভগবান কিসের ভগবান। যে ভগবান সাকার হতে পারেন, নিরাকার হতে পারেন না সেই ভগবান কিসের ভগবান। সাধারণ বুদ্ধি, মন্দ বুদ্ধি যাদের তাদের কাছে এটা বিরাট সমস্যা, তারা এটাকে বুঝতেই পারে না।

গীতার মতে ভক্ত যারা হন তাঁরা দুই ধরণের হন। একজন ভক্ত মনে করেন – আমি তাঁতে তিনি আমাতে। শ্রীরামকৃষ্ণ আমার হৃদয়ে বাস করেন, আর আমি শ্রীরামকৃষ্ণের হৃদয়ে বাস করি। গীতার মতে অর্থাৎ ভগবানের মতে এঁরা হচ্ছেন শ্রেষ্ঠতম ভক্ত। আচার্য শঙ্করও নিজে বলছেন ভক্তির অনেক প্রকার হয় কিন্তু তার মধ্যে এটি হচ্ছে শ্রেষ্ঠতম ভক্তি। দ্বিতীয় প্রকারের ভক্তিতে ভক্ত বলেন, ছি ছি ছি, আমি আর শ্রীরামকৃষ্ণ কি কখন এক হতে পারি! তিনি মালিক আমি তার দাস। দ্বাদশ অধ্যায় হচ্ছে একেবারে একটি ব্যতিক্রমি অধ্যায়, এখানে ঈশ্বর আর জীবের পৃথকত্বকে গ্রহণ করা হচ্ছে। গীতায় এমন এমন অনেক কিছু গ্রহণ করা হয় না, আবার যেখানে একটু যা গ্রহণ করেছে সেটাকেও শঙ্করাচার্য উড়িয়ে দিয়েছেন। শঙ্করাচার্য হচ্ছে ঘোরতম জ্ঞানী, মানে শ্রেষ্ঠতম ভক্ত, আমি আর ঈশ্বর এক, এর বাইরে কিছুতেই তিনি যাবেন না। স্বামীজী একবার বেলুড় মঠ থেকে গঙ্গা পেরিয়ে কলকাতায় যাচ্ছেন। গঙ্গা পেরিয়ে বরাহনগরে দেখেন ফাগুর দোকানে গরম গরম কচুড়ি ভাজা হচ্ছে। কচুড়ি দেখে স্বামীজী কলকাতা যাওয়া বন্ধ করে এক চাঙড়া কচুরি কিনে সোজা বেলুড় মঠে ফিরে পুরনো মন্দিরে ঠাকুরের ছবির সামনে কচুড়ির চাঙড়াটা নিবেদন করে বলছেন – খাও ইয়াড়। এগুলো হচ্ছে শ্রেষ্ঠতম ভক্তির অভিব্যক্তি।

জোসেফিন ম্যাকলাউড ছিলেন বিরাট বড়লোক বাড়ির মহিলা। স্বামীজীর সাথে পরিচয় থেকে নিজেকে তিনি স্বামীজীর বন্ধু বলে ভাবতেন। চিরদিন অবিবাহতই থেকে যান। দীক্ষাও নেননি। তাঁর গলাতে একটা লকেট ঝুলত ওতে স্বামীজীর একটা চুল রাখা ছিল। বেলুড় মঠে যে ঘরে থাকতেন, সেই ঘরের বাইরে থেকে একদিন এক মহারাজ দেখতে পান ম্যাকলাউড স্বামীজীর একটা ছবির সামনে জোর নৃত্য করে যাচ্ছেন। বাইরে কে দাঁড়িয়ে আছে কোন হুঁশ নেই, একাত্ম হয়ে নেচেই যাচ্ছেন। স্বামীজীর সাথে সব সময় তিনি নিজেকে একাত্ম বোধ করতেন। এই একাত্ম বোধ হচ্ছে জ্ঞানীর পরাকাষ্টা, শ্রেষ্ঠতম জ্ঞান। সবাই ঈশ্বরের সাথে একাত্ম বোধ করতে পারে না। পারেনা বলে তারা স্বামী-ভৃত্যবৎ ব্যবহার করে, ঈশ্বর হচ্ছেন মালিক আমি তাঁর সেবক। শঙ্করাচার্য কিন্তু এই ধরণের ভক্তির নিন্দা করছেন না। আমাদের অনেকরই কিন্তু ভুল ধারণা যে তিনি এই ধরণের ভক্তিকে সমর্থন করেন না, কিন্তু তা নয়, শুধু তিনি এই ধরণের ভক্তিকে নিম্ন শ্রেণির ভক্তি বলছেন।

অর্জুন বলছেন, যারা আপনাকে অব্যক্ত অক্ষর রূপে উপাসনা করছেন, অব্যক্ত অক্ষর মানে সর্বভূতে তিনি ব্যপ্ত হয়ে আছেন, ঈশ্বরের কোন রূপ নেই, নিরাকার ইত্যাদি রূপে উপাসনা করেছে তারা শ্রেষ্ঠ না আপনি যে একাদশ অধ্যায়ে যে সাকার বিশ্বরূপ দেখালেন, যাতে আপনি হলে সর্বশক্তিমান, আপনি সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়কারি, এই রূপের যে ভজনা করছে এই দুই ধরণের উপাসকের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ? সোজা কথা হল যারা ভক্তি ভাব নিয়ে আপনার ভজনা করে তারা শ্রেষ্ঠ, না যারা জ্ঞানমার্গে উপাসনা করছে সে শ্রেষ্ঠ, সাকার উপাসক শ্রেষ্ঠ, না নিরাকার উপাসক শ্রেষ্ঠ। কিন্তু এখানে আগেই বলে দেওয়া উচিত যে, অব্যক্ত অক্ষরের সাধনা গৃহীরা কখনই করতে পারে না, সম্ভবই না। সংসারীরা স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, আত্মীয় বন্ধু বান্ধব নিয়ে এত রকমের বন্ধনে জড়িয়ে থাকে যে সে এত বড় কথা কখনই বলতে পারে না। তাদের জন্য এই একাদশ অধ্যায়, সাকার উপাসনা। এই দুটোর মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ বলতে গিয়ে ভগবান প্রথমে বলছেন যারা অব্যক্ত অক্ষরের উপাসক মানে নির্গুণ নিরাকারের সাধক তাদের কথা এখন মুলতুবি থাক তার আগে তোমাকে সগুণ সাকারের কথা বলি –

শ্রীভগবানুবাচ

**ময্যাবেশ্য মনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে। শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতাস্তে মে যুক্ততমা মতাঃ।।২।।**

*মধ্যাবেশ্য, ময়ি আবেশ্য,* আবেশ্য মানে ঢেলে দেওয়া, নিবেশ করা। যে নিজের মনটাকে পুরোপুরি ঢেলে দিয়েছে। কোথায়? *ময়ি,* আমাতে, আমার মধ্যে পুরোপুরি ঢেলে দিয়েছে। খোকা মহারাজ, যাঁর সন্ন্যাস নাম স্বামী সুবোধানন্দজী, কাশীপুরে ঠাকুরের কাছে এসেছেন, ঠাকুর বলছেন কি সারাদিন হৈ হৈ করে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছিস কিছুই জপ-ধ্যান করছিস না। খোকা মহারাজ বলছেন – যদি জপ-ধ্যানই করতে হত তাহলে আপনার কাছে কেন আসতাম। এখানে বলছেন তা করলে হবে না, শুধু নিজেকে ঢেলে দিলে হবে না। বলছেন, *নিত্যযুক্তা উপাসতে,* নিত্য, সর্বদা তার মন যুক্ত থাকবে, এক সেকেণ্ডের জন্যও মন ঈশ্বরের থেকে নড়বে না। তার মানে যখন নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস নিচ্ছে তখনও মনে করবে যে এটা ঈশ্বরেরই কার্য। স্নান করছে, আহারাদি করছে সবই ঈশ্বরের সেবা। সেইজন্য ষষ্ঠ অধ্যায়ে আমরা একটা শ্লোক পেরিয়ে এসেছিলাম যেখানে ভগবান বলছেন – *যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্মসু,* যোগী যা কিছু করছে সবই যুক্ত হয়ে করে, সবটাই পরিমিত ভাবে করবে। আজ বিয়ে বাড়িতে অনেক খাওয়া-দাওয়া হয়ে গেছে তাই শরীরের বিশ্রাম দরকার আজ আর খাওয়া দাওয়া করব না, আজ মন খারাপ খেতে ইচ্ছে করছে না, এইসব করলে চলবে না। খাওয়ান হচ্ছে কাকে? ভেতরে যিনি অন্তর্যামী আছেন তাঁকে নিবেদন করা হচ্ছে। ভগবানকে সকালে দেবেন আর রাত্রে দেবেন না, সেটা করলে তো হবে না, একটা ধারাবাহিকতা রাখতে হবে। আবার একদিন সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত যত কাজ আছে এক সঙ্গে শুরু করে কাজের বন্যা বইয়ে দিলাম, তারপরের তিন দিন পুরো বিশ্রাম। সবটাই পরিমিত হবে আর নিত্যযুক্তা, ভগবানের সঙ্গে যে যুক্ত এটা এক সেকেণ্ডের জন্যও ভুলে যাবে না।

*শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতাঃ,* শ্রদ্ধয়া হচ্ছে একাদশ অধ্যায়ে শেষ শ্লোকে যেটা বললেন, *মৎকর্মকৃন্মৎপরমো মদ্ভক্তঃ সঙ্গবর্জিতঃ,* আমার জন্যই কর্ম করছে, আমাকেই পরম গতি মনে করছে, আমারই ভজনা করছে আর সমস্ত রকমের আসক্তি বিরহিত, এইটাই শ্রদ্ধয়া। এই ধরণের ভক্তরাই *যুক্ততম মতাঃ,* একেবারে আমার সাথে সর্বদা যুক্ত, এরাই আমার মতে শ্রেষ্ঠ যোগী। এই ধরণের গুণাবলী যাঁর মধ্যে আছে সেই হল ভক্তের শিরোমণি। ঠাকুরের জীবনে যে আধ্যাত্মিক সাধনা তা অধ্যাত্ম পথের যারা পথিক তাদের পথ দেখানোর জন্য, কিন্তু তাঁর সেই সাধনার দিকে তাকালে দেখা যায় তিনি যখন যে সাধনা করছেন তখন অন্য কোন দিকে তাঁর মন যাচ্ছে না, একেবারে সেই সাধনার রাজ্যে ডুবে আছেন। কিন্তু সাধারণ ভক্তরা দীক্ষা নেওয়ার পর মন্ত্রটা জপ করতেও কেমন অনীহা ভাব, অথচ দীক্ষা নেওয়ার দুদিন পরেই এসে বলবে কিছুই তো হচ্ছে না। দীক্ষা নিয়েই মনে করছে ভগবানকে আঁচলে বেঁধে ফেলেছি, জপ পরে করলেও হবে। ঠাকুরের সন্তান স্বামী বিজ্ঞানন্দজীর কাছে একজন দীক্ষা নিয়েছেন। দীক্ষা নেওয়ার পরেই মহারাজকে জিজ্ঞেস করছেন – মহারাজ, মন্ত্র জপ যদি না করতে পারি তাহলে কি হবে? মহারাজও উত্তর দিচ্ছেন – কি আর হবে, যেটা হবার ছিল সেটা হবে না। তার মানে যে মন্ত্র তোমাকে ঈশ্বর দর্শন পর্যন্ত করিয়ে দিতে পারে সেই মন্ত্র পেয়েও তোমার কিছুই হবে না। এই মনোভাব নিয়ে কিছুই হবে না, তাহলে কি করলে হবে? *নিত্যযুক্তা,* সব সময় যুক্ত থাকতে হবে। কোথায়? সংসার, টাকা-পয়সা, মান-সম্মানে নয়, ঈশ্বরের প্রতি নিত্যযুক্তা। প্রতিটি মানুষ কোন না কোন কিছুতে সর্বদা যুক্ত তো থাকবেই। কিছুদিন আগে একজন খুব উত্তেজিত হয়ে বলছিলেন – আমি আমার জীবনের সাফল্যের মূল মন্ত্র পেয়ে গেছি। জিজ্ঞেস করা হল কি সেই মূল মন্ত্র। তখন তিনি বললেন স্বামীজী বলছেন Take up one idea and leave in that idea and be one with that idea, জীবনে টাকা টাকা আর সাফল্য এইটাই আমার আইডিয়া। কোন এক ম্যানেজমেন্ট গুরু স্বামীজীর কোটেশান গুলোকে নিয়ে ম্যানেজমেন্টের উপর কি একটা বই লিখেছেন সেখানে স্বামীজীর এই কোটেশান দিয়ে তার ব্যাখ্যা করে বলছেন তুমিও জীবনে সাফল্য যদি পেতে চাও তাহলে যে কোন একটা আইডিয়াকে নিয়ে লেগে পড়লে তুমিও সফল হয়ে একদিন কোটিপতি হতে পারবে। সাফল্য কখন আইডিয়া হতে পারে, টাকা-পয়সা কখন আদর্শ হতে পারে? আদর্শ মানে হচ্ছে অহিংসা, সততা, ব্রহ্মচর্য, এগুলোই আদর্শ। তবে হ্যাঁ আমি যদি বলি আমি যা করব সেটাকে চরম উৎকর্ষতার পর্যায়ে নিয়ে যাব, এই আদর্শ যদি থাকে তবে ঠিক আছে এটাই তার ব্যক্তিত্বকে নিখুঁত করে দেবে। কিন্তু এখানে বলছে be one with that idea, তুমি কি টাকার সঙ্গে এক হয়ে যেতে চাও? তুমি মানুষ রূপ ছেড়ে টাকার নোট হয়ে যেতে চাও? এইসব বিচিত্র আইডিয়া নিয়ে মানুষ বড় হচ্ছে। কামিনী-কাঞ্চনের মধ্যে সবাই মুখ থুবড়ে পড়ে আছে, কিন্তু এখানে বলা হচ্ছে ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত হতে। গুরু বলে দিয়েছে সকাল বিকাল একশ আট বার জপ করতে, গুরুর কথা উল্লঙ্ঘন করতে নেই তাই কোন রকমে সকাল বিকেল একশ আট বার জপ করি। তাতে কি ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত হওয়া বলা যাবে? কখনই না। নিত্যযুক্তা, একটা সেকেণ্ডও ঈশ্বরকে ছাড়া থাকা যাবে না, সর্বক্ষণ ঈশ্বরের ভাবে জাগ্রত।

কিন্তু যাঁরা অব্যক্ত অক্ষরের উপাসনা করছেন, যাঁরা সর্বত্যাগী? শঙ্করাচার্য বলছেন এঁদের এখানে কোন আলোচনাই হবে না, কারণ এনারা ভগবানের আত্মা, এঁদের যুক্ত অযুক্তের কোন প্রশ্নই নেই। আকবরের সভাসদরা সম্রাটকে বলছেন আপনি সব সময় বীরবলকেই বেশি গুরুত্ব দেন কেন? আকবর তখন কিছু না বলে চুপ করে রইলেন, মনে মনে ঠিক করলেন এদের একটু শিক্ষা দিতে হবে আমি কেন সব সময় বীরবল বীরবল করি। একদিন সভায় আকবর সবাইকে জিজ্ঞেস করলেন – আপনারা বলুন ভারতবর্ষে সবচেয়ে পবিত্র জল কি? সবাই এক বাক্যে বলছে গঙ্গার জলই সব থেকে পবিত্র। ইতিমধ্যে বীরবলও সভায় হাজির হয়েছে, তাকেও সম্রাট জিজ্ঞেস করছেন, বীরবল বলতো ভারতবর্ষের সব থেকে পবিত্র জল কোনটি? বীরবল বুঝে গেছেন কিছু একটা ব্যাপার আছে। বীরবল খুব গম্ভীর হয়ে বললেন – সব থেকে পবিত্র হল যমুনার জল। বলা মাত্র সভায় শোরগোল পড়ে গেল, কি বলছে গঙ্গার জল

ছেড়ে যমুনার জলকে পবিত্র বলছে বীরবলের মাথাটা নিশ্চয়ই খারাপ হয়ে গেছে। বীরবলকে ব্যাখ্যা করতে বলা হল। বীরবল তখন দণ্ডায়মান হয়ে বাদশার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বলছে – জাঁহাপনা, গঙ্গার জলতো জল নয়, ওটাতো অমৃত। জল যখন বলা হবে তখন যমুনার জল থেকে গণনা শুরু হয়, গঙ্গার জলতো এই বিচারে আসবেই না। গঙ্গার জলতো অমৃত, গঙ্গার জল পবিত্র করে। যমুনার জল থেকে গোণা শুরু হয় তাই সব থেকে পবিত্র জল যমুনা। যাঁরা সন্ন্যাসী, তাঁদের ভগবানের সঙ্গে যুক্ত অযুক্তের কোন প্রশ্নই উঠতে পারেনা। সন্ন্যাসী মানে গেরুয়া পড়লেই বলা হচ্ছে না, যাঁর মন কামিনী-কাঞ্চন থেকে সরে এসেছে, সরে এসে সে ঈশ্বরের যে কোন একটা রূপে, সেটা সাকার রূপই হোক আর নিরাকার রূপই হোক তাতে কিছু এসে যায় না, মনে করছে আমি তাঁতে তিনি আমাতে। গীতায় ভগবান বলছেন এই ধরণের যাঁরা ভক্ত – *তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি*, আমি তাঁকে কখনই নাশ হতে দিই না সেও কখনই আমাকে নাশ হতে দেয় না। কারণ আমি তাঁর আত্মা আর সে আমার আত্মা, তাই এক অপরের নাশ হতে দেয় না। তাই এঁদের যুক্ত আর অযুক্তের কোন প্রশ্নই হয় না। প্রশ্ন আসবে যারা জোর করে ধরার চেষ্টা করছে। ঠাকুর খুব সুন্দর উপমা দিচ্ছেন – বাপ যদি ছেলের হাত ধরে থাকে ছেলে কখনই পড়বে না, ছেলে যদি বাপের হাত ধরে তাহলে পড়তে পারে নাও পড়তে পারে। এই মাইক্রোফোনের নীচের স্টিল রডটা উপরে স্টীল রডের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে, দুটো স্টীল রড এক হয়ে যায়নি। কিন্তু এক ফোঁটা জল এই গ্লাশের জলে ফেলে দিলে এক হয়ে যাবে সেখানে যুক্ত হবার কোন প্রশ্নই আসবে না। ঠিক তেমন যিনি অক্ষর ব্রহ্মের উপাসক, যিনি দেখছেন আমি তাঁর মধ্যে তিনি আমার মধ্যে, যিনি দেখছেন তিনি ছাড়া আর কিছু নেই, সে তো ঈশ্বরের সাথে এক হয়ে গেছে, যুক্ত হবার কোন প্রশ্নই আসে না। এর পর বলছেন –

**যে ত্বক্ষরমনির্দেশ্যমব্যক্তং পর্যুপাসতে। সর্বত্রগমচিন্ত্যঞ্চ কূটস্থমচলং ধ্রুবম্।।৩।।**

*অক্ষরম্*, ঈশ্বরের কখন ক্ষয় হয় না, মানে তাঁর জন্মও নেই মৃত্যুও নেই, *অনির্দেশম্*, যাঁকে কখন নির্দেশ করে বলা যায় না, যেমন আমি টিউব লাইটটাকে নির্দেশ করে বলছি এটা টিউব লাইট, এটা পাখা, ইনি শ্রীকৃষ্ণ, ইনি শ্রীরাম, এইভাবে নির্দিষ্ট করে ঈশ্বরকে দেখান যায় না। *অব্যক্তং*, ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যেমন যে ভাবে বিষয় বস্তুকে জানা যায়, জগতকে জানা যায় সেই ভাবে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ঈশ্বরকে জানা যায় না। *পর্যুপাসতে*, এইভাবে যাঁরা ঈশ্বরকে উপাসনা করেন, কোন ভাবে? তিনি *অক্ষর*, তিনি *অনির্দেশম্*, তিনি *অব্যক্তম্*। শঙ্করাচার্য উপাসনার ব্যাখ্যা হচ্ছে - শাস্ত্রবিধিতে উপাসনার প্রথম সর্ত হল, শাস্ত্রে যে যে উপাস্যের কথা বলে দেওয়া হয়েছে, অর্থাৎ যাঁদের উপাসনা করা হবে, যেমন শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাম, যিশু হন বা আল্লাই হন, তাঁদেরকেই উপাসনা করা হবে। কিভাবে? শাস্ত্রোক্ত বিধি অনুসারে। ইদানিং কালে পাড়ার চ্যাংড়ারা মিলে যে সরস্বতি পূজা করে, বিশ্বকর্মা পূজা করছে, একটা মুর্তি বসিয়ে পূজার নামে হৈহুল্লোড়, মাইক বাজিয়ে ফুর্তি করে যাচ্ছে, এগুলো কখনই শাস্ত্রোক্ত বিধি অনুযায়ী পূজা নয়। দুই পুরোহিত ব্রাহ্মণের সাথে রাস্তায় দেখা হয়েছে, এক পুরোহিত অপর পুরোহিতকে জিজ্ঞেস করছে – হ্যাঁরে, আমি একটা দুর্গাপূজা করছি তাতেই হিমসিম খাচ্ছি আর তুই দশটা পূজা কি করে করছিস। এই পুরোহিত বলছে – কেন, আমি তো প্রতিমাতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করি না, প্রাণ প্রতিষ্ঠা করলে পরেই তো পাপ লাগবে, আমি তাই প্রাণ প্রতিষ্ঠা না করেই কোন রকমে পূজা সেরে দিচ্ছি। এই সব পূজোকে কখনই উপাসনা বলা হবে না, কারণ শাস্ত্রোক্ত বিধি অনুসারে পূজা করা হচ্ছে না। এরপর উপাসনার কি শর্ত? বলছেন, মনটাকে একেবারে তাঁর কাছে নিয়ে যেতে হবে, মনের প্রবাহ উপাস্যের প্রতি একেবারে তৈলধারাবৎ হবে। তারপরের শর্ত হচ্ছে – *সমানপ্রত্যয় প্রবাহ*। বুদ্ধির প্রবাহ এক রকম হবে, অর্থাৎ বুদ্ধি একেবারে সমান যাবে। গ্যাসে দুধ বসিয়ে পূজো করতে বসেছি, একবার করে জপ করছি আর মাথায় চিন্তা হচ্ছে দুধটা না উতলে পড়ে যায়। এইভাবে উপাসনা হয় না। শুধু তাই নয়, দীর্ঘকাল ধরে করে যেতে হবে। তাহলে উপাসনার কি কি শর্ত হল? প্রথমে একজনকে উপাস্য রূপে ঠিক করতে হবে, যাকে তাকে উপাস্য করলে হবে না, শাস্ত্রে যেসব উপাস্যের কথা বলা আছে তাঁদের একজনকে ঠিক করে নিতে হবে, যার যাঁকে ভালো লাগে তাঁকেই উপাস্য করা যেতে পারে। তারপর বলছেন সেই উপাস্যকে বুদ্ধির বিষয় করে সমান প্রবাহে এক মনে তাঁর চিন্তা করে যেতে হবে। শ্রীরামকৃষ্ণ যার উপাস্য সে শ্রীরামকৃষ্ণকে বুদ্ধির বিষয় করে নিয়ে ভাবতে হবে শ্রীরামকৃষ্ণ ছাড়া আর কিছু নেই। আর কত দিন জপ করতে হবে? বলছেন দীর্ঘকাল ব্যাপী করে যেতে হবে। আচার্য শঙ্কর বলছেন, ছয় মাস এক বছর দীর্ঘকাল নয়। দরকার পড়লে কয়েক জন্ম ধরে করে যেতে হবে। তখন এইটাকে বলা হবে উপাসনা।

তারপর বলছেন *সর্বত্রগম্*, তিনি সর্বব্যাপী, তিনি অনন্ত, তাই তিনি কোথাও যান না। কোথায় যাবেন। আমরা কোথায় চলি? আমার বাইরে যে জায়গাটা আছে সেইখানেই চলি। ভগবানের বাইরে বলে কিছু নেই, যিনি সর্বব্যাপী তার আর বাইরে ভেতরে বলে কিছু থাকতে পারেনা। *অচিন্ত্যং*, মন, বুদ্ধি দিয়ে তাঁকে চিন্তা করা যায় না। *অচলম্*, তিনি অচল, তাঁর নড়াচড়ার কোন জায়গাই নেই, তিনি নড়বেন কোথায়, সর্বত্র তিনিই তো আছেন। *কূটস্থম্*, ভগবান হচ্ছেন *কূটস্থম্*, মায়াকে বা প্রকৃতিকে কূট বলা হয়, ভগবান এই মায়া বা প্রকৃতির উপর ঘ্যাঁট হয়ে বসে আছেন, এইজন্য ভগবানের আরেকটি নাম হচ্ছে মায়াধীশ। *ধ্রুবম্*, শাশ্বত, এক ভাবে আছেন, সেই আদি কাল থেকে এক রকম ভাবে আছেন, কখন তাঁর পরিবর্তন হয় না।

আচার্য প্রথমে উপাসনাকে ব্যাখ্যা করলেন। এরপর যিনি উপাস্য তাঁর বর্ণনা করছেন, যাঁর উপাসনা করা হবে তিনি কি রকম? তিনি *অক্ষরম্, অনির্দেশম্, অব্যক্তম্, সর্বত্রগম্, অচিন্ত্যম্, কূটস্থম্, অচলম্ ও ধ্রুবম্*। যাঁরা সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী তাঁরা যে *অহং*

*ব্রহ্মাস্মির* উপাসনা করে, অর্থাৎ যাঁরা অদ্বৈতের উপাসক এগুলো হচ্ছে অদ্বৈতের উপাধি। যিনি এই অক্ষর ব্রহ্মের উপাসক হবে তিনি কি রকম হবেন –

**সংনিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামং সর্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ। তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্বভূতহিতে রতাঃ।।৪।।**

*ইন্দ্রিয়গ্রামং,* ইন্দ্রিয় সমূহ, যত রকমের ইন্দ্রিয় আছে সব ইন্দ্রিয়কে সংযম করবে, ইন্দ্রিয়ের বিষয় থেকে টেনে রাখবে। *সর্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ,* সব জায়গায় সমান বুদ্ধি। কোথায় সমান বুদ্ধি? শত্রু মিত্রে? তাঁর কোন শত্রু নেই মিত্র নেই, সবার প্রতি সমান বুদ্ধি। সবার প্রতি সমান ভালোবাসা, কারুর প্রতি বেশি কারুর প্রতি কম ভালোবাসা কখন হবে না। বাগানে অনেক গাঁদা ফুলের গাছ লাগান হয়েছে, যখন জল দেওয়া, সার দেওয়া হয় তখন সব গাঁদা গাছেই সমান ভাবে সার জল ইত্যাদি দেওয়া হয়, সব গাঁদা গাছেরই সমান পরিচর্যা করা হয়। কিন্তু আবার গোয়ালারা যে গরু বেশি দুধ দেয় তাকে বেশি খাওয়ার দেয়, বেশি খাওয়ালে বেশি দুধ দেবে। মানুষ যেখানে আশা করে সেখানই এই রকম কম বেশি ভালোবাসার ব্যাপার চলে আসে। যেখানে কোন আশা প্রত্যাশার জোয়ার-ভাটা নেই সেখানে এই ধরণের কম বেশি কিছুই নেই। যিনি আধ্যাত্মিক সাধক তাঁর আর এই জগৎ থেকে কোন প্রত্যাশা থাকে না, তাই তাঁর বুদ্ধিটা সমান হয়ে যায়। *তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব,* এই ধরণের লোকেরাই আমাকে পায়, এইখানেই আসল রহস্যের উন্মোচন ভগবান করে দিলেন। যদিও এখানে অক্ষর উপাসনার কথা চলছে, কিন্তু ভগবান বলছেন তাঁরা আমাকেই পায়। শ্রীকৃষ্ণ আর অক্ষর এই দুইয়ের মধ্যে কোন প্রভেদ নেই, শ্রীরামকৃষ্ণ আর ঈশ্বর এই দুইয়ের মধ্যে কোন তফাৎ নেই। শেষ সিদ্ধান্ত তাহলে কোথায় গিয়ে দাঁড়াল? নির্গুণ নিরাকার আর সগুণ সাকারের মধ্যে কোন তফাৎ নেই। যিনি অক্ষর উপাসক, অহং ব্রহ্মাস্মি বলে উপাসনা করছেন তিনিও শ্রীকৃষ্ণের কাছে যান, এটাই এই শ্লোকের মূল বক্তব্য। কিন্তু তার আগে আরেকটি শর্তের কথা বলছেন – *সর্বভূতহিতে রতাঃ,* সমস্ত প্রাণীর কল্যাণে তিনি সদাসর্বদা নিযুক্ত, সকলের হিত সাধন করে যাচ্ছেন। কিন্তু তাঁকেও তো খাওয়া দাওয়া করতে হবে, আহার করতে গেলে জীবহিংসা হয়ে যাচ্ছে। সেইজন্য শরীর ধারণের জন্য যতটুকু না নিলেই নয় সেইটুকুর বাইরে একটুও তিনি গ্রহণ করবেন না। খাবার পর দেখা যায় এঁদের খাওয়ার পাতে একটি দানাও পড়ে থাকে না। যাঁরা আরও উচ্চ সাধক তাঁরা ভিক্ষা পাত্রটিকে ধুয়ে ঐ জলটুকুও পান করে নেন। আমদের যা কিছু আহার্য্য বস্তু সবই আমরা প্রকৃতি থেকে শুষে নিচ্ছি, বাচ্চা যখন মায়ের বুক থেকে দুগ্ধ পান করে তখন সে মায়ের স্তন থেকে দুধকে শুষে টেনে নিচ্ছে, না করলে বাচ্চা বাঁচবে না। বড় হয়ে আমরা মাকে ছেড়ে প্রকৃতির থেকে টেনে নিচ্ছি। কোন কিছু থেকে শুষে নেওয়া অত্যন্ত গর্হিত কর্ম, কিন্তু এই গর্হিত কর্ম না করেও উপায় নেই, তা নাহলে আমরা শরীর ধারণ করতেই পারব না। বাচ্চা কি মার বুকের দুধ টেনে কুলকুচি করে ফেলত থাকে? মাও কি বাচ্চাকে ঐভাবে নিজের বুকের দুধ বাচ্চাকে অপচয় করতে দেবে? ঠিক তেমনি প্রকৃতি থেকে যেটা টেনে নেওয়া হচ্ছে সেটাকেও কখন অপচয় করা চলবে না। সেইজন্য মহাপুরুষরা কোন কারণেই খাবার দাবারের একটি দানাকেও অপচয় হতে দেন না। কারণ তিনি জানেন এই যে একটি দানা অপচয় হচ্ছে এতে একটি প্রাণীর প্রাণ হরণ করা হয়েছে, এটা যেন নষ্ট না হয়। আমাকে এখন শরীর ধারণ করতে হবে, প্রাণী হিংসা না করে উপায় নেই, কিন্তু যতটুকু দরকার তার বাইরে একটি প্রাণীকেও হত্যা করা যাবে না। যারা বিলাসবহুল জীবন যাপন করতে গিয়ে প্রচুর জিনিষের অপচয় করে, একটা জিনিষের সারটাকে বার করে বাকি জিনিষগুলোর অপচয় করছে এই ধরণের লোকেরা আর যাই হোক আধ্যাত্মিক পুরুষ কোন দিন হতে পারবে না। ভগবান পরের শ্লোকে বলছেন – তবে কি জান অর্জুন, এই অক্ষর উপাসনার পথটা বড় কঠিন।

**ক্লেশোহধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্। অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে।।৫।।**

দেহবোধ থাকতে অব্যক্ত সাধনা করা যায় না। ঠাকুরের উপমা আছে – যে অদ্বৈত সাধক তার হাত কেটে গেছে, দরদর করে রক্ত বেরোচ্ছে, কিন্তু বলছে কই আমার তো কিছু হয়নি। আমি তো দেহ নই, আমি শুদ্ধ আত্মা। হাতটা কার কেটেছে, দেহের কেটেছে। রক্তটা কার বেরোচ্ছে? দেহের বেরোচ্ছে, আমার তো হাত নয়, রক্তও আমার নয়। আমার জামাটা যদি ছিড়ে যায় আমার খারাপ লাগবেই, কিন্তু আমার তাতে কি হবে, আমার জামার হয়েছে, আমিতো জামা নই। কিন্তু একটা বাচ্চা ছেলের জামা যদি ছিড়ে যায় সে চেঁচিয়ে পুরো পাড়াকে জানিয়ে দেবে আমার জামা ছিড়ে গেছে। তাই ভগবান বলছেন – *ক্লেষঃ অধিকতর তেষাম্,* এই অব্যক্ত সাধন, অদ্বৈত সাধন অত্যন্ত কষ্টকর, *অব্যক্ত অসক্ত চেতসাম্,* যাঁরা অব্যক্ত বুদ্ধি লাগিয়ে সাধনা করেন। কারণ *অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং,* অব্যক্তে দুঃখই দুঃখ। কাদের জন্য দুঃখ? *দেহবদ্ভিরবাপ্যতে,* যাদের দেহবোধ আছে। দেহবোধ যাদের আছে তাদের জন্য এই পথ নয়। ঠাকুরের কি তাহলে দেহবোধ ছিল? ঠাকুর বেশি হাঁটাচলা করতে পারতেন না, ঠাকুরের শুদ্ধসত্ত্ব শরীর এত কোমল ছিল যে লুচি ছিড়তে গিয়ে তাঁর হাত কেটে যেত, দাড়ি কাটতে পারতেন না, তাঁর গাল মাখনের মত এত নরম ছিল। কিন্তু আমাদের যে অর্থে দেহবোধ হয় সেই অর্থে ঠাকুরের দেহবোধ একেবারে শূন্য ছিল। দেহটাকে ধরে রাখতে হবে বলে শরীরে একটু মনটাকে নামিয়ে রাখতেন। স্বামীজীরও দেহবোধ ছিল না। দক্ষিণেশ্বরে একদিন রাত্রিবেলা গিরিশ ঘোষ আর স্বামীজী পঞ্চবটীতে ধ্যান করছিলেন। কিছুক্ষণ ধ্যানে বসতেই গিরিশ ঘোষ মশার কামড়ে অস্থির হয়ে গেছেন, খালি মশাই মারতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পর স্বামীজীর দিকে তাকিয়েছেন, স্বামীজী তখন যুবক, অল্প বয়স, দেখেন নরেনের শরীর যেন কালো কম্বল দিয়ে ঢাকা, এত মশা

স্বামীজীকে ঘিরে নিয়েছে যে মনে হচ্ছে যেন পুরো কালো কম্বল দিয়ে কে যেন তাঁকে ঢেকে রেখেছে। কিন্তু নরেন একেবারে সমাধিতে লীন, কোন হুঁশ নেই। আমরা মশারির ভেতরে ধ্যান করতে বসলেও আগে দেখে নেই কটা মশা আগে থাকতে ঢুকে গেছে, পোকাটোকা আছে কিনা, এই ধরণের লোকেদের জন্য নিরাকার সাধনা নয়, গীতায় একেবারে পরিষ্কার করে বলে দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু যাদের দেহবোধ আছে, যাদের মনে এখনও জগৎকে ভোগ করার ইচ্ছা আছে, তাদের জন্য কি পথ? তখন ভগবান বলছেন এই নিরাকার সাধনার কথা এখন তুলে রেখে আমাদের আসল বিষয়ে চলে আসি –

**যে তু সর্বাণি কর্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরাঃ। অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে।।৬।।**

যাদের দেহবোধ আছে তাদের জন্য শরণাগতিযোগ, তাদের বলা হচ্ছে তুমি প্রভুর শরণ নাও। যত রকমের কর্ম করছ সব কর্ম তুমি *ময়ি সংন্যস্য*, আমাতে সমর্পণ কর। আমাদের হিন্দু সংস্কারে সন্ন্যাসকে প্রচণ্ড সম্মান করা হয়, সেইজন্য সবাই মনে করে ধর্ম ও অধ্যাত্ম হচ্ছে ত্যাগীদের জন্য। কিন্তু যারা গৃহস্থ তাদেরকেও সন্ন্যাসী বানিয়ে দেওয়া হয়। কিভাবে? সন্ন্যাসীতো সব কিছু ত্যাগ করে দিয়েছে, তুমি শুধু তোমার কর্মফলের আকাঙ্খাকে ত্যাগ করে দাও, আর যা কিছু কর্ম করছ সব শ্রীরামকৃষ্ণার্পণমস্তু বলে সমর্পণ করে দাও, এইটাই গৃহীদের পক্ষে সন্ন্যাস হয়ে গেল। তুমি তো তোমার স্ত্রী, পুত্র, পরিজনকে ফেলে দিয়ে গেরুয়া ধারণ করে সন্ন্যাসী হতে পারবে না, ঠিক আছে তোমায় কাউকে ত্যাগ করতে হবে না, তার বদলে দিনে দুবার, তিন বার, চার বার করে বল – ঠাকুর এই চার পাঁচ ঘন্টায় যা কিছু ভালো মন্দ করলাম এর সব ফল তোমার শ্রীচরণের সমর্পণ করলাম, তুমি গ্রহণ কর। এইভাবে করতে করতে এক সময় সত্যি সত্যি বোধ এসে যায় যে, আমি যা করছি সব ভগবানের জন্যই করছি।

অর্জুন দ্রৌপদীকে স্বয়ম্বরা থেকে জয় করে নিজদের বাসস্থানে ফিরে এসে দরজার বাইরের থেকে বলছেন – মা, মা, দ্যাখো আমি কি নিয়ে এসেছি। তখন পাণ্ডবরা ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে ভিক্ষা করত, যা ভিক্ষা করে আনত সব মাকে অর্পণ করে দিত। মা বলতেন তোমরা সবাই ভাগ করে নাও। দ্রৌপদীকে নিয়ে যখন অর্জুন এসেছে তখন কুন্তিও মনে করলেন ভিক্ষা করে ছেলেরা ফিরে এসেছে, তাই মা বললেন তোমরা পাঁচ ভাই ভাগ করে নাও। কিন্তু এখানে বলছেন মাকে অর্পণ না করে আমাকে অর্পণ কর। কেন? আমি *মৎপরঃ*, আমি শ্রেষ্ঠ, তোমার মার থেকেও আমি শ্রেষ্ঠ। সেইজন্য ভগবান নবম অধ্যায়ে বলেছিলেন – *পিতাহহমস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ*, পুরো বিশ্বের আমি হচ্ছি পিতা, আমিই তার মা, আমিই তার ধাতা, এই বিশ্বকে ধারণ করে আছি, আর আমি তোমার বাবারও বাবা। সেইজন্য আমি হলাম *মৎপরাঃ*। তুমি মনে মনে নিজকে বল – ঈশ্বর ছাড়া আর আমার কোন অবলম্বন নেই।

এই যোগ দিয়ে যারা সাধনা করে তাদের কি হয়? এটা পরের শ্লোকে বলবেন। মানুষ যখন নিজেকে অসহায় মনে করে, জগৎ তাকে ঠিকই চালিয়ে নিয়ে যায়। কিন্তু যারা সন্ন্যাসী তাদের কোন সম্বল নেই। আবার যারা সংসারে আছে তাদের বউ, সন্তান, অর্থ সবই আছে। কিন্তু এরাই আবার স্বার্থে ঘা পড়লে তার সর্বস্ব কেড়ে নিচ্ছে। চণ্ডীতে ঠিক এই ঘটনাই আছে, একজন রাজা সূরথ আরেক জন বৈশ্য নাম সমাধি, কাঁদতে কাঁদতে জঙ্গলে গেছে। রাজা বলছে, আমার মন্ত্রী, অমাত্যরা সব কেড়ে নিয়েছে, আর সমাধি বলছে আমার বউ আর ছেলে মিলে আমার সব পয়সা কড়ি কেড়ে নিয়ে মেরে তাড়িয়ে দিয়েছে। এখন এরা কোথায় যাবে? সবাই যেখানে যায়, সেই ঋষির আশ্রমে আশ্রয় নিয়েছে। এই সমস্যা আদিম কাল থেকে চলে আসছে, আর সবারই কম বেশি এই সমস্যা আছে। তখন কি হবে? *অনন্যেনৈব যোগেন*, হে ঠাকুর তুমি ছাড়া আমার আর কেউ নেই। এই যোগ যখন এসে যায় তখন যা কিছু করে, খাওয়া-দাওয়া, শোওয়া বসা সবটাই ঈশ্বরের জন্য। এইভাবে যখন অনন্য হয়ে সাধনা করে তখন ভগবান কি করেন –

**তেষামহং সমুদ্ধর্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ। ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিতচেতসাম্।।৭।।**

এই ধরণের ভক্ত, যে অদ্বৈত উপাসনা করতে পারছে না, কিন্তু আমার উপাসনা করছে। কি ভাবে করছে? সে জানে তার ক্ষমতা খুবই কম, সেইজন্য তার সব কিছু পুরোপুরি আমাতে সমর্পণ করে দিয়েছে, কারণ সে জানে, আমি শ্রীকৃষ্ণ, আমি ঈশ্বর, আমি *মৎপরাঃ*। আর আমি তখন কি করি –

*তেষামহং সমুদ্ধর্তা*, আমি তাকে উদ্ধার করে নিয়ে আসি। কিসের থেকে উদ্ধার করি? *মৃত্যুসংসারসাগরাৎ*, এই জন্ম-মৃত্যু সংসার সমুদ্রে সমস্ত প্রাণী হাবুডুবু খাচ্ছে, জন্ম নিচ্ছে মরছে, আবার জন্ম নিচ্ছে আবার মরছে, এইটাই হাবুডুবু। এই সংসারের জন্ম-মৃত্যু সাগর থেকে আমি এদের তুলে আনি। বর্ধমান থেকে হাওড়া রোজ যে ডেইলী প্যাসেঞ্জাররা আসা যাওয়া করছে এদের এই বোধ নেই যে কটা টাকার জন্য রোজ রোজ এত ভিড়ের মধ্যে ধকল সইতে সইতে প্রতিদিন আসা যাওয়া করতে হচ্ছে। আমাদের সমস্যা এইটাই যে এই জন্ম-মৃত্যু রূপ সংসারে কারুরই এই বোধ নেই যে আমরা জন্মাচ্ছি আর মরছি। মানুষ যখন রোগ ভোগ আর বয়সে মরে তখন অত মৃত্যু বোধ থাকে না, কিন্তু দাঁড় করিয়ে যদি একটা ভোঁতা খুড় দিয়ে গলা কাটতে থাকে তখন ব্যাথা লাগবে। সন্ন্যাসীদের জগৎকে এই রকম ভোঁতা খুড় দিয়ে গলা কাটার মত মনে হয়, সে বুঝতে পারে যে একটা ভোঁতা খুড় দিয়ে তাঁর গলা

কাটা হচ্ছে। যারা সন্ন্যাসী নয় তাদেরও গলা কাটছে কিন্তু টের পাচ্ছে না, তাকে যেন এনাসথেসিয়া দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছে। ফলে সে কোন টেরও পায়না, এইভাবে জন্মাতে আর মরতে থাকে আর বলে বেশ আছি। কিন্তু যাদের বোধ হয়ে গেছে যে এটা কি ভয়ঙ্কর ব্যাপার, তখন সে বলে এখান থেকে পালাতে হবে। কিন্তু পালাবে কি করে? পালাবার আগে জানতে হবে আমি আর ঈশ্বর এক, এই অদ্বৈত জ্ঞান ছাড়া হবে না। কিন্তু এখানে ভগবান বলছেন, না অদ্বৈত জ্ঞান না হলেও হবে, আমি তোমাকে পার করে দেব। কিন্তু তার জন্য আগে তোমাকে কয়েকটা কাজ করতে হবে। কি করতে হবে? এইখানে এসে ভগবান বলছেন – সারা দিন ধরে যা কিছু ভালো মন্দ কর্ম করছ সব আমাকে ফেরত দিয়ে দাও, তাহলেই আমি তোমাকে মৃত্যুসংসার থেকে বার করে নেব।

একটা তত্ত্বকে যদি আমরা মাথায় বসিয়ে নিই তাহলে অদ্বৈত, দ্বৈত, নিরাকার, সাকার এই নিয়ে কোন সংশয় কখনই হবে না। তত্ত্বটি খুবই সাধারণ, যিনি জ্ঞানমার্গি, অব্যক্ত, অক্ষর বা ঈশ্বরের নির্গুণ নিরাকারের সাধনা করছেন তিনি দেখেন আত্মাই সব কিছু হয়েছেন। গীতাতে প্রথম সমস্যা এসেছে অর্জুন যুদ্ধ করতে চাইছে না বলে। কেন যুদ্ধ করতে চাইছে না অর্জুন? অর্জুন শোক আর মোহগ্রস্ত হয়ে গেছে। মোহ হচ্ছে কোন জিনিষকে পাওয়ার ইচ্ছা। অর্জুনের মনটা এখন মোহগ্রস্ত হয়ে গেছে? কি নিয়ে মোহগ্রস্ত হয়েছে? বন্ধু বান্ধবরা সবাই মারা যাবে। মোহ হওয়ার পর যখন মোহ ভঙ্গ হয়ে যায় মানুষ তখন শোকগ্রস্ত হয়ে যায়। কেউ একজন অনেক আশা করে আছে যে একটা চাকরি পাব, একটা ইংক্রিমেন্ট বা একটা প্রমোশন পাব, এই নিয়ে সে মোহগ্রস্ত হয়ে আছে। বছরের শেষে জানা গেলে প্রমোশনটা হলো না বা ইংক্রিমেন্টটা হল না, চাকরির জন্য যে পরীক্ষা দিয়েছিল সেই পরীক্ষার রেজাল্ট বেরোল তাতে দেখল তার নাম নেই। তখন তার মোহভঙ্গ হয়ে গেল। মোহভঙ্গ যেই হয়ে গেল তখন সে শোকগ্রস্ত হয়ে পড়ল।

অর্জুন এখন শোক ও মোহগ্রস্ত, এখানে অর্জুনের শোক আর মোহটা ভাঙ্গান হচ্ছে। মোহ হচ্ছে, একটা অপ্রাপ্ত বস্তু, যেটা আমার কাছে নেই সেটা পাওয়ার ইচ্ছা। আর শোক হচ্ছে যেটা ছিল সেটা চলে যাওয়াতে শোক হয়েছে। যিনি জ্ঞানী তিনি দেখেন আত্মাই সব কিছু হয়েছেন, আর আমিও সেই আত্মা। যখন নিজেকে সেই আত্মাই দেখেন তখন তিনি কোনটাকে নিয়ে শোক করবেন আর কোনটা নিয়েই বা মোহ করবেন। যিনি ভক্ত তিনি দেখেন ঈশ্বরই সব কিছু হয়েছেন। এই সূত্রটা মনে রাখলে কখনই কোন সংশয় হবে না। সেইজন্য বলা হয় জ্ঞানমার্গ ও ভক্তিমার্গে, অদ্বৈত আর দ্বৈতে কোন তফাৎ নেই। অদ্বৈতবাদী দেখেছেন শুদ্ধ চৈতন্য যিনি, আত্মা যিনি তিনিই সব কিছু হয়েছেন, *সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম*, যা কিছু আছে ব্রহ্মই আছেন, এই ব্রহ্ম কিভাবে সব কিছু হয়েছেন সেটা এখানে আমাদের জানার বিষয় নয়। যে ভক্ত সে দেখে কৃষ্ণময় জগৎ, তুলসীদাস বলছেন – সিয় রামময় সব জগ জানু, পুরো জগতকে আমি দেখছি রাম আর সীতাই হয়েছেন। অধ্যাত্ম-রামায়ণে নারদ বলছেন – হে রাম, এই জগতে যা কিছু পুং বাচক সব শ্রীরাম আর স্ত্রী বাচক যা কিছু সব মা সীতা, শ্রীরাম আর সীতা ছাড়া কিছুই দেখছে না। এখানে আবার একটা তৃতীয় বাদ এসে গেল এখানে তিনটে সত্তা দেখছে। একে কি বলা হবে? যখন দুটো সত্তা দেখে ঈশ্বর আর জগৎ তখন বলা হচ্ছে দ্বৈত। এখন তিনটে সত্তা দেখছে, জগত দেখছে, রাম দেখছে আর সীতা দেখছে, তাহলে দ্বৈতবাদের পর ত্রৈতবাদ হয়ে যাবে। ত্রৈতবাদে জগৎ, শ্রীরাম আর সীতা, মানে জগৎ, শ্রীরামকৃষ্ণ আর শ্রীমা সারদাদেবী। আসলে কোনটাই নয়, গীতার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে, আর কথামৃতে ঠাকুরও বলছেন এই কাঁচা আমির নাশ। কিভাবে নাশ করবে? এখন আমি সীতা আর রামময় জগৎ দেখি, ঈশ্বরই সব কিছু হয়েছেন এটাই দেখি, আত্মা, ব্রহ্মই সব কিছু হয়েছেন এটাই দেখি, সব কিছুই যদি মায়া রূপেই দেখি আর সব কিছু তাঁরই ইচ্ছাতে হয়েছে দেখি, তাতে কিছুই আসে যায় না। নাশ করা দরকার যেটা সেটা হচ্ছে এই আমিকে। কোন্ আমির নাশ? কাঁচা আমির নাশ। ভগবান বুদ্ধও এইভাবে কথা বলছেন। একজনের শরীরে বিষযুক্ত বাণ বিদ্ধ হয়েছে। এখন সামনে প্রাথমিক কি কাজ? আগে বিষ বাণটা টেনে তুলে ক্ষতের চিকিৎসা করতে হবে। কিন্তু তা না করে যদি হিসাব করতে থাকি বাণটা কি দিয়ে বানানা হয়েছে, বিষটা কে লাগিয়েছিল, যে বাণটা মেরেছিল সে কালো না ফর্সা, রোগা না মোটা, এত হিসেব করতে করতেই রোগীর প্রাণবায়ু বেরিয়ে যাবে। আমাদের সবাই এই জন্ম-মৃত্যুর চক্রে সঙ্কটাপন্ন, আমাদের এই অবস্থা থেকে বাঁচতে হবে। কিভাবে বাঁচাবে? আত্মাই সব কিছু হয়েছেন এই জ্ঞানে বা ঈশ্বরই সব কিছু হয়েছেন এই জ্ঞানে। এই দুটো সিদ্ধান্তকেই প্রথম কয়েকটি শ্লোকে উত্থাপন করে আলোচনা করা হয়েছে। দ্বৈতবাদী দেখেন ঈশ্বরই সব কিছু হয়েছেন আর অদ্বৈতবাদী দেখেন আত্মাই সব কিছু হয়েছেন। আর শঙ্করাচার্য আলোচনায় বারবার বলবেন আত্মা আর ঈশ্বর অভেদ।

কিন্তু আমাদের মত সাধারণ বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ দেখে আমি আলাদা আর শ্রীরামকৃষ্ণ আলাদা। কিন্তু তাতেও কিছু আসে যায় না। ঠাকুরকে একজন বলছেন – আমরা যখন ঈশ্বরের পূজো করছি তখন কিন্তু আমরা নিজেরই পূজো করছি। ঠাকুর শুনে বলছেন – এতো বড় উঁচু কথা। উঁচু কথা হলেও এটাই সত্য। কিন্তু সাধারণ মানুষের কাছে এই ধরণের উঁচু কথা বলতে নেই। অল্প বুদ্ধি সম্পন্নরা এই ধরণের উচ্চ তত্ত্বের কথা শুনে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে অপপ্রয়োগ করে ফেলবে। সেইজন্য গীতায় ভগবান বলছেন – *ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্মসঙ্গিনাম্*, যারা অজ্ঞ তাদের এই ধরণের উঁচু কথা বলে তাদের বুদ্ধিকে বিচলিত করে দিও না। নিউটনের ল'জ অফ মোশান যখন নীচু ক্লাশে পড়ান হয় তখন বলা হয় না যে নিউটনের এই থিয়োরিটাই শেষ কথা নয়, থিয়োরি অফ রিলেটিভিটিই ঠিক থিয়োরি। কখনই এই ধরণের কথা বাচ্চা বয়সে বলা হয় না। নীচু ক্লাশে বলা হয় নিউটনের এই থিয়োরিটাই ঠিক,

তুমি এটাকেই ভালো করে আগে জেনে নাও। যখন ওপরের ক্লাশে যাবে তখন বলা হয় এই থিয়োরির এই মডিফিকেশন আছে। ঠিক তেমনি প্রাথমিক স্তরে দ্বৈতটাকেই সত্য বলে মেনে নিয়ে এগোতে হয়। তখন ভগবান বলেন *তেষামহং সমুদ্ধর্তা*, আমি তোমাকে বাঁচিয়ে দেব। আমার কাছে গুরুত্ব হচ্ছে জন্ম-মৃত্যু চক্রের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া। কিভাবে নিষ্কৃতি পাচ্ছি সেটার কোন গুরুত্ব আমার কাছে নেই।

তাই ভক্তিমার্গের সাধক বলে, উদ্দেশ্য যদি জন্ম-মৃত্যুর চক্র থেকে মুক্তি পাওয়াই হয়, তা যে জ্ঞানমার্গে অদ্বৈত সাধনা করছে সেতো শুধু মুক্তিই পেয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আমি যদি সগুণ সাকারের উপাসনা করি, ভক্তিমার্গের হই, তাহলে ভগবান তো বলে দিয়েছেন আমাকে উদ্ধার করে দেবেন, তাহলে আমার আর ভাবনা কি, আমার তো মুক্তি হবেই। গীতার কথা কাটবার জো নাই। আর তার সাথে আমি বোনাস পাব। কি সেই বোনাস? ভগবানে ভক্তি, ঈশ্বরের প্রতি ভক্তির আস্বাদনের আনন্দটা পেয়ে গেলাম। বিজ্ঞাপনে যেমন বলে – একটা শাড়ি কিনলে আরেকটা শাড়ি ফ্রি। ঈশ্বরের সগুণ সাকার উপাসনা করতে গিয়ে আমি মুক্তিও পেলাম আবার ঈশ্বরে ভক্তিটাও পেলাম। রথও দেখা হল কলাও বেচা হয়ে গেল, সেইজন্য ভক্তিযোগ শ্রেষ্ঠ। সগুণ সাকারের উপাসনাই শ্রেষ্ঠ। এগুলো হল ভক্তিমার্গের সাধকদের কথা। ভক্তিমার্গের পণ্ডিতরা নানা রকমের যুক্তি দেখিয়ে ভক্তিযোগকে এইভাবেই দেখান, আমরা এর আর কি বুঝব। যে যেই পথে চলছে সে সেই পথটাকে শ্রেষ্ঠ মনে করে আর যারা অন্য পথে চলেছে তারা ভুল পথে চলছে বলে মনে করে। ঠাকুর সেইজন্যই বলছেন মতুয়ার বুদ্ধি করো না। উদ্দেশ্য হচ্ছে জন্ম-মৃত্যু চক্র থেকে বেরিয়ে আসা। ভগবান বলছেন আমি তাকে বার করে নিয়ে আসব। কাকে এই জন্ম-মৃত্যু চক্র থেকে ভগবান বার করে নিয়ে আসবেন? *যে তু সর্বাণি কর্মাণি*, সে সব কর্ম আমার উপর ছেড়ে দিয়েছে। এই কথাই পরের শ্লোকে আরও পরিষ্কার করে বলছেন –

**ময্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়। নিবসিষ্যসি ময্যেব অত উর্ধ্বং ন সংশয়ঃ।।৮।।**

যদি তোমার একটুও সংশয় থাকে তাহলে *ময্যেব মন আধৎস্ব*, এখানে মন বলতে চিত্তকে বলা হচ্ছে। মন একটাই কিন্তু এক মনই চার ভাবে কাজ করে চলে। প্রথম কাজ হচ্ছে সংগ্রহাত্মিকা, বাইরের থেকে তথ্য সংগ্রহ করা। মনের এই অংশকে চিত্ত বলে। দ্বিতীয় কাজ হচ্ছে সংকল্পাত্মিকা ও বিকল্পাত্মিমা, এটা না হয় ওটা, আমি করব কি করব না। মনের এই অংশের নামও মন। আজকে বৃষ্টি পড়ছে, ভাবছি গীতার ক্লাশে যাবো কি যাবো না। যখন সংকল্প বিকল্প করে তাকেও মন বলছে। কিন্তু আমি ঠিক করে নিয়েছি, বৃষ্টি হোক আর নাই হোক আমি গীতার ক্লাশে যাবোই। এটা হচ্ছে নিশ্চয়াত্মিকা, মনের এই অংশের নাম বুদ্ধি। এর পর গীতার ক্লাশে গিয়ে নিজেকে ধন্য মনে করছি, আমার গীতার জ্ঞান হচ্ছে, এটা হয়ে গেল অভিমানাত্মিকা। মনের এই অংশের নাম অহঙ্কার, নিজেকে গীতা ক্লাশের সঙ্গে জুড়ে দিলাম। একই মনের চারটি রূপ – চিত্ত, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার। চিত্ত হচ্ছে অক্টোপাসের মত, অক্টোপাসের যেমন আটখানা হাত থাকে যার সাহায্যে সে বুঝতে পারে কোথায় কি আছে, চিত্ত এই অক্টোপাসের মত ইন্দ্রিয়গুলি দিয়ে সব কিছু সংগ্রহ করতে থাকে। এখানে বলছেন *ময্যেব মন আধৎস্ব*, আমাতে তুমি তোমার মনটাকে দিয়ে দাও, তোমার বুদ্ধি মানে তোমার নিশ্চয়াত্মিকা সেটাও দিয়ে দাও, মানে মনের এই চারটে অংশকে পুরোপুরি আমাতেই দিয়ে দাও। ঠাকুর বলছেন – আমি তো শালা যাবার নয়, তাই থাক শালা ঈশ্বরের দাস আমি হয়ে। মন সব সময় চঞ্চল, দাপাদাপি লাফালাফি করেই চলেছে, মন যদি না নড়াচড়া করে তাহলে বুঝতে হবে হয় সে মরে গেছে আর তা নাহলে তিনি সমাধিবান পুরুষ। মন শান্ত হবার নয়, তাই একটা কিছুতে মনটাকে ধরে রাখো, সেইজন্যই জপ-ধ্যান করতে বলা হয়, জপ ধ্যান না করতে ভালো লাগে তাহলে ঠাকুরের সম্বন্ধে কোন বই পড়, যে কোন একটা শাস্ত্র নিয়ে পাঠ কর। মূল কথা তোমার মনকে ঈশ্বরের বাইরে যেতে দিও না। এইভাবে যদি তুমি আমাতে সব মনটা দিয়ে রাখ তাহলে *নিবসিষ্যসি ময্যেব*, মানে তোমার মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহঙ্কার আমাকে দিয়ে দাও তাহলে আমি তোমাকে নিশ্চিত করে বলছি যে তুমি আমাতেই বাস করবে। এইভাবে পুরো মনকে ঈশ্বরে দিয়ে রাখাকে, *ময্যেব মন আধৎস্ব*, এই সাধনাকে বলা হয় সমাধানী মন বা সমাধান যোগ। এর পরে বলছেন –

**অথ চিত্তং সমাধাতুং ন শক্নোষি ময়ি স্থিরম্। অভ্যাসযোগেন ততো মামিচ্ছাপ্তুং ধনঞ্জয়।।৯।।**

এই সমাধান যোগ যদি তুমি না করতে পার, আমাতে তোমার মন পুরোপুরি দিতে পারছ না, গিরিশ ঘোষকে যেমন ঠাকুর কিছু করতে বলছেন, গিরিশ ঘোষ বলছেন এটা হবে না, ঠাকুর তখন বলছেন তাহলে এটা কর, এটাও পারব না, এইভাবে যেটাই করতে বলছেন গিরিশ ঘোষ বলছে ও আমার দ্বারা হবে না, ঠাকুর তখন বলছেন – তাহলে তুই আমাকে বকলমা দিয়ে দে, সব দায়ীত্ব আমার উপর ছেড়ে দে, ঠিক তেমনি ভগবানও অর্জুনকে একটার পর একটা উপায় বলে দিচ্ছেন। তোমার দ্বারা অদ্বৈত সাধন হবে না, ঠিক আছে তোমার যত রকমের কর্ম আছে, যা কিছু তোমার আছে সব আমাকে দিয়ে দাও। যেটা ছয় নম্বর শ্লোকে বলা হয়েছে, *যে তু সর্বাণি কর্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরঃ।* ভগবান তখন বলছেন, এই শরণাগতির ভাবকেও যদি না আনতে পার, আর যদি *অনন্যেনৈ যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে*, অনন্য চিত্তে আমার ধ্যান ও উপাসনা না করতে পার, তাহলে তোমার মনকে আমাতে ফেলে দিয়ে তোমার মনের চাঞ্চল্যটাকে দূর কর। আমি তাও পারছি না, এখনও আমার স্ত্রী, পুত্র, ধন এগুলির প্রতি আসক্তি আছে। ঠিক

আছে এটাও যদি তোমার দ্বারা সম্ভব না হয়, অর্থাৎ সমাধান যোগ যদি না করতে পার তাহলে তুমি অভ্যাসযোগ করতে পার। ঠাকুরকে একজন বলছে আমার মনতো স্থির হয় না, তখন ঠাকুর বলছেন – কেন গীতায় আছে অভ্যাসযোগ, অভ্যাসযোগ কর। অভ্যাস করাটা আমরা সকলেই জানি, শৈশবে যখন বর্ণমালা শেখানো হয় তখন একটা করে বর্ণ লিখে তার উপর দাগা বুলোতে দেওয়া হয়। ধর্মশাস্ত্রে অভ্যাস মানে বলছেন যে, *চিত্তস্য একোস্মিন আলম্বনে*। একটা আলম্বনকে নেওয়া হয়, যেমন শ্রীরামকৃষ্ণের ছবি নেওয়া হল বা ওঁকারকে নেওয়া হল, আর চিত্তকে, সংগ্রহাণাত্মিকা যেটা, যেখান থেকে মন চঞ্চল হচ্ছে, সেই চিত্তকে পুরোপুরি সেই আলম্বনে রেখে দিতে হয়। কিন্তু চিত্ততো ওখানে থাকবে না, এইটাই তো আমাদের সমস্যা। তখন কি করতে হবে? *পুনঃ পুনঃ স্থাপনম্*, বার বার মন ঐ আলম্বন থেকে পালিয়ে যাবে, আর বার বার মনকে ধরে এনে ঐ আলম্বনেই স্থাপন করতে হবে। মন পালাবে, এটাই মনের ধর্ম কিন্তু পুনঃ পুনঃ ধরে আবার নিয়ে আসতে হবে, এটাই হচ্ছে অভ্যাসযোগ। আমাদের জপ-ধ্যান করতে ইচ্ছে করছে না, কিন্তু ইচ্ছে না করলেও বসতে হবে। যদি তুমি অভ্যাসযোগেও অসমর্থ হও, আসনে বসে দু ঘন্টা যে জপ ধ্যান করবে সেটাও পেরে উঠছ না তখন ভগবান তোমার জন্য আরও সহজ উপায় বলে দিচ্ছেন –

**অভ্যাসেহপ্যসমর্থোহসি মৎকর্মপরমো ভব। মদর্থমপি কর্মাণি কুর্বন্ সিদ্ধিমবাপ্স্যসি।।১০।।**

এই অভ্যাসযোগেও যদি অসমর্থ হও, তাহলে তুমি আর কি করবে, তাহলে তুমি আমারই জন্য, আমারই প্রীতার্থে কর্ম করে যাও, যা কিছু কর্ম করবে মনে করবে আমার জন্যই করছ। যদি আমার জন্য কাজ করতে থাক তাহলেও তোমার সিদ্ধিলাভ হবে। এর নাম হচ্ছে প্রভুসেবা যোগ। *মদর্থমপি কর্মাণি*, মানে আমার জন্য কর্ম করাকে বলা নবধাভক্তি। নয় রকমের ভক্তি আমরা ভাগবতেও পাই – *শ্রবণং কীর্তনং স্মরণং পাদসেবনং অর্চনম্ শ্রবণং বন্দনম আত্মনিবেদনম্*, এই আমরা যেমন এখানে গীতার উপদেশ শুনছি, কীর্তনম্, ভগবানের নামগুণগান করা, ঠাকুর বলছেন সন্ধ্যে হলে হাততালি দিয়ে ভগবানের নাম করতে হয়, স্মরণম্, মনে মনে ঈশ্বরের নাম করছি, ঈশ্বরের চিন্তন করছি, পাদসেবনম্, ভগবানের পদসেবা, ভগবানের তো আর পা টেপা হয় না, তাই ফুল তোলা, জল আনা, ঠাকুরের ফটো বা বিগ্রহকে সাজগোজ করান এগুলোও পাদসেবনমের মধ্যে ধরা যায়, অর্চনম্ ভগবানের পূজা করা আরতি করা ইত্যাদি, বন্দনম্, ভগবানের বন্দনা করা। কিভাবে করতে হবে? ঈশ্বরের সাথে তিনটে ভাব নিয়ে আরাধনা করা যায়, *দাস্যম্, সখ্যম্ ও আত্মনিবেদনম্*। দাস ভাবে, আমি ভগবানের দাস, সখা ভাবে আর নিজেকে ভগবানে নিবেদন করে দেওয়া। এই রকম নবধাভক্তির কথা ভাগবতে উল্লেখ করা আছে। *মৎকর্মপরমো ভব*, এর মূল কথা হল ভগবানের পূজা অর্চনাদি, শাস্ত্রপাঠ যতটা বেশি করা যায়। আর *মৎকর্মপরমো ভব*, এইটাও যদি না করতে পার তাহলে –

**অথৈতদপ্যশক্তোহসি কর্তুং মদ্‌যোগমাশ্রিতঃ। সর্বকর্মফলত্যাগং ততঃ কুরু যতাত্মবান্।।১১।।**

যদি এগুলোর কোনটাই তুমি করতে না পার তাহলে *সর্বকর্মফলত্যাগং*, যত রকমের কর্ম করছে সব কর্মের ফল তুমি ত্যাগ কর। ঠাকুর এই নাও তোমার ভালো এই নাও তোমার মন্দ, এই নাও তোমার পাপ এই নাও তোমার পূণ্য। ঠাকুরও এই ভাবে সাধনা করেছিলেন, এটাই হচ্ছে বকলমা দেওয়া। এটা কখন করবে? যখন তুমি কোন কিছুই করতে পারছ না তখন বল – হে ঠাকুর অনেক ভালো কাজ করেছি অনেক মন্দ কাজও করেছে, কিন্তু সব কাজের ফল তোমাকেই সমর্পণ করলাম। ভালোতেও আমার কোন আনন্দ নেই মন্দতেও আমার কোন মন খারাপ হবে না। এর পরের শ্লোকে এই *সর্বকর্মফলত্যাগং* এর স্তুতি করা হচ্ছে –

**শ্রেয়ো হি জ্ঞানমভ্যাসাজ্ জ্ঞানাদ্ ধ্যানং বিশিষ্যতে। ধ্যানাৎ কর্মফলত্যাগস্ত্যাগাচ্ছান্তিরনন্তরম্।।১২।।**

আমাদের মন সর্বদাই চঞ্চল, চঞ্চল মন আমাদের চিত্তকে অশান্ত করে দেয়। তাই মনকে আগে শান্ত করতে হবে। কিভাবে শান্ত করতে হবে? *শ্রেয়ো হি জ্ঞানমভ্যাসাজ্*, তুমি না বুঝে সব কিছু করছ, জপ-ধ্যান যা করছ সব না বুঝেই করে যাচ্ছ, তোমার তত্ত্বজ্ঞান কিছুই নেই, এর থেকে জ্ঞানচর্চা করে জ্ঞানলাভ করা অনেক শ্রেয়ো, কারণ না জেনে বুঝে শুধু অনুশীলন করে যাওয়াটা অর্থহীন। এর থেকে বরং বোঝার চেষ্টা কর ভগবান কি, ভগবানের তত্ত্বকে জান। শুধু জ্ঞানচর্চা করলেই হবে না, এর থেকে জ্ঞানপূর্বক ধ্যান অনেক শ্রেষ্ঠ। কিন্তু এই সবের থেকে শ্রেষ্ঠ হচ্ছে কর্মফলত্যাগ। *ত্যগাৎ অনন্তরম্ শান্তিঃ*, যারা কর্মফলত্যাগ করে তারা সঙ্গে সঙ্গে শান্তি পেয়ে যায়। যখনই কেউ ঠিক ঠিক বলবে হে ঠাকুর ভালো মন্দ যা কিছু সব তোমাকে দিলাম, তার মনে সাথে সাথে শান্তি এসে যাবে। তার মুখে আর হাসিও আসবে না, কান্নাও আসবে না। গিরিশ ঘোষের ঠিক তাই হয়েছিল, ঠাকুরকে বকলমা দেওয়ার পর তাঁর যখন ছেলে মারা যায় তখন সে কাঁদতে পারছে না, কারণ তিনি সব কিছু ঠাকুরকে দিয়ে দিয়েছেন। ভালো-মন্দ সব কিছু ঠাকুরকে অর্পণ করার পরও যদি কারুর চোখে জল বা হাসি আসে তাহলে বুঝতে হবে ঠাকুরকে অর্পণের নামে সে পাটোয়ারি করছে। কারণ গীতা বলছে *ত্যাগাচ্ছান্তিরনন্তরম্*, সঙ্গে সঙ্গে তার শান্তি এসে যাবে। চোখে জল কোন্ জিনিষ নিয়ে আসে? মন্দ জিনিষই চোখে জল আনে। চোখে হাসি কোন্ জিনিষ আনে? ভালো জিনিষ আনে। কিন্তু আমি তো ভালো-মন্দ সবই ঠাকুরকে দিয়ে ফেলেছি, তাহলে এখন চোখে জল কেন, মুখে হাসি কেন?

অবধূতের চব্বিশ গুরুর কথা বলতে গিয়ে ঠাকুর বলছেন, অবধূত চিলকে গুরু করেছিল। চিল কোথা থেকে একটা মাছ ধরেছে। চিলের মুখে মাছ দেখে হাজারটা কাক কা কা কা করে চিলের পেছনে ধাওয়া করেছে। চিলটা যেদিকে যায় সেদিকেই কাক গুলো তাড়া করে যাচ্ছে, চিলটা কোথাও শান্তি পাচ্ছেনা। এমন সময় কোন ভাবে মাছটা চিলের মুখ থেকে পড়ে গেল। কাকগুলো চিলকে ছেড়ে এখন মাছের দিকে উড়ে গেল, চিলটাও শান্তি পেল। মানুষ কাজ করে কেন? তার মধ্যে শত শত আশাপাশ, এই আশা বাসনাকে পূরণ করবার জন্য তাকে দিবারাত্র কত পরিশ্রম করতে হচ্ছে। এখন এই আশাপাশ সব খসে পড়ে গেলে শান্তিতো এমনিতেই এসে যাবে। ভালো-মন্দ সব কর্মের ফল ঠাকুরকে সমর্পণ করার পর শান্তির ব্যাপারে যেটা বলা হল, এই ব্যাপারে এইখানে খুব সুন্দর একটা আপত্তি আনা হয়ে থাকে। উপনিষদে বলা হচ্ছে, যার সব কামনা বাসনা ত্যাগ হয়ে গেছে, যার সব কর্মত্যাগ হয়ে গেছে সেই শান্তি পায়, সেই মুক্তি পায়। কিন্তু কর্মত্যাগ বা কামনা-বাসনা ত্যাগের কথা না বলে ভগবান এখানে বলছেন সব কর্মফল ত্যাগের কথা। ভালো-মন্দ যাই হোক, ঠাকুরকে সমর্পণ করে দিলে শান্তি কি করে হবে? তার কর্মত্যাগ তো এখনও হয়নি। আসলে ভগবান এখানে কর্মফলত্যাগের স্তুতি করছেন। আমাদের শাস্ত্রে যে কোন ত্যাগকেই স্তুতি করা হয়, এই কারণে সন্ন্যাসের এত প্রশংসা ও সম্মান। সর্বকর্মত্যাগ এটা হচ্ছে সন্ন্যাসের সর্বোচ্চ আদর্শ, এই উচ্চতম আদর্শে তাঁর কোন কর্তব্যবোধও থাকে না। এই উচ্চতম আদর্শের পথে যাত্রা কোথা থেকে শুরু হয়? কর্মফলত্যাগ থেকেই সেই সর্বকর্মত্যাগের সর্বোচ্চ আদর্শের দিকে যাত্রা শুরু করা হয়। যে সংসারী সে কি করে কর্মত্যাগ করবে, তাকে সংসার প্রতিপালন করতে হচ্ছে, সংসারীর পক্ষে কর্মত্যাগ কখনই বাঞ্ছনীয় নয়। সেইজন্য বলা হয় তুমি কর্মত্যাগ করো না, কর্মত্যাগ তোমার দ্বারা হবে না, কিন্তু কর্মফলত্যাগে তুমি দৃঢ় ভাবে প্রতিষ্ঠিত হও। আমার সন্তান আছে, সন্তানকে শিক্ষা দিতে হবে, তাই সব থেকে ভালো স্কুলে ভালো শিক্ষার ব্যবস্থা করে দিলাম। এখন ছেলে বড় হয়ে একটা বাঁদর হল, এখন আমি কি করব? আমার কিছুই করার নেই। ঠাকুর আমাকে সন্তান দিয়েছেন, তাকে বড় করা আমার কর্তব্য, আমি সব রকমের সেরা ব্যবস্থা করে দিয়েছি, এর পর আমার আর কিছু করার নেই। কিন্তু আমরা কেঁদে মরি, কেঁদে কেঁদে আফশোষ করব আমার কি দুর্ভাগ্য আমার কপালেই এমন বাঁদর ছেলে ছিল। আমি কেন কাঁদতে যাব, আমি তো ঠাকুরকে সব কর্মফল ত্যাগ করে দিয়েছি, আমি এখন সাধনার পথে, আমি কর্ম করে যাব, কিন্তু কর্মের কোন ফল আমি নিচ্ছি না, সব ফল ঠাকুরের। ছেলে প্রত্যেক পরীক্ষায় ফার্স্ট হলেও আনন্দ করছি না, ছেলে লেখাপড়া না করে একটা বাঁদর তৈরী হয়েছে তাতেও আমি হা হুতাশ করছি না। গৃহস্থদের এটাই করতে বলা হচ্ছে। সেইজন্য ঠাকুর বলছেন – গৃহস্থরা বাইরের ত্যাগ করবে না, তারা মনে ত্যাগ করবে। তার মানে গৃহস্থের গৃহে সব কিছুই থাকবে, সোফা থাকবে, ফ্রীজ থাকবে, দরকার পড়লে এসি থাকবে, গাড়ি থাকবে কিন্তু মনে ত্যাগ, এগুলো যদি নাও থাকে তাতেও আমার কিছু যায় আসে না। কিন্তু কেন রাখব? আমি সংসারে আছি, আমার পরিবার আছে, আমার সাধ্য আছে, তাই রাখছি। এখন আমি জেনেশুনেই বিয়ে করে থাকি আর অজান্তেই বিয়ে করে থাকি, আমি তো একটা দায়ীত্ব নিয়ে ফেলেছি, আমরা স্বামী-স্ত্রী দুজনেই ঈশ্বরের সন্তান, আমরা দুজনে যেভাবেই হোক আমরা এক বাঁধনে বেঁধে গেছি, আমাদের মধ্যে সন্তানও এসে গেছে, সেও ঈশ্বরেরই সন্তান, এখন আমার অনেক দায়ীত্ব এসে গেছে। সেই দায়ীত্বকে তো আমি ঝেড়ে ফেলে দিতে পারিনা, কিন্তু এই দায়ীত্ব পালনের প্রতিদানে আমি কারুর কাছ থেকে কিছু প্রত্যাশাও করব না। তাই এখন আমি কি করে কর্মত্যাগ করব? তাই বলা হচ্ছে তুমি মনে ত্যাগ কর। এটাই কর্মফলত্যাগ, এই শ্লোকে এইটাই বলা হচ্ছে।

এখানে আচার্য শঙ্কর খুব সুন্দর বলছেন। অগস্ত্য মুনি ছিলেন ব্রাহ্মণ। দেবতা আর অসুরদের মধ্যে লড়াই সব সময় লেগেই আছে। দেবতাদের তাড়া খেয়ে অসুরগুলো সমুদ্রের তলায় গিয়ে লুকিয়ে পড়ে। আবার সুযোগ মত অসুররা সমুদ্র থেকে বেরিয়ে দেবতাদের উপর আক্রমণ করে। দেবতারা গিয়ে অগস্ত্য মুনির শরণাপন্ন হয়েছে। অসুরগুলো সমুদ্রের ভেতরে লুকিয়ে পড়ে বলে ওদের কিছুই করা যাচ্ছে না, আপনি একটা কিছু করুন যাতে এরা আর লুকিয়ে থাকার সুযোগ না পায়। অগস্ত্য মুনি তখন সমুদ্রের কাছে এসে গণ্ডুষে পুরো সমুদ্রকে পান করে নিয়েছেন। সমুদ্রে আর একফোঁটা জল নেই, অসুরদের আর লুকোবার জায়গা রইল না, তখন দেবতারা সব অসুরগুলোকে ধরে গলা কেটে দিল। শঙ্করাচার্য বলছেন, অগস্ত্য মুনির এতো ক্ষমতা ছিল, অগস্ত্য মুনি ব্রাহ্মণ ছিলেন বলে এখনও ব্রাহ্মণদের সম্মান করা হয়। ইদানিং ব্রাহ্মণরা যাই করে থাকুক না কেন, এখনও ব্রাহ্মণদের সম্মান করা হচ্ছে শুধু অগস্ত্য মুনির জন্য। অগস্ত্য মুনি পুরো সমুদ্রকে পান করে নিয়েছিলেন, তিনি শুধু পুরুতগিরিই করে বেড়াতেন না, তিনি ছিলেন উচ্চকোটির ঋষি, এত বড় ঋষি ছিলেন বলেই ব্রাহ্মণদের এত সম্মান করা হয়। ঠিক তেমনি এখানেও সমানাধিকরণ করা হচ্ছে, যিনি সন্ন্যাসী, যিনি ব্রহ্মজ্ঞানী তাঁর সম্পূর্ণ ত্যাগ। ঠাকুর বলছেন সন্ন্যাসী ষোল আনা ত্যাগ করলে গৃহস্থরা এক আনা ত্যাগ করে। সন্ন্যাসীদের দেখেই সবাই অনুপ্রাণিত হয়, তাই সন্ন্যাসীদের ষোল আনা ত্যাগের কথা বলা হয়। ঠাকুর বলছেন আমি যদি দাঁড়িয়ে প্রস্বাব করি তবে তোরা ঘুরে ঘুরে প্রস্বাব করবি। সন্ন্যাসী যদি ভোগে লিপ্ত হয় তাহলে গৃহস্থরা তো চুটিয়ে ভোগের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়বে। এখনতো বড় বড় বাবাজীরা সন্ন্যাসী সেজে বড় বড় বাড়ি করছে, প্লেনে করে ঘুরে বেড়াচ্ছে, ফলে সাধারণ মানুষও উন্মাদের মত ভোগে নেমে পড়েছে। গান্ধীজী যখন স্বাধীনতা আন্দোলনে সত্য আর অহিংসার আদর্শকে সামনে নিয়ে এলেন তখন অন্যরাও সত্য আর অহিংসাকে আদর্শ করল। নেতাজী বললেন, তুমি আমাকে রক্ত দাও আমি তোমাকে স্বাধীনতা দেব। নেতাজীর এই আহ্বানে লোকেরা অনেকদিন পর্যন্ত বলল আমরা দেশের স্বাধীনতার জন্য প্রাণ বিসর্জন দেব। আর এখন কমনওয়েলথ গেমসে নেতারা বলছেন লুটেপুটে খাও, বাকীরাও বলছেন আমরাও লুটেপুটে খাই। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ পূর্ণত্যাগে প্রতিষ্ঠিত বলে যারা কর্মফল ত্যাগ করছে

তাদেরকে উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে। বলছেন কর্মফল ত্যাগেও হবে। এর বেশি সে পারবে না, সম্ভবই নয়, আর জোর করে তাদেরকে দিয়ে কর্মত্যাগ করানও কখনই উচিৎ কাজ হবে না। এই করেই ভারতের অধঃপতন হয়ে গেল। বৌদ্ধ ধর্ম যখন খুব প্রসার লাভ করল তখন সবাই নিজেদের সম্মানযুক্ত মনে করত যদি আমার বাড়ির একজন কেউ সন্ন্যাস নেয়। বাড়ির যে ছেলেকে সন্ন্যাস দিতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তার হয়তো সন্ন্যাস নেওয়ার ইচ্ছেই নেই, ভোগের দিকেই মন পড়ে রয়েছে, তাও তাকে জোর করে সন্ন্যাস নিতে বাধ্য করা হত শুধু নিজের পরিবারের মর্যাদা বাড়াবার জন্য। এই করেই বৌদ্ধ ধর্মে গোলমাল শুরু হয়েছিল। খ্রীশ্চান ধর্মে সম্পত্তি নিয়ে ঝামেলা হবে তাই মেয়েদের নান বানিয়ে দেওয়া হচ্ছে। মেয়েরা হচ্ছে মাতৃত্বের প্রতিক, জন্মদাত্রী, তাদেরকে দিয়ে সৃষ্টি চলছে কিন্তু মেয়েদের জোর করে সন্ন্যাসীনি বানিয়ে দেওয়া হচ্ছে। সন্ন্যাসের জন্য সবাই প্রস্তুত নয়, সেইজন্য বলা হচ্ছে তোমরা কর্মত্যাগ করতে পারবে না তাই কর্মফল সমর্পণ কর। কিছুই না করে একটু কিছু করে ধীরে ধীরে যদি এগোয় তাতেই অনেক হবে।

এখানে কয়েকটি শ্লোকে ভগবান আত্মা আর ঈশ্বরের ভেদকে পরিষ্কার স্বীকার করছেন। আচার্য শঙ্করের এইটাই বিশেষত্ব, যদিও তিনি অভেদদর্শি, তাঁর মত এত বড় অদ্বৈতবাদী ভূ-ভারতে আর কেউ নেই, কিন্তু সাধারণ লোকেদের জন্য ভগবান যেখানে দ্বৈত ভাবে নিয়ে আসছেন, মানে সগুণ সাকারকে নিয়ে আসছেন আচার্যও এটাকে মেনে নিচ্ছেন। তাহলে কোনটা সত্য? কোনটাই সত্য নয়, আবার দুটোই সত্য, এই দুটোর বাইরেও যেটা আছে সেটাও সত্য। এই ব্যাপারে ঠাকুর খুব সুন্দর বলছেন – কাশীতে মৃত্যু হলে মুক্তি হয়। কিভাবে মুক্তি হয়? বলছেন শিব কানে তারকব্রহ্ম মন্ত্র দেন আর মা ভবানী পাশ কেটে দেন। তারকমন্ত্র দিচ্ছেন মানে শিব তার ইষ্ট হয়ে গেল, তারকমন্ত্র দিয়ে বলছেন – এই দ্যাখ্ আমার অখণ্ড রূপ। এই অখণ্ড রূপের ব্যাপারে আমরা সাধারণ মানুষ কি বুঝব, তবে যিনিই নির্গুণ তিনি সগুণ, যিনিই নিরাকার তিনিই সাকার। কিন্তু সাকার দৃষ্টি যতক্ষণ থাকবে ততক্ষণ অভেদ দৃষ্টি তার হবে না। শ্রীকৃষ্ণ ভগবান, আমি কখনই শ্রীকৃষ্ণ হতে পারব না, কিন্তু তত্ত্বতঃ আমি আর শ্রীকৃষ্ণ অভেদ। মাটি দিয়ে দুর্গা প্রতিমা বানানো হচ্ছে, সেই মাটি দিয়েই লক্ষ্মী, সরস্বতি, কার্তিক, গণেশ, সিংহ, মহিষ, অসুর সবই বানান হচ্ছে। এখন তত্ত্বতঃ মাটির দিক থেকে সবই এক। কিন্তু গণেশের ইঁদুর আর সিংহ কোন দিন এক হবে না। দুটই সত্য, ইঁদুরটাও সত্য সিংহটাও সত্য। ঠিক সেই রকম আমি কোন দিন শ্রীরামকৃষ্ণ হতে পারব না। আমি আত্মা, আমি ব্রহ্ম কিন্তু আমি কখনই ঈশ্বর নই। ঈশ্বর আর আত্মার ভেদ আছে। কিন্তু তাহলে যে অভেদ দৃষ্টির কথা বলা হয় সেটা কি? তখন বলছেন, শ্রীরামকৃষ্ণের যে বাস্তব তত্ত্ব আর আমার যে বাস্তব তত্ত্ব এটা এক, তত্ত্বের দিক থেকে সব সময় অভেদ দৃষ্টি আনা হয়। কিন্তু আমি দেখছি শ্রীরামকৃষ্ণ আমার মধ্যে বাস করছেন, আমি শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে বাস করছি। তখনও আমি ঠিকই দেখছি এতে কোন দোষ নেই। আবার কিছু ভক্ত দেখেন শ্রীরামকৃষ্ণ আলাদা আর আমি আলাদা, এতেও কোন দোষ নেই। এইটাই হচ্ছে শঙ্করাচার্যের বৈশিষ্ট্য, তিনি সামগ্রিক রূপটাকে গ্রহণ করেন, অন্যান্যরা রামানুজ, মাধ্বাচার্যরা খণ্ড খণ্ড রূপকে নিয়েই আবদ্ধ থেকে গেছেন। যারা গোঁড়া বৈষ্ণব তারা ছোট্ট একটা রূপকে নিয়েই পড়ে রয়েছে, শ্রীকৃষ্ণ বিনে আর কোন গতি নাহি। আবার যারা শাক্ত তারাও মনে করে কালী ছাড়া গতি নাই। কিন্তু তা কি করে হবে, এই রকম হলে তো শাস্ত্রের কথা মিথ্যা হয়ে যাবে। যেখান থেকে কালীর কথা, শ্রীকৃষ্ণের কথা বলা হচ্ছে সেখান থেকেই এই কথাও বলা হচ্ছে। ভেদ দৃষ্টি অভেদ দৃষ্টি দুটোকেই শাস্ত্রে রাখা হয়েছে, কারণ মানুষের মনের গঠন বিভিন্ন রকমের হয় বলেই সবার জন্য একই পথের কথা বলা হয় না। ঠাকুর বলছেন – মায়ের তিনটি সন্তান, কারুর জন্য মা মাছের কালিয়া বানিয়েছেন, কারুর জন্য মাছের অম্বল আবার কারুর জন্য মাছের সুক্তো রান্না করেছেন, যার পেটে যা সয়। সেই রকম ভগবান কারুর জন্য ঈশ্বরে অভেদ দৃষ্টি কারুর জন্য ভেদ দৃষ্টির কথা বলছেন। এই ভেদ দৃষ্টিকে নিয়ে পরের শ্লোকে সাধকের কতকগুলো আবশ্যিক গুণাবলীর কথা বলছেন যারা ঠিক ঠিক সাধক, এখানে অবশ্য শঙ্করাচার্য বলছেন যারা অদ্বৈত সাধক তাদেরকেও এই গুণগুলো অর্জন করে সেইমত আচরণ করতে বলছেন, অবশ্য এটা ঠিকই যে এই গুণগুলো দ্বৈত অদ্বৈত উভয় সাধকের জন্য একই হয়ে যায়। পরে ষোড়শ অধ্যায়েও এই গুণগুলোকে নিয়ে ভগবান আলোচনা করবেন।

এখানে খুব সুন্দর একটা কথা আচার্য বলছেন, যদিও এখানে কর্মত্যাগ না করে কর্ম করত বলছেন এবং কর্মফল ত্যাগের কথা বলা হচ্ছে কিন্তু যিনি জ্ঞানী তাঁর জন্য কর্মের কোন বিধান হয় না। কেন কর্মের বিধান হয় না? যতক্ষণ ভেদবুদ্ধি থাকবে ততক্ষণই প্রভু ও দাসের সম্পর্ক থাকবে, ততক্ষণই সে প্রভুর কাজ করবে। কিন্তু যখন বুঝে নিল তুমিও যা আমিও তা, তখন কে কার প্রভু বা কে কার দাস হবে। কিন্তু যখন বুঝে নেবে তত্ত্বতঃ আমি এক, শ্রীকৃষ্ণও যা আমিও তাই, তখন সে শ্রীকৃষ্ণের জন্য কাজ করবে না। প্রভু ও সেবকের এই ভেদবোধটা যতক্ষণ ততক্ষণই হে কৃষ্ণ তুমি প্রভু আমি তোমার সেবক। এই ভেদবোধটা চলে গেলে তার দ্বারা কোন কাজই হবে না। ঠাকুর খুব সহজ করে এই তত্ত্বটাকে বুঝিয়ে দিচ্ছেন – বউমা অন্তঃসত্বা হলে শাশুড়ি কাজ কমিয়ে দেন। সন্তান হয়ে গেলে তখন কোন কাজই করতে দেন না, তখন শুধু বাচ্চাকে নিয়েই আনন্দ করে আর সন্তানের সেবা যত্ন করতে থাকে। যার আত্মা আর ঈশ্বরে অভেদ দৃষ্টি হয়ে গেছে তার জন্য আর কোন কর্মই থাকবে না। মা সন্তানকে নিয়েই নাড়াচাড়া করে মশগুল থাকে, অর্থাৎ অভেদবোধ সম্পন্ন যিনি তিনি ঈশ্বর জ্ঞানেই আনন্দে থাকেন। এখন আধ্যাত্মিক সাধকের কিছু গুণের কথা বলা হচ্ছে –

**অদ্বেষ্টা সর্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ। নির্মমো নিরহংকারঃ সমদুঃখসুখঃ ক্ষমী।।১৩।।**

*অদ্বেষ্টা সর্বভূতানাং*, কোন প্রাণীর প্রতি তাঁর কোন দ্বেষ ভাব থাকে না। *মৈত্রঃ করুণ এব চ*, সবারই প্রতি তাঁর বন্ধুত্বের ভাব আর সকলের প্রতিই করুণায় তাঁর হৃদয় পরিপূর্ণ। *নির্মমো নিরহংকারঃ*, কোন কিছুর প্রতি তাঁর মমত্ব বোধ নেই, মানে এটা আমার এই বোধটা থাকে না, নিজের কোন কিছুকে নিয়ে সে অহংকার করে না, আমি এই, আমি সেই, আমার এই ক্ষমতা এই ভাব থাকে না। তার মানে কোন কিছুর প্রতি তাঁর মমত্ব আর অহংতা, আমি ও আমার এই ভাবটা থাকে না। *সমদুঃখসুখঃ ক্ষমী*, দুঃখ এলেও সে বিচলিত হয় না, আবার সুখেও তিনি উৎফুল্ল হয়ে ওঠেন না, আর সকলের প্রতি তাঁর ক্ষমা ভাব। যদি কেউ তাঁকে প্রহারও করে তাতেও তাঁর মনে কোন রকমের প্রতিক্রিয়া হয় না। একবার এক মহারাজ হাওড়া স্টেশন থেকে নেমে ট্যাক্সি স্ট্যাণ্ডের দিকে আসতে গিয়ে একটা ট্যাক্সি তাঁকে ধাক্কা মারতেই উনি রাস্তায় ছিটকে পড়ে যান। উনি বয়স্ক মহারাজ আর খুব বড় পণ্ডিত। বয়স্ক মহারাজ রাস্তায় পড়ে যেতেই সব লোকজন ছুটে এসে ট্যাক্সিওয়ালাকে এই মারে কি সেই মারে। বয়স্ক মহারাজ রাস্তাতে পড়ে থাকা অবস্থাতেই হাত জোড় করে চিৎকার করে বলছেন – ওকে ছেড়ে দিন, ওকে মারবেন না, আমার অদৃষ্টে ছিল তাই এই রকম হয়েছে। লোকেরা বুঝতে পারছে না অদৃষ্টটা কি। বক্তব্যটা হচ্ছে, ট্যাক্সিতে ধাক্কা খেয়ে যখন পড়ে গেছেন তখনও ওনার এই বোধটা কাজ করছে যে, আমার কপালে দুর্ভোগ ছিল তাই পড়ে গেছি, ট্যাক্সিওয়ালার তো এখানে কোন দোষ নেই। আমরা মনে করতে পারি যে মহারাজের এটা পাগলামো, হতে পারে পাগলামো, কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে আমরা এখানে যাঁরা আধ্যাত্মিক পুরুষ তাঁদের কথাই আলোচনা করছি, এখানে সংসারীদের কথা বলা হচ্ছে না। বলে, যে সত্ত্বগুণী হয় চোর ধরা পড়লে সে বলবে ঠিক আছে ছেড়ে দাও। রজোগুণী হলে চোরের জিনিষটা কেড়ে নিয়ে চোরকে তাড়িয়ে দেবে। আর তামোগুণী হলে বলবে – এতো ক্ষমতা, এতো দুঃসাহস আমার বাড়িতে চুরি করেছে! আগে চোরের সব মাল কেড়ে নেবে, তারপর চোরকে আচ্ছা করে মারধোর করবে তারপর পুলিশে দেবে। কিন্তু যখন সত্ত্বগুণের আধিক্য হয়ে যায় তখন সব কিছুতেই ক্ষমার ভাব এসে যায়। তারপর আরও গুণের কথা বলা হচ্ছে –

**সন্তুষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ। ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ।।১৪।।**

*সন্তুষ্টঃ সততং*, যিনি আধ্যাত্মিক পুরুষ, আধ্যাত্মিক সাধনা করছেন, তিনি তাঁর শরীর চালানোর জন্য যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুই নেবেন, তার বাইরে কিছু নেবেন না, ঐটুকু পেলেই সে সন্তুষ্ট। ঐটুকুর বাইরে তাঁকে কিছু দিতে গেলে তাঁর শরীরই নেবে না। সর্বদাই তাঁর মনে সন্তুষ্টি। *যোগী যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ*, সব সময় তাঁর চিত্ত পরমাত্মাতে সমাহিত হয়ে আছে, তাই সব সময় তাঁর সংযত স্বভাব আর আত্মবিষয়ে তাঁর মন দৃঢ় ধারণাযুক্ত, আর যেটা বলবেন সেটা করেই ছাড়বেন। কোন্ ব্যাপারে তিনি দৃঢ় নিশ্চয়? আমি তোকে শেষ করে দেব, এই ব্যাপারে নয়। কেননা আগেই বলা হয়েছে তিনি *সর্বভূতে হিতে রতঃ*, কখন তিনি কারুর ক্ষতি করেন না, তাঁর দ্বারা কখনই কারুর ক্ষতি হতে পারেনা। দৃঢ়নিশ্চয় বলা হচ্ছে উচ্চ ধারণার ব্যাপারে। *ময্যর্পিতমনোবুদ্ধিঃ*, ভগবানেই যার মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহংকার সমর্পিত। *যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ*, এই ধরণের ভক্তরাই আমার প্রিয়।

**যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ। হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈর্মুক্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ।।১৫।।**

তিনি জগতের কোন কিছু থেকেই উদ্বিগ্ন হন না, আর জগতের কেউ তাঁর থেকে উদ্বিগ্ন হয় না। আমাদের প্রত্যেকেরই কোন না কোন বন্ধু বান্ধব বা আত্মীয় আছে যার আসার কথা শুনলেই বাড়ির সবাই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। কিন্তু এখানে বলছেন আমি কারুর থেকে উদ্বিগ্ন হবো না আর আমার থেকেও কেউ উদ্বিগ্ন হবে না। আমাদের মধ্যে অনেকে আছে যারা কোন অনুষ্ঠানে গিয়েই দেখবে আমার বসার জায়গাটা ভালো জায়গাতে হয়েছে কিনা, খাওয়ার দাওয়ার ঠিক মত আয়োজন করা হয়েছে কিনা, না হলেই সবাইকে উদ্বিগ্ন করে মারবে। যিনি সাধুপুরুষ তিনি এই ভাবে কাউকে উদ্বিগ্ন করেন না, আর তিনিও কারুর থেকে উদ্বিগ্ন হন না, নিজের মত নিজে থাকেন। একটা বাঘ যদি বনের মধ্যে দিয়ে যখন বিচরণ করে তখন সে কত উদ্বেগহীন ভাবে চলে কিন্তু আমরা সবাই ভয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ি। ট্রেনে বাসে যখন আমরা ভ্রমণ করি তখন কিছু ছেলেমেয়েরা এমন ভাবে চলাফেরা করে, হয়তো সামনের সিটে পা তুলেই বসে থাকবে, কিছু বলতে গেলেই বলবে, আপনার তাতে কি কোন কষ্ট হচ্ছে। আরে শরীরে কোন কষ্ট হচ্ছে না কিন্তু মনে তো উদ্বিগ্নতা হচ্ছে। যারা সবাইকে উদ্বেগ দিয়ে বেড়ায় তারা হচ্ছে সমাজের অভিশাপ।

*হর্ষামর্ষ*, হর্ষ ও অমর্ষ, হর্ষ হচ্ছে কোন কিছু পেয়ে যে আনন্দ হচ্ছে, আর অমর্ষ হচ্ছে কোন কিছু না পেয়ে বা হারিয়ে বা কিছু হওয়ার কথা কিন্তু এখন হচ্ছে না বলে অসহিষ্ণু হওয়া। যিনি আধ্যাত্মিক পুরুষ তিনি ভালো কিছু পেলেও আনন্দে আহ্লাদে আটখানা হয়ে যান না আবার কোন কিছু হওয়ার আছে সেটা না হলে বা কোন কিছু পাওয়ার কথা সেটা না পাওয়া পর্যন্ত ছটফট করে অস্থির হয়ে পড়েন না। *ভয়োদ্বেগৈর্মুক্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ*, কোন রকমের ভয় বা উদ্বেগ তাঁকে বিচলিত করতে পারেনা, সমস্ত ভয় ও উদ্বেগ থেকে তিনি মুক্ত, এই ধরণের ভক্তরাই আমার প্রিয়।

**অনপেক্ষঃ শুচির্দক্ষ উদাসীনো গতব্যথঃ। সর্বারম্ভপরিত্যাগী যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ।।১৬।।**

যিনি ভক্ত, তিনি কোন কিছুর অপেক্ষা রাখেন না, নিঃস্পৃহ। *শুচিঃ*, তাঁর শরীর ও আনুষাঙ্গিক যা কিছু আছে সব পবিত্র। অনেকে স্নানই রোজ করতে চায় না, রোজ স্নান করলেও জামাকাপড় কাচে না, আমাদের ছোটবেলা থেকে অভ্যেস করিয়ে দেওয়া হয়েছে বাসি জামাকাপড় কখন ব্যবহার করবে না, রোজ বাসি জামাকাপড় ধুয়ে দিতে হয়। শরীর, শরীরের সাজপোশাক, আর ব্যবহার্য যা কিছু থাকবে সব কিছুর শুচিতা যদি না থাকে তাহলে এরা ভালো কিছু কাজ কখনই করতে পারেনা। আর *দক্ষঃ*, সব কাজেই চৌখস, যে কোন কাজই তাঁরা অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে করে দেন। ঠাকুর যোগানন্দ মহারাজকে বলছেন, ভক্ত হবি তো বোকা হবি কেন। যখন বাজার করবে সব কিছু দরাদরি করে কিনবেন, কেননা বাজারওয়ালারা তো সুযোগ পেলে ঠকাবেই, দরদাম করে ওজন ঠিক মত দেখে সব জিনিষ পত্র কেনাকেটা করবেন, বাজার-ওয়ালাকে ঠকাবার সুযোগ দেবেন না। সাধু মানে বোকা তো নয়ই বরং সবার থেকে বেশি দক্ষ। যে কাজে নামবেন মনে হবে তিনি এই কাজেরই একজন বিশেষ পারদর্শী। ভগবান বোকা ভক্তকে নিয়ে কি করবেন! একদিকে যেমন সে দক্ষতার সঙ্গে কাজ করবে আবার অন্য দিকে সব কিছুতেই উদাসীন মানে পক্ষপাতশূন্য, আর কোন ভয়ডর বলে তাঁর মধ্যে কিছু থাকবে না। *সর্বারম্ভপরিত্যাগী*, সব কাজেই তিনি দক্ষ অথচ তিনি নিজে থেকে নতুন কোন কাজে জড়াবেন না। ম্যানেজমেন্টের লোকেদের মাথায় যেমন সব সময় নতুন নতুন প্রজেক্ট ঘুরছে, ঈশ্বরের যিনি ভক্ত, তাঁর মাথায় কোন নতুন প্রজেক্ট নেই, তাঁর মাথায় একটাই প্রোজেক্ট, ঈশ্বরের ধ্যান, তার বাইরে আর কিছু নেই। ঈশ্বরের আদেশ পেলে যতটুকু করতে হবে ততটুকুই করবেন, ওর বাইরে আর কিছুতেই তিনি নিজেকে জড়াবেন না। এই ধরণের যাঁরা ভক্ত তাঁরাই আমার সব থেকে প্রিয়।

এই শ্লোকে *গতব্যথঃ* বলা হয়েছে, গতব্যথঃ মানে যাঁর কোন ব্যাথা নেই। আচার্য শঙ্কর বলছেন – *গতব্যথঃ* মানে গতভয়ঃ, অর্থাৎ ব্যাথার উৎস হচ্ছে ভয়, ভয় থেকেই ব্যাথা আসে। ভক্তের কোন কিছুর ভয় থাকে না, পূর্ব পূর্ব অভিজ্ঞতাতে আমার এই রকম খারাপ হয়েছিল, আবার এই রকম খারাপ কিছু হতে পারে, ভক্তের এই ব্যাপারটা থাকে না। এই অবস্থাটাকে ভক্ত অতিক্রম করে যায়, তাই সে *গতব্যথঃ*।

**যো ন হৃষ্যতি ন দ্বেষ্টি ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি। শুভাশুভপরিত্যাগী ভক্তিমান্ যঃ স মে প্রিয়ঃ।।১৭।।**

ভক্ত এই রকম নয় যে কোন ভালো কিছু পেলে সে হৃষ্ট হচ্ছে, খারাপ কিছু এসে গেলে সে দুখী হচ্ছে আর গালে হাত দিয়ে বসে বসে এই নিয়ে শোক করছে। আকাঙ্ক্ষা করছে, এই চাকরিটা পেলে ভালো হয়, এই প্রমোশনটা পেলে এত টাকা মাইনে বাড়বে। *শুভাশুভপরিত্যাগী*, ভালো মন্দ কোন কিছুতেই তিনি নিজেকে জড়ান না, শুভ ও অশুভ সব কর্মকে পরিত্যাগ করেছেন, এই ধরণের ভক্তরাই আমার প্রিয়।

**সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ। শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু সমঃ সঙ্গবিবর্জিতঃ।।১৮।।**

শত্রু মিত্রতে ভক্তের সমান দৃষ্টি, সমান ভাবে দেখা মানে, আসলে ভক্তের কোন শত্রুও নেই মিত্রও নেই, ভক্ত নিরপেক্ষ। মান অপমানে তাঁর সমান ভাব, তাঁকে কেউ সম্মান করলেও তাঁর কিছু মনে হয় না আবার কেউ অপমান করলেও তাঁর তাতে কিছু আসে যায় না। মান অপমানে কেন ভক্তের কিছু আসে যায় না? পাঁচ বছরের বাচ্চা যদি আমাকে বলে, কাকু তুমি একটা বোকা। এই কথা শুনে আমি হাসব না কাঁদব। কিছুই করব না। পাঁচ বছরের বাচ্চা যদি আবার বলে, কাকু তুমি কতো কিছু জান, তুমি কত বড় পণ্ডিত। শুনে আমার কি হবে? কিছুই হবে না। এই ধরণের ভক্ত ভগবানের ব্যক্তিত্বের সাথে এমন ভাবে একত্ব অনুভব করেন যে জগতটাকে তিনি পাঁচ বছরের বাচ্চার মত দেখেন। মুর্খ যদি স্তুতি করে তারও দাম নেই, আবার মুর্খ যখন নিন্দা করে তারও কোন দাম নেই। পাকিস্তানের বিজ্ঞানী আব্দুস সালাম যিনি নোবেল প্রাইজ পেয়েছিলেন, নোবেল প্রাইজ পাওয়ার পর তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয়েছে নোবেল প্রাইজ পেয়ে আপনার কি রকম লাগছে। আব্দুস সালাম বলছেন, কি আর লাগবে, আমার একটি মেয়ে আছে ক্লাশ ফাইভে পড়ে, সে দিনরাত আমাকে বলে – বাবা তুমি একটা মুর্খ। একদিন মেয়েটি একটা অঙ্ক পারছিল না বলে বাবার কাছে অঙ্কটা বুঝতে গেছে। বাবা অঙ্কটা বুঝিয়ে দেওয়ার পর পরের দিন ক্লাশে গিয়ে টীচারকে মেয়েটি ঐভাবে করে দেখিয়েছে। কিন্তু টীচার বলে দিয়েছে এই প্রসেসে করলে হবে না। মেয়ে বাড়ি ফিরে সালামকে বলছে – বাবা তুমি একটা মহামুর্খ। সালাম তাই বলছেন, জগৎ আমাকে নোবেল প্রাইজ দিয়ে দিল কিন্তু বাড়িতে আমি এখনও মহামুর্খই। কিন্তু তাই বলে সালাম কি গালে হাত দিয়ে বসে শোক করছেন? আবার মেয়েটি যদি বলে – বাবা তুমি কি বিরাট পণ্ডিত। তাতেও সালামের কিছুই মনে হবে না। সালাম সাহেব তাঁর বিজ্ঞানের সাম্রাজ্যে হারিয়ে গেছেন, এখন তাঁকে কে কি বলছে তাতে তিনি থোরাই গ্রাহ্য করবেন। আইনস্টাইন অত বড় বিজ্ঞানী, তাঁর থিয়োরি অফ রিলেটিভিটি বেরিয়ে গিয়ে তিনি তখন নোবেল প্রাইজ পেয়ে গেছেন। সেই সময় তাঁর দুটো বিখ্যাত ছবি আছে, একটা ছবিতে তিনি মাকালীর মত জিভ বার করে রয়েছেন, আরেকটি ছবিতে নিজের টুপিটা আকাশে ছুঁড়ে দিয়ে তিনি হাঁ করে ক্যাবলার মত আকাশের দিকে তাকিয়ে আছেন। সবাই তাঁকে বলছে – আপনি এতো বড় একজন বিজ্ঞানী হয়ে এই রকম জোকারদের মত কেন ছবি তুলতে গেলেন। আসলে যারা প্রেস ফটোগ্রাফার আইনস্টাইনকে যেমন যেমন পোজ নিয়ে ছবি দিতে

বলছে তিনিও সেই রকম পোজ করে ছবি দিয়ে যাচ্ছেন। পরে একজন আইনস্টাইনের জীবনীতে বলছেন, তিনি এত বিশাল মাপের ছিলেন যে এই জগৎটা তাঁর কাছে বাচ্চার মত মনে হত, আর তিনিও এই জগতের সাথে বাচ্চার মত ব্যবহার করতেন। অথচ তিনিই আবার যখন কাগজ কলম নিয়ে বসে যেতেন তখন অন্য এক জগতের মানুষ। তিনি যখন থিয়োরি অফ রিলেটিভিটি লিখছেন তখন তাঁর একটি ছেলে ছয়-সাত বছরের, আরেকটি ছেলে দুই-এক বছরের। বাড়িতে ওনার স্ত্রী নেই, বাচ্চা দুটোকে তাঁর কাছে দিয়ে তিনি কোথাও কাজে ব্যস্ত হয়ে আছেন। একদিকে তিনি থিয়োরি অফ রিলেটিভিটি লিখে যাচ্ছেন আরকে দিকে ছোট্ট বাচ্চাটাকে ঘুম পাড়াবার জন্য চাপড় দিয়ে যাচ্ছেন। অন্য দিকে বড় ছেলেটি স্কুলের কি একটা পড়া বুঝতে চাইছে। একদিকে তিনি ছোটটাকে চাপড়ে যাচ্ছেন, অন্য দিকে বড়টিকে বলে যাচ্ছেন, ইয়েস স্যার, ওয়ান মিনিট, ওয়ান মিনিট, আবার আরেক দিকে থিয়োরি অফ রিলেটিভিটি লিখে যাচ্ছেন। নিজের লেখার ব্যাপারে যখন ডুবে যাচ্ছেন তখন তাঁর আর কোন হুঁশ নেই, অথচ ফটোগ্রাফার যখন বলছে টুপিটা আকাশে ছুঁড়ে দিতে, ছুঁড়ে দিচ্ছেন, জিভ বার করুন, জিভ বার করে দিচ্ছেন। এখানেও তিনি কাউকেই গ্রাহ্য করছেন না। যাঁরা মহাপুরুষ হন তাঁরা এই রকমই হন, জগতকে তাঁরা গ্রাহ্যই করবেন না।

স্বামীজী চিকাগো ধর্মমহাসভাতে যখন সিস্টার এণ্ড ব্রাদার্স বলে যে হাততালি পেলেন তাতেও তাঁর মাথা ঘুরে যায়নি, আবার যখন চুল কাটতে গেছেন তখন সেখানে যখন তাঁকে বলা হল নিগারদের এখানে চুল কাটা হয় না, স্বামীজীও সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এলেন। একবারও বলতে গেলেন না যে আমি নিগ্রো নই, আসলে জগৎ তাঁকে কি বলল তাতে তিনি থোরাই কেয়ার করছেন। এটাই হচ্ছে ঠিক ঠিক *মানাপমানয়োঃ*, কোন কিছুই তাঁকে স্পর্শ করে না। তারপর বলছেন –

**তুল্যনিন্দাস্তুতির্মৌনী সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ। অনিকেতঃ স্থিরমতির্ভক্তিমান্ মে প্রিয়ো নরঃ।।১৯।।**

এখানেও এই একই কথা বলা হচ্ছে। নিন্দা ও প্রশংসায় তাঁর সমান ভাব, সব সময় তিনি পরিতৃপ্ত, *কেনচিৎ*, যৎ কিঞ্চিত যা পান তাতেই তিনি সন্তুষ্ট। *অনিকেতঃ*, তাঁর কোন নির্দিষ্ট বাসস্থান নেই। *স্থিরমতিঃ*, তাঁর বুদ্ধিটা সব সময় স্থির। অস্থিরমতিঃ কি রকম? এই বলে দিল আমি আজ থেকে মাছ খাবো না, তারপর কেউ বলে দিল মাছ না খেলে শরীর দুর্বল হবে, তখন আবার ঠিক করে নিল, নাঃ, আজ থেকেই মাছ খাব। অনেকে আবার ঠিক করে কাল থেকে আমি রুটিন করে চলব। রুটিনটা এদের কতদিন চলে? যতক্ষণ রুটিনটা লেখা হয় ততক্ষণই রুটিন চলে। এই ধরণের লোকেদের দ্বারা আধ্যাত্মিক সাধনাতো হয়ই না জাগতিক কাজেও সাফল্য পায় না। ভগবান বলছেন যিনি বুদ্ধি আমাতে অর্থাৎ পরামাত্মাতেই স্থির করে নিয়েছেন, সেই ধরণের ভক্তিমানই আমার প্রিয়। এত সব বলার পর বলছেন –

**যে তু ধর্মামৃতমিদং যথোক্তং পর্যুপাসতে। শ্রদ্দধানা মৎপরমা ভক্তাস্তেহতীব মে প্রিয়াঃ।।২০।।**

এই এতক্ষণ যত উপাসনার কথা বলা হয়েছে, এই ধরণের যারা অমৃতত্ব প্রাপক মোক্ষদায়ক উপাসনা অত্যন্ত শ্রদ্ধা নিয়ে করেন তাঁরাই আমার অতীব প্রিয়। এই অধ্যায়ের শেষ সাতটি শ্লোকে যা বলা হয়েছে, সেই ব্যাপারে আচার্য শঙ্কর তাঁর ভাষ্যে বলছেন এগুলো সবই হল জ্ঞানীর লক্ষণ। যারা সাধারণ ভক্ত তাদের দ্বারা এই গুণাবলীকে অর্জন করা খুব কঠিণ। *অনিকেতঃ* কি করে হবে? যারা সংসারী, যাদের ঘরবাড়ি আছে তারা কি করে ঘরবাড়ি ছেড়ে দিয়ে আজ এখানে কাল সেখানে ঘুরে বেড়াতে পারবে। সেইজন্য আচার্য শঙ্কর বলছেন, যাঁরা সন্ন্যাসী, যাঁরা উচ্চতম সিদ্ধ পুরুষ এগুলো হল তাঁদের বর্ণনা।

আচার্য শঙ্কর দুই ধরণের ভক্তির কথা বলছেন, একটা হচ্ছে সাধারণ ভক্তি, আরেকটি হচ্ছে উত্তম ভক্তি। উত্তম ভক্তি হচ্ছে প্রকৃত জ্ঞান, ঈশ্বর আর আমার মধ্যে কোন ভেদ নেই, এই অভেদবুদ্ধিকে বলা হচ্ছে উত্তম ভক্তি, তার মানে ঈশ্বর আর আমি তত্ত্বতঃ এক। আর সাধারণ ভক্তিতে আমি আর ঈশ্বর আলাদা। যখন আমি আর ঈশ্বর আলাদা এই বোধ থাকে তখন নবধা ভক্তির কথা বলা হয়, যেটা এর আগে আমরা আলোচনা করেছিলাম। এই ভক্তিকেই ঠাকুর বলছেন অপরা ভক্তি। আর এই অধ্যায়ের শেষের দিকে জ্ঞানীর যে লক্ষণের কথা বলা হল এটাই হচ্ছে পরা ভক্তি। অপরা ভক্তি যতক্ষণ না হয় ততক্ষণ পরা ভক্তি হয় না। কথামৃত পড়লে মনে হয় যেন রাগাত্মিকা ভক্তি বা পরা ভক্তিই হচ্ছে উদ্দেশ্য। কিন্তু দীর্ঘ দিন ধরে যদি এত জপ, এত ধ্যান, এত নৈবেদ্য, এত পূজো, এত উপাচার এইভাবে অপরা ভক্তির অনুশীলন না করা হলে উন্মাদ ভক্তি, রাগাত্মিকা ভক্তি বা পরা ভক্তি হয় না। সেইজন্য বলা জ্ঞান হল উত্তম ভক্তির লক্ষণ। ঈশ্বরের তত্ত্বকে যতক্ষণ না জানা হয় ততক্ষণ কিন্তু ঈশ্বরের প্রতি শুদ্ধ ভালোবাসা হয় না। ঠাকুর যাকে পরা ভক্তি বা রাগাত্মিকা ভক্তি বলছেন গীতায় তাকে জ্ঞান বা ঈশ্বরের তত্ত্বকে জানার কথা বলা হচ্ছে। তত্ত্বতঃ জানা মানে জ্ঞান, সেইজন্য জ্ঞানকে বলা হচ্ছে উত্তম লক্ষণ। শাস্ত্রাদি পড়ার পর, জিনিষটাকে বোঝা হল, তারপর মানুষ দীর্ঘ দিন ধরে জপ, ধ্যান, নিষ্ঠা, পূজো, আচার এইসব অপরা ভক্তি করে যায়। অপরা ভক্তি করতে করতে তত্ত্বটা ঠিক ঠিক বুঝতে পারে। তত্ত্বটা যখন বুঝতে পারে তখন সে তাঁকে ভালোবেসে ফেলে। যখন ভালোবেসে ফেলে তখন আর তার অন্য দিকে আর দৃষ্টি যায় না, পূজো আচারের দিকেও আর মন যায় না। এই নিয়ে একটা সুন্দর গল্প আছে।

অনেক কাল আগে এক ব্যক্তির ইচ্ছে হল সোমরস পান করবে। সোমরস তৈরী করতে সোম পাতা চাই, আর সোমরস হচ্ছে দেবতাদের অর্ঘ্য। এক দোকানে গিয়ে জিজ্ঞেস করছে সোম পাতা আছে? দোকানদার বলছে, হ্যাঁ আছে, তুমি কত টাকা দেবে? লোকটি বলছে দশ টাকা দেব। দোকানদার বলছে – সোমরাজা ততোহভূয়াৎ, মানে সোমরাজার দাম তার থেকেও বেশি। বলে লোকটিকে ভাগিয়ে দিয়েছে। আরেকটা দোকানে গেছে সেই দোকানদারও বলছে সোমরাজা ততোহভূয়াৎ। এইভাবে কয়েকটা দোকান ঘোরা হয়ে গেছে, যেখানেই যাচ্ছে সেখানে যত দাম বলছে দোকানদার এই একই কথা বলে যাচ্ছে, সে যত দাম দিতে চাইছে দোকানদার বলছে সোমরাজার দাম তার থেকে বেশি। শেষ যে দোকানে গেছে সেখানেও এই একই কথা বলতেই লোকটি ঝাঁপিয়ে পড়ে বলছে – নিকুচি করেছে তোমার ততোহভূয়াৎ, আমার সোম পাতা চাইই চাই। বলেই সে যেখানে সোম পাতা রাখা ছিল সেখানে ঝাঁপিয়ে পড়ে টেনে সোম পাতা যা পেরেছে নিয়ে এসেছে। লোকটি আস্তে আস্তে দাম বাড়িয়ে যাচ্ছে, প্রথমে দশ টাকা, তারপর কুড়ি টাকা, তিরিশ টাকা এইভাবে দাম বাড়াতে বাড়াতে যখন তার সর্বস্ব সোম পাতার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেছে তখনও যখন বলছে সোমরাজা ততোহভূয়াৎ, বলছে নিকুচি করেছে তোমার ততোহভূয়াৎ, আমার চাইই চাই। বলেই সে ঝাঁপিয়ে পড়ে সোম পাতা নিয়ে এসেছে। এখানে প্রথমের দিকে যেটা হচ্ছিল কুড়ি টাকা, তিরিশ টাকা করে যে দাম বাড়াচ্ছিল এটা হল অপরা ভক্তি। ঈশ্বরের জন্য এটা করছি, ঈশ্বরের জন্য এটা ছাড়লাম, এইভাবে একটা অবস্থার পর সে বলে ঈশ্বর ছাড়া আমি থাকতেই পারবো না। তখন সে সব কিছু ছেড়ে দিয়ে সংসার ফংসার সব ফেলে দিয়ে ঈশ্বরকেই চাই বলে ঝাঁপিয়ে পড়ে, এইটাই পরা ভক্তি। কিন্তু সেই এক কথাই বলতে হয়, পরা ভক্তি কখনই হবে না যতক্ষণ সাধক এই পূজা, জপ, ধ্যান ও উপাচারের মধ্যে দিয়ে না যায়। এই হচ্ছে দ্বাদশ অধ্যায়ের ভক্তিযোগ।

**ওঁ তৎসদিতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসুপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়ং যোগশাস্ত্রে**
**শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে ভক্তিযোগো নাম দ্বাদশোহধ্যায়ঃ।।**

********

ত্রয়োদশ অধ্যায়

## ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞবিভাগযোগ

২রা অক্টোবর ২০১০

ত্রয়োদশ অধ্যায় আলোচনার শুরুতেই বলে রাখা ভালো যে, গীতার এই অধ্যায় হচ্ছে সব থেকে কঠিনতম অধ্যায়। ত্রয়োদশ অধ্যায়ে এমন অনেক তত্ত্ব আছে যে তত্ত্বগুলো অত্যন্ত দুর্বোধ্য ও জটিল। এই অধ্যায়ের দুর্বোধ্যতা আর জটিলতা থেকেই পরবর্তি কালে হিন্দুধর্মের বিভিন্ন দর্শন ও বিভিন্ন শাখার উৎপত্তি হয়েছে। আচার্য শঙ্কর যাঁর প্রচেষ্টার জন্য হিন্দু ধর্ম আজকে এইখানে এসে দাঁড়িয়েছে, তিনিও এই অধ্যায়ের ভাষ্য রচনার সময় নিজের তরফ থেকেই সেই সব আপত্তি তুলছেন, যে আপত্তিগুলো হিন্দু ধর্মের অন্যান্য শাখা থেকে অদ্বৈতবাদীদের বিরুদ্ধে, বেদান্ত দর্শনের বিরুদ্ধে উত্থাপন করা হয়। সব আপত্তি গুলো তুলে আচার্য নিজেই আবার এই আপত্তির বিরুদ্ধে জবাব দিয়ে বিরোধীদের সমস্ত বক্তব্যকে খণ্ডন করেছেন। এই রকম আলোচনা হতে হতে আচার্য একজনের মুখ দিয়ে বলাচ্ছেন – যাই বলুন, এই বেদান্ত অত্যন্ত জটিল, কিছুই বোঝা যায় না, আর বেদান্তমার্গিদের মাথাটাও পরিষ্কার নয়, এই কারণে সাংখ্যবাদীরা, বৈশাষিকরা, বৌদ্ধরা, জৈনরা সবাই হিন্দুধর্মকে পরিত্যাগ করে চলে গেছে। কারণ বেদান্তবাদীদের কাছেও বেদান্তদর্শন পরিষ্কার নয়। এটা শঙ্করাচার্য নিজে লিখছেন, আজ থেকে চৌদ্দশ বছর আগে শঙ্করাচার্য নিজেই বলছেন হিন্দুধর্মের তত্ত্ব এত জটিল ও কঠিন যে হিন্দুধর্মের তত্ত্বকে সঠিক ভাবে বোঝা ও ধারণা করা কত কঠিন।

এত কঠিন কেন হয়ে যায়? যদিও এই ব্যাপারটাকে বোঝার জন্য এর আগে আমাদের অনেক আলোচনা হয়েছে, তথাপি জিনিষটাকে আরেকটু পরিষ্কার করে বোঝার জন্য সংক্ষেপে আলোচনা করে নেওয়ার প্রয়োজন আছে। যদিও অনেকে মনে করেন হিন্দুধর্মের অনেক কিছুই কাল্পনিক আর আজগুবি কিন্তু এটা সম্পূর্ণ একটা অমূলক ধারণা, হিন্দুধর্ম সত্যিকারের প্রখর বাস্তববাদী দর্শনের উপর প্রতিষ্ঠিত। হিন্দুধর্মের বাস্তববাদীতা কোথা থেকে শুরু করা হচ্ছে? আমি এখানে গীতার ক্লাশ নিচ্ছি, আমার সামনে একটা টেবিল আছে, টেবিলের উপর মাইক্রোফোন আছে আর আমার সামনে শ্রোতারা বসে আছেন। আমি পরিষ্কার বুঝতে পারছি আমি হলাম এক সজীব প্রাণী আর আমার সামনে এই মাইক্রোফোনটা একটা জড় বস্তু, এই বোতলটাও একটা জড় বস্তু আর আমি আর যাঁরা আমার সামনে শ্রোতা রয়েছেন সবাই চেতন পদার্থ, আমাদের সকলের চৈতন্য আছে। আমরা চেতন আর বোতলটা জড় এই জিনিষটাকে আমরা কিভাবে ব্যাখ্যা করতে পারে? জীব বিজ্ঞানের তত্ত্ব দিয়ে যদি ব্যাখ্যা করা হয় তখন বায়োলজি অনেকগুলো বৈশিষ্ট্যকে নিয়ে আসবে। কিন্তু বেদান্ত অত কিছুতে যাবেই না। বেদান্ত স্পষ্ট করে বলবে – তোমার কি এই বোধ আছে যে তুমি আছ, আমি বলব হ্যাঁ বোধ আছে যে আমি আছি। কিন্তু এই মাইক্রোফোন কিছুই বলবে না। এখন এই মাইক্রোফোনকে সরিয়ে দিয়ে যদি জিজ্ঞেস করা হয় যে, আপনি আছেন আর আপনার সামনে এই জগৎ আছে, এ দুটো জিনিষকে মানছেন তো? অবশ্যই মানছি। এখন আমি আছি আর আমার সামনে এমন কিছু জিনিষ আছে যে কোন উত্তর দিতে পারছেনা, নিজেকে অভিব্যক্ত করতে পারছেনা আর এই পুরো জগতটা আছে। যারা ভৌতিকবাদী, যারা বিজ্ঞানী তারা এই অবস্থাতে বলবে আমি আছি মাইক্রোফোন আছে এটাতো পরিষ্কার। যে বলবে এটা আমার মনে কল্পনা, যে বলবে এটা স্বপ্ন, তাদের কথাতে আমাদের কোন কাজ নেই। বেদান্তও বলবে তুমি আছ আর মাইক্রোফোন আছে এতে কোন সন্দেহ নেই। এরপর যাঁরা সাধনা করেছেন, তিনি যিশুই হন আর শ্রীরামকৃষ্ণই হন, তাঁরা দেখছেন ঈশ্বর ছাড়া আর কিছু নেই, অথচ আমরা ঈশ্বরকে দেখতে পাচ্ছি না, আর এই মাইক্রোফোনটাও যে ঈশ্বর এটাকে মানা দূরে থাকুক কল্পনাও করতে পারব না। এখন এই দুটো দৃষ্টিকোণের মেল বন্ধন করান যাবে কিভাবে? শ্রীরামকৃষ্ণ যখন সাধনা শুরু করেছেন তখন তিনি দেখছেন তিনি আলাদা আর এই মাইক্রোফোন আলাদা, তিনিই আবার যখন জ্ঞানের চরম অবস্থায় চলে গেলেন তখন তিনি দেখছেন ঈশ্বর ছাড়া কিছুই নেই। তাহলে এই মাইক্রোফোন হচ্ছে ঈশ্বরেরই একটা রূপ। এই দুটোকে মেলান যাবে কিভাবে? এই জিনিষটাকেই শ্রীরামকৃষ্ণ এইভাবে দেখেছেন, যিশু অন্য ভাবে দেখেছেন, মহম্মদ আরেক ভাবে দেখেছেন, বুদ্ধও অন্য ভাবে দেখেছেন। কিন্তু একটা জিনিষ সবাই দেখেছেন সেটা হল, তাঁরা নিজেকে দেখছেন আবার জগতকেও দেখছেন, এতে কারুর কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু যখন ধ্যানের গভীরে যাচ্ছেন, প্রার্থনার গভীরে যখন প্রবেশ করছেন, চিন্তার একটা সীমাকে যখন অতিক্রম করে যাচ্ছেন তখন দেখছেন চৈতন্য সত্তাই হচ্ছে আসল সত্তা। এই শরীর, মাইক্রোফোন সেই চৈতন্য সত্তার কাছে অতি সাধারণ নগণ্য জিনিষ।

কি রকম সাধারণ জিনিষ? এক রাজরানী তার শৈশব অবস্থায় পুতুল নিয়ে খেলত। সেই শৈশব অবস্থা থেকে সে এখন রাজরানী হয়ে গেছে, বিরাট সাম্রাজ্যকে চালাতে হচ্ছে। যে রাজরানী হওয়ার পর যে সাম্রাজ্য চালাচ্ছে আর ছোটবেলায় যে পুতুল নিয়ে খেলা করত সেই পুতুল আর সাম্রাজ্যের মধ্যে এখন বিরাট ব্যবধান হয়ে গেছে। যিশু, শ্রীরামকৃষ্ণ, মহম্মদ, বুদ্ধ এনারাও জ্ঞানের অবস্থায় এসে জগতকে দেখেন ছোট্ট খেলনার মত আর পারমার্থিক সত্তাকেই আসল দেখেন। এই দুটোর মধ্যে একটা যোগ কোথাও আছে, এটাও মন আর সেই অবস্থায় যা দেখেছিল সেটাও মন, এই দুটোকে মেলান যাবে কিভাবে? সমস্ত ধর্মীয় দর্শনের সামনে এটাই হচ্ছে গভীর সমস্যা। সাধনার আগে আমি জগতকে যে রকমটি দেখছিলাম সিদ্ধির পর সেই জগতকে অন্য রকম দেখছি। তাহলে

কোনটা সত্য? দুটোই সত্য। কারণ আমি এই জগতকেও সত্য দেখছি আর শ্রীরামকৃষ্ণও ঐটাকে সত্য দেখছেন। তাহলে হয় ঐটা থেকে এটা এসেছে আর তা না হলে এটা থেকে ঐটা এসেছে। শ্রীরামকৃষ্ণ আবার এই জগতকে দেখছেন পুতুলের মত। তাহলে রাজরানীর যে সাম্রাজ্য, সেই সাম্রাজ্য থেকে পুতুল এসেছে, পুতুল থেকে সাম্রাজ্য হয়নি। সাম্রাজ্য থেকে পুতুলটা কিভাবে হল এই সমস্যাটা থেকে যাচ্ছে। সমস্যা কোথায়?

চৈতন্য, তা যাই হয়ে থাকুক না কেন, আমাদের পক্ষে চৈতন্য কি বোঝা সম্ভবই নয়, এই চৈতন্য থেকে জড় পদার্থ এসেছে। এটা কিভাবে এসেছে? দ্বিতীয় হচ্ছে, জড় ও চৈতন্যের সম্পর্কটা কোথায় আর কিভাবে সম্পর্ক হচ্ছে দুটোর মধ্যে? যে কোন ধর্মের কাছে এটা হচ্ছে সব থেকে বড় সমস্যা। এই সমস্যার সমাধান বিভিন্ন ভাবে করা হয়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে বলা হয়, তোমাকে এই নিয়ে বেশি মাথা ঘামাতে হবে না, নিজের যে ধর্ম পালন করার সুযোগ পেয়েছ সেটাকে ঠিক ভাবে পালন করে যাও আর ঠাকুরের নাম করে যাও, বাকিটা সময় হলে নিজেই তুমি বুঝতে পারবে। যারা দ্বৈতবাদী, যেমন খ্রীশ্চান, ইসলাম, আমাদের বৈষ্ণব সম্প্রদায় এরা বলবে তাঁর ইচ্ছা, ভগবান ইচ্ছা করলেন জগৎ সৃষ্টি হয়ে গেল।

গীতাতে এই সমস্যাকে অনেক গভীরে নিয়ে গিয়ে আলোচনা করছে। চৈতন্য সত্তা যেটা আছে সেটাতো আছেই, আর জড় পদার্থ যেটা আছে তারও সত্তা আছে। এই চৈতন্য সত্তা আর জড়ের সত্তা এই দুটোর যোগসূত্রটা কোথায়, আর কিভাবে একটি অপরে পরিণত হচ্ছে, এই প্রশ্নগুলোকে বিভিন্ন দিক থেকে উত্থাপন করে গীতা সমাধান দিচ্ছে। হিন্দু ধর্মে ঋষিদের পরম্পরা সুদূর প্রাচীন কাল থেকে বিশাল ভাবে বিস্তার করে আছে। অযোধ্যার ব্যাপারে কিছু দিন আগে যে রায় বেরিয়েছে, সেখানে আর্কোলজিক্যাল সার্ভের রিপোর্ট যিনি দিয়েছেন, তিনি লিখছেন অযোধ্যাতে এমন কিছু কিছু জিনিষ পাওয়া গেছে যেগুলো তিনশো খ্রীষ্টপূর্বের। মানে আজ থেকে তেইশ'শ বছরের পুরনো, তেইশ'শ বছরের পুরনো মন্দির ঐখানে ছিল। এগুলো আমাদের আলোচ্য বিষয় নয়, আমাদের বক্তব্য হচ্ছে ভারতের এই পরম্পরাটা অতি প্রাচীন। আর যদি ঠিক ঠিক বিচার করা হয় তাহলে আমাদের এই দেশের মাটিতে লক্ষ লক্ষ সত্যদ্রষ্টা ঋষিরা জন্ম নিয়েছিলেন। এনারা প্রত্যেকে নিজেদের মত চৈতন্য সত্তা দেখেছেন, জড় সত্তাকে সমান ভাবে দেখেছেন। আমাদের কাছে এটা মাইক্রোফোন, আমার যদি আধো ঘুম আধো জাগরণও হয় তখনও এটাকে মাইক্রোফোনই মনে হবে বাঘ কখনই ভাববো না, স্বপ্নে হয়ত ভাবতে পারি। ঋষিরাও এটাকে মাইক্রোফোনই দেখবেন কিন্তু তাঁদের কাছে এই মাইক্রোফোনের একটা পারমার্থিক সত্তা আছে। সেই যে পারমার্থিক সত্তা, মানে পরম, একমাত্র, সনাতন, অনন্ত, সেটা হচ্ছে চৈতন্য। তাঁরা দেখছেন এই চৈতন্যই আছে, চৈতন্যের বাইরে কিছু নেই। যেমন খ্রীষ্টান ধর্মে বলা হয় In the beginning there was word, and the word was with God and word was God এখানে খ্রীশ্চানরা যেটা বলছে আমরা এটাকেই ওম্ বা নাদব্রহ্ম বলি। প্রথমে কি ছিল? নাদব্রহ্ম বা ওঁ, ওরা ওঁ বলেনা, ওঁ আমরা বলি। প্রথমে শব্দ ছিল। শব্দ কোথায় ছিল? ভগবানের সঙ্গে ছিল। শব্দ কি ছিল? শব্দই ভগবান ছিল। আমরাও তাই বলি, ওঁ হল ভগবানের সব থেকে বড় অভিব্যক্তি। ওঁ আর ভগবান অভেদ। ওঁই ভগবান। হিন্দু আর খ্রীশ্চান ধর্মতো একই কথা বলছে। তার মানে প্রথমে ভগবানই ছিলেন। ভগবানতো আর হাত-পাওয়ালা নন, চৈতন্য। মুসলমানরাও বলে আল্লা ছাড়া কিছু নেই। বৌদ্ধরাও তাই বলছে, হয় শূন্য বলে তা নয়তো বিজ্ঞান বলবে কিন্তু এই যে জগত যা দেখছি এটা কিন্তু সনাতন নয়। যিনি যে ধর্মেরই হোন না কেন এটাকে সবাই মানছেন। কিন্তু ভগবান আর এই মাইক্রোফোনের মিলটা কিভাবে হয়? ভগবানের একটা রূপ হল এই মাইক্রোফোন, এটা কিভাবে হচ্ছে?

আমি আছি আর এই জগৎ আছে, আমি বুঝতে পারছি আমি আছি আর জগৎও আছে সেটাও বুঝতে পারছি, কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ, যিশু খ্রীষ্ট বা বুদ্ধ এনারা দেখছেন একমাত্র চৈতন্য সত্তাই আছেন। আমি আর এই বোতলের মধ্যে আমি আমার জীবনী শক্তি দিয়ে পার্থক্য করছি, আমার জীবন আছে বোতলের জীবন নেই। আমার দেহ থেকে প্রাণ বেরিয়ে গেলে বোতলের সাথে আমার এই দেহের কোন পার্থক্য থাকবে না, দুটোই তখন জড় পদার্থ। সাধারণ লোক একটি জীবকে দেখে বলছে এটা চৈতন্য, এই চৈতন্য আছে বলেই মানুষ মানুষ রূপে গণ্য হচ্ছে। কিন্তু যাঁরা আধ্যাত্মিক পুরুষ তাঁরা বলছেন এই জীব ও জগৎকে নিয়ে যা কিছু আছে সবটাই চৈতন্য। এখন এই যে সর্বব্যপী চৈতন্য আর জীবের মধ্যে যে চৈতন্যকে সাধারণ মানুষ দেখছে এই দুটোর যোগ কোথায়? এইটাই হল আধ্যাত্মিক দর্শনের কাছে সব থেকে বৃহত্তম সমস্যা। আমি জীবিত এটা বুঝতে পারছি, কিন্তু একটা জীবন্ত দেহ আর মৃতদেহের মধ্যে তফাৎটা কোথায়?

যেটা সাধারণ ভাবে ধারণা করা হয়, বিশেষত সাধারণ মানুষ মনে করে আর আধ্যাত্মিক পুরুষরাও বলেন যে এই দেহের মধ্যে এমন কিছু একটা বস্তু আছে যাকে আমরা বলছি জীবাত্মা, খ্রীশ্চানরা বলছে soul সোল, মুসলমানরা বলছে রুক্, বৌদ্ধ, জৈন, শিখ এরাও বলছে আত্মা। তবে আমাদের আত্মা আর খ্রীশ্চানদের সোল এই দুটোর মধ্যে তফাৎ আছে। সমাধির গভীরের বা ভক্তির পরাকাষ্টায় যে সর্বব্যাপী শুধু শুদ্ধ চৈতন্যকে দেখছে, আর আমরা যে শুধু জীবাত্মারূপে চৈতন্যকে দেখছি এই দুটোর যোগসূত্রকে বার করাই হচ্ছে দার্শনিকদের কাছে এক বিরাট সমস্যা। তিনটে জিনিষকে নিয়েই সমস্যা, একটা মরা মানুষ, জীবিত মানুষ আর জীবন্ত

মানুষের মধ্যে সমাধিবান পুরুষ। যিনি সমাধিবান পুরুষ, সমাধিতে যিনি উপলব্ধি করেছেন, তিনিও তিনটে জিনিষ দেখছেন, একটা দেখছে মরা মানুষ, একটা দেখছে জীবন্ত মানুষ আর নিজের সমাধির অবস্থা। মরা মানুষ আর জীবন্ত মানুষের কিসের তফাৎ? জীবন্ত মানুষ আর সমাধিতে যিনি জ্ঞান লাভ করেছেন তার মধ্যে কি তফাৎ? আর এই তিনটের আবার কি সম্পর্ক? পুরো আধ্যাত্মিকতায় এটাই সমস্যা, এর বাইরে আধ্যাত্মিকতার আর কিছু নেই। সমগ্র ধর্ম জগতে যত দর্শন আছে একমাত্র এই তিনটে জিনিষকেই আলোচনা করছে। এই তিনটেকে আলোচনা করতে গিয়ে আরো পাঁচটা প্রশ্ন বেরিয়ে আসে। এই তিনটে কি কি বলছেন – জীব কি, জড় আর জীবকে নিয়ে যে সমগ্র জগৎ দেখছি সেটা কি, আর ঈশ্বর কি? যে ধর্মেই আমরা যাই না কেন সমস্ত ধর্মীয় দর্শন এই তিনটে জিনিষকেই ব্যাখ্যা করে।

গীতার ত্রয়োদশ অধ্যায় একটা বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে জীব, জগৎ আর ঈশ্বর এই তিনটে জিনিষকে ব্যাখ্যা করছে। এই তিনটেকে জেনে নিলে আমার কি লাভ হবে? আমরা জগতের স্বরূপকে যদি জেনে নিতে পারি তাহলে যে জগৎ আমাদের অক্টোপাশের মত আস্টেপৃষ্টে বেঁধে রেখেছে সে বন্ধন থেকে ছাড়া পেয়ে যাব। এখন যদি জানতে পারি এই লোকটি জলাতঙ্ক রোগে আক্রান্ত, যাকে তাকে সে কামড়াতে আসছে, আর যাকেই কামড়াচ্ছে তারই জলাতঙ্ক রোগ হয়ে যাবে, তখন আমি সেই লোকটি থেকে পালাতে চাইব। আবার যদি শুনি এই লোকটি লটারিতে এক কোটি টাকা পেয়েছে আর সবাইকে দশ হাজার টাকা করে বিলোচ্ছে, তখন আমরা সবাই ঐ লোকটির সামনে লাইন লাগিয়ে দেব। যখন আমি প্রকৃতির স্বরূপ জেনে গেলাম, প্রকৃতি কি ক্ষতি করতে পারে বুঝে গেছি আর ঈশ্বরের স্বরূপও জেনে গেলাম, ঈশ্বর আমার কি ভালো করতে পারেন জেনে গেলে আমি সেই মত আমার জ্ঞান বুদ্ধিকে কাজে লাগাব।

আমাদের জানা আছে গীতার উদ্দেশ্য কি, গীতা আমাদের কি বলতে চাইছে। সমস্য হচ্ছে অর্জুন যুদ্ধ করতে চাইছে না, কারণ অর্জুনের মোহ এসে গেছে। মোহ এসে যাওয়া মানে তার বুদ্ধি ও চিন্তা ভাবনা মোহ মেঘে আচ্ছন্ন হয়ে গেছে, ফলে অর্জুনের মধ্যে শোকের জন্ম হয়েছে। আচার্য শঙ্কর বলছেন গীতার উদ্দেশ্য হচ্ছে এই শোক আর মোহকে নাশ করা। শোক হচ্ছে যেটা ছিল সেটা চলে গেছে, আর মোহ মানে একটা জিনিষ পেতে চাইছি কিন্তু পাচ্ছি না। মানুষ কখন কান্নাকাটি করে? যেটা চাইছে কিন্তু পাচ্ছে না, তখন কাঁদবে, যেটা ছিল সেটা চলে গেছে তার জন্যও কাঁদছে। মেয়ে যখন বিয়ের পর বাপের বাড়ি থেকে শ্বশুর বাড়িতে যায় তখন খুব কাঁদে, কারণ এতদিন ধরে যাদের অবলম্বন করে বেঁচে ছিলাম তাদের হারালাম। এখন জগতের স্বরূপটাকে জানা হয়ে যাবে তখন সাথে সাথে শোক আর মোহের স্বভাবটাও জানা হয়ে যাবে। তখন এই শোক মোহ আমাকে কিছু করতে পারবে না। আর যখন ঈশ্বরের স্বরূপকে জেনে গেলাম, ঈশ্বরের সঙ্গে এক হয়ে গেলে শুধু এই জন্মের জন্যই শোক ও মোহ থেকে ছাড়া পেয়ে যাব না, শোক ও মোহের যে উৎস পুনর্জন্ম, সেটাই নাশ হয়ে যাবে। সেইজন্য এই জ্ঞানকে বলা হয় পরামার্থ সিদ্ধি, মানুষের প্রকৃত মঙ্গল যেটা হবার, সেটা হয়ে যাবে। ত্রয়োদশ অধ্যায়ে এই জিনিষগুলোকে ব্যাখ্যা করা হচ্ছে। আবার চতুর্দশ অধ্যায়েও এই একই জিনিষের আলোচনা হবে, কিন্তু ত্রয়োদশ অধ্যায়ে একভাবে ব্যাখ্যা করা হবে চতুর্দশ অধ্যায়ে অন্য ভাবে করা হবে। বিভিন্ন অধ্যায়ে এই একই জিনিষের আলোচনা করা হচ্ছে কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন ভাবে করা হচ্ছে।

জীব, জগৎ আর ঈশ্বরকে ব্যাখ্যা করে একবার যখন সব কিছু পরিষ্কার করে দেবে তারপর বলা হবে কিভাবে আমরা এই জগৎ থেকে বেরোতে পারব আর কিভাবে আমরা ঈশ্বর পর্যন্ত পৌঁছাতে পারব। ত্রয়োদশ অধ্যায়ের মূল বক্তব্য এটিকে নিয়েই।

সপ্তম অধ্যায়ে ভগবান বলেছিলেন আমার দুটো প্রকৃতি, প্রকৃতি মানে স্বভাব। এই দুটো প্রকৃতির নাম দিচ্ছেন পরা প্রকৃতি আর অপরা প্রকৃতি, অপরা মানে হচ্ছে নিম্ন, পরা মানে উচ্চ। ভগবানের পরা প্রকৃতি হল চৈতন্য আর অপরা প্রকৃতি হচ্ছে জড়। অপরা প্রকৃতিও ভগবানারেই, এই অপরা প্রকৃতি চব্বিশটি তত্ত্বের সমষ্টি, যেটা এর আগেও আমরা অনেকবার আলোচনা করেছিলাম, এগুলো হল প্রকৃতি, প্রকৃতি থেকে মহৎ, অহঙ্কার, পঞ্চ তন্মাত্রা, সেখান থেকে সূক্ষ্মভূত ও স্থূলভূত এইভাবে চব্বিশটি তত্ত্বের জন্ম হয়।

এখন যদি বলা হয় মাইক্রোফোনের ইস্পাতের এই দণ্ডটি কি? ইস্পাতের এই দণ্ডটি একটি স্থূল পদার্থ। একে বিজ্ঞান এক ভাবে ব্যাখ্যা করবে আর আমাদের আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে আরেক ভাবে ব্যাখ্যা করা হয়। বিজ্ঞান বলবে এটা কতকগুলো অনু-পরমাণুর সমষ্টি, কিন্তু এই অনু-পরমাণুর অবস্থা থেকে আমাদের আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে এর ব্যাখ্যা করা শুরু হয়না। বিজ্ঞান বলবে এই অনু-পরমাণুর পেছনে আছে ইলেক্ট্রন প্রোটন, এই ইলেক্ট্রন প্রোটনের পেছনে আছে কোয়ার্ক। কোয়ার্ক যখন এলো তখন আধ্যাত্মিক পুরুষ বলবেন – এবার তোমরা আমাদের কাছাকাছি এসেছ, মানে তন্মাত্রার কাছাকাছি এসেছ। আধ্যাত্মিকতায় তন্মাত্রাটা কার? বলবেন সমষ্টি মনের। মনটা কি? মনও খুব সূক্ষ্ম তন্মাত্রা দিয়ে তৈরী। সেগুলো কি? প্রকৃতি। প্রকৃতি কি? প্রকৃতি কি এটা ঠিক বোঝান যাবে না। প্রকৃতি পদার্থ হতে পারে আবার শুদ্ধ গুণ বিশিষ্ট হতে পারে। যেমন একটা লাল গোলাপের দুটো জিনিষ আছে, একটা হচ্ছে গোলাপ আর একটি হচ্ছে লাল রঙ, redness, redness আছে বলে আমরা বলছি লাল গোলাপ। প্রকৃতিকে যদি একটা লাল

গোলাপ বলে কল্পনা করে হয় তাহলে প্রকৃতি হচ্ছে এই redness। আবার প্রকৃতিকে অতি সূক্ষ্ম পদার্থ বা পার্টিকেলস রূপেও ব্যাখ্যা করা হয়, কিন্তু পদার্থ এত সূক্ষ্ম যে তাকে আর পদার্থ বলা যায় না। যেমন ফোটন, ফোটনকে আমরা কি বলব, অনেকে বলে ফোটন হল এণার্জি প্যাকেজ কেউ বলে পার্টিকেল, কারণ ফোটন দুটোরই ধর্ম নিয়ে চলে। ইদানিং কালে বিজ্ঞান অনেক উন্নত হয়েছে বলে আমাদের মুনি ঋষিদের কথাগুলো এখন খুব ভালোভাবে বুঝতে পারছি। হিন্দুধর্ম যদি বুঝতে হয়, আমাদের মুনি ঋষিদের বেদবাক্য গুলোকে যদি ধরতে হয় তাহলে প্রথমে ফিজিক্সটা বিশেষ করে ফাণ্ডামেন্টাল পার্টিকেলসটা ভালো করে পড়তে হবে। আলো দু ভাবে কাজ করে, কখন আলোকে মনে হবে শুধুই এণার্জি, আলোর আবার এমন কিছু প্রপার্টি আছে যার জন্য আলোকে শুদ্ধ পদার্থ বলেই মনে হবে। ফোটনও পদার্থের মত আচরণ করে আবার এণার্জির মতও আচরণ করে। অথচ ফোটনের কোন ওজন নেই, পদার্থের অনেক ধর্মের মধ্যে প্রধান একটা ধর্ম যে তার ওজন হবে। অথচ আলোর কোন ওজন নেই। আইনস্টাইন যখন এই কথা বললেন তখন লোকেরা বলল এর মাথাটা খারাপ। কিন্তু পরীক্ষমূলক গবেষণার পর দেখা গেল আইনস্টাইন যা বলছেন সেটাই সত্য। ফোটনটা হচ্ছে পদার্থ, কিন্তু তার ওজন নেই, অথচ পদার্থের প্রথম ধর্মই হল এর ওজন থাকতে হবে। প্রকৃতি ঠিক তাই, প্রকৃতি হচ্ছে জড় পদার্থ অথচ তার কোন ওজন নেই। প্রকৃতি আবার গুণ বিশিষ্ট কিন্তু তার কোন বস্তু নেই, আবার অন্য দিক দিয়ে দেখলে বোঝা যায় প্রকৃতির মধ্যে বস্তু আছে। কি রকম বস্তু আছে? বস্তুগুলো এতই সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতম যে ফোটনের মত বলা যাবে না যে এর কোন কিছু বস্তু আছে। পুরুষ, প্রকৃতি, মহৎ, অহঙ্কার, তন্মাত্রা এই কারণে এতো কঠিন বলে মনে হয়। আমাদের ঋষিরা কি করে যে এই জিনিষগুলোকে ধরতে পেরেছিলেন ভগবানই জানেন। এখন থেকে একশ বছর আগেও এই জিনিষগুলোকে বোঝা আমাদের পক্ষে অসম্ভব ছিল। এখন আমরা টুকটাক একটু বিজ্ঞানের কিছু জিনিষ পড়ছি বলে বুঝতে পারছি এগুলো সম্ভব। কিন্তু আগেকার দিনে বিদেশীরা পুরুষ, প্রকৃতি, মহৎ, এই চব্বিশ তত্ত্বকে অধ্যয়ণ করে এগুলোকে বিচার করতে গিয়ে কোন কুল কিনারা না পেয় শেষে অসম্ভব বলে উড়িয়ে দিয়েছিল। কিন্তু এখন বিজ্ঞানের অনেক নতুন নতুন তত্ত্ব আবিষ্কারের পর কিছুটা বোঝা যাচ্ছে যে, এগুলো সম্ভব হলেও হতে পারে।

এই যে পরা প্রকৃতি আর অপরা প্রকৃতিতে যে সমষ্টি চৈতন্যের অভিব্যক্তি হচ্ছে, এরই খুব ছোট্ট একটা অংশ প্রকৃতি হয়ে পাল্টে যায়। প্রকৃতিতে পাল্টে গিয়ে এইটাই হয়ে যায় আমাদের এই বিশাল জগৎ। এই অনন্ত চৈতন্যের একটা ছোট্ট অংশ প্রকৃতিতে রূপান্তরিত হয়ে এই বিশাল জগৎ আকার ধারণ করল। কিন্তু আমাদের শাস্ত্রে ঈশ্বরের বা চৈতন্যের যে বর্ণনা করা হয়েছে, সেখানে বারে বারে বলা হয়েছে যে চৈতন্য বা ঈশ্বরের কোন ভগ্নাংশ হতে পারেনা। কারণ যে জিনিষরই অংশ হবে সেটাই বিকার ধর্মী, দোষযুক্ত। ঈশ্বর হচ্ছেন অবিকারী ও দোষহীন। তাহলে এই যে প্রকৃতিটা এলো এটা কোথা থেকে এল? দ্বৈতবাদীরা, বিশেষ করে বৈষ্ণবরা বলবে এটা ঈশ্বরের ইচ্ছা, তিনি ইচ্ছে করলে কি না করতে পারেন। স্বামীজী বারবার বলছে – The moment you say God's will, you need to say that you do not have the answer, যখনই বলছি ভগবানের ইচ্ছা তখন এটাও কিন্তু বলা হয়ে যাচ্ছে যে আমার জানা নেই। তাহলে তো জিনিষটা rational হল না। আমরা এখানে জিনিষটা যত সহজ ভাবেই বলি না কেন, মাধ্বাচার্য বা বৈষ্ণবদের এত সহজ যুক্তি দিয়ে কাবু করা যাবে না। ওনারা যে যুক্তিগুলো নিয়ে হাজির হবেন তাতে অদ্বৈতবাদীরাও ওদের সামনে দাঁড়াতেই পারবে না। কিন্তু যাঁরা শঙ্করাচার্যের মতাবলম্বী তাঁরা আবার এঁদেরকে ধর্তব্যের মধ্যেই আনবেন না।

আমরা শঙ্করাচার্যের মতকে নিয়ে বিশ্লেষণ করছি। শঙ্করাচার্যও বলছেন যে এই যে জগতকে দেখছি একে কখনই না করে দেওয়া যাবে না। আর এই জগতের যে একটা সত্তা আছে একেও না করা যাবে না। তাহলে অবিকারী ঈশ্বর থেকে এই বিকারী জগৎ কিভাবে আসছে? আমি এখানে মাইক্রোফোন দেখছি, বোতল দেখছি, এত লোক আমার সামনে রয়েছে, আমি তো কখনই বলতে পারি না যে এগুলো কিছুই নেই, এগুলো সব মিথ্যা। তাহলে যে আমিতে ভর করে এই সব কিছুকে মিথ্যা বলছি সেই আমিটাও তো মিথ্যা হয়ে যাবে। আর আমি যদি সত্য হই তাহলে এগুলো সবই সত্য। এই সত্যকে অস্বীকার করা যাচ্ছে না, ভগবানকেও না করা যাচ্ছে না, আবার ভগবানকে টুকরোও করা যায় না। তাহলে এগুলো আসছে কোত্থেকে? সমস্ত দর্শনের কাছে আরেক নতুন এক বিরাট সমস্যা দাঁড়িয়ে গেল। সেইজন্য তখন বেদান্তের দৃষ্টিতে বলা হয় এটাই হচ্ছে মায়া।

মায়াতে একটা জিনিষের সত্তা এসে যাচ্ছে কিন্তু সেই জিনিষের সত্তার পরিবর্তন এসে যায়। কি রকম সত্তার পরিবর্তন হয়ে যায়? একটা অভিধান কত মোটা একটা বই, কিন্তু পুরো এই মোটা বইটিতে কি আছে দেখতে গেলে দেখা যাবে শুধু ছাব্বিশটা অক্ষর আছে। আমরা কত রকমের গান, বাজনা শুনছি, কত রকমের রাগ-রাগিণী, কিন্তু সব গান, বাজনা সাতটা সুরে সা রে গা মা পা ধা নির মধ্যেই আবদ্ধ। বিশ্বে কত রঙের খেলা, কিন্তু জগতে মাত্র তিনটি মূল রঙ, লাল, হলুদ আর নীল। এই তিনটে মূল রঙ থেকে জগতে কত রকমের রঙের খেলা হয়েই চলেছে। কি করে এগুলো হচ্ছে? তখন শঙ্করাচার্য বলবেন, এইটাই মায়া। কিসের মায়া? আসল রঙ কয়টি? তিনটে। এই তিনটে থেকে সাতটা রঙ বেরিয়ে এলো আর এই সাতটা রঙ থেকে সারা বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের রঙ বেরিয়ে এল। আর এই সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যা কিছু দেখছি সব কিছুকে মাত্র ১১০টি মূল মৌলিক বস্তু থেকেই এসেছে, এই ১১০টি বস্তুর

বাইরে কিছু নেই। এই ১১০টি যে পদার্থ দিয়ে যে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি হয়েছে, এটাই মায়া। যেমন দুধ দই হয়ে যাচ্ছে, এটাই মায়া। সত্তাটা হল দুধ, কিন্তু পরিবর্তন হয়ে দই বা ছানা হয়ে যাচ্ছে, ঠিক এই রকম ১১০ খানা বস্তু পরিবর্তন হয়ে পুরো বিশ্বব্রহ্মাণ্ড হয়ে যাচ্ছে। এই ১১০টি বস্তু বস্তুত ইলেক্ট্রোন প্রটোন ছাড়া আর কিছুই নয়। পরে দেখা যাচ্ছে ইলেক্ট্রোন প্রটোন মিলে প্রায় চৌষট্টি খানা পার্টিকেলস হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু চৌষট্টি খানা মৌলিক উপাদান কখনই হতে পারেনা। বিজ্ঞানীরাই এখন বলতে শুরু করেছেন যে শেষে গিয়ে মাত্র তিনটে কোয়ার্ক থাকছে। এই তিনটে কোয়ার্কের যখন দু রকম সাজান হয় তখন ছয় রকমের হয়, এই ছটি থেকেই সব কিছু আসছে। তার মানে যাবতীয় যা কিছু এই জগতে দেখছি তা শুধু এই কটি কোয়ার্কই আছে। তার মানে এই কটাকে কয়েকটি ভাবে সাজিয়ে দিচ্ছে তাতেই এই জগৎ, এটাই মায়া। ঠাকুর কলকাতায় রাজভবনের সামনে দিয়ে যাচ্ছেন, হৃদয়নাথ ঠাকুরকে বলছেন – মামা, এটা রাজভবন। ঠাকুর বলছেন – আমি দেখলাম একটা মাটির ঢিপি। সত্যিই তো তাই, মাটির ঢিপি আর রাজভবনের মধ্যে কি আর তফাৎ আছে। এটাই মায়া। মায়া যখন এসে গেল তখন মাটির ঢিপি ভেঙে রাজভবন হয়ে যাচ্ছে। মায়াকে সরিয়ে দিলে রাজভবন ভেঙে মাটির ঢিপি হয়ে গেল। আবার মাটির ঢিপি আর ইলেক্ট্রোনের মধ্যে কি তফাৎ আছে? তাও মায়া। ইলেক্ট্রোনের সাথে যখন মায়া যোগ হয়ে যাচ্ছে তখন মাটির ঢিপি হয়ে যাচ্ছে।

তাহলে মায়াটি কে? মূল বস্তুর এমন একটা পরিবর্তন হয়ে যায়, যে পরিবর্তনটা বস্তুর প্রকৃত সত্তাকে ঢেকে দেয়, সাথে সাথে আরেকটা নতুন জিনিষকে সামনে নিয়ে আসে। সেইজন্য এনারা যেটা ভালো উদাহরণ নিয়ে আসে সেটা হচ্ছে মরীচিকা। মরুভূমিতে যেতে হবে না, গরমের সময় দুপুর বেলা গাড়ি করে হাইওয়ে দিয়ে যাওয়ার সময় মনে হবে রাস্তায় যেন জল পড়ে আছে, অথচ জল নেই। মরুভূমিতে যে মরীচিকাতে যে জল দেখা যায়, দূরে যদি কোন শহর থাকে তাহলে সেই শহরের প্রতিবিম্ব ঐ জলের মধ্যে এসে পড়ে, পুরো শহরটাকে পরিষ্কার ঐ জলে দেখা যায়। যত ঐ মরীচিকার দিকে এগোতে থাকব ততই দূরে সরে যেতে থাকবে। এখানে সত্তাটা হল মরুভূমি, মায়া এসে মরুভূমিকে ঢেকে দিচ্ছে, মরুভূমিকে ঢেকে দেওয়ার জন্য সেখানে জল দেখাচ্ছে। এই উদাহরণটা দিয়ে এনারা বলছেন, যা কিছু আছে সচ্চিদানন্দই আছেন, ভগবান ছাড়া আর কিছু নেই। কিন্তু তাঁরই মায়া এসে মানুষ দেখাচ্ছে, এই মানুষের ভেতরে আবার জীবাত্মাকে দেখাচ্ছে, আবার এটাকে মাইক্রোফোন, বোতল দেখাচ্ছে। তাহলে এই মানুষ আর বোতলের মধ্যে কি কোন তফাৎ আছে? হ্যাঁ, নিশ্চয়ই আছে। চৈতন্য সত্তার তফাৎ এসে যাচ্ছে। এই যে চৈতন্য সত্তা বা জীবাত্মা আছে একে চার্বাকপন্থিরা মানবে না, আর বিজ্ঞানীরাও মানে না। এই দুই জন বাদে বাকি সবাই মানবে। তারা বলে মানুষ মরে গেলে চৈতন্য সত্তা বেরিয়ে যায় এগুলো কিছুই নয়, মস্তিষ্ক, হৃদয়ের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে গেলে মানুষ মরে যায়। এই চৈতন্য সত্তার সাথে এই জীব ও জড়ের কি সম্পর্ক? এইখানে এসে প্রত্যেকটি ধর্ম প্রত্যেকের থেকে আলাদা হয়ে যায়, কারুর সাথে কারুর মিল হবে না।

আমরা এখন যে ত্রয়োদশ অধ্যায়ের আলোচনা করতে যাচ্ছি এখানে বলবে এই বিরাট চৈতন্য সত্তা আর এই জীব ও জড় এই দুটোই এক, কোন তফাৎ নেই। আমার অন্তর্যামি যিনি আছেন তিনিই সেই অখণ্ড সচ্চিদানন্দ, তিনিই সেই পূর্ণ শ্রীরামচন্দ্র, তিনিই সেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। আমার ভেতরে যিনি আছেন তিনিই সেই অখণ্ড সচ্চিদানন্দ, তাহলে তার ভেতরে কে আছেন? অখণ্ড সচ্চিদানন্দই তাঁর মধ্যে আছে। তাহলে অখণ্ড সচ্চিদানন্দ দুই কি করে হল? অখণ্ড সচ্চিদানন্দ দুটো নন, সচ্চিদানন্দ সচ্চিদানন্দই আছেন। আমার শরীর আর তার শরীর আলাদা এটা হচ্ছে আমার মনের কল্পনা, এটাই মায়া। মায়া অঘটনঘটয়সী, যেটা আছে সেটাকে ঢেকে দিচ্ছে, যেটা নেই সেটাকে দেখিয়ে দিচ্ছে। আছেন একমাত্র শ্রীরামচন্দ্র বা শ্রীকৃষ্ণ, কিন্তু মায়া এসে সেটাকে ঢেকে দিয়ে দুটো শরীরকে দেখিয়ে দিচ্ছে। তাহলে এই দুটো শরীর কি নেই? অবশ্যই আছে। তাহলে কি এটা মনের ভুল? আদপেই মনের ভুল নয়। যেখানে আমার আমি বোধ থাকবে সেখানে এই শরীরবোধও থাকবে। এই আমি বোধ থেকেই সব কাজ করা হচ্ছে। শরীরবোধ যতক্ষণ আছে এগুলো এই রকমই দেখাবে তাই সবই সত্য, কারণ যা কিছু কাজ করা হচ্ছে এই শরীরবোধ থেকেই করা হয়ে থাকে। কিন্তু যখন জ্ঞান হয়ে যাবে তখন দেখবে অখণ্ড সচ্চিদানন্দের সত্তা ছাড়া আর কিছু নেই। এইটাই হচ্ছে ত্রয়োদশ অধ্যায়ের মূল বক্তব্য। ইসলাম, খ্রীশ্চান, মাধ্বাচার্যের দ্বৈতবাদ বলবে আমার আত্মা তার আত্মা আলাদা, আর এই সব আত্মার মালিক হলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বা আল্লা বা যিশু। যারা বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী তারা বলবে – যেমন একটা গাছ, গাছের অনেকগুলো পাতা থাকবে, ঐ একই গাছের আমি একটি পাতা সে একটি পাতা, মানে আলাদা কিন্তু একই বৃক্ষের সাথে যুক্ত হয়ে আছি। শঙ্করাচার্যের অদ্বৈতবাদ বলবে – তুমি যে ভাবছ আমি আলদা সে আলাদা কারণ তুমি অজ্ঞানী। তখন দ্বৈতবাদীরা শঙ্করাচার্যকে বলবে – তুমি অজ্ঞানী, তোমার বাবা অজ্ঞানী, তোমার ঠাকুর্দা অজ্ঞানী। এর বাইরেও শঙ্করাচার্যের নামে দ্বৈতবাদীরা অনেক গালাগাল দেয়।

আসলে দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত আর অদ্বৈতের মধ্যে কোন তফাৎ নেই। আমি এখন সব কিছুকে আলাদা আলাদা দেখছি। যখন বিশ্বাবিদ্যালয়ের ছাত্র হিসেবে মনে করব তখন এই ক্লাশের আর অন্যান্য ক্লাশের সবার সাথে এক মনে করব। ঠিক সেই রকম শ্রীরামকৃষ্ণই যদি একমাত্র চৈতন্য সত্তা হন, তাহলে চৈতন্যের ব্যাখ্যা অনুসারে সবটাই এক। মানুষ হিসেবে মুসলমান, খ্রীশ্চান, হিন্দু ও বৌদ্ধ সবাই এক, সেই ভাবে চৈতন্য হিসাবে সবাই এক কিন্তু জীবাত্মা হিসাবে আমরা সবাই আলাদা। এটা আলাদা না এক নির্ভর করে এই হৃদয়ে। আমি বাঙ্গালী, আমি বিহারী অনেকেই বলে, আবার এটাও বলা যাবে যে, আমরা বাঙ্গালী নই, বিহারী নয় আমরা

সবাই ভারতীয়। তখন প্রাদেশিকতার আলাদা ভাবটা সরে গিয়ে সব এক হয়ে গেল। আবার বলছে, এই পৃথিবী হল একটা বৃহৎ পরিবার, এখানে আবার জাতিগত পৃথক ভাব সরে গিয়ে এক হয়ে গেল। এই এক বোধ চলে গেলে ভারত পাকিস্থান আলাদা হয়ে যাবে। আমরা জিনিষটাকে কিভাবে দেখছি তার উপর নির্ভর করে। সমাধি অবস্থাতেও ঠিক এটাই হয়, আমি সাধনা যে ভাবে করে এসেছি সিদ্ধি অবস্থাতে ঠিক সেই রকমটিই হবে। সেইজন্য দ্বাদশ অধ্যায়ে আচার্য শঙ্কর আত্মা আর ঈশ্বরের ভেদকে স্বীকার করেছেন। আবার ত্রয়োদশ অধ্যায়ে এসে বলছেন আত্মাই ঈশ্বর, ঈশ্বরই আত্মা। দুটোকেই দেখান হয়েছে, নির্ভর করছে আমি কিভাবে দেখছি, আমি কিভাবে দেখতে চাইছি।

এর আগে পরা প্রকৃতি আর অপরা প্রকৃতির কথা বলা হয়েছিল, আর বলেছিলেন যে, যা কিছু আছে আমিই আছি, আমিই এই পরা ও অপরা প্রকৃতি হয়েছি। মানুষের মধ্যে যে চৈতন্য সত্তা রয়েছে সেটাও আমি, আর মানুষের যে শরীরটা দেখা যাচ্ছে সেটাও আমি। আমি আলাদা নই, এই দেহটা অপরা প্রকৃতি আর চৈতন্য সত্তা পরা প্রকৃতি। এইবার এই জায়গাটা থেকেই শুরু করছেন, যাতে মানুষের মধ্যে বৈরাগ্য আসে, যাতে ভগবানের দিকে মানুষের মন যায়। ক্ষেতের উপমা দিয়ে বলছেন –

শ্রীভগবানুবাচ

**ইদং শরীরং কৌন্তেয় ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে। এতদ্ যো বেত্তি তং প্রাহুঃ ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি তদ্বিদঃ।।১।।**

এই শরীরটা হচ্ছে ক্ষেত্র, আর এই শরীরটাকে যে জানছে সে হয়ে গেল ক্ষেত্রজ্ঞ। দুটো শব্দ এখানে এসে গেল – ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ। যে জিনিষটা ক্ষয় বা ক্ষরণ্ হয় সেই জিনিষটাকে বলা হচ্ছে ক্ষেত্র। আচার্য শঙ্কর ক্ষেত্রের ব্যাখায় করতে গিয়ে অনেকগুলো শর্তের কথা বলছেন। যে জিনিষটাকে সব সময় ক্ষত হওয়া থেকে বাঁচাতে হয়, যেমন আমরা রাস্থাঘাটে চলার সময় কত সাবধাণে চলাফেরা করি যাতে কোন দুর্ঘটনা না হয়ে আমার শরীরটার কিছু ক্ষতি না হয়ে যায়। কিন্তু যতই শরীরটাকে বাঁচানোর চেষ্টা করিনা কেন এই শরীরের ক্ষয় হবেই। আমি আগের আগের জন্মে যা ভালোমন্দ কর্ম করেছি আর এই জন্মে যা ভালোমন্দ কর্ম করছি, সব কর্মের ফল কোথায় পাওয়া যায়? এই শরীরেই সব কর্মের ফল পাওয়া যায়। বলা হয় যে, যারা আগের জন্মে ভালো কাজ করেছে তাদের শরীর সৌম্য ও দেখতে সুন্দর হয়। কাউকে দেখা যায় কানা, কারুর পা খোড়া, কেউ বোবা, আবার কারুর বুদ্ধি কম। সবার এই রকম হয় না কেন? সব পূর্ব পূর্ব কর্মের ফলে হচ্ছে। মোদ্দা কথা হল আমি এই জন্মে বা আগের আগের জন্মে যা যা কর্ম করেছি সেই সমস্ত কর্মের একটা ফল থাকবে। এখন এই কর্মফলটা কোথায় যাবে? কর্মফলের অনুসারেই আমরা একেক জন একেক ধরণের শরীর পাচ্ছি, আর সেই শরীরের উপর দিয়েই সব কর্মফল ভোগ হয়।

ক্ষেত্রজ্ঞের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আচার্য বলছেন পা থেকে মাথা পর্যন্ত যার শরীর বোধ আছে সে হচ্ছে ক্ষেত্রজ্ঞ। ক্ষেত্রজ্ঞের এই সংজ্ঞাটি খুব জটিল। আমাদের মধ্যে প্রশ্ন হতে পারে যে, একটা কুকুরের কি পা থেকে মাথা পর্যন্ত শরীরের বোধ আছে বা একটা মাছ কি তার শরীরের ব্যাপারে সচেতন? শরীরে অনুভূতি আছে বলেই সাপের লেজে পা দিলে ফোঁস করে ওঠে। এখানে আচার্য বলছেন, *বিষয়ীকরোতি*, যার শরীরের বিষয়ে জ্ঞান আছে, যেখান থেকে আমি বোধ হচ্ছে, সেই ক্ষেত্রজ্ঞ। তার মানে যদি সাপ, কুকুর, মাছের এই বোধ থাকে তাহলে এরাও কিন্তু ক্ষেত্রজ্ঞ। এমনকি ভাইরাস ব্যক্টেরিয়ারেরও যদি আমি বোধ থাকে তাহলে এরাও ক্ষেত্রজ্ঞ। আমরা যেভাবে বোধ করছি যে আমার একটা শরীর আছে কিন্তু এই বোতলের সেই বোধ নেই যে সে একটা বোতল, অর্থাৎ নিজের আমি বোধটা এই বোতলের নেই, সেই কারণে বোতল ক্ষেত্রজ্ঞ নয়। যদি ক্ষেত্রজ্ঞ না হয় তাহলে বুঝতে হবে এর চৈতন্য সত্তা নেই। চৈতন্য সত্তাকে পরিষ্কার ভাবে ব্যাখ্যা করা হচ্ছে এই আমি বোধ, আমি আছি দিয়ে। ঠাকুর আবার এটাকে আরও এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে গিয়ে বলছেন, যার মানে হুঁশ আছে সেই মানুষ। মানে হুঁশ মানেই I consciousness, আমি বোধ। আচার্য শঙ্কর এটাকেই ব্যাখ্যা করে সংজ্ঞা নিরুপণ করছেন – পা থেকে মাথা পর্যন্ত যার বোধ আছে।

ঠাকুর এখানে মানুষকে বলছেন ক্ষেত্রজ্ঞ বা জীব। জীবের সংজ্ঞা হল যার আমি বোধ আছে, যার এই শরীর বোধ আছে। এখন আমি বলতে পারি যে, এই আমি বোধটা তো বুদ্ধি দিয়ে করা হচ্ছে, এখন অপারেশন করার সময় রোগীকে যখন অজ্ঞান করবার জন্য ইঞ্জেকেশান পুশ করা হচ্ছে তখন রোগীর আমি শরীর এই বোধ চলে যাচ্ছে। অজ্ঞান করা মানে তার বুদ্ধিটাকেই অকেজো করে দেওয়া হচ্ছে, মূলতঃ বুদ্ধির নার্ভ সেণ্টারটাকে বন্ধ করে দেওয়া হয়। নার্ভ সেণ্টার বন্ধ হয়ে যাওয়া মানে শরীরের সব অনুভূতি চলে গেল। শরীরের অনুভূতি যদি নার্ভ সেণ্টারকে অফ্ করে দেওয়ার জন্য চলে যায় তাহলে নার্ভ সেন্টারই ক্ষেত্রজ্ঞ হয়ে যাবে। এই সব কারণের জন্যই শাস্ত্র বোঝা খুব কঠিন। আবার সুষুপ্তি অবস্থায় যখন মানুষ চলে যায় তখনও তার শরীর বোধ চলে যাচ্ছে। তাহলে যাকে ক্ষেত্রজ্ঞ বলা হচ্ছে সে কখন ক্ষেত্রজ্ঞ আবার কখন সে ক্ষেত্রজ্ঞ নয়। আসলে ব্যাপারটা তা হচ্ছে না।

বেদান্তে এই প্রশ্নগুলো নিয়ে বহুবার আলোচনা করা হয়েছে। বলছেন সুষুপ্তি বা যখন ইঞ্জেকশন দিয়ে বেহুঁশ করে দেওয়া হচ্ছে তখন আমি বোধ বা শরীর বোধ থাকে না ঠিকই কিন্তু ঐ অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসার পর সে ঐ অবস্থাটাকে সে বিষয়রূপেই

দেখতে পারে – আমি তখন বেহুঁশ ছিলাম, বা ঘুম ভেঙ্গে গেলে বলতে পারে আমার খুব সাউণ্ড স্লিপ হয়েছে কোন কিছুই টের পায়নি অথবা অপারেশনের পর বলছি, অপারেশনের সময় আমার কোন হুঁশ ছিল না। এখানে আমি আমার ঐ অবস্থাটাকে বিষয়ীকৃত করছি। এই বোতলটা বিষয়, আমি দেখছি আমি হলাম বিষয়ী, আমি subject আর এই বোতলটা হচ্ছে আমি যে বেহুঁশ হয়েছিলাম ঐ অবস্থাটা হয়ে যাচ্ছে object। আবার যখন সুষুপ্তিতে চলে যায় তখনতো একেবারেই কিছু হুঁশ থাকে না, কিন্তু সেই অবস্থাতেও স্মৃতির ধারাবাহিকতাটা নষ্ট না হয়ে চলতে থাকে, মানে সুষুপ্তির আগেও আমি ছিলাম এখনও আমি আছি। এই আমি বোধটুকু থেকে যায়। স্বাভাবিক অবস্থাতে সে যে শুধু শরীরকেই জানছে তা নয়, এমনকি নিজের নার্ভ সেন্টারকেও জানে, আর এই নার্ভ সেন্টারকে যে জানছে সেই মনকেও সে জানে, বলছে আমার মন আজকে ভালো নেই, আমার বুদ্ধি আজকে কাজ করছে না। এতে এটাই স্পষ্ট যে মন ও বুদ্ধিও বিষয়(object)। যেটাই বিষয় সেটাই ক্ষেত্র আর যে ক্ষেত্রকে জানছে সেই হচ্ছে ক্ষেত্রজ্ঞ। যেটাকে জানা যায় সেটাই ক্ষেত্র আর সেটাকে যিনি জানছেন তিনিই ক্ষেত্রজ্ঞ, এটাই হচ্ছে প্রথম শ্লোকের মূল বক্তব্য। দ্বিতীয় শ্লোকে বলছেন –

**ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি সর্বক্ষেত্রেষু ভারত। ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োর্জ্ঞানং যত্তজ্জ্ঞানং মতং মম।।২।।**

তোমাকে বললাম ক্ষেত্র কি, ক্ষেত্র হচ্ছে objective knowledge আর subjective knowledge হচ্ছে শরীরের ভেতরে যিনি থাকেন যিনি এই পুরো বিষয়কে জানছেন তিনি হচ্ছেন ক্ষেত্রজ্ঞ। এই দুটোই শুধু নয়, এর সাথে আমি আরেকটি তত্ত্ব যোগ করছি – *ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি*, আমিই সেই ক্ষেত্রজ্ঞ। আমি কে? মানে, ভেতরে যিনি জীবাত্মা আছেন তিনি শ্রীকৃষ্ণ আর এই শরীরের বাইরে যে বিরাট রূপে আছেন তিনিও শ্রীকৃষ্ণ, যেটা আগেই বিশ্বরূপদর্শনযোগে বলে দেওয়া হয়েছে। দশম অধ্যায়ে ভগবান বলে দিলেন – যেখানে যা যা আছে সব আমি। এটা বলার পর একাদশ অধ্যায়ে গিয়ে তিনি তাঁর বিরাট স্বরূপকে দেখিয়ে দিলেন। এরপরেই ত্রয়োদশ অধ্যায়ে এখানে এসে বলছেন – তোমার শরীরে যিনি সব কিছুকে জানতে পারছেন সেটা আমিই, আমিই বিরাট আবার আমিই স্বরাট। যে বিরাট রূপকে দেখে একাদশ অধ্যায়ে অর্জুন ভয়ে কাঁপছে, তাকাতে পারছে না, সেই বিরাট রূপী তিনিই আবার তোমার শরীরের ক্ষেত্রজ্ঞ, অন্তর্যামী, আত্মা রূপে বিরাজ করছেন। আমিই সেই বিরাট যাকে তুমি কিছুক্ষণ আগে দেখেছিলে, আবার আমিই এই স্বরাট।

ত্রয়োদশ অধ্যায়ের এই শ্লোকটি (১৩/২) খুব বিখ্যাত একটি শ্লোক। এই শ্লোকটির উপর শঙ্করাচার্যের খুব নামকরা ভাষ্য আছে, আচার্য এর উপর বিরাট লম্বা ভাষ্য দিয়েছেন। আচার্য নিজেই বিরোধী পক্ষ অবলম্বন করে নানা রকমের তর্ক যুক্তিকে দাঁড় করিয়ে আবার তিনি নিজেই সেগুলোকে খণ্ডন করছেন। যদি জীবাত্মা আর শ্রীকৃষ্ণ অভিন্ন হন তাহলে তো বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের কোন অস্তিত্বই থাকবে না। কারণ বৈষ্ণব সম্প্রদায় দাঁড়িয়ে আছে এই একটি তত্ত্বের উপরে, আমি আর শ্রীকৃষ্ণ আলাদা। দ্বাদশ অধ্যায়ে ভগবান বলেছিলেন – *তেষামহং সমুদ্ধর্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ*, শ্রীকৃষ্ণ বলছেন আমার ভক্তকে আমি এই জন্ম-মৃত্যু চক্র থেকে উদ্ধার করি। তাহলে আমি আর শ্রীকৃষ্ণ অভিন্ন কি করে হলাম? এই প্রশ্নের উপর এখনও বিরাট তর্ক এখনও চলছে। আমাদের হিন্দুধর্মের তৎকালীন যত দর্শন ও মত ছিল, তার প্রধান প্রধান মূল বিষয়গুলো এইখানে উত্থাপন করা হচ্ছে। সেগুলোকে আচার্য এক এক করে খণ্ডন করেছেন। শঙ্করাচার্যের যুক্তিগুলিকে বিরোধীরা আবার খণ্ডন করছে, সেগুলোরও আচার্য আবার উত্তর দিচ্ছেন। সেইজন্য এই ১৩/২ এর শ্লোকটি অত্যন্ত দুর্বোধ্য। প্রত্যেকটি দর্শনের উপর অগাধ দখল না থাকলে এর যুক্তিতর্ককে বোধগম্য করা যায় না।

পুরো ভাষ্যে না গিয়ে আমরা আচার্যের ভাষ্যের কয়েকটি মূল বিষয়ের মধ্যে আলোচনাকে সীমাবদ্ধ রাখছি। আমাদের শরীরে যে আত্মা আছেন সেই আত্মা যদি শ্রীরামকৃষ্ণই হন বা আল্লাই হন বা গড হন তাহলে দর্শনের দিক থেকে কি কি সমস্যা হতে পারে? আচার্য যখন বললেন আমার ভেতরে যে আত্মা আছেন, সেই আত্মা আর শ্রীকৃষ্ণ অভিন্ন। এই কথা শোনার পর আচার্যের বিরোধীরা তুলোধুনো করতে শুরু করবে এটাই স্বাভাবিক।

বিরোধীরা যে যুক্তি গুলো আচার্যের বক্তব্যের বিরুদ্ধে নিয়ে আসেন তার মধ্যে একটি হচ্ছে, আমার জীবাত্মা আর সবার জীবাত্মা আলাদা। আচার্যও বলছেন তোমরা ঠিকই বলছ, তাহলে গীতার এই শ্লোকে ভগবান বলছেন শ্রীকৃষ্ণই জীবাত্মা, না এটাও ঠিক বলছে, কিন্তু একটা জায়গায় তফাৎ আছে। এই জীবাত্মা আর তার জীবাত্মার মধ্যে একটু তফাৎ আছে। কোথায় তফাৎ আছে? বলছেন জ্ঞান ও অজ্ঞানের তফাৎ। যতক্ষণ তুমি অজ্ঞানে আছে, যতক্ষণ তোমার দেহবোধ আছে, তোমার মন আছে এই বোধ আছে তখন আমি আলাদা তুমি আলাদা। কিন্তু সমাধিতে যখন তোমার জ্ঞান হয়ে যাবে তখন তুমি দেখবে তুমিও যা আমিও তা। শ্রীশ্রীলীলাপ্রসঙ্গে এই প্রসঙ্গটা অনেক বার ঘুরে ঘুরে আলোচনা করা হয়েছে। আচার্যের যারা বিরোধী তারা তখন বলবেন – না না, জ্ঞান অজ্ঞান দিয়ে এত সহজে বললে হবে না। আমার ভেতরে যে জীবাত্মা আছে সে যদি শ্রীকৃষ্ণ হন তাহলে আগের জন্মেও এই জীবাত্মা শ্রীকৃষ্ণই ছিলেন, যদি তাই হয় তাহলে আগের জন্মে আমি যখন মরেছিলাম তখন শ্রীকৃষ্ণ সংসারী হয়ে গেলেন। জন্ম-মৃত্যুর মাধ্যমে জীবাত্মা যে একবার উপরে আর নীচে যাতায়াত করছে তাহলে ভগবানই জন্মাচ্ছেন আর মরছেন। তবে তো ভগবান সংসারী হয়ে গেলেন, এর ফলে তো বিরাট সমস্যা হয়ে যাবে। আপনি যে বলছেন ভগবানই আমাদের সবার অন্তর্যামী, তাহলে পুনর্জন্ম কার

হচ্ছে? মৃত্যুর পর দেহের এখানেই বিনাশ হয়ে গেল, জীবাত্মাই জন্ম নিচ্ছে, আর আপনি বলছেন জীবাত্মা আর ভগবান এক, তার মানে ভগবান জন্মাচ্ছেন আর মরছেন, এতে তো ভগবান সংসারী হয়ে যাবেন। দ্বিতীয় আপত্তি আনছেন যে, ভগবানই যদি সব কিছু হন তাহলে তো সংসারের অভাব হয়ে যাচ্ছে, সংসার বলে তো কিছু থাকবে না। তৃতীয় আপত্তি আরও গুরুতর, বলছেন বেদান্তের সমস্ত শাস্ত্র বলে যাচ্ছে তুমিই সেই ব্রহ্ম, আমি যদি সাক্ষাৎ শ্রীরামকৃষ্ণ হই, তাহলে মুক্তিটা কার হবে? যিনি ভগবান তাঁর আবার মুক্তি কি, যিনি ভগবান তাঁর আবার বন্ধনই বা কিসের। তাই হলে ভগবানের কোন বন্ধনের প্রশ্নই আসবে না, আর তার ফলে সর্ব শাস্ত্র মিথ্যা হয়ে যাবে। কারণ শাস্ত্রই বন্ধন থেকে মুক্তির দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য সমস্ত তত্ত্বকে হাজির করাচ্ছে। ভগবানই যদি সব কিছু হয়ে থাকেন তাহলে তো কারুর বন্ধন বলে কিছু নেই, আমরা কেন তাহলে গীতা, উপনিষদ পড়তে যাব, আমাদের তো কোন বন্ধনই নেই। বন্ধন যখন নেই তাহলে মুক্তিরও কোন প্রশ্ন আসবে না। আমরা সবাই শাস্ত্র পড়ছি মুক্তি কি করে হবে তার জন্য, কিন্তু সবাই যদি শ্রীকৃষ্ণ হন তাহলে মুক্তির সাধনা করার কোন দরকারই নেই, শাস্ত্র অধ্যয়ণেরও কোন প্রয়োজন নেই। এইভাবে আচার্য শঙ্করকে তাঁর বিরোধীরা আক্রমণ করেছে।

এরপর আচার্য একটার পর একটা প্রশ্নের উত্তর দেবেন। আচার্য যেমন যেমন উত্তর দেবেন বিরোধীরাও তেমন তেমন ভাবে আবার আক্রমণ করবে, ছাড়বে না কিছুতেই। শঙ্করাচার্যের গীতা ভাষ্যে প্রায় চোদ্দ পাতা ধরে এই যুক্তি তর্কের লড়াই চলেছে। শঙ্করাচার্য চোদ্দশ খ্রীস্টাব্দে এই ভাষ্য রচনা করে গেছেন কিন্তু এখনও তাঁর ভাষ্যকে নিয়ে বিতর্ক চলে আসছে, এখনও যুক্তির লড়াই শেষ হয়নি। আমাদের বুদ্ধি অতি সাধারণ স্তরের হওয়াতে আমরা শাস্ত্রের সূক্ষ্ম জিনিষ গুলিকে ধরতে পারিনা। শাস্ত্রের সূক্ষ্ম বিষয় গুলোর উপর বুদ্ধির অনুশীলন ছোটবেলা থেকেই শুরু হওয়া উচিৎ, একটা বয়সের পর এগুলোকে ধারণা করা অসম্ভব।

আচার্য শঙ্কর বলছেন – তোমরা যে আপত্তি গুলো করেছ এতে কোন দোষ নেই, আপত্তি গুলো ঠিকই করেছ। কিন্তু জ্ঞান আর অজ্ঞানই সব কিছুকে তফাৎ করে দিচ্ছে। যিনি জ্ঞানী পুরুষ, সমাধিবান পুরুষ তিনি দেখছেন, জন্ম-মৃত্যু বলে কিছু নেই, ধর্ম অধর্ম বলে কিছু নেই, পাপও নেই পূণ্যও নেই। সেইজন্য বলছেন *ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে*। চিনি দিয়ে যখন খেলনা বানান হয় তখন সব খেলনাগুলোর সবটাই চিনি। যে খেলনাটাই মুখে দিই না কেন, সবটাই মিষ্টি লাগবে, কারণ এতে চিনি ছাড়া আর কিছু নেই। কালী মন্দিরে যখন জয় মা কালী বলে বলি দেওয়া হচ্ছে তখন ঠাকুর সাক্ষাৎ দেখছেন যে, যে পাঠাকে বলি দেওয়া হবে সেটাও সচ্চিদানন্দ, যে খুটিতে বাঁধা হয়েছে সেটাও সচ্চিদানন্দ, খড়্গটাও সচ্চিদানন্দ, আর যে বলি দিচ্ছে সেও সচ্চিদানন্দ। বলির পর পাঠাটা মরে যখন আবার জন্ম নেবে সেটাও সচ্চিদানন্দই। তাহলে কে কোথায় যাচ্ছে? সচ্চিদানন্দ সচ্চিদানন্দেই আছেন, কেউ কোথাও যাচ্ছে না। তাহলে সচ্চিদানন্দ কি করে সংসারী হলেন? সংসারী মানে যার আসা-যাওয়া আছে, নড়াচড়া আছে, কিন্তু এখানে তো কোথাও আসা যাওয়া হচ্ছে না, সচ্চিদানন্দ ছাড়া তো কিছুই নেই। তাই তোমরা যে কথাগুলো বলছ এগুলো সব অজ্ঞানের থেকে বলছ। আর অজ্ঞানে আর জ্ঞানে এই তফাৎ হচ্ছে বলে এই রকম আসা-যাওয়া, নড়াচড়া সব দেখায়। যে অজ্ঞানী তার দৃষ্টিতে এগুলোকে সব সত্যি বলেই মনে হবে, কিন্তু জ্ঞানীর কখন এই রকম হবে না। এখানে যেটা বলা হচ্ছে এটা জ্ঞানের উপলব্ধির উপর দাঁড়িয়ে বলা হচ্ছে।

এখানে পুরো আলোচনটা হচ্ছে জ্ঞাতাকে নিয়ে। জ্ঞাতা মানে যিনি জানছেন, আমি এই জিনিষটাকে জানছি, এই জানাটা চৈতন্য দিয়ে হচ্ছে। আমরা যাকে মন বলে জানছি, এই মন হচ্ছে একটি জড় পদার্থ, ঠিক এই বোতলের মতই। চৈতন্যের আলো যখন এই মনের উপর প্রতিফলিত হয় তখন মনটাও যেন আলোকিত হয়ে ওঠে। আমরা অজ্ঞানী, আমরা নিজেকে আমাদের মনের সঙ্গে একাত্ম করে নিয়েছি। কর্তাপণ, ভোক্তাপণ এগুলো কখন ঈশ্বরের হতে পারেনা। তাহলে এগুলো কার? যে মনের সাথে, দেহের সাথে নিজেকে জুড়ে দিয়ে দেহ মনের সাথে একাত্ম হয়ে আছে। আমি মন, আমি দেহ যে ভাবছে তারই কর্তাপণ আর ভোক্তাপণ। তাহলে কর্তাপণ ভোক্তাপণটা কে? ঠাকুর বলছেন কাঁচা আমি। কাঁচা আমিটাই মায়া। এইখানে এনারা একটা উপমা নিয়ে আসেন। খুব ঠাণ্ডা জল এই গ্লাশে রাখা আছে, একটা তপ্ত লোহার টুকরোকে এখন এই গ্লাশের মধ্যে ফেলে দিলে গ্লাশের জল গরম হয়ে যাবে আর লোহার টুকরোটা ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। শুদ্ধ আত্মাও কোন কিছুতেই থাকেন না, কোন কাজই করবে না, চৈতন্যের এটাই স্বভাব। কিন্তু যখনই শুদ্ধ চৈতন্য প্রকৃতির কাছে চলে আসে তখন প্রকৃতি নৃত্য করতে শুরু করে দেয়। চৈতন্যও প্রকৃতির নৃত্য দেখে হতবাক হয়ে যায়। হতবাক হয়ে চৈতন্য তাঁর স্বরূপকে ভুলে যায়। ভুলে গিয়ে চৈতন্য প্রকৃতির নৃত্য দেখে মনে করে আমিই নাচছি। কর্তাপণ, ভোক্তাপণ, জ্ঞাতাপণ এগুলো আসলে প্রকৃতির। কিন্তু চৈতন্য মনে করছে যে এগুলো সবই আমার। আমি ট্রেনে বসে আছি ট্রেন চলছে না, পাশ দিয়ে একই দিকে আরেকটা ট্রেন চলে গেলে মনে হবে আমার ট্রেনটা পেছনের দিকে চলতে শুরু করেছে। এইটাই মায়া। পুরুষ ও প্রকৃতির ক্ষেত্রে ঠিক এইটাই হয়। পুরুষ মানে আত্মা যিনি সে চুপ করে বসে আছে, কিছুই করছে না, কিন্তু প্রকৃতি তার নাচ নেচে যাচ্ছে। প্রকৃতির সেই নাচ দেখতে দেখতে পুরুষ আস্তে আস্তে মুগ্ধ হয়ে যায়। পুরুষ একই জায়গায় বসে থাকে একটুও নড়াচড়া করছে না এইবার প্রকৃতি যখন অন্য দিকে চলে যায় পুরুষ মনে করছে সেও ওখানে চলে গেছে, প্রকৃতি যখন এই দিকে আবার চলে আসে পুরুষ মনে করছে সেও এখানে চলে এসেছে। পুরুষ সব সময় শুধু এই রকমই মনে করে যাচ্ছে।

শাস্ত্র বলে প্রকৃতি এই নাচ কখনই বন্ধ হবে না, কিন্তু তুমি বুঝে নাও তুমি আর প্রকৃতি শুধু আলাদাই নও, তোমরা দুজনেই বিপরীত ধর্মী, প্রকৃতির সাথে তোমার কোন সম্পর্কই নেই। যেমন একজন রাজপুত্র আর এক ভিখারীর মেয়ে, এরা দুজনে বলছে আমরা বিয়ে করব। সবাই বলছে তোমরা বিপরীত ধর্মী, এই বিয়ে হতে পারেনা। না, আমি ওকে ভালোবাসি, আমি আর ও এক। এখন রাজপুত্রকে যতই বোঝান হোক সে কিছুতেই বুঝতে চাইবে না। পুরুষ ও প্রকৃতি ঠিক তাই, এমন ভালোবাসা পুরুষ প্রকৃতিকে দিয়ে দেয় যে প্রকৃতির সাথে নিজেকে অভিন্ন মনে করে। প্রকৃতি কি পুরুষের জন্য নেচে যাচ্ছে, প্রকৃতির ভারি বয়ে গেছে, সে নিজের আনন্দে নিজের মত নেচে যাচ্ছে। কিন্তু পুরুষ মনে করছে যে প্রকৃতি আমার জন্যই নাচছে। এই ধরণের নানান উপমা দিয়ে আলোচনা আগেও অনেকবার করা হয়েছে, কিন্তু মূল বক্তব্য একটা দিকেই নিয়ে যাবে, সেটা হল – পুরুষ হচ্ছে চৈতন্য, সেই চৈতন্য আর সচ্চিদানন্দ এক। আমার আপনার ভেতরে যে চৈতন্য তিনিই সেই পূর্ণব্রহ্ম সচ্চিদানন্দ, এইটাই হল আচার্য শঙ্করের অভিমত।

বেদান্ত মত বলতে আমরা এখানে আচার্য শঙ্করের মতকেই মনে করছি, কিন্তু বেদান্ত মতের মধ্যে রামানুজ ও মাধ্বাচার্যের মতকেও যুক্ত করা হয়। আচার্য শঙ্করও বলছেন, সিদ্ধান্ত যাই হোক না কেন, কিন্তু ব্যবহার যেটা হচ্ছে অর্থাৎ যেটা চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি, এটাকে কখনই অস্বীকার করা যাবে না। এই কারণে বেদান্তে দুই ধরণের সত্তাকে গ্রহণ করা হয় – (১) পারমার্থিক সত্তা ও (২) ব্যবহারিক সত্তা। ব্যবহারিক সত্তা বলতে আমি এই মুহুর্তে যা দেখছি, আমি আপনি সবাই আলাদা। কিন্তু পরমার্থত তা নয়, পারমার্থিক সত্তাতে কোন ভেদ নেই, তিনিই আছেন, তিনি ছাড়া আর কিছু নেই। ব্যবহার কালে এই অভিন্নতটা থাকে না, তখন এটা পাল্টে যায়। আচার্য শঙ্কর যেটা বারে বারে বলছেন, তোমার যে ব্যবহারিক সত্তা আছে সেটাকে অতিক্রম করে তুমি পারমার্থিক সত্তাতে উঠে এস, তাহলে জাগতিক ব্যাপারে যে দুঃখ-যন্ত্রণা আছে সেটাতে তুমি আর কষ্ট পাবে না।

তোমরা যে প্রশ্ন করছ, সবই যদি ঈশ্বর হন তাহলে মুক্তির আর কি দরকার, শাস্ত্রেরই বা আর কিসের প্রয়োজন, আমিই যদি শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীরামকৃষ্ণ হই তাহলে সাধনার করার কি দরকার। আচার্য বলছেন, তোমাদের এই প্রশ্ন করার অধিকারই নেই, কারণ তোমার অজ্ঞান এখনও দূরীভূত হয়নি, তুমি এখনও ব্যবহারিক সত্তাতে আছে। যত দিন তুমি ব্যবহারিক সত্তাতে থাকবে তত দিন তোমাকে সব কিছু মানতে হবে, শাস্ত্র মানতে হবে, বন্ধন ও মুক্তিকে মানতে হবে, পূজো অর্চনা মানতে হবে। কিন্তু তুমি যদি জিজ্ঞাসা কর আসল সত্যটা কি তখন বলতে হবে অদ্বৈতই আসল সত্য। অদ্বৈত মানে ঈশ্বর ছাড়া আর কিছু নেই, তিনিই একমাত্র আছেন। তাহলে ব্যবহারিক কি করে হয়ে যাচ্ছেন? বলছেন, এটাই মায়া, মায়াতে ব্যবহারিক মনে হয়। এই মায়াটা কার? ভগবানরই মায়া। তিনি তাঁরই মায়া দিয়ে আসল জিনিষটাকে ঢেকে দিয়ে সেই জিনিষটাকে নতুন করে অন্য একটা জিনিষ দেখিয়ে দিচ্ছেন। বেদান্তীরা এটাকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সমুদ্র আর ঢেউয়ের উপমা নিয়ে আসেন। সমুদ্র এক, সমুদ্রের উপর ঢেউ উঠছে, ঢেউয়ের সমুদ্র নয়, সমুদ্রের ঢেউ। কোনটা বড় ঢেউ কোনটা ছোট ঢেউ, সমুদ্র থেকে ঢেউ উঠে আবার সমুদ্রেই মিলিয়ে যাচ্ছে। যদি ঢেউ রূপে দেখি তখন সব ঢেউই আলাদা আলাদা, কিন্তু ঢেউকে যখন জলরাশি রূপে দেখি তখন সবটাই এক। আমি আর আপনি নাম রূপে দুজন আলাদা, মানুষ রূপে আমরা এক। আচার্য এইটাই বলছেন, পরামার্থ সত্যের দিক থেকে আমরা সবাই এক, কিন্তু ব্যবহার সত্তাতে দুই এসে যাবে। ব্যবহার সত্তাটাই অজ্ঞান। অজ্ঞান হচ্ছে যেখানে আমি আমার মনটাকে শরীর, ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি ইত্যাদির সঙ্গে জুড়ে রেখেছি। যখন এগুলো থেকে মনটা সরে আসবে তখন দেখতে পাব যে, এরা নিজের মত নাচানাচি করে, এরাতো আমার কথা মত চলে না, অকারণে আমি এদের সঙ্গে এক হয়ে কেঁদে মরছি।

ছোট গল্পের জনক হচ্ছেন ফরাসীর বিখ্যাত লেখক মোঁপাসা। একটি ছোট গল্পে দেখাচ্ছেন এক অতি সাধারণ মধ্যবিত্ত স্বামী-স্ত্রী। স্ত্রীর একবার সখ হল গয়না পড়বে। বড়লোক এক আত্মীয়ের পার্টিতে নিমন্ত্রনে যাবে বলে তার এক অবস্থাপন্ন বন্ধুর স্ত্রীর কাছ থেকে একটা মুক্তোর নেকলেস ধার করে নিয়ে এসেছে। খুব দামী আর সুন্দর নেকলেস পড়ে মহিলা পার্টিতে গেছে, মুক্তোর নেকলেসে মহিলাকে খুব সুন্দর দেখাচ্ছিল, মহিলাও খুব খুশি, সবার সাথে নাচ করে খুব আনন্দও পেয়েছে। বাড়িতে ফিরে নেকলেসটিকে যত্ন করে তুলে রেখে ঘুমিয়েছে। সকাল বেলা নেকলেসটি বন্ধুর স্ত্রীর কাছে ফেরত দিতে যাবে সময় দেখে যেখানে নেকলেসটি রেখেছিল সেখান থেকে সেটি চুরি হয়ে গেছে। দুজনেই খুব মুষড়ে পড়েছে, স্ত্রী খুব কান্নাকাটি শুরু করেছে। যার কাছ থেকে এনেছিল তাকে তো সেটা ফেরত দিতে হবে। কোথা থেকে এত টাকা পাবে যে এত দামী একটা মুক্তোর নেকলেস কিনে ফেরত দেবে, এদের আর্থিক ক্ষমতার বাইরে। স্বামী-স্ত্রী দুজনে মিলে ঠিক করে ওদের ঘরবাড়ি বিক্রী করে দিল, বিক্রী যা টাকা হল তার সাথে আরও অনেক টাকা ধার করে ঠিক ঐ রকম একটা নেকলেস কিনে বন্ধুর স্ত্রীকে ফেরত দিয়ে এসেছে। তারা এত বড়লোক যে খুলেও দেখেনি কি ফেরত দিল – ও, নেকলেসটা নিয়ে এসেছ, বলে বাক্সটা আলমারীতে তুলে রেখেছে।

এরপর এরা দুজন যে ভদ্র সমাজে বাস করত, সেই এলাকার বাসস্থান ছেড়ে দিয়ে একটা নোংরা বস্তিতে গিয়ে থাকতে শুরু করেছে। অত দেনা মাথার উপর। এইভাবে আট-দশ বছর তাদের খুব কষ্টের মধ্যে দিন কাটিয়ে সব দেনা শোধ করা হয়ে গেছে। এরপর একদিন তারা ঠিক করল সেই বড়লোক বন্ধুর বাড়িতে একবার দেখা করে আসি, অনেকদিন কোন খোঁজও নেওয়া হয়নি।

বন্ধুর বাড়িতে যাওয়া পরই তার স্ত্রী এদের দুজনকে দেখে বলছে, আরে তোমাদের কত দিন দেখিনি, কি ব্যাপার বলতো, এত বছর তোমরা কোথায় ছিলে? তখন সেই ভদ্রলোক বলছ যে – না, তেমন কিছু নয়, একটা অঘটন ঘটে গিয়েছিল। কথা বলতে বলতে তখন তারা মনে করিয়ে দিল যে – আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে আমরা একবার আপনার কাছ থেকে একটা মুক্তোর নেকলেস ধার করেছিলাম। ভদ্রমহিলা বলছেন – হ্যাঁ, হ্যাঁ মনে আছে, তাতে কি হয়েছে? না সেটা চুরি হয়ে গিয়েছিল বলে আমরা ঘরবাড়ি বিক্রী করে যা টাকা হয়েছে তার ওপর আরও অনেক ধারদেনা করে ঐ রকম আরেকটা নেকলেস কিনে আপনাকে ফেরত দিতে হয়েছিল বলে আমরা এই জায়গা ছেড়ে অন্য একটা কম দামের বাড়িতে বাস করছিলাম, তাই এত দিন দেখা হয়নি।

ভদ্রমহিলা তখন এদের দুজনকে জিজ্ঞেস করছে – কত টাকা দিয়ে ঐ নেকলেসটা কিনেছিলে? এই ধরুন প্রায় হাজার পাউণ্ড হবে। আরে, তোমরা একি করেছ, আমি তোমাদের যেটা দিয়েছিলাম সেটাতো ইমিটেশন গয়না ছিল, ওর দাম তো অতি নগণ্য। যেটা চুরি হয়েছিল সেটার দাম ছিল হয়তো পাঁচ ডলারের আর এরা মনে করেছে পাঁচ হাজার ডলারের। আর তারপর এরা টাকা ধার করে, বাড়ি বিক্রী করে, দশ বছর চোখের জল ফেলে কষ্ট করে দেনা শোধ করে গেছে। এই হচ্ছে মায়া।

কিছুই নয়, কিন্তু সেটাকেই আমরা বিরাট কিছু মনে করে রেখেছি, আর তার পেছনে যোগান দিতে গিয়ে আমার প্রাণ দিয়ে দিচ্ছি, নিজের শান্তি, আনন্দ সব বিসর্জন দিয়ে দিচ্ছি। যে মুহূর্তে আমি জেনে যাই যে এটি অতি নগণ্য তাৎপর্যবিহীন, তখন আফশোষ করে মরি এই একটা সামান্য জিনিষের জন্য আমি এত দিন ধরে কেঁদে মরছিলাম! ছেলে বলছে ঐ মেয়ের জন্য প্রাণ দিয়ে দেব, যখন প্রাণ দিতে যাচ্ছে তখন দেখছে মেয়েটি অন্য একটি ছেলেকে মন প্রাণ দিয়ে বসে আছে, এইটাই মায়া। আগেকার দিনে স্বয়ম্বর সভা হতে, মেয়ের হাতে মালা তুলে দিয়ে বলে দেওয়া হত, তোমার সামনে এত সব পুরুষ রয়েছে তুমি যাকে পছন্দ করবে তার গলায় মালা পড়িয়ে দাও, তাকেই তুমি বিয়ে করবে। আমরা সবাই কিন্তু তাই, আমরাও হাতে মালা নিয়ে ঘুরছি স্বয়ম্বর করবার জন্য, এখন আমি যাকে বরণ করবে আমার জীবন সেই রকমই চলবে। আমরা বরণ করছি দেহকে, ইন্দ্রিয়কে, মনকে, বুদ্ধিকে, অহঙ্কারকে, তারপর তাদের সাথে কখন কাঁদছি, কখন হাসছি, কখন মরছি। শাস্ত্র বলছে, আরে বুদ্ধু তুমি কাকে বরণ করেছ, এগুলোকে ছাড়, এখন ভারতে ডিভোর্স মামলার সুযোগ এসে গেছে, আগেকার দিনে এই সুযোগ ছিল না, তুমি এখন এই মামলার সুযোগ নিয়ে এদেরকে ডিভোর্স দাও। ডিভোর্স দিয়ে তুমি কাকে বরণ করবে? নতুন মালা নিয়ে আত্মাকে সেই মালাটা পড়িয়ে দাও। তখন তোমার শোক, মোহ, দুঃখ, কষ্ট সব চিরন্তন রূপে মিটে যাবে। আমাদের যত বেদান্তের শাস্ত্র আছে তার সার বক্তব্য এইটাই। তোমার হাতে স্বয়ংম্বরের মালা আছে, এখন তোমার সামনে তোমার দেহ, মন, ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি, অহঙ্কার এরা আছে আর এক ধারে আত্মা আছেন, এবার তুমি ঠিক কর তুমি কার গলায় মালা দেবে। যদি আত্মাকে ছেড়ে বাকী যারা আছে তাদের গলায় মালা দাও তাহলে কত জীবন যে তোমাকে কাঁদতে হবে তুমি ধারণাই করতে পারবে না। আর যদি তুমি এই মালা আত্মার গলায় দিয়ে আত্মাকে বরণ করে নাও তাহলে চিরতরে তুমি সমস্ত দুঃখ-কষ্ট, পাপ-পূণ্য, জন্ম-মৃত্যুর পারে চলে যাবে।

আত্মাটা কে? তুমিই সেই আত্মা। কিন্তু তুমি মনে করছ আমি শরীর, আমি মন, আমি ইন্দ্রিয়, আমি অহঙ্কার, আমি বুদ্ধি, আর এই ভেবে তুমি জন্ম জন্ম কেঁদে ভাসাচ্ছ। বেদান্তের মূল বক্তব্য এইটাই, এই বক্তব্যটাই এখানে ভগবান অর্জুনকে বলতে চাইছেন। এই অধ্যায়ের নাম ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞযোগ, ক্ষেত্র কি আর ক্ষেত্রজ্ঞ কি, এই দুটো জিনিষকেই আলোচনাতে রাখা হয়েছে, ক্ষেত্র হচ্ছে জড় পদার্থ আর ক্ষেত্রজ্ঞ হচ্ছেন আত্মা বা যিনি জানছেন, এই দুটো জিনিষ আর তার তত্ত্ব নিরুপণ চলছে। তারপর বলছেন –

**তৎ ক্ষেত্রং যচ্চ যাদৃক্ চ যদ্বিকারি যতশ্চ যৎ। স চ যো যৎপ্রভাবশ্চ তৎ সমাসেন মে শৃণু**।।৩।।

শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলছেন – আমি তোমাকে আগে ক্ষেত্র, ক্ষেত বা শরীর এর স্বরূপটা কি, এর উপাদান গুলো কি, কিভাবে বিকার যুক্ত হচ্ছে, এর স্বভাব কি, এর বৈশিষ্ট্য কি সব পরিষ্কার করে বিশ্লেষণ করে দেখাব। ক্ষেত্রকে বিশ্লেষণ করার পর আমি তোমাকে ক্ষেত্রজ্ঞ স্বরূপতঃ যা সেটাকে বুঝিয়ে দেব। শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, এই যে তত্ত্বগুলো আমি তোমাকে বলতে যাচ্ছি এগুলো কোনটাই আমার নিজের কোন মনগড়া বানান কথা নয়। শ্রীকৃষ্ণ বলছেন এগুলো তাঁর কথা নয়, তাহলে কার কথা? আমরা এর আগেও সত্যের তিনটি পরীক্ষা নিয়ে আলোচনা করেছি। একটা জিনিষকে যে সত্য বলছি, এখন এটা সত্য কিনা কিভাবে বুঝতে পারব, এর তিনটে পরীক্ষা হয় – শ্রুতি, যুক্তি ও অনুভূতি। শ্রুতি হচ্ছে পরম্পরা, আমি যেটাকে সত্য বলে মনে করছি তার কথা বেদে আছে কিনা, যদি বেদে থাকে তাহলে সত্য বলে মেনে নিতে কোন দ্বিধা থাকবে না। বিচারকরা যখন বিচার করেন তখন তাঁরা দেখেন এর আগের আগের ক্ষেত্রে এই রকম ঘটনাতে কি রায় দেওয়া হয়েছিল, তারপর দেখেন এই ব্যাপারে আইন কি বলছে, আর আমাদের কাছে ঘটনার যা নথিপত্র আছে তাতে কি বলা হচ্ছে। এই তিনটে যখন মিল হবে তখনই বিচারক তাঁর রায় দেন।

আধ্যাত্মিক দর্শনের ক্ষেত্রেও ঠিক এইভাবে বিচার করে একটা তত্ত্বকে সত্য বলে গণ্য করা হয় – শ্রুতি, যুক্তি ও অনুভূতি। শ্রুতি মানে বেদ, বেদে এটা আছে কিনা, পরম্পরাতে এর আগে এটাকে রাখা হয়েছি কিনা। আর কথাটা যুক্তিযুক্ত কিনা। যেটা বলা

হয়েছে সেটা বাস্তব অনুভূতিতে উপলব্ধ হয়েছে কিনা। শ্রীকৃষ্ণও অর্জুনকে ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের ব্যাপারে যা কিছু বলতে যাবেন সেটা এই শ্রুতি, যুক্তি ও অনুভূতিতে আগেই পরীক্ষিত হয়ে গেছে, এটাই পরের শ্লোকে বলছেন –

**ঋষিভির্বহুধা গীতং ছন্দোভির্বিবিধৈঃ পৃথক্। ব্রহ্মসূত্রপদৈশ্চৈব হেতুমদ্ভির্বিনিশ্চিতৈঃ।।৪।।**

আমি তোমাকে যা বলতে যাচ্ছি, *ঋষিভির্বহুধা গীতং,* বশিষ্টাদি বড় বড় যে প্রসিদ্ধ ঋষিরা ছিলেন তাঁরা ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের ব্যাপারে ঠিক এই ভাবেই বর্ণনা করে গেছেন, *ছন্দোভির্বিবিধৈঃ পৃথক্,* ঋগ্বেদাদিতে আর বেদচতুষ্টয়ের বিভিন্ন শাখাতে, বিভিন্ন ছন্দের দ্বারা এই তত্ত্বের বর্ণনা করা হয়েছে, *ব্রহ্মসূত্রপদৈশ্চৈব,* উপনিষদে যে ব্রহ্মপদবাক্যম্ কথাগুলো আছে সবটাই যুক্তিতে প্রতিষ্ঠিত, *হেতুমদ্ভির্বিনিশ্চিতৈঃ,* যখন তুমি এটাকে চিন্তা করবে তখন তুমি পরিষ্কার বুঝতে পারবে যে পুরো ব্যাপারটা যুক্তিযুক্ত, তোমার কোন সন্দেহই থাকবে না। যেদিক থেকেই তুমি দেখো না কেন, বেদে এই কথা গুলো আছে, ঋষিরা এই রকমই দর্শন করেছেন, উপনিষদে এই কথাগুলো আছে, আর এর সব কটা সিদ্ধান্তগুলো যুক্তিতে দাঁড়িয়ে আছে। আমি বলছি বলেই তুমি মেনে নিও না। তুমি তাহলে কেন মানবে? কারণ এই কথা গুলো বেদে আছে, ঋষিরা এই জিনিষগুলো অনুভব করেছেন, উপনিষদে যেখানে যেখানে ব্রহ্মপদবাক্যম্ আছে সেখানে এই কথাগুলো আছে আর এর প্রত্যেকটি কথা যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, শ্রুতি, যুক্তি ও অনুভূতি এই তিনটিই এখানে এসে গেছে। সুতরাং আমি যা বলছি সবটাই সত্য।

অন্যান্য ধর্মের সাথে হিন্দুধর্মের একটা বিরাট মৌলিক পার্থক্য যে একটা অবস্থাতে হিন্দুধর্ম নিজের শাস্ত্রকেও ছাড়িয়ে যায়। উপনিষদেই বলছে – *তত্র বেদা অবেদা ভবতি*। যখন কেউ অনুভূতির ঐ স্তরে চলে যাবে তখন *তত্র বেদা অবেদা ভবতি*। যদি কোন মুসলমান বা খ্রীশ্চান বলে আমি কোরান বা বাইবেলকে ছাড়িয়ে গেছি, তাহলে তার জীবন সংশয় হয়ে যাবে। কিন্তু কোন সন্ন্যাসী যদি বলে আমি বেদকে ছাড়িয়ে গেছি তাহলে তাঁকে প্রণাম করবার জন্য ভক্তদের বিশাল লাইন পড়ে যাবে। কোন সন্ন্যাসীই বেদের মধ্যে আবদ্ধ নন, যতক্ষণ না বেদকে ছাড়িয়ে যাচ্ছে আধ্যাত্মিক রাজ্যে ততক্ষণ সে কিছুই নয়। শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, এখানকার অনুভূতি বেদ বেদান্তকে ছাড়িয়ে গেছে। তবে হ্যাঁ, তাঁর অনুভূতিকে বেদ বেদান্তে সংযুক্ত করে দেওয়া হবে। কিন্তু অনুভূতির বিষয়টা পাল্টাবে না, বেদবেদান্তকে অনুভূতি ছাড়িয়ে যাচ্ছে কিন্তু বাস্তবিক সত্তাকে কিভাবে ছাড়াবে। সচ্চিদানন্দই বস্তু আর বাকি সব অবস্তু, এই জিনিষটাকে কোন দিনই ছাড়িয়ে যাবে না। আমি যে শহরে থাকি সেই শহরের উপর যত বই লেখা হয়ে থাকুক, সব বইয়ের থেকে ঐ শহরের উপর জ্ঞান আমার বেশি থাকবে। প্রত্যক্ষ অনুভূতি যেটা সেটা পুঁথিগত জ্ঞান থেকে বেশি হতে বাধ্য। বেদ হচ্ছে আধ্যাত্মিক সত্যের বর্ণনা। যতক্ষণ না আমি অনুভূতির সেই চরম অবস্থাতে না গিয়ে থাকি ততক্ষণ বেদ হচ্ছে সর্বোপরি। শ্রীকৃষ্ণ এইটাই এইখানে বলছেন – আমি তোমাকে যে কথাগুলো বলতে যাচ্ছি এগুলো আমার চিন্তা ভাবনা থেকে বেরোয়নি, শ্রুতি, যুক্তি ও অনুভূতির পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। তারপরের শ্লোকে যা বলছেন এগুলো সপ্তম অধ্যায়েও আলোচনা করা হয়েছে –

**মহাভূতান্যহঙ্কারো বুদ্ধিরব্যক্তমেব চ। ইন্দ্রিয়াণি দশৈকঞ্চ পঞ্চ চেন্দ্রিয়গোচরাঃ।।৫।।**

ক্ষেত্র হচ্ছে যে যে জিনিষকে জানা যায়। কি কি জিনিষকে জানা যায়? প্রথমে আসছে প্রকৃতি, অব্যকৃত মূলা প্রকৃতির কথা বলা হচ্ছে, সবার উৎপত্তি যেখান থেকে হচ্ছে, সব কিছুর জননী, প্রকৃতি থেকে আসছে মহৎ, যাকে বলছে মহৎ বুদ্ধি, তার নীচে আসছে সমষ্টি অহঙ্কার, এই সমষ্টি অহঙ্কার থেকে আসছে পাঁচটি তন্মাত্রা, এই পাঁচটা তন্মাত্রা থেকে বেরিয়ে আসছে পঞ্চ মহাভূত। এই পঞ্চভূত থেকে তৈরী হচ্ছে *ইন্দ্রিয়াণি দশৈকঞ্চ,* দশটি ইন্দ্রিয়, আর মন। তাই মন আর চোখ বেদান্তের মতে পৃথক নয়, কিন্তু জড় বিজ্ঞানে মন আর চোখ সম্পূর্ণ আলাদা। বিজ্ঞানের মতে মন হচ্ছে চৈতন্য। কিন্তু বেদান্তের মতে মন জড়। তবে হাত পা থেকে চোখ যেমন বেশি মূল্যবান তেমনি অন্যান্য ইন্দ্রিয় থেকে মন অনেক বেশি মূল্যবান। এখানে মনে রাখা খুব দরকার যে, এই চোখ, কান, নাক ইত্যাদি এগুলো কিন্তু ইন্দ্রিয় নয়, এগুলো ইন্দ্রিয়ের যন্ত্র বা গোলক। আসল ইন্দ্রিয় আছে মস্তিস্কে যে নার্ভ সেন্টার আছে সেইখানে। এখন যে অন্ধ তার কটা ইন্দ্রিয় থাকবে? তখনও তার দশটা ইন্দ্রিয়ই থাকবে, কারণ বাইরের এই চোখের সাথে বেদান্ত যেগুলোকে ইন্দ্রিয় বলছে তার সাথে কোন সম্পর্কই নেই। আসল ইন্দ্রিয় মস্তিস্কে স্নায়ু কেন্দ্রে, মস্তিস্কের স্নায়ু কেন্দ্র তার দুর্বল থাকতে পারে বা সবল থাকতে পারে, কিন্তু একটা ইন্দ্রিয়ও বাদ যাবে না। আমাদের বাইরের এই চোখ কান হচ্ছে মাইক্রোস্কোপ আর টেলিস্কোপের মত। প্রকৃতি থেকে শুরু করে এই স্থূল জগৎ সবই হচ্ছে ক্ষেত্র। এখানেই ক্ষেত্র শেষ হয়ে যাচ্ছে না, এর পরেও আছে।

**ইচ্ছা দ্বেষঃ সুখং দুঃখং সংঘাতশ্চেতনা ধৃতিঃ। এতৎ ক্ষেত্রং সমাসেন সবিকারমুদাহৃতম্।।৬।।**

ক্ষেত্রের যে বিকার এগুলোও তোমাকে বলছি। আমাদের কিছু কিছু দর্শন আছে, বিশেষ করে নৈয়ায়িকরা মনে করেন এগুলো হচ্ছে আত্মার ধর্ম। এখানে গীতাতে এই মতকে অস্বীকার করা হচ্ছে। *ইচ্ছা,* ইচ্ছা হচ্ছে যখন কোন কিছু পাওয়ার বাসনা মনে জাগে। ইচ্ছা কোন্ ব্যাপারে জাগে? যে জিনিষটা পেয়ে আগে সুখ ও আনন্দ পেয়েছিল সেটাই মানুষ পেতে ইচ্ছে করে। যেটা পেয়ে দুঃখ কষ্টের অভিজ্ঞতা হয়েছে সেটাকে কেউ পেতে ইচ্ছে করে না। ইচ্ছা হচ্ছে মনের একটা অবস্থার রূপান্তর। মনের মধ্যে ইচ্ছা কেন

জাগছে? আমার এতে সুবিধা হবে। কোথাও যাওয়ার জন্য আমাকে একটা গাড়ি পাঠান হয়েছে, আমি খোঁজ করছি গাড়িতে এসি লাগান আছে কিনা। কেন খোঁজ নিচ্ছি, কারণ এসি গাড়িতে চাপলে আরামের সুবিধা আছে। আমার মনে বসে আছে যে এসিতে গেলে সুবিধা হয়, সেইজন্য আমার ইচ্ছা হয় ঐ সুখটুকু পেতে। *দ্বেষঃ,* দ্বেষ হচ্ছে ইচ্ছার ঠিক বিপরীত। যে জিনিষটা পেয়ে আমি কষ্ট পেয়েছিলাম সেই জিনিষটাকে আমি এড়িয়ে যাব, আমার কাছে সেই জিনিষটা যদি ফিরে আসে আমি তার থেকে সরে আসব। যে বন্ধুর থেকে আমি অনেক কষ্ট পেয়েছি, সে যদি আবার বন্ধুত্ব করতে আসে তখন আমি বলব – অনেক হয়েছে ভাই, তোমার মত বন্ধু আমার দরকার নেই। *সুখম্,* ইচ্ছা হচ্ছে আমি একটা জিনিষকে পেতে চাইছি, সেটাকে পাওয়ার পর যে আনন্দ হয় সেটাকে বলছে সুখম্। *দুঃখম্,* যে জিনিষটাকে আমি দ্বেষ করছি, সেটা এখন আমার কাছে এসে যাওয়াতে যে কষ্ট হচ্ছে সেটাকে *দুঃখম্* বলছে। *সংঘাতঃ,* সংঘাত হচ্ছে দেহ আর ইন্দ্রিয়ের সংঘাত, প্রাণীর শরীরে যেটা সব সময় হয়ে চলেছে, এখানে এই শরীরের কথা বলা হচ্ছে। *চেতনা,* মনের উপর আত্মা যখন প্রতিবিম্বিত হয় তখন মনটা ঝলমল করে ওঠে, তখন মনে হয় মনটাই যেন চৈতন্য হয়ে গেছে। আমরা এখানে যে কথা বলছি, কথা শুনছি, আমরা মনে করছি মন দিয়েই আমরা সব কিছু করছি, মনটাই যেন চৈতন্য, মনের চৈতন্য শক্তিতেই যেন সব কিছু হচ্ছে। কিন্তু বেদান্তে মন কোন ভাবেই চৈতন্য নয়, বেদান্তে চৈতন্য বলতে একমাত্র সচ্চিদানন্দই। এই যে চেতনাবোধ, বিজ্ঞান যাকে চৈতন্য বলছে, আমাদের কাছে এটা ক্ষেত্র। বেদান্ত আর বিজ্ঞানের মধ্যে এটি একটা বিরাট তফাৎ হয়ে যাচ্ছে। বেদান্তের মতে মন আর মনের সব কার্যই হচ্ছে জড়। সেইজন্য চৈতন্য আর চেতনা এই দুটো আলাদা শব্দকে তারা ব্যবহার করে। আসলে চেতনা হচ্ছে অনুভূতি, একটা বরফকে স্পর্শ করে আমার ঠাণ্ডা অনুভব হচ্ছে, এই অনুভূতি কে বিজ্ঞান বলছে চৈতন্য কিন্তু আমাদের কাছে এটা অনুভূতির চেতনা। চেতনাকে তাই আমরা ক্ষেত্রের মধ্যে রাখি, মানে প্রকৃতির বা জড়ের অন্তর্গত। *ধৃতিঃ,* মানুষ যখন কষ্ট পায়, দুঃখ পায়, তখন যে শক্তি দিয়ে শরীর, মন, ইন্দ্রিয়কে ধরে রাখে, সেই শক্তিকে বলছে ধৃতি। যেহেতু ধৃতি শরীর মন ইন্দ্রিয়ের মধ্যে পড়ছে সেইহেতু ধৃতিও ক্ষেত্রের মধ্যে গণ্য করা হয়।

অন্তঃকরণ বা মনের যত রকম উপাদান আছে, সবই সংক্ষেপে বলে দেওয়া হল। যেখান থেকে শরীর এসেছে সেগুলো সবই প্রকৃতি। শরীর প্রকৃতি, শরীরের যত ইন্দ্রিয় সব প্রকৃতি, মন প্রকৃতি, মনের যে বিভিন্ন অবস্থা, যেমন কিছু পাওয়ার ইচ্ছা, কিছু থেকে পালিয়ে যাওয়া, কিছু পেয়ে যে সুখ হচ্ছে, অপছন্দ কিছু পেয়ে দুঃখ, দুঃখ কষ্টের মধ্যেও যে শক্তি শরীর মন ইন্দ্রিয়কে ধরে রাখছে, এগুলো সংক্ষেপে বলে দিয়ে বলছেন এগুলো সবই ক্ষেত্রের অন্তর্গত। আমি খুব পড়াশোনা করতে ভালোবাসি, শাস্ত্র ছাড়া আমি আর কিছু পড়িনা সারাদিন শাস্ত্র নিয়েই পড়ে আছি, এটাও কিন্তু ক্ষেত্র। কারণ, এটাও ইচ্ছা। কি ইচ্ছা? শাস্ত্র পড়ব। আমার ইচ্ছে করে সারাদিন জপ করি, এটাও ক্ষেত্র। এগুলো উপর উপর অত বোঝা যায় না, ভেতরে ঢুকলে বোঝা যায় এগুলো কত জটিল ব্যাপার। এই ধরণের জটিল তত্ত্ব সব সময় আলোচনা করতে হয়, না হলে মাথা থেকে হারিয়ে যাবে। সেইজন্য আগেকার দিনের ব্রাহ্মণরা কুড়ি বছর পঁচিশ বছর ধরে দিনে একবেলা করে খুব সাধারণ ভাবে আহার করতেন, ব্রহ্মচর্য পালন করতেন, গুরুসেবা করতেন আর বাকি সময় শুধু শাস্ত্র অধ্যয়ণ করতেন। সেইজন্য ব্রাহ্মণদের এতো সম্মান করা হত। পাঁচ হাজার, ছয় হাজার বছরের একটা বিদ্যাকে এতদিন ধরে ব্রাহ্মণরা ধরে রেখেছিলেন, এই প্রজন্মে এসে আমরা এটাকে নষ্ট করতে বসেছি।

ক্ষেত্রর ব্যাপারে তো তোমাকে বোঝান হল, এবারে তোমাকে ক্ষেত্রজ্ঞের ব্যাপারে বলছি। ক্ষেত্রজ্ঞের ব্যাপারে, অর্থাৎ যিনি অন্তর্যামী তাঁর ব্যাপারে তোমাকে তো বলব কিন্তু তুমি বুঝবে কি? অন্তর্যামীকে বোঝার ক্ষমতা তো সবার হয় না? ক্ষেত্রের ব্যাপারে, মানে আমার দেহ আছে ইন্দ্রিয় আছে সেতো সবাই জানে, বিজ্ঞানীরাও জানে, একটা বাচ্চা ছেলেও জানে। কিছু হলেই বাচ্চা বলে – মা আজ আমার মন খারাপ, আমার শরীর খারাপ। শরীর, মনের ব্যাপার একটা বাচ্চাও জানে। শুধু শরীর মনের ব্যাপারে জেনে কি হবে, এইটুকু জানার জন্যই কি শুধু শাস্ত্র অধ্যয়ন করা? শুধু শরীর মনের ধর্মকে জানলে কেউ আধ্যাত্মিক বিজ্ঞানী হতে পারেনা। অন্তর্যামীর ব্যাপারে জানাটাই আসল জানা। অন্তর্যামীকে তোমার বোঝার ক্ষমতা যদি থাকে তবেই আমি তোমাকে বলব। অন্তর্যামীর ব্যাপারে কিছু শোনা বা ধারণা করার আগে তোমাকে কিছু যোগত্যা বা গুণাবলী অর্জন করতে হবে। কি সেই যোগ্যতা? তার জন্য তোমাকে কিছু গুণ অর্জন করতে হবে। এই গুণগুলো যদি তোমার মধ্যে থাকে তবেই তুমি ক্ষেত্রজ্ঞের ব্যাপারে কিছু জানার যোগ্য বলে বিবেচিত হবে। কি সেই গুণগুলো? ভগবান অর্জুনকে চারটে শ্লোকে এই গুণগুলোর বর্ণনা করছেন।

**অমানিত্বমদম্ভিত্বমহিংসা ক্ষান্তিরার্জবম্। আচার্যোপাসনং শৌচং স্থৈর্যমাত্মবিনিগ্রহঃ।।৭।।**

*মানিত্বম্* মানে আমি একটা বড় কিছু এই ভাব কিন্তু *অমানিত্বম্* হচ্ছে আমার মধ্যে অনেক ব্যাপারে উৎকর্ষতা আছে কিন্তু সেই ব্যাপারে আমার কোন আত্মশ্লাঘা নেই। *দম্ভ,* নিজের যে বিশেষত্ব সেটাকে জাহির করে বেড়ান, আমি একজন বড় ডাক্তার, আমি একজন বড় জ্যোতিষি। *মানিত্বমে* ভেতরেই থাকে কিন্তু প্রকাশ করে বেড়ায় না, দম্ভে প্রকাশ হয়ে যায়, এর উল্টো *অদম্ভ,* নিজের বিশেষত্বকে নিয়ে কাউকে কিছু বলতে যায় না। *অহিংসা* হচ্ছে মনের এক উচ্চ অবস্থা, কোন প্রাণীকেই সে কোন ভাবেই ক্লেশ দেয় না। *ক্ষমা,* আমার সামনেই যদি কেউ অপরাধ করে তাতে আমার মনে কোন বিকার হবে না। *আর্জবম্,* ঋজুতা, মনের মধ্যে কোন ধরণের প্যাঁচ নেই। *আচার্যোপাসনং,* আচার্যের, গুরুর সেবা, উপাসনা করে। *শৌচম্,* শরীর মন যদি খুব পরিষ্কার না থাকে তাহলে

কিন্তু আধ্যাত্মিক বিদ্যা আসবে না। শৌচের একটা প্রধান লক্ষণ হচ্ছে, যে বস্ত্র আজ পরিধান করেছি আগামীকাল সেই বস্ত্রকে ধৌত করে অন্য পরিষ্কার বস্ত্র পরিধান করতে হবে। এক কাপড় দুদিন পরিধান করা চলবে না। তোমার কাপড়, ঘরবাড়ি খুব সাফসুতরো থাকবে সাথে সাথে মনটাকেও পরিষ্কার রাখতে হবে। আধ্যাত্মিক জীবনে শৌচ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, রোজ নিয়মিত স্নান করা, কাপড় কাচা, সব কিছু গুছিয়ে রাখা খুব জরুরি। *স্থৈর্যম্*, দেহ মনের স্থির ভাব। অনেকে চুপচাপ বসে আছে কিন্তু অনবরত পা নাচাবে, হাত নাড়বে, মাথা চুলকাবে আর মনটা সব সময় নানান দিকে দৌড়াচ্ছে, এগুলোকে বন্ধ করে তোমার দেহ মনকে স্থির না করতে পারলে আধ্যাত্মবিদ্যার অধিকারী হতে পারবে না। *আত্মবিনিগ্রহঃ*, শরীর ও মনের যে স্বভাব ও প্রবৃত্তি সেখান থেকে টেনে আত্মার ধর্মে প্রতিষ্ঠিত করাকে বলা হয় *আত্মবিনিগ্রহঃ*, নিজের মধ্যে শান্তভাবকে অবলম্বন করা। শরীর মন যেটা চাইছে তাকে প্রশ্রয় দিয়ে অন্য দিকে তাদের অযথা যেতে না দেওয়া।

৩রা অক্টোবর ২০১০

ক্ষেত্র আর ক্ষেত্রজ্ঞের অত বিরাট আলোচনাকে আমাদের সাধারণ বুদ্ধিতে সহজ ভাবে বলা যেতে পারে ক্ষেত্র হচ্ছে জড় আর ক্ষেত্রজ্ঞ হচ্ছে চেতন, ইংরাজীতে যাকে matter & spirit বলছে। আর শরীরের আলোচনা করার পর দেখা যাচ্ছে যে, শরীরের যাবতীয় যা কিছু আছে সবই জড় পদার্থ। যার দ্বারা কোন জিনিষের বোধ হচ্ছে, কোন জিনিষকে জানা যাচ্ছে সেটা হচ্ছে চেতন। বাচ্চা যখন কোন কিছু দেখছে সে মনে করে আমার চোখ দেখছে, আবার বায়োলজিতে বলছে চোখ দেখছে না, চোখের পেছনে যে অপ্টিক নার্ভ আছে সেই দেখার কাজটা করছে। যখন নিউরোলজি, সাইকোলজিতে যাচ্ছে তখন বলছে মস্তিষ্ক এই দেখার কাজ করছে। কিন্তু যখন আধ্যাত্মিকতায় আসছে তখন বলা হচ্ছে, এরা কেউই দেখছে না, এদের সবের পেছনে এক চৈতন্য সত্তা আছেন, তিনি আছেন বলে সব কিছু বোধ হওয়া, জানা সম্ভব হচ্ছে। এই চৈতন্য সত্তা যদি না থাকেন তাহলে আমি যত কথাই শুনি, আমার চোখ যা কিছুই দেখুক না কেন, কোন কিছুকেই বোধ করতে পারবে না। যারা কোন কিছু একবার শুনেই চট করে বুঝে নিতে পারে তখন বুঝতে হবে তার মধ্যে চৈতন্য সত্তা খুব জাগ্রত, চৈতন্যের উপর যে আবরণ আছে সেটা খুব পাতলা। যারা মূঢ় বুদ্ধি সম্পন্ন তাদের চৈতন্যের উপর মোটা আবরণ পড়ে আছে।

গীতা দর্শনের কোন তত্ত্ব আলোচনাতে যাবে না, দর্শনের আলোচনা করা গীতার কর্ম নয়। শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে গিয়ে কেউ যদি বলত, আমাকে অমুক দর্শনটা একটু বুঝিয়ে দিনতো। ঠাকুর বলতেন – কে জানে বাপু, উগুনো আমার জানা নেই। ঠাকুরের কাছে যদি আধ্যাত্মিক কিছু প্রশ্ন নিয়ে যাওয়া হত তিনি তাঁর উত্তর দিয়ে দিতেন। দর্শনের আলোচনা অন্যরা করে, বিজ্ঞান, শিল্প, কলা, সাহিত্যে আলাদা আলাদা লোক ঠিক করা আছে তারাই এগুলো আলোচনা করে বুঝিয়ে দেবেন। গীতা দর্শনকে আলোচনা করে না, আধ্যাত্মিক তত্ত্ব আর সেই তত্ত্বে কিভাবে পৌঁছান যাবে তাকে নিয়ে গীতা আলোচনা করে। পরের দিকে ভাষ্যকাররা এসে দেখান গীতাতে যে আধ্যাত্মিক তত্ত্বের আলোচনা করা হয়েছে, সেই তত্ত্ব থেকে দর্শন কিভাবে বেরিয়ে আসছে। বিজ্ঞান বলে দেয় ক্ষেত্র বা জড়ের উপর কিভাবে প্রভুত্ব করতে হবে। বন্যাকে প্রতিরোধ করতে কিভাবে নদীর উপর বড় বড় বাঁধ বানাতে হবে, ঘরে ঘরে বিদ্যুত কিভাবে পৌঁছে দিতে হবে, শরীরের ব্যাধিকে কিভাবে প্রতিরোধ করতে হবে, এগুলো বিজ্ঞানের কাজ। কিন্তু ক্ষেত্রজ্ঞকে কিভাবে জানা যাবে সেটা আধ্যাত্মিকতা ছাড়া কেউ বলে দিতে পারবে না। এখন কেউ যদি কোন আধ্যাত্মিক পুরুষকে বলেন আমাকে ক্ষেত্রজ্ঞটা বুঝিয়ে দিন, আপনি বলছেন জীবাত্মা পরমাত্মার কোন ভেদ নেই, যিনি ভেতরে আছেন তিনিই সর্বব্যাপী নারায়ণ, আমাকে এগুলো বুঝিয়ে দিন। আধ্যাত্মিক পুরুষ তখন বলবেন, তোমাকে বাপু এখনতো বোঝান যাবে না, তার আগে তোমাকে যোগ্যতা অর্জন করতে হবে, যোগ্যাতা হচ্ছে তোমাকে কিছু গুণের অধিকারী হতে হবে। কি কি সেই গুণ? এর আগে আমরা এই গুণগুলির কিছু আলোচনা করেছিলাম, বাকিটা এখন বলা করা হচ্ছে।

**ইন্দ্রিয়ার্থেষু বৈরাগ্যমনহঙ্কার এব চ। জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধি-দুঃখ-দোষানুদর্শনম্।।৮।।**

আমাদের দশটি ইন্দ্রিয় সব সময় বিষয়ের প্রতি ধাবিত হয়ে চলেছে। চোখ সুন্দর দৃশ্য দেখতে চাইছে, কান ভালো সঙ্গীত শুনতে চাইছে, জিহ্বা রসনার প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে, ত্বক সুখদায়ক ও আরামদায়ক স্পর্শ চাইছে, শীতের সময় উষ্ণতা চাইছে আর গরমের সময় চাইছে ঠাণ্ডা ঘরে থাকতে। গীতা বলছে তুমি এই দশটি ইন্দ্রিয় থেকে নিজেকে পৃথক করে নাও, এরা তোমার চাকর, চাকরের কথা মত মালিক কখন চলে না, মালিকের আদেশকেই চাকরকে পালন করতে হয়। আসল কথা ইন্দ্রিয়ের সব কিছু থেকে তোমাকে বৈরাগ্য নিতে হবে। যেটা আসার আসছে, যেটা যাওয়ার চলে যাচ্ছে, কোনটাতেই আমি বিচলিত হচ্ছি না। তাই বলে শীতের সময় আমাকে খুব ঠাণ্ডা জলে স্নান করতে আর গরমের সময় কম্বল গায়ে দিয়ে ঘুরতে বলা হচ্ছে না। *অনহঙ্কার এব চ*, অভিমানরিহত্য, আমার মত পণ্ডিত নেই, আমার মত বিজ্ঞান কেউ জানে না, আমার মত দেখতে সুন্দর কেউ নেই, এই ধরণের অভিমানী অহঙ্কারীদের আধ্যাত্মিক পথে আসার কোন সম্ভবনাই নেই। আধ্যাত্মিক পুরুষ হতে গেলে কোন ধরণের অহঙ্কার থাকা চলবে না। *জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধি-দুঃখা-দোষানুদর্শনম্* - জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি এগুলোতে দোষ দর্শন করতে হবে। জন্ম হলে, মানে শরীর

ধারণ করলে কত রকমের কষ্ট। মৃত্যুতো আছেই কিন্তু মৃত্যুর আগেই কতক নরক যন্ত্রণা শরীরধারীকে ভোগ করতে হয়। জরা মানে বৃদ্ধ অবস্থা, শঙ্করাচার্য বলছেন – বৃদ্ধ হলে স্মৃতি শক্তি চলে যায়, সাথে সাথে প্রজ্ঞা শক্তি, বোধ শক্তি চলে যায় আর পরিবারের লোকরা কেউ আমল দেয়না, সবাই তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে। শঙ্করাচার্য নিজেও খুব অল্প বয়স বেঁচে ছিলেন। আচার্য তাঁর ষোল বছরের মধ্যেই সব কিছু রচনা শেষ করে রেখেছিলেন। মাত্র আট বছর বয়সে তিনি বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন, চার বছর সাধনা করে বারো বছর বয়সে সব সাধনা শেষ করলেন আর পরের চার বছরের মধ্যে গীতা, উপনিষদ, ব্রহ্মসূত্রের সব ভাষ্য লিখলেন। বাকি ষোল বছর ধরে সারা ভারত ব্যাপী ঘুরে ঘুরে তিনি অদ্বৈত বেদান্তের উপদেশ দিয়ে গেলেন। বত্রিশ বছরে দেহ ছেড়ে দিলেন। আচার্যের একেকটা ভাষ্য এমন যে এখনও বড় বড় পণ্ডিতরাও বুঝতে গিয়ে মাথার চুল ছিঁড়ে ফেলেন। নিউটন আঠারো বছর বয়সে ইন্টিগ্রাল ক্যালকুলাস আবিষ্কার করলেন। শঙ্করাচার্য তাই বলছেন, বুড়ো বয়সে মাথা কাজ করেনা আর বাড়ির লোকেরা গ্রাহ্য করে না।

আমরা অনেকে ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করি, হে ঠাকুর, আমি যদি বাচ্চাই থেকে যেতাম তাহলে বুড়ো হওয়ার যে কষ্ট সেটা পেতে হতো না। কিন্তু শাস্ত্র বলছে, বাচ্চা থেকে শুধু বড় হওয়াটাই নয়, জন্মটাই যেন না নিতে হয়। জন্মটাই দোষ, এই জায়গা থেকেই মানুষ মুক্তির ধারণা করতে শুরু করেছে। শুধু বাচ্চা থেকে বড় হওয়া, বড় থেকে বুড়ো হওয়া আর বুড়ো হয়ে মরে যাওয়ার কষ্টের কথাই বলা হচ্ছে না, জন্ম নেওয়াটাই কষ্টের। জন্ম থেকেই তো মার খেয়ে চলেছে, বাচ্চা বয়সে বড়দের কাছে মার খায়, যৌবনে স্ত্রীর কাছে মার খায়, বুড়ো বয়সে সন্তানের কাছে মার খায়, আর মারা যাওয়ার পর যারা শশ্মানে পোড়াতে যায় তারা লাঠি পেটাই করে। মানুষ তো সারা জীবন লাঠি খেয়েই মরে। এগুলো দেখার পরও জীবনের প্রতি মানুষের বিরক্তি আসেনা, এটাই মায়া। ঠাকুর বলছেন – উট কাঁটা ঘাস খায়, মুখ দিয়ে দরদর করে রক্ত বেরোয়, তবুও কাঁটা ঘাস খাওয়া ছাড়তে চায়না।

যার জন্ম থেকে আনন্দ হচ্ছে, জীবন পেয়ে ভাবে বাঃ বেশ আছি, ঠাকুরকে একজন বলছেন, আমার তো মুক্তি পাওয়ার ইচ্ছে নেই, জীবনটাতো ভালই লাগে। ঠাকুর বলছেন – বল না, তোমার এখনও ভোগের ইচ্ছা রয়েছে। তার মানে, সে সাধনা করে সাধনাতে পতন হওয়ার পর মানুষ হয়ে জন্মায়নি, নীচু যোনি থেকে লড়াই করে মানুষ হয়ে জন্মেছে বলে তার *ইন্দ্রিয়ার্থেষু বৈরাগ্যম্* হচ্ছে না। কারণ ইন্দ্রিয়ের ভোগের প্রতি আসক্তি তাদেরই হয় যারা নীচ যোনি থেকে উপরে এসেছে। কিন্তু যারা ওপর থেকে পতন হয়ে মনুষ্য শরীরে আসে তাদের ইন্দ্রিয়ের প্রতি আসক্তি থাকে না, থাকলেও খুব কম থাকবে।

আচার্য শঙ্কর বলছে, জন্মতেই যদি তোমার আনন্দ হয় তাহলে তোমার জন্য আধ্যাত্মিকতা নয়। ভগবান বুদ্ধের যখন সন্তান জন্ম নিল তখন তিনি কেন কাঁদলেন? তিনি দেখলেন সন্তান তাঁকে বাঁধতে এসেছে, আর সন্তানও নিজের দুঃখকে বরণ করে নিতে এসেছে। ভগবান বুদ্ধ তার আগে জরা, ব্যাধি ও মৃত্যু এই তিনটেকেও দেখেছিলেন। অথচ আমাদের হাসপাতাল গুলিতে যারা ডাক্তার নার্স রয়েছে তারা এই চারটকেই দিনরাত দেখছে, বাচ্চার জন্মও দেখছে, ব্যাধিকেও দেখছে, বুড়ো বয়সে ডায়লাসিস চলছে সেটাও দেখতে হচ্ছে, আর মরতেও দেখছে। কিন্তু এদেরকি কোন বৈরাগ্য হচ্ছে? উল্টে তাদের আরও আনন্দ হয় কারণ এই চারটেতেই তারা শুধু দেখছে টাকা আর টাকা। ভগবান বুদ্ধ মাত্র তিন দিনে একটা একটা করে দেখেছিলেন, আর যারা হাসপাতাল চালায় তারা নিত্য এক সঙ্গে চারটেকেই দেখছে কিন্তু এক ফোঁটা বৈরাগ্য আসছে না। আচার্য একটি স্তবে বলছেন – *কালঃ ক্রীড়তে গচ্ছত্যায়ুস্তদপি ন মুঞ্চত্যাশাবায়ুঃ,* কাল খেলা করে যাচ্ছে, আয়ু শেষ হয়ে আসছে কিন্তু বৃথা আশা কাউকে ত্যাগ করে না। সবাই মনে করে আমার মৃত্যু হবে না, আমার অসুখ করবে না, আমি বুড়ো হবো না। যাদের কাছে এই জন্ম, জরা, ব্যাধি এগুলো আনন্দের ব্যাপার জগৎটা তাদের জন্য, যাদের কাছে এগুলো দুঃখের ব্যাপার তারাই ক্ষেত্রজ্ঞ জ্ঞানের জন্য প্রস্তুত। খুব কঠিন ব্যাপার, তাই তো উপনিষদে ঋষি বলছেন – *কশ্চিদ্ধীরঃ প্রত্যগাত্মানমৈক্ষদ্ আবৃত্তচক্ষুরমৃতত্বমিচ্ছন্* (কঠ-২/১/১), মানুষ যতক্ষণ আবৃত্ত চক্ষু না হচ্ছে, চোখ, কান, নাক, জিহ্বাকে বন্ধ করে ভেতরের দিকে দৃষ্টি না দিচ্ছে ততক্ষণ আধ্যাত্মিক জ্ঞান হয় না। এই আবৃত চক্ষুর ভাষ্যে বলছেন, আবৃত চক্ষু হচ্ছে তীব্র ইচ্ছা শক্তি। কি রকম ইচ্ছা শক্তি? এই রকম উৎসাহ নিয়ে নামতে হবে, গঙ্গাকে গঙ্গাসাগর থেকে ঠেলে আমি গোমুখের মুখের মধ্যে ঢুকিয়ে দেব, এই ইচ্ছা শক্তি নিয়ে যে নামে একমাত্র সেই আধ্যাত্মিক জীবনে সফল হয় বাকীদের কিছুই হয় না। এই শ্লোকগুলো অনুধ্যান করলে বোঝা যায় আধ্যাত্মিক পথ কত ক্ষুরধার। ক্ষেত্রজ্ঞকে জানতে হলে আর কি কি গুণ থাকতে হবে?

**অসক্তিরনভিষ্বঙ্গঃ পুত্রদারগৃহাদিষু। নিত্যঞ্চ সমচিত্তত্বমিষ্টানিষ্টোপপত্তিষু।**।৯।।

যখন আমরা বারবার বিচার করতে থাকব জন্ম হচ্ছে দুঃখ, জরা দুঃখ, ব্যাধি দুঃখ, মৃত্যু দুঃখ, তখন *অসক্তি* আসে। *অসক্তি* হচ্ছে নিজের কিছু কিছু জিনিষের প্রতি আসক্তি। যেমন কিছু লোকের বিশেষ কোন খাদ্যের প্রতি আসক্তি বা দুর্বলতা, তারা বলে আমার সব কিছুই ঠিক আছে কিন্তু মিষ্টি খাবারের প্রতি আমার খুব লোভ আছে, এটাকে বলা হচ্ছে *অসক্তি*। তারপরে বলছেন *অনভিষ্বঙ্গঃ,* আমাদের দুই রকম ভাবে আসক্তি হয়, একটা হচ্ছে নিজের শরীর, মন ও ইন্দ্রিয় দিয়ে। আরেকটা হয় অপরের শরীর, মন ও ইন্দ্রিয় দিয়ে। মা ছেলেকে বলে, তুমি খেলেই আমার খাওয়া হয় সোনা। ছেলে মেয়েকে বলে তোমার আনন্দেই আমার আনন্দ। এটাকেই বলা হচ্ছে *অভিষ্বঙ্গঃ*। *অভিষ্বঙ্গ* সবার মধ্যে থাকতে বাধ্য, *অভিষ্বঙ্গ* যদি না থাকে তাহলে এই জগতের সমস্ত কার্য

ক্রিয়াকলাপ বন্ধ হয়ে যাবে। মোহনবাগান আর ইস্টবেঙ্গলের খেলা হয়েছে, খেলার পর হারা জেতা নিয়ে দুই দলের সমর্থকের মধ্যে মারামারি কাটাকাটি, এইটাই *অভিষ্বঙ্গঃ।* মোহনবাগান আর ইস্টবেঙ্গলে কটা প্লেয়ার খেলছে, একটা বলকে নিয়ে গোলের মধ্যে ঢোকাচ্ছে, আবার পরের বছর দুই দলের প্লেয়াররা দল পাল্টে অন্য দলে নাম লেখাচ্ছে, এই নিয়ে নিজেদের মধ্যে মারামারি কাটাকাটি করা, এর থেকে মুর্খতা আর কি হতে পারে। আমি একজনকে ভালোবাসি, তার ভালো কিছু হলে আমিও আনন্দ পাচ্ছি, তার খারাপ কিছু হল আমারও মন খারাপ হয়ে গেল, এটাই হচ্ছে *অভিষ্বঙ্গঃ*। সাধনার প্রথম অবস্থায় এই *অভিষ্বঙ্গকে* আটকাতে হয়, নিজের শরীর মনের বাইরে যা কিছু আছে তার থেকে সংযোগটা কেটে দিতে হবে। আমার কর্তব্য যেটা সেটা করতে হবে, যেহেতু আমি সংসারে আছি, সংসারে থাকতে গেলে কিছু কর্তব্য কর্ম আমাকে করতেই হবে। আনন্দও করব কিন্তু ভেতরে যেন কোন দাগ না কাটে। বাইরের সংযোগটা কাটার পর নিজের দেহ মন ও ইন্দ্রিয় দিয়ে যে আসক্তি হয় সেটাকে কাটতে হবে। *অনভিষ্বঙ্গ* কিসের থেকে বলছেন? *পুত্রদারগৃহাদিষু*, পুত্র মানে সন্তানাদি থেকে, নিজের সন্তানের যখন ভালো কিছু হয় তখন কি আনন্দ, এক গাল হাসি নিয়ে সবাইকে সন্তানের সুখ্যাতি বলে বেড়াবে। *দার*, মানে স্ত্রী, মানুষ সত্তর বয়সেও নিজের স্ত্রীকে খুশি করতে উঠে পড়ে লেগে থাকে। *গৃহাদিষু*, বাড়ি, গাড়িতেও প্রচণ্ড অভিষ্বঙ্গ লেগে থাকে, গাড়িটা খারাপ হয়ে গেল, মন খারাপ করে বাড়িতে বসে আছে। গাড়ি খারাপ হলে মন খারাপ হবেই কিন্তু তার জন্য ভেঙ্গে পড়ে থাকাটা কোন কাজের কথা নয়। আমার যত কিছু শান্তি, আনন্দ সব আমার স্ত্রী, পুত্র, গাড়ি, বাড়িকে নিয়ে, এই মনোভাবটাকে আটকাবার কথা বলা হচ্ছে।

তারপরে বলছেন, *নিত্যঞ্চ সমচিত্তত্বম্*, চিত্ত মানে মন, *সমচিত্ত* মানে মনের সাম্য ভাব, *নিত্যঞ্চ*, সব সময়। সব সময় মনের সাম্য ভাবকে বজায় রাখতে বলা হচ্ছে। বৌদ্ধধর্মে এটাকে বলা হচ্ছে awareness জাগ্রত, যে কাজই করি না কেন, কাজ করার সময় সব সময় সচেতনশীলতাকে জাগ্রত রাখতে হয়। আমরা যখন খাওয়া দাওয়া করি তখন কখন খাওয়া শুরু হল আর কখন খাওয়া শেষ হল খেয়ালই থাকে না, কিন্তু খাওয়াটাও একটা ধ্যান। প্রত্যেকটা গ্রাস আমি মুখে দিচ্ছি, চর্বন করছি, গলাধঃকরণ করছি এই ব্যাপারে সব সময় আমি সচেতন। শুধু খাওয়াতেই নয়, হাঁটা চলা, কথা বলা, দেখা সব কিছুতে আমি সচেতন যে আমি হাঁটছি, আমি কথা বলছি। শিক্ষক ক্লাশে পড়াচ্ছেন, কোন ছেলে হাত নাড়ছে, পা নাড়ছে, কথা বলছে কোনটাই শিক্ষকের নজর এড়িয়ে যাবে না, ঠিক সেই রকম চব্বিশ ঘন্টা নিজের ব্যাপারেও সজাগ থাকতে বলা হচ্ছে, আমি এই জিনিষটা করছি, awareness is the alertness। আমি এই কাজটা করছি এই যে awareness, this is alertness, এই ধরণের মানুষ কাজ করার সময় কোন ভুল করে না। এমনকি যখন সে কোন ভুল কাজ করে ফেলে তখনও কিন্তু সে সজাগ থাকে যে আমি ভুল কাজ করে ফেলছি। মিলিন্দা বলে এক রাজা ছিলেন, নাগসেন নামে এক সাধুর সঙ্গে তার এক প্রশ্নোত্তর হয়েছিল। প্রশ্নগুলোর মধ্যে awareness জিনিষটাকে highlight করার জন্য একটা প্রশ্ন করা হয়েছিল – একজন লোক জেনেশুনে পাপ করছে, আরেকজন না জেনে পাপ করছে, এখন কার বেশি দোষ হবে? তখন নাগসেন উত্তর দিচ্ছেন – যে না জেনে পাপ করে সব সময় তার দোষটাই বেশি হয়। মিলিন্দা উত্তর শুনে চমকে উঠেছে, এটা কি করে হবে। মিলিন্দার সংশয় দূর করবার জন্য নাগসেন বলছেন – একটা তপ্ত লোহা সামনে রাখা আছে, এখন একজন না জেনে সেই তপ্ত লোহাটাকে ধরল আরেকজন জেনে বুঝে গরম লোহাটাকে ধরল, এখানে কার হাত বেশি পুড়বে? রাজা মিলিন্দা বলছে, যে না জেনে ধরবে, কারণ সে পুরোটাই ঝাঁপিয়ে পড়ে ধরবে। আর যে জানে এই লোহাটা গরম সে সাবধান হয়েই ধরবে। তারও হাত পুড়বে, কিন্তু যেহেতু সে সজাগ ছিল তাই সাবধান হয়ে ধরবে। পাপের ক্ষেত্রেও ঠিক তাই হয়। যে সজাগ সে জানে যে আমি যে কাজটা করতে যাচ্ছি সেটা ভুল কাজ করছি তখন তার দোষটা তাকে বেশি ধরে না। এই awarenessকে বলে *সমচিত্তত্বম্*, equanity of mind, যখন এই *সমচিত্তত্বম্* আসে তখন সে বেশি দুঃখও করে না আবার আনন্দে বেশি উৎফুল্ল হয় না। একটি গরীব লোকের নামে এক কোটি টাকার লটারি উঠেছে, লোকটাকে যদি খবর দেওয়া হয় তাহলে লোকটা পাগল হয়ে যাবে। পোস্টম্যান লটারির চিঠি নিয়ে এসে বলছে – আচ্ছা তোমার যদি লটারি ওঠে তাহলে তোমার কি হবে? আমি খুব খুশি হব। আচ্ছা যদি লটারিতে তুমি দশ হাজার টাকা পাও তাহলে তুমি কি করবে? আমার একটা মোষ কেনার আছে, আমি একটা মোষ কিনব। যদি তুমি এক লাখ টাকা পাও? তাহলে একটা জমি কিনে চাষবাশ করব। আর যদি পাঁচ লাখ টাকা পাও? তাহলে একটা বাড়ি কিনব। এই ভাবে পোস্টম্যান আস্তে আস্তে আসল খবটার দিকে নিয়ে যেতে যেতে পঞ্চাশ লাখ টাকা পর্যন্ত নিয়ে গেছে। শেষে বলছে তুমি যদি এক কোটি টাকা পাও? তাহলে পঞ্চাশ লাখ তোমাকে দিয়ে দেব। এটা শুনে পোস্টম্যানই হার্টফলে হয়ে মরে গেল। কেন এই রকম হল? *সমচিত্তত্বমের* অভাব। যে ঐ গরীবলোকটাকে সামলাতে যাচ্ছে যাতে মনের সাম্যভাব না হারিয়ে ফেলে, শেষে সেইই ডুবে গেল। আর বলছেন *ইষ্টানিষ্টোপপত্তিষু*, ভালো জিনিষই পাক আর খারাপ জিনিষই যদি পেয়ে থাকে তাহলেও তার মন একই থাকবে। এক রকম থাকা মানে, *সমচিত্তত্বম্*। খুব জপ-ধ্যান, অনেক দিন তপস্যা না করলে এগুলো এমনি এমনি হয় না। এমনিতেও জপ ধ্যান করলে ছোট খাটো দৈনন্দিন সমস্যা গুলো চলে যায়। আর দশ হাজার জপ যদি দিনে না করতে পারে তাহলে কিছুতেই মন সাম্যভাবে আসতে পারবে না। শ্রীমাও বলছেন, সবাই এসে বলে মন স্থির হয় না, দিনে দশ হাজার জপ করুক দেখুক না, মন শান্ত হয় কিনা দেখুক। পাঁচ হাজার, দশ হাজার দিনে জপ করলে নিজেই বুঝতে পারবে *সমচিত্তত্বম্* কাকে বলে, নিজে থেকেই মনের মধ্যে সাম্যভাব এসে যাবে। এগুলো বলে বোঝান যায় না। এবারে ভগবান বলছেন, শুধু এই গুণগুলো দিয়েই হবে না, তার সাথে সাথে –

**ময়ি চানন্যযোগেন ভক্তিরব্যভিচারিণী। বিবিক্তদেশসেবিত্বমরতির্জনসংসদি।।১০।।**

তুমি এখন ক্ষেত্রজ্ঞকে জানতে চলেছ, মানে ভগবানকে জানতে চলেছ, শুধু ভগবানকেই নয় সেই ভগবান যিনি সবারই হৃদয়েই বিরাজমান এই বোধটাকে তুমি অনুভব করতে চলেছ, সেইজন্য আরও কিছু জিনিষ তোমাকে আয়ত্ত করতে হবে। কি সেই জিনিষ? *ময়ি চানন্যযোগেন*, অনন্য যোগ, অন্য কোন দিকে আর মন যাবে না। আমার এটাও দরকার ওটাও দরকার, জগৎটাকেও হাত বাড়িয়ে খাবলাব আবার ভগবানকেও মাঝে মাঝে খাবলাব, এইভাবে হবে না। সেইজন্য ঠাকুর বলছেন – অদ্বৈতজ্ঞান আঁচলে বেঁধে যা কিছু করার কর। আরও বলছেন – আগে ঈশ্বর লাভ তারপর সংসারে থাকো, হাতে তেল মেখে কাঁঠাল ভাঙলে কাঁঠালের আঁঠাতে হাত আটকে যাবে না। অনন্য যোগ হচ্ছে একমুখি ভক্তি যোগ। আর বলছেন *অব্যভিচারিণী ভক্তি*, ব্যভিচারিণী হচ্ছে যখন মন দুই বা দুইয়ের বেশি দিকে যায়, ব্যভিচারিণী ভক্তির আচরণের মধ্যে বিভাজন আছে, অর্থাৎ দুই নৌকাতে পা রাখা। এখানে বলছেন তোমার ভক্তি হবে অব্যভিচারিণী, আমার শ্রীকৃষ্ণ ছাড়া আর কেউ নেই, শ্রীরামকৃষ্ণ ছাড়া আমার আর কোন কিছুতে মন যায় না।

দুটো জিনিষ বললেন, *অনন্যযোগেন* আর *অব্যভিচারিণী*। আচার্য শঙ্কর তাঁর ভাষ্যে বলছেন – প্রথমটা হচ্ছে আমার ভক্তি একমাত্র বাসুদেবের প্রতি, দ্বিতীয় হচ্ছে ভগবান বাসুদেব ছাড়া আর কিছু নেই – *ন অন্য ভগবতো বাসুদেবাৎ পরঃ*, মানুষ, পশু, পাখি, কীট, পতঙ্গ যা কিছু আছে বাসুদেব ছাড়া আর কিছু নেই। *স এব নো গতি*, তিনিই আমার গতি, মৃত্যুর পর তিনিই আমার আশ্রয়, তিনিই আমার আলয়, তিনিই আমার পরমপদ। *ইতি এবং নিশ্চিতাঃ অব্যভিচারিণী*, এই নিশ্চিত বুদ্ধি যে শ্রীরামকৃষ্ণ ছাড়া আর কিছু নেই, আমার শ্রীরামকৃষ্ণ ছাড়া আর কোন আশ্রয় নেই আর শ্রীরামকৃষ্ণ ছাড়া আমার কোন গতি নেই, এই নিশ্চিত বুদ্ধিকেই বলা হচ্ছে অব্যভিচারিণি। এই অব্যভিচারিণী ভক্তিতে কি হয়, যখন কেউ আমার গলা কাটছে তখন মনে করছি শ্রীরামকৃষ্ণই আমার গলা কাটছে, আর তখন কেউ এসে যদি বাঁচিয়ে দেয় তখনও মনে করছি শ্রীরামকৃষ্ণই আমাকে বাঁচিয়ে দিলেন। মৃত্যুর পর তাঁর ইচ্ছাতেই আমার যা গতি হবার হবে, আর যদি মুক্তিও হয় তাহলেও আমি তাঁর কাছে গিয়েই থাকব, এই নিশ্চিত বুদ্ধি।

*বিবিক্তদেশসেবিত্বম্*, নির্জন বাসের কথা বলা হচ্ছে। ষষ্ঠ অধ্যায়েও ভগবান নির্জন বাসের কথা বলেছিলেন, *যোগী যুঞ্জীত সততমাত্মানং রহসি স্থিতঃ*, যিনি যোগী হতে চাইছেন তাঁকে নির্জন স্থানে একাকী যোগ সাধনা করতে হবে। সংসারের কোলাহলে, যেখানে স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, আত্মীয়, বন্ধু বান্ধবের হৈচৈ সেখানে আর যাই হোক আধ্যাত্মিক সাধনা হয় না। সাধারণ মানুষের কথা বলা হচ্ছে না, তারা দু চার দিনের জন্য কর্মস্থল থেকে ছুটি পেলে সংসার ছেড়ে এদিক সেদিক বেরিয়ে পড়ে, এই ধরণের নির্জন বাসের কথা এখানে বলা হচ্ছে না, ঠাকুরের কথায় এরা হচ্ছে পোকামাকড়। কিন্তু যারা ভক্ত তারাও এই নির্জনবাসকে সেই ভাবে কোন গুরুত্ব দিতে চায়না, আশ্রমে গিয়ে ভালো ঘর, ভালো খাবারদাবার কেমন, কি কি বেড়ানোর জায়গা আছে, এই খোঁজ করতেই ব্যস্ত হয়ে পড়ে। ঠাকুরের নামে বেরিয়ে পড়ে তিনি যেখানে যেভাবেই রাখুন এই মনোভাব নিয়ে শুধু একটু ঈশ্বর চিন্তা করবার জন্য নির্জনবাস করতে ভক্তরাই চায় না। যতক্ষণ নির্জনবাস না করা হচ্ছে ততক্ষণ তোমার দ্বারা আধ্যাত্মিক সাধনা হবে না। *অরতির জন-সংসদি*, প্রথমে নির্জনবাস তারপর লোকজনের সংস্রব থেকে দূরে থাকতে হবে। আচার্য শঙ্কর এখানে মন্তব্য করছেন, চিত্তের যে প্রসন্নতা সেটা সব সময় নির্জন প্রদেশেই পাওয়া যায়। স্বামীজীও বারবার বলছেন আত্মিক শক্তি ও আধ্যাত্মিক শক্তির বিকাশ কখনই অনেক লোকের ভীড়ের মধ্যে হতে পারেনা।

জনসংসদির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আচার্য শঙ্কর একটি অত্যন্ত মূলবান কথা যোগ করে বলছেন – সব সময় এই ধরণের লোকজন থেকে দূরে থাকবে। কি ধরণের লোকের থেকে দূরে থাকতে বলছেন? প্রথম হচ্ছে *প্রাকৃতিনাং*, মানে আধ্যাত্মিক জগতে যারা মুর্খ, জাগতিক ক্ষেত্রে খুব বড় কিছু হতে পারে কিন্তু আধ্যাত্মিকতার ব্যাপারে একেবার শূন্য, এদের থেকে সব সময় দূরে থাকবে। *সংস্কারশূন্যানাম্*, আধ্যাত্মিক সংস্কার যাদের নেই। *অবিনীতানাম্*, যাদের আচরণে বিনয় নেই, নম্রতা নেই। এই ধরণের লোকেদের থেকে দূরে থাকাটাই হচ্ছে জনসংসদি। কিন্তু যাঁরা সন্ত মহাত্মা, সাধুপুরুষ, তাঁদের সঙ্গ করতে হবে। এই কথা গুলো কার উদ্দেশ্যে বলা হচ্ছে? ভক্ত বা সাধারণ মানুষদের বলা হচ্ছে না। তুমি জীবনে কি চাইছ? তুমি ক্ষেত্রকে জানতে চাইছ, না কি ক্ষেত্রজ্ঞকে জানতে চাইছ? জগতকে জানতে চাইছ, না জগতস্রষ্টাকে জানতে চাইছ। যদি জগতকে জানতে চাও তাহলে কোটিপতিদের কাছে, রাজনৈতিক নেতাদের কাছে যেতে হবে, বিজ্ঞানীদের কাছে যেতে হবে। যদি জগতস্রষ্টাকে জানতে চাও তাহলে আগে তোমার মধ্যে এই গুণগুলিকে নিয়ে এস। এই গুণগুলো অর্জন না করা পর্যন্ত ক্ষেত্রজ্ঞকে তোমার জানা হবে না। এই গুণগুলোকে জানার পর বলছেন –

**অধ্যাত্ম জ্ঞান নিত্যত্বং তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনম্। এতজ্ জ্ঞানমিতি প্রোক্তমজ্ঞানং যদতোহন্যথা।।১১।।**

ঠাকুর বলছেন মূলো খেলে মূলোর ঢেকুর ওঠে। বাচ্চারা গোয়েন্দার কমিকস পড়ে পড়ে এমন হয়ে যায় যে, সব জায়গাতে গোয়েন্দাগিরি করতে থাকে, যেখানে গোয়েন্দাগিরির কিছু নেই সেখানেও গোয়েন্দাগিরি করবে, কারণ এইটাই, মূলো খেলে মূলোর ঢেকুর ওঠে। সেইজন্য বলছেন, *অধ্যাত্ম জ্ঞান নিত্যত্বং*, নিত্য শাস্ত্র অধ্যয়ন, দিনরাত শাস্ত্র চর্চা করতে হবে। *তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনম্*, মানে

তত্ত্বজ্ঞান, সংসার থেকে কিভাবে উদ্ধার হবে, মোক্ষ বিষয়ক আলোচনাই সব সময় করতে হবে। আশ্রমে, মন্দিরে গিয়ে শুধু ঈশ্বর বিষয়ক আলোচনাই করতে হয়, কিন্তু তা না করে শুধু রাজনীতি, কোন নেতা কি বলল, কোন নেত্রী কি করল এই নিয়েই মানুষ সব সময় আলোচনা করে যাচ্ছে। যদি কথা বলতে হয় তাহলে মোক্ষ কিভাবে হয় এই নিয়েই কথা বলতে হবে। এখানে বলা হচ্ছে না যে ঠাকুর কি কি খেতে ভালোবাসতেন, জিলিপি খেতে ভালোবাসতেন না কচুরী খেতে বেশি ভালোবাসতেন এই নিয়ে আলোচনা করতে। শ্রীমা কিভাবে রুটি বেলতেন এই কথা আলোচনা করতে বলা হচ্ছে না। *তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনম্*, তোমার আলোচনার মূল কেন্দ্রবিন্দু পুরো মোক্ষের মধ্যেই রাখতে হবে। যে শাস্ত্রে মুক্তির কথা, মোক্ষ বিদ্যা বলা হয়েছে কেবল সেই শাস্ত্রই পড়তে হবে, এমনকি পৌরানিক কাহিনীও পড়া চলবে না। অথচ চারিদিকে পৌরানিক কাহিনীরই বর্ণনা হয়ে চলেছে, কারণ ভক্তরা যেটা চায় প্রবচনকারীরার সেটাই বলবে। স্বামীজী বেলুড় মঠের নিয়ম কানুন তৈরী করার সময় বলে গেছেন, দেখিস, বেলুড় মঠকে একটা বাবাজীর আখড়া বানিয়ে ফেলিস না। বাবাজীর আখড়া না বানান মানে, ঠাকুর জিলিপি খেতে ভালোবাসতেন কি বাসতেন না, এগুলোকে নিয়ে বেশি আলোচনা করতে যেও না, মোক্ষচর্চা ছাড়া আর কোন চর্চা করবে না।

*এতজ্ জ্ঞানমিতি প্রোক্তমজ্ঞানং যদতোহন্যথা*, এতক্ষণ ধরে তোমাকে যা কিছু বলা হল এইটাই হল জ্ঞান, এর বিপরীত যা কিছু সবই অজ্ঞান। তাহলে প্রশ্ন হতে পারে, আমি একা একা নির্জনে থাকছি, সাধুসঙ্গ করছি এটা জ্ঞান হল কি করে? আচার্য শঙ্কর বলছেন – তা নয়, যেটাই পথ সেটাই লক্ষ্য। আধ্যাত্মিক শাস্ত্রের বিশেষত্ব হচ্ছে যে, আধ্যাত্মিক শাস্ত্রে, কারক, ক্রিয়া আর ফল এই তিনটে জিনিষ এক হয়। কারক মানে যার দ্বারা কর্ম সম্পাদিত হয়। সম্বোধনকে যদি সরিয়ে দেওয়া হয়, মানে ওহে রামবাবু, যদি 'ওহে' টাকে সরিয়ে দেওয়া হয় তাহলে সাতটি কারক হয়। কারকের পর কর্ম, কর্ম করলেই তার একটা ফল হবে। যে কোন কর্মের পেছনে তিনটে উপাদান থাকতে হবে – কারক, ক্রিয়া আর ফল। একটা রুটি খেতে গেলে কত রকমের কারক এসে যায়, যেমন – আমি থালা থেকে হাত দিয়ে মায়ের বানান উৎকৃষ্ট গমের থেকে তৈরী আটার রুটি খাচ্ছি। খাওয়াটা ক্রিয়া, ফল হল আমার পেট ভরবে। আধ্যাত্মিক শাস্ত্রে এই নয়টি জিনিষ, সাতটা কারক, ক্রিয়া আর ফল সব এক হয়ে যায়। এর সব থেকে ভালো উদাহরণ হচ্ছে গীতার চতুর্থ অধ্যায়ের চব্বিশ নং শ্লোক – *ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্*। যে রুটি খাচ্ছে সে ব্রহ্ম, যার সাহায্যে খাচ্ছে মানে হাত সেটাও ব্রহ্ম, থালা থেকে খাচ্ছে, থালাটাও ব্রহ্ম, মা যিনি বানিয়েছেন তিনিও ব্রহ্ম, যেটা খাচ্ছে রুটিটাও ব্রহ্ম, খাওয়ার যে ক্রিয়া হচ্ছে সেটাও ব্রহ্ম, ক্রিয়ার ফল যেটা হবে সেটাও ব্রহ্ম। অধ্যাত্ম বিদ্যাতে কারক, ক্রিয়া ও ফল আলাদা হয় না। এখানে এই জিনিষটাকেই বলা হচ্ছে, এই যা কিছু বলা হল, এরা আমাদের জ্ঞান পর্যন্ত নিয়ে যাচ্ছে। সেইজন্য এইগুলোও জ্ঞান। আধ্যাত্মিক জ্ঞানে জ্ঞান আর জ্ঞানে পৌঁছাবার যে পথ দুটোই এক, আবার জ্ঞানে পৌঁছে যাবার যে ফল সেটাও এক। যে অনন্য ভক্তির কথা বলা হয়েছে, এই অনন্য ভক্তি জ্ঞান পর্যন্ত নিয়ে যায় তাই এটাও জ্ঞান। বৈরাগ্য, এটাও জ্ঞান, কারণ বৈরাগ্য জ্ঞান পর্যন্ত নিয়ে যায়। জ্ঞানের ফলও জ্ঞান।

অজ্ঞান সংসারে প্রবৃত্ত করে, সংসারের দিকে নিয়ে যায়। জ্ঞান ঠিক উল্টো দিকে নিয়ে যায়, জ্ঞানের যা কিছু সব অজ্ঞানের উল্টো। এর আগে ভগবান বলছিলেন জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি আর দুঃখে দোষ দর্শন করতে। কিন্তু নার্সিং হোমের মালিক রোগ ব্যাধি হলে খুব আনন্দ পায়, কারণ যত রোগী ভর্তি হবে তত তার ধনের ভাণ্ডার উপচে পড়তে থাকবে, এইটাই সংসার। যে এগুলোতে দোষ দেখতে শুরু করবে তখন এইটাই তার কাছে জ্ঞান, কারণ এইবার এইটাই তাকে জ্ঞানের দিকে নিয়ে যাবে। এখন আমি বলছি আমি জন্ম চাইনা, আমি ব্যাধি চাইনা, শুধু নিজের জন্যই নয়, পরের জন্যও চাইছি। তাহলে ডাক্তারদের কি হবে? মানুষের রোগ ঘেটেই ডাক্তারদের জীবন নির্বাহ করতে হচ্ছে, তাই অপরের ব্যাধিতেই ডাক্তারদের সুখ। সেইজন্য ডাক্তারদের অর্থ ঠাকুর স্পর্শ করতে পারতেন না। উকিল মিথ্যে কথা বলে পয়সা উপার্জন করে বলে উকিলের টাকাও ঠাকুর ছুঁতে পারতেন না। কারণ এরা হচ্ছে ঘোর বিষয়ী। তাহলে ডাক্তাররা কি করবে? যে চাষবাশ করে অর্থোপার্জন করছে সেও তো চারটে জীবহত্যা করে চাষ করছে। ডাক্তাররা রোগীর কষ্টের সময় গলা টিপে টাকা আদায় করে। সবাইকে তো বাঁচতে হবে। আমাদের শাস্ত্রে কোথাও বলছে না যে, তুমি ছাড়া বাকি সবাই বেশি মূল্যবান। কিন্তু সব সময় বলছে আমি নিজে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, আমাকে মুক্তি পেতে হবে। বাঙ্গালী বলছে, আমার বাঙ্গালী শরীর মাছ ছাড়া থাকতে পারিনা। শাস্ত্র কখনই বলবে না যে তুমি মাছ খেও না, মাংস খেও না। তুমি মাছ খেতে চাইছ খাও, মাংস খেতে চাইছ খাও, কেউ তোমাকে বারণ করছে না। কিন্তু তুমি সব সময় মাথায় রাখবে, তোমার মুখে যে ভাতের দুটো দানা যাচ্ছে এটাও কিছু প্রাণী হিংসার দ্বারা সংগ্রহিত হয়েছে, চাল, গম, আনাজ সবই প্রাণ সম্পদ। সেইজন্য শাস্ত্র বলছে, তুমি ততটুকুই নাও যতটুকু তোমার দরকার। হে ডাক্তার বাবু, তুমিও রোগীদের কাছ থেকে ততটুকুই নাও যতটুকু তোমার দরকার।

এখানে প্রশ্নটা এসেছিল *ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি*, মানুষের ভেতরে যিনি অন্তর্যামী তিনিই নারায়ণ, তিনিই হচ্ছেন পরমব্রহ্ম। যিনিই পরমব্রহ্ম, তিনিই নারায়ণ, তিনিই অন্তর্যামী, তিনিই আত্মা, তিনিই বিভু, তিনিই প্রভু, তিনিই সব। এই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের জ্ঞানই হচ্ছে প্রকৃত জ্ঞান। ক্ষেত্রের কথা বলে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু ক্ষেত্রজ্ঞকে জানতে হলে তোমাকে কিছু গুণের অধিকারী হতে হবে।

সেই গুণগুলো কি বলে দেওয়া হল। এখন একজন সাধারণ ভক্ত এসে বলছে – আপনি যা যা করতে বলেছেন আমি সব শুনতে রাজী আছি, কিন্তু যাঁকে জানব, সেই ক্ষেত্রজ্ঞের সম্বন্ধে একটু কিছু বলুন, তাঁর কি কি গুণ, কি কি বৈশিষ্ট্য। যিনি একমাত্র সত্তা তিনি সগুণ আবার তিনিই নির্গুণ, আবার এগুলোর পারেও তিনি। তখন ভগবান সাধারণ মানুষদের বোঝাবার জন্য বলছেন –

**জ্ঞেয়ং যত্তৎ প্রবক্ষ্যামি যজ্ জ্ঞাত্বাহমৃতমশ্নুতে। অনাদিমৎ পরং ব্রহ্ম ন সৎ তন্নাসদুচ্যতে।।১৩।।**

এই শ্লোকটিও খুব জটিল শ্লোক, এর উপরে আচার্য শঙ্করের বিরাট ভাষ্য আছে। এই জগতে যেটা জানার মত জিনিষ সেটাই এখন আমি তোমাকে বলব। ভগবান এবার জ্ঞাতব্য বিষয়কে নিয়ে বলছেন *যজ্ জ্ঞাত্ব অমৃতমশ্নুতে*, যাঁকে জেনে তুমি অমৃত লাভ করতে পারবে। মানুষ সারা জীবন খেটেখুটে শ্রীমার ভাষায় দেড় সের ছাই লাভ করে। টলস্টয়ের একটি বিখ্যাত গল্প আছে – এক ব্যক্তি জমি কেনার জন্য এক জায়গায় গেছে। সেখানকার জমিদার বললে, সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠে সারাদিন তুমি যতটা জমি হেঁটে আসবে সবটাই তোমার হয়ে যাবে। সকালবেলা উঠেই লোকটা দৌড়াতে শুরু করে দিল, একটাই তার মাথায় যতটা জমি একদিনে দৌড়ে আসা যাবে। সেইজন্য খাওয়া-দাওয়া সব ছেড়েছুড়ে দৌড়াতেই থাকল। সূর্যাস্ত হতে একটু বাকি, শরীর আর টানতে পারছে না। সব শেষে দেখাচ্ছে সূর্য অস্ত গেল গেল আর সেও মুর্ছিত হয়ে মাটিতে পড়ে মারা গেল। এবার তাকে কবর দিতে হবে, টলস্টয় খুব সুন্দর বর্ণনা দিচ্ছেন। যে জমির সর্দার ছিল সে বলল – after all he needed seven fits of land। কবর দিতে অতটুকু জমিই লাগল। সারা জীবন ব্যাপি কত কিছু করছে, আমি সেই করব আমি তমুক করব, সব করে শেষে দেড় সের ছাই। এরাই হল মৃত্যুধর্মা। ভগবান বলছেন, তুমি মৃত্যুধর্মা কেন হতে যাবে আমি তোমাকে যেটা শেখাব যেটা জেনে তুমি *অমৃতত্বম্* লাভ করবে, *জ্ঞাত্বাহমৃতমশ্নুতে*। কাকে জেনে তুমি অমৃতত্ব লাভ করবে? ব্রহ্মকে। ব্রহ্ম কি রকম?

*অনাদিমৎ পরং ব্রহ্ম*, ব্রহ্মের কোন আদি নেই, তিনি অনাদি, ব্রহ্মের কোন আরম্ভও নেই শেষও নেই, এরপর আর কোন প্রশ্ন হয় না। কারণ ব্রহ্ম অনাদি, এখন তাঁর যদি আদি কারণ কোন কিছু হয় তাহলে সেই আদি কারণেরও একটা আদি কারণ থাকতে হবে, এইভাবে চললে কোথাও তো শেষ হবে না। এটাকে বলা অনবস্থাদোষ। এই অনবস্থাদোষ যাতে না হয় সেইজন্য ন্যায় যখন পড়ান হয় তখন একটা জায়গাতে এসে এটাকে আটকে দেওয়া হয়। এই বোতলটা কোথায় আছে? টেবিলে আছে। টেবিলটা কোথায় আছে? মেঝের উপর আছে। মেঝে কোথায় আছে? পৃথিবীতে আছে। পৃথিবী কোথায় আছে? সৌরজগতে আছে। সৌরজগত কোথায় আছে? এই ব্রহ্মাণ্ডে আছে। ব্রহ্মাণ্ড কোথায় আছে? বিজ্ঞান এখানে বলবে আর এগিও না। গার্গিও যখন এইভাবে এক এক করে প্রশ্ন করতে করতে এগিয়ে চলেছে একটা জায়গায় এসে যাজ্ঞবল্ক্য বলছে – গার্গি, এর পর আর প্রশ্ন করো না, তাহলে তোমার মুণ্ডু ধড় থেকে আলাদা হয়ে মাটিতে খসে পড়ে যাবে। আসলে যাজ্ঞবল্ক্য গার্গিকে বোকার মত প্রশ্ন করতে নিষেধ করছেন, প্রশ্ন যখন করবে তখন বুদ্ধিমানের মত প্রশ্ন করবে। গার্গি বুদ্ধিমতী, শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছেন, কিন্তু প্রশ্ন যখন করতে শুরু করেছেন তখন আর থামতে পারছেন না, একটা জায়গায় এসে বুঝে গেছেন যে তাঁকে হার স্বীকার করতে হচ্ছে, কিন্তু পরাজয়কে স্বীকার করে থামতেও মন চাইছে না। যখন যাজ্ঞবল্ক্য বললেন তোমার মুণ্ডু খসে যাবে, তখন গার্গি থমকে গিয়ে প্রশ্ন করা বন্ধ করলেন। ব্রহ্ম অনাদি, ঈশ্বর অনাদি, এর পর আর কোন প্রশ্ন হতে পারেনা।

*মৎপরং*, ব্রহ্মের উপরে আর কিছু নেই, শ্রীকৃষ্ণের থেকে আর কেউ শ্রেষ্ঠ নেই। ঠাকুর বলছেন – ঈশ্বরের কৃপা হলে সব বশে এসে যায়। বলেই ঠাকুর মাস্টারমশাইর দিকে তাকিয়ে বলছেন – নিজেরে স্ত্রী পর্যন্ত। মানে, স্ত্রীরা কখনই কারুর বশে আসে না, কিন্তু যার উপর ঈশ্বরের কৃপা হয় তার স্ত্রীও তার বশে এসে যায়। *মৎপরং*, বাড়িতে গিন্নী মালকিন হতে পারে গিন্নী কিন্তু ঈশ্বরের উপরে নয়। তারপর বলছেন – *ন সৎ তন্নাসদুচ্যতে*, এই শব্দগুলো *ন সৎ ন অসৎ*, উপনিষদে বারবার এমনকি গীতাতেও একাধিকবার আসে। নাসদীয়সূক্তে বলা হচ্ছে *নাসদাসীন্নো সদাসীত্তদানীং নাসীদ্রজো নো ব্যোম পরো যৎ*, সৃষ্টির আগে সৎও ছিল না অসৎও ছিল না। এখানে সৃষ্টির সময়কার বর্ণনা করা হচ্ছে, কিন্তু গীতাতে ব্রহ্ম কি রকম বলতে গিয়ে বলা হচ্ছে, *ন সৎ ন অসৎ উচ্যতে*। এখানে সৎ মানে যে জিনিষটাকে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা জানা যাচ্ছে। আমি এই বোতলটা হাত দিয়ে ধরলাম, তার মানে বোতলটা আছে, তাহলে বোতলটা সৎ, বোতলটা আছে। কিন্তু এইভাবে ব্রহ্মকে জানা যায় না, তার মানে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ব্রহ্মকে কখনই জানা যাবে না তাই ব্রহ্ম *ন সৎ*। এখন নাস্তিকরা বলে ঈশ্বর যদি থেকে থাকেন তাহলে আমাকে দেখা দিক, কিন্তু সেই ভাবেতো তাঁকে এই ইন্দ্রিয় দিয়ে দেখা যাবে না, তাই তিনি সৎ নন। ঈশ্বর যদি সৎ না হন তাহলে তিনি কি ঘোড়ার ডিম না বন্ধ্যাপুত্র বা আকাশকুসুম, যার কোন অস্তিত্বই হয় না, তাহলে ঈশ্বরের কি কোন অস্তিত্বই নেই? ঈশ্বর কি তাহলে অসৎ? না, তাঁর অস্তিত্ব আছে কিন্তু তাঁকে জানা যাবে না, ব্রহ্মকে এই ধরণের অসৎ বলা যাবে না। তাঁর যে অত্যন্ত অভাব সেটাও আছে। তাহলে তিনি কি রকম আছেন? সমাধিতে মনের এক বিশেষ অবস্থায় তাঁকে জানা যায়, তাই তিনি অসৎ নন, অথচ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা তাঁকে জানা যায় না তাই তিনি সৎ নন। তাই এখানে বলা হল, ব্রহ্ম সৎও নন অসৎও নন।

এখানে আচার্য একটা যুক্তি দিয়ে সৎ ও অসৎকে পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিচ্ছেন। আমরা অসৎকে কিভাবে বোঝাতে পারি? বলছেন জগতে দুই ধরণের বুদ্ধির কথা বলা হয়, একটা অস্তি বুদ্ধি আরেকটা হচ্ছে নাস্তি বুদ্ধি। অস্তি বুদ্ধি হচ্ছে, এই বোতলটা এখানে আছে, এটা হল অস্তি বুদ্ধি। এই বোতলটা কি ঘোড়া? না এটা ঘোড়া নয়, এইটা হচ্ছে নাস্তি বুদ্ধি। নাস্তি বুদ্ধিতে বলা হচ্ছে এই জিনিষটা এখানে নেই। এই বোতলে ঘোড়া নেই, ঘোড়াতে নাস্তি বুদ্ধি প্রয়োগ করা হল। এখন ঈশ্বরে অস্তি বুদ্ধি লাগানো যাবে না। কেন লাগানো যাবে না? অস্তি বুদ্ধি লাগাতে হলে ইন্দ্রিয়ের দরকার, তাহলে ঈশ্বর সৎ নন। তাহলে ঈশ্বরে নাস্তি বুদ্ধি লাগাতে হবে। কিন্তু নাস্তি বুদ্ধিতেও মনকে লাগাতে হবে, কারণ বোতলটা যে ঘোড়া নয় এই বোধটা আসছে মন থেকে। এই মন দিয়ে ব্রহ্মকে ধরা যাবে না। তাই ব্রহ্ম হলে অস্তি নাস্তির পার। অস্তিটাও বুদ্ধির একটা অবস্থা, যেখানে বুদ্ধি সেটাকে বিষয় বানিয়ে নেয়, নাস্তিও বুদ্ধির ব্যাপার। এই জায়গাটাতে এসে বিভিন্ন দর্শন ভিন্ন মত পোষণ করে। অনেকে বলছে অভাব বলে কিছু হয় না। কিন্তু বেদান্ত মতে অভাব তত্ত্বটি খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অভাবও জ্ঞানের একটা মাধ্যম। এইজন্য নাস্তিবুদ্ধির ধারণা একটা অত্যন্ত মূল্যবান বিষয়। নাস্তিবুদ্ধিকে যদি না মানা হয় তাহলে বেদান্ত দর্শন পাল্টে গিয়ে অন্য একটা আলাদা দর্শন সৃষ্টি হয়ে যাবে। এই বোতলে আমি ঘোড়া দেখছি না, এই উপলব্ধির জন্য আমার একটা বিশেষ বোদ্ধিক ক্ষমতা থাকতে হবে। ঈশ্বরের ক্ষেত্রে অস্তিবুদ্ধিও কাজ করবে না, নাস্তিবুদ্ধিও কাজ করবে না। সেইজন্য তিনি সৎও নন অসৎও নন।

যে কোন জিনিষ যখন জানা হয় তখন সেই জানার মাধ্যমে আমাদের চার রকমের জ্ঞান লাভ হয়। একটা হচ্ছে জাতি, আমরা কি? মানুষ, আমাদের মানুষ জাতি রূপে জানছি। দ্বিতীয় ক্রিয়া, কোন কার্য দ্বারা আমি জানছি। তৃতীয় গুণ, কোন জিনিষের গুণ দিয়ে আমি সেই জিনিষটাকে জানছি। আর চতুর্থ হচ্ছে সম্বন্ধ, জিনিষের সম্পর্ক দিয়ে জানা যায়। ভারতীয় ঐতিহ্যে এই জিনিষগুলোকে আমাদের ঋষিরা কত তপস্যা করে গভীরে গিয়ে আবিষ্কার করেছেন ভাবলেই আমাদের অন্তরটা শ্রদ্ধায় আপ্লুত হয়ে যায়। কোন জিনিষকে জানতে হলে এই চারটে জিনিষকে দিয়েই জানা হয়, জাতি, ক্রিয়া, গুণ ও সম্বন্ধ। ব্রহ্মের ক্ষেত্রে বলা হয় যে ব্রহ্মের কোন জাতি নেই। কোন জাতি নেই বলতে বলা হচ্ছে, ব্রহ্মের সমান তো আর কেউ নেই। আমরা একটা বিশেষ জিনিষকে যখন জানি তখন তাকে সাধারণের সঙ্গে না মিলিয়ে জানতে পারিনা। যেমন ঘোড়া, আমার ঘোড়ার ব্যাপারে একটা সাধারণ ধারণা আছে, সেই ধারণাকে অবলম্বন করে আমি একটা বিশেষ ঘোড়াকে জানছি। নোবেল জয়ী লেখক ওরহান্ পামুরের বিখ্যাত বই 'মাই নেম ইজ রেড' তাতে ইসলামিক মিনিয়েচারিস্টদের নিয়ে বলতে গিয়ে দেখান হচ্ছে যে তারা ঘোড়া আঁকত। চল্লিশ পঞ্চাশ বছর ধরে ঘোড়া আঁকতে আঁকতে এমন একটা অবস্থাতে চলে যেত যে, চোখ বন্ধ করে তারা ঘোড়া এঁকে দিত। এটাকে একটা কোন বিশেষ ঘোড়া বলে মনে হবে না, এঁকে দিয়ে বলবে, এই ঘোড়াটি হচ্ছে সেই ঘোড়া আল্লার মনে যখন প্রথম ঘোড়ার কল্পনা এসেছিল। ঐ অবস্থাতে এদের কোন কিছু আঁকতে গেলে চোখের দরকার হবে না, মন দিয়েই এঁকে দেবেন। চোদ্দ'শ পনের'শ শতাব্দিতে যত ইসলামিক মিনিয়েচারিস্ট ছিল, বিশেষ করে তুর্কী অঞ্চলে, তাদের জীবনের স্বপ্ন ছিল যে তারা যেন অন্ধ হয়ে যায়। যে শিল্পী অন্ধ হয়ে যেত তারা মনে করত সে হচ্ছে মহৎ শিল্পী। ঐ অবস্থাতে তার চোখের দরকার হয় না, বিনা চোখেই সে আঁকবে, কারণ আল্লার মনের যে কল্পনা ছিল, আর এই শিল্পী যেটা আঁকছে এই দুটো এক। এরা বলত – style is imperfection, when you are imperfect you create a style, ঘোড়া একটা জাতি, আর প্রত্যেকটি ঘোড়া হচ্ছে সেই জাতির প্রতিরূপ, প্রত্যেকটি ঘোড়ার সাথে প্রত্যেকটি ঘোড়ার কিছু না কিছু অমিল আছে, কিন্তু তবুও জাতি রূপে সব ঘোড়া এক। আমরা মানুষ, প্রত্যেকেই আলাদা আলাদা রূপে প্রতিপন্ন হচ্ছি, কিন্তু তবুও আমরা বলছি আমরা সবাই সেই মানুষ। কোন জিনিষকে যখন জানা হচ্ছে তখন তার জাতি দিয়ে জানছি, genre, কিন্তু ব্রহ্মের কোন জাতি নেই, কারণ ব্রহ্মের সমান আর কেউ নেই, সাধারণ থেকে বিশেষে যাব কিভাবে।

তারপর হচ্ছে গুণ, একটা জিনিষকে তার গুণ দিয়ে জানা যায়। বাতাসে দুর্গন্ধ আসছে, বাতাসে সুগন্ধ আসছে। এখানে দুর্গন্ধ সুগন্ধ দিয়ে বাতাসকে বুঝতে পারছি। কিন্তু ব্রহ্ম হচ্ছেন নির্গুণ। ক্রিয়া দিয়ে জানা হল, একটা জিনিষের যে ক্রিয়াবাচক সেটা দিয়ে বস্তুটাকে জানছি, যেমন বাতাস বইছে। বাতাস যে চলছে এই চলা দেখে বুঝতে পারছি বাতাস আছে। ব্রহ্ম হলেন ক্রিয়াহীন। ক্রিয়াহীন কেন? ব্রহ্ম হচ্ছেন অনন্ত, তিনি সর্বব্যাপী, তিনিই আছেন। এখন তিনি কিভাবে কার উপর ক্রিয়া করবেন। ক্রিয়া করবার জন্য একটা জায়গা ও আরেকটা বস্তুর দরকার, কিন্তু বলা হচ্ছে ব্রহ্মই আছেন, তিনি কার উপর আর কোথায় ক্রিয়া করবেন। এই বোতলটা এখানে আছে, আমি টেবিল থেকে তুলে মাটিতে রাখতে পারি। এই বোতলের বাইরে ভেতরে আকাশ রয়েছে তাই এই বোতলকে আমি যেখানে খুশি নিয়ে যেতে পারি। কিন্তু ব্রহ্ম হচ্ছেন অনন্ত, তাই ব্রহ্ম কোথায় নড়াচড়া করবে। সম্বন্ধের মাধ্যমে আমরা একটা জিনিষকে জানতে পারি। ব্রহ্ম হচ্ছেন অদ্বিতীয়, ইন্দ্রিয়ের অবিষয়, সেইজন্য ব্রহ্মের সাথে কারুর কোন সম্বন্ধ করা যাবে না। সম্বন্ধ কিভাবে হয়? ইন্দ্রিয়ের যখন বিষয় হয় তখনই সম্বন্ধ হয়, এই বোতলটা এখানে আছে, এই বোতল আমার চোখের বিষয়। কোন দ্রব্যকে যখন সম্বন্ধ করা হয় তখন তার জন্য একটা আধার আবশ্যক। এই আধারটা হল ইন্দ্রিয়। অথচ ব্রহ্ম ইন্দ্রিয়ের বিষয় হবে না, তাই ব্রহ্মকে কারুর সাথে সম্বন্ধ করা যাবে না। যে চারটের মাধ্যমে আমাদের যে জ্ঞান লাভ হচ্ছে সেই চারটে দিয়ে ব্রহ্মের জ্ঞান লাভ করা যাবে না, এই চারটে হল – জাতি, ক্রিয়া, গুণ ও সম্বন্ধ।

আমাদের শাস্ত্র যেভাবে সৎ আর অসৎ এর ব্যাখ্যা করেছে তাতে সাধারণ মানুষের মনে অনেক সংশয় এসে যেতে পারে, তারা মনে করতে পারে যে আসলে ঈশ্বর বলে কিছু নেই। এই সংশয় যাতে না আসে তাই আবার এখানে উল্টো করে বলছেন। এই পদ্ধতিকে আমাদের শাস্ত্রীয় পরিভাষায় বলা হয় অধ্যারোপ। একটা জিনিষকে বোঝা যাচ্ছে না, তখন সেই জিনিষটার উপর একটা কিছু আরোপ করে দেওয়া হয়। এলপিজি গ্যাসের মধ্যে এক ধরণের কেমিক্যালস্ মিশিয়ে দেওয়া হয়, যাতে গ্যাস লিক হলে গন্ধতে বোঝা যাবে যে গ্যাস লিক হচ্ছে, সেই রকম এখানে পরের শ্লোকে ব্রহ্মের উপর কতকগুলি উপাধি চাপিয়ে দিয়ে বোঝান হচ্ছে –

**সর্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্। সর্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি।।১৩।।**

প্রথমে বলা হল ব্রহ্ম *ন সৎ ন অসৎ*, কিন্তু এখানে এসে বলছেন ঈশ্বরের পা সর্বত্র, সর্বত্র তাঁর মাথা, তাঁর চোখ সব দিকে, সব জায়গায় তাঁর কান, তিনিই সব কিছুতে ছেয়ে আছেন। একদিকে বলা হল, তিনি সৎও নন অসৎও নন, তাহলে আশঙ্কা হবে যে ভগবান বুঝি নেই, সাধারণ লোকেরা ভুল বুঝে বসতে পারে। সেই আশঙ্কাটাকে আটকাবার জন্য এখানে বলা হচ্ছে – তিনি নেই বলতে পারবে না, তিনি আছেন, কিভাবে আছেন? বেদের পুরুষসূক্তমের ভাবটা এইখানে নিয়ে আসা হয়েছে – *সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ*। সহস্র মানে চারিদিকে তাঁর অনন্ত মস্তক, অনন্ত নেত্র, অনন্ত পাদবিশিষ্ট। এখানে কি রকম বলা হচ্ছে? প্রত্যেক প্রাণীর ইন্দ্রিয়রূপ উপাধিতে ক্ষেত্রজ্ঞের মানে অন্তর্যামী রূপে তাঁর অস্তিত্বকে অনুভব করা যায়। ঈশ্বরকে তাঁর সামগ্রিক রূপকে আমরা জানতে পারিনা। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের বাড়িটা কত বড় যদি কেউ জিজ্ঞেস করে তখন আমরা তাকে কিভাবে বোঝাব? আমরা হাত দিয়ে মেপে দেখাতে পারব না, এই হাতের একটা সীমাবদ্ধতা আছে, হাতের যতটুকু সাইজ তার থেকে বড় সাইজের জিনিষকে আমি দেখাতে পারবনা। আমাদের বুদ্ধিরও একটা সীমাবদ্ধতা আছে, বুদ্ধি আমাদের এতটুকু আর তিনি হচ্ছে বিরাট। তাই বুদ্ধি দিয়ে তাঁকে ধরা যাচ্ছে না বলে মুখেও বলতে পারছে না। তাই বলা হচ্ছে, প্রত্যেকটি প্রাণীর যে ইন্দ্রিয়, চোখ, কান, নাক ইত্যাদি কাজ করে চলেছে। কেন ইন্দ্রিয়গুলো কাজ করছে? কারণ ইন্দ্রিয়ের পেছনে একটা চেতন সত্তা বিদ্যমান রয়েছে। প্রত্যেক জীবের ইন্দ্রিয়ের কর্মগুলো যেখানে সমন্বয় হচ্ছে, সেই সত্তাকে দেখে বোঝা যায় তিনি আছেন। তার মানে, এই ইন্দ্রিয়ের কাজ দেখে তাঁর আভাস পাওয়া যায়। সবারই হাত, পা ইন্দ্রিয় কাজ করছে। তাহলে *সর্বতঃ পাণিপাদং তৎ*, সমস্ত দিকে তাঁর হাত পা কাজ করছে। যেখানেই হাত পা ইন্দ্রিয় কাজ করছে, সেখানেই তাঁর সত্তাকে বোঝা যাচ্ছে। এতগুলো ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে কাজ হচ্ছে বলেই জানা যাচ্ছে যে তিনি আছেন। কিন্তু যেভাবে হাত দিয়ে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের বাড়িটাকে বোঝান যাবে না, ঠিক সেই রকম মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয় দিয়ে তাঁর সামগ্রিক রূপকে বোঝান যাবে না। কিন্তু তিনি আছেন এটাকে বোঝান যাবে। তিনি আছেন কি প্রমাণ? আমার চোখ কাজ করছে, আমার হাত পা কাজ করছে। লাটু মহারাজের সাথে একজনের তর্ক হচ্ছিল ভগবান আছেন কি নেই। ঠাকুর খুব সহজ ভাষায় ঠিক এইভাবেই লাটু মহারাজকে বলেছিলেন – তুই বলতে পারলিনা যে, এই জীব, জগৎ, প্রাণী, গাছ, পাতা, ফুল এগুলো আছে, তিনি করেছেন বলেই এগুলো আছে। এই শ্লোকে সৎ অসৎএর সমস্যাটাকে দূর করার জন্য এইভাবে এখানে বোঝান হচ্ছে। এই ভাবটাই স্বামীজীর কবিতাতে আরও সুন্দর ভাবে প্রস্ফুটিত হচ্ছে – জীবে প্রেম করে যেইজন সেইজন সেবিছে ঈশ্বর। যিনি ঈশ্বর, যিনি পরমাত্মা তিনিই আবার সমস্ত জীবে অন্তর্যামী হয়ে বিরাজ করছেন। তিনি অন্তর্যামী হয়ে আছেন বলেই এই চোখ, কান, নাক, হাত, পা সব ইন্দ্রিয় গুলো কাজ করছে।

কঠোপনিষদে একটা শ্লোকে বলছেন – *ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্যঃ। ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ।।*(২/৩/৩)। ব্রহ্মের ভয়ে অগ্নি তাপ দিচ্ছে, সূর্য তাপ বিকিরণ করছে, ইন্দ্র, বায়ু, যম সবাই যার যার কাজ করে চলেছে। ব্রহ্ম চৈতন্য সত্তা যিনি আছেন তিনি থাকার জন্যই এই দেবতারা কাজ করছেন। মৃত্যুর সময় এই চৈতন্য যখন বেরিয়ে যায় তখন প্রথমে হাত, পা কর্মেন্দ্রিয়গুলো বন্ধ হয়ে যায়। তারপর আস্তে আস্তে জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলো বন্ধ হয়ে যায়। ডাক্তারবাবু এসে দেখেন হার্ট এখন কাজ করছে, ব্রেণ এখনও কাজ করছে, কিছুক্ষণ পর এরাও কাজ বন্ধ করে দেয়। মুরগীর মুণ্ডুটা যখন কেটে শরীর থেকে আলাদা করে ছেড়ে দেওয়া হয় তখনও মুরগী ছুটে পালিয়ে যাবে। মুণ্ডুবিহীন হয়ে মুরগী নেচে বেড়াচ্ছে। চৈতন্য সত্তা যখন ছেড়ে চলে গেল তখন তার মৃত্যু হয়ে গেল। কিছুক্ষণ যাবৎ তার ইন্দ্রিয়গুলো চলতে থাকে। কিন্তু ইন্দ্রিয়ের যে প্রধান কাজ, তথ্য সংগ্রহ করে সেটাকে ঠিক মত সাজিয়ে উপস্থাপন করাটা বন্ধ হয়ে যায়। কিছুক্ষণ তাৎক্ষণিক গতিবেগে চলতে থাকে কিন্তু মূল কাজগুলো বন্ধ হয়ে যায়।

যে জিনিষটাকে জানছি সেটাকে বলছে জ্ঞাতব্য, জানার বিষয়। যিনি জানছেন তিনি হলে জ্ঞাতা। এখানে আলোচনা চলছে এই জ্ঞাতাটা কে। এই ব্যাপারে বলছেন জ্ঞাতা হচ্ছেন একমাত্র ব্রহ্ম। সেই ব্রহ্ম যখন সমস্ত প্রাণীর মধ্যে অবস্থান করছেন তখন তাঁকে অন্তর্যামী বলছি। কিন্তু আমি বুঝতে পারছি যে, চোখ, কান, নাক এগুলোই যা কাজ করার করছে। তখন বলছেন, না না, এগুলো সব হচ্ছে যন্ত্র মাত্র। ইন্টারনেটে আমরা যেমন কত রকমের ডাটা ডাউনলোডিং করছি, এগুলোও বিভিন্ন রকমের ডাটাকে ডাউনলোডিং করে আনছে। এখন যে জ্ঞাতা তাঁকে আমি জানব কি করে? শ্রুতি বলছেন, *বিজ্ঞাতারং অরে কেনপি জানিয়াৎ*। প্রায়ই এই উদাহরণটা দেওয়া হয়, আমি আমার ডান হাত দিয়ে জগতের সব কিছুকেই ধরে নিতে পারি, কিন্তু একটা জিনিষকেই ধরতে পারিনা, সেটা হচ্ছে নিজের ডান হাত দিয়ে ডান হাতকে ধরা। আমি এই চোখ দিয়ে সারা বিশ্বের সব কিছুকে দেখতে পারি, কিন্তু একটা জিনিষকেই

দেখতে পারিনা, সেটা হল নিজের চোখকে দেখতে পারিনা। যিনি জ্ঞাতা তিনি কখনই জ্ঞেয় হন না। তাই যিনি প্রকৃত জ্ঞাতা তিনি কখনই জ্ঞানের বিষয় হতে পারেন না। এই তত্ত্বকেই এইখানে এইভাবে উপস্থাপনা করা হচ্ছে। কিন্তু আমি চোখ দিয়ে যা দেখতে পাচ্ছি অন্যরাও সেটাকে দেখতে পাচ্ছে, এখানে সেটাতো খাটবে না। আমার চোখের পেছনে যে নার্ভ সেন্টার রয়েছে সেটাও চৈতন্যের সাহায্যেই কাজ করছে। কিন্তু সবার পেছনে আছেন সেই শুদ্ধ ব্রহ্ম, তাঁকে কেউ কোন দিন জানতে পারবে না। তবে না জানা গেলেও অনুভব করা যায়। কিভাবে অনুভব করা যায়? আমাদের সবার যে চোখ, কান, নাক কাজ করছে তাতে বোঝা যাচ্ছে যে এদের সবার পেছনে একজন চৈতন্য সত্তা আছেন বলেই এরা কাজ করছে। এটা হচ্ছে আভাস মাত্রম্, শুধু আভাসে জানা যায়, অন্য ভাবে জানা যায় না। ঠাকুরও বলছেন – ব্রহ্মকে বোধে বোধ করা হয়। যেভাবে আমরা এই জগতকে দেখছি সেইভাবে ব্রহ্মকে দেখা যায় না। কিন্তু এখানে বলছেন, ভগবানের হাজারটা হাত, হাজারটা পা। তাহলে ভগবানের যদি আর্থারাইটিজ হয়ে যায় তাহলে এত হাত আর এত পায়ের কে চিকিৎসা করবে। বিশ্বরূপ দর্শনে অর্জুন দেখছেন ভগবানের *বহুদরং*, মানে অসংখ্য পেট। আমাদের একটা পেট নিয়েই কত সমস্যা, ভগবানের যদি এ্যাসিডিটি হয় তাহলে কত জেলুসিল খেতে হবে? এই উদ্ভট ভাবনা যাতে মনের মধ্যে না আসে তাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পরের শ্লোকে বলছেন –

**সর্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্বেন্দ্রিয়বিবর্জিতম্। অসক্তং সর্বভৃচ্চৈব নির্গুণং গুণভোক্তৃ চ।।১৪।।**

এর আগে যে ভাবে ভগবানের স্বরূপ বর্ণনা করা হয়েছ, এখন ঠিক তার উল্টো দিক দিয়ে বর্ণনা করা হচ্ছে। প্রথমটা বলা হল আমাদের মত সাধারণ মানুষকে বোঝানর জন্য, এবারে সেটাকেই আবার অপবাদ করা হচ্ছে, মানে যেটা অধ্যারোপ করা হয়েছিল সেটাকে এখন সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। যা কিছ গুণ আছে এগুলো হচ্ছে তাঁর অবভাস, এইভাবে তিনি অবভাসিত হন। এগুলো সবই আভাস মাত্র, আসল নয়। যেমন মরুভূমিতে মরীচিকাতে যে জল দেখা যাচ্ছে সেটা জলের আভাস মাত্র, আসল জল নয়, মরীচিকার জলে কারুর পায়ের পাতাও ভিজবে না। সমুদ্রের জল আসল জল, মরুভূমির জল আভাস মাত্র। আর *সর্বেন্দ্রিয়বিবর্জিতম্* তাঁর কোন ইন্দ্রিয় নেই, সমস্ত ইন্দ্রিয় বিবর্জিত। *অসক্তং সর্বভৃচ্চৈব*, এইটাই হচ্ছে দৈবী রহস্য, তাঁর হাত নেই পা নেই, তাও মনে হয় যেন তিনি চলছেন। অনন্ত যিনি তিনি কোথায় চলবেন, সবটাই তো তিনি। অধ্যাত্ম রামায়ণে ঠিক এইভাবেই বলা হচ্ছে – শ্রীরাম কোথাও যান না, শ্রীরাম কোথাও চলেন না অথচ মনে হচ্ছে তিনি এই করছেন সেই করছেন। যিনি অনন্ত তাঁর চলা ফেরার জন্য আলাদা একটা জায়গার দরকার, এখন তিনিই সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হয়ে রয়েছেন তাই জায়গা কোথায় যে তিনি চলে ফিরে বেড়াবেন। তাই বলা হয় ঈশ্বর কিছুই করেন না, কিছু করার জায়গাই নেই তাঁর। এটাকেই বেদান্ত বলছে মায়া। জড় পদার্থ বল আর চৈতন্য পদার্থ বল, ভগবান ছাড়া কিছুই নেই। তাহলে আমি যে ঘাড় নাড়ছি, আর এই মাইক্রোফোন যে ধ্বণি সম্প্রসারণ করছে এটা কি হচ্ছে? বেদান্ত বলছেন, হ্যাঁ এগুলো ঠিকই করছেন, কিন্তু তুমি কোন কিছু করাটাকে যে অর্থে নিচ্ছ সেই অর্থে এটা করা নয়। এটাকে বলছেন যেন করছেন। এই যেন করছেন বলে এটাকে বেদান্তে বলা হয় ব্যবহারিক সত্তা। আমি যদি পরমার্থ নাও জানি, বাস্তব সত্তাকে যদি নাও জানি তাতে কিছু আসে যায় না, ব্যবহারিক সত্তাতে তোমার কাজ চলে যাবে। তাহলে পরমার্থটা কি? *শুদ্ধ ব্রহ্ম পরাৎপর রাম*। তিনি অনন্ত, নির্গুণ, নিরাকার, তাই তিনি কোথায় যাবেন আর কিই বা করবেন। মায়াতে এসে সেই শুদ্ধ ব্রহ্মকে যেন করছেন বলে মনে হচ্ছে, এইটাই ব্যবহারিক সত্তা। ঠাকুর বলছেন – আমি সেই অখণ্ড সচ্চিদানন্দ ছাড়া আর কিছুই দেখছি না, লেটো ওখানে গালে হাত দিয়ে বসে আছে, আমি দেখছি তিনিই যেন একটা মুখোশ পড়ে গালে হাত দিয়ে বসে আছেন। সমস্ত প্রাণী যেন একটা মুখোশ মাত্র। এখন একজন যদি একটা বাঘের মুখোশ পড়ে নেয় আর আরেকজন যদি একটা ছাগলের মুখোশ পড়ে নেয়। এবার যে বাঘের মুখোশ পড়ে যে আছে সেই ছাগলের মুখোশ পড়া লোকটার দিকে লম্ফঝম্প দিয়ে এগোতে থাকে তখন আমরা কি বলব, মনে হচ্ছে যেন এই বাঘটা ঐ ছাগলটাকে খেয়ে ফেলবে। কিন্তু আসলে খেতে পারবে কি? এটাতো আসল বাঘ নয় আর ওটাও আসল ছাগল নয়। আসল খেতে আসা আর যেন খেতে আসছে এই দুটোর মধ্যে অনেক পার্থক্য। একটা জিনিষ করছে বলতে আমরা যেমন বুঝি এটা কিন্তু আসলে তা নয়। *অসক্তং*, সব সময় অসক্ত, কোন কিছুর সাথে তাঁর কোন যোগ নেই। যেমন মরুভূমিতে যতই জল দেখা যাক, তাতে বালির একটা কণা পর্যন্ত ভিজবে না। ঠিক তেমনি এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে যাবতীয় যা কিছু হয়ে চলেছে তাতে ভগবান কোথাও অসক্ত হবেন না। কারণ এই জগতটা একটা মরীচিকার মত, এর পারমার্থিক সত্তা নেই, কিন্তু ব্যবহারিক সত্তা আছে। টিভিতে যখন মহাভারত সিরিয়াল হয়েছিল তখন সেখানে দেখান হচ্ছে কত লক্ষ লক্ষ লোক মরছে, আসলে কেউই মরেনি। পারমার্থিক দৃষ্টিতে এই জগতের কোনটাই কিছু নয়। যেমন সিনেমাটা আমার কাছে কিছু নয়, তেমনি তাঁর কাছে এই জগতের কোন কিছুই কিছু নয়। কিন্তু আমাদের কাছে জগতের সব কিছুই সত্য, যখন সিনেমা হলে সিনেমা দেখছি তখন ওটাকেই সত্য বলে মনে হচ্ছে, সিনেমা শেষ হয়ে যাওয়ার পর হল থেকে বেরিয়ে পরে মনে হয় সবটাই অভিনয়।

*নির্গুণং গুণভোক্তৃ চ*, তিনি নির্গুণ অথচ তিনি গুণকে ভোগ করছেন, এই চোখ কান নাক দিয়ে আমরা জগতকে ভোগ করছি। একদিকে তিনি নির্গুণ আবার অন্য দিকে তিনি *গুণভোক্তৃ*, বেদান্তে এই ধরণের দ্বন্দ্বাত্মক ও বিপরীত ভাবকে নিয়ে আসা হয়, এটাই বেদান্তের বিশেষত্ব। কারণ যে জিনিষটাকে বাক্য দ্বারা বোঝান যাবে না, কোন ভাবেই প্রকাশ করা যাবে না, অথচ আমাকে বোঝাতে হবে। কিন্তু বোঝাব কি করে, তখন এই ধরণের বিপরীত শব্দ দিয়ে বোঝান হয়। ঈশ্বর কি বস্তু সেতো কখনই কোন ভাবে

বোঝান যাবে না, কারণ তিনি বুদ্ধির বিষয় নয়, সব কিছুকে বিষয়ীকরণ করা যাবে কিন্তু ব্রহ্ম বা আত্মাকে বিষয়ীকরণ করা যায় না। তখন বোঝানর জন্য বিপরীতার্থক বস্তু দিয়ে বোঝান হয়, যেমন এখানে বলছেন তিনি নির্গুণ কিন্তু গুণের ভোক্তা। অনেক দিন জপধ্যান, তপস্যা, নির্জনবাস আর সাধুসঙ্গ না থাকলে এই ধরণের ঈশ্বরীয় তত্ত্বের ধারণা হওয়া খুবই কঠিন। তবে এটা দৃঢ় ভাবে বলা যেতে পারে এই যা কিছু বলা হচ্ছে এসবই ধ্রুব সত্য, এর বেশি আর কিছু বলা যায় না। এতক্ষণ উপাধি নিয়ে বলা হয়েছে এবার ঈশ্বরের গুণ সম্বন্ধে বলা হচ্ছে –

**বহিরন্তশ্চ ভূতানামচরং চরমেব চ। সূক্ষ্মত্বাৎ তদবিজ্ঞেয়ং দূরস্থং চান্তিকে চ তৎ।।১৫।।**

*বহিরন্তশ্চ ভূতানাম্,* সমস্ত ভূত অর্থাৎ জীবের ভেতরে তিনি যেমন আছেন আবার বাইরেও তিনিই আছেন। এই বোতলটাকে যদি গঙ্গার গর্ভে ফেলে দেওয়া হয় তখন এই বোতলের ভেতরেও গঙ্গাজল বাইরেও গঙ্গাজল। সেই ব্রহ্ম, সেই ঈশ্বর বাইরেও আছেন ভেতরেও আছেন। *অচরম্ চরমেব চ,* অচর, মানে তিনি চলতে পারেন না, স্থাবর, তিনি অনন্ত কিনা তাই তিনি চলতে পারেন না, চলে যাবেন কোথায়, যাবার কোন জায়গাই নেই। *চরমেব চ,* অথচ দেখাচ্ছে তিনি চলছেন, এই দেহসমূহ যত আছে সব চলে ফিরে বেড়াচ্ছে। আমি হাত নাড়ছি, আগে বলা হয়েছিল তিনি আছেন বলেই আমি হাত নাড়তে পারছি, বা তিনিই হাত নাড়ছেন। *সূক্ষ্মত্বাৎ তদবিজ্ঞেয়ং,* তিনি অত্যন্ত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম, এখানে সূক্ষ্ম মানে যাঁর বুদ্ধি অত্যন্ত সূক্ষ্ম একমাত্র তিনিই ধরতে পারছেন, স্থূল বুদ্ধি দিয়ে এটাকে ধরা যায় না। *দূরস্থং,* তিনি অনেক অনেক দূরে আবার *চান্তিকে চ তৎ,* তিনি অতি নিকটে। যারা অজ্ঞানী তাদের থেকে ভগবান অনেক দূরে কিন্তু যাঁরা জ্ঞানী তাঁদের কাছে ঈশ্বরের থেকে কাছের জিনিষ আর কিছু নেই। ঠাকুর এই ব্যাপারটাকে খুব সুন্দর করে বলছেন – যারা অজ্ঞানী তারা বলে ভগবান ঐ আকাশে, যাঁরা জ্ঞানী তাঁরা বলে তিনি সবার হৃদয়ে আর যাঁরা বিজ্ঞানী তাঁরা বলেন সর্বভূতে তিনিই আছেন, তিনি ছাড়া আর কিছু নেই। তারপর বলছেন –

**অবিভক্তং চ ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতম্। ভূতভর্তৃ চ তজ্জ্ঞেয়ং গ্রসিষ্ণু প্রভবিষ্ণু চ।।১৬।।**

তিনি *অবিভক্তম্,* এক অনন্তই আছেন, অথচ দেখাচ্ছে বিভক্ত। ঠাকুর বলছেন – ঈশ্বর দুই বার হাসেন, একবার হাসেন যখন দুই ভাই দড়ি ফেলে দিয়ে বলে ঐদিকটা তোর এই দিকটা আমার। কিন্তু সবটাই তাঁর, তিনি *অবিভক্তম্,* কিন্তু আমরা দেখছি আমি আলাদা, আপনি আলাদা, সবাই আলাদা আলাদা। এখানে বলছেন *বিভক্তমিব, ইব* মানে যেন, যেন বিভক্ত। তার মানে এই যত আলাদা দেখছি এগুলো আসলে আলাদা নয়। কেন এই আলাদা দেখাচ্ছে? এইটাই মায়া। *ভূতভর্তৃ চ তজ্জ্ঞেয়ং,* প্রত্যেক প্রাণীর যা কিছুর দরকার হচ্ছে সব তিনি যোগাড় করে দিচ্ছেন, সব কিছুর যোগানদার তিনিই। *তজ্জ্ঞেয়ং,* যিনি জ্ঞেয়, সেই ব্রহ্মই সর্বভূতে অবিভক্ত হয়েও যেন বিভক্ত দেখাচ্ছেন। *গ্রসিষ্ণু প্রভবিষ্ণু চ, গ্রসিষ্ণু* মানে সংহার কর্তা, তিনিই প্রলয় কালে সব গ্রাস করে নেন, *প্রভবিষ্ণু চ,* তিনিই আবার সৃষ্টি করছেন। সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় এই তিনটে তিনিই করেন। আর তাঁর কি গুণ?

**জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতিস্তমসঃ পরমুচ্যতে। জ্ঞানং জ্ঞেয়ং জ্ঞানগম্যং হৃদি সর্বস্য ধিষ্ঠিতম্।।১৭।।**

*জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতিঃ,* তিনি সমুদয় জ্যোতিরও জ্যোতি। আমরা এই টিউব লাইটের আলো দেখছি, এই আলোটা কোথা থেকে আসছে? ইলেক্ট্রিসিটি থেকে আসছে। ইলেক্ট্রিসিটি কোথা থেকে আসছে? জল থেকে। জল কোথা থেকে আসছে? মেঘ থেকে যে বর্ষণ হচ্ছে তার থেকে। মেঘ কিভাবে হচ্ছে? সূর্যের তাপে। তাহলে এই টিউবলাইটের আলোটা আসলে কি? সূর্যেরই আলো। সূর্যেরা আলোটা আসলে কি? মূলতঃ এ্যাটমিক ফিউশান আর ফিশান। তাহলে সূর্যের এই আলোই কি শেষ কথা? না তা নয়। এরও পেছনে তিনি আছেন বলেই সূর্য আলো বিকিরণ করছে। তিনি জ্যোতিরও জ্যোতি, তিনি আছেন বলেই সূর্য আলো দিচ্ছে। *তমসঃ পরমুচ্যতে,* সেখানে কোন অন্ধকারের কল্পনা করা যায় না। পৃথিবীতে আমরা দিন আর রাতের কল্পনা করি, কিন্তু সূর্যে দিন আর রাতের কোন প্রশ্নই নেই, কারণ সূর্যে সর্বদাই আলো। ঠিক তেমনি ঈশ্বর হচ্ছেন জ্যোতির্ময়, সমস্ত তমসার পারে। *জ্ঞানং জ্ঞেয়ং জ্ঞানগম্যং,* একটু আগে যে বলা হল কারক, ক্রিয়া ও কর্ম, মোট যে নয়টি দ্বারা কর্ম হয়, সবটাই তিনি। জ্ঞানের ব্যাপারেও ঠিক তাই হয়, তিনি হচ্ছেন জ্ঞান, তিনি হচ্ছেন জ্ঞেয় আর তিনিই জ্ঞানগম্য। *হৃদি সর্বস্য ধিষ্ঠিতম্,* তিনিই সকলের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত আছেন।

**ইতি ক্ষেত্রং তথা জ্ঞেনং চোক্তং সমাসতঃ। মদ্ভক্ত এতদ্বিজ্ঞায় মদ্ভাবয়োপপদ্যতে।।১৮।।**

হে অর্জুন তোমাকে সংক্ষেপে ক্ষেত্রের ব্যাপারে বললাম, জ্ঞানের ব্যাপারে বলা হল আর জ্ঞেয়র ব্যাপারে বললাম। জ্ঞান মানে যেটা দিয়ে জানা যাবে। কাকে জানা যাবে? জ্ঞেয়কে। জ্ঞেয় কে? ঈশ্বর বা ব্রহ্ম। ব্রহ্মের বিষয়ে বলা হল। ব্রহ্মের কাছে কিভাবে পৌঁছাবে সেটাও বললাম। তার বাইরে যে অজ্ঞান, ক্ষেত্রের মাধ্যমে সেটাও বর্ণনা করা হল। মূল কথা হল ঈশ্বর কি, সংসার থেকে ঈশ্বরের কাছে যাবার পথ কি এই তিনটের ব্যাপারে তোমাকে সংক্ষেপে জানান হল।

*মদ্ভক্ত এতদ্বিজ্ঞায় মদ্ভাবয়োপপদ্যতে*, আমার যারা ভক্ত, ঈশ্বরকে যারা ভক্তি করে, তারা যখন এই তিনটে জিনিষকে ঠিক ঠিক বুঝে নেয়, তখন তারা মোক্ষ লাভ করে। আমার যে ভাব সেটাকে পেয়ে ধন্য হয়ে যায়। শ্রীরামকৃষ্ণকে যারা ভক্তি করে তারা শ্রীরামকৃষ্ণের ভাব লাভ করে। শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবটা কি? ত্যাগ, তপস্যা, দয়া, ক্ষমা, আধ্যাত্মিকতা। ভক্তরা মনে করে শ্রীরামকৃষ্ণের জপ করছি, মৃত্যুর পর শ্রীরামকৃষ্ণলোকে যাব। না তা নয়, শ্রীরামকৃষ্ণের ভাব, মানে জন্ম-মৃত্যুর যে বন্ধন এইটা থেকে মুক্ত হয়ে যায়।

৯ই অক্টোবর ২০১০

আমাদের এখানে মনে রাখতে হবে বেদান্তে জড় আর চেতনের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই, যেটা জড় সেটাই চেতন, যেটা চেতন সেটাই জড়। কিন্তু তফাৎটা হয় অভিব্যক্তিতে, প্রকাশেই তারতম্যটা ধরা পড়ে। চৈতন্য যেটা প্রতিবিম্বিত হচ্ছে তারমধ্যে তারতম্য হয়। সূর্যের আলো সব কিছুতেই পড়ছে কিন্তু আয়নাতে যত পরিষ্কার প্রতিফলন হবে পাথরে তার তুলনায় কম হবে। পাথরের থেকে জলে আবার ভালো প্রতিফলন হবে। জড় আর চেতন সবটা ভগবানরই, জড়টাও ভগবানের চেতনটাও ভগবানের। কিন্তু আমাদের সুবিধার জন্য আমরা দুটো ভাগে বিভক্ত করে বলছি এটা হচ্ছে জড় আর এটা হচ্ছে চৈতন্য। জড় আর চেতনই হয়ে যায় ক্ষেত্র আর ক্ষেত্রজ্ঞ। যিনি জানেন তাঁকে বলা হয় ক্ষেত্রজ্ঞ আর যেটাকে জানা হয় সেটাকে বলা হচ্ছে ক্ষেত্র। এরপর বলা হচ্ছে –

**প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব বিদ্ধ্যনাদী উভাবপি। বিকারাংশ্চ গুণাংশ্চৈব বিদ্ধি প্রকৃতিসম্ভবান্।।১৯।।**

সপ্তম অধ্যায়ে বলা হয়েছিল ভগবানের দুটো প্রকৃতি, পরা ও অপরা। ভগবানরই এই দুটো রূপ। যেমন আমরা বলি ভগবানের দুটো রূপ – সাকার আর নিরাকার। অপরা প্রকৃতি হচ্ছে নিম্ন প্রকৃতি যার থেকে সমস্ত জড় পদার্থের সৃষ্টি হচ্ছে আর পরা প্রকৃতি হচ্ছে উচ্চ প্রকৃতি, যাকে চৈতন্য বলা হয়। যেমন আমি আছি, আমি বুঝতে পারছি আমার হাত, আমার কান, আমার চোখ আছে এগুলো সবই জড় পদার্থ। কিন্তু আমি যে বোধ হচ্ছে এটাই হল চৈতন্য। এই দুটো জিনিষ জড় আর চৈতন্য হচ্ছে অপরা আর পরা প্রকৃতির সৃষ্টি।

এখন এখানে বলছেন *প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব বিদ্ধ্যনাদী উভাবপি*। আমরা এর আগে বলেছিলাম যে গীতা হচ্ছে সমন্বয় শাস্ত্র। দুটো মত আছে, একটা মত একদিক দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে আরেকটা মত অন্য দিক নিয়ে যাচ্ছে, গীতা এই দুটো মতকে সমন্বয় করে দিচ্ছে। ভারতের বেশির ভাগ দর্শন পুরুষ আর প্রকৃতিকে মানে না, আবার অনেক দর্শন আছে যারা ঈশ্বরকে মানে না। যেমন সাংখ্যদর্শন, যেটি ভারতের আধ্যাত্মিক দর্শনে বেদান্তের পরেই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দর্শন। সাংখ্যদর্শনের যিনি প্রবক্তা কপিল মুনিকে বলা হয় ভারতীয় দর্শনের জনক। সাংখ্যদর্শনের বক্তব্য প্রচণ্ড দৃঢ় যুক্তির উপর দাঁড়িয়ে আছে। আমরা সবাই ঈশ্বরকে নিয়ে আর ধর্ম ধর্ম করে এতো মাতামাতি করি কিন্তু বেশির ভাগই জানেনা যে হিন্দু ধর্মের পেছনে যে সাংখ্যদর্শনের মত একটি অনন্য বলিষ্ঠ স্বতন্ত্র দর্শন রয়েছে, অথচ এই দর্শনে ঈশ্বরের কোন কথাই নেই।

সাংখ্যদর্শনের মূল বক্তব্য হচ্ছে – দুটো নদী গঙ্গা আর যমুনা পাশাপাশি প্রবাহ হয়ে চলেছে। গঙ্গা ও যমুনা পাশাপাশি চলতে চলতে কোন কোন জায়গায় এক হয়ে যাচ্ছে, যেমন এলাহাবাদ সঙ্গমে। মিশে গিয়ে কিছুটা চলার পর আবার আলাদা হয়ে যায়। চলতে চলতে আবার তারা পরস্পরে মিশে যাচ্ছে, বাংলা চারকে আড়াআড়ি করে লেখা হলে যেমনটি হয়। সাংখ্যে একটা নদী হচ্ছে চৈতন্যের বা পুরুষ, আরেকটা নদী হচ্ছে জড় পদার্থের বা প্রকৃতি। প্রকৃতি আর পুরুষ, এই দুটো নদী আদি কাল থেকে নিজের মতে বয়ে চলেছে, আর অনন্তকাল ধরে এইভাবে চলতেই থাকবে। যখনই প্রকৃতি আর পুরুষের মিলন হয় তখন সৃষ্টির খেলা শুরু হয়ে যায়। এখানে পুরুষ মানে ব্যাটাছেলে আর প্রকৃতি মানে কোন নারীকে বোঝাচ্ছে না, পুরুষ মানে চৈতন্যকে বলা হচ্ছে আর প্রকৃতি মানে জড়। যখন পুরুষ প্রকৃতির কাছাকাছি চলে আসে তখন প্রকৃতি পুরুষকে দেখে নৃত্য শুরু করে দেয়। যেমন চুম্বক পাথর লোহার টুকরোর পাশ দিয়ে নিয়ে গেলে লোহার টুকরো গুলো নাচতে শুরু করে দেয়। এদিকে প্রকৃতি যখন নাচতে শুরু করে দেয় তখন পুরুষ প্রকৃতিকে এত ভালোবেসে ফেলে যে, ভাবে যে আমিই নাচ করছি। প্রকৃতির নৃত্যকে পুরুষ মনে করে এটা আমারই নৃত্য। পুরুষ এইভাবে প্রকৃতির নৃত্যে মুগ্ধ হয়ে যায় আর এইখান থেকেই সৃষ্টি হয় সংসারের। এইবার সংসার চলতে শুরু করল। সংসার চলতেই থাকছে, এইভাবে চলতে চলতে একটা সময় বিভিন্ন ভাবে মানুষ যখন দুঃখ পায়, আঘাত পায়, কষ্ট পায়, অশ্রুপাত হয়, তখন বলে আমার এইসব কিছু লাগবে না। তখন পুরুষ প্রকৃতির যে মায়া সেইখান থেকে সরে আসতে থাকে। পুরুষ যখন প্রকৃতির কাছ থেকে সরে আসতে থাকে তখন প্রকৃতি আবার নতুন রকমের খেলা নিয়ে পুরুষের সামনে হাজির হয়। তখন পুরুষ আবার প্রকৃতিতে মুগ্ধ হয়ে পড়ে। আবার প্রকৃতি থেকে যখন পুরুষ কষ্ট পায় তখন আবার সে প্রকৃতি থেকে সরে আসতে শুরু করে। এইভাবে চলতে চলতে প্রকৃতির ভাণ্ডারে যত রকমের খেলা দেখানো মজুত থাকে সব যখন শেষ হয়ে যায়, পুরুষও যখন বুঝে নেয় যে আমার প্রকৃতির সব খেলা দেখা মিটে গেছে, তখন সে বলে আমার আর কোন কিছুই লাগবে না। তখন পুরুষ আর প্রকৃতির নদীটা আবার আলাদা হয়ে যায়।

এই পুরুষ আর প্রকৃতিকে বলা হচ্ছে *বিদ্ধ্যানাদী উভাবপি*, ভেতরে যে চৈতন্য সত্তা আছেন তিনি অনন্ত ও অনাদি আর প্রকৃতি, মানে যে জড় পদার্থ সেটাও অনাদি। *বিকারাংশ্চ গুণাংশ্চৈব*, প্রকৃতির যখন বিবর্তন হতে শুরু হয়, মানে প্রকৃতি থেকে আসছে মহৎ, মহৎ থেকে অহঙ্কার, অহঙ্কার থেকে সূক্ষ্ম ভূত, স্থূল ভূত, স্থূল ভূত থেকে ইন্দ্রিয়াদি, এগুলো সব বেরোচ্ছে প্রকৃতি থেকে। এখানে বক্তব্য হচ্ছে পুরুষ যিনি, যাকে চৈতন্য বলা হচ্ছে, আত্মা যিনি তাঁর কখনই কোন রকমের বিকার বা বিবর্তন হয় না। যা কিছু বিকার, পরিবর্তন সব প্রকৃতিতেই হচ্ছে, আত্মাতে এই ধরণের কিছু হয় না। এই জায়গাটাকে আমরা অনেকেই ধরতে পারিনা, এটা একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিক। যে জিনিষের পরিবর্তন হয় সেটাই প্রকৃতির অন্তর্গত। আমাকে কেউ প্রশংসা করলে মনটা খুশিতে ভরপুর হয়ে যায়, আবার আমাকে কেউ গালাগাল দিলে মনটা বিমর্ষ হয়ে গেল। তাহলে মনটা এক সময় ভালো হচ্ছে আরেক সময় খারাপ হচ্ছে, মনটা তাই জড় পদার্থ বা প্রকৃতির হয়ে গেল। আমরা ছোটবেলা থেকে শিক্ষা পেয়ে এসেছি যে মনই সব, মনের বাইরে আর কিছু নেই। কিন্তু বেদান্তে ও সাংখ্যে মন হচ্ছে অতি সাধারণ বস্তু। আমাদের এই শরীরের যাবতীয় যা কিছু আছে সবই বয়স বাড়ার সাথে সাথে পাল্টে যাচ্ছে, তাই এই শরীরের সব কিছুই হচ্ছে জড় পদার্থ। মহাকাশে যত নক্ষত্র, তারা, নক্ষত্রপুঞ্জ, এই পৃথিবীর যা কিছু আছে সব কিছুই প্রকৃতির অন্তর্গত। বিকারধর্মী যা কিছু আছে সবই প্রকৃতি মানে জড়।

সাংখ্যদর্শনের হল এই মতবাদ। বেদান্ত আর সাংখ্য একই দর্শন কিন্তু বেদান্ত আর সাংখ্যের তফাৎ হচ্ছে, সাংখ্য মতে পুরুষ আর প্রকৃতি পুরো আলাদা, এরা দুটো যেন নদী, অনাদি অনন্ত কাল থেকে বয়ে চলেছে। কিন্তু বেদান্ত মতে যিনি ভগবান বা ঈশ্বর বা আত্মা তাঁর একটা অংশ যেন জড় প্রকৃতি হয়ে যায়। যেহেতু ভগবান অনন্ত সেইজন্য জড় পদার্থও অনন্ত। ভগবান অনন্ত বলে চৈতন্য বা পুরুষও অনন্ত। সেইজন্য বলছে পুরুষ আর প্রকৃতি অনন্ত। কেন বলছে অনন্ত? কারণ অনন্তের কোন অংশ হতে পারেনা। একটা জিনিষ বৃহৎ তার অংশ হতে পারে কিন্তু যিনি অনন্ত তাঁর কোন অংশ হয় না। ভগবান অনন্ত তাই তাঁর যা কিছু আছে সেটাও অনন্ত। সপ্তম অধ্যায়ে ভগবান বলছেন আমারই দুটো প্রকৃতি, পরা ও অপরা। তাই পরা প্রকৃতি যেমন অনন্ত অপরা প্রকৃতিও অনন্ত। এখানে এসে সাংখ্য আর বেদান্ত এক হয়ে গেল। ত্রয়োদশ অধ্যায়ের এই ঊনিশ নং শ্লোক খুবই গভীর এক তত্ত্বকে উপস্থাপন করছে, এই শ্লোকটিই সাংখ্যদর্শন আর বেদান্ত দর্শনের মেলবন্ধন করাচ্ছে। মুশকিল হল সাংখ্যদর্শনকে পুরোপুরি মেনে নিলে অনেক ক্ষেত্রে সমস্যা এসে যায়, বেদান্ত দর্শনও আবার সাংখ্যদর্শনকে গ্রহণ করতে অস্বীকার করে। কিন্তু সাংখ্যের কিছুটা আর বেদান্তের কিছুটা নিয়ে ব্যাসদেব আর শঙ্করাচার্য এখানে সাংখ্য আর বেদান্তকে মিলিয়ে দিচ্ছেন। সাংখ্যদর্শনকে বলছেন তুমি যে বলছ পুরুষ আর প্রকৃতি এই দুটো অনাদি আর অনন্ত, তুমি ঠিকই বলছ, এর মধ্যে ভুল কিছু নেই। কিন্তু এই দুটো ভগবানরই। যেহেতু ভগবান অনন্ত তাই এই দুটোকেও অনন্ত হতেই হবে। তার মানে এনারা সাংখ্য থেকে এক কদম পেছনে গিয়ে বেদান্ত আর সাংখ্যকে প্রায় এক জায়গাতে এনে দাঁড় করিয়ে দিলেন। স্বামীজী বেদান্ত আর সাংখ্যের উপরে যত ভাষণ দিয়েছেন তিনি কিন্তু সাংখ্য আর বেদান্তের মিল যেখানে আছে সেই জায়গাতে বেশি জোর দিয়েছেন। এখন যে দর্শনগুলো আমাদের সামনে আসছে, বেদান্ত দর্শন যেভাবে এগুলোকে ব্যাখ্যা করেছে, বিশেষ করে স্বামীজী যেভাবে ব্যাখ্যা করেছেন, সেটা কিন্তু শঙ্করাচার্যেরই মত, যেটা আচার্য এই শ্লোকের ভাষ্যে ব্যাখ্যা করেছেন। ভগবান অনন্ত বলে তাঁর সব কিছুই অনন্ত, তাঁর প্রকৃতিও অনন্ত। তাঁর প্রকৃতি দুই ধরণের পরা ও অপরা প্রকৃতি, পরা প্রকৃতি পুরুষ বা চৈতন্য আর অপরা প্রকৃতি জড় পদার্থ। কিন্তু পুরুষ প্রকৃতির মিলনে যা কিছু ক্রিয়া বিক্রিয়া আর তার যা ফল হচ্ছে সেটাও কিন্তু প্রকৃতির অন্তর্গত।

এই শ্লোকটি এই দিক থেকেও খুব তাৎপর্য যে এখানে ঈশ্বর এই শব্দটা কোথাও আনা হচ্ছে না, বলা হচ্ছে পুরুষ আর প্রকৃতি। আচার্য শঙ্কর খুব সুন্দর একটা যুক্তি দিয়ে সাংখ্য মতাবলম্বীদের বলছেন, ঈশ্বরকে যদি পুরুষ আর প্রকৃতির উপরে না মানা হয় তাহলে আমাদের যত শাস্ত্র আছে সব মিথ্যা হয়ে যাবে। কারণ এই দুজনকে কাছে আনার জন্য একজনকে দরকার। ঠাকুরকে গিরিশ ঘোষ জিজ্ঞেস করছেন – গুরুর কি প্রয়োজন আছে? গুরুকে কেন দরকার? ঠাকুর বলছেন গুরু হলেন ঘটক। আগেকার দিনে ঘটকরা ছেলের জন্য মেয়ে খুঁজত আর মেয়ের জন্য ছেলে খুঁজত। এখন ঘটকের ঘটকালি উঠে গেছে, বর্তমানে ছেলে মেয়েরা নিজেরাই ইন্টারনেটে নিজেদের পছন্দের পাত্র-পাত্রী খুঁজে বেড়াচ্ছে। আজকের যুগে ইন্টারনেটকেই ঘটক বলা যেতে পারে। সাংখ্যের পুরুষ আর প্রকৃতি অনন্ত, কিন্তু এদের মিলন ঘটাবে কে? তার কারণ পুরুষ যিনি চৈতন্য সে অক্রিয়, চলতে পারেনা। অন্য দিকে প্রকৃতি সে সক্রিয় কিন্তু তার বুদ্ধি নেই, জড়। পুরুষ যখন প্রকৃতির কাছে চলে আসে তখন প্রকৃতিতে বুদ্ধি এসে যায়। কিন্তু পুরুষ প্রকৃতির কাছে আসবে কিভাবে? একজনের চলার ক্ষমতা নেই, পুরুষ চৈতন্য তাই তাঁর চলার কিছু নেই, আর প্রকৃতির বুদ্ধি নেই, আমি কোন দিকে যাব, কিভাবে যাব এটা বোঝার বুদ্ধিও প্রকৃতির নেই। সেইজন্য ভগবানের দরকার, ভগবান না হলে দুজনের মিলন হতে পারেনা। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, যদি চৈতন্য আর জড় অনন্ত হয়, সেই চৈতন্য বা পুরুষ যখন প্রকৃতির ফাঁদে আটকে যায় তখন সে বেরোবে কি করে? যে জিনিষটা অনন্ত সেখানে থেকে বেরিয়ে আসার কোন প্রশ্নই হয় না। এখন প্রকৃতি অনন্ত, তার শক্তিও যদি অনন্ত হয় তাহলে আত্মা বা পুরুষ যে বন্ধনে পড়ে গেছে সেতো কোন দিনই প্রকৃতি থেকে বেরোতে পারবে না। কিন্তু সব শাস্ত্রের শেষ কথা হল মুক্তি, সব ধর্ম সব শাস্ত্র মুক্তি মুক্তি করে চিৎকার করে চলেছে। এই যদি পরিস্থিতি হয় তাহলে কি করে মুক্তি সম্ভব? তখন এক

তৃতীয় সত্তাকে থাকতেই হবে, যিনি এই পুরুষ ও প্রকৃতির থেকে বেশি ক্ষমতাবান ও শক্তিশালী আর এই দুটোরই তিনি বাইরে, সেই তৃতীয় সত্তা যিনি, তিনিই হচ্ছেন ভগবান। প্রকৃতি আর পুরুষের কথা বলার পর বলছেন সংসারটা কি?

**কার্যকরণকর্তৃত্বে হেতুঃ প্রকৃতিরুচ্যতে। পুরুষঃ সুখদুঃখানাং ভোক্তৃত্বে হেতুরুচ্যতে।।২০।।**
**পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো হি ভুঙ্ক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্। কারণং গুণসঙ্গোঽস্য সদসদ্যোনিজন্মসু।।২১।।**

সংসারটা কি? ভোগ আর ভোক্তাই হল সংসার। যদি ভোক্তা না থাকে তাহলে ভোগের সামগ্রী রেখে কোন উদ্দেশ্যই সিদ্ধ হবে না। অন্য দিকে যদি ভোগ না থাকে তাহলে ভোক্তা থেকেও কিছুই হবে না। সংসার হতে গেলে এই দুটো ভোগ আর ভোক্তৃত্বকে চাই। *কার্যকরণকর্তৃত্বে*, কার্য মানে এখানে শরীর আর করণ হচ্ছে এই ইন্দ্রিয়গুলো, কর্তৃত্ব হচ্ছে যেখানে আমি কাজ করছি এই বোধ হচ্ছে। যত রকমের কার্য আর কার্যের যত রকমের রূপ আছে, তার করণ আর এই বোধ যে আমি করছি, এগুলো সবই *প্রকৃতিরুচ্যতে*, প্রকৃতির অন্তর্গত। *পুরুষঃ সুখদুঃখানাং*, এই পুরুষ, যিনি চৈতন্য, এই শরীরের মধ্যে অবস্থান করছেন, তিনিই এই সব *সুখদুঃখানাং ভোক্তৃত্বে হেতুরুচ্যতে*, সব কিছুর একমাত্র ভোক্তা তিনিই। ভোগ কে করছে? পুরুষ। কাকে ভোগ করছে? প্রকৃতিকে। কার মাধ্যমে ভোগ করছে? প্রকৃতির মাধ্যমেই করছে। পুরুষ প্রকৃতির দ্বারাই প্রকৃতিকে ভোগ করে। যেমন, পুরুষ একটা ভালো দৃশ্য দেখছে। এখন এই দৃশ্য সে কি দিয়ে দেখছে? চোখ দিয়ে। চোখটা প্রকৃতির, যাকে করণ বলা হয়েছে। দৃশ্য যেটা দেখছে সেটাও প্রকৃতির। কে দেখছে? পুরুষ বা চৈতন্য। ঠাণ্ডা জলে যদি গরম লোহাকে চুবিয়ে দেওয়া হয়, তখন জল হয়ে যায় গরম, লোহা হয়ে যায় ঠাণ্ডা। পুরুষের সাথে যখন প্রকৃতির মিলন হয় তখন ঠিক এই জিনিষটাই হয়। এরা দুজনেই বিপরীত ধর্মী, মানে পুরুষ হচ্ছে চৈতন্য প্রকৃতি জড়। কিন্তু যখন মিলন হয় তখন পুরুষ মনে করে এই সুখ দুঃখ সব আমার, অন্য দিকে প্রকৃতি মনে করতে শুরু করে আমি চৈতন্য, চৈতন্যটা আমার। এর ফলে আমার যে মন সেটা হচ্ছে জড়, কিন্তু মন ভাবছে আমিই চৈতন্য, আর আমি, যে ভোক্তা, সে মনে করে আমি সুখী আমি দুঃখী। কিন্তু চৈতন্যের কখনই সুখ-দুঃখ হতেই পারেনা। আমরা যখন কারুর প্রশংসা করি আসলে আমরা তার মনেরই প্রশংসা করছি। যাকে প্রশংসা করা হচ্ছে সে মনে করছে আমার মনটা কত বুদ্ধিমান। কিন্তু মনের কোন বুদ্ধি নেই। আবার যখন কারুর সমালোচনা করছি তখন তিনি বলছেন – তুমি আমার বুকে খুব কষ্ট দিলে। আসলে তিনি বলতে চাইছেন তাঁর যে অনুভূতি হচ্ছে এটা বেদনাদায়ক। তাঁর তো বেদনাগ্রস্থ হওয়ার কথা নয়, বেদনা প্রাপ্ত হওয়া তো মনের কাজ। কিন্তু পুরুষ নিজেকে বোকার মত মনের সাথে একত্ব করে নেয়। বিয়ের পর স্বামী স্ত্রীর হাত ধরে বা স্ত্রী স্বামীর হাত ধরে বলে – তোমার দুঃখ আমার দুঃখ, তোমার সুখ আমার সুখ। কিন্তু বোঝেনা যে তুমি তুমিই, আমি আমিই, তোমার জ্বর হলে আমার জ্বর হবে না, তোমার হাত কেটে গেলে আমার হাত দিয়ে রক্ত বেরোবে না। পুরুষ আর প্রকৃতি বিপরীতে ধর্মী কিন্তু এ ওকে ও তাকে ধরে নিয়ে অপরের ধর্মটাকে নিজের ধর্ম মনে করে পুরুষ মনে করে আমি সুখী আমি দুঃখী, আর প্রকৃতি মনে করে আমি চৈতন্য। মন জড় কিন্তু সে ভাবছে আমার বুদ্ধি, আমার জ্ঞান। আর আমি ভাবি, আমার কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু আমারতো কষ্ট হবার কথা নয়। আসল আমিটা কে? মানুষের যখন মুক্তি হয় যায়, যখন তার জ্ঞানলাভ হয় তখন মানুষ এইটাই দেখে যে আমার আসল আমিটতো আত্মা, আত্মার সাথে এসবের কোন সম্পর্কই নেই, এগুলো তো মনের ধর্ম, শরীরের ধর্ম।

মূল কথা হল, আমার যে শুদ্ধ চৈতন্য আত্মা এই প্রকৃতির সাথে নিজেকে এক করে নিয়েছে। এর আগে যেমন বলেছিলেন – *অসক্তিরনভিষঙ্গঃ পুত্রদারগৃহাদিষু*, তুমি তোমার সন্তানের সঙ্গে এক করে রেখেছে, তোমার স্ত্রী, তোমার বাড়ি, গাড়ি, সম্পত্তির সাথে জুড়ে দিয়েছে। নতুন গাড়িটা এ্যাক্সিডেন্টে ভেঙ্গে গেল আমি কান্না শুরু করে দেই। বিরাট সম্পত্তি এসে গেল আমি আনন্দে লাফিয়ে উঠছি। এই সম্পত্তি, এই বাড়ি, গাড়ির সাথে আমার আদপেই কোন সম্পর্ক নেই। গাড়ীটা কি আমার শরীর? শরীর নয়, কিন্তু গাড়ীর সাথে আমি নিজেকে একত্ব অনুভব করছি বলে গাড়ীটা ভেঙ্গে যাওয়াতে আমার ব্যাথা অনুভব হচ্ছে। ঠিক সেইভাবে আমরা আমাদের শরীরের সাথে নিজেকে এক করে রেখে মনে করছি শরীরটাই আমি, এর ফলে শরীরের ধর্মানুসারে যা কিছু হচ্ছে তাতে আমরা অস্থির হয়ে পড়ছি। যারা আরেকটু উপরে তারা নিজের মনের সাথে একত্ব করে নেয়, মনের ভালো হলে সে সুখী হচ্ছে, মনের খারাপ কিছু হলে সে ভেঙ্গে পড়ছে। এই যা কিছু সুখ-দুঃখ, ব্যাথা বেদনা, আনন্দ, নিরানন্দ সব কিছুর একটাই কারণ, তা হল পুরুষ প্রকৃতির সাথে নিজেকে বেঁধে ফেলে প্রকৃতির ধর্মকে নিজের ধর্ম করে নিয়েছে। এখানে কিন্তু মনে রাখতে হবে এই প্রকৃতি কিন্তু নারী নয় আর পুরুষ ব্যাটাছেলে নয়। পুরুষ হচ্ছে চৈতন্য আর প্রকৃতি হল জড়। এর মধ্যে আমি হচ্ছি পুরুষ যুক্ত প্রকৃতি, যে নারী সেও পুরুষ যুক্ত প্রকৃতি। যত পশু আছে সব পশুও এই পুরুষ আর প্রকৃতির মিলনের ফল। কিন্তু পরের দিকে কেউ কেউ প্রকৃতিকে নারীর সঙ্গে জুড়ে দিয়েছে, সাংখ্যে কোথাও নারী-পুরুষের কথা বলা হচ্ছে না। একজন নারীর যে সমস্যা সেই একই সমস্যা একজন পুরুষরেও। স্থুল শরীর থেকে যখন সূক্ষ্ম শরীরে বেরিয়ে যায় তখন নারী-পুরুষের আর কোন বিভেদ থাকছে না। যে সূক্ষ্ম শরীর মৃত্যুর পর স্থুল শরীরকে ছেড়ে বেরিয়ে আসছে পরে সে নারীর শরীরেও জন্ম নিতে পারে আবার পুরুষ শরীরেরও জন্ম নিতে পারে। যিনি এই সূক্ষ্ম শরীরের পেছনে আছেন তাঁর পুরুষ-নারীর কোন ভেদ নেই। সূক্ষ্ম শরীর যে ধরণের স্থুল শরীর ধারণ করবে, সেই শরীরের মত সে কাঠামো পেয়ে যাবে। কিন্তু স্থুল আর সূক্ষ্ম শরীরের পেছনে আত্মার কাছে চলে গেলে নারী পুরুষের ভেদের কোন প্রশ্নই থাকে না। এটাকে আরও ভালো বোঝা যাবে, আমাদের শাস্ত্র কখনই মেয়েদের জন্য আলাদা সাধনা আর ছেলেদের আলাদা সাধনার কথা বলে

না, কেননা মনের যে সমস্যা সেটা ছেলে-মেয়ে উভয়ের ক্ষেত্রে এক। আমাদের হিন্দু দর্শনের ধারণা অনুসারে পরবর্তি জন্মে একটা মেয়ে ছেলে হয়ে যেতে পারে ছেলে মেয়ে হয়ে যেতে পারে।

এবারে তুমি বুঝে গেলে পুরুষ কি, প্রকৃতি কি, এদের কি কি ধর্ম, এবারে তোমাকে জানতে হবে যিনি ঠিক ঠিক ক্ষেত্রজ্ঞ তিনি কি রকম। ভগবান আবার আমাদের ভেতরের দিকে দৃষ্টিটা ঘুরিয়ে দিচ্ছেন –

**উপদ্রষ্টানুমন্তা চ ভর্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ। পরমাত্মেতি চাপ্যুক্তো দেহেঽস্মিন্ পুরুষঃ পরঃ।।২২।।**

যিনি পুরুষ, আত্মারূপে শরীরের ভেতরে অধিষ্ঠান করে আছেন, তাঁর কি কি ধর্ম? তিনি হলেন *উপদ্রষ্টা,* মানে সাক্ষী হয়ে সব কিছু দেখে যাচ্ছেন। আসলে আত্মার একটা ধর্ম হচ্ছে তিনি কোন কিছুতেই জড়ান না। তিনি *অনুমন্তা,* যিনি অনুমোদন করেন। এই জিনিষটা আবার সাংখ্য থেকে নিয়ে আসা হয়েছে। ঠাকুর খুব সুন্দর উপমা দিয়ে এই *অনুমন্তাকে* বুঝিয়ে দিচ্ছেন। কাজের বাড়িতে গিন্নী সব কাজ করে যাচ্ছে, বাড়ির কর্তা এক জায়গায় বসে ভুরুর ভুরুর করে তামাক টেনে যাচ্ছে। গিন্নী মাঝে মাঝে আঁচলে হাত মুছতে মুছতে এসে কর্তাকে জানিয়ে যাচ্ছে, এই কাজটা করতে হবে, কর্তাও হুঁম্ একটা শব্দ করে অনুমোদন করে দিচ্ছে। প্রকৃতিও চৈতন্যের অনুমোদন ছাড়া কোন কাজ করতে পারেনা, চৈতন্য সত্তা আছে বলেই প্রকৃতি সব করতে পারছে। চৈতন্য সত্তা যখন শরীর থেকে বেরিয়ে যায় তখন শরীর থাকলেও মানুষ কিছুই করতে পারেনা, কারণ তার অনুমোদন করার তখন কেউ নেই। *ভর্তা* শব্দের অর্থ হচ্ছে যিনি আমাদের প্রয়োজনীয় যা কিছু আছে তা সরবরাহ করেন। ভর্তা শব্দ থেকে ভাতার এই শব্দ এসেছে, ভাতার মানে স্বামীকে ভাতার বলা হয়, স্ত্রীর যা যা দরকার সব স্বামী যোগাড় করে দেন, অর্থাৎ যিনি ভরণ-পোষণ করছেন। যার চোখের দৃষ্টি প্রবল, কান যার প্রখর, বুদ্ধি যার তীক্ষ্ণ, তার মানে ইন্দ্রিয়ের তারতম্য আছে। এদের ইন্দ্রিয়গুলো ভালো কাজ করে। কি করে ইন্দ্রিয়গুলো ভালো কাজ করছে? বলছেন - তার ভেতরে যে চৈতন্য সত্তা রয়েছেন, যিনি আত্মা তাঁর চৈতন্য শক্তি এই ইন্দ্রিয়গুলিতে বেশি করে প্রতিফলিত হচ্ছে বলে এগুলো ভালো কাজ করতে পারছে। যার মধ্যে প্রতিফলিত চৈতন্য যত স্বচ্ছ, তার ইন্দ্রিয়গুলো ততো ভালো কাজ করে। প্রতিফলিত চৈতন্য কেন বলা হচ্ছে, কারণ এই চোখ, কান, নাক এদের আসলে কোন চৈতন্যই নেই, সব জড়। ভোক্তা বলা হচ্ছে আত্মাকে, যিনি হচ্ছে প্রকৃত ভোক্তা। আমরা যখন কোন কিছু খাই তখন আস্বাদ করে জিহ্বা, আস্বাদ করে সে মস্তিষ্ককে খবর দেয়, কিন্তু মস্তিষ্কের পেছনে বসে আছেন সেই স্বয়ম্ভূ। ভাল লাগা স্বয়ম্ভূর হওয়া চাই, উনিই হচ্ছে ঠিক ঠিক ভোক্তা। শরীরের যিনি আত্মা তিনি হলেন *মহেশ্বরঃ,* ওঁর উপরে আর কেউই নেই।

*পরমাত্মেতি চাপ্যুক্ত দেহেঽস্মিন্ পুরুষঃ পরঃ,* তিনিই হচ্ছেন পরমাত্মা। আসলে আমাদের যিনি পরমাত্মা বেদান্তে তাঁর সাথে আত্মার কোন পার্থক্য করা হয় না। ভেতরে যিনি অন্তর্যামী আছেন আর বাইরে সর্বব্যাপী যিনি আছেন তাঁরা এক ও সমান। এই হচ্ছে ক্ষেত্রজ্ঞের গুণ ও ধর্ম – *উপদ্রষ্টানুমন্তা চ ভর্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ। পরমাত্মেতি চাপ্যুক্ত দেহেঽস্মিন্ পুরুষঃ পরঃ।।* এই দেহ যেটা আছে এটা থেকে ক্ষেত্রজ্ঞ সম্পূর্ণ ভাবে আলাদা। চৈতন্য সত্তাই হচ্ছে আসল সত্তা। আমার মন কেমন, আমার চিন্তা ভাবনা কেমন এই সব জিনিষ অন্তর্যামীর গোচরে থাকে। আমি যখন কারুর সামনে দাঁড়াই তখন আমার অন্তর্যামী আমার সামনের লোকটির অন্তর্যামীকে সরাসরি প্রশ্ন করে লোকটি কি রকম? তার অন্তর্যামীও সরাসরি বলে দেয় লোকটি এই রকম। তখন ওর অন্তর্যামী আমার অন্তর্যামীকে বলে দেয় এর সাথে এই রকম ব্যবহার কর, আর আমার অন্তর্যামী বলে ওর সাথে এই রকম ব্যবহার কর। সেইজন্য যারা খারাপ লোক হয়, তাদের খারাপ লোকের সাথেই বন্ধুত্ব হয়। আমি যদি খারাপ হই, আর যে খারাপ লোকের সাথে মেলামেশা শুরু করতে যাব তখন আমার অন্তর্যামী তার অন্তর্যামীকে বলে দেয় লোকটি কিন্তু বেশ গোলমেলে, সাথে সাথে দুজনের মধ্যে বন্ধুত্ব করিয়ে দেয়। অন্তর্যামী আবার সাক্ষী, দূর থেকে সব কিছু দেখে যাবেন, কোন কিছুতেই জড়াবেন না। স্বয়ম্ভূ যিনি, তিনি কখনই বলবেন না যে তোমার মনকে ঠিক কর, তার ভারি বয়ে গেছে বলতে। তুমি যদি চাও খারাপ হতে তাহলে খারাপই হও, আর তোমার সাথে খারাপ লোকের বন্ধুত্ব করিয়ে দেবে। খারাপ লোকের কাছে যখনই ভালো লোক আসবে, তিনি আস্তে আস্তে তাকে ভালো লোকের কাছ থেকে সরিয়ে দেবেন। অন্তর্যামী, স্বয়ম্ভূ ঠিক এই ভাবে আচরণ করে থাকেন।

কিছু লোক আছে যারা আক্ষেপ করে, দুঃখ হতাশায় বলে আমাকে জগৎ চিনল না। এরা তো ভগবানকেও ছাড়িয়ে গেল, মানুষতো ভগবানকেও চিনে ফেলে, আর তুমি এতো কঠিণ যে সারা জগৎ তোমাকে চিনতে পারল না! কিন্তু তোমার সামনে যিনি আছেন তাঁর অন্তর্যামী তোমাকে এক ঝলক দেখেই বলে দেবেন তুমি কেমন। একটা মানুষকে বোকা বানানো অত সহজ নয়, হয় কি, অনেক ক্ষেত্রে মানুষ মেনে নেয়, মেনে নেওয়া ছাড়া কিছু করারও নেই। বাবা-মা যেমন সন্তানের সব কিছু মেনে নেয়, ঠিক তেমনি অন্তর্যামীও মেনে নেন। যখনই আমি একটা লোকের সামনে দাঁড়াব, আমার অন্তর্যামী বলে দেবেন লোকটা কেমন, অনেকে সময় আমরা এটাকে বলি স্বজ্ঞা, কিন্তু কোন স্বজ্ঞা নয়, ইন্দ্রিয়ের মাধ্যম ব্যতিরেকে পরিষ্কার সোজাসাপ্টা জ্ঞান। এমনিতে আমরা যা কিছু শিখি জানি সবই ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে জানছি। কিন্তু একজনের অন্তর্যামী সাথে আরেকজনের অন্তর্যামীর সরাসরি আদান-প্রদান চলে, চৈতন্য চৈতন্যের সাথে প্রত্যক্ষ ভাবে যোগাযোগ হয়ে যায়। সেইজন্য যখন কেউ বলে সারা জগৎ আমাকে ভুল বুঝল, আর তুমিও

আমাকে ভুল বুঝলে। কিন্তু কোথাও কিছুই ভুল বোঝাবুঝি হয়নি, আজ পর্যন্ত যা বুঝে এসেছে ঠিকই বুঝে এসেছে। আমাদের সবার জীবন চিনিতে বালিতে মিশে আছে। আমি আমার চিনিটুকুকে দেখছি আর তুমি আমার বালিটুকুকে দেখছ। তোমার বালি আছে বলেই তুমি বালি দেখছ। জগতে একটি লোকও নেই যে তাকে ভুল বোঝা হয়েছে। ভুল বোঝার কোন সম্ভবনাই নেই, সবাইকে ঠিকই বোঝা হয়ে আছে, শুধু আমাদের দৃষ্টিটা কোথায় ফেলছি সেইখানে তফাৎ হয়ে যায়। ভুল বোঝাবুঝি কোথায় হবে? যেখানে কথা দিয়ে বিচার হচ্ছে, যেখানে চোখ দিয়ে, ইন্দ্রিয় দিয়ে মাপা হচ্ছে, সেখানে ভুল বোঝাবুঝি হওয়াটা অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু অন্তর্যামী অন্তর্যামীর মধ্যে কোন ভুল বোঝাবুঝির অবকাশ নেই, কারণ তাদের কথাবার্তা সরাসরি হয়, কোন ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে হয় না। আবার অন্তর্যামীর আওয়াজ মিনমিনে ফিনফিনে হয়, আর ইন্দ্রিয়ের আওয়াজগুলো ঢাকঢোল পেটানর মত আওয়াজ হয়। ঐ আওয়াজে অন্তর্যামীর আওয়াজটা হারিয়ে যায়। যে মানুষ যত চুপচাপ, শান্ত থাকে, ক্রিয়া-কর্ম যত কম হয়, সেই অন্তর্যামীর এই আওয়াজটাকে তত ভালো শুনতে পারে। যেমন শ্রীরামকৃষ্ণ, তিনি ঐ তীব্র সাধনা করার পর তাঁর অন্তঃকরণের এত শুদ্ধি হয়ে গেছে, যার ফলে তাঁকে কোন কিছুর জন্য তাঁর ইন্দ্রিয়ের উপর নির্ভর করা কাকে বলে জানতেনই না। ঠাকুরের অন্তর্যামীই বলে দিচ্ছে এটা এই। ঠাকুরের কাছে যখন কোন লোক আসত তিনি লোকটার ভেতরটা কাঁচের শোকেসের ভেতরে রাখা জিনিষের মত সব স্পষ্ট দেখতে পেতেন। সেইজন্য বলা হয় এই পৃথিবীতে ভুল বোঝাবুঝির কোন অবকাশই নেই। যে মনে করছে জগৎ আমাকে চিনতে পারল না, জগৎ আমাকে মূল্য দিল না, বুঝে নিতে হবে লোকটি প্রচণ্ড গোলমেলে, তার বিনাশের রাস্তা পরিষ্কার হয়ে আছে। মানুষের স্তরে পৌঁছাতে তার অনেক জন্ম এখনও বাকি আছে। যাই হোক, এরপর ভগবান বলছেন –

**য এবং বেত্তি পুরুষং প্রকৃতিং চ গুণৈঃ সহ। সর্বথা বর্তমানোঽপি ন স ভূয়োঽভিজায়তে।।২৩।।**

যখন মানুষ পুরুষ আর প্রকৃতির প্রভেদটা ধরে ফেলে, তখন *ন স ভূয়োঽভিজায়তে,* সে যে কাজই করে থাকুক না কেন তার আর পুনর্জন্ম হয় না। প্রত্যেক জীবেই মৃত্যুর পরেও তার জীবনের অস্তিত্ব অন্য এক ভাবে চলতে থাকে, এই ধারণাতে যদি আমার বিশ্বাস না থাকে তাহলে ধর্ম ও আধ্যাত্মিক জীবন আমার জন্য নয়। ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতা সবার জন্য নয়, যারা যুক্তিবাদী, যারা বলছে আমি শুধু বিজ্ঞানেই বিশ্বাস করি, ধর্ম তাদের জন্য নয়। কিন্তু যদি আমি বিশ্বাস করি যে, মৃত্যুর পরও আমার জীবন প্রবাহ অন্য এক খাতে অন্য ভাবে চলতে থাকে, তাহলে আমি যে কোন ধর্মই অবলম্বন করতে পারি, আমি হিন্দু হতে পারি, আমি খ্রীশ্চান হতে পারে, বৌদ্ধ, জৈন, ইসলাম যে কোন ধর্মই গ্রহণ করতে পারি। এটা গেল একটা দিক, এরপর আরেকটি দিক হচ্ছে, যদি আমি পুনর্জন্মে বিশ্বাস না করি তাহলে ভারতীয় কোন ধর্মই আমার জন্য নয়, তাহলে খ্রীশ্চান বা ইসলাম ধর্মে যেতে হবে।

ভারতের মূল ধর্ম হচ্ছে, হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন আর শিখ ধর্ম। ভারতীয় এই চারটে ধর্মের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এরা প্রত্যেকেই পুনর্জন্মবাদে বিশ্বাস করে। আমি যদি বলি আমি ধর্মের সব কথা মানতে পারি কিন্তু পুনর্জন্মবাদকে মানব না, তাহলে ভারতের কোন ধর্মই আমার জন্য নয়, আমাকে হয় খ্রীশ্চান হতে হবে নতুবা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে হবে। এমনকি যারা বৌদ্ধধর্মালম্বী, যারা নির্বাণ নির্বাণ করেন, তারাও বলেন নির্বাণ না প্রাপ্তি হওয়া পর্যন্ত পুনর্জন্ম চলতেই থাকবে। কিভাবে পুনর্জন্ম হয়? এদের মতে বলা হয় সঞ্চিত আর প্রারব্ধ অনুসারে পুনর্জন্ম হয়। আমরা সবাই কাঁধে একটা পুটলি নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি। কি রকম পুটলি বয়ে বেড়াচ্ছি? কম্প্যুটারের হার্ডডিস্কের মত। হার্ডডিস্ককে যদি জিজ্ঞেস করা হয় তোমার এতে কত জিবি মেমোরি আছে? চার জিবি মেমোরি হতে পারে, আট জিবি মেমোরি হতে পারে, কিন্তু তার সাইজটা এক থাকে। চেকিং করলে জানা যাবে হার্ডডিস্কের মেমোরি কতটা ব্যবহার করা হয়েছে। আমাদের সবারই মধ্যে এই রকম একটা হার্ডডিস্ক মেমোরি রয়েছে। জন্ম জন্ম এই মেমোরিটাকে আমরা বহন করে চলছি। আমাদের এই হার্ডডিস্ক মেমোরিতে কি থাকে? সঞ্চিত কর্ম আর প্রারব্ধ কর্ম। যা কর্ম করেছি, ভালো মন্দ যে কর্মই হোক না কেন, সব ঐ হার্ডডিস্কে গিয়ে রেকর্ড হয়ে থাকে। মৃত্যুর পর যখন আবার একটা জন্ম নেওয়ার সময় আসে, তখন সে একটা শরীরকে ধরে নেয়। শরীর ধরে নেওয়ার সাথে সাথে কম্প্যুটারের প্রোগ্রামিং যেটা করা আছে সেটা আগের আগের জন্মে কি কি সে সংগ্রহিত হয়ে আছে সব সংগ্রহগুলো কে সার্চিং করতে শুরু করে, আর ঠিক করে নেয় এই শরীরের মাধ্যমে কি কি জিনিষ বেরোতে পারে। তখন ঐ জিনিষগুলোকে মেমোরি থেকে টেনে দাঁড় করিয়ে দেয়, এগুলোকে বলা হচ্ছে প্রারব্ধ। তারপর থাকে ওয়ার্কিং মেমোরি, যে প্রোগ্রামে কাজ করা হচ্ছে সেই প্রোগ্রামিংটুকু সামনে এসে গেছে। আমাকে যদি এখন ওয়ার্ক প্রসেসিংএ কাজ করতে হয় তাহলে ওয়ার্ক প্রসেসিং এর প্রোগ্রামে চলে যাবে, যখন ডাটা প্রসেসিং এ কাজ করব তখন ডাটা প্রসেসিং প্রোগ্রামে চলে যেতে হবে, আবার ইন্টারনেটে কাজ করলে ইন্টারনেটিং প্রোগ্রামিং এ চলে যাব। এইটাকে বলছে প্রারব্ধ। প্রারব্ধের মধ্যে আবার দুটো থাকে, একটা হচ্ছে অনারম্ভ, আরেকটি হল ফলীয়ান। অনারম্ভ মানে এখনও পরে আছে। এই যে আমরা প্রায়ই বলি আগামীকাল আমার কি হবে আমি কি করে জানব। আমার প্রারব্ধ যেটা আছে তার কোনটা কাজ করবে আমরা বলতে পারিনা। অনেক সময় আমরা বলি – আমার জীবনে কি এক অঘটন ঘটে গেল। কিন্তু অঘটন না হওয়াটাই আশ্চর্যের। আমার জীবন যদি সাদামাটা ভাবে চলতে থাকে, তার মানে আগামীকাল কি হবে সবই বুঝতে পারছি তাহলে আমার জীবনটা একটা পাথরের টুকরো ছাড়া আর কিছুই নয়, পাথরের টুকরোও জানে আমি আজ যেখানে আছি আগামীকালও এইখানেই এই ভাবেই পড়ে থাকব। আজ থেকে হাজার বছর আগে হিমালয়ে যা পাথর ছিল এখনও সেই পাথর সেইভাবেই পড়ে আছে। কিন্তু মানব জীবন পাথরের মত পড়ে থাকে না, এর জীবনের প্রতিনিয়ত পরিবর্তন

হয়েই চলেছে। একটা মাছের জীবনে কি হবে সবাই মোটামুটি আন্দাজ করে নিয়েছে, মাছটা জলে জন্ম নিল, পোকা-মাকড় যা খাওয়ার খেয়ে নিল, একদিন কেউ এসে মাছটাকে ধরবে, টুকরো টুকরো করে নুন-হলুদ মাখিয়ে গরম তেলে ছেড়ে ভাজা ভাজা করবে। কিন্তু এইভাবে মানব জীবনের কোন ভবিষ্যৎবাণী করা যায় না। আমাদের কার কি প্রারব্ধ আছে আমরা কেউ জানিনা, আগামীকাল আমি রাজা হয়েও যেতে পারি আবার ফকিরও হয়ে যেতে পারি, কি হব কেউ বলতে পারেনা। যেসব সাধারণ মানুষের জীবনের ভবিষ্যৎবাণী করে দেওয়া যায় তাহলে বুঝে নিতে হবে মরার পর সে গাছপালা হয়ে জন্ম নেবে। মানুষের জীবনে যদি ওঠা নামা না হয় তাহলে বুঝতে হবে যে কোথাও কোন গোলমাল আছে, যদি কারুর জীবন এই রকম ওঠা নামা শূন্য হয় তাহলে বুঝতে হবে সে ভুলে মানুষ হয় জন্ম নিয়েছে, তার কুকুর বেড়াল হয়ে জন্মাবার কথা ছিল। প্রারব্ধ মানেই হল তাই, কিছুই বলা যায় না জীবনের কখন কি হবে, আর এইভাবে একবার উঠবে আবার নামবে। ফলীয়মান কর্ম হল, এখন আমি যা করছি এটা আগের আগের প্রারব্ধ কর্মের ফলবশতঃ করতে হচ্ছে।

এখানে তাই বলা হচ্ছে, যে মুহূর্তে আমি জানতে পারলাম আত্মা কি আর জড় পদার্থ কি, সঙ্গে সঙ্গে আমার যে সঞ্চিত কর্ম হার্ডডিস্কে আছে সেটাকে ফরমেট করে দেওয়া হল, ফরমেট মানে হার্ডডিস্কটা খালি করে দেওয়া, ভালো মন্দ যা কর্ম রেকর্ডেড ছিল সব মুছে দিল, *ন স ভূয়োঽভিজায়তে*, তার আর জন্ম নিতে হবে না। হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন ও শিখ ধর্মের সর্বোচ্চ অবস্থা হল এইটাই, এই জন্ম-মৃত্যু চক্র থেকে বেরিয়ে আসা। ভারতের এই চারটে ধর্মের মূল লক্ষ্যই হচ্ছে আবার যেন জন্ম নিতে না হয়। এই শ্রেষ্ঠ অবস্থাকে প্রাপ্ত হওয়ার একমাত্র উপায় হচ্ছে আত্মা কি আর জড় পদার্থ কি এইটাকে জানা। আত্মা কি আর জড় পদার্থকে একবার জেনে নিলে জড় আলাদা হয়ে যাবে আত্মা আলাদা হয়ে যাবে। তখন ফলীয়মান যে কর্মগুলো আছে সেগুলো আসবে। স্বামীজীর জীবনকেই উদাহরণ নিয়ে যদি বলি – স্বামীজী সন্ন্যাস নিয়ে সাধনা করে সমাধিতে বুঝে গেলেন আত্মা কি আর জড় কি। এখন তিনি হয়ে গেলেন বিজ্ঞানী। এরপরও তাঁর শরীর খারাপ করছে, খিদে পাচ্ছে, মেজাজ গরম হচ্ছে, অন্য দিকে সারা বিশ্ব তাঁর পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়ছে। এখন স্বামীজী বলছেন – হে প্রকৃতি, তোমার আদর করাতেও আমার কিছু এসে যাবে না, আর তোমার থাপ্পড় মারাতেও আমার কিছু যায় আসে না, তোমার সাথে আমার এখন ডিভোর্স হয়ে গেছে। একটা ছেলে আর একটা মেয়ে, বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর মেয়েটি কখন ছেলেটিকে চড় মারছে, কখন আদর করছে। এরপর একদিন এদের মধ্যে ডিভোর্সের মামলা হয়েছে, জজ সাহেব ডিভোর্সের রায় দিয়ে দিয়েছেন। তারপর কোর্ট থেকে বেরিয়ে দুজনে গাড়ি করে ফেরত যাচ্ছে, যেতে যেতে সারা রাস্তা মেয়েটি ছেলেটিকে আবার কখন চড় মারছে আবার কখন আদরও করছে। ছেলেটি এখন জানে আরতো কয়েক মিনিটের ব্যাপার, গাড়ি থেকে নেমে গেলে আমি এর থেকে মুক্ত, এখন যাই করুক আমার তাতে কিছুই এসে যাবে না। মুক্ত পুরুষও ঠিক এই ধরণের আচরণ করেন, তিনি জেনে গেছেন আমি মুক্ত হয়ে গেছি, আমি আর কোন কিছুকেই গ্রাহ্য করিনা। মুক্তির যে কি আনন্দ তা আমরা কল্পনাই করতে পারিনা। এরাও মুক্তির আনন্দে মশগুল হয়ে যান, তিনি তখন জেনে গেছেন আমার আর জন্ম হবে না, এখন প্রকৃতিও আর তাকে কোন ভাবেই কিছু করতে পারবে না।

মহাপুরুষদের যতই সমস্যা আসুক তাঁর কিছুই আসে যায় না। মুক্ত পুরুষকে যদি জিজ্ঞেস কর, আপনি তো মুক্ত হয়ে গেছেন, আপনার তো সমস্যা মিটে গেছে, আপনার তো আর জন্ম হবে না, কিন্তু আমাদের কি হবে? তখন মুক্ত পুরুষ বলবেন, তোমরাও এই আনন্দই পাবে যদি তোমরাও মুক্ত হয়ে যেতে পার। আমি কি ভাবে মুক্ত হবে? তুমি তোমার স্বরূপকে জান, তোমার আত্মাকে জান আর জড়কে জান। সমস্যা হচ্ছে তুমি সেই আত্মা কিন্তু তুমি নিজেকে জড়ের সাথে এক করে নিয়ে জড়ের ধর্ম স্বীকার করে কখন আনন্দ পাচ্ছ, কখন দুঃখ পাচ্ছ। তুমি যে নিজেকে বদ্ধ ভাবছ, এই বন্ধনটা আসলে কোন বন্ধনই নয়। আমি নিজেই নিজের ডান হাতের আঙুল দিয়ে বাঁ হাতের আঙুলগুলোকে চেপে চিৎকার করছি আমার হাত আটকে গেছে, ছাড়াতে পারছি না। তুমিও ঠিক এই রকম তোমার আত্মাকে বোকার মত প্রকৃতির সব কিছুর সঙ্গে জড়িয়ে নিয়ে হাসছ, কাঁদছ, লাফাচ্ছ, মরছ, জন্মাচ্ছ। আমাদের সমস্ত শাস্ত্র বারবার বলছে তোমার সঙ্গে এই শরীর, মন, বুদ্ধির কোন সম্পর্কই নেই, কিন্তু আমরা জোর করে বোকার মত জড়িয়ে ধরে আছি। একটা ছেলে মেয়েকে যেমন বলে – আমি তোমাকে ছাড়া কি করে বাঁচব। এইটাই মায়া। শাস্ত্র বলছে, তুমি এই বন্ধন থেকে বেরিয়ে এসো, এর সাথে তোমার কোন সম্বন্ধই নেই, তুমি সেই পুরুষ, সেই আত্মা। তুমি যখন প্রকৃতির সমস্ত মিথ্যা সম্বন্ধ থেকে বেরিয়ে পুরুষের ধর্মে প্রতিষ্ঠিত হবে তখন আর তোমার পুনর্জন্ম হবে না।

ভগবান তো বলে দিলেন আত্মা কি আর জড় কি, এই দুটোকে জানলে আমার আর পুনর্জন্ম হবে না। কিন্তু আত্মা এই আর জড় এই আমি জানব কি উপায়ে? এই সংশয় যাতে না আসে তাই ভগবান আগেই বলে দিচ্ছেন কি ভাবে তুমি তোমার প্রকৃত স্বরূপকে জানতে পারবে –

**ধ্যানেনাত্মনি পশ্যন্তি কেচিদাত্মানমাত্মনা। অন্যে সাংখ্যেন যোগেন কর্মযোগেন চাপরে।।২৪।।**

শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, মত পত, যত মত তত পথ। এইটাই গীতা এখানে বর্ণনা করছে। তুমি যে শুদ্ধাত্মা, তুমি যে পুরুষ এটাকে জানা যায়। কিভাবে জানবে? *ধ্যানেনাত্মনি পশ্যন্তি*, ধ্যান করতে করতে মনের সব বৃত্তিগুলো পরিষ্কার হয়ে যাওয়ার পর *কেচিদাত্মানমাত্মনা*, নিজের অন্তঃকরণেই তুমি তোমার প্রকৃত স্বরূপকে জানতে পারবে। *অন্যে সাংখ্যেন যোগেন*, এখানে আবার সাংখ্যের অর্থ হচ্ছে দর্শন বা জ্ঞান। কিসের দর্শন? মানে আত্মা কি আর জড় কি, এই জ্ঞানযোগের দ্বারা আত্মা আর জড়ের ধর্মকে জেনে নিয়ে জড় পদার্থকে সরিয়ে দেওয়া, তখন মানুষ মুক্ত হয়ে যায়। তারপর বলছেন *কর্মযোগেন চাপরে*, কর্মযোগ হচ্ছে *ঈশ্বারার্পণ বুদ্ধ্যা*, অর্থাৎ আমি যা কিছুই করি না কেন, ভালো মন্দ সব ঈশ্বরকে অর্পণ করে দিচ্ছি, এই ভাব নিয়ে যখন কর্ম করা হয় এটাই হয়ে যায় কর্মযোগ। এইভাবে ঈশ্বারার্পণ বুদ্ধিতে কর্ম করতে করতে তোমার অন্তঃকরণ শুদ্ধ হয়ে যাবে, সেই শুদ্ধ অন্তঃকরণে তুমি আত্মা কি জড় কি বুঝতে পারবে। কর্ম সবাই করছে, কিন্তু সবাই এইভাব নিয়ে কর্ম করছে না। আগের দিনে দেখা যেত কেউ হাঁচি দেওয়ার পর রাম রাম বলত, মানে এই হাঁচিটাও শ্রীরামের, কাশি হলে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে। যখন কোন কিছু গোনা হত তখন বলত রাম, দুই, তিন এইভাবে গোনা শুরু করে, ওজন শুরু করছে তখনও বলত রামেজি রাম। যা কিছুই শুরু করা হত আগে ঈশ্বরকে অর্পণ করে শুরু করা হত। এটাই কর্মযোগ। যদি ঈশ্বরকে কিছুই অর্পণ না করি, তখন সেটা হয়ে গেল কর্ম। এই কর্ম বন্ধন তৈরী করে আর কর্মযোগ বন্ধন মুক্ত করে। তারপর বলছেন –

**অন্যে ত্বেবমজানন্তঃ শ্রুত্বাহন্যেভ্য উপাসতে। তেঽপি চাতিতরন্ত্যেব মৃত্যুং শ্রুতিপরায়ণাঃ।।২৫।।**

অনেকে আছেন যাঁরা মনে করে আমার দ্বারা এই পথ সেই পথ দিয়ে ধ্যান করা, উপাসনা করা, কর্মযোগ করা সম্ভব হবে না, তাহলে কি আমার দ্বারা আত্মার স্বরূপকে জানা হবে না? না, তোমারও হবে, *শ্রুত্বাহন্যেভ্য উপাসতে*, ভগবানের কথা শুনে যাও, রোজ ঠাকুরের কথা শুনে যেতে থাক। আচার্য তাঁর শিষ্যকে বলে দিলেন যে এটাই সত্য, তুমি এর সাধনা কর। শিষ্য আচার্যের কথা মত যদি সাধনা করতে থাকে তাহলে সেটা থেকেই তার হয়ে যায়। আসলে আমাদের সাধনা অনেকটা এই রকমই, আমরাতো ধ্যানযোগও করতে পারিনা, কর্মযোগও ঠিক ঠিক করিনা আর জ্ঞানযোগের তো প্রশ্নই নেই। আমাদের কাছে এটাই সহজ পথ – গুরুদেবের কাছে দীক্ষা নিলাম, গুরু বলে দিলেন এই তোর ইষ্ট, গুরু যদি বলে দেন এই ভেড়াই তোর ইষ্ট। তখন সে ভেড়াকেই ইষ্ট ভেবে ধ্যান করতে শুরু করল, সেইখান থেকেই জ্ঞান হয়ে গেল। *শ্রুত্বাহন্যেভ্য উপাসতে*, শুনতে থাকাটাও একটা সাধনা। আর গুরুর মুখে যেমনটি শুনেছে, শুনে গুরুর কথা মত সাধনা করাটাও সাধনা।

*শ্রুতিপরায়ণাঃ*, যারা বারবার ধর্ম কথা শুনে যাচ্ছে। কিন্তু যে পাঁচ জায়গাতে গিয়ে ধর্ম কথা শুনে বেড়ায় এতে তার কোন উপকার হবে না। কিন্তু সে যখন একই কথা বারবার শুনছে তখন সে হচ্ছে *শ্রুতিপরায়ণ*। হিন্দীভাষী অঞ্চলে সবারই ঘরে একটা করে রামচরিতমানস রাখা থাকে। সেখানে সবাই শুধু এইটাকেই পাঠ করতে থাকে, দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর, বংশের পর বংশ পাঠ হয়েই চলেছে। সেইজন্য হিন্দী বেল্টে ধর্মের প্রভাব এখনও এত শক্তিশালী, ভারতের বিভিন্ন জায়গায় মুসলিমদের এত অত্যাচার, খ্রীশ্চানদের এত প্রচার হওয়া সত্ত্বেও হিন্দী বেল্টে অন্যান্য জায়গার মত দাঁত ফোটাতে পারেনি। *শ্রুতিপরায়ণাঃ* মানে দশটা বই নিয়ে পড়ে যেতে বলা হচ্ছে না, *শ্রুতিপরায়ণাঃ* বলতে বলা হয় একটা বইকে বেছে নিয়ে ওর মধ্যেই ঘুরপাক খেয়ে যেতে হবে। গীতা হোক, উপনিষদ হোক, রামায়ণ হোক, ভাগবত হোক, কথামৃত হোক কোন একটা বই দিনের পর দিন পড়েই চলেছে, এইটাই *তেঽপি চাতিতরন্ত্যেব মৃত্যুং*, তাকে মৃত্যু থেকে পার করিয়ে দেয়। এত কিছু বলার পর আবার সেই আগেকার তত্ত্ব কথাতে চলে আসছেন –

**যাবৎ সঞ্জায়তে কিঞ্চিৎ সত্ত্বং স্থাবরজঙ্গমম্। ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞসংযোগাৎ তদ্বিদ্ধি ভরতভর্ষভ।।২৬।।**

হে অর্জুন, জগতে স্থাবর জঙ্গম যা কিছু দেখছ, যেটা চলছে, যেটা স্থবির, যা কিছুই হোক সবই হচ্ছে জড় আর চৈতন্যের সংমিশ্রণ, ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের সংমিশ্রণেই সব কিছু। এই জগতে এমন কোন কিছু নেই যেটা ক্ষেত্র আর ক্ষেত্রজ্ঞের সংমিশ্রণের বাইরে। ত্রয়োদশ অধ্যায়ের পুরো আলোচ্য বিষয় হচ্ছে ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ, মানে পুরুষ আর প্রকৃতি বা চৈতন্য আর জড়। সেইজন্য ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নানান ভাবে বলা হচ্ছে যে এই জগৎ হল জড় আর চৈতন্যের সম্মিলন। তাই বলা হচ্ছে তুমি এইটাকে জেনে নিয়ে জড় থেকে নিজেকে বাইরে তুলে নিয়ে এসে চৈতন্যের উপর তোমার দৃষ্টিকে একাগ্র কর, তাহলেই তুমি মুক্ত হয়ে যাবে। তোমার জীবনের লক্ষ্য যদি হয় আত্যন্তিক সুখপ্রাপ্তি, তাহলে তোমাকে মুক্ত জীবনে আসতে হবে। কিসের থেকে মুক্ত হতে বলা হচ্ছে? জড়, ক্ষেত্র বা এই প্রকৃতি থেকে মুক্ত হতে বলা হচ্ছে। যেটার থেকে আমি মুক্তি চাইছি আগে তার ধর্মটাকে জানতে হবে। শরীর খারাপ হলে ডাক্তারের কাছে গিয়ে বলতে হবে শরীরের কোথায় আমার কষ্ট হচ্ছে। শাস্ত্রও বলে দিচ্ছে, আগে তুমি বোঝ তোমার কি সমস্যাটা হচ্ছে। সমস্যাটা হচ্ছে আমার যে প্রকৃত স্বরূপ সেটা জড়ের ধর্মকে নিজের মনে করে সেটাতেই সে বদ্ধ হয়ে জড়ের ফল ভোগ করছে। তাহলে তুমি এখন জড়ের সব কিছুকে জেনে ওখান থেকে বেরিয়ে এসো। গীতা এই অধ্যায়ে এইটাই করছে, জড়ের সব ধর্মকে

বিস্তারিত ভাবে বুঝিয়ে দিচ্ছে, যাতে মানুষ এই জড়ের থাবা থেকে বেরিয়ে নিজের স্বরূপে ফিরে এসে একমাত্র চৈতন্য সত্তার সাথে সে নিজের একত্বকে অনুভব করতে পারে।

হিন্দুধর্মের দর্শনে সৃষ্টির অনেক রকম বর্ণনা পাওয়া যায়, এদের মধ্যে সৃষ্টির যে তত্ত্বটিকে সব থেকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয় সেটি হল সৎকার্যবাদ। সৎকার্যবাদের মূল বক্তব্য হল, কোন জিনিষই অসৎ থেকে সৃষ্টি হয় না। সৎ মানে যেটা আছে, একটা কিছু আছে যার থেকেই সব কিছুর সৃষ্টি হচ্ছে। সৎকার্যবাদের আবার দুটো শাখা আছে – পরিণামবাদ আর বিবর্তবাদ। সাংখ্যদর্শন পরিণামবাদকে অবলম্বন করে এগিয়ে যায়, এরা বলছেন যে সব কিছুরই একটা পরিণাম হয়, যেমন দুধ থেকে দই হচ্ছে। একটা কার্য হচ্ছে সেই কার্যের জন্য একটা পরিণাম হচ্ছে, একটা জিনিষ যেটা ছিল এতে সেটা পাল্টে অন্য একটা কিছু হয়ে যাচ্ছে, এটাকেই বলছেন কারণ আর তার পরিণাম। বিবর্তবাদে বলছে, যা কিছু পরিবর্তন হচ্ছে সেখানে সেই জিনিষটার নাম ও রূপেরই শুধু পরিবর্তন হচ্ছে। নাম ও রূপের পরিবর্তনটাকে যদি সরিয়ে দেওয়া হয় তাহলে সেই বস্তুটি যা ছিল তাই থাকবে। যেমন মাটি থেকে আমি হাতি বানালাম, মানুষ তৈরী করলাম, ইঁদুর বানালাম। এখন হাতি, মানুষ ও ইঁদুর আপাত ভাবে মনে হবে সব আলাদা। যারা সাংখ্যবাদী, পরিণামবাদের যারা প্রবক্তা তারা বলবে এই পরিবর্তনটা সত্য। কারণ এই হাতি, ইঁদুর এগুলো আসছে মাটি আর তার মধ্যে একটা প্রচেষ্টা থেকে। কিন্তু যারা বিবর্তবাদকে মানে তার বলে, না না, তা কেন হবে, তুমি যদি নাম আর রূপকে বাদ দিয়ে দাও তাহলে তারা সেই এক বস্তুই থাকবে। এখানে যা কিছু আছে, বোতল, টেবিল, চেয়ার, মাইক্রোফোন সব আলাদা আলাদা নাম ও রূপে দেখছি। কিন্তু এগুলোকে যদি একসাথে জড়ো করি তখন দেখব এগুলো সবই ইলেক্ট্রোন প্রোটন আর নিউট্রনের সমষ্টি ছাড়া আর কিছুই নয়। শুধু ইলেক্ট্রোন, প্রোটন আর নিউট্রন, এই তিনটে জিনিষ সারা জগতে খেলা করছে। আবার এই পৃথিবীতে যা কিছু আছে মূলতঃ সবই সূর্যের আলো। পৃথিবীতে সূর্যের যে আলো আসছে তাতে ফটো সিন্থেসিস হচ্ছে, এণার্জি আসছে, সেই এণার্জি আবার বিভিন্ন এণার্জিতে রূপান্তরিত হয়ে যাচ্ছে, এই রূপান্তরিত এণার্জি থেকেই বিভিন্ন ধরণের প্রাণীর সৃষ্টি হচ্ছে। পৃথিবীতে যত রকমের প্রাণী আছে, সেই ব্যাকটেরিয়া থেকে শুরু করে গাছপালা থেকে আরম্ভ করে কীট পতঙ্গ, জন্তু, পশু মানুষ সবই সেই সূর্যের আলোই বিভিন্ন ভাবে রূপান্তরিত হয়ে এত কিছুর রূপ পরিগ্রহ করছে, সূর্যের আলোর বাইরে কিছুই নেই। আমরা সবাই সেই সূর্যেরই আলো, এখানে আমিও যা, আপনিও তা। আমার শরীরে যে সূর্যের আলো কাজ করছে, আপনার শরীরেও সেই একই সূর্যের আলো কাজ করে চলেছে। এইটাই বেদান্ত বলছে, জগতে যা কিছু আছে সব সেই একই বস্তু। কিন্তু এক রহস্যময় কারণের ফলে, যেটা কেউ ব্যাখ্যা করতে পারেনা, নাম ও রূপের মধ্যে দিয়ে পরিবর্তন এসে যায়। নাম ও রূপ যখন এসে যায় তখন কিন্তু সব কিছুকে আলাদা মনে হবে। আমি আলাদা আপনিও আলাদা, কিন্তু পুরুষ হিসেবে আমি আপনি এক। আবার মানবজাতি হিসাবে আমরা সবাই এক, সেখান নারী আর পুরুষও থাকছে না। আবার জীবন্ত প্রাণী রূপে আমরা সমস্ত প্রাণীর সাথে এক। এই নাম ও রূপকেই বেদান্ত বলছে মায়া। কিন্তু সত্য সত্যই থাকে, সত্যের কোন পরিবর্তন হচ্ছে না। শুধু আমাদের মিথ্যা জ্ঞানটা চলে যায়। তার মানে, আমি দেখছি আপনি এখানে বসে আছেন, এটা হচ্ছে সত্য জ্ঞান। কিন্তু আমি আসলে কি দেখছি, একটা অস্তিত্বকেই দেখছি, সৎ আর তার সাথে যোগ হচ্ছে এই নাম ও রূপ। এই নাম ও রূপ চলে গেলে পড়ে থাকবে শুধু সৎ। বেদান্ত শুধু বলছে তুমি কেবল এই সৎএর উপর তোমার মনকে কেন্দ্রিভূত কর। নাম ও রূপকে ভুলে যাও, কারণ নাম ও রূপের কোন মূল্যই নেই। তুমি যদি নাম ও রূপকে দেখেই থাক, বেদান্ত বলছে ঠিক আছে তুমি তাই দেখ এতে কোন দোষের কিছু হবে না, কিন্তু তুমি জেনে নাও এই নাম ও রূপ শুধু জড়ের সঙ্গেই জড়িত। জড়ের পেছনে আবার রয়েছে এণার্জি, এণার্জির পেছনে রয়েছে প্রকৃতি, আর এই প্রকৃতির পেছনে রয়েছে সেই এক পরমাত্মা, যিনি সবার পরমেশ্বর। পরমাত্মার বাইরে কোন কিছুরই অস্তিত্ব নেই। এই জ্ঞানের দ্বারা যখন তোমার অজ্ঞান চলে যাবে তারপর আর তোমাকে জন্ম নিতে হবে না। পুনর্জন্মের একমাত্র কারণ অজ্ঞান, যার অজ্ঞান নাশ হয়ে যায় তার আর কেন পুনর্জন্ম হবে। যদি আমি জেনে যাই এটা পুরুষ এটা প্রকৃতি, তাহলে আমার কি হবে?

**সমং সর্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরম্। বিনশ্যৎস্ববিনশ্যন্তং যঃ পশ্যতি স পশ্যতি।।২৭।।**

*সমং সর্বেষু ভূতেষু*, সেই পরমেশ্বর সমস্ত ভূতে সমান ভাবে বিরাজ করে আছেন, এই জ্ঞান এসে যায়। *বিনশ্যৎস্ববিনশ্যন্তং*, সৃষ্টির সব কিছু যদি বিনাশ হয়ে যায়, যার জ্ঞান হয়ে যায় সে দেখে অবিনাশী পরমেশ্বরের বিনাশ কখনই হয় না। তার মানে আমি একটা নাম ও রূপ নিয়ে এই শরীর ধারণ করে আছি, মৃত্যুতে আমার শরীরের যখন বিনাশ হয়ে যাবে কিন্তু আমার ভেতরে যিনি পরমেশ্বর আছেন তাঁর কিন্তু নাশ হয়নি, তিনি সেই একই ভাবে চলতে থাকেন। অন্য দিকে এই পৃথিবী একদিন ধ্বংস হয়ে যাবে। আমরা সবাই আতঙ্কিত হয়ে থাকি এই পৃথিবী যখন ধ্বংস হয়ে যাবে তখন আমাদের কি হবে? কিছুই হবে না। এইজন্য বেদান্ত বলছে যে অর্থে আমরা বিনাশের কথা চিন্তা করে আতঙ্কিত হয়ে থাকি সেই অর্থে কোন কিছুরই বিনাশ হয় না। পুরো পৃথিবী যখন ধ্বংস হয়ে যাবে তখন সে বাষ্পীভূত হয়ে এণার্জিতে চলে যাবে। এই পৃথিবীটা কার? ঈশ্বরের। এণার্জিটা কার? সেটাও ঈশ্বরের। শুধু আকারটা পাল্টাচ্ছে। সৃষ্টি কখনই নাশ হয়ে যায় না, এইজন্য বেদান্তীরা এইগুলো নিয়ে কখনই উদ্বিগ্ন হয় না। কারা উদ্বিগ্ন হয়? খ্রীশ্চান আর মুসলিমরা। কারণ এদের মতে আল্লা বা ঈশ্বর এই সৃষ্টিটাকে শুধু একবারের মতই সামনে নিয়ে আসেন। যদি সৃষ্টিটা এককালীন হয় তাহলে আল্লার কাছে অনেক সমস্যা এসে যাবে। কিন্তু বেদান্তীদের কাছে কোন সমস্যা হয় না। যদি সারা পৃথিবী বা

পুরো ব্রহ্মাণ্ডই যদি বিনাশের দিকে চলে যায় তাহলে আমাদের কাছে কিছুই হবে না, সব এণার্জি ফর্মে চলে যাবে। এণার্জিও চলে গেল, তখন ভগবানের প্রকৃতিতে বীজরূপে পড়ে থাকবে। যখন আবার সৃষ্টি হবে সেই বীজ থেকে আবার এণার্জি ফর্মে চলে আসবে, এণার্জি ফর্ম থেকে আবার এই পুরো সৃষ্টি দাঁড়িয়ে যাবে। এইজন্য আমাদের কাছে সৃষ্টির কোন গুরুত্ব নেই, গুরুত্ব হচ্ছেন সেই পরমেশ্বর, পরমেশ্বরের বাইরে আমাদের কাছে কোন কিছুরই গুরুত্ব নেই। মানুষ মরে যাক, পশুপাখি সব মরে যাক, সমগ্র সৃষ্টিই ধ্বংস হয়ে যাক কিন্তু পরমেশ্বরের কোন বিনাশ নেই, তিনি আদি ও অনন্ত। এই জ্ঞান যখন যার এসে যায় তখন রোগ, শোক তাকে আর কাবু করতে পারেনা। ভগবান বুদ্ধ যখন রোগগ্রস্ত, বৃদ্ধাবস্থা ও মৃত্যুর রূপকে দেখে নিলেন তখন তাঁর মনে বৈরাগ্য এসে গেল। সন্ন্যাসী হয়ে বেরিয়ে গিয়ে তিনি বুদ্ধ হয়ে গেলেন। বুদ্ধ হয়ে যাওয়ার পরও তিনি রোগশোক দেখেছেন, মৃত্যুও দেখেছেন। কিন্তু তখন তিনি দেখছেন এগুলো সব মিথ্যা, বুদ্ধ হওয়ার আগে এগুলোকে দেখে তিনি কষ্ট পেয়েছিলেন। কিন্তু বুদ্ধ হওয়ার পর তিনি বুঝলেন নির্বাণটাই আসল। আমি যদি বলি, সিয়ারাম ম্যায় সব জগ জানু, সমস্ত জগতকে আমি সীতারাম রূপেই জানছি। তাহলে এই জগতের যদি নাশ হয়ে যায় তাহলেও সীতা আর রাম শেষ হয়ে যাবেন না। সীতা আর রামই যদি আমার সব কিছু হয়ে থাকেন তাহলে জগৎ থাকল কি থাকল না তাতে আমার কি আসে যায়। জগতের কষ্ট দেখলে, মানুষের দুঃখ দুর্দশা দেখলে আমারও কষ্ট হবে এতে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু সব কিছুর উপরে হলেন সীতারাম। আর বলছেন –

**সমং পশ্যন্ হি সর্বত্র সমবস্থিতমীশ্বরম্। ন হিনস্ত্যাত্মনাত্মানং ততো যাতি পরাং গতিম্।।২৮।।**

মানুষ যখন সেই অবস্থায় পৌঁছে গিয়ে পুরুষ প্রকৃতির বিভেদকে দেখতে পায়, *সমং পশ্যন্ হি সর্বত্র*, তখন দেখে এই যা কিছু দেখছি সব শ্রীরামকৃষ্ণই হয়েছেন। তখন সে দেখে *সমবস্থিতমীশ্বরম্*, সে দেখে আমি সেই ঈশ্বরেই আছি, ঈশ্বরও আমার মধ্যেই আছেন। যার এই বোধ হয় যায় তখন সে কাকেই বা হিংসা করবে আর কাকেই বা ঘৃণা করবে, *ন হিনস্ত্যাত্মনাত্মানং*, নিজের বা অপরের হিংসা করে না। ঈশোপনিষদে একটা মন্ত্র আছে যেখানে বলছেন *অসুর্যা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃতাঃ। তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি যে কে চাত্মহনো জনাঃ*।।৩।। যারা আত্মহন্তা, এটাকে অনেকে অনুবাদ করছেন যারা আত্মহত্যা করে, কিন্তু এখানে আত্মহত্যার কথা বলা হচ্ছে না, আত্মহন্তা হচ্ছে, যে নিজের স্বরূপকে জানে না। যারা নিজের স্বরূপকে জানেনা তারা মৃত্যুর পর কোথায় যায়? *অসুর্যা নাম তে লোকা*, যে লোকে সূর্যের আলোও পৌঁছায় না, মানে একেবারে অন্ধকারের মধ্যে তারা চলে যায়। উপনিষদের এই ধারণাটাকেই গীতার এই শ্লোকে পুনরল্লিখিত করা হয়েছে। যখন সাধক জেনে গেল যে ভগবানই এই সব কিছু হয়েছেন, তখন সে নিজের হিংসা করে না। নিজেকে হিংসা করা মানে, যে অজ্ঞানী। অজ্ঞানী কি করে? মৃত্যুর সময় এই শরীরটাকে ত্যাগ করে আরেকটি শরীরকে নিয়ে নেয়, তারপর এই শরীরটাকেও সে মেরে ফেলে তারপর আরেকটা শরীর নিয়ে নেয়। এইভাবে কত কত জন্ম ধরে একটা নতুন শরীর ধারণ করছে, তারপর সেই শরীরটাকে মেরে ফেলছে, আবার একটা নতুন শরীর নিচ্ছে। জন্ম মানেই শরীর, মৃত্যু মানেই এই শরীরের নাশ। তার মানে প্রত্যেক জন্মেই সে নিজেকে হত্যা করছে। অজ্ঞান নাশ হয়ে গিয়ে যখন আত্মজ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে যায় তখন এই আত্মহন্তাটাই বন্ধ হয়ে যায়। আর অন্য ভাবে বলা যায়, সে কারুর প্রতি হিংসা, বিদ্বেষ করে না। যখন সে বুঝে নিল যে ঈশ্বর ছাড়া আর কিছু নেই তখন সে অন্যের প্রতি কোন দ্বেষ ভাব রাখেনা। কি করে হিংসা বিদ্বেষ করবে, সেতো দেখতে পারছে যে ঈশ্বর নিজেই এই সব কিছু হয়েছেন। তখন আর কি হচ্ছে?

**প্রকৃত্যৈব চ কর্মাণি ক্রিয়মাণানি সর্বশঃ। যঃ পশ্যতি তথাত্মানমকর্তারং স পশ্যতি।।২৯।।**

যখন সে বুঝে নেয় যাবতীয় যা কিছু হচ্ছে, *প্রকৃত্যৈব চ কর্মাণি*, প্রকৃতিই সব কিছু করছে, যত রকমের কর্মাদি হয়ে চলেছে সব প্রকৃতির জন্যই হচ্ছে, প্রকৃতিই করে যাচ্ছে। যারা অজ্ঞানী তারা দেখে যে আমিই করছি বা অন্য কেউ করছে। কিন্তু যিনি জ্ঞানী তিনি দেখেন এর আত্মা, তার আত্মা, ওর আত্মা সব এক আর আত্মা কিছুই করছেন না, হাত, পা, মুখ যেটা নাড়ছে সেটাও প্রকৃতির কার্য। এই জিনিষটাকে যখন সে দেখে নিল যে আত্মা কিছুই করছেন না, সব প্রকৃতিই করছে তখন *যঃ পশ্যতি তথাত্মানমকর্তারং স পশ্যতি*, এই যা কিছু হচ্ছে তার ভেতরে একজন চৈতন্য সত্তা আছেন বলেই এই ইন্দ্রিয়গুলো নড়ছে, আবার ইন্দ্রিয়গুলো নড়ছে বলে চৈতন্য নড়ছে তা নয়। যা হচ্ছে সেটাও আবার তিনি নন। উনুনের নীচে আগুন আছে বলে হাড়িতে আলু-পটল লাফায়, কিন্তু আগুনটা লাফাচ্ছে না। কারণ যিনি আত্মা তিনি অকর্তা, কিন্তু তিনি আছেন বলেই শরীরের সব কিছু নড়ছে। তারপর বলছেন –

**যদা ভূতপৃথগ্ ভাবমেকস্থমনুপশ্যতি। তত এব চ বিস্তারং ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা।।৩০।।**

তখন দেখে এই যত পৃথক পৃথক প্রাণী জগতে আছে, সব কিছুর ভেতরে সেই এক ব্রহ্ম, সেই এক আত্মাকেই দর্শন করেন। *তত এব চ বিস্তারং*, ব্রহ্ম এইভাবে নিজেকে বিস্তার করে এই এত কিছু হয়েছেন। মায়ের চারটে সন্তান, মা এই চারটে সন্তানের মধ্যে নিজেকে বিস্তার করেছেন। ঠিক তেমন যিনি শুদ্ধ আত্মা, তাঁর দুটো প্রকৃতি পরা প্রকৃতি আর অপরা প্রকৃতি, এই অপরা প্রকৃতি থেকেই এই পুরো বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের বিস্তার হয়েছে। এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে আমরা সবাই রয়েছি, আমরা সবাই হলাম সেই শুদ্ধ আত্মারই বিস্তার। তাই আত্মার বাইরে কিছুই নেই। সেইজন্য এই বোধ এসে গেলে তার পুরো মানসিকতাই পাল্টে যায়। এমনিতে

সাধারণ অবস্থায় আমরা নিজেদের ভাই-বোনদের সব থেকে বেশি ভালোবাসি, কারণ আমি জানি এরা হচ্ছে আমার মায়েরই বিস্তার, আমরা ভাইবোনরা সবাই এক সূত্রে বাঁধা আছি। এখন লোকেরা বলে ভাইয়ের মত শত্রু হয় না, ঠিকই বলে, কিন্তু ভাইয়ের মত বন্ধুও তো হয় না। ইংরাজীতে একটা কথাই আছে – blood is thicker than water যতই খারাপ সম্পর্ক তৈরী হোক, ভাই-বোনের যে সম্পর্ক এর মত সুদৃঢ় সম্পর্ক আর কোন ধরণের সম্পর্কে হয় না। যার কাছে স্বার্থটাই সর্বস্ব, তাদের কথা এখানে বলা হচ্ছে না, স্বার্থের জন্য শুধু ভাই-বোন কেন, যাকে যা কিছু খুশি করে দেওয়া যায়। স্বার্থ না থাকলে ভাই-বোনের মত সম্পর্ক আর কিছুতে দেখা যায় না, কারণ ঐটাই, আমার যেখান থেকে বিস্তার হয়েছে, এরাও সেইখান থেকে বিস্তার পেয়েছে। এটাকেই যদি আরও বড় করে দেওয়া যায়, যখন শুদ্ধ আত্মাকে দেখছি তখন দেখছি যা কিছু আছে সব এই শুদ্ধ আত্মারই বিস্তার, তখনই আমরা ঠিক ঠিক একত্ব অনুভব করতে সক্ষম হই। তখন এই জগতের কোন কিছুর ক্ষমতা নেই যে আমাকে শোক, মোহ, বিষাদ, ক্রোধের মধ্যে ঠেলে দিতে পারবে। আমরা মনে করি আমরা যে দুঃখ কষ্ট পাই, এগুলো সব বাইরের জগৎ থেকে আমার উপর চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। অথচ আমরা যদি খুব ভালো করে বিশ্লেষণ করে দেখি তাহলে দেখতে পাব যে আমার যত রকমের সমস্যা সব আমার ভেতর থেকেই আসছে, আমার সব কিছুর জন্য আমি নিজেই দায়ী। কেউ বাইরে থেকে কোন সমস্যা আমার জন্য তৈরী করছে না। বেশির ভাগ সমস্যা প্রাথমিক অবস্থায় আমার ভেতর থেকে তৈরী হয়, পরে এই সমস্যাটাই বাইরে থেকে ঘুরে আমার কাছে ফেরত চলে আসে। আমি নিজেকে পাল্টে ফেললে জগৎও সাথে সাথে পাল্টে যাবে। এইটাই বাস্তব। যে সমস্যাটা বাইরে থেকে আসছে, তাও খুব কম করে দশ শতাংশ, সেগুলোও পাল্টে যাবে যদি এই ভাবটা থাকে আমি আর তুমি অভেদ।

অনেকে গান্ধীজীর নামে সমালোচনার দৃষ্টি নিয়ে বলে যে, ইংরেজরা ভদ্রলোক ছিলেন বলে গান্ধীজী অহিংসার অনুশীলন করতে পেরেছিলেন। জার্মান বা ফরাসীদের হাতে যদি গান্ধীজী পড়তেন তাহলে এই দুটো জাত গান্ধীজীকে দুদিনে সোজা করে দিত। আমরা যদি আমাদের শাস্ত্রের কথা দিয়ে অনুসরণ করে বিচার করি তাহলে দেখা যাবে যে এদের এই ধরণের মন্তব্য আদপেই সঠিক নয়। ভগবান বুদ্ধ যখন অঙ্গুলিমালের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন, অঙ্গুলিমাল একটু পিছিয়ে গেল। নেলসন মেণ্ডেলা দক্ষিণ আফ্রিকাতে বর্ণ বিদ্বেষের বিরুদ্ধে আন্দোলনে পুরোপুরি অহিংস ভাবধারাকে অবলম্বন করে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। অহিংসার জন্যই তিনি তাঁর দেশ ও জাতিকে স্বাধীনতা এনে দিতে পারলেন। উনি বারবার বলেছেন আমি গান্ধীজীর কাছ থেকে অহিংস আন্দোলনের প্রেরণা পেয়েছি। কেউ যদি ভেতর থেকে ঠিক ঠিক অহিংসাতে প্রতিষ্ঠিত হয়, আর তার এই অহিংসা ব্রতের খবর যদি অন্তর্যামীর কাছেও পৌঁছে যায়, তখন যত বর্বর আর নৃশংসই হোক না কেন, তারা এই অহিংসাতে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তির সামনে দাঁড়াতেই পারবে না। এই ধরণের অহিংসাতে প্রতিষ্ঠিত হওয়াটা অত্যন্ত উচ্চ আধ্যাত্মিকতার ব্যপার, সাধারণ মানুষের পক্ষে ঐ ধরণের অহিংসাতে প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভবই না। সাধারণের জন্য ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ। অহিংসাদি এগুলো সন্ন্যাসীদের জন্যই। *যদা ভূতপৃথগ্ ভাবমেকস্থমনুপশ্যতি*, সব জীবের মধ্যে যখন দেখছেন এই এক জিনিষ, এটা হচ্ছে আধ্যাত্মিকতার চরম অবস্থা, তখন তার মধ্যে আর কারুর প্রতি হিংসা, বিদ্বেষ আসার কোন প্রশ্নই হয় না। সাথে সাথে তাঁরা এটাও বুঝে নেন যে যা কিছু আছে সবই এই ব্রহ্মেরই বিস্তার। এই বোধ যখন তাঁর এসে যায় তখন সে ব্রহ্মের সাথে এক হয়ে যায়, তাঁর আর বিনাশ হয় না, জন্ম-মৃত্যুর পারে চলে যায়। এরপর বলছেন –

**অনাদিত্বান্নির্গুণাত্বাৎ পরমাত্মাহয়মব্যয়ঃ। শরীরস্থোহপি কৌন্তেয় ন করোতি ন লিপ্যতে।।৩১।।**

হে কৌন্তেয় এই পরমাত্মা হলেন অনাদি, পরমাত্মার কোন আরম্ভ বা শুরু নেই। আর *নির্গুণাত্বাৎ*, পরমাত্মার কোন গুণ নেই। কারণ গুণ থাকলেই কখন সগুণ হবে কখন নির্গুণ হবে, তাহলে সমস্যা হয়ে যাবে, নির্গুণ হচ্ছে একেবারে শুদ্ধ। *পরমাত্মাহয়মব্যয়ঃ*, আমার ভেতরে যিনি আছে, আর আমার বাইরে সর্বব্যপী যিনি আছেন, এই দুটো সত্তা কখনই আলাদা নন, ভেতরে আর বাইরে সেই একই পরমাত্মা। এই পরমাত্মা হলেন *অব্যয়ঃ*, এঁর কোন রকমের ক্ষয় হয় না। তিনি প্রত্যেক জীবের শরীরে অবস্থান করেও শরীরের কোন কিছুতে লিপ্ত হন না, কোন কিছু করেনও না।

এখানে অনেক রকমের প্রশ্ন এসে যায়। প্রথম কথা হচ্ছে, ইনি শরীরের ভেতরে আছেন অথচ কিছু করেন না, তাহলে এই সব কিছু করছেটা কে, শরীরতো জড় সেতো কিছু করতে পারেনা? না, তখন বলছেন আত্মাত উপস্থিতিতে প্রকৃতিই সব কিছু নিজে থেকে করে যাচ্ছে। চুম্বক আর লোহার যে সম্পর্ক এখানেও ঠিক যেন সেই একই সম্পর্ক, লোহার টুকরোর কাছে যেই চুম্বক পাথরকে নিয়ে আসা হয় তখনই লোহার টুকরো গুলো নড়তে শুরু করে। ইলেক্ট্রিসিটিতে ঠিক এই একই জিনিষ হয়, বিদ্যুৎ প্রবাহ যখন হতে থাকে তখন তামার তারগুলো ইলেক্ট্রো ম্যগনেটে রূপান্তরিত হয়ে যায় তখন মোটর ঘুরতে শুরু হয়ে যায়। এই মোটর চলছে বলে এত বিশাল বিশাল ট্রেন চলছে। কেন আত্মা কিছুতে লিপ্ত হয় না?

**যথা সর্বগতং সৌক্ষ্ম্যাদাকাশং নোপলিপ্যতে। সর্বত্রাবস্থিতো দেহে তথাত্মা নোপলিপ্যতে।।৩২।।**

যেমন সর্বব্যাপী আকাশ সব জায়গাতে আছে, পাঁকের মধ্যেও আকাশ, এই বোতলের মধ্যেও আকাশ, গ্যাসের মধ্যেও আকাশ কিন্তু আকাশ অতি সূক্ষ্ম বস্তু বলে কোন বস্তুতেই বস্তুর ধর্মে লিপ্ত হয় না, ঠিক সেই রকম সমস্ত দেহের মধ্যে থেকেও আত্মা এই শরীরের কোন ধর্ম বা গুণের দ্বারা কখনও লিপ্ত হন না।

**যথা প্রকাশয়ত্যেকঃ কৃৎস্নং লোকমিমং রবিঃ। ক্ষেত্রং ক্ষেত্রী তথা কৃৎস্নং প্রকাশয়তি ভারত।।৩৩।।**

ভোরের আকাশে যখন সূর্যের উদয় হয় তখন তার কিরণের দ্বারা সব কিছুকে প্রকাশিত করে দিচ্ছে। এখন এই সূর্যের আলোতে কেউ ডাকাতি করছে, কেউ চাষবাস করছে, কেউ ছবি আঁকছে, কেউ কবিতা লিখছে, তাতে সূর্যের কিছু আসে যায় না। ঠিক সেই রকম আত্মা যখন শরীর মানে ক্ষেত্রকে আশ্রয় করে তখন পুরো শরীরটা আলোকিত হয়ে যায়। আমি যে হাত নাড়ছি, কথা বলছি এগুলো কি করে সম্ভব হচ্ছে? বলছেন, কারণ এই শরীরের মধ্যে আত্মা আছেন বলেই এত কিছু করা সম্ভব হচ্ছে। কিন্তু এর কোন কিছুতেই আত্মা লিপ্ত হন না। অথচ আমরা মনে করছি আমি হাত নাড়লাম, আমি কথা বলছি, আমি ব্যাথা পেয়েছি, আমি চোখ পিটপিট করছি। আমিটা কে? যার আমি বোধ আছে সেতো আত্মা, আমি সেই শুদ্ধ আত্মা। আসল অনুভূতি কার হচ্ছে? আত্মার, অথচ আত্মা কিছুই করছেন না। এই হাতটা তাহলে কে নাড়ছে? প্রকৃতি নাড়ছে, অথচ বলছি আমি নাড়ছি, এটাই দৈবী রহস্য। পুরুষ নিজেকে প্রকৃতির সঙ্গে এক ভাবছে। কিন্তু যিনি সমাধিবান পুরুষ, যাঁর জ্ঞান লাভ হয়ে গেছে, তিনি দেখছেন সব প্রকৃতিই করছে, আমি কিছুই করছি না। তাঁর হাত কেটে গেলে তাঁরও ব্যাথা অনুভব হবে, কিন্তু আমার লেগেছে ঐ ভাবটা তাঁর হয় না। শেষ শ্লোকে বলছেন –

**ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োরেবমন্তরং জ্ঞানচক্ষুষা। ভূতপ্রকৃতিমোক্ষঞ্চ যে বিদুর্যান্তি তে পরম্।।৩৪।।**

আধ্যাত্মিক জগতের চরম অবস্থা তাঁরাই লাভ করতে পারেন যাঁরা জেনে গেছেন ক্ষেত্র কি আর ক্ষেত্রজ্ঞ কি, ক্ষেত্র আর ক্ষেত্রজ্ঞের পার্থক্যটাকে যাঁরা ধরে ফেলেছেন। কারা ঠিক ঠিক বুঝতে পারেন? *ভূতপ্রকৃতিমোক্ষঞ্চ*, ভূত আর প্রকৃতির যে অবিদ্যা, জড় জগতের যখন অত্যন্ত অভাব হয়, মানে ভূত, প্রকৃতির অবিদ্যাকে নাশ করে দিতে যাঁরা সক্ষম হন তাঁরাই *বিদুর্যান্তি তে পরম্*, পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন। পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হওয়া মানে আত্মজ্ঞান, ব্রহ্মজ্ঞান, ঈশ্বরজ্ঞান। এই ঈশ্বর জ্ঞান যাঁদের হয় তাঁরা জানেন দেহ আলাদা আত্মা আলাদা।

এই হচ্ছে ত্রয়োদশ অধ্যায়ের ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞযোগের যা কিছু। আমাদের জানতে হবে ক্ষেত্র কি আর ক্ষেত্রজ্ঞ কি। ক্ষেত্র হচ্ছে জড় পদার্থ বা প্রকৃতি, ক্ষেত্রজ্ঞ হচ্ছে চৈতন্য বা পুরুষ। যা কিছু হচ্ছে ক্ষেত্রে হচ্ছে। কেন হচ্ছে? কারণ ক্ষেত্রজ্ঞ আছে বলে। ক্ষেত্রজ্ঞ কে? সবার ভেতরে যে আত্মা রয়েছেন। এই আত্মা কে? সেই পরমাত্মা। ভেতরের আত্মা আর বাইরে যে পরমাত্মা রয়েছেন এই দুইয়ের মধ্যে কোন ভেদ নেই। এই ক্ষেত্র রূপে সমগ্র জড় জগতের যা কিছু দেখছি এটা হচ্ছে সেই পরমাত্মার প্রকৃতি। শেষে বলছেন পরমাত্মা কোন কিছুতে লিপ্ত হন না, যেমন আকাশ কিছুতে লিপ্ত হয় না, সূর্য যেমন কিছুতে লিপ্ত হয় না।

এইখানেই হবে সত্যের পরীক্ষা, আমি জেনে গেছি ক্ষেত্র কি, ক্ষেত্রজ্ঞ কি, আমি কোন কিছুতে লিপ্ত হচ্ছি কিনা এটাই হল আমার পরীক্ষা। এখন ভারতে তো বাবাজীতে ছেয়ে গেছে, সবাই কত কি শেখাচ্ছে, নিঃশ্বাস কিভাবে নিতে হবে, ধ্যান কিভাবে করতে হবে, কত রকমের লিভিং আর্ট শেখাচ্ছে। আমরা কি করে জানব এরা সত্যিকারের বাবাজী কিনা? দেখতে হবে কোন কিছুতে লিপ্ত হচ্ছে কিনা, কার মত? *যথা সর্বগতং সৌক্ষ্ম্যাদাকাশং নোপলিপ্যতে*, সূর্যের মত কোন কিছুতে লিপ্ত হয় না। ভালোতেও লিপ্ত হয় না, মন্দতেও লিপ্ত হয় না। এটাই হচ্ছে পরীক্ষা। এই হচ্ছে সেই অবস্থায়, যে অবস্থায় পৌঁছে গেলে তাঁকে আর জন্ম নিতে হবে না।

**ওঁ তৎসদিতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসুপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে**
**শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞবিভাগযোগো নাম ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ।।**

********

১০ই অক্টোবর ২০১০

চতুর্দশ অধ্যায়

# গুণত্রয়বিভাগযোগ

ত্রয়োদশ অধ্যায়ে দুটো শ্লোকে যার মধ্যে একটা হচ্ছে ২১ নং শ্লোক, যেখানে বলা হয়েছিল – *পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো হি ভুঙক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্*, তার মানে হচ্ছে, এই পুরুষ প্রকৃতির মধ্যে বসে প্রকৃতির যাবতীয় যা কিছু আছে ভোগ করে। আরেকটি হল ২৬ নং শ্লোক সেখানে বলা হয়েছিল, *যাবৎ সঞ্জায়তে কিঞ্চিৎ সত্ত্বং স্থাবরজঙ্গমম্। ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞসংযোগাৎ তদ্বিদ্ধি ভরতবর্ষভ।।* এতে বলা হচ্ছে যা কিছু পদার্থ আছে তা হল প্রকৃতি, আর চৈতন্য যেটা আছে সেটা হচ্ছে পুরুষ। এই দুটো যখন এক সঙ্গে চলে তখনই সংসার এসে যায়। যাঁরা দর্শন নিয়ে খুব আলোচনা করেন তাঁদের কাছে এগুলো খুব বিতর্কিত বিষয়। সংসারটা আসলে কি, এটাকে ব্যাখ্যা করা অসম্ভব। তার একটা কারণ হল মানুষের বুদ্ধি খুব সীমিত, তাই যেখানে গুরু-শিষ্যের পরম্পরা থাকে না সেখানেই এটা খুব বিপজ্জনক হয়ে যায়। পাশ্চাত্য দর্শনে তিনজনের মধ্যে ঠিক ঠিক গুরু-শিষ্যের পরম্পরা ছিল – সক্রেটিস, সক্রেটিস থেকে প্লেটো আর প্লেটো থেকে এ্যরিস্টটল। সক্রেটিস যা কিছু বুঝেছিলেন তিনি সেটা তাঁর শিষ্য প্লেটোকে বুঝিয়েছিলেন, প্লেটো যেটা বুঝেছিলেন তিনি আবার সেটা এ্যরিস্টটলকে বুঝিয়ে গেছেন। এনারা কিন্তু পরে এক অপরের থেকে উল্টো তত্ত্ব উপস্থাপন করে গেছেন। গুরু-শিষ্যের যে মৌলিক নিয়ম তাতে গুরু যেটা বলে দিয়েছেন সেটাকে নিয়েই শিষ্য এগোবে, ওর উপরে নিজের কেরামতি দেখানো যাবে না। কিছু যে নিজের কেরামতি একেবারেই দেখাবে না তা নয়, অনেক ক্ষেত্রেই কোন কোন শিষ্য নিজেও কিছু নতুন তত্ত্ব নিয়ে হাজির হয়ে গুরুর মৌলিক তত্ত্বর সাথে জুড়ে দেবে, নতুবা নিজেই একটা নতুন সম্প্রদায় তৈরী করে দেবে, তখন কিন্তু সে হয়ে যাবে সম্প্রদায় কর্তা। তবে সম্প্রদায় কর্তা একটা প্রজন্মেই হয়ে যাবে এই অনুমতি আমাদের হিন্দু প্রথাতে দেওয়া নেই। যেমন রামানুজ, রামানুজ আচার্য শঙ্করের পরম্পরা থেকেই দীক্ষিত হয়েছিলেন, সেটাতেই শিক্ষা পেয়েছিলেন। পরে তিনি শঙ্করাচার্যের সম্প্রদায় থেকে সরে এসেছিলেন। তারপর তিনি বিশিষ্টাদ্বৈতের সম্প্রদায় কর্তা হয়ে গিয়েছিলেন। ঠিক তেমনি, মাধ্বাচার্যও বড় হয়েছিলেন অদ্বৈত সম্প্রদায়ে, কিন্তু তিনিও পরে তাঁর মত পাল্টে সম্প্রদায় কর্তা হয়েছিলেন। চৈতন্য মহাপ্রভু সন্ন্যাস নিয়েছিলেন দশনামী সম্প্রদায় থেকে, কিন্তু তিনিও পরে লাইন বদল করে সম্প্রদায় কর্তা হয়ে যান। আমাদের ঠাকুর সন্ন্যাস নিলেন তোতাপুরির কাছ থেকে, মানে শঙ্করাচার্যের সম্প্রদায়। এই চারজন, রামানুজ, মাধ্বাচার্য, চৈতন্য মহাপ্রভু আর আমাদের ঠাকুর, এই চারজনদের পরম্পরা হচ্ছে শঙ্করাচার্য কিন্তু এনারা পরে হয়ে গেলেন সম্প্রদায় কর্তা। সেখান থেকে তাঁদের নতুন সম্প্রদায় চলতে থাকল। যদিও আমাদের মূল শেকড় আচার্য শঙ্কর কিন্তু অনেক জায়গায় আমরা শঙ্করাচার্যের মত থেকে সরে এসেছি, কারণ এটা এখন নতুন সম্প্রদায়।

আধ্যাত্মিক দর্শনকে চারটি প্রশ্নের সমাধান দিতে হয়, ঈশ্বর কি, জীব কি, জগৎ কি আর মায়া কি। ঈশ্বর হচ্ছেন সব কিছুর নাশ হয়ে গেলেও যেটা থেকে যায়, অন্য দিকে তিনিই সব কিছুর উৎস। উৎসের যে চৈতন্য সত্তা তাকে বলা হয় ঈশ্বর। ঈশ্বরকে আমি যেভাবেই গ্রহণ করিনা কেন সেটা আমার ব্যাপার। ঈশ্বরকে কেউ ব্রহ্ম বলতে পারে, কৃষ্ণ বলে কেউ নিতে পারে, কেউ আল্লা বলে নিতে পারে সেটা যার যার ব্যাপার। কিন্তু মূল জায়গাটা একই থাকছে সেটা হচ্ছে ঈশ্বর। জীব হচ্ছে চৈতন্যের ব্যক্তি সত্তা। আমি আর এই মাইক্রোফোনের মধ্যে অনেক তফাৎ আছে। আমি বুঝতে পারছি আমার ভেতরে বিশেষ এমন কিছু একটা আছে যেটা আমাকে মাইক্রোফোনের থেকে আলাদা করে দিচ্ছে। এটাকে বলা হচ্ছে জীব। জগৎ হচ্ছে সমুদয় জড় পদার্থ। আর মায়া হচ্ছে সৃষ্টির প্রক্রিয়া। ভগবান যদি থাকেন আর ভগবান যদি নাও থাকেন এই সৃষ্টির প্রক্রিয়া থাকবে। যখনই কেউ ঠিক করে থাকেন যে আমি আধ্যাত্মিক দর্শন রচনা করব, প্রথমে তাকে কিন্তু এই চারটেকে ব্যাখ্যা করতে হবে। যদি সে বলে ঈশ্বর আছেন তাহলে তাকে তার দর্শনে যুক্তি দিয়ে প্রমাণিত করতে হবে ঈশ্বর আছেন। যদি বিজ্ঞানীদের মত বলেন আমি ঈশ্বর মানিনা, তাহলে তাকে সেটাও প্রমাণ করতে হবে ঈশ্বর কেন নেই। এরপর তাকে জীব কি ব্যাখ্যা করতে হবে, জগৎ কি সেটাকে ব্যাখ্যা করতে হবে। আর জড় পদার্থ থেকে চৈতন্যের আবির্ভাব কিভাবে হয়েছে। যেমন আমি বুঝতে পারছি আমি আর এই প্লাস্টিকের বোতল আলাদা, তাকে যুক্তি দিয়ে দেখাতে হবে কেন এই দুটো আলাদা, কিভাবে আলাদা হল। আধ্যাত্মিক দর্শনকে এই জিনিষগুলিকে ব্যাখ্যা করতেই হবে। একজন যদি কেউ ঠিক করেন এই সব কিছু আমি আমার নিজের চিন্তা ভাবনা দিয়ে উদ্ঘাটন করে দেব, কিন্তু সেটা কখনই হয়ে ওঠে না। কারণ মানুষ হচ্ছে ক্ষুদ্র বুদ্ধি সম্পন্ন। এই ক্ষুদ্র বুদ্ধি সম্পন্নতার জন্য তাকে গুরু-শিষ্য পরম্পরার উপর নির্ভর করতে হয়। ভারতে যে গুরু-শিষ্যের পরম্পরা চলে আসছে সেটা মূলতঃ ধর্ম, অধ্যাত্ম আর দর্শনকে ভিত্তি করেই চলে আসছে। পাশ্চাত্য জগতে গুরু-শিষ্যের পরম্পরা হচ্ছে একমাত্র বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে। ফিজিক্স, বায়োলজি, কেমেস্ট্রি যে ব্যাপারেই হোক না কেন, গুরু যেটা বলে দেন সেটাই তারা শেখে। গুরুর কাছ থেকে যেটা শিখছে, সেটাকে নিয়ে তারা আবার এগিয়ে যাচ্ছে। এই পরম্পরা আছে বলেই ফিজিক্স, বায়োলজিতে আজকে পাশ্চাত্য জাতি এতো এগোতে পেরেছে। কোন শিষ্যের কাছে গিয়ে যখন আগের থিয়োরিটা পাল্টে যায় তখন সেই শিষ্য ঐ নতুন লাইনের হয়ে গেলেন সম্প্রদায় কর্তা। যেমন আইনস্টাইন, আইনস্টাইন কখন ভাবেননি যে তিনি একটা সম্প্রদায় কর্তা হয়ে যাবেন। তিনি একটা জিনিষকে নিয়ে এগোতে থাকলেন, সেখান থেকে ছিটকে গেলেন অন্য দিকে। বিজ্ঞানে গুরু-শিষ্য পরম্পরা থাকাতে বিজ্ঞান আজ অনেক উন্নতি করেছে।

এখন এই যে প্রথম তিনটে প্রশ্ন, চৈতন্য কি, জড় কি? আর চৈতন্য আর জড়ের মিলনে যে জীব সৃষ্টি হচ্ছে সেটা কি, আর এই পুরো জিনিষটা হলো কিভাবে? এই প্রশ্নগুলোকে সমাধান করা অত্যন্ত কঠিন। ঈশ্বর হচ্ছেন শুদ্ধ চৈতন্য, কিন্তু যখন জড়ের সঙ্গে মিলন হয়ে যাচ্ছে তখন তাঁকেই বলা হচ্ছে জীব। চৈতন্যের বাইরে হচ্ছে জড় জগৎ আর পুরো জিনিষটা যেভাবে এক থেকে বহু হচ্ছে এটাকে বলছে সৃষ্টি প্রক্রিয়া, সৃষ্টির এই প্রক্রিয়াকেই আবার বেদান্তে বলছে মায়া। ঈশ্বর, জীব, জগৎ আর মায়াকে তাই ব্যাখ্যা করা খুব কঠিন। আমাদের আধ্যাত্মিক গুরুরা সাধনা করে যেখানে পৌঁছেছেন, সেখান থেকে জগৎকে তাঁরা যেভাবে দেখেছেন, সেই দৃষ্টিভঙ্গিটাই তাঁরা আমাদের সামনে দিয়ে গেছেন। তাঁদের গুরু-শিষ্য পরম্পরা সেই দৃষ্টিভঙ্গিকে অবলম্বন করে সাধনা করে যাঁরা এগিয়ে গেছেন তাঁদের কেউ কেউ জিনিষগুলোকে বুঝেছেন আবার কেউ বুঝতে পারেননি। এনারা আবার নিজেদের মত ব্যাখ্যা করে চলে গেছেন। এইসব কারণে দর্শনের অনেক কিছুই জট পাকিয়ে গেছে। যার ফলে সৃষ্টির প্রকরণকে আর যে চারটে প্রশ্নকে প্রত্যেক দর্শনকে ব্যাখ্যা করতেই হবে, কিন্তু বুঝতে গিয়ে পুরো ব্যাপারটা অত্যন্ত কঠিন ও জটিল হয়ে যায়।

আধ্যাত্মিক জগতে পুরো সমস্যা আমাকে নিজেকে নিয়ে। যেমন এখানে আমি বসে আছি, আমার সামনে এই মাইক্রোফোনটাও রাখা আছে, আমি আর এই মাইক্রোফোন আলাদা, আমি জীবন্ত আর মাইক্রোফোন জীবন্ত নয়। তাহলে আমার ভেতরে এমন কিছু একটা আছে যেটা আমাকে এই মাইক্রোফোন থেকে আলাদা করে দিচ্ছে। সেটা হল চৈতন্য। এখন এই চৈতন্যটা কি? অন্য দিকে বিজ্ঞান প্রশ্ন তুলছে আদৌ শুদ্ধ চৈতন্য বা ব্রহ্ম বলে কিছু আছে কিনা? ধর্ম ও অধ্যাত্মে এই শুদ্ধ চৈতন্যকেই বলছে ব্রহ্ম, ঈশ্বর, শ্রীকৃষ্ণ, আল্লা ইত্যাদি। এই শুদ্ধ চৈতন্য জড়ের মধ্যে এসে যখন পড়ছে তখন তাকে বলছে জীব। জড় পদার্থ হচ্ছে যার চৈতন্য নেই। আর এই পুরো যে প্রক্রিয়াতে জীব জগৎ তৈরী হচ্ছে তাকে বলা হচ্ছে সৃষ্টির প্রকরণ। আমাদের যত রকমের মত আছে, যেমন ষড়-দর্শন, ষড়-দর্শনের মধ্যে বেদান্তের যে বিভিন্ন শাখা আছে, এ ছাড়া তন্ত্র মত আছে, শাক্ত মত আছে আর অন্য দিকে আছে বিজ্ঞান, যেটা প্রায় চার্বাক দর্শনের কাছাকাছি, এছাড়া বৌদ্ধ মত আছে, এরা সবাই এই চারটে প্রশ্নকে ব্যাখ্যা করে যাচ্ছে। যদি আমাদের কেউ জিজ্ঞেস করে দর্শন শাস্ত্রে আসলে কি আছে? তাহলে আমরা পরিষ্কার বলে দিতে পারে যে, দর্শন শাস্ত্রে এই চারটে প্রশ্নকে নিয়েই আলোচনা করা হয়েছে।

জড়কে আইনস্টাইন এক কথায় সহজ করে ব্যাখ্যা করে দিলেন matter is nothing but energy বললেন এণার্জি ম্যাটার হয় ম্যাটার এণার্জি হয়। তাহলে বলতে হয় পদার্থের নিজস্ব কোন অস্তিত্ব নেই। আইনস্টাইন সমস্যাটা সমাধান করে দিলেন। আমাদের মুনি ঋষিরা আজ থেকে চার হাজার বছর আগে থাকতেই এই কথা জগৎবাসীকে বলে দিয়েছেন। তন্মাত্রা ছাড়া পদার্থ আর কিছুই নয়, আবার তন্মাত্রা এণার্জির থেকে আরও অনেক নীচে অবস্থান করছে। যেখান থেকে সৃষ্টি হয়, সেই প্রকৃতি থেকে এই তন্মাত্রা অনেক নীচে অবস্থান করছে। প্রথমে প্রকৃতি, প্রকৃতির ঠিক পরেই আসছে মহৎ বা কসমিক মাইণ্ড বা প্রতিফলিত চৈতন্য। সেখান থেকে বেরিয়ে আসছে এণার্জি, এই এণার্জিই তন্মাত্রার রূপ নেয়, এই তন্মাত্রা থেকে আসছে পদার্থ। এটা না হয় বোঝা গেলে, কিন্তু এর যে প্রক্রিয়, মানে সৃষ্টির প্রকরণ, এটাকে অনেকে মানতে চাইবে না। কারণ খ্রীশ্চান ও ইসলাম ধর্ম বলবে, তিনি ইচ্ছা করলেন let there be light, there was light তার মানে তাঁর ইচ্ছাতেই সৃষ্টি হয়ে গেল, সব ঝামেলা এখানে মিটিয়ে ফেলা হল। কিন্তু আমাদের হিন্দু ধর্ম এই একটি বাক্যে কখনই সন্তুষ্ট হবে না, আর এই তত্ত্বকেও হিন্দু ধর্ম মানবে না, কারণ এখানে গুরু-শিষ্য পরম্পরা আছে, এখানে প্রত্যেকটি জিনিষকে খুঁটিয় খুঁটিয়ে বিচার করে দেখা হয়।

ত্রয়োদশ অধ্যায়ে আমরা ঠিক এই জিনিষটাকে আলোচনা করেছিলাম, যেখানে ভগবান বলছেন – *যাবৎ সঞ্জায়তে কিঞ্চিৎ সত্ত্বং স্থাবরজঙ্গমম্,* এই জগতে যা কিছু স্থাবর জঙ্গম আছে সবই হল *ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞসংযোগাৎ,* ক্ষেত্র আর ক্ষেত্রজ্ঞ, অর্থাৎ জড় পদার্থ আর চৈতন্যের বা পুরুষ ও প্রকৃতির সম্মিলনে এই সব কিছু সৃষ্টি হচ্ছে। জগৎলীলা যেটা চলছে এটা হচ্ছে পুরুষ যখন প্রকৃতিকে ভোগ করে। পুরুষ যদি প্রকৃতিকে ভোগ না করে তাহলে এটাকে সংসার বলা যাবে না। তার মানে শুধু জড়ই পড়ে রয়েছে তাহলে সেটা সংসার হবে না, সংসার হতে গেলে জীবকে মঞ্চে আসতে হবে।

ত্রয়োদশ অধ্যায়ে ঈশ্বর, প্রকৃতি, ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের উপর বেশি জোর দেওয়া হয়েছে। চতুর্দশ অধ্যায়ে এসে একমাত্র ক্ষেত্রের উপর জোর দেওয়া হচ্ছে। এর পেছনে যে ভাবটা বেশি কাজ করে তা হল, একটা জিনিষকে জানা মানে তাকে ভালোবাসা, একটা জিনিষকে জানা মানে শক্তি অর্জন করা। আমরা যদি একটা জিনিষকে নাই জানি তাহলে সেটাকে ভালোবাসব কি করে? আমি যদি নাই বুঝি জড় কি চৈতন্য কি, তাহলে আমি চৈতন্যকে ভালোবাসব কি করে? প্রথমে জড় আর চৈতন্যের সম্মিলনের ব্যাপারটা ত্রয়োদশ অধ্যায়ে বলা হল, কিন্তু চতুর্দশ অধ্যায় বলবে জড় জিনিষটা কি। জড় জিনিষটাকে আমাদের বুঝিয়ে দেওয়ার একমাত্র কারণ হচ্ছে, আমি যাতে জড়ের সব কিছু জেনে নিয়ে জড় থেকে নিজেকে বার করে নিয়ে আসতে পারি।

এই অধ্যায়ে কপিলের সাংখ্য মতকে অবলম্বন করা হয়েছে। যদিও সাংখ্য মতকে বেদান্ত মোটামুটি মেনে নেয় কিন্তু একটা জায়গাতে বেদান্ত সাংখ্যকে মানবে না। এই জিনিষটাকে আচার্য শঙ্করও মেনেছেন স্বামীজীও স্বীকার করেছেন। সাংখ্যের মতে প্রকৃতি হচ্ছে স্বতন্ত্র, স্বাধীন সত্তা কিন্তু বেদান্তের কাছে স্বাধীন নয়। বেদান্তের মতে প্রকৃতি হল ঈশ্বরের অধীন আর ঈশ্বরেরই একটা রূপ হচ্ছে প্রকৃতি। এইটাকে যদি সাংখ্য মেনে নেয় তাহলে সাংখ্য আর বেদান্ত এক হয়ে যাবে। তবুও বেদান্ত সাংখ্য থেকে এক ধাপ এগিয়ে থাকবে যদিও সাংখ্য প্রকৃতিকে ঈশ্বরেরই একটা রূপ এবং ঈশ্বরের অধীন বলে কখনই মানবে না। সাংখ্য মতে প্রকৃতি এক দিক দিয়ে যাচ্ছে আর চৈতন্য আরেক দিকে দিয়ে যাচ্ছে, আর যখনই দুটো এক জায়গায় গিয়ে মিলবে তখনই সৃষ্টির প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যাবে, যখন আলাদা হয়ে যায় তখন সৃষ্টির সব কিছুর নাশ হয়ে যায়, মানে প্রলয় হয়ে যায়। শাক্ত, তন্ত্র এবং পাশুপত মতাবলম্বীরা সব কিছু এই ভাবেই মানে। এরা বলে শিব আর শক্তি। যখনই শিব আর শক্তির খেলা শুরু হয় তখনই সৃষ্টি হতে থাকে, যখন শিব আর শক্তি দুজন দুজনের মধ্যে এক হয়ে যায় তখন সৃষ্টির সব প্রক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায়। শিব শক্তি যদিও এখানে আলাদা হয়ে যাচ্ছে দেখায় কিন্তু এটাকে মিলন বলে দেখান হয়, এটাই শিব শক্তির খেলা। এগুলো একেক মতের একেকটি সিদ্ধান্ত। এখন কোন্ সিদ্ধান্ত ঠিক আর কোন্ সিদ্ধান্ত ঠিক নয় এটা কেউ কোন দিন বলতে পারবে না, তার কারণ মহম্মদ বলবেন আল্লাই সব, যিশু বলবেন গডই সব কিছু, শ্রীরামকৃষ্ণ বলবেন ব্রহ্ম আর শক্তি অভেদ, ব্রহ্ম ও শক্তিই সব আবার অন্য দিকে বৈষ্ণবরা বলবে শ্রীকৃষ্ণই সব, বৌদ্ধরা বলবে নির্বাণই সব। কেউই কিন্তু চার্বাকদের মত প্রকৃতি বা জড়ই সব কখনই বলবেন না। যারা বলে বিভিন্ন ধর্মে আলাদা আলাদা কথা বলে নিজেদের মধ্যে ঝগড়া বিবাদ করছে, তারা কিন্তু একটা জিনিষকে ভুলে যাচ্ছে যে, এরা সবাই চৈতন্য সত্তাকে একমাত্র সত্তা বলে একবাক্যে স্বীকার করছেন। জড়কে একমাত্র বিজ্ঞানীরাই প্রাধান্য দেয়, যাঁরাই আধ্যাত্মিক জগতে আছেন তাঁরা কেউই জড়কে প্রাধান্য দেন না, শুধু যে প্রাধান্য দিচ্ছেন না তা নয়, প্রকৃতিকে তোয়াক্কাই করেন না, আর জড়ের যে কোন মূল্য আছে সেটাকেও তাঁরা কোন কালেই কোন গুরুত্ব দেননি। এটাই হচ্ছে প্রধান পার্থক্য। কিন্তু সমস্যাটা হচ্ছে অন্য জায়গায়, যত শাস্ত্র আছে, আর যে যেভাবে সাধনা করেছে তার সিদ্ধি তার সেইভাবেই হয়েছে, তার বাইরে তার সিদ্ধি হয়নি। তার মানে, শ্রীরামকৃষ্ণ যখন কালীকে নিয়ে সাধনা শুরু করলেন, শেষে কিন্তু তিনি মাকালীকেই দেখছেন, যিনি শ্রীকৃষ্ণকে নিয়ে সাধনা করেছেন শেষে তিনি শ্রীকৃষ্ণকেই সব দেখছেন। কিন্তু একটা জায়গায় এদের সবারই মিল আছে, তা হচ্ছে কেউই জড়কে একেবারেই গুরুত্ব দিচ্ছেন না।

চৈতন্য সত্তাকে আমি কিভাবে দেখব সেটা আমার সাধনার উপরে নির্ভর করে, গুরু আমাকে কিভাবে সাধনা করতে বলেছেন আমার সিদ্ধি সেটার উপর নির্ভর করবে, কিন্তু সবার ক্ষেত্রে শেষে গিয়ে একটা জিনিষ এক হয়, সেটা হচ্ছে জড়ের সমস্ত তাৎপর্যতা ও গুরুত্ব হারিয়ে যায়। জড়ের স্থূল রূপ হল কামিনী-কাঞ্চন আর নাম-যশ, মানে নারীসুখ, ধনসুখ আর নামসুখ। সাধনা করতে করতে যেমন যেমন আমি সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতমতে অগ্রসর হতে থাকব, তন্মাত্রা, তন্মাত্রা থেকে মনে, মন থেকে অহঙ্কারে আর শেষে গিয়ে যখন প্রকৃতিতে যাব তখন আমাকে এই প্রকৃতিকেও ত্যাগ করে নামিয়ে দিয়ে শেষ লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যেতে হবে। চৈতন্য সত্তার কোথাও জড় বলে আর কিছু থাকে না। যে কোন ধর্মের যিনি আধ্যাত্মিক পুরুষ, তাঁকে যখন বিশ্লেষণ করা হবে তখন সব ধর্ম যাই বলে থাকুক চরম সত্য সবার ক্ষেত্রে এক, অধ্যাত্ম বলতে যা বোঝায় তাতে জড়ের কোন সত্তাই নেই।

যার কোন সত্তা নেই সেটাই গীতা এখানে আমাদের জানিয়ে দিচ্ছে। আমরা যেমন গীতার জন্য জড় পদার্থের খবর জানতে পারছি, অন্যান্য ধর্মে জড় পদার্থের এই সব কথা কখন শোনেনি আর সেইভাবে জানেও না। এই দিক দিয়ে আমাদের অনেক সুবিধে হয়ে গেছে, কারণ আমাদের ধর্মের সব কিছুই গুরু-শিষ্য পরম্পরা হওয়াতে সব লিপিবদ্ধ হয়ে গেছে। লিপিবদ্ধ হয়ে যাওয়াতে আমরা জানতে পারছি ধর্মতত্ত্বটা কি, তখন বোঝা যায় যে এই জড়কে কেন ত্যাগ করতে বলা হচ্ছে। এতে সাধকের সাধনাতে সাহায্য হয়।

এই চতুর্দশ অধ্যায়ের মূল অনুশীলন হচ্ছে জড়ের ধর্ম। জড়ের ধর্মকে নিয়েই এই অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। প্রথম শ্লোকে ভগবান বলছেন –

শ্রীভগবানুবাচ

**পরং ভূয়ঃ প্রবক্ষ্যামি জ্ঞানানাং জ্ঞানমুত্তমম্। যজ্জ্ঞাত্বা মুনয়ঃ সর্বে সিদ্ধিমিতো গতাঃ।।১।।**

ভগবান অর্জুনকে বলছেন আমি তোমাকে এখন জ্ঞানের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান সম্বন্ধে অবগত করাব। জ্ঞান বলতে এখানে পাঁচটা বিষয় সম্বন্ধে জানাকে বলছেন। এই সব জ্ঞানের মধ্যে যেটি সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান সেই ব্যাপারে বলতে যাচ্ছেন। এই সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানকে জানলে কি হবে? *যজ্জ্ঞাত্বা মুনয়ঃ সর্বে,* এর আগে যত মুনি ঋষিরা ছিলেন তাঁরা এই জ্ঞান লাভ করার পর *সিদ্ধিমিতো গতাঃ*, সিদ্ধি লাভ করেছেন, অর্থাৎ সবাই শ্রেষ্ঠ পুরুষ হয়ে গেছেন। জ্ঞান অনেক রকমের হয়, তার মধ্যে গ্রাজুয়েট হওয়াও জ্ঞান লাভ, কত গ্রাজুয়েট আছে কিন্তু তাদের মধ্যে সবাইতো বিখ্যাত হয়ে যাচ্ছে না, পিএইচডি ডিগ্রীধারী অনেকেই আছেন কিন্তু সবাই আইনস্টাইন হয়ে যায়নি।

জগতের একটা কঠিন বাস্তব নিয়ম এই যে, সবাই আসল জিনিষকে নিজের কাছে রাখে আর নকল জিনিষকে নিজের কাছ থেকে তাড়াতাড়ি বিদায় করার জন্য উঠেপড়ে লাগে। টাকা অর্জনের জন্য সবাই ছুটছে, কিন্তু নকল নোট যদি কারুর কাছে এসে যায় আর সে যদি জানতে পারে যে এই পঞ্চাশ টাকার নোটটা নকল, তখন সে চেষ্টা করে যত তাড়াতাড়ি অপরকে গচিয়ে দেওয়ার। আসলটাকে সবাই ধরে রাখে আর নকলটাকে সঙ্গে সঙ্গে ছেড়ে দেয়। যদি কোথাও চালাতে না পারে শেষে সব সকল নোট মন্দিরে প্রণামীর বাক্সে পড়ে। এতে দুটোই হল, পূণ্যও হল আর নকল নোটটাকে চালিয়ে দেওয়াও হল। কোনটা আসল আর কোনটা নকল এটাকে ব্যাখ্যা করার জন্যই এই চতুর্দশ অধ্যায়কে ভগবান বেছে নিয়েছেন। এখানেও জগতের আসলটা কি আর নকলটা কি জেনে নিয়ে নকলটাকে ফেলে দেওয়ার কথাই বলা হচ্ছে। ভগবান বলছেন, এই আসলটাকে জেনে এর আগের আগের মুনি ঋষিরা পরম সিদ্ধি, মানে আধ্যাত্মিক জগতের চরম অনুভুতিটুকু পেয়ে গিয়ে শ্রেষ্ঠ পুরুষ হয়ে গেলেন। তার মানে জ্ঞান অনেকেরই ছিল, কিন্তু যাঁরা মুনি, মুনি মানে যিনি মননশীল, তাঁরা এই আসলটাকে জেনে মহৎ হয়ে গেলেন। ভগবান বলতে চাইছেন, এই শ্রেষ্ঠ জ্ঞানটি লাভ করলে তোমার মুক্তি পেতে সুবিধে হবে। কিসের থেকে মুক্তি? বন্ধন থেকে। কিসের বন্ধন? যিনি বিশুদ্ধ চৈতন্য তাঁর উপরে একটা আবরণ পড়ে গেছে, এই আবরণটাই বন্ধন। এই আবরণটা কিসের? জড়ের বা প্রকৃতির।

**ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্যমাগতাঃ। সর্গেঽপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ।।২।।**

হে অর্জুন, *ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য*, এই জ্ঞানকে তুমি যদি আশ্রয় করে নাও তাহলেই তুমি *মম সাধর্ম্যমাগতাঃ*, আমার *সাধর্ম*, অর্থাৎ আমার স্বরূপতা তুমি পেয়ে যাবে। আমাদের যত মোক্ষশাস্ত্র আছে তাতে অনেক ধরণের কথা বলা হলেও মূল দৃষ্টিটা হচ্ছে, শ্রীকৃষ্ণের ঐ ভাবকে তিনি পেয়ে যান, তাঁর যে ধর্ম সেই ধর্মটা তিনি পেয়ে যান। আমি যদি শ্রীকৃষ্ণের সাধনা করে থাকি, তাহলে এই সাধনায় আমার যে সিদ্ধি হবে তাতে শ্রীকৃষ্ণের ভাবের সাথে আমি এক হয়ে যাব, সে তাঁর যে ভাবই থাকুক না কেন। শ্রীকৃষ্ণের এই ভাব পেয়ে গেলে কি হবে? *সর্গেঽপি নোপজায়ন্তে*, যখন সৃষ্টি হবে তখন তোমার আর জন্ম হবে না, *প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ*, যখন প্রলয় হবে তখন তোমার বিনাশ হবে না। বলতে চাইছেন যে, জন্ম-মৃত্যুর যে চক্র, সেই চক্র থেকে তুমি বেরিয়ে আসবে।

আমরা সব সময় বলি, শুধু কাজ আর কাজ, ঘুম থেকে উঠে কাজ, ঘুমোতে যাওয়ার সময়ও কাজ, কবে যে এই কাজের বোঝা আমার ঘাড় থেকে নামবে এই দুশ্চিন্তা আর দুর্ভাবনায় রাত্রে ঘুম হয় না। আর ভাবছি, কবে যে আমি এই দুশ্চিন্তা আর দুর্ভাবনা থেকে মুক্তি পাব, কবে যে এই দুঃখ-কষ্টের যন্ত্রণার হাত থেকে ছাড়া পাব। কবে আমি এই কাজের থেকে মুক্তি পাব এই নিয়ে আমাদের চিন্তা ভাবনা আছে, কবে অনিদ্রা থেকে মুক্তি পাব তার চিন্তা আছে কিন্তু আমরা কখনই ভাবি না যে এই একটি দিন আর একটি করে রাত আমাদের জীবনে কত দিন ধরে চলবে! আজকে এই রাতটা কেটে যাবে আবার আরেকটি রাত আসবে, এই ভাবে কত রাত যে কাটবে এটাকে নিয়ে আমরা কেউই ভাবিনা। এই চক্র থেকে কিভাবে বেরোতে পারব এটাকে আমরা কেউই চিন্তা করছি না। যখন মৃত্যু আসবে তখন মরে যাব, এখন আমার বাঘে খেয়েই মৃত্যু হোক, রোগে ভুগে মারা যাই আবার স্বাভাবিক ভাবেই মারা যাই না কেন, কিংবা গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়েই মরি, আবার আমাকে জন্মাতে হবে। আমি বলতে পারি আবার জন্ম নিলে আমার এই জন্মের এই আমি বোধটাতো থাকবে না। কিন্তু সেটাও অনেকের থাকে। যারা দেখতে পান তারাও বুঝতে পারেন তাদের কষ্ট হচ্ছে। সেইজন্য বলছেন, *ইদ জ্ঞানমুপাশ্রিত্য*, তোমাকে যে জ্ঞানের কথা বলতে যাচ্ছি এই জ্ঞানের আশ্রয় যদি তুমি নাও তার ফলে তুমি আমার ধর্ম পেয়ে যাবে। এখন তুমি কি ধর্মে আছ? এখানে দুটি ধর্মের কথা বলা হচ্ছে, একটা হচ্ছে মৃত্যুধর্মা এবং আরেকটি হচ্ছে অমৃত্যু ধর্মা। ভগবানই হলেন একমাত্র অমৃত্যু ধর্মা, ভগবানের জন্ম নেই মৃত্যু নেই। ভগবান ছাড়া বাকি সব কিছুই হল মৃত্যুধর্মা, সবার জন্ম আছে মৃত্যু আছে। তুমি এখন মৃত্যুধর্মাতে রয়েছে। এই জ্ঞানকে আশ্রয় করতে পারলে এই মৃত্যুধর্মা থেকে তুমি হয়ে যাবে অমৃত্যু ধর্মা। ভগবানের সাথে তুমি এক হয়ে যাবে। এখানে কিন্তু ভগবানের সাথে এক হয়ে যাওয়ার কথা বলা হচ্ছে না, বলা হচ্ছে *সাধর্ম্যমাগতাঃ*, ভগবানের যে স্বরূপ, মানে শ্রীকৃষ্ণের যে স্বরূপ সেটা পেয়ে যাবে।

এই প্লাস্টিকের বোতলটা যখন নষ্ট হয়ে যাবে তখন এটাকে সের দরে বিক্রী করে দেব। সেখান থেকে এই ভাঙ্গা বোতলটা আবার প্লাস্টিকের কারখানায় চলে যাবে। সেখান থেকে আবার রিসাইকেল হয়ে এই প্লাস্টিকটা আবার একটা নতুন বোতল হয়ে বেরিয়ে আসবে। এই বোতলের আত্মা হচ্ছে এর প্লাস্টিকত্ব। এই প্লাস্টিকটাই বার বার ঘুরে ঘুরে প্লাস্টিকের বোতল হবে, কখন বালতি হবে, মগ হবে, প্লাস্টিকের বিভিন্ন জিনিষের মধ্যে বারবার ঘুরপাক খেতে থাকবে, আর যতই রূপ পাল্টাতে থাকুক না কেন, এর প্লাস্টিকত্বটা সব সময় থেকে যাবে। এখন মনে করুন, এর প্লাস্টিকটা এমন একটা তাপমাত্রাতে নিয়ে যাওয়া হল, যেখানে গিয়ে এর মলিক্যুলস গুলো সম্পূর্ণ রূপ পরিবর্তিত হয়ে আলাদা হয়ে গেল, তখন এই প্লাস্টিকের ধর্মটাই শেষ হয়ে গেল। এখন এই মলিক্যুলসগুলিকেও ভেঙ্গে যদি ইলেক্ট্রন প্রোটনে নিয়ে ভেঙ্গে দিয়ে শুধু মাত্র এণার্জিতে রূপান্তরিত করে দেওয়া হয়, এরপর তার কি হবে ভগবানই জানেন। কিন্তু এইখানে যেটা বলা হচ্ছে সেটা বিজ্ঞানের এই স্তর থেকে আরও এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে বলা হচ্ছে। এই যে প্লাস্টিক থেকে পরিবর্তন হয়ে মলিক্যুলস্ পদার্থে চলে গেল, মলিক্যুলস্ থেকে পরিবর্তন হয়ে ইলেক্ট্রন প্রোটনে চলে গেল, ইলেক্ট্রন প্রোটন থেকে রূপান্তরিত হয়ে পিওর এণার্জিতে চলে গেল, এর পর এই পদার্থটা আর কখন ফিরে আসবে না, কিন্তু এণার্জি থেকেও

রিসাইকেল হতে থাকবে। কিন্তু তুমি যদি অমৃত্যু ধর্মা হয়ে যাও তাহলে কিন্তু তোমার আর রিসাইকেলিং কোন ভাবেই হবে না। এই কথাটাই এখানে বলছেন *সর্গেঽপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ*। কারুর প্রতি অন্যায় অত্যাচার করে সে যদি মরে গিয়ে মশাও হয়ে যায় তাহলে যার প্রতি অন্যায় করা হয়েছে সেও মশা হয়ে তার প্রতিশোধ নেওয়ার প্রচেষ্টাকে চালিয়ে যাবে, কেউ কাউকে ছাড়বে না। একমাত্র ছাড়বে কখন? *ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য*, এই জ্ঞানের যেদিন আমি আশ্রয় নেব, তখনই এই বাঁধন থেকে ছাড়া পেয়ে যাবে, তখন আর আমি মৃত্যুধর্মা থাকব না। কিন্তু আমার যারা পারিপার্শ্বিক আত্মীয় বন্ধু-বান্ধব যারা আছে তারা কিন্তু এখানেই পড়ে থাকবে। এই একটা জায়গাতে কেউ কাউকে সাহায্য করতে পারেনা। আমি আমার পিতৃপুরুষদের স্বর্গে টেনে নিয়ে যেতে সাহায্য করতে পারি, এই জগতে যারা আছে তাদের আমি টাকা, পয়সা, ধন-দৌলত যা আছে সর্বস্ব দিয়ে সাহায্য করতে পারি, কিন্তু মুক্তির পথে আমি কাউকে টেনে নিয়ে যেতে পারব না। একটাই পারি, সে যে অজ্ঞানতার অন্ধকারে পড়ে আছে সেখান থেকে টেনে তার চেতনাকে একটু উপরে নিয়ে আসতে পারি। কিন্তু মুক্তির পথে নিয়ে যেতে পারব না। এই জায়গাটা হচ্ছে যার যার জ্ঞানের উপলব্ধির ব্যাপার। এখানে কেউ কাউকে সাহায্য করতে পারেনা। শ্রীমা স্বয়ং জগজ্জননী কিন্তু তাঁর ভাই, ভাইপো, ভাইঝিরা এক অবস্থাতেই পড়ে রইল।

ভগবান বুদ্ধের খুব সুন্দর একটা গল্প আছে। একজন যুবক সাধক, দেখতে খুব সুন্দর। সে এক শহরে ঘুরতে গেছে, গিয়ে দেখছে শহরের এক জায়গায় বিরাট ভিড়। অল্প বয়সী, জগতের কোন কিছুর ব্যাপারে তার কোন অভিজ্ঞতাই নেই, একটা বয়সে সে অনেক কষ্ট করে কটি টাকা উপার্জন করেছিল। সেই শহরের ভীড়ের মধ্যে একটি খুব সুন্দর মেয়েকে দেখে তার ভালো লেগে গেছে। মেয়েটির হাতে কয়কটি পদ্মফুল। ছেলেটি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করছে, কি ব্যাপার, তোমার হাতে পদ্মফুল কেন? তখন মেয়েটি বলছে – আজকে এই শহরে এক বিরাট বড় সাধক আসছেন, এগুলো তাঁরই চরণে নিবেদন করব। ছেলেটি জিজ্ঞেস করল – কত করে এই পদ্মফুল কিনেছ? মেয়েটি যত দাম বলল ঠিক ঐ কটি টাকাই ছেলেটির সম্বল। ছেলেটি তখন বলছেন – আমার কাছে ঠিক এই কটি টাকাই আছে, আমি ঐ দাম দিচ্ছি তুমি আমাকে পদ্মফুল কয়টি দিয়ে দাও, কারণ আমিও এই পথে বেরিয়েছি, আমার খুব ইচ্ছা এই পদ্মফুল কটি আমি তাঁকে নিবেদন করব, তোমার তো এই পথ নয় তুমি এই ফুল নিয়ে কি করবে, আমাকে দিয়ে দাও। সেই মেয়ে মাথা নীচু করে বলছে – এই পদ্মফুল আমি তোমাকে দেব না। ছেলেটি বলছে – না না, তুমি না করো না, তুমি যা চাইবে আমি দিতে রাজী আছে, তুমি আমাকে পদ্মফুল কটি দিয়ে দাও, কারণ এক্ষুণি সে মহাত্মা এসে হাজির হবেন।

তখন মেয়েটি লজ্জা জড়িত স্বরে বলছে – আমি যখন থেকে তোমাকে দেখছি তখন থেকেই আমি তোমাকে ভালোবেসে ফেলেছি, তুমি যদি আমাকে বিয়ে করতে রাজী হয়ে যাও তাহলে আমি এই পদ্মফুল দিতে রাজী আছি। ছেলেটি পদ্মফুল নিতে এত আগ্রহ যে বলেই দিল হ্যাঁ, আমি রাজী আছি। মেয়েটি ফুল কটি দিয়ে দিল। এখন ঐ মহাত্মার কাছে এমন ভীড় হয়ে আছে যে তাঁর কাছে যাবারই উপায় নেই। তখন ছেলেটি ছুঁড়েই সেই পদ্মফুল কটি মহাত্মার উদ্দেশ্যে নিবেদন করল। ঐ পদ্মফুল সোজা মহাত্মার হাতে গিয়ে পড়েছে। তখন মেয়েটিও কটি পদ্মফুল ছুঁড়ে দিয়েছে, ঐ ফুল কটিও মহাত্মার হাতে গিয়ে পড়েছে। মহাত্মা ছিলেন বিরাট জ্ঞানী পুরুষ, তিনি বলছেন – এই ফুলগুলো যে ছুঁড়েছে তাকে আমার সামনে নিয়ে আসা হোক। তখন এই দুইজনকে ভীড়ের মাঝখান দিয়ে মহাত্মাজীর সামনে নিয়ে আসা হয়েছে। এদেরকে দেখাই মহাত্মা বলছেন – তোমরা দুজনেই ধন্য, তোমাদেরই ফুল আমার হাতে এসে এভাবে পড়েছে, আমি বলছি তোমাদের মনের ইচ্ছা পূর্ণ হবে। ছেলেটি বলছে, আমার মনের ইচ্ছা সিদ্ধপুরুষ হওয়া আর মেয়েটির মনে ইচ্ছা আমি যেন একে জন্মজন্মান্তরে স্বামী রূপে পাই। মহাত্মা তখন বললেন – তোমাদের দুজনের ইচ্ছাই পূর্ণ হবে। মেয়েটিকে বললেন যত দিন এর মুক্তি না হচ্ছে তত দিন জন্মজন্মান্তরে তুমিই একে পাবে। এই মেয়েটিই পরে গিয়ে যশোধারা হয়েছিলেন। শেষ জন্ম পর্যন্ত যশোধারা ভগবান বুদ্ধের পেছন পেছনে ঘুরেছেন। শেষ দিন যখন বুদ্ধ বেরিয়ে যাচ্ছেন যশোধারা তখন আর তাকে বাধা দেননি। এরপর ভগবান বলছেন –

**মম যোনির্মহদ্ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্। সম্ভবঃ সর্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত**।।৩।।

*সর্বভূতানাং*, যা কিছু তোমার সামনে দেখছ এদের সবারই উৎপত্তি *মম যোনির্মহদ্ব্রহ্ম* থেকে, আমার যোনিই হচ্ছে মহৎ ব্রহ্ম হচ্ছেন, এই মহৎ ব্রহ্মই সর্বভূতের উৎপত্তির কারণ। এখানে মহৎ ব্রহ্ম বলতে প্রকৃতিকে বোঝাচ্ছে। ভগবান বলছেন যে, প্রকৃতি আমার যোনি যেখানে গর্ভধারণ করা হয়। শুধু তাই নয়, আমার যোনিতে যে গর্ভধারণ হচ্ছে তার বীজ আমিই প্রদান করি, আমার থেকেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বীজ আসছে। তার মানে সৃষ্টির প্রকরণে পৃথক কোন সত্তা আসছে না, সব কিছুই তিনি, তাঁরই গর্ভ, তাঁরই বীজ, তিনি নিজেই এই সব কিছু হয়েছেন। সৃষ্টির এই প্রকরণের ব্যাখ্যা দেওয়া অসম্ভব। সৃষ্টির ব্যাপারে যখন কোন দার্শনিকের তত্ত্বের মধ্যে যাব তখন মনে হবে তিনিই ঠিক বলছেন। এই তত্ত্বের উল্টো যদি কেউ সৃষ্টির ব্যাপারে বলে তখন মনে হবে এই নতুন তত্ত্বটাকেই ঠিক মনে হবে। গীতাতে ভগবান এই অধ্যায়ে যেটা সবার জন্য খুলে দিলেন তা হচ্ছে – ভগবানের দুটো প্রকৃতি, পরা ও অপরা প্রকৃতি। অপরা প্রকৃতি হল ঈশ্বরের যোনি, অপরা প্রকৃতি হচ্ছে জড়, এই অপরা প্রকৃতিতে তিনি যেন গর্ভ প্রদান করছেন। মানে যে চৈতন্য সত্তা সে চুম্বকের মত, চুম্বককে যেই লোহার কাছে নিয়ে আসা হল তখনই লোহার টুকরো গুলো নড়ে উঠল। এই পাখাটা এমনিতে চুপচাপ সিলিংএর উপর ঝুলছে, যেই সুইচটা অন্ করে দেওয়া হবে তখনই ইলেক্ট্রিসিটি এসে যেতেই বন্‌বন্ করে ঘুরতে শুরু করবে।

অথচ পাখার নিজে থেকে ঘোরার শক্তি নেই। বিদ্যুৎশক্তিই একে ঘোরাচ্ছে। অন্য দিকে ইলেক্ট্রিসিটির সেই শক্তি নেই যে পাখা ছাড়াই সে আমাদের বাতাস দিতে পারবে। বাতাস দেওয়ার ক্ষমতা পাখার, পাখার আবার নড়ার ক্ষমতা নেই। পাখা আমাদের বাতাস দিচ্ছে না, ইলেক্ট্রিসিটিও বাতাস দিচ্ছে না, তাহলে বাতাসটা কে দিচ্ছে? এর ঠিক ঠিক উত্তর দেওয়া যায় না।

এই কথাটাই এই শ্লোকে বলার উদ্দেশ্য। প্রকৃতি না থাকলে কোন সৃষ্টিই হবে না, আবার পুরুষ যতক্ষণ প্রকৃতির মধ্যে না আসছে ততক্ষণ কোন সৃষ্টি হবে না। এই পাখাটা শক্তির ঘনীভূত রূপ অন্য দিকে ইলেক্ট্রিসিটিও শক্তি, এই দিক থেকে দুটো একই জিনিষ। এই শক্তিই এক সময় জড় হয়ে যাচ্ছে, এই জড়ের মধ্যে যখন সেই শক্তি বীজরূপে আসছে তখনই সব কিছুর উৎপত্তি হচ্ছে। মজার ব্যাপার হল এইসব আইডিয়া উপমার সাহায্যে যা দিয়ে গেছেন আধুনিক বিজ্ঞান এখনও তার ধারে কাছে যেতে পারেনি। আইনস্টাইন ফরমুলা দিলেন $E = MC^2$ তার মানে এণার্জি হচ্ছে জড় পদার্থ, সেই পদার্থ থেকে পাখার ব্লেড হয়েছে। এটাকেই বলা হচ্ছে মহৎ যোনি, মানে প্রকৃতি। এই প্রকৃতির মধ্যে যখন পরা প্রকৃতি এসে যায় তখন সৃষ্টির খেলা শুরু হয়ে গেল। আমরা দেখছি মাত্র যে এই জগৎটা চলছে। কেন চলছে? কারণ পরা প্রকৃতি এর মধ্যে আছে। এই জগতের মা-বাবা কে? ভগবান নিজেই, কারণ ভগবান নিজে বীজ দিয়েছেন বলে তিনি বাবা, আবার ভগবান নিজেই মা, কারণ তিনি যোনি। সেইজন্য নবম অধ্যায়ে ভগবান বলেছিলেন – *পিতাহহমস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহ*, এই ব্রহ্মাণ্ডের সব কিছুর পিতা আমি, মাতাও আমি। সেইজন্য বলা হয়, গীতাতে কখনই দুটো আলাদা সত্তাকে স্বীকার করা হয় না। যেমন বিজ্ঞানী বলছে জড় আর চৈতন্য দুটো আলাদা সত্তা, তন্ত্র যেমন বলছে শিব আর শক্তি দুটো আলাদা। কিন্তু গীতাতে আলাদা কোন সত্তাকে মানা হয় না, যিনি আছেন তিনিই আছেন, তাঁরই দুটি রূপ হয়ে যাচ্ছে – পরা ও অপরা। অপরা মানে রেলের বড় ইঞ্জিন প্রস্তুত আছে, সুইচ অন্ করা হল, ইলেক্ট্রিসিটি ইঞ্জিনে এসে গেল, এবার ইঞ্জিন অত বড় লম্বা ট্রেনকে টানতে শুরু করে দিল। অপরা প্রকৃতিটাও ভগবানের। যত অপরা প্রকৃতি মানে জড় পদার্থ, এই জড় পদার্থে যতদিন চৈতন্য সত্তা না আসছে ততদিন সে পড়েই থাকবে। চৈতন্য সত্তাটা কি? ভগবান সেই বীজটা দিয়ে দিচ্ছেন। যার মধ্যে ভগবান বীজ দিচ্ছেন সেটাও তিনি নিজেই হয়েছেন, আবার বীজটাও তিনি। ঈশ্বরের বাইরে কিছুই নেই। তাই পরের শ্লোকে বলছেন –

**সর্বযোনিষু কৌন্তেয় মূর্তয়ঃ সম্ভবন্তি যাঃ। তাসাং ব্রহ্ম মহদ্‌যোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা।।৪।।**

হে অর্জুন, তুমি যা কিছু দেখছ, কাদেরকে দেখছে অর্জুন? দেব, পিতৃগণ, মানুষ, পশু, মৃগাদি, *সর্বযোনিষু*, যত রকমের যোনি দেখছ, সব আলাদা আলাদা। এখানে সব যোনি এক এই কথা বলা হচ্ছে না, সবই আলাদা, দেবতা আলাদা, মানুষ আলাদা আর পশু, পাখি, মৃগ সব আলাদা। এদের যখন বিনাশ হয়ে যাবে তখন এরা এদের যার যার সত্তাতে বিলীন হয়ে আবার সেখান থেকেই আগের আগের রূপ ধারণ করবে। এই প্লাস্টিক আলাদা, এই কাগজ আলাদা, এই লোহাটা আলাদা। কিন্তু যখন সের দরে বিক্রী হয়ে চলে যাবে তখন গুদামে গিয়ে লোহা লোহার জায়গায় চলে যাবে, প্লাস্টিক প্লাস্টিকের জায়গায় চলে যাবে। তবে একটু যে এদিক সেদিক একেবারেই হবে না তা নয়, এর একটু ওটাতেও যেতে পারে আবার ওর একটু এটাতেও আসতে পারে। সাধারণত এই ধরণের কিছু হয় না, যারা মানুষ হয়ে জন্মেছে তারা মরার পর আগামী জন্মে পিঁপড়ে হয়ে জন্মাবার সম্ভবনা খুব কম। এই যত আলাদা আলাদা দেহ, রূপ আছে এদের মধ্যে যে চৈতন্য রয়েছে সেটা আমি। মানুষ যখন মরে যায় তখন তার মুর্তিটা একই থাকে কিন্তু তার শরীর থেকে কিছু একটা বেরিয়ে যায়। এই যে শরীরের আকার যেটা তৈরী হয়েছে সেটা প্রকৃতি থেকে তৈরী হয়েছে কিন্তু এর মধ্যে যে জীবনী শক্তি সেটা আসছে সেই চৈতন্য থেকে। আবার প্রকৃতিটাও ভগবানেরই কিন্তু এটা হচ্ছে অপরা প্রকৃতি, কিন্তু প্রাণ যেটা এই শরীরকে ধরে রাখছে সেটা ভগবান দেন। সেইজন্য বলছেন *অহং বীজপ্রদঃ পিতা*।

তিন নং শ্লোকে যেটা বলা হয়েছে সেটা হচ্ছে সমষ্টি তত্ত্ব (Macro), সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের যে সৃষ্টি হচ্ছে তার বীজ তিনিই দিচ্ছেন, অন্য দিকে যেটা ব্যষ্টিতে (Micro) যে সৃষ্টি হচ্ছে সেটার ক্ষেত্রেও তিনিই বীজ প্রদান করছেন। জীববিজ্ঞানীরা যেমন বলেন যে, জড় পদার্থ পড়ে ছিল, সেই পদার্থের বিবর্তন হতে হতে তাতে জীবনের প্রকাশ এসে যায়। কিন্তু আমাদের হিন্দুদর্শন তা মানছে না, এখানে বলা হয় যখন সূক্ষ্ম শরীরে যোগ হয়, যখন মায়ের গর্ভে আস্তে আস্তে শরীর ধারণ হতে থাকে তখন কোন একটা স্তরে এসে চৈতন্য সেই শরীরের প্রবেশ করে। তারপরই তার জীব উপাধি এসে যায়। আমাদের ভারত সরকার বলছে মায়ের গর্ভে ছয় মাস পড়েই শিশুর জীবনী শক্তি এসে যায়। ভারত সরকার কোথা থেকে এই ছয় মাসের হিসেব পেয়েছে আমাদের জানা নেই। বিভিন্ন ধর্মে এই সময়টার বিভিন্ন তারতম্য আছে। কোন ধর্মে বলে নয় মাস পর আত্মা এই শরীরকে ধারণ করে। এই নিয়ে বিভিন্ন মত আছে। আমরা এখানে কিন্তু গীতার মত বলছি। গীতা বলছে তখন আমি সেই শরীরে প্রবেশ করি। কখন প্রবেশ করেন বলছে? যখন এই শরীরটা আকার ধারণ করে নেয়। পুরো শরীরের আকার ধারণ না হওয়া পর্যন্ত যেন তিনি তাতে প্রবেশ করেন না। আমাদের পক্ষে বলা খুব মুশকিল যে এতে এনারা কি বলতে চাইছেন আর এগুলো কতটা যুক্তি দ্বারা বিচারের গ্রহণযোগ্য সেটাও আমরা বলতে পারিনা। কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ যে তত্ত্বটা বলতে চাইছেন তা হল – *যৎ পিণ্ডাণ্ডে তৎ ব্রহ্মাণ্ডে*, মানে পিণ্ডে যা আছে ব্রহ্মাণ্ডে তাই আছে। ক্ষুদ্র যে পদ্ধতিতে তৈরী বৃহৎও একই পদ্ধতিতে তৈরী।

ঠাকুরের পার্থিব শরীর চলে যাওয়ার পর স্বামীজী যখন পরিব্রাজক রূপে ভারত পরিক্রমা করছিলেন, সেই সময় আলমোড়ার কাছে কাঁকড়িঘাটে তিনি ধ্যান করছিলেন। তাঁর সঙ্গে স্বামী তুরিয়ানন্দজীও আছেন। ধ্যান করতে করতে হঠাৎ ধ্যান থেকে উঠে এসে হরি মহারাজকে জড়িয়ে ধরে বলছেন – হরিভাই, আজকে আমি জগতের এক বিরাট রহস্যেকে উদ্‌ঘাটন করতে পেরেছি। সেটা হল – একটা অনু যে পদ্ধতিতে তৈরী এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডও সেই একই পদ্ধতিতে তৈরী। গীতার তিন নং আর চার নং শ্লোক এই একই কথা বলা হয়েছে। আচার্য শঙ্কর আবার এখানে যোগ করছেন – দেবতা, পিতৃ, মনুষ্য, পশু ও মৃগাদি যত মুর্তি আছে ভগবান এর মধ্যে যখন প্রবেশ করেন তখনই এগুলো ক্রিয়াসম্পন্ন হয়। তার আগে বলছেন এই জগতে যা কিছু আছে আমি হলাম তার যোনি আর *বীজপ্রদঃ পিতা*। স্বামীজী যে ধ্যানে উপলব্ধি করলেন পিণ্ড আর ব্রহ্মাণ্ড এক, স্বামীজী কি গীতার এই শ্লোকগুলো জানতেন না? স্বামীজী তো গীতা সঙ্গে নিয়ে ঘুরতেন। তাই স্বামীজী এই দুটো শ্লোক জানতেন না এটা বিশ্বাস করা যায় না। আসলে আমাদের যতই যুক্তি সঞ্জাত জ্ঞান হোক আর শাস্ত্র সঞ্জাত জ্ঞান হোক, এগুলো কোন কাজেই লাগবে না, যতক্ষণ না এই জ্ঞানকে প্রত্যক্ষ অনুভব করা হচ্ছে। প্রত্যক্ষ জ্ঞান না হওয়া পর্যন্ত কোন শাস্ত্র, গীতা মুখস্ত থাকলেও এর কোন দাম নেই। স্বামীজীর মত লোক, যিনি সাক্ষাৎ ঠাকুরের কাছে শিক্ষা পেয়েছিলেন, ঠাকুর তাঁকে নির্বিকল্প সমাধিটুকু পর্যন্ত আস্বাদ করিয়ে দিয়েছেন। সেই স্বামীজীও এই বলে চেঁচাচ্ছেন – দাদা, আমি আজকে একটা আলো পেলাম। যে আলোটা স্বামীজী পেলেন সেটা হাজার হাজার বছর ধরে গীতাতে মানুষ আবৃত্তি করে আসছে। প্রত্যক্ষ জ্ঞান না হলে কোন কিছুর দাম নেই। স্বামীজীর মত পুরুষ গীতার এই শ্লোককে প্রত্যক্ষ অনুভব করছেন, তার উপর আচার্য শঙ্কর তাঁর গীতার ভাষ্যে এর সমর্থনে একই মন্তব্য করেছেন, তাই গীতাকে নিয়ে আর কোন প্রশ্ন করা চলে না। এরপর বলছেন –

**সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবাঃ। নিবধ্নন্তি মহাবাহো দেহে দেহিনমব্যয়ম্।**।৫।।

প্রকৃতি যিনি, যাঁকে মহৎ ব্রহ্ম বলা হচ্ছে, সেই প্রকৃতি তিনটে গুণের সমষ্টি। এই তিনটি গুণ হল সত্ত্ব, রজঃ ও তমো। সত্ত্ব, রজঃ ও তমোকে নিয়ে শাস্ত্রে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। স্বামীজীও তাঁর বক্তৃতার বিভিন্ন জায়গায় এই তিন গুণকে নিয়ে বিভিন্ন ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। কোথাও তিনি বলছেন এগুলো হল গুণ, কোথাও কোথাও এই তিনটেকে বলছেন পার্টিক্যালস্। স্বামীজী চেয়েছিলেন শাস্ত্রের এই জিনিষগুলিকে বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে ব্যাখ্যা করে একটা সঠিক যুক্তিযুক্ত তত্ত্বে প্রতিষ্ঠা করতে। বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে স্বামীজী এমন কিছু উপমাকে নিয়ে এসেছেন যে মনে হচ্ছে এই তিনটে খুব সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বস্তুর উপাদান, কিন্তু তারপরই আবার বলছেন – জিনিষটাকে ঠিক এইভাবেও বোঝা যাবে না। জিনিষটা এই জায়গায় এই রকম হবে আবার আরেক জায়গায় বলছেন জিনিষটা এই। যেমন ভাইরাস, ভাইরাসের ক্ষেত্রে বোঝা যায় না যে এটা সজীব না জড়। আবার খুব নিম্ন শ্রেণীতে এমন কিছু ইউনিসেল অফ্ এ্যনিম্যাল আছে সেটা উদ্ভিদ না জন্তু বোঝা যায় না। সত্ত্ব, রজঃ ও তমও ঠিক তাই, এগুলো গুণ না খুব সূক্ষ্ম উপাদান বোঝা যায় না। এটা সব থেকে ভালো বোঝা যাবে, আমরা যে ফোটন দেখছি এটাকে বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন ভাবে দেখেন। ফোটনকে একদিকে বিজ্ঞানীরা বলছে এটা পার্টিকেল্ আবার অন্য দিকে বলছে ফোটন পিওর এণার্জি। যদি ফোটনকে পদার্থ রূপে দেখা হয় তাহলে পদার্থের যে মৌলিক নিয়ম তা হল it has to occupy space and it must have weight, কিন্তু আলো দুটোর একটাও মৌলিক শর্তকে পূরণ করছে না, অথচ পদার্থের মত তার আচরণ। অন্য দিকে ফোটনের যে ধর্ম পাওয়া যাচ্ছে তাতে তাকে পিওর এণার্জি বলে মনে হয়। এখন ফোটনকে আমরা কি বলব? পদার্থ না পিওর এণার্জি? বলা খুব মুশকিল। সত্ত্ব, রজঃ ও তমোও ঠিক তাই। এটা পিওর এণার্জি না খুব সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পদার্থ বোঝা যায় না। ফোটনকে যদিও পার্টিকেল বলা হয় কিন্তু এত সূক্ষ্ম যে সে আকাশের কোন স্থানকে দখল করছে না আর কোন ওজনও এর নেই। ফোটনের যদি ওজন হয়ে যায় তাহলে সর্বনাশ হয়ে যাবে। অথচ পদার্থের ধর্মানুসারে সে বেঁকে যাচ্ছে। যখন বিরাট নক্ষত্রের পাশ দিয়ে আসছে তখন সেই নক্ষত্র তাকে টেনে নিচ্ছে, মাধ্যাকর্ষণ শক্তি তার মধ্যে কাজ করছে।

আমাদের ঋষিরাও যখন সত্ত্ব, রজঃ ও তমোকে ব্যাখ্যা করছেন তখন মনে হবে এগুলো শুদ্ধ গুণ। কি রকম শুদ্ধ গুণ? যেমন এই গেরুয়া রঙের জামা, এটাতে দুটো জিনিষ কাপড় আর গেরুয়া রঙ। এখন কাপড়টাকে সরিয়ে দিলে গেরুয়া রঙই থাকবে। গেরুয়া রঙটা আসলে মাটি। এখন আমি কি সেই অবস্থাকে কল্পনা করতে পারি যেখানে কোন কাপড় নেই, কোন মাটি নেই শুধু গেরুয়া রঙ আছে? যদি কল্পনা করা যায় তাহলে ঐটাই হচ্ছে সত্ত্ব, রজঃ ও তমো, শুদ্ধ গুণ যা কোন পদার্থের সাথে যুক্ত নয়। প্রকৃতি এত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম যে এতে কোন পদার্থ যুক্ত থাকে না। আমাদের যে সাতটা রঙ এর মধ্যে তিনটে রঙ হচ্ছে মৌলিক – লাল, হলুদ আর নীল। সত্ত্ব, রজ ও তমোও কতকটা এই রকম, আমরা বলতে পারি হলুদ, লাল আর নীল হল সত্ত্ব, রজ ও তমেরই রঙ। অনেকের মতে রঙের সংমিশ্রণে একটু পার্থক্য এসে যায়, লাল, সাদা আর কালো। কিন্তু কোথাও লাল, সাদা আর কালোর কথা বলা হচ্ছে না, এটা পরের দিকের মত। লাল, হলুদ আর নীল থেকে যেমন এই ব্রহ্মাণ্ডের সব রঙের সৃষ্টি হয়, ঠিক তেমনি এই সত্ত্ব, রজঃ ও তমো দিয়ে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হচ্ছে।

শাস্ত্রে এত বিশদ ভাবে বলা হয় না, এনারা শুধু এদের ধর্মটাকে বলে যাবেন কিন্তু জিনিষটা কি সেটা বলবেন না। কি কি ধর্ম? যেমন রেল লাইনের সিগন্যালে লাল আলো দেখলে ট্রেন দাঁড়িয়ে যাবে, আর লাল ও নীলের মিশ্রণে যখন সবুজ হয় তখন ট্রেন চলতে শুরু করে দেয়। ঠিক সেইভাবেই এই তিনটের ধর্মকে নিয়ে বলছেন – এই তিনটে গুণ দেহীকে, মানে বিশুদ্ধ আত্মাকে এই দেহে বেঁধে নেয়। বেঁধে নেয় বলা হচ্ছে কিন্তু এটা সত্যিকারের বাঁধন নয়, বাস্তবিক বাঁধন হলে কখনই ছাড়ান যাবে না, যদিও এটা আচার্য শঙ্করের মত। তাহলে কি হয়? যেন বেঁধে নেয়। প্রকৃতির সাথে এই পুরুষের কোন ব্যাপারই নেই, কিন্তু প্রকৃতি যখন পুরুষকে উঠতে বলে তখন পুরুষ উঠে বসে, বসতে বললে বসে। বেদান্তরও মৌলিক মত যে এই বাঁধনটা আসল নয়। কিভাবে প্রকৃতি এই তিনটে গুণ দিয়ে পুরুষকে বাঁধে?

**তত্র সত্ত্বং নির্মলত্বাৎ প্রকাশকমনাময়ম্। সুখসঙ্গেন বধ্নাতি জ্ঞানসঙ্গেন চানঘ।।৬।।**

সত্ত্বগুণ হল স্ফটিকের মত নির্মল, কোন ধরণের মল তাতে নেই আর সত্ত্বগুণই শুদ্ধ চৈতন্যের সব থেকে বেশি অভিব্যঞ্জক। সত্ত্বগুণ এত স্বচ্ছ ও নির্মল অথচ এই সত্ত্বগুণও বিশুদ্ধ আত্মাকে বেঁধে ফেলে। কিভাবে বাঁধে? যে মানুষের মধ্যে সত্ত্বগুণ বৃদ্ধি পায় তার মধ্যে দুটো জিনিষ বাড়ে, জ্ঞানের প্রতি নিষ্ঠা আর সুখানুভূতি। *সুখসঙ্গেন বধ্নাতি জ্ঞানসঙ্গেন চানঘ*, সুখ আর জ্ঞান দিয়ে বাঁধে। একটা মানুষ সত্ত্বগুণী কিনা আমরা কি করে বুঝব? যার মধ্যে সত্ত্বগুণের প্রভাব বাড়তে থাকে তার জ্ঞানের প্রতি নিষ্ঠাটা বেড়ে যায় আর সব সময় একটা সুখের অনুভূতি আসে। এখানে এই সুখ কিন্তু ইন্দ্রিয় সুখ নয়, কোন কারণ নেই সব সময় একটা সুখ ও আনন্দের ভাব যেন তার মধ্যে বিরাজ করতে থাকে। সেইজন্য যদি কারুর কারণে অকারণে চোখের জল বেরোয়, বুঝতে হবে সে সত্ত্বগুণ থেকে অনেক দূরে আছে। আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্বের অধিকারী হতে হলে আগে তাকে জ্ঞানী হতে হবে, যার মধ্যে জ্ঞানের প্রতি স্পৃহা ও নিষ্ঠা এসেছে বুঝতে হবে তার মধ্যে এখন সত্ত্বগুণের আধিক্য হয়েছে। এখন এই সুখ আর জ্ঞানের স্পৃহা তাকে বন্ধনে ফেলে দেয়। যদি সত্ত্বগুণকে অতিক্রম করতে হয় তাহলে আগে তাকে জ্ঞানী হতে হবে। সত্ত্বগুণকে পার করা মানে এই সুখ আর জ্ঞানকে ছেড়ে বেরিয়ে আসতে হবে। যদি কোন সাধু বা আধ্যাত্মিক পুরুষ খুব ঠাকুরের জপ-ধ্যান করছে, প্রচুর পূজো পাঠ করছে, কিন্তু যদি তার জ্ঞাননিষ্ঠা না থাকে তাহলে কিন্তু তার সত্ত্বগুণকে অতিক্রম করা সম্ভব হবে না। অথচ সে জপ-ধ্যান করে আনন্দ পাচ্ছে, সুখের মধ্যে ভেসে বেড়াচ্ছে তাহলে বুঝতে হবে আংশিক সাত্ত্বিক গুণ তার মধ্যে এসেছে। পূর্ণ সত্ত্বগুণের অধিকারী হলে সে আধ্যাত্মিক পুরুষ হয়ে যাবে।

সত্ত্ব, রজঃ ও তমো কিভাবে বন্ধন করে এটাকে বোঝাতে গিয়ে ঠাকুর তিনটে ডাকাতের গল্প বলছেন। এক পথিক জঙ্গল দিয়ে যাচ্ছিল। পথের মধ্যে তিন ডাকাত তাকে ধরে সব কেড়েকুড়ে নিয়েছে। প্রথম ডাকাত বলছে, একে আর বাঁচিয়ে রেখে কি কাজ একে মেরে ফেলে দিলেই ভালো। দ্বিতীয় ডাকাত বলছে – এর তো সব কিছু কেড়ে নেওয়া হয়েছে, একে মেরে কোন কাজ নেই তার চেয়ে বরং একে গাছে বেঁধে রেখে আমরা চলে যাই। গাছের সাথে বেঁধে রেখে তিন ডাকাত কিছু দূর চলে যাওয়ার পর তৃতীয় ডাকাত এসে পথিককে বলছে – আহা, তোমার খুব লেগেছে, ঠিক আছে আমি তোমার সব বাঁধন খুলে দিচ্ছি। এই বলে সব বাঁধন খুলে দিয়েছে। তারপর তাকে জঙ্গলের মধ্য দিয়ে রাস্তা দেখিয়ে সদর রাস্তায় তুলে দিয়ে বলছে, এই পথ ধরে সোজা চলে যাও, ঐ যে তোমার বাড়ি দেখা যাচ্ছে। তখন পথিক বলছে, আপনি আমার এত উপকার করলেন আমার সাথে আমাদের বাড়িতে এসে একটু ঘুরে যান। তৃতীয় ডাকাতটি বলছে – না, আমার ওখানে যাবার উপায় নেই, পুলিশে ধরবে। প্রথম ডাকাত যে বলছিল একে মেরে ফেলে দাও, সে হচ্ছে তমোগুণী, তমোগুণে বিনাশ। দ্বিতীয় ডাকাত হচ্ছে রজোগুণ, সে মানুষকে আস্টেপৃষ্টে বেঁধে ফেলে। তৃতীয় ব্যক্তি হচ্ছে সত্ত্বগুণী, সত্ত্বগুণও ঈশ্বরের বাড়িতে ঢুকতে পারেনা, সেও বাঁধে। কিন্তু ঠাকুর বলছেন সত্ত্বগুণ মুক্তির রাস্তা দেখিয়ে দেবে কিন্তু মুক্তি দিতে পারবে না, সেও বাঁধে। কিভাবে বাঁধে? *সুখসঙ্গেন বধ্নাতি জ্ঞানসঙ্গেন চানঘ*।

সেইজন্য ঠাকুর বলছেন – কোন একটা বিষয়ে খুব বেশি যদি জ্ঞান হয়ে যায় বা জানার যদি খুব ইচ্ছে থাকে, সে কিন্তু ভগবান লাভ করতে পারেনা। যেমন কেউ যদি গান বাজনা এই রকম কিছুতে খুব ওস্তাদ, লেখালেখি খুব ভালো করে, খুব ভালো বক্তৃতা দিতে পারে, মানে যে কোন বিষয়ে যদি তার বিরাট দক্ষতা থাকে তাহলে কিন্তু তার ঈশ্বর লাভ হবে না, কারণ সত্ত্বগুণ তাকে বেঁধে নিয়েছে। সত্ত্বগুণের এই দুটো হচ্ছে বৈশিষ্ট্য – জ্ঞান আর সুখ। আধ্যাত্মিক পথে এগোতে হলে শেষে গিয়ে এই দুটো জিনিষকেও ছাড়তে হয়। কিছু কিছু লোককে দেখলেই মনে হবে প্রশান্ত ভাব চেহারার মধ্যে, মানে সে খুব সুখে আছে, অর্থাৎ সত্ত্বগুণের প্রাধান্য তার মধ্যে বিরাজ করছে। আবার দেখা যায় একই দিনে মানুষের ঘন্টায় ঘন্টায় গুণ পাল্টে যায়। সুখ আর জ্ঞান দিয়ে বোঝা যায় তার গুণ কিভাবে পাল্টাচ্ছে। কিন্তু আত্মা হচ্ছেন সুখ-দুঃখের পারে আবার জ্ঞান-অজ্ঞানেরও পারে। সেইজন্য কেউ যদি নিজেকে মনে করে আমি জ্ঞানী, আমি সুখী তখন এটাও তার কাছে বন্ধন হয়ে গেল। কিন্তু এই বাঁধনটা এত সূক্ষ্ম যে সব সময় ধরা যায় না। সেইজন্য সত্ত্বগুণী লোক একটু চেষ্টা করলেই আধ্যাত্মিক পুরুষ হয়ে যেতে পারে। কিন্তু সত্ত্বগুণের বাঁধন এত সূক্ষ্ম আর এত শক্ত বাঁধন যে ছাড়ান যায় না। দড়ি দিয়ে যদি কেউ বেঁধে রাখে তাহলে সেই বাঁধনকে ছাড়ান যায়, কিন্তু স্ত্রী পুত্রাদি যদি চোখের জলে বেঁধে রাখে তাহলে সেই বাঁধনকে ছাড়ান যায় না।

এই সুখটা হচ্ছে অনাত্মাস্বরূপ, আত্মার জ্ঞানে যে আনন্দ হচ্ছে তা নয়। যারা সন্ন্যাসী হয়ে আশ্রম জীবন যাপন করছে তারা হচ্ছে প্রকৃত সুখী। রোজ গঙ্গাস্নান হচ্ছে, ঠাকুর দর্শন হচ্ছে, ঠিক সময়ে আহারাদির ব্যবস্থা করা আছে, কোন ধরণের চিন্তাভাবনা নেই, এগুলো হচ্ছে সুখের উপকরণ। এটাও কিন্তু এক ধরণের বন্ধন। এগুলোর থেকেও তাকে উপরে চলে যেতে হবে। তবে উচ্চ আধ্যাত্মিক পুরুষরা তাঁদের উচ্চাবস্থা থেকে অবতরণ করে যখন জাগতিক ক্ষেত্রে নেমে আসেন তখন তারা সত্ত্বগুণকে অবলম্বন করে জগতের মাঝে বিচরণ করেন। কিন্তু যাঁরা মহাপুরুষ তাঁদের কাছে এসবের কোন দরকার হয় না। যেমন শ্রীরামচন্দ্র, তিনি রজোগুণকে আশ্রয় করে ছিলেন, যেমন কুর্মাবতারে তমোগুণকে আশ্রয় করে ছিলেন। এনারা হলে অবতার, এনাদের ক্ষেত্রে এগুলো প্রযোজ্য নয়। কিন্তু সাধু, মহাত্মারা সব সময় সত্ত্বগুণকেই আশ্রয় করে থাকেন। এনারা যখনই কোন কথা বলেন ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গই করেন, কারুর সাথে আলাপ করতে হলে মিষ্টি করে কথা বলেন। যারা সব সময় খোঁট মেরে কথা বলে, প্যাঁচ মেরে কথা বলে, বুঝতে হবে তার মধ্যে গোলমাল আছে। সত্ত্বগুণী নিজের জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত, নিজের সুখে মশগুল হয়ে থাকেন, অপরকেও সেইভাবে তিনি প্রত্যাশা করেন। এরপর রজোগুণের কথা বলছেন –

**রজো রাগাত্মকং বিদ্ধি তৃষ্ণাসঙ্গসমুদ্ভবম্। তন্নিবধ্নাতি কৌন্তেয় কর্মসঙ্গেন দেহিনম্।।৭।।**

রজোগুণের প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে অনুরাগ, কোন একটা বিশেষ বস্তুর প্রতি আসক্তি। *তৃষ্ণাসঙ্গসমুদ্ভবম্*, একটা বস্তু আমার কাছে নেই, অপ্রাপ্ত বস্তু, কিন্তু সেই বস্তুকে আমার পাওয়ার প্রবল ইচ্ছা, এটাকে বলা হচ্ছে তৃষ্ণা। আরেকটা হয়, একটা জিনিষকে আমি পেয়েছি, পাওয়ার পর সেটাকে ধরে রাখছি, এটাকে বলছে স্নেহ। এই স্নেহটি হল আসক্তি। আমি একজনকে ভালোবাসছি কিন্তু পাচ্ছি না, এটা হয়ে গেল তৃষ্ণা। পেয়ে গেছি, এখন ধরে রাখতে চাইছি, এটাকে বলছেন আসক্তি। এই তৃষ্ণা আর আসক্তির জন্ম সব সময় রজোগুণ থেকে হচ্ছে। যিনি সত্ত্বগুণী সে কোন কিছুকে ধরে রাখতে চাইবে না, একটা দামী মোবাইল তাকে কেউ দিয়েছে, আরেকজন এসে বলল – এই মোবাইল সেটটা কি সুন্দর, সত্ত্বগুণী সঙ্গে সঙ্গে বলবে – এটা তোমার পছন্দ হয়েছে, ঠিক আছে এটা তুমি নিয়ে যাও।

রজোগুণের ধর্ম হল তৃষ্ণা আর আসক্তি। এই তৃষ্ণা আর আসক্তি রজোগুণীকে বাঁধছে কিভাবে? *কর্মসঙ্গেন বধ্নাতি*, তাকে দিয়ে খুব কাজ করাতে থাকবে। আমার এই চাকরি চাই, আমাকে প্রমোশন পেতে হবে, আর তার জন্য সে দিনরাত খেটে মরছে। সব সময় যে তৃষ্ণার জন্য কাজ করবে তা নয়, কখন বলবে আমার job satisfaction, life এর fulfillment চাই, নানা রকমের শব্দ নিয়ে আসবে। কিন্তু সব কিছুর মূলে কর্ম, কর্মই তাকে নাচাতে থাকবে। যে কোন জিনিষের জন্য তৃষ্ণা, নাম-যশ এটাও তৃষ্ণা, লোকে আমাকে জানুক আমিও একটা কিছু। যখন নাম-যশ হয়ে গেল তখন সজাগ হয়ে যাবে এই নাম-যশটা যাতে ধরে রাখতে পারি, হারিয়ে না যায়, আমার যেন কোন কলঙ্ক না হয়। এর জন্য তখন যে কাজ করছে এটাও রজোগুণ থেকেই করছে। আর এই দুটোর যে উল্টো সেটা হচ্ছে তমোগুণ –

**তমস্ত্বজ্ঞানজং বিদ্ধি মোহনং সর্বদেহিনাম্। প্রমাদালস্যনিদ্রাভিস্তন্নিবধ্নাতি ভারত।।৮।।**

তমোগুণের প্রধাণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে মোহ বৃদ্ধি করে। মোহ হচ্ছে, যে জিনিষটা যে রকম আছে, সেই রকম না দেখে অন্য রকম দেখে। একজন রেল ইঞ্জিনের চালক, সে সারা জীবন রেলগাড়ি চালাচ্ছে। লাল দেখলে সে ট্রেনকে দাঁড় করিয়ে দেয় আর সবুজ সিগন্যাল দেখলে গাড়ি চালিয়ে যায়। এখন সে কোন অনুষ্ঠানে গেছে, সেখানে সবুজ দরজা দেখে ঢুকে পড়ছে, লাল রঙের দরজা দেখে দাঁড়িয়ে পড়ছে। তার মস্তিষ্কের মধ্যে এটাই বসে গেছে। জিনিষটা যা, তা না দেখে আরও একটা কিছু দেখায়, এটাকে বলে মোহ। আমি যখন একটা সুন্দর বাড়ি দেখলাম, দেখছি এটা একটা সুন্দর বাড়ি মাত্র। কিন্তু মোহ করবে কি, সে আরেক ধাপ আমাকে এগিয়ে দেবে, আমাকে এই বাড়িটা পেতে হবে। মোহ এসে আসল বস্তুটাকে ঢেকে দিচ্ছে। মোহ এসে প্রথমেই মস্তিষ্ককে মেঘাচ্ছন্ন করে দেয়, মস্তিষ্ককে একটা ঘোরের মধ্যে ঠেলে দেয়। মস্তিষ্ককে ঢেকে দিয়ে সে করে কি – *প্রমাদালস্যনিদ্রাভিঃ*, প্রমাদ হচ্ছে কাজের প্রতি অযত্নশীল, যখন কোন কাজ করবে তখন সেই কাজে কোন নিষ্ঠাতো থাকেই না, অপরন্তু কোন রকমে দায়সারা ভাবে করে দিয়েই খালাস। একটা কাজ করছে তাতে কোন সচেতনতা এদের থাকে না, কোন কাজেই সজাগ ভাবে করে না। বৌদ্ধ ধর্মের পুরোটাই হচ্ছে সচেতনতা, আমি পড়াচ্ছি, আমি সচেতন যে আমি পড়াচ্ছি, আমি খাচ্ছি তখনও আমি সচেতন ভাবে প্রত্যেকটি গ্রাসকে মুখে নিচ্ছি। অথচ আমাদের মধ্যে শতকরা নিরানব্বুইজন যখন কাজ করি তখন আমাদের কোন হুঁশ থাকে না যে আমি কাজ করছি। স্বাভাবিক সময়ে আমাদের মস্তিষ্কের সেল গুলো অটো সিস্টেমে থাকে বলে কাজটা হয়ে যায়। আমি যখন জামা পড়ছি ব্রেন তখন অটো সিস্টেমে থাকে বলে জামার বোতাম গুলো লেগে যায়। আমাদের এখানে এতো লোক বসে আছে, এখানে আসার সময় সবাই জামা পড়েছেন, কিন্তু তার মধ্যে একজনকেও পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ, যে বলবে বোতাম লাগানোর সময় আমি সচেতন ভাবে জামার বোতাম লাগিয়েছি। চশমা যখন চোখে লাগাচ্ছি তখনও আমি সচেতন নই যে আমি চশমা পড়ছি। কারণ আমরা সবাই তমোগুণের আশ্রিত। এইটাই প্রমাদ। মনের যে শক্তি আসে সেটা সব সময় আসে এই সচেতনতাকে আশ্রয় করে। সচেতনতার

অভাবই হল প্রমাদ। যার মধ্যে যত প্রমাদ হয় তার জীবনে সাফল্য তত কম হয়। সফলতটা যদিও কোন কোন ক্ষেত্রে গিয়ে পেয়ে যায়, কিন্তু একটা ধাপের পর আর এগোতে পারেনা। সনিদ্রা, যখন ঘুমোবে তখন ইচ্ছে করে আরও শুয়ে থাকি, আর যখনই সুযোগ পাবে তখনই বিছানায় শরীরটা এলিয়ে দিয়ে নাক ডাকতে শুরু করে দেবে। আর আলস্য, আজ থাক কালকে করা যাবে, এই মনোভাব নিয়ে সব কাজকে এড়িয়ে যায়। তমোগুণীদের জীবনে অনেক কিছু হতে পারে কিন্তু একটা জিনিষ এরা পারেনা, সেটা হল এরা জীবনে কাউকে ভালোবাসতে পারেনা। কারণ to know is to love, to love is to know, প্রমাদ মানে অজ্ঞান, অজ্ঞান মানে সে কোনটা ঠিক কোনটা ঠিক নয় জানতে পারছে না। এরা অপরকে তো ভালোবাসতেই পারেনা এমনকি এরা নিজেকেও ভালোবাসতে পারেনা। তমোগুণী যারা তারা নিজেকেও ভালোবাসতে পারেনা, নিজের জন্য কোনটা ভালো কোনটা মন্দ তাই জানেনা, কি খাচ্ছে সেই ব্যাপারেই কোন হুঁশ থাকেনা, ঘুমোচ্ছে সে ব্যাপারেও হুঁশ নেই। বিছানা পরিষ্কার করে, বালিশ সুন্দর করে সাজিয়ে যে ঘুমোবে তাতেও কোন হুঁশ থাকেনা, যেখানে যখন যে ভাবে পারবে শুয়ে পড়বে। কি খেলে শরীরের ভালো হবে, কি খেলে শরীর খারাপ হতে পারে, কি করলে মনের ভালো হবে, এই ব্যাপারেও কোন চিন্তা ভাবনা না করে যখন যা পাবে তাই করতে থাকবে, তাই খেতে থাকবে। এটাই হচ্ছে তমোগুণের লক্ষণ। সত্ত্ব, রজো ও তমোর ধর্মকে আবার খুব সংক্ষেপে বলছেন –

**সত্ত্বং সুখে সঞ্জয়তি রজঃ কর্মণি ভারত। জ্ঞানমাবৃত্য তু তমঃ প্রমাদে সঞ্জয়ত্যুত।।৯।।**

সত্ত্বগুণ মানুষকে সুখে নিযুক্ত করে, রজোগুণ কর্মের মধ্যে ঠেলে দেয় আর তমোগুণ সত্ত্বগুণে যে জ্ঞানাদি হয় সেই জ্ঞানকে ঢেকে দেয়। সারা বিশ্বে বেশির ভাগ মানুষই স্বভাবত তমোগুণী। যার রজোগুণ যখন আটকে যায় তখন সে ঘোর তমোগুণে চলে যায়। স্বামীজী বলছেন – তুমি যখন ধ্যান করতে চাও তাহলে বসে বসে ধ্যান কর, আর ধ্যান করার সময় যদি তোমাকে বলা হয় এই বাগানের সব্জীগুলো নিয়ে বেলুড় বাজারে বিক্রী করতে হবে, তুমি এক্ষুণি ধ্যান থেকে উঠে বেলুড় বাজারে গিয়ে হাসি মুখে বিক্রী করতে চলে যাবে। সন্ন্যাসীদের জীবন সব সময় সত্ত্ব আর রজোগুণে বাঁধা থাকে অন্য দিকে সংসারীদের জীবন রজো আর তমোগুণের মধ্যেই ঘুরপাক খায়। যারা বলে আমি খাটতে খাটতে মরে যেতে চাই, আমি কাজ ছাড়া থাকতে পারিনা, এরা আধ্যাত্মিক জীবনে কোন দিন এগোতে পারবে না। এরা সব সময় রজো আর তমোর মধ্যে থাকে, যখনই রজোগুণে থাকতে পারবে না, তখনই তমোগুণে চলে যাবে। তমোগুণে চলে এলেই তাকে প্রমাদ, আলস্য আর নিদ্রা আচ্ছন্ন করে ফেলবে। যাদের জীবন রজো তমোর মধ্যে খেলে বেড়াচ্ছে তারা কখনই ভালোবাসতে পারেনা। শুধু যে ভালোবাসতেই পারেনা তা নয়, তারা কোন ভালো কাজও করতে পারেনা, এমনকি পড়াশোনাতেও সাফল্য পায়না। বিশ্ববিদ্যালয়ের যেসব ছাত্ররা উপরের দিকে সাফল্য লাভ করে এরাও রজোগুণী, একটা ধাপ পর্যন্ত এরা যেতে পারে ঠিকই। এরা কখনই তমোগুণের আশ্রয় নেয় না। আইনস্টাইনের মত বড় বড় বিজ্ঞানীরা বিরাট সত্ত্বগুণের অধিকারী ছিলেন। এনারা যখন কাজের মধ্যে থাকেন না তখন মনটাকে গুটিয়ে একটা কিছু লিখতে বসে গেলেন, তা নাহলে একটা ভালো সঙ্গীতের মধ্যে ডুবে গেলেন, মানে সত্ত্বগুণে চলে গেলেন। এখানেও সেই সত্ত্বগুণের সুখ তাঁদের বেঁধে ফেলছেন, সেই সুখটা হল সঙ্গীতের সুখ। তাই বলে তাঁরা বলতে যাবেন না যে, আমাকে কাজ করতেই হবে এই বলে গাধার মত দৌড়াবেন না। এরপর বলছেন –

**রজস্তমশ্চাভিভূয় সত্ত্বং ভবতি ভারত। রজঃ সত্ত্বং তমশ্চৈব তমঃ সত্ত্বং রজস্তথা।।১০।।**

কুকুরের তিনটে বাচ্চা হয়েছে, এই তিনটে বাচ্চা সব সময় এক সঙ্গে থাকবে। আর সব সময় একটা একটার সাথে কামড়াকামড়ি করবে। সত্ত্ব, রজঃ আর তমোও ঠিক এই রকম কুকুরের বাচ্চার মত, সব সময় এক সঙ্গে থাকবে আর মারামারি করবে। কি নিয়ে মারামারি করে? কে বেশি ক্ষমতা দেখাতে পারে। তমো চেষ্টা করবে সত্ত্ব আর রজোকে কি করে দাবিয়ে সে উপরে থাকবে, রজো চেষ্টা করে সত্ত্ব ও তমোকে দাবিয়ে রাখতে, আর সত্ত্বও এই রকম তম আর রজোকে দাবিয়ে রেখে নিজেকে বড় করতে চেষ্টা করবে। এর মধ্যে সাধারণত সব থেকে বেশি মার খায় সত্ত্ব। আবার যারা সাধু তাদের ক্ষেত্রে তমোটা বেশি মার খায়। আমরা কি করে বুঝবো যে এই লোকটির মধ্যে সত্ত্বগুণ আছে না রজোগুণ আছে? তখন পরের তিনটে শ্লোকে সত্ত্ব, রজঃ আর তমোগুণীদের লক্ষণ বলছেন –

**সর্বদ্বারেষু দেহহস্মিন্ প্রকাশ উপজায়তে। জ্ঞানং যদা তদা বিদ্যাদ্বিবৃদ্ধং সত্ত্বমিত্যুত।।১১।।**

*সর্বদ্বারেষু দেহহস্মিন্*, যখন দেখা যাবে যে শরীরের যত ইন্দ্রিয়ের দ্বার আছে, সেই সমস্ত ইন্দ্রিয়ের দ্বারের প্রকাশ খুব বেড়ে যাচ্ছে তখন বুঝতে হবে যে, তার মধ্যে সত্ত্বগুণের প্রভাব বৃদ্ধি পেয়েছে। সাধারণত যারা সত্ত্বগুণী হয় তাদের বুদ্ধি প্রচণ্ড তীক্ষ্ণ হয়। তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সব সময় সত্ত্বগুণের চিহ্ন। বুদ্ধি হচ্ছে ইন্দ্রিয়ের শেষ দ্বার। চোখ দিয়ে যেটা দেখছে সেটা এক দৃষ্টিতে বুঝে নেয় যে কি হচ্ছে, কান দিয়ে যে কথা বা শব্দটা শুনছে সঙ্গে সঙ্গে বুঝে নেবে কি বলতে চাইছে, শব্দের পেছনে বা বক্তব্যের পেছনে কি উদ্দেশ্য আছে সাথে সাথে ধরে ফেলে। তবে এখানে বুঝতে হবে যে যাদের চোখের দৃষ্টি খুব ভালো, শ্রবণেন্দ্রিয় প্রখর তারা সবাই সত্ত্বগুণী হবে এমন কথা নয়, বলা হচ্ছে যারা সত্ত্বগুণী তাদের প্রত্যেকটি ইন্দ্রিয়ের প্রখরতা খুব বৃদ্ধি পায়। রজোগুণীর লক্ষণ বলছেন –

**লোভঃ প্রবৃত্তিরারম্ভঃ কর্মণামশমঃ স্পৃহা। রজস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে ভরতবর্ষভ।।১২।।**

লোভ যখন খুব বেড়ে যায়, অপরের এটা আছে আমারও সেটা চাই, আর প্রবৃত্তি, প্রবৃত্তি মানে সাংসারিক প্রচেষ্টা আর কর্ম, আমাকে অনেক কিছু করতে হবে, আমাকে এটা পেতে হবে, আমাকে এই করতে হবে, সব সময় এই চিন্তা করে যাচ্ছে তখন বুঝতে হবে তার মধ্যে রজোগুণের আধিক্য হয়েছে। সত্ত্বগুণীরা নিজে থেকে কোন কাজে জড়াতে চাইবে না, যেমন যুধিষ্ঠিররা শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত চেষ্টা করে গেছেন কিভাবে যুদ্ধটাকে আটকানো যায়। *অশমঃ,* সব সময় মনটা চঞ্চল থাকে, চঞ্চলতা থেকে মন অশান্ত হয়ে ওঠে, একে শেষ করতে হবে, ওটাকে আটকাতে হবে, এটা পেতে হবে, সব সময় চঞ্চল হয়ে ছটফট করবে, আর এতেই মনটা সব সময় অশান্ত হয়ে থাকে। রজোগুণ থেকে এই অশান্তির জন্ম। আর অপূরণীয় স্পৃহা, আমার এটা চাই সেটা চাই, এগুলো রজোগুণ থেকে আসে। আর তমোগুণের লক্ষণ হচ্ছে –

**অপ্রকাশোঽপ্রবৃত্তিশ্চ প্রমাদো মোহ এব চ। তমস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে কুরুনন্দন।।১৩।।**

*অপ্রকাশঃ,* তমোগুণের প্রধান লক্ষণ হচ্ছে অবিবেকী, একই জিনিষ বারবার বুঝিয়ে দেওয়া হচ্ছে তমোগুণী কিন্তু কিছুতেই সেটা বুঝবে না। তমোগুণীর লক্ষণ মন্দবুদ্ধি, যেটা বলব তার উল্টো বুঝবে। তমোগুণীর বুদ্ধি বলতে কিছুই থাকে না, যার ফলে কোনটা কর্তব্য কোনটা অকর্তব্য বুঝতেই পারেনা, এইটাই প্রমাদ। অবিবেকী, প্রমাদ, মোহ এগুলো হচ্ছে তমোগুণীর লক্ষণ।

মূল কথা যেটা বলতে চাইছেন তা হল, সত্ত্বগুণী কতকগুলি বিশেষ কয়েকটি গুণে গুণান্বিত, রজোগুণী সব সময় সক্রিয়, আর তমোগুণীরা প্রচণ্ড স্বার্থপরায়ণ হয়। যাদের মধ্যে স্বার্থপরতা থাকে তারা সব সময় নিজেকে নিয়েই চিন্তা ভাবনা করে। তমোগুণীকে যদি কোন কাজ দেওয়া হয় তখন আগে সে নিজেরটা দেখে নেবে। হিন্দু শাস্ত্রে সত্ত্ব, রজঃ ও তমো খুব গভীর ভাবে ঢুকে গেছে। এর ফলে সব কিছুতেই এনারা সত্ত্ব, রজঃ ও তমোতে টেনে নিয়ে আসবেন। এমনকি বলবেন যে জলের তিনটে অবস্থা, যখন বাষ্প হচ্ছে তখন সত্ত্বগুণ, যখন এই জলের অবস্থায় আছে তখন তার রজোগুণ, আবার যখন বরফ হয়ে যাচ্ছে তখন সেটাকে বলছেন জলের তমো অবস্থা। ঠাকুরও বলছেন, ভক্তির আবার সত্ত্ব, রজঃ তমো আছে। কিন্তু গীতাতে সত্ত্ব, তমো ও রজোকে মোটামুটি এইটুকুর মধ্যেই ব্যাখ্যা করে দিয়েছেন। স্বামীজী এক জায়গায় বলছেন – যখন এই শরীরে সাম্যভাব আসে তখন সেটা হয় সত্ত্বগুণ থেকে। আর Forces of attraction কে এক জায়গায় বলছেন তমোগুণ আবার অন্য জায়গায় বলছেন রজোগুণ। আবার forces of rupulsion কে বলছেন রজোগুণ। স্বামীজী চাইছিলেন এই তিনটে গুণকে বিজ্ঞানের সাথে মেলাতে। এই কারণে তিনি তিনটে গুণকে তিন রকমের force এর সাথে যুক্ত করার চেষ্টা করেছেন – equilibriumforce, forces of attraction and forces of repulsion। স্বামীজী এগুলো কোন লিখিত আকারে কোথায় দেননি, বক্তৃতার মধ্যে উল্লেখ করেছিলেন মাত্র। এই গুণগুলোর লক্ষণতো জীবিত অবস্থায় যেমনটি দেখা যায় সেই রকম বলা হল, কিন্তু মৃত্যুর পর কি হয়?

**যদা সত্ত্বে প্রবৃদ্ধে তু প্রলয়ং যাতি দেহভৃৎ। তদোত্তমবিদাং লোকানমলান্ প্রতিপদ্যতে।।১৪।।**

সত্ত্বগুণে অবস্থিত থেকে যদি কেউ দেহত্যাগ করে তাহলে সে মৃত্যুর পর উচ্চ স্বর্গে গিয়ে দেবতাদি যোনিতে, বা ঋষিদের যোনি বা পিতৃদের যোনিতে গিয়ে জন্ম গ্রহণ করে।

**রজসি প্রলয়ং গত্বা কর্মসঙ্গিষু জায়তে। তথা প্রলীনস্তমসি মূঢ়যোনিষু জায়তে।।১৫।।**

মৃত্যুর সময় যদি রজোগুণের আধিক্য থাকে, অর্থাৎ ভেতরে যদি তৃষ্ণাদি প্রচুর থাকে তখন *কর্মসঙ্গিষু জায়তে* – *কর্মসঙ্গিষু* মানে মানুষ যোনি, মানে মনুষ্যলোকে গিয়ে জন্ম নেয়। সবাই কাজ করে, সাপ, বিছে, এ্যমিবাও কাজ করে, কিন্তু মানুষের মধ্যে কর্মের প্রাধান্য বেশি দেখা যায়। মৃত্যুর সময় যদি তমো গুণের আধিক্য এসে যায় তখন সে *মূঢ়যোনিষু জায়তে* – মনুষ্যতের প্রাণী, মানে ছাগল, ভেড়া, পিঁপড়ে, ফড়িং এর মধ্যে গিয়ে জন্ম নেয়। এগুলোকে আমরা মূঢ়যোনি বলে মনে করি। কিন্তু যদি বলি কাক তো খুব সেয়ানা, না কাকও মূঢ়যোনি। তারপর বলছেন –

**কর্মণঃ সুকৃতস্যাহুঃ সাত্ত্বিকং নির্মলং ফলম্। রজসস্তু ফলং দুঃখমজ্ঞানং তমসঃ ফলম্।।১৬**

যাঁরা শ্রেষ্ঠ পুরুষ, যাঁদের এর সব কিছুই ধারণা হয়ে গেছে, তাঁরা বলেন – সাত্ত্বিক যা কিছু কর্ম করা হয় সেই কর্মের ফল সব সময়, *নির্মলং ফলম্*। যেমন এখানে আমরা গীতার উপর আলোচনা করছি, মানে জ্ঞানচর্চা করছি, জ্ঞানচর্চা করার যে ফল তাতে মন কখনই বিক্ষুব্ধ হবে না। যখনই কোন শাস্ত্র আলোচনা করা হয় তখন যে আলোচনা করছেন আর যাঁরা শুনছেন সবাইকে সাত্ত্বিক অবস্থায় থাকতেই হবে। সাত্ত্বিক কর্মের ফল তাই সব সময় পবিত্র ও শুদ্ধ হয়। *রজসস্তু ফলং দুঃখম্,* রজোগুণে যখন খুব বেশি কাজ করা হয় আর খুব বেশি পরিমাণে যদি তৃষ্ণা লোভাদি থাকে, সেই কর্মের ফল সব সময় দুঃখ। *অজ্ঞানং তমসঃ ফলম্,* তামসিক কর্মের

ফল সব সময় অজ্ঞান। অজ্ঞান মানে যেটা ঠিক সেটা জানেনা, একটা জিনিষের যে বাস্তবিক স্বরূপ সেটাকে জানা যায় না। একই জিনিষ বারংবার বলে যাচ্ছেন –

**সত্ত্বাৎ সঞ্জায়তে জ্ঞানং রজসো লোভ এব চ। প্রমাদমোহৌ তমসো ভবতোঽজ্ঞানমেব চ।।১৭।।**

তিনটে গুণই নিজেদের মধ্যে মারামারি করছে, মারামারি করে যখন সত্ত্বগুণের আধিক্য বেড়ে যায় তখন জ্ঞানের প্রতি আসক্তি বেড়ে যায়। তাহলে আমরা বলতে পারি যে এত লোক আমেরিকা, ইংল্যাণ্ডে গিয়ে এত এত ডিগ্রী নিচ্ছে তাহলে এরাও সত্ত্বগুণী। না, এরা কেউই সত্ত্বগুণী নয়, কারণ এরা জ্ঞানের জন্যই বিদেশে যাচ্ছে না, একটা বড় ডিগ্রী নিয়ে কিভাবে আরও পয়সা রোজগার করবে। পয়সা রোজগার মানেই অবাধারিত রজোগুণের আধিক্য তার মধ্যে বেশি। *রজসো লোভ এব চ*, আমার প্রমোশন হোক, আমার বেতন বৃদ্ধি হোক, এই লোভ রজোগুণ থেকে আসছে। তমোগুণ থেকে প্রমাদ, মোহ আর অজ্ঞান হয়। সব জিনিষ গুলোকে আগে একবার বলা হয়েছিল সেই জিনিষ গুলোকেই আবার বলা হচ্ছে, মৃত্যুর পর কি কি গুণে কি কি হয় সেটা আগেও বলা হয়েছিল, এইখানে আবার বলা হচ্ছে –

**উর্ধ্বং গচ্ছন্তি সত্ত্বস্থা মধ্যে তিষ্ঠন্তি রাজসাঃ। জঘন্যগুণবৃত্তস্থা অধো গচ্ছন্তি তামসাঃ।।১৮।।**

মৃত্যুর পর সত্ত্বগুণী উপরের দিকে দেবলোকে চলে যান, রজোগুণীরা মাঝখানে থেকে যায় আর নীচের দিকে চলে যায় তমোগুণীরা। নীচের দিকে মানে তীর্যকযোনিতে। এগুলোকে যুক্তি দিয়ে বিচার করতে গেলে কি হবে আমাদের জানা নেই, তবে আমরা এই মতেই বড় হয়েছি, এই মত আমাদের পরম্পরাতে চলে আসছে, একে কোন প্রশ্ন করা যাবে না। যদি কেউ বলে মৃত্যুর পর কিছু আছে আমি মানিনা, মানে পুনর্জন্মকে আমি মানিনা, তাহলে তাকে বলতে হয় – ভাই, তোমার জন্য ধর্ম নয়। তুমি যাই হয়ে যাও, দার্শনিক হতে পার, বিজ্ঞানী হতে পার কিন্তু ধর্মে তুমি আসতে পারবে না, বিশেষ করে হিন্দুধর্মে। তোমার জন্য খ্রীশ্চান বা মুসলিম ধর্ম। যদি আমি নিজেকে হিন্দু বলে স্বীকার করি তাহলে আমাকে গীতা মানতে হবে, আর গীতার এই চতুর্দশ অধ্যায়কেও মানতে হবে। গীতা হিন্দু ধর্মের শেষ কথা। গীতাতে ভগবান বলছেন মৃত্যুর আগে তোমার মধ্যে যে গুণের আধিক্য থাকবে মৃত্যুর পর সেই অনুসারে তোমার আবার জন্ম হবে। গীতার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে মোক্ষ, জন্ম-মৃত্যুর এই চক্রের পারে যেতে হবে তাই পরের শ্লোকেই ভগবান বলছেন –

**নান্যং গুণেভ্যঃ কর্তারং যদা দ্রষ্টাহনুপশ্যতি। গুণেভ্যশ্চ পরং বেত্তি মদ্ভাবং সোঽধিগচ্ছতি।।১৯।।**

যিনি মুমুক্ষু, মুক্তির পথে যিনি অগ্রসর হচ্ছেন, তিনি দেখেন এই জগতে যাবতীয় যা কার্য হচ্ছে, সমস্ত কার্যের মূলে হল সত্ত্ব, রজঃ আর তমোর খেলা। তিনি পরিষ্কার দেখতে পান আত্মা যিনি, তিনি এই গুণের কোন কিছুতে জড়িয়ে নেই। তিন গুণের এই খেলাকে যখন সে দেখে নিল তখনই সে মোক্ষের দিকে এগিয়ে গেল। যখন দেখে ভালো কিছু হচ্ছে তখন তিনি বুঝে যান যে এটা সত্ত্বগুণের জন্য হচ্ছে। খুব ছোটাছুটি, দৌড়ঝাপ করছে, বুঝে যান যে, এত ছোটাছুটি সব রজোগুণের জন্য। খুনোখুনি করছে দেখছেন এ তমোগুণকে আশ্রয় করে নিয়েছে, খুনোখুনি মানেই তামসিক বৃত্তি। বিরাট দাগী আসামী তারও যে আত্মা আছে সে কিন্তু নির্লিপ্ত। এইটি যখন সাধক দেখতে পায় তখন, তার নিজেরই যখন কিছু ভালো হচ্ছে দেখে তখন সে বুঝতে পারে যে আমার এবার সাত্ত্বিকগুণটা উপরের দিকে উঠছে। হঠাৎ তার মনে কিছু একটা পাওয়ার ইচ্ছে হল, তখন সে পরিষ্কার বুঝতে পারে যে আমার এখন রজোগুণের ভাব বৃদ্ধি পাচ্ছে, তার মধ্যে যখন তমোগুণের ভাব জাগবে সেটাও বুঝতে পারবে। আমি এগুলোর কিছুতেই না, আমি নির্লিপ্ত। এবার কিন্তু সে মোক্ষমার্গি হয়ে গেল। জগতের যা কিছুই হয়ে যাক সে দেখতে পায় সবই সত্ত্ব, রজঃ ও তমোর খেলা। দুর্গাপূজাতে সবাই কত আনন্দ নিয়ে মায়ের পূজো করছে, ঢাক বাজছে, কত অনুষ্ঠান হচ্ছে, এখানেও সেই তিন গুণের খেলা, তবে এটা সত্ত্ব রজোর খেলা, যে কোন পূজো মানেই সত্ত্ব রজোর খেলা, তমো এখানে নেই। তিনি হয়তো একজন খুব জ্ঞানী পুরুষকে দেখছেন, সেখানেও দেখছেন এর মধ্যেও সেই সত্ত্বগুণের খেলা চলছে, আত্মা এখানেও নির্লিপ্ত। আবার দেখছেন কুম্ভকর্ণের মত লোক, খালি খাওয়া দাওয়া আর ঘুম, এখানে আবার তমোগুণের খেলা। এ সবই প্রকৃতির খেলা, এখানে আত্মার কোন কিছু খেলা নেই। তারপর বলছেন – এই রকম হলে সে ভগবানের দিকে এগিয়ে যায়। কিভাবে এগোয়?

**গুণানেতানতীত্য ত্রীন্ দেহী দেহসমুদ্ভবান্। জন্মমৃত্যুজরাদুঃখৈর্বিমুক্তোঽমৃতমশ্নুতে।।২০।।**

যা কিছুর জন্ম আদি হয় তার বীজ হচ্ছে এই সত্ত্ব, রজঃ ও তমো। কিন্তু যখনই বুঝে নেয় এই তিনটে গুণ আলাদা আর আমি আলাদা তখন *গুণানেতানতীত্য ত্রীন্*, এই গুণ গুলোকে সে অতিক্রম করে যায়। আমরা একটা কাল্পনিক সম্পর্ক তৈরী করে প্রকৃতির এই তিন গুণের সাথে নিজেদের জড়িয়ে ফেলি। তার ফলে আমরা এই তিন গুণের কথায় উঠতে বললে উঠি, বসতে বললে বসি। কিন্তু যখন বুঝে নেয় যে এরা আলাদা আর আমি আলাদা, তখন কেন আমি এদের কথা ওঠাবসা করব। যখন বুঝে নিলাম এরা

আলাদা তখন আমি এই তিন গুণ থেকে বেরিয়ে আসব এরপর এই তিন গুণের নিয়ম-কানুন আমার উপর খাটবে না। তখন কি হবে? জন্ম, মৃত্যু, জরা, দুঃখ এগুলোও এই তিনটে গুণের খেলা, এই খেলা থেকে বেরিয়ে আসা মানে আমাকে আর জন্ম, মৃত্যু, জরা, দুঃখ এগুলো আর স্পর্শ করতে পারবে না, তখন *অমৃতমশ্নুতে*, এগুলো স্পর্শ না করতে পারলে আমার অমৃত লাভ হয়ে গেল। এরপর অর্জুন প্রশ্ন করছেন –

অর্জুন উবাচ

**কৈর্লিঙ্গৈস্ত্রীন্ গুণানেতানতীতো ভবতি প্রভো। কিমাচারঃ কথং চৈতাংস্ত্রীন্ গুণানতিবর্ততে।।২১।।**

অর্জুন জিজ্ঞেস করছেন, কি করে বুঝব যে কেউ তিনটে গুণের পারে চলে গেছেন? যেমন ঠাকুর, তিনি বিজ্ঞানীর অবস্থায় চলে গেছেন, মানে তিনটে গুণের পারে অবস্থান করছেন। কিন্তু এই সংসারে থাকতে গেলে সবাইকে একটা গুণকে আশ্রয় করে থাকতে হবে, অথচ সে তত্ত্বতঃ ভেতরে বুঝে গেছে যে আমি এই তিনটে গুণের পারে। কিন্তু কি করে জানা যাবে যে সে বুঝে গেছে যে সে আলাদা আর এই গুণগুলো আলাদা? কোন স্কুল হস্টেলে যখন অনেক ছেলে খেতে বসে তখন তার মধ্যে বর্তমান ছাত্রও আছে আবার প্রাক্তন ছাত্রও আছে। এখন একজন বাইরের লোক কি করে বুঝবে যে এর মধ্যে কে প্রাক্তন ছাত্র কে বর্তমান ছাত্র? দুজনেই এক সঙ্গে খেতে বসছে, দুজনেই মন্দিরে যাচ্ছে। অথচ আমি কি করে বুঝব এই দুই ছাত্রের মধ্যে পার্থক্যটা কোথায়? এখানে অর্জুন ঠিক এই প্রশ্নটাই করছেন। বদ্ধজীব আর মুক্তজীব, মুক্তজীবকেও সংসারে সংসারীদের মত আচরণ করতে হচ্ছে। মুক্ত পুরুষের শরীর আছে, সেই শরীরে ভাইরাসের আক্রমণও হবে, তার সর্দি-কাশিও হবে, তার পেট খারাপ হবে, ঘুম পাবে, সবই হবে। কিন্তু বুঝবো কি করে যে ইনি ত্রিগুণাতীত? যে বর্তমান ছাত্র সে শিক্ষকের ভয়ে সব সময় তটস্থ হয়ে থাকবে, কিন্তু প্রাক্তন ছাত্র শিক্ষকের ভয়ে তটস্থ হবে না। সে জানে আমি এই বিদ্যালয় থেকে মুক্ত, যখন খুশি আমি স্কুল থেকে বেরিয়ে চলে যেতে পারি। কি করে বুঝব আমরা তাকে, তার আচরণ কি রকম হয়, তার ব্যবহার কেমন, আর কিভাবে এই গুণকে অতিক্রম করতে পারে? এখানে জড় আর চৈতন্যের আলোচনা থেকে সরে এসে আবার তত্ত্বের আলোচনায় আসছেন। তখন ভগবান বলছেন –

শ্রীভগবানুবাচ

**প্রকাশঞ্চ প্রবৃত্তিঞ্চ মোহমেব চ পাণ্ডব। ন দ্বেষ্টি সম্প্রবৃত্তানি ন নিবৃত্তানি কাঙ্ক্ষতি।।২২।।**

ত্রিগুণাতীত যিনি, তিনি বোঝেন এই যে তিনটে গুণের যে বৈশিষ্ট্য, যেমন সত্ত্বগুণের ধর্ম হচ্ছে প্রকাশ, মানে বুদ্ধি খুব তীক্ষ্ণ, সব কিছুই সে বুঝে নিতে পারে, প্রবৃত্তি যেটা রজোগুণের ধর্ম, মানে কাজের প্রতি স্পৃহা আর তমোর ধর্ম হল মোহ, যেটা যেমন দেখার কথা সেটা না দেখে তার উল্টোটা দেখে, প্রমাদগ্রস্ত মন, এই সব কিছু হচ্ছে প্রকৃতির খেলা। এগুলো প্রকৃতির খেলা বুঝে নিয়ে *সে ন দ্বেষ্টি সম্প্রবৃত্তানি ন নিবৃত্তানি কাঙ্ক্ষতি*, প্রকৃতির কোন কিছুকেই সে পেতে ইচ্ছে করেনা, আর যেটা এসে গেছে সেটাকে ফেলে দেওয়ার জন্যও ছটফট করেন না। যখন কোন কিছু জানার জন্য বই পড়ার ইচ্ছে হল তখন বুঝে নিলেন যে এটা সত্ত্বগুণের খেলা, জ্ঞানলাভের ইচ্ছাটা প্রকাশ রূপে এসেছে। প্রবৃত্তি, হঠাৎ খুব কাজ করার ইচ্ছে জাগল। একজন খুব বড় সাধু ছিলেন, তিনি আশ্রমে কখনই কোন কাজকর্ম করতেন না। উনি কোন কোন আশ্রমে গিয়ে দুমাস কি চার মাস কখন এক বছর দুবছর থাকতেন। আর শুধু জপ ধ্যান করতেন। মাঝে মাঝে গিয়ে আশ্রমের মহন্তকে বলতেন – শোন, আমার মধ্যে একটু রজোগুণ জেগেছে, তাই আমি ঠিক করেছি আশ্রমের এইটুকু জায়গাতে একটু চাষবাস করব। আমার চাষবাস করার পর তোমার যদি কাজের দরকার হয় তাহলে যা থাকবে তুমি উপড়ে দিও, আমি চাষবাস করেছি বলে তুমি এগুলো রেখে দিতে যেওনা, আমার রজোগুণ জেগেছে বলে কাজ করে রজোগুণটাকে বার করে দেব। উনি খুব সম্মানিত সাধু ছিলেন, শুধুই জপ-ধ্যান করতেন। এইটাই হয়, রজোগুণ জাগা মানে প্রবৃত্তি জেগে গেছে, প্রবৃত্তি জাগা মানে এখন কিছু কাজ করতে হবে, কাজ করে এটাকে বের করে দিতে হবে। ঘুম পেলে যেমন সবাইকে ঘুমোতে হয়, ঠিক তেমনি সাধু-সন্ন্যাসীদের যখন কাজের প্রবৃত্তি জাগে তখন সেটাকে মিটিয়ে দিতে হয়, না মেটালে সর্বনাশ হয়ে যাওয়ার প্রচণ্ড সম্ভবনা তৈরী করে দেবে। ঠাকুরেরও এই রকম হয়েছিল, মাঝ রাতে তাঁরও একবার ঐ রকম কাজের প্রবৃত্তি জেগে গিয়েছিল, তখনই তাঁকে সেটা মেটাতে হবে। সেইজন্য সাধু-সন্ন্যাসীদের যদি কামিনী-কাঞ্চন নিয়ে যদি কোন কিছু মাথায় এসে যায় তাহলে তাঁদের খুব সমস্যা হয়ে যায়, কারণ কামিনী-কাঞ্চনকে মেটানো সন্ন্যাসী অবস্থায় মেটানো অসম্ভব। সেইজন্য যখনই রজোগুণের প্রবৃত্তি আসবে সেটাকে কাজ করে মিটিয়ে দিতে হয়। যে সাধুর কথা বলছিলাম, উনিও মঠের বেশ কিছুটা জায়গা জুড়ে প্রচুর গাছ লাগিয়ে দিতেন। এখনও সেই সব আশ্রমের সাধুরা বলেন এই গাছগুলো ঐ মহারাজের লাগানো। এক আশ্রমে উনি একবার গিয়ে ভুট্টা চাষ করতে শুরু করেছেন। উনি হচ্ছেন সাধুপুরুষ, এখন উনি কাজ করছেন তাঁর রজোগুণ জেগে গেছে বলে নিজেই বীজ লাগাচ্ছেন, নিজেই জল দিচ্ছেন, গাছের পরিচর্যা নিজের হাতেই করছেন। সেই আশ্রমের সাধুরা এখনও বলে সেই ভূট্টা গাছে যে ভুট্টা হয়েছিল তার সাইজ হয়েছিল আজ পর্যন্ত ঐ রকম সাইজের ভুট্টা কেউ দেখেননি। কারণ উনি তো নিজের জন্য, বা লোভে পড়ে গাছ লাগাননি, রজোগুণ জেগে গিয়েছে আমাকে এখন এই রজোগুণকে মিটিয়ে দিতে হবে। ফলে তাঁর কার্যদক্ষতা আর

সেই কাজের যে ফসল দুটোই বিশাল আকারের ছিল। গুণের এই ধর্মগুলিকে জেনে নিয়ে এনাদের আর কোন কিছুর প্রতি আসক্তিও হয় না, আবার কোন কিছুর থেকে আমাকে পালাতে হবে সেটাও ভাবেন না।

আসলে সমস্যা একটা যেটা হয় তা হল, এখন কার মধ্যে কি গুণ জেগেছে এটা আমরা কেউই বুঝতে পারব না, কারণ এটা স্বসংবেদ্য, যার জেগেছে সেই একমাত্র জানতে পারবে বাইরের কেউ জানতে পারবে না। এর ফলে যে তমোগুণী সে বুম্ মেরে চুপচাপ বসে আছে, দেখে সবাই মনে করবে এ যেন বিরাট সত্ত্বগুণী লোক। কিন্তু আমাদের এখানে আলোচনা তাদের জন্যই করা হচ্ছে যারা আধ্যাত্মিক পুরুষ হতে চান, তাই এখানে সাধারণ লোকেদের নিয়ে কোন কথা হচ্ছে না। যিনি আধ্যাত্মিক পুরুষ তিনি কিন্তু পরিষ্কার বুঝতে পারেন যে আমার এখন রজোগুণ জেগেছে বা তমোগুণ একটু ধাক্কা মারছে। কিন্তু যাঁরাই আধ্যাত্মিক পথে আসেন বেশির ভাগই ঠগবাজ, স্বামীজী তখনকার দিনেই বলছেন ধর্মের পথে শতকরা আশি জনই হল ঠগবাজ, বাকি পনের শতাংশ মাথা খারাপ আর বাকি পাঁচ শতাংশ ঠিক ঠিক থাকে। বর্তমানে তো ঠগবাজ আর মাথা খারাপ মিলিয়ে ৯৯ শতাংশে পৌঁছে গেছে। কার ভেতরে কি বৃত্তি জেগেছে বাইরে থেকে কেউ জানতে বা বুঝতে পারবে না, সেইজন্য যার তমোগুণ জেগেছে সেটাকে সে সত্ত্বগুণ বলে চালিয়ে দিচ্ছে, যখন রজোগুণ জেগেছে তখন সমাজের সেবা করে জাহির করছে আমি সমাজসেবক, সাধু নিজেকে সমাজসেবায়, দেশোদ্ধারে লাগিয়ে দিয়ে বলছে আমি মানুষের জন্য কাজ করতে চাই, কিন্তু যে কথাটা বলতে পারছে না, তা হল আমার মধ্যে কামনা-বাসনা জেগেছে, নাম-যশের ইচ্ছে জেগেছে, সেটা বলারও ক্ষমতা নেই, আর কারুর বাইরে থেকে বোঝারও ক্ষমতা নেই। সত্যি কথা বলতে জগতে ত্রিগুণাতীতের সংখ্যা খুবই নগণ্য। এনারা মহাপুরুষ, এখানে মহাপুরুষদের কথাই বলা হচ্ছে, তিনি বুঝতে পারেন আমার এই গুণটা জাগছে কিন্তু তাঁকে বাঁধতে পারবে না। আমাদের মধ্যে যখন যে গুণটা জাগবে সেই গুণ তার ধর্ম দিয়ে আমাকে বেঁধে ফেলবে। যেমন হস্টেলের ঘন্টা পড়লে প্রাক্তন ছাত্র জানে যে আমাকে এখন খাওয়ার ঘরে যেতে হবে, কিন্তু সে ইচ্ছে করলে হস্টেলের ক্যাম্পাস থেকে বেরিয়ে গিয়ে হোটেলেও খেয়ে আসতে পারে, কিন্তু যে বর্তমান ছাত্র সে তা করতে পারবে না, তাকে খাওয়ার ঘরেই যেতে হবে। গুণাতীতের আর কি লক্ষণ –

**উদাসীনবদাসীনো গুণৈর্য ন বিচাল্যতে। গুণা বর্তন্ত ইত্যেবং যোঽবতিষ্ঠতি নেঙ্গতে।।২৩।।**

এই তিনটে গুণ পরস্পরের উপর কার্য করে চলেছে, কখন সত্ত্বগুণ রজোগুণকে দাবিয়ে দিচ্ছে, কখন রজোগুণ বাকি দুটোকে আবার কখন তমোগুণ বাকি দুটোকে দাবিয়ে দিচ্ছে। এই তিনটে গুণ কুকুরের বাচ্চার মত খেলা করে যাচ্ছে। যিনি গুণাতীত তিনি সব কিছুকে দেখতে থাকেন – এবার আমার রজোগুণ বেড়েছে, তার মানে আমার ইন্দ্রিয়গুলো এখন কাজ করবার জন্য নিশপিশ করবে, এবার আমার তমোগুণ বেড়েছে, আমার শরীর এখন ঘুমোতে চাইবে। এনারা এগুলোকে পরিষ্কার বুঝতে পারেন, কিন্তু তাঁকে কোন গুণই নাচাতে পারবে না। সাধুর কখন ইচ্ছে হল তীর্থ করার, তিনি তখন বুঝতে পারেন যে আমার এখন রজোগুণ বেড়েছে, এটাকে মেটাবার জন্য তিনি করলেন কি, ঠিক আছে আমি পায়ে হেঁটে কাশী চললাম। একদিকে তীর্থ করাও হয়ে গেল অন্য দিকে রজোগুণ যেটা জেগেছিল সেটাও বেরিয়ে গেল, এবার তিনি শান্ত হয়ে অনেক দিন চুপচাপ কূটস্থ হয়ে অবিচলিত ভাবে মনকে আত্মস্বরূপে নিয়ে গিয়ে বসে যাবেন। এই ধরণের লোকেরাই ঠিকঠিক গুণাতীত। সাধারণ লোকেদের মধ্যে যে ধরণের বাসনা জাগ্রত হয় এটা ঠিক সেই ধরণের বাসনা নয়। আর কি বৈশিষ্ট্য?

**সমদুঃখসুখঃ স্বস্থঃ সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ। তুল্যপ্রিয়াপ্রিয়ো ধীরস্তুল্যনিন্দাত্মসংস্তুতিঃ।।২৪।।**

দ্বিতীয় অধ্যায়ে স্থিতপ্রজ্ঞের যে লক্ষণগুলো আলোচনা করা হয়েছিল, সেই একই জিনিষ আবার এখানে বলা হচ্ছে। সুখে দুঃখে তাঁর মন সমান থাকে আর টাকা পয়সা সম্পদ এলেও যা আবার চলে গেলেও তিনি সমান থাকেন। তিনি জানেন টাকা পয়সা হল রজোগুণের খেলা, টাকা পয়সা চলে যাচ্ছে এটাও রজোগুণের খেলা। আমার যদি মন খারাপ হয় সেটা তমোগুণের খেলা, কারণ মন খারাপ মানে অজ্ঞান, অজ্ঞান হল তমোগুণের ধর্ম। টাকা পয়সা চলে যাওয়া, তাতে মন খারাপ হওয়া এখানে আত্মার তো কিছুই হচ্ছে না। তাঁরও প্রিয় ও অপ্রিয় বোধ আছে, কিন্তু দুটোতেই তাঁর সমান দৃষ্টি। প্রিয় ও অপ্রিয় কোন কিছুতেই তাঁর কিছু আসে যায় না, প্রিয় এলেও যা অপ্রিয় এলেও তাই। সন্ত তুলসীদাস লিখছেন – বন্দো সন্ত অসজ্জন চরণা, সাধুকে প্রণাম অসাধুকেও প্রণাম। কিন্তু ত্রিগুণাতীত যিনি, তিনি সাধু অসাধু কিছু দেখবেন না, তাঁর কাছে সব সমান। উপলব্ধিহীনরাই পার্থক্য করবে, উপলব্ধি হয়ে গেলে আর কোন কিছুতে পার্থক্য করবে না। যেটাই তমোগুণ, সেটাই রজোগুণ সেটাই সত্ত্বগুণ। আমি তমোগুণের চাপে আছি না সত্ত্বগুণে উদ্ভাসিত আছি সেটা কোন ব্যাপারই নয়, জিনিষটা একই। হিন্দুধর্মের লক্ষ্য হচ্ছে এই তিন গুণকে অতিক্রম করা। কিন্তু খ্রীশ্চান আর ইসলাম ধর্মের লক্ষ্য হচ্ছে সত্ত্বগুণে প্রতিষ্ঠিত হওয়া। এইটাই হিন্দুধর্মের সাথে অন্যান্য ধর্মের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য। তার ফলে যিনি ত্রিগুণাতীত তাঁর কাছে আমি সত্ত্বগুণেই থাকি আর তমোগুণেই থাকি সবটাই সমান। ঠাকুর শ্রীমাকে বলছেন – কোলকাতার লোকগুলো পোকামাকড়ের মত কিলবিল করছে। এখানে তিনি কষ্ট পাচ্ছেন। আর বিদ্যাসাগরকেও দেখে বলছেন – ভেতরে সোনা চাপা আছে তার খপর নাই। বিদ্যাসাগর তখনকার দিনের একজন শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত, অগাধ জ্ঞান কিন্তু ঠাকুরের চোখে তিনি সমালোচিত হচ্ছেন। আর

কোলকাতার লোকগুলো মহা তমোগুণে আচ্ছন্ন, তাদেরকেও সমালোচনা করছেন। ত্রিগুণাতীতের কাছে দুজনেই সমান নিন্দনীয়। শ্রীরামকৃষ্ণের দৃষ্টিতে বিদ্যাসাগরের স্থান অন্য সাধারণ লোকের থেকে আদপেই উঁচুতে নয়। এগুলো আবার সব জায়গায় বলতে নেই, কিন্তু এটাই ঘটনা। মানে, কেউ যদি জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত থাকে, ত্রিগুণাতীতের কাছে এটাও গুণের খেলা। একজন আসামী আর একজন জ্ঞানীর মধ্যে যে বিরাট পার্থক্য হবে তা কখনই হবে না, গুণগত মানে পার্থক্য থাকতে পারে। কিন্তু একই জিনিষ দুজনের মধ্যে কারুর তমোগুণ বেশি আবার কারুর সত্ত্বগুণ বেশি। সব কটি গুণই সমান, আগেই বলেছেন – *রজস্তমশ্চাভিভূয় সত্ত্বং ভবতি ভারত*, একটা গুণ বাকি দুটোকে চাপা দিয়ে উপরে আসে, আজকে যে তমোগুণ উপরের দিকে আছে, পরে ঐটাই পাল্টে সত্ত্বগুণ হয়ে যাবে। কতদিন তমোগুণ বাকি দুটো গুণকে চাপা দিয়ে রাখবে? যদি সে চায় একদিনেই সে তমোগুণকে সরিয়ে সত্ত্বগুণকে উপরে নিয়ে আসতে পারবে। ঈশ্বরের কৃপা হলে এই মুহুর্তে তার সত্ত্বগুণ জেগে যাবে। বাল্মীকি ছিলেন দস্যু রত্নাকর, যদিও আমরা কোথাও পাইনা যে বাল্মীকি আগে দস্যু রত্নাকর ছিলেন, হতেই পারেন না। কিন্তু এগুলো হচ্ছে আখ্যায়িকা, এই আখ্যায়িকা গুলোতে এটাই বলতে চাইছে যে তমোগুণ যে কোন সময়, এমন কি যে কোন মুহুর্তে সত্ত্বগুণে রূপান্তরিত হয়ে যেতে পারে। কারণ একটা জিনিষ প্রচণ্ড সক্রিয় ছিল সেটাকে বিপরীতে দিক দিয়ে সমান করে দেওয়া হল।

এখানে দেখতে হবে তিনি এই তিনটে গুণকে অতিক্রম করে গেছেন কিনা, আর গুণের বন্ধনে আছেন কিনা। কিন্তু আমাদের কাছে তিনটে গুণের ধারণাই পরিষ্কার নয় তাই ত্রিগুণাতীতের ধারণা করা খুব মুশকিল। যার ফলে কিছু না জেনেশুনে মহাপুরুষদের সম্বন্ধে আমরা অনেক উল্টোপাল্টা মন্তব্য বলে ফেলি – স্বামী বিবেকানন্দ কি এই জিনিষ করতেন, শ্রীরামকৃষ্ণ কি এইগুলো করতেন । আমরা এটা বুঝতে পারিনা যে, এঁদেরকে এই তিনটে গুণ সত্ত্ব, রজো আর তমো দিয়ে মাপা যায় না। তারপর বলছেন –

**মানাপমানয়োস্তুল্যস্তুল্যো মিত্রাআরিপক্ষয়োঃ। সর্বারম্ভপরিত্যাগী গুণাতীতঃ স উচ্যতে।।২৫।।**

মান, অপমান, শত্রু, মিত্র সব কিছুতে ত্রিগুণাতীতের সমান দৃষ্টি। শুধু যে তিনিই সমান দেখছেন তা নয়, যারা শত্রু মিত্র তারাও ত্রিগুণাতীত থেকে কোন অপমানিত বা ভয় পায় না, এরাও জানে তিনি সবারই বন্ধু। *সর্বারম্ভপরিত্যাগী*, তিনি নতুন কোন কাজতো করবেনই না, উপরন্তু নতুন কোন কর্মও তৈরী করবেন না। নতুন কোন কাজে তাঁর কোন আগ্রহই নেই। স্বামীজী যেটা করেছিলেন সেটা সর্বসাধারণের কল্যাণের জন্য, নিজের স্বার্থের জন্য কোন কাজই করতে যাবেন না। অর্জুনের শেষ প্রশ্ন ছিল কি করে এই তিনটে গুণকে অতিক্রম করা যায় –

**মাঞ্চ যোহব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে। স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে।।২৬।।**

অব্যভিচারী ভক্তিযোগের দ্বারা সেবার কথা বলা হচ্ছে। এখানেও ভক্তিযোগের কথা বলা হচ্ছে। কিভাবে ভক্তিযোগ করা হয় সেটা আগেও এসেছে, পঞ্চদশ অধ্যায়েও আবার ভগবান আলোচনা করবেন। কিন্তু এখানে একটা খুব মূল্যবান গভীর তাৎপর্যপূর্ণ শব্দকে ভক্তিযোগের আগে ব্যবহার করা হয়েছে, সেটা হল অব্যভিচারী। ব্যভিচার বলতে বোঝায় দুই ধরণের আচরণ, আচরণে যখন বৈষম্য এসে যায় তখনই সেই আচরণকে বলছেন ব্যভিচারী আচরণ। স্বামী নিজের স্ত্রীকে ছেড়ে বা স্ত্রী নিজের স্বামীকে ছেড়ে অন্য নারী বা পুরুষের কাছে যখন যায় তখনই সাধারণ অর্থে এটাকে ব্যভিচার বলা হয়। কিন্তু ভক্তিশাস্ত্রে অব্যভিচারী ভক্তি বলতে বোঝায়, এক ইষ্টকে ধরে তাঁতেই পুরো মনকে লাগান আর অন্য কোন দিকে মনকে না যেতে দেওয়া। এই বিষয়টা এর আগেও অনেকবার এসেছে, যেমন বলেছিলেন *মচ্চিত্তঃ মৎপরঃ*, যে ঠিক ঠিক আমার ভক্ত তার মন সব সময় আমাতেই থাকে, আমাকেই শ্রেষ্ঠ ও সবার উপরে মনে করে। একটা ছেলে একটা মেয়ের প্রতি আসক্ত হতে পারে, একটা চাকর তার মালিকের প্রতি পুরো আনুগত্য ঢেলে দিতে পারে কিন্তু এরা দুজনেই জানে যে ভগবান মেয়েটি বা আমার মালিকের থেকে উপরে। কিন্তু আমাদের সমস্যা হচ্ছে, আমাদের মনটা পড়ে থাকে সাংসারিক বস্তুতে, মনে করি ঠাকুরই সর্বশক্তিমান, তিনি সবার উপরে, কিন্তু যখন ঠাকুরের উপর নির্ভর করার সময় আসে তখন ঠাকুরের থেকে ছিটকে আরও চারটে দিকে ছুটে যাই। ছুটে গিয়ে একবার এই বাবাজীকে ধরছি, একবার তান্ত্রিকের কাছে যাচ্ছি, একবার জ্যোতিষিদের কাছে যাচ্ছি, যার ফলে আমাদের কিছুই হয় না। এটাই ব্যভিচারী ভক্তি, কিন্তু যখন বলব হে ঠাকুর তুমিই আমার সব, তুমিই একমাত্র এই সঙ্কট থেকে আমাকে পরিত্রাণ করতে পার, আমি তোমাকে ছাড়া আর কারুকে জানিনা, চিনিনা, বুঝিনা, তুমিই আমার একমাত্র ভরসার স্থল, একমাত্র আশ্রয়, এইটাই অব্যভিচারী ভক্তি। এই অব্যভিচার ভক্তির কথা মানুষকে বলে বোঝান যাবে না। মানুষের যখন অব্যভিচার ভক্তি হয়, একটা জিনিষকেই যখন ঠিক ঠিক ধরে রাখে তখনই তার জীবনটা একটা শক্ত ভীতের উপর দাঁড়িয়ে যায়। অনেক সময় মনে হয় এই বুঝি আমার সব কিছু নাশ হয়ে গেল, গেল গেল মনে হলেও কিন্তু শেষ মুহুর্তে তার জীবনের সব কিছুই আবার ঠিক পথে চলে আসে। কারণ মানুষের মন যখন একমুখী হয়ে যায় তার শক্তি তখন প্রচণ্ড ভাবে বেড়ে যায়। সাধারণ দৃষ্টি দিয়েও যদি দেখা যায় তাতেও এই একই পরিণাম দেখা যায়, যেমন কোন স্ত্রী যদি তার দুশ্চরিত্র, লম্পট স্বামীকে ভেবে থাকে আমার স্বামীই আমার সব কিছু, আমার যা কিছুই হয়ে যাক আমার স্বামীকে ছাড়া আমার আর কোন গতি নেই, দেখা যায় কিছু হোক আর না হোক একটা সময়ে, অন্ততঃ শেষ জীবনেও তার স্বামী এসে তার পায়ে পড়বেই পড়বে, পড়তে বাধ্য।

একমুখীনতার একটা আলাদা শক্তি আছে কিনা। ভক্তির ক্ষেত্রেও ঠিক তাই হয়, আর ভক্তিতে যেটাতে খুব বেশি জোর দেওয়া হয় সেটা হল অব্যভিচারিণী, ব্যভিচার যেন কখনই না হয়। একবার শ্রীরামকৃষ্ণের পূজো করছি, আবার শ্রীরামের পূজো করছি, কিছু দিন পর আবার শ্রীকৃষ্ণেরও পূজো করছি, এইভাবে হয় না। একজনকে ধরে তাঁর উপর পুরো নির্ভর করে থাকতে হবে। আমরা এই ঠাকুরের উপর নির্ভর করছি আবার বিপদের সময় এদিক ওদিক ছোটাছুটি করছি। এই ঠাকুরকে ভালোবাসছি আবার জগতের প্রতিও আসক্তি রেখে দিয়েছি, এই করে ভক্তি হয় না। ঠাকুর মানে ঠাকুর, ব্যস্ অন্য আর কোন দিকে যাওয়া যায়ি নেই, কোন ছুটোছুটি নেই। বলছেন You cannot serve God and mammon at the same time। ঠাকুরকেও ভালোবাসব আর মানুষজনকেও কাছে টানব, এই ভাবে হবে না। যারা জগৎকেও ভালোবাসছে আবার ঈশ্বরকেও ভালোবাসে তাদের ভক্তি ব্যভিচারী ভক্তি হয়ে গেল। অব্যভিচারিণী মানে একমাত্র ঠাকুর, ঠাকুর ছাড়া আর কারুর প্রতি ভালোবাসা যাবে না। এঁরাই *স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে*, এঁরাই তিনটে গুণকে অতিক্রম করতে পারেন এবং ঈশ্বরের কৃপায় ব্রহ্মপদ পাওয়ার যোগ্য হয়।শেষে ভগবান বলছেন –

**ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহহমমৃতস্যাব্যয়স্য চ। শাশ্বতস্য চ ধর্মস্য সুখস্যৈকান্তিকস্য চ।।২৭।।**

ভগবান বলছেন, আমি হচ্ছি ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা, পরমাত্মার প্রতিষ্ঠা। এখানে এই কথা ভগবান বলতে চাইছেন যে, আমি আর ব্রহ্ম এক, মানে শ্রীকৃষ্ণ আর ব্রহ্ম এক। আচার্য শঙ্কর বলছেন – শক্তি আর শক্তিমান এই দুইজনই অভেদ। বড় বড় পণ্ডিতরা মনে করে আচার্য শঙ্কর ছিলেন কট্টর অদ্বৈতবাদী, কিন্তু এখানে আচার্যের ভাষ্যে তিনি যা বলছেন তাতে তাঁর প্রতি এই মন্তব্য কতটা অযৌক্তিক বোঝা যায়। আচার্য পরিষ্কার বলছেন যে, শক্তি আর শক্তিমান এক। ঠাকুরও বলছেন ব্রহ্ম আর শক্তি অভেদ। যারা ঠাকুরের কথা, আচার্য শঙ্করের অদ্বৈতবাদের তত্ত্বকে উল্টোপাল্টা অর্থ করে মাথায় নিয়ে ঘুরছেন তাদের জন্য আচার্যের ভাষ্যের এই কথাগুলোকে অনুধাবন করা উচিত – যে ঈশ্বরীয় দৈবী শক্তিতে ভক্তদের অনুগ্রহার্থে ব্রহ্ম প্রবর্তিত হন, মানে ব্রহ্ম নিজেই প্রবর্তিত হন, সেই শক্তি আর আমি ব্রহ্ম এক, কারণ শক্তি আর শক্তিমান এক। এই মন্তব্য করছেন আচার্য শঙ্কর নিজের গীতার ভাষ্যে, অথচ মুর্খ পণ্ডিতরা বলে বেড়ায় আচার্য শঙ্কর শক্তি মানতেন না। আচার্য শঙ্কর নিজেই বলছেন – ব্রহ্ম যিনি তিনিই প্রবর্তিত হন, মানে তিনি তাঁরই শক্তিতে অবতারাদি হন, আর শক্তি ও শক্তিমান এক। আমিই শ্রীকৃষ্ণ আর আমিই ব্রহ্ম, দুটো এক, আমি যে কৃপা করছি এটাই ব্রহ্মের শক্তি।

আবার আচার্য আরও বলছেন – সগুণ ব্রহ্মের নির্বিকল্প ভাব নির্গুণ ব্রহ্ম হলাম আমি। নির্গুণ ব্রহ্ম সগুণ ব্রহ্মেই প্রতিষ্ঠিত। মানে, শ্রীকৃষ্ণ, ঈশ্বর, সগুণ ব্রহ্ম, নির্গুণ ব্রহ্ম এঁরা একই। আচার্য শঙ্কর কোথাও সগুণ ব্রহ্ম আর নির্গুণ ব্রহ্মকে আলাদা করে দেখছেন না। যিনি নির্গুণ তিনিই সগুণ। আচার্য শঙ্করের এইসব কথা আবার ঠাকুরের মুখে বসে গেছে। আসলে আচার্য শঙ্কর আর শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে কোথাও ভেদ নেই। এই সগুণ ব্রহ্মের কি বৈশিষ্ট্য? অমরণধর্মা, এঁর কখনই মৃত্যু হয় না। *শাশ্বতস্য চ ধর্মস্য সুখস্যৈকান্তিকস্য চা*, এই সুখ অন্য কোথাও পাওয়া যায় না, এটাই চরম সুখ। তাঁর আর জন্মাদি হয় না, কারণ জন্ম-মৃত্যু হল তিন গুণের খেলা।

আমাকে নিয়েই একটা সিনেমা হয়েছে, আমিই সেই সিনেমাতে অভিনয় করেছি। আমাকে সেই সিনেমা দেখাতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সিনেমাটা অনেকক্ষণ দেখে দেখে আমি মুগ্ধ হয়ে গেছি। মুগ্ধ হয়ে আমি কখন চোখের জল ফেলছি, কখন হাসছি, কখন ভয় পাচ্ছি। হঠাৎ আমাকে কেউ মনে করিয়ে দিল – ওরে গাধা, এটাতো তোর নিজেরই ছবি। যেই বলে দিল আমারও সম্বিৎ ফিরে এলো, ও তাইতো এটাতো আমারই ছবি। অদ্বৈত মতে ঠিক তাই হয়। সেই শুদ্ধ ব্রহ্মই আছেন, তাছাড়া আর কিছু নেই। আর এই দৃশ্যগুলো তার সামনে উঠছে আবার বিলীন হয়ে যাচ্ছে। আমরা সবাই এই জগতে সিনেমা দেখছি, এই সিনেমা আমাদের নিজেদেরকে নিয়েই তৈরী। আমি এই জগতের সব কিছু দেখে কখন হাসছি, কখন কাঁদছি, তখন একজন এসে ধাক্কা মেরে বললো – আরে পাগলা তুই কাঁদছিস কেন, এগুলো তো সব তোরই ছবি। আমার চৈতন্য হয়ে গেলে আর আমি কাঁদব না, আমি আর সিনেমা দেখবো না। কিন্তু সিনেমা কি বন্ধ হয়ে যাবে? সিনেমা চলতেই থাকবে, বাকি যারা আছে তারা ঐ দৃশ্য দেখতে থাকবে আর তাতে তারা কখন হাসবে, কখন কাঁদবে। আমার মুক্তি হয়ে যাবে বাকিদের মুক্তি হবে না, অথচ আমরা সবাই এক। এই জিনিষটাকে বোঝানর জন্য নানা রকমের উপমার সাহায্য নেওয়া হয়। শাস্ত্রে বারংবার বলা হচ্ছে যে, আত্মার কখন জন্ম হয় না, মৃত্যু হয় না। তাহলে সামনে যা কিছু দেখছি এগুলো কি? এগুলো সবই কল্পনা। তাঁর সামনে এই দৃশ্যগুলো যেন ভেসে চলেছে। কিন্তু সাধারণ লোকেদের এই ধরণের কথা বলা যায় না, তাই সাধারণ লোকদের বোঝাতে গেলে আগে তার স্তর থেকেই তাকে বিভিন্ন ভাবে বোঝানর প্রযত্ন করতে হয়, এখানেও তাই জড়ের ধর্মটাকে পরিষ্কার করে দেওয়া হল। এখানেই আমরা চতুর্দশ অধ্যায় শেষ করলাম।

**ওঁ তৎসদিতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসুপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়ং যোগশাস্ত্রে
শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে গুণত্রয়বিভাগযোগো নাম চতুর্দশোহধ্যায়ঃ।।**

পঞ্চদশ অধ্যায়

# পুরুষোত্তমযোগ

১৩ই নভেম্বর ২০১০

আজ আমরা শ্রীমদ্ভাগবত গীতার পঞ্চদশ অধ্যায় আলোচনা করতে যাচ্ছি। পঞ্চদশ অধ্যায়ের শেষে এই অধ্যায়কে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ *গুহ্যতমং শাস্ত্রং* বলছেন। সমগ্র গীতাই হচ্ছে শাস্ত্র, অথচ ভগবান পঞ্চদশ অধ্যায়কে একটা বিশেষ শাস্ত্র রূপে উল্লেখ করছেন। আচার্য শঙ্কর তাঁর ভাষ্যেও এই একই কথা বলছেন, পুরো গীতাটাই শাস্ত্র কিন্তু সমগ্র বেদ, বেদের যা কিছু তত্ত্ব ও দর্শন তার সবটাই এই পঞ্চদশ অধ্যায়ে বীজাকারে দেওয়া হয়েছে। সেই কারণে এই অধ্যায়কে আলাদা করে শাস্ত্র বলা হচ্ছে। ঈশ্বরের তত্ত্বকে যদি জানতে হয় তাহলে এই পঞ্চদশ অধ্যায়কে সম্যক রূপে অধ্যয়ণ করলে সেই তত্ত্বটা জানা যায়। এখানে অন্য আর কিছু নেই, ঠিক ঠিক যে ঈশ্বরীয় তত্ত্ব, সেটাকেই এখানে আলোচনা করা হয়েছে। সেই কারণে এই অধ্যায়ের নামকরণ করা হয়েছে পুরুষোত্তমযোগ, পুরুষোত্তম বলতে এখানে ভগবান নারায়ণকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। যিনি সাক্ষাৎ নারায়ণ তাঁর স্বরূপের কথাই এখানে বর্ণনা করা হয়েছে। যেখানে শুধুই ঈশ্বরীয় তত্ত্বকে, স্বয়ং নারায়ণের স্বরূপ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে সেই কারণে এই অধ্যায়কে বিশেষ রূপে শাস্ত্র বলা হচ্ছে। শাস্ত্র বলতে যদিও আরও অনেক আনুষাঙ্গিক জিনিষ এসে পড়ে, কিন্তু এখানে শুধুই ঈশ্বরীয় তত্ত্বকে নিয়েই বলা হয়েছে, ঈশ্বর তত্ত্বের বাইরে এই অধ্যায়ে আর কিছু নেই। কিভাবে আধ্যাত্মিক জীবন যাপন করবে, কি ধরণের আচরণ করবে সেসব কথা কিছু বলা হচ্ছে না, কিন্তু ধরে নেওয়া হয়েছে যে আমি এই রকমটিই করব। এর মূল তত্ত্বকে বিশ্লেষণ করতে করতে এগুলোকে টেনে বার করে আনা যায়। আমাদের বেলুড় মঠের যেখানেই কোন ভাণ্ডারা হয় তখন এই পঞ্চদশ অধ্যায় পাঠ করা হয়। উত্তরাখণ্ডে যেখানে সাধুদের ভাণ্ডারা চলে সেখানেও তখন পঞ্চদশ অধ্যায় পাঠ করা হয়। পঞ্চদশ অধ্যায় পুরোপুরি ঈশ্বরের তত্ত্ব।

অধ্যাত্ম রামায়ণে শ্রীরামচন্দ্র যখন শবরীর সাথে ঈশ্বরের তত্ত্ব জ্ঞান নিয়ে আলোচনা করছেন তখন সেখানে তিনি শবরীকে নবধা ভক্তির কথা বলছেন। শুধু অধ্যাত্ম রামায়ণেই নয়, ভাগবত ও আমাদের অন্যান্য অনেক ভক্তিশাস্ত্রে এই নবধা ভক্তির কথা বহু ভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। নবধা ভক্তির শেষ যে ভক্তির কথা বলা হচ্ছে মানে নবম ভক্তির কথাতে ঈশ্বরের জ্ঞান, ঈশ্বরের তত্ত্ব কথা বলা হচ্ছে। ঈশ্বরের তত্ত্বজ্ঞানই ভক্তির পরাকাষ্ঠা। আচার্য শঙ্কর ঘুরে ঘুরে এই কথাই বলবেন, আর অধ্যাত্ম রামায়ণেও এই ঈশ্বরীয় তত্ত্বজ্ঞানকে বার বার সামনে নিয়ে আসা হয়েছে। সেখানে এইটাই বলা হচ্ছে যে, ভক্তির শেষ কথা হচ্ছে ঈশ্বরের তত্ত্বজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হওয়া। সেইজন্য অধ্যাত্ম শাস্ত্রে জ্ঞান আর ভক্তি বলে আলাদা কিছু হয় না। ভক্তির প্রাথমিক স্তর শুরু হয় অপরা ভক্তি দিয়ে, এত জপ করতে হবে, এত উপাচারে পূজা করতে হবে। অপরা ভক্তির অনুশীলন করতে করতে একটা অবস্থা হয় যখন ঈশ্বরের প্রতি ভালোবাসা উদয় হয়। ঈশ্বরের প্রতি ভালোবাসাটা যখন জেগে যায় তখন ঈশ্বরীয় কথা আলোচনা, তাঁর কথা শুনতে, ঈশ্বর সম্বন্ধে শাস্ত্র কি বলছে এইসবের দিকে মনটা আকৃষ্ট হয়। এইভাবে চলতে চলতে একটা সময় তার মনটা ঈশ্বরীয় তত্ত্বের দিকে চলে যায়। এরপর যখন ঈশ্বরের তত্ত্বজ্ঞানে সে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় তখন সেটা হয়ে যায় ভক্তির পরাকাষ্ঠা। ভক্তির পরাকাষ্ঠা হল ঈশ্বরীয় তত্ত্বজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হওয়া। একটা জিনিষকে জানা মানে সেই জিনিষটাকে ভালোবাসা, একটা জিনিষের সম্বন্ধে যতক্ষণ না জানা যায় ততক্ষণ সেই জিনিষকে কখনই ভালোবাসা যায় না। ঈশ্বরের ব্যাপারেও ঠিক তাই, ঈশ্বরের ব্যাপারে জানা, ঈশ্বরের তত্ত্বকে জানা আর ঈশ্বরকে ভালোবাসা এই দুটো জিনিষ এক, এই দুইয়ের মধ্যে কোন তফাৎ নেই। পঞ্চদশ অধ্যায়ে ঈশ্বরের এই তত্ত্বজ্ঞান নিয়েই আলোচনা করা হচ্ছে। এই তত্ত্বকে ধারণা করলেই আমাদের ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি লাভ হবে, এতেই আমাদের জ্ঞান হবে।

পঞ্চদশ অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকটি কঠোপনিষদ থেকে নেওয়া হয়েছে। গীতাতে কঠোপনিষদের প্রভাব খুব বেশি দেখা যায়। এখানে যেমন প্রথম শ্লোকটি কঠোপনিষদ থেকে নেওয়া হয়েছে, দ্বিতীয় অধ্যায়েও এবং আরও কয়েক জায়গায় কঠোপনিষদ থেকে বেশ কয়েকটি শ্লোককে নেওয়া হয়েছে। এই অধ্যায়েও প্রথম শ্লোকের ধারণাটা কঠোপনিষদ থেকে নেওয়া। এর আগে আগে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন যে, যারা কর্ম করে অর্থাৎ যারা কর্মী তাদের কর্মফল ভগবানের হাতে। আর যারা জ্ঞানমার্গের উপাসনে করে জ্ঞান লাভ করে, যে জ্ঞানরূপী ফল পায় সেটাও ভগবানের হাতে। শুধু তাই নয়, যারা ভক্তিযোগের মাধ্যমে ঈশ্বরের ভজনা করে, সেখানেও ঈশ্বরের কৃপাতে তারা গুণাতীত হয়ে যায় আর জ্ঞানপ্রাপ্তির দ্বারা মোক্ষ লাভ করে। এই মন্তব্যটি আচার্য শঙ্কর নিজে থেকে যোগ করেছেন। নবধা ভক্তিতে ভক্তি করতে করতে একটা অবস্থার পর তার অগ্রগতি যেন থেমে যায়। কোন স্তরে আটকে যাচ্ছে? ঠিক যেখানে কর্মীরা গিয়ে আটকে যায়। কর্মী কর্ম করতে পারে কিন্তু তার ফল ভগবান দেন, জ্ঞানীরা জ্ঞান বিচার করতে পারেন কিন্তু জ্ঞানীর যে জ্ঞান বিচারের ফল সেটা ভগবান দেন। আমি ভক্তি করে যেতে পারি কিন্তু আমার মধ্যে যে ভক্তি জিনিষটা জাগবে সেটা ভগবান দেন। কিভাবে দেবেন? তিনি ভক্তকে ত্রিগুণাতীত করে দেন। ত্রিগুণাতীত হয়ে গেলে জ্ঞানপ্রাপ্তি হয়ে যায়। কি জ্ঞান? তত্ত্বজ্ঞান, ঈশ্বরের জ্ঞানটা পেয়ে যায়। ঈশ্বরের জ্ঞানপ্রাপ্তি আর মোক্ষ একই জিনিষ, যেটা গীতায় বারবার বলা হয়েছে।

একজন লোক যদি কোন শহরে গিয়ে জানতে পারে যে, এই শহরে এমন একজন আছেন যাঁর এই ক্ষমতা, এই ঐশ্বর্য আছে, তখন ইচ্ছে হয় এই লোকটার ব্যাপারে একটু খোঁজ নিই, তাঁর সঙ্গে একবার দেখা করি, আলাপ কর ইত্যাদি। ঈশ্বর যিনি এত ক্ষমতাবান, যিনি কর্মীকে কর্মফল দিচ্ছেন, জ্ঞানীকে জ্ঞান দিচ্ছেন, ভক্তকে ভক্তি দিচ্ছেন, ইচ্ছে হবে যে ঈশ্বরের ব্যাপারে একটু খোঁজ নিই। যাঁর এতো বাগান, এতো বাড়ি, এত কোম্পানির কাগজ, সেই বাবুকে তো আগে জানতে হবে। এটাই ঈশ্বরের তত্ত্বজ্ঞান লাভের সদিচ্ছা। ঈশ্বরের তত্ত্বজ্ঞান জানার ব্যাপারে যাদের সদিচ্ছা হয়েছে তাদেরকে এই তত্ত্বজ্ঞান দেওয়ার আগে যে সংসার থেকে সে মুক্তি পেতে চাইছি সেই সংসারের স্বরূপটাকে আগে তাকে জানাতে হবে, তাই প্রথমে ভগবান সংসার রূপ বৃক্ষের বর্ণনা করছেন। এই সংসারও ঈশ্বরেরই, ঈশ্বর থেকেই এই সংসারের উৎপত্তি। সাধারণ মানুষ মনে করে ভগবান আকাশের উপরে কোথাও অবস্থান করে এই সংসারকে চালাচ্ছেন। এখন এই সংসারকে যদি একটা বৃক্ষ রূপে কল্পনা করা হয় তাহলে এই বৃক্ষের মূল উপরের দিকে চলে যাবে, কারণ সংসার ঈশ্বরের থেকেই এসেছে। সেইজন্য বিজ্ঞানীরা এই জগতের ব্যাপারে যে নানান রকমের সমস্যার কথা বলে, অনেক পরিবেশ বিজ্ঞানীরা বলছে যে জগৎ ধ্বংস হয়ে যাবে, নুস্টারডমও বলছে জগৎ ধ্বংস হয়ে যাবে, ইসলাম ধর্মেও বলছে জগতের প্রলয় হয়ে যাবে। এগুলো হিন্দুদের কাছে কোন সমস্যাই নয়। কারণ সৃষ্টি ঈশ্বরের, ঈশ্বরের ইচ্ছে না হলে কখনই এই জগৎ ধ্বংস হবে না। এগুলো অত্যন্ত গভীর তত্ত্বের কথা, সাধারণ মানুষকে এগুলো বোঝান যায় না, বুঝলেও সবাই বুঝতে চায় না। যাঁরা গভীর তত্ত্বের মধ্যে ডুবে থাকেন তাঁরা জানেন সৃষ্টি ঈশ্বরের, আমার আপনার কথায় এই জগতের কিছুই হবে না। প্রথম শ্লোকেই তাই ভগবান এই সংসার বৃক্ষের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলছেন –

শ্রীভগবানুবাচ

**ঊর্ধ্বমূলমধঃশাখমশ্বত্থং প্রাহুরব্যয়ম্। ছন্দাংসি যস্য পর্ণানি যস্তং বেদ স বেদবিৎ।।১।।**

বলছেন যে জিনিষটা যত সূক্ষ্ম হয় সেই জিনিষটা তত উপরে যায়। এমনিতেই ভারী জিনিষ নীচে চলে আস আর হাল্কা জিনিষ উপরে চলে যায়। জগতে দুটো বিপরীত ধর্মী আইন আছে, একটা হচ্ছে Law of gravitation আরেকটা হচ্ছে Law of buoyancy প্রথমটাতে নীচের দিকে নিয়ে আসে, দ্বিতীয়টাতে উপরের দিকে নিয়ে যায়। আগুন জ্বালালে ধুয়োটা উপরের দিকে যায়, আর ছাইটা নীচের দিকে পড়ে থাকে। এইটাই আশ্চর্যের, এই জগতে এক সঙ্গে দুটো জিনিষ চলছে। জাগতিক নিয়মে যেমন Law of gravitation এবং Law of buoyancy কাজ করছে, আমাদের প্রত্যেকের জীবনেও ঠিক এই একই জিনিষ কাজ করে। আমি যেটার জন্য যোগ্য মাধ্যাকর্ষণ আমাকে সেই দিকে নিয়ে যাবে। যদি বেশি নীচের দিকে চলে যায় তাহলে buoyancy আমাকে আস্তে করে উপরে তুলে দেবে। যেমন একটা বালতিতে বা নদীতে একটা রাবার বল জোর করে নীচের দিকে ফেলে দিলে কিছুক্ষণ পরে বলটা জলের উপরে ভেসে উঠবে। একটা পাথরকে যদি উপরে ছুঁড়ে দেন কিছুক্ষণ পরে সেটা নীচের দিকে চলে আসবে। জগতে সূক্ষ্ম জিনিষগুলি উপরে চলে যায় আর উপরেই থাকে। আমরা এর আগে আগে দেখেছি প্রথমে প্রকৃতি, প্রকৃতি থেকে মহৎ, মহৎ থেকে অহঙ্কার আর সবার শেষে আসছে এই স্থুল জগৎ। স্থুল জগতের যেটা সূক্ষ্ম সেটা উপরে থাকবে, যেটা তন্মাত্রা সেটা উপরে থাকে। তন্মাত্রা থেকে সূক্ষ্ম হচ্ছে অহঙ্কার, অহঙ্কারের থেকেও সূক্ষ্ম হচ্ছে মহৎ, মহতের থেকে সূক্ষ্ম হচ্ছে প্রকৃতি, মানে আস্তে আস্তে উপরের দিকে যাচ্ছে। ঈশ্বরের ব্যাপারে আমাদের যে ধারণা যে ঈশ্বর উপরে, সেটা এই কারণেই করা হয়। কারণ যে জিনিষটা যত সূক্ষ্ম সেই জিনিষটা তত উপরে যায়। ঈশ্বর হচ্ছেন সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম, সূক্ষ্ম থেকেও সূক্ষ্মতর, সেইজন্যই ঈশ্বরকে উপরের দিকে কল্পনা করা হয়। সাধারণ মানুষ ঈশ্বরকে যে উপরের দিকে কল্পনা করে এটা কিছু ভুল কল্পনা নয়। সেই উপর থেকেই সব নীচের দিকে নেমে আসছে। এই কারণে এখানে বলা হচ্ছে *ঊর্ধ্বমূলম্*।

এই সংসারটাকে একটা অশ্বত্থ গাছের সাথে তুলনা করা হয়েছে। যেভাবে আমরা গাছপালা দেখি এখানে সেইভাবে দেখানো হচ্ছে না, এই অশ্বত্থ গাছের শেকড়টা ওপরের দিকে আর তার শাখা প্রশাখা সব নীচের দিকে বিস্তৃত হয়ে আছে। কিছু কিছু বইতেও এই রকম ছবি দেওয়া থাকে, শেকড়টা ওপরে আর তার ডাল-পালাগুলো নীচের দিকে ছড়িয়ে আছে। আমরা মনে করি আমাদের দুটো আর এই শরীর আমাদের মাথাটাকে বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। আসলে কিন্তু তা নয়, এই মুণ্ডুটাই আমাদের শরীরকে বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। এটাই ঠাকুর বলছেন – দ্যাখো কি আশ্চর্য, মাথাটা গোড়া সেটা চলে গেছে ওপরে। গাছের শেকড় কেটে দিলে গাছ যেমন মরে যায়, মানুষের ক্ষেত্রেও তাই হয়, মুণ্ডুটা কেটে দিলে সব শেষ। মানুষের হাত পা কেটে গেলেও বেঁচে থাকে কিন্তু মুণ্ডু কাটা পড়লে সব শেষ। গাছের বেলায় এর ঠিক উল্টো গাছের শেকড় নীচের দিকে। শেকড় না থাকলে গাছ বাঁচতে পারবে না। হিন্দুদের কাছেই এইটাই একটা মস্ত বড় পরম্পরা, এখানে ব্রাহ্মণরা হচ্ছেন বিদ্যার মুণ্ডু, ভারতের একশ কোটি লোকের মুর্খতাকে ব্রাহ্মণরা কয়েকজন মিলে বয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। ক্ষত্রিয়রাও তাই, একশ কোটি লোকের কাপুরুষতাকে এই কয়েকজন মিলে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে। বৈশ্যরাও ঠিক তাই, কয়েকজন মিলে পুরো দেশের অর্থনীতির চক্রটাকে ঘোরাচ্ছে। এর ফলে পুরো শরীরটা, মানে ভারতের পুরো জনসম্পদ এগিয়ে গেছে আর তার মুণ্ডুটা পেছনে পেছনে হাঁটছে।

এইটাই অবাক কাণ্ড, মুণ্ডুটা উপরে। এই সংসারটা হচ্ছে অশ্বত্থ বৃক্ষের মত, এখানে *ঊর্ধ্বমূলমধঃশাখম্* বলা হচ্ছে সংসারবৃক্ষের শেকড়টা উপরের দিকে, আর *অধঃশাখম্* এর ডালপালাগুলো আবার নীচের দিকে। *প্রাহুরব্যয়ম্*, এটাকে অব্যয় বলা হয়। এই বৃক্ষকে যদি কেটেও দেওয়া হয় আবার নতুন বৃক্ষ বেরিয়ে আসবে। ঠিক ঠিক অর্থে যাকে বিনাশ বলা হয় সেই অর্থে হিন্দুরা মনে করে বিনাশ বলে কিছু নেই। মাকালী সব সময় সৃষ্টি করেই চলেছেন, সেইজন্য বলছেন *অব্যয়ম্*। এই সৃষ্টি কখনই শেষ হয় না। বিজ্ঞান যে বলছে জড়ের বিনাশের পর সব এণার্জিতে চলে যাবে। হিন্দুরাও ঠিক এইটাই বলছে, সব মানুষ, জীব, জগৎ যদি লয় হয়ে যায় তাহলে সব এণার্জিতে চলে যাবে। প্রকৃতির দৃষ্টিতে তো কিছুই পাল্টাল না। আমাদের যদি বলা হয় কাল থেকে আমরা এই ঘরে না বসে পাশের ঘরে বসব, তখন আমাদের ঘরটা পাল্টে গেল কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সলার, বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্যাকাল্টি, এখানকার ছাত্র এগুলো বিশ্ববিদ্যালয়ের দৃষ্টিতে কিছুই পাল্টায়নি। সব কিছু বিশ্ববিদ্যালয়ের এই বিল্ডিং এর মধ্যেই আছে এই বাড়ির বাইরে কিছুই চলে যাচ্ছে না। আগে আমাদের বিএড কলেজে ক্লাশ হত, এখন এই বাড়িতে ক্লাশ হচ্ছে, বেলুড় মঠের দৃষ্টিতে কি কিছু পাল্টাল? কিছুই পাল্টাল না। আমাদের ক্ষেত্রে ব্যয় হতে পারে, কিন্তু এই সংসার বৃক্ষ চলতেই থাকবে, এটাকেই বলা হচ্ছে *অব্যয়ম্*। পরিবেশবিদরা বলছেন সেভ্ আর্থ, কিন্তু পৃথিবী যেমন আছে তেমনই থাকবে, তুমি নিজেকে আগে সেভ্ কর। পৃথিবীকে আমরা কি বাঁচাব, মাঝখান থেকে তুমিই মারা যাবে, তাই আগে তুমি নিজেকে বাঁচাও।

এই সংসার বৃক্ষের বাকি যা কিছু আছে সবই ক্ষণ, মানে কিছুক্ষণের জন্য থাকে। সংস্কৃতে আগামীকালকে বলা হয় 'শ্ব', অ+শ্ব, মানে যেটা আগামীকাল পর্যন্ত থাকবে না। ন শ্ব অপি স্থাতা, কাল পর্যন্ত যেটা থাকবে না, এটাকে বলা হয় অশ্বথ, যেটা স্থায়ী নয়। এই সংসার কাল পর্যন্ত থাকবে না, অথচ আমাদের মন এমন ভাবে সংস্কারাচ্ছন্ন হয়ে আছে যে, এই মুহুর্তে যেটা আছে সেটাকে মনে করছি এটা কালকেও থাকবে। আজ আকাশ মেঘলা, মনে হচ্ছে আগামীকালও আকাশ মেঘলা থাকবে। তত্ত্বগত ভাবে বলে দেওয়া যাচ্ছে যে কাল আকাশ পরিষ্কার হয়ে যাবে, কিন্তু মন এই জিনিষটাকে ঠিক মানতে চায় না। যার জন্য দেখা যায় যখনই শরীর খারাপ করে, কোন অজানা কারণে যদি শরীরের একটা ব্যাথা হয় প্রথমেই মনে হবে এই ব্যাথা বুঝি আর কোন দিন ভালো হবে না। যখন টাকা-পয়সা আসে, মনে আনন্দ হচ্ছে, তখন মনে হয় এই আনন্দটা বুঝি চিরদিন এইভাবেই থাকবে। কিন্তু আমরা সাবধান হই না, কর্মফলের জন্য এই সুখটা এসেছে, কর্মফল শেষ হয়ে গেলে এটা যে থাকবে না, এই জিনিষটাকে মন মানতে চায় না। দুঃখের ক্ষেত্রেও একই জিনিষ, কর্মফলের জন্য দুঃখ এসেছে, কর্মফল কেটে গেলে দুঃখটা থাকবে না। একজন ব্যক্তির যেটা ঠিক ঠিক অবস্থা সেই অবস্থা কখনই পাল্টে যায় না, বাকি যে জিনিষগুলো আছে সেগুলো সব ছায়ার মত আসে আর যায়। আমাদের ঠিক ঠিক অবস্থা হচ্ছে আত্মস্বরূপ, আত্মা যদি না মানি তাহলে মন বুদ্ধির উপর যা কিছু আছে সবই অস্থায়ী। শরীর আজকে ভালো আছে, কাল খারাপ হবে। আজকে মন খারাপ, কাল বলছি আমার মনে শান্তি, বয়স হলে বলি আমার বুদ্ধি আর কাজ করছে না। আমরা বলি দাঁত থাকতে দাঁতের মর্যাদা দিই না, ভাবি দাঁত চিরকালই বুঝি ভালো থাকবে। কিন্তু কিছুই ভালো থাকবে না। আমাদের মস্তিষ্ক এমন ভাবেই তৈরী করা হয়েছে যে, আমাদের আগামীকালের জন্য প্রস্তুতি নিতেও দেবে না। যারা আগামীকালের জন্য প্রস্তুতি নিয়ে নেয়, যারা জানে আগামীকাল এগুলো ভালো থাকবে না, তারাই বুদ্ধিমান। যারা বোঝে একশ বছর পর শরীরের কোন ইন্দ্রিয়ই এই রকম থাকবে না, তারা আরও বুদ্ধিমান। তখন তারা করে কি, একটা সময়ে ঈশ্বরের প্রতি মনটা দিয়ে দেয়। সেইজন্য সময় থাকতে থাকতে আমাদের এমন প্রস্তুতি নিয়ে নিতে হবে যাতে একটা অবস্থাতে আমার জ্ঞানপ্রাপ্তি হয়ে যায়।

আবার বলা হচ্ছে যে, এই সংসার বৃক্ষ অনাদি কাল থেকে চলে আসছে, এর শেষ হবার কিছু নেই। এইজন্য বলা হচ্ছে আদি অন্ত রহিত, এই কারণে বলা হচ্ছে *অব্যয়ম্*। ব্যয় মানে খরচ হয়ে যাওয়া। যদি বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের দৃষ্টিতে দেখি এই ব্রহ্মাণ্ড কখন নাশ হয় না। যখন বলে ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হল, আসলে তখন পদার্থ জন্ম নিল। কোন বিজ্ঞানী কোন দিন বলতে পারবে না যে, বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড শূন্য থেকে সৃষ্টি হয়েছে। কোথাও না কোথা থেকে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আসছে, সেটাকে এণার্জিই বলি আর যাই বলি, সেটাও ভগবানেরই। বিজ্ঞানীরা যেভাবে সৃষ্টির কথা বলে তাতে খ্রীশ্চান বা মুসলমানদের সমস্যা হয়, কিন্তু তাতে আমাদের হিন্দুদের কোন সমস্যাই হয় না। কারণ পদার্থ যেটা সেটা ভগবানের আর এণার্জি সেটাও ভগবানের। পদার্থের উপরে যদি বুদ্ধিকে নিয়ে আসা হয় তখন সেটাও ভগবানের। ভগবানের বাইরে কিছুই নেই। তবে হ্যাঁ, প্রকাশের তারতম্য হতে পারে, আর এই হওয়াটা কোন আশ্চর্যের কিছু নয়। প্রকাশের ক্ষেত্রে হিন্দুরা বলে প্রকাশ সব সময়ই হয়ে চলেছে। মুহুর্তে একদিকে যেমন কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডের জন্ম হচ্ছে, অন্য দিকে কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডের প্রলয় হয়ে চলেছে।

এই সংসার বৃক্ষকে সব সময় রক্ষা করা হচ্ছে। বৃক্ষকে যেমন তার বক্কল, তার পাতা রক্ষা করে। পাতা যদি না থাকে গাছ মরে যাবে। সংশ্লেষক পদ্ধতি থেকে শুরু করে যা কিছু হচ্ছে সবই গাছের পাতার মধ্য দিয়ে হয়। এই সংসার রূপী বৃক্ষের রক্ষণ বেক্ষণের কাজ হচ্ছে ছন্দের মাধ্যমে, *ছন্দাংসি যস্য পর্ণানি*, এই সংসারবৃক্ষের পাতা হচ্ছে ছন্দ। ছন্দ বলতে সব সময় বোঝায় বেদকে, ঋক, সাম আর যজুর্বেদ। ছন্দ যদি না হয় তাহলে সেটা অথর্ববেদ হয়ে যায়। যখনই ছন্দের কথা বলা হয় তখন এর অনেকগুলো নাম এসে যায়, তার মধ্যে একটা নাম হল ত্রয়ি, তিন রকমের ছন্দ। মূল কথা হল বেদ আছে বলে এই সংসারের রক্ষা

হচ্ছে। বেদের কাজ হচ্ছে মানুষকে ঋতম্ শেখান, মানে ধর্ম শেখায়, কোনটা ধর্ম কোনটা অধর্ম বেদ শিক্ষা দিচ্ছে। মানুষ যখন ধর্ম পালন করে, অধর্ম থেকে দূরে থাকে, এই আচরণ দিয়ে সংসারের রক্ষা হয়। যখন মানুষ বেদকে অস্বীকার করে অধর্ম করতে শুরু করে তখন সংসার অধঃপতনের দিকে চলে যায়। পরিবেশ বিপন্ন বলে যে আজকে সবাই চিৎকার করছে, এর কারণ মানুষ বেদ ও তার ধর্ম থেকে সরে এসেছে। আমরা যদি মরেই যায় তখন সংসার থাকলো কি না থাকলো তাতে আমার আর কি। আলোচনা আমাদেরকে নিয়েই হচ্ছে। এখানে পৃথিবী গুরুত্ব নয়, সংসারও গুরুত্ব নয়, গুরুত্ব হচ্ছে আমরা। আমিই যদি নাশ হয়ে যাই তাহলে আর কিছুই রইল না। আমার নাশ কি করে রক্ষা পাবে? বলছেন, বেদ থেকে, *ছন্দাংসি যস্য পর্ণানি*, বেদ হল এই বৃক্ষের পাতা। *যস্তং বেদ স বেদবিৎ*, সংসারবৃক্ষের এই ব্যাপারগুলোকে যিনি ঠিক ঠিক জানেন, যেমন এই বৃক্ষের শেকড় কোথায়, বৃক্ষটা কি, পাতাগুলো কি ইত্যাদি, অর্থাৎ বৃক্ষের যা কিছু দিয়ে একটা বৃক্ষের পরিচয় সেই প্রত্যেকটি জিনিষের কি কি কাজ, এটাকে যিনি জেনে গেছেন তিনিই বেদবিৎ। এই বেদার্থকে যিনি ঠিক ঠিক বোঝেন, এই সংসার বৃক্ষের প্রকৃত রূপ কি আর এর মূলই বা কোথায়, এই বৃক্ষকে রক্ষণাবেক্ষণ কে করছে, এগুলোকে যিনি জেনে গেছেন তিনিই হচ্ছে প্রকৃত সর্বজ্ঞ। এর পরের শ্লোকেও কবিতার ভাষাতে এই সংসার বৃক্ষের বর্ণনা করছেন –

**অধশ্চোর্ধ্বং প্রসৃতাস্তস্য শাখা**
**গুণপ্রবৃদ্ধা বিষয়প্রবালাঃ।**
**অধশ্চ মূলান্যনুসন্ততানি**
**কর্মানুবন্ধীনি মনুষ্যলোকে।।২।।**

এই সংসারবৃক্ষের মূলটা উপরের দিকে, নীচের দিকে এই বৃক্ষের বিস্তার হচ্ছে। কিভাবে বিস্তার হচ্ছে? সত্ত্ব, রজো ও তমো এই তিন গুণ, যেটা মূলে রয়েছে, ঐ মূলকে নিয়ে এই বৃক্ষ স্থূল ভাব প্রাপ্ত হচ্ছে। গাছের শেকড় মাটির নীচে থাকে বলে আমরা গাছের শেকড় দেখতে পাইনা, ঠিক তেমনি ভগবানকেও দেখা যায় না আর তাঁর যে তিনটে গুণ আছে সত্ত্ব, রজো আর তমো, এই তিনটে গুণকেও দেখা যায় না। শুদ্ধচৈতন্য যে স্থূল ভাব প্রাপ্ত হচ্ছেন সেটা এই তিন গুণের মাধ্যমেই প্রাপ্ত হন। তখনই নীচের দিকে বৃক্ষের বিস্তার হতে শুরু করে। এখানে মনে রাখতে হবে এটা পুরোপুরি উপমা, বেদান্তের একটা তত্ত্বকে বোঝানোর জন্য এই উপমার সাহায্য নেওয়া হয়েছে।

এই সূক্ষ্ম থেকে স্থূল ভাব প্রাপ্ত হওয়ার পর কি হচ্ছে – *গুণপ্রবৃদ্ধা বিষয়প্রবালাঃ*, ভোগের বিষয় এসে যায়, ভোগের বিষয়গুলো হচ্ছে *প্রবালাঃ*, প্রবালা হচ্ছে গাছের ডালে যখন কচি কচি পাতা বেরোয়, জল আলো বাতাস পেয়ে পেয়ে পাতাগুলো বড় হতে থাকে। এই কচি কচি পাতা গুলোকে বলা হচ্ছে *বিষয়প্রবালাঃ*, ছোট ছোট ভোগের বিষয়, ভোগের তৃষ্ণা যত মিটতে থাকে ততই সংসারের বিস্তার হতে থাকে। *প্রসৃতাস্তস্য শাখা*, মানে এর ডাল-পালাগুলো চারিদিকে ছড়িয়ে রয়েছে। কোথায় ছড়িয়ে রয়েছে? মনুষ্যলোক থেকে শুরু করে নীচের দিকে একেবারে পাতাল পর্যন্ত, আর উপরের দিকে একেবারে ব্রহ্মা পর্যন্ত। এর সবটাই হচ্ছে এই সংসার সৃষ্টির বিস্তার। মানুষ যখন নানা রকমের কর্ম করে, তখন ঐ কর্মফল অনুসারে বিভিন্ন রকমের দেহ তৈরী হয়। ভালো কর্ম করল দেবতার শরীর পেল, খারাপ কর্ম করল নীচ যোনিতে চলে গেল। এই যে নানা রকমের দেহের উৎপত্তি হচ্ছে এগুলো সব একেকটা যেন *প্রবালাঃ*, বাংলায় কিশলয় বা ফেকড়ি বলে। এইভাবে বিভিন্ন মানুষ, বিভিন্ন জীব নানা রকমের কর্ম করছে, যেমন যেমন কর্ম করছে তেমন তেমন তার দেহ বা যোনি প্রাপ্তি হয়। একটা শরীর ছিল, সেটা থেকে বেরিয়ে গেল, বৃক্ষের একটা ডাল যেন শুকিয়ে গেল। আমি আপনি মরে গেলাম, বৃক্ষের দুটো পাতা যেন শুকিয়ে গেল। ততক্ষণে আমি আরেকটা শরীর নিয়ে নেলাম, মানে গাছের আরেকটা পাতা গজাল। এই চক্র অনাদি কাল থেকে চলে আসছে। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে ব্রহ্মা থেকে স্থাবর পর্যন্ত বিরাট দেখছি বলে আমরা কিছু বুঝতে পারছি না, কিন্তু পয়েন্ট সাইজে এর যদি একটা ছবি নেওয়া যেত তাহলে আমরা অবাক হয়ে যেতাম। গাছের এখানে ওখানে আলো জ্বলছে, তার মধ্যে একটা আলো নিবে গেল, মানে একটা ব্রহ্মাণ্ড শেষ হয়ে গেল, একটা জায়গায় আলো জ্বলে উঠিল, মানে আরেক জায়গায় আরেকটি নতুন ব্রহ্মাণ্ডের সূচনা হল। এর কোন একটা ছোট্ট জায়গায় যদি ম্যাগনিফাই করে দেখা হয় তখন দেখা যাবে এর মধ্যে বিগবাঙ হল, অন্য কোথাও ব্ল্যাকহোল হল। এটাকেও যদি ম্যাগনিফাই করা হয় তখন সেখানে দেখা যাবে লোক জন্মাচ্ছে, মরছে। এই সবটাকে মিলিয়েই আবার যদি দেখা হয় তখন এটাই সৃষ্টি।

*অধশ্চ মূলান্যনুসন্ততানি*, আবার বলছেন নীচের দিক যেখানে যেখানে যাচ্ছে সেখানেও মূল বেরোতে থাকে। বটবৃক্ষ বা অশ্বত্থবৃক্ষের আবার শেকড় ঝুলে নীচের দিকে নামতে থাকে। শেকড় ঝুলে আসা মানে আবার নতুন দেহ আসছে, নতুন দেহের আবার নতুন ধর্মাধর্ম রূপী নানান রকমের কাজ শুরু হয়। যখন নতুন কাজ হতে শুরু হল সেখান থেকে আবার নতুন শেকড় ছাড়তে শুরু করে। সেইজন্য এই সৃষ্টির শেষ হয় না। প্রথম যখন সৃষ্টি হয়েছে তখন গুটি কয়েকজন ঋষি মুনিরা ছিলেন। তাঁরা আবার নতুন চিন্তা ভাবনা করলেন, সেখান থেকে আরও সৃষ্টি বেড়ে গেল। সেই ভাবে হতে হতে এখন আমি হয়েছি, এখন আমিও চিন্তা ভাবনা করছি, এই চিন্তা ভাবনা করতে করতে আমিও আবার একট দেহ ধারণ করব, আরেকজনও চিন্তা ভাবনা করছে, তারও পর পর দেহ হতে

থাকবে। একেকটা দেহ হচ্ছে মানে, সেখান থেকে আরেকটা দেহ হচ্ছে, তার মানে একটা একটার সাথে জড়িয়ে যাচ্ছে। এই জড়ানোর প্রক্রিয়ার যেন কোন শেষ নেই। এটা একটা তত্ত্বের কাব্যিক বর্ণনা। প্রথমে মনুষ্যলোকে ধর্মাধর্ম বিষয়গুলো যেন এগিয়ে এগিয়ে চলে, আর সেই বিষয়কে পূরণ করা রূপ ইচ্ছে যেন তার পেছনে পেছনে চলতে থাকে। এটাকেই এখানে বলা হচ্ছে *কর্মানুবন্ধীনি*, কর্মের অনুবন্ধন। তার মানে, এই যে বিষয় বাসনাগুলো রয়েছে এর ঠিক পেছনে পেছনে কর্মগুলো, মানে পাওয়ার ইচ্ছে, সরে যাওয়ার ইচ্ছে এগুলো ছুটতে থাকে। এই সব কর্মের যে কর্মফল আবার তার পেছনে পেছনে চলতে থাকে। সেই কর্মফলানুসারে নতুন নতুন দেহ সৃষ্টি হতে থাকে। ঐ দেহের জন্য আবার নতুন ধর্মাধর্ম শুরু হয়।

এই দুই নং শ্লোকের কোন ভালো ভাষ্যকে ঠিক ঠিক অনুধাবন করে বোঝার চেষ্টা করতে গেলে প্রথমে সবারই মাথা গুলিয়ে যাবে। গোটা ব্যাপারটাই যেন একটা মহা জাল। পুরো সৃষ্টি, এই সংসার যেন এক বিরাট জালের মত। জালের যে ছোট ছোট খোপ আছে সেখানে থেকে আবার একটা জাল বেরিয়েছে, সেই জালের যত খোপ আছে সেখান থেকে আবার অসংখ্য জাল বেরিয়েছে। এই সংসার অরণ্যে যদি একবার কেউ ঢুকে পড়ে তাহলে আর সে এই অরণ্য থেকে বেরোতে পারবে না। এখানে অরণ্য ঠিক বলা যাবে না, কারণ অনেক গাছ নিয়ে অরণ্য হয়, এখানে বলছে সংসারবৃক্ষ, সৃষ্টি বলতে একটি গাছ। কিন্তু কিভাবে হচ্ছে? ঈশ্বরের থেকে শেকড় বেরিয়েছে, তিনটে গুণ সত্ত্ব, রজো আর তমো হল এর শেকড়। শেকড় থেকে এগোতেই এসে গেল বিষয়, বিষয়ের পেছনেই সব জিনিষগুলো ছুটতে শুরু করল। যেমনি ছুটতে শুরু করল, তখন তার কর্মফল রূপে নতুন নতুন দেহ সৃষ্টি হল। সব দেহগুলো যেন একটা একটা করে বৃক্ষের নতুন নতুন শাখা তৈরী হল। আর প্রত্যেক মুহূর্তে নতুন নতুন বিষয় বেরোচ্ছে। টিভিতে কত নতুন নতুন চ্যানেল আসছে, একেকটা চ্যানেলে কত নতুন নতুন প্রোগ্রাম সৃষ্টি হচ্ছে, যত নতুন নতুন প্রোগ্রাম তৈরী হচ্ছে তত আমার সেগুলো দেখতে ইচ্ছে করছে। যেই আমার মনে ইচ্ছের জন্ম হল তখন সেখান থেকে নতুন শেকড় বেরিয়ে গেল।

বলছেন যে, কর্ম সব জায়গাতেই হয়, দেবলোক, স্বর্গলোক, পাতাললোক সব জায়গাতেই কর্ম হয় কিন্তু মনুষ্যলোকে যেন বেশি দেখা যায়। সব লোকেই সংসারবৃক্ষের বিস্তার হচ্ছে, কিন্তু মনুষ্যলোকে ইন্দ্রিয়গুলো এমন ভাবে থাকে আর বিষয়গুলো এমন ভাবে থাকে যে এখানে কাজ করা খুব সহজ, সেইজন্য অন্যান্য লোকের থেকে মনুষ্যলোকে কর্ম বেশি হয়। যেমন মনুষ্যেতর প্রাণীদের মধ্যে তাদের একেকটা ইন্দ্রিয় খুব প্রবল থাকে আবার কিছু কিছু ইন্দ্রিয় দুর্বল থাকে। কিন্তু মানুষের প্রত্যেকটি ইন্দ্রিয় সমান ভাবে চলে। তবে মানুষের বুদ্ধি ইন্দ্রিয় সব থেকে প্রবল। তাই মানুষ যে লোকেই থাকুক না সেই লোকেই কর্মের প্রাধান্য থাকবে। এর ফলে এই মনুষ্যলোকে সংসারবৃক্ষ আরও জটিল আকার ধারণ করে। স্বর্গলোক হচ্ছে ভোগভূমি, এখানে ভোগের প্রাধান্য হওয়াতে এখানে কর্ম বেশি হয় না। সেইজন্য মনুষ্যলোককে বলা হচ্ছে *কর্মানুবন্ধীনি মনুষ্যলোকে*। মনুষ্যলোকে আছে বিষয়, বিষয়ের পেছনে পেছনে চলছে কর্ম, তার পেছনে পেছনে চলেছে কর্মের ফল। কারণ বিষয়কে পেতে চায় বলে কর্ম হচ্ছে। কর্ম যখনই করা হয় তখন তার একটা কর্মফল হবে, কর্মফল হলেই নতুন দেহ আসবে, নতুন দেহ যখন হবে তখন আবার সেও বিষয়ের পেছনে দৌড়াবে, তখন আবার নতুন কর্ম হচ্ছে। এই প্রক্রিয়া এইভাবেই লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি যুগ ধরে অনন্ত কাল থেকে চলছে তো চলছেই, এর আর থামার কোন লক্ষণই নেই। এর ফলে সংসারবৃক্ষ অত্যন্ত জটিল থেকে জটিলতর হয়ে যাচ্ছে। এর পরের শ্লোকে বলছেন –

**ন রূপমস্যেহ তথোপলভ্যতে**
**নান্তো ন চাদির্ন চ সম্প্রতিষ্ঠা।**
**অশ্বত্থমেনং সুবিরূঢ়মূল-**
**মসঙ্গশস্ত্রেণ দৃঢ়েন ছিত্বা।।৩৩।।**

*ন রূপমস্যেহ তথোপলভ্যতে*, এই যে সংসারবৃক্ষের বর্ণনা করা হল, আর যেভাবে বর্ণনা করা হয়েছে সেইভাবে এই সংসারবৃক্ষের রূপকে দেখা যায় না। কেন দেখা যায় না? সংসারটা হচ্ছে আসলে মরীচিকা। মরুভূমিতে যেভাবে মরীচিকাকে দেখা হয়, ঠিক তেমনি এই সংসারকে আমরা যেভাবে দেখছি আসলে যে রকমটি দেখা যাওয়ার কথা সেই রকম দেখা যায় না, এটাকে অন্য রকম দেখায়। কি রকম দেখছি? এই বিল্ডিং, এই ঘর, ঘরের মধ্যে আমরা বসে আছি, পাখা ঘুরছে, লাইট জ্বলছে, এইভাবেই দেখছি। কিন্তু আমরা যে বৃক্ষরূপ সংসারের মধ্যে রয়েছি, যেখানে প্রতিদিন নতুন নতুন কিশলয় আসছে, নতুন নতুন ভোগবৃত্তি আসছে, নতুন নতুন কর্ম সৃষ্টি হচ্ছে, কর্ম থেকে কর্ম ফল, আবার সেই কর্ম ফল থেকে আবার কর্ম, এইভাবে আমরা এই সংসারকে দেখতে পাইনা। কে দেখতে পায়? যাঁরা জ্ঞানী পুরুষ তাঁরাই দেখতে পায়। যশোধারার যখন সন্তান হল তখন বাড়িতে সবারই খুব আনন্দ হল কিন্তু গৌতম বুদ্ধ বললেন – আমার আবার একটা নতুন বন্ধন সৃষ্টি হল। কিন্তু বাকি সবাই আনন্দ করছে, জিনিষটা যেমন বাকিরা সেই রকম দেখতে পাচ্ছে না। ঠিক তেমনি, আমরা যেভাবে এই জগতটাকে দেখছি, আসলে জগৎ ঠিক সেই রকম নয়।

জগৎটা কি রকম? এখানে গীতা শাস্ত্রে সংসার বৃক্ষকে যেভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, অথচ সেটাকে ঐভাবে দেখা যাচ্ছে না, কারণ এটা মরীচিকা। মরীচিকা হওয়ার জন্য এর কখনও অবসানও হয় না। এই বোর্ডে আমি একটা জিরো লিখলাম, এটাকে এখানে

সবাই দেখতে পাচ্ছে। এখন এই জিরোটা মুছে দেওয়া হল। এখন এখানে কেউ জিরো দেখতে পাচ্ছে না। কিন্তু আমরা কল্পনা করতে পারছি যে এখানে একটা জিরো ছিল। একটা জিনিষ যদি বস্তুত থাকে, সেটা যদি চলে যায় তখন সেটা সবার জন্যই চলে গেল। কিন্তু আমাদের মনের মধ্যে যদি সবার সমষ্টি কল্পনা থাকে, তার মধ্যে একজনের কল্পনা যদি ভেঙ্গে যায় তখন বাকিদের ক্ষেত্রে কল্পনাটা তো ভাঙছে না। আমাদের সবারই জলতৃষ্ণা পেয়েছে, আমি এক গ্লাশ জল পান করতেই আমার জলতৃষ্ণা চলে গেল, কিন্তু বাকিদের জলতৃষ্ণা থেকে যাবে। এই মরীচিকাই হল মূল সমস্যা। আমরা সবাই ভুল দেখছি, এইটাই জাদু, এইজন্য একে বলছেন মায়া। এখন স্বামী বিবেকানন্দের মায়াটা বন্ধ হয়ে গেল, তখন তিনি আগে যে জগতকে দেখেছিলেন এখন তিনি সেই জগতকে আর জগৎ দেখছেন না, জগৎকে বৃক্ষ দেখছেন। কিন্তু আমাদের চোখে কি এই জগৎকে বৃক্ষ দেখছি, আমাদের সেই ভ্রমটা কি চলে গেছে? কোন দিনই যাবে না। বোর্ডে যদি জিরো লেখাটা বস্তুত থাকত তাহলে কিন্তু জিরোটা মুছে দেওয়ার পর সেটা সবার জন্যই চলে যেতে। সংসার যদি বস্তুত থাকত তাহলে সংসার চলে গেলে সবার জন্যই চলে যেত। এটা হচ্ছে বেদান্তের একটি অত্যন্ত বিরাট গভীর যুক্তি। এই সংসারের মায়া যার জন্য চলে গেল তখন সেটা তার জন্যই চলে গেল, কিন্তু বাকিদের জন্য থেকে যাবে। বাকিদের জন্য থেকে যাচ্ছে বলেই এই সংসার আরামসে চলতেই থাকবে, কোন দিনই এর নাশ হবে না। অনেক বেশি লোকের যদি মায়া চলে যায়, মুক্তি হয়ে যায়, জ্ঞান হয়ে যায় তখন ভগবান আরও কিছু নতুন শরীর তৈরী করে নেবেন। আবার তাদের সমষ্টি মায়া চলতে থাকবে, সেটা আর কোন দিন থামবে না।

সংসার কোথা থেকে শুরু হল আর কত দূর গেল, এটাকে ঠিক ঠিক বিচার যদি করতে বসা হয় তখন তার কোন হিসেবই করা যাবে না। এর কোথায় আদি কোথায় অন্ত একে বিচার করে কোন দিনই জানা যাবে না। মরীচিকাকে যদি বিচার করে জানতে চাই তখন এই মরীচিকা কোথা থেকে শুরু হল আর কতদূর যাবে বলা যায় না। এইজন্য কি হচ্ছে, *চ সম্প্রতিষ্ঠা,* যার আদি নেই অন্ত নেই তার আবার মাঝখান কি, উপর কি আর নীচই বা কি। এগুলো খুবই সূক্ষ্ম যুক্তি। এগুলোকেই বিচার করে দেখতে হয়। একটা সান্ত জিনিষকে বলা যেতে পারে এর আদি এখান থেকে আর অন্তটা সেখানে, কিন্তু এই সংসারবৃক্ষকে হিসেব করে বলা যাবে না যে, এর আদি এখানে অন্ত সেখানে। সেইজন্য আমাদের পুরানে ব্যাখ্যা করে বলা হচ্ছে যে সৃষ্টি এই সময় থেকে শুরু হয়েছিল। এটা কেবলমাত্র একটা ধারণা করা জন্য বলা হচ্ছে। এই সংসারবৃক্ষ চিরদিনই এই রকম চলছে আর এই রকমই চিরদিন চলতে থাকবে, মায়াতেই এটা চলছে। তার আদি নেই, একে কখন অন্ত করা যাবে না। কেন অন্ত করা যাবে না? কারণ যেটা আমার ক্ষেত্রে শেষ হয়ে যেতে পারে কিন্তু বাকিদের ক্ষেত্রে সেটা থেকে যাবে। কিন্তু এটা আবার বস্তুত নেই। সেইজন্য একে বলা হচ্ছে *ন চ সম্প্রতিষ্ঠা,* যার আদি নেই অন্ত নেই তার আবার মধ্য কি।

এখন এখানে বলা হচ্ছে যার আদি নেই অন্ত নেই মধ্য নেই, কিন্তু ব্রহ্মও তো তাই, ব্রহ্মের আদি নেই, অন্ত নেই মধ্য নেই। একাদশ অধ্যায়ে ঈশ্বরের বর্ণনা করতে গিয়ে ঠিক এইটাই বলা হয়েছিল – *নান্তং ন মধ্যং ন পুনস্তবাদিং,* আপনার আদি নেই, অন্ত নেই, মধ্য নেই। আবার এখানে মায়াকেও ঠিক তাই বলা হচ্ছে, কিন্তু বলছেন *ন চ সম্প্রতিষ্ঠা*। ঈশ্বর আর মায়াতে এইটাই তফাৎ। ঈশ্বরের আদি, অন্ত ও মধ্য নেই মায়ারও আদি, অন্ত ও মধ্য নেই, কিন্তু ঈশ্বর হচ্ছেন প্রতিষ্ঠিত আর মায়া হচ্ছে *ন চ সম্প্রতিষ্ঠিতা,* বাস্তবিক অর্থে তার কোন সত্তা নেই। কারণ এটা মরীচিকা। সেইজন্য এই সংসারবৃক্ষকে কল্পনা করা হয় মরুভূমি আর তার মরীচিকা রূপে। মরুভূমিটা ঠিক ঠিক সত্য, তারও আদি নেই অন্ত নেই আর তার যে মরীচিকা তারও আদি নেই অন্ত নেই কিন্তু মরীচিকার প্রতিষ্ঠা নেই। তার প্রমাণ, মরীচিকাতে যে জল দেখা যাচ্ছে সেই জলে মরুভূমির একটি বালিকণাও ভিজবে না, ঐ জলপান করে আমার এক ফোঁটা তৃষ্ণাও মিটবে না। এই যুক্তির মধ্যে সূক্ষ্ম ভাব রয়েছে। এই সূক্ষ্ম ভাবটা কোথা থেকে আনা হচ্ছে? একজন যাঁর মায়া কেটে গেছে, তাঁর কথাকে আশ্রয় করে এই যুক্তিটাকে দাঁড় করান হচ্ছে। যুক্তিটা কোথায় দাঁড় করান হচ্ছে? যখন এই মায়া কেটে গেল, সব বুঝে গেল তখন দেখতে পায় যে এর মধ্যে একটা কিছু গোলমাল আছে। সেইখান থেকে চিন্তা করে দেখছেন যে এর আদি নেই অন্ত নেই, ঈশ্বরের যে প্রতিষ্ঠা আছে এই মায়ার সেই রকম কোন প্রতিষ্ঠা নেই।

এমন একটা মাছ যার না আছে মুড়া, না আছে ল্যাজা, না আছে পেটি। এই বৃক্ষও ঠিক তাই। অথচ এর শেকড় গুলো অত্যন্ত দৃঢ় – *সুবিরূঢ়মূলম্*। দৃঢ় কেন, এই শেকড় বাইরে কিছু নেই, মানুষের মনের মধ্যে একেবারে গেঁথে রয়েছে। এই শেকড় গুলো কোন্ শেকড়? মূলটা নয়, অশ্বত্থ বৃক্ষের যে ঝুরি নেমে এসেছে। বোটানিক্যাল গার্ডেনে যে বট গাছটা আছে এর এত ঝুরি বেরিয়ে আছে যে এর আসল শেকড়টাই এখন হারিয়ে গেছে। সৃষ্টির যে আসল রূপ ভগবানই হারিয়ে গেছেন, বাকি সব কিছু থেকে গেছে। ভাবতেও অবাক লাগে, তিন সাড়ে তিন হাজার বছর আগে আমাদের পূর্বজ ঋষিরা এইসব মূল্যবান তত্ত্ব উপলব্ধি করে আমাদের জন্য লিপিবদ্ধ করে গেছেন।

*অশ্বত্থমেনং সুবিরূঢ়মূলম্* আমার আপনার কাছে এই অশ্বত্থবৃক্ষ সুদৃঢ় হয়ে গেঁথে আছে, আমার ভেতরে এর নড়াচড়ার কোন লক্ষণই নেই। কিন্তু ভাই এই সংসারবৃক্ষের যে শেকড় আমার ভেতরে সুদৃঢ় ভাবে গেঁথে রয়েছে, সেই শেকড়কে উৎপাটিত করে এই

সংসারবৃক্ষ থেকে বেরোতে হবে। কিভাবে বেরোন যাবে? তখন বলছেন – *অসঙ্গশস্ত্রেণ দৃঢ়েন ছিত্বা*। এর শেকড়কে কেটে উড়িয়ে দিতে হবে। কেটে উড়িয়ে দিতে হবে, অথচ আশ্চর্য যে গাছটারই কোন অস্তিত্ব নেই। চরমে এইটাই দেখে যে, গাছটা কোন কালেই ছিল না। কিন্তু এই গাছকে তীক্ষ্ণ ধারাল অস্ত্র বা কুড়ুল দিয়ে কাটতে হবে। এই কুড়ুলটা কি? বলছেন *অসঙ্গ শস্ত্র*, অনাসক্তি, অনাসক্তি রূপী যে অস্ত্র সেটা দিয়েই এই বৃক্ষকে কেটে ফেলতে হবে। কিসের থেকে অনাসক্তি? বলছেন পুত্রৈষেণা, বিত্তৈষেণা ও লোকৈষেণা থেকে অনাসক্তি – সন্তানের ইচ্ছা, সম্পদের ইচ্ছা আর উচ্চলোকের ইচ্ছা। যখন আমি ঠিক করে নিলাম জগতের কোন কিছুই আর আমি চাই না, তখন এই অস্ত্রটা দৃঢ় হয়ে গেল। *অসঙ্গশস্ত্র* আর দৃঢ় এই দুটো এক সঙ্গে চলবে। অসঙ্গ মানে অনাসক্তিকে আমরা প্রায়ই মনে করি যে, আমার ঘরবাড়ি, পরিজন আর কোন কিছুই ভালো না লাগাকে, শুধু এটাকেই অনাসক্তি বলছেন না। এই ভালো না লাগার মধ্যে *দৃঢ়েন* নেই, *দৃঢ়েন* কিভাবে বলছেন? পরমাত্মার সম্মুখে গিয়ে নিজেকে বারবার দৃঢ় করে দাঁড় করান আর বিবেক, বৈরাগ্য ও অভ্যাস রূপী পাথরের উপর ঘষে ঘষে এই অনাসক্তির অস্ত্রটাকে সুতীক্ষ্ণ ধারাল করে নিতে হবে, তবেই এই সংসারবৃক্ষকে ছেদন করা যাবে।

যেমন কোন নব্বুই বছরের বুড়োবুড়ি দম্পতিকে বলা হয় আপনার কি সন্তান চাই? নব্বুই বছরের বুড়োবুড়ি কি কখন বলবে আমার সন্তান চাই? তাহলে তো বলতে হবে এদের পুত্রৈষেণা কেটে গেছে। মরার মুখে যদি বলা হয় আপনাকে কয়েক লাখ টাকা দেব? সে লোক এখন টাকা নিয়ে কি করবে, তাহলে কি তার বিত্তৈষেণা চলে গেছে? নাম-যশ তার এখন কিছুই দরকার নেই। তাহলে তো সে পুরো অনাসক্ত হয়ে গেল। কিন্তু আদপে তার কিছুই হয়নি, আসলে তার ইন্দ্রিয় এখন আর তাকে মদত দিচ্ছে না। কোন ভাবে এই নব্বুই বছরের বুড়োবুড়িকে যদি একটা ভালো শরীর আর যৌবন দিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে এরাই আবার ঐ শরীর নিয়ে ভোগের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। কোথায় ধরা পড়বে? বারবার পরমাত্মার সম্মুখে গিয়ে নিজের মনকে দাঁড় করানোতে। ঠাকুরের ছবির সামনে প্রণাম করা নয়, একেবারে পরমাত্মার সামনে গিয়ে নিজেকে দাঁড় করাতে হবে। ঈশ্বর চিন্তন তৈলধারাবৎ চলছে, আর বিবেক বৈরাগ্যের অভ্যাস সর্বদা করে চলেছে। যে বুড়ো হয়ে গেছে তার পরমাত্মার ধারণাই নেই, আর বিবেক বৈরাগ্যও নেই, অভ্যাসের তো কোন প্রশ্নই নেই। কর্ণশুদ্ধির জন্য বয়স কালে দীক্ষা নিয়ে কিছুই হয় না। কম বয়সে, যৌবন অবস্থায় যদি বলে আমি নিজের ইচ্ছেতেই এই সব এষণাকে ত্যাগ করলাম। শুধু সন্ন্যাসী হলেও হবে না, সন্ন্যাসী মানে সে বিয়েথা করেনি, কোথাও উপার্জন করার আর সুযোগ নেই, সন্ন্যাসী স্বর্গ নরকে বিশ্বাসই করে না তাই লোকৈষেণার প্রশ্নই হয় না। তাই বলে কি সে সংসারবৃক্ষকে কাটতে পারবে? না, পারবে না। তখনই পারবে, যখন মনটাকে সব সময় ঠাকুরের কাছে ফেলে রাখতে পারবে, আর তার সাথে বিবেক বৈরাগ্য। ঠাকুরই সব, তিনিই নিত্য আর বাকি সব অনিত্য এই বিবেককে জাগ্রত করে বৈরাগ্যের অভ্যাস করতে হবে। ঠাকুর যেমন বলছেন, ঈশ্বরই নিত্য বাকি সব অনিত্য। এই নিত্যানিত্যের বিচারের দ্বারা বিবেককে সব সময় জাগ্রত করে রাখতে হবে। তার মানে অনিত্য বস্তু থেকে নিজেকে সরিয়ে আনা আর নিত্য যিনি তাঁর কাছে গিয়ে বারবার দাঁড়ান। বিবেক বৈরাগ্যের এই যে অভ্যাস করা হচ্ছে আর সাথে সাথে এইটার উপরে দাঁড়িয়ে আমার পুত্রৈষেণা, বিত্তৈষেণা ও লোকৈষেণার ত্যাগ করাটাই ঘষামাজা। পরমাত্মার সম্মুখে বারবার দাঁড়িয়ে এই জিনিষ গুলো অভ্যেস করে করে সব কিছু যখন চিরতরে ত্যাগ হয়ে গেল, তখন পুরো এই সংসারবৃক্ষ উৎপাটিত হয়ে যাবে। সংসারবৃক্ষ উপড়ে যাওয়ার মানেটা হচ্ছে ভেতর থেকে যত রকমের চাহিদা আছে সব চলে গেল। যার ভেতর থেকে সব চাহিদার বীজগুলো চলে গেল এখন সে হয়ে গেল জিতেন্দ্রীয়। তার মানে এখন যদি তাকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বা অর্জুনের মত একটা সুন্দর শরীর দিয়ে দেওয়া যায়, তাহলেও তার মনে পুত্রৈষণা, বিত্তৈষেণা ও লোকৈষেণা আসবে না। এতক্ষণে গাছটা উপড়ে পড়ল। কিন্তু তাই বলে তার এখনও কিছুই হয়নি। এর পরে মনটাকে সহজে ভগবানের উপরে লাগাতে পারবে। এইবার আরম্ভ হবে তার আসল সাধনা। আধ্যাত্মিক সাধনা এইভাবেই শুরু হয়। মানুষ যখন জিতেন্দ্রীয় হয় তারপরেই ঠিক ঠিক আধ্যাত্মিক সাধনা শুরু হয়। তিন নং শ্লোকটা হচ্ছে সাধনার শুরুর কথা, এখানেই শেষ নয়, এইখান থেকেই শুরু হয়। এখন যে তুমি সব গাছটা উপড়ে ফেলে দিলে, তাতে কি হবে? ফেকড়িগুলো আবার এসে তাকে বেঁধে নেয়। ঠাকুর বলছেন – যে জিতেন্দ্রীয় সে কি না করতে পারে, তাঁর কৃপায় ঈশ্বর দর্শন পর্যন্ত হয়ে যেতে পারে। জিতেন্দ্রীয় হওয়াটা কিছুই নয়, তবে জিতেন্দ্রীয় না হওয়া পর্যন্ত আধ্যাত্মিক সাধনা শুরু করাই যাবে না। তিন নং শ্লোকটা বলা হয় জিতেন্দ্রীয়কে নিয়ে, যে অবস্থায় সে পুরো সংসারবৃক্ষকে উপড়ে ফেলে দিয়েছে। উপরে ফেলে দেওয়ার পর বলছেন –

**ততঃ পদং তৎ পরিমার্গিতব্যং**
**যস্মিন্ গতা ন নিবর্তন্তি ভূয়ঃ।**
**তমেব চাদ্যং পুরুষং প্রপদ্যে**
**যতঃ প্রবৃত্তিঃ প্রসৃতা পুরাণী।**।৪।।

এইবার জিতেন্দ্রীয়কে বলতে হবে আমি সেই বৈষ্ণবপদ, ভগবান বিষ্ণুপদে যে ভক্তি, সেই ভক্তিকে আমি খুঁজতে চাই, সেই ভক্তি আমি পেতে চাই। কেন? ঐ অবস্থা পেয়ে গেলে আমাকে আর জন্ম-মৃত্যু চক্রে ঘুরপাক খেতে হবে না, সংসারবৃক্ষের এই কুহেলিকার প্রবাহের মধ্যে আমাকে হারিয়ে যেতে হবে না। জিতেন্দ্রীয়তো এই সংসারবৃক্ষকে তার মন থেকে এবারকার মত তো

উপড়ে দিয়েছে, কিন্তু ভবিষ্যতে আবার বৃক্ষের জন্ম হওয়ার সেই সম্ভবনা থেকে গেছে। আমরা যে বুড়োবুড়ির উপমা দিলাম, এদের এই জন্মের মত সব কিছু শেষ হয়ে গেছে, কিন্তু বীজগুলো আগামী জন্মের জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে। এর থেকে বাঁচার জন্য যে বীজগুলো রয়ে গেছে সেটা জ্বালিয়ে পুড়িয়ে শেষ করে দিতে হবে। বীজগুলো কিভাবে দগ্ধ হবে? *ততঃ পদং তৎ পরিমার্গিতব্যং*, ঐ পরং ব্রহ্মপদ অন্বেষণ করতে হবে। *যস্মিন্ গতা ন নিবর্তন্তি ভূয়ঃ* যেখানে পৌঁছে গেলে আর প্রত্যাগমন করতে হবে না। *তমেব চাদ্যং পুরুষং প্রপদ্যে* সেই আদি পুরুষ ব্রহ্মকে আশ্রয় করার জন্য তাঁকে খুঁজছে। কিভাবে খুঁজছে? আমি সেই আদি পুরুষের শরণ নিলাম, *প্রবৃত্তিঃ*, মানে এই সংসার-প্রবাহ যে আদি পুরুষ থেকে নিঃসৃত হয়েছে, সেই আদি পুরুষের আশ্রয়ের জন্য আমি তাঁর শরণ নিলাম। সেই আদি পুরুষ কি রকম? যিনি এই সংসারকে জাদু খেলার মত সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন। *যতঃ প্রবৃত্তিঃ প্রসৃতা পুরাণী*, যেখান থেকে এই পুরো সৃষ্টি বেরিয়ে এসেছে। ঠাকুর বলছেন – বাবুর সঙ্গে যো সো করে যদি কোন রকমে সাক্ষাত করা যায়, দারোয়ানের গলাধাক্কা খেয়েই হোক আর যে করেই হোক, তখন বাবুই বলে দেবেন কত বাগান, কত কোম্পানির কাগজ আছে। এই সংসারবৃক্ষের মূলে যিনি বিদ্যমান, তাঁর কাছে কোন রকমে একবার পৌঁছে গেলে আর এই সংসারে ঘুরে ঘুরে আসতে হবে না।

কিভাবে তাঁকে পাওয়া যাবে, এই যেমন জিতেন্দ্রীয়ের ক্ষেত্রে বলা হল, যিনি জিতেন্দ্রীয় তিনি সংসারবৃক্ষকে উপড়ে দিয়েছেন, এই সংসার থেকে নিজেকে আলাদা করে নাও তারপর সেই পরমপদ, আদি পুরুষ যার থেকে এই সংসার রূপী বৃক্ষ বেরিয়ে এসেছে তাঁর অন্বেষণ করতে থাক, তাঁর আশ্রয়ে চলে যাও, তবেই তুমি সেখানে পৌঁছে গিয়ে তাঁর সাক্ষাৎ করতে পারবে। তারপর বলছেন –

**নির্মানমোহা জিতসঙ্গদোষা**
**অধ্যাত্মনিত্যা বিনিবৃত্তকামাঃ।**
**দ্বন্দ্বৈর্বিমুক্তাঃ সুখদুঃখসংজ্ঞৈ-**
**র্গচ্ছন্ত্যমূঢ়াঃ পদমব্যয়ং তৎ।।৫।।**

প্রকৃত আধ্যাত্মিক পুরুষ যিনি তাঁর বিশেষ কয়েকটি গুণের কথা এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে, এগুলো আমরা এর আগেও আলোচনা করেছি। সংক্ষেপে হচ্ছে *নির্মানমোহা*, নির্মান, নিঃ+মান্, মান-যশের কোন বাসনা নেই, কে আমাকে সম্মান দিল আর সম্মান দিল না, মানযশের মোহ থেকে যিনি মুক্ত হয়ে গেছেন। মোহ হচ্ছে যে জিনিষটা কাছে নেই সেই জিনিষটাকে পাওয়ার ইচ্ছা। *জিতসঙ্গদোষা*, আসক্তিরূপী দোষ থেকে যিনি মুক্ত। শুধু মোহ বলতে বোঝায় যে জিনিষটা নেই সেই জিনিষটার প্রতি মোহ, আসক্তিরূপী দোষ হচ্ছে যেটা আছে সেটাকে ধরে রাখার ইচ্ছা। আমাদের সবারই মনে এই ভয় সব সময় থাকে, আমার সন্তান আছে, সন্তান হয়তো আমাকে ছেড়ে চলে যেতে পারে, আমার স্ত্রী হয়তো আমাকে ছেড়ে চলে যেতে পারে, মানে যে জিনিষটা আমার কাছে আছে সেটা হারিয়ে যাবার ভয়, এটাই হল সঙ্গদোষ। যে জিনিষটা নেই সেটাকে পাওয়ার ইচ্ছা এটাই মোহ। এই দোষকে যিনি জয় করেছেন তিনিই সাধুপুরুষ, তিনিই *জিতসঙ্গদোষা*। এই জিনিষগুলোকে নিয়ে ত্রয়োদশ অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে, যেখানে নয় নং শ্লোকে বলা হয়েছিল – *অসক্তিরনভিষ্বঙ্গঃ পুত্রাদারগৃহাদিষু*। আর বলছেন, *অধ্যাত্মনিত্যা*, সব সময় অধ্যাত্ম চিন্তনে মনটা নিয়োজিত, অধ্যাত্ম চিন্তনের বাইরে আর কোন ধরণের চিন্তা থাকে না। *বিনিবৃত্তকামাঃ*, যত রকমের কামনা-বাসনা ছিল সব খসে পড়ে গেছে, আমাকে এটা করতে হবে সেটা করতে হবে এই ধরণের সব ইচ্ছা খসে গেছে। *দ্বন্দ্বৈর্বিমুক্তাঃ* সমস্ত রকমের দ্বন্দ্ব থেকে তিনি বেরিয়ে আসতে পেরেছেন, শীত-উষ্ণ, প্রিয়-অপ্রিয়, পাপ-পূণ্য এগুলোই দ্বন্দ্ব। এগুলো থেকে তার মন উঠে এসেছে, এগুলোর দিকে তাঁর আর মন যায় না। *সুখদুঃখসঙ্গৈজ্ঞঃ*, সুখ ও দুঃখ রূপ দ্বন্দ্বের পারে চলে গেছেন, মানে সব কিছুকে তিনি ছেড়ে দিয়েছেন।

সাধু আর সাধারণ ভক্তের এইটাই তফাৎ। সাধুর যদি কোন সুখ আসে, সে ভালো করেই জানেন যে আমার কপালে ছিল তাই এই সুখ এসেছে। যারা সাধু নন, সাধারণ লোক জানে যে এই সুখটা চিরস্থায়ী, এটাকে কিভাবে ধরে রাখা যেতে পারে তার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে যায়। যখন কষ্ট হয় তখন সাধু জানে যে এটা আমার কাছে কোন ভাবে ক্ষণিকের জন্য এসে গেছে, একটা সময়ের পর এটাও চলে যাবে। সাধারণ লোক ভাবে এই দুঃখটা কোন দিন আর যাবে না, এটা চিরস্থায়ী, বর্তমানটাই সাধারণ লোকের কাছে স্থায়ী। তখন এরা ভাবে আমার মত দুঃখ কেউ পায়নি, আমি হলাম অভাগা, আমার মত পোড়া কপাল এই জগতে আর একটিও নেই। কিন্তু যাঁরা আধ্যাত্মিক পথে আছেন তার বলেন সুখ-দুঃখ সব জগতের ওপরে, এগুলো আসবে আবার যাবে তাই এই দিকে তাঁরা কোন নজরই দেন না। তাঁর কাছে একটাই লক্ষ্য, কি লক্ষ্য? আমাকে এগোতে হবে। *ততঃ পদং তৎ পরিগার্বতব্যং*। কোথায় এগোতে হবে? *যস্মিন্ গতা ন নিবর্তন্তি ভূয়ঃ*, যেখানে গেলে আমাকে আর ফেরত আসতে হবে না, সেই লক্ষ্যের দিকে আমাকে এগোতে হবে। সেইজন্য আমাকে সুখ-দুঃখের দিকে মন দিলে চলবে না, প্রিয়-অপ্রিয়ের দিকে তাকিয়ে থাকলে চলবে না, কে আমাকে মান দিল কে আমাকে মান দিল না এগুলো থেকে বেরোতে হবে। এখানে জীবন আমাকে আমন্ত্রণ করে বলে, বাবা তুমি মন থেকে কি চাও খুলে বল। যখন আমি বলি আমি তো এখানে বেশ আছি, তখন ভগবান বলেন – ঠিক আছে তুমি এতেই মত্ত হয়ে থাক। যখন আমি বলি আমার আর চুষি কাঠি লাগবে না, চুষি কাঠি মানে সংসার রূপী এই খেলনা আমার আর লাগবে না। তখন

আমাকে সংসারের এই সুখ-দুঃখ, প্রিয়-অপ্রিয়, মান-অপমান এগুলোকে ছাড়তে হবে, এগুলো না ছাড়লে এগোতে পারব না। যারা মূঢ়, তারাই একমাত্র দুঃখ পায়। মূঢ় হচ্ছে, যারা মোহে পড়ে আছে, যার মন একেবারে মোহগ্রস্ত। কিন্তু যারা *অমূঢ়াঃ,* যাদের মোহ নাশ হয়ে গেছে তারাই একমাত্র সেই *পদমব্যয়ং তৎ* যে অবস্থার বর্ণনা করা হল সেই পরম পদ লাভ করেন। এখানে যে *পদমব্যয়ং তৎ* বলা হচ্ছে, এটি ঈশ্বরের যে অবস্থা সেটাকে অব্যয় বলা হচ্ছে, অন্য দিকে সংসারবৃক্ষকেও অব্যয় বলা হচ্ছে। তার কারণ ঈশ্বর অনন্ত তাই তাঁর মায়াও অনন্ত। মায়া সীমিত না অনন্ত, মায়া কোথা থেকে এলো এই ধরণের প্রশ্নের শেষ নেই, আর এর যুক্তিতর্কেরও শেষ নেই। মূল হচ্ছে আমি আছি আর আমার সমস্যা আছে, আমাকে এই সমস্যা থেকে বেরোতে হবে। অব্যয় পদের দিকে, ঈশ্বরের দিকে আমাকে এগোতে হবে। ঈশ্বরের দিকে যদি এগোতে চাও তাহলে এইটাই একমাত্র পথ। ঈশ্বরের কি ব্যাখ্যা, মায়ার কি স্বরূপ এই সব জানার পেছনে, যুক্তিতর্কের বিচারের মধ্যে গিয়ে মনকে সংশয় সাগরে নিমজ্জ করে কোন কাজ নেই। তবে হ্যাঁ, ঈশ্বরের ব্যাখ্যা একটু জানার দরকার আছে, একটু জেনে নিয়ে তোমাকে যা যা করতে বলা হবে করতে থাক, এর বেশি কিছু জানার আর তোমার দরকার নেই। সেইখানে যে যাব, সেই *পদমব্যয়ং,* ঈশ্বরের যে তত্ত্ব, ঈশ্বরের যে স্বরূপ, সেই রামকৃষ্ণলোকটা কি রকম? সেই রামকৃষ্ণলোক কি রকম বলতে গিয়ে পরের শ্লোকে ভগবান বলছেন –

**ন তদ্ভাসয়তে সূর্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ। যদ্ গত্বা ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম।।৬।।**

ঐ যে *পদমব্যয়ং* এর কথা বলা হচ্ছে, সেই রামকৃষ্ণলোক এত তেজোময় যে সেখানে সূর্য চন্দ্রও নিজকে প্রকাশ করতে পারেনা। যখন দিনের বেলা সূর্য পৃথিবীর আকাশে প্রদীপ্ত থাকে তখন সেখানে যতই হাজার ওয়াটের আলো জ্বালিয়ে দেওয়া হোক না কেন, ঐ আলো সূর্যের তেজোময় আলোকে ঢাকতে পারবে না। ভগবানের যে লোক সেটা এতো তেজোময় যে, পৃথিবীর আকাশের সূর্য কেন, এই রকম কোটি কোটি সূর্যও সেই তেজোময় আলোতে এমন ভাবে ঢাকা পড়ে থাকবে যে বোঝাই যাবে না যে এখানে কোটি কোটি সূর্য কিরণ দিচ্ছে। *যত গত্বা ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম,* দুটো গুণের কথা এখানে বলছেন। প্রথম হচ্ছে ভগবানের লোক এমন তেজোময় যে, যে কোন জাগতিক আলো সেখানে অর্থহীন হয়ে যায়। আমাদের পৃথিবীতে সূর্যের আলো সব থেকে জোরালো, এই আলোর সামনে আর কোন আলো দাঁড়াতে পারে না, কিন্তু এই সূর্যকেও ঈশ্বরের জ্যোতির মধ্যে ফ্যাকাসে দেখায়। এই লোকের আরেকটি গুণ যে, যদি এই লোকে আমি চলে যেতে পারি তাহলে আর আমাকে সেখান থেকে ফেরত আসতে হবে না।

আচার্য শঙ্কর তাঁর ভাষ্যে এখানে বলছেন, যেটাকে আমরা নিউটনের থার্ড ল অফ গ্র্যাভিটেশান বা ফার্স্ট ল অফ গ্র্যাভিটেশান বলতে পারি। বলছেন প্রত্যেকটি সংযোগ বিয়োগে পরিণত হয়। যে জিনিষটাই যায় সেটাই আবার ফেরত আসে। একটা জিনিষকে যখন উপরে ছুঁড়ে দেওয়া হয়, কিছুক্ষণ পরে সেটা আবার নীচে নেমে আসে। তাহলে গীতা কি করে এই কথা বলছে যে, ওখানে পৌঁছে গেলে আর ফেরত আসতে হয় না। আবার বলা হয় প্রত্যেকটি মিলনই পরে বিয়োগান্তক পরিণতিতে চলে যায়। তাহলে কি করে বলা হচ্ছে যে সেই পরম অব্যয় পদের সংযোগ হয়ে গেলে আর কখনই সেখান থেকে বিয়োগ হয় না?

গীতার পঞ্চদশ অধ্যায়ের এই সপ্তম শ্লোকটি, যত রকমের আধ্যাত্মিক দর্শন বা তত্ত্ব হতে পারে, সব দর্শন ও তত্ত্বের সার, সব তত্ত্বের আত্মা। বলছেন –

**মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ। মনঃষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি।।৭।।**

এই যে জড় ও চৈতন্য নিয়ে যে জগৎ, প্রকৃতি, এটা *মমৈবাংশো,* এটা আমারই একটা স্বরূপ। আচার্য শঙ্কর খুব মজার ছিলেন, তিনি দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত আর অদ্বৈত সবাইকে এক সঙ্গে নিয়ে চলেন। এই শ্লোকের ভাষ্যে বলছেন – তুমি এই অংশ বলতে, ভাব, অবয়ব, একদেশ যে অর্থেই নাও না কেন তাতে কিছু যায় আসে না। বক্তব্য হচ্ছে, চৈতন্য সত্তা যেটা সেটা ভগবানরই অংশ। ভগবান তাই বলছেন *মমৈবাংশো,* এটা আমারই অংশ। জীব কে? জীব মাত্র আমারই অংশ। একে এখন কেউ অংশ বলুক, ভাগ বলুক, অবয়ব বলুক, যেমন বলে অবয়ব অবয়বী সম্পর্ক, মানে গাছ আর পাতার যে সম্পর্ক, রামানুজের যে মত, যেভাবেই বলুক না কেন তাতে এর কিছুই যায় আসে না। আসলে আচার্য শঙ্করের যে দর্শন এটাই হচ্ছে গীতার ঠিক ঠিক দর্শন, এটা স্বামীজীও বলছেন।

যতক্ষণ আমি বলছি ব্রহ্মাই বস্তু বাকি সব অবস্তু, ব্রহ্মাই হচ্ছেন সেই চৈতন্য স্বরূপ, এই পর্যন্ত না হয় সব ঠিক আছে, আচার্যও এটাকে মেনে নিচ্ছেন। কিন্তু কেউ যখন প্রশ্ন করে, তাহলে এই জড় কোথা থেকে এলো? তখন উনি বলবেন এটা মায়া। ভালো করে চিন্তা ভাবনা করলে বোঝা যায় সত্যিই এটা মায়া ছাড়া কিছু হতেই পারে না, চিন্তা ভাবনা করে এই মায়াকে কিছুই বোঝার উপায় নেই। এখন ব্রহ্মের উপর একটা আবরণ পড়ে গেল, যেটাকে মায়া বলা হচ্ছে, সেটাতো তাঁরই শক্তি, ব্রহ্ম আর শক্তিতে কোন ভেদ নেই। কিন্তু মায়ার আবরণ এসে গেলেই ব্রহ্মকে অন্য রকম দেখাচ্ছে। আচার্য বলছেন – এই যে মায়ার ছায়া, এই ছায়ার এমনই খেলা যে সেখানে সেই ছায়ার মধ্যে মন তৈরী হয়ে যায়। এই মনের মধ্যে সেই ব্রহ্মই প্রতিবিম্বিত হচ্ছেন। আমরা

জানি এই পৃথিবীর জন্ম সূর্য থেকে, পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই সূর্যের জন্যই। এই পৃথিবীর মাটি দিয়ে যদি একটা ঘট তৈয়ার করা হয়, তাহলে এই ঘটটাও সেই সূর্য থেকেই এসেছে বলা যায়, ঘটের মধ্যে যদি জল রাখা হয় সেই জলও সূর্যেরই। এখন সেই জলপূর্ণ ঘটটি যদি সূর্যের আলোর মধ্যে রেখে দেওয়া হয়, তখন সেই জলে কি প্রতিবিম্বিত হবে? সেই সূর্যই প্রতিবিম্বিত হচ্ছে। কোথায় প্রতিবিম্বিত হচ্ছে? জলের উপর। জলটা কার? সূর্যের। ঘটটা কার? সূর্যের। কে প্রতিবিম্বিত হচ্ছেন? তিনি নিজেই প্রতিবিম্বিত হচ্ছেন। এবার জলটা শুকিয়ে বাষ্প হয়ে উবে গেল বা ঘটটা গেল ভেঙ্গে। এখন সেই প্রতিবিম্বিত সূর্যটা কোথায় গেল? কোথাও যায়নি, যেখানে ছিল সেখানেই আছে। সূর্য কখন নীচে আসেইনি, অথচ আমি ভাবছিলাম সূর্য এই ঘটের মধ্যেই আছে। আমি সূর্যের দিকে তাকাতে অভ্যস্ত নই, গরু, ভেড়া, ছাগলের মত মাটির দিকে তাকিয়েই চলি। এখন এখানে হাজারটা ঘট আছে, এবার আমি একটা একটা করে ঘটগুলোকে ভাঙ্গতে থাকলাম এখন এগুলোর মধ্যে যে সূর্য প্রতিবিম্বিত হচ্ছিল সেগুলো কোথায় গেল? কোথাও যায়নি, যেখানে ছিল সেখানেই আছে। যেটা ভাঙ্গলো সেটা কার? সেটাও তারই। এই যে মন, যেখানে চৈতন্য প্রতিভাসিত হয়ে আমি বোধ হচ্ছে, যারা জ্ঞানী তাদের যে ঈশ্বরের জ্ঞান হয়, সেই জ্ঞানটা কোথায় হয়? তার মনে জ্ঞান হয়। এই মনটা কার? সেটাও ভগবানেরই। সেই মনটা কোথায়? দেহে। দেহটা কোথা থেকে এসেছে? সেইখান থেকেই এসেছে। তাঁর বাইরে কিছু নেই। কিন্তু মনের মধ্যে যেটা হচ্ছে সেটা প্রতিবিম্বিত। ঠিক তেমনি, একটা কাঁচের গ্লাশে যে আকাশ আছে সেটা আবদ্ধ আকাশ। এবার এই কাঁচের গ্লাশটাকে ভেঙ্গে দেওয়া হয়, এখন কাঁচের ভেতরের আকাশটা কোথায় গেল? কোথাও যায়নি। যে আকাশে ছিল সেই আকাশেই আছে। সেইজন্য বলা হচ্ছে – এর কোন আসা যাওয়া হয় না। যতক্ষণ আমাদের বালবুদ্ধি বা মূঢ়বুদ্ধি থাকে ততক্ষণ আমরা মনে করি অমুক লোকটি মারা গেল। কিন্তু তাঁর কাছে কিছুই হচ্ছে না, তিনি দেখছেন তিনি কোথাও আসেনও না যানও না।

এই যখন আসা যাওয়া হয় তখন বলছেন – *মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ*, আমার যে অংশ বলছে সেটাও সেখান থেকেই আসে। আর কিভাবে আসে? ঐ যে প্রতিবিম্বিত সূর্য সে করে কি, *মনঃষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণী প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি*, প্রকৃতির মধ্যে যে পঞ্চ ইন্দ্রিয়গুলো আর তার সাথে যে মন আছে, এই ছয়টিকে আস্তে করে নিজের দিকে টেনে নিয়ে আসে। যেমন, আয়নাতে প্রতিবিম্বিত সূর্যের আলোকে দেখে ছটি বাচ্চা এসে সেখানে দাঁড়িয়ে পড়ল, এবার ছটি বাচ্চা মিলে ঐ প্রতিবিম্বিত সূর্যের আলোকে নিয়ে খেলা শুরু করল। এই যে প্রতিবিম্বিত সূর্য আর বাচ্চাগুলো কিন্তু আলাদা নয়, আর প্রতিবিম্বিত সূর্য ও আর আসল সূর্যও আলাদা নয় সবটাই এক। কিন্তু মাঝখান থেকে এমনই মায়া যে, তার দৌলতে প্রতিবিম্বিত সূর্য আর আসল সূর্যকে আলাদা মনে হয়। আর প্রতিবিম্বিত সূর্য নিজের চারপাশে যে ছয়টি বাচ্চা রয়েছে তাদের সাথে এক মনে করে। আর এই ছটি বাচ্চাও মনে করে এই প্রতিবিম্বিত সূর্য আর তারা এক। এই সব কিছু মিলিয়ে এমন এক জট পাকিয়ে যায় যে, এক অপরকে ছাড়তে পারেনা। এবার ছয় জনে মিলে ঐ আয়নাটাকে ছয় দিকে ধরল, তারপর বাচ্চাগুলো যেদিকে যাবে আয়নার প্রতিবিম্বকেও সেই দিকে যেতে হবে। কিন্তু প্রতিবিম্বটাই এই ছয়টি বাচ্চাকে টেনে নিজের কাছে নিয়ে এসেছিল। এটাই হচ্ছে মায়া, এগুলো হচ্ছে সৃষ্টির ব্যাখ্যা। এই উপমাগুলোকে খুব পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে ধরতে গেলে গোলমাল হয়ে যাবে।

কিন্তু মূল হচ্ছে এইটাই, চৈতন্য যখন প্রকৃতির মধ্যে খেলা করে, তখন প্রকৃতির সব কিছুকে নিজের মধ্যে টেনে নেয়। যখন পুরো জিনিষটাকে আকর্ষণ করে নিল, তখন দেহের মধ্যে যে বিভিন্ন গোলক আছে, চোখ, কান নাক ইত্যাদি, ঐ জায়গায় গিয়ে বসে যায়। এবার প্রকৃতির খেলা শুরু হয়ে গেল। এই চোখ, কান, নাক এগুলো কিন্তু ইন্দ্রিয় নয়, এগুলো হল ইন্দ্রিয়ের যন্ত্র, আসল ইন্দ্রিয় মস্তিষ্কে বসে আছে। চোখ যন্ত্র দিয়ে আসল ইন্দ্রিয় একটা দৃশ্যকে ধরে নিয়ে এসে তার সাথে নিজেকে সংযুক্ত করবে। জীবাত্মা সব ইন্দ্রিয়ের বিষয়গুলোকে ধরে নিয়ে কখন আনন্দ পাচ্ছে, কখন সুখ পাচ্ছে কখন আবার দুঃখ, হতাশায় ভেঙ্গে পড়ছে। জীবাত্মা আবার কে? জীবাত্মা সেই ব্রহ্মেরই প্রতিবিম্ব। এইবার শ্রবণেন্দ্রিয় কানের মাধ্যমে কাজ করতে থাকে, ঘ্রাণেন্দ্রিয় নাকের মাধ্যমে কাজ করছে, রসনেন্দ্রিয় জিহ্বার মাধ্যমে কাজ করতে শুরু করে। এইভাবে ইন্দ্রিয়গুলো কাজ করতে থাকে। চৈতন্য সত্তা, শরীর ও ইন্দ্রিয়ের সব খেলা মিলেমিশে একেবারে একাকার হয়ে যায়। আলাদা করে কাউকে বোঝবার কোন উপায় নেই। সেইজন্য সাধনার প্রাথমিক স্তরে আগে ইন্দ্রিয়ের গ্রাহক যন্ত্রগুলোকে বন্ধ করতে বলা হয়। বাইরের ইন্দ্রিয়কে দমন করার পর ভেতরে মস্তিষ্কে যে ইন্দ্রিয়গুলো বসে আছে সেইগুলোকে আটকান হয়। এই আটকানোর পর ইন্দ্রিয় আর মনকে আলাদা করা হয়। সবার শেষে মন আর আত্মাকে আলাদা করা হয়। তখন দেখে, আরে মনটাই তো সেই জিনিষ যেখানে শুদ্ধ চৈতন্য প্রতিবিম্বিত হচ্ছিলেন। বুঝে নেওয়ার পর এবার মনটাকেও ছাড়িয়ে গেল। এইখানেই খেলা শেষ। এখন সে কোথায় চলে গেল? কোথাও সে যায়নি, যেখানে ছিল সেখানেই আছে – *যদ্ গত্বা ন নিবর্তন্তে*। মনের মধ্যে যে চৈতন্য প্রতিবিম্বিত হচ্ছিল যেটাকে সে ভুল ভাবছিল সেটা বন্ধ হয়ে গেল। শাস্ত্রের এই জিনিষগুলোকে যদি আমাদের কেউ বুঝিয়ে দেয় তাহলে আমরা হয়তো বুঝে যাব, কিন্তু সাধন, ভজন, তপস্যা না থাকলে এগুলো ধারণা করা যায় না। তত্ত্ব কথা শুধু শুনে গেলে কিছুই হবে না, তার সাথে সাথে এগুলোও করতে হবে। গীতা হচ্ছে মোক্ষশাস্ত্র, সাধন-ভজন করা না থাকলে সব কথা বোঝা যাবে না। কখন সে আকর্ষিত করে?

**শরীরং যদবাপ্নোতি যচ্চাপ্যুৎক্রামতীশ্বরঃ। গৃহীত্বৈতানি সংযাতি বায়ুর্গন্ধানিবাশয়াৎ।।৮।।**

উপনিষদেই এই তত্ত্বগুলো এসে গিয়েছিল, যখন মানুষ দেহত্যাগ করে তখন কিভাবে এক শরীর থেকে আরেক শরীরে জীবাত্মা যায়। অনেক সময় জোঁকের উপমা নিয়ে আসা হয়। জোঁক পেছনের অংশ দিয়ে একটা জায়গার উপর আশ্রয় করে আছে, আর সামনের অংশটাকে সুরের মত ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখতে থাকে কোথায় আশ্রয় নেবে। যেই আশ্রয় পেয়ে গেল তখন পেছনের অংশটাকে ছেড়ে দেয়। এই তত্ত্ব অনুযায়ী একটা শরীর থাকতে থাকতে সে আরেকটা শরীরকে গ্রহণ করে নিয়ে সেখানে চলে যাবে। এর উপর আরেকটি তত্ত্ব আছে, যেটা এখানে বলা হচ্ছে – *বায়ুর্গন্ধানিবাশয়াৎ*। জীবাত্মার যখন দেহ থেকে বেরোবার সময় হয়ে গেল, তখন জীবাত্মা এই শরীর থেকে বেরিয়ে যায়, মানে এই পাত্রটা ভেঙ্গে গেছে। মস্তিষ্কের মধ্যে যে ছটি ইন্দ্রিয় ছিল সেগুলোকে সঙ্গে করে নিয়ে বেরিয়ে গিয়ে আরেকটা শরীর ধারণ করে। এই পাত্রটা এখন ভেঙ্গে গেছে। এর যে ছটি ইন্দ্রিয় আছে, এই ছয়টি ইন্দ্রিয়কে নিয়ে সে আরেকটা শরীরকে আশ্রয় করবে। মূল কথা হল যখন দেহত্যাগ হয় তখন জীবাত্মা ইন্দ্রিয়গুলোকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে যায়। এর ফলে এর আগের জন্মে যে সব সংস্কারাদি ও কামনা বাসনা ছিল, সেই সংস্কার আর প্রবৃত্তিগুলো চলতে থাকে।

কিন্তু গীতাতে এর আগেই বলছেন মৃত্যুর সময় আমি যেমনটি চিন্তা করব, আমার শরীর সেই রকমটিই হবে। এই রকম নানা রকমের তত্ত্ব হয়, কিন্তু আমরা কি করে বলব কোনটা ঠিক। নাসদীয়সূক্তমে তাই বলছেন – *কো অদ্ধা বেদ ক ইহ প্রবোচৎ*, এগুলো এই লোকে কেই বা প্রকৃষ্ট রূপে বলতে পারবে? কিছু কিছু জিনিষ দেখা যায় আবার কিছু কিছু জিনিষ দেখা যায় না। অথচ সব জিনিষরই ব্যাখ্যা দরকার, সেইজন্য আমাদের মুনি ঋষিরা ব্যাখ্যা দিয়ে গেছেন। আচার্য শঙ্করও বলছেন – একটা স্তর পেরিয়ে এলে এরপর আর কোন প্রশ্ন করা চলে না। বেশি প্রশ্ন করলে জিনিষটার আর তাৎপর্য থাকে না, সব কিছু হারিয়ে যায়, তাই অল্প একটু বুঝিয়ে দেওয়া হল, এরপর তোমাকে যা বলা হয়েছে তাই করতে থাক। মূল জিনিষ হল ব্রহ্মই হচ্ছেন তত্ত্ব, তিনিই নিত্য বাকি সব অনিত্য – এই জিনিষটার উপরেই সব সময় জোর দেওয়া হচ্ছে।

**শরীরং যদবাপ্নোতি যচ্চাপ্যুৎক্রামতীশ্বরঃ। গৃহীত্বৈতানি সংযাতি বায়ুর্গন্ধানিবাশয়াৎ।।৮।।**

এখানে যে ঈশ্বরের কথা বলা হচ্ছে, এই ঈশ্বর হচ্ছেন দেহাদিসংঘাতের যিনি মালিক। ভগবান যিনি প্রতিবিম্বিত চৈতন্যও তিনি। মৃত্যুর সময় তিনিই এই শরীর থেকে বেরিয়ে আরেকটি শরীরে যান। কিভাবে যান? *বায়ুর্গন্ধানিবাশয়াৎ*, যেমন বাতাস যখন প্রবাহ হয় তখন সে ফুল থেকে তার গন্ধটাকে টেনে নিয়ে চলে যায়। বাতাস যেমন সুগন্ধ দুর্গন্ধ সবই টেনে নিয়ে চলে যায়, ঠিক তেমনি, ঈশ্বর, যিনি জীবাত্মা তিনি এই ইন্দ্রিয়গুলোকে টেনে নিয়ে চলে যান। এইখানে স্বামীজী বারবার বলছেন, তন্মাত্রা কোন গুণ বা ধর্ম নয়, তন্মাত্রা হচ্ছে বস্তু কণা। তার ফলে, জীবাত্মা যখন চলতে থাকে তখন এক অপরকে ধরে থাকে। যখন বাপ আর বাচ্চা নদী পার হয় তখন বাপও বাচ্চাকে ধরে থাকে বাচ্চাও বাপকে ধরে থাকে, কেউ কাউকে ছাড়ে না। ঠিক তেমনি যখন জীবাত্মা এক শরীর থেকে বেরিয়ে চলে আসে তখন জীবাত্মা ঐ ইন্দ্রিয়গুলোকে ধরে রাখে আর ইন্দ্রিয়গুলোও জীবাত্মাকে ধরে রাখে। এইভাবে গিয়ে জীবাত্মা আরেকটা শরীরকে আশ্রয় করে নেয়। এটা ঠিক কম্প্যুটারের মত, কম্প্যুটারের মনিটর থেকে সব কিছু পাল্টে গেলেও তার হার্ডডিস্ক একই থাকবে, আর হার্ডডিস্কে যতই নতুন নতুন ডাটা, নতুন প্রোগ্রাম দিচ্ছে ততই তার জিনিষগুলো পাল্টাচ্ছে। এই ভাবে চলতে চলতে এক সময় মনিটর থেকে শুরু করে সব কিছু খারাপ হয়ে গেলে, সব ফেলে দিলাম, কিন্তু হার্ডডিস্কটা নিয়ে চলে গেলাম, সেটাকে আরেকটা কম্প্যুটারে বসিয়ে দেওয়া হল, আবার কম্প্যুটার চলতে থাকল, আবার নতুন নতুন ডাটা, প্রোগ্রামিং লোড হতে থাকল। কিন্তু কোন প্রোগ্রামে আগে যেটা ভুল ছিল সেটা এখানেও থেকে গেছে। মেমোরিতে যেমন ছিল তেমনই থাকবে। কম্প্যুটার হওয়াতে আমাদের শাস্ত্রগুলো বুঝতে সুবিধা হয়ে গেছে। আমি যতই পাল্টে যাই না কেন, কম্প্যুটারের কিবোর্ড, মনিটর মাউজ যেটাই খারাপ হয়ে যাক না কেন, তাতে কিছু যায় আসে না, আবার সব কিছু দোকান থেকে কিনে লাগিয়ে দেওয়া যাবে, কিন্তু হার্ডডিস্ক কখন পাল্টান যাবেই না। যা যা ভুল করেছি, যা যা ভালো করেছি সব প্রোগ্রাম এই হার্ডডিস্ক ধরে রেখেছে। এক কম্প্যুটার থেকে আরেক কম্প্যুটারে নিয়ে যাচ্ছে কিন্তু হার্ডডিস্ক যেমন থাকার তেমনই থাকছে। কি কি ইন্দ্রিয় জীবাত্মার সঙ্গে সঙ্গে শরীর থেকে বেরিয়ে চলতে থাকে?

**শ্রোত্রং চক্ষুঃ স্পর্শনঞ্চ রসনং ঘ্রাণমেব চ। অধিষ্ঠায় মনশ্চায়ং বিষয়ানুপসেবতে।।৯।।**

এই ছয়টি ইন্দ্রিয়, পঞ্চ ইন্দ্রিয় আর ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় হচ্ছে মন, এই ছয়টি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা জীবাত্মা *বিষয়ানুপসেবতে*, বিষয় ভোগ করে। ধরুন একটা জিনিষের প্রতি জীবাত্মা খুব আকৃষ্ট হয়ে গেছে, সেটাকে ভোগ করতে করতে তার চোখের ক্ষমতা খুব বাড়তে বাড়তে প্রচণ্ড ক্ষমতা এসে গেছে। জীবাত্মা, প্রতিবিম্বিত চৈতন্য যে, তার ঐটা দিয়ে ভোগ করতে করতে তারও খুব ভালো লাগতে শুরু হল। এবার এর পরে যে জন্মটা হবে সেখানে এমন যোনিতে যাবে যেখানে চোখের দৃষ্টি প্রচণ্ড শক্তিশালী হওয়া দরকার। তখন সে আরও বেশি করে ভোগ করবে, কিন্তু ভোগ করা মানে তার সাথে কষ্টটাও আসবে। তখন এমন একটা কষ্ট এসে গেল সেই সময় তার মধ্যে চেতনা এলো যে, না বাবা আমার আর এই জিনিষ ভোগের দরকার নেই। আবার সে কম্প্যুটারের প্রোগ্রামগুলোকে

পাল্টাতে শুরু করে দিল। এই করে করে তার জন্মের পর মৃত্যু, মৃত্যুর পর আবার জন্ম চলতেই থাকবে, সেই কারণে এই সংসারবৃক্ষকে বলা হচ্ছে অব্যয়ম্, কখনই শেষ হবে না, চলছে তো চলছেই। কোন এক জন্মে শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করে, অবতারের কথা শুনে, সাধুসঙ্গ করে হঠাৎ তার মধ্যে চৈতন্যের উদয় হয়, তখন সে বলে এবার আমি এই সংসারবৃক্ষকে উচ্ছেদ করেই ছাড়ব। তখন সে উচ্ছেদ করার জন্য যা যা করার দরকার সেই সব করতে নেমে যাবে, আর *ততঃ পদং তৎ পরিমার্গিতব্যং*, তখন সেই ব্রহ্মপদের অন্বেষণে বেরিয়ে পড়বে। তারপর বলছেন –

**উৎক্রামন্তং স্থিতং বাপি ভুঞ্জানং বা গুণান্বিতম্। বিমূঢ়া নানুপশ্যন্তি পশ্যন্তি জ্ঞানচক্ষুষঃ।।১০।।**

জীবাত্মা আগের শরীরকে ছেড়ে নতুন শরীর ধারণ করছে বা শরীরে বসে বিষয়ের ভোগ করছে, জীবাত্মার এই যে নানা রকমের ক্রিয়াকলাপ, আর এগুলো যে ভাবে হচ্ছে এই সব কিছুই স্পষ্টতঃ দৃষ্টিগোচর। কিন্তু *বিমূঢ়া নানুপশ্যন্তি*, সাধারণ মানুষ যারা তারা এই জিনিষগুলিকে দেখতে পায়না। *পশ্যন্তি জ্ঞানচক্ষুষঃ*, যাঁদের জ্ঞানচক্ষু আছে একমাত্র তাঁরাই এইগুলো দেখতে পান। ঠাকুরকে গ্রামের লোকরা জিজ্ঞেস করছে – বাবা, তুমি খাচ্ছ, না কাউকে আহুতি দিচ্ছ? ব্যসদেব যেমন গোপীদের থেকে সব ননী, মাখন খাওয়ার পর যমুনাকে বলছেন – হে যমুনে, আমি যদি কিছু না খেয়ে থাকি তাহলে তোমার দুই ভাগ হয়ে যাক, আমরা মাঝখান দিয়ে তোমাকে পার করে যাই। ব্যাসদেব জানেন যে, আমি কিছু খাইনি, আহুতি দেওয়া হয়েছে, এখানে আমি বোধ নেই। যিনি আত্মজ্ঞানী, যাঁর ঈশ্বর দর্শন হয়েছে, তিনি পরিষ্কার দেখতে পান যে, ভেতরে একজন আছেন তিনিই এগুলো চাইছেন তাই এগুলো করাচ্ছেন বলেই এই সব কিছু হচ্ছে, আমি তো সেই নির্লিপ্ত আত্মা, আত্মা তো কিছুই করেন না। রামপ্রসাদের গানে যেমন বলা হচ্ছে – সকলি তোমারি ইচ্ছা, এটা ঐ তোমার নয়, এটা হচ্ছে এই তোমার। আত্মা আর ঈশ্বরে কোন ভেদ নেই। আমরা কথায় কথায় বলি ঠাকুরের ইচ্ছা। ঠাকুরের ইচ্ছাতেই সব হচ্ছে এতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু ঠাকুর আর আমার আত্মা কি আলাদা? আমার আত্মাই তো ঐগুলো করছে, আমি আর আমার আত্মাও আলাদা নয়, তাহলে আমিই তো ওগুলো করছি। এখানে কি বলছেন? *উৎক্রামন্তং*, মানে দেহ থেকে উৎক্রামন্ত হয়ে অন্য শরীরে যে যাচ্ছে, *স্থিতং*, বা এই শরীরের মধ্যে চুপচাপ অবস্থান করে আছেন, *ভুঞ্জানং*, বা খাওয়া-দাওয়া করছে, *গুণান্বিতম্*, সুখ দুঃখ ও মোহের সাথে যুক্ত হয়ে আছে, যাই করুক না কেন, এগুলো করাচ্ছেন ভেতরে যিনি ঈশ্বর আছেন। সেইজন্য যদি কেউ জিজ্ঞেস করে আজকে কেন ক্লাশে এলেন না? সহজ উত্তর দিয়ে দিই – ঠাকুরের ইচ্ছা ছিল না। এখানে আমরা ঠাকুর বলতে বোঝাতে চাইছি বেলুড় মঠের মন্দিরের ঠাকুর বা আকাশের কোন ঠাকুর। এখানে কিন্তু তা বলা হচ্ছে না। আমার অন্তরে হৃদয়ের মধ্যে যে ঠাকুর বসে আছেন তাঁর কথা বলতে চাইছে। তারপরের শ্লোকে বলছেন –

**যতন্তো যোগিনশ্চৈনং পশ্যন্ত্যাত্মন্যবস্থিতম্। যতন্তোহপ্যকৃতাত্মানো নৈনং পশ্যন্ত্যচেতসঃ।।১১।।**

এর আগের শ্লোকে বলা হয়েছিল এই জিনিষগুলোকে মূঢ় ব্যক্তিগণ দেখতে পায় না। তবে কারা দেখতে পায়। যাঁরা সমাহিতচিত্ত যোগী তাঁরা দেখতে পান, *যতন্তো*, যাঁরা তাঁকে জানার চেষ্টা করছেন তিনিও দেখতে পান। দুজন দেখতে পায় – *যতন্তঃ* আর *যোগিণঃ*। যাঁরা যোগী বা সিদ্ধ পুরুষ তাঁরা দেখতে পান আর যাঁরা সিদ্ধির পথে আছেন তাঁরাও দেখতে পান। এনারা কি দেখেন? নিজের যে অন্তঃকরণ সেটা তিনিই। কিন্তু কারা দেখতে পায়না? *অকৃত-আত্মানঃ*, যে চেষ্টা করছে কিন্তু নিজের অন্তঃকরণের শুদ্ধি ও সংস্কার করেনি, এখানে শর্ত আরোপ করছেন – যারা বাজে আচরণ করছে, দুরাচারী থেকে বেরিয়ে আসেনি, যারা অশান্ত, যারা অহঙ্কারী, যারা অবিবেকী। তারা চেষ্টা করছে কিন্তু আত্মার সাক্ষাৎ করতে পারেনা। চার ধরণের লোক দেখতে পায়না – যারা পুরোপুরি জাগতিক মানসিকতার মধ্যে আছে, চেষ্টা করছে, শাস্ত্র অধ্যয়ন করছে, তপস্যাও করছে কিন্তু ভেতরে সব দুর্গুণ আছে, অহঙ্কার আছে, দুরাচার থেকে সরে আসেনি – কঠোপনিষদের মন্ত্রে যমরাজও ঠিক এই কথাই বলছেন – *নাবিরতো দুশ্চরিতান্নাশান্তো নাসমাহিতঃ। নাশান্তমানসো বাহপি প্রজ্ঞানেনৈনমাপ্নুয়াৎ*।।(১/২/২৪) – যে পাপাচরণ থেকে নিবৃত্ত হয়নি, ইন্দ্রিয় লোলুপতা যার বন্ধ হয়নি, একাগ্রচিত্ত লাভ করতে পারেনি, সমাধি লাভের ফলের দিকে ব্যাকুল হয়ে থাকে এই চারজন চেষ্টা করেলেও আত্মাকে প্রজ্ঞার দ্বারা লাভ করতে পারেনা। কিন্তু যারা এর বিপরীত, যাদের মন শান্ত, চেষ্টা করছে তারা দেখতে পায়। আর যাঁরা সিদ্ধপুরুষ তাঁরাতো দেখতেই পান। এনার কি দেখতে পান? ভেতরে একজন বসে আছেন তিনিই এই সব কিছু করাচ্ছেন। ঠাকুর বলছেন – শুকনো নারকল, ভেতরটা ঢপড় ঢপড় করে। আত্মা আর শরীর পুরো আলাদা, পরিষ্কার দেখা যায়। গীতার কথা এগুলোকে কাটবার জো নেই, তাই শুধু নয়, বারংবার একই কথা অনেকবার বলে যাচ্ছেন। গীতার পঞ্চদশ অধ্যায়ের দশ আর এগারো নং শ্লোকে যেটা ভগবান বলছেন এটাই হচ্ছে বাস্তব। এই বাস্তবকে যুক্তিতে প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে যে দর্শনকে দাঁড় করাতে হচ্ছে, সেটাকে মেলানো খুব কঠিন হয়ে যায়। শঙ্করাচার্য, ব্যাসদেব, শ্রীরামকৃষ্ণের মত পুরুষরা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছেন যে ভেতরে আত্মা আছেন।

ভেতরে একজন আছেন যিনি এই শরীরটাকে চালাচ্ছেন, তখন দেখছেন যিনি চালাচ্ছেন তিনি কিন্তু মন থেকে আলাদা, মনটা আবার ইন্দ্রিয় থেকে আলাদা, ইন্দ্রিয়গুলো আবার গোলকগুলো থেকে আলাদা, গোলকগুলো আবার শরীর থেকে আলাদা। পরিষ্কার এই আলাদা ব্যাপারটাকে দেখতে পান। তিনিই সব কিছু ভোগ করছেন পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছেন। সিদ্ধির অবস্থায় আরেকটা জিনিষ

দেখতে পান, সেটা হচ্ছে ইনি আর তিনি এক, দুটোর মধ্যে কোন তফাৎ নেই। কিন্তু ভেতরে যে জ্যোতির্ময় পুরুষ রয়েছেন তাঁকে দর্শনের জন্য সিদ্ধির অবস্থার দরকার পড়ে না, সাধন অবস্থাতেই দর্শন করা যায়। পরের চারটি শ্লোকে ঈশ্বর, যাঁর তত্ত্ব কথা বলা হচ্ছে, তাঁর বিভুতির কথা বলা হবে।

এরপর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ঈশ্বরের বিভূতির বর্ণনা করছেন। বলা হচ্ছে বৈষ্ণব পদ পেলে মানুষকে আর ফিরে আসতে হয় না। যেমন উপমা দেওয়া হল, সূর্য আর তার প্রতিবিম্ব, ঠাকুরও এই উপমা দিয়ে ব্রহ্মপদের গূঢ় তত্ত্বটিকে বোঝাচ্ছেন, দশটি ঘট আছে তাতে সূর্য প্রতিবিম্বিত হচ্ছে। একটা একটা করে দশটি ঘটই ভেঙ্গে ফেলা হল, শেষে কি আছে সেটা মুখে বলা যাবে না। তার আগে যখন একটি ঘট ছিল তখন কটা সূর্য আছে? দুটো সূর্য একটা প্রতিবিম্বিত আরেকটি উপরে সত্য সূর্য আছে। শেষ ঘটটিকেও ভেঙ্গে ফেলা দেওয়ার যা আছে সেটা মুখে বলা যাবে না। যা আছে তাই আছে। এই যাঁর বৈশিষ্ট্য তাঁর কি কি গুণ –

**যদাদিত্যগতং তেজো জগদ্ভাসয়তেঽখিলম্। যচ্চন্দ্রমসি যচ্চাগ্নৌ তত্তেজো বিদ্ধি মামকম্।।১২।।**

ভগবান দশম অধ্যায়, একাদশ অধ্যায় এমনকি দ্বাদশ অধ্যায়েও নিজের যে বিভূতি, এমনকি তাঁর প্রকৃতির কথা বর্ণনা করেছেন। এর আগে বলা হয়েছিল *ন তদ্ভাসয়তে সূর্যো*, তাঁর এমন তেজ, যে তেজে সূর্যকেও ফ্যাকাসে দেখায়। এখানে এবার বলছেন, *যদাদিত্যগতং তেজো*, সূর্যের যে তেজ, যেই তেজে *জগদ্ভাসয়তেঽখিলম্*, সমস্ত জগৎ উদ্ভাসিত হচ্ছে, *যচ্চন্দ্রমসি*, চন্দ্রমার মধ্যে যে তেজ, *যচ্চাগ্নৌ*, অগ্নির মধ্যে যে তেজ, সে তেজ আমিই। কিন্তু চাঁদে আমরা যে আলো দেখতে পাই সেটা সূর্যের আলোরই প্রতিফলন, চন্দ্রমার যে তেজ সেটা সূর্যেরই তেজ। অগ্নি, সেটা কাঠই হোক আর পেট্রোলই হোক তার মধ্যে দাহিকা শক্তির তেজ সেটাও সূর্য থেকেই এসেছে। তাই অগ্নির যে তেজ সেটা সূর্যেরই তেজ। আবার সূর্যের যে তেজ সেটা আবার কার তেজ? বলছেন সেটা ঈশ্বরের তেজ। ঈশ্বরের যে চৈতন্যময় জ্যোতি এইটাই সূর্যে উদ্ভাসিত হচ্ছে। সূর্যের কিরণ চন্দ্রমাতে প্রতিফলিত হচ্ছে, সূর্য থেকেই পৃথিবীর জন্ম হয়েছে, পৃথিবীতে যে গাছপালা হচ্ছে সেই গাছপালা প্রাকৃতিক কারণে মাটির নীচে চাপা পড়ে যাচ্ছে, সেখান থেকে পেট্রোল হচ্ছে, কয়লা হচ্ছে, সেইখান থেকে যে অগ্নির উৎপত্তি হচ্ছে সেটা আবার সূর্য থেকেই এসেছ। যদি কেউ বলে, ঈশ্বরের তেজ শুধু সূর্যের মধ্যেই কেন হবে, সব কিছুতেই তাঁর তেজ রয়েছে। হ্যাঁ সে ঠিকই বলছে, এটা উপমার জন্য বলা হয়েছে। সব কিছুতেই তেজ আছে, কারণ প্রকৃতি যখন ধীরে ধীরে বিবর্তিত হতে থাকে, তখন তার মধ্যে যে তন্মাত্রা গুলো সৃষ্টি হয় সেই তন্মাত্রার মধ্যে তেজও আছে, সব কিছুর মধ্যেই তেজ আছে। সৃষ্টির প্রক্রিয়ায় তেজ থাকতেই হবে, যে কোন বস্তুর মধ্যে আট ভাগের এক ভাগ তেজ থাকতেই হবে।

আমি সব কিছুর সামনে গিয়ে দাঁড়াতে পারি, পাথরের সামনে, দেওয়ালের সামনে, গাছের সামনে, কিন্তু সব কিছুর থেকে আমার প্রতিবিম্ব পরিষ্কার দেখা যাবে আয়নাতে। ঠিক তেমনি এই ব্রহ্মজ্যোতি সব জায়গায় সমান ভাবে ভাসছে, এই বোতলেও ব্রহ্মজ্যোতি আছে, এই চেয়ারেও ব্রহ্মজ্যোতি আছে কিন্তু আদিত্যে সব থেকে বেশি আছে। এই কথাই ঠাকুর অন্য ভাবে বলছেন – একজন জমিদার সব জায়গাতেই থাকেন কিন্তু অমুক বৈঠকখানাতে তাঁকে বেশি পাওয়া যায়। অগ্নি রূপী তেজ সব কিছুতেই আছে কিন্তু কাঠের মধ্যে বেশি আছে, কেরোসিন, পেট্রোলে কাঠের থেকেও বেশি আছে। কোন জিনিষের প্রকাশ সব জায়গাতে সমান হয় না। তারতম্য থাকবেই, সেইজন্য যদিও বলা হয় সব মানুষই এক, কিন্তু সব মানুষ কখনই এক হয় না। সব কিছুতেই মানুষ মানুষের থেকে আলাদা – ধন সম্পদ থেকে আলাদা, বিদ্যা বুদ্ধি থেকে আলাদা, অনেক কিছু থেকেই আলাদা। আর সবচেয়ে বড় কথা, যে চৈতন্যশক্তি তার মধ্যে প্রতিবিম্বিত হচ্ছে বা প্রকাশিত হচ্ছে, সবার মধ্যেই সেই চৈতন্যশক্তির প্রকাশ পুরোপুরি আলাদা, কারুর মধ্যে বেশি কারুর মধ্যে কম। সেইজন্য সব মানুষই সমান কখনই বলা যায় না। প্রকাশের এই তারতম্য থাকবেই, কখনই সমান হবে না। তাই বলা হল এই ব্রহ্মজ্যোতি সব থেকে সূর্যের মধ্যে বেশি প্রতিফলিত হচ্ছে। তারপর বলছেন –

**গামাবিশ্য চ ভূতানি ধারয়াম্যহমোজসা। পুষ্ণামি চৌষধীঃ সর্বাঃ সোমো ভূত্বা রসাত্মকঃ।।১৩।।**

যারা গীতা অধ্যয়ন করছে তাদের পক্ষে পুরো গীতাকে মুখস্ত করা একটু কঠিন হলেও অভ্যাস ও নিত্য অনুশীলন ও পাঠের দ্বারা মুখস্ত করা সম্ভব হয়। একান্তই যদি পুরো গীতাকে মুখস্ত না করা সম্ভব হয় তাহলে অন্তত এই পঞ্চদশ অধ্যায়ের কুড়িটি শ্লোককে মুখস্ত করা অবশ্যই উচিৎ। কারণ এই অধ্যায়কে প্রথমেই বলা হয়েছে শাস্ত্র। এর মধ্যে ঈশ্বর তত্ত্ব সংক্ষেপে এত প্রাঞ্জল ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যেটা উপনিষদে বা গীতার অন্য অধ্যায়েও পাওয়া যাবে না। ঈশ্বরীয় তত্ত্বের কথা বলতে গিয়ে সব কিছুর বর্ণনা করা হয়েছে। পঞ্চদশ অধ্যায় থেকে সমস্ত দর্শনের তত্ত্বগুলিকে টেনে বার করে নিয়ে আসা যায়।

*গামাবিশ্য*, গাম্ মানে পৃথিবী, *গাম্ আবিশ্য*, পৃথিবীর মধ্যে একেবারে ঢুকে। এই পৃথিবী, শুধু পৃথিবীই নয়, যত গ্রহ আছে, নক্ষত্র আছে, যত ব্রহ্মাণ্ড আছে, আমি এর মধ্যে ঢুকে আছি, এর মধ্যেই আমি ওতপ্রোত হয়ে আছি, ভগবান যে ভেতরে ঢুকে শুধু

বসে আছেন তা নয়, বলছেন আমি একেবারে ওতপ্রোত ভাবে এর সাথে এক হয়ে পুরো সৃষ্টিকে ধারণ করে আছি। আমি ধরে আছি, যদি না ধরে রাখি তাহলে এই পৃথিবী এই সৌরমণ্ডল থেকে ছিটকে বেরিয়ে যাবে। এখান থেকে পুরানে বলা হচ্ছে দশটি হাতি আছে, যাদে বলা হয় দিগ্‌গজ, তারাই পৃথিবীকে ধারণ করে আছে। গীতা কিন্তু এই ধরণের কোন কথা বলছে না, আমি ওতপ্রোতো ভাবে এর সাথে জড়িয়ে আমিই একে ধারণ করে আছি। কি ভাবে? *গাম্ আবিশ্য,* এই পৃথিবীর মধ্যে ঢুকে আছি। শুধু পৃথিবীকে নয়, যে কোন গ্রহ নক্ষত্রকে তিনিই ধরে আছেন। পৃথিবীটা কেন আছে? বিজ্ঞানী বলতে পারে মাধ্যাকর্ষণের জন্য বা attraction pullই বলা হোক না কেন, কিন্তু এই যে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি, যে শক্তি পৃথিবীকে ধারণ করে আছে, সেই শক্তিটাও ভগবানেরই। ভগবান ছাড়া কিছু নেই কিনা। শক্তিও তিনি, বলও তিনি, জড়ও তিনি, ধাতাও তিনিই। তিনিই সব কিছুকে ধারণ করে আছেন। বলছেন, আমি যদি না থাকি এই পৃথিবী চৌচিড় হয়ে মহাকাশে ছড়িয়ে যাবে, শুধু পৃথিবীই নয় যে কোন গ্রহ বা নক্ষত্রের ক্ষেত্রে এই একই জিনিষ হবে। তাহলে ভগবান কি ল অফ্ গ্র্যাভিটেশানের কথা জানতেন। অবশ্যই জানতেন। মূল কথা হচ্ছে ঈশ্বর ছাড়া কিছু নেই। জগদ্ধাত্রী পূজো নিয়ে কথামৃতে ঠাকুর বলছেন – তিনি না ধরলে জগৎ পড়ে যায়, জগদ্ধাত্রী যিনি জগতকে ধারণ করে আছেন। তিনি না ধরে রাখলে জগৎ তো পড়ে যাবেই আর তার আগে এই পৃথিবীর নৈতিকতা ও আধ্যাত্মিকতাও নষ্ট হয়ে যাবে। তিনি ধারণ করে আছেন বলে পৃথিবী তার কক্ষপথ থেকে ছিটকে গিয়ে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে না। এই পৃথিবীতে আমি প্রবেশ করে এর যত ভূত আছে তাদের সবাইকে ধারণ করে থাকি, এইজন্য বলছেন *ধারয়াম্ অহম্*। ঈশ্বর এই জগতকে কিভাবে ধারণ করে আছেন?

প্রথমে বলছেন, আমি একে ধারণ করে আছি বলে পৃথিবী ফেটে চৌচিড় হয়ে যাচ্ছে না, দ্বিতীয়তঃ বলছেন *পুষ্ণামি চৌষুধীঃ সর্বাঃ সোমো ভূত্বা রসাত্মকঃ*। এই জগতে যত জীব আছে, যাদেরই জীবন আছে তাদের সবাইকে শরীর রক্ষার জন্য কিছু আহার করতে হয়। জীব যাই আহার করুক না কেন সব কিছুর মূল হচ্ছে বনস্পতি বা ওষধি। এখানে ওষধি মানে মেডিসিনের কথা বলা হচ্ছে না, ওষধি মানে পুষ্টিমতি, যা প্রাণীদের পোষণ করে, বৃক্ষাদি ও গাছপালা থেকে আমাদের পুষ্টি হয় বলে গাছপালাকে বলা হয় ওষধি। এই ওষধিকে আবার কে পোষণ করে? *সোমো ভূত্বা রসাত্মকঃ,* যে কোন জিনিষ, যার মধ্যে রস আছে, যেমন জল, জলের মধ্যে রস আছে, জগতে এই রকম যত রস আছে তার খনি হচ্ছে সোম। যে কোন রসের সার বা আত্মা হচ্ছে সোম। সব কিছু রসের মূলে হচ্ছে সোম, যার দেবতা হচ্ছেন চন্দ্রমা। ভগবান বলছেন, আমি হচ্ছি রসের আত্মা সোম। আমি না থাকলে কোন কিছুতে রস বলে কোন কিছু থাকবে না। সব কিছুরই একটা আত্মা আছে। মানুষের আত্মা হচ্ছেন, ঠাকুর যেমন বলছেন – যার মানে হুঁশ আছে সেই মানুষ। যেমন এই স্টীল, এই স্টীলের আত্মা হল এর কঠিণত্ব। ঠিক তেমনি জলের আত্মা হচ্ছে রস, সব কিছুকে ভিজিয়ে দেয়। এখানে রসের আত্মা হচ্ছে সোম, ভগবান বলছেন এই সোমটাই আমি। ভগবান না থাকলে সোম বলে কিছু থাকবে না, সোম না থাকলে রসের রসত্বটা চলে যাবে।

এই যে রসনা, যেটা বৃষ্টি হয়ে মাটিতে পতিত হয়ে মাটিকে সরেস করছে, গাছপালা এই রস থেকে বড় হচ্ছে, সেই গাছপালাকে আবার মানুষ ও পশুপাখিরা আহার্য রূপে গ্রহণ করছে, এইভাবে যে পোষণটা হচ্ছে সেটা আমার জন্যই হচ্ছে। আমি যদি না থাকি তাহলে এই যা কিছু দেখছ সব নষ্ট হয়ে যাবে। এখানেই সব শেষ হয়ে যাচ্ছে না, প্রথমে তিনি হয়ে যাচ্ছেন গাছপালার যে রস, আর রসের যে সার সেটাও তিনিই হয়েছেন। তারপর কি হচ্ছে?

**অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা প্রাণিনাং দেহমাশ্রিতঃ। প্রাণাপানসমাযুক্তঃ পচাম্যন্নং চতুর্বিধম্।।১৪।।**

একদিকে তিনি হচ্ছেন খাদ্য, আমরা যে রোজ চাল, ডাল, তরিতরকারী খাচ্ছি এগুলোর সার হচ্ছে রস, রসের সার হচ্ছে সোম আর সোম হচ্ছেন ভগবান নিজে। তার মানে আমি কাকে আহার করছি? আমরা যেটা আহার করছি তার যে আত্মা, তার যে সার, সেটা হচ্ছেন ভগবান নিজে। আহার করে আমরা এই খাদ্যকে কোথায় আহুতি দিচ্ছি? জঠরে। জঠরে গিয়ে ভুক্ত আহার হজম হচ্ছে। কে হজম করছেন? ভগবান বলছেন, *অহম্* আমি নিজে হজম করি। কিভাবে হজম করছেন ভগবান? *অহং বৈশ্বানরো,* জঠরাগ্নিকে বৈশ্বানর বলা হয়। তাহলে ব্যাপারটা কি দাঁড়াল? *অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা প্রাণিনাং দেহমাশ্রিতঃ,* সমস্ত প্রাণীর দেহকে আশ্রয় করে জঠরাগ্নি হয়ে আমি তাদের আহার্য বস্তুকে হজম করি। যারই জঠর আছে, যেখানেই জঠর আছে সেখানেই অগ্নি আছে। এই অগ্নি এ্যাসিড রূপে থাকলেও তাতে কিছু আসে যায় না, এ্যাসিড সব ভুক্ত বস্তুকে জ্বালিয়ে দিচ্ছে। *প্রাণাপানসমাযুক্তঃ,* প্রাণ বায়ু বাইরে বেরিয়ে যাচ্ছে অপান বায়ু ভেতরে আসছে, প্রাণ ও অপান দিয়ে যে শক্তি তৈরী হচ্ছে, এই শক্তি দিয়ে শরীরটা চলছে। যার জন্য দেখা যায় যাদের শ্বাসকষ্ট হয় তাদের পেটের গণ্ডগোল হয়, আবার যাদের পেটের গণ্ডগোল হয় তাদের শ্বাসকষ্ট হয়, কারণ এই দুটোর মধ্যে সম্পর্ক রয়েছে। অবশ্য শরীরের সব কিছুই পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত, কোনটাই আলাদা ভাবে কিছু হয় না। এরপর বলছেন, *পচাম্যন্নং চতুর্বিধম্,* যেভাবেই তুমি খাও না কেন, তুমি চিবিয়ে খাও, তুমি গিলে খাও, তুমি টেনে খাও আর তুমি চুষে চুষে খাও, মানে চর্ব্য, চুষ্য, লেহ্য ও পেয় এই চার প্রকারে যা কিছুই তুমি আহার করো না কেন, এগুলোকে আমি নিজেই হজম করি। বৈশ্বানর যে হজম করছে, আর অন্ন হচ্ছে সোম, এই দুটোই ভগবান নিজে। যিনি খাচ্ছেন তিনিও ভগবান, যে হজম করছে সেটাও তিনি, যে অন্ন ভেতরে ভুক্ত হয়ে যাচ্ছে সেটাও তিনি। সেইজন্য সমস্ত জগৎ হচ্ছে অগ্নি আর সোম স্বরূপ, কেউ পুড়ছে কেউ

পোড়াচ্ছে। কিন্তু দুটোই তিনি, অগ্নিও তিনি আর যেটা পুড়ছে সেটাও তিনি। সেইজন্য খাওয়ার সময় যে বলা হয় ব্রহ্মার্পণং, সেটাও এই একই জিনিষ। এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সব কিছুকে গ্রহণ করলে অন্নদোষে আর সে লিপ্ত হয় না।

স্বামীজী যখন আমেরিকাতে ছিলেন তখন তাঁকে জিজ্ঞেস করা হচ্ছে? স্বামীজী, আপনি কি আমিষ খাদ্য গ্রহণ করবেন? স্বামীজী তখন বলছেন – আমাকে আমার গুরু বলে দিয়েছেন, ভিক্ষাতে যা পাওয়া যাবে তাই গ্রহণ করবি। ঠিক এই কারণে স্বামীজীর ভক্ষ আর অভক্ষ বলে কিছু বোধ ছিল না। কারণ তিনি জানতেন যেটাই আহার করা হচ্ছে সেটাই অগ্নিতে আহুতি দেওয়া হচ্ছে, আহুতি যেটা দেওয়া হল সেটাও তিনি, যে অগ্নিতে আহুতি দেওয়া হল সেটাও তিনি। যে হাত দিয়ে তিনি আহার করছেন সেই হাতও তিনি, কর্তা, কর্ম, ক্রিয়া, করণ, সম্প্রদান, আপাদন ও সম্বন্ধ সবটাই তিনি। কারকের যে সাত রকমের বিভক্তি আছে সবটাই তিনি। আর কর্ম যেটার উপর করা হচ্ছে সেটাও তিনি, পুরো ক্রিয়া যেটা হচ্ছে সেটাও তিনি। যে কোন কাজের জন্য সব মিলিয়ে নয়টি প্রক্রিয়া, কর্তা, করণ, কর্ম ইত্যাদি হল সাত খানা, সাথে যে ক্রিয়াটা করা হচ্ছে আর তার ফল, সব মিলিয়ে নয়টি। যে কোন কাজ যখন করা হয় তখন তার নয়টি অঙ্গ থাকে। কর্তা – যে করছে, কর্ম – যেটার উপর করা হচ্ছে, করণ – যেট দিয়ে করা হচ্ছে, এইভাবে কারকের সাতখানা বিভক্তি সাথে যে ক্রিয়াটা করা হচ্ছে আর তার একটা ফল আছে, এই নয়টি অঙ্গ আছে সবটাই ভগবান, তাঁর বাইরে কিছু নেই। এই ব্যাপারটাকে যখন যে বুঝে নেবে তখন সে ব্যাসদেবের মত বলবে, আমার খুব ক্ষিধে পেয়েছে আমাকে কিছু খেতে দাও। তারপর খুব করে ননী মাখন খেয়ে বলবে – হে যমুনে আমি যদি কিছু না খেয়ে থাকেই তাহলে তুমি দ্বিধা বিভক্ত হও। তখন যমুনাও দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যাবে। ব্যাসদেব জানেন ননী মাখন যা খেয়েছি সেটাও তিনি, যাকে আহুতি দেওয়া হল সেটাও তিনি, আম মাঝখানে কোথাও নেই, সবটাই তিনি, যমুনাও দুই ভাগ হয়ে গেল। যোগশাস্ত্রে আছে সত্যসঙ্কল্প, যিনি সত্য কথাতে প্রতিষ্ঠিত তিনি *ক্রিয়াফল আশ্রয়িত্বম্*, কোন কর্ম না করেই কর্মের ফল পেয়ে যান। যমুনাকে দুই ভাগ করতে গেলে যমুনাতে বাঁধ দিতে হবে তাহলেই যমুনার ওপারে যাবার রাস্থা হবে। ব্যাসদেব সত্যে প্রতিষ্ঠিত, তিনি যমুনাকে রাস্থা দিতে বললেন, যমুনাকেও রাস্থা দিতে হল। গোপীরা ভাবছে ব্যাসদেব যে এতো ননী মাখন খেলেন তাহলে এগুলো গেল কোথায়, ব্যাসদেবতো বললেন আমি কিছু খাইনি। ব্যাসদেব জানেন তিনি যে খেয়েছেন সেও তিনি, আর যেটা খাওয়ান হয়েছে সেটাও তিনি।

**সর্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো**
**মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনঞ্চ।**
**বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদ্যো**
**বেদান্তকৃদ্ বেদবিদেব চাহম্।।১৫।।**

ভগবান বলছেন, *সর্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো*, সমস্ত প্রাণী জগতে আমিই বসে আছি। এর আগে আমরা ব্যাখ্যা করে বলেছিলাম যে, যিনি জ্ঞানী পুরুষ তিনি পরিষ্কার দেখতে পান শরীর, মন, ইন্দ্রিয় সব আলাদা আর আত্মাও আলাদা। কিন্তু যিনি পাক্কা সিদ্ধ পুরুষ তিনি দেখেন আত্মা আর ঈশ্বর এক। ঈশ্বরই আত্মা হয়ে এই শরীরের মধ্যে বসে আছেন, সেইজন্যই এই শরীর ইন্দ্রিয় মন সব চলছে। কিন্তু *মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনঞ্চ*, যিন অজ্ঞানী পুরুষ তিনি দেখতে পায়না। যারা সাধনা করছে, কিন্তু মন পরিষ্কার হয়নি তারাও দেখতে পায়না। ফলে সবার হৃদয়ে যে তিনি আছেন লোকেরা বুঝতে পারেনা। *মত্তঃ* আমার থেকেই, মানে যিনি অন্তর্যামী হয়ে আছেন, তাঁর থেকেই *স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনঞ্চ*, স্মৃতি, একটা জিনিষকে মনে রাখা, এই স্মৃতিটা আমার থেকেই আসে, আর জ্ঞান, একটা বস্তুর ব্যাপারে যে ঠিক ঠিক জ্ঞান, সেটাও আমার থেকেই আসে। সেইজন্য যারা ঠিক ঠিক সাধক ও সাধুপুরুষ তাঁদের বুদ্ধি খুব তীক্ষ্ণ ও তুখোড় হয়। মুর্খরা কখনই সাধক হতে পারেনা, উল্টো ভাবেও বলা যায় সাধকরা কখনই মুর্খ হতে পারেনা। কারণ মুর্খদের ধারণা করার কোন ক্ষমতাই থাকে না। লাটু মহারাজের জীবনের আগের অবস্থা এক রকম কিন্তু পরের দিকে ঠাকুরের সংস্পর্শে আসার পর তিনি যেমন যেমন এগিয়ে যাচ্ছেন তখন তাঁর প্রত্যেকটি কথা ও বাক্যের মধ্যে কি তীক্ষ্ণ বুদ্ধির ছাপ। কারণ ভগবান নিজে তাঁর বুদ্ধির মধ্যে বসে আছেন কিনা, স্মৃতির মধ্যেও তিনিই বসে আছেন তাই কিছুই ভুলবেন না, আর জ্ঞান তো আসবেই। ভগবান বলছেন স্মৃতি আর জ্ঞান তাঁর থেকে আসে। আর *অপোহনং চ*, স্মৃতি আর জ্ঞান চলে যাওয়াটাও তাঁরই। স্মৃতি যে চলে যাচ্ছে, কিছু মনে করতে পারা যাচ্ছে না, সেটাও তাঁরই। আর জ্ঞান চলে যাওয়াতে যে কিছু বুঝতে পারছে না, সেটাও তাঁরই কারণে, জ্ঞান ও অজ্ঞান এবং স্মৃতি ও বিস্মৃতি দুটোই তাঁর।

ভগবান কিভাবে স্মৃতি আর জ্ঞান দেন? এখানে আচার্য শঙ্কর যোগ করছেন, যাঁরা পূণ্যকর্মা, যাঁরা কোন খারাপ কাজ করে না, তাঁদের এই দুটো কখনই *অপোহনম্* হয় না। কিন্তু যারা পাপকর্মা তাদের স্মৃতি ও জ্ঞান দুটোরই ক্ষতি হয়। একজন ভক্ত শ্রীমাকে বলছেন – মা, আশীর্বাদ করুন যাতে তাঁর নামে পাগল হয়ে যেতে পারি। শ্রীমা শুনে বলছেন – সেকি বাবা, কত পাপ করলে মাথা খারাপ হয়। সেইজন্য বলা হয় শাস্ত্র কথা শুনে যখন সেই রকম আচরণ করা হয় সেটা করা হয় নিজের ইচ্ছানুযায়ী। হিন্দু শাস্ত্রে ভালো ও মন্দের কোন বিভাজন রেখা নেই, এটা ভগবানের এটা শয়তানের এই ভাবে কখনই বিভাজন করা হয় না, কারণ সবটাই

ভগবানের। ভালোটাও ভগবানের মন্দটাও ভগবানের, এখন দেখতে হবে আমি কোনটা চাইছি। তোমার যদি মিথ্যে কথা বলতে ভালো লাগে, ভোগে লিপ্ত থাকতে ভালো লাগে, দুরাচার করতে ভালো লাগে তাহলে তাতেই লেগে থাকো, কেউ বারণ করছে না, কিন্তু তুমি জন্মাতেই থাকবে, আর কোথায় কোন্ যোনীতে গিয়ে জন্ম নেবে তারও কোন ঠিক নেই। তোমার যদি মিথ্যে কথা আর চালাকি করতেই ভালো লাগে তাহলে ভগবান আগামী জন্মে তোমাকে শেয়াল করে পাঠিয়ে এমন সুযোগ করে দেবে সব সময় চালাকি করেই মরবে। অপরের আড়ালে নিন্দা করতে যদি ভালো লাগে তাহলে পরের জন্মে তোমাকে ভগবান ছারপোকা হয়েই জন্মাতে হবে। ছারপোকা সব সময় পিঠেই কামরায়, পেছনে পরনিন্দা পরচর্চা করে বেরালে তাই ছাড়পোকা হতে হয়। কিন্তু শেয়াল, ছারপোকাও ভগবানের বাইরে নয়, এরাও ভগবানেরই। ঠাকুর তাই বলছেন – মা, এই নাও তোমার পূণ্য এই নাও তোমার পাপ। পাপ আর পূণ্য দুটোই তাঁর। আমি কোনটা চাইছি? শাস্ত্র বলে, তুমি যদি পাপ নাও তাহলে তোমার এই এই সমস্যা হবে। সেইজন্য প্রাথমিক অবস্থায় প্রথমে তুমি পূণ্যের দিকে যাও। কথামৃতে আছে বাঘ নারায়ণ, মাহুত নারায়ণ, লুচ্চর রূপী নারায়ণ। বাঘ নারায়ণকে দূর থেকে প্রণাম করতে হয়। সাধুরা জানে মেয়েদের মধ্যেও ভগবানই আছেন, কিন্তু মেয়েদের দেখলেই বলেন – মা তুমি তোমার লেজ দেখাও। কারণ পুরুষদের কাছে মেয়ে হচ্ছে নাগিণী। কিন্তু তাদের মধ্যেও সেই ভগবান, কিন্তু লেজ দেখাও মানে আমার সামনে থেকে সরে যাও। যদি সাপকে আলিঙ্গন করতে যাই তাহলে কি পরিণাম সবারই জানা আছে। কিন্তু সবটাই তিনি, আমাকে ঠিক করে নিতে হবে আমার কোনটা লাগবে, যখন ঠিক করে নিলাম, তখন সেই দিকে পুরো দমে এগোতে হবে। যদি পুরো দমে না এগোও তাহলে ফলটা আমার কমই হবে। আমার যদি মনে হয় একেবারে ভোগের মধ্যে নেমে পড়ি, তখন আমাকে কেউ বারণ করতে আসবে না, শাস্ত্র কক্ষণ বারণ করবে না। কিন্তু বলে দেবে এটা করলে আমার কি হবে। শাস্ত্র এইটাই বলে দিচ্ছেই ভালো করলে এই হয়, খারাপ করলে এই হয়।

*বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদ্যো,* যত বেদ আছে তাতে আমিই হচ্ছ একমাত্র জানার। বেদ আমারই কথা বলছে। *বেদান্তকৃদ্ বেদবিদেব চাহম্,* বেদান্তের যত সম্প্রদায়, দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত, অদ্বৈত, আর যত বড় বড় সাধু মহারাজদের যত সম্প্রদায় আছে তার সবার কর্তা হলাম আমি। আর আমিই *বেদবিদেব চাহম্,* আমিই একমাত্র বেদকে ঠিক ঠিক জানি। গীতার পঞ্চদশ অধ্যায়কে আচার্য বলছেন বেদের সার, বেদার্থ। এখানে ঈশ্বরের তত্ত্ব আলোচনা করা হচ্ছে, যদি আমার মত সাধারণ লোক ঈশ্বরের তত্ত্বকে বুঝে যাই, তাহলে পঞ্চদশ অধ্যায়ে কি আছে আমার জানা হয়ে যাবে। পঞ্চদশ অধ্যায় কি বলতে চাইছে যদি আমি জেনে যাই, তাহলে আমার বেদ জানা হয়ে গেল। কিন্তু বেদজ্ঞ হচ্ছেন একমার ঈশ্বর। তাহলে আমার কি হল? আমি আর ঈশ্বর এক হয়ে গেলাম। সেইজন্য বলা হয়, ঈশ্বর হওয়াও যা, বেদজ্ঞ হওয়াও তাই, তত্ত্বজ্ঞ হওয়াও তাই। কারণ বেদবিৎ হচ্ছেন সাক্ষাৎ ঈশ্বর। এই চারটে শ্লোকে ঈশ্বরের কিছু বিভূতির কথা বলার পরেই বলছেন

**দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ। ক্ষরঃ সর্বাণি ভূতানি কূটস্থোঽক্ষর উচ্যতে।।১৬।।**

এই ১৬ নং শ্লোক এসে বিভিন্ন ভাষ্যকাররা বিভিন্ন ভাবে ব্যাখ্যা করেন। আজ থেকে সাড়ে তিন হাজার বছর আগে ঋষিরা এইসব তত্ত্ব আবিষ্কার করে গেছেন, তারপর থেকে কত রকমের দর্শন এসেছে, কত রকমের দর্শন শাস্ত্র রচিত হয়েছে। এখানে পুরুষ বলতে বোঝাচ্ছেন প্রকৃতিকে আর তার বিকৃতিকে, অর্থাৎ প্রকৃতি থেকে যেটা বিবর্তিত হয়, তাকেই ক্ষর বলা হচ্ছে, আর প্রকৃতিকে অক্ষর বলা হচ্ছে। আবার এই দুটোকেই বলছেন পুরুষ। মজার ব্যাপার হল, আর কোথাও এইভাবে প্রকৃতি আর তার বিবর্তনকে পুরুষ বলা হয় না, পুরুষ বলতে শুধু চৈতন্যকেই বলা হয়। আসলে প্রকৃতিও ভগবানেরই কিনা। বলছেন পুরুষ দুই রকমের – একটা হচ্ছে ক্ষর আরেকটি হচ্ছে অক্ষর। ক্ষর মানে যার বিকার আছে, আকার পাল্টায় আর অক্ষর হচ্ছে যার কোন কিছুই পাল্টাচ্ছে না। হাইড্রোজেন আর অক্সিজেনকে যদি মিশিয়ে দেওয়া হয় তাহলে জল হয়ে যাবে, হাইড্রোজেন হয়ে গেল ক্ষর। আর জলকে যদি ইলেক্ট্রোনোসিস্ করে দেন তখন জল ভেঙ্গে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন হয়ে যাবে, তাই জলও হয়ে গেল ক্ষর। জলও ক্ষর আর হাইড্রোজেন অক্সিজেনও ক্ষর। কিন্তু পদার্থের দিক থেকে এরা যেমন ছিল তেমনই আছে। এই পৃথিবীও যেমন ছিল তেমনই আছে, খালি এর রূপটা পাল্টাচ্ছে। আর যদি পুরো সৌরমণ্ডলকে নিয়ে নেওয়া হয়, সেটারও যা ছিল তাই আছে, শুধু আকারটা পাল্টাচ্ছে। সূর্যের রশ্মি আসছে, ফটো সিন্থেসিস হয়ে গাছপালা হয়ে যাচ্ছে। গাছপালা গুলো আবার মাটির নীচে চাপা পড়ে পেট্রোল ডিজেল হয়ে যাচ্ছে। পেট্রোল আর ডিজেল যখন জ্বালানি হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে তখন তাপ হয়ে যাচ্ছে। শুধু এদের রূপগুলো পাল্টে যাচ্ছে। যখন পুরো বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডকে নেওয়া হবে তখন ক্ষর বলতে বোঝাচ্ছে প্রকৃতি, একেবারে কূটস্থ। যেমন চালের হাড়ি, ভেতরে চালগুলো আগুনের তাপে জলের মধ্যে টগবগ করে ফুটছে, কিন্তু চালের হাড়িটা একেবারে স্থির, কূটস্থ। চাল, ডাল, আলু, পটল যতই ডান দিক বাঁ দিকে যাক, উপর নীচ করুক হাড়িটা স্থির থাকছে। ঠিক তেমনি হাড়িটা হচ্ছে অক্ষর, আর হাড়ির ভেতরের চালগুলো হচ্ছে ক্ষর।

*ক্ষরঃ সর্বাণি ভূতানি,* যত রকমের জীব আর যা কিছু আছে সব হচ্ছে ক্ষর, সবার রূপটাই পাল্টায় কিন্তু *কূটস্থোঽক্ষর উচ্যতে,* কিন্তু প্রকৃতি হচ্ছে অক্ষর, এখানে কূটস্থ হচ্ছে রাশিকৃত, গুদামে যেমন চাল, ডাল রাশিকৃত ভাবে মজুত করে রাখা থাকে, তেমনি

প্রকৃতির মধ্যে নানান রকমের রাশিকৃত বস্তু। ক্ষর আর অক্ষর এই দুটো থেকে একেবারে আলাদা তৃতীয় একজন পুরুষ আছেন, তাঁকে কি বলছেন?

**উত্তমঃ পুরুষস্তন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ। যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ।।১৭।।**

প্রথমে পুরুষের দুটো রূপের কথা বলা হল, একটা ক্ষর রূপ আরেকটা অক্ষর রূপ, একদিকে প্রকৃতি আর অন্য দিকে ক্ষর, আর পুরুষের তৃতীয় আরেকটা দিক হল *উত্তমঃ*। পুরুষের তিনটে দিক, উত্তম, মধ্যম আর অধম, অধম হল ক্ষর যার রূপটা পাল্টাচ্ছে, মধ্যমটা হল যেটা কূটরাশি সমগ্র প্রকৃতিকে দেখছে। এই দুটোর পারে হল *উত্তমঃ পুরুষস্তন্যঃ*, এই দুটো থেকে পুরো আলাদা। *পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ*, এঁকেই পরমাত্মা বলা হয়। *যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ*, সব কিছুর অন্তরাত্মা হলেন ভগবান। একটা যে কেঁচো তারও অন্তরাত্মা ভগবান, একটা পচা পাতা তারও অন্তরাত্মা ভগবান, মাটি, জল সব কিছুর অন্তরাত্মা ভগবান, যেটা দশম অধ্যায়ে বিভূতিযোগে বলা হয়েছে, এর মধ্যে আমি এটা, ওর মধ্যে আমি এটা। যেমন বলছেন *দ্যূতং ছলয়তামস্মি*, যত রকমের ছল চাতুরি হতে পারে তার মধ্যে আমি হলাম জুয়া খেলা। জুয়া খেলে কত লোক বিনাশের দিকে চলে যাচ্ছে, ভগবান নিজেই এই জুয়া খেলা। *মৌনং চৈবাস্মি গুহ্যানাং*, যত রকমের গোপনীয়তা হতে পারে তার মধ্যে আমি মৌন, সব কিছুর সার হচ্ছেন তিনি নিজে।

বলছেন – *যো লোকত্রয়ম্*, তিনটে লোকে ভূঃ ভূবঃ স্বঃ, এই যে তিনটে লোক, এই তিনটে লোকে তিনি *আবিশ্য*, তিনি এই তিনটে লোকের মধ্যে ঢুকে আছেন। কিভাবে ঢুকে আছেন? স্বরূপ সত্তা মাত্র, তিনি যে সত্যিকারে ওর মধ্যে ঢুকে গেছেন তা নয়, ঈশ্বরের যে স্বরূপ তার সত্তা মাত্র, অন্তরাত্মা রূপে ঢুকে আছেন। শ্রীকৃষ্ণ ভগবান হয়ে তিনি যে তার মধ্যে ঢুকে গেছেন তা নয়। তিনি আছেন বলেই এই সব কিছু আছে। জগদ্ধাত্রি রূপের কথা বলতে গিয়ে ঠাকুর বলছেন, তিনি এই জগতকে ধারণ করে আছেন বলে জগৎ দাঁড়িয়ে আছে, তিনি না থাকলে এই জগৎ এই অবস্থায় থাকত না। এই ঈশ্বর সবার ভেতরে অন্তরাত্মা রূপে অবস্থান করে সবাইকে চালাচ্ছেন। যিশু বলছেন, লবণের যদি লবণত্ব চলে যায় তাহলে সেটা একটা পাথর মাত্র, ঐ পাথরকে ফেলে দিতে হবে। তাহলে লবণের আত্মা কি? লবণের লবণত্বটাই লবণের আত্মা। সেই লবণত্বটা কে? ভগবান নিজে। লবণ থেকে যদি ভগবানের বিভূতি চলে যায় তাহলে ওটা পাথর হয়ে যাবে। পাথর যেটা হবে সেটাও ভগবানের, তখন পাথরের আত্মা আবার পাল্টে যাবে। লবণ, পাথর সবই ক্ষর পদার্থ, ক্ষর পদার্থ হলেই বা, সেটাও ভগবান, সেটাও পুরুষ কিন্তু অধম। উত্তম পুরুষ কি? সেটাই পরের শ্লোকে বলছেন, তার ক্ষরও নেই অক্ষরও নেই। সারটা কোন জিনিষেরই চলে যায় না, সার বিহীন হয়ে গেলে সেটার অস্তিত্বই শেষ হয়ে গেল, অনীশ্বর হয়ে যায়।

**যস্মাৎ ক্ষরমতীতোহহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ। অতোহস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ।।১৮।।**

যেটা ক্ষর, যার রূপ পাল্টায়, সেটা থেকে আমি অনেক দূরে। আর *অক্ষরাদপি চোত্তমঃ*, যেটা মায়া, যেটা স্তুপীকৃত হয়ে প্রকৃতি রূপে বসে আছে, আমি তার থেকেও উত্তম। *অতোহস্মি লোকে বেদে চ*, এইজন্য তিনটে লোকে আমাকে *প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ*, পুরুষোত্তম বলে সম্বোধন করে। ক্ষর যেটা পাল্টে যায়, আর অক্ষর, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, যাকে দেখলে আপাতঃ দৃষ্টিতে মনে হয় যেন কোন পরিবর্তন হচ্ছে না, এই দুটো থেকে আমি শ্রেষ্ঠ। এই কথা বলার পর বলছেন –

**যো মামেবমসংমূঢ়ো জানাতি পুরুষোত্তমম্। স সর্ববিদ ভজতি মাং সর্বভাবেন ভারত।।১৯।।**

এই যে এতক্ষণ আমার সার সম্বন্ধে বলা হল, *যো মামেবমসংমূঢ়ো*, যে মোহগ্রস্ত নয়, *জানাতি পুরুষোত্তমম্*, এই যে এতক্ষণ পুরুষোত্তমের তত্ত্বটা বলা হল, এটাকে যিনি জানেন, আমাকে মানে আমার স্বরূপকে যিনি জানেন, তিনি – *স সর্ববিদ ভজতি মাং*, সেই সর্বজ্ঞ আমারই ভজনা করেন। আমাকে মানে বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণকে এইভাবে জানেন, সবারই আত্মা আমি এটা বুঝে *সর্বভাবেন ভারত*, সব ভাবে আমাকে ভজনা করে। কিভাবে ভজনা করে? ইনি হচ্ছেন পুরুষোত্তম, ইনি হচ্ছে সর্বজ্ঞ, সব কিছুতেই ভগবান আছেন। এই ভাব যার হয় সেই হয়ে গেল সর্বজ্ঞ। সব কিছুর আত্মা তিনি, আত্মা বলতে এখানে বলছে সেই বস্তুর সারটাকে। শেষ শ্লোকে এসে ভগবান বলছেন –

**ইতি গুহ্যতমং শাস্ত্রমিদমুক্তং ময়াহনঘ। এতদ্ বুদ্ধা বুদ্ধিমান্ স্যাৎ কৃতকৃত্যশ্চ ভারত।।২০।।**

হে অর্জুন, আমি তোমাকে খুব গুহ্য শাস্ত্র বললাম, *ইতি গুহ্যতমং শাস্ত্রমিদমুক্তং*। *এতদ্ বুদ্ধা বুদ্ধিমান্ স্যাৎ কৃতকৃতশ্চ ভারত*, এইটাকে তুমি বুঝে নাও, বুঝে নিয়ে কৃতকৃত্য হয়ে যাও।

সমস্ত গীতাই হচ্ছে শাস্ত্র, কিন্তু এর মধ্যে পঞ্চদশ অধ্যায়কে শাস্ত্র বলা হচ্ছে। কারণ এই অধ্যায়ে পুরো বেদের তত্ত্ব দেওয়া হয়েছে। বেদের তত্ত্ব কি? এর আগে যেমন বলা হল, *বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদ্যো*। বেদ কি বলছে? আমারই কথা বলছে। আমার তত্ত্ব কথা কোথায় বলা হয়েছে? গীতার পঞ্চদশ অধ্যায়ে বলা হয়েছে। আমার সারতত্ত্বের কথা কোথায় বলা হয়েছে? বেদে বলা হয়েছে। বলছেন, এইটাকে যখন মানুষ ঠিক ঠিক বুঝে নেয় তখনই মানুষ কৃতকৃত্য হয়ে যায়। কৃতকৃত্য মানে, জীবনে আমার যেটা করার কথা ছিল, সেটা করা হয়ে গেল। যেমন, আমি রাজার কাছে গিয়ে বললাম, হে রাজামশাই, আমার এই জিনিষটা চাই, তা নাহলে আমার খুব কষ্ট হবে। রাজা আমার প্রার্থনা শুনে সেটা দিয়ে দিলেন, তখন আমি কৃতকৃত্য হয়ে গেলাম। মানব জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে ঈশ্বর লাভ। ঈশ্বর লাভ বলে, কিন্তু ঈশ্বর তো কোন বস্তু নয় যে তাঁকে আমি পেয়ে যাব, আসলে ঈশ্বরের তত্ত্বকে জানা। ঈশ্বরের তত্ত্বকে জানা, সেটাই পঞ্চদশ অধ্যায়ে বলা হয়েছে। ঈশ্বরের তত্ত্বকে যখন আমি বুঝে গেলাম তখন আমার যে উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য এই মনুষ্য জীবন সেই উদ্দেশ্য চরিতার্থ হয়ে গেল। সৃষ্টির আদিম কাল থেকে যে আমার জন্ম-মৃত্যুর খেলা চলছে, সেই খেলাটা বন্ধ হয়ে গেল, তার ফলে আমি কৃতকৃত্য হয়ে গেলাম। শ্রেষ্ঠ কুলে যখন ব্রাহ্মণ জন্ম নেয় তখন তার উদ্দেশ্য একটাই ঈশ্বর জ্ঞান, এই ঈশ্বর জ্ঞান যখন হয়ে গেল তখন তাঁর জীবনের আর কিছু বাকী থাকে না, সব কিছুই তার হয়ে গেল, কোন কর্তব্য আর বাকী নেই। এই ঈশ্বর জ্ঞানের বাইরে যা কিছুই করা হোক না কেন, যজ্ঞ কর, তপস্যা কর, তীর্থ কর, এইসব করে যতই সে পূণ্য অর্জন করুক না কেন সে কিন্তু কৃতকৃত্য হবে না। ঈশ্বরকে জানলেই সে কৃতকৃত্য হয়, ঈশ্বরকে জানা মানে ঈশ্বরের তত্ত্বকে জানা।

ঈশ্বরের তত্ত্ব এই পঞ্চদশ অধ্যায়ে বলা হয়েছে, আরও অনেক জায়গাতে ঈশ্বররের তত্ত্ব বলা হয়েছে, কিন্তু পঞ্চদশ অধ্যায়ে অত্যন্ত সুস্পষ্ট ও প্রাঞ্জল ভাবে সরাসরি ঈশ্বর তত্ত্বের সারটাকেই শুধু বলা হয়েছে। যেমন *ঊর্ধ্বমূলমধঃশাখমশ্বত্থং*, এতে একদিকে সৃষ্টিরও কথা বলছেন, ভগবান নিজের কথাও বলছেন আবার সংসারের কথাও বলছেন, জীবের কথা বলছেন আবার মায়ার কথাও বলছেন। যে কোন ধর্ম বা দর্শন মূল চারটে জিনিষের কথাই আলোচনা করে – ঈশ্বর, মানে ঈশ্বর তত্ত্ব, জীব, জগৎ আর মায়া। এই চারটে জিনিষকে যেখানে ব্যাখ্যা করা হবে তাকেই শাস্ত্র বলে গণ্য করা হবে। এখানে ভগবান এই চারটে জিনিষকেই ব্যাখ্যা করছেন, জীবের ব্যাখ্যা করে বলছেন – *মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ*, আমারই অংশ থেকে জীবের উৎপত্তি হচ্ছে। জগৎ কি? *ঊর্ধ্বমূলমধঃশাখম*, জগৎ কিভাবে আসছে সেটাকে বলা হয়ে গেল। আর মায়া, *ক্ষরঃ সর্বাণি ভূতানি কূটস্থোঽক্ষর উচ্যতে*, এই যা কিছু বিকার হচ্ছে, রূপ পাল্টাচ্ছে এইটাই মায়া। এই চারটে জিনিষকেই এই অধ্যায়ে আলোচনা করে হয়েছে বলেই এই অধ্যায়কে ভগবান বলছেন *গুহ্যতমং শাস্ত্রং*, যেটা মানুষকে মুক্তির দিকে নিয়ে যায়। এই জ্ঞানের যে ফল তারও এখানে বর্ণনা করা হয়েছে – *যদ্ গত্বা ন নিবর্তন্তে*, যেখানে পৌঁছে গেলে মানুষকে আর জন্ম গ্রহণ করতে হয় না। সেইজন্য এই অধ্যায়কে শাস্ত্র বলা হচ্ছে।

**ওঁ তৎসদিতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসুপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে**
**শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে পুরুষোত্তমযোগো নাম পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ।।**

## ষোড়শ অধ্যায়
# দৈবাসুরসম্পদ্বিভাগযোগ

১৪ই নভেম্বর, ২০১০

নবম অধ্যায়ের আলোচনার সময় একটা শ্লোক এসেছিল যেখানে বলা হচ্ছে – *মোঘাশা মোঘকর্মাণো মোঘজ্ঞানা বিচেতসঃ। রাক্ষসীমাসুরীঞ্চৈব প্রকৃতিং মোহিনীং শ্রিতাঃ।।(৯/১২)।* বলছেন, কিছু লোক আছে যাদের স্বভাব অত্যন্ত জঘন্য প্রকৃতির। এদের সবটাই, জপ, ধ্যান, প্রার্থনা সব মিথ্যাচারে পরিপূর্ণ। নবম অধ্যায়ের এই শ্লোকটাকেই ষোড়শ অধ্যায়ে বিস্তার করে দেখানো হয়েছে রাক্ষসী বা আসুরী প্রকৃতির লোক কাদের বলব। রাক্ষস অসুর বলতে আমরা যে ভাবে কল্পনা করি, বিশেষ করে গল্প কাহিনী আর টিভি সিরিয়ালে যেভাবে রাক্ষস ও অসুরদের দেখানো হয়, আচার্য শঙ্কর কিন্তু রাক্ষস অসুর সম্বন্ধে এই ধারণাকে কোন গুরুত্ব দেননি। শঙ্করাচার্যের মতে মানুষের মধ্যেই দেব ভাবাসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব আছে আবার মানুষের মধ্যেই অসুর ভাবাসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব আছে, যদিও উনি রাক্ষস অসুর এই শব্দগুলো ব্যবহার করেছেন কিন্তু তিনি এই শব্দগুলিকে ঐভাবে নেননি যেভাবে আমরা গল্প, কমিকস বা টিভিতে দেখে থাকি। গীতাও ঠিক ঐভাবেই বলছে যেভাবে আচার্য বলছেন। সত্যি কথা বলতে প্রজাপতি কাশ্যপের সন্তানদের মধ্যেই দেবতা আছে, রাক্ষস আছে অসুরও আছে, তাই এরা যে অন্য ধরণের কিছু হবে, যে বর্ণনা আমরা সচরাচর পাই, সেই ধরণের কিছু নয়।

এখানে বলা হচ্ছে – যখন মানুষ সাধনার পথে এগোয় তখন প্রথমে তাকে রাক্ষসী ও আসুরীক বৃত্তিগুলো ত্যাগ করতে হয়। এই বৃত্তিগুলো ত্যাগ না হলে শুধু যে আধ্যাত্মিক জীবনই এগোতে পারবে না তা নয়, মানবিক ও সামাজিক জীবনের অভ্যুদয়ও স্তব্দ হয়ে যাবে। ঠিক আগের অধ্যায়ে একটা শ্লোক আছে যেখানে বলা হচ্ছে – *যতন্তোঽপ্যকৃতাত্মানো,* যারা অকৃতাত্মা তারা যে সাধন ভজন করছে তাতে তাদের কিছুই হয় না। ঠাকুর বলছেন – কলকাতার এতো লক্ষ লক্ষ লোক এত জপ করছে কিন্তু কারুর কিছু হয় না কেন? হবেটা কি করে, কারণ তাদের রাক্ষসী আসুরীক বৃত্তি গুলো ভেতর থেকে যায়নি। বয়স হলে যখন দাঁত পড়ে যায়, ইন্দ্রিয়গুলো শিথিল হয়ে যায় তখন এই বৃত্তিগুলো সাময়িক ভাবে চলে যায়, তখন আবার ভালোটাও করার ক্ষমতা থাকে না। এই কারণে ষোড়শ অধ্যায়টি হচ্ছে একেবারে আধ্যাত্মিকতার ব্যবহারিক রূপ। কেউ যদি মজা করেও বলে – জানো ভাই, আমার জীবনে যা কিছু আছে আজ সব শাস্ত্রের সাথে মিলে যাচ্ছে। তাকে যদি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করি। তখন সে গীতার ষোড়শ অধ্যায়টি খুলে দেখিয়ে দিয়ে বলবে ওখানে আসুরিক বৃত্তির যা যা বর্ণনা আছে তার সবটাই আমার সাথে মিলে যাচ্ছে। মজা করে বললেও সে কিন্তু ঠিকই বলেছে। এই অধ্যায়ে পরিষ্কার করে দেখানো হচ্ছে কোনটা ভালো কোনটা খারাপ, আর সোজাসুজি বলা হচ্ছে, যদি তোমার মধ্যে আসুরিক বৃত্তি থাকে, ঐ বৃত্তিকে না ছাড়লে তুমি কিন্তু আধ্যাত্মিক জীবনে এগোতে পারবে না। প্রথমেই ভগবান শুরু করছেন –

শ্রীভগবানুবাচ

**অভয়ং সত্ত্বসংশুদ্ধির্জ্ঞানযোগব্যবস্থিতিঃ। দানং দমশ্চ যজ্ঞশ্চ স্বাধ্যায়স্তপ আর্জবম্।।১।।**

কোন ভূমিকা না করে ভগবান সোজাসুজি বলে দিচ্ছেন এই এই হচ্ছে দৈবীসম্পদ। প্রথম তিনটে শ্লোকে দৈবী গুণগুলিকে একেকটা শব্দ দিয়ে বলে যাচ্ছেন, যাদের মধ্যে দৈবীপ্রকৃতি, সুপ্রকৃতি আছে সেগুলো কি কি। ভগবান দৈবীগুণের যে তালিকাটি এখানে রেখেছেন এটাই সবটা নয়, আবার একটা দুটো গুণকে বিশ্লেষণ করে সেই গুণ থেকেই আরও কিছু গুণাবলীকেও দাঁড় করিয়ে দেওয়া যায়। এখানে শুধু কয়েকটির উল্লেখ করে দেওয়া হয়েছে। সেগুলো কি কি?

*অভয়ং,* অভয় দুই ভাবে আসে, একটা হচ্ছে অপরকে নির্ভয় দেওয়া আর আরেকটি হচ্ছে নিজেও নির্ভয় থাকা। আচার্য শঙ্কর এখানে তিনি নিজের অর্থে নিচ্ছেন, নির্ভয় মানে মানুষ যখন দুর্বল থাকে তখন তার মধ্যে ভয় কাজ করে। বলছেন – সে এতো বলবান ও শক্তিশালী হয় যে, কোন কিছুতেই তার ভয় থাকে না। বেশি বলবান ও শক্তিশালী থাকলে আবার ঔদ্ধতও হয়ে যাওয়ার খুব সম্ভবনা থেকে যায়। পাড়ার মস্তানরাও বলে আমি কাউকে ভয় করিনা। যে কোন মানুষ যদি বলে আমি তোমাকে ভয় পাইনা বা আমি কাউকে ভয় পাইনা, এরা হল মহা ভীতু লোক, আসলে নিজের ভয়কে চাপা দেওয়ার জন্য এই ধরণের ভাষা ব্যবহার করছে। সে নিজেও বুঝতে পারেনা যে সে ভয় পাচ্ছে। কারণ মানুষ যেটা বলে, বেশির ভাগ সময় দেখা যায় তার ব্যক্তিত্ব ঠিক তার বিপরীত। যদি বলে আমি তোমাকে ভালোবাসি, তার মানে সে ভালোবাসছে না। ভারতের মায়েরা তার সন্তানকে কখনই বলে না যে, আমি তোমাকে ভালোবাসি, ইদানিং কালে অবশ্য বলতে শুরু করেছে। যে মুহূর্তে শুনবেন কেউ বলছে আমি তোমাকে ভালোবাসি, তখনই বুঝতে হবে কোথাও গোলমাল আছে। *অভয়ং,* মানে একেবারে নির্ভয়, সে কাউকে ভয় পায়না। যে কাউকে ভয় পায়না, তার থেকে অন্য কোন প্রাণীও ভীত হয় না। শ্রীকৃষ্ণ কাউকে ভয় পেতেন না, উল্টো দিকে শ্রীকৃষ্ণকেও দেখে কেউ ভয় পেতনা। দুর্যোধন, যে সব সময় শ্রীকৃষ্ণের বিরোধী পক্ষে ছিল, সেও কিন্তু সব সময় শ্রীকৃষ্ণের সাথে সহজ ভাবে কথা বলতে আসত। যে অভয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়, তখন তাকে অপরেও ভয় পাবেনা, অথচ তিনি শক্তিমান।

*সত্যসংশুদ্ধি,* এর অর্থ হচ্ছে অন্তঃকরণের শুদ্ধি। সত্য বলতে দুটিকে বোঝায়, একটা হচ্ছে বুদ্ধি আর দ্বিতীয় হচ্ছে অন্তঃকরণ, অন্তঃকরণ আবার চারটেকে নিয়ে হয় – মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহঙ্কার। মন যেটা একেবারে শুদ্ধ, আচার্য বলছেন - অপরকে ঠকায় না, মিথ্যে কথা বলে না আর কোন ধরণের কপট আচরণ করে না, এইগুলো যখন যার মধ্যে দেখা যাবে বুঝতে হবে তার মন একেবারে পরিষ্কার। ঠাকুর বলছেন সরল না হলে ঈশ্বরের দিকে মন যায় না। কিন্তু আমাদের কাছে সরল মানে বোকা। কিন্তু তা নয়, এদের তুখোড় বুদ্ধি থাকবে, কিন্তু অন্তঃকরণের শুদ্ধি থাকবে। ঠাকুর সরল বলতে যেটা বলছেন, সেটা এইটাই বোঝাচ্ছে *সত্যসংশুদ্ধি,* অন্তঃকরণ পরিষ্কার কিন্তু বোকা না।

*জ্ঞানযোগ ব্যবস্থিতিঃ,* সর্বদা জ্ঞান আর যোগে অবস্থিতি। শ্রীকৃষ্ণ যখন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ ক্ষেত্রে যুদ্ধ করাচ্ছেন তখন তিনি এই জ্ঞান আর যোগে অবস্থিত হয়েই সব কিছু করেছেন। জ্ঞান হচ্ছে, শাস্ত্র ও আচার্যের মুখ থেকে শ্রবণ করে আত্ম ও অনাত্মের, ঈশ্বর, ব্রহ্মের যে ঠিক ঠিক জ্ঞান, আর এই জ্ঞানে সব সময় সচেতন থাকা। এখানে জ্ঞান বলতে প্রত্যক্ষ অনুভূতিকে বলা হচ্ছে না। আত্মা এই রকম, অনাত্মা এই রকম, ঈশ্বর এই রকম আর তাঁর সৃষ্টি এই রকম, ব্রহ্ম এই রকম আর মায়া এই রকম, এই ব্যাপার গুলো তাঁর কাছে একেবারে পরিষ্কার আর এই জ্ঞানে সব সময় সচেতন, মনটা সব সময় এই জ্ঞানে বসে আছে। দ্বিতীয় হচ্ছে যোগ, আচার্য শঙ্কর যোগের ব্যাখ্যা করছেন – যে জিনিষটাকে তত্ত্বগত ভাবে বোঝা হয়েছে, সেই জিনিষটাকে বাস্তবিক অর্থে ধারণা করে নেওয়া। বলছেন, মনের একাগ্রতা দিয়ে প্রত্যক্ষ অনুভব করে নিচ্ছে। এখানে যোগ শব্দকে বিজ্ঞান অর্থে নেওয়া হয়েছে। দুটোকেই সমান ভাবে প্রাপ্ত হয়েছে, তাঁর যে শুধু প্রত্যক্ষ অনুভব হয়েছে তাই নয়, যেটা অনুভব হয়েছে তার তাত্ত্বিক জ্ঞানটাও সে আয়ত্ত করে নিয়েছে। আবার শুধু যে তাত্ত্বিক জ্ঞানটা আছে তা নয়, তার প্রত্যক্ষ অনুভবটাও আছে।

*দানং দমশ্চ যজ্ঞশ্চ স্বাধ্যায়স্তপ আর্জবম্,* দান হচ্ছে নিজের সামার্থ অনুযায়ী কিছু দান করা। এখানে একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ শর্তের কথা আচার্য শঙ্কর বারবার বলছেন – নিজের সামর্থের বাইরে গিয়ে দান করাকে দান বলে গণ্য করা হয় না, এটা হচ্ছে মুর্খতা। নিজের সামর্থের মধ্যে দান করাটাই দান। বিভিন্ন ধর্মে দানের ব্যাপারে বিভিন্ন রকমের শর্তের কথা বলা হয়, যেমন ইসলাম ধর্মে উপার্জনের বারো ভাগের এক ভাগ দান করতে বলা হচ্ছে, হিন্দুদের মধ্যে অনেকে চার ভাগের এক ভাগ দান করে। এখন সব সম্প্রদায় থেকে বলা হয় আয়ের অন্ততঃ এক ভাগ দান করুন, কিন্তু মানুষ তাও করতে চায় না। কিন্তু যারা শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করছে তাদের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নুন্যতম দশ ভাগ দান করা উচিত। দানটা হচ্ছে ত্যাগের চিহ্ন। মূল হচ্ছে এই সংসার ত্যাগ, কিন্তু সংসার ত্যাগতো সবার পক্ষে সম্ভব নয় আর উচিতও নয়, তাই যদি দশ হাজার টাকা কারুর মাইনে হয় তাহলে এক হাজার টাকা আমার দানে যাবে এটা একেবারে নির্দিষ্ট করে রাখতে হবে। কোথায় দান করবে সেটা তার ব্যাপার, কিন্তু হিসাবের মধ্যে এটাকে ধরে রাখতে হবে। দান যদি না থাকে তাহলে মন খুব সঙ্কুচিত ও সঙ্কীর্ণ হয়ে পড়ে।

এরপর হচ্ছে *দমঃ,* দম হচ্ছে, বাহ্যকরণ উপশম্। অমুক জায়গায় খেলা হচ্ছে চলে গেলাম, অমুক জায়গায় জলসা হচ্ছে ছুটে গেলাম, অমুক জায়গায় প্রচুর সেল দিচ্ছে তিড়িং করে সেখানে চলে গেলাম, এগুলোকে আটকানই হচ্ছে দম। ঠাকুর বলছেন – কলকাতার লোকগুনো সব হুজুগে আর খালি লেকচার দেবে। হুজুগে মানেই হচ্ছে তার বাইরের ইন্দ্রিয়গুলির সংযমের অভাব। দম মানেই বাইরের ইন্দ্রিয়গুলোকে সংযত করা। *যজ্ঞঃ,* নিয়মিত যজ্ঞ করতে বলা হচ্ছে। মনুস্মৃতিতে পাঁচ রকমের যজ্ঞের কথা বলা হচ্ছে। এর মধ্যে প্রথম হচ্ছে দেবযজ্ঞ। দেবযজ্ঞকে আবার অন্য ভাবেও বলা হয়, কিন্তু দেবযজ্ঞ হচ্ছে পূজো, জপ ইত্যাদি করা। দ্বিতীয় পিতৃযজ্ঞ, পিতৃদের নামে কিছু অর্পণ করা। যেমন মহালয়ার দিনে পিতৃদের উদ্দেশ্যে অর্পণ করা, প্রতিদিন খাওয়ার সময় পিতৃদের নাম করে কিছু অন্নজল নৈবদ্য রূপে দিতে হয়। তৃতীয় হচ্ছে ভূতযজ্ঞ, পশুপাখিদের কিছু খাওয়ান। খাওয়ার পরে কুকুর, বেড়াল, গরু, পিঁপড়ের জন্য কিছু দিতে হয়। চতুর্থ নৃযজ্ঞ, প্রতিদিন নিয়মিত বাইরের কাউকে আপ্যায়ন করে কিছু খাওয়ান। হায়দ্রাবাদে রামকৃষ্ণ মঠে এক টাকা করে টিকিটে গরীবদের রোজ একবেলা পেট ভরে খাওয়ার ব্যবস্থা করা আছে। প্রতিদিন হাজার, দেড় হাজার লোক সেখানে খেতে আসে। পঞ্চম ব্রহ্মযজ্ঞ, ব্রহ্মযজ্ঞ যদিও বিশেষ করে ব্রহ্মচারীদের জন্য, কিন্তু সংসারীদেরও করা উচিৎ। ব্রহ্মযজ্ঞ হচ্ছে খুব গভীর ভাবে শাস্ত্র অধ্যয়ণ ও জপ ধ্যান করা। তার মানে, সকালে উঠে যখন জপ-ধ্যান করে গীতা উপনিষদ পাঠ করল তখন এটাই ব্রহ্মযজ্ঞ হয়ে গেল। স্নানাদি করে যে পূজো অর্চনা করল তখন সেটা হয়ে গেল দেবযজ্ঞ। এই ভাবে পাঁচটা যজ্ঞ নিয়মিত ভাবে করতে হয়। আগেকার দিনে ছিল অগ্নিহোত্রাদি কর্ম, ব্যাপারটা একই। তার সাথে বলা হচ্ছে স্বাধ্যায়, স্বাধ্যায়টা ব্রহ্মযজ্ঞের অন্তর্গত। যে কোন হিন্দুর জীবনচক্র তখনই সম্পূর্ণ হয় যখন এই পাঁচটা যজ্ঞ করা হয়। এই পঞ্চযজ্ঞ যদি না করা হয় তাহলে সে কিন্তু হিন্দু নয়। *তপঃ,* তপের উপর সপ্তদশ অধ্যায়ে বিস্তৃত আলোচনা করা হবে। *আর্জবম* হচ্ছে সরলতা, ঋজুতা। কথাবার্তায়, আচার ব্যবহারে কোন কিছুতে কোন রকম প্যাঁচঘোচ থাকবে না। অর্জুন ছিলেন ঠিক ঠিক আর্জবম। একটা শ্লোকেই এতগুলো গুণের কথা বলা হল। দ্বিতীয় শ্লোকে আরও কিছু দৈবীসম্পদের কথা বলা হচ্ছে –

**অহিংসা সত্যমক্রোধস্ত্যাগঃ শান্তিরপৈশুনম্। দয়া ভূতেষ্বলোলুপ্ত্বং মার্দবং হ্রীরচাপলম্।।২।।**

অহিংসা হচ্ছে, কোন প্রাণীকে কোন ভাবেই কষ্ট না দেওয়া। অনেকে আছেন অপরের সাথে মজা করার নামে তাকে টীজ্ করে আনন্দ পায়, কিন্তু তার সাথেই যখন অন্য কেউ মজা করতে যায় নিজের বেলায় তখন রুষ্ট হয়ে যায়। তাকে যদি সেই সময় বলা হয় আপনিও তো এইভাবে অপরের সাথে মজা করে কষ্ট দেন। তখন সে হয়তো বলবে – কই আমি তো এই ধরণের মজা করিনা। আসলে এটা ঠিকই আমরা যখন কারুর সাথে মজা করি তখন আমরা বুঝতেও পারিনা যে এই মজা করার জন্য অপরে কষ্ট পাচ্ছে। এই ব্যাপারে যিনি আধ্যাত্মিক সাধক, তাঁকে খুব সজাগ ও সাবধান থাকতে হয়। এমন কোন মজা করা উচিৎ নয় যেটাতে কারুর কষ্ট হয়।

*সত্যম্,* সত্যের মধ্যে অপ্রিয় বচনকেও ধরে নেওয়া হয়। বলছেন, অপ্রিয় কথা কখনই কাউকে বলবে না। যে রকমটি আছে সেই রকমটিই বলতে হয়। মনুস্মৃতিতেও পরিষ্কার করে বলা হচ্ছে যে সত্য আর প্রিয় সব সময় এক সাথে চলে। *অক্রোধ,* অপরে আমাকে প্রচণ্ড গালাগাল দিল কিন্তু আমি কোন প্রতিক্রিয়া না দেখিয়ে সহ্য করে নিলাম। আমাদের ব্যক্তিত্ব এত ঠুনকো আর এত ছ্যাবলামোতে ভরা যে একটু কিছু কেউ বললেই আমরা তিড়িং করে লাফিয়ে উঠি। আমাদের ব্যক্তিত্ব ঠিক হিণ্ডেলিয়ামের পাত্রের মত, আগুনে সামন্য একটু রাখলেই গরম হয়ে যায়, একটু সামান্য কিছু বললেই আমরা উত্তেজিত হয়ে পড়ি। এই ধরণের লোকেরা আধ্যাত্মিক পথে এগোতে পারেনা। যদি উল্টে তোমাকে কেউ মেরেও দেয় তাতেও তোমার ভেতরে রাগকে জাগতে দেবে না। ছ'মাসের শিশু কিছু বোঝে না, আমি কোলে করে আদর করছি, বাচ্চা আমার কান ধরে টেনে দিল, এখন কি আমি বাচ্চাটাকে মারতে শুরু করব! জগতকে এই রকম ছ'মাসের শিশুর মত দেখতে হয়। আধ্যাত্মিক সাধকের কাছে জগতের কোন গুরুত্বই নেই। জগতকে যখন ছ'মাসের বাচ্চা দেখবে তখন আর ক্রোধ আসবেই না, এই শিশুদের উপর আমি কি রাগ করব! *ত্যাগঃ,* ত্যাগ হচ্ছে সন্ন্যাসের বৃত্তি, যেটা দান থেকে শুরু হয় সেটাই ত্যাগে গিয়ে পরিসমাপ্তি হয়। *শান্তিঃ,* এখানে শান্তি হচ্ছে অন্তঃকরণের শান্তি। ঠাকুর অশান্ত অন্তঃকরণের উপমা দিচ্ছেন, মন যেন দক্ষিণেশ্বরের বানরের মত, গাছের ডালে চুপ করে বসে আছে কিন্তু মন ঘুরছে কোন বাগানে কি ফল হয়েছে। হাত পা না নেড়ে চুপচাপ বসে থাকাটাই শান্ত নয়, মনটাও শান্ত থাকতে হবে। কোন এক মহারাজ একবার মহাপুরুষ মহারাজের কাছে অনুমতি নিতে গেছেন যে তিনি এক বছর হৃষিকেশে গিয়ে মৌন থেকে তপস্যা করবেন। মহাপুরুষ মহারাজ শুধু বললেন – ভেতরটাও। আসলে মহাপুরুষ মহারাজ বলতে চাইছেন, মুখ বন্ধ করে রাখলেই মৌন থাকা হয় না, ভেতরটাও মানে অন্তঃকরণকেও মৌন রাখতে হবে। *অপৈশুনম্,* অপৈশুনম্ হচ্ছে অপরের ছিদ্র অন্বেষণ না করা, পিশুনিবৃত্তির অভাব। পিশুনি বৃত্তি হচ্ছে *পররন্ধ্র প্রকটিকরণম্,* পরের দোষ নিয়ে আলোচনা করা। পরের দোষকে নিয়ে আলোচনা করাকেই বলা হয় পিশুনি বৃত্তি। পাহাড়ী অঞ্চলে পিশু নামে ছারপোকার মত এক প্রকার পোকা হয়। পোকাগুলো বিছানায় এসে বাসা করে, এরা সব সময় পিঠ থেকেই রক্ত চুষবে। পাহাড়িদের কম্বলে শত শত হাজার হাজার পিশু থাকে। কোন রকমে যদি রাত্রিবেলা ঘুমের মধ্যে কম্বলে শরীর লেগে থাকে সকালে বিছানার সাদা চাদর লাল হয়ে যাবে। আমারই রক্তে চাদর লাল হয়ে থাকে, ঘুমের মধ্যে রক্ত খেয়ে পেট মোটা হয়ে যায়, তারপর শরীরের চাপে ওগুলো পিশে যায়, তার ফলে রক্ত বিছানাতে লেগে লাল হয়ে যায়। আধ্যাত্মিক পথে যারা আসতে চাইছেন তাদের আগে এই অপরের নিন্দা করার বৃত্তিটাকে ছাড়তে হবে। *অপৈশুনম্,* অপরের ছিদ্র অন্বেষণ করার বৃত্তি না থাকাটাও দৈবী সম্পদ। *অলোলুপ্ত্বম্,* কোন লোভ না করা। এখানে বলছেন, যদি কখন বিষয়ের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের সংযোগ হয়ে গেল, সেই সময় ইন্দ্রিয়ের কোন বিকার হতে না দেওয়া। যেমন আমার কোন বন্ধু একটা নতুন গাড়ি কেনার পর আমাকে দেখাতে এসেছে। এখন আমি গাড়িটা দেখলাম, তাতে চাপলাম। এখানে গাড়ি হচ্ছে বিষয় আর তার সাথে আমার ইন্দ্রিয়ের যোগ হল। ইন্দ্রিয়ের যোগ হতেই পারে, এখানে করার কিছু নেই। এবার যদি আমার বিকার হয়, তাহলে দুটো জিনিষ হবে, একটা হচ্ছে আমার মনে ইচ্ছে হবে আমি যদি এই রকম একটা গাড়ি পেয়ে যাই, আর তা নাহলে আমার মধ্যে হিংসা বৃত্তি আসবে। হিংসা বৃত্তি থেকে মনের মধ্যে আরেকটা বৃত্তি উঠে আমাকে চিন্তা করিয়ে নিচ্ছে – এই গাড়িটার সাথে একটা ট্রাকের ধাক্কা লাগলে হয়। এখানে বলা হচ্ছে এই বিকারকে উঠতে না দেওয়াই হচ্ছে অলোলুপ্ত্বম্। *হ্রী,* হ্রী হচ্ছে লজ্জা। মানুষ যখন যেটা করে সেটা একটা পর্দার আড়ালে করতে হয়। কিন্তু আজ টিভি খুললেই দেখা যায় সবার বাথরুম, বেডরুম সব টিভির পর্দায় নিয়ে আসা হচ্ছে। এইটাই হচ্ছে হ্রীর অভাব। যদি মদই খেতে হয় তবে লুকিয়ে খাও কেউ বারণ করছে না। অনেকে আবার বলে – আমি যা করি সবার সামনে করি, আমার কোন লুকোচুরির ব্যাপার নেই, আমি যা বলি খোলাখুলি বলি, আর আমি যা করি খোলাখুলি করি। তার মানে এর হ্রীর অভাব, এর বিনাশ হতে আর বাকি নেই। *অপৈশুনম্* আর *হ্রী,* অপৈশুনম হচ্ছে পরের ব্যাপারে, তুমি যা বলার তার সামনেই খোলাখুলি বল আর নিজের ব্যাপারে হ্রী, আমি যা করি খোলাখুলি করে বলা মানে তার হ্রী চলে গেছে। সমাজে যে কোন লোকের অপৈশুনম্ আর হ্রী যদি চলে গিয়ে থাকে তাহলে সে অসুর হয়ে গেছে। আজকাল কিছু হলেই সমাজের যে কোন স্তরের ছেলে মেয়ে বুড়ো সবাই রাস্তায় উদোম নৃত্য করতে থাকে, এদের সবার হ্রী চলে গেছে। আগেকার দিনে খুব নিচু স্তরের লোকেরা এই রকম নৃত্য করত। পূজোর সময় ধুনুচি নাচ যেটা করা হত সেটা প্রতিমার সামনেই শুধু করা হত। এখন সেই নৃত্য রাস্তায় এসে গেছে। আসলে সমাজে এখন আসুরকি বৃত্তিটা সামনে এসে গেছে। হিন্দু সমাজে আগেকার দিনে যাদের এই ধরণের বৃত্তি ছিল তাদের শূদ্র বলে অভিহিত করা হত। তোমাদের এগুলো করতে কেউ বারণ করছে না, এগুলো তুমি খুব কর, কিন্তু তুমি সমাজের বাইরে থাকবে সামনে আসবে না। এখন গণতন্ত্রের যুগ, সব

বাঁধন আলগা করে দেওয়াতে সব কিছু বাইরে চলে এসেছে। সমান অধিকার খুবই ভালো, স্বামীজীও বলছেন সমান অধিকার না হলে সমাজ এগোতে পারবে না, কিন্তু দুর্গুণেরও যদি সমান অধিকার দিয়ে দেওয়া হয় তাহলে তার ফল সমাজকেই ভোগ করতে হবে, এবং তাই হচ্ছে ইদানিং। *মার্দবম্,* মৃদু ভাষা ব্যবহার করা, কটূ কথা না বলা। *অচাপলম্,* বিনা কারণে হাত পা না নাড়া, বিনা কারণে কথা না বলা। বাচ্চারা চপল হয়, সব সময় হাত পা নেড়েই যাচ্ছে, আর কথা বলতেই থাকে, বাচ্চারা যদি এগুলো না করে তাহলে বুঝতে হবে বাচ্চার শারীরিক কোন ত্রুটি আছে, এটাই এদের স্বাভাবিক। কিন্তু বড় হয়েও যদি এই রকম করে তাহলে বুঝতে হবে মস্তিষ্কে বা শরীর মনে কোথাও তার কোন গণ্ডগোল আছে। আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে বয়স অনুসারে বিভিন্ন সময়ে কিছু কিছু জিনিষ থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে আসতে বলা হয়। চপল জিনিষটাকে খারাপ বলা হয় না, কিন্তু তা বাচ্চা বয়সেই সীমাবদ্ধ। বাচ্চা বয়সকে তুমি অতিক্রম করে এসেছ এখন তোমার আর চপলতা শোভা পায় না। তারপরে আরও কিছু দৈবী সম্পদের কথা বলা হচ্ছে –

**তেজঃ ক্ষমা ধৃতিঃ শৌচমদ্রোহো নাতিমানিতা। ভবন্তি সম্পদং দৈবীমভিজাতস্য ভারত।।৩।।**

*তেজঃ,* তেজকে এখানে আচার্য বলছেন প্রাগলভ, সব সময় শরীরের মধ্যে একটা ঝকঝকে তরতাজা ভাব। আচার্য এটাও বলছেন, চামড়ায় প্রসাধন করে, মানে পাউডার, ক্রীম লাগিয়ে ঝকঝক করা হচ্ছে না, সামনে দাঁড়ালেই মনে হবে যেন তেজ বেরোচ্ছে। *ক্ষমা,* কেউ আমার সাথে দুর্ব্যবহার করলে আমার মনে কোন বিকার আসবে না। ক্ষমা মানে এই নয় যে, মনে মনে ফুঁসছি কিন্তু মুখে কিছু বলছি না, এখানে বলা হচ্ছে তোমার মনে এই নিয়ে কোন বিকারই উঠবে না। আগে বলা হয়েছিল অক্রোধ আর এখানে বলা হচ্ছে ক্ষমা, আচার্য শঙ্কর বলছেন – অক্রোধ মানে, আমার মধ্যে ক্রোধটা এসেছে কিন্তু আমি ক্রোধটাকে ঠাণ্ডা করে নিলাম, এটা হল অক্রোধ, কিন্তু ক্ষমা হচ্ছে আরেক ধাপ উঁচুতে। ক্ষমাতে ক্রোধকে উঠতেই দিল না। আচার্য শঙ্কর হচ্ছেন ভগবান, তিনি একজন অবতার, যখন দেখলেন শাস্ত্রে একই ভাবে যখন দুটো শব্দ আসছে কিন্তু দুটোর মধ্যে একটা সূক্ষ্ম তফাৎ রয়েছে, তিনি সেই সূক্ষ্ম তফাৎটাকে পরিষ্কার করে দিয়ে আমাদের সংশয়কে দূর করে স্পষ্ট করে দিলেন। *ধৃতিঃ,* আমরা যখন কাজকর্ম করি তখন পরিশ্রান্ত হয়ে অবসন্ন হয়ে যাই, অবসন্ন হয়ে যাওয়ার পর আর কিছু করার ইচ্ছা থাকে না। কিন্তু ঐ অবস্থাতেও নিজের শক্তিকে ধরে রাখা এটাই হচ্ছে ধৃতি।

কিছু দিন আগে কোন এক টিভি চ্যানেলের এক মহিলা সাংবাদিক রাজস্থানের এক প্রত্যন্ত গ্রামের মহিলাদের উপর একটা তথ্যচিত্র তৈরী করতে গিয়ে সেই গ্রামের মহিলাদের সাথে থাকতে হয়েছিল। গ্রামের মহিলারা বলছে – আমরা তোমাকে ইন্টারভিউ দেব কিন্তু আমরা সারাদিন যা করি সেটা তোমাকেও করতে হবে। সাংবাদিক মহিলাটি রাজি হয়ে যাওয়ার পর সকালবেলা গম ক্ষেতে নিয়ে ওরা তার হাতে একটা কাস্তে ধরিয়ে দিয়ে বলছে এই গমগুলো কাট। কাস্তে চালান সবার দ্বারা হয় না, এমনিতে দেখলে মনে হবে খুব সহজ, কিন্তু সেই সাংবাদিক মহিলা কাস্তে নিয়ে গম ক্ষেতে নেমে গিয়ে যেই কাটতে গেছে দেখছে কিছুই কাটছে না। ঐ দেখে গ্রামের মেয়ের হো হো করে হাসতে শুরু করেছে। মহিলা সাংবাদিকের তখন আঁতে একটু করে ঘা লাগতে শুরু করেছে। তারপর সারাদিন খাটাখাটুনির পর বাড়িতে এসে সন্ধ্যে বেলা এক গামলা আটা হাসিমুখে ঠাসতে শুরু করেছে, মুখে চোখে কোন বিকার নেই। সাংবাদিককেও দেওয়া হয়েছে আটা ঠাসতে, সেখানেও তার নাজেহাল অবস্থা। ঐ সাংবাদিক মহিলা খুব লজ্জা করে লিখছেন, সারাদিন এরা ক্ষেতে হাড়ভাঙা খাটুনি করে এসে সন্ধ্যেবেলা রান্না করতে বসেছে, আবার রাত্রিবেলা গিয়ে স্বামীর পা টিপতে হবে, অথচ এদের মনে কোন বিকার নেই। সাংবাদিক স্বীকারোক্তি করছে, আমিও তো রোজ সারাদিন খাটাখাটুনির পর বাড়ি ফিরি কিন্তু কোন দিন আমার স্বামীর জন্য এক কাপ চাও করে দিইনি রান্নতো দূরের কথা, আর গ্রামের মহিলাদের উপর কত অত্যাচারের কাহিনী আমরা শুনে আসছি, কিন্তু কোথাও অত্যাচার হচ্ছে দেখতে পেলাম না, এরাতো কি হাসিমুখে আনন্দে সব কাজ করছে, এদের মধ্যে এই নিয়ে ক্ষোভও নেই বিকারও নেই। ওদের যদি বলা হয় তুমি কেন রান্না করতে যাচ্ছ, ছেড়ে দাও রান্না করা। ওরা অবাক হয়ে যাবে, কেন রান্না করব না, এটাইতো আমার ধর্ম। এটাকেই বলা হচ্ছে ধৃতি। সারাদিন কাজ করার পর সন্ধ্যে বেলাতেও যে শারীরিক শক্তিটাকে ধরে রেখেছে, সেটা দিয়ে পরিবারের সবার রান্না করবে, সবাইকে খাওয়াবে, শোওয়ার সময় স্বামীর পা টিপবে, আবার সকাল হলে মাঠে গিয়ে খাটবে, এটা হয় ধৃতি থেকে, নিজের শক্তিটাকে ধরে রাখা। *শৌচ,* যোগশাস্ত্রেও শৌচের উপর প্রচণ্ড গুরুত্ব দেওয়া হয়। শৌচ হচ্ছে মনের ভেতর আর শরীরের বাইরের সব কিছুকে পরিষ্কার রাখা। জল ও মাটি দিয়ে শরীরের ধৌত ও মার্জনা করাই বাহ্য শৌচ। আগেকার দিনে সাবান ছিল না বলে মাটি দিয়ে সাবানের সব কাজ করা হত। শুধু তাই নয়, যে পোষাক এক দিন ব্যবহার করা হয়েছে পরের দিন সেই পোষাক না ধুয়ে আর ব্যবহার করা চলবে না। আজকালকার দিনে সময়ের যেমন অভাব তেমনি জলের সরবরাহও সীমিত, সেইজন্য সবার পক্ষে রোজ জামা কাপড় কাচা সম্ভব হয়ে ওঠে না। কিন্তু শৌচ মানে শরীরের মার্জনার সাথে সাথে নিজের জামা কাপড় একদিনের বেশি ব্যবহার না করা। সাধারণ জামা কাপড় ব্যবহার করবে যার মধ্যে একটা শালীনতা থাকবে কিন্তু কাচবে রোজ। এরপর বলছেন *অদ্রোহ,* অপরের প্রতি শত্রু বা বৈরী ভাব না রাখাকে বলা হচ্ছে অদ্রোহ। *নাতিমানিতা,* অতিমানিতা হচ্ছে নিজেকে বিরাট মনে করা। আমার মধ্যে অনেক গুণ থাকতে পারে কিন্তু ভাবছি আমার মত আর কেউ নেই। অতিমানিতার বিপরীত হচ্ছে নাতিমানিতা, আমার যত গুণই থাকুক না কেন, সেই গুণ নিয়ে আমি কখনই নিজেকে বিরাট কিছু মনে করছি না আর নিজের গুণের ব্যাপারে অপরের কাছে নিজেকে জাহিরও করছি না।

*অভিজাতস্য ভারত*, হে অর্জুন এই যে দৈবী গুণের কথা বলা হল, এই গুণ গুলোই হচ্ছে ঠিক ঠিক আভিজাত্যের লক্ষণ। আমরা মনে করি ভালো বাড়ি, ভালো গাড়ি, অনেক টাকা থাকলে তাকেই আভিজাত্য বলা হয়। কিন্তু তা নয়, এই দৈবী সম্পদ যার মধ্যে আছে তারই আভিজাত্য আছে বলতে হবে। এই গুণ গুলি যদি থাকে তাহলে আভিজাত্য আছে, যার নেই তার সব কিছু থাকলেও আভিজাত্য নেই বলতে হবে, তাহলে সে অসংস্কৃত। যাদের আসুরিক বৃত্তি তাদের কি হয় –

**দম্ভো দর্পোঽভিমানশ্চ ক্রোধঃ পারুষ্যমেব চ। অজ্ঞানং চাভিজাতস্য পার্থ সম্পদমাসুরীম্।।৪।।**

*দম্ভঃ* শব্দকে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ভাবে অর্থ করা হয়, কিন্তু এখানে হচ্ছে ধর্মধ্বজী, ধর্মের পতাকাকে খুব উঁচু করে রাখা, আমার মত ধার্মিক কেউ নেই। যখন কুম্ভমেলার মত বড় মেলা হয় সেখানে সাধুদের তাঁবুতে খুব উঁচু উঁচু পতাকা লাগান থাকে, যার পতাকা যত উঁচু সে তত বড় পাণ্ডা। দম্ভ মানে হচ্ছে লোককে দেখানো আমি একটা বিরাট কিছু। *দর্পঃ*, এটাও অহঙ্কার, নিজের জন্য অহঙ্কার হচ্ছে না, কিন্তু নিজের বংশ, পরিবার নিয়ে অহঙ্কার। এখানে অহঙ্কার দুই রকমের আমি অমুক বড় বংশের, দ্বিতীয় আমার এই সাফল্য। এগুলো সবই আসুরিক বৃত্তি, যাদের মধ্যে আসুরিক বৃত্তি আছে তাদের মধ্যে এই দম্ভ, দর্প এগুলো অত্যধিক দেখা যাবে। *অভিমানঃ*, নিজের মধ্যে খুব অহঙ্কার আছে কিন্তু প্রকাশ করছে না, ভেতরে ভেতরে খুব অহঙ্কার থাকে। *ক্রোধঃ*, রাগ করা। *পারুষ্য*, কাউকে কড়া কথা বলা, কটূ কথা বলা। যখন কাউকে আঘাত দিয়ে ব্যঙ্গ করে কিছু বলা হয় সেটাই কড়া কথা। কেউ হয়তো কানা তাকে বলছে সুনয়না। অন্ধ ভিক্ষা করছে, এই ধরণের লোকেরা বলবে, বাঃ তোমার চোখটা দারুণ তো। এগুলো চ্যাংড়া ছেলেরা নিজেদের বন্ধুদের মধ্যে করে থাকে। মানুষ যখন জন্মায় তখন তারা স্বভাবতই অসংস্কৃত হয়েই জন্মায়। সেইজন্য বাচ্চাদের মধ্যে প্রথমের দিকে আসুরিক বৃত্তিটা প্রবল থাকে, পরিবারে যেমন যেমন বড় হতে থাকে বাড়ির সংস্কৃতি আর অনুশাসন তার এই আসুরিক বৃত্তিকে মার্জিত করতে থাকে। মার্জন করতে করতেই ধীরে ধীরে আভিজাত্যটা আসতে থাকে। *অজ্ঞানং*, কর্তব্য আর অকর্তব্যের ব্যাপারে অজ্ঞ, কি করা উচিত আর কি করা উচিত নয় এই জ্ঞানটা তার থাকে না। *চাভিজাতস্য পার্থ সম্পদমাসুরীম্* যারা এই ধরণের গুণ নিয়ে জন্ম নিয়েছে তারা হচ্ছে আসুরিক বৃত্তি সম্পন্ন ব্যক্তি। যাদের মধ্যে দৈবীসম্পদ আছে একমাত্র তাদেরকেই আভিজাত্য বলা হয়। এই আসুরকি সম্পদকে পরে আরও বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করবেন। এই দুটো, দৈবী ও আসুরিক সম্পদ যার থাকে তার কি হয়?

**দৈবী সম্পদ্বিমোক্ষায় নিবন্ধায়াসুরী মতা। মা শুচঃ সম্পদং দৈবীমভিজাতোঽসি পাণ্ডব।।৫৫।।**

যদি দৈবী সম্পদ কারুর মধ্যে এসে যায় তাহলে সে মুক্তির দিকে এগিয়ে যায়। সত্ত্বগুণ যাদের এসে যায় তাদেরই মধ্যে এই দৈবী সম্পদ জাগ্রত হয়, সত্ত্বগুণ না হলে দৈবী সম্পদ আসে না। যাদের মধ্যে আসুরিক বৃত্তি আছে তাদেরকে আস্তে করে বেঁধে নিয়ে চলে যায়, সংসারের দিকে তাকে ঠেলে দেয়। এইসব কথা শুনে অর্জুনের মাথা ঘুরতে আরম্ভ করেছে এই ভেবে যে, এই যত দৈব সম্পদের কথা বলা হল, এগুলো আমার মধ্যে আছে কি নেই কি কর বুঝব। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্যামী, তিনি অর্জুনের মনের ভাব বুঝতে পেরে তাঁকে আশ্বাস দিয়ে বলছেন – *মা শুচঃ সম্পদং দৈবীমভিজাতোঽসি পাণ্ডব* - হে অর্জুন, তুমি শোক করো না, তোমার ঘাবড়াবার কিছু নেই দৈবী সম্পদ নিয়েই তোমার জন্ম হয়েছে। আগের আগের জন্ম থেকে এই দৈবসম্পদ তুমি নিয়ে এসেছ। গীতাতে পুনর্জন্মের উপর খুব বেশি কর জোর দেওয়া হয়েছে। আসলে গীতাতে যে এতগুলো দৈবীসম্পদের কথা বলা হয়েছে, কোন লোকের মধ্যেই সব কটি দৈবীসম্পদ একসাথে থাকে না। কিন্তু কারুর মধ্যে দু-চারটে দৈবীসম্পদ যদি খুব দৃঢ় ভাবে থাকে আর সে যদি ভাবে আমাকে উপরে দিকে উঠতে হবে তাহলে বাকি গুণগুলো আস্তে আস্তে তার মধ্যে প্রকটিত হতে থাকবে। তারপর বলছেন –

**দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন্ দৈব আসুর এব চ। দৈবো বিস্তরশঃ প্রোক্ত আসুরং পার্থ মে শৃণু।।৬।।**

সৃষ্টি যখন হয়েছিল তখন এই দুই রকমের সম্পদ সম্পন্ন মানুষের সৃষ্টি হয়েছিল দৈব ও আসুর। পুরানে এটাকেই অন্য ভাবে বলা হয়েছে, সেখানে বলছে প্রজাপতির দুই সন্তান, দেবতা আর অসুর। গীতাতে দেবতা বা অসুরের দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে না, এখানে শুধু মানুষকে নিয়েই বলা হচ্ছে। দৈবীসম্পদের ব্যাপারে ভগবান বিস্তারিত ভাবে বললেন এবার ভগবান আসুরী সম্পদের কথা বলছেন। গীতাতে এসে গুণগুলোকে দু ভাগে ভাগ করে দেওয়া হয়েছে। মানুষ মাত্রই দুই ধরণের গুণ নিয়ে জন্মায়, কিছু মানুষের মধ্যে থাকে দৈবীসম্পদ এবং কিছু মানুষের মধ্যে আছে আসুরিক সম্পদ। প্রথম তিনটে শ্লোকে মানুষের দৈবীসম্পদের কথা বলা হল। এর পর থেকে আসুরিক বৃত্তি গুলিকে নিয়ে বলছেন –

**প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ জনা ন বিদুরাসুরাঃ। ন শৌচং নাপি চাচারো ন সত্যং তেষু বিদ্যতে।।৭।।**

আসুরিক বৃত্তি সম্পন্ন যারা, তারা ভালো ভালো যে গুণ গুলো রয়েছে সেগুলো অনুশীলন করা তো দূরের কথা এই গুণগুলোর ব্যাপারে তাদের কোন ধারণাই নেই। বেদে দু রকম ধর্মের কথা বলা হয় – একটা হচ্ছে প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম আর নিবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম। প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম হচ্ছে একটা কিছুতে লাগা, আর নিবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম হচ্ছে সরে আসা। প্রবৃত্তিমার্গ হচ্ছে গৃহস্থধর্ম আর নিবৃত্তিমার্গ

হচ্ছে সন্ন্যাসধর্ম। কিন্তু প্রবৃত্তি হচ্ছে একটা কিছুতে মন দেওয়া, কিন্তু একজন সন্ন্যাসী যখন সন্ন্যাসের দিকে মন দিল তখন বলা হয় সন্ন্যাসে তার প্রবৃত্তি হয়েছে, এখানে তার জগৎ থেকে নিবৃত্তি হয়েছে। নিবৃত্তিমার্গ হচ্ছে সন্ন্যাস, কিন্তু নিবৃত্তি মানে হচ্ছে সরে আসা। সন্ন্যাসধর্মে যখন প্রবৃত্তি হয় তখন তাকে বলা হচ্ছে নিবৃত্তিমার্গ, নিবৃত্তি আর নিবৃত্তিমার্গ দুটো আলাদা জিনিষ। এগুলো খুব সূক্ষ্ম তফাৎ। প্রবৃত্তি হচ্ছে কোনটা করতে হয় আর নিবৃত্তি হচ্ছে কোনটা থেকে সরে আসতে হয়, প্রবৃত্তি আর নিবৃত্তি এই দুটো একসাথেই চলে, সেন্ট্রিফিউগাল ফোর্স ও সেন্ট্রিফিউডাল ফোর্সের মত এক সঙ্গে থাকে। আমরা এখন ষোড়শ অধ্যায় অধ্যয়ণ করছি, মানে এর মধ্যে আমাদের প্রবৃত্তি আছে। এরপর আমরা চা পান করতে যাব তখন চায়ে প্রবৃত্তি হয়ে যাবে, এখান থেকে তখন স্বাভাবিক ভাবেই নিবৃত্তি হয়ে যাবে। একটা জিনিষের থেকে নিবৃত্তি না হলে অন্য জিনিষে প্রবৃত্তি হয় না। এখানে বলছেন – পুরুষার্থ সাধনে প্রবৃত্তি। পুরুষার্থ হচ্ছে ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ, এই চারটেতে লেগে থাকাটা হচ্ছে ঠিক ঠিক প্রবৃত্তি। আর এখানে নিবৃত্তি মানে অনর্থহেতো, যেগুলো অনর্থ কারণ সেখান থেকে সরে আসা। এখানে নিবৃত্তি বলতে সন্ন্যাসকে বোঝাচ্ছে না, বলছেন সরে থাকতে হয়। কোথা থেকে সরে থাকতে হয়? অনর্থহেতো, যেগুলো পুরুষার্থ সাধনে সাহায্য করে না, যেমন মিথ্যে কথা বলা, চুরি করা, ছল করা ইত্যাদি এগুলো সব হচ্ছে অনর্থ কারণ। ভগবান বলছেন, যাদের আসুরিক বৃত্তি তাদের এই প্রবৃত্তি আর নিবৃত্তির জ্ঞান একেবারেই থাকে না। দুর্যোধন যেমন বলছেন, আমি ধর্মটা কি জানি কিন্তু তাতে প্রবৃত্তি হয় না, অধর্মটা কি সেটাও জানি কিন্তু সেখান থেকে মন সরে আসছে না। প্রবৃত্তি মানে ধর্মে মন দেওয়া আর নিবৃত্তি মানে অধর্ম থেকে নিজেকে সরিয়ে আনা। এখানে এইটাই বলা হচ্ছে, আসুরিক মনোভাবাপন্ন ব্যক্তির প্রবৃত্তি আর নিবৃত্তির জ্ঞানই থাকে না। দুর্যোধন এদের থেকে এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে বলছে, সে ধর্ম ও অধর্মটা জানে কিন্তু অধর্ম থেকে সরে আসতে মন চাইছে না। এখানে কিন্তু তা বলা হচ্ছে না, যারা আসুরিক তারা জানেও না ধর্ম কোনটা আর অধর্ম কোনটা। এরা মনে করে আমি যেটা করছি সেটাই ঠিক।

*ন শৌচং নাপি চাচারো ন সত্যং তেষু বিদ্যতে* – আসুরকি বৃত্তি সম্পন্ন লোকের মধ্যে তিনটে জিনিষের অভাব বিশেষ ভাবে পরিলক্ষিত হয় – শৌচের অভাব, আচারের অভাব আর সত্যের অভাব। যারা কম বয়সী তাদের ক্ষেত্রে এই জিনিষগুলো প্রযোজ্য নয়। কিন্তু একটা বয়সের পর এই তিনটে জিনিষের অভাব থাকাটা একেবারেই বাঞ্ছনীয় নয়। আগেকার দিনের ব্রাহ্মণ ছেলেদের ছোটবেলা থেকেই এই অভ্যাস গুলোকে অনুশাসনের মাধ্যমে তৈরী করিয়ে দেওয়া হত, যার ফলে এরাও খুব কঠোর ভাবে পালন করতে বাধ্য থাকত, সেখানে কোন চালাকি করতে পারতো না, এও জানতো যে এটাই আমাদের জীবনচর্চা। এরাও আশায় বসে থাকতো কবে আমার উপনয়ন হবে, উপনয়ন হওয়া মানে বেদারম্ভ, আমি বেদকে জানতে পারবো। এখন সব কিছুই একটা উপাচার আর আনুষ্ঠানিক পর্যায়ে চলে গেছে। *আচারঃ* হচ্ছে, শাস্ত্র আর আচার্যের কাছ থেকে যে জিনিষগুলো আমি জেনে গেলাম এবার সেটাকে ঠিক ভাবে পালন করে যাওয়া। সব শেষে তৃতীয় হচ্ছে *সত্যম্* - জিনিষটা ঠিক যে রকম, সেই রকম না বলাটাই হচ্ছে অসত্য।

যারা আসুরিক বৃত্তি সম্পন্ন তারা অশুদ্ধ হবে, পোশাক, শরীরের ব্যাপারে কোন শৌচ রক্ষা করবে না, এঁটোখাটা কিছুই মানবে না। এরা *মায়াবীনহ*, মায়াবীনহ মানে দুরাচারী, দেখায় এক রকম করে অন্য রকম, এদের সব কিছুই ছল, কপট আর মিথ্যাচারে ভরা। কথাও মিথ্যা বলে আর আচরণটাও মিথ্যা। এই তিনটে যার মধ্যে থাকবে সে হল পুরোপুরি অসুর। এই তিনটেই যদি কারুর মধ্যে না থাকে তাহলে সে দৈবী সম্পন্ন। তবে সবার মধ্যে কিছু না কিছু এই আসুরিক গুণগুলো থাকে। অনেকে এমন শুদ্ধাচারী যে চা খাওয়ার পরও হাত ধুয়ে নেয়। টাকা-পয়সা এগুলো হচ্ছে লক্ষ্মী আর বিদ্যা হচ্ছে সরস্বতি। এইজন্য একদিকে চা খাচ্ছে আবার সেই হাতে টাকা পয়সা ঘাটতে গেলে মনটা খুঁত খুঁত করবে, যারা ঠিক ঠিক আচারি তারা সেইজন্য বাইরে বেরিয়ে চাও খাবে না। পূজোর সময় পূজারীকে যদি কোন কারণে একটা কথা বলতে হয় তাহলে তাকে আচমণ করে শুদ্ধি করে নিতে হয়, কারণ কথা বলা মানে মুখকে এঁটো করে দেওয়া। অনেকে মনে করতে পারেন এগুলো শুচিবাঈয়ের পর্যায়ে চলে যায়। কিন্তু এগুলোকে শুচিবাঈ দোষের মধ্যে গণ্য করা যায় না, কারণ যারা শুচিবাঈগ্রস্ত তারা সব সময় তটস্থ থাকে এই বুঝি আমার অশৌচ হয়ে গেল, সব সময় গেল গেল ভাব। কিন্তু যখন খুব পবিত্র ভাবে উচ্চ ভাব নিয়ে পূজো করে তখন কথা বললে মুখটা এঁটো হয়ে যাবে এই ব্যাপারে পূজারীকে সব সময় সজাগ থাকতে হয়। ঠাকুর যেটাকে শুচিবাঈ বলছেন এটা এক প্রকার মানসিক ব্যাধি এই ব্যাধিকে ডাক্তারী ভাষায় বলা হয় ওসিডি, Obsessive Compulsive Disorder, ওসিডি যখন এসে যায় তখন তার মনটা সব সময় শঙ্কাতে থাকে, দরজায় তালা লাগাল, দু পা চলে যাওয়ার পর আবার ফিরে এসে দেখবে তালা লাগান হয়েছে কিন। এগুলো শুচিবাঈ, ঠাকুর এদের কথাই বলছেন। কিন্তু যাদের আধ্যাত্মিক জীবন তাদের আচার ও শৌচ অত্যন্ত অত্যাবশ্যক। শুচিভাব না থাকলে কখনই আধ্যাত্মিক জীবন হবেই না। স্বামীজী একবার কিসব খেয়ে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে গিয়ে বলছেন – আমি আজ অনেক কুখাদ্য খেয়ে এসেছি। মানে স্বামীজী আগে থাকতেই ঠাকুরকে সাবধান করে দিচ্ছেন, ঠাকুর আচারি ব্রাহ্মণ কিনা, কোথায় বসলে কি অশুচি হয়ে যাবে তাই। ঠাকুর বলছেন, ওতে তোর কিছু হবে না। স্বামীজী যাই খাননা কেন তাতে তাঁর কখন অশুদ্ধি হবে না। অন্য দিকে আভ্যন্তর শুচিতা হচ্ছে মনের শুদ্ধি, যোগশাস্ত্রে এই নিয়ে বিশদ আলোচনা আছে। অহিংসা, স্বাধ্যায় এগুলো হচ্ছে আভ্যন্তর শুদ্ধি। দৈবীসম্পদে যে গুণগুলোর কথা বলা হল এগুলোকে সচেতন ভাবে অনুশীলন করাটাই আভ্যন্তর শুদ্ধি। এর পরের শ্লোকে বলছেন –

**অসত্যমপ্রতিষ্ঠং তে জগদাহুরনীশ্বরম্। অপরস্পরসম্ভূতং কিমন্যৎ কামহৈতুকম্।।৮।।**

আসুরিক বৃত্তি সম্পন্ন মানুষরা জগতকে যেভাবে দেখে, জগতের সম্বন্ধে এদের যে দর্শন সেটাকেই এখানে বলা হচ্ছে। এরা বলে, *অসত্যমপ্রতিষ্ঠং*, আমরা যেমন মিথ্যে দিয়ে ভরা এই জগতটাও মিথ্যাতে প্রতিষ্ঠিত, জগতে সত্য বলে কিছু নেই। ঠাকুর বলছেন মূলো খেলে মূলোর ঢেকুর ওঠে, আমি আপনি সবাই মিথ্যাকে আশ্রয় করে আছি তাই জগতটাকেও দেখছি অসত্য। জগতের সব কিছুর পরিবর্তন হচ্ছে, কোনটাই সত্য নয়, আর এই জগত শুধুই চালবাজিতেই ভরা, এই ভাবটা এসে যায়। *অপ্রতিষ্ঠং*, এদের মতে ধর্ম আর অধর্ম জগতের প্রতিষ্ঠার কারণ নয়। কিন্তু শাস্ত্র বলছে জগতটা ধর্ম আর অধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত। এর আগে পঞ্চদশ অধ্যায়ে বলা হয়েছে – *গুণপ্রবৃদ্ধা বিষয়প্রবালাঃ*, এই সংসারবৃক্ষের মূল হচ্ছে ধর্ম আর অধর্ম। কিন্তু আসুরকি বৃত্তির লোকেরা এই কথা মানবে না। *জগদাহুরনীশ্বরম্* জগত ঈশ্বর বিহীন, এখানে ঈশ্বর বলে কিছু নেই। ভগবান বুদ্ধও ঈশ্বর মানতেন না, কিন্তু এখানে এই জিনিষটাকে বলা হচ্ছে না। গীতাতে বলছে – একটা নিয়মে ধর্ম ও অধর্ম নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। কিন্তু ভগবান বুদ্ধ এই ধর্মচক্রটাকে আবার মানতেন, সেটাকেই তিনি সারনাথে প্রতিষ্ঠিত করলেন। একটা অদৃশ্য শক্তি এই ধর্মকে নিয়ন্ত্রণ করে। আমরা বলি জগতের যা কিছু সৃষ্টি ঈশ্বরের, তিনিই সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করছেন, তিনিই সব দেখছেন, আমি আপনি এখানে কিছুই নয়। এই জিনিষগুলোকে এরা মানবে না, ঈশ্বর বলে আবার কিছু আছে নাকি, সব ফালতু, কিছুই নেই, তাই ঈশ্বরের সেবা না করে আগে মানুষের উপকার কর। কিন্তু অধ্যাত্ম শাস্ত্র বলছে আগে এই আমিটাকে মানে নিজেকে বাঁচাবার চেষ্টা কর, জগতোদ্ধারের কাজ তুমি কি আর করবে। ঠাকুর বলছেন গঙ্গাতে বর্ষার সময় প্রচুর কাঁকড়া হয়। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে তোমার অস্তিত্ব এই কাঁকড়া থেকেও নিকৃষ্ট, তুমি আবার কি জগতের ভালো করবে! নিজের ভালোটা আগে দেখ, তারপর তুমি অপরের ভালো করতে যাও। স্বামীজী যে বলছেন অপরের ভালো করার কথা, স্বামীজী কিন্তু অপরের ভালো করার কথা কোথাও বলছেন না, তিনি শিব রূপী জীবের সেবা করার কথা বলছেন, এই দুটোতে তফাৎ আছে। সেবা করার কথায় বলছেন, তুমি যে সেবা কাজ করছ আসলে তুমি নিজের ভালোর জন্যই করছ অপরের জন্য নয়।

*অপরস্পরসম্ভূতম্*, এই আসুরিক বৃত্তির লোকের বলে এই জগৎ কিভাবে সৃষ্টি হচ্ছে? যখন নারী আর পুরুষের সংযোগ হয় তখন সৃষ্টি হয়। নারী পুরুষের সংযোগ কেন হয়? *কিমন্যৎ কামহৈতুকম্* - এর একটাই কারণ কাম, কাম হেতু। মনে যখন কাম উদ্রেক হয় তখন স্ত্রী পুরুষ কাছাকাছি হয়, কাছে গেলে সৃষ্টি এগোতে থাকে। পশু, পাখি, কীট, পতঙ্গ, মানুষ সব প্রাণীর মধ্যে তাই হয়, আর সৃষ্টি এইভাবেই চলছে। এইটাই হচ্ছে চার্বাকদের মত, বিজ্ঞানও এই একই কথা বলে, সৃষ্টি যেটা হয় এটার পেছনে কোন অদৃশ্য কারণ নেই, ধর্ম ও অধর্ম বলে কিছু নেই। বিগ্‌ব্যাঙ হলো, তারপর কোন ভাবে জগতে জীবন এসে গেছে, তারপর নারী আর পুরুষের সংযোগে সৃষ্টি চলতে থাকে। এই ভাবটা গীতার মতে আসুরিক ভাব। গীতা এই ভাবটাকে অস্বীকার করছে না, বলছে এটাও আছে কিন্তু এটা আসুরিক মত। এই ভাব যদি তুমি রাখ তাহলে কিন্তু তুমি সংসার বন্ধনে পড়ে যাবে। এই কারণে আধ্যাত্মিকতা আর বিজ্ঞান কখনই একসাথে যেতে পারেনা। সৃষ্টির ব্যাপারে বিজ্ঞানের যে মত সেটা গীতা কখনই গ্রহণ করবে না। আমাদের দেশে যত আধ্যাত্মিক পুরুষ এসেছেন এনারা অদৃশ্য জিনিষ যেটা সেটাকে সামনে নিয়ে আসেন। এনারা বলেন, যা কিছু হয় এর পেছনে একটা অদৃশ্য কারণ আছে, সেই অদৃশ্যটা অন্ধকারে ঢাকা কোন অবস্তু নয়, একেবারে চৈতন্যবান সত্তা। আমি যে রকম কর্ম করছি সেই রকমই ফল দেবে কিন্তু চলবে অদৃশ্য ভাবে, ওটাকে দেখা যায় না। নারী পুরুষ সংযোগের উপরেই যদি সব কিছু চলত তাহলে, বন্ধ্যানারীর বা দুটো সন্তান হয়ে অনেক নারীর আর কোন সন্তান হয় না, আর অনেক সময় নারী পুরুষ সংযোগ হয়েও কিছু হয় না, তাই আমাদের দেশের নারীরা এখনও সন্তান কামনার জন্য ভগবানের কাছে শরণাপন্ন হয়। আমাদের হিন্দুধর্মের অনেক শাস্ত্রেই নারী পুরুষের সংযোগ ব্যতিরেকেই অনেক জন্মের কাহিনী পাওয়া যায়, যেমন কৌরবদের জন্ম অন্য ভাবে হয়েছে, শুকদেবের কোন মা নেই অথচ তাঁর জন্ম হয়েছে। আবার প্রায়ই দেখা যেত কোন মুনি বা ঋষি তাঁর শক্তি যেটা, সেটাকে অগ্নিতে স্থাপন করে দিতেন, তখন অগ্নি হয়ে গেল গর্ভ, সেখান থেকে একটা সন্তান বেরিয়ে এল। দ্রৌপদী ও ধৃষ্টদ্যুম্নের মাও নেই বাবাও নেই, যজ্ঞের অগ্নি থেকে এদের দুজনের জন্ম হয়েছিল। খ্রীশ্চানরা বলে যোশেফ ও মেরীর সংযোগ ব্যতিরেকেই যিশুর জন্ম হয়েছে। কিন্তু দ্রৌপদীর তো কোন যোগাযোগই হয়নি, পুরোপুরি অগ্নি থেকে হয়েছে। যিশুর জন্মের হাজার বছর আগে মহাভারত লেখা হয়ে গেছে। যজ্ঞ থেকে জন্মের অনেক কাহিনী মহাভারতেই লিপিবদ্ধ হয়ে আছে। অন্য দিকে আরেকটা যেটা খুব মারাত্মক সমস্যা এসে যায়, তা হল অর্জুনরা আক্রমণ করে দ্রুপদ রাজাকে বন্দী করে নিয়ে গেছে। দ্রুপদ সেখান থেকে ছাড়া পেয়ে রাজ্যে এসে যজ্ঞ করার পর দ্রৌপদীর জন্ম, তাহলে অর্জুন আর দ্রৌপদীর বয়সের বিরাট পার্থক্য এসে যাচ্ছে, অর্জুন দ্রৌপদীর থেকে প্রায় আঠারো বছরের মত বড়। তাহলে তো সেটা আবার ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে মিলবে না। সেখানে তাই কি বলা হচ্ছে? যজ্ঞ থেকে জন্ম নিয়েই দ্রৌপদী বড় হয়ে গেল। এটা এতো বেশি অলৌকিক ব্যাপার যে এই ব্যাপারটাকে অনেক হিন্দুই মানতে চাইবে না। তাহলে আরেকটা যেটা সম্ভবনা থাকতে পারে, এদের আগেই জন্ম হয়ে গিয়েছিল কিন্তু একটা সময়ে গিয়ে যজ্ঞ করার সময় আমার ছেলেকে যজ্ঞের নামে উৎসর্গ করা হল দ্রোণাচার্যের বধের জন্য। তবে এগুলো আখ্যায়িকা বলে বেশি আক্ষরিক ভাবে নিতে নেই। খ্রীশ্চানরা সারা বিশ্বকে বোকা বানিয়ে দিয়েছে কিন্তু ভারতে এসে এরা আর মাথা তুলতে পারল না। খ্রীশ্চানরা বলছে যিশুর জন্মের সাথে বাবার কোন সম্পর্কই নেই। আমাদের অযোনিজ, মানে যোনি থেকেই জন্ম হয়নি এই রকম ঘটনা ভুরি ভুরি আছে। তাই বলে আমরা তাদের পূজো করিনা, দ্রৌপদীকে কেউ পূজো করেনা। ব্যাসদেবের সাথে এক অপ্সরার দেখা হওয়ার পর তাঁর মন কিছুটা বিচলিত হয়ে গিয়েছিল, তখন তাঁর মনে এক সন্তানের

বাসনার জন্ম হল, উনি তখন তাঁর তেজকে অগ্নিতে সংস্থাপন করে দিলেন। সেখান থেকে শুকদেবের জন্ম হল। এক দিক দিয়ে দেখতে গেলে শুকদেবের মাও নেই বাবাও নেই। অন্য দিকে মহাভারতে আছে যে ব্যাসদেব ধৃতরাস্ট্রাদির জন্ম দিয়েছেন। সৃষ্টির পেছনে কাম শক্তিই কাজ করে, কিন্তু যিশুর ক্ষেত্রে আমরা বলব – হ্যাঁ, তিনি বাবা মার মারফতেই হয়েছেন কিন্তু শক্তি যেটা সেটা হচ্ছে ঈশ্বরীয় শক্তি। এখানে যেটা বলা হচ্ছে সেটা শক্তির কথা, ঈশ্বরীয় কোন শক্তি আছে কিনা, অদৃশ্য কোন শক্তি আছে কিনা সেই ব্যাপারে বলা হচ্ছে।

**এতাং দৃষ্টিমবষ্টভ্য নষ্টাত্মানোঽল্পবুদ্ধয়ঃ। প্রভবন্ত্যুগ্রকর্মাণঃ ক্ষয়ায় জগতোঽহিতাঃ।।৯।।**

এই ধরণের অল্প বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ, যারা সব কিছুতে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা খোঁজে, এদের পরলোক সাধন বলে কিছু অবশিষ্ট থাকে না, যার ফলে মনটা সব সময় মলিন থাকে। পরলোক সাধন মানে যেখানে মানুষ চেষ্টা করে নিজেকে উপরের দিকে নিয়ে যায়। এরা শুধু ভোগের দিকেই ডুবে থাকে, ভোগ ছাড়া আর কিছু জানেনা, বোঝেনা। এই ধরণের লোকেরা আস্তে আস্তে *প্রভবন্ত্যুগ্রকর্মাণঃ*, এদের যত রকমের কাজ উগ্র ও হিংসাত্মক হয়, নিজের বাপ-মাকে মারধোর করছে, অপরকে লুটেপুটে খাচ্ছে। আর *ক্ষয়ায় জগতোঽহিতাঃ*, জগতের অহিতের জন্যই এরা তাদের জীবনটা পুরোপুরি অর্পণ করে দেয়।

**কামমাশ্রিত্য দুষ্পূরং দম্ভমানমদান্বিতাঃ। মোহাদ্ গৃহীত্বাঽসদ্গ্রাহান্ প্রবর্তন্তেঽশুচিব্রতাঃ।।১০।।**

এদের মন, চিত্ত সব সময় দুষ্পূরণীয় কামকে আশ্রয় করে থাকে, যার জন্য এদের কামনা বাসনা কখনই পূর্ণ হয় না। *দম্ভমানমদান্বিতাঃ*, দম্ভ, অভিমান আর মদ এই তিনটে জিনিষে এদের ভেতরটা একেবার পরিপূর্ণ হয়ে আছে। *অশুচিব্রতাঃ*, এদের আচরণ অত্যন্ত খারাপ, এত খারাপ যে সবারই চোখে লাগে, যেটা শাস্ত্রের সঙ্গে মেলে না। *মোহাৎ গৃহীত্বা অসদ্গ্রাহান্*, অন্যরা শাস্ত্রচর্চা করে ও গুরুমুখে শ্রবণ করে যে জ্ঞান প্রাপ্ত হয়, এদের মধ্যে সেই জ্ঞানের অভাব থাকে। এর ফলে এরা নিজেরাই জোর করে কিছু সিদ্ধান্ত তৈরী করে ঐভাবেই তাদের জীবনটাকে চালাতে থাকে। যেমন, বিজ্ঞান, জ্যোতিষচর্চা, গণিত এই সব নিয়ে হিন্দুদের কোন সমস্যা ছিল না, বরঞ্চ উল্টে তারা এগুলোকে উৎসাহিতই করেছে। এনাদের কাছে একটাই স্থির ছিল তা হচ্ছে, ব্রহ্ম নিত্য আর বাকি সব অনিত্য, অনিত্য মানে বলতে চাইছেন এই জিনিষগুলির দিকে বেশি মন দিও না। অন্যান্য ধর্মে বিজ্ঞানকে নিয়ে প্রচুর সমস্যা হয়। যখন ধর্মের তত্ত্বকে ঠিক ঠিক ধরতে না পারে তখন এরা একটা নিজের মত থিয়োরিকে ঠিক করে অসদ্ আচরণ করতে থাকে, যেমন আমার জন্ম যদি বাবা মার কামের জন্য হয়ে থাকে তাহলে তো আমার জন্য একটাই জিনিষ আছে সেটা কাম, তাই আমি কাম ভোগ করব। কিন্তু শাস্ত্রের দিক দিয়ে যেতে গেলে সৃষ্টি ঈশ্বরের, তিনিই এই সৃষ্টি করেছেন, আমাকেও তিনিই করেছেন। সেইজন্য স্বামীজী বলছেন, যে সন্তানের জন্মের জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করা হয়নি, সেই সন্তান সংসারে পক্ষে একটা অভিশাপ হয়ে জন্মায়। কারণ এরা সত্যিকারের কাম বাসনাতে জন্ম নিয়েছে। অন্য দিকে বাবা-মাও ভাবছে, এই সন্তান এখন না এলেই ভালো হত, তখন বুঝে নিতে হবে এই সন্তান এক অভিশাপ হয়ে এসেছে। কিন্তু এও যে আসছে সেও ভগবানেরই সৃষ্টি, ভগবানের সৃষ্টির বাইরে কিছুই নেই। এরপর বলছেন –

**চিন্তামপরিমেয়াঞ্চ প্রলয়ান্তামুপাশ্রিতাঃ। কামোপভোগপরমা এতাবদিতি নিশ্চিতাঃ।।১১।।**

*প্রলয়ান্তামুপাশ্রিতাঃ*, মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত সে *চিন্তামপরিমেয়াঞ্চ*, দুনিয়ার চিন্তা, অপরিমেয় চিন্তা, যে চিন্তাকে মাপা যায়না সেই চিন্তা ভাবনার বোঝা মাথায় নিয়ে ঘুরতে থাকে। কি নিয়ে চিন্তা করে? কাম ও ভোগের চিন্তা, কি ভোগ করব, কিভাবে আরো ভোগ করব, আরও ভোগ করার উপায় কিভাবে হবে এই চিন্তা। কামভোগটাই এদের জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য, এই ভোগতত্ত্ব নিয়েই চলতে থাকে, ভোগের জন্যই নানান রকম পরিকল্পনা ও ছক করে চলতে থাকে।

**আশাপাশশতৈর্বদ্ধাঃ কামক্রোধপরায়ণাঃ। ঈহন্তে কামভোগার্থমন্যায়েনার্থসঞ্চয়ান্।।১২।।**

*আশাপাশশতৈর্বদ্ধাঃ*, শত শত আশাপাশে এরা বদ্ধ হয়ে আছে। *কামক্রোধপরায়ণাঃ*, কাম আর ক্রোধের অধীনে এরা বশীভূত হয়ে আছে, যার ফলে কাম ও ক্রোধের দ্বারাই এদের জীবন এগিয়ে চলে। কাম হচ্ছে একটা জিনিষকে পাওয়ার ইচ্ছা, আর যখন পেলো না সেটা যাতে অন্য কেউও না পেতে পারে তাই তাকে নষ্ট করে দেওয়ার ইচ্ছা। ভালো করে যদি বিচার করা যায় তাহলে জগতের বেশির ভাগই এই ধরণের হয়, জগতের সবাই যা কিছু করে সব কাম ক্রোধ পরায়ণ হয়েই করে। *ঈহন্তে কামভোগার্থমন্যায়েনার্থসঞ্চয়ান্*, কামভোগের জন্য এরা অন্যায় পূর্বক অর্থ সঞ্চয়ন করে, ঘুষ নেবে, ছল চাতুরি করে লোকের থেকে টাকা হাতিয়ে নেবে, লটারিতে টাকা ঢালবে। এরা সব সময় কি করে?

**ইদমদ্য ময়া লব্ধমিদং প্রাপ্স্যে মনোরথম্। ইদমস্তীদমপি মে ভবিষ্যতি পুনর্ধনম্।।১৩।।**

এইটা আমার কব্জায় এসে গেছে, এইবার এটাকেও কব্জায় আনতে হবে। এই কোম্পানিটাকে কিনে নিয়েছি, এইবার ঐ কোম্পানিটাকেও কিনব। *ইদমস্তীদমপি মে*, এটা তো আমার আছেই, এইবার ঐটাও কিনব। আমার বাড়ি কেনা হয়ে গেছে এইবার গাড়িটাও কিনে ফেলব। এখন হাতে কম ছিল বলে এই পাঁচ লাখ টাকার গাড়িটা কিনলাম, আগামী বছর এই গাড়িটা বিক্রী করে কুড়ি লাখ টাকার গাড়ি কিনব। এই ধরণের বৃত্তিতে যারা বিচরণ করে বুঝে নিতে হবে সে একজন মহা আসুরিক বৃত্তি সম্পন্ন। আর কি করে?

**অসৌ ময়া হতঃ শত্রুর্হনিষ্যে চাপরানপি। ঈশ্বরোঽহমহং ভোগী সিদ্ধোঽহং বলবান্ সুখী।।১৪।।**

আমার এই শত্রু ছিল সেটাকে শেষ করে দিয়েছি, আর বাকী যে কটা শত্রু আছে সব কটাকে এবার জব্দ করে দেব, কেউ বাঁচবে না। *ঈশ্বরোঽহমহং*, আমি হলাম ঈশ্বর, এখানে ঈশ্বর মানে নিজেকে ভগবান অর্থে বলছে না, আমার ক্ষমতা আছে। জানেনা আমার কি ক্ষমতা, যখন ক্ষমতা দেখাব তখন বুঝবে। রাজনৈতিক নেতা, অফিসের বিগ বসেদের মধ্যে এই ধরণের বৃত্তি খুব বেশি দেখা যায়, সব সময় বলতে থাকে, আমার ক্ষমতা জানেনা, এতদিন ক্ষমতা দেখাইনি এবার দেখাব। আচার্য শঙ্কর এই উপমা দিচ্ছেন, দেবদত্ত নামে আমার এক দুর্জয় শত্রুকে শেষ করে দিলাম, আর এই সব দুই পয়সার কাঙালীকে শেষ করতে কতক্ষণ, পিঁপড়ের মত পিষে দেব। তোমার থেকে বড় কত নেতাকে পার করলাম, আর তুমি কে হে চুনোপুটি। আমিই ক্ষমতাবান, আমিই সব ভোগ করব। *সিদ্ধোঽহং*, এখানে সিদ্ধ মানে জাগতিক সব কিছু সে পেয়ে গেছে, আমার স্ত্রী, পুত্র, নাতি-নাতনি সব আছে। *বলবান্ সুখী*, আমার শরীরে শক্তি আছে, মনে তেজ আছে, সব দিক দিয়ে আমিই শ্রেষ্ঠ, আমার মত আর কেউ সুখী নেই। শুধু তাই নয় –

**আঢ্যোঽভিজনবানস্মি কোঽন্যোঽস্তি সদৃশো ময়া। যক্ষ্যে দাস্যামি মোদিষ্য ইত্যজ্ঞানবিমোহিতাঃ।।১৫।।**

প্রায়ই লোকেদের বলতে দেখা যায়, আমার টাকা পয়সা নিয়ে কোন সমস্যা নেই, বংশের দিক থেকেও কুলীন। কুলীন মানে, সাত পুরুষ থেকে আমি শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ। সেইজন্য ধনবানের দিক দিয়ে, বংশের দিক দিয়ে আমার সমকক্ষ কেউ হতে পারেনা। খবরের কাগজে যদি পাত্র-পাত্রীর বিজ্ঞাপন ভালো করে দেখা যায়, সেইখানে ছেলে বা মেয়ের বিবরণে ঠিক এই ধরণের বৃত্তিটাই চোখের সামনে ভেসে উঠবে। ছেলে কত উচ্চ বংশ, ছেলে এতো টাকা রোজগার করছে। আগেকার দিনে মেয়েরা পর পুরুষের সামনে আসতে পারতো না, আর এখন পাত্র-পাত্রী বিজ্ঞাপনে বলছে, আমার মেয়ে এই রকম দেখতে, আমার মেয়ে এত লেখাপড়া করেছে ইত্যাদি। *যক্ষ্যে দাস্যামি*, আমি এমন যজ্ঞ করব যে, কেউ এই রকম যজ্ঞ কোন দিন চোখে দেখা দূরে থাক, কল্পনাও করতে পারেনি। *দাস্যামি*, আমি দান করব, এমন দান করব যে লোকের চোখ কপালে উঠে আসবে। *মোদিষ্য*, যত রকমের আনন্দ হতে পারে আমি সব আনন্দ করব। কি রকম? যারা নাচগান করে তাদেরকে আমি ডেকে আসর বসাব, সেখানে আমি নোট ছুড়ব। যখন কেউ বাড়িতে অনুষ্ঠানাদি করে তখনো এই জিনিষটাই তাদের মাথায় বাসা বেঁধে থাকে। বাড়িতে ছেলের পৈতে দেবে সেখানেও দু পয়সার ভাড়াটে নাচনীওয়ালিদের নিয়ে নাচ করাবে।

**অনেকচিত্তবিভ্রান্তা মোহজালসমাবৃতাঃ। প্রসক্তাঃ কামভোগেষু পতন্তি নরকেঽশুচৌ।।১৬।।**

আমি ধনী, আমি উচ্চবংশের, আমার সমান আর কে আছে, এই সব করে করে অবিবেকী হয়ে যায় আর এগুলোকে ধরে রাখার জন্য বা অর্জন করার জন্য নানা রকমের সঙ্কল্প করে করে এদের চিত্তটা এই সবেই মত্ত হয়ে থাকে আর এতেই এদের চিত্তটা সব সময় বিক্ষিপ্ত হয়ে থাকে। *পতন্তি নরকেঽশুচৌ*, এর ফলে এরা এমন পাপ করতে থাকে যে মৃত্যুর পর সব থেকে যে অশুচি নরক আছে, সেখানে গিয়ে পতিত হয়। শঙ্করাচার্য একজন ঘোর অদ্বৈতবাদি হলেও তিনি এই সব কিছুকে মানতেন।

**আত্মসম্ভাবিতাঃ স্তব্ধা ধনমানমদান্বিতাঃ। যজন্তে নামযজ্ঞৈস্তে দম্ভেনাবিধিপূর্বকম্।।১৮।।**

*আত্মসম্ভাবিতাঃ*, আমার মত গুণ আর কারুর মধ্যে নেই। যারা সাধু পুরুষ, সমাজের যারা অগ্রগণ্য পুরুষ তারা এই ধরণের লোকদের ভালো বলছেন না, সম্মান করছেন না কিন্তু এরা নিজেকে মনে করছে সে বিরাটা কিছু। কিছু তোষামুদি আর মোসায়েবি ধরণের লোক যাকে ভালো বলছে সে কখনই প্রকৃত ভালো লোক নয়। সাধু পুরুষরা, সমাজের শ্রেষ্ঠ পুরুষরা যাকে ভালো বলবে সেই ভালো লোক। আমি ভালো না খারাপ লোকে কি বলছে তাতে কিছুই হবে না, লোকেরা আমাকে যতই ভালো বলুক, কোন সাধু পুরুষরা যখন আমাকে ভালো বলে স্বীকৃতি দেবে তবেই আমি বুঝব যে আমি সত্যিকারের ভালো লোক। বলা হচ্ছে লোকে কি বলবে সেদিকে তাকিও না। আবশ্যই তাকাবে, তা নাহলে আমি জানব কি করে যে আমার মধ্যে এই গুণগুলো রয়েছে, কিন্তু সেই লোকগুলো কে? সাধু পুরুষ যারা। তাহলে সাধু পুরুষ কারা? কোথাও না কোথাও আমি মনে করি যে এই লোকগুলি সাধুপুরুষ। এরাই যখন আমার কাজকে স্বীকৃতি দেবে তবেই আমি মনে করতে পারি যে আমার কাজটা ঠিক। এর বাইরে যে যাই বলুক, ভালো বলুক কি মন্দ বলুক তাতে কিছুই আমার যায় আসে না। এখানে আচরণের ব্যাপারে এই কথাই বলা হচ্ছে, আমি কি করছি সেটার কোন গুরুত্ব

নেই, কিন্তু সাধুপুরুষরা এই ব্যাপারে কি বলছে। *যজন্তে নামযজ্ঞৈস্তে দম্ভেনাবিধিপূর্বকম্,* এরা যজ্ঞ করবে কিন্তু সেই যজ্ঞের পেছনে একটাই উদ্দেশ্য আমার নাম যশ। আর এই ধরণের যজ্ঞে কোন আচার নেই কোন বিধি নেই। যদিও আমাদের পরম্পরাতে বিবাহ অনুষ্ঠান একটি পবিত্র যজ্ঞ, কিন্তু ইদানিং কালে বিবাহ অনুষ্ঠানে যা হয়, দেখে মনে হয় যেন সিনেমার শ্যুটিং চলছে। সব কিছুই *অবিধিপূর্বকম্* হচ্ছে। এর ফলে কি হয় –

**অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধঞ্চ সংশ্রিতাঃ। মামাত্মপরদেহেষু প্রদ্বিষন্তোহভ্যসুয়কাঃ।।১৮।।**

এদের অহঙ্কার হচ্ছে শুধু নিজেকে নিয়ে, আমি আমি আমি করে যাচ্ছে, সব কিছুতেই আমি আমি করতে গিয়ে যাঁরা সৎলোক মহাপুরুষ তাঁদের দোষ আবিষ্কার করতে থাকে এবং তাঁদের অনুকরণ না করে নিজের মর্জিমাফিক চলে। অপরকে পীড়া উৎপাদনে প্রচণ্ড ক্ষমতা থাকে, আর দর্পে পরিপূর্ণ থাকে। দর্প হচ্ছে, এমন অহঙ্কার তাদের হয়ে যায় যে, প্রয়োজনে এরা কামের প্রবাহে নিজেদের ধর্মকে পর্যন্ত অতিক্রম করে যায়। এমন কাম যে, এদের মন সব সময় স্ত্রীজাতির প্রতি কামের বিকারে বিকারগ্রস্ত থাকে। এই কাম যখন প্রতিহত হয় তখন ক্রোধের বৃত্তিতে আচ্ছন্ন হয়ে যায়। এরা ঈশ্বরের বাক্যকে উল্লঙ্ঘন করে চলে, ঈশ্বরের কথা মত না চলা মানে ঈশ্বরদ্বেষী। ঈশ্বরদ্বেষী হয়ে এরা নিজের ভেতরে আর অপরের ভেতরে অন্তর্যামীরূপে ঈশ্বর যিনি আছেন, তাঁকে অবহেলনা করে। তার সামনে কেউ অপরের সদ্‌গুণের প্রশংসা করলে সে বলবে – আরে এগুলো সব ভণ্ডামি, ভালো করে খোঁজ নাও এর ভেতরে ভেতরে এর অনেক বদমতলব আছে। এই যে সে নিন্দা করল, এই নিন্দাটা সে তার ভেতরে যিনি অন্তর্যামী আছেন তাঁর নিন্দা করা হল। কাকে সে কষ্ট দিল? অন্তর্যামীকে, এটাই শাস্ত্র নিষেধ করছে। শাস্ত্র বলছে – আমরা কেউ যখন কষ্ট পাই, সেই কষ্টটা অন্তর্যামী পান, সেইজন্য কাউকে কোন রকম কষ্ট দিতে নেই। এরাতো শাস্ত্রের কথা মানবে না, তাই এদেরকে ভগবান কি করেন?

**তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্। ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষ্বেব যোনিষু।।১৯।।**

ভগবান বলছেন আমি এই ধরণের *দ্বিষতঃ,* সাধুবিদ্বেষী, ক্রূর, *নরাধমান্* মানে নরাধম নিকৃষ্ট অশুভকারীদের নিক্ষেপ করে দিই। কোথায় ভগবান নিক্ষেপ করছেন? *আসুরীষু যোনিষু* – নরকরূপ যে জঘন্য আসুরিক যোনি আছে, সেখানে ফেলে দিই। এখানে ভগবান বলছেন আমি ফেলে দিই, আমাদের মনে রাখতে হবে আত্মা মানে অন্তর্যামী আর ঈশ্বরের মধ্যে কোন তফাৎ নেই। অন্তর্যামী আমাদের সমস্ত কাজকর্মের হিসেব রাখেন, আর আমার মনের ভেতরে যে ভাবটা আছে সেটাই বাইরে আমার শরীরে ফুটে উঠবে। আমার অন্তর্যামী সব হিসেব রাখছে, এখন আমি যেমন যেমন ভালো মন্দ কাজ করছি, সেই কর্মের অনুসারে অন্তর্যামী আমাকে ঠিক সেই রকম যোনিতে নিয়ে যাবেন। এখন এটা ঈশ্বরই করাচ্ছেন বলি আর অন্তর্যামীই করাচ্ছেন বলি, তাতে কিছু যায় আসে না, সেটা একই জিনিষ। কিন্তু মূল কথা হচ্ছে আমি যেমনটি কর্ম করেছি পরের জন্মে সেই অনুসারেই আমি যোনি পাব, এর বাইরে কোন ভাবেই যাবে না। ঈশ্বর হচ্ছেন কর্মাধ্যক্ষ, তিনি না থাকলে যে কর্ম করা হয়েছে সেই কর্মফল কর্মকর্তার কাছে পৌঁছাবে না। এই দিক থেকে বলা যায় যে, তাঁর ইচ্ছাতেই এইগুলো হচ্ছে। আবার চৈতন্য ছাড়া কোন কাজ হয় না, সুতরাং তাঁর ইচ্ছাতেই সব হচ্ছে। কিন্তু মূল দায়টা আসে আমার উপর। ভগবান নিজের খামখেয়ালি মত কাউকে ঈশ্বরের দিকে নিয়ে যাচ্ছেন আবার কাউকে বিপথে নিয়ে যাচ্ছেন তা কখনই হয় না। আমি যে রকমটি করেছি ঠিক সেই রকমটিই পাব। তবে যদি কেউ তাঁর শরণাগত হয়ে যায় তখন ভগবান তাকে কর্মের প্রারব্ধ থেকে বাঁচিয়ে দেন। এখানেও সেই কথাই হচ্ছে, তাঁর অন্তর্যামীই তাকে বাঁচায়। আচার্য শঙ্করও তাঁর ভাষ্যে বলছেন – যারা অশুভ কাজ করে, ক্রূর কর্মা তারা বাঘ, সিংহাদি যোনিতে গিয়ে জন্ম নেয়। যাদের খুব মাংস খাওয়াতে আসক্তি তারা পরে শকুন হয়েই জন্মাবে, শুধু মাংস খেয়েই থাকবে অন্য কিছু আর তাকে খেতে হবে না।

**আসুরীং যোনিমাপন্না মূঢ়া জন্মনি জন্মনি। মামপ্রাপ্যৈব কৌন্তেয় ততো যান্ত্যধমাং গতিম্।।২০।।**

বলছেন আসুরী যোনিতে এরা জন্ম জন্ম কেবল ঘুরতেই থাকে। *মামপ্রাপ্যৈব কৌন্তেয়,* হে কুন্তিপুত্র, এরা আমাকে কখনই লাভ করতে পারেনা, আর আমাকে না পেয়ে এরা কেবল নীচের দিকে পতিত হয়ে অধম গতি প্রাপ্ত হয়। এখন যে ঐ রকম নীচ যোনি থেকে আরও নীচ যোনিতে যেতে থাকে, সে মনে করে আমি বেশ সুখেই আছি। ঠাকুর এর খুব সুন্দর উপমা দিচ্ছেন – গুবরে পোকাকে নারদ বলছেন – কি গোবরের মধ্যে পড়ে আছিস, চল আমি তোকে বৈকুন্ঠে নিয়ে যাব। গুবরে পোকা নারদকে বলছে – বৈকুন্ঠে যেতে পারি কিন্তু ওখানে ভালো গোবর পাওয়া যাবে কিনা আগে বল? গুবরে পোকাতো গোবরের মধ্যে খুব আনন্দে আছে। কিন্তু যারা উচ্চ আধারের তাঁরা দেখতে পাচ্ছেন যে এরা কি কষ্টের মধ্যে পড়ে আছে। *মাম অপ্রাপ্যৈব,* মানে আমাকে না পেয়ে, কিন্তু আচার্য শঙ্কর এখানে আরও পরিষ্কার করে ভাষ্যে বলছেন – ভগবানকে পাওয়ার তো কোন প্রশ্নই নেই, এখানে মাম্ মানে ভগবানের যে পথ, সেই পথে চলে না বলে আরও নীচের দিকে চলে যায়, সুতরাং ভগবানকে পাওয়ার কথা আসছেই না।

এই অধ্যায়ের কুড়ির নং শ্লোকটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। *অধমাং গতিম্* এই ব্যাপারে বলতে গিয়ে দ্বৈতবাদী মাধ্বাচার্য বলছেন, *অধমাং গতিম্* মানে চিরন্তন নরক। কিন্তু চিরকালের জন্য নরক এই ধারণা হিন্দুদের মধ্যে কখন ছিল না। মাধ্বাচার্যের সময়ের কিছু আগে থাকতেই ভারতে ইসলাম ধর্ম খুব ভালোভাবেই এসে গিয়েছিল। তিনি হয়ত ইসলাম ধর্ম থেকে এই চিরন্তর নরকের ধারণাটা

নিয়ে থাকতে পারেন, কিন্তু ভারতের আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যে এই ধারণা কখনই ছিল না। এখানেও বলা হচ্ছে অধম গতিতে চলে যাবে অর্থাৎ খুব নীচের দিকে চলে যাবে, কিন্তু তাই বলে চিরকালের জন্য নরকে চলে যাবে সেটা কখনই হবে না। সেখান থেকেও সে একদিন উঠে দাঁড়াবে, কবে উঠবে আর কত শত কোটি বছর লাগবে তার হিসেব কেউ দিতে পারবে না। হিন্দুধর্মের পরম্পরাতে দুই রকমের গতির কথা বলা হয়, একটা হচ্ছে নীচের দিক থেকে উপরের দিকে যাচ্ছে, আরেকটা ওপর থেকে নীচের দিকে আসে। ডারউনের সঙ্গে আমাদের কোন বিরোধ নেই, বিবর্তনকেও আমরা মানি কিন্তু বিবর্তনের সাথে সাথে আমরা বলি যেমন তুমি উপরে দিকে যাবে তেমনি তোমাকে নীচেও যেতে হতে পারে।

আমরা এখানে যত লোক আছি তার মধ্যে দুই ধরণের লোক আছে, কেউ উপর থেকে নীচে এসেছেন কেউ আবার নীচের থেকে উপরে এসেছেন। কেউ দেবলোক ঋষিলোক থেকে নীচে এসেছেন আবার কেউ আছেন যারা পশুযোনি থেকে বা আদিম বর্বর থেকে উপরের দিকে এসেছেন। যারা নীচের থেকে উপরে আসে তারা খুব আনন্দে থাকে। দুজন লোক আছে এবং দুজনের কাছেই এক কোটি টাকা আছে। এদের একজন খুব আনন্দে আছে আরেকজন মনমরা হয়ে আছে। যে এক লাখ থেকে এক কোটিতে এসেছে সে মহা আনন্দে থাকবে আর যে একশ কোটি থেকে এক কোটিতে এসেছে তার মন খুব খারাপ থাকবে। ঠিক সেই রকম যে উপর থেকে নীচে এসেছে সে শান্তিতে থাকতে পারবে না, কিন্তু যে নীচের থেকে উপরে এসেছে সে বলবে বেশ আছি। সেইজন্য ঠাকুর বলছেন – যার এই বোধ হচ্ছে যে আমি বেশ আছি, সে কিন্তু আধ্যাত্মিক জীবনে এগোতে পারেনা। যে তার বর্তমান অবস্থাতে বোধ করে এই অবস্থায় আমার মনে শান্তি হচ্ছে না, সেই এগোতে পারে, তার মানে সে উপর থেকে নীচে এসেছে, সে এই অবস্থাতে শান্তিতে থাকতে পারেনা। যে অধম গতিতে যেতে থাকে একটা জায়গায় গিয়ে সে থেমে যায়। এত কথা কারুকে বললে সে কিছুই ধরতে পারবে না, সে আরও ধাঁধায় পড়ে যাবে। সেইজন্য ভগবান অর্জুনকে সংক্ষেপে বলছেন –

**ত্রিবিধং নরকস্যেদং দ্বারং নাশনমাত্মনঃ। কামঃ ক্রোধস্তথা লোভস্তস্মাদেতত্রয়ং ত্যজেৎ।।২১।।**

ভগবান বলছেন, তুমি সংক্ষেপে জেনে নাও এই যে অধম গতি প্রাপ্তির কথা বলা হচ্ছে, এই অধম গতি নরকের দ্বার তিনটি – *কামঃ ক্রোধস্তথা লোভঃ*, কাম, ক্রোধ ও লোভ এই তিনটেই নরকের দ্বার। কাম হচ্ছে কোন কিছু পাওয়ার বাসনা, ক্রোধ, না পেলে রেগে যাওয়া আর লোভ, যেটা আমার পাওয়ার কথা নয় কিন্তু অপরের আছে বলে সেটাকে পাওয়ার ইচ্ছা। মূলতঃ পুরো ব্যাপারটা হচ্ছে কামকে নিয়ে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে এই জিনিষটাকে আরও বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করা হয়েছে – *ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ*। একটা জিনিষকে পাওয়ার ইচ্ছা হয়েছে, সেই জিনিষটাকে পেলে এক রকম মনের বৃত্তি হবে, না পেলে অন্য রকম বৃত্তি হবে। এই বৃত্তিগুলি একটা জায়গায় গিয়েই দাঁড়ায়, সেটা হচ্ছে *কামঃ*। এই তিনটেই জীবের অধোগতির কারণ, সুতরাং হে অর্জুন তুমি এই তিনটেকে বিষবৎ ত্যাগ করে বেরিয়ে এসো।

**এতৈর্বিমুক্তঃ কৌন্তেয় তমোদ্বারৈস্ত্রিভির্নরঃ। আচরত্যাত্মনঃ শ্রেয়স্ততো যাতি পরাং গতিম্।।২২।।**

এই তিনটে বৃত্তি কাম, ক্রোধ ও লোভকে যখন কোন মানুষ ত্যাগ করে বেরিয়ে আসতে পারে, তখন বোঝা যাবে এবার সে আধ্যাত্মিক পথের সাধনায় নেমেছে। আত্মকল্যাণের জন্য সাধন, যেটা কামক্রোধাদির জন্য করতে পারত না, আমরা যখন জপ-ধ্যানে বসি তখন বেশিক্ষণ বসতে পারিনা, কারণ কিছুক্ষণ পরেই কোন ভাবে মনটাকে আসন থেকে তুলে দেবে। আসলে আমাদের মধ্যে কামনা-বাসনা গিজ্‌গিজ্ করছে, আমরা নিজেরাও জানতে পারিনা যে আমাদের মধ্যে কামনা-বাসনা আছে, এগুলো কায়দা করে আমাকে আসন থেকে উঠিয়ে দেবে। কিন্তু কাম, ক্রোধ আর লোভ এই তিনটে যখন পুরোপুরি চলে গেল, এরপর অনেকক্ষণ টানা আসনে বসে জপ-ধ্যান করতে পারবে। সব কিছুর মূলে রয়েছে কাম, কামের পুর্তি না হলেই নানা রকমের আসুরিক বৃত্তি, যেগুলোর বর্ণনা করা হল এর সবটাই কাম থেকেই হয়েছে। এই তিনটে থেকে মন যখন পুরোপুরি বেরিয়ে আসে তখনই – *আচরত্যাত্মনঃ শ্রেয়ো*, শ্রেয়োর পথের পথিক হয়, তার আগে পর্যন্ত হয় না। যে জিনিষগুলো আগে করা সম্ভব হচ্ছিল না, এইবার সে সেই জিনিষগুলোই করতে শুরু করে। এরপর আরেক ধাপ এগিয়ে তারও যে মূল সেটা কি বলছেন?

**যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ততে কামকারতঃ। ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্।।২৩।।**

গীতার মূল সমস্যা ছিল অর্জুন যুদ্ধ করবে না। সেই সমস্যাকে তুমি কিভাবে সমাধান করবে? এইবার ভগবান অর্জুনকে বলছেন – হে অর্জুন, শাস্ত্রবিধিকে উল্লঙ্ঘন করে যে নিজের কাম বাসনাকে নিজের অসংশোধিত বুদ্ধি ও ইচ্ছানুযায়ী চরিতার্থ করে সে – *ন স সিদ্ধিমবাপনোতি*, এই জগতে সে সিদ্ধি পায়না, *ন সুখং ন পরাং গতিম্* - সংসারে সে সুখ পায়না আর মৃত্যুর পর সে উত্তম গতি লাভ থেকে বঞ্চিত হয়, স্বর্গলোকে, দেবলোকে না গিয়ে সে নীচ যোনি প্রাপ্ত হয়। কাঁচা মন যদি নিজের গুরু হয়ে যায়, তখন সে কোন্ দিকে নিয়ে যাবে তার কোন ঠিক নেই, কেননা কাঁচা মন বুদ্ধিকে ভ্রষ্ট করে দেয়। সেইজন্য প্রথমে শাস্ত্রের বিধি মেনে, শাস্ত্র যেটা বলছে, মহাত্মারা যা বলেন সেইটাকে পালন করে চলতে হয়। যদি শাস্ত্রবিধি না পালন করতে পারছে তাহলে ঈশ্বরকে সে বলুক

যে, হে ঠাকুর আমি পারছি না। কিন্তু মনকে যদি গুরু বানিয়ে সব কিছুকে নিজের মত যুক্তি দিয়ে বিচার করতে শুরু করে দেয়, তাহলে কিন্তু সে বিপদে পড়ে যাবে। সেইজন্য ভগবান শেষ শ্লোকে বলছেন –

**তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণং তে কার্যাকার্যব্যবস্থিতৌ। জ্ঞাত্বা শাস্ত্রবিধানোক্তং কর্ম কর্তুমিহার্হসি।।২৪।।**

কোনটা করব, কোনটা করব না, এটা জানব কোত্থেকে? শাস্ত্র থেকে। শাস্ত্র যেটা বলছে সেটাই করতে হবে। আমার কাছে শাস্ত্র কোনটা? যেটাকে আমি মানছি সেটাই আমার কাছে শাস্ত্র। আমি গীতা মানছি, গীতা আমার শাস্ত্র। আমি উপনিষদ মানি, উপনিষদ তখন আমার শাস্ত্র, যদি কথামৃত মানি তাহলে কথামৃতই আমার শাস্ত্র। বাইবেল বা কোরান মানছি সেটাও আমার শাস্ত্র হতে পারে। আমি যেটাকেই মানি না কেন তাতে কিছুই ভুল নেই। কিন্তু যেটাকে মেনে নিয়েছে তাকে সেই অনুসারেই চলা শুরু করতে হবে। একটা অবস্থার শেষে কোন কিছুতে তফাৎ খুঁজে পাওয়া যায় না। বলছেন – *কার্যাকার্যব্যবস্থিতৌ* – কর্তব্য অকর্তব্যের ব্যবস্থা বিষয়ে শাস্ত্রই তোমার প্রমাণ। *জ্ঞাত্বা শাস্ত্রবিধানোক্তং কর্ম কর্তুমিহার্হসি* – সেইজন্য তোমার স্বধর্ম কোনটা সেটাও শাস্ত্র থেকেই জানা যাবে। তুমি যে বলছ – আমি যুদ্ধ করব না, এতে তুমি ঘোর অন্যায় কাজ করছ। কেন অন্যায়? শাস্ত্রই বলছে তোমাকে কাজ করতে হবে, শাস্ত্রই বলছে তুমি ক্ষত্রিয়, শাস্ত্রই বলছে ক্ষত্রিয়ের স্বধর্ম যুদ্ধ করা। সুতরাং তোমাকে যুদ্ধ করতেই হবে, তোমার নিজের কাঁচা বুদ্ধিকে এখানে প্রয়োগ করতে যেও না। তুমি যদি নিজের বুদ্ধি লাগাও তাহলে – *ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং পরাং গতিম্* - তোমার জীবনের উদ্দেশ্য সিদ্ধি লাভ, সেই সিদ্ধি তুমি পাবে না, সিদ্ধি না পেলে তুমি জাগতিক কোন সুখ পাবেনা, তার মানে এই জীবনে তুমি সুখ পাবেনা এবং পরের জীবনেও তোমার *পরাং গতিম্ হবে না*, সব দিক দিয়েই তোমার পরিণাম হবে অধোগতি।

জুইস ও ইসলাম পরম্পরায় একটা খুব দৃঢ় ধারণা হয়ে আছে যে, ভগবান যখন মানুষ সৃষ্টি করলেন তখন ইব্লিশকে বলা হল মানুষকে প্রণাম করতে। ইব্লিশ ছিল একজন দেবতা। কিন্তু ইব্লিশ ভগবানকে এতই ভালোবাসত যে, সে সঙ্কল্প করে রেখেছিল ভগবান ছাড়া আর কারুর কাছে সে মাথা নত করবে না। ইব্লিশের কথা শুনে ভগবান প্রচণ্ড রেগে গেলেন, সঙ্গে সঙ্গে ইব্লিশকে ভগবান একটা শয়তান বানিয়ে দিলেন। ইব্লিশ তো ভগবানকে প্রচণ্ড ভালোবাসত তবুও কেন ভগবান তাকে শয়তান বানিয়ে দিলেন? কারণ ইব্লিশ শাস্ত্র প্রমাণ রাখতে পারেনি। ভগবানের কথা কি না, ভগবানের কথাই শাস্ত্র। ভগবান বলে দিলেন মানুষের সামনে গিয়ে মাথা নত করতে, মনে রাখতে হবে এখানে মানুষকে বড় করা হচ্ছে না। এই ব্যাপারটাকে এইখানে গীতাতে এই শ্লোকে এসে বোঝা যাবে – *তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণং তে*। ভগবানের কথাই শাস্ত্র, ইব্লিশ শাস্ত্রের কথা শোনেনি। দক্ষিণেশ্বরে একদিন রাখালকে ঠাকুর পান সাজতে বলেছেন, রাখাল বলছে পান সাজাটাজা আমার দ্বারা হবে না। লাটু মহারাজ কাছেই ছিলেন, রাখাল ঐ রকম বলাতে লাটু মহারাজ খুব রেগে গেছেন। রাজা মহারাজকে লাটু মহারাজ বলছেন – তুমি ওনার সামনে মুখের ওপর ঐভাবে না বলে দিলে! রাখাল মহারাজও সঙ্গে সঙ্গে বলছেন – তোর যদি এতই সাধ থাকে তা তুই সাজ না। এই সেই কথাতে দুজনের মধ্যে তুমুল কথা কাটাকাটি শুরু হয়ে গেছে। লাটু মহারাজ রাগে কাঁপতে শুরু করেছেন। তখন ঠাকুর রামলালদাদাকে ডেকে বলছেন – রামলাল, বলো কে ঠিক। রামলালদাদা বললেন – রাখালই ঠিক। লাটু শুনে আরও রেগে গেছে – আপনারা কোলকাতের বড়লোক মানুষ ঐ রকমই তো বলবেন। পরে কিন্তু লাটু মহারাজ বুঝতে পারলেন যে তাঁর খুব ভুল হয়েছে। কোন অবস্থাতেই বড়দের সামনে ক্রোধ দেখাতে নেই। আর রাজা মহারাজ শুধু ঐ কাজের জন্য নন, সারা জীবন তিনি এই ধরণের কোন কাজ করেননি, শ্রীমা বলতেন – রাখালের জন ঐসব কাজ নয়, কাউকে দিয়ে ও করিয়ে নিতে পারবে, ঐ জন্যই তো ওকে সবাই রাজা বলে। সবার জন্য সব কাজ নয়, সেবাদি রাখাল মহারাজ কোন দিন সেইভাবে করেননি যেভাবে লাটু মহারাজ ও অন্যরা করতেন। লাটু যে ঠাকুরের সামনে ক্রোধ প্রকাশ করেছে এইটাই শাস্ত্রবিরোধী।

মূল কথা হচ্ছে যদি তোমার জীবনকে সুসংগঠিত করতে চাও তাহলে কখনই তোমার নিজের বুদ্ধিকে আশ্রয় করে এগোবার চেষ্টা করতে যেও না। যে কোন একটা শাস্ত্রকে অবলম্বন কর, আর সেই শাস্ত্রানুসারে চল। অর্জুন নিজের বুদ্ধিকে আশ্রয় করে বলেছিলেন আমি যুদ্ধ করবনা। কিন্তু অর্জুন হচ্ছে ক্ষত্রিয়, ক্ষত্রিয়ের ধর্ম হচ্ছে যুদ্ধ করা। তোমার সামনে একটা যুদ্ধ অবশ্যাম্ভাবি, সেই যুদ্ধে তুমি যুদ্ধ করতে এসেছ, এরপর তুমি আর পিছিয়ে আসতে পারো না। শাস্ত্র বলছে ক্ষত্রিয়ের ধর্ম হচ্ছে যুদ্ধ কর। শাস্ত্রকে অবলম্বন করে সেই অনুসারে তোমাকে চলতে হবে। কারণ তোমার বুদ্ধি কখন মোহগ্রস্ত হয়ে যাবে কোন ঠিক নেই। বুদ্ধি মোহগ্রস্ত হলেই তখন নিজের কোন ইচ্ছা বা মতলবকে ঠাকুরের ইচ্ছা বলে চালিয়ে দেওয়ার হীন প্রয়াস এসে যাবে, আর নানা রকমের যুক্তিকে খাড়া করে সেই কাজটা করতে এগিয়ে যাবে। সেইজন্য বলছে শাস্ত্রে কি বলছে সেটা দেখে নাও আর তার বাইরে কোন মতেই যাওয়া চলবে না। যদি না পার তাহলে বল আমি পারছি না, সেটা না করে যদি যুক্তিবাদীদের মত বিচার করতে যাও তাহলে তোমার সর্বনাশটি হয়ে যাবে। যারাই শাস্ত্রকে ছেড়ে যুক্তির আশ্রয় নিয়ে এগোয় বা বলে ঠাকুরের ইচ্ছায় করেছি, সে ভক্তই হোক আর পণ্ডিতই হোক সে মরেছে। শাস্ত্র যেটা বলছে করতে শুধু সেটাই কর, শাস্ত্র যেটা নিষেধ করছে সেটা কখনই করতে যেও না।

**ওঁ তৎসদিতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসুপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে**
**শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে দৈবাসুরসম্পদ্বিভাগযোগো নাম ষোড়শোঽধ্যায়ঃ।।**

সপ্তদশ অধ্যায়

# শ্রদ্ধাত্রয়বিভাগযোগ

২০শে নভেম্বর, ২০১০

কিছুটা চতুর্দশ অধ্যায় আর কিছুটা ষোড়শ অধ্যায়ের সাথে সপ্তদশ অধ্যায়ের ধারাবাহিকতার যোগসূত্র রয়েছে। ষোড়শ অধ্যায়ের শেষে ভগবান বলছেন – কোন্ কাজ করবে আর কোন্ কাজ করবে না এই ব্যাপারে *তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণং তে*, শাস্ত্রই এই ব্যাপারে তোমার পথ প্রদর্শক হোক। আর চতুর্দশ অধ্যায়ে সত্ত্ব, রজো আর তমো এই তিনটে গুণ নিয়ে অনেক আলোচনা করা হয়েছিল, এই দুটোকে নিয়ে সমন্বয় করে সপ্তদশ অধ্যায় শুরু হচ্ছে। সপ্তদশ অধ্যায়ে আবার যা বলা হয়েছে সেটাকেই আবার অষ্টাদশ অধ্যায়ে টেনে নিয়ে আরও বিস্তৃত ভাবে বলা হয়েছে।

ষোড়শ অধ্যায়ে অর্জুনকে ভগবান বলে দিলেন যা কিছু করবে শাস্ত্রের কথা মত করবে, শাস্ত্রের বাইরে কিছু করবে না। মানুষ নিজের বুদ্ধি ও সেই বুদ্ধির গোড়ায় জল দেওয়ার জন্য যুক্তি দাঁড় করিয়ে যখন কিছু করতে শুরু করে তখন তাকে বুদ্ধি বিভিন্ন ভাবে নাচাতে শুরু করে দেয়। নিজেও বুঝতে পারবে না, বুদ্ধি কখন তাকে নাচাতে শুরু করেছে। জপ-ধ্যান করার সময়, কিংবা বিভিন্ন রকম জীবন-যাপন করার সময় মানুষ নিজের বুদ্ধিকে যেমনি লাগাতে শুরু করে, প্রথম দিকে সব ঠিকঠিকাই চলতে থাকে, তারপর যে কোথায় তাকে উড়িয়ে নিয়ে যাবে, টেরই পাওয়া যাবে না। মানুষ যখন ডুবতে শুরু করে তখন সে কত নীচে ডুবতে থাকে সে নিজেও বুঝতে পারেনা। মানুষ যখন উপরের দিকে উঠতে শুরু করে তখন সে বুঝতে পারে আমি কতটা উপরে এসেছি, যে হিমালয়ের যত উপরে উঠছে ততই সে বুঝতে পারে দম নেওয়া কত কঠিন হয়ে যায়। এই যে বলা হয় যত আমি খাটব তত আমার পথ সহজ হয়, এখানে তা নয়, এর ঠিক উল্টোটাই হয়। কতকগুলো কাজ আছে সেই কাজ যত শেষের দিকে আসে ততই সেই কাজ শেষ করা কঠিন হয়ে যায়। সাহিত্যিক যখন কোন বই লেখেন যত লেখা শেষের দিকে এগিয়ে আসে ততই লেখাটা কঠিন হয়ে যায়। মাউন্ট এভারেস্টের পর্বতারোহীরা শেষের দিকে এসে আর যেন টানতে পারেনা। যারা আধ্যাত্মিক পথে চলছেন তাদের ক্ষেত্রেও ঠিক এই ব্যাপারটাই হয়, যত এগোবে তত কঠিন। জীবন এখন সহজ ভাবে চলছে, না কঠিন অবস্থার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে, এটাতেই বোঝা যায় একজন নীচের দিকে গোত্তা মারছে না উপরের দিকে উঠছে। যদি প্রত্যেকটি পদক্ষেপকে খুব কঠিন হয়ে যাচ্ছে বলে মনে হয় তাহলে বুঝতে হবে সে উপরের দিকে এগোচ্ছে। আর যদি মনে হয় সব কিছু খুব ভালোভাবে চলছে তাহলে বুঝতে হবে কোথাও একটা গোলমাল চলছে। স্বামী যতিশ্বরানন্দজী বলতেন – তোমার আধ্যাত্মিক জীবনে যদি সব কিছু ভালো চলছে তাহলে কোথাও কিছু একটা ঘাটতি আছে। মন যখন খেলা করতে শুরু করে তখন এই জিনিষটা হয়, সেই সময় মন নিজের সুবিধা মত সব হিসেব বার করে চলতে থাকে। এইটাকে নিয়েই অর্জুন বিচলিত হয়ে প্রশ্ন করছেন –

অর্জুন উবাচ

**যে শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ। তেষাং নিষ্ঠা তু কা কৃষ্ণ সত্ত্বমাহো রজস্তমঃ।।১।।**

একজন লোক যে শাস্ত্রবিধিকে মানছে না কিন্তু খুব শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করছে, এখন তার এই শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠাকে হে ভগবান আপনি কি বলবেন, এই শ্রদ্ধাকে আপনি সত্ত্ব বলবেন, না রজো নাকি তমো বলবেন? সত্ত্বটা হচ্ছে শ্রেষ্ঠতম, রজো হচ্ছে মাঝামাঝি আর তমোটা সুবিধার নয়। অর্জুনের এই প্রশ্ন রীতিমত জটিল, *যে শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য*, যে শাস্ত্রবিধিকে ছেড়ে দিয়েছে বা গুরু যেভাবে জপধ্যান করতে বলেছেন, যেভাবে আচরণ করতে বলেছেন, সেটাকে সে মানছে না অথচ নিজে যা করছে সেটা খুব শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠার সাথেই করে যাচ্ছে। অর্জুনের প্রশ্নটা এই ধরণের। আগেকার দিনে, এমনকি কয়েক বছর আগে পর্যন্ত ব্রাহ্মণদের কোন ধরণের সুযোগই দেওয়া হত না, তোমাকে এই যজ্ঞ উপবীত দেওয়া হয়ে গেলে এইবার মৃত্যু পর্যন্ত এইটাই তোমার জীবন, এর ডান দিক বাঁ দিক করা চলবে না, একটু এদিকে থেকে সেদিকে গেছে তো তোমাকে ব্রাহ্মণত্ব থেকেই বিদায় করে দেওয়া হবে।

আচার্য শঙ্কর আবার নিজের থেকে কিছু কথা যোগ করে বলছেন – শাস্ত্রবিধিটা যে জেনে গেছে অথচ সেটাকে পালন করছে না, এখানে তাদের কথা একেবারেই আলোচনা করা হচ্ছে না, ধরেই নেওয়া হয়েছে সে একেবারে গোল্লায় গেছে, কারণ শাস্ত্রবিধি জেনে যাওয়ার পর সেটাকে পালন না করাকে কখনই প্রশ্রয় দেওয়া হয় না। এখানে বলা হচ্ছে, এই ব্যাপারে শাস্ত্র কি বলছে তোমার জানা নেই বা তুমি শাস্ত্র অধ্যয়ণ করোনি। তাহলে তুমি কিভাবে আচরণ করছ? এখানেও কিন্তু তোমার নিজের বুদ্ধিকে আশ্রয় করে আচরণ করছ না, *বৃদ্ধ ব্যবহারঃ দর্শনাৎ*, বৃদ্ধ ব্যবহার হচ্ছে বাড়িতে বা সমাজে যারা বয়স্ক মানুষরা যে রকমটি আচরণ করছেন, এই বৃদ্ধরাও কিন্তু শাস্ত্র জানেন না বা শাস্ত্র এই ব্যাপারে কি বলছে জানেন না, কিন্তু শাস্ত্রবিধিমৎ আচরণ করছেন। অনন্ত মুর্তি নামে একজন দক্ষিণ ভারতীয় পণ্ডিত কন্নড় ভাষায় অনেক কাহিনী ও উপন্যাস লিখেছেন। সাহিত্যে তিনি জ্ঞানপীঠ পুরস্কার পেয়েছিলেন আবার একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যও ছিলেন। তিনি তাঁর উপন্যাসে এই ধরণের প্রচুর প্রশ্নকে নিয়ে এসেছেন। ওনার বেশির ভাগ উপন্যাসই গ্রামকে কেন্দ্র করে, সেই গ্রামে কয়েকজন ব্রাহ্মণ আছেন, তাঁদের কেউ শাস্ত্র জানেন আবার অনেকে শাস্ত্র জানেন না,

আবার কেউ বৃদ্ধ ব্যবহার, শুধু পালন করে যাচ্ছেন। আবার অনেকে আছে যারা শাস্ত্রের সব কিছুর বিরোধিতা করে বলত আমরা এগুলো মানব না। আচার্য শঙ্কর বলছেন – তুমি যদি শাস্ত্র জান আর যদি বল আমাকে এগুলো মানব না, পালনও করবো না, এখানে তোমাকে নিয়ে কোন কথা বলা হচ্ছে না। তুমি যদি বল আমি শাস্ত্র জানিনা, সত্যি সত্যিই তুমি আদপেই শাস্ত্র জাননা তাহলে তোমার আশেপাশে যারা বৃদ্ধ আছেন তাঁরা যে রকমটি আচরণ করছেন তুমিও সেটাকেই অনুসরণ করে নিজের জীবনে পালন কর। কিভাবে পালন করছে? *শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ*, শ্রদ্ধার সাথে যুক্ত হয়ে আচরণ করছে।

এখানে শ্রদ্ধা এই শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্য ও গভীর তত্ত্ববোধক ভাবকে বহন করছে। যে অর্থে এখানে শ্রদ্ধার কথা বলা হচ্ছে, সেই অর্থে ইংরাজীতে শ্রদ্ধার অনুবাদ হয় না। এখানে শ্রদ্ধার মূল অর্থ হচ্ছে আমার মনের ঠিক ঠিক গতি বা ভাব। জন্ম জন্মান্তরে আমরা যে কাজগুলো করেছি তাকে ভিত্তি করে মৃত্যুর সময় আমাদের চিত্তের মধ্যে একটা ঘূর্ণাবর্ত তৈরী হয়, ঐ ঘূর্ণি চলতে চলতে ওর মধ্যেকার কিছু জিনিষ যেন ফেনার মত হয়ে উপরের দিকে চলে আসে। ঐ ফেনা যেটা উপরের দিকে চলে এলো ঐটাকে কেন্দ্র করেই আমার পরবর্তি নতুন জন্ম হবে। যোগশাস্ত্রে এই জিনিষটাকে এইভাবে বলা হয়। এর আগের জন্মে মৃত্যুর সময় ঠিক যে জিনিষটা ফেনার মত সামনে এসে দাঁড়ায় এটাকেই বলা হয় স্বভাব। এই স্বভাব থেকে কিছু কিছু প্রবৃত্তির জন্ম নেয়, এই পুরো জিনিষটাকেই বলা হয় শ্রদ্ধা। এর আগের জন্ম আমরা কি ছিলাম জানিনা, কিন্তু এখানে যখন শাস্ত্র অধ্যয়ন করতে এসেছি তাহলে নিশ্চয়ই ভক্ত ছিলাম, তা নাহলে এত কঠিন শাস্ত্র কেন পড়তে আসব। আমাদের মধ্যে হাজার হাজার কোটি কোটি জন্মের যে বিশাল সংস্কারের বোঝা জমে আছে, মৃত্যুর সময় এই সংস্কার গুলোই তোলপাড় করতে থাকে, এগুলোকে বলা হয় সংস্কার সমূহ। তোলপাড় হতে হতে তার মধ্য থেকে কিছু কিছু সংস্কার উপরিভাগে চলে আসে, উপরিভাগের এই সংস্কারগুলোকেই বলা হয় স্বভাব। এই স্বভাব থেকে শ্রদ্ধার জন্ম হয়। মনের ভেতরে যে স্বভাব রয়েছে আর যার প্রেরণায় সে যে ধরণের কাজে নিজেকে যুক্ত করে কাজ করছে, এটাকেই বলা হচ্ছে শ্রদ্ধা।

কঠোপনিষদে খুব সুন্দর বলছে – *শ্রদ্ধাবিবেশো*, নচিকেতার মধ্যে শ্রদ্ধা এলো। কিসের শ্রদ্ধা এলো? নচিকেতার মনের মধ্যে ধর্মের প্রতি, শাস্ত্রের প্রতি যে প্রবৃত্তি রয়েছে তাতে সে বুঝতে পারলো বাবা যে রুগ্ন গরুগুলোকে দান করছেন এটা তিনি ঠিক করছেন না। নচিকেতার কাছে এখন অনেকগুলো ধর্ম এসে গেছে, একদিকে তার কাছে বাবা যেটা বলছেন সেটাই করা উচিত, অন্য দিকে শাস্ত্র বলছে সব কিছু দান করতে হয়, অন্য দিকে বাবার মঙ্গলের জন্য বাবাকে যদি কটূ কথা বলতে হয় তাহলে সেটাও বলা দরকার। এরপরও পারিপার্শ্বিক আরও কিছু আনুষাঙ্গিক জিনিষ কাজ করছে, এইগুলোই সব কিছুকে ঠিক করে নচিকেতাকে বাবাকে এই কথা বলার জন্য উদ্বুদ্ধ করল – বাবা, তুমি আমাকে কাকে দিচ্ছ। শ্রীরামচন্দ্রের ক্ষেত্রেও ঠিক একই জিনিষ হয়েছিল, যখন বালিকে বধ করবেন তখন শ্রীরামচন্দ্রের একদিকে মনে হচ্ছে বালির সাথে আমার কোন ঝগড়া-বিবাদ নেই, অকারণে কেন বালিকে বধ করব। এই কাজটা ঠিক হবে কি হবে না। অন্য দিকে সুগ্রীবকে কথা দিয়েছেন বালি বধ করে তার স্ত্রী ও রাজ্য ফিরিয়ে দেবেন। এই যে নানান রকমের বিষয় কাজ করছে এর মধ্যে থেকে একটা জিনিষকে ঠিক করে শ্রীরামচন্দ্র এগিয়ে গেলেন। শ্রীরামচন্দ্র যে কাজটা করলেন এটা করতে পারলেন তাঁর শ্রদ্ধার জন্য। শ্রদ্ধা মানে হচ্ছে mental disposition, মনের গতি। মনের গতিটা হচ্ছে, আমাদের অন্তঃকরণের যে বৃত্তিগুলো রয়েছে, যেটা গত জন্মে আমিই তৈরী করে রেখেছিলাম। এই বৃত্তিগুলো ভগবান কখনই দেন না, এগুলো আমারই সৃষ্টি। যোগশাস্ত্র আর বেদান্ত এই জিনিষগুলোকে কখনই ভগবানের ঘাড়ে ফেলে দেয় না। আমাকে এমন ভাবে কে তৈরী করেছে? ভগবান কখনই এই ভাবে আমাকে, আপনাকে তৈরী করেন না, এই জিনিষগুলোও দেন না। তাহলে এগুলো কে তৈরী করেছে? হ্যাঁ ভগবনাই দিয়েছেন এতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু সেই কে? আমার আপনার যিনি অন্তর্যামী, আমি নিজেই এগুলো সৃষ্টি করেছি। ভালো মন্দ আমার যা কিছু হচ্ছে সবটাই আমার নিজস্ব অর্জিত।

এখানে এটাই বলা হচ্ছে, যারা শাস্ত্র জানে কিন্তু অবিধিপূর্বক সব কাজ করছে তাদের সম্বন্ধে কোন কথাই হবে না। তুমি শাস্ত্র জানো অথচ মানবে না, এটা কোন মতেই চলবে না। তুমি শাস্ত্রের কথা জানো না কিন্তু তা সত্ত্বেও নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধার সঙ্গে সব কিছু করে যাচ্ছ তখন এই প্রশ্ন হতে পারে। এই প্রশ্নের উত্তরে তখন শ্রীভগবান বলবেন এই শ্রদ্ধাকে কি বলা হয়। এর আগে আমরা সত্ত্ব, রজো ও তমো এই তিনটে গুণের আলোচনা করেছি। প্রশ্নটা আবার আমরা একটু মনে করছি, একজন শাস্ত্র জানেনা কিন্তু খুব শ্রদ্ধার সঙ্গে সব কিছু করছে, এখন এই শ্রদ্ধাকে আমরা সাত্ত্বিক শ্রদ্ধা বলব, না রাজসিক বলব কিংবা তামসিক বলব? ভগবান তখন বলছেন শ্রদ্ধা সব সময় তিন রকমের –

শ্রীভগবানুবাচ

**ত্রিবিধা ভবতি শ্রদ্ধা দেহিনাং সা স্বভাবজা। সাত্ত্বিকী রাজসী চৈব তামসী চেতি তাং শৃণু।।২।।**

ভগবান বলছেন শ্রদ্ধা তিন রকমের। কোন শ্রদ্ধার কথা বলছেন? যে জানেনা এই ব্যাপারে শাস্ত্র কি বলেছে, কিন্তু তারপরেও সে শ্রদ্ধা সহকারে সব কিছু করছে। এই শ্রদ্ধা তিন রকমের হয়। কিছুক্ষণ আগে বলা হল যে, মৃত্যুর সময় তার পূর্ব পূর্ব কর্মের ফলে যে সংস্কারগুলো জমে আছে সেই সংস্কার থেকে ফেনার মত কিছু সংস্কার তার মনের মধ্যে ভেসে ওঠে, আর সেই অনুসারে তার

পরের জন্মটা নির্ধারিত হয়। মৃত্যুর সময় যদি তার নিজের সত্ত্বগুণের সংস্কারটা ভেসে ওঠে তাহলে দেবতাদি পূজোর দিকে তার মনটা যায়। যখন রজোগুণ ভেসে ওঠে তখন তাদের যক্ষ, রাক্ষসাদির পূজোর দিকে মনটা যায়। যারা বড় বড় অফিসার, রাজনৈতিক নেতা, বড় বড় ব্যবসায়ী এরা হচ্ছে যক্ষ, রাক্ষসের দলের, প্রচণ্ড ক্ষমতা এদের। এখন যারা এদের অধীনে চাকরী করছে এরা ধর্মকর্ম করে এই সব যক্ষ, রাক্ষসদের পূজো করছে। এদের খুশি করে কিভাবে আরও বেশি পয়সা উপার্জন করতে পারে এই চিন্তা নিয়েই এরা ব্যস্ত থাকে। এগুলো সবই রজোগুণ থেকে জন্ম নেয়। মৃত্যুর সময় যদি তমোগুণ উপরের দিকে চলে আসে তখন এরা আরও নীচের দিকে নেমে যায়, এরা সব প্রেত, পিশাচ, ভূতাদির পূজো করে। গ্রামে গঞ্জে এখনও এই ভূত পিশাচের পূজো চোখে পড়ে। তবে আগেকার দিনে, বিশেষ করে শঙ্করাচার্য যখন এই ভাষ্য রচনা করছেন, তার মানে আজ থেকে প্রায় বারো চৌদ্দশ বছর আগে প্রেত, পিশাচের পূজো খুব প্রচলিত ছিল। এখন অবশ্য এগুলো অনেক কমে গিয়ে হিন্দু ধর্ম একটা সুশৃঙ্খল নির্দিষ্ট পদ্ধতির মধ্যে দাঁড়িয়ে গেছে। হিন্দুধর্মে যা কিছু পূজো আর্চা মোটামুটি শিব, কালী, বিষ্ণুর মধ্যেই আবদ্ধ হয়ে গেছে। শ্রদ্ধা এই তিন রকম কিভাবে হয়?

**সত্ত্বানুরূপা সর্বস্য শ্রদ্ধা ভবতি ভারত। শ্রদ্ধাময়োঽয়ং পুরুষো যো যচ্ছ্রদ্ধঃ স এব সঃ।।৩।।**

গীতার এই শ্লোকটি একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শ্লোক। আমার মনের মধ্যে শ্রদ্ধা জিনিষটা, আমার মনের গতি এটা সব সময়ই *সত্ত্বানুরূপা*, এখানে সত্ত্ব মানে বুদ্ধি। আমার মনের ভেতরে যেটা আছে আমার শ্রদ্ধাটাও সেই রকমই হবে, আমি চেষ্টা করলেও অন্য রকম করতে পারব না। যার জন্য দেখা যায় মানুষ এক ভাবে কোন একটা বিশেষ দেবতাকেই শুধু পূজো করে যেতে পারেনা। এইটাই হিন্দুধর্মের বৈশিষ্ট্য। সব মুসলমানরা যেমন পশ্চিমের দিকে মুখ করে নমাজ পড়ে। তাদেরকে যদি জিজ্ঞেস করা হয় তোমরা কেন পশ্চিমের দিকে মুখ করে নমাজ পড়ছ? তার উত্তরে তারা বলবে আমাদের তীর্থ মক্কা পশ্চিমে। মুসলমানদের একটাই ধর্মগ্রন্থ কোরান। কিন্তু হিন্দুধর্মের এসব কিছুই নেই, কেউ পূবদিকে মুখ, কেউ পশ্চিম দিকে মুখ করে পূজো করছে, কেউ উত্তর দিকে মুখ করে পূজো করছে, তারপর হিন্দুধর্মে কখনই একটা বিশেষ তীর্থকেই একমাত্র ধর্মস্থল রূপে মর্যাদা দেওয়া হয় না।

একজন ফলের চাষ করছে, তাকে অনেক রকম ফলের বীজ দেওয়া হয়েছে। বীজের সময় সবটাই এক রকমের লাগছে। বীজ লাগানো হল, চারা বেরোলে দেখে মনে হবে সব যেন একই গাছের চারা। এরপর এক বছর যেতে না যেতেই বোঝা যায় এটা বাবলা গাছ এটা আম গাছ। আরও পরে দেখা গেলো এখানে দশটি আম গাছ আছে। এরপর আমগাছ গুলোও আলাদা আলাদা হয়ে যাবে, এটা ল্যাংড়া আম, এটা হিমসাগর, এটা বোম্বাই আম সব আস্তে আস্তে পরিষ্কার হয়ে যায়। ঠিক তেমনি হিন্দুধর্মে যখন মানুষ জন্ম নেয় তখন এদের মানসিকতাটা পুরো অন্য রকম হয়ে যায়, তার পূজো করার দৃষ্টিভঙ্গিটা বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে পাল্টাতে থাকে। যখনই মানুষ ধ্যান ধারণা করতে শুরু করে তখন তার মনের একটা গতি হয়। তার মনের গতি অনুসারে কিছু কথা সে গ্রহণ করতে চায়, কিছু কথা সে গ্রহণ করতে চায় না। তখন কেউ শিবকে ভালোবাসবে, কেউ কৃষ্ণকে ভালোবাসবে। সেইজন্য বলা হল মনের ভেতরটা যে রকম সেই অনুসারে সবারই সত্ত্ব, রজো আর তমোগুণের শ্রদ্ধা হয়। *শ্রদ্ধাময়োঽয়ং*, একটা মানুষের পরিচয় সেটাই যেটা তার শ্রদ্ধা, অর্থাৎ তার স্বভাবটি যেমন। মন বুদ্ধি অহঙ্কারাদি দিয়ে তৈরী আমার যে অন্তঃকরণ, আমি ঐটাই। ঠাকুর বলছেন – মানুষ কে? যার মানে হুঁশ আছে সেই মানুষ। মান হচ্ছে নিজের অহং যেটা। এখানে এই কথাই ভগবান বলছেন। যে কোন সংসারী জীবের যেমনটি শ্রদ্ধা সে নিজেও ঠিক তেমনটি। এখন যদি ভালো করে বিচার করতে বসি তাহলে দেখব মানুষের একমাত্র টাকা-পয়সা ছাড়া কোন জিনিষের প্রতি শ্রদ্ধা নেই। কিন্তু টাকা-পয়সা কখন শ্রদ্ধার জিনিষ হতে পারেনা। শ্রদ্ধা মানেই হচ্ছে, শাস্ত্রে যে কথাগুলো বলা আছে সেই কথাগুলোকে সে কিভাবে নিচ্ছে তার উপরে তার শ্রদ্ধা ঠিক হবে। এই ভাবটাই আবার নির্ভর করে জন্মজন্মান্তরে তার সংস্কার কি রকম হচ্ছে। তাই একজনের শ্রদ্ধার উপর নির্ভর করবে সে কি রকম মানুষ। শ্রদ্ধা মানেই হল তার মানে হুঁশ কি রকম। মান বলতে তুমি কি বুঝছ, তোমার অহংটা কি এটাই হচ্ছে মান, সেটাকেই এখানে শ্রদ্ধা বলা হচ্ছে। শ্রদ্ধা সব সময় হয় অন্তঃকরণ থেকে, তোমার মনটি যেমন তুমি লোকটি তেমন। তোমার মনটি বোঝা যাবে তোমার শ্রদ্ধাটি কেমন তাই দিয়ে, বিভিন্ন জিনিষের প্রতি তোমার শ্রদ্ধা কেমন।

আমরা বলি মানুষকে কি করে চিনব, কোন মানুষকেই চেনা যায় না। কিন্তু গীতা বলছে, তা না, কিছুক্ষণ দেখলেই বোঝা যায় মানুষটি কেমন। কিভাবে চিনবে? ওর বাইরের যে আচরণ, সব কিছুর প্রতি তার শ্রদ্ধাটি কি রকম সেটা দেখে। কিছু দিন আগে খুব সুন্দর একটা লেখা বেরিয়েছিল, তাতে বলা হচ্ছে – আপনি নিজের ছেলের বিয়ের জন্য উপযুক্ত পাত্রী খুঁজছেন, নিজের মেয়ের বিয়ের জন্য উপযুক্ত পাত্র চাইছেন? তাহলে যার বাড়িতে বিয়ে দেবেন সেই বাড়িতে গিয়ে দেখুন সেই লোকটি নিজের চাকর-বাকর ও কুকুর বেড়ালের সাথে কি রকম ব্যবহার করে। সম্বন্ধ করতে গেলে সেতো চা-মিষ্টি দিয়ে আপ্যায়ন করবেই, ঐ দিয়ে বোঝা যাবে না। কিন্তু তাদের বাড়ির চাকর, ঝি, কুকুর বেড়াল এগুলো একে অপরের প্রতি কি রকম আচরণ করছে সেটা দেখেই বুঝতে পারবেন ঐ বাড়িতে এসে আপনার মেয়ে কেমন থাকবে। এদের পরস্পরের ব্যবহারেই বোঝা যাবে এর শ্রদ্ধাটা কেমন। এখানে কিন্তু বাংলাতে যে শ্রদ্ধার কথা বোঝায় সেই শ্রদ্ধার কথা বলা হচ্ছে না, এটাকে খুব ভালো করে মনে রাখতে হবে। এই শ্রদ্ধা হচ্ছে মনের গতিটি কি রকম। বলছেন যে, দু মিনিট কাউকে যদি লক্ষ্য করা যায় তাহলে বুঝতে পারা যাবে লোকটি কি রকম, কে ছটফটে, কে শান্ত, কার

মন সাত্ত্বিকের দিকে যাচ্ছে, কার মন রাজসিকের দিকে বা তামসিকের দিকে যাচ্ছে পরিষ্কার বোঝা যায়। কি দিয়ে বোঝা যায়? বাইরের লক্ষণ দিয়ে। কি কি সেই লক্ষণ? পরের শ্লোকে ভগবান এটাকে আরও পরিষ্কার করে দিচ্ছেন –

**যজন্তে সাত্ত্বিকা দেবান্ যক্ষরক্ষাংসি রাজসাঃ। প্রেতান্ ভূতগণাংশ্চান্যে যজন্তে তামসা জনাঃ।।৪।।**

এখান থেকে শুরু করে অষ্টাদশ অধ্যায় পর্যন্ত মানুষের তিনটে শ্রেণীর উপর আলোচনাকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। তবে সরাসরি কাউকে বলা হচ্ছে না যে আপনি শুধুই সাত্ত্বিক বা রাজসিক বা তামসিক। তা না করে বলে দিচ্ছে আপনার এই আচরণটা সাত্ত্বিক, এই ধরণের আচরণটা আপনার রাজসিক, এই আচরণ আপনার তামসিক গুণকে প্রকাশ করছে। যখন যার বেশির ভাগ আচরণই সাত্ত্বিক ভাবাপন্ন তখন সে সাত্ত্বিক পুরুষ, এইভাবে কেউ রাজসিক কেউ তামসিক। আবার একজনের মধ্যে অনেক সময় তিনটে গুণই সমান ভাবে মেশান দেখা যায়। অষ্টাদশ অধ্যায়ে গিয়ে এইটাই বলা হচ্ছে যারা ব্রাহ্মণ তাদের বেশির ভাগ আচরণই সাত্ত্বিক, ব্রাহ্মণ মানেই সাত্ত্বিক। ক্ষত্রিয়ের মধ্যে সত্ত্বগুণ কমে গিয়ে রজোগুণ বেড়ে যায়, বৈশ্যদের রজো কমে তমোগুণ বেড়ে যায় আর শূদ্রদের তামসিক গুণ প্রচণ্ড বেড়ে যায়। তাই বলে কি ব্রাহ্মণরা কাজ করবে না, শূদ্ররা কি তমোগুণের প্রভাবে ঘুমিয়েই কাটাবে? না তা নয়। এখান থেকে শুরু করে অষ্টাদশ অধ্যায় পর্যন্ত যে বর্ণনা করা হচ্ছে এতে বোঝা যাবে কার মনের গতি কি রকম।

এই শ্লোকে ভগবান বলছেন, যাঁরা সাত্ত্বিক পুরুষ তাঁরা দেবতাদির পূজো করেন। এখানে দেবতা বলতে আগেকার দিনের দেবতা ইন্দ্র, বরুণ, মিত্র ইত্যাদি দেবতাদের কথা বলা হচ্ছে, কিন্তু এখনকার দিনে দেবতা বলতে বোঝাবে যারা শিবের বা শ্রীকৃষ্ণের পূজো করছে, ঠাকুরের পূজো করছে, মানে অবতারাদির পূজো করছে। তখনকার দিনে যক্ষ, রাক্ষসদের পূজো করা হত, এখনকার দিনে এগুলো অনেক কমে গেছে। ঠিক সেই রকম আগেকার দিনে ভূত প্রেতাদির পূজোও করা হত।

আসলে মানুষ শাস্ত্রের কথা কিছু না কিছু জানে, কারণ শাস্ত্রের কথা মানুষের মুখে মুখে ঘুরতে ঘুরতে এত বেশি প্রচলিত হয়ে গেছে যে শাস্ত্রকে একেবারেই জানেনা এই রকম লোক খুব কম পাওয়া যাবে। আর ভারতের মাটি এমনই যে শাস্ত্রের কথা ঘুরে ঘুরে সবার কাছে পৌঁছেই যায়। হাজারের মধ্যে কোন একজনকে পেলেও পাওয়া যেতে পারে, যে শাস্ত্রের কথা জানেনা অথচ সাত্ত্বিক ভাবে থাকে। শাস্ত্র একদিকে যেমন জানা দরকার, অন্য দিকে ঠিক তেমনি অন্য দিকে শাস্ত্র যে কথাগুলো বলছে সেই কথাগুলো পালন করা দরকার। পরের শ্লোকে বলছেন যারা শাস্ত্রের কথা জানেনা, শাস্ত্রবিধি পালন করে না তারা কি করে –

**অশাস্ত্রবিহিতং ঘোরং তপ্যন্তে যে তপো জনাঃ। দম্ভাহঙ্কারসংযুক্তাঃ কামরাগবলান্বিতাঃ।।৫।।**

যারা শাস্ত্রটাস্ত্র জানেনা তারা মনে করে একটা বিরাট তপস্যা করলেই সব হয়ে যাবে, তপস্যা ছাড়া কিছু বোঝে না। মহাবীর জৈনের যারা অনুগামী তারা এইগুলো নিয়ে খুব তপস্যা করতেন, কিন্তু *দম্ভাহঙ্কারসংযুক্তাঃ*, এইখানে বাকিদের সাথে জৈনদের তফাৎ হয়ে যায়। জৈনরা তপস্যা করতেন মুক্তি পাওয়ার জন্য, কিন্তু বাকি যারা তপস্যা করে এরা *দম্ভাহঙ্কারসংযুক্তাঃ*, এদের তপস্যা দম্ভ আর অহঙ্কারকে আশ্রয় করে। গঙ্গাসাগর মেলার সময় অনেক বাবাজী আছেন যাঁরা শীতের ঠাণ্ডাতে খালি গায়ে কাঁটার উপর বা লোহার পেরেকের উপর শুয়ে থাকেন আর তীর্থযাত্রীদের দেখান যেন আমি বিরাট একটা কিছু করছি। এগুলো হচ্ছে *অশাস্ত্রবিহিতং*, কোন শাস্ত্রই বলছে না যে তোমাকে কাঁটার উপর শুয়ে থাকতে হবে, এক পায়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে, শাস্ত্রে এই ধরণের কোন কথাই বলেনি। শাস্ত্র বলছে তপস্যা করতে। কিন্তু তাই বলে তুমি মনের মধ্যে একটা উদ্ভট ধারণা করে দম্ভ আর অহঙ্কারের বশীভূত হয়ে একটা তপস্যা করলেই কিছু হবে না। আমি যেমন লোহার পেরেকের উপর শুয়ে থাকি এই রকম আর কেউ পারবে না, এই ভাবটাই এদের প্রধান। এদের ধ্যান করাটা কিন্তু এখানে উদ্দেশ্য নয়, উদ্দেশ্য হচ্ছ দম্ভ, দম্ভ মানে নিজের পতাকাটাকে উঁচু করে দেখান। আর অহঙ্কার, আমার মত সাধনা কেউ কোন দিন করেছে নাকি! শাস্ত্র না জানলে প্রথমের দিকে এই দম্ভ আর অহঙ্কারই আসে। আর কি বলছেন – *কামরাগবলান্বিতাঃ*, তপস্যা করতে গেলে শক্তির দরকার, সেইজন্য বলে বয়স হয়ে গেলে আর জপ-ধ্যান করা যায় না, যা কিছু করার কম বয়সেই করে নিতে হয়। সাধনা করতে গেলেও শক্তির দরকার, আর তপস্যাতেও প্রচণ্ড শক্তির দরকার। এখানে বলছেন যাঁরা সাত্ত্বিক মানুষ তাঁরা তপস্যা করতে গিয়ে যে শক্তিকে লাগাচ্ছে সেই শক্তি আসছে তাঁর ভেতরের সাত্ত্বিক শ্রদ্ধা থেকে। বাকি যারা সাধারণ লোক, যাদের কথা এখানে বলা হচ্ছে তারা যে তপস্যা করে সেটা কামনা-বাসনা থেকে প্রেরিত হয়ে করে। রাগ হচ্ছে আসক্তি, কাম আর রাগটা যদিও খুব কাছাকাছি, কিন্তু রাগ আরও সূক্ষ্ম স্তরের, কাম আরেকটু স্থূল স্তরের। বেশির ভাগ মানুষই কামনা-বাসনা, আসক্তি বশতঃ *ঘোরং তপ্যন্তে*, ঘোর তপস্যা করে। যখনই কেউ বলছে আমি ঘোর তপস্যা করছি, তখন দেখতে হবে তপস্যাটা শাস্ত্রবিহিত না অশাস্ত্রবিহিত। শাস্ত্রে কোথাও ঘোর তপস্যার কথা বলে না, আর অশাস্ত্রবিহিত যদি হয় তাহলে দেখতে হবে এই তপস্যার পেছনে কি কোন দম্ভ ও অহঙ্কার আছে না সত্যিই ঈশ্বরকে পাওয়ার ইচ্ছে থেকে তপস্যা করছে। ঈশ্বরকে পাওয়ার ইচ্ছে থাকলে কখনই এই রকম করবে না, কারণ –

**কর্শয়ন্তঃ শরীরস্থং ভূতগ্রামচেতসঃ। মাঞ্চৈবান্তঃশরীরস্থং তান্ বিদ্ধ্যাসুরনিশ্চয়ান্।।৬।।**

এই ধরণের তপস্যা অসুর রাক্ষসরা করে। নিজের শরীর আর ইন্দ্রিয়কে এরা প্রচণ্ড কষ্ট দেয়। কয়েকজন মহিলা ঠাকুরকে দর্শন করতে আসার দিন উপোস করে এসেছে। উপোস করে আছে শুনেই ঠাকুর তক্ষুণি তাদের ফল প্রসাদ খেতে দিলেন। ঠাকুর বলছেন – আমাকে দর্শন করতে কেউ যদি উপোস করে আসে তাতে আমারই কষ্ট হয়। এমনকি একাদশীর দিনও ঠাকুর বলতেন তোমরা কিছু খাবে। শরীরকে কষ্ট দেওয়া হয় শরীর বোধটাকে কমান। বিহার, ইউপিতে ছট পূজা হয়, বলে এটা নাকি সূর্যের পূজো, আদপেই সূর্যের পূজো নয়, আসলে এটা হচ্ছে মা ষষ্টির ব্রত পালন করা, যার সন্তান হয়নি সে সন্তান কামনা করে আর যাদের সন্তান আছে তারা আমার সন্তানাদির যাতে মঙ্গল হয় সেই উদ্দেশ্যে ষষ্টি পূজো করছে। যারা এই ছট পূজো করছে তারা নিজেরাও জানেনা কি করছি আর কেন করছি। উদ্দেশ্যটা ভগবানের প্রতি ভক্তি লাভ নয়। যারা এই ব্রত পালন করে তারা সারা রাত উপোস করে থাকে আর রাত্রি জাগরণ করে। সূর্য অস্ত যাওয়ার সময় সূর্যকে এই বলে সাক্ষী রাখা হয় – হে সূর্যদেব, আমি তোমাকে সাক্ষী রেখে আমার এই তপস্যা শুরু করলাম। এবার সারা রাত উপোস থাকে, আসলে সারা দিন থেকেই উপোস থাকে। সারা রাত জেগে থাকবে আর সকালে সূর্যদেবকে অর্ঘ্য দেবে। তপস্যা তো করতে হবে, কিন্তু রাত্রে তো ঘুম পেয়ে যাবে, কারণ সারাদিন উপোস করে আছে আবার কাজকর্মও করতে হচ্ছে, সেইজন্য যাতে ঘুমিয়ে না পড়ে তাই ভিডিও লাগিয়ে সিনেমা চালু করে জাগিয়ে রাখা হয়। এইগুলোকেই বলা হয় আসুরিক তপস্যা। আসল উদ্দেশ্যটা হারিয়ে গেছে, তপস্যার উদ্দেশ্য হচ্ছে তপস্যা করলে একটা পূণ্য অর্জন হয়, সেই পূণ্যে আমার মনের পরিবর্তন হবে আর আমার আশেপাশে যারা আছে তাদেরও মঙ্গল হবে। এখন এই ভাবটা হারিয়ে গেছে, এখন উদ্দেশ্য হল রাতে জেগে থাকা। কিভাবে জেগে থাকবে? সে এখন ভিডিওতে সিনেমা চালিয়েই হোক আর নাচ গান করে যা করেই হোক। এই ভাবে তারা *কর্শয়ন্তঃ শরীরস্থং,* শরীরের যত ইন্দ্রিয়গুলো আছে তাদের কষ্ট দিচ্ছে।

আর কি হচ্ছে? *মাঞ্চৈবান্তঃশরীরস্থং,* এই শরীরের মধ্যে আমি যে অন্তর্যামী রূপে বিরাজ করে আছি, এই করে সে আমাকেও কষ্ট দিচ্ছে। আসলে ভগবানকে তো কষ্ট দেওয়া যায় না, যিনি শুদ্ধ আত্মা তাঁকে কষ্ট দেওয়া যায় না। কিন্তু ভগবানের পথে না চলাটাই হচ্ছে ভগবানকে কষ্ট দেওয়া। শাস্ত্র ভগবানরেই কথা বলছে, তাই শাস্ত্রবিহিত ভাবে না চলা মানেই ভগবানকে কষ্ট দেওয়া। *তান্ বিদ্ধ্যাসুরনিশ্চয়ান্,* এরাই আসুরিক বুদ্ধিবিশিষ্ট, এদের জেনে কি হবে – হে অর্জুন, তুমি যখন বুঝে গেলে এরা আসুরিক তখন তুমি আর এদের সঙ্গ করতে যাবে না। কারণ এদের সঙ্গ করলে তোমার মনও নীচের দিকে চলে যাবে। যখন শাস্ত্রবিহিত মতে দেবতাদের পূজো করা হচ্ছে ততক্ষণ এক রকম আর যখন শাস্ত্রবিহিত ভাবে না করে ঘোর তপস্যা করছে আর তার পেছনে কাম আর রাগ প্রেরিত আছে, এই ধরণের তপস্যা রাজসিক আর অত্যন্ত জঘন্য। আর যখন শরীরকে কষ্ট দিয়ে ঘোর তপস্যা করছে সেটা আরও জঘন্য, এদের সাথে তুমি কোন সম্পর্ক রাখবে না। গঙ্গাসাগরে বা অন্যান্য জায়গাতে যারা শরীরকে কষ্ট দিয়ে তপস্যা করছে, গীতার মতে তাদের সাথে কথা বলাও উচিৎ নয়, কারণ এরা অসুর, এদের সাধনাটা আসুরিক এগুলোকে কখনই দৈবী সাধন বলা যায় না। এরপর ভগবান অন্য প্রসঙ্গে গিয়ে খাওয়া দাওয়া ও অন্যান্য বিষয় নিয়ে বলবেন। এগুলো বলা হচ্ছে যাতে তুমি যদি ভুল করতে থাক তাহলে তুমি সেই ভুলগুলিকে শুধরে নিতে পারবে, যেটা শুধরে নেওয়া হয়েছে এইবার সেইখানে তোমার মনটা যেন দৃঢ় থাকে, ভগবান বলছে –

**আহারস্ত্বপি সর্বস্য ত্রিবিধো ভবতি প্রিয়ঃ। যজ্ঞস্তপস্তথা দানং তেষাং ভেদমিমং শৃণু।।৭।।**

মানুষের যত রকমের আহার্য বস্তু আছে সব আহারকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। সত্ত্ব, রজো আর তমোর অনুসারে খাওয়া-দাওয়া যেমন তিন ধরণের হয়, সেই রকম যজ্ঞ তিন ধরণের, তপস্যা তিন ধরণের আর দানও তিন ধরণের হয়। এই তিন ধরণের সব কিছু তোমাকে শোনান হচ্ছে। অষ্টাদশ অধ্যায়ে আবার এইগুলোকে নিয়ে বলা হবে। এই তিন ধরণের সব কিছু যখন জেনে যাবে তখন তুমি যে তপস্যা করবে, দানাদি করবে, খাওয়া-দাওয়া করবে তখন তুমি সেই রকমটিই করবে, যদি না কর তাহলে তোমার মন কিন্তু আস্তে আস্তে নীচের দিকে চলে যাবে। প্রথমে সাত্ত্বিক আহারের কথা বলা হচ্ছে –

**আয়ুঃসত্ত্ববলারোগ্যসুখপ্রীতিবিবর্ধনাঃ। রস্যাঃ স্নিগ্ধাঃ স্থিরা হৃদ্যা আহারাঃ সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ।।৮।।**

আগেকার দিনে আমাদের দেশে বিধবা বিবাহ প্রথা ছিল না। অনেক সময় মেয়েরা কম বয়সে বিধবা হয়ে যেতে, অল্প বয়সী বিধবাদের সামলে রাখার জন্য তাদের সাত্ত্বিক আহারের বেশি ব্যবস্থা করা হত যাতে তাদের মনে কোন ধরণের চঞ্চলতা যেন না জাগে। এখানে অনেকেই হিন্দুধর্মকে নঞংকারাত্মক ধর্ম বলে, হিন্দুধর্ম এই জগৎকে অস্বীকার করে। এখানেই বোঝা যায় যে এই ধারণাটা কতখানি ভ্রান্ত, প্রথমেই বলছে খাবার এমন খাবে যাতে আয়ু বৃদ্ধি হয়, দীর্ঘ দিন যেন বেঁচে থাকতে পার। দীর্ঘ দিন কিভাবে বেঁচে থাকবে? বুদ্ধি যেন তোমার ঠিক থাকে, সেইজন্য বলছেন *আয়ুঃসত্ত্ব,* সত্ত্ব মানে বুদ্ধি, অর্থাৎ এমন খাবার খাবে যাতে তোমার আয়ু বৃদ্ধি হয় আর বুদ্ধিটাও বাড়ে। *বল* – খেয়ে তোমার শরীরের যেন বল বৃদ্ধি হয়। এমন খাবার খেতে না, যে খাওয়া খেলে হজম করতেই সব শক্তি ক্ষয় হয়ে যায়। *আরোগ্য* – এমন খাবার খেতে হবে শরীরটা যাতে সব সময় রোগমুক্ত থাকে। *সুখপ্রীতি* – খাওয়া-

দাওয়ার পর মনের মধ্যে যেন একটা সুখের ভাব, তৃপ্তির ভাব থাকে আর প্রীতি, খাদ্যটা এমন হবে যাতে মনটাকে অশান্ত না করে দেয়। যেমন মদ খাওয়া, মদ পান করার পর প্রীতির ভাব থাকে না, তখন বলে কে কার খুড়ো কে কার বাপ। আয়ু, বুদ্ধি, আরোগ্য, সুখ, মনের শান্ত ভাব এই জিনিষগুলো যেন বিবর্ধন হয়। এই জিনিষগুলো যদি না বৃদ্ধি পায় তাহলে বুঝতে হবে তার খাওয়াতে কোন দোষ আছে। যে খাওয়াতে এই জিনিষগুলো বৃদ্ধি পায় একমাত্র সেই খাবারই হচ্ছে সাত্ত্বিক আহার। সাত্ত্বিক আহারের লক্ষণ কি কি? *রস্যাঃ,* খাবারটা কখনই রসহীন শুষ্ক থাকবে না। শুকনো খাবার, যেমন নিমকি, চানাচুর এগুলো কখনই সাত্ত্বিক খাবারের মধ্যে গণ্য করা হয় না। *স্নিগ্ধাঃ,* খাবারের মধ্যে কোন অমসৃণতা থাকবে না, একটা মসৃণ ভাব থাকে, স্পর্শ করেই সুখ অনুভব হবে। *স্থিরা,* মানে খাবারটা বেশ কিছুক্ষণ পেটে থাকবে, এই খাওয়া হল তারপরেই আবার খিদে পেয়ে গেল এই রকমট হবে না, যেমন ডাল, ভাত, রুটি পেটে অনেকক্ষণ থাকে অথচ এর মধ্যে সবই আছে, রস্যা, স্নিগ্ধা, স্থিরা হৃদ্যা সবই থাকবে, এই কারণে আমাদের ভারতীয় খাবার অনেকটাই সাত্ত্বিক খাবার। *হৃদ্যা,* যেটা আমাদের প্রিয়, খেতে আরামদায়ক ও ভালো লাগে। দুধ, দই, পায়েস সবই সাত্ত্বিক খাবার, এর মধ্যে পায়েসটা হল সব থেকে ঠিক ঠিক সাত্ত্বিক খাদ্য। হিমালয়ের দিকে সাধুদের কাছে গেলে তাঁরা চা খেতে দেন না, এক গ্লাশ দুধ হাতে ধরিয়ে দেন। সাধু সাত্ত্বিক খাবার ছাড়া খাবেন না। আর রাজসিক খাবার কোন গুলো –

**কট্বম্ললবণাত্যুষ্ণতীক্ষ্ণরুক্ষবিদাহিনঃ। আহারা রাজসস্যেষ্টাঃ দুঃখশোকাময়প্রদাঃ।।৯।।**

কিছু কিছু খাবার আছে যেগুলো খেলে দুঃখের জন্ম দেয়, শোক জন্ম দেয় আর রোগ জন্ম দেয়। এই খাবারগুলো হচ্ছে রাজসিক খাবার। রাজসিক খাবারের বিশেষত্ব কি? এখানে প্রতিটি শব্দের সাথে অতি কথাটা লাগাতে হবে, অতি লবণাক্ত, অতি টক, অতি কটু, মানে খুব বেশি মাত্রায় যদি তেতো হয়, অতি উষ্ণ, অতি তীক্ষ্ণ, তীক্ষ্ণ মানে খুব ঝাল লঙ্কা ও মশলা দিয়ে তৈরী খাবার আর খুব রুক্ষ, মানে শুকনো খাবার। এই ধরণের সব খাবার হচ্ছে রাজসিক। কার কোন খাদ্যে বেশি রুচি আছে দেখেই বোঝা যাবে লোকটার মনের গতি কি রকম। মাংস যদি কেউ স্টু করে খায় তাহলে এই মাংস খাওয়াটা সাত্ত্বিক খাবারে চলে যাবে। এই মাংসই যখন ঝাল ও অনেক রকম মশলা দিয়ে রান্না করা হবে তখন এটাই রাজসিক খাবারের মধ্যে গণ্য করা হবে। তামসিক খাবার হচ্ছে-

**যাতযামং গতরসং পূতি পর্যুষিতঞ্চ যৎ। উচ্ছিষ্টমপি চামেধ্যং ভোজনং তামসপ্রিয়ম্।।১০।।**

তামসিক লোকেদের খাওয়া-দাওয়াটা একেবারেই অন্য ধরণের। *যাতযামং,* মানে মন্দ পক্ক, রান্নাটাও অসম্পূর্ণ, একটু কাঁচা কাঁচা থাকতেই রান্না শেষ। কাঁচা কাঁচা রান্না যে অজান্তে করছে তা নয়, জেনে শুনেই করছে, বলে নাকি এতে ভিটামিনটা ভালো থাকে, কিন্তু মোটেই তা হয় না, এগুলো সব অশাস্ত্রবিহিত খাবার। আমাদের মুনি ঋষিরা পাঁচ হাজার বছর ধরে পরীক্ষা নিরিক্ষা করে এগুলো ঠিক করে গেছেন, এক কথায় এগুলোকে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। কাঁচা কাঁচা থাকলে হজম করা কঠিন হয়, হজম ঠিক মত না হলে জপ-ধ্যানে মন বসবে না। *গতরসং,* খাবারটার রসযুক্ত ছিল কিন্তু এতদিনে সেই রস শুকিয়ে গেছে। মুনি ঋষিরা বায়ু, পিত্ত কফের নাড়ির একটা সামঞ্জস্য রাখার জন্য এই ধরণের খাবার থেকে দূরে থাকতে বলতেন। আমরা এগুলো জানিনা বলে মানতে চাইনা। পূতি, দুর্গন্ধ যুক্ত খাবার, মানে পচে গেছে, যেমন শুটকি মাছ, মাছের রসটা শুকিয়ে গেছে আবার পচেও গেছে, শুটকি মাছ পুরো তামসিক খাবার। *পর্যুষিতং,* বাসি খাবার, রাত্রে রান্না করে পরের দিন খাওয়া। এগুলোকে আলোচনার করার সময় আমাদের বাড়ির আর্থিক অবস্থাকেও মাথায় রাখতে হবে। গ্রামে গঞ্জে আলো ও জ্বালানি বাঁচাবার জন্য অনেকে রাত্রেই অনেক রুটি বানিয়ে রাখে, যাতে পরের দিন সকালবেলাতেই পুরুষরা মাঠে ঘাটে কাজকর্ম করতে যাবার আগে ঐ রুটি খেয়েই বেরিয়ে যেতে পারে। এগুলো আলাদা জিনিষ, এখানে বলা হচ্ছে তোমার মনের গতিটা কি রকম, আর সেই অনুসারে তুমি তোমার খাদ্য বাছাই করবে। এখানে বলছেন না যে তুমি কি খাচ্ছ, বলছে তোমার কি খেতে ভালো লাগছে। যদি বল আমার বাসি রুটি খেতে ভালো লাগে তাহলে কিন্তু তোমার মধ্যে তামসিক ভাব আছে। কিন্তু তুমি যদি বল আমার উপায় নেই বলে বাসি রুটি খেতে হচ্ছে কিন্তু টাটকা গরম গরম রুটি খেতেই ভালো লাগে, তখন জিনিষটা অন্য রকম হয়ে যাবে। এখানে বলা হচ্ছে তোমার মন কি চাইছে।

*উচ্ছিষ্টমপি চামেধ্যং,* আমাদের হিন্দু শাস্ত্রে কারুর মুখের খাবার বা পাতের খাবার খাওয়া অত্যন্ত গর্হিত কর্ম। ঠাকুর নিজের বাবার কথা বলতে গিয়ে বলছেন – যে সাত্ত্বিক লোক সে নিজের এঁটো খাবার কাউকে দেয়না। এখনতো এঁটোকাটা কেউই মানে না। কিছু দিন আগেও আমাদের সমাজে বাচ্চাদের উচ্ছিষ্টের ব্যাপারে পরিবারের মধ্যেই শিক্ষা দেওয়া হত, উচ্ছিষ্ট খাবারের ব্যাপারে তাই সবাই খুব সজাগ থাকত। এখন এগুলো সব শিথিল হয়ে গেছে আর সবাই সবার এঁটো খাচ্ছে। মা ও সন্তানের আলাদা সম্পর্ক সেখানে কিছু বলার থাকে না। এখানে বলা হচ্ছে, যদি এই জিনিষগুলোকে কেউ না মানে তাহলে বুঝতে হবে তার মধ্যে তামসিক ভাব জাগ্রত হচ্ছে। এসব বলা তাদের জন্যই যারা সাধন ভজন করে উপরের দিকে ওঠার চেষ্টা করছে। সাধন ভজনের মধ্যে যখন থাকবে তখন সেই সময় তোমার মনটাও যেন সাত্ত্বিক ভাবাপন্ন হয়। সাত্ত্বিক ভাব যদি না থাকে তাহলে কোথাও না কোথাও তোমার পতন অনিবার্য হয়ে যাবে। সুচের মধ্যে যখন সুতো পড়ান হয় তখন একটি আঁশ যদি থাকে তাহলে আর সুচের মধ্যে দিয়ে সুতো গলবে না। এগুলোর মধ্যে যদি কোথাও একটু গোলমাল থাকে তাহলে কিন্তু সাধন ভজন হবে না। গুজরাটে একটা প্রথা আছে, কারুর বাড়িতে যদি কোন সম্মানীয় অতিথি আসেন তখন তাঁর সম্মানার্থে মুখ থেকে এঁটো বার করে তাঁর পাতে দেবে। এটা হচ্ছে গুজরাতে

সর্বোচ্চ সম্মান প্রদান, এর থেকে আর কোন ভাবে কাউকে উচ্চ সম্মান প্রদান করা যাবে না। হিন্দীতে প্রবাদই আছে – দাঁত কাটি রোটি। আমাদের সমস্যা যে আমরা নিজেদেরকে দিয়ে অন্য সম্প্রদায়ের সংস্কৃতি ও রীতিনীতির সমালোচনা করি, কিন্তু এটা কখনই সমালোচনা করার পদ্ধতি নয়, ওদের সংস্কৃতিতে গিয়ে ব্যাপারটাকে দেখা উচিৎ। এখানে মূল ব্যাপার হচ্ছে এঁটোর ভাবটা যেন তোমার মধ্যে সর্বদা জাগ্রত থাকে। এঁটোর মধ্যে কিছুটা তন্মাত্রার ব্যাপারটাও জড়িত থাকে।

এটা যে শুধু খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারেই থাকবে তা নয়। একজনকে কিছু দেওয়ার উদ্দেশ্যে কোন জিনিষ কেনার পর সেটা তাকে না দিয়ে অন্য কারুকে দেওয়াটাও ঠিক নয়। আমি যে মুহুর্তে ঠিক করেছি যে এটা কাউকে দেব সেখানেই ঐ বস্তুটা উচ্ছিষ্ট হয়ে গেল, ওটা আর কারুকে দেওয়া উচিৎ নয়। স্বামী বিজ্ঞানানন্দজীর জীবনে একটা এই ধরণের ঘটনা লিপিবদ্ধ আছে। এলাহাবাদে একবার এক ভক্ত নিজের বাড়ির গাছের কিছু ভালো জাতের আম নিজের সন্তানের হাত দিয়ে স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী কাছে পাঠিয়েছেন। বাচ্চাটি বাস্কেটে করে আম নিয়ে যাচ্ছে, যেতে যেতে উপরের দুটি আম দেখে ভাবছে – আমগুলো বেশ দেখতে, খেতে পারলে হত। বিজ্ঞানমহারাজের কাছে বাচ্চাটি আম নিয়ে হাজির হয়েছে। আমগুলো মহারাজ দেখলেন, দেখার পর বলছেন – বাঃ খুব ভালো আম নিয়ে এসেছ, দাঁড়াও তোমাকে কটা আম দিই। বাচ্চাটি বলছে – না না, আমার আম লাগবে না। কিন্তু ছেলেটি যে কটা আম দেখে ভেবেছিল খেতে পারলে ভালো হত, ঠিক সেই কটি আমই তুলে তুলে বিজ্ঞান মহারাজ ছেলেটির হাতে দিয়ে বললেন – এই আম কটা তুমি নাও, আমি তোমাকে দিচ্ছি, তুমি রাস্তা দিয়ে খেতে খেতে যেও। মহাপুরুষরা দেখেই বুঝতে পেরে গিয়েছলেন কোন আমগুলো এঁটো হয়ে গেছে। ঠাকুরের জীবনে এই ধরণের অনেক ঘটনা আছে। কোন জিনিষের অগ্রভাগ কাউকে দেওয়া হয়েছে, কিংবা চিন্তা করে নিয়েছে ঠাকুর আর কখনই ওটা গ্রহণ করতেন না। সাধারণ লোকেরা এগুলো বুঝতে পারেনা। শ্রীমা খুব সুন্দর বলছেন – সন্ন্যাসীর যে সাদা কাপড়, তাতে যদি একটু কালো দাগ লেগে যায় দূর থেকে সেটা স্পষ্ট দেখা যায়, আর গৃহস্থ মানে কালো কাপড়, সেখানে যদি আধ বোতল কালি ঢেলে দিলেও বোঝা যাবে না যে কালি লেগেছে।

তিন রকমের খাওয়া দাওয়ার কথা বলার পর এবারে তিন রকম যজ্ঞের কথা বলা হচ্ছে। যজ্ঞের মধ্যে অনেক কিছু আছে, পূজো অর্চনা, তীর্থ যাত্রা, নিজের জপ-ধ্যান, শাস্ত্র অধ্যয়ণ এই সব কিছুকেই যজ্ঞের মধ্যে ধরা হয়। সব যজ্ঞই তিন রকমের সাত্ত্বিক যজ্ঞ, রাজসিক যজ্ঞ আর তামসিক যজ্ঞ –

**অফলাকাঙ্ক্ষিভির্যজ্ঞো বিধিদিষ্টো য ইজ্যতে। যষ্টব্যমেবেতি মনঃ সমাধায় স সাত্ত্বিকঃ।।১১।।**

সাত্ত্বিক ভাবাপন্ন ব্যক্তি যখন যজ্ঞ করে তখন সেই যজ্ঞে কোন ফলের আকাঙ্ক্ষা রাখে না, আর একেবারে পুরোপুরি শাস্ত্রবিধি অনুসারে যজ্ঞ করে। কোন ফলাকাঙ্ক্ষাতো থাকবেই না, উপরন্তু সে শুধু এটাই মনের মধ্যে ধারণা করে রেখেছে যে যজ্ঞ করাটা, যজ্ঞের যে স্বরূপ সেটাকে সম্পাদন করাটাই আমার একমাত্র কর্তব্য। এটাই আমার কর্তব্য বলে আমি এই যজ্ঞ করছি। আমি সকালে উঠে কেন জপ-ধ্যান করছি? কারণ জপ-ধ্যান করাটাই আমার কর্তব্য। আমাদের ব্রাহ্মণ সমাজে ব্রাহ্মণরা যে এত কিছু করতেন, তাঁরা পূণ্যার্জনের জন্যই যে সব কিছু করছেন একেবারেই সেটা ভাবতেন না, বরঞ্চ তাঁরা জানতেন – *অকরণে প্রত্যবায়ঃ*, না করলে পাপ হবে। তুমি ব্রাহ্মণ সকালে উঠে যদি স্নান না কর তাহলে তোমার পাপ লাগবে, ত্রিসন্ধ্যা যদি গায়ত্রী জপ না কর তাহলে পাপ লাগবে, কারুর ছোঁয়া যদি খেয়ে নাও তাহলে তোমার পাপ লাগবে, যেটাই বলবে সেটা না করলে পাপ লাগবে, কোনটা করলে যে পূণ্য হবে সে কথা কোথাও বলা হত না। আমাদের সমাজ কতটা মূল্যবোধের উপরে প্রতিষ্ঠিত ছিল ভাবা যায় না, বলছেন – তুমি নিজেকে তিল তিল করে যজ্ঞে আহুতি দাও। ক্ষত্রিয়কেও তাই বলা হত – যুদ্ধ থেকে যদি তুমি পালিয়ে আস তাহলে তোমার পাপ লাগবে। পূণ্য তোমার কিসে হবে? তোমার কর্তব্য করতে করতে যদি তুমি মরে যাও তাহলেই তোমার পূণ্য হবে, এছাড়া তোমার পূণ্য বলে কিছু নেই। বৈশ্যদের বলা হত – তোমার কাছে যা সম্পদ আছে তার একটা কানাকড়িও তোমার নয়, তুমি শুধু এগুলোর অছি। ঠাকুরও মথুরবাবুকে বলছেন – এই সম্পদ, এই কর্মচারিরা সব মায়ের সম্পদ, তোমার কর্তব্য এই সম্পদ আর এই লোকজনদের রক্ষণাবেক্ষণ করা। আমাদের যা কিছু আছে, বাড়ি, গাড়ি, টাকা, স্ত্রী, সন্তান এরা সব ঠাকুরের সম্পত্তি, আমাকে দেখাভাল করার জন্য নিয়োগ করা হয়েছে। ঠিক ভাবে দেখাশোনা না করাটা ঘোর অন্যায়। সবটাতেই অকরণে প্রত্যবায়। আমি স্ত্রীর ভরণপোষণ করছি, সন্তানদের মানুষ করছি, এগুলো করলে কোন পূণ্য হয় না, না করলে বরং পাপ হবে। এটাই আমাদের সনাতন আদর্শ। আমাদের সমাজ ব্যবস্থা কতটা উন্নত ছিল কিন্তু আজ সেখান থেকে আমরা কত নীচে পড়ে গেছি। এরপর রাজসিক যজ্ঞের কথা বলা হচ্ছে –

**অভিসন্ধায় তু ফলং দম্ভার্থমপি চৈব যৎ। ইজ্যতে ভরতশ্রেষ্ঠ তং যজ্ঞং বিদ্ধি রাজসম্।।১২।।**

রাজসিক মনোভাবপন্ন লোকেরা যখনই কোন যজ্ঞ করে সেই যজ্ঞ থেকে কিছু ফল পাওয়ার জন্যই করে। এর থেকে বড় ব্যাপার হচ্ছে পাখণ্ডী ভাব, লোকেদের দেখানোর জন্য বিরাট আয়োজন করে যজ্ঞ করে। এই ভাবটাকেই এর আগের অধ্যায়ে খুব সুন্দর করে বর্ণনা করা হয়েছিল – *যক্ষ্যে দাস্যামি মোদিষ্য*, আমি যজ্ঞ করব, আমি দান করব, আমি এই করব ইত্যাদি। এখনকার দিনে বড় বড় নেতারা পাড়ার ক্লাবগুলো যেভাবে দুর্গাপূজো করে এরা সবই এই ভাব নিয়েই করে। আর তামসিক যজ্ঞ কি রকম?

**বিধিহীনমসৃষ্টান্নং মন্ত্রহীনমদক্ষিণম্। শ্রদ্ধাবিরহিতং যজ্ঞং তামসং পরিচক্ষতে।।১৩।।**

*বিধিহীনম্*, তামসিক যজ্ঞ করার সময় শাস্ত্রে যে রকমটি যেভাবে করতে বলা হয়েছে সেই বিধি অনুসারে কখনই করবে না। *অসৃষ্টান্নং*, যজ্ঞ করার সময় যজ্ঞকারী ব্রাহ্মণকে ঠিক মত অন্ন, বস্ত্র ও ফলমূল দিয়ে দক্ষিণা দিতে হয়, দক্ষিণা যদি ঠিক ঠিক না দেওয়া হয় তাহলে বলা হয় সেই যজ্ঞ অসম্পূর্ণ থেকে যায়। কারণ দক্ষিণা যজ্ঞের একটা অঙ্গ। *অসৃষ্টান্নং* মানে যজ্ঞে দক্ষিণা ঠিক ঠিক না দেওয়া। *মন্ত্রহীনম্*, তামসিক যজ্ঞে মন্ত্র বলে কিছু থাকে না, মন্ত্র উচ্চারণ হচ্ছে কিন্তু মন্ত্রের উচ্চারণে মন্ত্র, স্বর, বর্ণ এইগুলো সব রহিত হয়ে উচ্চারণ করে। *অদক্ষিণম্*, কোন দক্ষিণা না দেওয়া, মুদ্রাদির দ্বারা দক্ষিণাবিহীন। *শ্রদ্ধাবিরহিতং*, তামসিক যজ্ঞ কোন শ্রদ্ধা নিয়ে করে না, শ্রদ্ধাবিহীন। এইগুলো সব হচ্ছে তামসিক যজ্ঞ। এরপর তিন রকমের তপস্যার কথা বলা হচ্ছে।

**দেবদ্বিজগুরুপ্রাজ্ঞপূজনং শৌচমার্জবম্। ব্রহ্মচর্যমহিংসা চ শারীরং তপ উচ্যতে।।১৪।।**

তুমি যদি ঠিক ঠিক শরীরকে শুদ্ধ করতে চাও তাহলে কিছু শারীরিক তপস্যা করতে হবে। সেই তপস্যাগুলো কি কি? *দেবদ্বিজগুরুপ্রাজ্ঞপূজনং*, দেবতা, দ্বিজ মানে ব্রাহ্মণকে, গুরুজনকে আর প্রাজ্ঞ ব্যক্তিকে পূজো করবে। এখানে জ্ঞানী বা পণ্ডিত ব্রাহ্মণদের কথা বলা হচ্ছে না, যে কোন ব্রাহ্মণ সে পণ্ডিত হোন আর নাই হোন, ব্রাহ্মণ দেখলেই প্রণাম করবে। এটাই ভারতীয় ঐতিহ্য, ব্রাহ্মণ দেখলেই প্রণাম করতে হত। গুরুকে প্রণাম করবে, এখানে গুরু বলতে নিজের দীক্ষাগুরুকেই শুধু বোঝাচ্ছে না, যে কোন গুরুজনদের বোঝান হচ্ছে। আর প্রাজ্ঞ, যিনি বুদ্ধিমান ব্যক্তি তাঁকে সম্মান দেবে। মানুষের অহঙ্কারের ঢিপিটা অনেক উঁচু হয়ে আছে, যার জন্য কোন আধ্যাত্মিক জ্ঞান আমাদের মধ্যে ঢুকতে পারেনা। এই অহঙ্কারের ঢিপিটাকে সমান করবার জন্য শাস্ত্রে কয়েকটা জিনিষ করার কথা বলা হচ্ছে – ব্রাহ্মণের কাছে মাথা নত করবে, গুরুজনদের সামনে মাথা নত করবে, আর প্রাজ্ঞ, যিনি জিনিষটা জানেন তাঁর সামনে মাথা নত করবে। শঙ্করাচার্য খুব কম বয়সেই গুরু হয়ে গিয়েছিলেন, তাঁর শিষ্যদের অনেকেই তাঁর থেকে বয়সে বড় ছিলেন, কিন্তু তিনি ছিলেন প্রাজ্ঞ, সেইজন্য সবাই তাঁর কাছে গিয়ে মাথা নত করত। এ ছাড়া ব্রহ্মচর্য পালন করা, অহিংসা ভাবকে অনুশীলন করা এইগুলো হচ্ছে শারীরিক তপস্যা। ব্রহ্মচর্য ও অহিংসার সম্বন্ধে আমরা কিছু কিছু আলোচনা করেছি। আরও যত শাস্ত্র অধ্যয়ণ করা হবে তখন এই জিনিষগুলিকে নিয়ে আরও বিস্তৃত আলোচনা করা হবে। এমন তপস্যা, যে তপস্যাতে শরীরের প্রাধান্য থাকে, সেটাকে বলে *শারীরং তপ*, শারীরিক তপস্যা। *শৌচমার্জবম্*, শুচিতা বা শৌচ ও সরলতার অনুশীলন করাটাও শারীরিক তপস্যা। এরপর বাক্ আর মন, বিশেষ করে বাক বা বাণী সম্বন্ধিত তপস্যার কথা বলছেন –

**অনুদ্বেগকরং বাক্যং সত্যং প্রিয়হিতঞ্চ যৎ। স্বাধ্যায়াভ্যসনং চৈব বাঙ্ময়ং তপ উচ্যতে।।১৫।।**

বাল্মীকি রামায়ণে একটা জায়গায় বলা হচ্ছে – মানুষ যখন কোন কিছু কর্ম করে, তার আগে প্রথমে সে মনে মনে চিন্তা করে, তারপর সেটা বাণী দিয়ে প্রকাশ করে, তারপর সেটা শরীরের দ্বারা সম্পন্ন করে। আমাদের যে কোন কাজ শরীর দিয়ে প্রকাশ পায়, কিন্তু তারও আগে সেই কাজ বাণী দিয়ে শুরু হয়ে যায়, আর তারও আগে মনের ভেতরে চিন্তা রূপে ঘুরঘুর করে। কিন্তু তপস্যা যখন হয় তখন শরীরের তপস্যা হয়, তারপর বাক্ তপস্যা আর শেষে মনের তপস্যা। যখন দেখি অপরের প্রতি শ্রদ্ধা জন্মাচ্ছে, সাধু সন্ন্যাসীদের দেখলে প্রণাম করতে ইচ্ছে হচ্ছে, ঠাকুরের মন্দিরে নিয়মিত যাচ্ছি, তখন বুঝতে হবে যে আমার শারীরিক তপস্যা শুরু হয়েছে। অনেকে আছে যারা ঠাকুরের মন্দির যায়ও না প্রণামও করে না, বললে বলবে শ্রদ্ধাতো ভেতরে। কিন্তু শ্রদ্ধাতো বাইরে দেখবে লোকে, ভেতরে আবার শ্রদ্ধা হয় নাকি। যদি হয়ও বা, সেটাকে আবার বলতে হবে কেন যে আমার ভেতরে শ্রদ্ধা আছে। গীতাতে পরিষ্কার করে বলে দিচ্ছে দেবতা বা ঠাকুরকে প্রণাম করতে হবে – *দেবদ্বিজগুরুপ্রাজ্ঞপূজম্* দেবতা, ব্রাহ্মণ, গুরুজন ও প্রাজ্ঞদের সামনে মাথা নত করতে বলা হচ্ছে, এছাড়া বিভিন্ন জায়গাতে আরও অনেক কিছু বলা হয় যেটা শরীরের তপস্যা। কিন্তু সেই সাথে মনে রাখতে হবে – *কর্শয়ন্তঃ শরীরস্থং*, শরীরকে কষ্ট দিয়ে কোন তপস্যা করতে বলা হচ্ছে না, শরীরকে কষ্ট দেওয়া চলবে না। এখানে যে কটা তপস্যার কথা বলা হচ্ছে এতে কোথাও শরীরকে কষ্ট দেওয়া হচ্ছে না।

বাণীর তপস্যা কি রকম হবে? *অনুদ্বেগকরং বাক্যং*, উদ্বেগজনক কোন কথা বলবে না। এমন একটা কথা বলে দিলাম যার ফলে সামনের লোকটা মনে খুব দুঃখ পেল, এই ধরণের কথা বলতে নেই। আগেকার দিনে যাদের শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ বলা হত, তাঁরা কোন অবস্থাতেই কারুকে কটূ কথা বলতেন না। উদ্বেগকর কোন কথা বলতে হলে মিষ্টি করে বলে পাশ কাটিয়ে চলে যেতেন। *সত্যং*, বাণীর তপস্যাতে এনারা কখনই সত্য ছাড়া কোন কথা বলবেন না। *প্রিয়ম্*, কথাগুলো শুনতে খুব ভালো লাগবে। *হিতম্*, যে কথা বললে তার উপকার হবে, তার কোন কাজে আসবে একমাত্র সেই কথাই এনারা বলবেন। যে কোন কথা বলার মধ্যে এই সব কটাই থাকবে, উদ্বেগকর কথা হবে না, কথাট সত্য হবে, প্রিয় হবে আর হিতকর হবে। আচার্য শঙ্কর এখানে খুব সুন্দর উপমা দিচ্ছেন। ধরুন বাবা-মা তাদের বাচ্চা ছেলেকে বলছে – খোকা শান্ত হও, শান্ত হয়ে স্বাধ্যায় কর ও যোগ অভ্যাস কর, এগুলো করলে তোমার বিশেষ মঙ্গল হবে। এই বাক্য যখন গুরু বা মা-বাবা তাঁর শিষ্য বা সন্তানকে বলছেন, তখন এই কথাটা সত্য কথা, প্রিয় কথা, মিষ্টি ভাবে বলা হয়েছে, হিতকারি কথা আর এই কথার মধ্যে উদ্বেগকর কিছু নেই। বাণীর তপস্যা খুব কঠিন। বাণীর তপস্যাতে আর কি

করতে হয়? *স্বাধ্যায়াভ্যসনং*, রোজ নিয়ম করে দুই ঘন্টা কি তিন ঘন্টা স্বাধ্যায় করবে, মানে শাস্ত্র চর্চা করবে। এইগুলো হচ্ছে ঠিক ঠিক বাণীর তপস্যা।

যখন আমি কথা বলছি, তখন যদি হিতকারি কথা না হয় তাহলে সেই কথা বলা উচিত হবে না। মহাভারতে আছে, দুজন কথা বলছেন তখন পরস্পর সেই কথাই বলবে যাতে দুজনেরই ভালো হয়। তা না হলে মনের মধ্যে একটা সন্দেহ জাগে। কিন্তু গুরু যখন শিষ্যকে কিছু বলেন তখন ওর মধ্যে গুরুর কিছু থাকে না। কথা বলার সময় অনর্থক কথা বলতে নেই, যেটা কোন কাজে আসবে না, সেই ধরণের কথা বলা ঠিক না। যে কথাতে কারুর কোন কাজে আসবে না, কারুর কোন মঙ্গল হবে না সেই ধরণের কথা একেবারে বলা চলবে না। মমতা ব্যানার্জি কি করল, বুদ্ধদেববাবু কি করল এই নিয়ে আলোচনা করে কার কি হিত সাধন হচ্ছে, কিছুই হচ্ছে না, তবুও লোকেরা এই আলোচনা নিয়েই মেতে আছে। শাস্ত্র এই ধরণের আলোচনা করতে নিষেধ করছে। অনেক সময় তথ্য আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে কিছু অন্য ধরণের কথা বলা যেতে পারে। আর বলছেন সত্য ছাড়া মিথ্যা কথা বলতে নেই, কারণ আমি যদি কোন মিথ্যা কথা বলি, আজ হোক কাল হোক সেই মিথ্যাটা বেরিয়ে আসবে। সেটা প্রকাশ হয়ে গেলেই আমার জীবনে দুর্দশা নেমে আসবে, শুধু আমার জীবনেই নয় তারও জীবনে। আর কারুকে উদ্বেগকর কথা কখন বলতে নেই। আমার মনের মধ্যে শব্দের যে ভাণ্ডার রয়েছে, সেই ভাণ্ডারকে যখন সাজান হচ্ছে, কোন্ শব্দকে বাদ দেওয়া হবে, কোন্ শব্দকে প্রকাশ করা হবে এটাই হচ্ছে বাণীর তপস্যা। কথা বলার সময় আমাদের মাথাতে রাখতে হবে যে, এই জিহ্বা হচ্ছে মা সরস্বতির স্থান, সেইজন্য আজেবাজে বাক্য, নোংরা অপশব্দ দ্বারা সরস্বতিকে অপমান করতে নেই। যখন আমরা অপশব্দ ব্যবহার করি, অপ্রিয় কথা, উদ্বেগকর কথা, অহেতুক বাক্য প্রয়োগ করি তখন এতে মা সরস্বতির অপমান হয়। ঠিক ঠিক বাণীর তপস্যা যদি করতে হয় তাহলে এই শ্লোকে যা যা বলা হল তার সবটাই একসাথে মেনে চলতে হবে। যদি সত্যি কথা বলছি কিন্তু সেটা উদ্বেগকর, সত্যি কথা বলছি কিন্তু হিতকর নয় তাহলে এটাকে বাণীর তপস্যা বলা যাবে না। এখানে শুধুই সত্য কথা বলা হল, এতে সাধনা আর হল না, সাধন করতে হলে এর সব কটিকেই অনুসরণ করে চলতে হবে, কোনটাকেই বাদ দেওয়া চলবে না। আর মনের যে তপস্যা সেটা সম্বন্ধে বলছেন –

**মনঃপ্রসাদঃ সৌম্যত্বং মৌনমাত্মবিনিগ্রহঃ। ভাবসংশুদ্ধিরিত্যেতৎ তপো মানসমুচ্যতে।।১৬।।**

মনের সাধনা করার ব্যাপারে প্রথমে বলছেন *মনঃপ্রসাদঃ*, মনটাকে সব সময় প্রশান্ত রাখতে হবে, যখনই মন চঞ্চল হতে চাইছে তখনই মনকে যে কোন ভাবে টেনে সেখান থেকে ফিরিয়ে আনতে হবে। কিভাবে টেনে নিয়ে আসা হবে সেই ব্যপারে কিছুটা যোগশাস্ত্রে বর্ণনা করা হয়েছে – যেমন মৈত্রী, করুণা, মুদিত ও উপেক্ষার দ্বারা। যে করেই হোক মনকে অশান্ত চঞ্চল হতে দিতে নেই। সেইজন্য কাজকর্মে নিজেকে ব্যস্ত রাখলে চাঞ্চল্য কম হয়। চাঞ্চল্যতাকে প্রতিহত করতে হলে মনকে কামরাগ বিবর্জিতম্ করতে হবে, মনে কোন কামনা-বাসনা থাকবে না। পূজো উপাসনা, জপ-ধ্যান, মন্দিরে বিগ্রহ দর্শন করা এগুলো মনকে শান্ত হতে সাহায্য করে। খবরের কাগজ পড়া, টিভি দেখা, পাড়ার লোকেদের সঙ্গে আড্ডা মারা, এগুলোতে মন কখনই শান্ত হয় না। একা একা থাকলেও মন শান্ত হবে না। মানুষের স্বভাবই এমন যে সে একা কখন থাকতে পারেনা, তার একজন সঙ্গী দরকার। আমরা মুখে যতই ঈশ্বরের কথা বলি না কেন, ভগবানকে সঙ্গী করতে পারিনা, সেইজন্য খুব করে শাস্ত্র অধ্যয়ণ করতে হয়। শাস্ত্র পড়া, চিন্তন করা, মাঝে মাঝে নিজের চিন্তা ভাবনাকে নিয়ে কিছু লেখালেখি করা, এগুলো যদি দিনে এক ঘন্টা করে করা হয় তাহলে মন অনেক শান্ত হয়ে যাবে। এরপর আসছে *সৌম্যত্বং*, আমার মন প্রসন্ন, কিন্তু মন শুধু প্রসন্ন হলেই হবে না, মুখের উপর তার ছাপ আসতে হবে, মুখের মধ্যে একটা মৃদু হাসির প্রলেপ থাকবে। মুখ দেখলেই বোঝা যায় কার মন শান্ত আর কার মন চঞ্চল। মন শান্ত থাকলে মুখের মধ্যে একটা সৌম্য ভাব এসে যাবে। তারপর *মৌনম্*, কথাবার্তা কম বলবে, মুখে কথা বন্ধ করার কথা বলছেন না, মনে মনে কথা বলটা বন্ধ করতে হবে। মহাপুরুষ মহারাজকে এক সাধু বলছেন, আমি হিমালয়ে গিয়ে এক বছর মৌন অবলম্বন করে তপস্যা করব। মহাপুরুষ মহারাজ সাধুকে বলছেন – ভেতরটাও। এখানে মৌন মানে হচ্ছে ভেতরটা, মনে মনে বকবক করাটা আটকাতে হবে। প্রচুর জপ-ধ্যান করলে, ঠাকুরের নাম করলে এটাকে আটকানো যায়। *ভাবসংশুদ্ধিঃ*, অপরের সাথে যখন ব্যবহার করছি তখন ভেতরের ভাবটা পরিষ্কার রাখতে হবে। মানুষের মনে প্রচণ্ড ছল কপটতা থাকে, মুখে এক রকম ব্যবহারে অন্য রকম, এটাই হচ্ছে ভাব অশুদ্ধি। কারুকে পছন্দ অপছন্দের ব্যাপার থাকতেই পারে কিন্তু তাই বলে লৌকিকতার ক্ষেত্রে একটা সম্মানের ভাব নিয়ে চলা দরকার। এমনও দেখা যায় কোন ছাত্রের অভিবাবক তার সন্তানের সাথে দেখা করতে গেছে, সেখানে কোন এক মহারাজ ছিলেন, অভিবাবক ছেলেকে জিজ্ঞেস করছে – হ্যাঁরে, এই মহারাজ তোর কোন কাজে আসবে? ছেলে বলেছে হ্যাঁ। ব্যাস্, তারপরে সেই অভিবাবক মহারাজকে বলতে শুরু করলেন – মহারাজ, আমার ছেলে বাড়িতে শুধু আপনারই কথা বলে, আপনার মত সাধু হয় না। এগুলো হচ্ছে প্রচণ্ড ছল কপটতা। বেশির ভাগ লোকের ধারণা যে, সংসারে থাকতে গেলে এগুলো একটু আধটু করা দরকার। দরকার যদি মনে করে থাক তা করো, কেউ বারণ করছে না, কিন্তু তুমি কোন দিন আধ্যাত্মিক হতে পারবেন না। একটা জিনিষ জেনে রাখা দরকার, আমার ভাব যদি শুদ্ধ থাকে তাহলে কেউ আমাকে কোন কিছুই করতে পারবে না, আমারও এই ধরণের ছল কপটতার আশ্রয় নেওয়ার কোন প্রয়োজনই হবে না। আসলে আমরা হলাম অত্যন্ত দুর্বল প্রকৃতির, নিজের দুর্বলতার জন্য ছল চাতুরির আশ্রয় নিই। আর সবটাই যখন বিফলে চলে যায় তখন মনে হয় কেন মিছিমিছি এই ধরণের ছল চাতুরির আশ্রয় নিতে গেলাম!

তিন ধরণের তপস্যার কথা বলা হল। এই তপস্যাগুলো আবার সাত্ত্বিক, রাজসিক আর তামসিক এই তিন রকমের হয়ে থাকে। সাত্ত্বিক তপস্যা কি রকম?

**শ্রদ্ধয়া পরয়া তপ্তং তপস্তৎ ত্রিবিধং নরৈঃ। অফলাকাঙ্ক্ষিভির্যুক্তৈঃ সাত্ত্বিকং পরিচক্ষতে।।১৭।।**

কায়িক, বাচিক ও মানসিক এই তিন ধরণের তপস্যায় যখন কোন ফলাকাঙ্ক্ষা রহিত হয়ে করা হয় তখন সেটাই সাত্ত্বিক তপস্যা বলে পরিগণিত হবে। আমি ভালো কথা কেন বলি? এটাই আমার স্বভাব। আমি কায়িক তপস্যা কেন করছি? আমার ভালো লাগে, এটাই আমার স্বভাব। আর রাজসিক তপস্যা কি রকম?

**সৎকারমানপূজার্থং তপো দম্ভেন চৈব যৎ। ক্রিয়তে তদিহ প্রোক্তং রাজসং চলমধ্রুবম্।।১৮।।**

*সৎকারমানপূজার্থং* লোকেরা আমাকে মানুক, জানুক, আমাকে সম্মান করুক এই অহঙ্কার ও দম্ভের ভাব নিয়ে যখন এই তপস্যাগুলো করছে, তখন এটাই *রাজসম্*, রাজসিক তপস্যা, *অধ্রুবম্* এই তপস্যা কোন ফল দেয় না। লোকে আমাকে মানল, জানল, আমার এইখানেই সব কিছু শেষ হয়ে গেল। একাদশী করবে সবাইকে জানিয়ে করবে, একাদশী করাটা উদ্দেশ্য নয়, লোককে জানানটাই উদ্দেশ্য। তামসিক তপস্যা হচ্ছে –

**মূঢ়গ্রাহেণাত্মনো যৎ পীড়য়া ক্রিয়তে তপঃ। পরস্যোৎসাদনার্থং বা তৎ তামসমুদাহৃতম্।।১৯।।**

নিজের শরীরকে কষ্ট দিয়ে যখন যে তপস্যা করা হচ্ছে আর অপরের ক্ষতি সাধনার্থে মুর্খ ভাবে তপস্যা করা হচ্ছে, তখন এই তপস্যাকে বলা হচ্ছে তামসিক তপস্যা। ছাগ বলি দেওয়াটাও এই অর্থে তামসিক বলা যেতে পারে, যেহেতু অপরের প্রাণ হরণ করা হচ্ছে। যারা বলি দিচ্ছে তারা বলতে পারে, পশু গায়ত্রী দিয়ে এই পশুর মুক্তি হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু ছাগল কি মুক্তি চাইছে? ছাগলের মা, ছাগলের ভাইয়েরা কেউ পছন্দ করছে না। শুধু আমার মাংস খাওয়ার ইচ্ছে হয়েছে তাই বলি দিচ্ছি। তবে তন্ত্রে বিধান দিচ্ছে যে, তুমি পশুর মাংস খেতে চাইছ, ঠিক আছে তাই খাও, কিন্তু এটাকে মায়ের প্রসাদ করে গ্রহণ করলে তোমার মনের এই হিংসা বৃত্তি ও অন্যান্য খারাপ বৃত্তিগুলো দমে যাবে। সেইজন্যই এই বিধান গুলোকে দেওয়া হয়েছে, তা না হলে ক্রমশ তুমি অসুর হয়ে উঠবে। মায়ের কাছে বলি দিচ্ছে বলেই এই পাশবিক বৃত্তিগুলো কমছে। কিন্তু ঠাকুর লেবুটাও কাটতে পারতেন না, ঠাকুর দেখছেন লেবুটাও তো তাঁরই সৃষ্টি, সেই দিক দিয়ে দেখতে গেলে লেবু কাটাও যা ছাগ বলি দেওয়াও তাই। লেবু খেতেতো হবে, কোন উপায় নেই, তাই ঠাকুর হাতে ছুড়ি নিয়ে 'জয় মা কালী' বলে লেবু কাটতেন। দক্ষিণেশ্বরে বিশেষ দিনে মায়ের কাছে ছাগ বলি দেওয়া হয়েছে, তার মাংস রান্না করে মায়ের ভোগে দেওয়া হয়েছে, ঠাকুরের তো মাংস খাওয়ার প্রশ্নই উঠতে পারেনা। ঠাকুর বলছেন – মা পাছে রাগ করেন তাই কপালে মায়ের প্রসাদী ঝোলের একটা ফোঁটা ঠেকাই। অপরকে কষ্ট দিয়ে ও নিজের শরীরকে কষ্ট দিয়ে যে তপস্যাই করা হোক না কেন সেই তপস্যাতে কিছুই হয় না, এগুলো পুরো তামসিক তপস্যা। এরপর বলছেন তিন রকম দানের কথা –

**দাতব্যমিতি যদ্দানং দীয়তেহনুপকারিণে। দেশে কালে চ পাত্রে চ তদ্দানং সাত্ত্বিকং স্মৃতম্।।২০।।**

দান করা আমার কর্তব্য সেইজন্য দান করছি, দানের পেছনে এই একমাত্র ভাব। কোন প্রত্যাশা না করে, যাকে দান করছি সেও প্রত্যুত্তরে আমাকে কিছু দেবে এই আশা না করে যে দান করা হয় সেটাই সাত্ত্বিক দান। *দেশে কালে চ পাত্রে চ* – দান করার ক্ষেত্রে কোথায় দান করছি, কাকে দান করছি এগুলোও খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যেমন পূণ্য দিনে, সংক্রান্তিতে পূণ্যভূমিতে দান করতে হয়। যাকে তাকে, যেখানে সেখানে দান করতে নেই। যারা ব্রাহ্মণ, বেদজ্ঞ, সৎপাত্র তাদেরকেই দান করতে হয়, যাকে তাকে দান দিতে নেই। রাণী রাসমনি দক্ষিণেশ্বরে দেবালয় তৈরী করেছেন, এখানকার ব্রাহ্মণরা পূজার সব ভোগের অন্ন আজেবাজে লোকগুলোকে খাইয়ে দিত। সেইজন্য ঠাকুর নিজে লক্ষ্য রাখতেন তাঁর ভাগের প্রসাদটা যেন ঠিক ঠিক আসে। একজন কষ্ট করে সৎ উদ্দেশ্য নিয়ে একটা জিনিষ করেছেন, সেটার যেন ঠিকঠাক রক্ষণা-বেক্ষণ হয়। দুঃখের বিষয় আমরা অনেকেই যারা ঠাকুরের ভক্ত তারা ঠাকুরের আধ্যাত্মিকতার এই বাস্তব ব্যবহারিক দিকটাকে দেখতে পায়না। রানী রাসমনি কত অর্থ ব্যয় করে মন্দির করেছেন, এখানকার সব কিছু যেন ঠিক ভাবে খরচ হয় সেই দিকে ঠাকুরের কি তীক্ষ্ণ নজর ছিল।

**যৎ তু প্রত্যুপকারার্থং ফলমুদ্দিশ্য বা পুনঃ। দীয়তে চ পরিক্লিষ্টং তদ্দানং রাজসং স্মৃতম্।।২১।।**

রাজসিক দান কোন গুলো? বলছেন, প্রত্যুপকারের আশা নিয়ে যখন কাউকে কিছু দান করা হয়, আমি একে দিয়েছি সেও আমায় কিছু দেবে। যদিও বা প্রত্যুপকারের আশা না থাকে তাহলে এটা আশা করে যে, আমি যে এই দান করলাম এর ফল স্বরূপ মৃত্যুর পর স্বর্গে আমার একটা জায়গা হবে। যদি কেউ বলে আপনি কেন দান করছেন, তখন সে বলবে আমি পূণ্য অর্জন করছি। আচার্য শঙ্করও মকর-সংক্রান্তির দিনে দানের কথা বলছেন। মকর-সংক্রান্তির দিনে দুনিয়ার কাঙালীরা এসে সকাল থেকে বেলুড় মঠে হাজির হয়ে যায়। প্রচুর লোক ঐ দিন বেলুড় মঠে স্নান করতে আসে আর সব কাঙালীকে চাল, আটা, পয়সা দান করে। কেন দান

করছে? বেলুড় মঠ পূণ্যভূমি, মকর-সংক্রান্তি একটা বিশেষ পবিত্র দিন, এই দিনে এই পূণ্যভূমিতে দান করলে আমার বিরাট পূণ্য হবে। কিন্তু এই দানই যদি এই ভেবে করা হয়, আজকের দিনে এই পূণ্যভূমিতে দান করা আমার এটা ধর্ম, তাহলে বুঝতে হবে আমি শ্রেষ্ঠতম দান করছি। কাঙালীদের দান করলে এক রকম দান আর সাধু সন্ন্যাসীদের দান অন্য রকম হবে। তামসিক দান কি রকম?

**অদেশকালে যদ্দানমপাত্রেভ্যশ্চ দীয়তে। অসৎকৃতমবজ্ঞাতং তৎ তামসমুদাহৃতম্।।২২।।**

তামসিক দান কি রকম? *অদেশকালে*, যেখানে সেখানে দান করতে থাকবে, *অপাত্রে*, যাকে তাকে দান করবে। ঠাকুর বলছেন – একটা কষাই গরু নিয়ে যাচ্ছিল, একটা শ্রাদ্ধ বাড়ি দেখে সেখানে ঢুকে পড়েছে। শ্রাদ্ধ বাড়ি খেয়ে গরুটাকে টানতে টানতে নিয়ে গিয়ে বলি দিল। এখন এই গোহত্যার পাপ শ্রাদ্ধ বাড়ির কর্তারও লাগল। এটাই হচ্ছে অপাত্রে দান, আগে বিচার করে দেখতে হবে একে দান দেওয়া যাবে কিনা। দানের ক্ষেত্রে চাওয়ার ব্যাপার আসছে না, কেউ কিছু চাইছে বলে তাকে কিছু দিয়ে দিলে সেটা দান হবে না। দান হল, নিজের ইচ্ছেতে সামর্থমত কাউকে কিছু দেওয়া। দান করার আগে বিচার করে দেখতে হয়। কি বিচার? দেশে, ঠিক জায়গায় বিশেষ দিনে আর পাত্রতা দেখে দান করতে হয়। যাকে তাকে যে কোন সময় দান করাকে দান বলে না। *অসৎকৃতমবজ্ঞাতং*, - অপ্রিয় বচনাদির দ্বারা সৎকারশূন্য হয়ে আর অবজ্ঞার ভাব নিয়ে দানকে তামসিক দান বলা হচ্ছে। আচার্য শঙ্কর বলছেন – *প্রিয়বচনং পাদপ্রক্ষালন্ পূজাদি*। কারুকে যখন দান করা হয় তখন এই তিনটে শর্তকে পূরণ করতে হবে। প্রিয় বচন, মিষ্টি করে আহ্বাণ করতে হয়, যাকে দান করা হবে তার পা জল দিয়ে ধুয়ে দিতে হবে, তারপর তাকে পূজা করতে হবে, এগুলো করার পর তাকে দান দিতে হয়। দানটাও একটা যজ্ঞ। এই দানে পুরো আচার আছে, এই আচারের মধ্যে এই তিনটে জিনিষ আছে, মিষ্টি কথা, পদসেবা আর পূজা। এ ছাড়া তাকে বসার জন্য ভালো একটা আসন দিতে হয়, সবাই মিলে হাতজোড় করে সম্মান দেখানো, এই জিনিষগুলো ঠিক ঠিক পালন করলে তবেই সেটা দান হয়। কাঙালীদের যেটা দেওয়া হয় সেটাকে দান বলে না, এটাকে ভিক্ষা দেওয়া বলা হয়।

যজ্ঞ, তপস্যা ও দান সবই আমরা ঠিক ঠিক ভাবে করছি, কিন্তু তা সত্ত্বেও মনের মধ্যে একটা খুঁতখুঁতানি থাকে। যেটা করছি সেটা ভালো হচ্ছে না, বা যেটা করছি সেটা আরও ভালো করতে চাইছি, তখন আমাদের কি করতে হবে? ভগবান বলছেন –

**ওঁ তৎসদিতি নির্দেশো ব্রহ্মণস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ। ব্রাহ্মণাস্তেন বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ বিহিতাঃ পুরা।।২৩।।**

ব্রহ্ম যিনি, যিনি সর্বব্যাপী, তাঁর তিনটি নাম – ওঁ, তৎ ও সৎ। ওঁ হচ্ছে ব্রহ্মের বাচক, ওঁ এর ব্যাপারে এর আগেও অনেক ব্যাখ্যা করা হয়েছে। তৎ শব্দে ব্রহ্মকে যেন আঙ্গুল দিয়ে নির্দেশ করা হচ্ছে। এগুলো বেদান্তের খুব গভীর তত্ত্ব। সৎ, সৎ মানে অস্তিত্ব, আমি আছি। তিনিই আছেন, তিনি ছাড়া আর কিছুই নেই। সৎ যিনি তিনিই চিৎ, যিনি চিৎ তিনিই আনন্দ, তিনিই সচ্চিদানন্দ। ওঁ তৎ সৎ, এটা হচ্ছে সেই যে ব্রহ্ম, তাঁর নির্দেশ, ওঁ তৎ সৎ হচ্ছে ভগবানরই নাম। *ব্রাহ্মণাস্তেন বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ*, ব্রাহ্মণ, বেদ ও যজ্ঞ, এই তিনটে জিনিষের উৎপত্তি সেই ব্রহ্ম থেকেই। এখন এই তিনটে জিনিষ, ব্রাহ্মণ, বেদ আর যজ্ঞের স্তুতি করার জন্য আমাদের মুনি ঋষিরা এই তিনটে জিনিষ 'ওঁ তৎ সৎ' আবিষ্কার করলেন। এরমধ্যে ওঁ সম্বন্ধে বলছেন –

**তস্মাদোমিত্যুদাহৃত্য যজ্ঞদানতপঃক্রিয়াঃ। প্রবর্তন্তে বিধানোক্তাঃ সততং ব্রহ্মবাদিনাম্।।২৪।।**

যজ্ঞ, দান, তপস্যা, মানে যত রকমের ক্রিয়া আছে, এটাকে পবিত্র করতে হলে শুধু ওঁ বললেই সব কিছু পবিত্র হয়ে যায়। *প্রবর্তন্তে বিদানোক্তাঃ সততং ব্রহ্মবাদিনাম্* - এখানে ভগবান বলছেন, এটা আমার কথা নয়, যাঁরা ব্রহ্মবাদি, জ্ঞানী পুরুষ, তাঁরা এই কথা বলে গেছেন। এনাদের কথা অনুসারে বেদের যে প্রবচন হয়, যারা বেদ পাঠ করছেন, যারা শুনছেন, এরা সব সময় সে যজ্ঞই হোক, দানই হোক প্রথমে ওঁ উচ্চারণের পরই সব কিছু শুরু করা হয় আবার ওঁ বলেই সমাপ্ত করা হয়। অনেক জায়গায় আজ্ঞা পাওয়ার জন্য ওঁ কে ব্যবহার করা হয় – আমি কি আসতে পারি? যে অনুমতি দিচ্ছে সে বলবে ওঁ। যখন কিছু শুরু করা হল তখন ওঁ উচ্চারণ করেই শুরু করা হয়। ঠিক সেই রকম *তৎ*, যখন কেউ কোন ধরণের ফলাকাঙ্ক্ষা না করে যজ্ঞাদি, তপস্যা ও দানাদির মাধ্যমে শুধু কর্মযোগ করে যাচ্ছে যাতে মুক্তির দিকে এগোতে পারে তখন তারা কি করেন -

**তদিত্যনভিসন্ধায় ফলং যজ্ঞতপঃক্রিয়াঃ। দানক্রিয়াশ্চ বিবিধাঃ ক্রিয়ন্তে মোক্ষকাঙ্ক্ষিভিঃ।।২৫।।**

প্রথমে বললেন যখন বেদ অধ্যয়ণ করা হয় তখন ওঁ দিয়ে শুরু করা হয়, কিন্তু এখন বলছেন *তৎ*। অর্থাৎ যখন ঠিক ঠিক কাজ করা হয় তখন বলবে *তৎ*। তখনকার দিনে প্রচলন ছিল, কিছু কিছু কাজে বলা হত ওঁ, আর কিছু কিছু কাজে *তৎ* শব্দ ব্যবহার করা হত, আবার কিছু কিছু কাজে *সৎ* বলা হত। যখনই কোন কাজের ব্যাপারে সন্দেহ আসবে, যেমন আমার জন্য এক গ্লাশ জল আনা হল, এখন আমি জানিনা এই জল কতটা শুদ্ধ আর কতটা অশুদ্ধ, এই অবস্থায় মনটা খুঁতখুঁত করতে থাকবে। কিন্তু আমি যেই গ্লাশটা হাতে নিয়ে বলে দিলাম '*ওঁ তৎসৎ*', তাহলেই সব কিছু শুদ্ধ হয়ে গেল। ভীড় বাসে বা ট্রেনে দাঁড়িয়ে যাচ্ছি, যেতে যেতে

আমার সামনের সীটের লোকটা নেমে গেল। এখন ঐ খালি সীটে আমি বসতে যাচ্ছি, এই সীটে এতক্ষণ যে লোকটা বসেছিল লোকটি কেমন প্রকৃতির জানিনা, মনটা খুঁতখুঁত করতে শুরু করে দিয়েছে। কিন্তু বসার আগে একবার *ওঁ তৎসৎ* বলে দিলেই সব শুদ্ধ হয়ে গেল। যাতেই একবার *ওঁ তৎসৎ* বলে দেওয়া হবে সেটাই একেবারে ব্রহ্ম বাচক হয়ে গেল, এবারে এর যত রকমের অশুদ্ধি ছিল সব চলে গেল। এরপর বলছেন *সৎ* শব্দকে নিয়ে –

**সদ্ভাবে সাধুভাবে চ সদিত্যেতৎ প্রযুজ্যতে। প্রশস্তে কর্মণি তথা সচ্ছব্দঃ পার্থ যুজ্যতে।।২৬।।**

যে কোন অবিদ্যমান বস্তু, যে জিনিষটা নেই, তার মধ্যে যখন *সৎ* ভাব আনতে হয়, যেমন একজন লোক অসাধু, খুব মিথ্যা কথা বলে, তার মানে তার মধ্যে *সৎ* ভাবের অভাব, এখন এই সৎ ভাব তার মধ্যে জাগাতে চাইছি তখন বলতে হয় *সৎ*। এই *সৎ* শব্দটা বলে দিলে তার মধ্যে *সৎ* ভাবটা আরোপ হয়ে যায়, সেখান থেকে সে আস্তে আস্তে উঠে আসে আর সে সদাচারবৃত্ত হয়ে যায়। আমার খুব পরিচিত কিন্তু আমি জানি সে মহা গোলমেলে, আর আমি চাইছি তার মঙ্গল হোক। এখন সে যখনই আমার সামনে আসবে, আমি জানি সে যা বলবে সব মিথ্যে বলবে, বাজে কথা বলবে। কিন্তু আমি যদি বলি সৎ, তখন ওর ভেতরে ভালো যা কিছু আছে সেটা উপরের দিকে চলে আসবে। এরপর থেকে সে আস্তে আস্তে সদাচার যুক্ত হয়ে যায়। এত আলাদা আলাদা না বলে যদি শুধু সংক্ষেপে *ওঁ তৎসৎ* বলে দিলেই সব কিছু শুদ্ধ হয়ে যায়। যখন বিবাহাদি মাঙ্গলিক কার্য হয়, আমি জানিনা মেয়েটি কেমন, বরটি কেমন সেইজন্য অনেকে খালি *ওঁ তৎসৎ* বলতেই থাকে। এরপর যদি ওর মধ্যে ভালো জিনিষ নাও থাকে তবুও সেটা তার ভেতরে এসে যাবে। আমার খুঁতখুঁতানিটা অন্তত চলে যাবে, তার কি হল না হল সেটা বড় কিছু না। এই ব্যাপারটাকেই ঠাকুর কৃষ্ণকিশোরের একটি ঘটনার সাহায্যে খুব সুন্দর বর্ণনা দিচ্ছেন। কৃষ্ণকিশোর বৃন্দাবনে গেছেন। একদিন কৃষ্ণকিশোরের খুব জলতেষ্টা পেয়েছে। একজন লোক ইজারা থেকে জল তুলছিল, তার কাছে জল চাইতে লোকটি বলল – আমি তো নীচ জাতি। কৃষ্ণকিশোর বললেন – তুই বল শিব শিব। লোকটি শিব শিব বলার পর তিনি ঐ নীচ জাতির হাতে জলপান করলেন। ঠাকুর বলছেন, কৃষ্ণকিশোর অত আচারি ব্রাহ্মণ সেও কিন্তু শিব শিব বলার পর ঐ নীচু জাতির হাত থেকে জল পান করলেন। শিব শিব বলা যা আর ওঁ তৎসৎ বলা একই ব্যাপার। আমরা বলি জয় ঠাকুর, জয় ঠাকুর একবার বলে দিলে সব কিছু শুদ্ধ হয়ে গেল। আমি যেখানে বসে ভগবানের চিন্তন করে নিলাম সেই জায়গাটা শুদ্ধ হয়ে গেল। গীতাতে যেটাতে ওঁ তৎসৎ বলছেন, পরের দিকে ভক্তি শাস্ত্রে শব্দটা পাল্টে সেটাই হরি হরি, শিব শিব বা নারায়ণ নারায়ণ, জয় ঠাকুর এসে গেছে। মূল কথা হচ্ছে, আমি যা কিছু করছি, সেই কাজের মধ্যে যদি আমার কোন সন্দেহ থাকে, খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে, কোন লোকের সাথে কথা বলাতে, কোন বস্তুর প্রতি, তখন ওটাকে শুদ্ধি করে নিতে হয়, শুদ্ধির দ্বারা ওকে সত্ত্বগুণে পরিবর্তন করতে হয়। কিভাবে সত্ত্বগুণে পরিবর্তন করব? এইভাবে, ওঁ তৎসৎ কিংবা জয় ঠাকুর, বা শিব শিব বলে।

**যজ্ঞে তপসি দানে চ স্থিতিঃ সদিতি চোচ্যতে। কর্ম চৈব তদর্থীয়ং সদিত্যেবাভিধীয়তে।।২৭।।**

এইভাবে যত কর্ম – যজ্ঞ, তপ, দান করা হলে যদি এর মধ্যে কোন অশুদ্ধি থেকে থাকে, কোন গোলমালও যদি এতে থাকে, তাহলে কিন্তু এটা শুদ্ধ হয়ে যায়। যেমন আমরা এখানে গীতার ক্লাশ করছি, ঠিক করা হল ক্লাশের পর আমরা এখানে সবাই একসাতে হরি ওঁ তৎসৎ করব, তাহলে এই ক্লাশে যদি কিছু গোলমাল থাকে, কোন দোষত্রুটি যদি হয়ে থাকে, ঠিক ঠিক ঈশ্বরের কাজ যদি না হয়ে থাকে, এগুলো সব ঠিক হয়ে যাবে। এবারে এটা সাত্ত্বিক যজ্ঞ হয়ে গেল। আমাদের এটা শিখিয়ে দেওয়া হচ্ছে যে, আমরা তো সব কিছু জানবো না কোথায় কি গোলমাল হয়ে আছে, কোনটা ঠিক আর কোনটা ঠিক নয় বুঝতেও পারব না, সেইজন্য সহজ একটা উপায় ঠিক করে দেওয়া হল, যখন তুমি কোন কিছুই জানবে না তখন তুমি বলবে ওঁ তৎসৎ। কিন্তু এর বিপরীত –

**অশ্রদ্ধয়া হুতং দত্তং তপস্তপ্তং কৃতঞ্চ যৎ। অসদিত্যুচ্যতে পার্থ ন চ তৎ প্রেত্য ন ইহ।।২৮।।**

*ওঁ তৎসৎ* এতে সৎ শব্দটা আসছে। কিন্তু এর বিপরীত যদি আমার শ্রদ্ধা না থাকে, অশ্রদ্ধা সহকারে যদি *হুতম্* মানে হবন করা হয়, *দত্তং* – যদি কোন দান করা হয়, *তপঃ* – তপস্যা করা হয় বা কোন কিছু কাজ, এই যা কিছু করব এগুলো সবই *অসদিত্যুচ্যতে,* সবটাই অসৎ, সমস্ত কর্মই বিফল হয়ে যায়। শ্রদ্ধার সঙ্গে যদি কোন কাজ না করা হয় তাহলে নিশ্চিত যে ঐ কাজের কোন ফলই আমি পাব না। শুধু যে এখানেই ফল পাবে না তা নয়, *ন চ তৎ প্রেত্য ন ইহ,* ইহকালেও কিছু পাবে না, পরকালেও কিছু পাবে না। শ্রদ্ধা থাকলেই তো আমি *ওঁ তৎসৎ* বলব। শ্রদ্ধা আছে, কিন্তু আমি শাস্ত্রবিধি জানিনা, তখন *ওঁ তৎসৎ* বলে দিলে ঐ কাজের সব কিছু শুদ্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু শ্রদ্ধা নেই অথচ ওঁ তৎসৎ বলে যাচ্ছি, এতে কিছুই হবে না, দেওয়াল ঠেলার মত হবে।

**ওঁ তৎসদিতি শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতাসুপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়ং যোগশাস্ত্রে**
**শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে শ্রদ্ধাত্রয়বিভাগযোগো নাম সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ।।**

********

### অষ্টাদশ অধ্যায়

## মোক্ষযোগ

২১শে নভেম্বর, ২০১০

আজ খুব পবিত্র দিন, কারণ আজকের দিনেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে গোপীদের সাথে রাসলীলা করেছিলেন, এই দিনটিকে বলা হয় রাসপূর্ণিমা। স্বামীজী বলছেন – আমরা বৃন্দাবনের শ্রীকৃষ্ণকে চাইনা, আমাদের কুরুক্ষেত্রের শ্রীকৃষ্ণকে চাই। আমরাও কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে যে গীতার উপদেশ দিয়েছিলেন সেই গীতার শেষ অধ্যায়কে রাসপূর্ণিমার দিনে শুরু করতে যাচ্ছি।

গীতার শেষ অধ্যায়ের নাম মোক্ষযোগ, এই অধ্যায়ের তিনটে বিশেষত্ব আছে। প্রথম বিশেষত্ব হচ্ছে, গীতার যা বক্তব্য এর আগের আগের অধ্যায়গুলোতে বলা হয়েছে তার সারাংশ এই অষ্টাদশ অধ্যায়ে দেওয়া হয়েছে। সাধারণ সারাংশ রচনাতে যেমন একটা সংক্ষেপে কিছু বলে দেওয়া হয়, এখানে সেটা করা হচ্ছে না, এখানে একই ভাবগুলোকে অন্য ভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে গীতার যে মূল ভাব সেগুলিকে উপস্থাপনা করা হয়েছিল। তৃতীয় অধ্যায় থেকে শুরু করে সপ্তদশ অধ্যায় পর্যন্ত সেই ভাবগুলোকে বিস্তার করা হয়েছে। এই পনেরটি অধ্যায়ে যে জালটাকে ছড়ান হয়েছিল, অষ্টাদশ অধ্যায়ে সেই জালটাকে গুটিয়ে নিয়ে আসা হয়েছে। এর আগেও আমরা বলেছি যে পুরো বেদের যা কিছু বক্তব্য সেটাকে বীজাকারে গীতাতে দেওয়া আছে। তৃতীয় বিশেষত্ব হচ্ছে, গীতার সাতশটি শ্লোক যে বুঝে নিয়েছে, তন্ত্রটাকে বাদ দিয়ে বৈদিক ধর্ম বলতে হিন্দুধর্মে যা আছে তার সবটাই তার জানা হয়ে গেল। তন্ত্রে যে উপাচারগুলো আছে তারও আবার কিছু কিছু গীতাতে খুব সূক্ষ্মভাবে দেওয়া আছে, তাকেও তুলে এনে বিস্তার করে নেওয়া যায়। আরেকটা যেটা বিশেষত্ব আছে তা হল, এর আগে যে কটি অধ্যায় আলোচনা করা হয়েছে, তার মধ্যে কয়েকটি জিনিষকে সেখানে শুধু ছুঁয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল, সেই জিনিষগুলিকে এই অষ্টম অধ্যায়ে বিস্তার করে দেখান হয়েছে। এই কারণে অষ্টাদশ অধ্যায়কে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আর খুব কঠিণ বলে গণ্য করা হয়ে থাকে। যদিও সব কটি অধ্যায়ের সারাংশটাকে এখানে দেওয়া হয়েছে কিন্তু তার মধ্যেও নতুন করে অনেক কিছু জিনিষকে নিয়ে আসা হয়েছে। যুক্তির দিক দিয়েও এর অনেক শ্লোক খুব জটিল বলে মনে হবে। অষ্টাদশ অধ্যায়ের মূল আলোচনাতে যাবার আগে আমাদের কয়েকটি জিনিষের ব্যপারে পরিষ্কার হয়ে যাওয়া দরকার, এগুলো পরিষ্কার হয়ে গেলে এই অধ্যায়কে বুঝতে সুবিধা হবে।

গীতা শুরু করা হয়েছিল একটি মূল সমস্যাকে নিয়ে। সেই সমস্যাটি হল শোক আর মোহ। মানুষ শোক আর মোহের সাগরে হাবুডুবু খাচ্ছে, কিভাবে এই শোক মোহের সাগর থেকে মানুষকে বার করা যায় এটাই হচ্ছে গীতার মূল উদ্দেশ্য। অর্জুন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে গেছে, কিন্তু কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধের সাজসজ্জা আর আত্মীয়, বন্ধু বান্ধবদের দেখার পর অর্জুনের মনকে দুটো জিনিষ গ্রাস করে নিয়েছে, এই দুটো হলো শোক আর মোহ। শোক আর মোহই হচ্ছে গীতার প্রধান বিষয়, যে সমস্যা শুধু অর্জুনেরই নয় আমাদের সবারই এটি এক বিরাট সমস্যা। অর্জুন ভাবছে এই যুদ্ধে আমার সব বন্ধু বান্ধবরা মারা যাবে তাই তাঁর মনে শোক এসে গেছে। এদের প্রতি অর্জুনের মোহ ছিল বলেই শোক আসছে, মূলতঃ মোহ থেকেই শোকের জন্ম হয়। যে জিনিষটা আছে সেটা হারিয়ে যাওয়ার ভয় থেকে আসে শোক, আর যখন হারানর ভয় থাকে তখন সেটাকে বলা হয় মোহ। সেইজন্য আমরা আগেও বলেছি যে ইমোশান সব সময়ই নেগেটিভ হয়। অনেক বই লেখা হয় যার নাম *Power of Positive Emotion* কিন্তু কোন ইমোশানই পজিটিভ নয়, সমস্ত রকমের ইমোশানই নেগেটিভ। যতগুলো ইমোশান আছে তার মধ্যে শোক আর মোহ আরও বেশি নেগেটিভ ইমোশান। সমস্যাটা হচ্ছে শোক আর মোহ, শোক আর মোহ সব সময় আসছে রাগ (Attachment) আর দ্বেষ (Aversion) থেকে। গীতার সমস্ত সমস্যা মাত্র এই দুটো জিনিষের মধ্যেই ঘুরপাক করছে, এই দুটো হল শোক আর মোহ। শোক আর মোহ এমনই জিনিষ যেটা প্রত্যেক মানুষের জীবনেই আসবে, কোন কিছুর মধ্যে না থাকলেও তাকে শোক ও মোহ ধরে নেবে।

এই শোক, মোহ, রাগ ও দ্বেষ সব কটি শব্দকে একটি মাত্র শব্দের মধ্যে বসিয়ে দেওয়া যায়, সেটা হচ্ছে কাম বা কামনা-বাসনা। কাম দুই ভাবে আসে, আমি একটা জিনিষকে পেতে চাইছি বা একটা জিনিষ থেকে পালাতে চাইছি, পাওয়া আর পালান এ ছাড়া আর কিছু নেই। আমি কখন একটা জিনিষকে পেতে চাইছি? যখন আমার মধ্যে অভাব বোধ আসবে তখনই আমি কিছু পেতে চাইব। পেট ভরা থাকলে বাঘ সিংহও শিকার করে না, মন ভরপুর হয়ে থাকলে আমিও আর কিছু চাইব না। তার মানে আমার কোন অভাব বোধ আছে বলেই পেতে চাইছি। অথচ শাস্ত্র বলছে আমি হচ্ছি সেই অখণ্ড সচ্চিদানন্দ পূর্ণ ব্রহ্ম। কিন্তু আমরা আমাদের নিজের এই স্বরূপত্বকে ভুলে আছি, এটাই মায়া। উপনিষদে বলছে আপ্তকামস্য কা স্পৃহা, যিনি আপ্তকাম তাঁর আবার কিসের কামনা-বাসনা। আমরা সেই অখণ্ড সচ্চিদানন্দ, আপ্তকাম অথচ কত কিছু পাওয়ার জন্য আমরা চারিদিকে দৌড়ে বেড়াচ্ছি, এটাই মায়া। যিনি পূর্ণকাম, আপ্তকাম তাঁর আর কিসের অভাব, এটা হতেই পারেনা, অন্য দিকে আমি বলছি আমি সেই ভগবান, ভগবান নাই হই তাঁর অঙ্গ তো, নয়তো ভগবানের দাস। তাহলে আমার কিসের অভাব, এইটা হচ্ছে সমস্ত শাস্ত্রের কাছে, বিশেষ করে অদ্বৈতবাদীদের কাছে সবচেয়ে

বড় সমস্যা। আমাদের কথা না হয় বাদ দিলাম, অধ্যাত্ম রামায়ণে বলছে, শ্রীরামচন্দ্র পূর্ণ ব্রহ্ম, অথচ সীতার জন্য কাতর হয়ে কেঁদে বেড়াচ্ছেন। কি করে এটা সম্ভব হচ্ছে? ঠাকুর বলছেন – পঞ্চভূতের ফাঁদে ব্রহ্ম পড়ে কাঁদে। যিনি পূর্ণ ব্রহ্ম তিনি কাঁদেন কি করে! এটা কখন হতেই পারেনা। কিন্তু আমাদের সবারই অভাব বোধ আছে, আপনি চাকরি করছেন অভাব বোধ আছে বলেই, সন্ন্যাসীরও কিছু একটা অভাব বোধ আছে বলেই ঘরবাড়ি ছেড়ে গেরুয়া ধারণ করছে।

সেইজন্য জ্ঞানীরা বলেন এই অভাব বোধটা বাস্তবে কখনই সত্য নয়। এই পুরো ব্যপারটা আসছে অজ্ঞান অবিদ্যা থেকে। পূর্ণ সচ্চিদানন্দকে কোথাও কোন ভাবে অবিদ্যা ঘিরে ফেলে। অবিদ্যা যেই তাঁকে ঘিরে নেয় প্রথমেই সে তাঁর স্বরূপটাকে ভুলে যায়। যখন ভুলে যায় সে তখন নিজেকেই খুঁজতে শুরু করে। কোথায় সে খুঁজতে শুরু করে? কখন সে নিজের স্ত্রীর মধ্যে খুঁজতে থাকে, কখন নিজের সন্তানের মধ্যে শুরু করে, কখন নিজের টাকা-পয়সা, মান-সম্মানের প্রতি খুঁজতে শুরু করে। শিখ ধর্মে গুরু নানক এটাকে খুব সুন্দর করে বলছেন – যিনি নির্গুণ নিরাকার তিনি যখন সগুণ সাকার হয়ে নিজের রূপের আস্বাদ করতে চান তখন এই সৃষ্টি বেরিয়ে আসে। উপনিষদে আবার বলছে *সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম*, যা কিছু আছে ব্রহ্ম ছাড়া কিছু নেই। ব্রহ্ম তো আর সমুদ্র নয়, সমুদ্র তো খণ্ড খণ্ড, কিন্তু ব্রহ্ম অখণ্ড। এগুলোকে একটু ধারণা না করতে পারলে বোঝা যায় না। চৈতন্য হচ্ছে অখণ্ড, যার কোন অংশ হয় না, খণ্ড হয় না। কিন্তু কোথা থেকে অজ্ঞান এসে অখণ্ডকে খণ্ড খণ্ড মনে করে। অজ্ঞান কোথা থেকে আসে আমাদের জানা নেই, বলছেন এই অজ্ঞানটাও মিথ্যা। যদি বলা হয় অজ্ঞানটা কোথাও না কোথাও থেকে চলে আসছে, তাহলে অজ্ঞানের সত্তাটা বাস্তবিক হয়ে যাবে। অজ্ঞান যদি বাস্তবিক সত্তা হয়ে যায় তাহলে দুটো সত্তা হয়ে যাবে, একটা হয়ে যাবে সচ্চিদানন্দের সত্তা আরেকটা হয়ে যাবে অজ্ঞানের সত্তা। তাহলে আবার এক বিরাট সমস্যা হয়ে যাবে। এখন এগুলোকে সাধারণ মানুষ মানতে পারেনা, সেইজন্য শিব আর শক্তির ধারণা নিয়ে আসা হয়, যেটা আমরা তন্ত্রে পাই। তন্ত্রে বলছে শিব আর শক্তির চিরন্তন খেলা চলতেই থাকে। ঠাকুর বলছেন – অগ্নি আর তার দাহিকা শক্তি। এগুলো হচ্ছে উপমা, উপমা হচ্ছে এক দেশীয়, শুধু উপমা দিয়ে এগুলোকে বোঝার চেষ্টা করতে নেই, ধারণা করা চাই। মূল কথা হচ্ছে অখণ্ড সচ্চিদানন্দ ছাড়া কিছু নেই। কিন্তু বেদান্ত মতে বলছে কোথা থেকে কিভাবে তার স্বরূপের ভুল হয়ে যায়। স্বরূপের যখন ভুল হয়ে যায় তখন তাকে অজ্ঞান ঢেকে ফেলে। সিনেমার প্রজেক্টর থেকে আলো ফেলা হচ্ছে, প্রজেক্টরের সামনে হঠাৎ একটা পর্দা এসে গেল। যখন পর্দার মাধ্যমে আলো বেরোচ্ছে তখন সেখানে নানান ছায়া ছবি ভাসতে দেখা যায়, ছবির সঙ্গে সে নিজেকে দ্রষ্টা করে একাত্ম করে নিচ্ছে।

এই অজ্ঞানতা থেকে জন্ম নেয় অভাব বোধ, অভাব বোধ থেকে জন্ম নেয় কাম, কাম থেকে জন্ম নিচ্ছে রাগ আর দ্বেষ। এখন আমি যদি কিছু পেতে চাই তাহলে আমাকে খাটতে হবে। জলতেষ্টা পেলে আমাকে কলের কাছে যেতে হবে। যখনই কামনার জন্ম হয় সে কামনাকে পুরণ করার জন্য আমাকে কাজ করতে হবে। যেমনি আমি কাজ করব তখন সেই কাজের একটা ফল হবে। যেই কাজে নেমে পড়ল তখন অবিদ্যা আরও বেড়ে যাবে, অবিদ্যা বাড়লে আরও কামনার জন্ম হবে, কামনা বাড়লেই কাজ বাড়বে, কাজ বাড়লেই আবার অবিদ্যা বাড়বে, এইভাবে একটা ভয়ঙ্কর আবর্ত তৈরী হয়ে গেল। এই ঘুর্ণাবর্ত থেকে আর কেউ বেরোতে পারেনা। এই পুরো ব্যাপারটাই এখন আমাকে খেলাতে থাকবে, একবার উপরে নিয়ে যাবে আবার নীচে নিয়ে আসবে। আমাদের পুরো শাস্ত্র শুধু এই জিনিষটাকেই আলোচনা করছে – সচ্চিদানন্দ কি, সেটা ভগবান না ব্রহ্ম, নির্গুণ না সগুণ, সাকার না নিরাকার, তারপর এসে যাচ্ছে অবিদ্যা। অবিদ্যার একটা পর্দা দিয়ে দেওয়া হল। পর্দা দিতেই ওর মধ্যে একটা অভাব বোধ এসে যায়, যাকে বলছে অপূর্ণতা। অপূর্ণতা যখন এসে গেল তখন সে পূর্ণ হতে চাইবে। পূর্ণ হওয়ার ইচ্ছে মানেই কামনা, কামনার পুর্তির জন্য দরকার কাজ। কাজ করতে নামলেই আরও অনেক রকমের খটামটি লাগবে, খোটাখুটি লাগলে আরও কামনা বাড়বে। আমি পিওন বলে সাহেবরা আমার উপর খুব দাপট দেখায়, আমাকে কেরানী হতে হবে। তখন আরও খাটাখাটি করে কেরানী হলাম। এক জন্মে কেরানী নাও হতে পারি, পাঁচ জন্মও লেগে যেতে পারে। কেরানী হয়েও শান্তি নেই, আমাকে অফিসার হতে হবে, সব সময় কিছু না কিছু কামনা লেগেই থাকবে। বাড়িতে আমি একা একা থাকি, কি করে সময় কাটাব তাই একটা বিয়ে করা দরকার। বিয়ে করার পর বউ বাড়িতে একা থাকে, তখন বাচ্চা চাই, একটার পর একটা লেগেই আছে, এর শেষ নেই। এটাই অবিদ্যাকে আরও বাড়িয়ে দিচ্ছে।

গীতা এই জায়গাটাকে বেছে নিয়েছে, রাগ ও দ্বেষ আর এই দুটোর জন্মদাতা শোক আর মোহকে। তোমার স্বরূপটা যেখানে মিশে গিয়ে হারিয়ে গেছে গীতা সেটাকে আলাদা করে আমাদের স্বরূপটাকে ফিরিয়ে দিচ্ছে। এই যে সচ্চিদানন্দ যে শৃঙ্খলের দ্বারা বন্ধনে পরে আছে, সেই শৃঙ্খলের তিনটে জিনিষ আছে – অবিদ্যা, কামনা আর কর্ম। এখন অবিদ্যাকে আমি নাশ করতে পারব না, কারণ অবিদ্যা হচ্ছে উৎস, যে উৎস থেকে বাকি সব কিছুর জন্ম হয়েছে। এর পর আসছে কামনা, কামনাকে আমরা নিয়ন্ত্রণ করতে পারি কিন্তু সমূলে সমস্ত কামনাকে নাশ করা অসম্ভব। ছোটবেলায় মেয়েরা পুতুল খেলতে ভালোবাসে, পুতুলের প্রতি তাদের প্রচণ্ড আসক্তি থাকে। একটু বড় হয়ে পুতুলের প্রতি আসক্তিটা কমে যায়, কিন্তু তাই বলে কি তার আসক্তিটা চলে গেছে, ততক্ষণে তার সাজ-পোশাকের প্রতি আসক্তি এসে গেছে। আসক্তিটা থেকে গেছে কিন্তু তার রূপটা পাল্টাতে থাকে। আসক্তিটা হচ্ছে খুব সূক্ষ্ম জিনিষ। বাবা-মারা সন্তানের কানে অনবরত বলে চলে – তোকে ক্লাশে ফার্স্ট হতে হবে, নম্বর বেশি পেতে হবে। বাচ্চা ছেলেও লেগে আছে যাতে নম্বর বেশি পাই। স্কুলে নম্বর পেতে থাকল, এরপর বোর্ডের পরীক্ষায় যাতে বেশি নম্বর আসে তার জন্য লেগে থাকল।

বোর্ডের পরীক্ষার পর জয়েন্ট এন্ট্রেসে যেন নম্বর বেশি আসে। জয়েন্ট এন্ট্রেসের পরে ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ্ ম্যানেজমেন্টে যেন চান্স পাই। সেখান থেকে বেরিয়ে সমাজে যখন লুট করতে নামব তখন যেন সবচেয়ে বেশি লুট করতে পারি। আসলে একই জিনিষ ঘুরছে। বাচ্চা ছেলে নিজেই একটা সংস্কার নিয়ে ঢুকেছে, সব কিছুতে যেন আমি টপে থাকতে পারি। এই সংস্কারের উপর সমাজও আর কিছু সংস্কার ওর মধ্যে ঢেলে দিচ্ছে। বাবা-মার অতৃপ্ত কামনা বাসনার যখন পুর্তি না হয় তখন তারা নিজের সন্তান বা যাকেই তারা ভালোবাসে তার মাধ্যমে সেই কামনা-বাসনা গুলোকে মেটাতে উঠে পড়ে লেগে যায়। আমাদের সমাজে বাড়ির যে গিন্নী, তার জীবনে আর বিশেষ কিছুই পাওয়ার আশা থাকে না, খুব জোর কয়লার জায়গায় গ্যাসের উনুনে রান্না করবে কিন্তু সে স্বামীর প্রমোশন নিয়ে দিনরাত চিন্তায় অস্থির হয়ে থাকে। কারণ নিজের জীবনের উন্নতি পাওয়ার যে বাসনা রয়েছে সেটা পুর্তি হচ্ছে না বলে সেটা স্বামীর উপর লাগিয়ে দিচ্ছে। ভালো করে দেখলে বোঝা যায় যে এই কামনা-বাসনাগুলো যাওয়ার নয়।

এখন পড়ে রইল কর্ম। অবিদ্যাকে আমরা কিছুই করতে পারব না, আসক্তিকে দূর করাও খুবই দুঃসাধ্য। শার্লক হোমসের একটা কাহিনীতে খুব সুন্দর একটা উক্তি আছে, সেখানে বলছেন - When you rule out the impossible, what remains has to be the solution, how so ever improbable it might be, কোন এক ঘটনার রহস্য খুঁজতে গিয়ে যে জিনিষ গুলো অসম্ভব মনে হবে সেগুলোকে আগে সরিয়ে দিতে হবে, তারপর যেটা থেকে যাবে যদিও মনে হয় এটা ঠিক সম্ভব নয়, তা সত্ত্বেও ঐটাই রহস্যের সমাধান বার করে দেবে। অবিদ্যাকে সরানো অসম্ভব, কারণ অবিদ্যা হচ্ছে সবার মা, আসক্তি এটা যদিও সম্ভব কিন্তু খুব কঠিন। বাকি রইল কর্ম এটা improbable তাই এটাকেই আক্রমণ করতে হবে। এ ছাড়া আমাদের আর কোন রাস্তা নেই। একটা কেল্লাতে ঢুকতে যাচ্ছি, কেল্লার তিনটে দরজা, দুটো দরজা ভেতর থেকে পুরো সীল করে দেওয়া আছে। এখন বাকি যে দরজাটা রয়েছে সেটা দিয়েই সমস্ত শক্তিকে একত্রিত করে আক্রমণ করতে হবে। তাই অষ্টাদশ অধ্যায় এই কর্মকেই পুরো আক্রমণ করছে, পুরো অধ্যায় এই কর্মকে নিয়েই বলছে। আসলে কর্মকে কিভাবে আক্রমণ করা যেতে পারে এটার উপরই সব কিছুকে গীতা কেন্দ্রিভূত করছে। অবিদ্যার স্বরূপকে গীতা বলে দিচ্ছে, আসক্তির কত রূপে আসতে পারে সেটাও গীতা বলে দিচ্ছে, অবিদ্যা আর আসক্তি থেকে কি কি হয় সেটাও গীতা বলে দিচ্ছে, কিন্তু অবিদ্যাকে আমরা কাটাতে পারব না, আসক্তিকেও সম্পূর্ণ রূপ বিনাশ করে দিতে পারব না। দুটো চলে গেল এখন একটাই পড়ে রইল, সেটা হল কর্ম, তাই গীতা বিভিন্ন ভাবে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে এই কর্মকেই লক্ষ্য করে আক্রমণ করে গেছে। কর্মের যত রকমের রূপ হতে পারে সব কটা রূপকে গীতা একবার এইদিক থেকে একবার ঐদিক থেকে আক্রমণ করে গেছে। অষ্টাদশ অধ্যায়ের এইটাই হচ্ছে বিষয়, কর্ম জিনিষটা কি, কর্মের কত রকমের রূপ আছে, কর্মের যে বিভিন্ন ফ্যাক্টর আছে সেগুলিকে আলোচনা করে এগুলোকে কিভাবে আক্রমণ করা যেতে পারে, এর সাথে সাথে এটাও বলবে এই সমস্ত কিছু থেকে কিভাবে বেরিয়ে আসতে হবে।

গীতাতে দুটো শব্দ অনেকবার এসেছে, বিশেষ করে পঞ্চম অধ্যায়ে এই দুটো শব্দকে নিয়ে অনেক বেশি নাড়াচাড়া করা হয়েছে – এর একটা হল সন্ন্যাস আরেকটি হল ত্যাগ। আমাদের কাছে সন্ন্যাসী মানে যিনি গেরুয়া ধারণ করেছেন আর ত্যাগ মানে যিনি সব কিছু থেকে সরে এসেছেন। যখন মহাভারত রচনা হচ্ছে সেই সময় আর বিশেষ করে যখন দর্শনের খুঁটিনাটি জিনিষগুলোকে নিয়ে বলা হয়ে তখন এই দুটো শব্দ হচ্ছে inter changeable, যেমন কেউ বলেন আমি এই জিনিষটাকে সন্ন্যাস দিলাম, আর সন্ন্যাসীরা বলে আমি সংসার ত্যাগ করলাম। সবাই বলছে কাজ করাকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে, এখন কাজ করাকে নিয়ন্ত্রণ করতে গেলে কাজ করা বন্ধ করতে হবে, কাজ বন্ধ না করলে বন্ধন বাড়তেই থাকবে। কিন্তু কাজ করা আমরা বন্ধ করব কি করে, কারণ আমার নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস পড়াতো বন্ধ হবে না, চোখ পিটপিটানি তো বন্ধ করা যাবে না, খাওয়া-দাওয়া বন্ধ হবে না, এগুলোও কর্মের মধ্যে পড়ছে, এগুলো কি করে বন্ধ করব! এর আগেও আমরা এই জিনিষগুলো নিয়ে আলোচনা করেছি, এখানে আবার সেটাকে আলোচনা করা হবে কি করে কর্মকে নিয়ন্ত্রণ করে আসক্তিকে কমিয়ে এনে অবিদ্যার পর্দাটাকে ছিড়ে নিজের স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। অষ্টাদশ অধ্যায়ের মূল বক্তব্য পুরো এই বিষয়টার উপরই কেন্দ্রিভূত করা হয়েছে। কর্মের সমস্ত বিষয়, কর্মের রূপ, কর্মের উৎস, মোদ্দা কথা কর্মের যা কিছু আছে, কর্ম করতে গেলে যে পাঁচটি জিনিষের সাহায্যের দরকার, যে পাঁচটিকে ছাড়া কোন কাজ হয় না, এই সব কিছু নিয়েই এই অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।

অষ্টাদশ অধ্যায়ে কি আছে আমরা হাল্কা করে জেনে নিলাম। কর্ম সব সময় দুই স্তরে হয়। প্রথম স্তরে একটা সময় যখন কেউ ব্যবসা বাণিজ্য করছে, মন পুরো কামিনী-কাঞ্চনে আসক্ত হয়ে ভাবছে প্রচুর পয়সা রোজগার করতে হবে তখন মন-প্রাণ দিয়ে সেই কাজ করে। ছেলেমেয়েরা প্রশংসা পাওয়ার জন্য যেটাই করে সেটাই মন-প্রাণ দিয়ে করে। দ্বিতীয় স্তরে dispassionately কাজ করে। কাজ করছে কিন্তু সে জানে এই কাজে আমার কোন লাভ নেই। একটা অবস্থায় কোন কাজ এলে বলবে এই কাজটা কি অন্য কাউকে দিয়ে করান যাবে না, কিন্তু এক সময় সেই লোকই অন্যদের কাজ নিজে টেনে নিয়ে করে দিত। এর মধ্যে কিন্তু অলসতা বা দায়ীত্ব এড়িয়ে যাওয়ার কথা বলা হচ্ছে না। এটাই হচ্ছে অনাসক্তের একটা প্রাথমিক ধাপ, আমাকে করতে বলেছে বলেই আমি করছি, এই কাজ করে আমার যে বিশেষ লাভ-ক্ষতি হবে সেই নিয়ে ভাবছি না। করতে হবে তাই করছি। এই দুটো স্তরের থেকে আরেকটা শেষ স্তর আছে – এনারা কোন কাজ করেন না। হাতি ঘোড়া দিয়ে দড়ি ধরে টেনে আনলেও এনারা কাজে নামবেন না।

কখন সখন নিজের মনের মত হয়তো কিছু করে দেবেন। এনারা হচ্ছেন্ পরমহংস পরিব্রাজক, এনারা হচ্ছেন মানব জাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ মানব। যেমন ত্রৈলঙ্গ্যস্বামী, যাই হয়ে যাক, কোন কিছুতেই কোন কাজ করতেন না।

এখানে আবার একটা সমস্যা এসে পড়ে। মানুষ শ্রেষ্ঠদের দেখেই যা শেখার শেখে। এখন ত্রৈলঙ্গ্যস্বামী কোন কাজ করছেন না, আমিও তাহলে কাজ করব না। ঠাকুর নাচ-গান, উপদেশ দেওয়া ছাড়া আর কোন কাজই করলেন না, এখন বাকিরা যদি বলে আমরাও কোন কাজ করব না, তখনই বিরাট সমস্যা এসে যায়। ঠিক তাই হয়েছিল, মাস্টারমশাইও এই ধারণার বশবর্তী হয়ে বলতেন, ঠাকুর তো কখন কাজ করতে বলেননি। যখন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন প্রতিষ্ঠিত হল তখন সাধুদের মধ্যে এই নিয়ে তুমুল বিতর্কের বাতাবরণ তৈরী হয়ে গিয়েছিল, রোগীর সেবা, স্কুল কলেজ চালান এগুলোতো ঠাকুরের ভাব না। অন্য দিকে স্বামীজী বলছেন – কাজ করে করে মরে যা। কথামৃতে ঠাকুর বলছেন – আগে ঈশ্বর দর্শন তারপরে কাজ কর। এই বিতর্কে শ্রীশ্রীমা জল ঢেলে দিয়ে বলে দিলেন, নরেন যেটা বলছে ঐটাই ঠিক। রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রতিষ্ঠার লগ্নেই যে এই সমস্যা হয়েছিল তাই নয়, এই সমস্যা ভারতের চিরন্তন সমস্যা, ভারতে কাজ না করাটাই আধ্যাত্মিকতার মাপকাঠি হয়ে প্রতিষ্ঠা পেয়ে গেল, এই ভাবনাটাই ভারতের যত দুর্দশা ও চরম দুর্গতির কারণ, এই ধারণাটা অত্যন্ত ভ্রান্ত যে কাজ না করাটাই আধ্যাত্মিকতার চিহ্ন। বেদ উপনিষদ থেকে ভারতে এই সমস্যা চলে আসছে, গীতাতেও বারবার এই সমস্যাকে সমাধানের জন্য অর্জুনকে অনেক তত্ত্ব ও যুক্তি দিয়ে বোঝান হয়েছে। শঙ্করাচার্যও বারবার বলে গেছেন কাজ করতে হবে, স্বামীজী বলে গেছেন কাজ কর, তা সত্ত্বেও রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনকে এই সমস্যা ধরে নিয়েছিল। অনেক সময় কেউ খুব কাজ করলে অন্যরা বলবে – এর মনের মধ্যে কামনা-বাসনা গিজ্‌গিজ্ করছে বলে কাজ করে মরছে। আবার যে কাজ না করে দিনরাত জপ-ধ্যান স্বাধ্যায় নিয়ে ডুবে আছে, তাকে বলবে – দেখেছো ঠাকুরের ভাবের প্রতি এর একটুও ভালোবাসা নেই বলে কোন কাজ করেনা।

এখানে আমরা তিনটে স্তরের কথা পেলাম – প্রথম passionately, দ্বিতীয় dispassionately আর তৃতীয় হচ্ছে no work কোন কাজ করবে না। এই যে দ্বিতীয় স্তরে work dispassionately যেখানে তোমার কোন চাহিদা থাকবে না, কারণ তুমি মনে করছ এই কাজ করাটাই তোমার কর্তব্য তাই এই কর্ম করা। কর্মযোগ বলছে তুমি সব কাজ তোমার কর্তব্য ভেবে সম্পন্ন কর, কর্তব্য রূপে ভেবে নিয়ে কাজে পুরোপুরি আত্মনিয়োগ করে কাজ করতে হবে। যদি না করে তাহলে সংস্কার বন্ধন তৈরী করে দেবে।

বেদ মতে আমাদের চার ধরণের কর্ম করতে হয় – ১) নিত্যকর্ম, প্রতিদিনের পূজো, জপ-ধ্যান, যেগুলো আমাকে করতেই হবে। নিত্যকর্মকে সংস্কৃতে বলা হয় অকরণে প্রত্যবায়, নিত্যকর্ম যদি না করা হয় তাহলে পাপ লাগবে, করলে কোন পূণ্য নেই। অষ্টাদশ অধ্যায়ে অনেক জায়গায় এই নিয়ে তর্ক আসবে, তর্ক এই নিয়ে যে নিত্যকর্ম ফল দেয় কি দেয় না। না, নিত্যকর্মও ফল দেয়। আর আচার্য শঙ্কর যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করে দেবেন যে এটা ভুল ধারণা, নিত্যকর্ম করলে যে কোন ফল হয় না তা নয়। নিত্যকর্ম না করলে পাপ হয়, কিন্তু করলে কিছু একটাতো হচ্ছে যার জন্য পাপগুলো আটকে যাচ্ছে। আচার্য শঙ্কর যখন গীতার ভাষ্য রচনা করছিলেন, সেই সময় কিছু কিছু পণ্ডিতদের বিশেষ করে পূর্বমীমাংসকদের মত ছিল যে নিত্যকর্মের কোন ফল হয় না। কিন্তু আচার্য শঙ্কর যুক্তি দিয়ে সিদ্ধান্ত করে দেখালেন নিত্যকর্মেরও ফল হয়। অষ্টাদশ অধ্যায়ের এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত, আচার্য শঙ্করের এই সিদ্ধান্তকে যদি না মানা হয় তাহলে অষ্টাদশ অধ্যায়ের মূল বক্তব্য অন্য দিকে ঘুরে যাবে। এর মধ্যে খুব সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম যুক্তি আছে। জপ করাকে আমরা যজ্ঞ রূপে ভাবতে পারি, কিন্তু পূর্বমীমাংসকদের যুক্তিকে নিলে জপকে যজ্ঞ বলা যাবে না। কারণ যজ্ঞ মানেই হচ্ছে কোন কিছু ফল তাতে থাকবে, নিত্যকর্ম কোন ফল দেয় না বলে জপকে যজ্ঞ রূপে ভাবা যাবে না, যদিও এটা পূর্বমীমাংসকদের মত। আমরা জপকে যজ্ঞ রূপেই ধরি। ২) দ্বিতীয় হচ্ছে নৈমিত্তিক কর্ম। নৈমিত্তিক কর্ম হচ্ছে যে কর্মগুলো বিশেষ বিশেষ সময়, তিথি বা দিনে করা হয়। মকর সংক্রান্তির দিন গঙ্গায় স্নান করা, দান করা এটা হচ্ছে নৈমিত্তিক কর্ম, নিমিত্তর জন্য কর্ম করা, রোজ করছে না কিন্তু ঐ বিশেষ দিনে করা হচ্ছে। এই দুই ধরণের কর্ম আমাদের শুদ্ধিকরণ করছে, আর কোন মানত আছে সেটাকে পূরণ করার জন্যও নৈমিত্তিক কর্ম করে, নিমিত্ত মানে বিশেষ একটা কারণে করা হচ্ছে। ৩) তৃতীয় হচ্ছে কাম্য কর্ম। আমার মধ্যে যখন কোন কিছু একটা পাওয়ার প্রচণ্ড বাসনা হয়েছে, আমি চাইছি আমার একটা প্রমোশন হোক, প্রমোশন হওয়ার জন্য বাড়িতে একটা বিরাট যজ্ঞের আয়োজন করলাম, এই যজ্ঞটা হয়ে গেল কাম্য কর্ম। ৪) চতুর্থ হচ্ছে নিষিদ্ধ কর্ম, শাস্ত্র যে কর্মগুলো করতে নিষেধ করছে।

বৈদিক মতে যজ্ঞ বলতে যেটাকে ঠিক ঠিক বোঝায় সেটা এই কাম্য কর্মেই হয়, বাকি তিনটেতে যজ্ঞ হয় না। কাম্য কর্ম না হলে ওটা ঠিক ঠিক যজ্ঞের মধ্যে গণ্য হয় না। নিত্যকর্মের মধ্যে অগ্নিহোত্রাদি কর্ম, যেটা ভোরবেলা করা হত, যদিও বেদে এটাকে যজ্ঞ বলা হত, কিন্তু নিত্যকর্ম বলে ঐ অর্থে যজ্ঞে ছিল না। পারিবারে স্বতন্ত্র ব্যক্তিগত ভাবে যে পূজা করা হয় তাকে কখনই যজ্ঞ বলে গণ্য করা হয় না, যজ্ঞ বলা হবে যখন সমাজে সবাই মিলে অনুষ্ঠান করে যজ্ঞ করছে। নিষিদ্ধ জিনিষটা লোকেরা আড়ালে করে, নিত্যকর্ম যে যার ঘরে করছে, নৈমিত্তিক কর্মও ব্যক্তিগত ভাবে করে, সেইজন্য পারিভাষিক অর্থে এইগুলোকে যজ্ঞ বলা যায় না। কিন্তু পরের দিকে যে পঞ্চ মহাযজ্ঞের ধারণা এলো, সেটাও গৃহস্থের জন্য আর এগুলোকেও নিত্যকর্মের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। দেবযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ, নৃযজ্ঞ ইত্যাদি পাঁচ রকমের যজ্ঞ রোজ করতে হত, রোজ গরীবদের খাওয়াবে, পশুপাখিদের খাওয়াবে, অতিথিদের সেবা

করবে, স্বাধ্যায় করবে, এগুলোকে যদিও পঞ্চ মহাযজ্ঞ বলা হচ্ছে, কিন্তু বেদে যে অর্থে যজ্ঞ বলা হয় সেই অর্থে পঞ্চ মহাযজ্ঞকে যজ্ঞ বলছে না। চারটে কর্মের মধ্যে কাম্য কর্মটাই ঠিক ঠিক যজ্ঞের মধ্যে পড়ে।

গীতাতে যেখানে ত্যাগ ও সন্ন্যাসের কথা আসবে সেখানে এই চারটে কর্মের মধ্যে কাম্য কর্ম আর নিষিদ্ধ কর্মকে সম্পূর্ণ বাদ দিয়ে দেবে। নিষিদ্ধ কর্মকে নিয়ে কেউ কোন প্রশ্ন করবে না, সবাই এটাকে বাদ দিয়ে রেখে কথা বলতে আসবে। যারা ত্যাগী, যারা আধ্যাত্মিক জীবনে অগ্রসর হতে চাইছে তাদের জন্যও নৈমিত্তিক কর্মেরও খুব একটা দরকার হয় না। কিন্তু নিত্যকর্মে এসে ঝামেলাটা শুরু হয়। শঙ্করাচার্যের দৃঢ় অভিমত হচ্ছে, যিনি পরমহংস, যিনি আত্মার স্বরূপ বুঝে নিয়েছেন তাঁর জীবনধারা সাধারণ মানুষের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। যিনি আত্মার স্বরূপ উপলব্ধি করে নিয়েছেন তাঁর কাজের গতি পুরোপুরি পাল্টে যাবে। কি কি পাল্টাচ্ছে? নিত্যকর্ম তিনি কোন অবস্থাতেই আর করবেন না। করতে চাইলেও তিনি করতে পারবেন না। সন্ন্যাস ধর্মের প্রতি ভারতের চিরদিনই আকর্ষণ ছিল কিন্তু শঙ্করাচার্য এসে সন্ন্যাস ধর্মকে আরও জনপ্রিয় করে দিলেন। উপনিষদেই আছে, যেদিন তোমার মধ্যে বৈরাগ্য এসে যাবে সেদিনই তুমি সন্ন্যাস নিয়ে পরিব্রাজক হয়ে যাও। কিন্তু মানুষের মধ্যে জনপ্রিয় হওয়া বলতে যেটা বোঝায় সেটা হয়েছে শঙ্করাচার্যের আবির্ভাব থেকে। পূর্বমীমাংসকরা, যাদের মধ্যে মণ্ডন মিশ্রের মত তার্কিক পণ্ডিতরা ছিলেন তাঁরা এই সন্ন্যাস ধর্মের প্রচণ্ড বিরোধিতা করলেন। এদের মতে বলছে – শাস্ত্রে বলছে নিত্যকর্ম করতে, কিন্তু যেমনি আমি নিত্যকর্ম করলাম তখনই আমি আর সন্ন্যাসী থাকলাম না। কারণ সন্ন্যাসী প্রথমেই অগ্নিকে ত্যাগ করে দেয়। অন্য দিকে শঙ্করাচার্য সন্ন্যাস ধর্মকে সব থেকে উঁচুতে তুলে দিলেন, তুমি সন্ন্যাসী হয়ে গেছে, তোমার আর কোন কর্তব্য নেই, তোমার মা-বাবার প্রতি কর্তব্য নেই, সমাজের প্রতি কোন কর্তব্য নেই, দেবতাদের প্রতি কোন কর্তব্য নেই, সন্ন্যাসীর একটাই কর্তব্য শুধু আত্মচিন্তন। এর সুন্দর দৃষ্টান্ত আমরা ঠাকুরের জীবনে দেখতে পাই। ঠাকুরের সমস্ত সাধনা সমাপ্ত হয়ে গেছে। একদিন তিনি ঠিক করলেন গঙ্গায় পিতৃদের নামে জলাঞ্জলী দেবেন। গঙ্গায় তর্পণ করতে গিয়ে ঠাকুর দেখছেন তাঁর আঙুলের ফাঁক দিয়ে সব জল গলে যাচ্ছে, তর্পণ করা আর হল না। ঠাকুরের গলিত হস্ত হয়ে গিয়েছিল। গলিত হস্ত হচ্ছে, আধ্যাত্মিকতার চরম অবস্থায় যাঁরা পৌঁছে যান তাঁরা আর নিত্যকর্ম, নৈমিত্তিক কর্ম করতে পারেন না। পিতৃদের নামে জলাঞ্জলী দেওয়াটা নৈমিত্তিক কর্মের মধ্যে পড়ে। এই কর্মগুলো করতে চাইলেও এনারা করতে পারেন না। এমনকি গুরু যেটা বলে দিয়েছেন সকাল বিকেল মালা জপ করা, সেটাও এনারা করতে পারেন না। সেইজন্য শ্রীমাকে যখন ঠাকুর পূজা করলেন তখন তিনি সব কিছু, জপের মালাটি পর্যন্ত মায়ের চরণে অর্পণ করে দিয়েছিলেন। অষ্টাদশ অধ্যায়ে যে জটিল তত্ত্বগুলো নিয়ে আলোচনা হয়েছে তার সব কিছুই ঠাকুরের জীবনে খুব সহজ ভাবে দৃষ্টান্ত হয়ে আছে। সেইজন্য আগে যেগুলো তর্কের বিষয় ছিল, শঙ্করাচার্য এই রকম বলছেন, রামানুজ অন্য রকম বলছেন, সমস্ত তর্করেই ঠাকুরের জীবনে এসে চিরদিনের মত মীমাংসা হয়ে গেছে। শঙ্করাচার্য, রামানুজ, মাধ্বাচার্য এনারা কি বলছেন তার কোন কিছুই ঠাকুরের পড়ার সুযোগ হয়নি, কিন্তু তিনি এমন এক জীবন যাপন করে গেলেন শাস্ত্র যেমনটি বলছে, শঙ্করাচার্য যা যা বলেছেন, সব তাঁর জীবনে উপলব্ধি করেছেন। সেইজন্য এখন আর এই নিয়ে কোন প্রশ্নই হয় না।

এখন প্রথম passionately, দ্বিতীয় dispassionately আর তৃতীয় হচ্ছে no work কোন কাজ করবে না, এর সাথে ঐ চারটে কর্মের মধ্যে দুটোকে বাদ দিয়ে নিত্য আর নৈমিত্তিক কর্ম এই সব কিছুকে মিলিয়ে অর্জুন প্রশ্ন করছেন

অর্জুন উবাচ

**সন্ন্যাসস্য মহাবাহো তত্ত্বমিচ্ছামি বেদিতুম্। ত্যাগস্য চ হৃষীকেশ পৃথক্ কেশিনিষুদন।।১।।**

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কেশি নামে এক রাক্ষস, যে ঘোড়ার রূপ ধরে অনেক রকম অত্যাচার করত, তাকে বধ করেছিলেন বলে শ্রীকৃষ্ণের আরেকটি নাম কিশিনিষুদন। অর্জুন ভগবানকে প্রশ্ন করছেন – হে কেশিনিষুদন, সন্ন্যাস কি আর ত্যাগ কি, এই দুটোকে আমি তত্ত্বতঃ জানতে চাই। এই তত্ত্বতঃ শব্দটা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ, তত্ত্বতঃ হচ্ছে একটা জিনিষের সার। যতক্ষণ পর্যন্ত একটা জিনিষের যে সার তাকে না জানা যাচ্ছে ততক্ষণ কিন্তু জিনিষটাকে সম্পূর্ণ ভাবে জানা হবে না। আমরা কথায় কথায় অপমানিত হলেই বলি আমার আত্মসম্মানে আঘাত করা হয়েছে। আমি কি আমার আত্মাকে জানি? আত্মাকে জানলে তার অপমান বোধই হবে না, আর যে আত্মাকে জানেনা তার আবার আত্মসম্মান বোধ হবে কিসের। এগুলো একটা কথার কথা, বলতে হয় বলে দিই। যে কোন জিনিষকে তখনই জানা হয় যখন সেই জিনিষটাকে তত্ত্বতঃ জানা হয়। ভক্তিটা তখনই হয় যখন ঈশ্বরের তত্ত্বটাকে জানা হয়। আমরা যে মন্দিরে গিয়ে ঠাকুরের বিগ্রহের সামনে মাথা নত করছি, এই বিগ্রহটাই শ্রীরামকৃষ্ণ নন। শ্রীরামকৃষ্ণ হচ্ছে একটা তত্ত্ব, তত্ত্বকে জানা আর তত্ত্বের সাথে এক হয়ে যাওয়া একই ব্যাপার। আমি যদি আপনার তত্ত্বটা ঠিক ঠিক জানি তাহলে আমি আপনার সাথে এক হয়ে যাব।

জানার ব্যাপারটা অষ্টাদশ অধ্যায়ে আসবে, যদিও এটি খুব কঠিন বিষয়, কিন্তু একটু মন দিলে ব্যাপারটা বুঝতে অসুবিধা হবে না। আমি একটা জিনিষকে কিভাবে জানছি? আপনি আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন, আমি আপনাকে কিভাবে জানছি যে আপনি অমুক ব্যক্তি? আমার যে চৈতন্য সেটা আমার চোখ দিয়ে বেরিয়ে আপনাকে পুরো ঢেকে দিচ্ছে, সেই চৈতন্যই আবার আমার কাছে ফেরত এসে আমাকে আপনার ব্যাপারে সচেতন করে দিল। ফিজিক্সে বলে আলোর মাধ্যমে আপনার ছবিটা আমার চোখে পড়ছে।

কিন্তু এখানে ছবিটা যাচ্ছে, কিন্তু এই লোকটি সেই লোক এই বোধটা কোথা থেকে আসছে? আমাদের দর্শনে বলে, আমার যে চৈতন্য সেই চৈতন্য বাইরে যাচ্ছে, বাইরে গিয়ে বস্তুকে পরিমাপ করে আবার ভেতরে ফেরত চলে আসে। এখানেও কিন্তু সেই রূপটাকে জানছি। কিন্তু তত্ত্বতঃ যদি জানতে হয়, বিষয়টার সারটাকে যখন জানা হয় তখন বিষয়ের সাথে একাত্ম হয়ে যায়। যতক্ষণ না বিষয়ের সাথে এক হচ্ছে ততক্ষণ বিষয়কে জানতে পারা যাবে না। যেমন মা আর সন্তান, মা আর তার সন্তান তত্ত্বতঃ এক, সেইজন্য বাচ্চা যত দূরেই থাকুক, বাচ্চা কাঁদলে মা বুঝতে পারে আমার বাচ্চা কাঁদছে। বাচ্চা বড় হতে হতে মা আর সন্তানের মধ্যে ব্যবধাণটা আস্তে আস্তে বাড়তে থাকে। যারা ঠিক ঠিক প্রেম করে তাদের এমন একাত্মা হয়ে যায় পরস্পরের প্রতি, একজনের কিছু হলে আরেকজন বুঝতে পারে। স্বামীজী একটা ঘটনার কথা উল্লেখ করছেন – একটা ছেলে একটা মেয়েকে খুব ভালোবাসত, এমন ভালোবাসত যে ছেলেটি মেয়েটির সাথে একাত্ম হয়ে গিয়েছিল। একদিন ছেলেটি স্বামীজীকে বলছে – আমার বন্ধুটি আজকে অমুক রঙের জামা পড়েছে। পরে স্বামীজী খোঁজ নিয়ে দেখছেন যে ছেলেটি ঠিকই বলেছিল, অথচ ওরা দুজন দুজনের থেকে দশ কিলোমিটার দূরত্বে অবস্থান করছে। এখানেও কিন্তু তত্ত্বতঃ হচ্ছে না, এখানে মনটা এক হয়ে আছে। তত্ত্বতঃ যখন হবে তখন আর তার সাথে এক হয়ে যাবে। এক না হওয়া পর্যন্ত আমরা একটা জিনিষকে তত্ত্বতঃ জানতে পারিনা। ভগবানের তত্ত্ব জানা মানে ভগবানের সাথে এক হয়ে যাওয়া। সমুদ্রের তত্ত্বকে জানা মানে এক ফোটা জল তাকে সমুদ্রের সাথে এক হয়ে যেতে হয়, তা নাহলে এটাকে জানা যায় না। যখন ঠিক অর্জুন বুঝে যাবে সন্ন্যাস কি, ত্যাগ কি তখন অর্জুন সন্ন্যাস ও ত্যাগে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে। মজার ব্যাপার হল এর আগের আগের অধ্যায়গুলিতে ভগবান অর্জুনকে অনেকবার সন্ন্যাস আর ত্যাগের কথা বুঝিয়েছেন, কিন্তু আবার অষ্টাদশ অধ্যায়ে অর্জুন প্রশ্ন করছে। কারণ অর্জুন তখনও সন্ন্যাস ও ত্যাগে প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি। অর্জুন যদি আগেই বুঝে নিত তাহলে এই প্রশ্ন, সন্ন্যাস কি, ত্যাগ কি তাহলে এই প্রশ্ন করত না। আমাদের যত জ্ঞান আছে সবই superficial বাইরে থেকে আমরা কতকগুলো তথ্য সংগ্রহ করছি, তত্ত্বতঃ আমরা কোন কিছুই জানছি না, যদি কোন জিনিষকে আমরা তত্ত্বতঃ জেনে যাই তাহলে ঐ জিনিষকে নিয়ে কোন দিন আমাদের কোন সমস্যাই হবে না।

আমাদের জেনে রাখা দরকার যে দ্বিতীয় অধ্যায়ে আর অষ্টাদশ অধ্যায়ে কয়েকটি শ্লোক আছে যেটা ভগবানের মত নয়, অথচ অনেক বড় বড় পণ্ডিতরাও এই শ্লোকগুলোকে গীতার মত বলে উল্লেখ করেন। যেমন গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে সাতাশ নং শ্লোকে আছে – *জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ*, অর্থাৎ যে জন্মেছে সে মরবে, যে মরেছে সে আবার জন্ম নেবে, কিন্তু এটা আদপেই গীতার মত নয়। গীতাতে ভগবান অর্জুনকে বলছেন যদি তুমি এই মতকে অবলম্বন কর তাহলে এই রকমটি হবে, কিন্তু এটা বলছেন না যে এই মতটাই সত্য। ঠিক তেমনি অষ্টাদশ অধ্যায়ের এর পরের শ্লোকে ভগবান বলছেন –

শ্রীভগবানুবাচ

**কাম্যানাং কর্মণাং ন্যাসং সন্ন্যাসং কবয়ো বিদুঃ। সর্বকর্মফলত্যাগং প্রাহুস্ত্যাগং বিচক্ষণাঃ।।২।।**

যাঁরা কবি, কবি মানে ক্রান্তদর্শী, ভগবানের একটা নাম হচ্ছে কবি, যাঁরা কবি, যাঁরা জ্ঞানী তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ *কাম্যানং কর্মণাং ন্যাসং*, কাম্য কর্ম পরিত্যাগকেই সন্ন্যাস বলে মনে করেন। এখানে নিষিদ্ধ কর্মের কথা উল্লেখই করা হবে না। প্রত্যেক ধর্মীয় অনুশাসনে নিষিদ্ধ কর্মের একটা নির্দিষ্ট তালিকা ঠিক করে দেওয়া আছে, এই কর্মগুলো তুমি কোন মতেই করবে না। একমাত্র হিন্দুধর্মের এই ব্যাপারে একটু উদার, কেননা কোন কোন ক্ষেত্রে কিছু কিছু কর্মকে নিষিদ্ধ করা হয় আবার কোন কোন ক্ষেত্রে সেই কর্মের অনুষ্ঠানের অনুমতি দেয়। *সর্বকর্মফলত্যাগং প্রাহুস্ত্যাগং বিচক্ষণাঃ*, যত রকম কর্মের ফল ত্যাগকে অনেকে বলেন এটাই হচ্ছে ত্যাগ, কর্মফল ত্যাগ মানে dispassionate কাজ। এখানে ভগবান ত্যাগ ও সন্ন্যাসের সংজ্ঞা দিচ্ছেন, বলছেন – আগেকার কিছু কিছু পণ্ডিতরা বলে গেছেন যদি তুমি কাম্য কর্ম ত্যাগ কর তাহলে তুমি সন্ন্যাসী কিন্তু নিত্যকর্মও করবে নৈমিত্তিক কর্মও করবে। ভগবান এখানে নিজের মত দিচ্ছেন না, বলছেন কেউ কেউ এই রকম বলে থাকেন। আবার অনেকে মনে করেন যত রকমের কর্ম করা হয় সব কর্মের ফলত্যাগকেই প্রকৃত ত্যাগ বলেন। আবার অনেকে বলে থাকেন –

**ত্যাজ্যং দোষবদিত্যেকে কর্ম প্রাহুর্মনীষিণাঃ। যজ্ঞদানতপঃ কর্ম ন ত্যাজ্যমিতি চাপরে।।৩।।**

সাংখ্যযোগের মতাবলম্বীরা মনে করেন যত রকমের কাজ আছে সবই দোষযুক্ত ও বন্ধনের কারণ। কারণ কাজ মানে হচ্ছে অবিদ্যা, কাজ মানে প্রকৃতির রাজ্য। প্রকৃতির রাজ্যে থাকলেই তোমার সব কিছু গোলমালে ভরে যাবে। সেইজন্য সাংখ্যবাদিগণ বলেন সব কাজ বন্ধ কর, কাজ করো না, কাজ করলেই বন্ধনে পড়বে। এখানে শুধু সন্ন্যাসীদের কথা বলা হচ্ছে, সব সাধকের জন্য এই কথা বলা হচ্ছে না। আবার অনেকে বলেন – *যজ্ঞদানতপঃ কর্ম ন ত্যাজ্যমিতি চাপরে*, যজ্ঞ, দান, তপস্যা এই তিনটে জিনিষকে কখনই ছেড়ে দেবে না। এখানে ভগবান বিভিন্ন ধরণের মত বলছেন। কিন্তু শঙ্করাচার্যকে প্রতিষ্ঠা করতে হবে যে, সন্ন্যাসীর কোন কর্তব্য নেই, কোন দায়ীত্ব নেই। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এখানে যত মত তখন ছিল ও তার আগে ছিল সব মত গুলোকে বলে দিলেন, শঙ্করাচার্য এগুলোকে আধার করে খুব নিপুণ ভাবে আমাদের সেই দিকে নিয়ে যাবেন যেখানে তিনি প্রতিষ্ঠা করে দেখাবেন যে সন্ন্যাসীর কর্তব্য বলে কিছু থাকতে পারেনা।

গীতাতে মানুষকে তিনটে শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে, খুব হলে এটাকে চারটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যেতে পারে। প্রথম শ্রেণীতে হলেন শ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দের মত ব্যক্তিত্ব অথবা যে কোন আধ্যাত্মিক জ্ঞানে উদ্ভাসিত পুরুষ, যিশু, বুদ্ধের মত পুরুষরা। এনারা সব কিছুর উর্ধে, কোন কিছুই এদের স্পর্শ করতে পারবে না। দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ছে যাঁরা আধ্যাত্মিক তত্ত্বটাকে মোটামুটি বুঝে নিয়েছেন, কিন্তু এখনও তাঁর প্রত্যক্ষ উপলব্ধি হয়নি, তার মানে এনারা জ্ঞানী কিন্তু বিজ্ঞানী হননি। এনাদের দুটো পথই বলে দেওয়া হয়, তুমি যদি চাও তাহলে এই রকম করতে পার, আর না চাও তাহলে তোমাকে কিছু করতে হবে না। কিন্তু তোমাকে সব সময় সচেতন থাকতে হবে যে মূল লক্ষ্য তোমার এখনও প্রাপ্ত হয়নি তাই এখনও তোমাকে মূল লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে চলার পথে সব সময় লেগে থাকতে হবে। তৃতীয় শ্রেণীর হচ্ছে, যারা আধ্যাত্মিক পথে এগোতে চায় কিন্তু তাদের অতটা ক্ষমতা নেই আর পাত্রতাও নেই। এই তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত ব্যক্তিদের জন্যই গীতা। আমি আধ্যাত্মিক পথে এগোতে চাই, আমি সব কিছু বুঝতে চাই কিন্তু আমার সেই ক্ষমতা ও জ্ঞান নেই। তখন গীতা তাদের বলবে তোমার জন্য একটাই উপদেশ, তুমি কাজ করে যাও। এদের মধ্যে এখনও কামনা বাসনা কিছু কিছু আছে, কিছু কিছু কর্তব্য বোধ আছে, আমাকে বাবাকে দেখতে হবে, মাকে দেখতে হবে, সমাজে এত দুঃখ কষ্ট আছে এটাকে দূর করতে হবে। এই বোধ গুলো যার আছে তার মানে তার মধ্যে অপূর্ণতা বিদ্যমান। এরাই শোক মোহতে হাবুডুবু খাচ্ছে, হাবুডুবু খাওয়া থেকে সে পরিত্রাণ পেতে চাইছে, তখন গীতা এদেরকে একটাই কথা বলে দিচ্ছে, তোমাকে কাজ করতে হবে। কাজ কিভাবে করতে হবে এটাই আবার এই অধ্যায়ে আলোচনা করা হবে। কিন্তু যে প্রকৃত সন্ন্যাসী সে কাজ করবে না, কারণ তার নিজেরও কোন চাহিদা নেই, আর সন্ন্যাসী শোক মোহে হাবুডুবু খাবে কোন প্রশ্নই নেই।

কোন সন্ন্যাসী এসে আমাকে যদি বলে আমি হচ্ছি পরমহংস পরিব্রাজক, আমার কোন কর্তব্য নেই, দায়ীত্ব নেই, আমার কোন পাপ নেই পূণ্য নেই, আমার ধর্ম নেই অধর্ম নেই। এখন আমি কি করব, আমাকে পরীক্ষা করে দেখতে হবে তাঁর কোন প্রতিক্রিয়া হয় কিনা কোন কিছুতে। আগেকার দিনে ঋষি মুনি যাঁরা ছিলেন তাঁরাও এই রকম পরীক্ষা নিতে যেতেন। কোথাও হয়তো শুনতে পেলেন অমুক জায়গায় এক বিরাট ঋষির আবির্ভাব হয়েছে, অন্যান্য ঋষিরাও সেইখানে পরীক্ষা নেওয়ার জন্য পোঁছে যেতেন। মহাভারতে মুদ্গল বলে এক ঋষি ছিলেন, তিনি খুব তপস্যা করতেন আর তাতেই তাঁর খুব নামডাক হয়ে যায়। দুর্বাসা মুনি তাঁকে পরীক্ষা করতে পোঁছে গেছেন। মুদ্গল ঋষি পনেরো দিন পর একদিন মাত্র আহার করতেন, ঠিক খাবার সময় দুর্বাসা মুনি সেইখানে পোঁছে গিয়ে তাঁর সব খাবার খেয়ে নিয়েছেন। পনেরো দিন পর আবার যখন মুদ্গল ঋষির আহার গ্রহণের দিন এসেছে, আবার সেইদিন দুর্বাসা মুনি সেখানে পোঁছে গিয়ে আবার তাঁর আহার খেয়ে নিয়েছেন। এই করে করে প্রায় তিন মাস মুদ্গল ঋষি, তাঁর পত্নিকে আর তাঁর সন্তানকে খেতে দিলেন না। কিন্তু মুদ্গল ঋষি পুরো শান্ত নির্বিকার থাকলেন। তখন দুর্বাসা মুনি বললেন – দেখুন মানুষ সব কিছুকে জয় করতে পারে কিন্তু পেটের যে ক্ষুধা সেটাকে জয় করা যায় না, আপনি সত্যিই মহান। এইভাবে পরীক্ষা করে দেখা হয় তাঁর মন কতটা বিচলিত হচ্ছে। স্বামীজীকে ব্যক্তিগত ভাবে যখন কেউ আক্রমণ করত তখন তিনি কিছু বলতেন না, কিন্তু কেউ ভারতের নামে, হিন্দুধর্মের নামে, ঠাকুরের নামে যদি কিছু বলে দিত, ব্যাস্ সোজা গিয়ে তিনি তার টুটিটা চেপে ধরতেন। আমেরিকাতা স্বামীজী এতো লাঞ্ছনা, অপমান করা হয়েছে কিন্তু তার জন্য তিনি একটি শব্দও কোথাও ব্যবহার করেননি। কিন্তু ভারতের নামে, হিন্দুধর্মের নামে কিছু বললে একেবারে ঝাঁপিয়ে পড়তেন। এগুলো হচ্ছে পরমহংসের বৈশিষ্ট্য।

এইবার ভগবান নিজের মত অর্জুনকে বলছেন। এর আগের আগের ঋষিরা অনেক মত দিয়েছেন এবার আমার মত তোমাকে জানাচ্ছি। শঙ্করাচার্য খুব সুন্দর বলছেন – শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলছেন আমার মত এইজন্য দামী, কারণ আমি হচ্ছি ঈশ্বর, আমার কথাই শেষ কথা। এর আগে দশম ও একাদশ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর নিজের স্বরূপ বর্ণন করে অর্জুনকে বিশ্বরূপ দর্শন করিয়ে দিয়েছেন। শ্রীকৃষ্ণ যে ঈশ্বর এই ব্যাপারে অর্জুনেরও এখন কোন সংশয় নেই। শ্রীভগবান বলছেন –

**নিশ্চয়ং শৃণু মে তত্র ত্যাগে ভরতসত্তম। ত্যাগো হি পুরুষব্যাঘ্র ত্রিবিধঃ সম্প্রকীর্তিতঃ।।৪।।**

হে ভরতশ্রেষ্ঠ, এবার আমার নিশ্চিত মত শোন – হে পুরুষব্যাঘ্র, এই ত্যাগ ও সন্ন্যাস তিন রকমের হয়। তিন রকমের কি কি ত্যাগ হয় এর পরে পরে আলোচনা করা হব। শঙ্করাচার্যের মত ঘোর অদ্বৈতী বারবার বলছেন – এটা ঈশ্বরের কথা, একে কাটবার জো নেই।

**যজ্ঞদানতপঃকর্ম ন ত্যাজ্যং কার্যমেব তৎ। যজ্ঞো দানং তপশ্চৈব পাবনানি মনীষিণাম্।।৫।।**

যজ্ঞ, দান ও তপঃ অর্থাৎ যজ্ঞ করা, দান করা আর তপস্যা করা, এই তিনটে কাজকে *ন ত্যাজ্যং কার্যমেব তৎ*, কখনই ত্যাগ করবে না। এই জায়গাটাতে এসে অনেকের মনে সংশয় আসতে পারে, গীতা যদি কেউ নিজে থেকে পড়তে যায় তাহলে কিন্তু তার সব কিছু গোলমাল হয়ে যাবে। সেইজন্য আচার্য শঙ্করের মতকে অনুসরণ করে গীতা যদি অধ্যায়ণ না করা হয় তাহলে অর্থ গুলো সব গুলিয়ে যাবে। আচার্য তাঁর ভাষ্যে বলছেন, এই শ্লোকগুলো সন্ন্যাসীদের জন্য নয়, এগুলো সাধারণ মানুষদের জন্য ভগবান

বলছেন। এখন একজন সংসারীর ইচ্ছে হয়েছে আধ্যাত্মিক জীবন যাপন করবে, সে বলছে আমার বেশি কোন চাহিদা নেই, একটু খাওয়া-পড়া আর থাকার জায়গা হলেই চলে যাবে, কারণ তার সংসার আছে। এখন সে কি করবে? তাকে বলা হবে, তুমি বাকি যা কিছু আছে সব ছেড়ে দাও কিন্তু এই তিনটে জিনিষকে ত্যাগ করে দিও না। সে কি কি ছাড়বে না? যজ্ঞ করা ছাড়বে না, দান করা ছাড়বে না আর তপস্যা করা ছাড়বে না। কেন এই তিনটেকে ছাড়তে নিষেধ করা হচ্ছে? *যজ্ঞো দানং তপশ্চৈব পাবনানি মনীষিণাম্* - যাঁরা মনীষি, যাঁরা ফলকামনা রহিত পুরুষ, যাঁদের জগৎ থেকে কিছু চাওয়ার নেই, যিনি জগতের সব কিছুর উর্দ্ধে চলে গেছেন, তাঁদেরকেও এই তিনটে জিনিষ *পাবনানি*, পাবন করে মানে পবিত্র করে। সাধারণ লোকেদের কথা বাদ দাও, যারা অতি সাধারণ তাদেরকেও এগুলো পবিত্র করবেই। সে যদি যজ্ঞ কর, যে কোন যজ্ঞই করুক না কেন, তাকে পবিত্র করবে। সেইজন্য মনুস্মৃতিতে ষোড়শ সংস্কারের, ষোল রকমের সংস্কারের কথা বলা হচ্ছে, যেটা তন্ত্রে গিয়ে দশ রকমের সংস্কারে দাঁড়িয়েছে, যেখান থেকে নাম হয়েছে দশকর্মা ভাণ্ডার। সন্তানের জন্ম থেকে শুরু করে মৃত্যুর পর চিতায় ওঠান পর্যন্ত যত রকমের সংস্কার হতে পারে সব কিছু এতে বলা হচ্ছে। নামকরণ, অন্নপ্রাশন, উপনয়ন, বিদ্যারম্ভ, বিবাহ সবটাই হচ্ছে সংস্কার, যে সংস্কারই করবে সেটাই যজ্ঞ। জন্মের সাথে সাথে মানুষকে যজ্ঞ দিয়ে বেঁধে দেওয়া হল। মানুষতো ঘর সংসার করবেই, মানুষ খাওয়া-দাওয়া করবেই, মানুষের মধ্যে আসক্তি থাকবেই কিন্তু এগুলোর রূপটাকে পাল্টে দেওয়া হচ্ছে। কি করে পাল্টাচ্ছে? যজ্ঞ দিয়ে বেঁধে দেওয়া হচ্ছে। আর দান, মানুষ নিজের জন্য সঞ্চয় করবে, মানুষ যে আত্মকেন্দ্রিক ও স্বার্থপর হবে এটা জানা কথা। মানুষ স্বার্থপরতা বশতঃ সব কিছুকে কাঁকড়ার মত আঁকড়ে ধরে থাকবে, এটাকে একটু আলগা করতে হবে। যিনি মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য, ঈশ্বরের সাক্ষাৎকার করতে চান তাকে জগৎ পুরো ছেড়ে দিতে হবে। জগতকে তো সবার পরে ছাড়বে কিন্তু তার আগে কোথাও তো তাকে প্রথম পা ফেলতে হবে। কি করে প্রথম পা ফেলবে? দানের মাধ্যমে সে প্রথম ত্যাগের পথে পা ফেলবে। সেইজন্য বিশ্বের যত ধর্ম আছে, সব ধর্মে দানকে প্রচণ্ড মূল্য দেওয়া হয়। বিভিন্ন ধর্মে দানের তারতম্য আছে, কোথাও বলে আয়ের দশ ভাগ দান কর, কোথাও বলবে পনেরো শতাংশ দান কর, তা না হলে মানুষ আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে এগোতে পারেনা। কেউ যদি মনে করে আমি প্রচুর জপ ধ্যান করে যাচ্ছি, তাই অন্য কোন যজ্ঞ করব না, দানও করব না, তাহলে কিন্তু তার কিছুই হবে না।

এরপর আসছে তপস্যা, সপ্তদশ অধ্যায়ে তিন রকমের তপস্যার কথা বলা হয়েছে – শরীরের তপস্যা, বাচিক তপস্যা আর মনের তপস্যা। বাচিক তপস্যাতে বলাই হয়েছে – *অনুদ্বেগকরং বাক্যং সত্যং প্রিয়হিতঞ্চ যৎ*, চারটে শর্ত। কথাগুলো সত্য হবে, কথাগুলো প্রিয় হবে, কথাগুলো হিতকারী হবে আর শেষ এই তিনটে শর্ত পূর্ণ করলেও এই কথাগুলো শুনে সামনের লোকটির যেন গাত্রদাহ না হয়, *অনুদ্বেগকরং*, উদ্বেগকর বাক্য প্রয়োগ করা যাবে না। এই চারটে শর্তকে মেনে নিয়ে যখন কেউ কথা বলে তখন বুঝতে হবে যে সে বাচিক তপস্যা করছে। মনের তপস্যা হচ্ছে *ভাবসংশুদ্ধি*, ভেতরটা যখন পরিষ্কার করা হয়, ভেতরেও যা বাইরেও তাই, মন মুখ এক। আমরা এর পুরো উল্টোটা করি, বাইরে আর ভেতর সম্পূর্ণ আলাদা। ভেতরটা পুরো গোলমেলে আর বাইরে কি মিষ্টি মিষ্টি ভদ্র আচরণ। আর আমাদের কথাগুলো সব সময় হয় অসত্য এবং উদ্বেগকর। কি রকম? আমার বাইরে ভেতরে এক, যা বলি মুখের উপর বলে দিই। যেমনি আমি বলছি, আমি যা বলি মুখের উপর বলি, এটা উদ্বেগকর বাক্য হয়ে গেল, তার মানে আমি একটা নোংরা কথা বলতে যাচ্ছি। আর যেটা বলতে যাচ্ছি স্বভাবতই সেটা অপ্রিয় কথা হবে, সত্য হবে কিনা তাতেও সন্দেহ আছে। অথচ আমার ভেতর ও বাইরে এক নয়, মানে *ভাবসংশুদ্ধি* নেই। আমরা দিনরাত যা করি, যা বলি, গীতায় যা বলা হয়েছে ঠিক তার উল্টোটাই করি। সেইজন্যই আমাদের এত দুর্গতি, এইজন্য গীতাও বলছে – *ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্*, এই ধরণের লোকেরা সিদ্ধি পায়না, কোন ধরণের সাফল্য এদের দ্বারা হয় না, এরা এই জগতে কোন সুখ শান্তি পায়না, সব সময় অশান্তিতে মরে আর *ন পরাং গতিম্* মরার পরে নীচের দিকে যাবে, উপরের দিকে যেতে পারবেই না। তোমার কোন তপস্যা নেই, তোমার কোন দান নেই, তুমি কোন যজ্ঞই করো না তারপর সবাই সবাইকে লুটেপুটে খাচ্ছে। আগে ছিল আমি তোমাকে দেখবে তুমি আমাকে দেখব, কিন্তু এখন এসে গেছে প্রতিযোগিতার দৌড়, কে কাকে ল্যাং মেরে আগে এগিয়ে যাবে তার জন্য প্রাণপন চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

কিছু দিন আগে রিডার্স ডাইজেস্টে খুব সুন্দর একটা ঘটনার কথা বেরিয়েছিল। যিনি লেখক তিনি বলছেন – পনের কুড়ি বছর আগে তিনি এক বিয়ের অনুষ্ঠানে গিয়েছিলেন, সেই অনুষ্ঠানে অনেক কিছুই হচ্ছিল। সেখানে হঠাৎ বাচ্চাদেরকে বলা হল – যে নিমন্ত্রণের কার্ডটা সবচেয়ে আগে দৌড়ে নিয়ে আসবে তাকে একটা স্পেশাল প্রাইজ দেওয়া হবে। একটা বাচ্চা মেয়ে দৌড়ে গিয়ে নিমন্ত্রণ কার্ডটা নিয়ে এগোচ্ছে, সেই সময় একটা ছেলে মাঝ পথ থেকে দৌড়ে গিয়ে মেয়েটার হাত থেকে কার্ডটা কেড়ে নিয়ে স্টেজে পৌঁছে গেছে। যে ভদ্রলোক ঘটনাটা লিখছেন উনি বলছেন, আমি তো ঘটনাটা দেখে থ হয়ে গেলাম, এটা কি রকম হল! সঙ্গে সঙ্গে তিনি বাচ্চা ছেলেটার বাবাকে গিয়ে বললেন – দেখলেন আপনার ছেলেটি কি করল! ছেলেটির বাবা বলল – কেন, কি হয়েছে, বাচ্চা বাচ্চাতে ওরকম হয়েই থাকে এটা নিয়ে এত কথা বলার কি আছে। লেখক ভদ্রলোক ভাবছেন – এত বড় একটা অন্যায় কাজ করল আর বাবা হয়ে নিজের সন্তানকে কিছু বলল না! এরপর অনেক বছর কেটে গেছে কারুর সাথে আর কোন যোগাযোগ নেই। অনেক বছর পর লেখকের স্ত্রী তাকে বলছেন – জানো, ঐ ভদ্রলোকের কি অবস্থা। ঐ ছেলেটি এতদিনে বড় হয়ে গেছে, বড় হয়ে গিয়ে বাপ-মাকে মেরে পিটিয়ে তাদের কাছ থেকে সব সম্পত্তি জোর করে নিজের নামে লিখিয়ে নিয়েছে, এরপর নানা রকমের অত্যাচার করছে,

খেতে দিচ্ছে না। লেখকের মনটা খুব করুণায় ভরে গেল। উনি ঐ ভদ্রলোককে ফোন করলেন। ছেলেটিই ফোন ধরল, ধরে খুব ভদ্রভাবে নরম গলায় বলল – বাবার সঙ্গে তো এখন কথা বলা যাবে না। উনিও ফোনটা রেখে দিলেন। লেখক লিখছেন – আমার মাথায় ঐ দৃশ্যটাই বারবার ঘুরছে, কিভাবে ঐ বাচ্চা মেয়েটার হাত থেকে কার্ডটা কেড়ে দৌড়ে বেরিয়ে চলে গেল। আজ একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হল, আজকে বাপের হাত থেকে জিনিষটা কেড়ে নিল। সমাজে এই জিনিষই এখন হচ্ছে। একজন মনস্তাত্ত্বিক বলছেন – ভারত পাঁচ হাজার বছর ধরে যে জিনিষটাকে দাঁড় করিয়ে গেছে, দশ বছরের মধ্যে আধুনিক সমাজ সেটাকে উড়িয়ে ছুড়ে ফেলে দিয়েছে। এখন দিন দিন পাগলের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। সমাজের এখন এমন অবস্থা হয়ে গেছে যে, পাগলামির কিছু কিছু ওষুধ টালা ট্যাঙ্কের জলে মিশিয়ে দিতে হবে, লোকেরা যখন জল খাবে তখন ঐ ওষুধ গুলোও তাদের পেটে যাবে যাতে মাথাটা ঠিক থাকে। সমাজ এখন উন্মত্তের মত হয়ে গেছে, কেউ সামলাতে পারছে না, যে যাকে পারছে লুটেপুটে খাচ্ছে। কেন এই অবস্থা আজ? কারণ – *যজ্ঞদানতপঃকর্ম*, না আছে তার যজ্ঞ, না আছে তার তপস্যা, না আছে এদের কোন দান। সকাল আটটায় বাড়ি থেকে বেরিয়ে অফিস যাচ্ছে, রাত আটটায় বাড়ি ফিরছে, পুরো জীবনটা এইটুকুর মধ্যে ঘুরপাক করছে। অফিসে গিয়ে কি করছে? যেটুকু কাজ ছিল সেটুকু করে দিয়ে অফিসের পলিটিক্সের মধ্যে নাক গলিয়ে কাকে টাইট দেওয়া যায়, কিভাবে প্রমোশনটা বাগানো যায়, কিভাবে প্যাকেজটাকে মোটা করা যায় এই নিয়েই দিনরাত মেতে আছে। এরপর ভগবান বলছেন –

**এতান্যপি তু কর্মাণি সঙ্গং ত্যাক্ত্বা ফলানি চ। কর্তব্যানীতি মে পার্থ নিশ্চিতং মতমুত্তমম্।।৬।।**

এই শ্লোকটি হচ্ছে খুব গুরুত্বপূর্ণ। সাধারণ মানুষকে *যজ্ঞদানতপঃকর্ম*, যজ্ঞ, দান, তপস্যা করতেই হবে, এ ছাড়া কোন রাস্তা নেই। কিন্তু যদি তুমি জীবনে ওপরে উঠে গিয়ে থাক, যদি তুমি মনে কর আমি বেশ কিছু উপরে উঠে গেছি কিন্তু এখনও ভগবান লাভ হয়নি, তখন তুমি এই যজ্ঞ, দান আর তপস্যা কিভাবে করবে? *সঙ্গং ত্যাক্ত্বা ফলানি চ*, কোন কিছুর প্রতি তোমার আসক্তি থাকবে না, আর কোন কর্মের ফলাকাঙ্ক্ষা থাকবে না। সাধারণ লোক যারা, তারা পুরো আসক্তির ভাব নিয়ে এই কাজ গুলো করে – হে ঠাকুর, আমি এই তোমার নাম করছি আমার ছেলের যেন একটা ভালো চাকরি হয়। এটা সাধারণ ভক্তদের কথা বলা হল। আর যারা অভক্ত তারা কিছুই করবে না, দূর্, ঠাকুর ঠুকুর আবার কি। *কর্তব্যানীতি মে পার্থ*, সাধারণ ভক্ত ঠাকুরের কাছে গিয়ে বলছে – ঠাকুর আমার ছেলের যেন একটা চাকরি হয়। কিন্তু যিনি শ্রেষ্ঠ ভক্ত, তিনি কি করবেন? তোমার কাছে আমার এই আসাটা কর্তব্য, আমি কোন আশা নিয়ে তোমার কাছে আসিনি, এটা আমার কর্তব্য তোমাকে আমার প্রণাম করা। এটা হল উচ্চতম ভক্তের উদাহরণ। যিনি পরমহংস পরিব্রাজক তাঁদেরতো মন্দিরে যাওয়ার দরকারই পরবে না, মন্দিরে যাবে, সেখানে গিয়ে বলবে তুমিও যা আমিও তাই। কিন্তু যারা সাধক, জীবনটাকে তাৎপর্যময় করতে চাইছে, তাদেরকে যজ্ঞ, দান আর তপস্যা এই তিনটে সব সময় করে যেতে হবে। যারা জীবনে একটু উপরে উঠে গেছে, আধ্যাত্মিক বোধ একটু এসে গেছে, তারাও এটাই করবে কিন্তু তাতে কোন ফলাকাঙ্ক্ষা থাকবে না। কিসের আকাঙ্ক্ষা থাকবে? এটা আমার কর্তব্য তাই করছি, এছাড়া আর কিছু না, শাস্ত্র আমাকে বলে দিয়েছে এগুলো করতে হবে। সাধারণ লোক বলবে, ঠাকুর আমি জপ করছি দেখো আমার ছেলের যেন মঙ্গল হয়। এতেও কোন ভুল নেই, জপ একেবারে না করার থেকে এই ভাবে জপ করা অনেক ভালো।

ফলাকাঙ্ক্ষা রহিত হয়ে যখন এই তিনটে যজ্ঞ, দান, তপঃ করতে শুরু করবে তখন বুঝতে হবে এবার সে আধ্যাত্মিকতার দিকে এগোতে শুরু করল। আগেকার দিনের পণ্ডিতরা কাম্য কর্মকে এর মধ্যে ধরে রেখেছিলেন। কিন্তু পরের দিকে এনারা কাম্য কর্মকে অস্বীকার করে দিয়েছেন, যজ্ঞ, দান আর তপস্যা এই তিনটে কর্ম হয়ে গেল নিত্য ও নৈমত্তিক কর্মের মধ্যে। কাম্য কর্ম, যেটা দিয়ে তোমার ইচ্ছাকে পূরণ করতে চাইছ সেই কর্ম তুমি করবে না। এখন যাদের মনে কামনা বাসনা রয়েছে তারা আর কি করবে, তারা এটাও করবে ঐটাও করবে। এরপর ভগবান তিন রকম ত্যাগের কথা বলছেন –

**নিয়তস্য তু সন্ন্যাসঃ কর্মণো নোপপদ্যতে। মোহাৎ তস্য পরিত্যাগস্তামসঃ পরিকীর্তিতঃ।।৭।।**

যাঁরা জ্ঞানী পুরুষ, আধ্যাত্মিক জগতে অনেক উপরে উঠে গেছেন, এই শ্লোকগুলো তাঁদের জন্য বলা হচ্ছে না, আমাদের মত সাধারণ লোকেদের জন্য ভগবান অর্জুনকে এই শ্লোকগুলো বলছেন। এখানে বলছেন *নিয়তস্য তু সন্ন্যাসঃ*, নিয়ত কর্ম বলতে নিত্যকর্মকে বলছেন। আমাদের মত সাধারণ লোকেদের পক্ষে কোন অবস্থায় এই নিত্যকর্মকে সন্ন্যাস করা চলে না, এটাই গীতার মত। নিত্যকর্ম, যেমন সন্ধ্যাবন্দনাদি, সন্ধ্যাবন্দনা ব্রাহ্মণদের পক্ষে অবশ্যই কর্তব্য। এখানে নিত্য বলা হচ্ছে না, বলছেন নিয়ত কর্ম, মানে জন্মসূত্রে যে কর্তব্য কর্মগুলি আমার কাছে এসে গেছে। তাই নিয়ত কর্মটাই হচ্ছে স্বধর্ম। স্বধর্মের মধ্যে কি কি পড়বে? নিত্যকর্ম, আধ্যাত্মিক উন্মেষের জন্য যা যা দরকার সব কর্ম এর মধ্যে এসে যাবে, নৈমিত্তিক কর্ম, বিশেষ দিনে যে কর্মগুলো করতে বলা হচ্ছে, তৃতীয় হচ্ছে পেশা হিসেবে আমি যে কাজ করছি, যেমন কেউ শিক্ষকতা করছেন, কেউ অফিসে চাকরি করছেন, এইগুলো সব নিয়ত কর্ম। যে কর্মগুলো আমার জন্য নির্ধারিত করে দেওয়া হয়েছে এইগুলোকেই নিয়ত কর্ম বলা হচ্ছে। এই নিয়ত কর্মে আমি কিন্তু কখনই ফাঁকি মারতে পারব না। নিয়ত কর্মের সন্ন্যাসের কথা ভাবাও যেতে পারেনা। তার মানে যাই হয়ে যাক না কেন নিয়ত কর্ম আমাকে করতেই হবে। যদি না করে? তাহলে প্রশ্ন আসবে কেন করবে না? না করার একটাই কারণ। সেটা হচ্ছে মোহে পড়ে

করতে চাইছে না। আমি একজন সরকারি অফিসের কর্মচারী, আমার কাজ হল যে ফাইলগুলো আসছে সেগুলো ভালো করে দেখে সই করে এগিয়ে দেওয়া। আমি এখন ফাইলগুলো আটকে দিলাম, ঘুষ না দিলে ফাইল এগোব না। তার মানে আমি নিয়ত কর্ম থেকে সরে গেলাম। কেন সরে এসেছি? মোহের জন্য, ঘুষ না দিলে ছাড়ব না। এটাও ত্যাগ, তার মানে আমি তো আর কাজ করছি না, কাজ না করাই তো সন্ন্যাস। আমি তো ত্যাগী হয়ে গেলাম। কাজ না করাটাই হল সন্ন্যাস। সরকারী বাবুরা কাজ করছেন না, তাহলে তো তারা পাক্কা সন্ন্যাসী। এই ব্যাপারটাকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এখানে আটকে দিচ্ছেন। তুমি আগে জিজ্ঞেস কর তাদের, তারা কেন কাজটা করছে না। টাকা দিলে করবে? হ্যাঁ করবে। তাহলে মোহের জন্য কাজ করছে না। এরা হল তামসিক ত্যাগী, তার মানে এদের নরকে যাওয়ার রাস্থাটা খুলে গেল। যখনই মোহে পড়ে কর্মত্যাগ করছে তখন সে হচ্ছে তামসিক ত্যাগী।

আবার অনেক সময় বাড়িতে খুব অশান্তি, ছেলেমেয়েকে খাওয়াতে পারছে না, তখন সে সব কিছু ছেড়েছুড়ে সন্ন্যাসী হয়ে চলে গেল। ঠাকুর এটাই কথামৃতে গল্পচ্ছলে বলছেন – সংসারের জ্বালায় জ্বলে সব ছেড়ে দিয়ে কাশীবাসী হয়ে গেল, তারপর কিছু দিন পরে চিঠি লিখছে – আমার এখানে একটা কর্ম হয়েছে, কয়েক দিন পরেই আমি বাড়ি ফিরছি। একে বলা হয় মর্কট বৈরাগ্য। এখানেও সে মোহে পড়ে গেছে, কাজকর্ম করছে না, সন্ন্যাস নিয়ে নিচ্ছে সবই মোহের জন্য। মর্কট বৈরাগ্যের সন্ন্যাসকে কখনই অনুমতি দেওয়া হয় না। এর পরিণাম হচ্ছে অধোগতি, মানুষকে নীচের দিকে নিয়ে যায়। অন্য দিকে রাজসিক ত্যাগ হছে –

**দুঃখমিত্যেব যৎ কর্ম কায়ক্লেশভয়াৎ ত্যজেৎ। স কৃত্বা রাজসং ত্যাগং নৈব ত্যাগফলং লভেৎ।।৮।।**

দ্বিতীয় শ্রেনীর যারা তারা বলে কাজ করাটা যে কি জ্বালা, সকালে উঠে ঘর ঝাড় দেওয়া, ঘর মোছা, বাসন মাজা এগুলো করতে গেলেই গায়ে ব্যাথা এসে যায়। যে কাজটা এখন করতে হবে তখন বলবে, আজ থাক কাল করলে হবে। কাজ না করা মানেই ত্যাগ, কাজ না করা মানেই সন্ন্যাস, কিন্তু শরীরের কষ্ট হবে এই ভয়ে যখন কাজকে সন্ন্যাস দিচ্ছে, তখন এটাকে বলা হচ্ছে রাজসিক ত্যাগ। এই ত্যাগেরও কোন ফল হবে না, আর এই ত্যাগ আমাকে কোথাও নিয়ে যাবে না। একটা হল মোহে পড়ে আমি কাজ করছি না, আরেকটা হল কাজ করলেই খাটনি হবে, গায়ে ব্যাথা হবে, মানে কুঁড়েমি, আলস্যের জন্য যখন কর্মকে ত্যাগ করা হয় তখন সেই ত্যাগকে রাজসিক ত্যাগ বলা হচ্ছে। এই তামসিক ত্যাগ আর রাজসিক ত্যাগ কখনই আমাকে মুক্তির দিকে নিয়ে যেতে পারবে না।

এখানে বুঝতে হবে যে এখানে একদিন দুদিনের ব্যাপারকে নিয়ে কিছু বলা হচ্ছে না, এদের স্বাভাবিক স্বভাবকে নিয়ে বলা হচ্ছে। এখন বাড়িতে কিছু সঙ্কট হয়ে গেছে, সেই সঙ্কট থেকে আমি মনে করলাম আমি সন্ন্যাস নিয়ে নেব, খুব ঠিক কথা। যেই সন্ন্যাসী হয় সেও কিছু না কিছু অভিজ্ঞতা থেকেই সন্ন্যাস নিচ্ছে। ভগবান বুদ্ধ ছিলেন রাজার সন্তান। তিনি একদিন এক বৃদ্ধকে দেখলেন, রোগগ্রস্ত মানুষ দেখলেন, মৃত্যু দেখলেন, সন্ন্যাসী দেখলেন, এগুলো দেখে তাঁর বৈরাগ্য এসে গেল। এগুলো দেখেই তিনি সন্ন্যাসী হয়ে গেলেন। তিনি আবার পরে জাতক কথাতে বলছেন, অনেক জন্ম জন্মান্তর থেকে আস্তে আস্তে সিদ্ধির দিকে এগোচ্ছেন। এখন কেউ যদি কলকাতায় রামকৃষ্ণ সেবাপ্রতিষ্ঠানে যায় সেখানে সে এই চারটে জিনিষকে এক সঙ্গেই দেখতে পাচ্ছে, যে চারটে জিনিষ দেখে ভগবান বুদ্ধের বৈরাগ্য এসে গিয়েছিল। সেবাপ্রতিষ্ঠানে বৃদ্ধকে দেখবেন, অসুস্থ লোক দেখবেন, মরা মানুষও দেখবেন আবার সন্ন্যাসীকেও দেখতে পাবেন। কিন্তু কজনের বুদ্ধের মত বৈরাগ্য হচ্ছে। ভগবান বুদ্ধ ভগবান বুদ্ধই, সবাই আর ভগবান বুদ্ধ হতে পারেন। ঠিক তেমনি শ্মশানে কিছু দেখে নিলে, কিংবা সংসারে খুব জোর একটা আঘাত পেল, কিংবা বিরাট বিশ্বাসঘাতকতা হয়েছে তার সাথে তখন সাময়িক একটা বৈরাগ্য আসবে, সেটা কয়েকদিনের জন্য স্থায়ী হবে। কিন্তু এখানে যেটা বলা হচ্ছে এই জিনিষগুলো স্থায়ী। কাজকর্ম করে না, সরকারী অফিসের বাবু, আসি যাই মাইনে পাই, কাজ করলে উপরি চাই। তামসিক ত্যাগ আর রাজসিক ত্যাগে যাই হয়ে যাক, সে কোনদিন আধ্যাত্মিক হতে পারবে না। আধ্যাত্মিক হওয়ার জন্য দরকার সাত্ত্বিক ত্যাগ। সাত্ত্বিক ত্যাগটা কি?

**কার্যমিত্যেব যৎ কর্ম নিয়তং ক্রিয়তেঽর্জুন। সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলঞ্চৈব স ত্যাগঃ সাত্ত্বিকো মতঃ।।৯।।**

সাত আর আট নং শ্লোক দুটোকে নয় নং শ্লোকে এসে পুরো উল্টে দিচ্ছে, সাত আর আটে বলা হয়েছে ত্যাগের কথা আর নয় নং শ্লোকে বলছে কাজের কথা। এখানে আবার নিয়ত কর্মের কথা বলা হচ্ছে, নিত্যকর্ম বলা হচ্ছে না, নিয়ত কর্ম মানে নির্ধারিত কর্ম। এখানে বলছেন *কার্যমিত্যেব যৎ কর্ম নিয়তং ক্রিয়তেঽর্জুন*, সে সব নিয়ত কর্ম কর্তব্যপরায়ণ হয়ে করে যাচ্ছে। *সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলঞ্চৈব* – কিন্তু ফলের কোন প্রত্যাশা করেনা। বাড়িতে নতুন বউ এসেছে, আসার পর থেকে বউ বাড়ির সব কাজ সামলাচ্ছে, রান্না করা, সবাইকে খেতে দেওয়া, সবার যত্ন নেওয়া, সব করে যাচ্ছে কিন্তু কোন ফলের আশা সে করছে না, শাশুড়ি আমাকে ভালো বলবে, স্বামী আমার প্রশংসা করবে এই ভাব নিয়ে সে কাজ করছে না। কেন করছে? এটাই আমার কাজ, এটাই আমার কর্তব্য। অফিসে যখন আছি তখন অফিসের নির্ধারিত যে কাজ সেটা করাই আমার কর্তব্য। এই ভাব নিয়ে যখন কাজ করছে তখন এটাকে বলা হচ্ছে সাত্ত্বিক ত্যাগ। এখানে এসে শঙ্করাচার্যের বিরোধীরা বলবে – এতক্ষণ তুমি ত্যাগের কথা বলে এলে আর এখানে কাজ করার কথা বলা হচ্ছে, তাহলে একে সাত্ত্বিক ত্যাগ কি করে বলছ? শঙ্করাচার্য তখন বলছেন – কর্মত্যাগ করাটাই ত্যাগ নয়। কর্মফল

ত্যাগই হচ্ছে সাত্ত্বিক ত্যাগ। বাকি দুটো হচ্ছে কর্ম ত্যাগ কিন্তু সাত্ত্বিক ত্যাগে কর্ম ত্যাগ নয়, কর্মফল ত্যাগ। সাত্ত্বিক ত্যাগে কোন কর্ম ত্যাগ হয় না। ত্যাগ হয়, কাম্য কর্ম আর নিষিদ্ধ কর্ম ত্যাগ হয়। কিন্তু নিত্যাকর্ম, নৈমিত্তিক কর্ম, স্বধর্মের কর্ম এই তিনটে মিলিয়ে হচ্ছে নিয়ত কর্ম, নিয়ত কর্ম কখনই ত্যাগ করা যাবে না।

ত্যাগের বিচারে সমস্ত মানুষকে ছয়টি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। সবচেয়ে উপরে রয়েছেন যিনি ব্রহ্মজ্ঞানী বা আত্মজ্ঞানী যিনি নিজের স্বরূপ জেনে গেছেন। দ্বিতীয় হচ্ছে অধিকারী, যাঁরা আধ্যাত্মিক পথে অনেক এগিয়ে গেছেন, মনটা তাঁদের একেবারে শুদ্ধ হয়ে গেছে কিন্তু এখন উপলব্ধি হয়নি, আত্মার সাক্ষাৎকার হয়নি। মনটা এনাদের কি রকম শুদ্ধ হয়ে গেছে? যেটা কঠোপনিষদে বলছেন – *নাবিরতো দুশ্চরিতান্নাশান্তো নাসমাহিতঃ। নাশান্তমানসো বাহপি প্রজ্ঞানেনৈনমাপ্নুয়াৎ*।।১/২/২৪।। যিনি দুশ্চরিত্রতা থেকে সরে এসেছেন, যাঁর মন শান্ত হয়ে গেছে, যাঁর মনে কোন ধরণের চাঞ্চল্যতা নেই, এমনকি আমার কবে জ্ঞানপ্রাপ্তি হবে এই ভাবটাও যার আসেনা, কিন্তু তাঁর জ্ঞান উপলব্ধি এখনও হয়নি, এনারা যদি নিয়ত কর্ম নাও করে এঁদের কোন পাপ লাগবে না। কিন্তু আমাদের দেহ মন কিছুই শান্ত হয়নি, তাই আমাদের এই নিয়ত কর্মগুলো করতে হবে। তৃতীয় হচ্ছে কর্মাধিকারী, যারা গেরুয়া ধারণ করে নিয়েছে কিন্তু আমরা এখনও কর্মাধিকারী। কিন্তু তাদের হচ্ছে ফলত্যাগ, সব কাজ করবে কিন্তু কাজের কোন ধরণের ফলের দিকে মনটা থাকবে না। এখানে থেকে আস্তে আস্তে মনটা পবিত্র হতে থাকবে। পবিত্র হতে হতে দ্বিতীয় শ্রেণীতে যাবে, দ্বিতীয় শ্রেণী থেকে প্রথম শ্রেণীতে যাবে। এর ঠিক নীচেই আসছে চতুর্থ, রাজসিক ত্যাগ। পঞ্চম হচ্ছে তামসিক ত্যাগ। ষষ্ঠ হছে তারও নীচে একেবারে সাধারণ মানুষ, এদের উপর কোন কিছুই খাটে না, শাস্ত্র এদের জন্য নয়। পরের শ্লোকে বলছেন –

**ন দ্বেষ্ট্যকুশলং কর্ম কুশলে নানুষজ্জতে। ত্যাগী সত্ত্বসমাবিষ্টো মেধাবী ছিন্নসংশয়ঃ।।১০।।**

গীতা কখনই নিম্ন শ্রেণীর কিছু নিয়ে আলোচনা করবে না, সব সময় উচ্চ তত্ত্বগুলোকেই গীতা আমাদের সামনে তুলে ধরছে। এখানে বলা হচ্ছে মেধাবী কে? *মেধাবী ছিন্নসংশয়ঃ*, যার সমস্ত সংশয় ছিন্ন হয়ে গেছে সেই মেধাবী, তার মন থেকে সমস্ত সন্দেহ মিটে গেছে, কোন সংশয় আর নেই। মেধাকে আমাদের শাস্ত্রে এইভাবে ব্যাখ্যা করা হয় – *গ্রহণ ধারণ সামর্থম্*। গ্রহণ, আমি কত তাড়াতাড়ি একটা জিনিষকে ভালো ভাবে বুঝে নিতে পারছি। ধারণ, বুঝে নিয়ে সেটাকে ভেতরে কত ভালো ধরে রাখতে পারছি। মেধাতে দুটো জিনিষ দেখতে হয়, কত তাড়াতাড়ি জিনিষটাকে ভালো করে বুঝে নিচ্ছে আর সেই জিনিষটাকে কত ভালো ধরে রাখার সামর্থ তার আছে। এই দুটো ক্ষমতা যদি কারুর মধ্যে থাকে সে যে কোন ক্ষেত্রে সাফল্য পেয়ে যাবে। আধ্যাত্মিক জগতে আমি কাকে মেধাবী বলব? *ন দেষ্টি অকুশলং কর্ম*, যে কোন বাজে কাজ, যেমন কাম্য কর্ম, অপছন্দের কাজও যদি তার সামনে এসে যায়, তখন সেই কর্মের প্রতি তার কোন দ্বেষ হয় না, অসন্তুষ্ট বোধ করেনা। আর *কুশলে নানুসজ্জতে*, আবার যখন মনের মত কাজ বা ভালো কাজ এসে গেলে সেই কাজের প্রতি আসক্তি তাও হয় না। মনের মত কাজ দিলে সবাই করতে পারবে। গাধাকে যদি মাঠে ঘাস খেতে ছেড়ে দেওয়া হয় সেতো মাঠে চরে বেড়াবে এতে আশ্চর্যের কি আছে। মনের মত কাজ বিরাট কিছু করছে এতো সে করবেই, এটা তো জানা কথা। কিন্তু যারা ঠিক ঠিক মেধাবী তারা কখন বিচার করে না, যে এটা আমার মনের মত কাজ আর এটা আমার মনের মত কাজ নয়, মনের মত কাজকে বেশি ভালো ভাবে করবে, যেটা মনের মত কাজ নয় সেটাকে অত মন দিয়ে করবে না, এই ধরণের মনোভাব মেধাবীর কখনই থাকে না। *ত্যাগী সত্ত্বসমাবিষ্টো*, এরাই হল সাত্ত্বিক ত্যাগী, এরাই ঠিক ঠিক সাত্ত্বিক ভাবে প্রতিষ্ঠিত। কোন এক সেন্টারে এক মহারাজ ছিলেন, তিনি প্রচুর জপ-ধ্যান করতেন, জপ-ধ্যান নিয়েই তিনি সারাটা সময় কাটিয়ে দিতেন, খুব বেশি কাজে জড়াতেন না। কেন জড়াতেন না? তাঁর কোন কিছু চাওয়া-পাওয়া ছিল না। সেই সেন্টারে বাইরে থেকে এক সিনিয়র মহারাজ এসেছেন, তিনি সেখান থেকে ফিরে যাবেন। সন্ধ্যে বেলা তাঁকে হাওড়া স্টেশনে ছেড়ে আসতে একজনকে তাঁর সাথে যেতে হবে। কিন্তু এমনই কপাল যে সেদিন সেই সেন্টারে এমন কোন মহারাজ ছিলেন না যে তাঁকে হাওড়া স্টেশনে ছেড়ে দিয়ে আসবে। ঐ মহারাজকে যখন ব্যাপারটা জানান হল তক্ষুণি তিনি কাঁধে চাদরটা ফেলে নিজের জপ-ধ্যান ফেলে দিয়ে ওনাকে নিয়ে হাওড়া স্টেশনে ছাড়তে চলে গেলেন। এই হচ্ছে *ন দ্বেষ্ট্যকুশলং কর্ম কুশলে নানুসজ্জতে*। শুভ কাজ হোক আর অশুভ কাজই হোক, পছন্দের কাজ হোক আর অপছন্দের কাজই হোক, কোন কাজের প্রতি তার বিদ্বেষ থাকবে না আবার প্রীতিও থাকবে না।

কর্মযোগ হচ্ছে এটাই যেটা এতক্ষণ আলোচনা করা হল, সাত্ত্বিক ত্যাগ। এইভাবে প্রথমে প্রচুর কাজ করবে, কাজ করতে করতে আস্তে আস্তে সে কর্মফল থেকে নিজেকে আলাদা করে নেয়। কর্মফল ত্যাগ করে এমন একটা অবস্থায় সে পৌঁছে যায়, যেখানে এসে রাজসিক ও তামসিক ত্যাগ বাদ হয়ে যায়। এখন যা কাজ আসছে সেই কাজই করে দেবে। ঠাকুর বলছেন কর্মযোগ কি, যে কাজটা না করলেই নয়, যে কাজটা সামনে পড়ে গেল সেই কাজটা করে দিল, এর বাইরে তার আর কোন আগ্রহ নেই, বিশেষ করে নিজের তরফ থেকে কোন আগ্রহ থাকে না। এইভাবে কর্ম করতে করতে তার অন্তঃকরণ একেবারে শুদ্ধ পবিত্র হয়ে যায়। অন্তঃকরণের শুদ্ধিকরণ হচ্ছে কিনা তার পরীক্ষা হচ্ছে, অন্যের মনে কি ভাব উঠছে পরিষ্কার বুঝতে পারা যায়। এটাই হচ্ছে প্রথম ধাপ, এইভাবে কর্ম করে করে তার অন্তঃকরণ শুদ্ধ হয়ে যায়। দ্বিতীয় ধাপে, শাস্ত্র অধ্যয়ণ করে করে বা শাস্ত্র শ্রবণ করে করে নিজের যে স্বরূপ, মানে তত্ত্বজ্ঞানটা পরিষ্কার হয়ে যায়। নিজের স্বরূপ কি? আমি সেই শুদ্ধ আত্মা, আমার জন্ম-মৃত্যু নেই, আমার বাস্তবিক স্বরূপ হচ্ছে আমি

শ্রীরামকৃষ্ণের সাথে অভেদ। এই তত্ত্বজ্ঞানটা সে বুঝে নেয়, কিন্তু এখনও তার অপরোক্ষানুভূতি হয়নি, কারণ অপরোক্ষানুভূতিতে সে পরিষ্কার দেখতে পায়। কি দেখতে পায়? ঠাকুর বলছেন – নারকেলের সব জল শুকিয়ে গেলে যেমন শাঁস আলাদা খোল আলাদা হয়ে যায়, নাড়ালে ঢপর ঢপর করে, ঠিক তেমনি পরিষ্কার বোঝা যায় দেহ আলাদা আত্মা আলাদা। এখন তা নৈষ্কর্ম্যলক্ষণ হয়ে গেল, জগতের কোন কিছুতেই তার আর আগ্রহ নেই, সে নিশ্চুপ হয়ে বসে আছে। চরম উপলব্ধি যখন হয়ে গেলে তখন আর কোন কিছুই তাকে টানতে পারবে না। টানবে, যখন লোকসংগ্রহের জন্য, অপরের দুঃখ-কষ্ট দেখে তার ভালো করার জন্য কাজ করবেন। মথুরের সঙ্গে ঠাকুর তীর্থ দর্শনে বৈদ্যনাথধামে গেছেন, সেখানকার লোকেদের দুরবস্থা দেখে মথুরকে বললেন এদেরকে এক মাথা তেল আর পেট ভরে খাওয়াতে। কর্ম বলতে যেমন বুঝি ঠাকুরের এটাকে সেই হিসাবে কর্ম বলা যাবে না, লোকেদের দেখে ঠাকুরের করুণার উদ্রেক হল, অতটুকু মথুরকে দিয়ে করিয়ে দিলেন, তাতে ঠাকুরে মনে ঐ যে করুণার ভাবটা এসেছিল সেটা মিটে গেল। ঠাকুর অবতার, তিনি তার রসদ্দারকে দিয়ে তো ঐখানে কাঙালীদের খাওয়ালেন কিন্তু তাই বলে কি এখন সাঁওতালপরগণাতে কোন অভাব নেই? এখনও সেখানকার আদিবাসীরা যেমন কাঙালী ছিল তেমন কাঙালীই আছে। জগৎ এই রকমই থাকবে, জগৎ পাল্টাবার জায়গা নয়। যিনি আত্মজ্ঞানী জীবের দুঃখ-কষ্ট দেখে তার মনে করুণার উদয় হয়, ঠাকুরের মনেও করুণার ভাব জাগল, করুণার ভাব জাগল তাইতে তিনি অতটুকু করে দিলেন, ওটা ঐখানেই শেষ, এরপর এর কোন অর্থ খুঁজতে যাওয়াটা ঠিক হবে না। স্বামীজী যেটা করেছিলেন, ওনার মিশনই ছিল আলাদা, ওনার মিশন ছিল এমন একটা মেশিন বানাব যেটা চলতেই থাকবে সমস্ত লোকের মঙ্গলের জন্য। একটা দুটো বড় কাজ করেই এই মেশিন থমকে যাবে না। স্বামীজীর সেই মেশিন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন রূপে চলছে।

যার এখনও দেহবুদ্ধি আছে, আমি বোধ যার আছে, যার এখনও ক্ষিদে পায়, জলতেষ্টা পায়, শীতগ্রীষ্মের অনুভূতি হয়, তাদের কিন্তু কাজ করতেই হবে। আগে বলা হয়েছে, যিনি আত্মজ্ঞানী, তাঁর লক্ষণ হচ্ছে নৈষ্কর্মসিদ্ধি, তিনি কোন কাজ করবেন না। কিন্তু যাদের শরীর বোধ আছে তাদের কাজ ত্যাগ করলে চলবে না। সেটাই ভগবান পরের শ্লোকে বলছেন –

**ন হি দেহভৃতা শক্যং ত্যক্তুং কর্মাণ্যশেষতঃ। যস্তু কর্মফলত্যাগী স ত্যাগীত্যভিধীয়তে।।১১।।**

যার একটুও শরীর বোধ আছে সে যদি কর্মত্যাগ করেছে তো সে মরেছে, তার একটুও কর্ম ত্যাগ করা চলবে না, প্রত্যেকটি কর্তব্য কর্ম তাকে অবশ্যই করতে হবে। দেহবোধ থেকে কাজ করার পরেও যদি সে কর্মফল ত্যাগ করে তাহলেই আমরা তাকে ত্যাগী বলতে পারব। এখান থেকে ধীরে ধীরে ভগবান সন্ন্যাস আর ত্যাগের পার্থক্যটাকে তুলে ধরছেন। সন্ন্যাসী কে? যিনি সব কাজ করা ছেড়ে দিয়েছেন। কেন সে কর্ম করা ছেড়ে দিয়েছে? সে আগের আগের জন্মে কর্মযোগ করে এসেছে, বা এই জন্মেই কর্মযোগ করে মনটাকে একেবারে শুদ্ধ করে নিয়েছে। মন একেবারে শুদ্ধ হয়ে গেছে আর আত্মার অস্তিত্ব, আর তার স্বরূপ যে সেই আত্মা, এর ওপর তার দৃঢ় আস্থা এসে গেছে। এখন এর কোন কামনা-বাসনা নেই, ভয় নেই, কামনা-বাসনা না থাকলে সে কাজ করতে যাবে কেন। মানুষ কাজ করে কেন? কোন জিনিষ প্রিয় সেটাকে পেতে চাইছে আর কোন জিনিষ অপ্রিয় সেটা থেকে পালাতে চাইছে, এই রাগ আর দ্বেষের বশবর্তী হয়েই তাকে কাজ করতে হচ্ছে। যে সন্ন্যাসী তার মন পরিশুদ্ধ হয়ে গেছে, কর্মযোগ করে নিয়েছে, আত্মার সম্বন্ধে তার জ্ঞান হয়ে গেছে, এখন সে কেন কাজ করতে যাবে। তার জ্ঞাননিষ্ঠা হয়ে গেছে, তাকে আর কাজ করতে হবে না, এরা হয়ে গেল সন্ন্যাসী। এবার দ্বিতীয় শ্রেণী যারা তাদের মন এখনও শুদ্ধ হয়নি। কারুর অন্তঃকরণ শুদ্ধ হয়েছে কিনা আমি কি করে বুঝব? খুবই সহজ, খিদে পেলে মন ছটফট করে কিনা, খুব ঠাণ্ডায় বা খুব গরমে কাতর হয়ে পড়ছে কিনা, মন কতটা চঞ্চল হচ্ছে, যদি এগুলো সবই হচ্ছে তাহলে বুঝতে হবে তোমার মন এখনও পরিষ্কার হয়নি। এর পর আরও কিছু কিছু লক্ষণ আছে যেগুলো সচরাচর ধরা যায় না, যেমন অপরের জিনিষ দেখে আমার লোভ হচ্ছে কিনা। কিন্তু খাওয়া-দাওয়া, শীত ও গরমে এটা বোঝা যায়। ঠাকুর বলছেন – খিদে তো মানুষ মাত্রেরই হবে, এখন ভাত-ঝোল তৃপ্তি সহকারে আমি খেয়ে পেট ভরাতে পারছি কিনা, যতটুকু না হলে নয় ততটুকুতেই খুশি। শরীরের ধর্ম শীতকালে শীত করবেই, গরমে শরীর হাঁসফাঁস করবেই। ঠাকুরেরও খুব শীত করত, একবারতো তিনি বলছেন মাফলারটা কেটে মোজা করা যায় কিনা, তার মানে তাঁর পায়ে খুব ঠাণ্ডা লাগত, সেই ঠাণ্ডাটাকে কিভাবে আটকান যায় ভাবতেন। কিন্তু দেখতে হবে যেটুকু দরকার সেটুকুতে সব মিটে যাচ্ছে কিনা।

*দেহভৃতা* বলতে বলা হচ্ছে যাদের দেহবোধ আছে কিন্তু ব্যপক অর্থে ধরলে *দেহভৃতার* আরেকটি অর্থ হচ্ছে যারা নিজের দেহকেই আত্মা বলে মনে করে। যারা অত্যন্ত মূঢ় তারা বলে মম পুত্র মম আত্মা, আমার সন্তানই আমার আত্মা। সেইজন্য হিন্দু সম্প্রদায়ে পুত্র কামনা প্রচণ্ড ভাবে এসে গেছে। জীব মাত্রেই যে প্রবল ইচ্ছা যেটা, সেটা হচ্ছে মৈথুন করা। কিন্তু হিন্দু সম্প্রদায়ে যখন বিবাহ করা হয় তখন সেখানে উদ্দেশ্যই হচ্ছে পুত্রপ্রাপ্তি, কারণ পুত্রপ্রাপ্ত হচ্ছে তরোতি, আমি বিস্তার পেলাম। কিভাবে বিস্তার পেলাম? আমার পুত্রের মাধ্যমে, সেইজন্য আমার পুত্র আমার আত্মা। এর বাইরে যখন অন্য রকম হয় তখন বলে আমার দেহটাই আমার আত্মা। এটা হল আসুরিক বৃত্তি, অসুর যারা তারা মনে করে আমার দেহ, আমার ইন্দ্রিয়ই আমার আত্মা। বেশির ভাগ মানুষই এই ধরণের, কত রকমের স্প্রে, কত রকমের পাউডার, কসমেটিক দিয়ে দেহকে সাজাচ্ছে, কারণ এদের কাছে দেহটাই সব কিছু। চিন্তা ভাবনায় যখন পরিবর্তন আসে তখন আস্তে আস্তে এগোতে থাকে, কেউ প্রাণকে আত্মা বলে, কেউ মন-বুদ্ধিকে আত্মা বলে। চিন্তা

ভাবনার পরিবর্তন হতে হতে একটা সময় জীবাত্মাকে আত্মা বলছে। সবার শেষে দেখে সর্বব্যাপী আত্মা। *দেহভৃতা* মানে দেহকেই আত্মা বলে মনে করা, তার মানে দেহের যা ধর্ম তার সঙ্গে নিজেকে একাত্ম করে ফেলছে। যখন খুব গরম লাগছে তখন বলছে আমার গরম লাগছে, যখন খুব ঠাণ্ডা তখন বলছে ঠাণ্ডায় আমি জমে যাচ্ছি, তখন এই বোধ থাকে না যে এগুলো দেহের কষ্ট। দেহভৃতার আরেকটি অর্থ দেহাভিমানী, যার শরীরবোধ প্রচণ্ড। জগতের বেশির ভাগ মানুষই দেহাভিমানী। দেহাভিমানীর কাজ করতে হবে, কাজ না করলে এদের চিত্তশুদ্ধ হবে না। প্রচুর কাজ করতে করতে, কিভাবে করবে, যজ্ঞ, দান আর তপস্যা, এইগুলো করতে করতে একটা সময় থেকে মন শুদ্ধ ও অনাসক্ত হতে শুরু করে। যত মন শুদ্ধ হতে থাকবে ততই তাকে যজ্ঞ, দান আর তপস্যা করে যেতে হবে। শেষে গিয়ে যখন দেখবে তার মন একেবারে শুদ্ধ হয়ে গেছে, এখন আর তার মনে কোন ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষা নেই, আত্মার যে তত্ত্ব সেটা বুঝে গেছে, তখন সে কাজ করা আস্তে আস্তে বন্ধ করে দেয়। কাজ বন্ধ করে কি করে? তখন আত্মচিন্তনে মনটাকে বেশি করে নিবিষ্ট করে।

যখন দেহাভিমানীরা কর্মফল ত্যাগ করা আরম্ভ করে, সব কাজ শেষ করে ঠাকুরের কাছে গিয়ে বলছে, ঠাকুর তোমাকে আমার সব কর্মের ফল সমর্পণ করলাম, তখন ফল সমর্পণ করতে করতে দেহাভিমানীর মনটাও শুদ্ধ হতে থাকে। যখন সব কর্মের ফল ত্যাগ করে দেয় তখন কি হয়?

**অনিষ্টমিষ্টং মিশ্রঞ্চ ত্রিবিধং কর্মণঃ ফলম্। ভবত্যত্যাগিনাং প্রেত্য ন তু সন্ন্যাসিনাং ক্বচিৎ।।১২।।**

যারা সন্ন্যাসী, যারা সব কর্মের ফল ত্যাগ করে দিয়েছেন, তাদের আর কোন কর্মের ফল স্পর্শ করতে পারেনা। এখন সে মানুষকে মেরে ফেলুক, যাই করুক তার কোন ফল হবেই না। কেন হবে না? শ্রীকৃষ্ণ, কত লোককে মারলেন, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে কত মিথ্যা কথা বলছেন, যুদ্ধে কত লোককে মারিয়ে দিলেন, রাসলীলা করলেন কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে কোন বিকার নেই, সম্পূর্ণ নিস্পৃহ। শ্রীরামচন্দ্র, অত বিশাল লঙ্কার সেনা সমূহকে শেষ করে দিলেন, বালিকে লুকিয়ে হত্যা করলেন, সীতাকে বনবাসে পাঠিয়ে দিলেন, কিন্তু তাঁর মন সব সময় একেবারে শান্ত। কেন? এই জিনিষটাই এখানে আলোচনা করা হচ্ছে, কেন শান্ত হয়। সম্পূর্ণ অনাসক্ত। এনাদের কোন কর্মফলই স্পর্শ করছে না। কিন্তু বাকীদের ক্ষেত্রে তিন রকমের কর্মফল হয় – ইষ্ট, অনিষ্ট আর মিশ্র। ইষ্ট মানে ভালো, এই কর্মফলে মানুষ মৃত্যুর পর দেবাতাদি লোকে গিয়ে জন্ম গ্রহণ করে। অনিষ্টম, যখন খারাপ কাজ, নিষিদ্ধ কর্মাদি করল তখন মৃত্যুর পর নিম্নযোনিতে গিয়ে জন্ম নেয়। মিশ্রম্, কর্মফলে ভালো মন্দ মেশানো আছে, এই কর্মফলে মানুষ যোনিতে গিয়ে জন্ম গ্রহণ করে, মানুষের মধ্যে সব রকমের কর্মফল মেশানো থাকে। কিন্তু যারা সন্ন্যাসী, যারা কর্মফলত্যাগী এদের কিছুই স্পর্শ করে না। কর্ম করলেই ভেতরে একটা ছাপ পড়ে, সন্ন্যাসী এই ছাপটাকে ভেতর পর্যন্ত আসতে দেন না। আমাদের যখন আসক্তি থাকে তখন মনের উপর যেন একটা কালির প্রলেপ লাগানো থাকে, কালির মধ্যে ঐ ছাপটা পড়ছে বলে সেই অনুসারে আমাদের জন্মাদি হয়। যদি ঐ কালিটা কাঁচ থেকে মুছে দেওয়া হয় তখন আর ছাপ পড়ে না। মন যখন ঐ রকম কাঁচের মত স্বচ্ছ হয়ে যায় তখন আমি কাউকে হত্যা করছি, কি চুরি করছি তাতে কিছুই ছাপ পড়ে না। *ভবত্যত্যাগিনাং প্রেত্য*, মৃত্যুর পর যে ফল প্রাপ্তি হয় সেটা একমাত্র অজ্ঞ সাধারণ জীবেরই হয়। জন্মান্তরের যে নিয়ম, মৃত্যুর পর স্বর্গে কি নরকে যাওয়া আসা এটা উচ্চকোটি ও সন্ন্যাসীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় না। এরপর থেকে কাজ কিভাবে হয়, কর্মকে কাঁটাছেড়া করা হচ্ছে –

**পঞ্চৈমানি মহাবাহো কারণানি নিবোধ মে। সাংখ্যে কৃতান্তে প্রোক্তানি সিদ্ধয়ে সর্বকর্মণাম্।।১৩।।**

ভগবান বলছেন যে কোন কর্মের পেছনে পাঁচটি কারণ থাকে। ভারত পাকিস্থানকে আক্রমণ করতে চাইছে। তার আগে ভারতকে পাকিস্থানের পুরো মানচিত্রটাকে জানতে হবে, তার কোথায় কোথায় অস্ত্র মজুত করা আছে, কি কি অস্ত্র পাকিস্থানের অস্ত্রভাণ্ডারে রাখা আছে, সৈন্যবল কতখানি এগুলো না জানা পর্যন্ত শত্রুকে পর্যুদস্ত করা যাবে না। আমি শাস্ত্র শুনে, শাস্ত্র অধ্যয়ণ করে, সাধু সঙ্গ করে বুঝতে পারছি যে আমাকে এই সংসার রূপ জঞ্জাল থেকে বেরোতে হবে। এই সংসারের উৎস কে? অবিদ্যা। অবিদ্যাকে আমি নাশ করতে পারবো না, তারপর রইল কামনা-বাসনা, কামনা-বাসনাকেও সরাসরি আক্রমণ করে শেষ করে দেওয়া দুঃসাধ্য, শেষে পড়ে রইল কর্ম। এখন আমাকে এই কর্মকে আক্রমণ করতে হবে। তাহলে কর্মের পুরো রূপরেখাকে আগে আমাকে জানতে হবে। ভগবান সেটাই এখানে করছেন, কর্মের পুরো মানচিত্রটা আমাদের সামনে দিয়ে দিচ্ছেন। বলছেন – *পঞ্চৈমানি মহাবাহো কারণানি নিবোধ মে*, কর্মের পেছনে পাঁচটা কারণ আছে। *সাংখ্যে কৃতান্তে প্রোক্তানি সিদ্ধয়ে সর্বকর্মণাম্*, এখানে যে সাংখ্যের কথা ভগবান বলছেন, শঙ্করাচার্য এই সাংখ্যকে বেদান্তের অর্থেই গ্রহণ করেছেন আবার এই সাংখ্যকে কপিল মুনির দর্শন সাংখ্য মত হিসাবেও নিয়েছেন। শঙ্করাচার্য সাংখ্যকে সঠিক জ্ঞান এই ভাবে অনুবাদ করেছেন আর বেদান্ত হল সেই সঠিক জ্ঞানের তত্ত্ব। ভগবান বলছেন সাংখ্য ও বেদান্তেও যে কোন কর্মের পশ্চাতে পাঁচটি কারণ বলা হয়েছে। যখন আমরা কোন কাজ করি তখন মনে করি আমি কাজ করছি। এখানে আমি বলতে বোঝায় নিজের আত্মাকে। আমাদের পরম্পরাতে কোন কোন পণ্ডিত ছিলেন, বিশেষ করে নৈয়ায়িকরা, তারা মনে করেন যখন কোন কাজ করা হয় তখন আত্মার উপর সে কাজের ছাপ পড়ে। আবার অনেকে মনে করেন তা

কেন হবে, শরীর দিয়েই কাজ হয়, তারজন্য আর অন্য কিছুর দরকার হয় না। কিন্তু গীতা বলছে না, কাজ যখন হয় তখন প্রত্যেক কাজের পেছনে পাঁচটা কারণ থাকে। এই পাঁচটি কারণ যখন থাকে তখনই কোন কাজ হতে পারে। সেগুলো কি কি?

**অধিষ্ঠানং তথা কর্তা করণঞ্চ পৃথগ্বিধম্। বিবিধাশ্চ পৃথক্ চেষ্টা দৈবঞ্চৈবাত্র পঞ্চমম্।।১৪।।**
**শরীরবাঙ্মনোভির্যৎ কর্ম প্রারভতে নরঃ। ন্যায্যং বা বিপরীতং বা পঞ্চৈতে তস্য হেতবঃ।।১৫।।**

যে কোন কাজই করা হোক না কেন, ভালো মন্দ, নিষিদ্ধ বা অনুমোদিত যে কোন কর্মই হোক না কেন, আর সেই কর্ম শরীর দিয়েই হোক, মন দিয়েই হোক বা বাক্য বা কথা দিয়েই হোক, এই সমস্ত কর্মের পেছনে পাঁচটা কারণকে থাকতেই হবে।

*অধিষ্ঠানং তথা কর্তা,* অধিষ্ঠান হচ্ছে শেষ আশ্রয়, মানে এই শরীর, এই শরীরকে অধিষ্ঠান বলা হচ্ছে। যে কোন কাজের জন্য শরীর হচ্ছে একটা গুরুত্বপূর্ণ কারণ। যার জন্য শরীরে কোন ব্যাধি, বার্ধক্য এসে গেলে আর ভালো ভাবে কাজ করা যায় না। *তথা কর্তা,* এখানে কর্তা জীবাত্মাকে বলা হচ্ছে। মানুষ যখন মরে যায় তখন শরীরটা তো থেকে যাচ্ছে কিন্তু সেই শরীর দিয়ে তো কোন কাজ করতে পারছে না। কেন কাজ করতে পারছে না? কারণ ঐ শরীরের জীবাত্মা নেই। সেইজন্য কাজের জন্য শরীরকেও থাকতে হবে জীবাত্মাকেও থাকতে হবে। জীবাত্মা হচ্ছে চৈতন্য। জীবাত্মা আছেন বলেই শরীর কাজ করতে পারে। যেমন এই পাখা, ইলেক্ট্রিসিটি যদি চলে যায় পাখা থাকবে কিন্তু ঘুরবে না, ঠিক তেমনি শরীরটা হচ্ছে পাখার মত, জীবাত্মা ইলেক্ট্রিসিটি। জীবাত্মা আছেন বলেই শরীর চলছে। অধিষ্ঠান শরীর, কর্তা জীবাত্মা এই দুটো কারণ হয়ে গেল। তৃতীয় হচ্ছে *করণম্,* করণ হচ্ছে যেটা দিয়ে কাজ করা হয়, যতগুলো আমাদের ইন্দ্রিয় আছে, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি এরা হচ্ছে করণ। শরীর আছে, জীবাত্মাও আছে কিন্তু ইন্দ্রিয় যদি না থাকে যেমন যদি কারুর দুটো হাতই কাটা থাকে তাহলে সে কতকগুলো কাজ করতে পারবে না। *বিবিধাশ্চ পৃথক্ চেষ্টা,* চেষ্টা বলতে বোঝায় প্রাণশক্তি। শরীর আছে, জীবাত্মা আছে, ইন্দ্রিয় আছে কিন্তু প্রাণ শক্তি তার নেই তাহলে তার কাজ করার ক্ষমতা থাকবে না। খাওয়া-দাওয়া ভালো ভাবে না করলে প্রাণশক্তিটা কমে যায়। সুনিয়ন্ত্রিত শ্বাস-প্রশ্বাস নিচ্ছে না, শ্বাস-প্রশ্বাস প্রাণশক্তির উপর নির্ভর করে। ভুজ্য খাদ্যদ্রব্যের যে হজম হয় সেই হজম শক্তি প্রাণশক্তির উপর নির্ভর করে। তাই প্রাণশক্তি যদি ঠিক না থাকে তাহলে কাজ করা সম্ভব হবে না। সেইজন্য অল্প বয়সে মানুষ প্রচুর কাজ করতে পারে। চব্বিশ পচিশ বছরে যে প্রাণশক্তি থাকে তাতে সেই বয়সের ছেলে-মেয়েরা প্রচুর কাজ করে, আবার যখন আশি বছর বয়সে চলে যাচ্ছে তখন সবই এক থাকছে কিন্তু প্রাণশক্তি কমে আসছে বলে আগের মত কাজ করতে পারেনা। পঞ্চম কারণ হচ্ছে *দৈবঞ্চৈবাত্র পঞ্চমম্* - দৈব হচ্ছে পঞ্চম কারণ। দৈব বলতে এখানে বোঝাচ্ছে, আমাদের যতগুলো ইন্দ্রিয় আছে প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের একজন অধিষ্ঠাত্রী দেবতা আছেন। যেমন চোখ, এখানে বাইরের এই চোখকে বলা হচ্ছে না, আমাদের স্নায়ুকেন্দ্রের ভেতরে যে চোখ আছে সেই চোখের দেবতা হলেন সূর্য, চোখের অধিষ্ঠান দেবতা হলেন সূর্য দেবতা। এখন যদি কোন কারণে সূর্য দেবতা আমার উপর রুষ্ট বা কুপিত হয়ে যান, তখন আমার অধিষ্ঠান মানে শরীর ঠিক আছে, কর্তা জীবাত্মা আছেন, সব কটি করণ মানে ইন্দ্রিয়গুলো সব আছে, প্রাণশক্তি পুরো আছে কিন্তু দেবতা আমার উপর বিরূপ। তখন চোখ থাকতেও আমি দেখতে পারবো না। মনের দেবতা হলেন চন্দ্রমা, তেমনি এই শরীরের অধিষ্ঠাত্রি দেবী হচ্ছেন পৃথ্বি, ভগবান বলছেন, এই যে দেবতা বা দেবী একসঙ্গে *দৈবম্* বলা হচ্ছে, এই *দৈবম্* যদি বিরূপ থাকে তাহলে কিন্তু আমাদের কাজ হবে না। এখানে ইন্দ্রিয় বলতে বাইরের ইন্দ্রিয়গুলিকে বলা হচ্ছে না, এগুলোকে বলা হয় গোলক, গোলকের দোষত্রুটি থাকতে পারে, কিন্তু আসল ইন্দ্রিয় আলাদা, সেগুলো আমাদের মস্তিষ্কের স্নায়ুকেন্দ্রে থাকে। সেই সব ইন্দ্রিয়ের আবার প্রত্যেকটির দেবতা আছে, সেইজন্য দেবতা যদি বিরূপ থাকেন, আমাদের বাকি সব কিছু ঠিক থাকলেও কাজ করা যাবে না। হিন্দুধর্মের চিন্তাধারাতে এটি একটি খুব প্রসিদ্ধ মত। আমরা যে বিভিন্ন দেব-দেবীর পূজা করি সেটা করা হয় ইন্দ্রিয়ের শক্তি বৃদ্ধির জন্য। কিন্তু এর সাথে আধ্যাত্মিকতার কোন সম্পর্ক নেই। এই পাঁচটা কারণ যদি ঠিক থাকে তাহলে কর্মে সিদ্ধি হবেই।

এখানে অনেকে জীবাত্মা আর আত্মার সাথে গোলমাল করে ফেলে। শাস্ত্রে আত্মা বলতে অনেক কিছু বোঝায়, একটা হচ্ছে অখণ্ড সচ্চিদানন্দ। এখানে সেই সচ্চিদানন্দকে বলা হচ্ছে না। কিন্তু আত্মা যখন অজ্ঞানবশতঃ শরীরের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে একাত্ম হয়ে শরীর ও ইন্দ্রিয়ের ধর্মকে নিজের ধর্ম মনে করছে তখন তাকে জীবাত্মা বলা হয়। আমার আমি বোধে আমি নিজেকে অমুক নামের এক ব্যক্তি বলে মনে করছি, কিন্তু এই ডাস্টারের এই বোধ নেই। আমার আমি বোধ হচ্ছে কিন্তু এই ডাস্টারের আমি বোধ হচ্ছে না, এই আমি বোধটাই আমাকে এই ডাস্টার থেকে আলাদা করে দিচ্ছে এর পেছনে কারণটা কোথায়? কারণটা হচ্ছে, আমার মধ্যে যে শুদ্ধ চৈতন্য আছে সেই এই দেহ আর ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে একাত্ম হয়ে এই আমি বোধ হচ্ছে। একেই জীবাত্মা বলা হয়। জীবাত্মাকে কখনই শুদ্ধ আত্মা বলা হয় না, কারণ শুদ্ধ আত্মা কখনই কারুর সাথে একাত্ম বোধ করেন না। ঐ শুদ্ধ আত্মা যখন অজ্ঞান আচ্ছাদিত হয়ে যান, তখন বিভিন্ন জিনিষের সাথে নিজেকে একাত্ম অনুভব করতে থাকে। আত্মা হচ্ছেন শুদ্ধ চৈতন্য, সমস্ত রকমের উপাধি শূন্য, কিন্তু এই শুদ্ধ আত্মার উপর যখন উপাধি এসে যায় তখনই তাঁকে জীবাত্মা বলা হয়। বাস্তবে জীবাত্মা হচ্ছে সেই সচ্চিদানন্দই কিন্তু অজ্ঞান আচ্ছাদিত। এই অজ্ঞানকে কাটাবার জন্যই এত শাস্ত্র, এত আলোচনা চলছে। এই জীবাত্মা আছে বলেই

এই শরীরটা চলছে। কিন্তু জীবাত্মা কোন কিছুর সাথে জড়ায় না, আর একা কিছুই করতে পারেনা। এই পাঁচটা কারণ যদি থাকে তবেই কোন কাজ হয়। এই পাঁচটা কারণের মধ্যে একটাও যদি হারিয়ে যায় তাহলে কাজ কিন্তু হবে না।

২৭শে নভেম্বর, ২০১০

মানুষের যা কিছু দুঃখ-কষ্ট, যা কিছু শোক এর সব কিছুর মূলে রয়েছে কামনা-বাসনা। কামনা-বাসনাই মানুষকে কর্মে প্রেরিত করছে। কর্ম যখন করছে, তখন ঐ কর্ম থেকে আরও কামনা-বাসনার জন্ম নেয়। যতক্ষণ অবিদ্যার নাশ না করতে পারছে, অর্থাৎ জ্ঞান প্রাপ্তি যতক্ষণ না হচ্ছে ততক্ষণ তাকে কষ্ট ভোগ করে যেতে হবে। এই অবিদ্যার নাশ করা যাবে না, অন্য দিকে তার মনে কামনা-বাসনাও গেঁড়ে বসে আছে, সেগুলোকেও সহজে উপড়ে ফেলা যাবে না। একমাত্র পথ হচ্ছে কর্মকে ঠিক করা। একটা বৃক্ষকে যখন কাটতে যাব তখন আমাকে জানতে হবে এটা কি গাছ, এই গাছের গোড়া, কাণ্ড কতখানি শক্তপোক্ত, কিভাবে কাটলে সুবিধা হবে। কর্মকে ঠিক করতে যাওয়ার আগে কর্মের পুরো ব্যাপারটা আমাকে জানতে হবে। গীতাতে আচার্য শঙ্কর তাই কর্মের পুরো বিশ্লেষণ করছেন। আচার্য গীতাকেই আশ্রয় করে কর্মের বিশ্লেষণ করে বলছেন – যে কোন কর্ম পাঁচটা বিষয়কে আশ্রয় করেই সম্পন্ন হয়। এই পাঁচটি আশ্রয় হল – অধিষ্ঠান, মানে এই শরীর, কর্তা, মানে শুদ্ধাত্মা যিনি শরীর, মন, ইন্দ্রিয়ের সাথে একাত্ম অনুভব করছেন, করণ হল আমাদের যত ইন্দ্রিয়গুলো, পৃথক চেষ্টা, চেষ্টা হচ্ছে প্রাণশক্তি যেখান থেকে কর্ম করতে যে শক্তির দরকার সেটা আসে আর শেষে হচ্ছে দৈবম্, দৈব হচ্ছে প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের যারা অভিমানী দেবতা, যে দেবতার উপস্থিতিতে ইন্দ্রিয়গুলো কাজ করছে। এগুলো আমরা এর আগে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করেছি। এর পর বলছেন –

**তত্রৈবং সতি কর্তারমাত্মানং কেবলন্তু যঃ। পশ্যত্যকৃতবুদ্ধিত্বান্ন স পশ্যতি দুর্মতিঃ।।১৬।।**

বলছেন যাদের বুদ্ধি পরিষ্কার হয়েছে, কিভাবে পরিষ্কার হয়েছে? আচার্যের মুখে শাস্ত্রের কথা শুনে শুনে এবং শাস্ত্রের কথা চিন্তন করতে করতে সে বুঝতে পারছে আত্মা কোন কাজ করেন না, আর আমি সেই আত্মা। এই যে কর্ম করা হচ্ছে এই কর্ম আমি করছি না। তাহলে কে করছে? এই পাঁচটা জিনিষই কাজ করছে। এই পাঁচটি হল – শরীর, ইন্দ্রিয় আর প্রাণ একদিকে এই তিনটে আর জীবাত্মা ও দেবতা অন্য দিকে এই দুই। এই পাঁচজন মিলে কাজ করছে, এর মধ্যে থেকে কোন একটা আশ্রয় যদি চলে যায় তাহলে কোন কাজই হবে না। সাধারণ মানুষ দেখছে – কই আমি তো দেখতে পাচ্ছিনা যে এই পাঁচটা কাজ করছে, আমিতো জানি আমিই কাজ করছি। এখানে কে গীতা অধ্যয়ণ করছে, আপনি বুঝতে পারছেন আপনি গীতা অধ্যয়ণ করছেন বাকিরাও দেখছে আমরাই গীতা অধ্যয়ণ করছি, তাহলে এতো কিছু আসছে কোথা থেকে। তখন গীতা এই শ্লোকের মাধ্যমে বলছে – এই জিনিষগুলোকে বোঝা তোমার ক্ষমতার বাইরে। তাহলে কে বুঝবে? যে শাস্ত্র পড়েছে, নিজে গীতা পড়লে হবে না, আচার্যের কাছে পড়তে হবে। আবার শুধু পড়লেই হবে না, যেটা পড়েছে সেটাকে চিন্তন মনন করতে হবে, তখন বুঝতে পারবে যখন যে কোন কাজই করা হোক না কেন, সেই কাজ আত্মা করেন না এবং তুমিও করো না, এই পাঁচটা আলাদা আশ্রয় মিলে করছে। যখন কয়লার ইঞ্জিন দিয়ে ট্রেনকে টানা হত তখন কোন স্টেশনে কয়লা ভরতে বা জল ভরতে ট্রেনকে অনেকক্ষণ দাঁড় করিয়ে রাখা হত। বাচ্চারা বিরক্ত হয়ে ট্রেনের সীটে বসেই ঠেলতে শুরু করত, ঠেলতে ঠেলতে হঠাৎ হয়তো ট্রেনটা চলতে শুরু করল, বাচ্চাটা তখন ভাবতে থাকে আমি যে ধাক্কা মারলাম ঐজন্য ট্রেনটা চলতে শুরু করেছে। ঠিক তেমনি আমি যখন মনে করছি এই কাজটা আমি করছি, তখন বাচ্চা যেমন মনে করছে আমার ঠেলাতে ট্রেন চলছে, এটাও ঠিক তাই। আসলে কাজ কে করছে? এই পাঁচটি জিনিষ, ড্রাইভার চালাচ্ছে, গার্ড সিগন্যাল দিচ্ছে, ইঞ্জিনে শক্তি আছে তাই ট্রেন চলছে, বাচ্চার ঠেলাতে কিছুই হচ্ছে না। কে কাজ করছে? এই পাঁচটা। কে মনে করছে আমি করছি? আমাদের মত দুর্মতিরা, এখানে বলছে *দুর্মতিঃ*। দুর্মতি কে? যে মনে করছে শরীরটাই আত্মা। অন্য দিকে যে মনে করছে দেহ আলাদা আত্মা আলাদা, মানে এই শরীরটা আছে, শরীরের মধ্যে আলাদ আত্মা জ্বলজ্বল করছে, সেই আত্মাই সব কিছু করে। এটা হচ্ছে নৈয়ায়িকদের মত। কিন্তু যে কর্ম করবে কর্মের ফল তার কাছেই যাবে। আত্মা যদি কর্ম করে তাহলে আত্মাই সুখ-দুঃখের ফল পাবে। আত্মা যদি সুখ-দুঃখের ফল পায় তাহলে তো আত্মার কোন দিনই মুক্তি হবে না। কিন্তু আচার্য শঙ্কর গীতা, উপনিষদের ভাষ্যে এই সব মতকে খণ্ডন করে দেখিয়ে দিয়েছেন যে এই তত্ত্ব কখনই চলে না।

দুর্মতি কে কে? দুর্মতি দুই ধরণের – প্রথম হল, যারা দেহকেই আত্মা মনে করে। দেহকে আত্মা মনে করছে কারা? আজকালকার দিনে যারা যুক্তিবাদী, বাস্তববাদী বলে নিজেদের জাহির করে, যারা বৈজ্ঞানিকদের মতকে অনুসরণ করে। আর দ্বিতীয় ধরণের দুর্মতি হচ্ছে, যারা মনে করে আত্মা দেহ থেকে আলাদা, দেহের মধ্যে আত্মা জ্বলজ্বল করছে, কাজ যেটা করা হচ্ছে সেটা এই আত্মাই করছে। এরা কারা? সমস্ত দ্বৈত মতালম্বী ধর্মের লোকেরা। গীতা ও আচার্যের মতে এরা সবাই হচ্ছে *দুর্মতিঃ*। এদের এই মতকে স্বীকার করলে বলতে হয়, মৃত্যুর পর শরীরটা নষ্ট হয়ে গেল। তাহলে পাপ-পূণ্য যা হয়েছে সেই অনুসারে কে স্বর্গ বা নরকে যাবে? যে কর্ম করেছে সেই স্বর্গ বা নরকে যাবে, আত্মাই করছে তাহলে আত্মাকেই স্বর্গ ও নরকে যেতে হবে। এই মতকে আচার্য মানছেন না, গীতাও মানছে না। গীতা তাই বলে দিচ্ছে যে বলছে আমি করেছি সেই দুর্মতিঃ। এই কথা বলার পর গীতার শেষ শ্লোক আসবে। অষ্টাদশ অধ্যায়ের সতেরো নং শ্লোকেই গীতা শেষ হয়ে যায়।

**যস্য নাহঙ্কৃতো ভাবো বুদ্ধির্যস্য ন লিপ্যতে। হত্বাপি স ইমাঁল্লোকান্ন হন্তি ন নিবধ্যতে।।১৭।।**

অর্জুনের মূল প্রশ্ন ছিল – *কথং ভীষ্মমহং সংখ্যে দ্রোণঞ্চ মধুসূদন। ঈষুভিঃ প্রতিযোৎস্যামি পূজার্হাবরিসূদন* – হে মধুসূদন আপনি বলুন, যাঁরা আমার পূজনীয়, যাঁরা সকলের পূজ্য, যাঁদের শ্রীচরণে সবার পূজা করার কথা, তাঁদের প্রতি আমি এই তীক্ষ্ণ বাণ নিক্ষেপ করব কিভাবে? এই প্রশ্নের উত্তর অর্জুনকে দেবার জন্য ভগবান সব কথা, সব তত্ত্ব ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এই বিরাট লম্বা আলোচনা করার পর এখানে এসে বলছেন – তুমি কোথায় মারছ, তুমি তো মারছ না – *অধিষ্ঠানং তথা কর্তা করণঞ্চ পৃথগ্বিধাম* ইত্যাদি বলে এই শ্লোকে বলছেন – *যস্য নাহঙ্কৃতো ভাবো বুদ্ধির্যস্য ন লিপ্যতে*, এইটাই হচ্ছে গীতার সার। মানুষ কাজ করেও কিভাবে জীবন্মুক্ত হয়ে যায়, কাজ করলেও কাজের ফল তাকে কিভাবে স্পর্শ করে না, ভগবান এতো কথা বলার পর সার কথাটা বলে দিচ্ছেন।

এর আগে বললেন, এই পাঁচটাকে আশ্রয় করে যে কর্ম হয় এটাকে সবাই বুঝতে পারবে না, মানে দুর্মতিরা বুঝতে পারবে না। কিন্তু কারা বুঝতে পারবে? সুমতিরা। সুমতি কারা? সুমতির তিনটে লক্ষণ, শাস্ত্র অধ্যয়ণ করেছে, আচার্যের উপদেশ গ্রহণ করেছে আর যুক্তি বা ন্যায়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, মানে নিজের শুদ্ধ বুদ্ধিকে প্রয়োগ করেছে। এই তিনটকে আশ্রয় করে মস্তিষ্ক ও বুদ্ধি যাঁর পরিষ্কার হয়ে গেছে সেই হচ্ছেন সুমতি। আমি বিরাট যুক্তিবাদী, আমি বড় বিজ্ঞানী হয়ে যেতে পারি, আমার অনেক গুণ থাকতে পারে, কিন্তু এগুলো দিয়ে আমি আত্মার তত্ত্ব কিছুই বুঝতে পারব না। আত্মার তত্ত্বকে বুঝতে অন্য ধরণের প্রতিভার দরকার, সবার জন্য এই তত্ত্ব নয়। কিন্তু বুদ্ধি যদি না থাকে তাহলে আমি শাস্ত্র বুঝতে পারব না। বৃদ্ধ বয়সে যখন কানে ভাল শুনতে পায়না, চোখে ভালো দেখতে পায়না, ইন্দ্রিয়ের সব ক্ষমতা শিথিল হয়ে আসে তখন যদি সে বলে আমি ধর্মকর্মে মন দেব, শনিবার শনিবার বেলুড় মঠে শাস্ত্র পাঠ শুনতে যাব, তাহলে কি এদের শাস্ত্র জ্ঞান হবে? কখনই হবে না। বাচ্চা বয়স থেকে, বারো চৌদ্দ বয়স থেকে যদি ধর্মে না প্রবেশ করে সে আর কোন দিন ধর্মকর্ম শিখবে না। ধর্মশাস্ত্র বুঝতে গেলে তিরিশের আগেই বুঝতে হবে, তিরিশের পর সব ফর্সা। কিন্তু আমরা হিন্দু বলে মনে করি এই জন্মে প্রথমে কিছু হল না, ঠিক আছে এখন তো শুরু করা যাক আগামী জন্মে আরেকটা সুযোগ পাওয়া যাবে। যাদের বুদ্ধি নেই তাদের দ্বারা আধ্যাত্মিক হওয়া যায় না, তুখোড় বুদ্ধি চাই। আইনস্টাইনেরও তো তুখোড় বুদ্ধি ছিল, তাতে কি হল। না, শুধু তুখোড় বুদ্ধি থাকলেও হবে না, শাস্ত্র অধ্যয়ণ করা চাই। শাস্ত্র অধ্যয়ণ করে আচার্যের কথার সাথে সেটাকে মেলাতে হয়, আমি শাস্ত্র পড়ে এটা বুঝেছি, আপনি এবার বলুন কোনটা ঠিক। আচার্য তখন ধরিয়ে দেন এটা ভুল এটা ঠিক। এইভাবে গুরুমুখে বার বার শুনে শুনে নিজের চিন্তাধারা, ভাবকে সংশোধনের দ্বারা পরমার্জিত করে যখন সেইভাবে নিজের জীবনকে চালনা করা হয় তখন তৈরী হয় শুদ্ধ সংস্কৃতি। মানুষের জীবনে যে শুদ্ধ আধ্যাত্মিক সংস্কৃতি আসে সেটা এইভাবেই তৈরী হয়। এই তিনটে শর্ত পূরণ না হলে কিন্তু শুদ্ধ সংস্কৃতি তৈরী হবে না। তখন সে ঠিক ঠিক বুঝতে পারে, এই যে আচার্য গীতার কথা বলছেন, এখানে আচার্যের বাণী যন্ত্র কাজ করছে, বাণী যন্ত্র শরীরকে আশ্রয় করে আছে। এই বাণীযন্ত্র গুলো কাজ করছে কারণ প্রাণশক্তি আছে বলে। আর এই পুরো ব্যাপারটা কাজ করছে কারণ এই শরীরটা তার সজীবত্বকে ধরে রেখেছে, সেটা হল জীব। জীবকে এখানে বলা হচ্ছে, যিনি শুদ্ধ আত্মা তিনি শরীর, মন, ইন্দ্রিয়ের সাথে নিজেকে একাত্ম করে নিয়েছে। আর সবার শেষে হচ্ছে বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠান দেবতারা, দেবতারা আছেন বলেই ইন্দ্রিয়গুলো নিজেদের যার যার কাজ ঠিক ঠিক ভাবে করছে। তাহলে আমি কে? আমি কিছুই না, আমি দ্রষ্টা মাত্র। যারা বড় হয়ে উপরে উঠে যায় তারা হয়ে যায় ম্যানেজার, কোচ, অবজার্ভার, তারা আর খেলা করে না, খেলা বাচ্চারা করে।

এই যে আমাদের সামনে পরিদৃশ্যমান জগত রয়েছে, ইন্দ্রিয়গুলো এই জগতের পেছনে ছুটছে, আর তার পেছনে রয়েছেন নির্বিকার নির্বেশেষ শুদ্ধ আত্মা। নির্বিকার শুদ্ধ আত্মার সাথে ইন্দ্রিয়গুলোকে জুড়ে দেওয়ার দালালিটা করে বুদ্ধি। বুদ্ধি কখন জগতের দিকে মন দেয় কখন নির্বিকার আত্মার দিকে মন দেয়, আর মাঝখানে থেকে আত্মাকে সব যোগান দিতে থাকে। যে বুদ্ধিমান, আচার্যের কাছে শাস্ত্র শুনে, নিজে শাস্ত্র অধ্যয়ণ করে করে যার বুদ্ধি সংস্কৃত হয়ে গেছে, সে তখন বুদ্ধিকে আর কোন জাগতিক ব্যাপারে লিপ্ত হতে দেয় না। বুদ্ধির সাথে ইন্দ্রিয়ের যে তারের সংযোগ ছিল সেই তারটাকে সে কেটে আলাদা করে দেয়। আমি ভাবটা সব সময় আসে বুদ্ধি থেকে আর বুদ্ধিই হচ্ছে সবার শেষ। বাচ্চা ছেলের জামা ছিড়ে গেলে যেমন সেও কষ্ট পায়, কারণ সে জামাটাকে মনে করছে জামাটাই আমি। যখন বড় হয়ে যায় তখন জামার প্রতি তার একাত্মটা চলে যায় কিন্তু জামার বদলে তার দেহের প্রতি একাত্ম ভাবটা চলে আসে। যারা আরও একটু উন্নত তাদের দেহের প্রতি অতটা আর আসক্তি থাকে না, কিন্তু নিজের মনের শক্তির প্রতি একাত্ম ভাবটা থেকে যায়, তখন সে মনে করে আমার দেহটার যা কিছু হয়ে যাক কিন্তু আমার বুদ্ধিটা যেন ঠিক থাকে। এই আমি ভাবটা আসে বুদ্ধি থেকে। যিনি আত্মজ্ঞানের পথে চলেছেন তিনি ঐ বুদ্ধি থেকেও নিজেকে আলাদা করে নেন। বুদ্ধি থেকে নিজেকে যখন আলাদা করে নেয় তখন কি হয়? আচার্য শঙ্কর এই জায়গাটাতে খুব সুন্দর ভাষ্য দিচ্ছেন – *ন অনুশায়নী ভবতি*, বিষয়ের পেছনে পেছনে বুদ্ধি আর দৌড়ায় না। আর কি হয়? আমি অমুক কাজ করেছি আমাকে নরকে যেতে হবে এই ভাব আর থাকে না। কথামৃতে ঠাকুর কতবার বলছেন – যে শালা নিজেকে পাপী পাপী বলে সেই শালা পাপী হয়। ঠাকুর আবার গানের মাধ্যমেও বলছেন – 'আমি দুর্গা দুর্গা বলে যদি মরি আখেরে এ দীনে না তার কেমনে জানা যাবে গো শঙ্করী' - এটাও সেই একই ভাব। আসলে আমার যে আমি, সেটাকে বুদ্ধির সঙ্গে জুড়ে রেখেছি, বুদ্ধিটা আবার ইন্দ্রিয়ের সাথে জুড়ে রয়েছে, ইন্দ্রিয় সব সময় তার

বিষয়ের উপরে কাজ করে, তাই ভালো-মন্দ বোধ এটা বুদ্ধির বোধ। আমি সেই বুদ্ধির সঙ্গে জুড়ে রেখেছি, তাই ভালো কাজ করলে মনে করছি আমি ভালো কাজ করেছি, মন্দ কাজ করলে মনে করছি আমি মন্দ কাজ করেছি। ভালো কাজ মানে স্বর্গে যাব আর মন্দ কাজ মানে আমি নরকে যাব। শাস্ত্র অধ্যয়ণ আর আচার্যের মুখে শাস্ত্রের কথা শ্রবণ করে নিজের বুদ্ধিকে সংস্কৃত করেছে সে তো তখন বুঝতে পারছে আমি তো কিছুই করছি না, শরীর ইন্দ্রিয়ই এই কাজগুলো করছে, আমি শরীর ইন্দ্রিয়ের থেকে আলাদা। আলাদা শুধু যে খারাপ কাজেই হবে তা নয়, ভালো কাজেও আলাদা মনে করছে। তখন সে বলে আমি ভালোও চাই না মন্দটাও চাই না। এটা অবশ্য ঠিক ভালো কাজ কখনই মানুষকে বন্ধনে ফেলে না, বন্ধনে সব সময় ফেলে খারাপ কাজ, সেইজন্য দেখা যায় শাস্ত্রে নরকের খুব বর্ণনা করা হয়। মিল্টন যখন স্বর্গের বর্ণনা করতে গেলেন তখন খুব একটা ভালো বর্ণনা করতে পারলেন না, কিন্তু নরকের যখন বর্ণনা করলেন তখন সেটা দারুণ প্রশংসিত হল। একজন সমালোচক তাই বললেন জন মিল্টন বিবাহিত ছিলেন বলে নরকের বর্ণনাটা খুব ভালো করতে পেরেছেন।

দশ বছর আগে আমি যদি কোন ভালো কাজ করে থাকি দশ বছর পর আমার আর মনে থাকবে না। কিন্তু কুড়ি বছর আগে একটা খারাপ কাজ করলে সেটা সারা জীবন মাথায় বসে থাকবে আর খুঁতখুঁত করতেই থাকবে। কারণ মানুষের স্বরূপই হচ্ছে সে অমৃতস্য পুত্রা। একটা সুন্দর বাড়িতে খুব সুন্দর টাইলস্ লাগানো আছে, তার মধ্যে একটা টাইল খুলে গেছে। এখন বাড়িতে অত সুন্দর টাইলস্ লাগানো আছে সেগুলো নজরে আসবে না, কিন্তু যে জায়গাটাতে একটা টাইল খসে গেছে সেই জায়গাটতেই ঘুরে ঘুরে দৃষ্টি চলে যাবে। এটা দোষদৃষ্টি নয়, আমাদের স্বভাবই হচ্ছে নিখাদ, যেখানেই গলদ থাকবে সেটাই তাই বেশি চোখে পড়ে। সেইজন্য গীতা বলছে, গলদটার দিকে তাকিও না, এটাও না ওটাও না, কোনটার দিকেই তাকিও না। আমাদের স্বভাবে অমৃতপুত্রের ভাব থাকাতে বাজে কাজ করলে সব সময় মনটা খুঁতখুঁত করে। খারাপ কিছু করে ফেললে ঠাকুর বলছেন – ভগবানের সামনে দাঁড়িয়ে বলতে হয়, এই কাজটা আমার অন্যায় হয়ে গেছে, এই ধরণের কাজ আমি আর কখনই করব না। এটা বলার পর আর কখনই সেই কাজ না করলে ঐখানেই জিনিষটা মিটে যায়, তার আর কোন পাপ লাগবে না। কিন্তু যদি সারাদিন ধরে চিন্তা করতে থাকি আমি অমুককে মন্দ কথা বলেছি, আমি না বলে এটা নিয়েছি, তাহলে কিন্তু পাপ আমাকে ছাড়বে না। শ্রীকৃষ্ণ তো সারা জীবন অপরের বাড়ি থেকে ননী মাখন চুরি করে গেলেন।

এখানে আমি চুরি করলাম কি, চুরি করলাম না, এগুলোর কোনটারই গুরুত্ব নেই, গুরুত্ব হচ্ছে ঐটাকে নিয়ে আমি ভাবছি কিনা। যদি ঐগুলোকে নিয়ে ভাবতে থাকি তাহলে আমি আধ্যাত্মিক পথ থেকে সরে আছি, আমার উন্নতির ধারা ব্যহত হয়ে যাবে। যদি ঐগুলোকে নিয়ে না ভেবে থাকি তাহলে – *হত্বাপি স ইমাঁল্লোকান্ন হন্তি ন নিবধ্যতে*। আমি যদি গোটা সৃষ্টিকে সংহার করে দিই তাতেও আমার কিছু মনে হবে না, আমাকেও যদি কেউ বধ করে দেয় তাতেও আমার কিছু মনে হবে না। এখানে কিন্তু দু দিকটাই থাকতে হবে। অনেক সময় মুর্খরা গীতাকে আক্রমণ করে বলে – আমি তো গীতাকে মানি, আমি যদি তোমাকে চড় মারি তাহলে আমি তো তোমাকে মারিনি। হ্যাঁ ভাই তুমি ঠিক কথাই বলেছ তবে তোমাকেও যদি কেউ চড় মারে তখন তোমারও যদি বোধ থাকে কই আমাকে তো কেউ চড় মারেনি তবে তোমার গীতা মানা সার্থক হবে। যার বুদ্ধি পরিষ্কার হয়ে গেছে সে দুটোতেই নির্বিকার থাকবে। ভালো মন্দ যাই হোক দুটোতেই সে নির্বিকার। এই নির্বিকার ভাব কখনই হবে না, হবে – যখন শাস্ত্র কথা গুরুমুখে শুনবে আর শাস্ত্র অধ্যয়ণ করে শাস্ত্রের কথা মত জীবনকে পরিচালিত করবে। দক্ষিণেশ্বরে একজন নিজেকে 'বেদান্তী' বলে জাহির করত আর চারিদিকে ব্যাভিচার করে বেড়াত। তাকে কেউ কিছু নিন্দাসূচক কিছু বললেই বলত – আমি তো কিছু করছি না, শরীর শরীরের সঙ্গে করছে। ঠাকুর শুনে বলছেন – তোমার বেদান্ত জ্ঞানে আমি ইত্যাদি করি।

একজন একজনকে মারছে কিন্তু মেরেও মারছে না, এটা কি রকম কথা হল? একদিকে তুমিই বলছ মারছে আবার অন্য দিকে বলছ মারছে না, এটা কি হচ্ছে তাহলে? তখন আচার্য শঙ্কর বলছেন – এই পার্থক্যটা হচ্ছে পারমার্থিক আর লৌকিক দৃষ্টিতে। মনে করা যাক কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের মাঝখানে আমি দাঁড়িয়ে আছি এবং আমার বুদ্ধি সংস্কৃত, আমি দেখছি এই যুদ্ধটা শ্রীকৃষ্ণ করাচ্ছেন, অর্জুন যে বাণ মেরে এত লোক মারছে সেটা শুধু অর্জুন মারছে বলে মরছে না, শ্রীকৃষ্ণের বুদ্ধি আছে বলেই অর্জুনের বাণে এত লোক মরছে। তাহলে আমি কি সিদ্ধান্ত আসব? শ্রীকৃষ্ণ এত লোককে মারাচ্ছেন। কিন্তু অর্জুনের দিকে যখন তাকাব তখন এটাও দেখছি যে অর্জুনই বাণ দিয়ে এদের মারছে। এবার মনে করা যাক স্বামী বিবেকানন্দ ঐ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে দাঁড়িয়ে আছেন। এখন স্বামী বিবেকানন্দ কি দেখবেন? অর্জুন হাত দিয়ে তীর চালাল, এটা কি অর্জুনের আত্মা? না, এটা *অধিষ্ঠানং তথা কর্তা* করছে। তাহলে অর্জুন মারছে কেন? অর্জুন মারল কারণ অর্জুনের বুদ্ধি ঐ মারাতে জড়িয়ে আছে। শ্রীকৃষ্ণের ক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণ এই যুদ্ধ করাচ্ছেন না। তাহলে কে করাচ্ছে? প্রকৃতি করাচ্ছে। কারণ স্বামীজী পরিষ্কার দেখছেন শ্রীকৃষ্ণের বুদ্ধি এই যুদ্ধে লিপ্ত নেই। এখন শ্রীকৃষ্ণ যদি বলেন আমি তো কাউকে মারিনি, স্বামীজীও বলবেন – শ্রীকৃষ্ণ ঠিকই বলছেন উনি কাউকে মারেননি, কারণ শ্রীকৃষ্ণের বুদ্ধি ওতে লিপ্ত নেই। বুদ্ধি যদি লিপ্ত না থাকে তাহলে তো আর কিছুই হল না, সব কাজ *অধিষ্ঠানং কর্তাই* করছে। ঠিক তেমনি শ্রীকৃষ্ণ চিকাগো ধর্মসভায় বসে দেখছেন স্বামীজী কোন ভাষণ দিচ্ছেন না, স্বামীজী তো নির্লিপ্ত। কিন্তু অন্যান্য যারা বক্তৃতা দিচ্ছেন তাদের দেখে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন যে এরা বক্তৃতা দিচ্ছে। লৌকিক দৃষ্টিতে দেখবে যে লোক মরছে, পারমার্থিক দৃষ্টিতে দেখবে যে, কাউকে তিনি মারছেন না, শরীর, ইন্দ্রিয়

এই জিনিষগুলো মারছে। এই জিনিষগুলো অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও গভীর তত্ত্ব, সাধারণ বুদ্ধিতে এগুলো ধরাও যায় না বোঝা তো দূরের কথা। অনেক দিন ধ্যান-ধারণা না থাকলে এই সূক্ষ্ম তত্ত্বের ধারণা করা অত্যন্ত কঠিন। যিনি শুদ্ধ আত্মা তিনি কোন কিছুতেই লিপ্ত হন না, সেইজন্য কোন পাপ বা পূণ্য তাঁর লাগছে না। সেইজন্য শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে দেখা যায়, যে জায়গাটাতে ওনার পাপবোধ আসত, ঐ জিনিষটা তিনি আর করবেনই না, কিন্তু বাকি সময় তাঁর ঐ ধরণের কোন বোধই নেই। যখন শ্রীরামকৃষ্ণের মনে হল ছাগ বলি দেওয়াটা ঠিক নয় তখন তিনি লেবুও কাটতে পারছেন না। লেবু কাটতে গিয়ে তিনি 'জয় মা কালী' বলে লেবুর উপর ছুরি চালাচ্ছেন। আবার যখন দেখছেন সবাই বসে আছেন, ঠাকুর বলছেন – দেখছি লেটো বসে ঘাড় নাড়ছে, দেখছি ভেতরে একজন আছে সেই ওর ভেতরে বসে ঘাড় নাড়ছে। মন বুদ্ধি যাঁদের একেবারে পরিশুদ্ধ হয়ে গেছে তাঁরা বাস্তবিক এগুলোকে প্রত্যক্ষ করেন। তখনই বলতে পারে – *হত্বাপি স ইমাঁল্লোকান্ন হন্তি ন নিবধ্যতে,* অর্জুন তুমি যদি তোমার বুদ্ধিকে আলাদা করে নাও তখন কিন্তু তোমার এই বোধ থাকবে না। তখন কি হবে? তুমি যে মনে করছ ভীষ্ম-দ্রোণ এনারা আমার পূজনীয়, নমস্য গুরুজন, এদের গায়ে তীর মারলে আমার পাপ লাগবে, সেই পাপ তোমার তখন আর লাগবে না। তুমি আলাদা, তোমার শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি আলাদা।

অর্জুনের যে প্রশ্নের উপর দাঁড়িয়ে গীতা যাত্রা শুরু করেছিল, এই শ্লোকে এসে সেই প্রশ্নের সমাধান করা হল, তুমি যে মনে করছে এদের গায়ে তীর মারলে তোমার পাপ লাগবে, কিন্তু এইভাবে যদি চিন্তা কর তাহলে তোমার আর পাপ লাগবে না। গীতার মূল বক্তব্য এইখানেই শেষ হয়ে যায়। এর পর সপ্তদশ অধ্যায়ে যে তিনটে গুণের কথা বলা হয়েছিল, সত্ত্ব, রজো আর তমোর, সেটাকে আরো শ্রেণীবিন্যাস করে বিস্তার করা হচ্ছে। এখানে কর্মের বিশ্লেষণ চলছে, কর্মের বিশ্লেষণ করতে গিয়ে আমরা আগেও দেখেছি যে কোন কাজে নটি আশ্রয় থাকে। কারকের সাতটি বিভক্তি – কর্তা, কর্ম, ক্রিয়া, করণ, সম্প্রদান, অপাদান ও সম্বন্ধ। আর তার সঙ্গে হয় মূল ক্রিয়া আর সব শেষে হচ্ছে যে কোন ক্রিয়ার একটা ফল হয় – এই হল মোট নটি। যেমন আমি খেলাম, আমি হল কারকের বিভক্তি, খেলাম মানে ক্রিয়া আর তার ফল হচ্ছে সন্তুষ্টি, আমি খেয়ে সন্তুষ্ট হলাম। আমি হলাম কর্তা, এই আমি কি খেলাম? আমি রুটি খেলাম, এখানে রুটি হয়ে গেল কর্ম, যেটার উপরে কর্ম হচ্ছে, হাত দিয়ে রুটি খেলাম, হাত হয়ে গেল করণ, আমি হাত দিয়ে থালা থেকে রুটি তুলে খেলাম, থালা থেকে হয়ে গেল অপাদান, এই রকম ভাবে কারকের সাতটি বিভক্তি থাকে।

এইবারে কর্মের যে বিভিন্ন বিষয়গুলো রয়েছে সেগুলোকে আলোচনা করা হবে। যে কোন কাজের পেছনে নয়টি আশ্রয় রয়েছে, এই নটির বাইরে আরেকটি আশ্রয় আছে, সেটা হচ্ছে যেটা কর্মের পেছনে আমাদের ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে। যে কোন কাজের পেছনে একটা প্রেরণা থাকে, একটা গাধা যে খেতে যাচ্ছে তার কারণ গাধাটার খিদে পেয়েছে। খিদের যে জ্ঞান, সেই জ্ঞান গাধাকে কর্মে প্রবৃত্ত করছে, এটাকে বলা হয় *কর্মচোদনা,* যে জিনিষটা আমাদের কাজের দিকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে। জ্ঞান আমাদের কাজের দিকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে, জ্ঞানটা হয়ে গেল impelling force অর্থাৎ যেটা মানুষকে কাজের দিকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে। অন্য দিকে হল আশ্রয়, আশ্রয় হল তিনটে, দেহ, মন ও বাক্। আমরা যে কাজ করছি সেটা দেহ দিয়ে করি, মন দিয়ে করি আর বচন দিয়ে করি। এটা হল কাজের তিনটে আশ্রয়। এই কর্মচোদনা, যেটা আমাদের কাজের দিকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে, সেটিও আবার তিনটে আশ্রয়কে নিয়ে চলে। পরের শ্লোকে এই জিনিষটাকেই উল্লেখ করা হচ্ছে –

**জ্ঞানং জ্ঞেয়ং পরিজ্ঞাতা ত্রিবিধা কর্মচোদনা। করণং কর্ম কর্তেতি ত্রিবিধঃ কর্মসংগ্রহঃ।।১৮।।**

যে কোন কাজ কারকের মাধ্যমে সাতটা বিভক্তি দিয়ে হয়। যখন একটা কাজ করা হয় তখন কত রকমের অনুষঙ্গ লাগে, কর্মের পুরো চিত্রটা একটা জটিল আকার নিয়ে নেয়। একটা কাজ করার পেছন কত কিছু আছে এই নিয়ে আমরা কখন ভাবি না। কারকের সাতটা বিভক্তি, ক্রিয়া, তার ফল আর তার পেছনে আশ্রয় আছে, আশ্রয়টা হচ্ছে দেহ, মন ও বাক্। আশ্রয় ছাড়া তো কাজ করতে পারবে না। তাকে কাজের দিকে ঠেলে নিয়ে যাওয়ার জন্য আবার তিনটে কারণ আছে – *জ্ঞানং জ্ঞেয়ং পরিজ্ঞাতা।* এতগুলো অনুষঙ্গ জানার পর এর প্রত্যেকটিকে আবার সত্ত্ব, রজো ও তমো এই তিনটে শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়।

আঠারো নং শ্লোকে শব্দগুলোকে inter change করে দেওয়া হয়েছে। কোথাও কর্ম বলতে ক্রিয়া বোঝায় আবার কোথাও কর্ম বলতে কারকের দ্বিতীয়া বোঝায়। যেটার উপরে কাজ করা হয় সেটাকে কারকের কর্ম বলা হয়, যেমন আমি রুটি খায়, এখানে রুটিটা হল কর্ম, আবার খাওয়াটাও কর্ম। গীতাতে তাই কখন কর্ম বলতে কারকের দ্বিতীয়া বোঝায় আবার কখন কর্ম বলতে মূল কর্মকেও বোঝায় আবার কোথাও কর্ম বলতে কর্মফল বোঝায়, সেইজন্য উপযুক্ত আচার্যের কাছে গীতা অধ্যয়ণ করতে বলা হয়। কর্ম বলতে এখানে দ্বিতীয়া বলছে না ক্রিয়া বলছে, না কর্মফল বলছে আমরা চট করে বুঝতে পারব না। এগুলোকে নিয়েই পর পর কয়েকটা শ্লোক চলবে।

(১) কর্মের তিনটে আশ্রয় – দেহ, মন ও বাক্। (২) কর্মের দিকে যেটা প্রেরিত করছে, অর্থাৎ *কর্মচোদনা* আবার তিনটে – *জ্ঞানং, জ্ঞেয়ং ও পরিজ্ঞাতা,* আর (৩) সাতটি কারক, (৪) ক্রিয়া আর শেষে (৫) কর্মফল। যে কোন কাজে এতগুলো জিনিষের দরকার।

সবার প্রথমে শুরু হবে *কর্মচোদনা*, কর্মচোদনা হচ্ছে – *জ্ঞানং, জ্ঞেয়ং ও পরিজ্ঞাতা*। গীতাতে জ্ঞান আর জ্ঞেয়কে এক করে দেওয়া হয়েছে। যে বস্তুকে জানা হবে সেটি হচ্ছে জ্ঞেয়, যে পদ্ধতিতে সেই বস্তুকে জানা হচ্ছে সেটাকে বলা হচ্ছে জ্ঞান। জ্ঞান আর জ্ঞেয়কে এক করে জ্ঞেয়তেই আলোচনা করা হয়েছে। *পরিজ্ঞাতা* হচ্ছে কর্তা। কারকের মধ্যে করণ, মানে যার মাধ্যমে কর্ম হবে, সেটাকেও এখানে অন্য ভাবে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমি হাত দিয়ে খাই, হাতটা করণ। কিন্তু এখানে এই কটি শ্লোকে করণ বলতে বোঝাচ্ছেন বুদ্ধি আর ধৃতিকে। গীতাতে ক্রিয়া বলতে বোঝাচ্ছে গ্রহণ ও ত্যাগকে, একটা জিনিষকে ধরা আর একটা জিনিষকে ছেড়ে দেওয়া। যত রকমের ক্রিয়া আছে সব ক্রিয়াকে দুটোতে নিয়ে আসা হয়েছে, ধরা আর ছাড়া। যা কিছুই করা হোক না কেন, হয় ধরে না হয়তো ছাড়ে forces of attraction and forces repulsion। যা কিছু ক্রিয়া হচ্ছে হয় কাছে টানছে আর তা নাহলে দূরে সরাচ্ছে। আর ফল সব সময় সুখ, দুঃখকে এখানে আনা হচ্ছে না, কারণ মানুষ সব সময় সুখই চায়। আর কর্ম, দ্বিতীয়া যেটাকে বলছে, সেটাকে ক্রিয়ার মধ্যেই অন্তর্গত করা হয়েছে। এইভাবেই পরপর আলোচনা করা হয়েছে।

*জ্ঞানং জ্ঞেয়ং পরিজ্ঞাতা ত্রিবিধা কর্মচোদনা* – কাজের দিকে তিনটে জিনিষ আমাদের ঠেলে দিচ্ছে, এই তিনটের কথা এখানে বলা হল – *জ্ঞানং জ্ঞেয়ং পরিজ্ঞাতা*। তারপর বলছেন – *করণং কর্ম কর্তেতি ত্রিবিধঃ কর্মসংগ্রহঃ*। *কর্মসংগ্রহঃ*, যেখানে সমস্ত কর্ম জমা হয়, এইখান থেকেই ভালোমন্দ যেমন যেমন কর্ম জমা হচ্ছে সেই অনুসারে মানুষকে ভলো মন্দ সংস্কারের দিকে নিয়ে যায়। যেখান থেকে মানুষকে পুনর্জন্মের দিকে নিয়ে যায় সেটা হচ্ছে *করণং কর্ম কর্তেতি*। এখানে কর্ম হচ্ছে দ্বিতীয়া। এর পরের শ্লোকে ব্যাপারটা আরও পরিষ্কার করছেন –

**জ্ঞানং কর্ম চ কর্তা চ ত্রিধৈব গুণভেদতঃ। প্রোচ্যতে গুণসংখ্যানে যথাবচ্ছৃণু তান্যপি।।১৯।।**

ভগবান বলছেন হে অর্জুন তোমাকে এবার আমি সব ব্যাখ্যা করব। জ্ঞানের কথা বলব, কর্মের কথা বলব আর কর্তার কথা বলব। এর আগের শ্লোকে কর্ম ছিল দ্বিতীয়া কিন্তু এখানে কর্ম বলতে ক্রিয়া বোঝায়। কর্তা আর পরিজ্ঞাতা এক, কারণ যিনি জ্ঞানলাভ করছেন তাকেও কর্তা বা ভোক্তা বলা হয় আবার যে কাজ করে তাকেও কর্তা বা ভোক্তা বলা হয়। *প্রোচ্যতে গুণসংখ্যানে*, যারা সাংখ্যবাদী তারা এই পুরো ব্যাপারটাকে কিভাবে দেখে সেটাও বলব। আসলে সাংখ্যদর্শন প্রকৃতির ব্যাপারটা সব চাইতে ভালো বর্ণনা করে। যে কোন কাজ শুরু করতে একটা প্রেরণা চাই। এই যে এখানে কত দূর দূর থেকে কত কষ্ট করে সবাই শাস্ত্র কথা শুনতে এসেছেন, কিছু একটা পাবে বলেই তো এত কষ্ট করে এখানে এসেছেন, এর পেছনে একটা জ্ঞান আছে। বলছেন একটা গরু বা মহামুর্খও প্রয়োজন না থাকলে সে কিন্তু কাজে নামে না। একট গরুরও যখন খিদে পায় তখনই সে ঘাস খাওয়ার জন্য কর্ম করে। সেখানে একটা জ্ঞান উৎপত্তি হয়। কিসের জ্ঞান? আমার খিদে পেয়েছে। এখানে যারা শাস্ত্র অধ্যয়ণ করতে এসেছেন তাদের কি জ্ঞান? আমাকে শাস্ত্র জানতে হবে। এই জ্ঞানের আবার তিনটে ভাগ আছে। জগতের যত জ্ঞান আছে তার তিনটে বিভাগ গুলো কি কি?

**সর্বভূতেষু যেনৈকং ভাবমব্যয়মীক্ষতে। অবিভক্তং বিভক্তেষু তজ্জ্ঞানং বিদ্ধি সাত্ত্বিকম্।।২১।।**

যার মনে এই জ্ঞানটা সব সময় আছে যে, যা কিছু জগতে আছে আত্মা ছাড়া কিছু নেই। ঐ এক অবিভক্ত অখণ্ড আত্মা ছাড়া আর কিছু নেই। ঐ আত্মাকেই আমরা যেন আলাদা আলাদা দেখছি। যেমন আমি আলাদা, এই মাইক্রোফোন আলাদা, শ্রোতারা আলাদা আলাদা কিন্তু বস্তুত দুটো এক। *অবিভক্তং বিভক্তেষু*, সব আলাদা আলাদা, আমি আলাদা, টেবিল আলাদা, মাইক আলাদা কিন্তু যিনি জ্ঞানী তিনি দেখছেন সব এক। আমরা সবাই এখানে বসে আছি, কেউ সন্ন্যাসী কেউ গৃহী, আমরা সবাই আলাদা আলাদা। আমার এই বোধ আছে যে আমি আপনি আলাদা। এখন যদি সবাইকে পুরুষ আর নারী হিসাবে দেখা হয় তাহলে শ্রেণী বিভগাটা দুইয়ে নেমে এলো – পুরুষ আর নারী ছাড়া আর কোন কিছু এখানে নেই। এবার যদি আমরা সবাই মনুষ্য জাতি হিসেবে দেখি তাহলে আমরা সবাই এক, মনুষ্য জাতি রূপে দেখাতে নারী আর পুরুষের ভেদটা থাকল না। এবারে যদি জড় আর সজীব হিসাবে বিচার করি তাহলে এই কাঠ, মাইক এরা হল জড় আর আমরা সজীব। আমরা যত সজীব প্রাণী আছে সবাই এক হয়ে গেলাম। এবার যদি বস্তু রূপে দেখি, তাহলে বস্তু রূপে আমরা সবাই এক, জড়টাও বস্তু, চেতনটাও বস্তু। এই করে করে যখন আরও পেছনের দিকে যাব তখন অস্তিত্ব রূপে সব কিছু এক হয়ে যাবে, শুদ্ধ সৎ। সেই সৎ যিনি আছেন তিনিই এই মাইক্রোফোন রূপে দেখাচ্ছেন, প্রাণী জগতে কত প্রাণী রূপে দেখাচ্ছেন, তিনি মানুষ রূপে দেখাচ্ছেন, তিনিই পুরুষ রূপে দেখাচ্ছেন, তিনিই নারী রূপে দেখাচ্ছেন, সিলিং এ যত পাখা আছে সব পাখা হিসেবে, বন্ধ পাখা রূপে আবার চলন্ত পাখা রূপে, জ্বলন্ত আলো, না জ্বলা টিউব লাইট সব রূপে তাঁকেই দেখাচ্ছে। এই বোধ যার আছে সে তখন যা কিছু করে সে এই বোধ নিয়ে কাজ করে। ঈশাব্যাস্য উপনিষদের ঋষি বলছেন *তত্র কো মোহঃ কঃ শোক অনুপশ্যতঃ*। যখন মানুষ বুঝে নেয় যা কিছু আছে সবটাই সেই এক বস্তু তখন সে কার জন্যই বা শোক করবে আর কার জন্যই বা মোহ করবে, তার পুরো দৃষ্টিভঙ্গীটাই পাল্টে যাবে। এই জ্ঞানকে বলা হচ্ছে সাত্ত্বিক জ্ঞান। এইবার আমরা শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনকে যদি দেখি তাহলে গীতার এই শ্লোকটাই দেখতে পাব। তাঁর এমন কোন জিনিষ নেই যেটা তাঁর পাওয়ার ইচ্ছা আছে। এমন কোন কিছু কি তাঁর আছে যে, এটা চলে গেলে তাঁর দুঃখ অনুভব হবে? নরেনের জন্য ঠাকুরের বুকে বিল্লি আঁচর মারছে, একজন ঠাকুরকে বললেন – একটা কায়েতের ছেলের জন্য আপনি এত অস্থির হচ্ছেন কেন। ঠাকুর বলছেন – এই দ্যাখো,

আমি নরেনের থেকে মনটা তুলে নিলাম। নরেন, রাখালের থেকে মন তুলে নিতেই ঠাকুরের শরীরের যত লোম, চুল ছিল সব সোজা সজারুর কাঁটার মত দাঁড়িয়ে গেল। ঠাকুরের কাছে অখণ্ড সচ্চিদানন্দ ছাড়া আর কিছু নেই, কিন্তু নরেন, রাখালের উপর আশ্রয় করে মনটা বাহ্য জগতে নামিয়ে রেখেছেন। এইটাই সাত্ত্বিক জ্ঞান, যখন অখণ্ড সচ্চিদানন্দ ছাড়া আর কিছু দেখে না। আমরা মুখে বলছি এক সচ্চিদানন্দ, এক ঈশ্বরই আছেন কিন্তু কাজের ক্ষেত্রে সেই ব্যবহার হচ্ছে না, তার মানে আমাদের জ্ঞানে কিছু গোলমাল আছে। পরের শ্লোকে দ্বৈতবাদীদের জ্ঞান সম্বন্ধে বলা হচ্ছে –

**পৃথক্ত্বেন তু যজ্জ্ঞানং নানাভাবান্ পৃথগ্বিধান্। বেত্তি সর্বেষু ভূতেষু তজ্জ্ঞানং বিদ্ধি রাজসম্।।২১।।**

এরা সব পৃথক পৃথক দেখে, আমি আলাদা তুমি আলাদা। আলাদা আলাদা বোধ আছে কিন্তু জানে ও বোঝে যে এর মধ্যে আত্মা আছেন, চৈতন্য বলে কোন বস্তু আছে। এই জ্ঞানটা হয়ে গেল রাজসিক জ্ঞান। কিন্তু যারা একেবারে মূঢ়, তামসিক তারা মনে করে –

**যৎ তু কৃৎস্নবদেকস্মিন্ কার্যে সক্তমহৈতুকম্। অতত্ত্বার্থবদল্পঞ্চ তৎ তামসমুদাহৃতম্।।২২।**

তামসিক জ্ঞানে আত্মাকে সীমিত করে একবারে খণ্ড খণ্ড করে দেয়। কোথায় সীমিত করে দেয়? শরীরের মধ্যে। শরীরের নাশ হয়ে গেলে আত্মার কি হবে? শরীরটা মরে গেলে আত্মাও শেষ হয়ে গেল। বিজ্ঞানীরা বলছে, আমি মরে গেলে সব শেষ, চার্বাকরাও একই কথা বলে, মৃত শরীরকে পুড়িয়ে দেওয়ার পর সব খেলা শেষ। এই ভাবটা জৈনদেরও আছে। আচার্য তাঁর ভাষ্যে এখানে বলছেন – মানুষ যখন দেখে শ্রীকৃষ্ণের প্রতিমা বা পটেই ভগবান, শ্রীকৃষ্ণের প্রতিমার বাইরে আরে কিছু নেই, যেটা অনেক বৈষ্ণবদেরও মত, তার মানে এরা হয়ে গেল তামসিক জ্ঞানের লোক। যখন বলবে এই শরীরটাই সব এর বাইরে আর কিছু নেই, এই ধরণের অযৌক্তিক, অযথার্থ এবং তুচ্ছ জ্ঞানকেই তামসিক জ্ঞান বলছে গীতা। কিন্তু যখন দেখছে এই শরীরেরও আত্মা আছেন ঐ শরীরেরও আত্মা আছেন সবার শরীরের আত্মা আছেন তখন এটা হয়ে গেল রাজসিক জ্ঞান। আর যখন দেখে আত্মাই শুধু আছেন, এই যে নানান রূপ আর বস্তু আছে এগুলো কাল্পনিক, আসলে সর্বভূতে এই অবিভক্ত অক্ষর আত্মাই আছেন এটাই হল সাত্ত্বিক জ্ঞান।

তামসিক জ্ঞানে প্রেরিত হয়ে যে কাজ করা হয় সেই কাজটাই অধম কাজ, রাজসিক জ্ঞানে প্রেরিত কাজগুলি এর থেকে আরেকটু ভালো আর সাত্ত্বিক জ্ঞানে প্রেরিত কাজই সব থেকে শ্রেষ্ঠ কাজ। যেমন কেউ যদি সত্যিই বলে আমি যা কাজ করছি তা সমগ্র মানবজাতির জন্য করছি, তখন সেই কাজটা মহৎ কাজ। যেমন কেউ কোন কিছু রচনা করে বলল এটা সমস্ত মানবজাতির জন্য লেখা হয়েছে, তখন ঐ লেখাটাই বিরাট সমাদর পাবে। কিন্তু যখন কেউ আমি আমার ধর্মকে বড় করার জন্য লিখছি মনে করে কিছু লিখছে সেই লেখাটা সঙ্কীর্ণ হয়ে গেল। যে কোন কাজ করা হয় তার পেছনে থাকে প্রেরণা, প্রেরণাটাই জ্ঞান, এখন এই জ্ঞানটা কি ধরণের সেটাকে দেখতে হবে। যদি মনে হয় অখণ্ড জ্ঞান, সেই অখণ্ডে যেন একটা বিভাজন হয়ে রয়েছে, তাহলে সেটা খুব উচ্চ জ্ঞান। যদি দেখে অখণ্ডের মধ্যে এই বিভাজন গুলো সত্য তাহলে এই জ্ঞানটা নিম্ন মানের জ্ঞান হয়ে গেল। যদি মনে করে আমার মধ্যে যতটুকু আছে এইটুকুতেই সব, এর বাইরে আর কিছু নেই, কলকাতাই শহর, দিল্লী, বোম্বে কোন শহর নাকি, তাহলে বুঝতে হবে সে তামসিক জ্ঞানকে আশ্রয় করে আছে, তার বিনাশ ছাড়া আর কোন গত্যন্তর নেই।

আমরা জ্ঞান কি জানলাম, যে জিনিষটা কাজে প্রেরণা দিচ্ছে। আমরা এর আগেও বলেছি যে অবিদ্যাকে আমরা নাশ করতে পারব না, অবিদ্যাজনিত কামও সহজে যাবে না, কাম থেকে সব সময় জন্ম নিচ্ছে কর্ম, তাই কর্মকেই আমরা হাতের কাছে পাচ্ছি, একেই প্রথকে ঠিক করতে হবে। তাই এখানে কর্মের পুরো কাঁটাছেড়া করা হয়েছে। কর্মের স্বরূপগুলোকে জেনে নিয়ে এবার নিজেকে দেখতে হবে আমি কোথায় দাঁড়িয়ে আছি। আমি খেয়ে কি মনে করতে পারছি আমার খাওয়াতে আমার স্ত্রীরও খাওয়া হয়ে গেল, হয়তো মনে করতে পারি, কিন্তু স্ত্রীর খাওয়া হলে আমারও খাওয়া হয়ে গেল এটা মনে করতে পারছি না, তাহলে কিন্তু আমার সাত্ত্বিক জ্ঞান হয়নি। ছেলের খাওয়া হলে মা মনে করে আমারই খাওয়া হল তাই মা হচ্ছে মহৎ। কিন্তু ভাই ভাইয়ের খাওয়া হলে মনে করতে পারেনা যে আমারও খাওয়া হল, তাই ভাই কখন গ্রেট হয় না। যখন মনে হয় আমরা সবাই এক, এই বিভাজনটা একটা কাল্পনিক তখন এই জ্ঞানটাই সবচাইতে উচ্চতম জ্ঞান। জ্ঞানের পর এবার সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ক্রিয়ার কথা বলা হচ্ছে –

**নিয়তং সঙ্গরহিতমরাগদ্বেষতঃ কৃতম্। অফলপ্রেপ্সুনা কর্ম যৎ তৎ সাত্ত্বিকমুচ্যতে।।২৩।।**

সাত্ত্বিক কর্ম কোনগুলো? মানুষ যখন নিয়তং কর্ম করে, অর্থাৎ যেটা নিত্য কর্তব্য কর্ম সেই কর্মই করবে, নিত্য কর্তব্য কর্মের বাইরে কোন কর্ম করবে না, কর্তব্য কর্মের বাইরে কোন কর্ম না করার অর্থ হচ্ছে নিজের কামনা বাসনা পুর্তির জন্য কোন কর্ম করবে না, তখন সেই কর্মই সাত্ত্বিক কর্ম। আসলে মানুষের নিয়ত কর্ম এত বেশি যে সব কর্তব্য কর্মকে সামলে ওঠা খুব মুশকিল হয়। যেমন একজন সন্ন্যাসী, তাঁর খাওয়া পড়ার দায়ীত্ব তিনি যে আশ্রমে আছেন সেই আশ্রমের। এখন সন্ন্যাসী যদি কোন কাজের দায়ীত্বে না থাকে তাহলে তাঁর করার কিছু থাকছে না, কিন্তু তা সত্ত্বেও সন্ন্যাসীদের কত কাজ করতে হয়, হয়তো অধ্যাপনা করতে

হয়, আশ্রমের যাতে কোন ক্ষতি না হয় সেটা সব সময় দেখতে হবে, সন্ন্যাসী ভাইয়েদের যাতে কোন ক্ষতি না হয় দেখতে হবে, আশ্রমে যারা আসছে তাদের যাতে কোন অসুবিধা না হয় সেটাও দেখতে হবে। এখানেই কর্তব্য কর্মের মধ্যে কত কর্ম চলে আসছে। এগুলো সবই নিয়ত কর্মের মধ্যে পড়ছে।

এই নিয়ত কর্ম কিভাবে করবে? *সঙ্গরহিত*, কোন রকম আসক্তি থাকবে না, কোন রাগ-দ্বেষ সেই কর্মের মধ্যে থাকবে না। একটা কর্তব্য কাজ সামনে এসে পড়লে যেন না বলে – এই ঝামেলাটা আবার কোত্থেকে এসে গেল। হঠাৎ করে পরিচিত একজন আমার বাড়িতে চলে এলেন, এখন অতিথি এলে তাকে আদর আপ্যায়ন করতে হবে, কিন্তু তা না করে গিন্নীকে ডেকে বলছি – ওগো কি আপদ কোত্থেকে যে ভদ্রলোক চলে এলেন, এখন দাও চা বিস্কুট যা দেবার দিয়ে বিদেয় কর, আমাদের বেরোনর ছিল সেটা আর হবে না মনে হচ্ছে। চা বিস্কুট দিয়ে একটু ভদ্রতার খাতিরে দুই একটা ভালো-মন্দ কথা বলতে বলতে মনে মনে ভাবছি কখন বিদেয় হবে। তার মানে আমি নিয়ত কর্ম করলাম না। *অফলপ্রেপ্সুনা কর্ম*, কোন ফলেরও আশা করবে না। কোন কামনা বাসনা নিয়ে যখন কর্ম করা হয় তখন সেই কর্মই হয়ে যায় রাজসিক কর্ম –

**যৎ তু কামেপ্সু না কর্ম সাহঙ্কারেণ বা পুনঃ। ক্রিয়তে বহুলায়াসং তদ্ রাজসমুদাহৃতম্।।২৪।।**

*ক্রিয়তে বহুলায়াসং*, অনেক পরিশ্রম করে, অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে কোন কাজ করা হল, কেন করা হল? *কামেপ্সু না*, ভোগের ইচ্ছাবশতঃ, *সাহঙ্কারেণ*, কোন না কোন ভাবে তার মধ্যে অহঙ্কার জড়িয়ে আছে, এই সব কর্মই হচ্ছে রাজসিক কর্ম। এখানে বলা হচ্ছে *সাহঙ্কারেণ*, অহঙ্কার যুক্ত, কিন্তু যাঁর সাত্ত্বিক জ্ঞান তাঁরও তো জ্ঞান হয়নি, সুতরাং তাঁরও অহঙ্কার আছে, ব্রহ্মজ্ঞান যারই হয়নি তারই অহঙ্কার থাকবে, তাহলে এখানেই কেন *সাহঙ্কারেণ* বলা হল? আচার্য শঙ্কর তাঁর ভাষ্যে বলছেন – যেমন যাঁরা ঠিক ঠিক পণ্ডিত, বিদগ্ধ ব্রাহ্মণ তাঁদেরকে বলা হয় নিরহঙ্কারী। সাত্ত্বিক হলেও তাঁর অহঙ্কার থাকবে, কিন্তু ঐ অহঙ্কারটা জ্ঞানের সঙ্গে জড়িয়ে আছে, যেমন চতুর্দশ অধ্যায়ে বলা হয়েছিল *সুখসঙ্গেন বধ্নাতি জ্ঞানসঙ্গেন চানঘ*, যাঁরই জ্ঞানের বোধ আছে, যাঁরই সুখের বোধ আছে তাঁরই অহঙ্কার আছে। কিন্তু এই অহঙ্কার হচ্ছে উচ্চ ধরণের অহঙ্কার আর বাকি যত অহঙ্কার সব নিম্ন প্রকৃতির অহঙ্কার। রজোগুণীর এই অহঙ্কার নিম্ন প্রকৃতির অহঙ্কার। তৃতীয় হচ্ছে তামসিক ক্রিয়া –

**অনুবন্ধং ক্ষয়ং হিংসামনপেক্ষ্য চ পৌরুষম্। মোহাদারভ্যতে কর্ম যৎ তৎ তামসমুচ্যতে।।২৫।।**

*অনুবন্ধং*, কাজের পরিণামের কথা না ভেবেই কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ে, আগে তো কাজে নেমে পড়ি পরে দেখা যাবে। *ক্ষয়ং*, কাজের পরিণাম না ভেবে নেমে তো পড়ল, কিন্তু নেমে পড়ে দেখে প্রচুর অর্থ আর শারীরকি ও মানসিক শক্তির অপচয় হয়ে গেল। *হিংসাম্* প্রচুর হিংসার আশ্রয় নিয়ে কাজ করে, অনেক লোককে কষ্ট দিয়ে সেই কাজ করা হল। ট্রাক, লরি, বাস দাঁড় করিয়ে জোর করে চাঁদা আদায় করা এটাও হিংসা। *অনপেক্ষ্য চ পৌরুষম্*, নিজের পৌরুষের, আমার কতটা ক্ষমতা আছে সেটা বিচার না করেই কাজে ঝাঁপিয়ে পড়বে। আমি দুর্গাপূজা করব আর প্রচুর বলি দেব। আর *মোহাদারভ্যতে কর্ম*, মতি ভ্রষ্ট হয়ে, মোহবশতঃ কাজে নামে। এইগুলো সব তামসিক কাজ। যে কোন কাজ করার সময় বিচার করতে হয়, যে কাজটা করতে যাচ্ছি এটা কি নিয়ত কর্ম মানে কর্তব্য কর্ম করছি, না কাম্য কর্ম করছি, কোন ইচ্ছা বশতঃ করছি। আর তৃতীয় হচ্ছে কোন আগু পিছু না ভেবে কোন কিছু বিচার না করে, অর্থের সামর্থ আছে কিনা, এর পরিণাম কি হবে, শক্তি আমার ক্ষয় হবে কিনা এগুলো না বিচার করে কাজে ঝাঁপিয়ে পড়া।

এতক্ষণ সাত্ত্বিক জ্ঞান, রাজসিক জ্ঞান আর তামসিক জ্ঞান এবং সাত্ত্বিক ক্রিয়া, রাজসিক ক্রিয়া আর তামসিক ক্রিয়ার কথা বলা হল, এরপর বলছেন সাত্ত্বিক কর্তা, রাজসিক কর্তা এবং তামসিক কর্তা কাকে বলে। সাত্ত্বিক কর্তা কে –

**মুক্তোসঙ্গোহনহংবাদী ধৃত্যুৎসাহসমন্বিতঃ। সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোর্নির্বিকারঃ কর্তা সাত্ত্বিক উচ্যতে।।২৬।।**

এই ভাবগুলোকে গীতাতে এর আগেও আলোচনা করা হয়েছে, এখানে সেই ভাবগুলোকে আবার সংক্ষেপে বলা হচ্ছে। *মুক্তোসঙ্গঃ*, অনাসক্ত, কোন কিছুতে আসক্ত হয় না, আমার কর্তব্য তাই আমি করে দিলাম, ভালো হল কি খারাপ হল সেটা আমাকে স্পর্শ করবে না। যিনি আচার্য তিনি শাস্ত্র অধ্যয়ণ করে শিষ্যদের উপদেশ দিচ্ছেন, তার জন্য নিজেকে ভালো করে প্রস্তুতি করে এসেছেন, এখন কেউ তাঁর উপদেশ দেওয়াকে প্রশংসা করল কি নিন্দা করল সেই ব্যাপারে আচার্যের কোন দৃষ্টি থাকবে না। *অনহংবাদী*, সাত্ত্বিক কর্তা কখনই মনে করে না যে আমি এই কাজটা করছি, তিনি জানেন যে আমার শরীর, মন, ইন্দ্রিয় এই কাজগুলো করছে। *ধৃত্যুৎসাহসমন্বিতঃ*, ধৃতি হচ্ছে ধরে রাখা, সাধারণ লোকেরা একটা কাজ করার পরই তার শরীরের শক্তি আস্তে আস্তে ক্ষয় হতে শুরু করে, সাত্ত্বিক কর্তা সেই শক্তিটাকে ধরে রাখে, যেটা তার শক্তিকে ধরে রাখছে তাকেই বলা হচ্ছে ধৃতি। *উৎসাহ*, অনেকে মনে করে মনের মত কাজ করতে পেলে জীবনে শান্তি পাওয়া যাবে। কিন্তু যদি কেউ ঠিক ঠিক শান্তি জীবনে পেতে চায় তাহলে তাকে একই ধরণের কাজ করলে চলবে না, কাজ পাল্টান মানেই তার বিশ্রাম হয়ে গেল। আচার্য ক্লাশ নিচ্ছেন এখানে তিনি তাঁর ধৃতিকে ধরে রেখেছেন, ক্লাশ শেষ হলেই অন্য এক শহরে তাঁকে ভাষণ দিতে যেতে হবে। ক্লাশ শেষ হওয়ার পর গাড়িতে যেতে

হবে সেখানে তার বিশ্রাম হয়ে গেল। যেতে যেতে ক্লান্তি এসে গেল, যখন আবার ক্লাশ শুরু করলেন তখন সেই ভ্রমণ ক্লান্তি চলে গিয়ে আবার বিশ্রাম এসে গেল। ওখান থেকে আবার ফিরে আসতে হবে, পথে গাড়িতে আবার বিশ্রাম, ঘরে এসে লিখতে বা পড়তে বসলেন তখন ঐটাই তার বিশ্রাম। লেখাপড়া যখন হয়ে যাবে তখন ঘুমোতে যাবেন সেটাও বিশ্রাম। এই দৃষ্টিভঙ্গি না এলে অশান্তি লেগেই থাকবে। যে মনে করছে এতক্ষণ কাজ করার পর এক কাপ চা খাওয়া যাক, চা খাওয়ার সময় তার একটু বিরাম, কিন্তু এখন যদি ভাবে চা খাওয়ার পর আবার কাজ, আবার পরিশ্রম তার আর জীবনে দুঃখের শেষ নেই। একেকটা কাজের থেকে অন্য কাজে যখন যাচ্ছে তখন প্রত্যেকটি কাজ থেকে তাকে আনন্দকে নিংড়ে নিতে হবে। সকালে বাড়ি থেকে অফিসে যাওয়ার সময় যে মনে করছে আমি কসাইখানাতে যাচ্ছি, আর অফিস থেকে বাড়ি ফেরার সময় যদি মনে করে বাঃবাঃ হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম, তাহলে তাকে বুঝে নিতে হবে যে, মনস্তাত্ত্বিক ডাক্তারের চেম্বারে তার নাম লেখান হল বলে। যে কাজটা করছি তখন এই কাজটাই আমার সব কিছু, এই ভাব না থাকলে অশান্তি, দুঃখকে কেউ আটকাতে পারবে না। এইজন্যই এখানে ধৃতি আর উৎসাহের কথা একসাথে বলা হল, ধৃতি মানে যখন যেটা করে যাচ্ছে সেটাকেই মন-প্রাণ দিয়ে ধরে থাকছে, আর উৎসাহ এই কাজটাই আমার জন্য সব।

*সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোর্নির্বিকারঃ*, এইভাবে কাজ করার পর আমাকে লোকে ভালো বলল কি মন্দ বলল তাতে আমার কিছু যায় আসে না, আমার ক্ষমতার পুরোটাই ঢেলে দিয়েছি। এরপর কাজের প্রশংসা বা নিন্দায় সাত্ত্বিক কর্তা নির্বিকার থাকছে। মূল কথা হল শাস্ত্রের আদেশে, গুরুর আদেশে সে কর্মে প্রবৃত্ত হয়েছে, নিজের কোন বিশেষ উদ্দেশ্য নেই। এরপর রাজসিক কর্তার বর্ণনা করা হচ্ছে –

**রাগী কর্মফলপ্রেপ্সুর্লুব্ধো হিংসাত্মকোঽশুচিঃ। হর্ষশোকান্বিতঃ কর্তা রাজসঃ পরিকীর্তিতঃ।।২৭।।**

রাজসিক কর্তার সব কিছুতেই আসক্তি লেগেই থাকে। *কর্মফলপ্রেপ্সুঃ* সব সময় কর্মের পরিণাম আর ফলের ব্যাপারে উদ্বিগ্ন হয়ে থাকে। বাচ্চারা যখন ‘অ’ লিখতে শুরু করে তখন স্লেটে একবার ‘অ’ যদি ঠিক মত লিখতে পারে তখন সারা পাড়াতে দেখিয়ে বেড়াবে আমি ‘অ’ লিখেছি, ‘অ’ লেখাটা কেমন হয়েছে জানতে চাইবে। একটা কাজ করে সেই কাজটা কেমন হয়েছে লোকে দেখে বলুক, এই ভাবটা অল্প বিস্তর সবারই হয়, আসলে এগুলো ছেলেমানুষী, একটা বয়স পর্যন্ত ঠিক আছে বড় হয়েও এগুলো করা মানে মস্তিষ্কের বিকৃতি। এগুলো হচ্ছে রাজসিক কর্তার লক্ষণ। *লুব্ধঃ*, অপরের জিনিষের প্রতি লোভ, শুধু অপরের জিনিষের প্রতিই নয়, কারুর প্রশংসা হলে, কারুর আনন্দ হলে রাজসিক কর্তার গাত্রদাহ শুরু হয়ে যাবে। *হিংসা*, দরকার পড়লে কারুকে খুনও করে দিতে পারে। *অশুচিঃ*, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে না। *হর্ষশোকান্বিতঃ*, ভালো কিছু হলেই আনন্দে লাফালাফি শুরু করে দেবে আর খারাপ কিছু হলে ভেঙ্গে পড়বে। এরা হল রাজসিক কর্তা। এরপর তামসিক কর্তার কথা বলা হচ্ছে –

**অযুক্তঃ প্রাকৃতঃ স্তব্ধঃ শঠো নৈষ্কৃতিকোঽলসঃ। বিষাদী দীর্ঘসূত্রী চ কর্তা তামস উচ্যতে।।২৮।।**

*অযুক্তঃ*, কোন কিছুতেই মনকে সমাহিত চিত্ত করে পারেনা। বেশির ভাগ ভক্তই জপের সময় ঘুমিয়ে পড়ে আর ঘুমোবার সময় বই পড়বে। যখন বই পড়ার কথা তখন জপ করতে চলে যায়। সব কিছুই করছে, কিন্তু যখন যে কাজ করার কথা তখন সেই কাজ করবে না। জপ করার সময় ভাবছে, ঠাকুর বলেছেন ধর্মীয় বই পড়া আর জপ করা সমান। বই পড়তে চলে গেল, বই পড়ার সময় ভাবছে, আচ্ছা বই পড়া আর ঠাকুরের সিনেমা দেখাতো একই, আচ্ছা এই ভিডিওটা একটু চালিয়ে দেখলে হয়। এবার ভিডিও চালিয়ে বসার পর কখন যে ঠাকুরের সিনেমা টিভির সিরিয়ালে ঢুকে গেছে বুঝতেই পারবে না। জপ থেকে একেবারে টিভি সিরিয়ালে চলে গেছে। *প্রাকৃতঃ*, মানে অত্যন্ত অসংস্কৃত বুদ্ধি, বুদ্ধি বলে কিছু নেই। যেমনটি জন্মেছে তেমনটিই আছে। এরা শাস্ত্র পড়বে না, গুরু সঙ্গ করে না, সাধু সঙ্গ করে না, সেইজন্য মস্তিষ্কটা পুরোপুরি অসংস্কৃত। প্রাকৃত বুদ্ধি মানে বাচ্চাদের বুদ্ধি। *স্তব্ধঃ*, আমি কারুর সামনে মাথা নোয়াবো না, এটাকে বলা হচ্ছে *স্তব্ধঃ*। *শঠঃ*, এখানে শঠ মানে হচ্ছে মায়াবী। নানা রকমের কৌশল অবলম্বন করে ছলনা করতে থাকবে, আসল জিনিষটাকে সামনে আসতে দেয় না। *নৈষ্কৃতিকঃ* হচ্ছে *পরবৃত্তি ছেদন পরঃ*, সব সময় পরিনিন্দা পরচর্চা করে বেড়ায়। *অলসঃ*, কুঁড়ে, কোন দিন পাঁচটায় উঠল, কোন দিন দশটায় উঠল। *বিশাদী*, সব সময় চোখের জল ফেলছে। *দীর্ঘসূত্রী*, আজ হবে কাল হবে করে কাজটাকে ফেলে রাখে।

এরপর বুদ্ধি আর ধৃতির সম্বন্ধে বলা হচ্ছে। বুদ্ধি হচ্ছে করণ, যেটা দিয়ে করা হয়, আর বুদ্ধিকে যে ধরে রাখে সেটা হচ্ছে ধৃতি, ধৃতিও করণের মধ্যে পড়ে। বুদ্ধি জ্ঞানের শক্তি আর ধৃতি কর্মের শক্তিকে সরবরাহ করে। বুদ্ধির জন্যই মানুষ জ্ঞান ও কর্মের দিকে এগোয়, সেইজন্য বুদ্ধির আলোচনটা করা খুব দরকার। এবারে সাত্ত্বিক বুদ্ধি, রাজসিক বুদ্ধি আর তামসিক বুদ্ধির কথা বলা হচ্ছে –

**বুদ্ধের্ভেদং ধৃতেশ্চৈব গুণতিস্ত্রিবিধং শৃণু। প্রোচ্যমানমশেষেণ পৃথক্‌ত্বেন ধনঞ্জয়।।২৯।।**

হে অর্জুন, সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণানুসারে এবার বুদ্ধি আর ধৃতির তিন রকমের প্রভেদটাকে বিস্তারিত ভাবে তোমাকে বলছি শোন –

**প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ কার্যাকার্যে ভয়াভয়ে। বন্ধং মোক্ষঞ্চ যা বেত্তি বুদ্ধিঃ সা পার্থ সাত্ত্বিকী।।৩০।।**

সাত্ত্বিক বুদ্ধিতে কোনটা প্রবৃত্তি আর কোনটা নিবৃত্তি কর্ম বোঝা যায়, কোনটা করব কোনটা করব না এটা ভালো ভাবেই বোঝা যায়। *কার্যাকার্যে*, কোনটা আমার নিয়ত কর্ম কোনটা আমার কর্তব্য কর্ম নয় সেটা সে ভালো করে বোঝে। *ভয়াভয়ে*, ভয় আর অভয়ের কারণ, মানে কোন জিনিষকে ভয় পেতে হয় আর কোন জিনিষকে ভয় পেতে নেই এই জিনিষগুলো সাত্ত্বিক বুদ্ধিই জানিয়ে দেয়। *বন্ধং মোক্ষঞ্চ*, কোনটা বন্ধন, কোনটা মুক্তির কারণ সেটা সাত্ত্বিক বুদ্ধিতে ভালো করে বোঝা যায়। কোনটাতে প্রবৃত্ত হতে হবে, কোনটা থেকে নিবৃত্ত নিতে হবে, আমার কর্তব্য কর্ম কি, অকর্তব্য কর্ম কি, কাকে ভয় করব কোনটাকে ভয় করব না, আর বন্ধন কি কারণে হয় ও মুক্তির উপায় কি, সাত্ত্বিক বুদ্ধিতে এই জিনিষগুলো পরিষ্কার হয়ে গেলে জীবনের জটিলতা দূরীভূত হয়ে জীবন সহজ ভাবে এগিয়ে যায়। রাজসিক বুদ্ধি কি রকম?

**যয়া ধর্মমধর্মঞ্চ কার্যঞ্চাকার্যমেব চ। অযথাবৎ প্রজানাতি বুদ্ধিঃ সা পার্থ রাজসী।।৩১।।**

রাজসিক বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তি জানে ধর্মটা কি, অধর্মটা কি, কিন্তু ঠিক ঠিক পুরোটা জানেনা। ঠিক ঠিক জানেনা এই কারণেই বলা হচ্ছে যে, কখন সে ধর্মকে অধর্ম রূপে দেখে কখন অধর্মকে ধর্ম মনে করে। ধর্ম আর অধর্মের মাঝখানে যে খুব সূক্ষ্ম বিভাজন রেখা আছে সেটাকে সে ধরতে পারেনা। মানুষ জানে ভারতের শেষ ধর্ম হচ্ছে সন্ন্যাস, সেই সন্ন্যাস ধর্মের প্রতি মোটামুটি সবারই শ্রদ্ধা আছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও কোন সন্ন্যাসীর সাথে দেখা হলেই বহু লোক জিজ্ঞেস করে বসে – আপনি কেন সন্ন্যাসী হয়েছেন? আপনার কি সমস্যা হয়েছিল যে সন্ন্যাস নিয়ে নিলেন? সন্ন্যাসীর প্রতি শ্রদ্ধা আছে ঠিকই কিন্তু ঠিক ঠিক বোঝে না যে, সন্ন্যাস হচ্ছে উচ্চতম আদর্শ। কিন্তু যে ঠিক ঠিক বুঝে নিয়েছে সে বলবে – আমারও কিন্তু সন্ন্যাস আদর্শের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা আছে কিন্তু এই জন্মে আমি পারলাম না এই আদর্শকে গ্রহণ করতে। এই কথাতেই বোঝা যায় যে এর ধর্ম অধর্মের জ্ঞান আছে। রাজসিক বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তিরা কোনটা কর্তব্য ও অকর্তব্য সেটাও জানে কিন্তু কর্তব্য ও অকর্তব্যের ব্যাপারে সম্পূর্ণ রূপে নিঃসন্দেহ হতে পারে না। কখন কখন এদের কর্তব্য ও অকর্তব্যের নির্ণয়ের ব্যাপারে মনের মধ্যে সংশয় হয়। আর তামসিক জ্ঞান হচ্ছে –

**অধর্মং ধর্মমিতি যা মন্যতে তমসাবৃতা। সর্বার্থান্ বিপরীতাংশ্চ বুদ্ধিঃ সা পার্থ তামসী।।৩২।।**

তামসিক বুদ্ধিতে ধর্মটাকে অধর্ম মনে করে আর অধর্মকে ধর্ম মনে করে। যখন কেউ উচ্চ আদর্শে থেকে যদি তিনি কিছু অধর্ম করতে শুরু করেন আর তার সাফাই গাওয়ার জন্য তখনও বলছেন যে – না, এটা ঠিকই আছে তখন বুঝে নিতে হয় যে তামসিক জ্ঞান তাঁকে ঢেকে ফেলেছে। যেটা অধর্ম সেটা করা উচিৎ নয়, কিন্তু সেটাই করছেন, শুধু করেই ক্ষান্ত হচ্ছেন না, সেটাকে আবার সাফাই দেবার জন্য নানা রকমের যুক্তির অবতারণা করছেন, তার মানে তার বুদ্ধি তামসিক বুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। আমি হরিনাম করি তাই আমার আশ্রম কত বিরাট হয়েছে, আমাকে কত লোক মানে কত লোক সম্মান করছে, কিন্তু ভুলে গেছে যে হরিনাম করার উদ্দেশ্য তো এগুলো নয়, হরিনামের উদ্দেশ্য তোমার মনকে ভক্তির দিকে নিয়ে যাওয়া। তার মানে তুমি অধর্মকে ধর্ম বলে মনে করছ। সেইজন্য স্বামীজী বলছেন – যখন তুমি compromise করবে তখন তুমি মেনে নাও যে আমি পারছি না তাই compromise করছি, তাই বলে আদর্শকে নিচু করতে যেও না। সাত্ত্বিক লোকেরা আদর্শকে আদর্শ রূপেই গ্রহণ করেন, রাজসিক লোকের compromise করে কিন্তু মেনে নেয় যে আমি compromise করছি আর তামসিক লোকেরা compromise কেই আদর্শ বলে চালিয়ে দেয়। এরপর সাত্ত্বিক ধৃতি, রাজসিক ধৃতি ও তামসিক ধৃতির কথা বলা হচ্ছে –

**ধৃত্যা যয়া ধারয়তে মনঃপ্রাণেন্দ্রিয়ক্রিয়াঃ। যোগেনাব্যভিচারিণ্যা ধৃতিঃ সা পার্থ সাত্ত্বিকী।।৩৩।।**

যে জিনিষটাকে দিয়ে মন, প্রাণ, ইন্দ্রিয় আর ক্রিয়াকে ধরে রাখা হয় আর *যোগেনাব্যভিচারিণ্যা*, শাস্ত্রে যে কথা গুলো বলা হচ্ছে, যতক্ষণ ইন্দ্রিয়, মন ও প্রাণ ঐ শাস্ত্র বাক্যের দিকেই ঠেলতে থাকে ততক্ষণ ঐটাই হল সাত্ত্বিক ধৃতি। সাত্ত্বিক ধৃতির প্রথম লক্ষণই হল শাস্ত্র বিরুদ্ধ কোন কিছুর দিকে যেতে দেবে না। অষ্টাদশ অধ্যায় নিজেকে পুরোপুরি কর্মের উপর উৎসর্গ করে দিয়েছে, কারণ উদ্দেশ্য হচ্ছে শোক মোহ থেকে মুক্তি পাওয়া। শোক মোহের জন্ম হচ্ছে অবিদ্যা থেকে। শোক আর মোহ কিভাবে আসে? কাম রূপে আসে। কাম কর্মকে জন্ম দেয়। যখনই কাজ করা হয় তখনই সেই কর্ম আবার অবিদ্যাকে জন্ম দিচ্ছে। তাই যে মুক্তি চাইছে, শোক মোহ থেকে বেরোতে চাইছে, তার একটাই পথ কর্মকে আগে ঠিক করা। কর্মকে কিভাবে ঠিক করা যাবে? হয় কর্ম থেকে পুরোপুরি বেরিয়ে আসতে হবে আর নয়তো কর্মকে ভালো করতে হবে। কর্মকে ঠিক করতে গিয়ে কর্মের এতগুলো দিক আসছে। প্রথমে *কর্মচোদনা*, যে জ্ঞান তাকে কর্মের দিকে ঠেলে এগিয়ে দিচ্ছে। *কর্মচোদনার* পরই আসছে দেহ, মন ও বাক্, যার দ্বারা কর্ম করা হয়। এরপর আসছে *জ্ঞানং জ্ঞেয়ং পরিজ্ঞাতা*, এই তিনটের পর সাতখানা কারক, সব শেষে আসছে ক্রিয়া আর তার ফল। এই পুরো জিনিষগুলোকে এখন পর পর বিশ্লেষণ করা হচ্ছে। বিশ্লেষণ করতে গিয়ে প্রথমেই দেখা যাচ্ছে যে জ্ঞান আর কর্ম এই দুটো জিনিষ হয় বুদ্ধিকে দিয়ে। সেইজন্য বুদ্ধি যদি ঠিক না হয় তাহলে কিন্তু কর্মকে কখনই ঠিক করা যাবে না। বুদ্ধিকে আবার শক্তি যোগান দিচ্ছে ধৃতি, ধৃতি মানে একটা জিনিষকে ধরে রাখা। পাহাড়ের শৃঙ্গকে যখন কেউ জয় করতে যায়, অনেক উঁচুতে চলে

যাওয়ার পর থেকে একেকটা কদম ফেলতে মানুষ হাঁপাতে শুরু করে, তখন যে শক্তি তাকে বলছে, না তোমাকে আরও কয়েক কদম এগিয়ে যেতে হবে, এটা হচ্ছে ধৃতি। মন, প্রাণ আর ইন্দ্রিয় এরা ক্রিয়া করে। এই তিনটে ক্রিয়াকে যে ধরে রাখে, কোন দিক দিয়ে ধরে রাখে? *যোগেনাব্যভিচারিণ্যা*, শাস্ত্র যে কথা গুলো বলেছে সেই কথার বাইরে তাকে ডান দিক বাঁ দিক যেতে দেবে না। যে কোন কারণে হোক আমি ঠিক করেছি আমি একাদশী বা শিবরাত্রির উপবাস করছি, আমার বুদ্ধি ঠিক করে নিয়েছে আমি উপবাসে থাকব। এখন যত বেলা বাড়তে থাকছে ততই আমার শরীরের কিছু কষ্ট অনুভূতি হতে শুরু করল, আমার জলতেষ্টা পেতে শুরু করেছে। এখন ধৃতি আমার মন, প্রাণ আর ইন্দ্রিয়কে ধরে আছে যাতে আমি জলটা না খেয়ে ফেলি। আর যখন এই ধৃতি আমাকে শাস্ত্র মতে নিয়ে চলে যাবে তখন সেটাই সাত্ত্বিক ধৃতি হয়ে গেল। রাজসিক ধৃতি কি রকম?

**যয়া তু ধর্মকামার্থান্ ধৃত্যা ধারয়তেঽর্জুন। প্রসঙ্গেন ফলাকাঙ্ক্ষী ধৃতিঃ সা পার্থ রাজসী।।৩৪।।**

এবারে উপোস করতে করতে যখন জলতেষ্টা পেল, তখন আমি ভাবলাম একটু জল খেলে আর কি হবে, জল খেয়ে না হয় একটু কুলকুচো করে দেব। এবার কিন্তু আমি নিজের সাথে compromise করে নিলাম। এই কারণে সাত্ত্বিক ধৃতি সব সময় মোক্ষের দিকে নিয়ে যায়। রাজসিক ধৃত সব সময় ভোগের দিকে নিয়ে যায়। কি ভোগ? ধর্ম, অর্থ আর কাম। ধর্ম, অর্থ আর কাম মানে সব সময় মনে রাখতে হবে অর্থ রোজগার করব, কামনা বাসনা যেটা মেটানো হবে সবই শাস্ত্র বিহিত হয়ে মেটাবে। শাস্ত্রে যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সেই নির্দেশানুসারেই ধর্ম, অর্থ আর কামের দিকে যাবে। *প্রসঙ্গেন ফলাকাঙ্ক্ষী*, ধর্ম, অর্থ ও কাম ভোগ করার জন্য শাস্ত্র যেমন যেমন বলেছে, তেমন তেমন তার বুদ্ধিটা তার ধৃতিকে নিয়ে তাতে লাগিয়ে দিচ্ছে। এই ধৃতিটাই বলা হচ্ছে রাজসিক ধৃতি। তামসিক ধৃতিটা কি রকম?

**যয়া স্বপ্নং ভয়ং শোকং বিষাদং মদমেব চ। ন বিমুঞ্চতি দুর্মেধা ধৃতিঃ সা পার্থ তামসী।।৩৫।।**

ধৃতি হচ্ছে ধরে রাখা, আমি যেমন জপ-ধ্যান করছি তখন আমাকে জপ-ধ্যানে এই ধৃতি ধরে রাখছে, ঠিক তেমনি যখন ফল ভোগ করা হয় সেখানেও ধৃতি ধরে রাখে। আর কোথায় ধরে রাখে? *যয়া স্বপ্নং*, যখন ঘুমোচ্ছি, যখন ঘুম ভাঙার কথা তখন ভাবছি আরেকটু শুয়ে থাকে, এটাও ধৃতি, ঘুমোতে ধরে রাখছে। *ভয়ং*, কোন কারণে ভয় পাচ্ছি, মন থেকে ভয় কিছুতেই যাচ্ছে না, ভয়টাকে ধরে রেখেছে। *শোকং*, যখন কোন কারণে শোক পেয়ে গেল তখন শোক থেকে আর বেরোতে চায় না। *বিষাদং*, মনটে ভার হয়ে গেল, সে ভারটাকে লাঘব করতে আর চাইছে না। *মদং*, তুমি জানো না আমি কে, আমি কখন কারুর সামনে মাথা নুইয়ে কথা বলি না, এই ধরণের মনোভাবের সাথে যে একাত্ম হয়ে সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে পারেনা, *ন বিমুঞ্চতি দুর্মেধা*, যার বুদ্ধিটা নাশ হয়ে গেছে তারা এখান থেকে সরতে পারেনা। আসলে এদের কাছে বিষয়রস সেবনটাই প্রাথমিক গুরুত্ব, ভোগ ছাড়া এরা জীবনের আর কিছুই জানেনা। সাত্ত্বিক ধৃতি মোক্ষের দিকে নিয়ে যায়, রাজসিক ধৃতি ধর্ম, অর্থ আর কামের দিকে নিয়ে যায় আর তামসিক ধৃতি শুধু বিষয় ভোগের দিকে নিয়ে যায়, কি করে শুধু ভোগ করা যায় ধৃতিটা শুধু সেই দিকেই থাকে।

সব শেষে আসছে ফল, ফল মানে সুখ। মানুষ যখনই কোন কাজ করে তার ফল হচ্ছে সুখ। এই সুখও তিন প্রকারের, সাত্ত্বিক সুখ, রাজসিক সুখ আর তামসিক সুখ। বলছেন –

**সুখং ত্বিদানীং ত্রিবিধং শৃণু মে ভরতর্ষভ। অভ্যাসাদ্ রমতে যত্র দুঃখান্তঞ্চ নিগচ্ছতি।।৩৬।।**

হে অর্জুন, তোমাকে আমি এবার তিন ধরণের সুখের কথা বলব। যে সুখে মানুষ অনেক অভ্যেসে করে করে মনকে নিযুক্ত করে, অর্থাৎ যে সুখে মন লাগানোর জন্য মানুষকে খুব পরিশ্রম করতে হয় সেই সুখটাই হচ্ছে সাত্ত্বিক সুখ। এখন আমরা যে কাজগুলো করছি তার মধ্যে কোন্ সুখ আছে যেটা আমরা অনেক পরিশ্রম করে, অনেক দিন অভ্যাস করার পর পাচ্ছি? এটা সবচেয়ে বেশি হয় জপ-ধ্যানে। মানুষ জপ-ধ্যান করতে পারেনা। যে মানুষটি এখন জপ-ধ্যান করে সুখ পাচ্ছে, সেটা সে অনেক দিন ধরে অভ্যাস করে করে জপ-ধ্যানে মন লাগিয়ে পাচ্ছে। ঐ মন লাগানো হয়ে গেলে একটা বয়সের পর থেকে সে জপ-ধ্যান থেকে সুখ পেতে শুরু করে। এই ধরণের সুখ এলে অন্য জিনিষ থেকে যদি কোন দুঃখও আসে, সেই দুঃখ থেকে রেহাই পাওয়া যায়। ঠাকুরও এই সুখের কথা কথামৃতে অন্য ভাবে বলছেন – বিষয়ানন্দ, ভজনানন্দ আর ব্রহ্মানন্দ। ভজনানন্দ আর ব্রহ্মানন্দের আস্বাদ অভ্যাস করে করে পাওয়া যায়। বিষয়ানন্দের জন্য অভ্যাস করতে হয় না। বিষয় ভোগে শুধু ঝাঁপিয়ে পড়লেই হল, শূয়োর যেমন কাদার মধ্যে ঝাঁপিয়ে আনন্দ পায়। কিন্তু বিষয়ানন্দ ছাড়া অন্য যে কোন উচ্চতর আনন্দের আস্বাদ পেতে হলে বার বার সেই জিনিষটার চর্চা করতে হয়, যেমন একজন বই পড়তে ভালোবাসে, এই বই পড়ার আনন্দটা তার একদিনেই আসেনি, অনেক দিন ধরে একটা অভ্যাসকে অনুশীলন করে করে বই পড়াটাকে সংস্কারে নিয়ে এসেছে। রাত্রে শোবার আগে বই পড়ে তার মনটা শান্ত করে শুতে যাচ্ছে। সুখ যেটা আমি পাচ্ছি, একটা জিনিষকে অনেক দিন ধরে চর্চা করা হয়েছে, চর্চা করে করে সেটা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে, এবার সে সেখান থেকে সুখ পাচ্ছে, এই সুখটাই হচ্ছে সাত্ত্বিক সুখ। কিন্তু নাটক, নভেল, সিনেমার গল্প পড়ে, টিভি দেখে ঘুমোতে

যাচ্ছি, তার মানে আমার মনের শেষ খোরাক হচ্ছে এইগুলো, তার মানে আমার মনের শান্তি কোন দিনই আর আসবে না। সাত্ত্বিক সুখের বৈশিষ্ট্য কি কি?

**যৎ তদগ্রে বিষমিব পরিণামেঽমৃতোপমম্। তৎ সুখং সাত্ত্বিকং প্রোক্তমাত্মবুদ্ধিপ্রসাদজম্।।৩৭।।**

সাত্ত্বিক সুখ পাওয়ার আগে যে পরিশ্রমটা হয় তাতে প্রচণ্ড কষ্ট হয়, বলছেন *অগ্রে বিষমিব*, প্রথম দিকে পরিশ্রমটা বিষতুল্য লাগে, প্রচণ্ড কষ্ট হয়। যেমন জপ-ধ্যানের ব্যাপারেই, প্রথমে কি কষ্ট দায়ক, কিছুতেই মন বসতে চায় না। কিন্তু পরে এর পরিণাম *অমৃতোপমম্*, অমৃতের মত লাগে। শুধু জপ-ধ্যানেই নয়, যে কোন পরিশ্রম সাপেক্ষ কর্মের পরিণাম এই রকমই হয়ে থাকে। এই ধরণের সুখ হচ্ছে ঠিক ঠিক সাত্ত্বিক সুখ। *আত্মবুদ্ধিপ্রসাদজম্*, এই সুখটা কেবল আত্মবুদ্ধি বা আত্মনিষ্ঠ বুদ্ধির নির্মলতা থেকেই উৎপন্ন হয়। রাজসিক সুখ হচ্ছে –

**বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগাদ্ যৎ তদগ্রেঽমৃতোপমম্। পরিণামে বিষমিব তৎ সুখং রাজসং স্মৃতম্।।৩৮।।**

ইন্দ্রিয়ের সাথে বিষয়ের সংযোগ হেতু যে ভোগ হয়, প্রথমে সেই ভোগ করাকে অমৃতের মত সুখকর মনে হয়। বিষয় ভোগে সবারই কি আনন্দই না হয়ে থাকে। কিন্তু পরিণামে এই সুখটাই অত্যন্ত পীড়াদায়ক হয়ে ওঠে, *পরিণামে বিষমিব*। যারা চিংড়ি মাছ খেতে ভালোবাসে অথচ খেলে এলার্জি হয়, বিয়ে বাড়িতে চিংড়ি মাছের মালাইকারি হয়েছে, এক মিনিট সে ভাববে খাবো কি খাবো না। তারপরেই বিষয়ের সাথে ইন্দ্রিয়ের সংযোগ হয়ে যায়, চিংড়ি দেখে আর লোভ সামলাতে পারছে না। খেয়ে নিল, খুব আনন্দ হল, তৃপ্তি হল। এরপর দুদিন পেটের ব্যাথায় বিছানাতে কাতরাতে থাকল। এখানে ইন্দ্রিয়ের সাথে বিষয়ের সংযোগ হয়েছে, *অমৃতোপমম্* হয়েছে, তারপরেই *বিষমিব*। এটা হচ্ছে রাজসিক সুখ। এখানে অভ্যাস বা পরিশ্রমের কিছু নেই, শুধু ইন্দ্রিয় আর বিষয়ের সংযোগটা হয়েছে, এর ফল সব সময় বিষমিব। যারা ডায়বেটিকসের রোগী তারাও মিষ্টি দেখে বলে লোভ সামলাতে পারলাম না, দুটো খেয়ে নিলাম, এর পরিণাম কি হবে সবাই জানে। তামসিক সুখ কি রকম?

**যদগ্রে চানুবন্ধে চ সুখং মোহনমাত্মনঃ। নিদ্রালস্যপ্রমাদোত্থং তৎ তামসমুদাহৃতম্।।৩৯।।**

যে জিনিষ ভোগের আগে এবং ভোগের পরে সব সময় আত্মাকে মোহিত করে রাখে, আর নিদ্রা, আলস্য, প্রমাদ এইগুলো থেকে যে সুখের জন্ম হয়েছে এই সুখগুলো সব সময় তামসিক। তামসিক সুখে কি হয়? খাওয়ার সময়ও কষ্ট খাওয়ার পরেও কষ্ট, ঠাকুর সেইজন্য সংসারকে বলছেন আমড়া, আটি আর চামড়া, খেলে অম্লশূল। আমড়া যখন খাচ্ছে তখন খেয়েও সুখ নেই, আমড়াতে আটি আর চামড়া ছাড়া কিছু নেই, খেয়ে আবার অম্লশূল হয়। যখন করছে তখনও কষ্ট পাচ্ছে, যখন ভোগ করছে তখনও কষ্ট, ভোগের পরেও কষ্ট, এর জন্য তামসিক লোকেরা সব সময় নিদ্রা, আলস্য আর প্রমাদে ডুবে থাকে। প্রমাদ হচ্ছে সংশয়, যে কোন ধরণের সংশয় হতে পারে আর এগুলো ভয়াদিতে গিয়ে শেষ হয়। এখানে এই প্রকরণটা শেষ হয়ে গেল। এরপর বলছেন –

**ন তদস্তি পৃথিব্যাং বা দিবি দেবেষু বা পুনঃ। সত্ত্বং প্রকৃতিজৈর্মুক্তং যদেভিঃ স্যাত্রিভির্গুণৈঃ।।৪০।।**

হে অর্জুন, এই সংসারে, এই সৃষ্টিতে এমন কোন জিনিষ নেই যেটা এই তিনটে গুণের মানে সত্ত্ব, রজো আর তমোর বাইরে। এই তিনটে গুণের আলোচনা প্রথম শুরু হয়েছিল সপ্তদশ অধ্যায়ে, যদিও চতুর্দশ অধ্যায়ের নাম ছিল গুণত্রয়বিভাগযোগ, সেখানে তিনটে গুণ নিয়ে যা বলেছিলেন, অষ্টাদশ অধ্যায়ে আবার এই তিনটে গুণকে নিয়ে আরও গভীরে আলোচনাটাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছেন। আসলে মহাভারত গ্রন্থকে বলা যায় সমণ্বয় শাস্ত্র, মহাভারতে হিন্দুধর্মের যে সমন্বয় করা হয়েছে বেদ উপনিষদে সে রকম সমণ্বয় বলে কিছু নেই, এমনকি বাল্মীকি রামায়ণেও হিন্দুধর্মের সেই রকম সমণ্বয় বলে কিছু করা হয়নি। মহাভারত থেকে সমণ্বয়ের চিন্তা ভাবনা শুরু হয়। গীতা মহাভারতেরই অঙ্গ, এখানে তাই হিন্দুধর্মের বেদের সময় থেকে মহাভারত পর্যন্ত যত রকমের চিন্তা ভাবনা এসেছে সব চিন্তা ভাবনাগুলোকে synt hesi se করা হয়েছে। গীতাতে সব থেকে বৃহৎ যে সমণ্বয় করা হয়েছে তা হল, সাংখ্য, বেদান্ত মানে উপনিষদের দর্শন, যোগ আর ভক্তির উপাদান বলতে যা কিছু ছিল সবগুলোকে সমণ্বয় করা হচ্ছে।

কপিল মুনির সাংখ্যদর্শনে যেভাবে প্রকৃতির তিনটে গুণের কথা সত্ত্ব, রজো আর তমোর ধারণাকে জোর দেওয়া হয়েছে সেইভাবে কিন্তু উপনিষদে এই জিনিষগুলোকে পাওয়া যায় না, বেদে তো একেবারেই নেই। গীতা এই জিনিষটাকে পুরো সমণ্বয় করে দিলেন। বলছেন – সংসারে যা কিছু আছে সবই এই তিন গুণে আবদ্ধ। আর আত্মা বা ব্রহ্ম এই তিন গুণের পারে, ত্রিগুণাতীত। গীতা এখানে খুব সুন্দর কৌশল করে বেদান্তকে উপরে ধরে রাখল কিন্তু তার সাথে সাংখ্যকেও সমণ্বয় করে দিল। যদি কারুর জীবনের উদ্দেশ্য হয় মুক্তিলাভ বা এটাও যদি কারুর উদ্দেশ্য হয় আমি জীবনে সুখ পেতে চাই, তখন এই শ্লোকগুলো পড়লে বোঝা যায় কখন আমি সাত্ত্বিক কর্তা, কখন আমার ক্রিয়া সাত্ত্বিক, কখন আমার জ্ঞান সাত্ত্বিক, কখন আমার ফল সাত্ত্বিক। যখন আমি সাত্ত্বিক ফলের দিকে যেতে চাইব তখন আমার ক্রিয়া সাত্ত্বিকে রাখতে হবে, আর তার কর্তাকে সাত্ত্বিক হতে হবে। আর যদি তুমি মুক্তি চাও তাহলেও

তোমাকে এগুলো জানতে হবে। আর যদি তুমি মুক্তি কামনাকে ছেড়ে দিয়ে এই সংসারে শ্রেষ্ঠ পুরুষ হতে চাও তখনও তোমাকে এই জিনিষগুলো জানতে হবে, যাতে যত শ্রেণী বিভাজন করা হয়েছে সব কটাতেই যেন তোমার সাত্ত্বিক ভাব থাকে। তামসিকটা স্বাভাবিক, মানুষ তামসিক ভাব নিয়ে এই সংসার ও সমাজে প্রবেশ করে, সেইজন্য তামসিকটা কাউকে শেখানোর দরকার হয় না। তামসিক থেকে রাজসিকে উত্তীর্ণ হয়ে কিভাবে সাত্ত্বিকে পৌঁছানো যায় সেটাই শেখানোর উদ্দেশ্য।

২৮শে নভেম্বর, ২০১০

অষ্টাদশ অধ্যায়ের কর্মকে নিয়েই গত কয়েকদিন ধরে আলোচনা চলছে। কর্মকে যতক্ষণ না বোঝা যায়, কাজ কিভাবে হয়, কাজ করতে কি কি জিনিষ লাগে অর্থাৎ কর্মের পুরো বিশ্লেষণ না করা হলে মানুষ কর্মের রহস্যকে উদ্‌ঘাটন করতে পারবে না। আসলে আমরা সবাই কর্মের শৃঙ্খলে বাঁধা পড়ে আছি, বন্ধন থেকেই কর্ম আবার কর্মের দ্বারাই আবার একটা নতুন বন্ধন তৈরী হয়, কর্মের প্রবাহই এই সংসারকে অনাদিকাল ধরে টেনে চলছে। বন্ধন থেকেই মানুষের মনে আরও অনেক কামনা বাসনা জাগতে থাকে, ঐ কামনা বাসনার পুর্তির জন্য তাকে আরও কাজ করতে হয়, সে কাজ থেকে আবার বন্ধন, আবার কর্ম এটা চলতেই থাকে।

আমাদের মনে করিয়ে দেবার জন্য কর্মের ব্যাপারটা আবার একটু ঝালিয়ে নেওয়া যাক। কাজের পেছনে কি কি কারণ আছে? মানুষ যখনই কোন কাজ করে সেই কাজের তিনটে আশ্রয় থাকে, শরীর, মন ও বাণী, এই তিনটেকে আশ্রয় করেই যাবতীয় কাজ হচ্ছে। কর্মের দিকে তিনটে জিনিষ আমাদের ঠেলে দিচ্ছে, এই তিনটে হচ্ছে – *জ্ঞানং জ্ঞেয়ং পরিজ্ঞাতা*। যতক্ষণ মানুষ না জানে এই কাজটা করে আমার কি হবে, কেন কাজটা করব, ততক্ষণ মানুষ কাজে নামতে চাইবে না। এরপর আসছে সাতটা কারক, যে কাজই করা হোক না কেন তাতে সাতটি কারক আর কারকের বিভক্তি লেগে থাকে। সাতটা কারকের পরে থাকে ক্রিয়া ইংরাজীতে যেটাকে বলা হয় verb, যেমন খাওয়া আর সব শেষে ক্রিয়ার একটা ফল। এই পনেরোটা জিনিষ (৩+৩+৭+২) যে কোন কাজের ক্ষেত্রে লেগে থাকে। আমাদের মত সাধারণ মানুষ যখন কাজ করে তখন মনে করি আমি এই কাজটা করলাম। কিন্তু আসলে কে কাজটা করল? এই নিয়েই গীতা আলোচনা করছে। একজন মনে করছে এই শরীর কাজ করছে। শরীরটা কে? আমি এই শরীর। নিজেকে শরীরের মধ্যেই আবদ্ধ করে রেখেছে, অর্থাৎ নিজের শুদ্ধ চৈতন্য স্বভাবকে সে শরীর, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির সাথে জড়িয়ে রেখেছে। বিজ্ঞানী ও চার্বাকদের এই মত। দ্বিতীয় মত হচ্ছে, আমি আলাদা, আমার এই শরীরের ভেতরে একটা চৈতন্য সত্তা আছে সেটা আলাদা। কে কাজ করছে? এই আত্মাই সব করছে, আত্মার জন্যই যা কিছু হচ্ছে। কাজের যে ফল সুখ-দুঃখ যাই ফল হোক না কেন, সব ফল এই আত্মাই পান। এটা হল, কিছুটা নৈয়ায়িকদের মত, কিছুটা পূর্বমীমাংসকদের মত, আর খ্রীশ্চান ও ইসলামদেরও এই মত। এদের সবার থেকে একেবারে অন্য মত হচ্ছে বেদান্তের মত। বেদান্ত মতে বলবে, এই মত গুলো কিছুই নয়, আসলে আমি কোন কাজই করছি না, এই যে পনেরোটা জিনিষের সাথে যে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হল, কাজ এই পনেরো জনই করছে। তখন প্রশ্ন আসবে, তাহলে কর্তাটি কে? বেদান্ত বলছে কর্তা হলেন জীব। জীব কে? যিনি সর্বব্যাপী শুদ্ধাত্মা, মন, বুদ্ধি ও অহংকারের গ্রন্থিতে যখন এই শুদ্ধ চৈতন্যের আলো এসে পড়ে তখন এই বুদ্ধি ও অহংকার চনমন করে জ্বলে ওঠে, এখন সে মনে করছে আমি সব কিছু করছি। এর ভ্রান্তির জন্য যিনি শুদ্ধাত্মা তিনি মনে করতে শুরু করেন যে, আমি করছি, এই আমিটাকেই কর্তা বলা হচ্ছ। কিন্তু তিনি কখনই কিছু করেন না। তাঁর উপর কখনই কর্মের ছাপটা পড়ে না। আমি যতক্ষণ শত্রুর ব্যাপারটা পুরোপুরি না জানছি, প্রকৃত শত্রু কে, কোথায় কোথায় সে লুকিয়ে থাকে, তার ক্ষমতাটা কতটুকু এগুলো না জানা গেলে শত্রুকে নাশ করব কি ভাবে। কর্মই হচ্ছে মানুষের সব থেকে কাছের শত্রু, এই কর্মকে যদি নাশ করতে হয় কর্মের এই ব্যাপারগুলো পরিষ্কার ভাবে না জানা থাকলে আমরা ভুলভাল জায়গাতে হানা দিয় হয়তো ভালো জিনিষ গুলিকেই শেষ করে দেব, যার ফলে মুক্তিও আমাদের নাগালের বাইরে অনেক দূরে চলে যাবে।

গীতারও এই মত, তুমি যদি মনে কর আমি বেশ আনন্দে আছি, তাহলে থাক আনন্দে, তোমার যদি মনে দুঃখ, কষ্ট, শোক, মোহ যা হওয়ার হোক, আমি ভালোই আছি, তাহলে তুমি তাই থাক। কিন্তু যদি তোমার মনে হয় জীবনের এই দুঃখ-কষ্ট, শোক-মোহ তোমাকে অতিষ্ঠ করে রেখেছে, তুমি আর সহ্য করতে পারছ না, এর থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছ, তখন গীতা তোমাকে বলবে, তাহলে তুমি আমার কাছে এসো, আমি তোমাকে শিখিয়ে দিচ্ছি কিভাবে তুমি এই দুঃখ-কষ্ট থেকে পরিত্রাণ পাবে। সেইজন্য প্রথম থেকেই ভারতে কখন ধর্ম প্রচার করা হতো না, আর ধর্মান্তরের কোন ব্যাপার ভারতে ছিল না। আমাদের মুনি ঋষিদের বক্তব্য ছিল, যদি তোমার গাত্রদাহ বেড়ে যায়, যদি মনে কর গাত্রদাহের জ্বালা আর সহ্য করতে পারা যাচ্ছে না, তখন তুমি আমার কাছে এসো আমি বলে দেব এর থেকে কিভাবে পরিত্রাণ পাবে। হিন্দুধর্মের তাই কোন প্রচার ছিল না, হিন্দুধর্মে ঠিক ঠিক প্রচার স্বামীজী শুরু করেছিলেন শুধু খ্রীশ্চানরা যেভাবে জোর করে ধর্মান্তর করছিলেন সেটাকে প্রতিরোধ করার জন্য। আত্মরক্ষার জন্য ঐটুকু খুবই প্রয়োজন ছিল, স্বামীজী যদি এতটুকু প্রচার না করতেন তাহলে কি যে হত বলা মুশকিল, সারা ভারত থেকে হয়তো সমস্ত ধর্ম মুছে যেত। কিন্তু হিন্দুরা নিজদের ধর্ম কখনই প্রচার করে না।

যাঁরা জ্ঞানী, আত্মার দর্শন করেছে, তাঁরা আমাদের ব্যাখ্যা করে বলে দেবেন তুমি এই কারণে কষ্ট পাচ্ছ, আসলে তুমি তোমার প্রকৃত স্বরূপকে ভুলে গেছ। ফলে তোমার মনে বিভিন্ন কামনা-বাসনার উদয় হচ্ছে। কামনা-বাসনা পুরণের ইচ্ছা যখন জাগ্রত হচ্ছে তখন সেটা আবার মন, বুদ্ধির গ্রন্থিতে একাত্ম হয়ে যাচ্ছে। মন বুদ্ধি এরা নিজের মত লাফিয়ে বেড়াচ্ছে আর তুমি মনে করছ এগুলো আমি, কিন্তু ওগুলো তো তোমার নয়। কোন জিনিষের সাথে অনেক দিন সঙ্গ করতে করতে ঐ জিনিষটার সাথে আমার একটা একাত্ম বোধ জন্মায়। প্রথমে মনে করতে শুরু করছি এটা আমার, সেখান থেকে মনে হতে থাকবে এটাই আমি। এরপর কেউ যখন সেই জিনিষটাকে নিয়ে হাঁটতে শুরু করে দেয়, আমিও তার পেছনে পেছনে চলতে শুরু করে দিলাম, কারণ এর সাথে আমি এক হয়ে গেছি। অথচ এই জিনিষের সাথে আমার কোন সম্পর্কই নেই, আমি তো এই জিনিষটা নই, আর এটাও আমার নয়। যেমন বাছুরকে ধরে নিয়ে যেতে শুরু করলে গরুও তার বাছুরের পেছনে পেছনে যেতে শুরু করে দেবে। আত্মা, যিনি শুদ্ধ চৈতন্য, তাঁরও ঠিক এই দশা হয়, ভ্রান্তি বশতঃ নিজেকে মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কারের সঙ্গে একাত্ম করে নেয়। আর মন বুদ্ধির যখন খেলা চলতে থাকে তখন শুদ্ধ আত্মা মনে করে আমার কষ্ট হচ্ছে, আমার আনন্দ হচ্ছে। মন, বুদ্ধি আর অহঙ্কার নিজেদের মধ্যে খেলা করছে, কখন মারামারি করছে, কখন আনন্দ করছে। ভারত পাকিস্থানের ক্রিকেট ম্যাচ হচ্ছে, ভারতের কেউ আউট হল আমি কাঁদতে শুরু করলাম, কেউ চার ছক্কা মারল আমি আনন্দে লাফাতে শুরু করে দিলাম। সিনেমা দেখার সময় হিরো হিরোইন আনন্দ করলে আমার আনন্দ হচ্ছে, ওদের বিরহ হলে আমি কাঁদতে শুরু করলাম। মনে করছি ওদের দুঃখটা আমার, অথচ আমি কোন ভাবেই এদের সাথে জড়িয়ে নই। কোথায় কোন্ অভিনেতা অভিনেত্রী অভিনয় করেছে, সেটাকে ছবি তুলে সিনেমা দেখাচ্ছে, আমি এখন সেটাকে দেখে হতবাক হচ্ছি। আত্মার সাথে মন, বুদ্ধি আর অহঙ্কারের ঠিক এই জিনিষটাই হয়। মন, বুদ্ধিরা কুকুরের বাচ্চার মত নিজেদের মধ্যে খেলা করে যাচ্ছে, ইন্দ্রিয় ইন্দ্রিয়ার্থের উপর খেলা করছে, চোখ দৃশ্যের উপরে, কান ধ্বণির উপরে খেলা করছে, মাঝখান থেকে আমার কোন সম্পর্কই নেই অথচ এদের সাথে আমি লাফিয়ে বেড়াচ্ছি। প্রথমে বলবে তুমি নিজেকে এদের থেকে আলাদা করতে শেখ, তারপর একটা অবস্থার পর আমি নিজেই এগুলো থেকে আলাদা হয়ে যাব। মন, বুদ্ধি আর অহঙ্কারের খেলাটা তারপরে কি হবে? যেমন চলছিল তেমনই চলতে থাকবে। জগতকে কেউ পাল্টাতে পারবে না, জগৎ যেমন চলছিল তেমনই চলতে থাকবে, কিন্তু মাঝখানে আমি জগৎ থেকে যে মুগ্ধ হচ্ছিলাম, সেখান থেকে আমি সরে আসব, আমি আর মুগ্ধ হব না। এইটাই গীতা বোঝাচ্ছে, এটা হচ্ছে যাঁরা খুব উচ্চস্তরের, তত্ত্বদর্শীদের কথা। কিন্তু আমরা যারা অতি সাধারণ লোক আমরা তো এত উচ্চস্তরের কথাতে কি বলতে চাইছে বুঝতে পারব না। তখন আমাদের যাঁরা ঋষিরা ছিলেন, তাঁরা আমাদের জীবনটা যাতে একটু ভালো করে চলতে পারে, জীবনটা যাতে শান্তিপূর্ণ হয় তার জন্য তাঁরা বর্ণাশ্রম প্রথাকে নিয়ে এলেন।

ইদানিং কালে বর্ণাশ্রম প্রথা নিয়ে অনেক তর্কবিতর্ক হচ্ছে ঠিকই, কিন্তু গীতার ভাষ্য লিখতে গিয়ে আচার্য শঙ্কর স্পষ্ট করে বলেই দিয়েছেন যারা ধর্ম মানে না, বেদের কথাকে শেষ কথা বলে স্বীকার করে না, তাদের জন্য বর্ণাশ্রম ধর্ম নয়। যারা নিজের বর্ণের কাজ ঠিক ঠিক ভাবে করে উপরের দিকে উঠতে চায় তাদের জন্যই বর্ণাশ্রম ধর্ম। কিন্তু যদি কেউ মনে করে আমি যা আছি বেশ আছি, এর উপরে ওঠার আমার কোন প্রয়োজন নেই, তাহলে তাকে বর্ণাশ্রম ধর্ম মানতে হবে না। বর্ণাশ্রম ধর্ম হচ্ছে প্রকৃতির রাজ্যে মায়ার অধীনে, তাই বর্ণাশ্রম প্রথা কোন দিনই সব দিক দিয়ে ত্রুটি মুক্ত হতে পারেনা। শুধু বর্ণাশ্রম ধর্মই নয়, যে কোন প্রথা তা গণতন্ত্রই হোক আর রাজতন্ত্রই হোক বা একনায়কতন্ত্রই হোক, কোন তন্ত্রই সম্পূর্ণ ভাবে ত্রুটি মুক্ত হতে পারবে না। মেয়েদের যদি কম বয়সে বিয়ে দেওয়ার প্রথা চালু করা হয় তখন এক ধরণের সমস্যা হবে, বেশি বয়সে বিয়ে দেওয়ার রেওয়াজ চালু করলে তখন আরেক ধরণের সমস্যা হবে। আমাদের আড়াই হাজার বছরের যে ইতিহাস লিখিত হয়ে আছে, তাতে দেখা যায় কোন প্রথাই চিরস্থায়ী ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। তার মধ্যে বর্ণাশ্রম প্রথাই ভারতে সব থেকে বেশি দিন ধরে চলে এসেছে। আর এটাও ঠিক যে, ভারতের সামাজিক গঠন এমনই হয়ে আছে যে এখান থেকে বর্ণাশ্রম প্রথা আর রাজধর্মের প্রতি আনুগত্য, এই দুটো জিনিষ কোন দিনই বিলুপ্ত হবে না। এখানে যার হাতে শাসন দণ্ড তার কাছেই সবাই মাথা নত করে, আমেরিকা ও ইংল্যাণ্ডে এই জিনিষ হয় না। কিন্তু ভারতের মাটির এমনই গুণ যে এখানে দুজন লোক একত্রিত হলেই একটা জাত বানিয়ে নেবে আর যার হাতে শাসন তার কথাই শুনবে কোন প্রশ্নও করবে না রাজাকে। যে কোন একটা প্রথা দিয়ে সামাজিক ব্যধিকে কখনই দূর করা যায় না। স্বামীজী তাই বলছেন – এটা হচ্ছে বাত ব্যাধির মত, পায়ের বাত সারাতে গেলে সেটা কোমরে ধরবে, কোমর থেকে সারালে সেই বাত ঘাড়ে আসবে, কোথাও না কোথাও বাতটা থেকে যাবে। সেইজন্য কোন সামাজিক ব্যবস্থা কখনই সম্পূর্ণ রূপে সার্থক হয় না। ঐ প্রথাটাকে মেনে নিতে হয়। যখন কোন শাসক দল অত্যাচার করতে শুরু করে তখন সমাজ সেই শাসক গোষ্টিকে উল্টে ফেলে দেয়। যে এখন গদিতে এসেছে সেও কি চিরকাল থাকবে? কখনই না, যেদিন সে ফায়দা লোটার সুযোগ সন্ধান করতে শুরু করল, নিজের হাতে ক্ষমতার অপব্যবহার করে অত্যাচার করতে শুরু করবে, একটা বিন্দু পর্যন্ত সমাজ সহ্য করবে, তারপর তাকে ছুঁড়ে ফেলে দেবে।

এখানে গীতাতে যে বর্ণাশ্রমের রূপরেখা দেওয়া হয়েছে, তাতে গীতার মৌলিক দর্শন হচ্ছে জীবনের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে মুক্তি। কিন্তু সাধারণ মানুষ মুক্তির জন্য প্রস্তুত নয়। সেইজন্য সাধারণ মানুষকে ধর্ম শেখানো হয়। জন্ম সূত্রে, পরিবার সূত্রে যে কাজ তোমার কাছে এসে গেছে, সেই কাজটাকে তুমি নিষ্ঠা নিয়ে করতে থাক, কাজ করতে থাকলে তুমি সেখান থেকে আস্তে আস্তে উপরের দিকে উঠে আসবে। যেদিন আধ্যাত্মিকতার ভাব নিজে তোমার ঘাড়টাকে ধরে নেবে, সেই দিন তুমি অন্য দিকে চলে যেতে পারবে।

যে কোন বড় কাজ যখন হয়, সেই কাজটা কখনই মানুষ করতে পারেনা। যাঁরা সাহিত্য রচনা করছেন, ছবি আঁকছেন, সঙ্গীত সাধনা করছেন, বিজ্ঞানের নতুন নতুন আবিষ্কারে যে বিজ্ঞানী নিরন্তর প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছেন আর যারা আধ্যাত্মিক সাধনা করছেন, এঁদের মধ্যে যাঁদেরকে সমাজ শ্রেষ্ঠ বলে স্বীকৃতি দিচ্ছে, মৃত্যুর দুশো বছর পর একজন স্রষ্টাকে ঠিক ঠিক মূল্যায়ন হয়, এঁরা কিন্তু কোন দিন বলেন না যে এটা আমি করেছি। এঁরা বলেন আমি এই কাজটাকে ভালোবাসতাম, তারপর কোন এক অদৃশ্য শক্তি আমাকে ঘাড়ে ধরে ঐ কাজটা করিয়ে নেয়। স্বামীজীকে দেখলে জিনিষটা আরও পরিষ্কার হয়ে যায়। একটা অবস্থা পর্যন্ত তিনি নিজে সাধনা করে গেলেন, সাধনা করতে করতে একটা অবস্থার পর দেখছেন কোন কিছুই আর তাঁর এক্তিয়ারের মধ্যে নেই। সাধারণ স্তরে একটা ছেলে আর মেয়ের পরিচয়ের পর উভয় উভয়কে ভালোবাসতে শুরু করল। আলাপ থেকে ভালোবাসা হতে হতে হঠাৎ তাদের মধ্যে মিলন হয়ে গেল। এরপর একজন আরেকজনকে ঘাড় ধরে সব কিছু করাতে শুরু করে। তখন দুজনে এক হয়ে গেল। কেউ যখন যে কোন বিদ্যার সঙ্গে এক হয়ে যাবে তখন সে বিদ্যাকে নিয়ে কিছু করতে হবে না, বিদ্যাই তখন হাত ধরে তাকে সব কিছু করাতে থাকবে। একটা ছেলে যখন একটা মেয়েকে তার প্রতি আকর্ষিত করার জন্য তার বাড়ির সামনে গিয়ে ঘুরঘুর করছে, বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা মারছে, বন্ধুদের দিয়ে চিঠি পাঠায়, ধর্মটাও ঠিক তাই। মন্দিরে গিয়ে যখন প্রণাম করছে, যখন শাস্ত্র পড়ছে, পূজো করছে, জপ করছে, ধ্যান করছে এগুলো সবই হচ্ছে ভগবানের নজরটাকে তার দিকে আকৃষ্ট করার প্রচেষ্টা। আসল যে প্রেম শুরু হয়, মেয়ে যতক্ষণ না রাজী হচ্ছে ততক্ষণ শুরু হবে না। ভগবান যতক্ষণ না তাকে ধরে নিচ্ছে ততক্ষণ তার কিছুই হবে না। আধ্যাত্মিক জীবন শুরু হয় তখনই যখন ভগবান তাকে ধরবে। তার আগে পর্যন্ত আধ্যাত্মিক জীবন শুরুই হবে না, শুধু ধর্ম জীবনের মধ্যেই ঘুরপাক করতে থাকবে। আমি এখন যদি বলি হ্যাঁ আমি ভগবানকেই চাই, তাহলে আমাকেও এইভাবে ঘুরঘুর করে যেতে হবে। কতদিন করব? সেটাও ভগবানই জানেন কতদিন ঘুরঘুর করব। একশটা জন্ম হাজারটা জন্ম হতে পারে। ঘুরঘুর করতে করতে যখন ব্যাকুলতা বাড়তে থাকবে, তখন হঠাৎ ভগবান ঘাড়ে ধরে নেবেন। লেখালেখির ক্ষেত্রেও ঠিক এটাই হয়। আমি একটা ভাবকে নিয়ে মাথায় খেলাচ্ছি, খেলাতে খেলাতে এক সময় ভাবটাই আমাকে ধরে নেবে। যখন ধরে নেবে তখন মনে হবে যেন ঘাড়ে একটা পেতনী বসেছে। ঠাকুর যখন সাধনার অবস্থায় আছেন, সেই সময় তাঁর গ্রামের এক মহিলা ঠাকুরকে দেখে বলছে – বাবাঃ, মনে হচ্ছে একে যেন বাঘে ধরেছে। বাঘ যখন ছাগলকে শিকার করে তখন তাকে খেলাতে শুরু করে। ভগবান বাঘের মত যখন কাউকে ধরে নেয় তখন তাকেও আগে খেলাতে শুরু করেন, এইবার তার আধ্যাত্মিক জীবন শুরু হতে যাচ্ছে। গীতাতে পুরো এই আধ্যাত্মিকতার বর্ণনা করা হয়েছে, কিন্তু এখনও আমরা যে জায়গাটাকে আলোচনা করতে যাচ্ছি এটা খুব সাধারণ স্তরে ধর্ম কি রকম হয়, তার সম্বন্ধে বলা হচ্ছে। কারণ সাধারণ মানুষ এত কিছু করতে পারবে না, আধ্যাত্মিকতার কিছু জানেও না, বোঝেও না, তার সেই রকম আগ্রহও নেই। কিন্তু একেবারেই যে রসাতলে যেতে চায় তাও না, একটু ইচ্ছে আছে, ধর্মের ব্যাপারে একটু উৎসুকতাও আছে। তখন তাদের গীতা বলছে, Don't try to become. Be. কিছু হওয়ার চেষ্টা করো না, যা আছ তাই থাক। এটাই হচ্ছে হিন্দুধর্মের মূল কথা। খ্রীশ্চান, ইসলাম ধর্মে বা অন্যান্য ধর্মে ধর্মটা হচ্ছে becoming, আমাকে ভক্ত হতে হবে, আমাকে সন্ন্যাসী হতে হবে, যিশুর কাছে যেতে হলে আমাকে খ্রীশ্চান হতে হবে, আল্লার কাছে যেতে হলে আমাকে মুসলমান হতে হবে, মানে আমি আছি একটা হতে হবে আরেকটা। হিন্দুধর্মে বলে – না, তোমাকে কিছু হতে হবে না, তুমি যা আছ তাই, তুমি নারী হও পুরুষ হও, যাই হও তোমাকে আর কিছু হতে হবে না। এখন যদি কোন ধর্ম বলে পুরুষ না হওয়া পর্যন্ত কোন গতি না, যেমন বৈষ্ণব ধর্ম বলে কৃষ্ণ ছাড়া গতি নাই, তার মানে আমাকে কৃষ্ণ ভক্ত হতে হবে, এই ধরণের চিন্তা ভাবনা সম্পূর্ণ রূপে হিন্দুধর্মের মূল আদর্শের বিরুদ্ধে যাচ্ছে। সেইজন্য গোঁড়া বৈষ্ণবদের হিন্দুধর্ম স্বীকার করেনা, মাধ্বাচার্যকেও তাই হিন্দুধর্ম গুরুত্ব দেয়নি।

এখন একজন এসে বলল, আমি কলেজে অধ্যাপনা করি আমি কি ধার্মিক হতে পারি? হিন্দুধর্ম বলবে হ্যাঁ পারবে। আরেকজন এসে বলল আমি একজন গৃহবধু আমি কি পারব ধার্মিক হতে? হ্যাঁ তুমিও পারবে। আমি ঝাড়ুদার, তুমিও পারবে। কোথাও কারুর অবস্থা থেকে সরে এসে একই পথ ধরে চলতে বলে হবে না, হিন্দুধর্মও এই জিনিষকে কোন ভাবেই গ্রহণ করে না। হিন্দুধর্ম ছাড়া বাকি সব ধর্ম এই পথ দিয়েই চলছে। এরা বলবে আগে তুমি পরিবর্তিত হও, হিন্দু ধর্ম বলবে, না তুমি যা আছ তাই থাক। বর্ণাশ্রম ধর্ম এইখান থেকেই শুরু হয়। বর্ণাশ্রম ধর্মের মূল তত্ত্ব হচ্ছে তোমাকে কিছু হওয়ার চেষ্টা করতে হবে না, তুমি যা আছ তাই থাক, ঐখান থেকেই তোমার ভগবানের দিকে যাত্রা শুরু করতে পারবে। তুমি শূদ্র পরিবারে জন্ম নিয়েছ তাতে হয়েছেটা কি, ঐখান থেকে তুমি সেইভাবেই ভগবানের কাছে যাবে একজন ব্রাহ্মণ যেভাবে ভগবানের কাছে যাবে। আমাদের শাস্ত্রে কোথাও বলছে না যে ভগবান লাভ করতে হলে শূদ্রকে ব্রাহ্মণ হয়ে জন্মাতে হবে। ব্রাহ্মণদের মধ্যে পরের দিকে অনেকে লোভী হওয়াতে তারা তাদের স্বার্থের কথা ভেবে শাস্ত্রের নানান রকমের সংজ্ঞা দিতে শুরু করল। কিন্তু গীতাতে কোথাও এই ধরণের উল্টোপাল্টা কথা বলবে না। তুমি ব্রাহ্মণ বংশেই জন্ম নাও, কি শূদ্র বংশে জন্মই নাও, এখান থেকেই তুমি ওপরের দিকে চলে আসতে পারবে, তোমাকে ব্রাহ্মণ হতে হবে না, ব্রাহ্মণকেও ক্ষত্রিয় হতে হবে না। একবার যদি এই ধরণের পরিবর্তন শুরু হয়ে যায়, সামাজিক বাঁধন বলে আর কিছুই থাকবে না।

আইনস্টাইনের Relativity কে নিয়ে বার্টাণ্ড রাসেল খুব মজাকরে ABC of Relativity নামে একটা খুব নামকরা বই লিখেছেন। বইটার বক্তব্য আমাদের ভাষায় এই রকম – এই কলকাতা শহর আছে, শহরে অনেক রেলওয়ে স্টেশন আছে, হাওড়া,

শিয়ালদহ, এখন নতুন কলকাতা স্টেশনও হয়েছে, শহরতলীতে লিলুয়া আছে, বেলুড়, বালি, উত্তরপাড়া আছে, অন্য দিকে উল্টোডাঙ্গা, দমদম, বেলঘরিয়া ইত্যাদি স্টেশন আছে। এখন যত স্টেশন আছে, স্টেশনের আশেপাশে যত বাড়ি আছে সব রোজ পাল্টাপাল্টি করে জায়গা বদল করে নেয়। আমি সকালে গিয়ে হাওড়া স্টেশনে টিকিট কাউন্টারে জিজ্ঞেস করলাম – দাদা আজকে বেলুড় স্টেশন কোথায় আছে? কাউন্টার থেকে আমাকে বলা হল – বেলুড় স্টেশন আজকে সাউথ শিয়ালদহের ক্যানিং চলে গেছে। বেলুড় স্টেশন ক্যানিং চলে গেছে! তাহলে বালী কোথায় গেছে? বালী তো আজকে চলে গেছে ব্যারাকপুরে। তা আমার তো বালী যাওয়ার ছিল। বালীর কোথায় যাওয়ার ছিল আপনার? বালীর তর্কসিদ্ধান্ত লেনে যাওয়ার ছিল। ও, বালীটা ব্যারাকপুরে গেছে কিন্তু তর্কসিদ্ধান্ত লেনটা গেছে সাতরাগাছি, আজকের দিনটা এটা এইভাবে থাকবে। আগামীকাল এটা অন্য রকম হয়ে ঘুরে যাবে, কোথায় যাবে বলা যাচ্ছে না। এই পরিস্থিতি যদি হয় তাহলে মানুষ এর কত হিসাব রাখবে! রোজ সকাল বেলায় বুকিং ক্লার্কদের কাছে লিস্ট চলে এলো তাতে বলা হচ্ছে আজকে সকালে বালী বর্ধমানের কাছে আছে, বর্ধমান উত্তরপাড়ার কাছে আছে আর উত্তরপাড়া নৈহাটি চলে গেছে। এই যদি অবস্থা হয় তাতে বড় বড় কম্প্যুটারই সামলাতে পারবে না আর বুকিং ক্লার্ক আর যাত্রীদের কি অবস্থা হবে! আমাদের মুনি ঋষিরা এই ব্যাপারটাকে সামলবার জন্য শহর গুলো যেমন একটা জায়গায় অবস্থিত, বাড়িগুলো যেমন একটা নির্দিষ্ট জায়গাতে স্থিত হয়ে আছে, ঠিক সেই রকম বর্ণগুলোকেও এইভাবে একটা জায়গায় স্থির করে দিলেন। আজকে সকালে তুমি ব্রাহ্মণ, কাল দুপুর থেকে ক্ষত্রিয় হয়ে যাবে আর পরশু দিন বিকেল থেকে শূদ্র হয়ে যাবে, তুমি এইটি করো না। আমাদের ভারতের বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় সবাই ব্রাহ্মণ হয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রবেশ করে আর সবাই বনিয়া হয়ে বেরিয়ে আসছে। বিদ্যা অর্জন কে করতে যায়? ব্রাহ্মণরাই বিদ্যা অর্জন করতে যাবে। তাই ব্রাহ্মণ হয়ে সব বিশ্ববিদ্যালয় গুলোতে আসছে আর সেখান থেকে পাশ করে হিসাব করে কোন কোম্পানি কত পে প্যাকেজ দেবে। যেদিন দেখলো ভারতে ইঞ্জিনিয়ারদের ভালো চাকরির বাজার আছে, সারা দেশের বাবা মারা ছেলেকে ইঞ্জিনিয়ার করতে উঠে পড়ে লেগে গেল। আবার যেদিন দেখলো ম্যানেজমেন্ট লাইনে ভালো মাইনে সবাই এমবিএ পড়ার জন্য ছুটলো। ফলে মাঝখানে যেসব কাজের জন্য লোক দরকার সেখানে উপযুক্ত লোক পাওয়া যাচ্ছে না। এটাও ঠিক ঐ রকম বালী, বেলুড় সকাল বেলাতে ডানা লাগিয়ে উড়ে উড়ে জায়গা পাল্টে নিচ্ছে। তখনকার দিনে সমাজের অনুশাসন এমন কঠোরই ছিল যে, দেখত দেখত তোমার ভোগ করার ইচ্ছা আছে তাহলে তুমি বর্ণাশ্রম ধর্মের বাইরে গিয়ে ভোগ কর। দ্বিতীয়তঃ যে কেউ এসে বলতে পারে আমি ধর্ম মানিনা, তাহলে বর্ণাশ্রম ধর্ম তোমার জন্য নয়। যদি হিন্দুধর্মকে আমি স্বীকার করি, তাহলে হিন্দুধর্মের উদ্দেশ্য হচ্ছে মুক্তি, মুক্তিই যদি উদ্দেশ্য হয় তাহলে আমি যে কোন বর্ণে থেকেই মুক্তি লাভ করতে পারি। এনারা তাই খুব কৌশলে একটা জিনিষকে আরোপ করে দিলেন, যে বর্ণে যত বেশি সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয়েছে সেই বর্ণের লোকেদের তত ত্যাগের করতে বলা হয়েছে। ব্রাহ্মণ হলে তোমাকে শীত-গ্রীষ্ম ভোর বেলায় স্নান করে এত গায়ত্রী জপ করতে হবে, এত বেদ মুখস্ত করতে হবে, এত উপোস করতে হবে। ক্ষত্রিয় হলে যুদ্ধে তোমাকে মরে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।

কাশী বিশ্বনাথ মন্দিরে একটা কুয়ো আছে, কেউ যদি তার মনের ইচ্ছা নিয়ে সেই কুয়োতে ঝাঁপ মারে তাহলে তার সেই ইচ্ছ পূর্ণ হয়ে যাবে। একজন মুচি ছিল, সে ভাবছে, আমার এইতো জীবন, সারাটা দিন খালি জুতো তৈরী করতে করতে সমস্ত জীবন কেটে গেল, আমি ঐ কুয়োতে ঝাঁপ দিয়ে প্রাণত্যাগ করব। মুচি এখন ঝাঁপ দিতে এসেছে দেখে বিশ্বনাথ মন্দিরের পাণ্ডারা দৌড়ে এসে তাকে আটকাচ্ছে, আরে দাঁড়াও দাঁড়াও, ঝাঁপ দেওয়ার আগে ঠিক কর মরে তুমি কি হতে চাও। মুচি কিছুক্ষণ চিন্তা করেই বলছে, আমি মরে ব্রাহ্মণ হতে চাই। এই কথা বলে তার মনে পড়ল, ওদের গ্রামে এক ব্রাহ্মণ ছিল, রোজ তাকে ভোরবেলা স্নান করতে হত, রোজ অনেক শাস্ত্র মুখস্ত করতে হত, মুখস্ত না করতে পারলে পণ্ডিতজী তার পিঠে বেত মারত। ঐ কথা মনে হতেই মুচি বলছে, ব্রাহ্মণ হয়ে আমার কাজ নেই, বাচ্চা বয়স থেকেই অত মার আমি খেতে পারব না। এর থেকে ভালো ক্ষত্রিয় হওয়া, তলোয়ার থাকবে, ঘোড়া থাকবে, আমাকে সবাই মানবে, ভয় পাবে। ভেবেই মনে হল, কিন্তু যদি কোন যুদ্ধ হয় তাহলে তো আমার প্রাণ চলে যেতে পারে। যদি মরেই যাই তাহলে ক্ষত্রিয় হয়ে আমার লাভটা কি হবে। এর থেকে ভালো শেঠজী হওয়া, গদিতে আরাম করে বসব, প্রচুর টাকা-পয়সা হবে, রোজ প্রচুর লোকজন আমার কাছে আসবে। তখন তার মনে পড়ল, ওদের গ্রামে এক শেঠজী ছিল, কি একটা ফাটকা খেলতে গিয়ে ওতেই তার সব টাকা-পয়সা চলে গিয়ে দেউলিয়া হয়ে যায়, পরে পুলিশে তাকে ধরে নিয়ে যায়। না বাবা তাহলে বৈশ্য হয়ে কাজ নেই। তাহলে আমি কি হব? আমি মুচিই হব, মুচি হয়েতো ভালোই আছি, দিনে দুটো করে জুতো বানাব আর আনন্দে থাকব। তখন পাণ্ডারা বলছে, ব্যাটা তুই তো মুচিই আছিস, মুচি হয়ে জন্মাবার জন্য আবার ঝাঁপ মারতে চাইছিস কেন, যা বাড়ি গিয়ে জুতো বানা।

সমাজে তখন এই ত্যাগের উপরে খুব জোর দেওয়া হত, যত আমি ত্যাগ করতে পারব সমাজ ততো আমাকে ওপরের দিকে রাখবে। যখন আমি বলছি আমার টাকা-পয়সা যা আছে সব সমাজের জন্য ত্যাগ করতে রাজী আছি, আমি তখন হয়ে গেলাম বৈশ্য। আমি সমাজের জন্য প্রাণ দিতে রাজী আছে, তখন আমি ক্ষত্রিয়। আমি আমার সব কিছু, দেহের যত সুখ, খাওয়া, ঘুম সব সমাজের জন্য ত্যাগ করতে রাজী আছি তখন আমি ব্রাহ্মণ। আগেকার দিনে যদি স্নাতক রাস্থা দিয়ে যেত, সামনে থেকে যদি রাজা আসতেন, রাজা তখন রথ থেকে নেমে গিয়ে স্নাতককে রাস্তা দিয়ে তাকে সম্মান দিতেন। এই সম্মান কেন দিচ্ছেন? তুমি বিদ্যাচর্চার জন্য তোমার সব সুখকে বিসর্জন দিয়েছ। বিভিন্ন স্মৃতিতে আছে, যে ব্রাহ্মণের কাছে টাকা-পয়সা থাকবে তাকে আর ব্রাহ্মণের মত

সম্মান দেখাবে না। এইভাবে বর্ণাশ্রমের মত একটা প্রথাকে খুব দৃঢ় ভাবে সমাজে গেঁথে দিয়ে সমাজের উন্নতি আর ব্যক্তিগত ভাবে একজনের মুক্তির রাস্থাকে সুগম করা হয়েছিল। আজকে যে ভারত যতটুকু এখনও মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে একমাত্র এই বর্ণাশ্রম প্রথার জন্যই দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু আমরা এর আগেও বলেছি যে কোন সামাজিক প্রথা কখনই সম্পুর্ণ হতে পারেনা। কিছু দিন থাকার পরই সে দুর্গন্ধ ছাড়বেই। স্বামীজীও বলছেন – এই বর্ণাশ্রম প্রথা দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে, যত তাড়াতাড়ি এর সংস্কার করা হয় ততই ভালো।

এখন সমাজে বর্ণাশ্রম প্রথা মোটামুটি ভাবে বলা যায় আর আগের মত নেই। এখন ভারতে একটা ঝাঁকুনি দেওয়া হচ্ছে। যখনই কোন অবতার পুরুষ আসেন, তখনই ভারতে একটা ঝাঁকুনি লাগে। এই ঝাঁকুনিতে ওপরের জিনিষ নীচে যায় নীচের জিনিষ ওপরে যায়, ঐটাই তখন শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে যায়, এরপর এটাই কয়েক হাজার বছর ধরে চলতে থাকবে। ঠাকুর আসার পরও একটা জোর ঝাঁকানি চলছে, এর ফলে যে পরিবারগুলো ওপরের দিকে চলে আসবে তারা হাজার বছর ওপরেই থাকবে, যারা নীচে চলে গেল তারা হাজার বছরের জন্য নীচে চলে গেল। শঙ্করাচার্যও এসে একটা বিরাট ঝাঁকুনি দিয়েছিলেন, তিনি অনেক জায়গাতে নিম্নবর্ণের লোকেদের ধরে ধরে ক্ষত্রিয় বানিয়ে দিয়েছিলেন। আচার্য শঙ্কর অবশ্য পরিস্কার করে বলে দিয়েছেন – যারা বেদ মানেনা, ধর্মকে যারা অর্থহীন মনে করে তাদের কাছে বর্ণাশ্রম ধর্মের কোন উপযোগিতা নেই।

এখন একটা সমস্যা এর মধ্যে আসতে থাকবেই। যেমন আমরা এখানে প্রায় সত্তর জনের মত গীতা অধ্যয়ণ করছি। এর মধ্য থেকে কিছু শ্রোতা বলছেন আমরা শাস্ত্র কথাই শুনতে চাই, অন্য দিকে কিছু শ্রোতা বলছে, শাস্ত্র শুনতে শুনতে আমরা ক্লান্ত হয়ে গেছি, এখন একটু হরিনাম কীর্তনে মাতোয়ারা হয়ে নৃত্য করা হোক। এখন যারা শাস্ত্র শুনতে চাইছে তারা কি করবে? তারা বলবে – শাস্ত্র কথা শুনতে যদি পছন্দ হয় তাহলে শোন, আর যদি না পছন্দ হয় তাহলে গেটের বাইরে গিয়ে নৃত্য কর। ভারতে ঠিক এই সমস্যাটাই হচ্ছিল, গরিষ্ঠ সংখ্যার হিন্দুরা বলছিল আমরা সামাজিক স্থিতিশীলতা চাই, আমরা ধর্ম চাই, আমাদের কারুর কারুর জীবনের উদ্দেশ্য মুক্তি, তোমাদের যদি না পছন্দ হয় ম্লেচ্ছ হয়ে তুমি সমাজের বাইরে গিয়ে অবস্থান কর। স্বামীজীও প্রচণ্ড গালাগালি দিতেন, তিনি বলছেন – ভারতে শিব এইভাবে ষাঁড়ে চড়ে বেড়াবেন, শ্রীকৃষ্ণ এইভাবে বাঁশি বাজাবেন, মাকালী এভাবেই পাঁঠা খাবেন, যার পছন্দ হবে না সে এই ভারতভূমি ছেড়ে চলে যাক। বলেই স্বামীজী বলছেন – শালারা যায়ও না, এখানকার অন্ন খাবে আবার এখানকার নিন্দা করবে। হিন্দুধর্ম সমাজের মধ্যে একটা ধর্মীয় সমতা বজায় রাখার জন্য এই ধরণের প্রথাগুলোকে নিয়ে এসেছিলেন। একদিকে বলবেন আমি বর্ণধর্ম প্রথা মানবো না অন্য দিকে বলবেন আমি হিন্দু, তা কি করে হবে, হিন্দুধর্ম মানেই বর্ণাশ্রম ধর্ম। যদি আধ্যাত্মিক জীবন তোমার উদ্দেশ্য না হয়, সামাজিক স্থিতিশীলতা যদি না মানো তাহলে তুমি হিন্দু কিসের। আমি জাতফাত মানিনা একদিকে বলছে আবার নিজের মেয়ের বিয়ে দেবার সময় স্বজাতি পাত্রের সন্ধান করে, এগুলো হচ্ছে চরম শঠতা। বর্ণাশ্রম ধর্মের মূলে রয়েছে ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে আধ্যাত্মিক উন্নতি আর সমষ্টিগত ক্ষেত্রে সামাজিক স্থিতিশীলতা। এই দুটো জিনিষ আসে একমাত্র বর্ণাশ্রম ধর্মের মাধ্যমে। যদিও উপনিষদে বর্ণাশ্রম ধর্ম সম্বন্ধে খুব একটা কিছু না বললেও গীতাতে একে খুব গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কারণ মহাভারতের সময়ে বর্ণাশ্রম ধর্ম খুব দৃঢ় ভাবে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল। গীতাতে কর্মকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করে এই কর্মকে কেন্দ্র করে এনারা একটা সংস্থাকে দাঁড় করিয়ে দিলেন কর্মকে ঠিক ঠিক ভাবে অনুশীলন করার জন্য। এই সংস্থার নাম হল বর্ণাশ্রম ধর্ম। সেই বর্ণাশ্রম ধর্ম সম্বন্ধে এবার গীতা কি বলছে দেখা যাক –

**ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং শূদ্রাণাঞ্চ পরন্তপ। কর্মাণি প্রবিভক্তানি স্বভাবপ্রভবৈর্গুণৈঃ।।৪১।।**

মানবজাতিকে বেঁচে থাকতে যে কাজ গুলোকে সব সময় করতে হয়, সেই কাজ গুলোকে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য আর শূদ্র এই চারটে জাতিতে বিভাজন করা হয়েছে। কিভাবে বিভাজন করা হয়েছে? *স্বভাবপ্রভবৈর্গুণৈঃ*, তাদের প্রকৃতিতে যে স্বভাব রয়েছে সেই অনুসারে তাদের এই চারটে শ্রেণীতে বিভাজন করা হয়েছে। এনাদের একটা মত ছিল যে, যদি কোন ব্রাহ্মণ বংশের ছেলের স্বভাবে যদি সব সময় রণং দেহি ভাব থাকে, এই জন্মটা না হয় সে কোন রকমে কাটিয়ে দেবে কিন্তু পরের জন্মে সে তার এই স্বভাবের জন্য ক্ষত্রিয়কুলে গিয়ে জন্ম নেবে। মানুষের যে রকমটি স্বভাব থাকে সেই অনুসারেই তার জন্ম হয়। এই মত কতটা ঠিক বা ভুল আমাদের পক্ষে বলা সম্ভব নয়, তবে গীতার কথা বলে আমাদের উপেক্ষা করার কোন কারণ নেই।

এর আগে ভগবান চতুর্থ অধ্যায়ে বলেছিলেন – *চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ*, তিনটে গুণের অনুসারে আমিই এই চারটে বর্ণকে সৃষ্টি করেছি। এখানেও এই কথাই বলছেন আমার প্রকৃতিতে আমারই ক্ষমতাতে এই চারটে বর্ণকে সৃষ্টি করা হয়েছে। এদের প্রত্যেকের কর্ম বিভাগ করা আছে, কে কোন্ কাজটা করবে। এর ফলে কি হয়? সামাজিক স্থিতিশীলতা বজায় থাকে আর একে অপরের কর্মে নাক গলাতে পারবে না। হিন্দু সমাজে প্রথম থেকেই ঠিক করে দেওয়া আছে এই কাজ পুরুষের, এই কাজ নারীর, এই কাজ অমুক জাতির, এই কাজ এই জাতির। প্রত্যেকের কাজগুলোকে যে বিভাজন করা হয়েছে, সেটা তাদের নিজস্ব ক্ষমতা আর গুণ দেখে বিভাজন করা হয়েছে। হঠাৎ খামখেয়াল বশতঃ কিছু বিভাজন করা হয়নি। সবাই বলে ধর্মের নামে যত লোকের সংহার হয়েছে অন্য কোন কিছুতে এতো লোকের সংহার হয়নি। কিছুদিন আগে একটা সমীক্ষাতে বলা হচ্ছে গত শতাব্দীতে ধর্মের নামে এক কোটিরও কিছু কম লোক মারা গেছে, অন্য দিকে সামাজিক সুস্থিরতাকে বজায় রাখার জন্য সারা বিশ্বে দশ কোটিরও বেশি লোক

মারা গেছে। স্ট্যালিনের সময় পুরো রাশিয়াতে না খেয়ে এক কোটি লোক মারা গিয়েছিল। কোন বর্ণাশ্রম প্রথা ছিল না, সব কিছু ভেঙে দিয়ে সরকার নিজের কব্জায় নিয়ে নিল। কিন্তু ভারতে বর্ণাশ্রম প্রথা কেন টিকে গিয়েছিল? মানুষের স্বভাবটি যেই রকম, তার গুণাবলী যেমনটি সেইভাবেই তাদেরকে কাজ দেওয়া হত। ঠিক এই কথাই এখানে আচার্য বলছেন – যাদের মধ্যে সত্ত্বগুণ বেশি আছে তাদেরকে বিদ্যার্জন এবং বিদ্যার প্রসারের দায়ীত্ব দেওয়া হল। তোমার মধ্যে রজোগুণ বেশি আছে? ঠিক আছে সমাজকে সামলানোর দায়ীত্ব তোমাকে দেওয়া হল। তুমি একটু হিসাবী লোক, ঠিক আছে তুমি বৈশ্যের দায়ীত্ব সামলাও, বৈশ্য মানে শুধু টাকা-পয়সা রাখা নয়, পুরো অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করে সমাজের অর্থাভাব, ভোগ্য সামগ্রীর অনটনকে আটকানো। যখন অনেক টাকা জমে যেত তখন এরা একটা মন্দির বানিয়ে দিতো, মন্দির বানিয়ে দেওয়াতে অনেক লোক কাজ পেয়ে গেল, আর টাকাটাও রেগুলেট হয়ে গেল। তোমার মধ্যে এই ধরণের কোন গুণ নেই ঠিক আছে তুমি সেবামূলক কাজ করতে থাক। তুমি তোমার নিজের খুশিমত কাজ করতে পারবে না, তোমার স্বভাব আর তোমার মধ্যে কি ধরণের গুণ আছে সেগুলো দেখেই তোমার কাজ ঠিক করে দেওয়া হবে। বেলুড় মঠে যখন কেউ সন্ন্যাসী হতে আসে তখন তাকেও বলে দেওয়া হয়, জপ-ধ্যান পরে হবে আগে সেবা কর, সাধুসেবা আর সমাজসেবা। কারণ আমরা স্বভাবে বেশির ভাগই শূদ্র। ব্রাহ্মণ হতে গেলে যে যে গুণের দরকার তা আমরা কল্পনাই করতে পারিনা। আমাদের কোন গুণই নেই কিন্তু আমরা সবাই চাইছি ক্ষমতা, টাকা আর সম্মান। সেবক হবার আগে সবাই সেব্য হতে চাইছে, এই করে পুরো সমাজ ব্যবস্থা চুরমার হতে চলেছে। এই জিনিষটাকে এনারা আটকে দিচ্ছেন, আটকবার জন্য পুরো ধর্মের অনুমতি নিয়ে আসছেন। তোমার ধর্ম তোমাকে এই করতে বলছে, মানুষ ধর্মকে একটু ভয় পায়। তুমি যদি ব্রাহ্মণ হতে চাও, আগে দেখে নাও ব্রাহ্মণের কি কি গুণ থাকলে পরে তুমি ব্রাহ্মণ হওয়ার যোগ্যাতা অর্জন করতে পারবে –

**শমো দমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জবমেব চ। জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম স্বভাবজম্।।৪২।।**

ব্রাহ্মণের কি রকম স্বভাব হবে সেটা এখানে বলা হচ্ছে, এরা আগে ষোড়শ অধ্যায়ে এই গুণগুলো নিয়ে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করেছি। *শমঃ* ও *দমঃ*, নিজের মন আর ইন্দ্রিয়ের উপর পুরো নিয়ন্ত্রণ থাকবে। *শৌচং*, ব্রাহ্মণকে সব সময় তার সব কিছু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। *ক্ষান্তিঃ* হচ্ছে ক্ষমা, কেউ যদি তাঁর কোন ক্ষতি করে দেয় তাকে তিনি ক্ষমা করে দেন, বদলা নেওয়ার কোন চিন্তাই মনের মধ্যে উঠবে না। বদলা নেওয়ার ভাবটা থাকে ক্ষত্রিয়দের। *আর্জবম্*, ব্রাহ্মণের মধ্যে সরলতার ভাব থাকতে হবে। কোন ধরণের কপটতা, ছল চাতুরির ভাব থাকলে সে ব্রাহ্মণই নয়। *জ্ঞানং বিজ্ঞানং*, শাস্ত্র অধ্যয়ণ আর শাস্ত্রের তত্ত্ব চিন্তন সব সময় করে যেতে হবে। সব থেকে বড় কথা হচ্ছে *আস্তিক্যং*, অস্তি ভাব, ঈশ্বরই সত্য আর শাস্ত্রের প্রতিটি বাক্য যে সত্য এতে অগাধ বিশ্বাস থাকতে হবে। যদি শাস্ত্র বাক্যে বিশ্বাস না থাকে তাহলে তুমি ব্রাহ্মণ হবার যোগ্য নও। এখন যারা ব্রাহ্মণ আছে তাদের যে ছেলেমেয়ে হবে আমরা কি করে জানব বড় হয়ে এরা কি হবে, কোন্ দিকে যাবে। এটা হচ্ছে এখনকার দিনের প্রথম সমস্যা। দ্বিতীয় সমস্যা হচ্ছে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়ের বিভাজনটা কোন বয়সে করা হবে। এখন যেমন সন্তান গ্রাজ্যুয়েট কি পোস্ট গ্রাজুয়েট হয়ে যাওয়ার পর ঠিক করা হয় কোন পেশা বা জীবিকাকে সে বেছে নেবে। ইদানিং কালে কোন ব্রাহ্মণ পরিবারের সব কিছুতে যদি ব্রাহ্মণ স্বভাব থাকে, আর একুশ বছর বয়সে সেই পরিবারের ছেলে মিলিটারিতে গিয়ে যোগ দিল। এখন একুশ বয়স পর্যন্ত বাড়ির যে শিক্ষা-দীক্ষার কালচারে বড় হল সেটা বৃথা হয়ে গেল। একুশ বছর পর্যন্ত সেই ব্রাহ্মণ পরিবারে থেকে ত্যাগ, তপস্যা, তিতিক্ষা ইত্যাদি, এরপর সে বিজনেস ম্যানেজমেন্টে ঢুকলো, এখানে সে শিক্ষা পেল যে করেই হোক তোমার পকেট ভরো। তার ফলে পরিবারে এত দিনের যা কিছু শিক্ষা পেয়েছে সবটাই তার বৃথা হয়ে গেল। একজন ডাক্তার পরিবারের ছেলে একুশ বছর পর্যন্ত ডাক্তারি পরিবেশে বড় হল, এরপর সে চলে গেলে ইঞ্জিনিয়ারিংএ, তার এতদিনের পরিবেশ সেটা এখন আর কোন কাজেই এলো না। একটা দুটো ব্যতিক্রম থাকতেই পারে, দু চারজন মার খাবে ঠিকই, কিন্তু বর্ণাশ্রম ধর্মকে ধরে রাখলে সামাজিক স্থিতিশীলতা যেমন থাকবে সাথে সাথে নিজের ও বাকি সকলেরও মঙ্গল হবে। এখন সব ভেঙ্গে গেছে, কে কোন্ দিকে যাবে কেউ বলতে পারছে না। কিন্তু বর্ণাশ্রম ধর্মে তোমার যখনই জন্ম হল সেদিন থেকেই তোমার রাস্থা নির্ধারিত হয়ে গেল। এখন একুশ বছর, বাইশ বছরে গিয়ে ঠিক করতে হচ্ছে আমি কোন্ দিকে যাব। তাই বর্ণাশ্রম ধর্মকে যাঁরা ঠিক করে দিয়েছিলেন তাঁরা এগুলো মাথায় রেখেই এই বর্ণাশ্রম ধর্মকে নিয়ে এলন। এরপর বলছেন ক্ষত্রিয়ের কি স্বভাব হবে –

**শৌর্যং তেজো ধৃতির্দাক্ষ্যং যুদ্ধে চাপ্যপলায়নম্। দানমীশ্বরভাবশ্চ ক্ষাত্রং কর্ম স্বভাবজম্।।৪৩।।**

ক্ষত্রিয়ের স্বভাবে সব সময় শৌর্য মানে শক্তির প্রকাশ থাকবে, তেজ, শরীরটা সব সময় তেজোদীপ্ত ভাবে দীপ্যমান থাকবে, ধৃতি, অনেকক্ষণ ধরে কোন কাজ করার পরও ক্ষত্রিয় ক্লান্তি অনুভব করবে না, *দাক্ষ্য*, কাজকর্মে খুব দক্ষ ও চৌখস হবে আর যুদ্ধে *চাপ্যপলায়নম্*, যুদ্ধ ভূমিতে কখন পিঠ দেখাবে না। রাজস্থানের রাজা ও সৈন্যরা ছিলেন এই রকম, মুঘলরা আমাদের দেশে এত বছর রাজত্ব করেছে শুধু এই রাজস্থানের সৈন্যদের উপর ভরসা করে। এরা কখনই যুদ্ধ ভূমি থেকে পালাতে জানত না, যুদ্ধ যখন করতে এসেছি হয় যুদ্ধ জিতে ফিরব না হয় আমার জীবন দিয়ে দেব। এই নিয়ে রাজস্থানের অনেক কাহিনী আছে। যুদ্ধ ভূমি থেকে রাজা যদি পালিয়ে আসত রানী পর্যন্ত রাজার আর মুখ দেখবে না, বলে দিত তুমি যুদ্ধ ভূমি থেকে পালিয়ে যখন এসেছ তুমি আমার কাছে মৃত। এই আদর্শ নিয়ে ভারত দাঁড়িয়ে ছিল, মরে যাব তবু যুদ্ধ ভূমি থেকে আমি পালাব না। আধুনিক যুগের ভারত তার পূর্বজদের

এই ত্যাগের কথা কল্পনাই করতে পারবে না। আজ এরাই জাতিপ্রথাকে গালাগাল দিচ্ছে। স্বামীজী যেটা বলেছিলেন, জাতিপ্রথার নামে উচ্চবর্ণের লোকেরা যে সুযোগটা নিচ্ছে সেটাকে আটকাতে হবে। *দানমীশ্বরভাবশ্চ*, ক্ষত্রিয় দান করবে, ব্রাহ্মণের কাছে অর্থ থাকতো না তাই তাদেরকে দানের ব্যাপারে কিছু বলা হত ন। *ঈশ্বরভাবশ্চ* – সব সময় প্রভুত্ব ভাব নিয়ে শাসন ক্ষমতাকে নিরেপেক্ষ ভাবে প্রয়োগ করবে। চাণক্য নীতিতে আছে, ব্রাহ্মণের শক্তি হচ্ছে বিদ্যা, রাজার শক্তি হচ্ছে সৈন্য, বৈশ্যদের শক্তি হচ্ছে বিত্ত আর পরিচর্যা করাটাই হচ্ছে শূদ্রের শক্তি। বৈশ্য আর শূদ্রের স্বভাব কি রকম –

**কৃষিগৌরক্ষ্যবাণিজ্যং বৈশ্যকর্ম স্বভাবজম্। পরিচর্যাত্মকং কর্ম শূদ্রাস্যাপি স্বভাবজম্।।৪৪।।**

বৈশ্যদের কাজ হচ্ছে বাণিজ্যা, কৃষি ও গোপালন, অনেকে মনে করেন শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন ক্ষত্রিয় কিন্তু আসলে শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন যাদবকুলের তাই বৈশ্য বর্ণের ছিলেন। আবার মহারাষ্ট্রের ওদিকে যারা যাদব তারা নিজেদের ক্ষত্রিয় বলে পরিচয় দেয়। কিন্তু যারাই চাষ-বাষের কাজ করে, গোশালার রক্ষণ আর দেখাশোনা করে সেই অনুসারে এরা সবাই বৈশ্য জাতির। চাষ-বাষ আর গোশালার কাজ ভারতে খুব ভাসমান, কখন ক্ষত্রিয়ের দিকে যায়, কখন শূদ্রের দিকে যায়, এই ধরণের কাজের কিছু আনুষাঙ্গিক কাজ কিছু বৈশ্যরা করে, কিছু শূদ্ররা করে কিছু ক্ষত্রিয়রা করে। কিন্তু মূলতঃ এই কাজগুলো বৈশ্যরাই বেশি সামলাত।

*পরিচর্যাত্মকং কর্ম শূদ্রাস্যাপি স্বভাবজম্*, পরিচর্যার মত যত কাজ, যেমন হোটেল ম্যানেজমেন্ট পরিচর্যার কাজ, এই কাজগুলো শূদ্রদের কাজ, কিন্তু এখন ব্রাহ্মণ ছেলেরা হোটেল ম্যানেজমেন্ট কাজের জন্য লাইন দিচ্ছে। বিভিন্ন মানুষের স্বভাব অনুযায়ী কাজের বর্ণনা করে এবারে মূল বক্তব্য রাখছেন –

**স্বে স্বে কর্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ। স্বকর্মনিরতঃ সিদ্ধিং যথা বিন্দতি তচ্ছৃণু।।৪৫।।**

নিজের নিজের কাজ যদি ঠিক ভাবে সম্পন্ন করতে থাকে তাহলে এই কর্মের দ্বারাই মানুষ নিজের সিদ্ধি লাভ করতে পারবে। এটাই হচ্ছে কর্মযোগ। *স্বকর্মনিরতঃ সিদ্ধিং যথা বিন্দতি তচ্ছৃণু*, হে অর্জুন, কিভাবে নিজের নিজের কর্ম করে সিদ্ধি লাভ করে এটাই এখন তোমাকে বলছি। আর নিজের কাজ না করে অপরের ধর্মের কাজ যারা করে তাদের কি হয় ভগবান আগেই বলে দিয়েছিলন – *স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ*, নিজের কাজ করে করে মরে যাওয়া অনেক ভালো তবু অন্যের স্বভাবের কাজ কখনই করতে যেও না, কারণ অন্যের বর্ণাশ্রমের ধর্মের অনুষ্ঠানই হল অধোগতির কারণ। আজকাল যারা চাকরি করতে যাচ্ছে, একটা চাকরিতে ঢুকেই কিছু দিন পরেই শুধু নজর থাকে অন্য কোন্ চাকরিতে এর থেকে ভালো পে প্যাকেজ আছে, এদের অধোগতি ছাড়া আর কোন গতি নেই। কিভাবে নিজের বর্ণাশ্রমের কাজের দ্বারা মানুষ সিদ্ধি লাভ করে?

**যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যেন সর্বমিদং ততম্। স্বকর্মণা তমভ্যর্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ।।৪৬।।**

*যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং*, যেখান থেকে মানুষ আর যাবতীয় যা কিছু আছে সবার জন্ম হচ্ছে, *যেন সর্বমিদং ততম্*, আর যেটা দিয়ে পুরো বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড আচ্ছাদিত হয়ে আছে। এই জিনিষ গুলো কল্পনা করা খুব কঠিণ। খুব সহজ ও কাছের কল্পনা হতে পারে সমুদ্র। বিশাল অনন্ত সমুদ্র, সেই সমুদ্রে বিরাট আকারের তিমি মাছ আছে, সমুদ্রেই তিমি মাছের জন্ম হচ্ছে, সমুদ্র না থাকলে তিমি মাছের উৎপত্তি হত না। আর সমুদ্রই আবার তাকে ঘিরে রয়েছে। ভগবান ঠিক তাই, ভগবান থেকেই সব কিছুর উৎপত্তি আবার ভগবানই সব কিছুকে ছেয়ে রেখেছেন। সমুদ্রের থেকেও আরও ভালো উপমা হতে পারে সূর্য, দিনের বেলায় আমরা সূর্যের আলোতে বাস করছি, আমাদের সবার অস্তিত্ব সূর্যের জন্যই, সূর্য না থাকলে আমাদের কোন অস্তিত্বই থাকত না। আর এই সূর্যের আলোই আমাদের পুরো বিশ্বকে আচ্ছাদিত করে রেখেছে। পৃথিবীটা সূর্যের জন্য, পৃথিবীতে যা কিছু হচ্ছে সূর্যের জন্যই, গাছপালা, চাষ-বাশ। গাছপালা সব সূর্যের জন্য, এই গাছ-পালাকে ছাগল গরু খাচ্ছে, আমরা আবার ছাগলের মাংস খাচ্ছি, গরুর দুধ পান করে বেঁচে আছি, সবই সূর্যের জন্য। অন্য দিকে সেই সূর্য আমাদের ঢেকে রেখেছে। আমার জন্ম সূর্যের জন্য, আমার স্থিতি সূর্যের জন্য, যাবতীয় যা কিছু সব সূর্যের জন্য। ঠিক তেমনি ভগবান থেকেই সব সৃষ্টি আবার ভগবানই পুরো জগৎকে ওতপ্রোতো ভাবে ছেয়ে রেখেছেন।

এই ভগবানকে তুমি পূজো করো, যে ভগবান তোমাকে ওতপ্রোতো ভাবে ছেয়ে রেখেছেন। ভগবানের পূজো কিভাবে করবে? মন্ত্রোচ্চারণ করে? ফুল চন্দন দিয়ে? না। *স্বকর্মণা তমভ্যর্চ্য*, তোমার নিজের কাজ দিয়ে তাঁর অর্চনা কর। জন্ম সূত্রে যে কাজই তোমার কাছে এসে থাকুক, তুমি সরকারি কর্মচারী হও, বা তুমি গৃহবধু হও তাও, তুমি শূদ্র হও, ব্রাহ্মণ হও, যাই হওনা কেন, যে কাজটাই করছ সেটাকে ভগবানের পূজো ভেবে কর। এর আগে আগে বলা হয়েছিল নিষ্কাম কর্মের কথা, এখন বলা হল এই নিষ্কাম কর্মই ভগবানের পূজো রূপে সম্পাদন কর। যে কাজই করে থাকো না কেন, সেটাই ভগবানের পূজো, এই ভাব নিয়ে কাজ কর, *তমভ্যর্চ্য*, মানে তাঁর পূজো। এইভাবে পূজো করলে কি হবে? *সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ*, মানুষ সিদ্ধি পেয়ে যাবে। কি সিদ্ধি? মন তোমার একেবারে পরিষ্কার হয়ে যাবে। মন পরিষ্কার হওয়া মানে, ঈশ্বর জ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান লাভের জন্য তোমার মন প্রস্তুত হয়ে গেল। অর্থাৎ এইভাবে পূজো ভেবে কাজ করতে করতে তোমার ব্রহ্মজ্ঞান হয়তো হবে না কিন্তু, একটু আগে যে কথাটা বলা হয়েছিল, ঈশ্বর জ্ঞান

বা ব্রহ্মজ্ঞান এমনিতে কখনই হয় না, তিন যখন ঘাড়ে ধরে দেখিয়ে দেন এই দ্যাখ্ আমার রূপ, তাছাড়া ঈশ্বর জ্ঞান হয় না। তিনি ঘাড়ে ধরার আগে পর্যন্ত আমাদের এই প্রস্তুতিতে সব সময় লেগে থাকতে হবে। জমির জঞ্জাল সব পরিষ্কার হয়ে গেল, বীজটা তৈরী আছে কিন্তু বৃষ্টি কবে হবে সেটা আমার হাতে নেই। ঈশ্বর জ্ঞান, ব্রহ্মজ্ঞান তাঁর কৃপা ছাড়া হয় না, কবে কৃপা হবে আমরা জানিনা, কিন্তু তিনি যখন ঘাড়ে ধরবেন তখন হবে, তার আগে পর্যন্ত আমাকে নিজের স্বধর্ম করে করে খেটে যেতে হবে, খেটে খেটে বিরাট প্রস্তুতি করে রাখতে হবে, তার আগে কিছুই হবে না। স্বধর্মের প্রশংসা করে তাই বলছেন –

**শ্রেয়ান্ স্বধর্মো বিগুণঃ পরধর্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ। স্বভাবনিয়তং কর্ম কুর্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্।।৪৭।।**

নোংরা জায়গায় যে পোকার জন্ম হয় সেখানকার নোংরা পোকার কোন ক্ষতি করে না। যেমন গোবরে যে পোকা হয় গোবরে সেই পোকার কোন ক্ষতি হয় না, গুবরে পোকাগুলো গোবরে খুব আনন্দে থাকে। নর্দমার জলে পোকা কিলবিল করে, ঐ নর্দমার জল কেউ যদি এক চুমুক পান করে তাহলে কলেরা হয়ে তার জীবন সংশয় উপস্থিত হবে। কিন্তু পোকাগুলো তো সব সময় ঐ নর্দমার জলেই থাকে, কই তার তো কিছু হচ্ছে না। কারণ যে যেখানে জন্মায় সেই জায়গা তার কখন ক্ষতিকারক হয় না। যে মানুষ যে স্বভাবের জন্য যে বর্ণে জন্মেছে, সেখানে কখনই তার কোন ক্ষতি হবে না, ঐ বর্ণটাই তার পক্ষে আদর্শ। হিন্দুদের মতে মানুষ সেখানেই জন্মাবে যে জায়গার জন্য সে উপযুক্ত। কখন সখন যে ভুলভাল হয় না তা নয়, এক আধটা ভুলভাল জায়গায় জন্ম নিয়ে নেয়। স্বামীজীও বলছেন, যে কোন জীব যে মুক্তির দিকে এগোচ্ছে তাকে এই ভারতভূমিতে জন্মাতেই হবে। ভারতে জন্মালে একটু ধর্মের ভাব আসবেই। এরপর ভগবান বলছেন –

**সহজং কর্ম কৌন্তেয় সদোষমপি ন ত্যজেৎ। সর্বারম্ভা হি দোষেণ ধূমেনাগ্নিরিবাবৃতাঃ।।৪৮।।**

হে অর্জুন তুমি যে বর্ণে জন্ম নিয়েছ সেই বর্ণের কাজ কখন ছেড়ে দিয়ে অন্য বর্ণের কাজ করতে যেও না, তুমি মনে রেখো *ধূমেনাগ্নিরিবাবৃতাঃ*, সব অগ্নিই ধূম দ্বারা আবৃত থাকে। অবশ্য গ্যাস বা মাইক্রোভেন আগুনের কথা এখানে বলা হচ্ছে না, শ্রীকৃষ্ণতো জানতেন না যে ভবিষ্যতে মাইক্রোভেন আসছে যাতে কোন ধুয়োই থাকবে না। বলছেন অগ্নি যেখানে থাকবে সেখানে ধুয়োও থাকবে, ঠিক সেই রকম কাজ যেখানেই থাকবে কিছু দোষও সেখানে থাকবে। তা ব্রাহ্মণের কাজেও দোষ আছে শূদ্রের কাজেও দোষ আছে। দোষ সব কর্মেই থাকবে, সেইজন্য স্বামীজী বলছেন – path of list resistence অনুসরণ করতে। Resistence সব জায়াগতেই থাকবে, তবে list resistence। list resistence কোথায় হবে? তোমার বংশে যে কর্মটা আছে। অবশ্য ইদানিং কালে এগুলো অনেক কিছু পাল্টে গেছে, সেইজন্য এগুলোকে নিয়ে বেশি মাতামাতি করার কিছু নেই।

**অসক্তবুদ্ধিঃ সর্বত্র জিতাত্মা বিগতস্পৃহঃ। নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধিং পরমাং সন্ন্যাসেনাধিগচ্ছতি।।৪৯।।**

মানুষ যখন এইভাবে কর্ম করতে থাকে, একটা অবস্থাতে গিয়ে সে *অসক্তবুদ্ধিঃ* হয়ে যায়, কাজের প্রতি আসক্তিটা থাকে না। সেখান থেকে সে *জিতাত্মা* হয়ে যায়, মানে তার সব কিছু নিজের নিয়ন্ত্রণে চলে আসে, *বিগতস্পৃহঃ*, তার ইচ্ছা আকাঙ্খা গুলো স্তিমিত হয়ে যায়, এগুলো এর আগেও অনেকবার উল্লেখ করা হয়েছে। *নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধিং*, তখন কর্মের প্রতি আর কোন আসক্তি থাকে না, আত্মার যে নিষ্ক্রিয়তার স্বভাব, সেই স্বভাবটা সে পেয়ে যায়। যতক্ষণ কারুর কর্মের প্রতি আসক্তি থাকে বুঝতে হবে ততক্ষণ তার ভেতরে কিছু না কিছু কামনা বাসনা আছে। সেইজন্য যে বলে আমি কাজ করে করে মরে যেতে চাই, তাহলে বুঝতে হবে সে এখনও অসুরের দলে আছে, তার ভেতরে এখনও অনেক অঙ্কটবঙ্কট আছে। মুক্তির ঠিক আগের অবস্থা হচ্ছে নৈষ্কর্ম্য। প্রথমের দিকে সব কিছুতেই প্রচণ্ড কাজের প্রতি স্পৃহা, আর ফলের প্রতি আসক্তি থাকবে। সেখান থেকে আস্তে আস্তে নিজের স্বধর্মের প্রতি আসক্তি আসবে আর সব কাজেতে নিষ্ঠা আসবে। সেখান থেকে আস্তে আস্তে একটা অবস্থায় এসে কর্মের যে ফল তার প্রতি আসক্তিটা চলে যায়। আমার কাজ করার কথা, যে কাজটা সামনে এসে যাবে সেটাকে নিষ্ঠাপূর্বক করে দিয়ে খালাস, আমার আর কিছু চাইনা। এর পরের স্টেজে বলবে আমার কাজও চাইনা কাজের ফলও চাইনা। তাহলে তুমি কি চাইছ? আমি তাঁকে চাই, যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন আমি তাঁকেই চাই, তাঁকে ছাড়া আমার আর কিছু লাগবে না। এটা হচ্ছে উচ্চতম অবস্থা। যারা সাধারণ মানুষ তার উপর এগুলোর কোন কিছুই প্রযোজ্য নয়। সেখান থেকে যখন একটু উপরের দিকে ওঠে তখন স্বধর্ম পালন করতে শুরু করে। স্বধর্ম পালনে কর্ম আর কর্মফল এই দুটোকে নিয়ে এগোতে থাকে। চলতে চলতে সে কর্মফলের ইচ্ছাটাকে ত্যাগ করে, কর্মফল ত্যাগ করে কর্তব্য রূপে সব কর্ম করে যায়। একটা অবস্থাতে এসে কাজের এই স্পৃহাটাও তার চলে যায়, যদি দরকার পড়ে তাহলে করে দেবে, দরকার না থাকলে করতে যাবে না। প্রথমে যায় কর্মফলস্পৃহা, তারপরে যায় কর্মস্পৃহা। এবারে সে জ্ঞানভক্তির জন্য প্রস্তুত হয়ে গেল। তারপর ভগবান কয়েকটি শ্লোকে পর পর বলছেন, মানুষ কিভাবে সিদ্ধি লাভ করে –

**সিদ্ধিং প্রাপ্তো যথা ব্রহ্ম তথাপ্নোতি নিবোধ মে। সমাসেনৈব কৌন্তেয় নিষ্ঠা জ্ঞানস্য যা পরা।।৫০।।**

এরপর থেকে ভগবান বলছেন মানুষ কিভাবে সিদ্ধির দিকে অগ্রসর হয়। প্রথমে মানুষ তার নিজের মনের মত যে কোন কাজ করছে, তারপর সেখান থেকে বর্ণাশ্রমের কাজ করতে শুরু করে, এরপরে কর্মফলের প্রতি স্পৃহা চলে যায়, তারপরে কর্মের প্রতি স্পৃহা চলে যায়। এখান থেকে এবার তার যে জ্ঞাননিষ্ঠার প্রাপ্তি হচ্ছে সেটা ভগবান অর্জুনকে সংক্ষেপে বলছেন –

**বুদ্ধ্যা বিশুদ্ধয়া যুক্তো ধৃত্যাত্মানং নিয়ম্য চ। শব্দাদীন্ বিষয়াংস্ত্যক্ত্বা রাগদ্বেষৌ ব্যুদস্য চ।।৫১।।**

*বুদ্ধ্যা বিশুদ্ধয়া*, বুদ্ধিকে পরিষ্কার করতে হয়। কিভাবে পরিষ্কার করতে হয়? শাস্ত্র শ্রবণ করে করে আর আচার্যের সঙ্গ করে করে। *ধৃতি আত্মানং নিয়ম্য চ*, ধৈর্য সহকারে শরীর মন ইন্দ্রিয়াদি যা কিছু আছে সব গুলোকে আস্তে আস্তে নিজের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসতে হয়, যত রকমের বাইরের আকর্ষণ আছে, যেমন *শব্দাদীন্* গান-বাজনা, নাটক নভেল, টিভি দেখা এগুলো থেকে শরীর মনকে নিয়ন্ত্রণে নিয়ে, শরীরের ধারণের জন্য যতটুকু প্রয়োজন তাতেও আসক্তি ও দ্বেষকে বর্জন করতে হবে। পশুর মত ভোগবৃত্তিকে আটকাতে হবে। আর কি করতে হবে –

**বিবিক্তসেবী লঘ্বাশী যতবাক্‌কায়মানসঃ। ধ্যানযোগপরো নিত্যং বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিতঃ।।৫২।।**

*বিবিক্তসেবী*, মাঝে মাঝে নির্জনে একান্ত বাস করতে হবে। লোকজনের মধ্যে বাস করে আধ্যাত্মিক অগ্রগতি সম্ভব হয় না। ঠাকুর কথামৃতে অনেকবার বলছেন – মাঝে মাঝে গৃহীদের সাধুসঙ্গ আর নির্জন বাস করতে হয়, তিন দিন হোক, এক মাস হোক যে যত দিন পারবে। দুধকে দই করতে হলে নির্জনে দই পাততে হয়, একটু পরেই ওটাকে নেড়ে দিলে দই আর জমবে না। আধ্যাত্মিক সাধনা করতে করতে যে ভাবটুকু জমে, লোকজনের মধ্যে থাকলে সেই ভাবটা বার বার নাড়া পড়ে যায় বলে গাড় হয়ে জমতে পারেনা। গীতার এইটাই বৈশিষ্ট্য, শুরু করবে খুব সাধারণ জিনিষকে নিয়ে, ওখান থেকে আস্তে করে টেনে ওপরের দিকে নিয়ে চলে যাবে। এক্ষুণি বলছিল বর্ণাশ্রমের মত সাধারণ পথের কথা, সেখান থেকে আবার নিয়ে চলে গেলে আধ্যাত্মিকতার দিকে। তুমি যদি মনে কর আমি অনেক কাজকর্ম করেছি এবার একটু আধ্যাত্মিকতার দিকে যেতে চাই, তাহলে মাঝে মাঝে একান্ত বাসে চলে যেতে হবে। *লঘ্বাশী*, মানে স্বল্পাহার করার কথা বলা হচ্ছে। আচার্য এখানে বলছেন – যারা স্বল্পাহারী তারা নিদ্রা দোষ, শারীরিক দোষাদি থেকে মুক্ত থাকে। আধ্যাত্মিক জীবনের সব থেকে বড় শত্রু হচ্ছে নিদ্রা আলস্য আর শরীরের ব্যাধি। খাওয়া-দাওয়া নিয়মিত আর নিয়ন্ত্রিত করলে এই দোষ গুলো চলে যায়। যার বেশি ঘুম হয় তার মানে তার খাওয়া-দাওয়া ত্রুটিপূর্ণ। আমরা ভালোভাবে জানিও না যে আমার শরীরের কখন কোন অবস্থাতে কি কি জিনিষ আর কতটুকু প্রয়োজন, সেইজন্য আমরা অজান্তে অনেক বেশি খাওয়া-দাওয়া করে ফেলি। *যতবাক্‌কায়মানসঃ*, শরীর, মন ও বাণীকে সব সময় সংযত ও নিয়ন্ত্রণ রাখতে হবে।

*ধ্যানযোগপরো নিত্যং*, সব সময় প্রচুর ধ্যান করার চেষ্টা করতে হবে তা নাহলে যোগ হয় না। এখানে কিন্তু জপকে জোর দেওয়া হচ্ছে না, আসলে ধ্যান না হলে আধ্যাত্মিক জীবন এগোতে পারে না। *বৈরাগ্যং*, ঈশ্বরই সৎ আর বাকি সব অসৎ, এই ভাবটাকে মনের ভেতরে সব সময় জাগ্রত রাখতে হবে। *সমুপাশ্রিতঃ*, মানে একান্ত বাস, স্বল্পাহার, শরীর-মন-বাণীকে সংযত, সব সময় প্রচুর ধ্যান আর ঈশ্বরই নিত্য বাকি সব অনিত্য এই ভাবকে অবলম্বন করে মনকে সব সময়ের জন্য জাগ্রত রাখা, এইগুলোকে আশ্রয় করে তোমাকে আধ্যাত্মিক সাধনার পথে এগোতে হবে। আর কি –

**অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং পরিগ্রহম্। বিমুচ্য নির্মমঃ শান্তো ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে।।৫৩।।**

আধ্যাত্মিক সাধনাতে মানুষ কিভাবে এগোয়? অহঙ্কার, কামরাগাদি পূর্ণ বল, দর্প, কাম, ক্রোধ এইগুলোকে দমন করে এগোতে হবে। এইভাবে এর আগে আগে যেগুলো করতে বলা হয়েছে তার সাথে এই জিনিষগুলোকে দমন করে এবং দেহ ও জীবনের প্রতি মমত্ব বোধকে ত্যাগ করলে কি হয়? তার মন চিত্তবেক্ষেপশূন্য অবস্থা প্রাপ্ত হয়। এইবার সে ব্রহ্মের সঙ্গে এক হবার প্রস্তুতি নিয়ে নিল। ব্রহ্ম হচ্ছেন শুদ্ধ নিত্য বস্তু, এখন যদি এখানে স্ফটিকের মত একেবারে শুদ্ধ জল থাকে এর মধ্যে এক ফোঁটা কালি ফেলতেও ইচ্ছে করবে না। এই শুদ্ধ জলের সাথে যদি এক হতে হয় তাহলে শুদ্ধ জলই মেশাতে হবে। সেইজন্য কঠোপনিষদে বলছেন – *যথোদকং শুদ্ধে শুদ্ধমাসিক্তং তাদৃগেব ভবতি*(২/১/১৫), নির্মল জলে যদি সেই রূপ নির্মল জল মিশিয়ে দিলে দুটো জল এক হয়ে যায়, মনটা যতক্ষণ একেবারে শুদ্ধ না হয়ে যায় ততক্ষণ ব্রহ্মের সাথে এক হবে না। আমরাতো ঈশ্বরের সাথে এক হয়েই আছি, আমরা ঈশ্বরের বাইরে নাকি, মাছ কি সমুদ্রের বাইরে নাকি, সেতো সমুদ্রের সাথে এক হয়েই আছে, কিন্তু সমুদ্রের যে রূপ সেই রূপে নেই। আমিও তো ঈশ্বরের সাথে এক, কিন্তু পার্থক্য কোথায় হচ্ছে, আলাদা হচ্ছে এই শরীর, মন, ইন্দ্রিয়, বাণী এগুলো রয়েছে এরাই বিভিন্ন রঙের খেলা দেখাচ্ছে। এই রঙগুলোকে পরিষ্কার করে দিলে যে ঈশ্বর সেই ঈশ্বরই থেকে যাবেন। উত্তরমেরু আর দক্ষিণমেরুতে জলে বরফ ভাসছে, বরফ গলে গেলে সেই জলের সাথে এক হয়ে গেল। যদি বলে মরে গেলেতো হয়েই গেল, না হবে না, কারণ মরে গেলে সূক্ষ্ম শরীরটা থেকে যাবে, সূক্ষ্ম শরীরটাও বরফের একটা টুকরো। ঐ সূক্ষ্ম শরীরকে না ভাঙা পর্যন্ত

ঈশ্বরের সাথে এক হবে না। কিন্তু সূক্ষ্ম শরীর কিছুতেই ভাঙবে না, সূক্ষ্ম শরীর ভাঙা অত্যন্ত কঠিন, ধ্যান করে নিজের আত্মস্বরূপকে না জানা পর্যন্ত সূক্ষ্ম শরীরের নাশ হবে না। আমরা ঈশ্বরের সাথে এক, ভেতরে ঈশ্বর বাইরেও ঈশ্বর, সেই ঈশ্বর সমুদ্র, সচ্চিদানন্দ সাগরেই আমরা ভাসছি। আপনি যদি মনে করেন বরফ হয়েতো বেশ আছি, তাহলে তাই থাকুন। যখন বরফ বরফের সঙ্গে টক্কর খেয়ে বরফ ভাঙবে তখন কষ্ট পাবে। আপনার অহঙ্কার আমার অহঙ্কারে যখন ঠোকাঠুকি হবে তখন আমাদের চোখে জল বেরোবে। চোখের জল যখন খুব বেশি বেরোবে তখন বলব – না এই ভাবে বরফ হয়ে আমি থাকতে চাইনা। তখন বলবে, তাহলে তোমার এই রূপটাকে ছাড়। রূপটাকে কিভাবে ছাড়বে? ধ্যান করে জানো যে তুমিও যা আর ঐ সমুদ্রের জলও তাই। তখন তুমি বলতে পারবে আমার এই বরফের রূপ লাগবে না। তবে বরফের রূপটাকে গলিয়ে দাও, গলিয়ে দিলে তখন আর কোন ঠোকাঠুকি হবে না। এইটাই হচ্ছে গীতার উদ্দেশ্য। এরপর বলছেন –

**ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি। সমঃ সর্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্।।৫৪।।**

যিনি ব্রহ্মস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যান তখন তার কি লাভ হয়? সে আর শোক মোহ করে না। এইটাই অর্জুনের সমস্যা ছিল, অর্জুন শোক মোহগ্রস্ত হয়ে গিয়েছিল। তাই ভগবান সব কিছু দেখিয়ে দিয়ে বলছেন, তুমি ব্রহ্মের সাথে একবার যদি এক হয়ে যেতে পার তাহলে আর তোমার শোক মোহ আসবে না। *সমঃ সর্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্* - আমি একজনকে দেখে আনন্দ পাচ্ছি, আরেকজনকে দেখে বিরক্ত হচ্ছি, এখান থেকেই অশান্তি সৃষ্টি হয়। এখন যদি সবাই এক হয়ে যায় তখন কাউকে দেখে বিরক্ত হব না, কাউকে দেখে আনন্দে উৎফুল্ল হবো না। যিনি ব্রহ্মভূতে এক হয়ে গেলেন, যিনি বুঝে গেলেন আমি আর সমুদ্র এক তখন সব বরফের চাঁইগুলোকে দেখে বলব – আরে এরা তো সব সমুদ্র, ব্যাটারা বরফের রূপটাকে পরিত্যাগ করছে না কেন। কিন্তু তাই বলে তখন আর কোন বরফের চাঁইগুলোর প্রতি ভালোবাসাও থাকবে না, আবার বিরক্তিও লাগবে না, সে জেনে গেছে এও যা আমিও তাই, আর সবাই তাই, সবই এক। সেই অবস্থায় যখন দুটো বরফে ঠোক্কর হবে তখন বলবে – ও কিছুই না, এতো জলে জলে ঠোক্কর হচ্ছে। কিন্তু অন্যদের ইমোশান থেকে চোখের জল বেরুচ্ছে, তখন তাকে বলবে – ওরে তুই তা নস্, তুই সমুদ্র। সে বলবে আমি মানিনা। তখন সে করুণা পরবশ হয়ে তাকে গীতার উপদেশ শোনাবে। গীতার উপদেশ মানে, এক কথায় বললে বলবে, তুই এর থেকে আলাদা নয়, দুটোই সমুদ্র। সে আবার মানতে চায় না। তখন তাকে তাই এত ভাবে বোঝানর চেষ্টা করা হচ্ছে।

এই ক্রম অনুযায়ী যখন সব কিছু পরিষ্কার হয়ে যায় তখন কি হয়? ঈশ্বরের ব্যাপারে যে জ্ঞান সেটা আস্তে করে ভক্তের মনে নেমে আসে। কি রকম করে?

**ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ। ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্।।৫৫।।**

ঈশ্বরের ভক্ত মানে যিনি ঈশ্বরের তত্ত্বজ্ঞান জানেন। ঠিক ঠিক ভক্ত হচ্ছেন, যিনি ঈশ্বর কি রকম, ঈশ্বরের ঠিক ঠিক সারটা কি, ঈশ্বরের স্বরূপটা কি এইটা জানতে পারেন। ঈশ্বরের স্বরূপটাকে যিনি জানেন তিনিই ঠিক ঠিক ভক্ত। *ভক্ত্যা মামভিজানাতি*, ভক্ত তখন জানতে পারেন আমি কি রকম, *যাবান্ যঃ চ অস্মি তত্ত্বতঃ*, আমি কি রকম সেটা ঠিক ঠিক তত্ত্বতঃ জানতে পারেন। একটা জিনিষের প্রতি ভালোবাসা জাগাতে হলে সেই জিনিষটাকে আগে জানতে হয়, যে জিনিষটাকে জানা যায় তাকেই ভালোবাসা যায়। মা নিজের ছেলেকে ভালোবাসে কারণ সে জানে যে এ আমার সন্তান। এটা শোনা যায় যে, যখন কোন দাঙ্গা হয়, বিশেষ করে হিন্দু মুসলমানের দাঙ্গা হয় তখন পরিচিতদের কেউ খুন করতে পারেনা, অপরিচিতদেরই খুন করতে পারে। লর্ড কার্ডিগান ছিলেন, যার নামে মেয়েদের জামা কার্ডিগান এসেছে, দুজন ছিলেন জেনারেল, এরা আবার জামাই ভগ্নিপতি ছিল, এদের মধ্যে ছিল অহঙ্কারের লড়াই। নিজেদের অহঙ্কার আর শৌর্যকে দেখানোর জন্য ফরাসী সৈন্যবাহিনীকে ছশ জন ব্রিটিশ আর্মি আক্রমণ করেছে। ফরাসীদের মধ্যে তিন দিকে কামান দাগান ছিল, সামনে আর দুই পাশে। এর মধ্যে লর্ড কার্ডিগানের জামাই আর ভগ্নিপতি নিজেদের ক্ষমতা দেখাবার জন্য আর্মিদের নিয়ে বেরিয়ে গেছে। তখন যিনি চিফ ছিলেন তিনি বলছেন – মারাত্মক কাণ্ড হয়ে গেছে। তখন তিনি একজন রাইডারকে দিয়ে একটা চিঠি দিয়ে পাঠিয়েছে এক্ষুণি আর্মিদের নিয়ে ফেরত চলে আসতে, তা নাহলে এরা কেউই বাঁচবে না। রাইডার ঘোড়া ছুটিয়ে অর্ডার নিয়ে গেছে, গিয়ে বলছে স্যার এটা ভুল হয়ে গেছে এক্ষুণি ফেরত আসতে বলা হচ্ছে। সামনে যে চিফ ছিল সে চিঠি পর্যন্ত নিল না, উপরন্তু নিজের সৈন্যদের বলে দিলে তোমরা কেউ আমার অর্ডার অমান্য করবে না। তারপর তো ফরাসী সৈন্যরা ব্রিটিশ আর্মিকে একেবারে কেটে শেষ করে দিয়েছে। ফরাসী সৈন্যদের যে নেতৃত্ব দিচ্ছিল, সে এর আগে একবার ব্রিটেন গিয়েছিল, সেখানে একটা বড় পার্টিতে এই ভদ্রলোকের সঙ্গে খাওয়া দাওয়া করেছিল। এক সময় দুজনে খাওয়া-দাওয়া করেছিল কিন্তু এখন তারা দুই শত্রুপক্ষের দুজন সেনা প্রধান। ফরাসীর সৈন্য প্রধান ঐ ভদ্রলোককে দেখেই থমকে গেছে। একটু হলে মেরেই দিত, যাই হোক থমকে গিয়ে আর তাকে মারেনি। এইভাবে লোকটি বেঁচে যায়। একে জানতো বলে ভালোবেসেছিল। আমরা যাকে জানিনা তাকে ভালোবাসতে পারিনা। সেইজন্য বলা হয় to know is to love, ভালোবাসা তখনই হয় যখন তাকে জানব। ঠাকুর দক্ষিনেশ্বরে নরেনকে প্রথম আলাপের পর একদিন বলছেন – এখন নব অনুরাগ এখন বেশি বেশি আসবি। বেশি বেশি আসা মানে কি, এখন নবানুরাগ, একে অপরকে জানতে হবে। একে অপরকে যত বেশি জানবে তত বেশি ভালোবাসা হবে। আবার এটাও আছে

যে, যত তোমাকে জানছি ততো তোমাকে আমাকে ঘেন্না করছি। কিন্তু এখানে ভগবানের কথা বলা হচ্ছে, ভগবানের কথা যত বেশি জানা হয় তত তাঁর প্রতি ভালোবাসা গাঢ় হতে থাকে। যত কম জানাজানি হবে ভালোবাসা তত কম থাকে। এই যে অনেকে বলে, অত শত আমার জেনে কি হবে। কিন্তু অত শত না জেনে থাকলে কখনই ভালোবাসতে পারবে না। ভগবানের গুণ যদি আমি নাই জানি, ভগবানের তত্ত্ব যদি আমি নাই জানি তাহলে ভগবানকে আমি কি ভালোবাসব! এইটাই এখানে বলছেন – *ভক্ত্যা মামভিজানাতি*, ভক্ত আমাকে জানতে পারে, কি রকম জানে, আমি যে রকমটি সেই রকমটি জানতে পারে।

*ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্*, ঈশ্বর জ্ঞান মানে এক হয়ে যাওয়া, আমার যে জিনিষটার জ্ঞান হয়ে গেল সেই জিনিষটার সাথে আমি এক হয়ে গেলাম। তথ্য জানাকেই জ্ঞান বলে না, ইন্টারনেটে অনেক কিছু তথ্য আসছে, কিন্তু সেটাকে জানা বলে না। জানা মানে হচ্ছে ওটার সঙ্গে এক হয়ে যাওয়া। যখন আমি আগুনে হাত দিচ্ছি তখনই আমি জানতে পারি আগুনে পুড়লে কি হয়। ঐ জ্ঞানটা ভেতর থেকে আসে, কিন্তু তথ্য সব সময় বাইরের থেকে আসে। জ্ঞান আর তথ্যের এইটাই তফাৎ। এখন ভগবানকে আমি যত জানছি সেটা আমার ভেতর থেকেই আসছে। যখন ঠিক ঠিক জানা হয়ে গেল, ভগবান এই, তখন আমার আর ভগবানের মধ্যে কোন তফাৎ রইল না। এই তত্ত্বটাকেই কবিত্বের ভাষায় গীতায় বলছেন – *বিশতে তদনন্তরম্*, ভগবানের সাথে এক হয়ে যায়। ভগবানের মধ্যে কি ঢুকে যাবে, ভগবানের মধ্যে তো সে ঢুকেই আছে, ভগবানকে জেনে গেল মানে, তার বুদ্ধি যেটা ছিল সেটা ভগবানের মধ্যে হারিয়ে গেল, তার নিজের যে আলাদা অস্তিত্ব বোধ ছিল সেটা ভগবানের অস্তিত্বের মধ্যে এক হয়ে নিজের আর আলাদা অস্তিত্ব থাকল না। তখন তার আকারটাই শুধু থাকবে, কিন্তু সে তত্ত্বতঃ জেনে গেল তুমিও যা আমিও তা, তখন এই শরীরের পতনের অপেক্ষায় থাকে বা অনেক সময় নিজে থেকেই শরীর ছেড়ে দেয়।

এই হচ্ছে পদ্ধতি, প্রথমে এই কুকুর বেড়ালের মত জীবন-যাপন করবে, টাকা-পয়সা, খাওয়া-দাওয়ার জন্য ছুটে মরবে। এখানে থেকে যখন মনের মধ্যে একটু ধর্মবোধ উদয় হল তখন বর্ণাশ্রম ধর্মে নিজের স্বধর্ম পালন করতে থাকবে। স্বধর্ম মানে যে কাজটা সে নিয়েছে, সেটাকে নিষ্ঠা পূর্বক করার পর ঈশ্বরার্পণবুদ্ধ্যা, সব কর্মের ফল ঈশ্বরে সমর্পণ করবে বা নিষ্কাম ভাবে কর্ম করবে। এইভাবে কর্ম করতে করতে একটা সময়ের পর কর্মফলস্পৃহা চলে যায়। লোকে আমাকে ভালো বলুক, লোকে আমাকে মান্যতা দিক, আমার প্রচুর টাকা-পয়সা হোক এই কামনা গুলো চলে যায়। কর্তব্য কর্ম এসে গেছে তাই করছি, কর্তব্যের বাইরে কোন কর্মেই আর আগ্রহ নেই। তারপর এটাও চলে যায়, আমি শুধু ঈশ্বরকে নিয়েই থাকব, তখন কর্মস্পৃহা ত্যাগ হয়ে গেল। ঈশ্বরকে নিয়ে থাকতে থাকতে ঈশ্বরের তত্ত্ব জ্ঞানটা ভেতর থেকে জেগে যায়। ঈশ্বরের জ্ঞান যখন জাগতে থাকে তখন বোঝা যাচ্ছে যে মন পরিষ্কার হচ্ছে। যেমন যেমন ঈশ্বরের তত্ত্ব জানছে তেমন তেমন মন পরিষ্কার হতে থাকছে। যেমন যেমন মন পরিষ্কার হচ্ছে, হতে হতে একটা সময় দুটো এক হয়ে গেল। এক হয়ে গেল মানে, সে ঈশ্বরের মধ্যে প্রবেশ করে গেল। বাঘ যেন শিকারকে ধরে নিয়েছে, আর তার বাঁচার ক্ষমতা নেই, কেউ বাঁচাতে পারবে না, শিকারটা এবার বাঘের পেটে চলে যাবে। কিন্তু এখানে ভগবানের পেটে গিয়ে নাশ হয় না, ভগবানের সত্তা পেয়ে যায়। এই কথা বলার পর বলছেন –

**সর্বকর্মাণ্যপি সদা কুর্বাণো মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ। মৎপ্রসাদাদবাপ্নোতি শাশ্বতং পদমব্যয়ম্।।৫৬।।**

এই শ্লোকটি খুব গভীর মর্মার্থক। যে মানুষ যে কোন কাজ, যা কিছু করছে, সেই কাজ করার সময় যদি সে মনের মধ্যে এই ভাবটাকে সদা জাগ্রত রাখতে পারে, হে প্রভু তুমিই আমার একমাত্র আশ্রয়, তুমি ছাড়া আর আমার কোন আশ্রয় নেই, শঙ্করাচার্য এখানে নিজের থেকে যোগ করছেন – *সর্বকর্মাণি প্রতিসিদ্ধানিহোপি*, প্রতিসিদ্ধ কাজ, শাস্ত্রে যে কাজটা নিষেধ করা আছে এই কাজটি করো না, সেই কাজও যদি করতে থাকে কিন্তু সে যদি বলে আমার আশ্রয় একমাত্র ঠাকুর, তখন কি হয়? *মৎপ্রসাদাদবাপ্নোতি শাশ্বতং পদমব্যয়ম্*, আমার কৃপায় সে শাশ্বত পদ পেয়ে যায়, শাশ্বত পদকে গীতা বলছে *শাশ্বতং পদ অব্যয়ম্*। তার অর্থ হল, যে ঈশ্বরের প্রকৃত ভক্ত, যে ঠিক ঠিক মনে প্রাণে ঈশ্বরের আশ্রিত, তার আর কাজের কোন ভালো মন্দ থাকে না। এর আগে যত রকমের কাজের কথা বলা হয়েছিল, নিত্য কর্ম, নৈমিত্তিক কর্ম, কাম্য কর্ম ও নিষিদ্ধ কর্ম, এই কর্মের সাথে শঙ্কর নিজের থেকে যোগ করে বলছেন, *প্রতিসিদ্ধানিহোপি*, প্রতিসিদ্ধ মানে এর বাইরেও যত নোংরা কাজও যদি সে করতে থাকে তাতেও তার কিছু পাপ পূণ্য বোধ হবে না। আগেকার দিনে ভারতে তাই হতো, ডাকাতর বন্দুক নিয়ে ডাকাতি করতে যাচ্ছে, যাওয়ার আগে মাকালীর সামনে দাঁড়িয়ে হাত জোড় করে বলছে – মা ডাকাতি করতে চললুম। তেলেভেলোর মাঠে যে ডাকাত শ্রীমাকে ধরেছিল, সেই ডাকাতও মাকালীর ভক্ত ছিল। আমাদের কাছে সবটাই ধর্ম ছিল, ডাকাতি করতে গেলেও ধর্মকে অনুসরণ করে ডাকাতি করত, কিন্তু ভগবানের আশ্রিত হতে হবে। এইখানে এসে অন্য যত ধর্ম আছে, সব ধর্মকে হিন্দুধর্ম অতিক্রম করে যায়। ঈশ্বরই বস্তু বাকি সব অবস্তু, এই ভাব যখন ভেতরে জাগ্রত হয়ে যায় তখন আর মন্দ কাজ ভালো কাজ বলে কিছু থাকে না। এগুলো খুব উচ্চ ভাব, সাধারণ মানুষ এই ভাবকে ধরতেও পারেনা, তাই সবার জন্য আধ্যাত্মিকতা নয়। এই ভাব নিজের পুরুষকারের দ্বারা আসবে না, এই ভাব হয় ঈশ্বরের কৃপায়, বলেই দিচ্ছেন *মৎপ্রসাদাদবাপ্নোতি*, আমার কৃপাতে। তার মানে এই নয় যে নিষিদ্ধ কর্ম নিষিদ্ধ থাকবে না, নিষিদ্ধ কর্ম নিষিদ্ধই থাকবে কিন্তু তার জন্য আর কোন কিছুই আটকাবে না। নিষিদ্ধ কর্ম যখন সে করবে তার ফল যে সে পাবেনা তা নয়, ফল সে পাবে, কর্মের

ফলটা যাবে কোথায়। তখন কি হবে? যদি সে নিষিদ্ধ কর্ম করে ভগবানই তখন তাকে দুটো চড় মারবে। আগে পুলিশকে দিয়ে, একে দিয়ে তাকে দিয়ে হয়রানি করে ফলটা ভোগ করিয়ে নিতেন। এখন ভগবান নিজেই দুটো চড় কষিয়ে দেন। কি ভাবে ভগবান তাকে চড় মারেন? সামাজিক অপমান হয়ে যাবে, শরীরে ব্যাধি এসে যাবে। কিন্তু তারপরও যদি সে ভগবানের আশ্রয়কে ধরে রেখে বলে, হ্যাঁ, আমি দোষ করেছি, তুমি মারার থাকলে মার। তখন সে বলে, হে ভগবান এই চড়টা তোমারই দেওয়া। এইটাই হচ্ছে উচ্চতম শরণাগতি। ছোট ছেলে বদমাইশি করার পর বাড়ির কেউ যদি তাকে মারতে আসে সে তখন কি করবে? মায়ের কাছে ছুটে পালায়। কিন্তু মার কাছে যদি বদমাইশি করে থাকে তখন সে কোথায় যাবে, মা যখন খুব মারতে থাকে সে তখন আরও মায়ের আঁচলের তলায় ঢুকে পড়ে। একটা অবস্থার পর মা ছেলেকে ক্ষমা করে কোলে তুলে নেয়। ভগবানও ঠিক তাই করেন, ভগবানও মারতে শুরু করেন। তখন সে কোথায় যাবে, তুমি ছাড়াতো আমার আর কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই। তখন ভগবান বলছেন *মৎপ্রসাদাদবাপ্নোতি শাশ্বতং পদমব্যয়ম্*, আমার কৃপাতে সে আমার শাশ্বত অব্যয় পদ লাভ করে নেয়। এইখানে উপনিষদ আর গীতার বিরাট পার্থক্য এসে যায়। উপনিষদ এর ধারে কাছে না গিয়ে বলবে কৃপা বলে কিছু নেই, তোমাকেই সব কিছু করতে হবে। এরপর বলছেন –

**চেতসা সর্বকর্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরঃ। বুদ্ধিযোগমুপাশ্রিত্য মচ্চিত্তঃ সততং ভব।।৫৭।।**

সেইজন্য হে অর্জুন, তোমার যা কিছু আছে, তোমার কর্ম, তোমার বুদ্ধি সবটাই তুমি আমার উপর অর্পণ করে বুদ্ধিযোগের আশ্রিত হয়ে এই ভাব নিয়ে তুমি আমাতে তোমার চিত্তকে স্থাপন কর। একটা ছেলে যখন একটা মেয়েকে ভালোবাসে তখন ছেলেটির চিন্তা ভাবনাতে খালি মেয়েটিই ঘুরতে থাকে, মেয়েটির বাইরে সে আর কিছুই ভাবতে পারেনা। নতুন বিয়ের পর স্ত্রী যখন রান্না করে তখন স্বামীকে মাথায় রেখে রান্না করে, নতুন স্বামী যা কিছু কেনাকাটি করে সব তার স্ত্রীর কথা মাথায় রেখেই করে, ঠিক তেমনি তুমি যা কিছু করবে আমাকে মাথায় রেখেই কর। আমার প্রতি তোমার ভাব, ভালোবাসা এমন নিবিড় যে, যে যুদ্ধটা করছ সেটাও মনে কর আমার জন্যই করছ। যুদ্ধে মার খাচ্ছ আমার জন্যই খাচ্ছ, জয় যখন পাচ্ছ আমার জন্যই পাচ্ছ। স্বামী-স্ত্রীর যেমন নিবিড় ভালোবাসা হয়, স্বামী যা কিছু করে স্ত্রীর জন্যই করে, স্ত্রী যা কিছু করে স্বামীর জন্যই করে, ঠিক তেমনি তুমি সব কিছু আমার কথা মাথায় রেখে আমার জন্যই করবে। সাধারণ মানুষ এই ভাবকে ধারণা করতে পারবে না বলে আমাদের তত্ত্বদর্শীরা তাই শ্রীকৃষ্ণ আর গোপীদের লীলাকে নিয়ে এসে এই ভাবটাকে সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রচার করেছিলেন। ঈশ্বরের প্রতি রাগানুরাগ ভক্তিটা কি রকম? গোপীদের শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যে ভালোবাসা সেটা এই রকম। গোপীরা সর্বদা শ্রীকৃষ্ণের কথাই চিন্তা করে চলেছেন, শ্রীরাধার চোখ সব সময় শ্রীকৃষ্ণের অনুরাগে রঞ্জিত। অথচ দেখুন, গোপীদের কথা, শ্রীরাধার কথা মহাভারতে পাওয়া যায় না, গীতাতেও কোন উল্লেখ নেই। সব থেকে প্রামাণিক গ্রন্থ তাতেও গোপী বা শ্রীরাধার কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। শ্রীরাধার চরিত্র ভক্তি সাহিত্যে অনেক পরের দিকে এসেছে। মানুষ কিভাবে ঈশ্বরকে ভালোবাসবে? শ্রীরাধার মত, তাঁর কাছে শ্রীকৃষ্ণ ছাড়া আর কিছু নেই। শ্রীকৃষ্ণ যখন নগ্নপদে কন্টক আচ্ছাদিত বন পথে চলেছেন তখন শ্রীরাধা তাঁর সূক্ষ্ম শরীরকে শ্রীকৃষ্ণের চরণতলে বিছিয়ে দিচ্ছেন যাতে শ্রীকৃষ্ণের কোমল চরণ কন্টকে বিদ্ধ না হয়। এগুলো খুবই উচ্চ ভক্তি ভাবের কথা, সাধারণ লোকেদের এগুলো শোনার জন্যই নয়। যাঁরা খুব উচ্চ শ্রেণীর সাধক তাঁরাই এর একটু বুঝতে পারেন কি বলতে চাইছে। এরপর বলছেন –

**মচ্চিত্তঃ সর্বদুর্গাণি মৎপ্রসাদাৎ তরিষ্যসি। অথ চেৎ ত্বমহঙ্কারান্ন শ্রোষ্যসি বিনঙ্ক্ষ্যসি।।৫৮।।**

এবার ভগবান পুরো জিনিষটাকে আস্তে আস্তে গুটিয়ে নিয়ে আসছেন। তুমি যদি আমাকে তোমার চিত্তে পুরোপুরি বসিয়ে নাও তাহলে – *সর্বদুর্গাণি মৎপ্রসাদাৎ তরিষ্যসি*, যত তোমার আপদ-বিপদ আছে সব আপদ-বিপদই আমার কৃপাতে ত্বরিয়ে যাবে। কিন্তু – *অথ চেৎ ত্বমহঙ্কারান্ন শ্রোষ্যসি বিনঙ্ক্ষ্যসি*, যদি তুমি নিজের অহঙ্কার বশতঃ আমার কথা না অনুসরণ কর তাহলে তোমার সব কিছুই নাশ হয়ে যাবে। নাশ হয়ে যাবে মানে কি যুদ্ধে হেরে যাবে, কি তুমি মারা যাবে ইত্যাদি? না তা নয়, তোমার উদ্দেশ্যটা হচ্ছে মুক্তি লাভ করা বা মুক্তির পথে এগোন। এর কোনটাই তাহলে তোমার হবে না। তুমি এখন বিভিন্ন যোনিতে ঘুরতে থাক।

**যদহঙ্কারমাশ্রিত্য ন যোৎস্য ইত মন্যসে। মিথ্যৈষ ব্যবসায়স্তে প্রকৃতিস্ত্বাং নিযোক্ষ্যতি।।৫৯।।**

শুধু তাই নয়, এবার তোমাকে আমি কাজের কথা বলছি। এখানে মূল বিষয় হচ্ছে যুদ্ধকে নিয়ে, তুমি নিজের বোকা অহঙ্কারের জন্য মনে করছে যে, আমি যুদ্ধ করব না, এই চিন্তা করাটাই তোমার বৃথা। এটা তোমার মিথ্যা কল্পনা ছাড়া কিছুই নয়, কারণ *প্রকৃতিস্ত্বাং নিযোক্ষ্যতি*, তোমার যে প্রকৃতি, তোমার যেটা স্বভাবে আছে, সেটাই তোমাকে দিয়ে যুদ্ধ করিয়ে ছাড়বে। একজন রাজার একটা খুব দামী ঘোড়া ছিল। ঘোড়া একদিন ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখছে, কোন এক যুদ্ধ করতে গিয়ে তার পায়ে চোট লেগেছে। এখন ঘোড়ার সাইকোসোম্যাটিক সমস্যা এসে গেছে। এখন সে একটা পা মুড়ে নিয়েছে, কিছুতেই একটা পা আর নামাচ্ছে না। ঘোড়ার দৃঢ় ধারণা হয়ে গেছে যে তার পা মোড়া, যুদ্ধে তার হাটু ভেঙে গেছে। রাজা তাঁর দামী ঘোড়ার এই অবস্থা দেখে মহা দুর্ভাবনাতে পড়েছেন, অনেক বৈদ্য, কবিরাজ দেখান হল, কিন্তু কিছুতেই কিছু হচ্ছে না, ঘোড়া কিছুতেই পা আর নামাচ্ছে না, যখন দাঁড়ায় তখন তিনটে পায়ে দাঁড়ায়, যখন হাটে তখন খুড়িয়ে খুড়িয়ে হাঁটে। এরপর অনেক খোঁজাখুজির পর এক বৈদ্যকে পাওয়া গেল,

সব শুনে বৈদ্যমশাই রাজাকে বলল, রাজা মশাই, আপনি একটা যুদ্ধের পরিকল্পন করুন, আর খুব জোর কাড়া-নাকাড়া, ঢাক-ঢোল বাজাতে শুরু করুন, শুনে মনে হবে যেন বিরাট যুদ্ধ লাগতে যাচ্ছে। বৈদ্যের কথামত একটা নকল যুদ্ধের ব্যবস্থা করা হয়েছে। কাড়া-নাকাড়া, ঢাক-ঢোলের আওয়াজ হতেই সব সৈন্যরা দৌড়ে এসে ঘোড়ার পিঠে লাফিয়ে উঠেই দুম্ দুম্ করে গুলি ছুড়তে শুরু করেছে। এই সবের মধ্যেই রাজাও দৌড়ে এসে এই ঘোড়াটির পিঠে উঠেই তলপেটে লাথি মেরেছেন। এখন ঘোড়ার প্রকৃতিতে এমন হয়ে আছে যে, যেই রাজা এসে উঠেছেন ঘোড়াও তখনই দৌড়াতে শুরু করেছে, দেখছে তার মোড়া পাটি খুলে গেছে। ঘোড়ার সত্যি যদি পা মোড়া থাকতো তাহলে ঘোড়াকে কেউ দৌড় করাতে পারতো না, কিন্তু ঘোড়ার পা কোথাও যায়নি, পা আছে, কিন্তু ভ্রান্তবশতঃ মনে করছো আমার পা নেই। কিন্তু ঠিক সময় এলে ঘোড়ার দৌড়ান শুরু হয়ে যাবে। অর্জুন যদি বলে, আমি যুদ্ধ ভূমি ছেড়ে চললাম, আর এক্ষুণি যুদ্ধ যদি শুরু হয়ে যায়, অর্জুন সরে যাবে। কিন্তু যখনই হা হা, হু হু, মারো কাটো এই সব আওয়াজে উঠতে শুরু করবে তখন অর্জুনই দৌড়ে এসে যুদ্ধে নেমে পড়বে। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের আগে বলরাম বলে দিলেন, আমি এই যুদ্ধে সবাইকে নিজের চোখের সামনে মরতে দেখেতে পারিনা। এই বলে তিনি কুরুক্ষেত্র যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে দিয়ে তীর্থ ভ্রমণে বেরিয়ে পড়লেন। তীর্থ ভ্রমণ সেরে ফিরে এসে দেখেন তখন দুর্যোধন ও ভীমের মধ্যে গদাযুদ্ধ চলছে। ঐ যুদ্ধে তিনি বিচারক হয়ে বসে পড়লেন। বলরামের প্রকৃতি কোথাও হারিয়ে যায়নি। আর যখন দুর্যোধনকে ভীম মারলেন তখন বলরামও লাঙল তুলে বলছেন – এটা মারাত্মক অন্যায় হয়েছে, আমি পুরো পৃথিবীকে ধ্বংস করে দেব। তখন শ্রীকৃষ্ণ দাদা বলরামকে এইটাই বললেন – যখন ধর্মযুদ্ধ হল তখন তো আপনি তীর্থ করতে বেরিয়ে গেলেন, আর এখন এসে ধর্ম দেখাচ্ছেন! এইটাই প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য, প্রকৃতি কোন ভাবে কোথাও চলে যাবে না। তুমি মনে করছ প্রকৃতিকে অস্বীকার করবে, কিন্তু পারবে না, তুমি মনে করছ আমি যুদ্ধ করবো না, তুমি যুদ্ধ না করে যাবে কোথায়, তোমার প্রকৃতিতে যুদ্ধ জন্ম থেকেই রয়েছে। প্রকৃতিই তোমাকে টেনে এনে যুদ্ধ করিয়ে ছাড়বে। রাজসভাতে এক সাধুবাবা এসেছেন, রাজাকে দেখে বলছেন – কি রাজা, অনেক দিনতো হল এবার সব কিছু ছেড়ে দিয়ে চল সন্ন্যাস নেবে। রাজা বলছে – আমি জঙ্গলে গেলে সেখানেও একটা সাম্রাজ্য দাঁড়িয়ে যাবে। এই কথাকেই আরও বিস্তার করে ভগবান বলছেন –

**স্বভাবজেন কৌন্তেয় নিবদ্ধঃ স্বেন কর্মণা। কর্তুং নেচ্ছসি যন্মোহাৎ করিষ্যস্যবশোঽপি তৎ।।৬০।।**

হে অর্জুন, এই যে যুদ্ধের নানা রকমের কৌশল, যুদ্ধে নিজের শৌর্য প্রদর্শন করা, এই ধরণের ক্ষত্রিয়োচি বিভিন্ন মানসিক বৃত্তিতে তোমার মন পুরোপুরি আচ্ছন্ন হয়ে আছে, সেইজন্য তুমি যে মোহে পড়ে অবিবেকবশতঃ বলছ আমি যুদ্ধ করব না, তুমি যুদ্ধ না করে থাকতেই পারবে না, যুদ্ধই তোমাকে টেনে নিয়ে যাবে। তোমার স্বভাব যখন তোমাকে যুদ্ধে টেনেই নিয়ে যাবে তাহলে তুমি কেন মিছি মিছি স্বধর্ম পালন করতে চাইছ না, তুমি স্বধর্ম পালনের জন্য যুদ্ধই কর।

এটাই হচ্ছে মূল কথা। দুঃখে পড়ে, কষ্টে পড়ে, মোহে পড়ে আমরা অনেক সময় অনেক কিছুই করে ফেলি যেটা আমার স্বধর্মের মধ্যে পড়ে না। কিছুদিন পরে দেখা যাবে যেখানে ছিলাম সেখানেই আবার আমাকে টেনে নিয়ে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। সেইজন্য কখনই নিজের ধর্মকে ছাড়তে নেই, নিজের ধর্ম ছেড়ে কিছু করাতে কোন লাভ হয় না। যখন অযথা যেচে নিজের ধর্ম ছেড়ে কাউকে উপকার বা সাহায্য করতে এগিয়ে যাই, তখন দেখা গেল কিছু দিন পরে সে যেমন ছিল তেমনই থেকে গেল, মাঝখান থেকে আমার ধর্মটা হারিয়ে গেল। সেইজন্য আমাদের শাস্ত্র, বিশেষ করে গীতা বারবার বলে দিচ্ছে তোমার ধর্মের বাইরে কিছু করতে যেও না, ধর্ম মানে আমার যা কর্তব্য কর্ম সেইটাই করে যেতে হবে, কর্তব্য কর্মের বাইরে যেতে নেই। বলছেন –

**ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি। ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া।।৬১।।**

এই পাখা কেন ঘুরছে? কারণ ইলেক্ট্রিসিটি আছে বলে। খেলনা পুতুল কেন নাচছে? কারণ ভেতরে ইলেক্ট্রিক্যাল মোটর লাগান আছে। যত সজীব প্রাণী আছে তাদের সবার ভেতরে ঈশ্বর বসে আছেন, তিনি হচ্ছে চৈতন্য সত্তা, চৈতন্য সত্তা আর আত্মা এক, আত্মা আর ঈশ্বর এক, ঈশ্বর আর ব্রহ্ম এক। সেইজন্য কুকুর হোক, বেড়াল হোক, মশা হোক, মাছি হোক আর মানুষই হোক, সবার ভেতরে সাক্ষাৎ সেই ঈশ্বর বসে আছেন। এই বোতলের নিজের চলার ক্ষমতা নেই, জড় জড়ই থাকে, জড় কখন নিজের থেকে চলতে পারেনা। জড় চলে চৈতন্য সত্তাতে, চৈতন্য সত্তা ব্যতিরকে জড় কখনই চলতে পারবে না। শক্তি তখনই কার্য করে যখন তার পেছনে চৈতন্য সত্তা থাকে। এই যে সমস্ত প্রাণী চলে ফিরে বেড়াচ্ছে কারণ সবার হৃদয়ে সেই চৈতন্য সত্তা, ঈশ্বর বসে আছেন বলে। এইজন্য বলছেন – *ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া,* অন্তর্যামী ঠাকুর সর্বজীবের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হয়ে পুতুলের মত সমস্ত জীবকে মায়ার দ্বারা চালাচ্ছেন। সেইজন্য কি করতে হয় –

**তমেব শরণং গচ্ছ সর্বভাবেন ভারত। তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্।।৬২।।**

সেইজন্য অর্জুন তোমাকে বলছি শরীরের ধর্মকে ত্যাগ করে তাঁর শরণ নাও। কার শরণ নেবে? যিনি তোমার হৃদয়ে বসে তোমাকে চালাচ্ছেন। তাঁর শরণ নিলে কি হবে – *তৎপ্রসাদাৎ পরাং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্,* আমাদের শরীরের মধ্যে দুটো শক্তি আছে, একটা জড়ের আরেকটা চৈতন্যের। আমরা মনে করছি হাড়িতে আলু, পটল লাফাচ্ছে। আলু, পটল লাফাচ্ছে কেন? নীচে আগুন

আছে বলে। শরীর চলছে কেন? ভেতরে চৈতন্য সত্তা বা ঈশ্বর আছেন বলে। সেইজন্য শরীরের উপর মানে জড় শক্তির আশ্রয় না নিয়ে ঈশ্বরের মানে চৈতন্য শক্তির আশ্রয় নাও। পুরো গীতা এইটাই আদেশ করছে তুমি তোমার শরীরের ধর্ম, শরীরের আশ্রয় ছেড়ে ঈশ্বরকে ধর। এই গুহ্য কথা বলার পর বলছেন –

**ইতি তে জ্ঞানমাখ্যাতং গুহ্যাদ্ গুহ্যতরং ময়া। বিমৃশ্যৈতদশেষেণ যথেচ্ছসি তথা কুরু।**।৬৩।।

হে অর্জুন, এই মাত্র তোমাকে যে কথা গুলো বললাম, এগুলো গুহ্যতর থেকে গুহ্যতম, এগুলো সাধারণ লোক বুঝতেই পারবে না। এবার তুমি *বিমৃশ্য,* মানে তুমি এখন ভালো করে চিন্তা ভাবনা কর, চিন্তা ভাবনা করে এবার তুমি তোমার যা মনে হয় কর। আচার্য শিষ্যকে যা উপদেশ দেওয়ার দিয়ে দেন, উপদেশ দেওয়ার পর আচার্য বলে দেন – আমার যা বলার বলে দিলাম, এবার তুমি বিচার কর, বিচার তোমাকে নিজেকে করতে হবে। বিচার করে ঠিক কর তুমি কি করবে। সেইজন্য অনেকে যে বোকার মত বলে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে যুদ্ধ করার জন্য তাতিয়ে ছিলেন, আদপেই এটা ঠিক নয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দ্বিতীয় অধ্যায়ে বলেছিলেন, তুমি বিচার করে দেখ, তুমি যদি যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যাও তাহলে তোমাকে দেখে লোকেরা হাসাহাসি করবে, ব্যঙ্গ করবে। কলঙ্কিত জীবন যাপন করার থেকে মরে যাওয়াই শ্রেয়। তার চেয়ে বরং তুমি স্বধর্ম পালন করে দৃষ্টান্ত স্থাপন কর, লোকে তোমাকেই অনুসরণ করবে। তারপর অষ্টাদশ অধ্যায়ে এসে ভগবান বলছেন, তুমি বলছ যুদ্ধ করবে না, কিন্তু তোমার প্রকৃতিই তোমাকে দিয়ে যুদ্ধ করিয়ে নেবে। একদিকে যুদ্ধ করবে না বলে চলে গিয়ে লোকের হাসির পাত্র হবে, পরে ঐ যুদ্ধটাই করবে, ততক্ষণে যা ক্ষতি হবার হয়ে যাবে। তবু আমি তোমাকে যা বলার বলে দিলাম, এবার তুমি নিজে ঠিক কর তুমি কি করবে, তোমার যেমনটি মনে হবে তেমনটিই করবে। তারপরেও আমি তোমাকে বলছি –

**সর্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ। ইষ্টোঽসি মে দৃঢ়মিতি ততো বক্ষ্যামি তে হিতম্**।।৬৪।।

এবারে আমি তোমাকে সর্বাপেক্ষা গুহ্যতম, আমার শ্রেষ্ঠ বাক্য, যেটা এর আগেও অনেকবার বলেছি সেই কথাই আবার তোমার হিতের জন্য বলছি। কারণ *ইষ্টোঽসি মে দৃঢ়মিতি,* এর আগেও তোমাকে বলেছি যে তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয়। কারণ ভগবান অর্জুনের ইষ্ট, আমি যাকে ভালোবাসব সেইতো আমাকে ভালোবাসবে। আমি যাকে ভালোবাসিনা, সে একদিন দুদিন আমার পেছনে ঘুরঘুর করে আমাকে পেল না বলে চলে যাবে। যার আমি ইষ্ট, তার মানে তাকেও আমাকে ইষ্ট করতে হবে। বন্ধু বন্ধু তখনই যখন দুজন দুজনকে ভালোবাসে, তা না হলে বন্ধুত্ব হয় না। অর্জুন তুমি আমাকে ভালোবাস, তাই তুমিও আমার ইষ্ট, মানে তুমিও আমার অত্যন্ত প্রিয়, সেইজন্য তোমাকে এই শ্রেষ্ঠ গুহ্য কথা বলছি। কি সেই গুহ্য কথা?

**মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু। মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে।**।৬৫।।

ভগবান এর আগের শ্লোকে নিজেও বলছেন যে এর আগেও তোমাকে বলেছি। নবম অধ্যায়ে এই ভাবটাকে তিনি নিয়ে এসেছিলেন এখন ঐ ভাবটাকেই আবার এখানে মনে করিয়ে দিচ্ছেন। ঠাকুর বলছেন মানুষ কে? যার আছে মানে হুঁশ। মান মানে কি? অহং বোধ। অহং বোধটা কোত্থেকে আসছে? ভেতরে যিনি অন্তর্যামী রূপে আছেন, তাঁর কাছ থেকে। এই ব্যাপারে যে সজাগ হতে চাইছে তাকে কি করতে হবে? *মন্মনা ভব,* মন, মানে তোমার চিত্ত, এখানে তুমি আমাকেই বসাও, অর্থাৎ ভগবান শ্রীকৃষ্ণকেই তোমার চিত্তে স্থাপিত কর। *মদ্ভক্তঃ,* তুমি আমারই ভক্ত হও, আমাকে ছাড়া আর কাউকে ভজনা করতে হবে না। আর *মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু,* আমারই পূজা অর্চনা করবে। আমরা সবাই কাকে পূজা অর্চনা করছি? অফিসে নিজের বস্‌কে করি, বাড়িতে নিজের গিন্নী বা স্বামীকে করি। অর্জুন, তুমি অন্য কাউকে পূজা অর্চনা করতে যেও না, আমি ভগবান, আমারই ভজনা কর। তাহলে কি হবে? *মামেবৈষ্যসি সত্যং তে,* তাহলে তুমি আমাকেই পাবে। এরা আগে আগে ভগবান এই দুটো শব্দ অনেকবার নিয়ে এসেছিলেন, *মচ্চিত্তঃ* আর *মৎপরঃ*। আমাদের মন সব সময় কোন একটা জিনিষকে নিয়ে পড়ে থাকে আর আমরা অন্য একটা জিনিষকে শ্রেষ্ঠ মনে করি। প্রায়ই দেখা যায় *মচ্চিত্তঃ* আর *মৎপরঃ* দুটো আলাদা হয়। আচার্য শঙ্কর নিজেই বলছেন, একজন যুবকের মন সব সময় একজন যুবতীতে পড়ে থাকে কিন্তু সেই যুবকও জানে যে ভগবান শিব বা বিষ্ণু এই মেয়েটিরও মালিক। বাড়িতে গিন্নী মালকাইন হতে পারে কিন্তু গিন্নীরও মালিক হচ্ছেন ভগবান। ঠিক তেমনি সাধারণ লোকেদের কাছে অফিসে সব থেকে ক্ষমতাবান হচ্ছে তার অফিসের বস্, বাড়িতে তার গিন্নী আর পাড়াতে মস্তানরা, আর মাথায় সব সময় ঘুরছে কামিনী-কাঞ্চন, এর পর সে কোন্ দিক দিয়ে এগোবে আর কিভাবেই ধর্ম সাধন করব!

কিন্তু গীতা বলছে, প্রথম কথা তোমাকে জানতে হবে যে ঈশ্বরই হচ্ছেন মালিক আর তাঁরই শরণাগতি নিতে হবে। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, চিন্তার মধ্যে সব সময় তাঁকেই রাখতে হবে। সেখান থেকে তখন আস্তে আস্তে শরীর মন সব পরিবর্তন হয়ে যায়। *সত্যং তে প্রতিজানে,* আমি তোমাকে দিব্যি খেয়ে বলছি, তুমি যদি তোমার মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার সব কিছু আমাকে দিয়ে দাও তাহলে এইটাই হবে যেটা আমি তোমাকে বললাম। আমি যদি তোমার সমস্ত মন, হৃদয় জুড়ে জড়িয়ে থাকি তাহলে এটা জেনে যাও যে, তুমি

পুরোপুরি আমার কাছেই আসবে। তখন কি হবে? তোমার কোন শোক মোহ থাকবে না, তোমার সব অশান্তি দূর হয়ে যাবে, এটা আমি দিব্যি খেয়ে বলছি। ঠাকুরও বলছেন – মাইরি বলছি, ঈশ্বর ছাড়া আমি আর কিছু জানিনা। দিব্যি খেয়ে এটাই বলছি যে, এ ছাড়া আর কিছু নেই।

এর পরের শ্লোকে ভগবান পুরো গীতাটাকে ঠিক ঠিক গুটিয়ে নিয়ে উপসংহার টানছেন আর আচার্য শঙ্কর বলছেন, গীতার এটাই হচ্ছে শেষ কথা। পুরো গীতাটাকে কেন অর্জুনকে বললেন? এই ৬৬ নং শ্লোকের জন্য। যিনি জ্ঞানী তাঁকে আর কি উপদেশ দেবেন, যে জেগে আছে তাকে তো আর জাগানোর কোন ব্যাপার থাকে না, যে ঘুমিয়ে আছে তাকেই জাগান হবে। তাই যিনি তত্ত্বজ্ঞানী, তাঁর জন্য গীতার কোন উপদেশ নয়, কারণ জ্ঞানীতো জানেন ঈশ্বরের কি স্বরূপ। কিন্তু তত্ত্বজ্ঞানীর অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে আমাদের মনে একটা আগ্রহ ও উৎসাহ সৃষ্টি করার জন্য। গীতাতে তাই দুটো বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, জ্ঞানীদের জন্য জ্ঞানযোগ আর কর্মিদের জন্য কর্মযোগ। কিন্তু যিনি তত্ত্বজ্ঞানী তিনি তো জেনে গেছেন তাঁকে কি করতে হবে, তাঁর জন্য গীতা নয়। গীতা হচ্ছে তাদেরই জন্য যারা তত্ত্বজ্ঞানীদের মত পারবে না। এরা পারবে না বলে পুরো গীতাতে তাদের মধ্যে আগ্রহ জাগাবার জন্য কোথাও তত্ত্বজ্ঞানীর বর্ণনা করছেন, কোথাও বিভিন্ন সাধনার কথা, আরও এটা সেটা বর্ণনা করে করে, জ্ঞানীদের বাদ দিয়ে আর সব মানুষের জন্য শেষ কথা এখানে বলছেন।

**সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়ষ্যামি মা শুচঃ।।৬৬।।**

তুমি তোমার সব ধর্ম ছাড়, অন্য কোন দিকে তোমার মনকে যেতে দিও না, আমাকে এত জপ করতে হবে, এতকক্ষণ ধ্যান করতে হবে, এত তীর্থ করতে হবে, আরও এই সেই করতে হবে, এই দেবতাকে, অমুক বাবাজীকে মানতে হবে, এই ধরণের যত রকমের ধর্ম কর্ম আছে সব ছেড়ে দিয়ে *মামেকং শরণং ব্রজ*, একমাত্র আমার শরণে চলে এস। *অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো*, তোমার জীবনের যত পাপ আছে, এই যে ভাবছ তুমি এতো লোককে মারবে বলে তোমার পাপ হবে, সব রকমের পাপ থেকে *মোক্ষয়ষ্যামি মা শুচঃ*, সব পাপ থেকে আমি তোমাকে টেনে বার করে নিয়ে আসব। পাপ থেকে টেনে বার করব বলছেন, এর অর্থ এই নয় যে তিনি কোন পক্ষপাত করছেন। কারণ ভগবানের উপর সব কিছু অর্পণ করে দিচ্ছে, এর আগে ভগবান যে অঙ্গিকার করে বলেছিলেন – *যস্য নাহঙ্কৃতো ভাবো বুদ্ধির্যস্য ন লিপ্যতে। হত্বাপি স ইমাঁল্লোকান্ন হন্তি ন নিবধ্যতে* – যখন পুরোপুরি ভগবানের প্রতি শরণাগতি হয়ে যায়, তখন তাঁর বুদ্ধি আর লিপ্ত হয় না, বুদ্ধি যদি লিপ্ত না হয় তখন তার ফলও তাঁর কাছে আসবে না, এবার তিনি সারা জগৎকেও যদি হত্যা করে দেন তখনও কোন কিছুই তাঁকে আর স্পর্শ করতে পারবে না। ভগবান উদ্ধার করেন না, মানুষ নিজেকেই নিজে উদ্ধার করে, কারণ তাঁর মন ভগবানে এতোটাই লিপ্ত হয়ে গেছে যে কোন কর্মের ছাপ তার মধ্যে আর পড়তে পারেনা, সেইজন্য কোন পাপই তাঁকে আর স্পর্শ করতে পারেনা। তাই ভগবান বলছেন, তুমি পুরোপুরি ভগবানের শরণাগত হয়ে যাও। এই কথা বলার পর গীতা এইখানেই শেষ হয়ে যাচ্ছে। গীতার মূল বক্তব্য হচ্ছে, যিনি জ্ঞানী তিনি শুধু আত্মচিন্তন বা ঈশ্বর চিন্তন নিয়েই থাকবেন, তাঁর কোন কর্তব্য কর্ম নেই। যাঁদের আমি বোধটুকু চলে গেছে তাঁদের জন্যই জ্ঞানযোগ। কিন্তু যাদের আমি বোধ আছে, অহঙ্কার বোধ আছে, দেহ বোধ আছে তাদের জন্য কর্ম। কর্ম কিভাবে করবে? ভগবানে কর্মের সব ফল অর্পণ করে কর্ম করতে হবে। তুমি বর্ণাশ্রম ধর্মকে মানো আর নাই মানো, তুমি হিন্দু ধর্মের সব কিছু মানো আর নাই মানো তাতে কিছু যায় আসে না, শুধু যা কিছু কর্ম করবে ঈশ্বরার্থে কর্ম করে সব কর্মের ফল ঈশ্বরকেই সমর্পন করবে। সেইজন্যই বলছে *সর্বধর্মান পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ*, এইটাই হচ্ছে গীতার মূল যুক্তি, এইটাই হচ্ছে গীতার মূল স্তম্ভ। পুরো গীতা কেন বলা হয়েছে? এই শ্লোকটাকে বলার জন্য। এরপর তোমার পূণ্য কর্মের জন্যও স্বর্গে যেতে হবে না, পাপ কর্মের জন্যও নরকে যেতে হবে না। তাহলে তুমি কোথায় যাবে? আমার সাথে তুমি এক হয়ে যাবে। আমার তো কোথাও আসা যাওয়া নেই, আমি সর্বব্যাপী, আমি অব্যয়, অখণ্ড সচ্চিদানন্দ। অখণ্ড সচ্চিদানন্দ কোথায় আসবে যাবে। আমি এখানে থেকে যেমন হেঁটে সল্টলেক যাই, তুমি কি সেই রকম হেঁটে রামকৃষ্ণলোক যাবে? না, তোমার কোন আসা যাওয়া হবে না, তুমি যা ছিলে তাই হয়ে গেলে। তুমি নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত স্বরূপ ছিলে এখন তাই হয়ে গেলে। ঈশ্বরের সাথে, অখণ্ড সচ্চিদানন্দের সাথে এক হয়ে গেলে। এরপর বলছেন –

**ইদং তু নাহতপস্কায় নাহভক্তায় কদাচন। ন চাহশুশ্রূষবে বাচ্যং ন চ মাং যোহভ্যসূয়তি।।৬৭।।**

দেখো অর্জুন, তোমাকে অনেক গুহ্য কথা বললাম, এগুলো তুমি কিন্তু যাকে তাকে বলে বেড়িও না। যেমন বাইবেল, কোরান যত লোককে বলতে পার তত ভালো, কিন্তু এখানে ঠিক তার উল্টো বলা হচ্ছে। *ন অপতপস্কায়*, যার কোন তপস্যা নেই তাকে এই গীতার কথা বলতে যেও না। *ন অভক্তায়*, যে আমার ভক্ত নয় তাকে গীতার কথা বলবে না। আর যে ভক্ত, তপস্বী কিন্তু *ন চাহশুশ্রূষবে বাচ্যং* আমার কথা শুনতে চায় না তাকেও কক্ষণ গীতার কথা শোনাবে না। *ন চ মাং যোহভ্যসূয়তি*, যারা আমার প্রতি দ্বেষ করে তাদের তো কোন মতেই আমার কথা শুনিও না। সেইজন্য যারা গীতার কথা শুনতে আগ্রহী নয় তাদের জোর করে বা লোভ দেখিয়ে গীতার কথা শুনতে নিয়ে যাওয়া কখনই উচিৎ নয়, এতে প্রচণ্ড পাপ হয়। গীতার কথা যার তার জন্য নয়। গীতার কথা তাহলে কাদের বলবে? তপস্যা থাকা চাই, শ্রীকৃষ্ণে ভক্তি থাকা চাই আর শোনার আগ্রহ থাকা চাই, ভগবানের প্রতি কোন বিদ্বেষ

ভাব যার নেই। আচার্য শঙ্কর খুব সুন্দর বলছেন – যদি মানুষের সব গুণ থাকে, মেধা আছে, বিরাট পণ্ডিত, কিন্তু ভগবানে তার বিশ্বাস নেই, মানে শ্রীকৃষ্ণে তার বিশ্বাস নেই, কোন ভাবেই তাকে গীতার কথা বলতে যেও না। আর এর মধ্যে এই কটি জিনিষের একটা যদি অনুপস্থিত থাকে তাকে কিন্তু গীতার কথা শুনিও না। গীতার কথা নাস্তিকদের জন্য একেবারেই নয়। এই আদর্শগুলো হিন্দুরা খুব কঠোর ভাবে অনুসরণ করত বলে গীতার কথা খুব বেশি প্রচার হত না। যাদের তপস্যা নেই, ভক্তি নেই, আগ্রহ নেই, অবিশ্বাসী, ঈশ্বরের প্রতি যাদের দ্বেষ আছে এদেরকে শাস্ত্রের কথা বললে শাস্ত্রের কষ্ট হয়। এরপর বলছেন –

**য ইদং পরমং গুহ্যং মদ্ভক্তেষ্বভিধাস্যতি। ভক্তিং ময়ি পরাং কৃত্বা মামেবৈষ্যত্যসংশয়ঃ।।৬৮।।**

যে আমার এই কথাগুলোর সেবা করবে, মানে যে আমার ভক্তকে এই কথাগুলো শোনাবে বা ব্যাখ্যা করবে সেও কিন্তু আমাকেই পাবে। অর্থাৎ আমি তোমাকে গীতার এই উপদেশ দিলাম এখন তুমি পালন করছ বলেই যে শুধু তুমিই আমাকে পাবে তা নয়, এমনকি যে শ্রদ্ধার সঙ্গে গীতার কথা শ্রবণ করে বা শ্রদ্ধার সঙ্গে গীতার ব্যাখ্যা করে কাউকে বোঝায় তাতেও তার ভক্তি লাভ হবে। এইটাই হচ্ছে ঠিক ঠিক ঠাকুরের কাজ, এইটাই জ্ঞানযজ্ঞ।

**ন চ তস্মান্মনুষ্যেষু কশ্চিন্মে প্রিয়কৃত্তমঃ। ভবিতা ন চ মে তস্মাদন্যঃ প্রিয়তরো ভুবি।।৬৯।।**

এই যে গীতা শাস্ত্রের পরম্পরাকে যাঁরা এগিয়ে নিয়ে চলেছেন, এঁদের প্রতি আমার সব থেকে বেশি ভালোবাসা, এঁরাই আমার প্রিয়পাত্র। কারণ এইটাই হচ্ছে ঠিক ঠিক ঠাকুরের কাজ। ঈশ্বরের কাজ কোনটা? তাঁর কথাকে পরম্পরা ভাবে চালিয়ে যাওয়া। কিন্তু এটাও মাথায় রাখতে হবে, পরম্পরাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে গিয়ে অপাত্রে ঈশ্বরের কথা বলতে যেও না। আর বলছেন –

**অধ্যেষ্যতে চ য ইমং ধর্ম্যং সংবাদমাবয়োঃ। জ্ঞানযজ্ঞেন তেনাহমিষ্টঃ স্যামিতি মে মতিঃ।।৭০।।**

আমাদের যে সংবাদ, অর্থাৎ এই শ্রীকৃষ্ণ-অর্জুন সংবাদকে যে জ্ঞানযজ্ঞ রূপে গ্রহণ করবে সে হবে শ্রেষ্ঠতম। এখানে আচার্য শঙ্কর চারটে যজ্ঞের কথা বলছেন – বিধি, জপ, উপাংশু ও মানস। বিধি যজ্ঞ – যাঁরা বিধি মেনে নানান রকমের যজ্ঞ, আচার উপাচার করেন, জপযজ্ঞ – যাঁরা প্রচুর জপ করছেন, উপাংশু যজ্ঞ – মন্ত্রোচ্চারণ ও বিভিন্ন মন্ত্রাদি নিয়ে পূজা করাকে উপাংশু যজ্ঞ বলা হয়। আর মানস যজ্ঞ, মনে মনে সব কিছু, মানে ধ্যানাদি করা। এই চারটে যজ্ঞের মধ্যে মানস যজ্ঞ হচ্ছে শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ। গীতা অধ্যয়ণ করা, গীতা ব্যাখ্যা করা, গীতার স্তুতি করা এগুলো হচ্ছে সব মানস যজ্ঞ। যিনি শ্রোতা তিনি কি পাবেন?

**শ্রদ্ধাবাননসূয়শ্চ শৃণুয়াদপি যো নরঃ। সোঽপিমুক্তঃশুভাল্লোঁকান্ প্রাপ্নুয়াৎ পুণ্যকর্মণাম্।।৭১।।**

শ্রদ্ধার সাথে যিনি গীতা শ্রবণ করে যাচ্ছেন তিনিও একই ফল পান। আসল কথা হচ্ছে সময় না হয়ে থাকলে কেউ গীতা শ্রদ্ধার সাথে নিষ্ঠা নিয়ে ধৈর্য ধরে শুনতে যাবে না। এখানে যাঁরা এত দিন ধরে গীতার আঠারোটি অধ্যায় শ্রদ্ধার সাথে নিষ্ঠাপূর্বক শুনে যাচ্ছেন, কত দূর দূর থেকে সবাই আসছেন, শীত গ্রীষ্ম বর্ষা উপেক্ষা করে দুপুরের বিশ্রামকে বিসর্জন দিয়ে এখানে সবাই আসছেন, নিষ্ঠা আর শ্রদ্ধা না থাকলে এতো কষ্ট করে কেউ গীতা শুনতে আসতেন না, এনারাই ধন্য। অনেক শুভ কর্ম না থাকলে এই রকম নিষ্ঠা, শ্রদ্ধা, ভক্তি, ধৈর্য হয় না। এবার অর্জুনকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জিজ্ঞেস করছেন –

**কচ্চিদেতচ্ছ্রুতং পার্থ ত্বয়ৈকাগ্রেণ চেতসা। কচ্চিদজ্ঞানসম্মোহঃ প্রনষ্টস্তে ধনঞ্জয়।।৭২।।**

হে অর্জুন, তোমাকে এতক্ষণ যে গুহ্য তত্ত্বের উপদেশ গুলো বললাম এগুলো মন দিয়ে শ্রবণ করেছো তো? এগুলো শোনার পর তোমার মনের মধ্যে যত অঙ্কট বঙ্কট ছিল সেগুলো পরিষ্কার হয়েছ তো, তোমার মোহ কি দূর হয়েছে? তখন অর্জুন বলছেন –

অর্জুন উবাচ

**নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা ত্বৎপ্রসাদান্ময়াচ্যুত। স্থিতোঽস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব।।৭৩।।**

হে ভগবান অচ্যুত, আপনার কথা শোনার পর আমার যে মোহ ছিল সেটা নষ্ট হয়েছে। অর্জুনের মোহ হয়েছিল যে ভীষ্ম দ্রোণ এঁদের আমি কিভাব বধ করব। একটা জিনিষ, যেটা আমার কাছে নেই, সেটাকে পাওয়ার ইচ্ছাতে মনটা যখন আচ্ছন্ন হয়ে যায় তখন সেটাকে বলা হয় লোভ, আর যেটা আমার কাছে আছে সেটাকে হারানোর ভয় মনটাকে যখন ঢেকে ফেলে তখন তাকে বলা হয় মোহ। শোক হচ্ছে, যে জিনিষটা আমার কাছে ছিল কিন্তু চলে গেছে বা হারিয়ে গেছে, তখন সেটার জন্য বিমর্ষ হয়ে পড়া। শোক, মোহ আর লোভ এই তিনটে মনকে সব সময় অবসাদে ভরিয়ে রাখে, আমার একটা বাড়ি ছিল সরকার সেই বাড়িটাকে দখল নিয়ে ভেঙ্গে দিয়েছে, কিংবা দুষ্কৃতকারীরার এসে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে, বাড়িটা চলে যাওয়াতে যে দুঃখ হল এটাকে বলা হচ্ছে শোক। আমার বাড়ি আছে, পার্টির লোকেরা এসে বলল এই বাড়িটাকে আমাদের পার্টির কাজে কিছু দিনের মধ্যেই ছেড়ে দিতে হবে, তখন বাড়িটা হারাবার ভয় এসে আমার মনকে গ্রাস করে নিল, মোহ হয়ে গেছে। আমার একটা গাড়ি আছে, অন্য কারুর এর থেকে একটা

দামী গাড়ি দেখে মনে হল, এই মডেলের গাড়ীটা হলে ভালো হত, তখন লোভ এসে মনটাকে অস্থির করে তুলল। শোক, মোহ আর লোভ এই নিয়েই সমস্ত জগৎ চলছে। অর্জুনের এই মোহটা কেটে গেছে। আর বলছেন *স্মৃতির্লব্ধা,* স্মৃতি হচ্ছে শাস্ত্র বাক্যকে জীবনের ধ্রুবতারা করে নিয়ে জীবনকে চালিয়ে নিয়ে যাওয়া। আজ থেকে এগারো বছর আগে এই দিনে আমি কি খেয়েছিলাম আমার মনে নেই, যদি মনে থাকে তাহলে এটা কম্প্যুটার মেমোরি, আমার জীবনে চলার পথে এই স্মৃতি কোন কাজেই লাগবে না। স্মৃতি মানে আজ থেকে এগারো বছর আগে কি খেয়েছিলাম সেটাকে মনে রাখাকে বলা হচ্ছে না। স্মৃতি হচ্ছে, আমার জীবনের জন্য শাস্ত্রে যে বাক্যগুলো বলা হয়েছে, সেই বাক্যগুলোকে মাথায় রেখে জীবনকে সেইভাবে পরিচালিত করা। *স্মৃতির্লব্ধা,* মানে আমি বুঝে গেছি আমাকে কি করতে হবে, কারণ আমি আমার কর্তব্য কর্মের ব্যাপারে সচেতন হয়ে গেছি। *ত্বৎপ্রসাদান্ময়াচ্যুত,* হে অচ্যুত, তোমার কৃপাতেই আমার সমস্ত মোহ নষ্ট হয়েছে আর আমি আমার স্মৃতিকে ফিরে পেয়েছি।

প্রথম অধ্যায়ে অর্জুন বলেছিলেন – *গাণ্ডীবং স্রংসতে হস্তাৎ* - আমার হাত কাঁপছে, হাত থেকে আমার গাণ্ডীব পড়ে যাচ্ছে, এখন বলছেন *স্থিতোঽস্মি,* আমি এখন স্থিত হয়ে গেছি। আর *গতসন্দেহঃ,* আমার সব সন্দেহ, সংশয় চলে গেছে। মুণ্ডকোপনিষদে এইটাই বলছেন – *ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ। ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে।*।(২/২/৮) – সেই পরমাত্মার দর্শনের পর হৃদয়ের সমস্ত গ্রন্থি বিনষ্ট হয়, সকল সংশয় ছিন্ন হয় এবং কর্মসমূহ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। এবার অর্জুন বলছেন – *করিষ্যে বচনং তব,* হে ভগবান, আপনি যা বলবেন আমি তাই করব। আমার আর কোন কর্তব্য নেই, এখন আমি লোভ মোহে পড়ে কোন কাজ করছি না, আপনি আদেশ করেছেন এটাই আমার কাছে ধর্ম। এই কথাই অর্জুন বলছেন আমার সমস্ত হৃদয় গ্রন্থি ছিন্ন হয়ে গেছে, আমার সব সন্দেহ দূর হয়েছে।

এইখানেই গীতা শেষ হয়ে যাচ্ছে। এর পরে মহাভারতের যে মূল কাহিনী ছিল তার সাথে আবার জুড়ে দেওয়া হচ্ছে। মূল কাহিনীতে ছিল ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়ের কাছ থেকে জানতে চাইছে – তুমি প্রথম থেকে একটু বল কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে কি হয়েছিল। *দৃষ্ট্বা তু পাণ্ডবানীকং ব্যূঢ়ং দুর্যোধনস্তদা,* এই বলে সঞ্জয় প্রথমে শুরু করেছিল। শুরু করে অর্জুন কি করল, অর্জুনের অবস্থা দেখে তাঁকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কি কি বললেন সব বলা হয়ে যাওয়ার পর ভগবানের কথা শুনে অর্জুনের মানসিক কি পরিবর্তন হল তার বর্ণনা করে এবারে সঞ্জয় আবার ধৃতরাষ্ট্রকে বলছেন –

সঞ্জয় উবাচ

**ইত্যহং বাসুদেবস্য পার্থস্য চ মহাত্মনঃ। সংবাদমিমমশ্রৌষমদ্ভুতং রোমহর্ষণম্।।৭৪**

হে রাজা ধৃতরাষ্ট্র, শ্রীকৃষ্ণ আর অর্জুনের এই অদ্ভুত সংবাদ শুনে আমার রোমাঞ্চ হচ্ছে, আমার লোমকূপ সব দাঁড়িয়ে গেছে। এখানে আমাদের আবার মনে রাখতে হবে যে, অনেকে ভুল করে ভাবে যে সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রের কাছে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের আঁখো দেখা হালের ধারাভাষ্য দিচ্ছিলেন। কিন্তু সঞ্জয় সরাসরি ধারাভাষ্য দেননি। এখানে সঞ্জয় বলছেন *অশ্রৌষম্,* আমি শুনলাম। সঞ্জয় নিজেই একজন কুরুক্ষেত্রের যোদ্ধা ছিলেন, তিনি একাধারে ধৃতরাষ্ট্রের মন্ত্রী ও সারথি। যুদ্ধের আগে ব্যাসদেব হস্তিনাপুরে এসে ধৃতরাষ্ট্রকে বললেন – আমি তোমাকে দিব্যদৃষ্টি দিচ্ছি যাতে তুমি যুদ্ধের সব কিছু নিজের চোখে দেখতে পার। ধৃতরাষ্ট্র তখন ব্যাসদেবকে বললেন – না, না, আমি নরসংহার দেখতে পারবো না, দিব্যদৃষ্টি আমার লাগবে না। তখন সঞ্জয়কে নিযুক্ত করা হল সময় সময় এসে ধৃতরাষ্ট্রকে যুদ্ধের সব কিছু বর্ণনা করার জন্য, তার জন্য সঞ্জয়কে বর দেওয়া হয়েছিল যে সঞ্জয় যখনই যেটা জানতে চাইবে তখনই সেটা সে মনে করতে পারবে। আসলে সঞ্জয় ছিলেন যুদ্ধ ক্ষেত্রে। মহাভারতে যুদ্ধ ক্ষেত্রে সঞ্জয় কি করেছিল তার বর্ণনা আছে।

ব্যাসদেবের বর ছিল সঞ্জয়কে যুদ্ধে কেউ বধ করতে পারবে না। পাণ্ডবরা একবার সঞ্জয়কে বধ করার জন্য ঘিরে ফেলেছিল। কিন্তু ব্যাসদেব তাড়াতাড়ি এসে পাণ্ডবদের আটকে দিয়ে বলছেন, সঞ্জয় অবধ্য। কুরুক্ষেত্রের কাছাকাছি কোন জায়গাতে ব্যাসদেবের কুঠিয়া ছিল। পুরো যুদ্ধটাকে তিনি নিজের চোখে দেখেছেন। ভাবলে অবাক লাগে ব্যাসদেবের মত অত বড় ঋষির জীবনটা সত্যিই কত দুঃখ কষ্ট ও বেদনায় ভরা ছিল। তাঁর জননী ছিলেন এক জেলের কন্যা, মৎস্যগন্ধা, পরে নাম হল সত্যবতী। বাবা ছিলেন এক ঋষি, কুমারী মেয়ের সাথে সম্পর্ক থেকে ব্যাসদেবের জন্য, একদিকে মাও ব্যাসদেবকে ছেড়ে দিয়েছিলেন, বাবাও দেখতেন না। এত বড় ঋষি, তাঁকে আবার মায়ের আদেশে ধৃতরাষ্ট্র আর পাণ্ডুর বাবা হতে হল, কারণ বিচিত্রবীর্যের সন্তানোৎপাদনের ক্ষমতা ছিল না। ধৃতরাষ্ট্র আর পাণ্ডুর সন্তানরা হল পাণ্ডব আর কৌরব, এরাই এখন যুদ্ধ করে পরস্পরকে বধ করবে। আসলে এরা সবাই তো ব্যাসদেবেরই পৌত্র। কিন্তু আমাদের শাস্ত্র মতে ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু কিন্তু ব্যাসদেবের সন্তান নয়, যদিও শারীরিক সম্বন্ধ থাকতে পারে, কিন্তু শাস্ত্রানুসারে এদের দুজনকেই বিচিত্রবীর্যেরই সন্তান হিসাবে গণ্য করা হবে। মনুস্মৃতিতে এটাকে পরিষ্কার করে বলা হয়েছে, নিযুক্ত স্বামী কখনই সন্তানের পিতা হিসাবে দাবী করতে পারবে না। যাই হোক নিজের পৌত্রদের এই সংহার ব্যাসদেব আবার তাঁর কুঠিয়া থেকে নিজের চোখে দেখছেন। সেটাকে আবার তিনি মহাভারতে বর্ণনা করছেন।

দশ দিন যখন যুদ্ধ অতিক্রান্ত হয়ে গেছে, দশ দিনের দিন সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে গিয়ে বলছেন – হে রাজন্, পিতামহ ভীষ্মের পতন হয়ে গেছে। এই খবর শোনা মাত্র ধৃতরাষ্ট্রের মাথায় যেন বজ্রাপাত হল, তিনি ভাবতেই পারছেন না, যে পিতামহ ভীষ্ম অষ্টবসুর একজন, তাঁর হাতে যখন অস্ত্র থাকবে তখন ত্রিভুবনের কারুর ক্ষমতা হবে না যে তাঁকে পরাস্ত করে, সেই ভীষ্মদেবের পতন কি করে হল। টুকটাক খবর ধৃতরাষ্ট্র এদিক ওদিক থেকে পাচ্ছিলেন ঠিকই কিন্তু বিস্তারিত যা খবর সঞ্জয়ের কাছেই পেতেন, কারণ সঞ্জয়ের দিব্যদৃষ্টি থাকাতে যেখানে মনট দিয়ে দিতেন সেই সময়ের পুরো দৃশ্যটা তাঁর চোখের সামনে ভেসে উঠত। সেইজন্য ভীষ্মের এই খবর শুনতেই ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়কে বলছেন তুমি যুদ্ধের প্রথম দিন থেকে যা যা হয়েছে সব বিস্তারিত ভাবে আমাকে বল। তখন ধৃতরাষ্ট্রের উক্তি দিয়েই গীতার প্রথম অধ্যায়ের প্রথম শ্লোক শুরু হচ্ছে – *ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা যুযুৎসবঃ। মামকাঃ পাণ্ডবাশ্চৈব কিমকুর্বত সঞ্জয়।।* তারপর সঞ্জয় বলতে শুরু করেছেন। এইভাবে গীতা শুরু হল। গীতা শেষ হচ্ছে অর্জুনের উপলব্ধির বর্ণনা দিয়ে। এরপর সঞ্জয়ের কাছে আবার ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে, সেখানে সঞ্জয় বলছেন যে এই অদ্ভুত কৃষ্ণার্জুন সংবাদ শুনে আমার সারা শরীর পুলকিত আর রোমাঞ্চ হচ্ছে। তারপর বলছেন –

**ব্যাসপ্রসাদাচ্ছ শ্রুতবানেতদ্ গুহ্যমহং পরম্। যোগং যোগেশ্বরাৎ কৃষ্ণাৎ সাক্ষাৎ কথয়তঃ স্বয়ম্।।৭৫।।**

যিনি যোগেশ্বর, যোগী শ্রেষ্ঠ, আর তিনি নিজে স্বয়ং যোগের *পরমং গুহ্যং*, অতীব গুহ্য কথা সব কিছু বর্ণনা করছেন, আমি সেটা তাঁর মুখ থেকে সাক্ষাৎ শুনলাম। অর্থাৎ ঈশ্বরের মুখ থেকে সাক্ষাৎ শোনা হয়েছে, এই গুহ্য যোগের বর্ণনা এর থেকে ভালো আর কার কাছে শুনতে পাওয়া যাবে। একমাত্র ব্যাসদেবের কৃপাতেই এটা সম্ভব হয়েছে, তিনি দিব্যদৃষ্টি দিয়েছিলেন বলেই আমি সব দেখতে শুনতে পেয়েছিলাম। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বলা হয় – যদি কোন বিষয়ে কিছু জানতে হয় তাহলে সব সময় ঐ বিষয়ের যিনি অথোরিটি তাঁর থেকেই জানতে হয়। ঠাকুরের ভাব ও আদর্শের উপর ইদানিং অনেক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে, ঠাকুরের উপর বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় প্রচুর লেখালেখিও হচ্ছে। এগুলো মোটামুটি সব ভক্তরাই পড়েন। কিন্তু ঠাকুরের জীবনী, ভাব ও আদর্শের অথোরিটি গ্রন্থ হচ্ছে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত, লীলাপ্রসঙ্গ এবং স্বামীজীর দশ খণ্ডের রচনাবলী। এখন হাতে গুণে পাওয়া যাবে না যে কজন ভক্ত এই তিনটে গ্রন্থ, কথামৃত, লীলাপ্রসঙ্গ আর স্বামীজীর রচনাবলী পুরোটা অধ্যয়ণ করেছেন। এই কটি গ্রন্থ না পড়লে ঠাকুরের ভাব ও ধর্ম আমরা বুঝতেই পারবো না, যতই লেকচার শুনি আর যতই পত্রপত্রিকায় বিভিন্ন প্রবন্ধ বা রচনা পড়ি। যদি ধর্ম বুঝতে হয়, রামকৃষ্ণ ভাবধারা যদি বুঝতে হয় তাহলে এই তিনটে বই অবশ্যই পড়তে হবে। এটাই এখানে সঞ্জয় বলছেন, আমি সাক্ষাৎ ভগবানের মুখ থেকে শুনেছি। সঞ্জয়ের যে কি অবস্থা তিনি নিজেও ভেবে আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে গেছেন, বলছেন –

**রাজন্ সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য সংবাদমিমমদ্ভুতম্। কেশবার্জুনয়োঃ পুণ্যং হৃষ্যামি চ মুহুর্মুহুঃ।।৭৬।।**

শ্রীকৃষ্ণ আর অর্জুনের এই কথোপকথন অতীব পূণ্যদায়ক, যত আমি স্মরণ করছি ততই মুহুর্মুহু রোমাঞ্চিত, পুলকিত ও আনন্দিত হচ্ছি।

**তচ্চ সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য রূপমত্যদ্ভুতং হরেঃ। বিস্ময়ো মে মহান্ রাজন্ হৃষ্যামি চ পুনঃ পুনঃ।।৭৭।।**

শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে যে তাঁর বিশ্বরূপ দর্শন করিয়েছিলেন, অর্জুন ছাড়া সঞ্জয়রেও দিব্যদৃষ্টি থাকার জন্য ভগবানের বিশ্বরূপ প্রত্যক্ষ দর্শন করার দুর্লভ সৌভাগ্য হয়েছিল। সেই দৃশ্যই আবার সঞ্জয়ের স্মরণে আসাতে ধৃতরাষ্ট্রকে বলছেন শ্রীকৃষ্ণের সেই অত্যদ্ভুত বিশ্বরূপ যত বার আমার স্মরণে আসছে তত বার আমার মহা বিস্ময় উৎপন্ন হচ্ছে আর তত বার আমি আনন্দ অনুভব করছি। এই সব বলে সব শেষে সঞ্জয় বলছেন –

**যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণো যত্র পার্থো ধনুর্ধরঃ। তত্র শ্রীর্বিজয়ো ভূতির্ধ্রুবা নীতির্মতির্মম।।৭৮।।**

এখন আট দিনের যুদ্ধ বাকি থাকতে সঞ্জয় যুদ্ধ কোন পরিণতির দিকে এগোচ্ছে বলে দিচ্ছেন। সাক্ষাৎ ভগবান যেখানে আছেন, তিনি হচ্ছেন যোগের ঈশ্বর, গাণ্ডীব নিয়ে অর্জুন যেখানে দাঁড়িয়ে আছে, শ্রী আর বিজয় এই দুটো জিনিষ সেখানেই থাকবে। শ্রী মানে ঐশ্বর্য, শ্রীর পরিভাষা হচ্ছে লক্ষ্মী। যে গৃহে শ্রী থাকে সেই গৃহই দেবীর আবাস। সেইজন্য নিয়মিত ঘরে ধুপ দীপ দেওয়া, পূজো অর্চনা করা, ঘরদোর পরিষ্কার করা, সাজগোজ করা প্রত্যেক গৃহীদেরই কর্তব্য, এগুলোতে ঘরে শ্রী আসে। এখানে সঞ্জয় বলছেন – যেখানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং, যেখানে ভগবানের সখা অর্জুন রয়েছে শ্রী আর বিজয় সেইখানেই থাকবে। *ভূতিঃ*, শ্রীকেই আরও বিস্তার করে বলা হচ্ছে, অভ্যুদয়। *ধ্রুবা নীতির্মতির্মম*, এইটাই ধ্রুব সত্য বলে আমার অভিমত আপনাকে জানিয়ে দিলাম।

প্রথম অধ্যায়ে সঞ্জয় এমন ভাবে বর্ণনা করেছিলেন আর এখানেও এমন ভাবে বলছেন যে, বোঝা যাচ্ছে সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে সাবধান করে দিচ্ছেন। আপনি রাজা, দশ দিনের যুদ্ধ হয়ে গেছে, আপনি ইচ্ছে করলে এখনও এই যুদ্ধকে বন্ধ করে দিতে পারেন,

তাতে আপনার সবাই বেঁচে যাবেন, আর এই নরসংহার থেকে সবাই রক্ষা পেয়ে যাবে। কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র সেই দিকে গেলেনই না। সঞ্জয় কিন্তু নানা ভাবে বার বার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল কিভাবে এই কৌরব বংশকে রক্ষা করা যায়, এখনও ধৃতরাষ্ট্রকে ভয় দেখিয়ে যাচ্ছেন। অন্য দিকে পিতামহ ভীষ্মের পতন হয়ে গেছে, এখনও সময় আছে। আপনার জয়ের কোন আশা নেই, আপনি জয়ের আশা পরিত্যাগ করে এখনও যদি যুধিষ্ঠিরদের প্রাপ্যটা ফিরিয়ে দেন তাহলে আপনার কুলের নাশকে আটকান যাবে। কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়ের কথা শুনল না। গীতার আঠারোটি অধ্যায় এইখানে এসে শেষ হচ্ছে।

গীতার দর্শনের মূল বক্তব্য হচ্ছে জীবনের উদ্দেশ্য ঈশ্বর লাভ। কিন্তু সবার দ্বারা এই জীবনেই ঈশ্বর লাভ সম্ভব নয়। কারুর এই জন্মেই ঈশ্বর লাভ হতে পারে, কারুর আগামী আগামী জন্মে ক্রমান্বয় উন্নতি লাভের মধ্য দিয়ে। এই ক্রমান্বয় উন্নতি কিভাবে হবে? যাঁরা ঈশ্বর লাভের জন্য প্রস্তুত আছেন, যাঁদের কোন দেহ বোধ নেই, সংসারের প্রতি কোন আশা আকাঙ্খা নেই, জগৎ থেকে কোন কিছুর প্রত্যাশা করে না, এঁরা জ্ঞানযোগকে অবলম্বন করে ঈশ্বরের বা আত্মার চিন্তা করে করে উন্নতির দিকে এগোবেন। যাঁরা ঈশ্বর লাভের জন্য প্রস্তুত নয়, যাঁদের এখনও অনেক কামনা-বাসনা রয়েছে, তাঁরা কর্ম করবেন। কিভাবে কর্ম করবেন? স্বধর্ম পালনের দ্বারা। স্বধর্ম পালন করতে করতে ফলস্পৃহা চলে যাবে। ফলস্পৃহা চলে যাবার পর এক সময় কর্মস্পৃহাও চলে যাবে। কর্মস্পৃহা চলে যাবার পর ঈশ্বরের চিন্তনে মনকে সব সময় নিযুক্ত রাখবে, তখন তাঁর মনটা পরিষ্কার হতে থাকবে। এরপর ঈশ্বরের কৃপাতে তাঁর মধ্যে ঈশ্বরের জ্ঞান প্রস্ফুটিত হয়ে যাবে। যখন ঈশ্বরের তত্ত্ব জ্ঞান এসে যাবে তখন সে ঈশ্বরের সাথে এক হয়ে গেল। এটাই গীতার মূল বক্তব্য। এই বলে জয় শ্রীগুরুমহারাজ বলে এত দিনের গীতা অনুধ্যান শেষ করা হচ্ছে।

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে
শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে মোক্ষযোগ নাম অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ।।

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা সমাপ্তা।
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ। হরি ওঁ তৎসৎ।
ওঁ শ্রীরামকৃষ্ণার্পণমস্তু ।।